দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

সচিত্র মাসিক পত্র

সপ্তবিংশ বর্ষ

দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ-১৩৪৬—জ্যৈষ্ঠ-১৩৪৭

সম্পাদক—

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
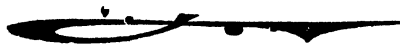
প্রকাশক—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—

পৌষ—১৩৪৬

দ্বিতীয় খণ্ড | সপ্তবিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

বাংলার খনিজসম্পদ ও বৈজ্ঞানিক শিল্প

অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের ভূগর্ভে বহুবিধ মূল্যবান খনিজপদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই ইহাকে রত্নপ্রসূ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের ভূতত্ত্বের সবিশেষ আলোচনা করিলে এরূপ বিশেষণ বাংলার প্রতি প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত হইবে কি-না সন্দেহ। আমরা আরও জানিতে পারিয়াছি যে, বহু নদনদী ও তাহাদের শাখাপ্রশাখার দ্বারা বাহিত পলি হইতে বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থান বিগত দশ পনর লক্ষ বৎসরের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে। এই উর্ব্বর পলি বা বাংলার মাটি হইতেই ফসলাদি ও নানাপ্রকার ফলফুল অল্প প্রয়াসে উৎপন্ন হইয়া যুগে যুগে বাঙ্গালীর জীবনধারণের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে বলিয়াই কবি গাহিয়াছেন—সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরং। এই সকল বিশেষণে ভূষিত করিয়া কবি এদেশের যথার্থ রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

বাংলাদেশের প্রকৃতিগত এরূপ অবস্থায় ইহা যে একটী কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভারের উপর নির্ভর করিয়া নানাপ্রকার শিল্প সহজেই গড়িয়া উঠিতে পারে। যথা, আকের চাষ হইতে চিনির কারখানা; অন্যান্য ফসল হইতে তৈলজাতীয় পদার্থ উদ্ধার করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে বহুবিধ দ্রব্যসম্ভার উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিলে নানাপ্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠানের সূচনা হইবে বলিয়া মনে হয়। এই সকল বিষয়ে রসায়নশাস্ত্রবিদ্‌গণ নানা শিল্পের পরিকল্পনা করিতে ও সে সম্বন্ধে মতামত দিতে পারিবেন।

সুতরাং এদেশ যাহাতে কৃষিশিল্পের ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে সে বিষয়ে দেশ-নেতৃবর্গের সবিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হইলেই মঙ্গল। এই কৃষিজাত উৎপন্নের উপর নির্ভর করিয়া এবং রসায়নশাস্ত্রবিদ্‌গণের চেষ্টায় নানা-

প্রকার বৈজ্ঞানিক শিল্পের সূচনা ও তাহাদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও পূর্ণবিকাশ হইলে দেশের ও দেশবাসীর অধিকতর উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। পলি হইতে উৎপন্ন ও কৃষিজাত নানা দ্রব্যসম্ভার ব্যতীত বাংলাদেশের ভূগর্ভে কিছু কিছু খনিজপদার্থের সন্ধান মিলিয়াছে সে সম্বন্ধে দু-এক কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বাংলার ভূতত্ত্বের মানচিত্রে দেখিতে পাই যে, প্রায় সকল স্থানেই বালুকামিশ্রিত কর্দ্দমাদি পলিদ্বারা আবৃত। ইহা যে কত গভীর তাহা আজও সঠিক জানিতে পারা যায় নাই। তবে গভীরতা যে পাঁচ শত ফুটেরও অধিক তাহা কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম বোরিং হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই বালুকা ও কর্দ্দমের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ স্থানসমূহে পঁচিশ-ত্রিশ ফুট নিম্নে একটী এক ফুট পীটজাতীয় কয়লাস্তর দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল পলিস্তরের বহু নিম্নে যে কি প্রকার প্রস্তর ও খনিজসম্পদ আছে তাহাও আজ অজ্ঞাত। তবে বাংলার পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তরাংশে একই যুগের একই প্রকার প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেই বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন যে, বাংলাদেশের পলিস্তরের নিম্নেও ঐ সমস্ত প্রস্তর পাওয়া যাইবে। বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে বাকুড়া মেদিনীপুর অঞ্চলে অতি পুরাকালের একশত-দেড়শত কোটী বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন স্তরের সঞ্চয় দেখিতে পাই। এই সকল স্থানের ভূতত্ত্ব আলোচনার ফলে যদিও বিশেষ কোনও খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই, তথাপি মনে হয়, বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করিলে কিছু স্বর্ণ প্রস্তরের (Gold Quartz) সন্ধান মিলিতেও পারে। বাংলার পশ্চিমাংশে বর্দ্ধমান জিলায় প্রায় বিশ-পচিশ কোটী বৎসর পূর্ব্বের গণ্ডোয়ানা যুগের স্তরের সমাবেশ দেখা যায়। এই স্তরের মধ্যে রাণীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্র অবস্থিত। উত্তর অঞ্চলে দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাদ্বয়ের মধ্যে আমরা প্রাচীন গণ্ডোয়ানা ও টারসায়ারী (Tertiary) যুগের প্রস্তর দেখিতে পাই। এই সকল স্থানের প্রস্তরসঞ্চয় হিমালয় অভ্যুত্থানকালীন চাপপ্রভাবে বিশেষভাবে পিষ্ট হইয়াছে ও সে কারণে তিনধারিয়া, কার্শিয়াং ও জয়ন্তি প্রভৃতি স্থানের গণ্ডোয়ানা যুগের স্তরে যে অল্প পরিমাণ কয়লা আছে তাহার খনন ও উদ্ধার বিশেষ কঠিন সাধ্য এবং কয়লাও ক্ষণভঙ্গুর অবস্থা-প্রাপ্ত হইয়াছে। দার্জ্জিলিং ও সিকিম অঞ্চলে কিছু তাম্রপ্রস্তরের সন্ধান পাওয়া গেলেও দুর্গমস্থানে অবস্থিত বলিয়া ইহার সম্পদের সঠিক পরিমাণ জানা যায় নাই ও ইহার পূর্ণ উদ্ধার ও ধাতু নিষ্কাষণ সহজসাধ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। জয়ন্তি অঞ্চলে চুনাপাথর যথেষ্ট পরিমাণে আছে ও ইহা হইতে চুন প্রস্তুত কার্য্যও কিছুদিন যাবৎ চলিতেছে; তবে এ অঞ্চলে চুনাপাথর হইতে সিমেন্ট (Portland Cement) প্রস্তুত হইতে পারে কি-না সে সম্বন্ধে এখনও বিশেষ মতামত পাওয়া যায় নাই। দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে টারসায়ারী (Tertiary) যুগের বালুকা-প্রস্তরের সমাবেশ আমরা উত্তরে বক্সা-ডুয়ার্স ও পূর্ব্বে পার্ব্বত্যত্রিপুরা রাজ্যের ও গারো পাহাড়ের দক্ষিণাংশে পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে দেখিতে পাই। এযুগে নানারূপ জৈব পদার্থের পচনের ফলে খনিজ তৈলের (Petroleum) উৎপত্তি ও সঞ্চয় স্থানে স্থানে সম্ভবপর হইয়াছে। বিশেষ পরীক্ষার ফলে এই যুগের প্রস্তরের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের স্থানে স্থানে ইহার অস্তিত্ব দেখিতে পাই। এ বিষয়ে বর্ত্তমানে ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুরের বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার ফলে আরও কিছু কিছু সন্ধান মিলিতেছে। যদি এই ত্রিপুরা রাজ্যের খনিজ তৈলসম্পদ যথেষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হয় তবে বাংলাদেশের খনিজ তৈলের অভাব কিঞ্চিৎ পূরণ হইবে বলিয়া আশা হয়। পূর্ব্বোক্ত আলোচনার ফলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, বাংলায় রাণীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্র ব্যতীত বিশেষ আশাপ্রদ মূল্যবান খনিজসম্ভার এখনও আমাদের আয়ত্তাধীন হয় নাই। এই রাণীগঞ্জস্থ কয়লাসম্পদ ও তৎসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক শিল্পের কথাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। ভারতের পাথুরে কয়লার প্রচলন পূর্ব্বে ছিল কি-না, তাহার কোনও বিবৃতি প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা কাঠকয়লার ব্যবহার বলিয়াই মনে হয়। তবে কতকগুলি স্থানের, যথা—বরাকর, কালিপাহাড়ী ইত্যাদি নাম হইতে অনেকে অনুমান করেন যে, এই সকল স্থানের কয়লার অস্তিত্ব লোকপূর্ব্বে জ্ঞাত ছিল বলিয়া এরূপ নামকরণ সম্ভবপর হইয়াছে। যাহা হউক, ভারতের মধ্যে রাণীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রই যে প্রথমে আবিষ্কার হইয়াছে সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আজ মুদ্রিত ও লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে একটী বিদেশী

কোম্পানী সীতারামপুরের নিকট কয়লা খননকার্য্য প্রথম আরম্ভ করেন এবং ক্রমশ ইহার কার্য্য বিশেষভাবে প্রসারিত হইতে থাকে। ভারতের কয়লা খনির মধ্যে রাণীগঞ্জের স্থানে স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা গভীর খাদ (পনর শত ফুট) দেখা যায় এবং বর্ত্তমানে ভারতের উৎপন্ন কয়লার মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এই ক্ষেত্র হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। রাণীগঞ্জ কয়লার ক্ষেত্র প্রায় ছয় শত বর্গমাইলব্যাপী প্রসারিত ও ইহাতে সর্ব্বসমেত প্রায় চল্লিশটী কয়লা স্তর পাওয়া গিয়াছে। কয়লা স্তরের উচ্চতা পাঁচ-ছয় ফুট হইতে সময় সময় বিশ-চল্লিশ ফুট হইয়া থাকে। এই সকল স্তরের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। অনেক দিনের পরিশ্রমের ফলে এই স্থানের দুই হাজার ফিট মধ্যে কয়লাসম্পদ সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কোক উৎপাদনকারী কয়লা—
প্রায় ২৫ কোটী টন

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কোক অনুৎপাদনকারী কয়লা—
প্রায় ১৬০ কোটী টন

নিম্ন শ্রেণীর কয়লা প্রায় ৬৮৬ কোটী টন

মোট কয়লা সম্পদ প্রায় ৮৭১ কোটী টন

বর্ত্তমান সময়ে প্রতি বৎসর প্রায় সত্তর লক্ষ টন কয়লা রাণীগঞ্জ অঞ্চলের খনি হইতে উত্তোলন করা হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে প্রচলিত খননপ্রণালী অনুসারে অর্দ্ধেকাংশের বেশী কয়লা ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করা সম্ভবপর হয় না এবং এই অপরিমার্জ্জিত প্রণালী প্রচলিত থাকায় বর্ত্তমানে ঘন ঘন দুর্ঘটনার ফলে বহুলোকের প্রাণনাশ হইতেছে ও মূল্যবান জাতীয় সম্পদের যে ক্ষতি হইতেছে তাহা পূরণ করা অসম্ভব। এ বিষয়ে ভারতবাসীর পুনঃ পুনঃ তীব্র আলোচনার ফলে সরকার বালুকাপূরণ-প্রথা (Sand Stowing) আইন বিধিবদ্ধ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই প্রথা অচিরে সকল খনিতে প্রচলিত হইলে ভবিষ্যতে খনি-দুর্ঘটনার বিশেষ লাঘব হইবে ও শতকরা প্রায় আশী-পঁচাশী ভাগ বা ততোধিক কয়লা উত্তোলন করা সম্ভবপর হইবে। ইহার ফলে দেশীয় কয়লা সম্পদের পরমায়ুও যথেষ্ট মাত্রায় বর্দ্ধিত হইবে সন্দেহ নাই।

বাংলাদেশের এই বহুমূল্য কয়লা সম্পদ যেভাবে বর্ত্তমানে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলে জানা গিয়াছে যে, ভারতের মধ্যে রাণীগঞ্জের উচ্চশ্রেণীর কয়লায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উদ্বায়ী ধূম (Volatiles) ও তৈলজাতীয় পদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই কারণে এই স্থানের কয়লা হইতে অধিক মাত্রায় গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই উদ্বায়ী ধূম হইতে আলকাতরা, বেঞ্জল অর্থাৎ পেট্রলজাতীয় তৈল, য়্যামোনিয়া, ন্যাপথেলিন প্রভৃতি দ্রব্যসম্ভার উৎপন্ন হইতে পারে। গবেষণার ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে, রাণীগঞ্জের উচ্চশ্রেণীর এক টন কয়লা হইতে বিশ-বাইশ গ্যালন আলকাতরা তিন-চারি গ্যালন বেঞ্জল (পেট্রল), সাত আট সের য়্যামোনিয়ম্ সাল্‌ফেট, ৪০০০-৫০০০ কিঃ ফিট গ্যাস ও প্রায় পনর হন্দর (৭৫ %) কোক্ কয়লা উদ্ধার করা যায়। এই আলকাতরা পুনরায় উত্তপ্ত করিলে নানাপ্রকার লাইট অয়েল, মিডল্ অয়েল ও পিচ্ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

কয়লার উদ্বায়ী ধূম হইতে এই সমুদয় পদার্থ বর্ত্তমানে অপসারিত না হওয়ার ফলে কি পরিমাণ মূল্যবান বস্তুর অপচয় হইতেছে তাহা অনেকের ধারণাতীত। বর্ত্তমানে কয়লার স্তূপে অগ্নিসংযোগ করিয়া যে প্রক্রিয়ায় পোড়া কয়লা প্রস্তুত হয় এবং তাহার ফলে যে পরিমাণ ধূম উদ্গীরণ হয় তাহার বাৎসরিক হিসাব করিলে দেখা যায়, প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ গ্যালন তৈল জাতীয় পদার্থ, পনর লক্ষ গ্যালন ফেনল ও ক্রিয়োজোট তৈল, বাইশ হাজার টন য়্যামন্ সাল্‌ফেট, প্রায় বত্রিশ হাজার টন পিচ্ ও বহু পরিমাণ গ্যাস উদ্ধার করা সম্ভব হইত। কিন্তু এই উচ্চশ্রেণীর কয়লা যথাতথা—নানারূপ কলকারখানায়, তাপোৎপাদনকারী বয়লারে ও বাষ্পীয় শকটে আজ ব্যবহৃত হইতেছে ও তৈল জাতীয় পদার্থ-বাহী উদ্বায়ী ধূম আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া বায়ুমণ্ডল দূষিত করিতেছে এবং মানবের কোন হিতকর কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারিতেছে না। এই খনিজ পদার্থের অপচয়ের সমূহ নিবারণকল্পে দেশবাসীর, তথা সরকারের বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, খনিজপদার্থ একবার ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করা হইলে তাহার আর পূরণ হইবে না এবং এই উদ্বায়ী ধূম একবার বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা হইতে

ভবিষ্যতে আর কিছু উদ্ধার করাও অসম্ভব। সুতরাং এখন হইতে সাবধানতা অবলম্বন না করিলে ভবিষ্যতে দেশবাসীকে এই অপচয়ের জন্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও অনুতপ্ত হইতে হইবে।

বর্ত্তমানে কয়লার ব্যবহারপ্রথারও কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই এবং ইহার অপব্যবহার প্রণালী সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করা কর্ত্তব্য। এবিষয়ে আমি জনসাধারণের, তথা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি ও করিতেছি। ভারত-সরকারের রেলওয়ে বোর্ডও এ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন, কারণ তাঁহারা নিম্নশ্রেণীর কয়লার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তে বাষ্পীয় শকটে কোক-উৎপাদনকারী বিশিষ্ট শ্রেণীর কয়লার যথেষ্ট অপব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা যে কোন মতেই দেশের পক্ষে হিতকর নহে, সে বিষয়ে আজ সকলেই একমত এবং অদূর ভবিষ্যতে ইহার সম্যক পরিবর্ত্তন হইলে সরকার দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন সন্দেহ নাই। দেশের নানা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেও এই শ্রেণীর কয়লার অপব্যবহার হইতেছে দেখিতে পাই। ইহারও যে আশু পরিবর্ত্তন আবশ্যক এবং জনসাধারণ যাহাতে এই গুরুতর বিষয় সহজে উপলব্ধি করিতে পারে সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক-গণের চেষ্টা ও প্রচার বিশেষ বাঞ্ছনীয়। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, কোন্ কোন্ শ্রেণীর কয়লা কিরূপ বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহৃত হওয়া উচিত—তাহা বিশেষ পরীক্ষার ও গবেষণার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে ও সেই ভাবে কয়লার ব্যবহার প্রচলিত হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। এ বিষয়ে সরকার হস্তক্ষেপ না করিলে কয়লাশিল্পের উন্নতি হইবে না। নিম্নশ্রেণীর কয়লা সাধারণ তাপ উৎপাদন কার্য্যের জন্য ব্যবহার হইলে বিশেষ কোনও ক্ষতি হইবে না। উচ্চশ্রেণীর কয়লার উদ্বায়ী ধূম হইতে আলকাতরা ও তৈল-জাতীয় পদার্থ অপসারিত করিয়া অবশিষ্ট কোক নানা উপায়ে কার্য্যকরী করা কর্ত্তব্য। উচ্চশ্রেণীর কোক-উৎপাদনকারী কয়লা কেবল মাত্র কোক্-শিল্পের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত, কারণ ইহার সম্পদ ভারতে অতি অল্প পরিমাণে বিদ্যমান এবং লৌহ প্রভৃতি ধাতু-নিষ্কাষণে বিশেষ উপযোগী। এই প্রকার প্রচলনবিধি কার্য্যত প্রয়োগ করা হইলে উৎকৃষ্ট কোক-উৎপাদনকারী কয়লাসম্পদের যথার্থ সংরক্ষণ হইবে বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে লেখক গতবৎসর সাহিত্য সম্মিলনের কৃষ্ণনগর অধিবেশনে একটী প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। নিম্নশ্রেণীর কয়লা নানা প্রক্রিয়ার দ্বারা গ্যাসে পরিণত করিয়া বহুবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত করা যাইতে পারিবে। এ প্রসঙ্গে গৃহস্থোপযোগী কোক্ বা পোড়া কয়লা-শিল্প সম্বন্ধে কিছু বলা একান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমানে নানা স্থানের নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা হইতে উদ্বায়ী ধূম উদ্ধার না করিয়া এই জাতীয় কোক উৎপাদন করা হয়। যে উপায়ে কয়লার গাদায় অগ্নি সংযোগ দ্বারা কোক্ প্রস্তুত করা হয় তাহা একেবারেই বিজ্ঞানসম্মত নহে এবং ইহার আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। সরকার এই প্রথার উন্নতিকল্পে কয়লার উপর একটী শুল্ক ধার্য্য করিয়াছেন এবং এই শুল্ক আজ বার-তের বৎসর যাবৎ আদায় করা হইতেছে; কিন্তু কেন যে প্রাচীন প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া সুপরিমার্জ্জিত উপায়ে কোক্ উৎপাদন করা হইতেছে না তাহার কৈফিয়ৎ বোধ হয় দেশবাসী আজ সরকারের 'সফ্ট কোক্ সেস কমিটির' নিকট দাবী করিতে সক্ষম। অন্যথায়, এই শুল্ক আদায় বন্ধ করিবার জন্য আন্দোলন করা কোনক্রমেই অনুচিত হইবে না।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে বাংলার কয়লাসম্পদ যথেষ্ট হইলেও ইহার বর্ত্তমান ব্যবহারপ্রণালী অনেকভাবেই দুষ্ট ও অপরিমার্জ্জিত এবং কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নহে। ইহাতে জাতীয় সম্পদের যথেষ্ট অপচয় হইতেছে, সে বিষয়ে জনসাধারণের ঔদাসীন্য দেশের পক্ষে মঙ্গলসূচক নহে। কয়লাসম্পদের কোনও মূল্যবান পদার্থ অপচয় না করিয়া সম্যকরূপে ব্যবহার ও কার্য্যোপযোগী করিতে হইলে আজ বাংলাদেশে কয়লাসম্পদের সহিত সংশ্লিষ্ট আরও নানারূপ বৈজ্ঞানিক শিল্পের সূচনা ও প্রতিষ্ঠা অবিলম্বে হওয়া আবশ্যক। ইহাতে জাতীয় সম্পদের সম্যক ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে নিম্ন পরিচ্ছেদে কিছু আভাস দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই সকল শিল্পের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে আজ আর কোনও মতভেদ নাই এবং বাংলাদেশে ইহাদের সূচনা ও প্রসারকার্য্যে সুবিধা ও অসুবিধার বিষয়ে কিছু আলোচনা আবশ্যক।

১। কোকশিল্প অর্থাৎ Low Temperature Carbonisation

২। আলকাতরা শিল্প অর্থাৎ Coal Tar Industry

৩। কয়লাকে তৈলজাতীয় পদার্থে পরিণত করা অর্থাৎ oil from coal

৪। গ্যাসশিল্প

৫। কয়লাচূর্ণীকৃত অবস্থায় ব্যবহৃত করা

৬। কয়লা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন

কোকশিল্প

এই low temperature corbonisation-এর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সকল তথ্য বিজ্ঞান-গবেষণাগারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছে ও এই শিল্প বিস্তারিতভাবে প্রচলনের ফলে বর্ত্তমান সভ্যজগতের যে অনেক উপকার সাধিত হইবে সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। এই প্রক্রিয়ায় কোক-উৎপাদনকারী কয়লা কোন আবদ্ধ পাত্রে বায়ু সংযোগব্যতিরেকে উত্তপ্ত করিলে উদ্বায়ী ধূম বহির্গত হইয়া গেলে পাত্রে যে পিণ্ড অবশিষ্ট থাকে তাহাকে soft coke বা semi coke বলা হয়। পাঁচ-সাতশত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করা হয় বলিয়া ইহাতে শতকরা পাঁচ-ছয় ভাগ উদ্বায়ী ধূম বিদ্যমান থাকে এবং এই কারণেই এই জাতীয় কোক অতি সহজেই প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাপসঞ্চার করিতে থাকে। এই প্রকার কোক্ সাধারণ গৃহস্থের রন্ধনচুল্লীর বিশেষ উপযোগী। কয়লা হইতে যে উদ্বায়ী ধূম বহির্গত হয় তাহা হইতে আলকাতরা, বেঞ্জল, য়্যামোনিয়ম্ সাল্‌ফেট, ফেনাইল ও গ্যাস প্রভৃতি পদার্থ অল্পায়াসেই উদ্ধার করা সম্ভবপর হইতেছে। ভারতের মধ্যে রাণীগঞ্জ কয়লায় এই সকল পদার্থের পরিমাণ কিছু অধিক। এই সকল পদার্থের নিত্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বর্ত্তমান সভ্যজগতে সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন। পেট্রলের ন্যায় বেঞ্জল ব্যবহার আজ যথেষ্ট প্রচলিত। বাংলার কৃষিকার্য্যে য়্যামোনিয়ম্ সাল্‌ফেট সার পদার্থের বহুল প্রসার অবশ্যম্ভাবী। আলকাতরা হইতে লাইট অয়েল, মিডল্ অয়েল ও ক্রিয়োজোট অয়েল প্রভৃতি পদার্থের উদ্ধার হইলে তাহা আমাদের নানা প্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারিবে এবং অবশিষ্ট পিচ (pitch)-এর ব্যবহার পথপ্রস্তুতকার্য্যে অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। আলকাতরা (Tar) হইতে নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে যে আরও নানাবিধ বস্তু ও গন্ধদ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভবপর হইয়াছে তাহা আজ বিজ্ঞান-সমাজে নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। এই প্রকার শিল্পের প্রচলন আমাদের দেশে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই সকল দ্রব্যসম্ভার উদ্ধারের পর যে গ্যাস অবশিষ্ট থাকে তাহার তাপ-উৎপাদনকারী শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় ইহার দ্বারা নানারূপ উপকার সাধিত হইতে পারিবে। এই শিল্প প্রতিষ্ঠানের সন্নিকটে ছোট ছোট কারখানা সহজেই গড়িয়া উঠিতে পারিবে এবং এই গ্যাস অল্প মূল্যে উৎপন্ন হইলে এই সকল কারখানার কাজও দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে। আবদ্ধ পাত্রে অবশিষ্ট যে সপ্ট কোক বা সেমি কোক বা পোড়া কয়লা পাওয়া যাইবে তাহা গৃহস্থের রন্ধনচুল্লীর বিশেষ উপযোগী সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে অপরিমার্জ্জিত উপায়ে যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কোক কয়লা উৎপন্ন হইয়া সাধারণ গৃহস্থের নিকট উপনীত হইতেছে তাহা অপেক্ষা এই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রস্তুত কোক্ সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই এবং ইহার দ্রুত প্রচলন ও বহুল প্রসার সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত হইতে পারা যায়। যে শুল্ক বর্ত্তমানে সরকার পোড়া কয়লার জন্য আদায় করিতেছেন তাহা এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা ও উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করিলে সুবুদ্ধির পরিচয় দিবেন। জার্ম্মানী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এই low temperature carbonisation শিল্পের সূচনা ও প্রচার বিশেষভাবে চলিতেছে এবং সম্প্রতি ইংলণ্ডে এই শিল্পের বহুল প্রসারের জন্য ইম্পিরিয়াল কেমিকাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ নামীয় কোম্পানীকে সরকার অনেক অর্থ সাহায্য করিতেছেন। রাণীগঞ্জের কয়লা এই হিসাবে বিশেষ উপযোগী বলিয়া সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সরকারের সাহায্য দ্বারা এরূপ হিতকর ও অতি-প্রয়োজনীয় একটী প্রতিষ্ঠানের সূচনা হইলে বাংলাদেশের একটী বিশেষ অভাব দূরীভূত হইয়া আরও নানাজাতীয় ছোট ছোট রাসায়নিক শিল্পও গড়িয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। রাণিগঞ্জ অঞ্চলে বা নিকটবর্ত্তী স্থানে এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে বা কলিকাতার উপকণ্ঠে স্থাপিত হইলে রেলযোগে কয়লা কর্ম্মস্থলে লইয়া আসিতে হইবে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এই শিল্পের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবার পথে বিজ্ঞানের

দিক দিয়া কোনও অন্তরায় নাই। তবে অসুবিধার কথা কিছু আলোচনা করাও আবশ্যক। অসুবিধার পথে প্রথমেই আর্থিক সমস্যার কথা উঠিতে পারে। তবে তাহা প্রধান অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত করিতে আমি বিশেষ ইচ্ছুক নাই। কারণ দেশে ধনী ব্যবসায়ীর অভাব নাই এবং সরকারের সাহায্য পাইলে ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতানুসারে অগ্রসর হইলে এরূপ প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত কঠিন ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে। দ্বিতীয় প্রশ্নটী এই, যে সমুদয় দ্রব্যসম্ভার এই শিল্প প্রতিষ্ঠান হইতে উৎপন্ন হইবে তাহা কি বিদেশ হইতে আমদানি দ্রব্যাদির সহিত গুণে ও মূল্য প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইবে? উৎপন্ন পদার্থের যথেষ্ট চাহিদা থাকিবে কি-না? আমার মতে এই প্রশ্ন দুইটীর সম্যক সমাধান করিতে পারিলে আর কোনও বাধা বিঘ্ন বা অন্তরায়ের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইবার কারণ থাকিবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক দ্বারা পরিচালিত এরূপ প্রতিষ্ঠান হইতে যে সকল দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইবে তাহার গুণাবলী উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ও বিদেশী পণ্যের সমকক্ষ বা অধিকতর উচ্চশ্রেণীর হইবে। এ বিষয়ে বহু দৃষ্টান্ত আজ ভারতের নানা প্রতিষ্ঠান হইতে পাওয়া যাইতেছে। তবে মূল্যের পরিমাণ কিরূপ নির্দ্ধারিত হইবে তাহা এ অবস্থায় বলা অসম্ভব। এরূপ প্রতিষ্ঠানের সূচনা ও প্রারম্ভে নানা প্রতিকূল অবস্থার সংঘটন হইতে পারে এবং অর্থাভাব হইলে সরকারের সাহায্য ও সহানুভূতি একান্ত আবশ্যক। উৎপন্ন দ্রব্যের যদি মূল্য কিছু অধিক হয় তবে বিদেশী দ্রব্যের প্রতিযোগিতা রোধ করিবার জন্য আমদানি পণ্যের উপর উপযুক্ত শুল্ক (Countervalling duty) ধার্য্য করা সরকারের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য হইবে, নতুবা এরূপ নূতন প্রতিষ্ঠান উন্নতি ও প্রসার লাভ করিবার পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইবে। পৃথিবীর সকল দেশেই এরূপ নূতন বৈজ্ঞানিক শিল্পের অপরাপর প্রতিষ্ঠানের সূচনা ও উন্নতিকল্পে সরকারের সাহায্য ও সহানুভূতির বহু দৃষ্টান্ত আজ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। শেষোক্ত প্রশ্নটীও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ কোক্, আলকাতরা, য়্যামোনিয়ম্ সাল্‌ফেট প্রভৃতি পদার্থের ব্যবহারের ক্রমবৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে এ সকল দ্রব্যসম্ভারের চাহিদা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে তাহা অনুমেয়। এই কৃষিপ্রধান দেশে রাসায়নিক সার পদার্থ (যথা, য়্যামোনিয়ম্ সাল্‌ফেট) ক্রমশ অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইবে ও তাহা এই জাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান হইতে সুলভে সরবরাহ হইতে থাকিবে। ইহার ফলে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইবে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, যাবতীয় কয়লাশিল্পের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটী সর্ব্বসাধারণের ও দেশের পক্ষে একটী বিশেষ হিতকর। ইহার প্রবর্ত্তনের জন্য দেশীয় ধনী ব্যবসায়ী ও বৈজ্ঞানিক কর্ম্মীদের সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া কিছু উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে এবং এরূপ শিল্পের সূচনা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

আলকাতরা শিল্প

উপরোক্ত প্রথম প্রতিষ্ঠানের প্রবর্ত্তন হইলে উহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে আলকাতরা উৎপন্ন হইবে। তাহা হইতে পুনরায় নানা জাতীয় গন্ধ ও রং প্রভৃতি দ্রব্যাদি উদ্ধার করা সম্ভব। এই জাতীয় সমুদয় পদার্থই আজ বিদেশ হইতে আমদানি হয় এবং কত লক্ষ টাকা যে দেশ হইতে বিদেশে যাইতেছে তাহার হিসাব অতি অল্প লোকেই রাখেন। এই উন্নত বৈজ্ঞানিক যুগেও যে আমাদের দেশে এই শিল্পের পরিকল্পনা এখনও হয় নাই তাহা বিশেষ পরিতাপের বিষয়। এই শিল্পের সূচনা হইলে দেশের অনেক আবশ্যকীয় সামগ্রী দেশেই উৎপন্ন হইবে এবং তজ্জন্য বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা দেশেই থাকিয়া যাইবে। এ বিষয়ে ধনী ব্যবসায়ীগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে যে দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইবে তাহা অনুমেয়। উপরোক্ত প্রথম প্রতিষ্ঠানের সন্নিকটেই এই প্রতিষ্ঠান সহজেই গড়িয়া উঠিতে পারিবে বা ব্যবসাকেন্দ্র ও শহরের উপকণ্ঠে ইহার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। এ প্রতিষ্ঠানের প্রথম অবস্থায় কিছু বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও যে তাহা অপসারিত করা অসম্ভব হইবে এরূপ মনে হয় না; কারণ সরকারের সাহায্য ও সহানুভূতি নিশ্চিত পাওয়া যাইবে। এই আলকাতরা হইতে বহুবিধ পদার্থ উদ্ধার করা সম্ভবপর হইবে ও সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য আমাদের

দৈনন্দিন ব্যবহারোপযোগী হইয়া সহজেই প্রচলিত হইতে থাকিবে। তবে বৈজ্ঞানিক শিল্পের ক্রমবিকাশের জন্য বৈজ্ঞানিকগণকে অধিকতর চেষ্টা করিতে হইবে ও তাঁহাদের গবেষণার ফলাফল দেশবাসীর মধ্যে বিশেষভাবে প্রচারিত করিতে হইবে। ধনী ব্যবসায়ীগণের সহিত সুপরামর্শ ঘনীভূত হইলে দেশের ব্যবসার ও আর্থিক সমস্যার সমাধান হইবে এরূপ আশা করা যায়।

কয়লাকে তৈল জাতীয় পদার্থে পরিণত-করণ

বর্ত্তমান সময়ে বাংলার উৎপন্ন খনিজপদার্থের তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, এক গ্যালন তৈলও খনি হইতে উত্তোলন করা হয় না। অথচ এই বাংলায় কত শত গ্যালন পেট্রল ও কেরোসিন তৈল ব্যবহৃত হইতেছে তাহা কাহারও নিকট অবিদিত নহে। প্রায় ছয় কোটী বৎসর পূর্ব্বে টারসিয়ারী যুগের প্রস্তরসঞ্চয় উত্তর বঙ্গে জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স প্রভৃতি স্থানে পাওয়া গেলেও তাহার মধ্যে খনিজ তৈলের সন্ধান আজও পাওয়া যায় নাই। তবে গারো পাহাড়ের দক্ষিণাংশে ও ত্রিপুরা রাজ্যের টারসিয়ারী যুগের প্রস্তরে কিছু তৈলের সন্ধান মিলিয়াছে এবং বর্ত্তমানে তাহার সম্পদের পরিমাণ ও অপরাপর জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুরের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এই প্রচেষ্টা ফলবতী হইলে বাংলার খনিজ তৈল কিছু পরিমাণে উৎপন্ন হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদগণ একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্তই করিয়াছেন যে, এ স্থানের তৈল-সম্পদের উত্তোলনকার্য্য আরম্ভ হইলেও তাহার দ্বারা বাংলার খনিজ তৈল সমস্যার সম্যক্ সমাধান হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে আসাম, ব্রহ্ম ও পাঞ্জাব প্রদেশ একত্রে পৃথিবীর উৎপন্ন তৈলের মধ্যে শতকরা একভাগ তৈল বৎসরে উৎপাদন করে। প্রতি বৎসর প্রায় ২৩ কোটী গ্যালন তৈল বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়। (রুশ = ১৩·৬%; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র = ১৭·২% ; বোর্ণিও = ১৩·৭% ; পারস্য = ৪২·৭% ; অন্যান্য দেশ = ১২·৮%)

সুতরাং অপর কোন উপায়ে যদি তৈল জাতীয় পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায় বা উৎপাদন করা যায়, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের ও ব্যবসায়ীদের মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। প্রথমোক্ত লো টেম্পারেচার কার্ব্বনিজেশন শিল্প হইতে কিছু তৈলজাতীয় পদার্থ পাওয়া গেলেও তাহা যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইবে না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা (hydrogenation or Berginisation) যে কয়লাকে তৈলে পরিণত করা সম্ভব তাহা বিগত ইউরোপ-মহাসমরের প্রাক্কালে জার্মানীর বৈজ্ঞানিক Bergius মহোদয় প্রতিপন্ন করিয়া মানবসমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন ও তাঁহার নাম আজ প্রাতঃস্মরণীয়। একটী আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে কিছু উত্তাপ ও চাপের প্রভাবে কয়লা চূর্ণের সহিত হাইড্রোজেন প্রতিক্রিয়ার ফলে কয়লা ক্রমশ দ্রবীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পরে এই পদার্থ হইতে তাপের বিভিন্ন মাত্রায় নানা প্রকার তৈল উদ্ধার করা হয়। এই পদ্ধতিকে Bergius সাহেবের নামে Berginisation বলা হয়। এই প্রণালীতে প্রায় অর্দ্ধেকাংশ কয়লা তৈলে পরিণত হইতে দেখা যায়। কয়লা ব্যতীত আলকাতরা ও গ্যাস হইতেও তৈল উৎপাদন করা সম্ভবপর হইয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর কয়লা হইতে আলকাতরা উদ্ধার করিয়া বা গ্যাসে পরিণত করিয়া তাহা হইতে তৈল উৎপাদন করিতে পারিলে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার ব্যবহার সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে। রাসায়নিক প্রক্রিয়া ক্রমশ নানা ভাবে পরিমার্জ্জিত ও উন্নত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন এবং সে বিষয়ের বিশদ আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে জার্ম্মাণীর Ficher, Tropsch প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা কয়লা হইতে উৎপন্ন এবং আলকাতরা বা গ্যাস হইতে উৎপন্ন যে সমস্ত তৈলজাতীয় পদার্থ পাওয়া যাইবে তাহা মোটরকার, বিমানপোত, এঞ্জিন ও নানাবিধ কলকারখানায় পেট্রলের পরিবর্ত্তে সুচারুরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে তাহা প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। তবে এ সমস্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা বাংলা দেশের কয়লা হইতে তৈল উৎপাদন করা কিরূপ ব্যয়সাধ্য, তাহার সঠিক হিসাব আজও বৈজ্ঞানিকগণ ব্যবসায়ীদের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রস্তুত করেন নাই। তাঁহাদের মনোযোগ অবিলম্বে এদিকে আকর্ষণ করিতেছি এবং বর্ত্তমানে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের সূচনা হইতে যদি বিশেষ আর্থিক অসুবিধা না হয় তবেই মঙ্গল। রাণীগঞ্জ কয়লার ক্ষেত্রে এইভাবে নানা কয়লা-শিল্প ও আনুষঙ্গিক অপরাপর অনেক প্রতিষ্ঠান

প্রসার লাভ করায় দেশের বহুবিধ দ্রব্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উৎপন্ন হইয়া দেশবাসীর ব্যবহারে নিযুক্ত হইবে এবং ক্রমশ বিদেশী দ্রব্যের চাহিদা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া দেশের মঙ্গল সাধিত হইতে থাকিবে। অবশ্য যদি এরূপ একটী প্রতিষ্ঠানের সূচনায় আর্থিক কিছু বাধা বিঘ্ন ঘটে, তাহার সমুচিত অপসারণের জন্য দেশবাসীর আন্তরিক চেষ্টা আবশ্যক। সরকারের সহানুভূতি, সাহায্য ও বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য্য না করিলে এই প্রকার জাতীয় প্রতিষ্ঠান যে বিদেশী প্রতিযোগিতা সত্বেও ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

গ্যাস-শিল্প

প্রথমোক্ত Low Temperature Carbonisation শিল্পে কয়লা হইতে উৎপন্ন গ্যাস যে নানা প্রকার কার্য্যে ও কলকারখানায় ব্যবহৃত হইতে পারিবে তাহা বলা হইয়াছে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা হইতে অধিক পরিমাণে গ্যাস উদ্ধার করাই সম্ভব। এই low temperature carbonisation শিল্পের সাহায্যে দেশের নিম্নশ্রেণীর ও অপকৃষ্ট কয়লার বিশেষ বা অধিকতর ব্যবহার হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এই নিম্নশ্রেণীর কয়লা স্তরগুলি আমাদের নানা উপায়ে কার্য্যকরী করিতে পারিলে উচ্চশ্রেণীর কয়লাসম্পদ অধিকতর দিন স্থায়ী হইয়া নানা প্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারিবে এবং এই উপায়ে কয়লাসম্পদের সংরক্ষণ সমস্যারও সমাধান হইতে পারিবে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা জলীয় বাষ্প ও বায়ুর সাহায্যে কয়লা সম্পূর্ণরূপে গ্যাসে (Producer or water gas) পরিণত হইতে পারে। উচ্চশ্রেণীর কয়লা হইতে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহার গুণাবলী নিম্নশ্রেণীর কয়লা হইতে প্রাপ্ত গ্যাস অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। নিম্নশ্রেণীর কয়লা এই উপায়ে গ্যাসে পরিণত করিবার পক্ষে কোনও অসুবিধা নাই এবং অল্প প্রয়াসে এই জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। এরূপ শিল্প শহরের নানা স্থানে কলকারখানায় বা শহরের উপকণ্ঠে বা রাণীগঞ্জ অঞ্চলে সহজেই স্থাপিত হইতে পারে। এই গ্যাস প্রস্তুতকার্য্য ও ছোট ছোট পিত্তল, লৌহ বা অন্যান্য ধাতু ঢালাই বা কাঁচের কারখানা একসঙ্গে এবং সুবিধামত একই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলে পরস্পর যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক ক্ষুদ্রতর শিল্পের সূচনা ও প্রসার লাভ হইবে সন্দেহ নাই। এই গ্যাস তাপ উৎপাদন ব্যতীত আলোক প্রদান কার্য্যে ও অপরাপর নানাবিধ উপায়ে নিয়োজিত করিতে পারা যাইবে। এইভাবে উৎপন্ন Producer Gas বা Water Gas যে বহুমূল্য পদার্থ নহে তাহা বৈজ্ঞানিকগণ জ্ঞাত আছেন। যদি এক স্থানে একটী বড় গ্যাস প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করা সম্ভবপর হয় তবে সে স্থান হইতে আবশ্যক হইলে এবং ব্যয়সাধ্য হইলে বহুদূর পর্য্যন্ত, এমন কি একশত-দেড়শত মাইল পর্য্যন্ত নল দ্বারা লইয়া যাইতে পারা যাইবে। এই গ্যাস-শিল্প যাহাতে অনতিবিলম্বে প্রবর্ত্তিত হয় সে বিষয়ে আমি ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বাংলার খনিতে যে সমস্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা আছে তাহার সদ্ব্যবহারের সম্যক সমাধান এই শিল্পের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে সাধিত হইবে। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট রুশিয়ার অভিনব প্রণালীতে কয়লাস্তর হইতে গ্যাস উৎপাদন করা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিলে এ বিষয়টী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তথায় খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করিবার পরিবর্ত্তে ভূগর্ভে নিহিত কয়লাস্তরে অগ্নি সংযোগ করা হয় এবং সেই প্রজ্জলিত স্তরের উপর বায়ু ও জলীয় বাষ্প রাসায়নিক পদ্ধতি অনুসারে (water gas reaction) ক্রমান্বয়ে প্রয়োগ করা হয়। ইহার ফলে কয়লা সম্পূর্ণরূপে গ্যাসে পরিণত হইতে থাকে। তবে প্রথমাবস্থায় বায়ু সংযোগে প্রজ্জলিত করা এবং পরবর্ত্তী সকল অবস্থায় বায়ু ও জলীয় বাষ্পের প্রয়োগ সর্ব্বতোভাবে পরিচালকের আয়ত্তাধীন থাকে এবং বাহিরের অন্য কোন স্থান হইতে যাহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। গ্যাস উৎপাদন-কালে প্রয়োজন হইলে সত্বর অগ্নি নির্ব্বাপিত করার সুব্যবস্থাও আছে। এই প্রকারে ভূগর্ভস্থ কয়লা স্তর হইতে ক্রমশ গ্যাস উৎপাদন করিয়া নলসংযোগে উপরে লইয়া আসিয়া গ্যাসাধারে সঞ্চিত করা হয়। কখনও কখনও শতাধিক মাইল দূরবর্ত্তী কলকারখানায় নল দ্বারা বাহিত হইয়া এই গ্যাস ব্যবহৃত হইতেছে। রুশিয়ায় এরূপ অভি-

জ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে খননকার্য্যের জটিলতা অনেক পরিমাণে সমাধান হয়। এ উপায়ে গ্যাস অল্প মূল্যে উৎপন্ন হওয়ায় এই শিল্পের অধিকতর প্রসার হইতেছে। এই অভিনব প্রণালী পৃথিবীর আর কোথাও প্রচলিত হইতেছে কি-না তাহা আমাদের অবিদিত। ভারতের কয়লা স্তর হইতে এরূপ প্রথায় সহজে এবং নির্ব্বিঘ্নে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হইবে কি-না তাহা খনিবিশেষজ্ঞ ও রসায়ন-শাস্ত্রবিদগণের চিন্তার বিষয়।

কয়লার চূর্ণীকৃত অবস্থায় ব্যবহার

কলকারখানায় বাষ্পীয় শকটের বা অর্ণবপোতের বাষ্প উৎপাদনকারী বয়লারে কয়লা বড় বড় খণ্ডাকারে ব্যবহৃত হইতেছে। যে উপায়ে বর্ত্তমানে কয়লার প্রজ্জ্বলনকার্য্য হয় এবং যে শ্রেণীর এঞ্জিন ও বয়লার প্রচলিত তাহাতে উচ্চ শ্রেণীর কয়লা ব্যতীত তাপ উৎপাদনকার্য্যে বিশেষ সুফল লাভ হয় না। এই জন্যই আজ ভারতের সকল প্রতিষ্ঠানেই উচ্চ শ্রেণীর কয়লার চাহিদাই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এবং নিম্ন শ্রেণীর কয়লার ব্যবহার কিছুমাত্রায় বর্দ্ধিত হইতেছে না। এই কারণে এবং ভারত সরকারের কোল গ্রেডিং বোর্ডের নিয়মাবলীর প্রচলন হেতু খনিপরিচালকগণ নিম্নশ্রেণীর কয়লার উদ্ধারকার্য্যে একেবারেই উদাসীন। এরূপ কার্য্যপ্রণালীর ফলে ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ ও গিরিডি প্রভৃতি স্থানের খনিতে গত কয় বৎসর মধ্যে কত বিস্ফোরণ ও দুর্ঘটনা হইয়াছে এবং তাহাতে কত নিরীহ লোকের প্রাণনাশ হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। যে বয়লারে কয়লা খণ্ডাকারে ব্যবহৃত হয় তাহাতে চূর্ণীকৃত কয়লার ব্যবহার অসম্ভব। যদি কলকারখানা ও বাষ্পীয় শকট প্রভৃতির এঞ্জিন ও বয়লারের কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তবে কয়লা চূর্ণীকৃত অবস্থায় সুচারুরূপে প্রজ্জ্বলিত ও ব্যবহৃত হইতে পারিবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, চূর্ণীকৃত অবস্থায় উচ্চতম হইতে নিম্নতম সমস্ত শ্রেণীর কয়লা সহজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে তাপ উৎপাদন করিতে সমর্থ। এই বিজ্ঞানসম্মত ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালীর প্রচলন হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কয়লার ব্যবহার ও সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চাহিদাও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। খনিপরিচালকগণও এই সকল শ্রেণীর কয়লার উত্তোলনকার্য্য সম্পন্ন করিতে আর দ্বিধা বোধ করিবেন না। ইহার ফলে খনি দুর্ঘটনারও যথেষ্ট লাঘব হইবে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে ভারতের সিমেণ্ট প্রস্তুত কারখানায়, ঘাটশিলার তাম্র নিষ্কাষণ চুল্লীতে ও অপরাপর কয়েকস্থানে মাত্র এইরূপ চূর্ণীকৃত অবস্থায় কয়লার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এই প্রথার প্রচলনের জন্য গত কয়েক বৎসর যাবৎ অনেক আন্দোলন হইয়া আসিতেছে এবং তাহার ফলে অচিরে কিছু সুফল লাভ হইলেই দেশের পক্ষে মঙ্গল। জার্মানী, আমেরিকা, জাপান ও অন্যান্য কয়েকটী দেশে এই প্রকার কয়লার প্রচলন যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

কয়লা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন

বাংলাদেশে হাইড্রো-ইলেকট্রিক পদ্ধতির প্রচলনে যখন কোনও সুবিধা দেখা যাইতেছে না, তখন অপর কোনও উপায়ে স্বল্পমূল্যে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন করা সম্বন্ধে দেশবাসীর মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

উপরোক্ত নানাবিধ পদ্ধতির মধ্যে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর কয়লা হইতে উৎপন্ন চূর্ণীকৃত কয়লার সদ্ব্যবহারের ফলে সহজে ও স্বল্পমূল্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের প্রতিষ্ঠান রাণীগঞ্জ অঞ্চলে স্থাপিত করা বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিযুক্ত হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের ফলে সমস্ত কয়লার খনিতে ও নানা প্রকার নূতন কলকারখানায় বৈদ্যুতিক শক্তি অল্প মূল্যে বিতরিত হইতে পারিবে। এ বিষয়ে সঠিক হিসাব বিশেষজ্ঞগণ করিতে পারিবেন। যদি প্রকৃতই বিশেষ অল্পমূল্যে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন সম্ভবপর হয়, তবে ছোটনাগপুর, রাঁচী প্রভৃতি স্থান হইতে এলুমিনিয়াম প্রস্তর আমদানী করিয়া তাহা হইতে বৈদ্যুতিক প্রণালী দ্বারা এলুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন রাণীগঞ্জে সম্ভবপর হইতে পারিবে। যদি এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় তবে ভারতের খনিজ শিল্পের মধ্যে একটী বিশেষ অভাব অপসারিত হইয়া অতি প্রয়োজনীয় শিল্পের সূচনা হইবে সন্দেহ নাই। ভারতের মধ্যে বাংলাদেশ একটী প্রধান শিল্পের কেন্দ্র হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমান ভারতের বিভিন্ন স্থানের বক্সাইট যৎসামান্য মূল্যে বিদেশে রপ্তানি হইতেছে ও বিদেশে এই এলুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশিত হইয়া আমাদের নিকট অত্যধিক মূল্যে বিক্রীত হইতেছে।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে এলুমিনিয়াম ধাতুর কিরূপ দ্রুত প্রচলন হইতেছে তাহা সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন। এরূপ অবস্থার অবসান না হইলে দেশের আর্থিক উন্নতি যে বিশেষ ব্যাহত হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এই বৈদ্যুতিক শক্তির প্রজনন ও প্রসার লাভ হইলে এলুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাষণ ব্যতীত অপরাপর লৌহ, তাম্র—পিত্তল বা নানা প্রকার মিশ্রিত ধাতুর প্রস্তুত ও ঢালাইকার্য্য সহজেই প্রচলিত হইবে। কয়লা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন-কার্য্য যাহাতে অচিরে সফল হয় সে বিষয়ে সরকারের বিশেষজ্ঞগণের মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনার ফলে আমরা পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, বাংলার রাণীগঞ্জ ক্ষেত্রে যে কয়লা-সম্পদ আছে তাহার সম্পূর্ণ উদ্ধার ও সম্যক ব্যবহার করাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে উচিত। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে কয়লা-সম্পর্কীয় নানা প্রকার শিল্পের প্রতিষ্ঠান যাহাতে অচিরে প্রবর্ত্তিত হয় সে বিষয়ে আমাদের যত্নবান হইতে হইবে; কারণ এ বিষয়ে যত বিলম্ব হইবে তত কয়লা-সম্পদের পরমায়ু হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের ফলে কয়লার অপব্যবহার ও নানা প্রকার আনুষঙ্গিক পদার্থের অপচয় নিবারিত হইবে। এই প্রবন্ধে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের কথা কল্পনা করা হইয়াছে তাহাদের সুবিধা সম্বন্ধে অনেক কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহাদের সূচনা ও প্রারম্ভকালে যে কিছু বাধা বিঘ্ন বা অন্তরায়ের সম্মুখীন হইতে হইবে তাহারও কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে। তবে কোনরূপ মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলে বাধা বিঘ্ন খণ্ডন জন্য যে সমবেত চেষ্টার ত্রুটি হইবে না এরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক এবং দেশের জনসাধারণ ও সরকারের সহানুভূতি ও সাহায্য পাইলে এ সকল অন্তরায় সহজেই দূরীভূত করিতে পারা যাইবে। এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনার জন্য ধনী ব্যবসায়ীগণের অগ্রসর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য ও বৈজ্ঞানিকগণের সহিত পরামর্শের ফলে কি ভাবে প্রতিষ্ঠানের সূচনা হইতে পারে তাহা স্থির করা উচিত। এ কারণে বিশেষজ্ঞ ও ব্যবসায়ীর সংযোগে একটী কমিটী গঠন করিয়া এ সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হওয়া উচিত। এদিকে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে কিছু সুফল লাভ হইবে সন্দেহ নাই।

তুমি আর আমি

শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার রায়

তোমাতে আমাতে বাহিব তরণী
আজি এ মধুর রাতে
আমি গা'ব গান শুনিবে গো তুমি
রহি মোর সাথে সাথে॥

পুলকিত হ'বো তুমি আর আমি—
শুনিয়া নদীর গান—
তোমার আমার মাঝখানে প্রিয়—
থাকিবে না ব্যবধান॥

ধরণীর মাঝে আমি আর তুমি
আর যেনো কেহ নাই—
মিলন মধুর চাঁদিনীর রাতে—
তোমারে নিকটে চাই॥

গগনে গগনে বাজিবে শঙ্খ
পুষ্প ঝরিবে শিরে—
এসো প্রিয় এসো, আরো সরে এসো
আমার কাছেতে ধীরে॥

সব কোলাহল থেমে যাক প্রিয়
সব কিছু দূরে থাক—
তুমি আর আমি, আমি আর তুমি
এই শুধ থেকে যাক॥

মোহ-মুক্তি

নাটক

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দশম দৃশ্য

স্থান রমণ মিত্রের (ভক্তিভূষণের) বাড়ীর অন্দর মহল

সময়⋯বেলা দশটা

উপস্থিত⋯রমণ মিত্র, পত্নী রাধারাণী, বিধবা কন্যা ননীবালা

ননীবালা। (পিতাকে) আমাকে এক-হপ্তার কড়ারে নিয়ে এলে বাবা—একমাস হয়ে গেল! সেখানে মা থাকলে ভাবতুম না। বাবার যে কি অসুবিধে হচ্ছে—তা আমিই জানি। সব কাজেই তিনি আমার মুখ চেয়ে থাকেন। আমি না হ'লে তাঁর একদণ্ড চলে না। তুমি আমাকে আজই সেথা রেখে এসো বাবা। দুবার তাঁদের লোক নিতে এলো, দুবারই তুমি ফিরিয়ে দিলে! তাঁদের টাকাকড়ি, কাগজ-পত্তোর সবই যে আমার ওই ট্রাঙ্কে। সেখানে টাকার দরকার—টাকা দিতে পারলুম না! তুমি চাবি খুঁজে পেলে না—আমার মাথা কাটা গেলো। এখন পেয়েছ তো বাবা?

রমণ। (সহাস্যে পত্নীর প্রতি) পাগলির কথা শোনো,—তাদের টাকার দরকার! কুবের বল্‌লে হয়, ভাসুর এটর্নি, আমি কি যে-সে ঘরে মেয়ে দিয়েছিলুম—ভাগ্য!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন—পত্নী অঞ্চলে চোখ মুছলেন

রমণ। (কন্যার প্রতি)—সেখানে তোমার আর সুখের কি আছে মা—যার জন্যে এত তাড়া? বাপ, মা, ভাই বোন নিয়ে বাপের বাড়ী থাকতে কি তোর কষ্ট হয় ননী? তাদের চাকর দাসীর অভাব কি?

ননী। ও-কথা কয়ো না বাবা। সেখানকার কথাটা তুমি যে ভাবচই না। বাবার খাওয়া-পরা থেকে টাকা-কড়ি, বিষয়কর্ম্মের খাতা-পত্র, সবই যে তাঁরা আমার হাতে দিয়ে রেখেছেন! সেখানে মা থাকলে আমি এতো ভাববো কেনো? তাঁদের জীবন-বিমার 'প্রিমিয়ম্' কবে দিতে হবে, কার কতো দিতে হবে—তাও যে আমাকেই দেখতে হয়—সময় না পেরিয়ে যায়! (চঞ্চলভাবে) চাবিটে দাও তো বাবা, একবার দেখি।

রমণ। আচ্ছা—ও-বেলা দেখিস্ ননী। কোথায় যে ফেললুম! বাড়িতেই আছে নিশ্চয়—দেখছি।

ননী। (শুনে ননীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, সে হতবুদ্ধির মত বাপের দিকে চেয়ে বললে) চাবি আজো পাওনি!

রমণ। (ননীর কথার উত্তর না দিয়ে পত্নী রাধারাণীর দিকে সহাস ভঙ্গিতে)—ঘোষজা তোমার মেয়েকে রাজরাণী বানিয়েছে! দেখচো তো—কত্তবড় চতুর লোক! গোটাকতক টাকা, কতকগুলো বাজে কাগজ, বীমার কাগজ দিয়ে কেমন ভুলিয়ে রেখেছে।

ননী। ও-সব কথা ক'য়ো না বাবা। ঐ ট্রাঙ্কেই তাঁদের যথাসর্ব্বস্ব—ব্যাঙ্ক-বই, চেক্-বই, বিষয়ের দলিল, গয়না-গাঁটি সবই—দু'খানা সইকরা চেক্ পর্য্যন্ত।—পাছে আমার কিছু দরকার হয়। চেক্-বই তাঁদের হাতে থাকলে—সেখানে টাকার অভাব পড়বে কেনো? বাবার কথা ছেড়ে দাও—তিনি দেবতা। তাঁর জন্যেই তো ছট্‌ফট্ করছি। ভাসুর খুব কড়া মানুষ, আবার তেমনি ভালো লোক! কেবল—মিথ্যে সইতে পারেন না। যা রোজগার করেন, সব এনে আমার কাছে ধোরে দেন। কিছু দরকার হ'লে—চেয়ে নেন। (অতিষ্ঠভাবে) না—আমি আর থাকতে পারব না বাবা, তুমি আমাকে রেখে এসো।

রমণ। (পত্নীর প্রতি) ছাখো! সেই ননীর (দীর্ঘ নিশ্বাস) শ্বশুরবাড়ী আজ বাপ-মার চেয়ে বড়ো! বে' দিলেই পর—

রাধারাণী। মেয়েদের যে সে-ই বাড়ী, সে-ই ঘর। তাই যেনো মেয়েরা জন্মজন্ম করে—(দীর্ঘনিশ্বাস)। এই আমার দেখ না, বাপের বাড়ির কথা তো ভুলেই গিয়েছি—

রমণ। আহা—অজ্ঞানের মত কি বোক্‌চো! তোমার কথা আর ওর কথা? ওর সেখানে⋯যাক্। ভাবছিলুম

ননীকে নিয়ে একবার সকল তীর্থ ঘুরে শেষ বৃন্দাবনে একখানা—

রাধারাণী। সে কি আমাদের ভাগ্যে—

ননী। না মা, আমি তা চাই না। সেখানে বাবা যতদিন আছেন—তাঁকে আমায় দেখতেই হবে—মা'র শেষ সময়ে তাঁকে কথা দিয়েছি।

রমণ। (পত্নীকে) শুন্‌চো ননীর কথা! ছেলেমানুষ—এর পর বুঝ্‌বে! ধর্ম্মকর্ম্ম যে সবার ওপোর মা। তুই তো শ্বশুরের কথাই ভাবছিস্, আর নিজের বাপের অবস্থাটা ভাবছিস নি! দেশ-সুদ্ধ লোক যে ভয় পাচ্ছে—আমার কখন কি হয়!

ননী। কেনো, কি হয়েছে তোমার বাবা? সেই 'হার্নিয়া'?

রমণ। না রে বেটি, হার্নিয়া নয়—হার্নিয়া নয়—একেবারে 'হরিনিয়া', এ রোগ কলিতে আর কে কবে দেখেছে! আমি তখন কি আর আমাতে থাকি মা—পুকুরেই পড়ি কি গাড়ির তলায় যাই, তা হরিই জানেন! আর এই সময় কি-না তুই শ্বশুরবাড়ি যাবার তরে ব্যস্ত! লোকে সন্তানকামনা কি এইজন্যে করে মা?

রাধারাণী। ওমা, তাও তো বটে! এ আবার তোমার কি হোলো বলো দিকি! দেখে সেদিন তো আমার হাত-পা থর্‌থর্ কোরে কাঁপছিলো—কেঁদে ফেলেছিলুম! ননীর তো মুখ শুকিয়ে গিয়েছিলো। কি বলোদিকি?

রমণ। কি কোরে বল্‌বো—সব শূন্য হয়ে যায়। আমি থাকি না, তিনি নিজের মধ্যে টেনে নেন। মুখ থেকে যা বেরয়, সব তিনিই ক'ন্, আমার কিছুই থাকে না। শুনেছি—সত্যযুগে ঋষিদের হোতো। এতদিন পরে ...তাঁর কৃপা! (চোখ মুছলেন)—কোথায় যে যাবো—ভেবে পাচ্ছি না! চতুর্দ্দিকের লোক এই ভেঙে পড়ে বোলে। এখনো সবাই শোনে নি। তাই তো বলছি—এইবেলা চল্ মা—তীর্থে পালাই। এ তো লুকিয়ে রাখবার জিনিষ নয়—এ যে তাঁর কৃপা! আর এই সময় কি-না ননী...

ননী। তা এখন আমায় যেতেই হবে বাবা। তার পর তাঁদের সব অবস্থা বুঝিয়ে না হয়...। তা হ'লে চাবিটে তুমি—

রমণ। (পত্নীকে) দেখচো তাঁর খেলাটা। শাস্ত্র মিছে কয় না—পুত্রকন্যা একটা ভ্রম মাত্র! সমাধি অবস্থায় তা তো স্পষ্টই বুঝতে পারি। তবু তাঁর সংসার নিয়ে থাকতে হয়। তাঁর লীলা লোপ করতে নাই। যারা বিষয়ের কীট তারা এ রহস্যের কি বুঝবে! মেয়েটা ভাবছে এক—তারা ভাবছে আর! বিষয়টা ননী না ভাগ কোরে নেয়—তাই ওকে ভুলিয়ে রাখা। এই খেলাই চলেছে! হরি হরি—

ননী। তুমিও তো বাবা...যে এইমাত্র বিধবা হয়েছে তার—

রমণ। আ মুখ্‌খু মেয়ে, ও বাগান-বাড়ী শোধন কোরে না দিলে যে কেউ নিতে সাহস করছে না। বউটি বোধ হয় ভালো, তাই তিনি কৃপা কোরে এই ব্যবস্থা করছেন। নাম আর দান ওখানে চললেই ওর সংস্কার হ'য়ে যাবে। মুক্তিসভা ওই বাড়িতে নিয়ে গেলেই নিত্য তাঁর নাম চলবে, আর নন্দ ডাক্তার হয়েছে—ঐ বাড়িতে দাতব্য চিকিৎসা চালাবে। এসব যোগাযোগ কি মানুষের ইচ্ছায় হয় রে ননী! বউটির জন্যে এতবড় ত্যাগস্বীকার, আমাকেই করতে হবে—অনাথার ভার নেওয়া তো চাড্ডিখানি কথা নয়!

ননী। এসব আমার কেমন ঠেক্‌ছে, সত্যিই ভালো লাগছে না।

রমণ। (ঈষৎ রাগত) বউয়ের কত জন্মের ভাগ্যি যে এ কৃপা এসেছে। এসব আধ্যাত্মিক বিষয় তুমি এখন বুঝবে না।

ননী। আমার বুঝে কাজ নেই বাবা। যা মানুষে বোঝে না, দুর্ব্বল মেয়েমানুষকে নিয়ে দেবতাদের এমন কাজ করা কেনো!

রমণ। (একটু হাসি টেনে, পত্নীর দিকে) শুনলে?

রাধারাণী। ছি মা, অমন কথা মুখে আনতে নেই—অকল্যেণ হয়। (হাতজোড় কোরে মাথায় ঠেকালেন)—তাঁর কৃপা না হ'লে আর... সেদিন তো নিজেই সব শুনলি—

ননী। আমার ও-সব বোঝবার মতো জ্ঞান হয়নি মা। ওতে থাকতেও চাই না। তবে বিধবার...যাক্। আমার চাবিটে দাও বাবা, আমি কালই যাবো। বড় অন্যায় হয়ে যাচ্ছে।

রমণ। এখনি খুঁজছি। একবারি আসনে বসলেই··· এসব তুচ্ছের জন্যে তাঁকে বিরক্ত করতে প্রাণ চায় না।—(পত্নীর প্রতি নিম্নকণ্ঠে)—যখন অংশ থেকে বঞ্চিত হয়ে শেষ এই বাপের কাছেই···হরি না করুন। দুনিয়াটা চিনতে এখনো ঢের দেরি! বিষয়ের ওই কাগজপত্তোর হাতে রাখতে দেওয়াই কাল। ওর দ্বারা শেষ একটা বড় রকমের ক্ষতি দেখিয়ে অংশটি লোপ কোরে দিয়ে পেটভাতায়—

ননী। ঠকি ঠোক্‌বো—আমার মনে পাপ ঢুকিয়ে—আমার শ্রদ্ধা নষ্ট কোরো না বাবা। আমি তাঁদের ভক্তি করি···

রমণ। বেশ, ভালো কথা। (পত্নীর প্রতি)—বাপের কর্ত্তব্য যা তা করলুম। আমাকে কেউ আর দুষ্‌তে পারবে না। এখন তোমরা কাজে যাও—আমি চাবিটে দেখি—

পত্নী ও কন্যার প্রস্থান

রমণ মিত্তির ঘরে ঢুকে এদিক উদিক দেখে—প্রদীপ মিটমিটে কোরে দিয়ে—দালানটায় এসে একবার সব দেখলেন। সবাই অন্য মহলে গেছে। তখন কাছা থেকে ট্রাঙ্কের চাবি বার কোরে ননীর টাঙ্ক খুললেন, ও তাড়াতাড়ি দলিলপত্র, অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজ, চেক্‌-বই, দু-তিনখানা খাতা প্রভৃতি এবং কয়েকখানি নোট—আর একটি গয়নার বাক্স বার কোরে একখানি ঝাড়নে রাখলেন। পরে নিজের ঘর থেকে ক্যাস্‌বক্স্‌ এনে, কাগজ খাতা প্রভৃতি তাইতে বন্ধ করলেন। চেক্‌ বই, গয়নার বাক্স আর নোটগুলি স্বতন্ত্র কোরে নিয়ে ট্রাঙ্ক বন্ধ কোরে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।—বেরিয়ে এসে—

রমণ। ব্যস্‌, বাক্সটা হারুর বাড়ী রেখে আসি গিয়ে। কাঁচামালগুলি (চিন্তা কোরে)···হাঁ, সেই ঠিক হবে। চাবিটে গাড়িতে বসবার পর ননীকে দিলেই হবে··।

ইতিমধ্যে স্বর্ণ ঝি এসে পোড়ে ব্যাপার দেখে অলক্ষ্যে সরে' যায়

একাদশ দৃশ্য

স্থান···রমণ মিত্রের বৈঠক্‌খানা

সময়···রাত নয়টা

উপস্থিত···রমণ মিত্র (ভক্তিভূষণ), চন্দ্র চৌধুরী, হারু ভট্টাচার্য্য, আশু বিশ্বাস। সকলেই চিন্তামগ্ন

রমণ। যাই-হোক্‌ চন্দোর, আর বিলম্ব করা নয়, শুভাংসি বহু বিঘ্নানি। বাগান-বাড়িতে মুক্তিসভা প্রতিষ্ঠার উৎসব খুব জাঁকালো হওয়া চাই। হ্যাণ্ড-বিল্‌ কালই ছাপ্‌তে দাও। সোমবারই শুভদিন—ছুটিও আছে। ঐ বাড়িতে সভার নব-প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাধা করা চাই-ই। এমন্‌টা করতে হবে যাতে ইতর ভদ্র সকলেই···বুঝলে! না আর দেরি করা নয়—শুভস্য শীঘ্রং। হঁ্যা, ওই মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পটা কার নামে করবে বলোদিকি? ঐটিই প্রধান কাজ। কারুর নামে তো করা চাই, নচেৎ কাজটি অস্পষ্ট থেকে যাবে।

চন্দ্র। (চিন্তিতভাবে) সমস্যার কথা···

রমণ। (ও-কথায় কান না দিয়ে) কাজটি সবার সামনে, বেশ উচ্চকণ্ঠে হওয়া চাই। লাহিড়ী-বউয়ের দানটা সকলে যেন ধন্য ধন্য রবে স্বীকার করেন। ভাগ্যবতী সবার মুখ থেকে যেন তাঁর এতবড় ত্যাগের যশটা শুনতে পান। পুণ্যলাভ তো করেইছেন। আর দ্যাখো, বিশেষ কোরে ওই উকীলপাড়ার জোঁদা জোঁদা কয়টিকে আদর কোরে আনা চাই—ঐ নলিনী, অবিনাশ, মিহির এরা নামী উকীল—হয়কে নয় কোরতে পারেন! এদের সামনে কাজটি হ'লে·· বুঝেছো।—দাতার নাম সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়বে—আমি কেবল সেইটিই চাই। এ ভারটি তোমার রইলো আশু।

আশু। আমাকে আর বেশী বলতে হবে না···

রমণ। চন্দোর, তুমি বলছিলে—সমস্যার কথা। তা বটে সমস্যা বই কি। বউ মানুষ, তাঁর নামে ·

হারু। না—না, তা হয় না। তিনি অত্যন্ত লজ্জাশীলা। মন্ত্রোচ্চারণ অশুদ্ধ হবেই। কার্য্য পণ্ড—মহাপাপ—মহাপাপ—

রমণ। (চিন্তিতভাবে) তবে!

হারু। চিন্তার কারণ নেই, আমি সে ঠিক্‌ কোরে আসবো—

রমণ। হঁ্যা—তাই করা চাই হারু। আজ ব্রজ নেই বলে তার বিধবাকে দশের সামনে···না, আমি তা পারব না। ভদ্রঘরের—

আশু। তায় বয়স বাইশ-তেইশ মাত্র, তাঁকে কি··

রমণ। অ্যাঃ তোমরা বলো কি! আহা—হা, এই কি তাঁর বিধবা হবার বয়স—না তা শোভাপায়! কতো বললে—বাইশ্‌-তেইশ্‌!

চন্দ্র। হাঁ—তাই হবে—

হারু। বরং কম দেখায়—

রমণ। আহা—একে বিধবা বলে! তবে তো তাঁকে সভার তত্ত্বাবধানে রাখাই উচিত ও ন্যায্য। এখন তাঁর আর অভিভাবক কে আছে?

আশু। সে আপনাকেই দেখতে হবে বই কি। কে আর দেখবে? আপনার সঙ্গে এখন তাঁর অবাধে কথাবার্ত্তা হওয়াও উচিত।

রমণ। তাই তো এখন দেখছি। তিনি কথা না কইলে চল্‌বে কি কোরে! মনের ইচ্ছা, মনের কষ্ট চেপে থাকলে যে (চন্দ্রের প্রতি) আমার আবার এ কি বিপদ হোলো চন্দোর?

চন্দ্র। ভার নিলে তার সঙ্গে কর্ত্তব্যও যে আসে—

হারু। আমরা তাকে বুঝিয়ে বোল্‌বো—আপনাকে আর পরের মতো দেখলে চলবে কেনো!

রমণ। তবে তোমরা তাঁকে বুঝিও চন্দোর। আহা—আজ এক বৎসর এই কষ্ট—উঃ! তিনি তো ফাঁকা বিধবা হননি, পাকা সম্পত্তির মালিকও হয়েছেন। সে-সবও তো সামলানো দরকার।—ভায়ের খপ্পোরে পড়লেই—হুঃ! যাক্ রাধে রাধে! এখন প্রতিষ্ঠাকার্য্যটি তো সত্বর সেরে ফ্যালো;—তাঁকে না হয় আমি দেখছি—

আশু। প্রতিষ্ঠাকার্য্যের চিন্তা রাখবেন না—ভূতে করে' দেবে। আপনি বরং অসহায়াকে দেখুন—

রমণ। সকলে যখন বোল্‌চো তবে, ওই যে সঙ্কল্পের কথাটা—ওটা বড় জটিল্। বেশ কোরে সব ভেবে ছাখো। যার-তার নামে তো হোতে পারে না—রাধারাণীর ইচ্ছাটাও দেখা চাই যে—

চন্দ্র। তাঁর সে ইচ্ছা না থাকলে আর···ও তোমার নামেই—

হারু। সে তো নিশ্চয়ই। ও নিয়ে আর মিথ্যা ভাববেন না। অর্ব্বাচীন ছোড়াদের কানে গেলে—বিঘ্নই বাড়বে। দেব-কার্য্যে গোপনই রীতি। না হ'লে দীক্ষা মন্ত্রাদি এত গোপনে রাখার বিধি থাকতো না—

রমণ। হারু ঠিক্ বলেছে, খুব ঠিক্ কথা।

চন্দ্র। এখন তবে ওঠা যাক্—এগারোটা হোলো।

রমণ। হ্যাঁ চন্দোর, নানা কাজে তোমাকে জানাতে ভুলেছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। কাল রাধারাণী (কেঁপে উঠলেন) অভয় দিয়েছেন—নিশ্চিন্ত থাকো। তাঁর সে কি হাসি! বলেন্—তোরা মিছে এতো ভাবিস কেনো, হয়েছে কি?

চন্দ্র। (দাঁড়িয়ে) তুমি বাল্যবন্ধু, যা ক'রবে তুমি—আমি নির্ভর কোরে নিশ্চিন্ত। (হাস্যমুখে) আরাম-বাগের মহাল্‌টা বুঝি তোমার নিজের নামে ডেকে রেখেছো?

রমণ। (সহাস্যে অথচ সবিস্ময়ে) শুনেছো বুঝি! কি করি—তখন আর সময় ছিল কোথায়? রাধারাণী অন্যগুলোরও ঐ রকম সুবিধে কোরে দিন্, তারপর সময় মতো একদিন গিয়ে 'ট্রান্‌স্‌ফার্' কোরে দিয়ে এলেই হবে। ও-তো এখন ঘরের কথা চন্দোর। ভেবেছিলুম—হঠাৎ শুনিয়ে তোমায়—হা—হা—এর মধ্যে শুনে বসে আছ!

দন্তবিকাশক হাস্য

চন্দ্র। তা না তো আর তোমাকে ধোরে আছি ভাই—

রমণ। সব তাঁর কৃপা—সব তাঁর কৃপা! যেমন করান্ তেম্‌নি করি—

হাত তুলে শূন্যে নমস্কার

চন্দ্র। এখন তবে চলি—

সকলের প্রস্থান

রমণ। খবর পেলে কোথায়! ভালই হয়েছে—একদিন তো পেতেই। হুঃ—বিষয়কর্ম্মে বন্ধুত্ব! জমিদারের কলঙ্ক!

হাস্যমুখে অন্দরে গমন

দ্বাদশ দৃশ্য

স্থান···ব্রজ লাহিড়ীর বাড়ী

সময়···বেলা আন্দাজ দশটা

উপস্থিত···চন্দ্র চৌধুরী, হারু ভট্‌চায্, কদম,
অপর্ণা দেবী দোরের আড়ালে

চন্দ্র। ব্রজর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করেছ বউমা—সাধ্বীর পরিচয় দিয়েছ। বিষয়ভোগ ক'দিনের জন্যে মা? কে ক'দিন আছে তার ঠিক্ নেই! এই যে আমার চেয়ে কতো

ছোট ছিলো চলে গেলো—(দীর্ঘনিশ্বাস)—এ কাজটি উভয়েরি—ইহকাল পরকালের হ'য়ে রইলো।

হারু। কি আর আশীর্ব্বাদ কোরবো? বউমা নারী-জন্ম সার্থক করলেন। শাস্ত্রে বলে—একদিক ভাঙে একদিক গড়ে—এই নিয়ম। বউমা তো দেখালেন! ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছে—যাবে না?

কদম। সবই আপনাদের সাহায্যে—আপনারাই করালেন—

চন্দ্র। আমাদের আর কোন্ যোগ্যতা ছিল মা! সবই ওই মহাপ্রাণ ভক্তিভূষণের ক্রিয়ার ফল। তা নইলে কি স্বয়ং রাধারাণীর আবির্ভাব হয়! ব্রজর আন্তরিক সঙ্কল্প আর সিদ্ধপুরুষের ভক্তির টান্—এই দুয়েতেই সম্ভব হয়েছে মা—

হারু। তাতে আর সন্দেহ আছে! কাজটা তো বউমাই করলেন—আমি আর কতটুকু সাহায্য করেছি? অক্ষয় তৃতীয়ার দানের ফল ব্যক্ত করেছিলুম মাত্র—পুরোহিতের যা কর্ত্তব্য। এখন দেশময় তেমনি জয় জয়-কার পড়ে গিয়েছে। কি আনন্দ! কই—শিরোমণি এই মহৎ সুযোগে একটা জোলো পুকুরের মায়া ত্যাগ করতে পারলে কি! ভাগ্য চাই—ভাগ্য চাই। মৃত্যুশয্যায়ও সুমতি এল না! হুঁ··

কদম। আহা তাঁদের যে বড় কষ্ট—

চন্দ্র। কি কষ্ট কদম? শিষ্যেরা দাঁড়িয়ে সমারোহ শ্রাদ্ধ করিয়ে গেলো।

কদম। তাঁরা তো ভেতরের অবস্থা জানেন না—কি কষ্টে যে দিন যায়! কালাচাঁদ কাকার বউ লুকিয়ে তাঁর বিয়ের চেলীখানি ··আর কি শুনবেন! কাচ্চাবাচ্চা খেতে পায় না (অঞ্চলে চক্ষু মুছলে।)

চন্দ্র। থাক্ ও-কথা, (উদাসভাবে) সত্য হ'লে ভগবান নিশ্চয়ই উপায় করে' দেবেন—

হারু। তোমরা স্ত্রীলোক, কিছুই বোঝ না। ওই পুকুরটির কথা চাপা দেবার ও-সব ফন্দি। বুঝেছ কদম। সিদ্ধপুরুষের কথাটা রাখলে—মঙ্গলই হোতো। দেবতাকে দিতে পারলে না, সাধুর মনোক্ষুণ্ণ করলে। কষ্ট পাবেই তো—ন্যায্য—

চন্দ্র। মৃতব্যক্তি সম্বন্ধে ওসব কথা কেনো কোচ্চো হারু! তিনি প্রবীণ জ্ঞানী লোক ছিলেন, যা ভালো বুঝেছেন করেছেন। যাক্ ও-কথা—

হ্যাঁ—যে কথাটা বউমাকে বলতে এসেছিলুম। ওই দান-পত্রের কাগজ আমার কাছেই রেখেছি মা—এখন রইলো। ভক্তিভূষণেরও সে-ই ইচ্ছা—এরপর সুবিধা মতো রেজেষ্ট্রী কোরে দিলেই হবে। চিন্তার কারণ নই।—হ্যাঁ—ভালো কথা, যে-বাড়িতে যাই, মেয়েরা সব বউমাকে দেখতে আসবার জন্যে ব্যস্ত! বলে—সাবিত্রীকে দেখব না! অনেকেই আসবে মা। এ কি কম কাজ করা হয়েছে—

হারু। সাক্ষাৎ দাক্ষায়ণী! অত বড় রাজার মা নিকষাও পারে নি! দেখতে আর আসবে না!

কদম। তাই তো দেখছি—আজ এক হপ্তা ধোরে বেলা দশটা না বাজতে নিত্যই অনেকের পায়ের ধূলো পড়ছে। দিদিমণি তাতে বড় লজ্জাসঙ্কোচ বোধ করছেন। বলেন—এ আবার কি, এসব কেনো!

চন্দ্র। সরল বুদ্ধি, ধারণাই নেই যে কতবড় কাজ করেছেন! চাপা থাকে কি? লোক আসবেই তো—আসিবে বই কি! জীবনে ঐ কাজ, কে-কটা দেখেছে? এ কাজের তৃপ্তিই তো ঐ-তে! চলো হারু, বেলা হচ্ছে; আচ্ছা এখন চললুম মা—

কদম। দিদিমণি প্রণাম করছেন।

চন্দ্র। ভগবান শান্তি দিন।

হারু। দানে মতি হোক্।

উভয়ের প্রস্থান

অপর্ণা। (বেরিয়ে এসে) তুই বুঝি প্রণাম করলিনি—

কদম। (সহাস্যে) বাড়ির গিন্নি করলেই সবারি করা হোলো।

অপর্ণা। তোর কি সবই ছিষ্টিছাড়া!

কদম। যাই আগে দোর বন্ধ কোরে আসি। এখুনি সব দল বেঁধে—

প্রস্থান ও পুনরাগমন

কদম। (ফিরে এসে)—যা করবার তা তো করেছো, এখন ধন্যিধন্যির ধাক্কা সামলাও। নাইতে-খেতে দিলে যে বাঁচি। টাকা বার করো, রোজ দু'কোনা কোরে পান চাই—এনে রাখতে হ'বে। এই পাঁচ-ছয় দিনের ওজন্

দেখে—মধু ময়রাকে ঢালা হুকুম্ দিয়ে এসেছি—সের-চারেক্ রসমুণ্ডি আর আড়াই সের কচুরি, চাইলেই যেনো পাওয়া যায়—

অপর্ণা। তোর সবই বাড়াবাড়ি! (সহাস্যে) হ্যাঁ—মতির মা'র কথাটা কি বলছিলি কদম?

কদম। ঐ যে কাল তোমাকে ধন্যবাদ দিতে এসেছিলেন গো—সঙ্গে দুটি নাতনী, আর ন বছরের বোন্‌ঝি। তারাও ধন্যবাদ দেবে কি-না! বোন্‌ঝি ছ'খানা কচুরি আর আদপো রসমুণ্ডি খেয়ে হাত গুটুলে—পারবে কেনো আর! মাগি আর আছে কোথায়! রাগ কোরে বলে কি-না—হতভাগা মেয়ের কিছু যদি রোচে! লাটসাহেবের বাড়ী বিয়ে না হোলে—না খেয়েই মোরবেন্! কেবল 'কালোজামই' ওঁর ভালো লাগে!

অপর্ণা। লাটসাহেবের বাড়ী বুঝি সব কালোজাম খায়?

কদম। য্যেম জানে…!

অপর্ণা। রসমুণ্ডির বদলে কালোজামই তবে বোলে আসিস্!

কদম। আচ্ছা গো তাই হবে। দাও, এখন আসন-গুলো বার্ করো। থান দশেক তো পেতে রাখি। কাজ এগুনো থাক্—

অপর্ণা। রোজ্ রোজ্ কে আসবে বল্। কেনো ভয় পাচ্ছি—স্!

কদম। ওঃ—দুথ্‌খু কেনো, বালাই—আসবে বইকি!

অপর্ণা। (সহাস্যে) তুমি মরো! তাদের তো আর কাজ নেই!

সদর দোরে আঘাত

আগন্তুক। দোর খোলো গো গেরস্তরা।

কদম। হোলো! কে আসবে বোলে যে বড় দুথ্‌খু করছিলে! দেখে নিও—না পালালে আর রক্ষে নেই! এসব ওই পোড়ারমুকোদেরই কাণ্ড—না হয় তো কি বলেছি!

দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত

আগন্তুক। ঘুমুলে নাকি গো?

কদম। কে গা?

দ্বারোদ্‌ঘাটন

—আসুন আসুন। কি ভাগ্যি—ওই অতদুর থেকে এই পথ আপনিও এসেছেন! আসুন আসুন। দিদিমণি পাখাখানা…

রাঙাদিদি। ভাগ্যি কি বল্ কদম—ভাগ্যি আমাদের বল্। যা কেউ ভাবতে পারে না, বউমা তাই দেখালেন। আহা—ব্রজ দেখলে না—

পাখা হাতে দিয়ে অপর্ণা প্রণাম করলে

আর কি বোল্‌বো! এর বাড়া কাজ আর কি আছে? জন্মজন্ম করো…

কদম। (অপর্ণাকে) দিদিমণি, তুমি বুঝি এঁদের সব চেন না? কবেই বা বেরিয়েছ! সবাই আমাদের আপনার। (প্রত্যেককে দেখাইয়া) ইনি সেজ তরফের মোক্ষদা মাসি। উনি কি কোথাও বেরোন—চন্দোর-সুয্যি দেখতে পায় না। তোমার প্রতি দয়া কোরে এসেছেন। ইনি—ছোট তরফের আন্দো পিসি। ওঁর কথা সবাই জানেন, গঙ্গাস্নানে যেতেও কেউ দেখেনি। ইনি—পাকপাড়ার প্রভাবতী। অনেকদিন পরে বাপের বাড়ী এসেছেন। তালুকের কাজকর্ম্ম সবই নিজে দেখেন। এঁদের সব কি পাওয়া যায়! দিদিমণির ভাগ্যি। ইনি—রেল-পারের বেণীবাবুর বোন—বেলা। ইনি—আমাদের বাজারপাড়ার অমরবাবুর শালী—রমলা—কি মিষ্টি গলা-গো! বোনটি অল্প বয়সে একটি মেয়ে বিইয়ে চলে গেলো। অমরবাবু পাগলের মত হয়ে যান—ও-ই এসে সব সামলে নিয়েছে। কতগুণ থাকলে তা পারে!—

আচ্ছা, আগে সব দয়া কোরে আসনে এসে বসুন্। মুখে একটু জল দিন। ছেলেমেয়েদের আনেননি কেনো? দিদিমণি ছেলেপুলে যে বড়ো ভালোবাসেন, পেলে…

মোক্ষদা। আহা, ভগবান যে তাও একটি…তা হোক্। একাই যা করলেন—অনেকের তো পাঁচ ছেলে আছে, কে পেরেছে? এ ভাগ্যি ক'জনের হয়।—কে কা'কে দেখবার জন্যে ছুটে আসে?

আন্দো-পিসি। (অপর্ণাকে) মা, তোমাকে দেখে সত্যিই চক্ষু সার্থক হোলো। হারুর শাশুড়ী, বউ, মেয়েরা, আসবে বোলে চুল বাঁধতে বসেছে। আমরা আর দাঁড়াতে পারলুম না—

রমলা। তা যাই বলো—শাশুড়ী মাগির চুল বাঁধার তাড়া দেখে আমার গা জ্বলে গেছে! তবু যদি টাক্ না…

মোক্ষদা। আহা এইস্ত্রী-মানুষ, বাঁধবে না? হারুর এখন যা হোক্ দু'পয়সা আসছে। বাঁধলেই বা (টেপা হাসি)

রমলা। বয়সটা তো দেখলে না মাসিমা!

আন্দো। তা হোক্—তা হোক্। বয়স যায় বোলে কি সাধও যাবে!

অপর্ণা খাবার সাজিয়ে রেকাবি এনে দিতে লাগলো

মোক্ষদা। এ আবার কি বউমা—এ কেনো! তোমাকে দেখলুম, এইতেই সুখ—

আন্দো। তাই তো—এসব কেনো? তোমাকে দেখেই তৃপ্তি মা—

রাঙাদিদি। তা হোক, মিষ্টি মুখ করাতে হয়। ও যে-কাজ করেছে ওর মনেরও সন্তোষ চাই তো। এখন ওর মন্—কি দিই কি দিই করছে। দেবার ঝোঁক ধরলে কি আর তৃপ্তি আছে? ও যে জানি, ওই রকমই হয়। এইবার মা দুগ্গাকে আন্ বউমা, আমরা সব প্রাণ-পুরে খাটি। মাকে আন্ বউ। ওঃ এখুনি আবার চৌধুরীপাড়ার সব আসবে—আমি জানি—হারুর গুষ্ঠী তো এলো বোলে। দেখা তো হোলো—যা কোথ্যিতে আসা। এখন চল্—বিকেলের কাজকম্মো তো আছে, চল্—

কদম। (সকলকে পান দিয়ে) এখনো বেলা আছে—একটু বসলে হোতো। রমলার একটা গান—

মোক্ষদা। আবার এলেই হবে—শুনো। এখন তো কাজকম্মো, যাওয়া আসা থাকবেই—

সকলে উঠলেন, অপর্ণার প্রণাম

প্রস্থান

কদম। (দোর দিয়ে এসে) কেমন লাগছে দিদিমণি?

অপর্ণা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) ছ'দিন্ নিত্য এক কথা একশোবার শুনে শুনে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে—আর ভালো লাগছে না। কোথাও ছুটে পালাতে ইচ্ছে হচ্ছে। এ থেকে আমাকে বাঁচা কদম—

কদম। পুণ্যির বিষফোড়া গো। এর তাড়োস্ আসতে দু-তিন মাস নেবে।

অপর্ণা। (শিউরে) বলিস্ কি কদম! এ যে আর একদিনও সইতে পারব না। মনে হচ্ছে, আগাগোড়াই যেন উপহাস্যি—

কদম। বুঝ্‌চো? বাচলুম! সব ওই অনামুকোদের গড়াপেটা! দশের মুখদে শুনিয়ে পাকা কোরে নিচ্ছে! দু-এক হপ্তা বোনের বাড়ী যাও না—এই তো ও-পারে। আমি এ বাড়ী আগ্‌লাবো। দিন পনেরো বই তো নয়। ভালো লাগে—যে কদিন ইচ্ছে থেকো—

অপর্ণা। ভাল লাগছিল না—লাগবেও না—(উদাস-ভাবে চিন্তা)

কদম। যাও, শীগ্‌গির দুটো কিছু মুখে দাও গে। এখুনি হারুর গুষ্ঠী এসে পোড়বে। বোকা সেজে এসব নিত্যি কে সুইতে পারে!

অপর্ণা। (চঞ্চল হ'য়ে কাতরভাবে) আমি আর পারব না কদম!

কদম। কেই বা পারে দিদি! উপায় ভাবছি, আগে তুমি কিছু মুখে দাও গে তো। হ'চ্ছে—

অপর্ণা অনিচ্ছায় চুপায়হীনার মত চলে গেলো

কদম। (চিন্তিতভাবে) এইবার সত্যিই জ্বালা ধরেছে। ছোট বোন্ কমলাকে আজ তিন দিন হোলো অবস্থা কিছু কিছু জানিয়ে খবর দিয়েছি। সে দু-এক দিনের মধ্যেই এসে নিয়ে যাবার জন্যে পেড়াপিড়ি কোরবে। ইনি আবার না বেঁকে বসেন্! নাঃ, এখন বোধ হয় সহজেই পারবো। লোকের ভয়ে ভয়েই মোলো! তা—যে সব লোক জুটেছে, ভয় না কোরেও তো পারে না! এদের চেয়ে বাঘ-ভাল্লুকও যে ভালো! (উৎসাহের সুরে) দেখছি—ও দানপত্র রেজিষ্টারী কেমন কোরে হয়! আমার আহার-নিদ্রে গেছে গো! বোকোসেরা ভেল্কী লাগিয়ে দিলে! নাই, ধন্যবাদের দল্ এলো বোলে। নাইতে খেতেও দেবে না গো—ঘুম্ তো গেছেই—

প্রস্থান

সেনাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। চিয়াং ১৮৮৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২০ খৃঃ-অঃ ডক্টর স্থনের অধীনে দক্ষিণ চীনকে লড়াইয়ে সামন্তদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ম যুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন ডঃ স্থনের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং প্রিয়পাত্র। ১৯২৩ খৃঃ-অঃ মস্কোতে থাকা-কালীন তাঁহার সহিত ট্রট্স্কির সাক্ষাৎ হয়। তিনি ট্রট্স্কির নিকটে উপদেশ গ্রহণ করেন যে "Patience and activity are the two essential factors for a revolutionary Party". (Foreign Affairs—July, 1938, pp. 612), ডঃ স্থনের মৃত্যুর পরেই ন্যাশন্যালিস্ট সৈন্যদল একাধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। কতকগুলি যোগ দিল কম্যুনিস্টদের সহিত, আর বেশীর ভাগই চিয়াং-এর বশ্যতা স্বীকার করিল। কম্যুনিস্টদের লড়াইয়ে সামন্তদের দমন করিবার জন্য প্রথম জীবনে কম্যুনিষ্টদের সহায়তা গ্রহণ করিলেও আসলে তিনি কোন দিনই উহাদের পছন্দ করিতেন না। এই কার্য্য স্থসম্পন্ন হওয়ার পর দেশ হইতে সাম্যবাদীদের বিতাড়িত করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন এবং কম্যুনিস্ট নেতাদের মস্তকে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার (এক ডলারে প্রায় তিনটাকা দুই আনা) ঘোষণা করিলেন। ১৯৩৬ খৃঃ অঃ ডিসেম্বর মাসে চাং হুসে-লিয়াং সাম্যবাদীদের প্ররোচনায় চিয়াংকে বন্দী করেন। সাম্যবাদীগণ চিয়াং-এর নিকট প্রস্তাব করে, চিয়াং তাহাদের বিরুদ্ধে শক্তি ক্ষয় না করিয়া বরঞ্চ দুই পক্ষেরই শত্রু জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করুন। চীন হইতে যত শীঘ্র সম্ভব জাপানকে তাড়াইয়া দেওয়া উচিত। চিয়াং যদি এই প্রস্তাবে সম্মত হয়, তাহা হইলে তাহারা চিয়াং-এর নেতৃত্বে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছে। চিয়াং-কেই-শেক তাহাদের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধ লাগিবার পূর্ব্বে চিয়াং চীনে রেলওয়ে, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণকার্য্যে, অস্ত্র নির্ম্মাণ, যন্ত্রাগার স্থাপন ও কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার কার্য্যে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন। দেশে শিক্ষাবিস্তার করার জন্যও তিনি সবিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। ১৯২৭ খৃঃ চিয়াং ডঃ স্থনের বিধবা স্ত্রীর দ্বিতীয়া ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া চীনাদের উপর তাহার ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। এক্ষণে তাঁহার কুয়ো-মিং-তাং-এর ও সৈন্যদলের উপর প্রভাব অপ্রতিহত।

বহু শতাব্দী ধরিয়া চীনের প্রতি ইংলণ্ড প্রভৃতি শক্তি লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিলেও তাহাদের আসল উদ্দেশ্য হইতেছে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থবিধা করা। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিয়েনৎ-সিন, সাংহাই, হংকং প্রভৃতি সমুদ্র-সংলগ্ন বন্দরগুলি ইউরোপীয়ান ও আমেরিকানদের শাসনের অধীনে দেখিতে পাই। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে আমেরিকা, জাপান, চীন, রুশিয়া অবস্থিত। তন্মধ্যে আমেরিকা ও রুশিয়ার নূতন রাজ্য জয়ের কোন দরকার নাই। চীনের নিজের দেশই এত বিস্তৃত, লোকসংখ্যা প্রচুর হইলেও তাহার এমন অবস্থা নয় যে সে আত্মরক্ষার্থ ছাড়া কোনরূপ যুদ্ধ করে। একমাত্র জাপান পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের নীতি অনুসরণ করিতে প্রস্তুত।

তিন বৎসর ধরিয়া চীন-জাপান যুদ্ধ চলিতেছে, ইহার কারণ-নির্ণয় করিতে হইলে আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। আমরা এই যুদ্ধকে কোনরূপেই অন্যান্য চীন-জাপান যুদ্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারি না।

জাপান সাম্রাজ্য কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া গঠিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য প্রভাব জাপানে বিস্তার লাভ করিবার পূর্ব্বে চীন ছিল জাপানের 'শিক্ষাগুরু'। চীন হইতে জাপান বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া জাপান দ্রুতবেগে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। তাহাদের নিকট হইতে সাম্রাজ্য বিস্তারের লোলুপতাটাও গ্রহণ করিতে ভোলে নাই। অচির-কাল মধ্যেই এই নূতন উদীয়মান প্রাচ্য জাতিটি ইংলণ্ড, ফ্রান্সকে সাম্রাজ্যবাদিতায় ছাড়াইয়া যাইবে বলিয়া সকলে অনুমান করে।

চীন-জাপান যুদ্ধগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে ভাগ করিতে পারি। ১৮৭৪ খৃঃ জাপান চীনের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া রিউ-কিউ দ্বীপ, ১৮৯৪-৯৫ ফরমোসা ও পেসকাতর দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে। কোরিয়া কিছু পরিমাণে জাপানের অধীনে আসে। ১৯০৪-৫ রুশিয়ার সহিত যুদ্ধে জাপান লায়োডুন উপদ্বীপ ও পোর্ট আর্থার হস্তগত করে। কোরিয়ায়ও তাহার প্রভাব বিস্তৃত হয়, পরে ১৯১০ খৃঃ তাহা একদম জাপান সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। মহাযুদ্ধের সময়ে ও

তাহার পরে জাপান চীনকে অধিকার করিবার চেষ্টা করে। ১৯৩৭ খৃঃ বর্ত্তমান সমর বাধে।

চীন-জাপান যুদ্ধের সর্ব্বপ্রধান কারণ—জাপানের লোকসংখ্যা দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে। জাপানের ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি ইহাদের ভরণপোষণ করিতে অক্ষম। জাপান প্রয়োজনাতিরিক্ত অধিবাসীদের দূর দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার নিমিত্ত পাঠাইতে প্রস্তুত ছিল। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে জাপানীরা বসতি স্থাপন করিতেছিল, আমেরিকায় জাপানীদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া যুক্তরাজ্য বিশেষ আইন করিয়া তাহাদের আগমন বন্ধ করিয়া দিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়াও পীতজাতিকে পছন্দ করে না। কাজেই জাপান অন্য পন্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহার নূতন রাজ্য জয় করিবার বাসনা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। এ বিষয়ে সে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল। চীন জাপানের নিকটবর্ত্তী দেশ। উহাকে অধিকারভুক্ত করার চেষ্টা করাই তাহার নিকট বিধেয় বোধ হইল। বস্তুত জাপান অনেক কলকারখানা স্থাপন করিয়াছে। এই সকল শিল্পাগারে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে হইলে কাঁচা মালের প্রয়োজন। তন্মধ্যে কিছু দ্রব্য বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে হয়। তুলা, তৈল, কয়লা, লৌহ, ইস্পাত ইত্যাদি অন্য দেশ হইতে আনিতে হয়। লৌহ ও ইস্পাত ব্যতীত শক্তিশালী সৈন্যদল ও নৌ-বাহিনী গঠন করা সম্ভবপর নহে। গল্‌ডিন্ তাঁহার গ্রন্থে (প্রাব্‌লেম্ অফ্ দি প্যাশিফিক ইন্ দি টুয়েন্থিয়েন চেঞ্চুরী) লৌহ আমদানি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, জাপানীদের লৌহের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়াই সময় সময় জাপান অনেক অসুবিধায় পতিত হয়; তাই সে সমগ্র চীনের লৌহ-শিল্পাগারগুলি নিজের করতলগত করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত। অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যের উপাদানও চীনে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তদুপরি জাপান নিজের শিল্পজাত দ্রব্য চীনে বিক্রয় করিয়া তাহার বদলে অধিবাসীদের জন্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। চীনারা জাপবিদ্বেষবশে অনেক সময়েই জাপানী জিনিষ বয়কট করিয়া অন্য দেশ হইতে সেই সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করে। চীনদেশ অধীনে আসিলে পর জাপানীরা চীনাদের ঐ সকল দ্রব্য কিনিবার জন্য বাধ্য করিতে পারে। ১৮৭৭ খৃঃ জাপানের রপ্তানি ও আমদানি মালের মূল্য পাঁচ কোটি ইয়েন, দশ বৎসর পরে তাহার সংখ্যা হয় নয় কোটি সত্তর লক্ষ ইয়েন, ১৮৯৭ সালে তাহাই আবার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দাঁড়াইল বত্রিশ কোটি আশী লক্ষ ইয়েন, ১৯০৪-৫এ আরও বাড়িয়া গেল বিরানব্বই কোটি সত্তর লক্ষ ইয়েন। মহাযুদ্ধের সময় একশত কোটি ইয়েনের অস্ত্র শস্ত্রই বিক্রয় হয়। যুদ্ধশান্তির পর ইউরোপ ও আমেরিকা জাপানী দ্রব্য কিনিতে চাহিল না। ১৯১৯ খৃঃ-অঃ একমাত্র আমেরিকা বিরাশী কোটি আশীলক্ষ ইয়েনের জাপানী দ্রব্য কিনিয়াছে, ১৯২০ সনে মাত্র সাড়ে ছাপান্ন কোটি ইয়েন মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিয়াছে। বহু কলকারখানা জাপানকে বন্ধ করিয়া দিতে হইল। যুদ্ধের সময়েও মজুরদের বেতন বৃদ্ধি পায় নাই, গৃহহারা দিনমজুরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল। একমাত্র ধনী ও পুঁজিওয়ালারা লাভবান হইল। ফলে প্রবলবেগে বেকার-সমস্যা দেখা দিল। স্থানে স্থানে ধর্ম্মঘট হইতে লাগিল, মজুরদের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। বারট্র্যাণ্ড রাশেল তাঁহার গ্রন্থে ('প্রাব্‌লেম্ অফ্ চায়না') জাপানের অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'এই সঙ্কটের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে, হয় তাহাকে চীন ও আমেরিকার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইবে, না হয় দেশে প্রোলেটারিয়ান বিদ্রোহের সম্মুখীন হইতে হইবে।

আভ্যন্তরিক অশান্তির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জাপ গভর্ণমেণ্ট মিকাডো বা সম্রাট-পূজা প্রচলন করিল এবং এশিয়া এশিয়াবাসীর এবং 'শ্বেতাতঙ্ক' মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। শিশুকাল হইতে জাপানীদের শিক্ষা দেওয়া হয় যে তাহাদের উপর ভগবান গুরুভার ন্যস্ত করিয়াছেন। তাহাদিগকে এশিয়ার সকল দেশকে ইউরোপীয়দের অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। ত্রিশ কোটি চীনা অধ্যুসিত দেশটাকে সাম্রাজ্যভুক্ত করা সহজ কথা নয়, তাই জাপান ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। মহাযুদ্ধের সময় জাপান জার্ম্মান-অধিকৃত চীনের সকল স্থান অধিকার করিল, উপরন্তু চীনকে মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও চিহ্‌লীতে রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার সুবিধা দিতে বাধ্য করিল। চীন জাপানের 'একুশ দাবীর' সর্ত্তে স্বীকৃত হইলে তখনই চীন তাহার কুক্ষীগত হইয়া যাইত। ওয়াসিংটন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া চীন সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা

করিবার প্রতিশ্রুতি দিলে কি হইবে, জাপান তাহার বাসনা পরিত্যাগ করে নাই। তানাকা স্মারক তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। চীনারা সজাগ হইবার পূর্ব্বেই চীন সাম্রাজ্য, মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া যাহাতে জাপানের করায়ত্ত হয় সেই মর্ম্মে জাপানের মন্ত্রী তানাকা সম্রাট পরামর্শ দেন। সে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের কথা। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সামান্য কারণে চীন জাপান যুদ্ধ বাধে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়া ও জেহল জাপ-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৯৩৫ খৃঃ-অঃ হোপাই, সানটুং, সান্‌সি, চাহার ও সু-উয়ান প্রদেশ লইয়া জাপ 'হাত-ধরা' স্বায়ত্তশাসনক্ষমতাপন্ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। কেবলমাত্র পূর্ব্ব-হোপাই প্রদেশে এ নীতি সাফল্য লাভ করে। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভেও হোপাই-চাহারে নান্‌কিং গভর্ণমেণ্টের অনুমতি ছাড়াই শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রয়াস পায়। তখন সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৭ জুলাই তারিখে একটি সামান্য ঘটনায় এই চীন-জাপান যুদ্ধ লাগিয়া গেল। ৭ই জুলাই রাত্রে চোংটাই রেলপথের ধারে জাপ ও চীনা সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ লাগে। জাপান ১৯০১ খৃষ্টাব্দের চুক্তিপত্রানুসারে পিকিং ও তিয়েনৎসিনে সৈন্য রাখে। চোংটাই পিকিং-এর নিকটে অবস্থিত। গণ্ডগোল মিটানোর জন্য কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। ইত্যবসরে জাপ-সৈন্যদল মাঞ্চুরিয়া ও জাপান হইতে চীনে আসিতে লাগিল। ইহার মধ্যে একদিন সাংহাইতে নৌ-বিভাগের দুজন কর্ম্মচারী নিহত হইলে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা স্থগিত হইয়া গেল। চতুর্দ্দিক হইতে জাপ সৈন্য আসিয়া সাংহাই ছাইয়া ফেলিল। চিয়াং-কেই-শেক চীনের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। সুতরাং পুরাদমে সমর আরম্ভ হইয়া গেল। কোন পক্ষ আগে গুলি ছুঁড়িয়াছিল—ইহার মীমাংসা এখনও হয় নাই।

যুদ্ধ করিবার জন্য যেন জাপান প্রস্তুত হইয়াই ছিল। মনে হয়, ইচ্ছা করিয়াই সংঘর্ষ বাধাইয়া ছিল। কারণ এই সময়ে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি জাপ আক্রমণের সুবিধা করিয়া দিয়াছিল। রুশিয়া আভ্যন্তরিক নানারূপ অশান্তিতে ব্যতিব্যস্ত হইতেছিল, উত্তর মাঞ্চুরিয়াতে আমুর নদীর নিকটে রুশিয়ার সহিত জাপ-সৈন্যের সংঘর্ষ হয়, কিন্তু রুশিয়া তাহা ২৯শে জুন মিটাইয়া ফেলে। জার্মানী, জাপান ও ইটালী কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে। আমেরিকাও কোনরূপ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স স্পেনের ব্যাপারের মীমাংসার জন্য মনোযোগী ছিল। অপর পক্ষে চিয়াং-এর চেষ্টায় চীনারা তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিতেছে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল; উপরন্তু উত্তর চীন হইতে জাপদের বিতাড়িত করিবার পরামর্শ হইতেছিল। ভালরূপে প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই আক্রমণ করিতে পারিলে জাপান সুফলের আশা করিতে পারে। চিয়াং-কেই-শেক জাপানের নিকট নত হইতে অস্বীকৃত হইলেন। জুলাই মাসেই জাপান তিয়েনৎ-সিন বন্দর অধিকারভুক্ত করিল। শীতকালের প্রারম্ভেই সে পীত নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই তারিখে চীন জাপান সমরের দুই বৎসর পূর্ণ হইল। তৃতীয় বৎসর চলিতেছে। এই সমরকে আমরা তিন পর্ব্বে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম পর্ব্বের কাল জুলাই মাসে পিইপিং নিকটে সংঘর্ষ হইতে ডিসেম্বর মাসের ন্যান্‌কিং পতন পর্য্যন্ত। এই পর্ব্বে তিনটি যুদ্ধে চীন-সৈন্যবাহিনী জাপ-সৈন্যের সম্মুখীন হয়। এই সকল যুদ্ধে চীন পরাজিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু কখনও চীনা সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয় নাই। শেষ মুহূর্ত্তে সেই স্থান হইতে দলবদ্ধভাবে শৃঙ্খলার সহিত অন্য জায়গায় সরিয়া গিয়াছে। উপরন্তু এই সকল যুদ্ধের ফলে চীনাদের ঐক্যবন্ধন দৃঢ় হইতেছে। পূর্ব্বে চীনে সেনাপতিদের ও চীনা নেতাদের মধ্যে দলাদলি বাধিয়াই থাকিত, শত্রুপক্ষ ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে ছাড়িত না, এখন সে ভীতি দূর হইয়াছে, তাহারা একতার সঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িতেছে। বারবার পরাজিত হইয়াও চীনা-নেতারা জাপান গভর্ণমেণ্টের নিকট সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করিতে অসম্মত।

প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ হয় সাংহাইতে। সাংহাই সংঘর্ষের স্থান হইতে ছয় শত মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। সেই স্থানেই চিয়াং তাঁহার সৈন্যদল প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধ তিন মাসকাল স্থায়ী ছিল। ন্যান্‌কিং অতি সহজেই অধিকৃত হইল। চিয়াং রাজধানী হাঙ্কাউতে স্থানান্তরিত করিলেন, সন্ধিস্থাপনের জন্য কোনরূপ ব্যস্ততা প্রদর্শন করিলেন না।

দ্বিতীয় পর্ব্বে জাপ-সৈন্য শুচাউ-এ অভিযান করে, তাইএর চোয়াং চীনাদের হাতে পরাজিত হয়, পরে পীত নদীর বাঁধ

ভাঙ্গিয়া ইয়াংসি উপত্যকা পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। ক্যাণ্টন ও হাঙ্কাউ পতনের পরই এই পর্ব্ব শেষ হয়। হাঙ্কাউ হইতে চুংকিং-এ রাজধানী স্থানান্তরিত হইল। এই প্রদেশে যাতায়াতের পথ অত্যন্ত দুর্গম। চীনারা নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে। সম্মুখযুদ্ধ এখন করে না, গরিলা যুদ্ধে জাপ-সৈন্যকে উদ্ব্যস্ত করিতেছে। চিয়াং সত্যই বলিয়াছেন, জাপান চীন সম্বন্ধে জাতিসঙ্ঘের চুক্তি ও ওয়াশিংটনের সন্ধিপত্র ও কেলগ-চুক্তিতে অখণ্ড চীনকে খণ্ড খণ্ড না করিবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে।

তৃতীয় পর্ব্বে জাপান চীনাদের অবাধ্যতার শাস্তিপ্রদান, ইউরোপীয় ও আমেরিকার সমুদ্র-সংলগ্ন স্থানগুলি ডাল-ভাতে করতলগত করিবার চেষ্টা করিবে। তিয়েনৎ-সিন ব্যাপার ইহার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। কতদিন ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। জাপানের আশাই পূর্ণ হইবে, না চীন জাপ-সৈন্যদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া দৃঢ় ঐক্যতাপাশে আবদ্ধ হইয়া নূতন জীবন-লাভ করিবে—ইহাই সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চীনের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তাহার আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ নহে। চীনের আর্থিক আয় খুব বেশী না হইলেও সে সৈন্যদল গঠন করিতে ও দুই বৎসর ধরিয়া জাপ-গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দাড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। সমুদ্র-সংলগ্ন বন্দর হইতে যে রাজস্ব পাইত তাহা এখন বন্ধ হইয়া গেলেও অনুরূপ নূতন ট্যাক্স প্রচলনের ফলে তাহার ক্ষতিপূরণ হইয়াছে। উপরন্তু গভর্ণমেণ্ট কখনও চুংকিং-সংলগ্ন স্থান হইতে কোনরূপ কর পাইত না, এখন সেই সকল হাতে আসিতেছে। তাহা ছাড়া, রূপা জাতীয় সম্পদে পরিণত করায় আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রচুর পরিমাণে কিনিতেছে। চীনামুদ্রাকে লোকে জাপানী ইয়েনের চাইতে অধিকতর বিশ্বাস করে। আর্থিক ব্যাপারে চীনের অবস্থা জাপান হইতে ভাল। অধিকাংশ চীনা কৃষিজীবিকালম্বী হওয়ায় অস্ত্রশস্ত্র কিনিতেই কেবল অর্থের প্রয়োজন হয়।

জাপানী সৈন্য হাঙ্কাউ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে সামরিক আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, তথায় ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারে, গতিরোধ করিবার কেহ নাই।

১৯৩৪ খৃঃ-অঃ চিয়াং গোপনে চীনা সামরিক কর্ম্মচারীদের যে উপদেশ দেন, তাহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি, চিয়াং বুঝিয়াছিলেন যে চীন-জাপান যুদ্ধ তিন-চার বৎসরের মধ্যেই লাগিবে। চীন হইতে দলাদলি দূর করিয়া তিনি সামরিক কর্ম্মচারীদের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার উপদেশ দেন। সকলকেই সামরিক রীতিনীতি শিক্ষা দিতে হইবে—যাহাতে তাহারা যুদ্ধের সময় চীন-সৈন্যবাহিনীকে প্রয়োজন হইলে সাহায্য করিতে পারে। তিনি বিশ্বাস করেন, চীনকে জাপানের বিরুদ্ধে খুব বেশী দিন একাকী যুদ্ধ করিতে হইবে না। উপরন্তু জাপান কখনও আমেরিকাকে পশ্চাতে রাখিয়া রুশিয়া ও ইংলণ্ডকে দক্ষিণ ও বামে ফেলিয়া চীন জয় করিতে পারিবে না। চীনাদেরও দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারা আত্মরক্ষার্থে জাপানের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে। জগতের সকল দেশই চীনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এবং সাহায্য করিতে প্রস্তুত। তৃতীয় পর্ব্বে চিয়াং জাপানীদের খোলাখুলি ভাবে বাধা দিতেছে না। চিয়াং 'scorched earth policy' অনুসরণ করিতেছেন। যে সকল স্থান জাপানের অধিকারে আসিবে সেথান হইতে অস্ত্রশস্ত্র যতদূর সম্ভব সঙ্গে লইয়া সৈন্যদল পশ্চাৎ দিকে সরিয়া যায় এবং শস্যক্ষেত্র, কলকারখানা, রেলপথ ইত্যাদি একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়া যায়। অধিকাংশ স্থলে কৃষকগণও সেই সকল গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে বসতি স্থাপন করিতেছে। অসহযোগিতা করার ব্যাপারে চীনারা কুশলতার পরিচয় বরাবর দিয়াছে। জাপানী দ্রব্য জাপ-সৈন্যদের বেয়নেটের খোঁচা ব্যতীত কেহই কিনে না। জাপানী কাগজ নোটও লইতে চাহে না। কাঁচামাল শিল্পাগারের জন্য সংগ্রহ করা জাপদের সম্ভব হয় না। যেখানে তুলা প্রভৃতি উৎপন্ন করা হইত তথায় কৃষকরা খাদ্যশস্য চাষ করে। গরিলা সৈন্যরা জাপদের চারিদিক হইতে ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকে, যে সব স্থানে একবার জাপ-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অতর্কিত আক্রমণ করিয়া পুনরায় অধিকার করে। সে সব স্থানে পুনরায় জাপানের পূর্ণ অধিকার স্থাপন করিতে বহু সৈন্য অকারণে ক্ষয় হয়। গরিলা সৈন্যদের জন্য অধিকৃত স্থান হইতেও সৈন্য সরাইয়া লইতে পারিতেছে না। উত্তর চীনে সৈন্যসংখ্যা নয় লক্ষ, একমাত্র মধ্য চীনেই জাপ-সৈন্যসংখ্যা দুই লক্ষ। মাঞ্চুরিয়া হইতেও সৈন্য সরাইয়া আনিতে পারে না, কারণ তাহারাও জাপদের উপর সন্তুষ্ট নহে।

সমুদ্রসংলগ্ন বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিই জাপানের করতলগত।

জাপান বাহির হইতে খাদ্য সরবরাহ করার পথ বন্ধ করিতে পারে। কিন্তু তাহাতেও চীনের কোন ক্ষতি হইবে না। যুদ্ধের পূর্ব্বে চীনে অতি অল্পসংখ্যক জিনিষই রেলপথে আসিত, জলপথে বা কুলির কাঁধে বাহিত হইত। যাহা দেশে উৎপন্ন হয় তাহাই চীনাদের পক্ষে যথেষ্ট। চীনা-সৈন্যদের জন্যও আলাদা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয় না, ক্ষেত্র হইতে নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে। অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করাই একটু দুরূহ। চিয়াং এ বিষয়েও পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সমুদ্রসংলগ্ন স্থানগুলি অধিকার করিয়া উত্তর চীন অতি সহজেই জাপানীরা করতলগত করিবে বুঝিয়া উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশের অভ্যন্তর ভাগে রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। যন্ত্রাগার এই সকল স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিছু পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আছে, সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে আরও বেশী লাগিবে। বহির্জগতের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের নিমিত্ত তিনটি মোটর রাস্তা আছে। প্রথমটি চুংকিং হইতে তুর্কী-সাইবেরিয়া সোভিয়েট রেল পর্য্যন্ত, দ্বিতীয়টি চুংকিং হইতে ইন্দো-চীন, অপরটি ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে। চীনের প্রধান অসুবিধা, তাহার এরোপ্লেন ও সুশিক্ষিত চালকের সংখ্যা কম। চীনের আকাশ হইতে জাপ এরোপ্লেনগুলি তাড়াইতে হইলে নিজেদের এরোপ্লেনের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে।

চীনা মেয়েরাও প্রাণপণে দেশবাসীদের সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে না। উত্তর চীনে মেয়েরা চাষ-আবাদের ভার গ্রহণ করিয়া স্বামীদের গরিলা সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবার সুযোগ দিতেছে। দক্ষিণে কোয়াংসিতেও চীনা মেয়েদের চাষ করিতে হয়। আঠার বৎসর হইতে সকল প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষদের সৈন্যদলে যোগ দিতে হইতেছে। ইহা ছাড়া, মাদাম চিয়াং-এর উৎসাহে তাহারা শিল্পাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া চালনা করিতেছে। মেয়েদের আহত সৈন্যদের শুশ্রূষা করিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সময় সময়ে তাহারা পুরুষের পোষাকে যুদ্ধও করিতেছে। মিস্ সেং চীনা মেয়েদের সম্পর্কে 'এশিয়াটিক রিভিউ' পত্রের জুলাই (১৯৩৯) সংখ্যায় বলিয়াছেন—"In one generation the Chinese woman has jumped from mediaeval to modern life."

চীনের একটি দুর্ব্বলতা আছে, বণিকসম্প্রদায় আপোষে মীমাংসা করিতে চাহে। চিয়াং বারবার ইহার বিরুদ্ধে চীনাদের সতর্ক করিয়া দিতেছেন। এই যুদ্ধ চীনাদের পক্ষে আশীর্ব্বাদের ন্যায় হইয়াছে—নূতন চীনের আবির্ভাব দেখা দিয়াছে। জাপানের আভ্যন্তরিক অবস্থা সুবিধার নহে। তবে এখন পর্য্যন্তও জাপানীরা জাপ-গভর্ণমেণ্টের পক্ষে আছে। অধিককাল যুদ্ধ চলিলে তাহাদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে পারে। জাপানে যেরূপ আমেরিকা ও ইংলণ্ডের প্রতি বিদ্বেষ দেখা দিতেছে তাহাতে উহাদের সহিত যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা আছে। রুশিয়ার সহিত জার্মানী 'অনাক্রমণ-চুক্তি' করায় জাপান অসুবিধায় পড়িল, তবে ইটালী তাহাকে ত্যাগ করিবে না বলিয়া আশা দিতেছে। ক্যাণ্টন হংকং-এর খুব নিকটে, জাপান হেইনান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। ঐ স্থান হইতে ইন্দো-চীন খুব দূরে নহে। সিঙ্গাপুর, হংকং প্রভৃতি স্থানে সামরিক আয়োজন চলিতেছে। এই সকল শক্তি চীনে নিজেদের স্বার্থ নিশ্চয়ই দেখিবে। তাহারা যুদ্ধ না করিয়া কিছুতেই চীনকে জাপানের কুক্ষীগত হইতে দিবে না বলিয়াই বোধ হয়। অপর পক্ষে, চীন করতলগত করাও জাপানের সম্ভবপর হইবে না। এত বড় যোজনবিস্তৃত দেশে রেলপথ খুব কমই আছে। জাপান রেলপথের নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিই অধিকার করিয়াছে। চীনের ভিতরে প্রবেশ করা জাপানের পক্ষে খুব সহজ কার্য্য হইবে না।

মিঃ ন্যাথনিয়েল পেফার-এর ভাষায় বলিতে গেলে এই কথা বলা উচিত—জাপান কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবে না। তাহার পতন অনিবার্য্য।

তবে ইউরোপের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সুবিধার নহে—সেখানে লড়াইয়ের ডামাডোল সুরু হইয়া গিয়াছে। ভূমধ্যসাগরে ব্রিটীশ জাহাজ চলাচল বন্ধ করা হইয়াছে।

ইউরোপে যুদ্ধ বাধায় সুদূর প্রাচ্যে জাপানের চীন জয়ের সুযোগ বৃদ্ধি পাইবে। অথবা কার্জ্জনের কথাই সত্য হইবে—"The future of Great Britain will be decided not in Europe, but in the Continent whence our emigrant stock first came and to which as conquerors their descendants have returned." "ইউরোপ গ্রেটবৃটেনের ভবিষ্যত স্থির করিবে না, যে মহাদেশ হইতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রথম আসিয়াছিলেন এবং যথায় তাহাদের উত্তরাধিকারীগণ বিজেতার বেশে গিয়াছে তথায় গ্রেট টেনের ভাগ্য নিরূপিত হইবে।"

বনফুল

১৪

মুকুজ্যেমশাই যখন মৃন্ময়ের বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আসন্ন অপরাহ্নের ম্লান রৌদ্রালোকে ক্ষুদ্র গলিটি তন্দ্রাতুর। চারিদিকে কোন জীবনের লক্ষণ নাই। একেবারে যে নাই তাহা নহে, একটা ডাস্টবিনের উপর উঠিয়া একটা লোম-ওঠা শীর্ণ কুকুর লুব্ধ আগ্রহে কি যেন খাইতেছে, কিছু দূরে একটা গলিতে ঢং ঢং শব্দ করিয়া একটা বাসনবিক্রেতা বাসন ফেরি করিতেছে। ইহা ছাড়া চতুর্দ্দিকে আর বিশেষ কোন চাঞ্চল্য নাই। মুকুজ্যেমশাই আসিয়া ডাকিতেই ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া গেল এবং তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন। মুকুজ্যেমশাই নামক ব্যক্তিটির সহিত অনেকেই পরিচিত কিন্তু তাঁহার আসল পরিচয় কেহই বোধ হয় জানে না। পরিচিত মণ্ডলে তিনি মুকুজ্যেমশাই নামেই খ্যাত, নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকেন—ভবতোষ মুখোপাধ্যায়। ইহার বেশী নিজের আর কোন পরিচয় তিনি কাহাকেও দেন না। তাঁহার সম্বন্ধে কেহ বেশী কৌতূহল প্রকাশ করিলে বলেন, পৃথিবীর অনেক জিনিসই ত জানো না, এটাও না হয় না জান্‌লে! বলেন আর হাসেন। তাঁহার শ্মশ্রুগুম্ফ সমাচ্ছন্ন মুখের হাসিতে অসামান্য একটি মাধুর্য্য আছে। আয়ত আরক্ত চক্ষু দুইটি সরল স্নিগ্ধ মধুর হাসিতে সর্ব্বদাই যেন ঝলমল করিতেছে। মুকুজ্যেমশায়ের নিজের কাজ বলিয়া কিছু নাই, কারণ তাঁহার নিজস্ব সাংসারিক কোন বন্ধনই নাই। কিন্তু মুকুজ্যেমশাই সর্ব্বদাই বিব্রত ও ব্যস্ত, নানা কাজের চাপে তিনি নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পান না। পরের জন্য চাকরি জোগাড় করা, কে আপিসের টাকা ভাঙিয়া জেলে গিয়াছে, তাহার সংসারের তত্ত্বাবধান করা ও জেল হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার নানাপ্রকার তদ্বির করা, কোথায় কোন্ রোগী আছে তাহার ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করা, ভিড়ের দিনে অল্প পয়সার মধ্যে থিয়েটারের জন্য টিকিট সংগ্রহ করা ইত্যাদি বহু বিচিত্র কর্ম্মভারে মুকুজ্যেমশাই সর্ব্বদাই নিপীড়িত। আজ তিনি কলিকাতায় আছেন, কাল রাজমহলে এবং তৎপরদিন দিনাজপুরে চলিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। সম্প্রতি তিনি কলিকাতা আসিয়াছিলেন শিরিষবাবুর পুত্রের অসুখের সম্পর্কে। পুত্রটি তো মারা গিয়াছে, এখন কন্যাটির বিবাহ ব্যাপারে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন। মৃন্ময়ের সহিত মুকুজ্যেমশাই-এর আলাপ বেশী দিনের নয়। হাসির বাবার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল এবং হাসির স্বামী হিসাবেই তিনি মৃন্ময়ের পরিচয় লাভ করিয়াছেন। যে বড় পুলিশ অফিসারটি হাসিকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন তিনিও মুকুজ্যেমশায়ের একজন ভক্ত এবং মুকুজ্যেমশায়ের সুপারিশেই তিনি একদা হাসির ভার লইয়াছিলেন। সুতরাং মৃন্ময়ের অপেক্ষা হাসিই মুকুজ্যেমশাই-এর বেশী আত্মীয়। মুকুজ্যেমশাই বাড়িতে ঢুকিয়া দেখিলেন হাসি ছাড়া বাড়িতে কেহ নাই। হাসি মুকুজ্যেমশাইকে দেখিয়া বলিল, আপনি এলেন তবু বাঁচলুম!

এরা সব কোথা?

ঠাকুরপো এখনও কলেজ থেকে ফেরে নি। আর জানেন, উনি আজ দু'দিন বাড়ি নেই। কি বিচ্ছিরি বলুন তো—

কোথা গেছে মৃন্ময়?

কি জানি আপিসের কাজে কোথায় গেছে—

সি. আই. ডি-র কর্ম্মে মৃন্ময়কে প্রায়ই বাহিরে যাইতে হয়। মুকুজ্যেমশাই হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, কবে ফিরবে কিছু বলে গেছে?

ঠোঁট ও হাত উল্টাইয়া হাসি বলিল, কিছু না। যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা ক'রে পর্য্যন্ত যায় নি। আপিস থেকে বাইরে বাইরে চলে গেছে, একটা কনেস্টবলের হাতে ঠাকুরপোকে একটা চিঠি লিখে দিয়ে গেছে যে, ফিরতে দু-চার দিন দেরি হতে পারে, আমরা যেন না ভাবি। দেখুন একবার আক্কেল।

মুকুজ্যেমশাই সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, কি করবে বেচারি, ওর চাকরিই হ'ল ওইরকম।

মুখে আগুন অমন চাকরির!

এই বলিয়া হাসি একটি কম্বল আনিয়া বিছাইয়া দিল।

কম্বলে উপবেশন করিয়া মুকুজ্যেমশাই বলিলেন, কই তোর বেরালছানাটা কোথা।

হাসির চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল।

কাল সকালে সেটা মরে গেছে।

মরে গেছে! আহা, কি ক'রে?

ঠাকুরপোর জন্যে। সদর দরজাটি কখন খুলে রেখেছিল, আর ও অমনি সুট ক'রে কখন বেরিয়ে গেছে রাস্তায়। বাস্, ওদের বাড়ির কুকুরটা এসে খ্যাক্ ক'রে কামড়ে দিলে!

তখখুনি মরে গেল?

না, বেঁচেছিল খানিকক্ষণ।

সহানুভূতিপূর্ণকণ্ঠে মুকুজ্যেমশাই বলিলেন, আহা—

ঠাকুরপোটা এমন পাষণ্ড—কি বললে শুনবেন, বললে—বাঁচা গেছে, আপদ গেছে!

ইহার উত্তরে মুকুজ্যেমশাই কিছু বলিলেন না দেখিয়া অধিকতর উষ্মাভরে হাসি বলিল, আপনি আস্কারা দিয়ে দিয়ে ঠাকুরপোকে আরও বাড়িয়ে তুলছেন!

ইহার উত্তরেও মুকুজ্যেমশাই কিছু বলিলেন না। উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব। বিড়ালের শোকে হাসি খুব বেশী ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে নাই, তাহার কারণ সে পরমুহূর্ত্তেই বলিল, আচ্ছা, আপনার চুলের দশা কি হয়েছে?

উত্তরে মুকুজ্যেমশাই হাস্যদীপ্ত চক্ষুর দৃষ্টি তাহার মুখের উপর স্থাপিত করিলেন।

হাসি আবার বলিল, আঁচড়ে দেব?

দে।

হাসি ঘরের ভিতর হইতে একটি বড় চিরুণী আনিয়া মুকুজ্যেমশায়ের কেশ-সংস্কারে লাগিয়া গেল। মুকুজ্যে-মশায়ের কেশ-সংস্কার খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। একমাথা বড় বড় তৈলবিহীন রুক্ষ চুল, আয়ত্তে আনা শক্ত। হাসি মরিয়া হইয়া চিরুণী চালাইতে লাগিল। মুকুজ্যেমশাই ধৈর্য্যসংকারে চোখমুখ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিলেন। খানিকক্ষণ পরে হাসির হুঁস হইল।

লাগছে আপনার?

পাগল, একটুও না!

এককাজ করি বরং, আগে একটু তেল দিয়ে নি, বেশ ভাল তেল আছে আমার।

মুকুজ্যেমশায়ের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া হাসি পুনরায় ঘরের ভিতর গেল এবং তৈল লইয়া আসিল। মুকুজ্যেমশাই আপত্তি করিলেন না। তৈল-সহযোগে ক্রমাগত আঁচড়াইয়া আঁচড়াইয়া হাসি যখন মুকুজ্যেমশায়ের চুলের শ্রী অনেকটা ফিরাইয়া ফেলিয়াছে তখন চিন্ময় কলেজ হইতে ফিরিল। ঢুকিতে ঢুকিতেই সে বলিল, ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে বৌদি, শিগ্‌গির খাবার দাও।

তাহার পর মুকুজ্যেমশাইকে দেখিতে পাইয়া সে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল ও পরমুহূর্ত্তে প্রণাম করিয়া বলিল, কতক্ষণ এসেছেন আপনি?

হাসি বলিল, মাথা যেন কাগের বাসা হয়েছিল, তবু অনেকটা পরিষ্কার হ'ল!

মুকুজ্যেমশাই বলিলেন, এইবার ছাড়, চিনুর সঙ্গে আমার দরকারি কথা আছে কয়েকটি। চিনু, আমার কাজের কতদূর হ'ল? আঃ, ছাড়্ আমাকে পাগলি—

দাঁড়ান না, সিঁথেটা ঠিক ক'রে দি।

চিনু বলিল, লিস্ট্ আমি তৈরি করেছি, অনেক হয়েছে।

কই, দেখি।

থামুন বইগুলো রেখে আসি আগে।

চিনু বই রাখিতে ভিতরে গেল।

হাসি মুকুজ্যেমশায়ের প্রসাধন শেষ করিয়া বলিল, কেমন হ'ল বলুন দেখি। মাথাটা বেশ ঝরঝরে লাগছে, না?

খুব।

যাই ঠাকুরপোকে খাবার দিইগে। আপনি কিছু খাবেন?

না। আমাকে খেতে দেখেছিস কখনো বিকেলে?

হাসি চিনুর জলখাবার আনিতে রান্নাঘরের দিকে গেল।

চিনু আসিয়া বলিল, সবসুদ্ধ পনের জন ছেলের নাম জোগাড় করেছি, দেখুন।

একটি ছোট খাতায় অনেকগুলি নাম টোকা ছিল। সেই খাতাখানি সে মুকুজ্যেমশায়ের হাতে দিয়া বলিল, যার যতটা পরিচয় পেয়েছি সব টুকে নিয়েছি, ঠিকানাও আছে ওতে অনেকের।

চিনুর কার্য্যনিপুণতায় মুকুজ্যেমশাই খুশি হইলেন।

বলিলেন—বাঃ!

চিনু বলিল, এদের মধ্যে এই শঙ্করসেবক রায় বলে ছেলেটি খুব ভাল। কলেজে ভাল ছেলে বলে খুব নাম। বাড়ির অবস্থাও ভাল শুনেছি।

মুকুজ্যেমশাই বলিলেন, ঠিকানাটা টোকা আছে তো? কই?

হস্টেলে থাকে, এই যে ঠিকানা।

মুকুজ্যেমশাই ঠিকানাটা দেখিয়া লইলেন ও তাহার পর খাতাটা চিনুকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, আচ্ছা, এটা এখন থাক তোমার কাছে। মেডিকেল কলেজ আর ল কলেজের দুজন ছেলেকেও দিয়েছি দুখানা খাতা। একদিন সব মিলিয়ে দেখি, তারপর বেরুনো যাবে। এখন তুমি চট্ ক'রে খেয়ে নাও, এক দান বাঘ-বকরি খেলা যাক এসো! সেদিন তুমি হারিয়ে দিয়েছিলে আমায়, তার শোধ না তুলে ছাড়ছি না

চিনু হাসিয়া বলিল, আজও জিততে দেব না।

হাসি খাবার লইয়া আসিয়াছিল।

সে বলিল, সাবধানে খেলবেন দাদামশাই, ভয়ঙ্কর চোর ও! মরা বকরিগুলো চুরি ক'রে ঢুকিয়ে দেয়!

চিনু চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, মিথ্যুক কোথাকার! নিজে খেলতে পারেন না, আবার আমার নামে দোষ দেওয়া হচ্ছে—

মুকুজ্যেমশাই হাসিতে লাগিলেন।

বলিলেন, আমার কাছে সে সব চালাকি চলবে না। নাও, তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।

চিনু কোনক্রমে পরোটা কয়খানা গলাধঃকরণ করিয়া মুকুজ্যেমশায়ের সহিত খেলিতে বসিয়া গেল।

হাসি মুকুজ্যেমশায়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া চিনু কখন কি ভাবে চুরি করে তাহা ধরিয়া ফেলিবার জন্য ওৎ পাতিয়া রহিল।

১৫

মিস বেলা মল্লিক দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁটটিকে চাপিয়া ভ্রূভঙ্গী-সহকারে একখানি পত্র পড়িতেছিলেন ও ভাবিতেছিলেন কি করিয়া তিনি তাঁহার জীবনের এই আধুনিকতম সমস্যাটির সমাধান করিবেন। এ জাতীয় সমস্যা তাঁহার জীবনে নূতন অথবা আকস্মিক নহে। রূপ এবং যৌবন থাকিলে স্ত্রীলোক মাত্রেরই জীবনে এরূপ সমস্যার আবির্ভাব স্বাভাবিক। বেলা মল্লিক ইহাতে কোনরূপ অভিনবত্ব অনুভব করিতেছিলেন না, তিনি ভাবিতেছিলেন কি উপায়ে সমস্যাটির সুচারু সমাধান করিয়া ফেলা যায়। তাঁহার মনোভাব অনেকটা দাবা-খেলোয়াড়ের মনোভাবের অনুরূপ। এরূপ প্রেমিক তাঁহার জীবনে একাধিক বার আসিয়াছে এবং প্রতিবারেই তিনি সু-কৌশলে আত্মরক্ষা করিয়াছেন। সম্ভবপর হইয়াছে, কারণ নিজে তিনি কখনও কাহারও প্রেমে পড়েন নাই। নিজের রূপ গুণ ও যৎসামান্য কালচারের প্রভাবে তিনি বহু পুরুষের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন বটে কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহার মনোযোগ কেহ আকর্ষণ করিতে পারেন নাই।

সম্প্রতি দুইটি প্রণয়ী আলোকলুব্ধ পতঙ্গের মত অহরহ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতেছে। ইহাদের একজনের সম্বন্ধে বেলা দেবী নিশ্চিন্ত আছেন, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিটি তাঁহার ভাবনা উদ্রিক্ত করিয়াছে। এই দ্বিতীয় লোকটির উচ্ছ্বাসের মধ্যে এমন একটা আত্মসমর্পণের ভঙ্গী রহিয়াছে যাহা উপেক্ষণীয় নহে। ইহা ঠিক নারী-দেহ-লুব্ধ পুরুষের লালসাময় প্রলাপ নহে—এ আকুলতার মধ্যে মর্ম্মস্পর্শী আন্তরিকতা রহিয়াছে; ঠিক সুরটি যেন বাজিতেছে। প্রথমোক্ত প্রণয়ীটির মধ্যে যে আন্তরিকতার অভাব আছে তাহা নয়, কিন্তু সে আন্তরিকতা মনকে নাড়া দেয় না। নারীর মনকে নাড়া দিবার ক্ষমতা অপূর্ব্ববাবুর নাই। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালিত নারী-স্তাবক, নারী-সঙ্গ-লিপ্সু। নারীর বন্ধু হইবার মত যোগ্যতা তাঁহার হয় তো আছে, কিন্তু প্রেমিক হইবার মত বলিষ্ঠতা তাঁহার নাই। প্রলুব্ধ ভ্রমরের মত প্রতি কুসুমের দ্বারে দ্বারে তিনি গুঞ্জন করিতেই পটু, আর কিছু করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। চাটুকার ভ্রমরকে দিয়া কুসুম তাহার নানা অভীষ্ট সিদ্ধ করাইয়া লয় কিন্তু কখনও ভ্রমরের কণ্ঠলগ্ন হয় না। কুসুম উপভোগ্য হয় সেই বলিষ্ঠ নিষ্ঠুরের যে তাহাকে নির্ম্মম হস্তে বৃন্ত-চ্যুত করে, নির্দ্দয় সূচিকা-আঘাতে মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া মালা গাঁথে। ইহা হয়ত বর্ব্বরতা, কিন্তু এই বর্ব্বরতার জন্যই বহু নারী-হৃদয় সমুৎসুক। অতি-সভ্য, অতি-সৌখীন,

অতি-মৃদু অতি-নমনীয় পুরুষ নারীর কাম্য নহে—অন্তত বেলার নহে। সুতরাং অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালিত সম্বন্ধে তাঁহার কোনরূপ দুর্ভাবনা ছিল না। তিনি গান শিখাইবার অছিলায় যে প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার সঙ্গসুখ লাভ করিতেই আসেন তাহা বেলা দেবী জানেন এবং সহ্য করেন। সহ্য করিবার হেতু আছে। এত সস্তায় এরূপ গানের শিক্ষক পাওয়া শক্ত। অপূর্ব্ববাবুর নিজের গলা যদিও খুব ভাল নয়, কিন্তু তিনি আধুনিক ও ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত সম্বন্ধে সত্যই অভিজ্ঞ। শিক্ষক হিসাবেও তিনি ভালো। তাছাড়া, আবেগের আতিশয্যে নানা রকম উপহারও তিনি আনিয়া দিতেছেন। সেদিন একটা ভাল এস্রাজ তাঁহাকে উপহার দিয়াছেন, নানা স্থান হইতে গানের স্বরলিপি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেন। বেলা মল্লিকের মত 'সঙ্গতি-বিহীনার পক্ষে এসব অবহেলা করিবার নয়। সঙ্গীত বিদ্যায় বেলার অনুরাগ আছে, গলাও ভাল। এই সুযোগে 'অর্থাৎ অপূর্ব্বকৃষ্ণের দুর্ব্বলতার সুযোগে যদি এই বিদ্যাটা আয়ত্ত করিয়া লওয়া যায়, ক্ষতি কি! মাত্র পাঁচ টাকা মাহিনায় অপূর্ব্বকৃষ্ণবাবুর মত একজন শিক্ষক পাওয়া সহজ নয়। মাত্র সঙ্গসুখ দান করিয়া এত অল্প বেতনে যদি অপূর্ব্ববাবুর মত লোক পাওয়া যায় বেলা তাহাতে আপত্তি করিবেন কেন। অপূর্ব্ববাবুর সম্বন্ধে সামান্যতম মোহও বেলার মনে নাই। অপূর্ব্ববাবুর মোহের সুযোগ লইয়া তিনি নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইতেছেন মাত্র এবং আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্যই তাঁহাকে একটা বেতন দিতেছেন। কারণ, এটা তিনি বেশ জানেন যে, বেতন না দিলেও অপূর্ব্ববাবু তাঁহাকে গান শিখাইতে আসিবেন। তথাপি বেলা দেবী তাঁহাকে বেতন দেন এইজন্য যে, কৃতজ্ঞতার বন্ধনেও তাঁহাকে যেন অপূর্ব্ববাবুর কাছে বাঁধা পড়িতে না হয়, ইচ্ছা করিলে যে-কোন দিনই যেন সম্পর্কটা চুকাইয়া দেওয়া চলে। সুতরাং অপূর্ব্ববাবুকে লইয়া বেলার দুর্ভাবনা নাই।

কিন্তু এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে এত সহজে এড়ানো যাইবে না। এড়ানো শক্ত, প্রথমত এই কারণে যে, সে প্রতিবেশী, সদা সর্ব্বদা তাহার সহিত দেখা হইতেছে। দ্বিতীয়ত, সে স্বজাতি, পালটি ঘর, সামাজিকভাবেও তাহার সহিত বিবাহ হইতে পারে এবং সে চাহিতেছেও তাহাই। কিছুদিন পূর্ব্বে সে বেলার দাদা প্রিয়বাবুর নিকট খোলাখুলিভাবেই এই প্রস্তাব করিয়াছিল। বেলার দাদাই বেলার একমাত্র অভিভাবক ও আত্মীয়। এই প্রস্তাবে তিনি খুশিই হইয়াছিলেন। এই বাজারে বোনটার যদি এমন একটা সহজ গতি হইয়া যায়, মন্দ কি। বেলা কিন্তু বিবাহ করিতে রাজি নহেন এবং সে কথা দাদাকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন। ভগ্নীর বয়স হইয়াছে, কিছু লেখাপড়াও শিখিয়াছে, তাহার নিজের একটা মতামত হইয়াছে, প্রিয় মল্লিক সোজাসুজি ভগ্নীর মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করিলেন না। তিনি বাঁকা পথ ধরিলেন। বেলাকে একদিন বলিলেন, আলাপ করে দেখ না একদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে! খাসা লোক, অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল, আমার তো বেশ লাগলো ছেলেটিকে—

সুতরাং বেলার সহিত লক্ষণবাবুর একদিন আলাপ-পরিচয় হইয়া গেল এবং তাহার পর হইতে লক্ষণবাবু সুযোগ পাইলেই আসিয়া হাজির হইতেছেন। এতদিন দূর হইতেই তিনি বেলাকে দেখিয়া ও বেলার গান শুনিয়া মুগ্ধ হইতেছিলেন, এখন প্রিয়বাবু সে দূরত্বটুকু ঘুচাইয়া আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ভাবটা, যদি বেলার ছেলেটিকে ভাল লাগিয়া যায়। প্রিয়বাবু লেখাপড়া-জানা শিক্ষিত ভদ্রলোক—ব্যাচিলার মানুষ—একশত টাকা বেতনের চাকুরি করেন। ভগ্নীটিকে লইয়া বিপন্ন হইয়া আছেন। ভগ্নীটি স্কন্ধ হইতে নামিলে তিনি এই আয়ে আরও একটু আরামে থাকিতে পারেন। কিন্তু মুস্কিল এই যে, ভগ্নী কিছুতেই নামিতে চান না। প্রিয়বাবু যত পাত্র আনিয়া জুটাইতেছেন, একটা-না-একটা ওজুহাতে বেলা তাহাদের নাকচ করিয়া দিতেছে। মেয়েটা প্রেমেও পড়ে না! ওই গানের মাস্টারটা হন্যে কুকুরের মত রোজ যাওয়া-আসা করিতেছে, একবার 'তু' করিয়া ডাকিলেই পায়ে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে, কিন্তু বেলা তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহে না। যে আশায় প্রিয়বাবু মাসে মাসে নগদ পাঁচ টাকা করিয়া খরচ করিতে রাজি হইয়াছিলেন, সে আশায় বহুকাল পূর্ব্বেই ছাই পড়িয়াছে। এখন টাকাটা অনর্থক খরচ হইতেছে বুঝিয়াও প্রিয়বাবু তাহা বন্ধ করিতে পারিতেছেন না। বেলাকে তিনি ভয় করেন।

'দেখা যাক, এ ছোকরা যদি কিছু ক'রে উঠতে পারে'—

এই মনোভাব লইয়া তিনি লক্ষণবাবুকে আনিয়া একদিন বেলার সহিত আলাপ করাইয়া দিয়াছেন।

বেলার মনোজগতে কোন বিপ্লব হয় নাই।

লক্ষণবাবু কিন্তু ক্ষেপিয়া গিয়াছেন।

লক্ষণবাবুর সহিত আলাপ করিয়া বেলা প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন যে, ইহাকে লইয়া মুস্কিলে পড়িতে হইবে। ছেলেটির বয়স কম বলিয়াই অতিশয় ভাব-প্রবণ—কাছে আসিয়া আলাপ করিতে পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছে। এই বিপদ হইতে কি কৌশলে ভদ্রভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ বেলার মাথায় একদিন একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। কুষ্ঠিখানাকে কাজে লাগান যাক্! বেলা লক্ষণবাবুকে বলিয়া বসিলেন যে, তাঁহার কুষ্ঠিতে খুব বিশ্বাস, বিবাহ-ব্যাপারে লক্ষণবাবু যদি সত্যই অগ্রসর হইতে চান তাহা হইলে উভয়ের কুষ্ঠি দুইটা সর্ব্বাগ্রে মিলাইয়া দেখা প্রয়োজন। নিজের কুষ্ঠির সম্বন্ধে বেলা দেবীর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। কুষ্ঠিখানি এমন যে কোন জ্যোতিষীই সজ্ঞানে সেটিকে ভাল বলিতে পারিবেন না। বেলার বাবা যখন বাঁচিয়া ছিলেন এবং বেলার বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন তখন এই কুষ্ঠিই বিবাহের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শেষটা বেলার বাবা ঠিক করিয়াছিলেন যে, এবার কেহ কুষ্ঠি চাহিলে একটা মিথ্যা কুষ্ঠি দিতে হইবে। সে প্রয়োজন অবশ্য আর হয় নাই। কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান এবং বেলা নিজেই নিজের বিবাহের কর্ত্রী হইয়া পড়েন। মা আগেই মারা গিয়াছিলেন। বেলার দাদা প্রিয়বাবু লোকচক্ষে যদিও বেলার অভিভাবক কিন্তু বেলার ব্যক্তিগত সকল ব্যাপারে বেলার মতই গ্রাহ্য এবং সে মত এতই সুস্পষ্ট যে, প্রিয়বাবু ভগ্নীর বিবাহের আশা এক প্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছেন। তিনি বেশ দেখিতে পাইতেছেন যে, বেলার বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই। সে ইচ্ছা থাকিলে এতদিন কোন্ কালে বিবাহ হইয়া যাইত। পুরুষের সংস্পর্শে আসিলেই বিগলিত হইয়া পড়িতে হইবে এ মনোভাব বেলার ত নাইই—বরং উল্টা। পুরুষের সংস্পর্শে আসিলে সে যেন আরও কঠিন হইয়া পড়ে। প্রিয়বাবু ভগ্নীর এই অদ্ভুত মনোবৃত্তির কোন অর্থ খুঁজিয়া না পাইয়া শেষটা হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।

লক্ষণবাবুর হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বেলা দেবী নিজের সাংঘাতিক কুষ্ঠিখানি কাজে লাগাইয়াছিলেন। কয়েক দিন পূর্ব্বে লক্ষণবাবু তাঁহার কুষ্ঠিখানি লইয়া গিয়াছেন। আজ অকস্মাৎ এই পত্রখানি আসিয়াছে—

বেলা,

এ কয়দিন আমি ক্রমাগত চিন্তা করিয়াছি। কোন কূল-কিনারা দেখিতে পাই নাই। অবশেষে তোমার কাছেই আসিয়াছি, তুমিই ইহার শেষ নিষ্পত্তি করিয়া দাও। তুমি কুষ্ঠিতে বিশ্বাস কর, আমিও করি। কিন্তু বিধাতার এমনি নির্ব্বন্ধ যে, কুষ্ঠি দুইটির কিছুতেই মিল হইতেছে না। আমি দুইজন জ্যোতিষীকে দেখাইয়াছি। দুইজনেই এ বিষয়ে একমত। একজন জ্যোতিষী কিন্তু বলিলেন যে মনের মিলই শ্রেষ্ঠ মিল। আমার মন তাঁহার কথায় সায় দিয়াছে। জানি না তোমার মনের কথা কি! তোমাকে বিবাহ করিলে সত্যই যদি কোন বিপদ ঘটে আমার তাহাতে ভয় নাই। তোমার জন্য সমস্ত বিপদ বরণ করিতে আমি প্রস্তুত আছি এবং আজীবন থাকিব। যদি অনুমতি দাও, আবার তোমার নিকট যাই। আমার মনের ভিতর যে কি হইতেছে তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। দোকানের ঠিকানায় উত্তর দিও। ইতি লক্ষণ

বেলা কিছুক্ষণ পত্রখানার পানে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে উত্তর লিখিতে সুরু করিলেন। সংক্ষিপ্ত উত্তর—

লক্ষণবাবু,

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। একদিন সময় করিয়া নিশ্চয় আসিবেন। আসিবেন না কেন? কুষ্ঠির বিরুদ্ধাচরণ করিতে ভয় হয়। দেখি, দাদা কি বলেন। নমস্কার। ইতি

শ্রীবেলা মল্লিক

পত্রখানি খামে মুড়িয়া ঠিকানা লিখিতে গিয়া বেলা দেবী টেবিলের উপর দুই বাহু প্রসারিত করিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। উচ্ছ্বসিত হাস্যবেগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

১৬

কলিকাতার বাহিরে একটি রেলওয়ে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে বসিয়া মৃন্ময় তাঁহার ডায়েরি লিখিতেছিল। সি. আই. ডি-তে কিছুকাল কাজ করিয়া এবং তাহাতে দক্ষতা

দেখাইয়া (এবং কিছুটা শ্বশুর মহাশয়ের তদ্বিরের ফলেও) মৃন্ময় সম্প্রতি আই. বি-তে ঢুকিয়াছে। আঠারো-উনিশ বছরের একটি ছোকরার পিছনে ঘুরিতে ঘুরিতে সে কলিকাতার বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। উপরওলার নির্দ্দেশমত সে ছেলেটির গতিবিধির ইতিহাস, নাম, ধাম, এমন কি, একটি ফটোগ্রাফ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়াছে। এমন তো সে কিছুই এ ছোকরার মধ্যে দেখিতে পাইল না যাহা ভীতিকর। বরং ছোকরাকে দেখিলে অতিশয় নিরীহ বলিয়াই মনে হয়। ইহার উপর কর্ত্তাদের এত নজর কেন? যে জন্যই হউক তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার ইচ্ছা অথবা অবসর মৃন্ময়ের নাই। সে মনিবের হুকুম তামিল করিয়াছে, ওইখানেই তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। কর্ত্তব্যের জের টানিয়া আনিয়া ব্যক্তিগত নিভৃত জীবনকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলা মৃন্ময়ের স্বভাব নয়। সুতরাং ডায়েরি ও রিপোর্ট লেখা শেষ করিয়া সে তাহার চাকুরি-জীবনের উপর তখনকার মত যবনিকা টানিয়া দিল এবং আরাম-কেদারায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া চক্ষু বুজিল।

একটু পরেই তাহার মনে স্বর্ণলতার ছবি ফুটিয়া উঠিল। সোনার মত গায়ের রঙ, লতার মত তন্বী—সত্যই সে স্বর্ণলতা ছিল। সহসা কোথায় চলিয়া গেল। এমন করিয়া চলিয়া যাইবার হেতুই-বা কি, মৃন্ময় আজও তাহা বুঝিতে পারে নাই। স্বর্ণলতার অন্তর্দ্ধানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই—

স্বর্ণলতা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছিল এবং ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিবার পর তাহার সহিত মৃন্ময়ের বিবাহ হয়। বিবাহের পর সামান্য একটি অস্থায়ী চাকুরি পাইয়া মৃন্ময় স্বর্ণলতাকে লইয়া কলিকাতা শহরে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করে। মৃন্ময়ের সামান্য আয়ে কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন চলিত। কিন্তু কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদন চলিলেই মানুষ সন্তুষ্ট থাকে না। স্বর্ণলতার মনে নানারূপ সখ। মৃন্ময়ের স্বল্প আয়ে সে সব সখ মিটিত না। একদিন স্বর্ণলতা মৃন্ময়কে বলিল যে, দুইজনে মিলিয়া উপার্জ্জন করিলে কেমন হয়—সে-ও চাকুরি করিবে। একটি কাগজে নাকি সে বিজ্ঞাপন দেখিয়াছে যে, একটি বালিকাকে পড়াইবার জন্য ম্যাট্রিকুলেশন পাশ একজন শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক। সকালে একঘণ্টা ও বিকালে একঘণ্টা বাড়িতে গিয়া পড়াইয়া আসিতে হইবে, বেতন মাসিক ত্রিশ টাকা।

মৃন্ময় হাসিয়া বলিয়াছিল, তুমি অতদূর গিয়ে রোজ পড়িয়ে আসতে পারবে?

কেন পারব না, নিশ্চয় পারব।

ইহার দুই দিন পরে মৃন্ময় একদিন আপিস হইতে ফিরিয়া দেখে স্বর্ণলতা নাই। পাড়ায় খোঁজ করিল, কেহ কিছু বলিতে পারিল না। যে ঠিকানা হইতে শিক্ষয়িত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল সেখানে গিয়া খোঁজ করিল, সেখানেও স্বর্ণলতা যায় নাই। তাঁহারা বলিলেন যে, স্বর্ণলতা নামে কোন শিক্ষয়িত্রী আসেন নাই। দুইদিন পরে খোঁজ লইতে গিয়া দেখিল সে বাড়িতে কেহ নাই। বাড়ি খালি পড়িয়া আছে—'টু লেট' ঝুলিতেছে। স্বর্ণলতার বাপের বাড়িতে খবর দিতে তাঁহারা মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, স্বর্ণ সেখানেও যায় নাই ত! কোথায় গেল সে? পুলিশে খবর দেওয়া হইল, হাসপাতালগুলিতে সন্ধান লওয়া হইল—কোন খবরই পাওয়া গেল না। এমনভাবে চলিয়া যাইবার অর্থ কি! অস্থায়ী চাকুরির মেয়াদও ফুরাইয়া আসিল—চাকুরিবিহীন উদভ্রান্ত মৃন্ময় সম্ভব অসম্ভব নানাস্থানে স্বর্ণলতার অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে লাগিল।

আজও ফিরিতেছে।

আরাম কেদারায় শুইয়া মৃন্ময় স্বর্ণলতার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যে প্রশ্ন বহুবার সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে সেই প্রশ্নটি আবার তাহার মনে জাগিতে লাগিল। স্বর্ণলতা কি তাহার দারিদ্র্যকে ঘৃণা করিয়া চলিয়া গিয়াছে? সে কি তাহাকে ভালবাসিত না? নিশ্চয় বাসিত! তবে সে এমন করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল কেন? তাহার মানসপটে স্বর্ণলতার যে মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে তাহা নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক। তাহাতে কোন কলুষ নাই। তবে চলিয়া গেল কেন? এ 'কেন'র উত্তর মৃন্ময় আজও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। মৃন্ময় স্বর্ণলতার প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছিল কি? মাত্র একবৎসর তো বিবাহ হইয়াছিল। সহসা তাহার মনে হইল সে হয়ত স্বর্ণলতাকে মোটেই চিনিতে পারে নাই। তাহার মানসপটে স্বর্ণলতার যে মুখখানি আঁকা রহিয়াছে—তাহাতে অদ্ভুত মৃদুহাসি! ওই সলজ্জ স্নিগ্ধ হাসিটুকুর কোন সদর্থই ত মৃন্ময় আজ পর্য্যন্ত করিতে পারিল না। উহা কি ব্যঙ্গের হাসি?

অনুরাগের হাসি? অর্থহীন হাসি? মৃন্ময় ঠিক বুঝিতে পারে না। কিন্তু একটা কথা মৃন্ময় নিঃসংশয়ে জানে যে, সে নিজে স্বর্ণলতাকে আজও ভালবাসে এবং একদিন না একদিন সে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেই।

ক্লিক্!

শব্দটা শুনিয়া মৃন্ময় চক্ষু খুলিয়া দেখিল। শ্যামবর্ণ নাতি-স্থূল সুদর্শন্ একটি ভদ্রলোক আসিয়া ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করিয়াছেন। মৃন্ময়কে চক্ষু খুলিতে দেখিয়া একটি ছোট ক্যামেরা তিনি পকেটের মধ্যে ঢুকাইয়া ফেলিলেন। মৃন্ময় ব্যাপারটা ভাল বুঝিল না। আগন্তুক ভদ্রলোকটি ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন, কতদূর যাবেন আপনি?

কোলকাতা।

ও।

মোটরের দালাল অচিনবাবু আবার বাহিরে চলিয়া গেলেন ও ক্ষণপরেই একটি কুলি-সমভিব্যাহারে ফিরিয়া আসিলেন। কুলির মাথা হইতে একটি সুটকেস ও হোল্ড-অল্ নামাইয়া লইতে লইতে পুনরায় ঈষৎ হাস্য করিয়া অচিনবাবু বলিলেন, একটু অসুবিধে করলাম আপনার, মাপ করবেন। বেশ একা একা শুয়ে ঘুমুচ্ছিলেন, না?

না, আমার কিছু অসুবিধে হবে না। আপনি এলেন কোথা থেকে! এখন তো কোন ট্রেন নেই।

আমি মোটরে এলাম। আমিও কোলকাতা যাব—

তাই নাকি? তা হ'লে তো ভালই হ'ল। একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

অচিনবাবুর ড্রাইভার আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল।

অচিনবাবু তাহাকে বলিলেন, তুমি ফিরে যাও, রাজা সায়েবকে ব'লে দিও আমার কাজ হয়ে গেছে। কোলকাতায় আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করব আমি!

সেলাম করিয়া ড্রাইভার চলিয়া গেল।

অচিনবাবু ওয়েটিং রুমের দ্বিতীয় ইজি চেয়ারটি দখল করিলেন। চক্ষু হইতে চশমাটি খুলিয়া রুমাল দিয়া চশমার কাচ দুইটি পরিপাটি রূপে পরিষ্কার করিয়া চশমাটি পুনরায় পরিধান করিলেন। তাহার পর হোল্ড্-অলের ভিতর হইতে একটি খবরের কাগজ বাহির করিয়া নিবিষ্টচিত্তে তাহা পড়িতে সুরু করিয়া দিলেন।

মৃন্ময় নির্ব্বাক হইয়া আগন্তুক ভদ্রলোকটির পানে চাহিয়া রহিল। লোকটি কে? কাহার ফোটো তুলিল? মৃন্ময়ের? কেন?—এই জাতীয় নানা প্রশ্ন মৃন্ময়ের মনের শান্তি বিঘ্নিত করিতে লাগিল। অচিনবাবু কিন্তু আর মৃন্ময়ের প্রতি মনোযোগ দিলেন না। তিনি প্রকাণ্ড খবরের কাগজখানা মুখের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, মৃন্ময় তাহার মুখটাও আর ভাল করিয়া দেখিতে পাইল না। মৃন্ময়ের কৌতূহল ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মৃন্ময় উঠিয়া বাহিরে গেল। বাহিরে গিয়া দেখিল দুই-একটি কুলি ছাড়া প্ল্যাটফর্মে আর কেহ নাই। তখন ধীরে ধীরে সে স্টেশনের বাহিরে গিয়া পিছন দিক হইতে ওয়েটিং রুমের বাহির দিকে আসিয়া দাঁড়াইল। খোলা জানালা দিয়া সে দেখিল অচিনবাবুর মুখখানা বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

মুখে হাসি নাই, চক্ষু দুইটি হইতে কিন্তু হাসি উপচাইয়া পড়িতেছে। মৃন্ময়ের কাছেও ছোট একটি ক্যামেরা ছিল। তাহার ডিটেকটিভ মন এ সুযোগ ত্যাগ করিতে চাহিল না। ক্ষিপ্রতার সহিত পকেট হইতে ক্যামেরাটি বাহির করিয়া অচিনবাবুর একখানা ফোটো সে তুলিয়া লইল।

অচিনবাবু কিছুই জানিতে পারিলেন না।

কবি বিজয় গুপ্ত

শ্রীহৃষীকেশ বসু বি-এ, কাব্যতীর্থ

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ও ভাষাবিজ্ঞানে-লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রগতিকামী বিদ্বজ্জন প্রথমেই আমাদের দেশের প্রাচীন কবিগণের অস্তিত্বের রূপকথা বলেন। সেই রূপকথা শুনিয়া যাহারা প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের হাত হইতে প্রথমে আমরা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের কতকটা ইতিহাস পাইয়াছি। সেই ইতিহাসে যে কাব্যগুলি আলোচিত হইয়াছে, কাব্যের দাবী তাহাদের যতটুকু আছে, ইতিহাসের দাবী তাহা হইতে অনেক বেশী। ব্রাহ্মণ্য যুগের কাব্য-সাহিত্যকে পরিষ্কাররূপে ও নিঃসন্দেহে ইতিহাস বলিতে পারি; সে ইতিহাস ধর্ম্মমূলকই হউক, সামাজিকই হউক অথবা ইতিবৃত্তমূলকই হউক, কিন্তু সত্যিকারের কাব্য যাহা বাঙালী-জীবনের শৈশব সরলতার উপর প্রেমের বহ্নিচাপে কামনা বাসনায়, স্বার্থত্যাগে ও মহিমায় বাঙ্গালী জীবনকে স্বচ্ছ, সরল ও প্রবাহবান করিয়া তুলিয়াছে; তাহা বৌদ্ধ-প্রভাবান্বিত বাঙ্গালা সাহিত্য। কৈফিয়ৎ দিয়া তাই এই কথাই বলিতেছি যে, বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙ্গলের আলোচনা কাব্যের দিক্ দিয়া বর্ত্তমান পাঠকের নিকট আস্বাদনযোগ্য হইবে না। ১৪১৬ শকের কিছু পূর্ব্বে মনসা-মঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্ত বাখরগঞ্জের অধীন গৌরনদী থানার অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম সনাতন গুপ্ত, মাতার নাম রুক্মিণী এবং স্ত্রীর নাম জানকী।

"সনাতন তনয় রুক্মিণী গর্ভজাত।
সেই বিজয়গুপ্তেরে রাখ জগন্নাথ॥"
"জানকী নাথের বাণী শুন দেবী ব্রাহ্মণি,
দাস করি রাখিবা চরণে"॥

বিজয় গুপ্ত স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া মনসা-মঙ্গল রচনা করেন। বিজয় গুপ্ত মনসা-মঙ্গলের তারিখ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"ঋতুশূন্য বেদশশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন সাহা নৃপতি-তিলক॥

অপর এক গ্রন্থে পাওয়া যায়:—

"ঋতু-শশী বেদ-শশী শক পরিমিত"

উপর্য্যুক্ত পাঠ হইতে পাওয়া যায়—১৪০৬ শক—এবং দ্বিতীয় পাঠ হইতে ১৪১৬ শক—অথবা ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ। দ্বিতীয় তারিখটি আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। কারণ ১৪০৬ শক মনসা-মঙ্গলের নির্দ্দিষ্ট কাল ধরিলে ইতিহাস-নির্দ্দিষ্ট কালের সহিত ঐক্য থাকে না। ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে হুসেন সাহ রাজা হন এবং কবির কাব্যেও হুসেন সাহর উল্লেখ আছে!

বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে কাণা হরি দত্ত, বর্দ্ধমান দাস, কর্ণপূর প্রভৃতি কয়েকজন মনসা-মঙ্গল লেখকের নাম পাওয়া যায়। ইহাদের ভিতর কাণা হরি দত্ত যে বিজয়গুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাণা হরি দত্তের সম্বন্ধে বিজয় গুপ্ত বলিয়াছেন:—

"প্রথমে রচিল গীত কাণা হরি দত্ত॥
হরি দত্তের যত গীত লুপ্ত পাইল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে"

এবং বিজয় গুপ্ত নিজের মুখেই বলিয়া গিয়াছেন যে, কাণা হরি দত্তের মঙ্গল কাব্যের উপর এক পোঁচ বেশী রঙ মাখাইয়াছেন এবং তন্ত্রীর আঘাত-বোলের সহিত মিলাইয়া দিয়াছেন—

"কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥"

যাহা হউক, বিজয় গুপ্তের কাব্যের মুটামুটি আলোচনা করিবার মুখেই এই কথাটি মনে স্বতঃই স্ফুরিত হয় যে, মধ্যযুগের সমস্ত কাব্য-সাহিত্যের মত গুপ্ত কবির কাব্যখানি ধর্ম্মসংঘাতমূলক। ব্রাহ্মণ্য যুগের কাব্যের যে লক্ষণ 'ধর্ম্ম লইয়া কোঁদল', গুপ্ত কবির কাব্যখানি তাহার সম্পূর্ণ প্রচ্ছদপট। শৈবধর্ম্মই যে সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীন, গুপ্ত কবির মঙ্গলকাব্যের সূত্রপাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া

যায়। পদ্মা মহাদেবের মানস-কন্যা, পুরাণের কশ্যপ-দুহিতা নহেন এবং মহাদেব তাঁহার মানস-কন্যাকে লইয়া কি ভোগাটাই না ভুগিয়াছেন। একদিকে চণ্ডী, অন্য দিকে পদ্মা। পদ্মা কন্যা, চণ্ডী স্ত্রী। পদ্মার মা নাই। চণ্ডী তাঁহার বিমাতা। ফুলের সাজিতে পদ্মাকে দেখিয়া চণ্ডীর ক্রোধের সীমা নাই। পদ্মা চণ্ডীকে মা বলিয়া জানেন, চণ্ডী তাঁহার বিমাতা হইলেও যদি কোন প্রকারে পদ্মা চণ্ডীকে আপন করিয়া লইতে পারেন সে চেষ্টার ত্রুটি পদ্মা করেন নাই। কিন্তু চণ্ডী পদ্মাকে সন্তানের চোখে দেখা ত দূরের কথা—তাহার বাসের নিমিত্ত ঘরের একটি কোণও ছাড়িয়া দিতে রাজী নহেন। এমন কি, জরৎকারু-আশীর্ব্বাদে পদ্মার গর্ভে অষ্টনাগ জন্মগ্রহণ করিলে চণ্ডী তাহাদের নিধনের চিন্তা পর্য্যন্ত করিতে ভুলেন নাই।

"ভাবিতে চিন্তিতে আমার প্রাণ কাঁপে ডরে।
কেন বুদ্ধি করিব পদ্মার অষ্টপুত্র মরে।"

যাহা হউক, শিব নিরুপায় হইয়া পদ্মাকে বনে রাখিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়া জয়ন্তীনগর নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন; সাহচর্য্যের জন্য নেতার সৃষ্টি করিলেন এবং পূজাপ্রচারের জন্য নিজে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। নির্ব্বিঘ্নে কাব্য সমাপ্তির সময়ও দেখিলাম, মহাদেব তখন অনেকটা পিছাইয়া পড়িয়াছেন; পূর্ব্বের মত আর তাঁহার অগ্রণী হইয়া কাজ করিবার প্রয়োজন নাই। লখাইয়ের জীবনদানে তিনি মাত্র পদ্মাবতীকে অনুরোধ করিলেন; তাঁহার নিজের কোনও হাত নাই। চাঁদ তাঁহার পরমভক্ত, 'লঘুজাতি কাণীর' শত অত্যাচারে ব্যথিত ও মথিত—চাঁদের কথা তাঁহার একবারও মনে পড়ে নাই। যদিও বা একবার পড়িল, তাহাও চণ্ডীর ভৎর্সনায়, কিন্তু পড়িলে কি হইবে, পদ্মার নিকট শিব নিরুপায় হইয়া অগাধ সাগরজলে চাঁদের প্রাণ ও ধনজন মাঙ্গিয়া লইলেন। ডিঙা ডুবানর অনুমতি তাঁহাকে দিতেই হইল। তারপর রহিলেন গঙ্গা ও চণ্ডী। গঙ্গা প্রথম হইতেই পদ্মার সহিত আপোষ রফা করিয়াছেন। কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে যে, গঙ্গার লৌকিকতার জ্ঞান আছে। পদ্মার হুকুম—কল্য চাঁদের চৌদ্দ ডিঙা ডুবাইতে হইবে। গঙ্গার ভদ্রতাজ্ঞানে যেন একটু বাধিল; গঙ্গা বলিলেন—

"আমার এমন কার্য্য উচিত না হয়॥"

পদ্মা কুপিতা হইয়া বলিলেন, "তোমার জল কেহ ছুঁইবে না, সাবধান।" ব্যাস্, বাজীমাৎ। মাত্র এইটুকুতেই গঙ্গার অব্যাহতি নাই। ধন্বন্তরি ওঝা হইতে আরম্ভ করিয়া চাঁদের সম্পর্কে যাঁহা কিছু সকলেরই রক্ষণাবেক্ষণের ভার গঙ্গার। দুর্গতির একশেষ আর কি?

এখন বাকী রহিলেন চণ্ডী। চণ্ডীর প্রাথমিক পরিচয় আমরা দিয়াছি। পদ্মা যখন পূজাপ্রচারে ব্যস্ত, তখন মহাদেব ও চণ্ডী দুইজনেই মর্ত্ত্য হইতে বিদায় লইয়াছেন। মহাদেব বিদায় লইয়াছেন শান্তি মূর্ত্তিতে; ধরা মাঝে যেন তাঁহার আর আবশ্যকতা নাই। যা পারে করুক পদ্মা—এই ভাবটি মহাদেবের চরিত্রে বেশ আগাগোড়াই খাপ খাইয়াছে; কিন্তু চণ্ডীর বিদায় যেন কতকটা ঈর্ষ্যা লইয়া। বরাবরই চণ্ডী পদ্মাকে বিষচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন; সেইজন্য ঘরে তাঁহাকে কিছুতেই স্থান দেন নাই। যিনি পদ্মাকে দেখিতে পারিলেন না, পদ্মার মাতৃ-সম্বোধন উপেক্ষা করিলেন, পদ্মার আটটি সন্তানকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন, ধরা হইতে তাঁহার অন্তর্ধান্ যে বেশ ভাল মনে হয় নাই, ইহা বুঝা গেল। তারপর চাঁদের ডিঙাডুবানর ব্যাপারে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য চণ্ডী মহাদেবকে ধম্‌কাইয়াছেনও কম নয় এবং অবশেষে দেখিলাম, নৃত্যশীলা বেহুলা যখন লখাইয়ের প্রাণ-ভিক্ষা চাহিল এবং শিবের আহ্বানে যখন পদ্মাবতী ছলে ও কৌশলে প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন আর একবার দেখিলাম চণ্ডীর উগ্রমূর্ত্তি। কিন্তু চণ্ডীর যত চোট্ মহাদেবের উপর, পদ্মার কাছে তিনি ঘেঁসিতেও পারেন নাই। কিন্তু মহাদেবের অপেক্ষা চণ্ডীর প্রভাব পদ্মার আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে বেশ সর্ব্বব্যাপী ছিল, শেষ মীমাংসায় কবি তাহাও দেখাইয়াছেন। পদ্মার কৃপায় বেহুলা সব ফিরিয়া পাইয়াছে, কিন্তু চাঁদ পদ্মার পূজা না দিলে বেহুলা আর থাকিবে না। চাঁদ একটু গোলে পড়িলেন। যাহা হউক, বাঁ হাতে পদ্মার পূজা দিবেন। তারপর চাঁদ আকাশে যখন পদ্মামূর্ত্তি ও চণ্ডীমূর্ত্তিতে অভেদ দেখিলেন, তখনই চাঁদ পদ্মাকে মানিয়া লইলেন।

রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থে চণ্ডীকাব্য প্রণেতা মুকুন্দরাম ও

ভারতচন্দ্রকে বিজয় গুপ্তের পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং বিজয় গুপ্তের ভাষাগত অনুকরণ ভারতচন্দ্রে ও ধর্ম্মমঙ্গলের কবি ঘনরামে বর্ত্তমান, ইহাও কাব্যাংশ উল্লেখের দ্বারা প্রমাণ করিতে ভোলেন নাই। যাহা হউক্, এই পরবর্ত্তী লেখকগণের সাহিত্যে আমরা চণ্ডী-ভজনার মহাসমারোহ দেখিতে পাইতেছি।

গুপ্তকবির মনসা-মঙ্গল গুপ্তকবির অথবা পরবর্ত্তী লেখকগণের অনুযোজনার ফলে উহা মনসামঙ্গল লেখক-সম্প্রদায়ের গণসাহিত্য হইয়া গুপ্তকবির শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত করিলেও বস্তুগত অনুযোজনায় কলঙ্কিত নয়, ইহা চিন্তা করিলেই বোঝা যায়। নায়ক ও প্রতিনায়কের ঘাত-প্রতিঘাতে কাব্যসম্পদের চরমবিকাশ, গতিবেগ বা evolution, নায়ক ও প্রতিনায়ক যেমন সত্য, তাহাদের সংঘর্ষের মূলনীতিটিও তেমনই সত্য। তাই বলিতেছি, মনসামঙ্গলে পদ্মা ও চণ্ডী তেমনই সত্য। বিজয় গুপ্ত দেখাইয়াছেন, চণ্ডীর মাহাত্ম্যে দেশ ভরিয়া গিয়াছিল; শিবের সাহায্যে পদ্মাবতী প্রতিষ্ঠিত হইলেন, কিন্তু চণ্ডীর অপরাধ বোঝা গেল না; চণ্ডী শিবকে কড়া শাসনে রাখিলেও শিব বাহিরে ঠিকরিয়া পড়িলেন। ইহার কোন গুপ্ত কারণ আছে, কবি তাহার উল্লেখ করেন নাই; পরিবর্ত্তনের একটা হেতু আছে। ঐ হেতু সমগ্র সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং ঐ হেতুতে যে আদর্শবাদ আছে, তাহা অভিজ্ঞতার ফলেই কাম্য হইয়া ওঠে। কিন্তু শক্তিবাদী গ্রন্থ-কর্ত্তৃগণ পরিবর্ত্তন স্বীকার করিলেন, অথচ সেই পরিবর্ত্তনের হেতুর উল্লেখ করিলেন না, ইহা ভাবিবার কথা। শাক্ত-ধর্ম্মের উত্থান সম্পর্কে দীনেশবাবু লিখিয়াছেন—উহা মুসলমান অধিকারে অধিকৃত দেশবাসীকে বৌদ্ধধর্ম্মের নিষ্ক্রিয় মার্গ হইতে রক্ষা করিয়াছে এবং ইস্লাম ধর্ম্মের জয়পতাকার সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য হিন্দুধর্ম্মে কৃচ্ছ তার আদেশ আনিয়াছে'; কিন্তু শক্তিবাদীদের ভিন্ন ভিন্ন দেবতা-অর্চ্চনার কোন হেতু তিনি উল্লেখ করেন নাই। করিবেনই বা কি করিয়া? পুনরুত্থিত ব্রাহ্মণ্য-যুগের সমগ্র ইতিহাসের অভিব্যক্তির তলদেশে উহা প্রচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছে। যাহা হউক্, এ আলোচনা অবান্তর মনে করি। শুধু এই কথাই বলিব, মনসার পূর্ব্বে চণ্ডীর ষোড়শোপচারে পূজা হইয়া গিয়াছে; চণ্ডী বাংলা জুড়িয়াছিলেন, বিজয় গুপ্ত তাহার সাক্ষী। শৈবধর্ম্মও নিষ্ক্রিয়, উহার সহিত কাহারও বাদ-বিসম্বাদ নাই বলিয়া উহা লইয়া মাথা ঘামাইবার কিছু নাই এবং শৈবধর্ম্ম যে সর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী, বৌদ্ধযুগও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। চণ্ডীর সহিত পদ্মাবতীকে যখন এত লড়াই করিতে হইল এবং শেষ পর্য্যন্ত পদ্মাবতী চণ্ডীতে অভেদ রূপ দেখিয়া যখন চাঁদ সদাগর মনসাপূজা মানিয়া লইলেন, তখন চণ্ডীর প্রভাব যে দেশে কত বেশী ছিল, তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। তাই বলিতেছি, প্রভাবান্বিতা এমন দেবতা দেশে থাকিতে কি কোন কবি চণ্ডীকাব্য লেখেন নাই? নিশ্চয়ই লিখিয়াছেন। ভাষা-ইতিহাসের লেখকগণ অনুসন্ধান করিলে খুব সম্ভব মিলিবে।

মনসামঙ্গলের কাহিনী বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পত্তি। ইহাতে অনুকরণ নাই; কবির মনোভূমিতে ইহার জন্ম। পৌরাণিক ভিত্তির উপর বেহুলা বা বিপুলা ও চাঁদ বেনে বা চন্দ্রধরকে লইয়া আখ্যানটি রূপায়িত হইয়াছে। পুরাণে মনসার সহিত চণ্ডীর বিদ্বেষ আছে। জরৎকারু মুনির সহিত মনসার বিবাহ হয়; মুনির ঔরসে মনসার গর্ভে আস্তিকের জন্ম হয়। জনমেজয়ের পিতা সম্রাট্ পরীক্ষিৎ সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন; পিতৃহত্যার প্রতিহিংসা লইবার জন্য জনমেজয় 'সত্র' নামক যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ইহাতে সর্পগণ ব্যাকুল হইয়া মনসার শরণাপন্ন হয়। মনসা আস্তিককে জনমেজয়ের নিকট পাঠাইলেন। আস্তিক জনমেজয়কে যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। গল্পাংশের নায়িকা বেহুলা বাংলার অভিনব সৃষ্টি। সীতার অগ্নি-পরীক্ষা দেখিয়াছি, সাবিত্রীকে যমরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেখিয়াছি, শৈব্যাকে মৃত শিশু কোলে লইয়া শ্মশানে বসিয়া কাঁদিতে দেখিয়াছি, কিন্তু বেহুলাকে যেমনটি দেখিলাম, এমনটি আর কোথাও দেখি নাই। বেহুলা সুন্দরী, নিষ্ঠাবতী, তপশ্চারিণী। সে মৃত স্বামীর ভেলায় ভাসিতে ভাসিতে শত প্রলোভন ও ভয় উত্তীর্ণ হইয়া নৃত্যের বিনিময়ে স্বামীকে ফিরিয়া পাইল। নারী-চরিত্রের ধর্ম্মাচরণে ইহা যে এক অভিনব সৃষ্টি, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সারা কাব্যখানির পাতা উল্টাইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে নারী ও পুরুষের সম্বন্ধকে বড় হীন করিয়া তুলিয়াছে। ইহারা যেন পুত্তলিকা। সূত্রধর দড়ি ধরিয়া যেমন করিয়া ইহাদের নাচাইয়াছে, ইহারা ঠিক তেমনই নাচিয়া গিয়াছে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা ইহাদের নাই। আত্ম-সম্বিৎ বা আত্ম-চেতনা ইহাদের নাই। প্রেম—যাহা সৃষ্টির মুখে অজ্ঞাত ভূমিকম্পের মত ফাটিয়া উঠিয়া নূতনের সৃষ্টি করে ও পুরাতনকে ধ্বসিয়া ফেলে, সে প্রেম ইহাদের নাই। বেহুলা মৃত স্বামীর গলিত শব ও পূতিগন্ধময় অস্থিগুলিকে বুকে চাপিয়া কেন স্বর্গরাজ্যে যাত্রা করিয়াছিল? কিসের প্রেরণায় তাহাকে উন্মাদিনী করিয়া তুলিয়াছিল? বেহুলা-চরিত্রের সকল গৌরব প্রেমের তাপে গলিয়া ঝরিয়া পড়ে নাই। উহা বৈধব্যের দুঃখমিশ্র সংস্কার হইতে জন্মিয়াছিল। এই যুগের নরনারীর কামনা-বাসনা খুব হীন প্রকৃতিরই ছিল; কিন্তু প্রেম—যাহা সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে বসন্তের মলয় হিল্লোলে মাধবী স্বপ্ন হইতে ভাসিয়া আসিয়াছিল, তাহা এ যুগের কবিগণের নিকট প্রত্যাখ্যাত হইল কেন? তাই বলিতে ইচ্ছা করে, ইতিহাস আছে সত্য—কিন্তু নরনারীর প্রাণে সুখদুঃখের মিলন-বিরহের ঘাত-প্রতিঘাতের ইতিহাস নাই। কাব্যের চিৎশক্তি—যাহা মানুষকে আরও আপনার করিয়া জানিতে শিখাইয়া দেয়, তাহা ইহাতে নাই।

ধন্বন্তরির বিনাশসাধন করিয়াও যখন চাঁদের সহিত মনসা পারিয়া উঠিলেন না, তখন অভিজ্ঞান হরণ করিবার নিমিত্ত মনসা মোহিনী রূপ ধারণ করিলেন। মাতা হইলেন গণিকা। ছিঃ ছিঃ। মাতৃরূপের সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী হইতে দেবত্ব মোচন করিয়া যাহারা গণিকার উচ্ছৃঙ্খলশ্রী বসাইয়া দিয়াছে তাহাদের সামাজিক আদর্শ যে হীন হইয়া পড়িবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু মনসামঙ্গলের সকল দোষ ত্রুটি সত্বেও একটি সত্য পরিকল্পনা রহিয়াছে, যাহা মঙ্গলকাব্যের পাঠক মাত্রেরই চোখে পড়ে। উহা চাঁদের চরিত্র। চাঁদ পঞ্চদশ শতাব্দীর বহু পূর্ব্ব হইতে বাংলার সমাজে পুরুষজাতির আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। চাঁদ বেনের ঘরের ছেলে, ধনের অধিকারী। এই যুগের বণিকেরা ধনপতি ছিল, সমুদ্র-যাত্রা ইহাদের সাধারণ কৃতিত্বের অঙ্গীভূত ছিল। চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতিকে দেখিয়াছি, বিপদে পড়িলেই চণ্ডীর স্তব করিতে দেখিয়াছি, নিরুপায় হইয়া শত্রুর হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু চাঁদ সে জাতীয় চরিত্র নহে। ইহা পুরুষ চরিত্রের সত্যই প্রতীক্—"বজ্রাদপি কঠোরাণি।"

মনসা চাঁদের শত্রু। গুয়া বাড়ী কাটিয়া নষ্ট করিলেও, ধন্বন্তরির মৃত্যু ঘটাইলেও, নায়িকার বেশে অভিজ্ঞান অপহরণ করিলেও, চাঁদ নিস্তেজ হইয়া পড়ে নাই। সব যাউক্, হেতালবাড়ী যাইবে কোথায়? চাঁদকে দেখিলেই মনে হয় রুদ্রের সেবক, পৌরুষের পরাকাষ্ঠা। বিপদে পড়িয়া দেবতার শরণাপন্ন হওয়া পুরুষ-চরিত্রের রীতি নহে। চাঁদ তাহার কুলদেবতার কথা ভুলিয়া গিয়াছে, চণ্ডীশঙ্করের কথা বিপদেও তাহার মনে পড়ে নাই। যাহা মনে পড়িয়াছে তাহা এই যে, সে পুরুষ, সে শক্তির মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। শত বিপদেও যাহা অচঞ্চল, প্রকৃষ্ট বিরুদ্ধ শক্তিতে যাহা অদম্য, সর্ব্বাবস্থায় যাহা নিজেকে আঁকড়াইয়া ধরে, সকলের উপর যাহা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে—তাহাই পুরুষ-চরিত্রের অভিজ্ঞান। ইহাতে যাঁহারা দাম্ভিকতার মলিন ছায়াপাত দেখিয়াছেন, তাঁহারা দেখেন নাই যে উহা দাম্ভিকতা নহে, উহা শৌর্য্যের আত্মপ্রকাশ।

চাঁদের অষ্ট সন্তান বিনষ্ট হইল; হউক্, তবুও চাঁদ সব্যসাচীর মত লক্ষ্য ধরিয়া আছে। সমুদ্রের মধ্যে পতিত হইয়াও তাহার এই দৃঢ়তা যায় নাই। পেটে অন্ন নাই, চোখে ঘুম নাই, সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে, তবুও চাদ—চাঁদ। সে এতটুকুও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই।

লখাইয়ের জন্ম হইল, বিবাহ হইল, মৃত্যু হইল, চাদ তাহার পণ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে; ভ্রূক্ষেপ নাই, দৃকপাত নাই, যেন সংসারের কোন স্পর্শই তাহার গায়ে লাগে না, যেন সুখদুঃখের পরপারে সে, যেন জন্মমৃত্যুর বাহিরে তাহার স্থান; তাই বলিতেছি—সে অনধিগম্য, অক্লেদ্য, অদাহ্য। কিন্তু এই পুরুষ-চরিত্রের আর একটি দিক আছে, তাহা 'মৃদুনি কুসুমাদপি'। বেহুলা ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু চাঁদ মনসার পূজা না দিলে সে ফিরিয়া যাইবে। চাঁদ গোলে পড়িল। প্রাণের অন্তরালে স্নেহ-মুকুরে পুত্রবধূর লক্ষ্মী-মূর্ত্তি সজল নয়নে প্রকটিত হইল। চাঁদ সব ভুলিয়া গেল। সারা জীবনের পণ অনায়াসে ভুলিয়া যাওয়া, স্নেহের দুর্ব্বলতায় নহে, পুরুষ-চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য, একথা বলিয়া দিতে হইবে না।

বাংলা সমাজের নৈতিক চরিত্রের অবনতি ছিল, দৈনন্দিন ব্যাপারে সংস্কার ছিল, জড়িমা ছিল, অন্ধ প্রেরণায় সেবার্চ্চনের বিধি ছিল; ইহারা সকলেই উপহাসাস্পদ; কিন্তু পুরুষের আদর্শ যাহা ছিল, তাহা সমগ্র

বিশ্বের কাব্যে চির-উজ্জ্বল, চির-শ্রেষ্ঠ। বিশ্বের নিখিল জাতির উপর দিয়া যুগ যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে, চলিয়া যাইতেছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ঘরে ঘরে আমরা আদর্শ পুরুষ খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি, কিন্তু চাঁদের পৌরুষাভিমান কোথাও পাই নাই। বাংলার সমাজ আজ সব দিক্ দিয়া উন্নত হইয়াছে; কিন্তু তেমন পুরুষের জন্ম হয় নাই—যিনি রুদ্রের মত ভীষণ, শিবের মত মঙ্গলময়। ইহাই চাঁদ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কাব্য হইতে ইতিহাসের অংশ ইহাতে বেশী মেলে। রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, স্পর্শ নাই—আছে যাহা তাহা ধূলিধূসরিত আতপম্লান কয়েকটি জীর্ণ পাপড়ি। প্রাচীন অট্টালিকা আছে সত্য, কিন্তু ইহাতে লোকের বাস নাই। ইহাকে নিরেট বিরল বলিতে পারি, কিন্তু হিরকের মত স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু বলিতে পারি না।

মানদা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

মোর জননীর সঙ্গিনী ছিলে—
ছিলে যেন পিসী মাসী,
তুমি আমাদের ধাত্রী পান্না
আমাদের শ্যামা দাসী।
আপন ভাবিতে আমাদের ঘর
গৃহ কাজে রত নাহি অবসর,
সুদীর্ঘ তব জীবন গোঙালে
আমাদিকে ভালবাসি।

২

তোমার যত্ন, তব শুশ্রূষা
আজ বুকে করে ভিড়,
জননীর পরিচারিকা যে তুমি
অর্দ্ধ শতাব্দীর।
যা'তে দিতে হাত, তাই পরিপাটী
তকৃতকে ঘর, ঝরঝরে বাটী,
সবই নির্ম্মল, স্নিগ্ধ কান্তি—
মোদের গৃহশ্রীর।

৩

উৎসবে সেবি আনন্দ তব!
হাস্যে ভরিতে বাড়ী,
দুঃখে ও রোগে তব সান্ত্বনা
কভু কি ভুলিতে পারি?
তব আঁখিজল, মিনতির সুর—
সকল বিপদ করে দিত দূর,
আজ সপ্ততি বর্ষের পর
চিরতরে ছাড়াছাড়ি।

৪

তোমার চিতায় গড়িতাম মঠ
থাকিলে প্রচুর ধন,
দাসীর শ্রাদ্ধে দান-সাগরের
করিতাম আয়োজন।
তোমার স্নেহের হ'ত প্রতিদান,
যোগ্য তোমার দেওয়া হ'ত মান,
কৃতজ্ঞতায় শুধু করি আজ
শ্রদ্ধাই নিবেদন।

৫

জানি নাক তুমি জন্মিয়াছিলে
উচ্চ কুলেতে কিনা।
তোমার ভক্তি তোমার নিষ্ঠা
আভিজাত্যের চিনা
তোমার সেবায় দেবতা তুষ্ট,
তোমার সেবায় হয়েছি পুষ্ট,
মোদের কুলজী অসম্পূর্ণ
তব উল্লেখ বিনা।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

বন খুব বেশী ভয়াবহ নহে, কিন্তু লতাগুল্মের ঝোপে একেবারে নিবিড়। সঘন ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কণ্টক বৃক্ষের প্রাচুর্য্যে মনুষ্যের প্রায় দুরধিগম্য। দক্ষিণ পার্শ্বে অতি নিকটেই গোবর্দ্ধন গিরিগাত্র, আর তাহারই ঠিক কোলে কোলে প্রস্তরবাধাময় একপদী অতি সঙ্কীর্ণ, চিহ্নমাত্রে পর্য্যবসিত, যেন পর্ব্বতরাজের সঙ্কেতময়ই একটি পথ! সেই পথে আমাদের তরুণ সন্ন্যাসী চলিয়াছেন। দ্বিপ্রহর রৌদ্রেরও সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। সেই প্রভাত-প্রফুল্ল গিরি সানুদেশের বনপথে সন্ন্যাসী চলিতে চলিতে প্রফুল্লকণ্ঠে মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে যেন ভগবৎ নাম কীর্ত্তনই গাহিতেছেন। বনপথে হরিণের পাল মনুষ্য সমাগমে সচকিত হইয়া লম্ফে ঝম্ফে পর্ব্বতগাত্রে উঠিয়া, কেহ-বা এদিকে ওদিকে সরিয়া গিয়া স্থির অথচ চকিত দৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, কোথাও বা ময়ূরের দল পথ ছাড়িয়া রুক্ষ কে-ও কে-ও রবে বৃক্ষশাখায় উঠিয়া বলিতেছে, কেহ বা অদূরে পর্ব্বতগাত্রে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া স্থিরভাবে যেন পরম গর্ব্বভরে দাঁড়াইয়া আছে; সঙ্গিনীকে মুগ্ধ করিবার তাহাদের এই সময়। পাখীরা তখনও প্রভাতী তান ত্যাগ করে নাই, প্রায় মরুভূমিতুল্য দেশের গিরি-সানুপথে পূর্ব্বাহ্নের বায়ু তখনও তাহার স্নিগ্ধতা হারায় নাই, চারিদিকে তাই বনকুঞ্জের অধিবাসীদিগের আনন্দ কলরব। গাছে গাছে বানরের লাফালাফি, কচিৎ বন্য শশকদের এদিক হইতে ওদিকে ছুটাছুটি, ময়ূরের কেকা ধ্বনিই সকলের উপর রব তুলিতেছে। তরুণ সন্ন্যাসী সহসা উচ্চকণ্ঠে প্রভাতী সুরে ধরিলেন—

"বৃক্ষডালে বাস কীর বোলয়ে মধুর, কুঞ্জের দুয়ারে রব করয়ে ময়ূর!" (বলে "কেও—কে-ও! আমার রাধা কৃষ্ণের কুঞ্জদ্বারে কে-ও কে-ও!")

"সন্ন্যাসীঠাকুর, এইবার তোমাকে ধরেছি!"

সচমকে সন্ন্যাসী পশ্চাতে ফিরিলেন। গোবিন্দকুণ্ডের তীরের সেই ধাবন-শীলা কিশোরী! স্তম্ভিত হইয়া তিনি দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

ঘন ঘন শ্বাস ফেলিয়া আরক্তমুখে দ্রুত নিকটস্থ হইতে হইতে বালিকা বলিল, "দেখুন, ঠিক্ পথ খুঁজে বার্ ক'রে আপনাকে ধরেছি কি-না,—উঃ!" সহসা দাঁড়াইয়া পড়িয়া একখানা পা ধরিয়া কাতরোক্তির সঙ্গে সঙ্গে বালিকা সেই সঙ্কীর্ণ পথের মধ্যেই বসিয়া পড়িল। সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে তাহার নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন বালিকা পথের প্রস্তরে আঘাত পাইয়াছে। একটু বিব্রতভাবে চারিদিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "এখানে তো জল বা অন্য এমন কিছুই নেই, যা দিয়ে তোমার পায়ের ব্যথা একটু নিবারণ হবে!" আঘাতের প্রথম ধাক্কাটা সাম্‌লাইয়া বালিকা মুখ তুলিল। বেদনার নীল আভা তখনও মুখে ছড়াইয়া আছে, তথাপি হাসির লহর তুলিয়া বলিল, "কোন্ ব্যথাটা নিবারণ করবেন? কাঁটায় তো পা ক্ষতবিক্ষত, রক্ত ঝর্‌ছে, পাথরের ঠক্কর লেগেই এমন করে না বসিয়ে দিলে!"

সন্ন্যাসী ঈষৎ ব্যথিত মুখে বলিলেন, "কেন তুমি এপথে এমন ভাবে এলে, এপথের সন্ধানই বা কি করে পেলে, এও আশ্চর্য্য! কিন্তু—ওঃ অনেক রক্তই যে পড়ছে পা দিয়ে। কাপড় ছিঁড়ে দেব—বাঁধ্‌বে?"

কিশোরী ততক্ষণ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, "ক্ষেপেছেন? আপনার ঐ গেরুয়া কাপড়ের টুক্‌রো দিয়ে? সর্ব্বনাশ, দাদু তাহলে আমার পায়ে 'কুড়িকুষ্ঠ' হবে বলে ভয়েই মরে যাবেন।"

সন্ন্যাসী ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বলিলেন, "এ ভিন্ন তো আর কোন উপায় নেই! তোমার পায়ে এখনও যে রক্ত পড়্‌ছে—কি দিতে পারি এখানে এ ছাড়া!"

"কিচ্ছু দরকার নেই! এখন আমার দাদুকে দেখা দেবেন কি-না, ফিরবেন কি-না?"

"কোথায় তোমার দাদু? তুমি এমন করে কোথা দিয়ে এপথে ঢুকলে? কেন এলে?"

"আপনি আমাদের সাড়া পেয়েই পালালেন কেন? যেখানটা দিয়ে আপনি কুণ্ডের ধারের বনের মধ্যে ঢুকে পড়্লেন সে আমি বেশ লক্ষ্য করেছিলাম! দাদু সাধু মহাত্মাদের দর্শন করতে ওখানকার আশ্রমে গেলেন, আমি এই মত্লবেই যেতে পারছি না বলে কুণ্ডের জলের ধারে বসে পড়েছিলাম। দাদুর দল চোখের আড়ালে গেলেই আমাকে আগ্লাতে যাকে রেখে গেছিলেন তাঁকে বল্লাম, যে 'টাঙ্গা কাছে ডেকে নিয়ে এস, উঠ্ব!' সে যেই ডাক্‌তে গেছে, আর অমনি উঠে ছুটতে ছুটতে ঠিক্ সেইখানটা দিয়ে ঢুকে দেখি ঠিক্ এইরকম পথ আর চারিদিকে গভীর জঙ্গল। ভয় যা করছিল—তবু আপনি কতদূরেই আর যেতে পেরেছেন, কোন বিপদ হলে চেঁচালে নিশ্চয় সাড়া পাওয়া যাবে—এই ভরসায় যতই এগুই, দেখি কোনই চিহ্ন নেই! উঃ আপনি কি হাঁটতে পারেন, এই প্রায় একঘণ্টা দৌড়ে এতক্ষণে আপনার নাগাল্ পেলাম!" অশমিত নিশ্বাসে থামিয়া থামিয়া অথচ অতি দ্রুতভাষায় বালিকা এই কথাগুলি বলিয়া গেল; তারপরে বলিল, "নেন্ এখন ফিরুন!"

"কোথায় ফিরবো? তোমার দাদু, তোমার সঙ্গীরা কি এখনও সেই গোবিন্দকুণ্ডে বসে আছে মনে কর? তারা তোমার সন্ধানে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আচ্ছা, আমার কাছে আর একজন ব্রহ্মচারী দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁকে কি দেখ্‌তে পাওনি? তিনি কি তোমার এই কাণ্ডে বাধা দিলেন না বা তোমার গতি লক্ষ্য করেননি? তোমাকে এই বনের মধ্যে যদি কেউ ঢুক্‌তে দেখে থাকে—তোমার সঙ্গীদের সে কথা সে বল্‌তে পারে, তা হ'লে তাঁরা এই পথেও তোমার সন্ধানে আস্‌তে পারেন।"

"আমাকে কেউ দেখেনি। আপনার সঙ্গী ঠাকুরটি আপনিও বনে ঢুক্‌লেন, তিনিও একটু পরেই চারিদিক চাইতে চাইতে আশ্রমের দিকে জোরে পা চালিয়ে দিলেন—যেন আমরা বাঘ কি ভল্লুক! দাদুর বোধ হয় তাঁকে খুঁজে বার্ করারও মতলব আছে! তাই আমাকে ছেড়েও অমন করে সেদিকে গেলেন! চলুন, এখন কোন্ দিকে যাবেন চলুন! কেন আপনি আমার দাদুকে কষ্ট দিলেন? আপনাকে না দেখ্‌তে পেয়ে তিনি যে কিরকম মুখে বসে পড়্লেন তা যদি দেখ্‌তেন! চলুন এখন তাঁকে খুঁজে আমাকে পৌছে দেবেন, চলুন তাঁর কাছে।"

"কেন, তুমি যেমন ক'রে আমাকে খুঁজে বার্ করেছ তেমনি করে তাঁকেও খুঁজে বার্ করতে পারবেনা? তুমি তো বিষম সাহসী মেয়ে দেখ্‌ছি—কি কাণ্ড!"

সন্ন্যাসী যেন বিস্ময় দমন করিতে পারিতেছিলেন না। "যদি বনের মধ্যে বিপথে গিয়ে পড়্‌তে, যদি কোন বিপদ ঘট্‌তো! এদিকে যে পথ আছে তাই বা কি করে জান্‌লে?"

"কেন আপনি যে এই দিকেই ঢুক্‌লেন? সত্যই তো আর আপনি 'ঠাকুর' নন্, মানুষই তো! দাদু যদিও বল্লেন "অন্তর্ধ্যান করলেন" কিন্তু আমি তো বনের মধ্যেই ঢুক্‌তে দেখ্‌লাম! আপনি যদি পারেন। আমিই বা পারব না কেন?"

"আশ্চর্য্য মেয়ে তুমি! এইটুকু বয়সে এত সাহস?"

"খুব এতটুকু নই—জানেন? স্কুলে আমি সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ি! চোদ্দবছর আমার বয়স! আপনি আমার চেয়ে খুব অনেক বেশী বড় হবেন না।"

সন্ন্যাসী এইবারে হাসিয়া ফেলিলেন, "আচ্ছা, তা হলে তো কোন ভাবনাই নেই! তুমি যেমন এসেছ সেই পথে ফিরে স্বচ্ছন্দে যেতে পারবে! কেমন তো?"

"নিশ্চয়! কিন্তু আপনি আমার দাদুর সঙ্গে দেখা করবেন না?"

"না!"

"বেশ!"

বালিকা নিশ্চল চক্ষে স্তব্ধভাবে সন্ন্যাসীর পানে ক্ষণেক চাহিল! হরিণীর মত উৰ্দ্ধোৎক্ষিপ্ত আহত দৃষ্টি, অপরূপ সুন্দর মুখে প্রথমে পাংশু, পরে দেখিতে দেখিতে ক্ষোভের ও ক্রোধের সংমিশ্রণে আরক্ত আভা জাগিয়া উঠিল—যেন উষার পাণ্ডুর আকাশে অরুণের উদয়চ্ছটার আভাস! নিশ্বাসের বেগে বক্ষ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। যেন সংসারত্যাগী বিরাগীর চক্ষে মহামায়া তাহার পরম মায়ার ফাঁদ পাতিলেন। সন্ন্যাসী একটু স্তব্ধভাবে চাহিয়া থাকিয়া সহসা মৃদু মৃদু উচ্চারণ করিলেন, "যোগমায়া যোগমায়া!" তারপরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "এই বনের বাইরে মঠের মধ্যেই পরিক্রমার পথ! লোকের কোলাহল এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে মন দিয়ে কান পাত্‌লে! ইচ্ছা কর ত এই বন থেকে কোন রকমে বেরিয়ে মাঠের মধ্যে পড়তে পার—তা হলেই বহু যাত্রীর দেখা

পাবে। চাই-কি, সঙ্গীদেরও দেখ্‌তে পেতে পার, তারা কেউ কেউ পরিক্রমার পথেও তোমাকে খুঁজ্‌তে বেরুতে পারে—"

বাধা দিয়া সক্রোধে বালিকা বলিয়া উঠিল, "আপনাকে আর পথ বাত্‌লাতে হবে না, আমিই তা বার্ করতে পারব।" বলার সঙ্গেই ক্রোধে যেন দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্যভাবে বালিকা একদিকে ছুটিয়া চলিল। একটু পরেই পিছনে শব্দ হইল।

"ওদিকে নয় ওদিকে নয়; আমার সঙ্গে এস—পথ ধরিয়ে দিচ্ছি!"

বালিকা চীৎকারের সঙ্গে প্রতিবাদ করিতে করিতে বেগে ছুটিল, "না—চাই না আপনার পথ দেখানো—যান্ আপনি, কেন আসছেন আমার পিছনে!" সন্ন্যাসী সবেগে বনপথের পার্শ্ব অতিক্রম করিয়া বালিকার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। এমন স্বরে "কি কর বালিকা" বলিয়া ধমক দিলেন যে সেই হরিণীর ন্যায় চঞ্চল গতি আপনি থামিয়া গেল। "তুমি বড় হয়েছ, অভিমান করছিলে—এইরকম স্বেচ্ছাচারে কত বিপদে পড়্‌তে, তা কি তোমার ধারণা নেই? কিরকম শিক্ষা পেয়েছ তুমি? সংসারিক জ্ঞান তোমার একেবারেই হয়নি।"

বালিকা মাথা হেঁট করিল, তারপরে ভীতা হরিণীর মত আয়তচক্ষে সন্ন্যাসীর পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "কেন? কিসের ভয়? কি করেছি আমি?"

সন্ন্যাসীও ক্ষণেক তাহার পানে চাহিয়া যেন আত্মগত-ভাবেই বলিলেন, "একেবারেই বালিকা!" আবার সন্ন্যাসীর পানে দৃষ্টি স্থির করিয়া কিশোরী বলিল, "আমার নাম ললিতা!"

"চল, তোমায় তোমার দাদুর কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"চলুন, কিন্তু কোথায় তাঁকে পাবেন? তিনি যদি গোবিন্দকুণ্ডে না থাকেন এতক্ষণ?"

"কাছাকাছি থাকারই কথা, অন্তত সঙ্গী কেউ না কেউ পাওয়া যাবেই। কিন্তু শোন ললিতা, তোমাকে সঙ্গীর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েই আমার কাজ শেষ হবে, তখন যেন এই রকম কোন ছেলেমানুষী ক'র না। তাদের দেখ্‌লেই তুমি তাদের কাছে চলে যাবে! আমাকে আর কোন বিব্রতে ফেল্‌বে না?"

"আচ্ছা চলুন তো" বলিয়া বালিকা মুখ ফিরাইয়া তাহার ওষ্ঠোদ্যত মৃদুহাসি যেন লুকাইল। সহসা তখনই অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া সন্ন্যাসীর পানে চাহিয়া বলিল, "তাই বা কেন, আপনি কেন কষ্ট করবেন আমার জন্যে? আপনাকে ফির্‌তে হবে না—আমি একাই যাব বল্‌ছি ত! ঝরণার ন্যায় গতিতে বালিকা যে পথে আসিয়াছিল সেইপথে ফিরিল। দূরে দূরে সন্ন্যাসী তাহার অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

(৫)

দশ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

পূর্ব্ববঙ্গের একখানি সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রামের প্রান্তভাগ। সম্মুখে লোক্যাল্ বোর্ডের সুদীর্ঘ রাস্তাটি প্রসারিত হইয়া বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে গিয়া মিশিয়াছে। একদিকে কর্ষিতভূমি বৈশাখের প্রখর মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কিরণে ঝলসিত! দূরে দুই একজন কৃষক সেই রৌদ্রেও সেই ভূমিকে কর্ষণ করিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে পূর্ব্ববঙ্গসুলভ শ্যামশোভার মধ্যে গ্রামের প্রান্তে দূর-বিসর্পিত পথটির উপরে একটি বৃহৎ শ্বেত অট্টালিকা বৈশাখী রৌদ্রে যেন হাসিতেছিল। চারিদিক যেন মধ্যাহ্ন বিশ্রামসুখে নীরব, কেবল সেই অট্টালিকাটির বহির্ভাগের একটি কক্ষমধ্য হইতে একটি মধুর বালকণ্ঠ ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনিত হইতেছিল। কক্ষটি অতি প্রশস্ত, গৃহমধ্যে বড় বড় কয়েকখানি চৌকীর উপর একটি ঢালা বিছানা, আগন্তুক অভ্যাগত এবং গৃহস্বামীর উপভোগের চিহ্নধারণ করিয়া পড়িয়া আছে, আর তাহারই একদিকে একটি অপূর্ব্ব-দর্শন বালক কতকগুলি পুস্তক লইয়া যেন ক্রীড়ার ভাবে নাড়াচাড়ার সঙ্গে কখনও কোনটা খুলিয়া যদৃচ্ছাক্রমে তাহার মধ্য হইতে কোনটার কোন কিছু উচ্চারণ করিতেছিল। পুস্তকগুলি বোধ হয় তাহার পাঠ্য-পুস্তক, কিন্তু কণ্ঠের গুণে তাহার আবৃত্তি সেই নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে একটি মধুর মোহময় সঙ্গীতগুঞ্জনের মতই ধ্বনিত হইতেছিল।

সহসা গৃহদ্বারের নিকটে একটি শব্দ উঠিল "বাবা, একটু বিশ্রামের স্থান কি পেতে পারি?" বালক সচকিতে মুখ ফিরাইয়া দেখিল দ্বারপথে একটি প্রবীণ ব্যক্তি দণ্ডায়মান! তাঁহার বক্ষ পর্য্যন্ত বিলম্বী শ্বেতশ্মশ্রুভার বাতাসে দুলিতেছে, মস্তকেও সেইরূপ শুভ্রকেশজাল

আস্কন্ধলম্বিত। বেশ একটু বড় বড় রুদ্রাক্ষের মধ্যে মধ্যে মোটা মোটা তুলসী কাষ্ঠের দানা গ্রথিত একছড়া মালা তাঁহার কণ্ঠ হইতে আবক্ষ দোদুল্যমান। সৌম্য শুভ্র শান্তমূর্ত্তি! রৌদ্রতাপে ঈষৎ যেন ক্লিষ্ট। বালক ব্যস্তভাবে শয্যা হইতে নামিতে নামিতে "এই যে বিছানা-পাতা রয়েছে, এসে বসুন" বলিয়া আগন্তুকের দিকে অগ্রসর হইল এবং তাঁহার হস্তের ক্ষুদ্র পুঁটুলিটি গ্রহণ করিবার জন্য হাত বাড়াইল। আগন্তুক বালকের হস্তে পুঁটুলিটি ছাড়িয়া দিয়া প্রীতভাবে ফরাশের এককোণে বসিয়া পড়িলেন এবং ঈষৎ বিস্মিতদৃষ্টিতে বালকের অপূর্ব্ব সুন্দর মুখের পানে চাহিলেন, যেন এমন দৃশ্য এবং এমন কথা তিনি আশা করেন নাই। বালক ততক্ষণে তাহার হস্তন্যস্ত পুঁটুলিটি অভ্যাগতের নিকটেই ফরাশের একধারে রাখিয়া গৃহের ভিতর দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। গতির বেগে তাহার স্কন্ধলম্বিত গুচ্ছ গুচ্ছ কুঞ্চিতকেশ স্কন্ধ ও পৃষ্ঠের সুগৌর কান্তির উপর নাচিয়া উঠিয়া দর্শকের চক্ষে যেন একটি আনন্দের হিল্লোল তুলিয়া দিল। আগন্তুক বালকটিকে দেখিয়া এমনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন যে, নিজের শ্রান্তির কথা বিস্মৃত হইয়া বালকের প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় অন্তর্গৃহের দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বালক শীঘ্রই ফিরিল। তাহার হাতে একঘটি জল। ঘটিটি নীচে রাখিয়া অপ্রস্তুতভাবে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আপনাকে পাখা দিয়ে যেতে ভুলে গেছি, দাদামশায় বাড়ী থাক্‌লে খুব বক্‌তেন।" বলিতে বলিতে বিস্তীর্ণ শয্যার একদিকে ঝুঁকিয়া বালক একখানি পাখা লইবার চেষ্টা করিতেই আগন্তুক সরিয়া গিয়া হস্তদ্বারা তাহাকে ক্রোড়ের নিকটে আকর্ষণ করিলেন এবং তাহার হাত হইতে পাখাখানি নিজের হাতে লইয়া স্নিগ্ধমুখে বলিলেন, "তোমার নাম কি বাবা?"

বালক নাম বলিল। "কি বল্লে? কমলাক্ষ?—আহা—ঠিক্ নাম রাখা হয়েছে বাবা তোমার। কমলাক্ষই বটে!" বালকের মধুর কণ্ঠ পুনঃ পুনঃ শুনিবার জন্যই যেন আগন্তুক তাহার সেই সুন্দর মুখের বিস্তৃত কমলনয়নের দিকে চাহিয়া বালককে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিলেন এবং মাঝে মাঝে বালকের দর্পণোজ্জ্বল ললাট এবং শুভ্রের উপর আরক্ত আভাযুক্ত গণ্ডস্থলের উপর হইতে কুঞ্চিত কেশগুচ্ছকে সরাইয়া দিতে লাগিলেন, নিজের শ্রান্তি ক্লান্তির কথা যেন আর তাঁহার কিছুই মনে রহিল না। বালকও বিরক্তিহীন চিত্তে প্রসন্ননম্র মুখে আগন্তুকের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে মাঝে মাঝে তাহার যুগল নয়ন বিস্ফারিত করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেছিল। তাহার পৌরাণিক কাহিনীময় কল্পনাকুশলী মন এই অভ্যাগতকে এক একবার নারদ ঋষি অথবা মহাদেবই ছদ্মবেশে আসিয়াছেন এইরূপ ভাবিয়া লইয়া তাঁহার বীণা বা তান্‌পুরার সন্ধানে মাঝে মাঝে চকিত দৃষ্টিতে পুঁটুলিটির পানেও চাহিতেছিল। সহসা ব্যস্তভাবে বালক বলিয়া উঠিল, "কই, পা ধুলেন না? জল তো এনেছি!"

"ধুই বাবা" বলিয়া আগন্তুক উঠিয়া দাঁড়াইতেই বালক ঘটিটি তুলিয়া লইয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। হস্ত পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া ও মুছিয়া আগন্তুক আসিয়া গৃহমধ্যস্থ শয্যায় বসিতেই বালক এবার পাখাখানি লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিল। পথিক স্নিগ্ধ হাস্যের সহিত তাহার হস্ত হইতে ব্যজনীখানি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "তা হ'লে একঘটি খাবার জল এনে দাও।" বালক আবার ভিতরের দিকে ছুটিল এবং অবিলম্বে পানীয় জল আনিয়া তাঁহার হস্তে দিতে দিতে বিজ্ঞের মত প্রশ্ন করিল, "কিছু খাবার আন্‌ব না?" "না বাবা, আহারের সময় এ নয়, তবে—"

"তবে কি? আর কি করব আদেশ করুন!"

"সে কি তুমি পারবে বাবা? বুড়োমানুষ আমরা একটু তামাক্ খাই, তোমাদের চাকর-বাকর যদি কেউ দিতে পারে—"

"আমিই পারব! দাদামশায়ের কাছে আমি শুই, রাত্রিবেলা তিনি মাঝে মাঝে তামাক্ খান! আমি তাঁকে সেজে দিই!"

বালক কক্ষান্তরে গিয়া ক্ষণকাল পরেই তামাকু সাজিয়া আনিয়া বৃদ্ধের হাতে দিতে দিতে হাসিয়া বলিল, "এইসব কল্কে দিনে রাতে সাজাই থাকে—দাদামশায় আর অতিথদের জন্যে—টিকেটা একটু ধরিয়ে দিলেই হয়!"

বৃদ্ধ হুক্কাহস্তে লইয়া একটু ইতঃস্তত: করিতেছেন দেখিয়াই সুচতুর বালক এবার বহির্দ্দিকে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সেই রৌদ্রের মধ্যে সে বাহিরে যাওয়ায়

বৃদ্ধ ব্যস্ত হইয়া তাহাকে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন কিন্তু সে তাঁহার নিজকার্য্য সারিয়া তবে ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল তাহার হস্তে লম্বছিন্ন কদলীপত্র রহিয়াছে। বৃদ্ধ অত্যন্ত প্রীতভাবে তাহার হস্ত হইতে পত্রটুকু লইতে লইতে বলিল, "বাবা, এতো বুদ্ধিমান তুমি! সকলের মুখের হুঁকোয় যে সকলে খায়না সেটুকু লক্ষ্য করেছ। তোমাদের সংসারও যে খুব অতিথিবৎসল তা বোঝা যাচ্ছে।"

কলার পাতার দ্বারা একটি ক্ষুদ্র নল প্রস্তুত করিয়া বৃদ্ধ তামাকু সেবন করিতেছেন, আর বালক একমনে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। হঠাৎ সে এক সময়ে বলিয়া উঠিল, "আপনি তানপুরা বাজান্ না?"

বৃদ্ধ হাসিলেন। দৃষ্টিতে দ্বিগুণ স্নেহ ভরিয়া বলিলেন, "না বাবা!"

"তবে কি বীণাই বাজান্?"

"তাও না। তবে তোমার কাছে সেই তানপুরা বা বীণাধারীকেও হয়ত একদিন ধরা পড়্তে হবে, তোমাকে দেখে এমনি আনন্দ আর এমনি লক্ষণ আমার মন পাচ্ছে!"

বালক একথায় সন্তুষ্ট না হইয়া একটু ক্ষুণ্নমনে বসিয়া আছে, বাহির হইতে এমন সময়ে কে ডাকিল, "দাদাঠাকুর, একটু জল দাও গো!"

বালক দ্বারের নিকটে আসিয়া দেখিল—বাহিরে একখানা লাঙ্গল ফেলিয়া রাখিয়া এক কৃষক মলিনবস্ত্রে শরীরের ঘর্ম্ম মুছিতেছে। বালক ডাকিল "নিতাই-দা, ঘরে এস। একজন ঠাকুর এসেছেন, দ্যাখ! জল এনে দিচ্ছি!"

ক্ষণপরে জল লইয়া বালক গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল এক অপূর্ব্বভাবের স্তব্ধতা সেইকক্ষে বিরাজ করিতেছে। শয্যার উপরে উপবিষ্ট ব্যক্তি হুঁকাটি মুখে মাত্র ধরিয়া একদৃষ্টিতে সম্মুখের গৃহের মেঝেয় যোড়হাতে উপবিষ্ট কৃষকের পানে চাহিয়া আছেন, আর সেই সরল কৃষক একেবারে যেন মোহাবিষ্টভাবে স্থিরদেহে স্তব্ধনেত্রে বৃদ্ধের মুখের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছে। উভয়ের চক্ষের দৃষ্টিতে যেন কি একটা ভাবের আদান-প্রদান চলিতেছে। কৃষকের চক্ষু দুটি আরক্তবর্ণ, আগন্তুকের দৃষ্টি একইরূপ প্রশান্ত। তত্ত্বসন্ধিৎসু বালকও স্থিরভাবে উভয়ের দিকে কিছুক্ষণ দেখিয়াও তাহাদের ভাব কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। বৃদ্ধকে তামাকু পানে বিরত দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "কই ঠাকুর, তামাক্ খাচ্ছেন না যে!" বৃদ্ধ যেন সচেতন হইয়া "এই যে খাচ্চি বাবা" বলিয়া হুঁকায় দু-একবার টান দিলেন এবং তখনই সেটি মাটীতে নামাইয়া রাখিয়া কৃষকের দিকে একটু ঝুঁকিলেন। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী সম্মুখে হেলাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক রেখো মন গুরুর চরণ নিরিখ্ ছেড়ো না।" সঙ্গে সঙ্গে কৃষক মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। বৃদ্ধও অমনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া একহস্তে পুঁটুলি গ্রহণ করিলেন; একবার মাত্র হাসিমুখে "আসি বাবা!" উচ্চারণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং আর কাহারও দিকে না চাহিয়া সেই প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যেই পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। বালক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আর নিতাই নামক কৃষক একইভাবে পড়িয়া রহিল, উভয়েরই যেন সংজ্ঞা নাই।

সহসা বালক তড়িৎস্পৃষ্টের মতই চমকিয়া উঠিয়া ছুটিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। দ্রুতপদে রাস্তার উপরে আসিয়া চাহিয়া দেখিল দূরে সেই মূর্ত্তি প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে সতেজে পথ অতিবাহন করিতেছেন। বালক চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ঠাকুর, ঠাকুর!" বালকের ক্ষীণ কণ্ঠ যে যথাস্থানে পৌছিল না তাহা বুঝিতে পারিয়া বালক তৎক্ষণাৎ দৌড়িতে আরম্ভ করিল! রৌদ্রে কোমল পা পুড়িয়া যাইতেছে, ততোধিক কোমল শরীর উত্তপ্ত হইয়া দর দর ধারে ঘাম ঝরিতেছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। কিছুক্ষণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আবার বালক উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "ঠাকুর—ঠাকুর-মশায়!"

বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া গিয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন। বালককে তদবস্থ দেখিয়া তিনিও দ্রুতপদে তাহার দিকে আসিতে লাগিলেন। উভয়ে ক্রমে নিকটস্থ হইতেই কি এক উত্তেজনায় বালকের দুই হস্ত সম্মুখের দিকে প্রসারিত হইয়া গেল, ঐ দুই হস্তের আকর্ষণে একেবারে তাহাকে বক্ষের উপর তুলিয়া লইয়া বৃদ্ধ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন "এ কি বাবা—এ কি! এমন ক'রে কেন এই রৌদ্রে ছুটে এলে?" "ঠাকুর—ঠাকুর!" "কেন বাবা—কেন? কি হ'ল তোমার?"

বালক যেন একটু সসংজ্ঞ হইল! ধীরে ধীরে তাঁহার ক্রোড় হইতে নামিবার চেষ্টা করিতে করিতে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "চলে এলেন, আপনাকে যে প্রণাম করা হয়নি!" বৃদ্ধ বালককে নামিতে না দিয়া দ্বিগুণ আদরে বক্ষে চাপিয়া বলিলেন, "প্রণামের ঢের বড় জিনিষ যে আমায় দিলে! এই

রৌদ্রে আবার কি ক'রে ফিরবে ? এই নরম পা দুখানি যে আবার পুড়ে যাবে !"

"ঠাকুর, আপনি নিতাইদাকে ও কি বল্লেন ?—ঠিক রেখো মন গুরুর চরণ নিরিখ্ ছেড়ো না। ও কথার অর্থ কি ? গুরু তো পূজনীয় লোককে বলে। এখানে গুরু কাকে বললেন ? কে গুরু, কার গুরু ?" ধীরে ধীরে বালকের মস্তক ও মুখখানি নিজ স্কন্ধের উপর রাখিয়া মৃদু মৃদু করাঘাতে যেন বালককে ঘুম পাড়াইয়া দিবার মত ভাবে বলিলেন, "সময় হ'লেই এসব কথার অর্থ বুঝ্‌তে পার্‌বে বাবা ! এখন তো বুঝ্‌বার সময় আসেনি।" বালক উত্তর দিল, "নিতাই দাদাকেই যে কি বুঝালেন ; সে কেন এমন হয়ে পড়ে আছে ?"

"ঐ সরল ভক্ত মানুষটির বুঝবার সময় এসেছে বাবা, তাই সে বুঝেছে। তুমিও সময় হ'লে বুঝ্‌বে, আর সে সময় যে শীগ্‌গিরই আস্‌বে, তাও তোমাকে দেখে বুঝ্‌ছি। এখন ঘরে যাও, বড় রৌদ্র, তোমার দাদামশায় উদ্বিগ্ন হবেন—সকলে ব্যস্ত হবে।"

"দাদামশায় তো এসময়ে চতুষ্পাঠীতে থাকেন, আমার উপরেই অতিথ-অভ্যাগতকে দেখ্‌বার ভার দিয়ে যান্। আপনি এমন করে কিচ্ছু না খেয়ে চলে এসেছেন শুন্‌লে আমাকে কি বল্‌বেন ?"

"কিছু বল্‌বেন না বাবা, সব কথা তাঁকে বলো, তিনি বুঝবেন। তিনি বড় ভাগ্যবান গৃহী যে, তাঁর ঘরে তোমার মত শিশুর উদয় হয়েছে। তুমি আমার যথেষ্ট সৎকারই তো করেছ, এইবার ঘরে যাও দাদু !"

"বড় মন কেমন করছে" বলিতে বলিতে মুগ্ধ বালক আবার তাঁহার স্কন্ধে শির রক্ষা করিল। বালককে ক্ষণিক স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে যেন অতি অনিচ্ছাতেই নামাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "এখন ঘরে যাও বাবা, পরে হয়ত কখনও—"

বলিতে বলিতে কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই পশ্চাৎ ফিরিয়া তিনি অতি দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিলেন, আর একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না। বালকও তাঁহাকে আর বাধা দিল না বা সহসা সেস্থান হইতে নড়িলও না, স্থিরচক্ষে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া সেই ক্রমে অপস্রিয়মান মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

৬

হাটের জনতা ! গ্রামের মধ্যস্থলে হাট, আর তাহার চারিদিকে লোকসংঘ যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কয়েকখানি গ্রামের লোকই সেখানে জড় হইয়া ফিরিতেছে ঘুরিতেছে বেসাতি করিতেছে। চারিদিকে শুধু লেনা দেনা ! ব্যাপারীরা তাহাদের বোঝা কমাইবার জন্য যেমন ব্যগ্র, ক্রেতারাও সেই সুযোগে অভীপ্সিত দ্রব্যের দাম কমাইবার জন্যও তেমনই উৎসুক, উভয় দলে যেন একটা হারজিতের খেলা চলিয়াছে। শাকসব্‌জী ফলমূল আনাজের স্তূপ ক্রমে যেন লুঠের ভাবেই কমিয়া আসিতেছে, জমিয়া রহিয়াছে কেবল শুষ্ক বস্তুর দোকান ! তাহাদের দ্রব্য নষ্ট হইবার ভয় নাই, তাই তাহার বিক্রেতারা আশানুরূপ দর কমাইতেছে না। তাঁতি জোলারা তাহাদের রং-বেরংয়ের গামছা ও বস্ত্রের গাঁটরী ধীরে ধীরে বাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছে, কেন না বেলা আর বেশী নাই ; কিন্তু কোন কোন নাছোড়বান্দা গ্রাহক তখনও তাহার মধ্য হইতে দুই-একখানা বস্ত্র টানিয়া লইয়া দর-দস্তর করিবার চেষ্টা করিতেছে। মনিহারীর দোকান অস্তোন্মুখ সূর্য্যের কিরণে হাটুরিয়াদিগের চক্ষু ঝল্‌সাইয়া নিজেদের দর আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে ! মুদির দোকান অটলভাবে বসিয়া, বাঁধা দরের জন্য তাহাদের কোন চাঞ্চল্য নাই। হাঁড়ি পাতিলের যেখানে স্তূপ সেই 'কুমারের দোকানেই গ্রাম্য স্ত্রীলোকদের বেশী ভিড় ! তাহারা রন্ধনস্থালীগুলি ঘুরাইয়া বাজাইয়া দর দাম করিয়া সে স্থানটি জাঁকাইয়া তুলিয়াছে।

হাটের অদূরে গ্রাম্য স্কুল। ছুটিপ্রাপ্ত বালকের দল মহা কলরবে মনোহারী দোকানের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। খাতা-পেন্সিল-কলম-লাট্টু-বাঁশী-ঘুড়ি, তাহাদের চাহিদার বস্তু অনেক, কাজেই গোলমালের আর শেষ নাই। এখানে-ওখানে দু-চারজন ভিক্ষুক ঘুরিয়া বেড়াইয়া করুণ প্রার্থনায় জনগণের মন গলাইবার চেষ্টায় ফিরিতেছে, কিন্তু কে তাহাদের দিকে মন দেয় ! হাটের বেলা যে ক্রমেই ফুরাইয়া আসিতেছে। কোথাও কোন বাউল তাহার গোপীযন্ত্র বাজাইয়া গান ধরিয়াছে—

"এ হাটে বিকায় না কো অন্য সুত,
বিকায় নন্দরাণীর সুত'

সে স্থত' যে না লবে
খেই হারাবে
জন্মের মত—

অন্য একজন গাহিতেছে—

"হরি দিনতো গেল সন্ধ্যা হল
পার কর আমারে"

গাব্গুবাগুব্ বা ডুব্কীর তালে তাহার তাল যোগাইয়া।

অনুচরের মস্তকে সওদা চাপাইয়া মাঝে মাঝে দুই একজন গ্রাম্য ভদ্রলোক জনতার মধ্য হইতে বাহির হইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ঐরূপ এক গায়ক বাউলের নিকট একটি বালককে দণ্ডায়মান দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। ব্যস্ত হইয়া জনতা ঠেলিয়া নিকটে গিয়া বলিলেন, "কমলাক্ষ! তুমি যে এ গ্রামে এ বেশে ভাই! তোমার দাদামশায় কই—কার সঙ্গে তুমি এখানে এমন সময়ে এসেছ?"

বালক সে ব্যক্তির মুখের পানে চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "আমি একাই এসেছি—না, হরিচরণদাদার সঙ্গে এসেছি।"

"কোথায় এসেছ? এই হাটে?"

বালক নিঃশব্দে অসম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

"তবে? চেহারাই বা এমন কেন? সমস্ত দিন কি খাওনি—স্নান করনি?"

এ প্রশ্নের আর উত্তর না পাইয়া তিনি বলিলেন, "কই তোমার হরিচরণদাদাই বা কই? সে সেই তোমাদের গ্রামের বৈরেগি ছোঁড়া তো? তার সঙ্গে তুমি একা এমনভাবে এখানে? তোমার দাদামশাই তোমার আসার কথা জানেন তো?"

"কি বাঁড়ুয্যেমশায়, কার সঙ্গে এত বকাবকি করছেন, হাট করা কি শেষ হয়নি?"

"হাট করার কথা এখন যাক্—এই ছেলেটিকে এখানে দেখে ভাবনায় পড়েছি হে!"

"কে এ ছেলেটি?"

"আরে আমাদের সান্ন্যালমহাশয়ের দৌহিত্র, তাঁর নয়নের তারা বল্লেও চলে, তাঁর সংসারের ও প্রাণ! একে এখানে এ বেশে দেখে আমার ভাল লাগ্ছে না তো! কোন্ এক বৈরাগী ছোক্‌রার সঙ্গে এই তিন চার ক্রোশ দূর এগ্রামে এসেছে! সান্ন্যালমশায়কে তুমি চেনো ত?"

"তাঁকে এদিকে পাঁচ-দশ ক্রোশের মধ্যে কে না জানে? প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি! ছেলেটি কি উড়োনচণ্ডে গোছের হয়েছে নাকি?"

"আরে না না, একটি রত্ন বল্লেও চলে, তা কি রূপে কি গুণে! এইটুকু ছেলের মেধা আর পড়াশুনার কথা যদি শোন —সে এক আশ্চর্য্য! তাই তো ভাব্ছি যে—কমলাক্ষ!— ওদিকে কোথায় যাচ্ছ দাদা! তোমার নিশ্চয় খাওয়া হয়নি, তুমি আমার সঙ্গে এস—তোমার হরিচরণদাদাকেও ডাক। শুনি কি ব্যাপার।"

"এই বাউলের গান শুন্তে সেও তো দাঁড়িয়ে ছিল, কোথায় গেল জানি না।"

"কোথায় আর যাবে, আমাকে হয়ত চেনে, দেখে হয়ত গা ঢাকা দিয়েছে। কি উদ্দেশ্যে সে তোমাকে সঙ্গে এনেছে তা তো বুঝ্ছি না—আচ্ছা সে কথা পরে হবে, তুমি আমার সঙ্গে এস! আমায় চিন্তে পারছ তো কমলাক্ষ? তোমার দাদামশায়ের আমি ছাত্র বল্লেও চলে, কতদিন তোমাদের বাড়ী—তাঁর কাছে গিয়েছি!"

"আপনাকে চিনেছি। হরিচরণদাদা আমাকে এখানে নিয়ে আসেনি, আমি নিজেই এসেছি, সে আমার সঙ্গে এসেছে মাত্র। তাকে খুঁজে না নিয়ে কোথাও আমি যাব না, আপনার সঙ্গেও যাব না, আপনি যান্।"

বালকের দৃঢ়স্বরে একটু আশ্চর্য্য হইয়া ভদ্রলোকটি তাহার মুখের পানে চাহিলেন। একটু থামিয়া পরে বলিলেন, "তুমি কি বেড়াতে এসেছ এ গ্রামে?"

"তাও আমি বলব্ না"—বলিয়া বালক সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্যই যেন অন্য দিকে চলিল। ভদ্রলোক কর্ত্তব্য-বিমূঢ়ভাবে তাহার অনুসরণ করিতে করিতে বলিলেন, "কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে আসছে যে কমলাক্ষ! এখন তো তোমার বাড়ী যেতে পারবে না! রাত্রে কোথায় থাক্‌বে, কোথায় খাবে? তোমার হরিচরণদাদাকে খুঁজে ডেকে নিয়েই আমার সঙ্গে এস দাদা, পরে সকালে—"

"আপনি মিথ্যা ডাকাডাকি করছেন, আমি যাব না আপনি যান্," বলিতে বলিতে বালক একটু দ্রুতপদেই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিল। ভদ্রলোক আর বালকের অনুসরণ না করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া যেন ইতি-কর্ত্তব্য চিন্তা করিয়া লইলেন।

* * * *

রাত্রি গভীর—অন্ধকারময়ী! স্কুলগৃহের পশ্চাৎ দিকের বারান্দায় এককোণের মৃদু মৃদু গুঞ্জনধ্বনি রজনীর ঝিল্লী-রবের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিল। "ভাই কমলাক্ষ, আমার ভয় করছে, তুমি বাড়ী ফিরে চল! সকালেই আমরা—"

"তুমি কিরকম বৈরাগী হরিচরণদাদা, তোমার ভয় করছে? কিসের ভয়?"

"তা জানি না, তোমার দাদাঠাকুর মশায়—"

"তোমাকে বকবেন এই তো? আমরা ভোরে উঠেই বেরিয়ে পড়ব—তিনি তোমায় পাবেন কি করে যে এত ভয় লাগছে তোমার? আর তাতেই বা এত ভয় কিসের ওঁকে? কেন তাঁর কথা বার বার আমার মনে পড়িয়ে দিচ্ছ? অন্য কথা বল! কাল আমরা উঠে সোজা পূর্ব্ব-দিকে চলে যাব—কেমন? যতদূর—নজর যাবে, ততদূর যাব—কেবলই যাব!" দ্বিতীয় কণ্ঠটি ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "আমরা যতদূরই যাই না কেন ভাই, আবারও ততদূর যেতে বাকি থাকবে; পথ কি ফুরায় ভাই, যতই চলবে ততই বাকি থাকবে।" "তবুও—তবুও আমরা যাব। একদিন না একদিন তো পথকে ফুরাতেই হবে। আর না-ই যদি ফুরায়, তাই বা কি—সে তো আরও মজা।"

"সমস্ত দিন তোমার খাওয়া হয়নি, ভিজে চাল কি তুমি খেতে পার?"

"কেন, আমি তো খেয়েছি চিবিয়ে খুব—খাইনি?"

"তাই তো ভাবছি যদি অসুখ করে, দাদাঠাকুর মশায় এতক্ষণ কি করছেন না জানি—"

"আবার সেই কথা? এই রাত্রেই আমি বেরিয়ে পড়ছি তা হলে। চললাম!"

ব্যস্তে ব্যস্তে তাহাকে যেন চাপিয়া ধরিয়া দ্বিতীয় কণ্ঠ আর্ত্তস্বরে বলিল, "আর বলবো না ভাই! তুমি এই চাদর-খানার ওপর শোও! এই ঝুলিটি মাথায় দাও! অনেক রাত হয়েছে, খুব ভোরে আবার তো চলতে হবে, এইবার ঘুমোও।"

"হরিচরণদাদা, তুমি নিজে মাটীতে হাতে মাথা দিয়ে শুয়ে আমাকে এই সবে শোয়াচ্ছ, ভাবছ আমি মাটীতে খালি মাথায় শুতে পারব না! আচ্ছা, আমি কত কি যে পারব, তা তুমি এর পরে দেখে নিও—"

"তা আমি এখনই বুঝতে পারছি ভাই, এখন ঘুমোও!"

* * * *

একটা সমবেত লোকসমাগমের চাপা কণ্ঠস্বরে এবং চক্ষে আলোক-লাগায় উভয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া বসিতে না বসিতে কমলাক্ষ দুইটি প্রসারিত বাহু বেষ্টনে বেষ্টিত হইয়া এক বিশাল বক্ষের মধ্যে আবদ্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভদ্রলোকের উল্লাসসূচক কণ্ঠধ্বনি "যাক্ এইখানেই ছিল! আমার লোক ওদের ওপর চোখ রেখে রাত্রে এখানে এদের ঢুকতে দেখেছিল, তবু আমার ভয় লাগছিল যদি পালায়! আপনি যতক্ষণ না এসে পড়েছিলেন সান্ন্যাল-মশায় ততক্ষণ আমি ছট্‌ফট্ করেছি! যাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম সে লোকটা ঘোড়ার মতই দৌড়ুতে পারে দেখছি—য়্যাঁ?"

কাহারও নিকটে সাড়া না পাইয়া তিনি কুণ্ঠিত জড়সড়-ভাবে একপাশে উপবিষ্ট হরিচরণকেই আক্রমণ করিলেন, "তুমিই বা কেমন ছোক্‌রা হ্যাঁ—এই ঘরের এই ছেলেকে নিয়ে এমনি ভাবে পালিয়ে যাচ্ছ? তোমার বৈরেগিগিরির সাক্‌রেদ আর খুঁজে পেলে না? তোমাকে আচ্ছা করে—"

বাধা দিয়া গম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হইল, "নির্দ্দোষীকে তিরস্কার ক'র না! আমি জানি এই রকমই ঘটবে। কিন্তু আমি যতদিন আছি ততদিন অন্তত ঘরে থাক্ কমলাক্ষ! সেও বোধ হয় খুব বেশী দিন নয়। সেই ক'টা দিন আমার বুকেই থাক্ দাদু।"

বক্ষে আবদ্ধ বালক এতক্ষণ যেন পাথরের মতই কঠিন-ভাবে স্তব্ধ হইয়াছিল। ক্রমশ তাহার আশ্রয় স্থানের অনির্ব্বচনীয় স্নেহোত্তাপে ধীরে ধীরে যেন গলিতে গলিতে কোমল হইয়া ক্রমে তাহাতে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। সেই আশ্রয়স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া সেই বিপুল বক্ষে মাথা রাখিয়া বালক শীঘ্রই যেন একেবারে ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

টি-এস-এলিয়ট ও তাঁহার প্রতিভা

শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বর্ত্তমান ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন ইয়েটস্ ও এলিয়ট। ইয়েটস্ সেদিন পরলোকগমন করেছেন কাজেই এককথায় বল্‌তে গেলে, এলিয়টই হচ্ছেন বর্ত্তমান ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। ম্যাসফিল্ড, "পোয়েট ল্যরিয়েট" হ'লেও শ্রেষ্ঠ কবি ন'ন। এ ছাড়া জীবিত কবিদের মধ্যে অডেন, পাউণ্ড, ছলা মেয়ার, এডমাণ্ড ব্লাণ্ডেন্, হার্বার্ট পামার, হাক্সলী, ষ্টিফেন কোণ্ডার, সীগ্ল, এডিথ সিট্‌ওয়েল প্রভৃতি শক্তিশালী কবি হলেও এলিয়টের সমকক্ষ নন। অথচ আমাদের দেশে ক'জনে তার লেখার সঙ্গে পরিচিত! আমাদের দেশে বিশ্বসাহিত্যের দরবারের ছাপ অর্থাৎ নোবেল প্রাইজ, কিংবা বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য কাজ না করলে কোন সাহিত্যিকের খোঁজ হয় না। এলিয়ট এ দলের লোক নন, কাজেই কয়েকজন মাত্র উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন খুব অল্প লোকেই তার নাম শুনেছেন! এ প্রবন্ধে তার জীবনী ও রচনাভঙ্গীর একটা আভাস দেওয়া হবে। পরে যদি সুযোগ ও সুবিধা হয় তা হ'লে এর চেয়ে বড় প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা ভবিষ্যতে রইল।

ইউনাইটেড ষ্টেটসের মিসৌরী বেসিনে সেণ্ট লুইস্ নামক স্থানে ইংরেজী ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে এলিয়ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতা হেনরী ওয়ার এলিয়টের সপ্তম ও সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। এলিয়টের পূর্ব্বপুরুষগণ সপ্তদশ শতাব্দীতে আমেরিকায় আসেন এবং স্থায়ী বাসিন্দা হ'ন্। প্রথমে তিনি ওয়াশিংটন্ স্মিথ একাডেমীতে ভর্ত্তি হন। এইখানে তাঁর প্রথম কলেজ-জীবন আরম্ভ হয়। এরপর তিনি 'হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। সেখানে তিনি হার্ভার্ড য়্যাড্‌ভোকেট ম্যাগাজিন-এর সম্পাদক ছিলেন। ১৯১০-১১ সালে তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। সেখানে তিনি সুইডিস্, রাশিয়ান ও গ্রীক্ অধ্যয়ন করেন। ১৯১১—১২ সালে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান্ ও ল্যাটিন্ অধ্যয়ন করেন। ১৯১২—১৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব, ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। এখানে তিনি ইটালিয়ান্ ও স্প্যানিশ্ ভাষাও শিক্ষা করেন। তিনি অদ্ভুত ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত। একমাত্র হরিনাথ দে ছাড়া কাহাকেও এতগুলি ভাষা এত অল্প বয়সে শিক্ষা করিতে শুনি নাই। ১৯১৩—১৪ সাল পর্য্যন্ত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শনের সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কার্য্য করেন। ঐ বৎসরেই তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "টনেলি ফেলোশিপ," পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯১৪ সালে তিনি ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ্ এথিক্স্-এ রচনা প্রকাশ করিতেন। ১৯১৫ সালে তিনি বিবাহ করেন। ১৯১৫—১৮ সালে তিনি "লয়েড্স্ ব্যাঙ্কে" কার্য্য করিতেন এবং "ইকনমিক জার্নাল"-এ প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্য দিতেন। ঐ কালে তিনি ইগোইষ্ট পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৯—১৯২১ সাল পর্য্যন্ত যখন মনস্বী মিডল্‌টন্ ম্যারী য়্যাথেনিয়ম নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তখন সুন্দর সুন্দর সব রচনা প্রকাশের জন্য দিতেন। ১৯২৩ সাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ক্রাইটেরিয়ন কোয়ার্টার্লি রিভিউ-র সম্পাদক। বর্ত্তমানে তিনি ফেবার এণ্ড ফেবার নামক বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক কোম্পানীর একজন বিশিষ্ট অংশীদার। ১৯২৭ হইতে তিনি ইংলণ্ডেই আছেন। ১৯৩২—৩৩ সালে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চার্ল্‌স্ এলিয়ট নর্টন প্রফেসার অফ্ পোয়েট্রি-রূপে আমন্ত্রিত হইয়া যান। এখন তিনি সাহিত্য-সাধনায় নিযুক্ত। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম টমাস্ ষ্টার্ণ এলিয়ট।

"কবিতাবলী" (১৯০৯—১৯৩৫), "দান্তে" "হোমেজ্ টু জন ড্রাইডেন" (১৯২৪) "মার্ডার ইন্ দি ক্যাথিড্রাল" (১৯৩৫) "ইউজ অব পোয়েট্রি এণ্ড ইউজ্ অব ক্রিটিসিজম্" "সেক্রেড্ উড" "এলিজাবেথান্ এসেজ্" "সিলেক্টেড এসেজ্" প্রভৃতি বই তিনি লিখেছেন। তার সমস্ত বইর বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই তার লেখার একটা মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হবে।

এলিয়ট কবি ও সমালোচক। তিনি বর্ত্তমান ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক। ক্রোচে, বার্গসঁ, মিডল্‌টন ম্যারী, এলিয়ট, সবাই সমান স্তরের সমালোচক। দার্শনিক হিসেবে হয়ত বার্গসঁ এলিয়টের চেয়ে বড়। এলিয়টের মতে শ্রেষ্ঠ সমালোচক হচ্ছেন—কোল্‌রিজ, এরিষ্টটল্, ড্রাইডেন। তিনি বলেন যে সমালোচনা হচ্ছে তিন রকমের, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সম্পূর্ণরূপে কাব্যিক। তিনি বলেন—

"Every form of genuine criticism is directed towards creation. The historical or philosophic critic of poetry is criticising poetry in order to create a a history or a philosophy ; poetic critic is criticising poetry in order to create poetry.

এখানে ম্যাথু আর্নল্ডের সঙ্গে তার মত মেলে না।

এলিয়টের সঙ্গে জেম্‌স্ জয়েসের অত্যন্ত সাদৃশ্য রয়েছে। এলিয়ট হচ্ছেন জয়েস্ "who uses poetry as his medium." (Herbert Reade) এলিয়ট অগাধ পণ্ডিত ও ভাষাবিদ্। তার প্রবন্ধাবলী ও "দান্তে" তার অগাধ মনীষা ও অপ্রমেয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়—টমাস্ ম্যান্-এর Der Zauberberg কিংবা ম্যাজিক মাউণ্টেন আল্‌ডুস্ হাক্সলীর এণ্ডস্ এণ্ড মীন্‌স্ কিংবা পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্ট যেমন নাকি দেয়।

যুদ্ধের পরবর্ত্তী সাহিত্যে তার মত এত প্রভাব বিস্তার কেউই করেন

নি। ডক্টর অমিয় চক্রবর্ত্তীর 'ডাইনেষ্ট য়্যাণ্ড পোষ্ট-ওয়ার ড্রামা' (ক্ল্যারেনডন প্রেস) পড়লে অনেকটা বোঝা যায়। এলিয়ট হচ্ছেন ক্লাসিক নীতিবাদের পক্ষপাতী, অর্থাৎ—ইংরেজীতে যাকে বলা হয়েছে, "bent towards Classicism, strict Catholicism and ethical purity." সুন্দরের উপাসনা ও তাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ শাসন বলে মেনে নিয়েছেন। তিনি দার্শনিক পণ্ডিত এবং "এথিক্যাল থিঙ্কার"। বর্ত্তমান সভ্যতা, অর্থাৎ—যাকে বার্ট্র্যাণ্ড রাসেল, শ', ওয়েলস্, মার্ক্স বলেছেন, "বুর্জোআ সভ্যতা"—তার বিরুদ্ধে তিনি করেছেন জয়যাত্রা। এইখানে তাঁর সঙ্গে ডি-এচ্ লরেন্সের মত খাপ খায়। কিন্তু দুজনের মত ভিন্ন। লরেন্স চেয়েছিলেন আদিম যুগে ফিরে যেতে, আর এলিয়ট চেয়েছেন আর্টের পবিত্রতার মধ্য দিয়ে জীবনকে আরও মহৎ করতে। কবিকে ভয়েস অফ্ দি ন্যাশন বলা হয়েছে ও হয়, যেমন টেনিসন্, ব্রিজেস্, অথবা ম্যাসফিল্ড, ইয়েটস্, কিংবা সিঙ্গ, অথবা ইটালীর দানুন্‌ৎসিও অথবা নব্য-আমেরিকার ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান্। কিন্তু এলিয়ট তা নন। তার কবিতা অতি শক্ত এবং তা শুধু কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির জন্যে। তিনি হচ্ছেন singer of an intellectual clique.

এলিয়টের কবিতাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে "ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড" যেটা নাকি তিনি এজরা পাউণ্ডের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড-এর টীকায় তিনি যা প্রমাণপঞ্জী দেখিয়েছেন তাতে তাঁর অগাধ মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে দ্বিতীয় প্রস্তাবে যে 'দ'এর তিন রকম অর্থ করা হয়েছে তা'ও তিনি কবিতায় উল্লেখ করেছেন। তিনি সংস্কৃত জানলেও ডয়সনের জার্মান অনুবাদের বেশী পক্ষপাতী। আপনারা সকলেই ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড পড়েছেন, কাজেই তার থেকে লাইন উদ্ধৃত ক'রে প্রবন্ধের কলেবর বৃহদাকার এবং বাঙলা প্রবন্ধকে ইংরেজী উদ্ধৃত বচনে কণ্টকিত করতে চাই না। "পরট্রেট অফ্ দি লেডী,' 'দি রক্,' 'রেসপেক্টেবিলিটি' প্রভৃতি কবিতায়ও তাঁর অসাধারণ কাব্যশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এলিয়টের একমাত্র নাটক হচ্ছে "মার্ডার ইন্ দি ক্যাথেড্রেল"-এর সম্বন্ধে কিছু বলেই প্রবন্ধের' যবনিকাপাত করব। ১৯৩৫ সালের খ্রীষ্টমাসে 'সেন্টবেকেট মেমোরিয়াল' অভিনয়ের জন্যে এটা রচিত হয় এবং অসাধারণ সাফল্য লাভ করে। এর ঘটনা হচ্ছে বেকেটের সঙ্গে হেনরীর কলহের চরম অবস্থাপ্রাপ্তি ও বেকেটের হত্যা ক্যান্টারবেরীর চ্যাপেলে। এই নাটকটি সম্পূর্ণভাবে গ্রীক্ মডেলে প্রণীত যেমন নাকি মিল্টনের "স্যামশন য়্যাগনিষ্টস্" অথবা সুইনবার্নের "য়্যাটাল্যান্টা ইন ক্যালিডন"। কেন-না য়্যারিষ্টটল-কথিত ট্রাজেডীর লক্ষণ এতে মিলে যায় এবং গ্রীক্ নাটকের দুইটি যা বিশেষত্ব, অর্থাৎ—কোরাস, (নাটকের আগে ও পিছে সংস্কৃত নাটকের নান্দী ও ভবভূতি এবং the three unities i e the unities of time, place and action. এই নাটকের গঠনসাদৃশ্যের সঙ্গে W. H. Anden প্রণীত Ascent of F 63 Dance of Death-এর অনেকটা সাদৃশ্য আছে। বেকেটের চরিত্রের গভীরতা, Tempters-দের উক্তি, কোরাস্, Priest-দের আশঙ্কা এবং রচনা-নৈপুণ্য ও দার্শনিকতা নাটকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করেছে। হার্ডির এপিক্ নাটক "ডায়নেষ্টস্"ও এত সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়নি—আমার মতে। এর ভাব ও ভাষা গভীর ও সুন্দর। কতকগুলি লাইন আপনাদের শোনাচ্ছি—

We do not know very much of the future
Except that from generation to generation,
The same things happen again and again
Men learn little from their experience
But in the life of one Man never the
Same time returns. (Part 1).

"Now is my way clear, now is the meaning plain
Temptation shall not come in this kind again
The last temptation is the greatest treason
To do the right deed for wrong reason
The natural vigour in the venial Sin
In the way in which our lives begin" (Part 1).

কেমন সুন্দর নয় কি! এরকম বহু লাইনে নাটকটি সম্পূর্ণ। এ সমস্ত ছাড়াও এলিয়ট বর্ত্তমান শেক্‌স্‌পীয়র-সমালোচকদের (Shakespeare-Scholar) অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

কথা ঃ—নিশিকান্ত

সুর ও স্বরলিপি ঃ—শ্রীমতী সাহানা দেবী

পণ

(তাল—ত্রিতাল)

এবার আমি ক'রেছি পণ রইব তোমার সাথে সাথে
অন্তরে মোর তোমার পরশ বইব আমি দিনে রাতে।
এবার আমার সাধন সাধা
ছাড়িয়ে যাবে সকল বাধা
তরী আমার বাইব তোমার ধ্রুব তারার ইশারাতে ॥

এবার তোমায় দিলাম সঁপে আমার মন্দ আমার ভালো,
তোমার শিখায় জ্বালিয়ে দিলাম আমার আঁধার আমার আলো।
আমার দুঃখ সুখের ধারা
তোমারি আনন্দে হারা
আমার অশ্রু হাসির মুকুল তোমার গলার মালা গাঁথে ॥

II II { পা র্সা নর্সা ন্র্সা | র্সপা -া মা পা | গা মা গমা পা I
এ - বা - র্ - আ মি ক' - রে -

পদা পমা জ্ঞমা সা I সণ্ -া সণ্ সা | মজ্ঞা মজ্ঞা মা পা |
ছি - প ণ্ র - ই ব তো - মা র্

মপা ধা পধা ণা | ধণা র্সা নর্সা ন্র্সা I } { র্সা র্রা -া র্রর্মা |
সা - থে - সা - থে - অ ন্ - ত

[র্জ্ঞর্পা র্মা র্জ্ঞর্মা র্জ্ঞা | র্রর্জ্ঞা র্রা র্সনা র্সা]
র্মা র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া | র্রর্মা র্জ্ঞা র্রর্জ্ঞা র্রা | র্সর্রা র্সনা র্সা -া I
রে - মো র্ তো - মা র্ প - র শ্

গা মা পা ধা | ণা র্সা র্সা -া | র্সগা মা পধা ণর্সা |
ব - ই ব আ - মি - দি - নে -

পণা ধপা মজ্ঞা রসা II II
রা - তে -

[পা না না -া | -া া ন্পা না | ন্পা -া না র্সা |
II { পনা নপা না -া | -া া না র্সা | র্রা র্সা র্রা র্মা |
এ - বা - ব আ মার্ সা - ধ ন্

[নর্সা র্রা র্সর্রা র্সর্সা I না র্সা র্রা -া | র্রর্মা র্জ্জর্রা র্সনা র্সা |
র্রর্মা র্জ্জর্রা র্সনা র্সা I পা না র্সা র্রা | র্রর্মা র্জ্জর্রা র্সনা র্সা |
সা - ধা - ছা ড়ি য়ে - যা - বে -

পা না পনা র্সর্রা | র্রর্জ্জা র্রর্সা ণধা পা]
পা ধা পধা ণা | ধর্সা ণধা পমা গমা I } { র্সা ন্র্সা র্রা -া |
স - ক ল বা - ধা - ত - রী -

[র্গর্রা া -া র্গা | র্রর্গা র্মর্পা র্মর্পা -া I
া া র্রা র্গা | র্গর্রা র্গা র্মা র্গর্মা | র্মা র্পা র্পা -া I
আ মার বা - হি র তো - মা র্

র্মর্পা র্মা র্জ্জর্মা র্জ্জা | র্রর্জ্জা র্রা র্সনা র্সা | র্রর্গা র্মর্পা র্রর্মা র্জ্জর্রা |
র্মর্পা র্মর্পা র্মর্জ্জা র্রা | র্রর্জ্জা র্সর্রা র্সনা র্সা | র্রর্পা র্মর্পা র্মর্জ্জা র্রা |
ধ্রু - ব - তা - রা র্ হি - শা -

র্সর্রা নর্সা পদা মপা I]
র্রর্পা র্মর্জ্জা র্রর্সা নর্সা I } II II
রা - তে -

[গরা গা রগা মপা | রগা মপা পা -া]
II { সা -া ন্সা রা | া া রা গা | গরা গা রগা মা | গমা পা মধপা ক্ষপা I
এ - বা র্ তো মায় দি - লা ম সঁ - পে - -

[র্সর্রা র্সর্রা র্সা ণা | ণর্রা র্সর্রা র্সা ণা | ণর্রা র্সণা ধপা মপা]
পধা ণা ণর্ধা র্সা | ণর্রা র্সা র্সা ণা | ণর্রা র্সা র্সা ণা | ধর্সা ণা পধা পা I
আ - মা র্ ম ন্ দ - আ - মা র্ ভা - লো -

[র্রা র্পা র্মা র্জ্জা | র্মা র্পর্মা র্জ্জা র্রা |
পমা ধপা র্সনা র্সা | র্রা র্সা র্রা র্মা | র্মর্রা র্মা র্জ্জর্মর্জ্জর্মা র্জ্জা |
তো - মা র্ শি - খা য় জা লি য়ে -
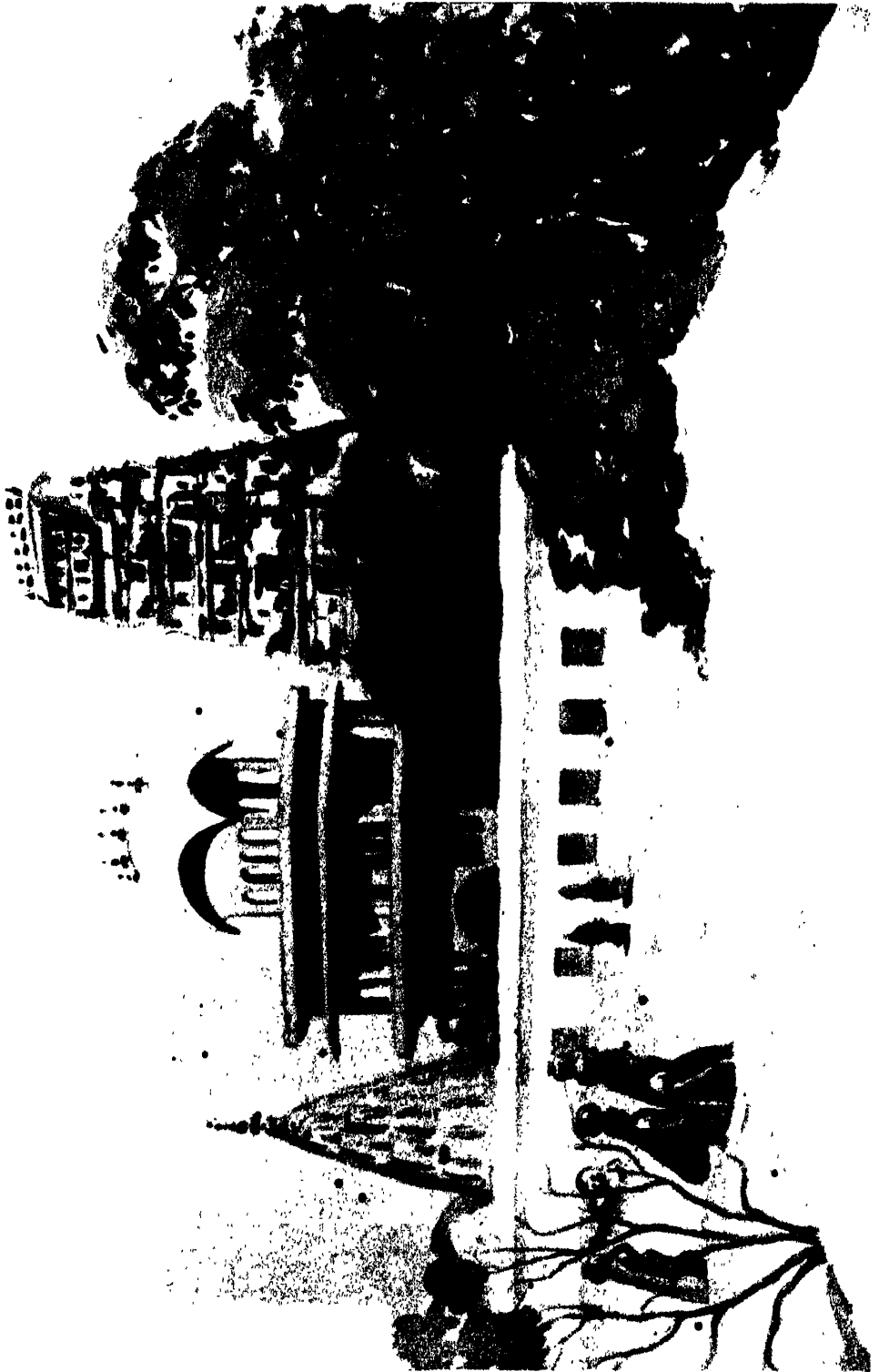
র্মা জ্ঞর্রা র্সনা র্সা]
র্রা জ্ঞর্রা র্সনা র্সা I গা মা পধা ণর্সা | র্সপা র্সা র্সা -া |
দি - লা ম আ - মা র্ আঁ - ধা র্

[গমা পদা মপা -া] [পা না মপা না |
র্রসা ণধা পমা গমা | ণধা পমা জ্ঞরা সনা I } { মা পা পা না |
আ - মা র্ আ - লো - আ - মা র্

া া না র্সা | নর্সা -া পনা র্সর্রা | র্সর্রা -া র্সনা র্সা I
া া না র্সা | র্রা সা র্রা র্মা | র্রমা -জ্ঞর্রা র্সনা র্সা I
দুঃ খ সু - খে র্ ধা - রা -

গা মা পধা ণর্সা | ধর্সা ণধা পমা গমা | পা র্সা নর্রা র্সর্সা |
র্সা না র্রসা নর্সা | র্সধা -া র্সণা ধণা | ণপা ধা ণর্রা র্সর্সা |
তো - মা - রি - আ - ন ন্ দে -

ধর্সা ণণা পধা মপা]
ধর্সা ণধা পমা গমা I } { র্সা নর্সা র্রা -া | া া র্রা র্গা |
হা - রা - আ - মা র্ অ শ্রু

গর্রা -া র্রা র্গা | র্রর্গা র্মর্পা র্পা -া I র্মর্পা র্মা জ্ঞর্মা জ্ঞা |
গরা র্গা র্মা গর্মা | র্মা র্পা র্পা -া I র্মর্পা র্মর্পা র্মজ্ঞা র্রা |
হা - সি র মু - কু ল্ তো - মা র

র্রজ্ঞা র্রা র্সনা সা | র্রর্পা র্মা জ্ঞর্মা জ্ঞর্রা | র্সর্রা নর্সা পদা মপা]
র্রজ্ঞা র্রজ্ঞা র্রসা নর্সা | র্রর্পা র্রর্পা র্মজ্ঞা র্রা | র্রর্পা র্মজ্ঞা র্রসা নর্সা } II II
গ - লা র মা - লা - গাঁ - থে -

গানে রসসৃষ্টি নির্ভর করে অনেকটা সুরের ইন্‌টোনেশনের উপর। ঠিক ইনটোনেশনটি না হ'লে সুরের ঠিক সেই রসটি ফোটে না। স্বরলিপির মুস্কিল এই যে তাতে ইনটোনেশনের কোনও আভাষ দেওয়া যায় না। এ-গানটির সুর লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এতে অনেক জায়গায় সুরের ছোট ছোট 'প্যাটার্ণ' ছন্দে রূপ নিয়েছে। গানটি ছন্দপ্রধান, বেশি ঠাঁয় লয়ে গাইলে এর রস তেমন ফুটবে না। —সুরকার

বেদ ও বৈদিক শাখা

ডক্টর আশুতোষ শাস্ত্রী, এম-এ, পি-এইচ-ডি, পি-আর-এস্, কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

বেদ কাহাকে বলে? মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক বাক্যসমষ্টিই বেদ (মন্ত্রশ্চ ব্রাহ্মণশ্চ বেদঃ। মীঃ শাবরভাষ্য ২।১।৩৩)। ইহা অবশ্য বেদের কর্ম্মকাণ্ড, এতদ্ব্যতীত আরণ্যক ও উপনিষদ্ ভাগ বেদের জ্ঞানকাণ্ড। মন্ত্র বলিতে যাহাতে মন্ত্রসকল সংকলিত হইয়াছে—সেই ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব সংহিতাকে বুঝায়। আর ব্রাহ্মণ শব্দে ঐ সকল সংহিতার ব্যাখ্যা বা সংহিতোক্ত যাগযজ্ঞের বিবরণীকে বুঝায়। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে সংহিতোক্ত মন্ত্রের বিনিয়োগ, যাগযজ্ঞ সম্পাদনের কৌশল, প্রশংসা, নিন্দা, আখ্যায়িকা নিবদ্ধ হইয়াছে। মহর্ষি জৈমিনি তৎকৃত মীমাংসাদর্শনে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা বা লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জৈমিনির মতে যে সকল বাক্যে যাগযজ্ঞের বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহা মন্ত্র, এতদ্ব্যতীত বেদভাগ ব্রাহ্মণ। প্রাচীন মীমাংসা-ভাষ্যকার শবরস্বামী জৈমিনি সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের নির্দ্দোষ (অব্যাপ্তি অতি-ব্যাপ্তি দোষ পরিশূন্য) লক্ষণ নিরূপণ করা যায় না; কেন না, কোন কোন ব্রাহ্মণেও বিধির বোধক মন্ত্র পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে কোন কোন সংহিতোক্ত মন্ত্রেও নিন্দা প্রশংসা ইতিহাস আখ্যায়িকা প্রভৃতি জানা যায়; সুতরাং মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের নির্দ্দোষ সংজ্ঞা নির্দ্দেশের চেষ্টা না করিয়া এইরূপ বলিলেই সঙ্গত হইবে যে, বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ম্মকাণ্ডের যে অংশকে 'মন্ত্র' আখ্যা দিয়াছেন তাহাই মন্ত্র, তদতিরিক্ত বেদভাগ ব্রাহ্মণ।

মন্ত্রভাগের ঋক্ যজুঃ সাম এইরূপে যে বিভাগ করা হইয়াছে তাহার ভিত্তি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন যে—যে সকল মন্ত্র ছন্দে নিবদ্ধ তাহার নাম ঋক্, যাহা গান করা যায় তাহা সাম, যে মন্ত্র গদ্যে লিখিত তাহার নাম যজুঃ। প্রত্যেক বেদেরই কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুইভাগ। কর্ম্মকাণ্ডের ফল স্বর্গ, জ্ঞান-কাণ্ডের ফল অপবর্গ; কর্ম্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য—জীবকে অভ্যুদয়-ভাগী করা, জ্ঞানকাণ্ডের উদ্দেশ্য—জীবকে মুক্তি-পথের সন্ধান দেওয়া। পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণের মতে প্রথমতঃ বেদের মন্ত্রভাগই প্রচলিত ছিল, পরে পৌরোহিত্যপ্রধান কৃত্রিমতার যুগে বেদের ব্রাহ্মণভাগ রচিত হয়; এবং আরও পরে মানবের জ্ঞান যখন ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া উঠিল তখন জ্ঞানকাণ্ড আরণ্যক ও উপনিষদ্ রচিত হইল। এই মতানুসারে বৈদিক সাহিত্যকে চারটী বিভিন্ন যুগপর্য্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) ছন্দোযুগ, (২) মন্ত্রযুগ, (৩) ব্রাহ্মণ যুগ এবং (৪) সূত্রযুগ। ছন্দঃ যুগই বেদের আদিম যুগ। এই যুগে মন্ত্রসমূহ রচিত হয় কিন্তু উহা তখন বিক্ষিপ্ত আকারে বিদ্যমান ছিল; পরে মন্ত্রযুগে ঐ বিক্ষিপ্ত মন্ত্রগুলি সুবিন্যস্ত ও গ্রথিত হইয়া ঋক্ সংহিতা প্রভৃতি সংহিতার আকার ধারণ করে। ব্রাহ্মণ যুগে ব্রাহ্মণ-সমূহ রচিত হয়। ব্রাহ্মণগ্রন্থে বৈদিক যাগযজ্ঞ কি ভাবে সম্পাদন করিতে হয় তাহার বিবরণ জানা যায়। সূত্রযুগে কল্পসূত্র, গৃহ্যসূত্র, শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি সূত্রসকল রচিত হয়। ঐ সকল সূত্রপাঠে বৈদিককালের সামাজিক নৈতিক ও ব্যবহারিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ত গেল বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের কথা। কর্ম্মকাণ্ডের পর জ্ঞানকাণ্ড—বিভিন্ন আরণ্যক ও উপনিষদসমূহ রচিত হইল। এই মত আমাদের দেশের প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণ অনুমোদন করেন না। তাঁহাদের মতে বৈদিক যুগের উষাকালেই কর্ম্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ড, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সহিত আরণ্যক ও উপনিষদ প্রসার লাভ করিয়াছিল। ছন্দোযুগ, সংহিতাযুগ, ব্রাহ্মণযুগ প্রভৃতি যুগবিভাগ কালের মাপকাঠিতে বিচার করিতে ভারতীয় প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণ কোনমতেই রাজী নহেন। বৈদিক সাহিত্যের প্রদর্শিত ক্রমবিকাশ তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, অতি প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ পাঠ করিলেই দেখা যায় যে, ঐ সময়ে কেবল পরিপূর্ণাঙ্গ বৈদিক সাহিত্যই বিদ্যমান ছিল এমন নহে, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি বেদাঙ্গসমূহও পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। বেদবিদ্যার ন্যায়

বেদাঙ্গসমূহও শ্রদ্ধার সহিত অধীত ও আলোচিত হইত। বৈদিক যুগে বেদাঙ্গের এইরূপ প্রসার—জ্ঞানরাজ্যের দিক্‌-চক্রবাল যে তখনও প্রাপ্তবিসারী ছিল তাহাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তমাধ্যায়ে অধ্যাত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু নারদ তাঁহার অধীত বিদ্যার বিবরণ প্রদান করিতে গিয়া সনৎকুমারকে বলিয়াছেন যে, আমি *ঋগ্‌ যজু সাম অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস পুরাণ,* ব্যাকরণ গণিত স্মৃতি, তর্কশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র নিরুক্ত ছন্দঃ জ্যোতিষ ধনুর্বেদ গারুড়বিদ্যা উৎপাতবিজ্ঞান, নিধিবিজ্ঞান নৃত্যগীত-বাদ্য প্রভৃতি চারুকলা সমস্তই অধ্যয়ন করিয়াছি।(১) নারদের প্রদত্ত বিবরণ পড়িয়া প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ লক্ষ্য করিয়াছেন কি? ছান্দোগ্য উপনিষদের যুগে বিদ্যাবনস্পতি বিভিন্ন শাখায় কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল? বৃহদারণ্যক উপনিষদে শতপথ, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কৌশিতকী প্রভৃতি ব্রাহ্মণগ্রন্থেও ঐরূপ পরিপূর্ণাঙ্গ বিবিধশাস্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সকল উপনিষদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ অতি প্রাচীন বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। অতিপ্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত ঐ সকল উপনিষদ্‌ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থেই যদি বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিপূর্ণ রূপের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে বৈদিকযুগের উষায় কেবল মন্ত্রসমূহই রচিত হইয়াছিল, অন্য কোন জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশ ছিল না—এইরূপ কল্পনা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নহে। এইজন্য আমাদের দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ কালের মাপকাঠী দিয়া বৈদিকযুগ-বিভাগ সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই অনন্তজ্ঞানরত্নাকর বেদকে মন্ত্র-সংহিতা ব্রাহ্মণ, আরণ্যক উপনিষৎ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিভাগ করা হইয়াছে।

বেদ তিন কি চার? ইহা লইয়াও নানা বিতর্ক শুনিতে পাওয়া যায়। "বেদাস্ত্রয়ী" বলিয়া যেমন একটী কথা আছে, সেইরূপ বেদাশ্চত্বার এইরূপও বহু শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের মতে ঋক্‌ যজুঃ সাম অথর্ব্ব এই চার বেদ। কেহ কেহ আবার "বেদাস্ত্রয়ী" এই মতই অনুমোদন করেন। ইঁহাদের মতে ঋক্‌ যজুঃ ও সাম এই তিনই মূল বেদ, অথর্ব্ববেদ ঋক্‌ যজুঃ সামবেদের ন্যায় তুল্যমর্য্যাদায় বেদ নহে; কেন না, অথর্ব্ববেদের যজ্ঞে কোন উপযোগিতা দেখা যায় না। ঋক্‌ যজুঃ ও সাম এই তিন বেদেরই যজ্ঞে উপযোগিতা অধিক; *সুতরাং ঐ তিনই প্রকৃত বেদ,* অথর্ব্ববেদ উহাদের তুল্যপর্য্যায়ে বেদ নহে। অথর্ব্ববেদকে পরবর্ত্তীকালে 'ত্রয়ী'র সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া বেদকে তিন স্থলে চার করা হইয়াছে। এই মতের সমর্থকেরা আরও বলেন যে, বিভিন্ন ব্রাহ্মণ ও উপনিষদগ্রন্থেও ঋক্‌ যজুঃ ও সাম এই তিনকেই বেদ বলা হইয়াছে, অথর্ব্ববেদের নামোল্লেখ করা হয় নাই। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের অন্তিম প্রপাঠকে সূর্য্যের যে উদয়াস্তের বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে ঋক্‌ যজুঃ ও সাম এই তিন বেদের কথা উল্লেখ থাকায় "বেদাস্ত্রয়ী" এই মতই সমর্থিত হইতেছে। শতপথব্রাহ্মণে দেখা যায় যে, সৃষ্টির উষায় প্রজাপতি যখন দ্যুলোক ভূলোক ও অন্তরীক্ষলোকের সৃষ্টি করিলেন তখন ক্রমে পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরীক্ষ হইতে বায়ু এবং দ্যুলোক হইতে সূর্য্য উৎপন্ন হইল এবং অগ্নি হইতে ঋক্‌বেদ, বায়ু হইতে যজুর্বেদ ও সূর্য্য হইতে সামবেদ উদ্ভূত হইল। শতপথব্রাহ্মণের এই বিবরণ হইতে ঋক্‌ যজুঃ ও সাম এই তিনই বেদ, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। নারায়ণোপনিষদেও তিন বেদের কথাই বলা হইয়াছে। মনুসংহিতায় শ্রাদ্ধে যে বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবার কথা বলা হইয়াছে সেখানে বেদবিৎ বলিতে ঋক্‌, যজু ও সামবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদবিৎ ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করা হয় নাই, বরং তাঁহাকে বর্জ্জনের কথাই বলা হইয়াছে। ইহা হইতেও "বেদাস্ত্রয়ী" এই মতই দৃঢ় হয়। ভারতের প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণ ঐ মত অনুমোদন করেন না। তাঁহাদের মতে ঋক্‌ যজুঃ সামের ন্যায় অথর্ব্ববেদও তুল্যমর্য্যাদায়ই বেদ। চতুর্ব্বেদই শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে সমান শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছে। ঋক্‌ যজুঃ ও সামবেদের মধ্যেও অথর্ব্ববেদের বহু মন্ত্র পাওয়া যায়। ঋক্‌বেদের সুপ্রসিদ্ধ পুরুষসূক্তে ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি বলিয়া যজ্ঞপুরুষের শরীর হইতে ঋক্‌ সাম যজুর সহিত ছন্দের যে উৎপত্তির কথা বিবৃত করা হইয়াছে, ঐ ছন্দসমূহই সংগৃহীত

(১) ঋগ্‌বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যং মেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাং ভগবোঽধ্যেমি। ছান্দোগ্য, ৭।১।২।

ও সঙ্কলিত হইয়া অথর্ব্ব সংহিতায় পরিণত হইয়াছে। এই ছন্দঃ অনুষ্টুভ্ ত্রিষ্টুভ্ প্রভৃতি ছন্দঃ নহে। শতপথব্রাহ্মণে 'সোঽয়মাথর্ব্বণো বেদঃ' বলিয়া অথর্ব্ব বেদেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রতিদিন অথর্ব্ব বেদ অধ্যয়ন (স্বাধ্যায়) করার কথা এবং তাহা দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি বিধান করার কথাও শতপথব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়। (১) তৈত্তিরীয়, প্রশ্ন, মুণ্ডক প্রভৃতি বিভিন্ন উপনিষদে এবং সুপ্রসিদ্ধ বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদেও অথর্ব্ব বেদের একাধিকবার উল্লেখ করা হইয়াছে। (২) বিষ্ণুপুরাণে বেদ-সঙ্কলের যে ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে অন্য বেদত্রয়ের ন্যায় অথর্ব্ববেদেরও সঙ্কলের কথা বলা হইয়াছে। চতুর্দ্দশ বিদ্যার যে পরিগণনা আছে তাহাতে 'বেদাশ্চত্বারঃ' বলিয়া স্পষ্টতঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। ঋষি শাতাতপ তৎকৃতসংহিতায় ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চার বেদ অধ্যয়নকারীকেই তুল্যরূপে বেদজ্ঞের সম্মান প্রদান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রকার পরিষৎ-গঠনপ্রসঙ্গে যেখানে বেদবিৎ পণ্ডিত সমাবেশের কথা বলিয়াছেন সেখানে কোথায়ও 'চতুর্ণাং বেদানাং পারগাঃ' কোথায়ও-বা 'ঋগ্ যজুঃ সামাথর্ব্ববিদঃ' এইরূপে চতুর্ব্বেদেরই উল্লেখ করিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রে প্রসঙ্গান্তরেও চতুর্ব্বেদের' ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের মতে অথর্ব্ববেদও যে অন্যতম বেদ এবং ঋক্ যজুঃ সামবেদের ন্যায়ই শ্রদ্ধেয়, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মীমাংসা ভাষ্যকার শবরস্বামী বেদাধিকরণে (মীঃ ১।১।২৭ সূত্র) ও সর্ব্বশাখাধিকরণে (মীঃ ২।৪।৮) বেদ ও তাহার শাখার বিবরণ প্রদান করিতে গিয়া বেদত্রয়ের ন্যায় অথর্ব্ববেদেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঋক যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয় যেমন অনাদি ও স্বতঃপ্রমাণ, অথর্ব্ববেদও সেইরূপ অনাদি ও স্বতঃপ্রমাণ। ন্যায় ও বৈশেষিক আচার্য্যগণের মতেও ঋক্ যজুঃ ও সামবেদের ন্যায় অথর্ব্ব-বেদও পরমেশ্বরের নিত্যপ্রজ্ঞারই বিকাশ, সুতরাং অন্য বেদত্রয়কে বেদ বলিয়া গ্রহণ করিলে অথর্ব্ববেদকে বেদ বলিয়া গ্রহণ না করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। ত্রয়ীর অন্তর্গত নহে বলিয়া অথর্ব্ববেদ বেদ নহে, এইরূপ যুক্তির কোন সারবত্তা নাই। ত্রয়ী বলিলে কি বুঝা যায়? যজ্ঞাদি কার্য্যে যে সকল বেদের প্রয়োগ আছে সেই বেদসমূহকেই যদি ত্রয়ী শব্দে গ্রহণ করা যায়, তবে অথর্ব্ববেদই-বা বাদ পড়িবে কেন? অথর্ব্ববেদের যজ্ঞাদি কর্ম্মে কোন উপযোগিতা নাই এমন কথা বলা যায় না। ইষ্টিযাগ, পশুযাগ, একাহীনযাগ প্রভৃতির বিবরণ অথর্ব্ববেদ হইতেই জানিতে পারা যায়। সোমযাগ প্রভৃতিতেও অথর্ব্ববেদের কোন উপযোগিতা নাই এমন কথা বলা যায় না, কারণ ঐ সকল যজ্ঞে অথর্ব্ববেদবিৎ ব্রহ্মা নিযুক্ত করার কথা ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়। গোপথ ব্রাহ্মণে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে যে প্রজাপতি সোমযাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বেদ-পুরুষগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদিগের মধ্যে কাহাকে কোন্ কর্ম্মে বরণ করিব? তাঁহারা উত্তর করিলেন, ঋগ্বেদবিৎকে হোতার পদে, যজুর্ব্বেদবিৎকে অধ্বর্য্যুর পদে, সামবেদবিৎকে উদ্গাতার পদে ও অথর্ব্ব বেদবিৎকে ব্রহ্মার পদে বরণ করুন। ব্রহ্মা ত্রিবেদজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। অথর্ব্ববেদ ঋগ্ যজুঃ ও সাম এই তিন বেদের মিলনভূমি। অতএব যিনি অথর্ব্ববেদ জানেন, তিনি তিন বেদই জানেন। এইজন্যই অথর্ব্ববেদবিৎই যজ্ঞে ব্রহ্মা হইবার উপযুক্ত পাত্র। অথর্ব্ববেদের অপর নাম ব্রহ্মবেদ। যজ্ঞে যাহা কিছু ন্যূনতা পরিলক্ষিত হইবে তাহা ব্রহ্মবেদের প্রভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। অথর্ব্ববেদ ঋক্ যজুঃ ও সাম এই তিন বেদের সমাহারেই গঠিত, সুতরাং 'ত্রয়ী' বলিলে অথর্ব্ববেদ একেবারেই বাদ পড়িয়া যায় এমন কথা বলা যায় না, কারণ 'ত্রয়ী' শব্দে তিন বেদের সমাহারকেই বুঝায়। এই সমাহার সমাহ্রিয়মান বেদত্রয় হইতে অতিরিক্ত না হইলেও সমাহার বা মিলনের ফলে যে সমুদয়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে তাহাকে বুঝাইবার জন্য একটী স্বতন্ত্র নাম দেওয়াই সঙ্গত। অথর্ব্ববেদ সেই বেদ সমুদায়। এইরূপে মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট ন্যায়মঞ্জরীতে অথর্ব্ববেদকে "ত্রয়ী"র অন্তর্ভুক্ত করিয়াও এক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টের মতে বেদের মধ্যে অথর্ব্ববেদ বা ব্রহ্মবেদই মূল বেদ—মূলং বৈ ব্রহ্মণো বেদাঃ। এই মূল বেদ হইতেই প্রণবের

(১) শতপথ ব্রাহ্মণ ১১।৩।৮

(২) তৈত্তিরীয় ২।৩।১, প্রশ্ন ২।৮, মুণ্ডক ১।১।৫, বৃহদাঃ ২।৪।১০, ৪।১।২, ৪।৫।১১, ছান্দোগ্য ৩।৪।১, ৭।১।২,

অভিব্যক্তি হইয়াছে। অথর্ব্ববেদ-বিধি অনুসারে উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইলে সেই মানবক সমস্ত বেদ পাঠেই অধিকারী হইয়া থাকে; কিন্তু যিনি অন্য বেদোক্ত বিধি অনুসারে উপনীত হন, তিনি অথর্ব্ববেদ পাঠের অধিকারী নহেন। জয়ন্ত ভট্টের এই সকল যুক্তি পর্য্যালোচনা করিলে অথর্ব্ববেদ যে অন্যতম প্রধান বেদ ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া থাকে। মন্বাদি শাস্ত্রে শ্রাদ্ধে ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভোজনের বিধান থাকায় অথর্ব্ববেদ অধ্যয়নকারীর শ্রাদ্ধে ভোজনের কথা বুঝায় না, এই যুক্তি কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নহে। শাস্ত্রে অথর্ব্ববেদবিৎকে পংক্তিপাবণ ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। পংক্তিপাবণ শব্দের অর্থ এই যে, ঐ ব্রাহ্মণ যে পংক্তিতে ভোজন করেন, সেই পংক্তিই পবিত্র হইয়া যায়। এইরূপ পংক্তিপাবণ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজনের অনধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা কোনমতেই ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম হইতে পারে না। ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্ব্বেদের কথা বহুস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে ঋক্ যজুঃ ও সামবেদের ন্যায় অথর্ব্ববেদও তুল্য-পর্য্যায়ে বেদ-মর্য্যাদার অধিকারী। ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই চার বেদই শ্রীহরির চতুর্ভুজের ন্যায় সমকক্ষ। এই চতুষ্কল্প বেদই অনন্ত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সুবিশাল বেদ-কাননের সৃষ্টি করিয়াছে।

চতুর্ব্বেদ—ইহা সাব্যস্ত হইল। অনন্ত শাখাবিসারী এই বেদ-চতুষ্টয় কি ভাবে আমাদের মধ্যে প্রসার লাভ করিল সেই ইতিহাস আমরা এখানে আলোচনা করিব। বেদ পরমেশ্বরের বাণী। পরমেশ্বর হইতে বেদের উৎপত্তির কথা বৈদিক সংহিতা, উপনিষৎ ও পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে শুনিতে পাওয়া যায়। ঋক্‌বেদের পুরুষ-সূক্তে সেই সহস্র-শীর্ষ যজ্ঞময় বেদ-পুরুষ হইতেই ঋক্-বেদাদি সংহিতার উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় যে পরমেশ্বর ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে সমস্ত বেদবিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। মুণ্ডক উপনিষদের প্রারম্ভেও ব্রহ্মা হইতেই বেদের উৎপত্তি ও বৈদিক সম্প্রদায়ের বিস্তৃতির ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। আদিদেব ব্রহ্মা সর্ব্ববিদ্যার সার সেই ব্রহ্মবিদ্যা নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বাকে প্রদান করেন। অথর্ব্বা উহা অঙ্গিরাকে দেন, অঙ্গিরা ভরদ্বাজকে, ভরদ্বাজ সত্যবাহকে এবং সত্যবাহ অঙ্গিরকে উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেন। ছান্দোগ্যে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা প্রজাপতিকে, প্রজাপতি মনুকে এবং মনু মানবগণকে বেদবিদ্যা দান করেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বয়ম্ভু ভগবানের নিকট হইতে ব্রহ্মা প্রথমতঃ বেদবিদ্যা লাভ করিয়া উহা প্রজাপতিকে প্রদান করেন। প্রজাপতি সনগ প্রভৃতি ঋষিগণকে উক্ত বিদ্যার উপদেশ দেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রারম্ভেও ব্যাসদেব উপনিষদের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন যে, সত্যস্বরূপ ভগবানই আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সুধীগণেরও দুর্বোধ্য বেদবিদ্যা সঞ্চারিত করেন। আচার্য্য শঙ্কর তদীয় শারীরক মীমাংসাভাষ্যে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বকল্পে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এইরূপ মহর্ষিগণের মধ্যে যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও প্রারব্ধভোগ সমাপ্ত না হওয়ায় বিদেহ মুক্তি লাভ করেন নাই তাঁহারাই পরকল্পে সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক বেদ প্রচারে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। পরমেশ্বরই বেদের আদিকর্ত্তা ও আদি-বক্তা। এইজন্যই বাৎস্যায়ন প্রভৃতি দার্শনিক আচার্য্যগণ বেদকে আপ্তবাক্য বা ঋষিবাক্য বলিয়াও আপ্ত মহর্ষিগণকে বেদের আদিকর্ত্তা বলেন নাই। পরমেশ্বরই আদিগুরু। পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত কাহারই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবার অধিকার নাই। মহর্ষি পাতঞ্জলি যোগদর্শনে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কালাতীত পরমেশ্বরই ব্রহ্মাদি দেব-গণেরও গুরু (স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ পাতঃ সূত্র)। সেই পরমগুরু পরমেশ্বরই ব্রহ্মাদি দেব-গণের মানসমন্দিরে বৈদিক জ্ঞানের আলোকবর্ত্তিকা প্রজ্বালিত করিয়াছেন। গীতায় শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ (গীতা ১৫।১৫)। পরমগুরু পরমেশ্বর কর্ত্তৃক মহর্ষিগণের হৃদয়-ক্ষেত্রে উক্ত বেদজ্ঞানবীজ কি ভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়া সহস্রশাখা-বিসারী বেদ-বনস্পতিতে পরিণত হইল ইহা জানিবার কুতূহল হওয়া বুদ্ধিমান্ মানুষমাত্রেরই স্বাভাবিক।—ইহার উত্তর আমরা পুরাণকারের মুখেই শুনিতে পাই। পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে—বেদবিদ্যার উপদেশ দিবার জন্যই ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ হইয়াছিলেন—

বেদ প্রক্লোচনার্থায় স্রষ্টা জাত চতুর্মুখঃ।

ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে তাঁহার মানস পুত্রগণকে সমস্ত বেদবিদ্যার

উপদেশ দিয়াছিলেন। ব্রহ্মার মানস পুত্রগণই প্রথমে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বেদ প্রচার করেন; পরে মহাবিষ্ণুর আদেশে কলি ও দ্বাপরের সন্ধিতে অপান্তরতমা নামক বেদাচার্য্য মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বিক্ষিপ্ত গদ্য-পদ্যাত্মক বেদমন্ত্রগুলিকে সংহত করিয়া ঋক্, যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই চার বেদ-সংহিতা সঙ্কলন করেন এবং পৌল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত নামক তাঁহার শিষ্য-চতুষ্টয়কে যথাক্রমে ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব-সংহিতা প্রদান করেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদের কর্ত্তা নহেন, তিনি সঙ্কলয়িতা মাত্র। এই বেদসঙ্কলন করার জন্যই তিনি বেদব্যাস এই সার্থক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে বেদব্যাসের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সুবিশাল বেদ-কাননের সৃষ্টি করেন। বিষ্ণুপুরাণের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, পৌলের দুই জন শিষ্য ছিল, তাঁহাদের নাম বাষ্কল ও ইন্দ্রমতি। বাষ্কলের যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, বৌধ্য, অগ্নিমাঠর, কালায়নি, গর্গ ও কথাজব নামে সাতজন শিষ্য ছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকে ঋগ্ বেদের এক এক শাখা অধ্যয়ন ও প্রবর্ত্তন করেন। এইরূপে বাষ্কল হইতে ঋগ্ বেদের সাতটী শাখার উৎপত্তি হয়। এই বাষ্কল-শাখার ঋগ্ বেদ-সংহিতা এখনও খণ্ডিত আকারে বিদ্যমান আছে। ইন্দ্রমতি প্রথমতঃ নিজ পুত্র মার্কণ্ডেয়কে বেদবিদ্যার কিয়ৎ অংশ দান করেন, পরে তাহার অপর দুইজন শিষ্য বেদমিত্র ও শাকপূর্ণিকে ঋগ্ বেদ-সংহিতা অধ্যাপন করেন। শাকপূর্ণির ক্রৌঞ্চ, বৈতালিক, ও বলাক নামে তিন জন শিষ্য হয়, আর বেদমিত্রের শিষ্য ছিলেন পাঁচ জন—মুদ্‌গল, গালব, বাৎস্য, শালীয় ও শিশির। ইঁহারা প্রত্যেকে ঋগ্ বেদের এক এক শাখা প্রবর্ত্তন করেন। যে ঋগ্ বেদ-সংহিতা মুদ্রিত আকারে আমরা এখন পাইতেছি তাহা শৈশিরীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।—বৈশম্পায়ন যে যজুর্ব্বেদ গ্রহণ করেন তাহা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ বা তৈত্তিরীয়-সংহিতা নামে পরিচিত। তৈত্তিরীয়-সংহিতা সাতাইশটী শাখায় বিভক্ত ছিল বলিয়া বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ঐ সকল শাখা-প্রবর্ত্তক ঋষিগণের নামের বিষ্ণুপুরাণে কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈশম্পায়নের প্রধান শিষ্য ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্য। যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তাঁহার গুরু বৈশম্পায়নের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় যাজ্ঞবল্ক্য নূতন যজুর্ব্বেদ সংকলন করেন। তাহার নাম বাজসনেয়ী সংহিতা বা শুক্ল যজুর্ব্বেদ। উক্ত শুক্ল যজুর্ব্বেদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন প্রভৃতি পনরটী বিভিন্ন শাখা ছিল, তন্মধ্যে বর্ত্তমানে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন এই দুই শাখাই প্রচলিত আছে।

সামবিদ্ জৈমিনির সুমন্ত ও সুকর্ম্মা নামে দুই জন শিষ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সুকর্ম্মারও দুই জন শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদের নাম হিরণ্যনাভ ও পৌষ্পিঞ্জি। হিরণ্য-নাভের শিষ্য কৃতি। কৃতি ভিন্ন হিরণ্যনাভের আরও ত্রিশ জন শিষ্য ছিলেন, তন্মধ্যে পনর জন প্রাচ্য সামবিৎ ও পনর জন উদীচ্য সামবিৎ। ইঁহারা প্রত্যেকে সামবেদের এক একটী শাখা প্রবর্ত্তন করেন। পৌষ্পিঞ্জির লোকাক্ষি, কুথুমী, কুশীদী ও লাঙ্গলি নামে চার জন শিষ্য ছিলেন। তাঁহারাও বিভিন্ন চারটী সামশাখা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কালের করালগ্রাসে ঐ সকল বিভিন্ন সামশাখা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কেবলমাত্র কৌথুম শাখা গুজরাটে, জৈমিনীয় শাখা কর্ণাটে এবং রাণায়ণীয় শাখা মহারাষ্ট্র দেশে আজও প্রচলিত আছে। অথর্ব্ববেদাধ্যায়ী সুমন্তর কবন্ধ নামে এক শিষ্য ছিলেন। কবন্ধের দুইজন শিষ্য হয়—দেবদর্শ ও পথ্য। পথ্যের জাজলি, কুমুদাদি ও শৌনক নামে তিন জন শিষ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। উঁহারা প্রত্যেকে অথর্ব্ববেদের এক এক শাখা প্রচার করেন। দেবদর্শেরও চারজন শিষ্য ছিলেন। পিপ্পলাদ তাঁহাদের অন্যতম। পিপ্পলাদের প্রবর্ত্তিত অথর্ব্ববেদের শাখা এখনও কাশ্মীর প্রদেশে রক্ষিত আছে বলিয়া শুনা যায়। অথর্ব্ব বেদের যে শাখা এখন প্রচলিত আছে তাহা পথ্যের অন্যতম শিষ্য শৌনকের প্রবর্ত্তিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

বিষ্ণুপুরাণের উক্তিকে ভিত্তি করিয়া আমরা বেদশাখার যৎসামান্য পরিচয় দিতে চেষ্টা করিলাম। বেদ সহস্রমূর্ত্তি বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। বেদের শাখাভেদই বেদের মূর্ত্তিভেদের কারণ। উদ্দাম কালস্রোতে অসংখ্য বেদশাখা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। বেদবনস্পতি আজ কাণ্ডমাত্র-সার হইয়া কালের বক্ষে সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান আছে। কবে ইহাতে পুনরায় নব শাখার উদ্‌গম হইবে, তত্ত্বফল ও জ্ঞানকুসুমে বেদবিটপি ভারতবাসীর মানসলোক উজ্জ্বল করিবে তাহা একমাত্র সর্ব্বান্তর্যামী বেদপুরুষই বলিতে পারেন।

বান-প্রস্থ

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ

যোগমায়া ঠাকুরুণের ঘুম প্রত্যহ শেষ রাত্রিতে ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু রোদ না ওঠা পর্য্যন্ত বিছানা ছাড়িয়া ওঠেন না। বড় ছেলের মেয়ে হাসি তাঁহার কাছে শোয়। নিজের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে হাসিকে ডাকিয়া তোলেন। হাসির ঘুম গাঢ়, তাই সহজে তাহার ঘুম ভাঙ্গে না; শুধু গল্প শুনিবার লোভে চোখের অতৃপ্ত ঘুম তাড়াইয়া সে ঠাকুমার কাছে ঘেঁসিয়া আসে।

বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প আরম্ভ হয়, কিন্তু মধ্যপথে রূপকথা ছাড়িয়া যোগমায়া নিজের জীবনের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করেন। হাসির কাছে তাহা কম চিত্তাকর্ষক নয়। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধা ঠাকুমা হাসির চোখে একান্ত রহস্যের বস্তু। তাঁহার ললাটের কুঞ্চিত রেখায় রেখায় কত সুখ ও দুঃখের, আনন্দ এবং বেদনার ইতিহাস আত্মগোপন করিয়া রাখিয়াছে; সেই কাহিনীগুলি জানিয়া লইতে হাসির বাসনা জাগে। বহুবার শোনা ঘটনাগুলিও তাই সে আগ্রহের সহিত শোনে।

যোগমায়া বুঝিতে পারেন জীবন-গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় তিনি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, ভবিষ্যতের কোন স্বপ্নই আর অবশিষ্ট নাই। বৃদ্ধ বয়সে স্থবির দিনগুলির একমাত্র সম্বল—কল্পনায় সত্তর বৎসরের দীর্ঘ পথটা বাহিয়া অতীতের দিকে ফিরিয়া যাওয়া। হাসি হয়ত কখনও কখনও ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু তাহাতে কিছু যায় আসে না। হাসি তো শুধু উপলক্ষ! বিগত দিনের কথা একবার আরম্ভ করিলে তিনি থামিতে পারেন না। কথা বলিতে পারিলেই তাঁহার তৃপ্তি!

যোগমায়া যখন গৃহিণী ছিলেন তখন তাঁহাকে দুই ঘণ্টা রাত্রি থাকিতে প্রত্যহ বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে হইত। একা তাঁহার উপরে কত কাজ! ধান আসিত ক্ষেত হইতে; সেই ধান শুকাইয়া গোলাজাত করা; ধান ভানা, আবার দুইবেলা রান্না করিয়া স্বামী এবং মাঠের মজুরদের খাওয়ানো। সারাদিনে একমুহূর্ত্তের অবসর মিলিত না।

তারপর হঠাৎ একদিন হাসির ঠাকুর্দ্দা মারা গেলেন; হাসির বাবা আর কাকা তো তখন নিতান্ত শিশু। সম্পত্তি যাহা ছিল জ্ঞাতির দল তাহার অধিকাংশ ঠকাইয়া লইল। অবশেষে নিরুপায় হইয়া চিরাভ্যস্ত আবক্ষ ঘোম্‌টা খুলিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে জীবন-যুদ্ধে নামিতে হইল—তাঁহার ছেলেদের মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরিয়া সহায়হীন নিরুপায় নারীর দারিদ্র্যের সঙ্গে সে কি কঠোর সংগ্রাম! ছেলেরা যখন উপার্জ্জনক্ষম হইল তখন যোগমায়া বৃদ্ধত্বের কোঠায় পা দিয়াছেন।

কেমন করিয়া ঠাকুমা তাঁহার ছেলেদের মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন সেই কাহিনী শুনিয়া হাসি মুগ্ধ হইয়া যায়। হাসির মনে হয়, তাহার ঠাকুমার মধ্যে এমন একটা শক্তি ছিল যাহা তাহার মায়ের মধ্যে নাই এবং অন্য মেয়েদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু যোগমায়া যে ক্রমশই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন সে কথা তিনি নিজেই বুঝিতে পারেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও ছেলের বৌদের সঙ্গে তিনি সংসার পরিচালনের তুচ্ছ বিষয় লইয়াও কলহ করিতেন। রাত্রির অন্ধকার থাকিতে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; বৌরা তখনও ওঠে না। তিনি ডাকিয়া তুলিতে যাইতেন; বলিতেন, ওঠো, সূর্য্যি না উঠ্‌তে রাতের এঁটো বাসনগুলো ধুয়ে রাখো—অর্দ্ধেক কাজ এগিয়ে যাবে। তা ছাড়া রোদ দেখা না দিতে উঠানে গোবর জলের ছড়া দাও, নইলে গৃহস্থের অমঙ্গল হবে।

প্রথম প্রথম অনিচ্ছাসত্বেও বৌরা শাশুড়ীর ডাকে উঠিয়া আসিত। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; বাড়ীতে ঝি আছে, চাকর আছে—এসব কাজ করিবে তাহারা। যোগমায়া জানেন এখন কাজ করিবার জন্য দাস-দাসী রাখা হইয়াছে। কিন্তু নিজের বধূজীবনটা তিনি যে ভাবে অতিবাহিত করিয়াছেন, ছেলের বৌদেরও তিনি সেই আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চান। তাঁহার নিজের জীবন যে পথে চলিয়াছে, তাহা ছাড়া ভিন্ন পথ যে থাকিতে

পারে ইহা তাঁহার ধারণাতীত। পৃথিবীর বয়স পঞ্চাশ বৎসর আগাইয়া গিয়াছে, এ খবর তাঁহার কাছে আসিয়া পৌঁছে নাই। সেদিনের গৃহিণী-জীবনের আদর্শ আজকার সংসার বাতিল করিয়া দিয়াছে, তথাপি যোগমায়া পুত্রবধূদের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার বধূরূপে দেখিতে চান। এই জন্যই অসন্তোষের সৃষ্টি হইত। ছেলেরা মায়ের ব্যবহারে বিরক্তি বোধ করে, অথচ প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারে না। পাড়ার লোকে যোগমায়াকে নিন্দা করে; বয়স হইয়াছে, বউদের হাতে সংসারের ভার দিয়া এখন পূজা-আর্চ্চায় মন দেওয়া উচিত, তা নয় কেবল খচ্-খচি!

বৌরা ওঠে না; যোগমায়া বিলীয়মান অন্ধকারে বাড়ীর সর্ব্বত্র গোবরজলের ছড়া দিতে দিতে আপন মনে বকিতেন। গোবরজলের গন্ধ না পাইলে নিশাচর জীবগুলি বাড়ীর সীমানা ত্যাগ করিবে না। কিন্তু তাঁহার কেন এত মাথা ব্যথা? যাহাদের সংসার তাহাদের যদি দরদ না থাকে তবে তাহা রসাতলে যাক্।

কিন্তু নিজের চোখের উপর সংসারের জিনিসগুলি অযত্নে নষ্ট হইবে ইহা তিনি চুপ করিয়া সহ্য করিতে পারেন না। কাঁঠালের পিঁড়িটা রৌদ্রে চৌচির হইয়া ফাটিয়া যাইতেছে, ইহা নীরবে দেখা যায় না। ঘরের লোক সবাই চোখের মাথা খাইয়া বসিয়াছে নাকি?

ছোট-বৌর হাত হইতে পড়িয়া তেঁতুল রাখিবার তৈলসিক্ত কালো কুচ্-কুচে হাঁড়িটা সেদিন ভাঙ্গিয়া গেল। যোগমায়া হাঁড়ির শোকে পাড়াটা মাথায় করিয়া তুলিলেন। যাহাকে সম্মুখে পাইলেন তাহাকেই হাঁড়ির ইতিহাসটা শুনাইয়া দিলেন। সেই কবে বহুদিন পূর্ব্বে একবার তাঁহার লাঙ্গলবন্ধের স্নানে যাইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। নগদ দশ পয়সা মূল্যে এইটি সেখানকার মেলা হইতে কিনিয়াছিলেন। এই ধরণের হাঁড়ি এখন আর মেলে না। আর পাইলেই বা কি? অনেকদিন ধরিয়া তেল মাখিয়া মাখিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া হাঁড়িটিকে এমন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন যে, পাঁচ বছর যাবৎ তেঁতুল মজুত করিয়া রাখিলেও একটি পোকা পড়িবে না। এখনকার বৌদের কি এসব সংসারী বুদ্ধি আছে?

বৌরা রাগ করিয়া বলে এগুলি মনের নীচতা। কিন্তু যোগমায়ার সম্পূর্ণ ইতিহাস তাহারা জানে না। নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও যোগমায়া সংসারের একটি জিনিষ হাতছাড়া করেন নাই, বরং যখনই পারিয়াছেন বাসনপত্র কিনিয়া সংখ্যা বাড়াইয়াছেন। একদিন ছেলেদের সংসার সাজাইতে হইবে, সেই আশায় তিনি তৈজসপত্র ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন। প্রত্যেকটি থালা, বাটি, ঘটি, গ্লাশের ইতিহাস তাঁহার নখ-দর্পণে। পরিবারের একটি লোক অপেক্ষা এগুলি বোধ হয় তাঁহার কাছে কম আদরের বস্তু নয়।

কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ যোগমায়া সংসার হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। দেহের শক্তি কমিয়া গিয়াছে, সর্ব্বশরীরে কেমন একটা জড়ত্বের ভাব। একবার যেখানে বসেন, বিশেষ প্রয়োজন না হইলে সেখান হইতে ওঠেন না। একটা অদ্ভুত তন্দ্রালুতা তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। কলহ করিবার, প্রতিবাদ করিবার, নিজের মতটাকে জোর করিয়া খাটাইয়া লইবার আগ্রহ আর নাই।

যোগমায়ার থাকিবার ঘরখানি ছেলেদের ঘর হইতে একটু দূরে। ভোর হইলেই ছোট ছোট নাতি-নাত্নীগুলি তাঁহার ঘরে আসিয়া আশ্রয় লয়, এটা তাহাদের খেলিবার ঘর। সারাদিনে ইহারাই তাঁহার প্রধান সঙ্গী। হাসি আসিয়া স্নান করাইয়া দেয়, ভাত খাওয়ায়। বৌরা দু-একবার আসে, কিন্তু বসে না বেশীক্ষণ, কাজের ছুতা করিয়া উঠিয়া যায়। প্রতিবেশিনীরা কেহ আসিলে যোগমায়া তাহাদের বসাইয়া রাখিয়া কথা বলিতে চান। কিন্তু এই বৃদ্ধার বাক্যস্রোত তাহাদের ভালো লাগে না, তাহারা উঠিয়া পালায়।

ছেলেরা পূর্ব্বে কাজ হইতে ফিরিয়াই মায়ের কাছে আসিত। সংসার সম্বন্ধে নানা আলোচনা চলিত। এখন তাহারা শুধু একবার আসিয়া মা কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিয়া যায়।

যোগমায়া দ্বিতীয়বার শিশুত্ব লাভ করিয়াছেন। সংসারের দায়িত্ব এখন আর নাই; শিশুর মতোই ভাবনা-চিন্তাহীন এখন তাঁহার জীবন। তাই ছোট ছোট নাতি-নাত্নীগুলির সঙ্গে তাঁহার মেলে ভাল।

কখনো কখনো যোগমায়া তাঁহার প্রসারিত জীর্ণ শয্যায় ছোট নাতিটিকে শোয়াইয়া মৃদুস্বরে গুঞ্জন করিতে থাকেন—"ঘুম পাড়ানি মাসীপিসি"। ক্রমে গুঞ্জন থামিয়া

যায়, যোগমায়ার মাথা নুইয়া পড়ে; তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। না, ঘুম ইহা নয়; কাহারও সামান্য একটু পদশব্দ হইলেই তিনি সোজা হইয়া বসিবেন। ইহা স্বপ্ন। চোখ বুজিলে বর্ত্তমানের এই সংসার লুপ্ত হইয়া অতীতের ছবিটা স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়া ওঠে, তাই তিনি ঘুমের ভান করেন। প্রথম বয়সে তিনি কি অসম্ভব ঘুম-কাতুরে ছিলেন! একবার ঘরে চোর প্রবেশ করিয়া তাঁহার হাত হইতে হাঙ্গর-মুখো বালা খুলিয়া লইয়া গেল, তিনি বিন্দুমাত্র টের পান নাই। বড় ছেলে প্রসন্ন কোলে আসিবার পর হইতে তাঁহার ঘুম চলিয়া গেল। ছেলে পাশ ফিরিলে তিনি টের পাইতেন; শঙ্কিতচিত্তে তাড়াতাড়ি তাহাকে জড়াইয়া ধরিতেন, পাছে খাট হইতে পড়িয়া যায়! একটু কাঁদিয়া উঠিলেই মাই মুখে দিয়া তাহাকে শান্ত করিতে হইত। সেই হইতে আর কখন যোগমায়ার ঘুম গাঢ় হয় নাই।

একটা ছবি প্রায়ই তাঁহার মনের আকাশে ভাসিয়া ওঠে। দুইটি ছোট ছেলে উঠানে ধুলায় পড়িয়া গড়াগড়ি করিতেছে। তাহাদের কোলে তুলিয়া আদর করিবার জন্য যোগমায়ার বুকটা তৃষিত হইয়া উঠিত। কিন্তু সংসারে তিনি একা সহস্রবিধ কাজে তাঁহার হাত আবদ্ধ—তাই ছেলেদের যত্ন তিনি সেদিন করিতে পারেন নাই। আজ তাঁহার অনন্ত অবসর, অথচ ছেলেরা তাঁহার শীর্ণ অক্ষম দুইটি বাহুর গণ্ডী এড়াইয়া বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে।

সেবার শীতের প্রারম্ভে যোগমায়া রোগশয্যায় পড়িলেন। সকলেই মনে করিল ইহাই তাঁহার মৃত্যু-শয্যা। যোগমায়াকে নিদ্রিত ভাবিয়া দুই ভাই শ্রাদ্ধের বিষয় আলোচনা করিতেছিল। জাঁক-জমক করিয়া শ্রাদ্ধ না করিলে লোকে নিন্দা করিবে ইত্যাদি। যোগমায়া মৃত্যুকে ব্যঙ্গ করিয়া বাঁচিয়া উঠিলেন। ইহার পর হইতে তাঁহার কেবলই মনে হইত সংসারে কেহ এত বৃদ্ধ বয়স অবধি বাঁচিয়া থাকাটা পছন্দ করিতেছে না। কবে তাঁহার অন্তিম দিন আসিবে তাহারই প্রত্যাশায় সকলে যেন উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে।

ঘোষেদের বুড়ী-মা আশী বছরে মারা গেল। তাহার শ্রাদ্ধে যে ঘটাটা হইয়াছিল তাহা যোগমায়া দেখিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও অমনি সমারোহ হইবে। ক্রন্দনের রোল তুলিয়া কেহ তাঁহার শবানুগমন করিবে না; খোল-করতালের ধ্বনি সহ কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে শ্মশানঘাটে লইয়া যাইবে। বাড়ীটা উৎসব-সজ্জায় সজ্জিত হইবে; আত্মীয়-পরিজন আসিয়া কোলাহল বাধাইবে; খাওয়া-দাওয়া হাসি-তামাসায় বাড়ীটা মুখর। শোকের কালো ছায়া কোথাও নাই, শুধু উৎসবের উন্মাদনা। এতদিন যে অনাবশ্যক আপদে সংসারটা ভারগ্রস্থ ছিল, আজ সেই ভার মুক্ত হইয়াছে, সেই মুক্তির আনন্দে সবাই মাতিয়া উঠিয়াছে।

এমনটি যে ঘটিবে ইহা যোগমায়া প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছেন। অথচ যোগমায়ার মনে মনে বহুদিন যাবৎ একটা গোপন আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, বাঁচিয়া থাকিতে যাহারা তাঁহাকে যথেষ্ট মর্য্যাদা দিল না, মৃত্যুর পর তাহারাই তাঁহার অভাব অনুভব করিবে—অনুভব করিয়া অনুতপ্ত হইবে! কিন্তু অশ্রুজলের ঝরণাধারায় সিক্ত করিয়া যোগমায়ার স্মৃতিকে কেহ সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে এমন ভরসা আর নাই।

আর একটা ঘটনা যোগমায়াকে গভীরভাবে আঘাত করিল। মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রসন্ন আসিয়া জানাইল—হাসির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, বিবাহের দিনও এই মাসেই। প্রসন্ন অনুমতি লইতে আসে নাই, কথা পাকা করিয়া তাঁহাকে শুধু জানাইতে আসিয়াছে। যোগমায়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বিবাহের মত এত বড় একটা ব্যাপার তাঁহার সম্মতি ছাড়া স্থির হইয়া গেল, ইহা তাঁহার বিশ্বাসের অতীত। যোগমায়ার আর একদিনের কথা মনে পড়িল।—প্রসন্ন বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু যোগমায়ার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বের নিকট তাহাকে অবশেষে মাথা নত করিতে হইয়াছিল। আজ সেই প্রসন্ন তাঁহার কর্ত্তৃত্বকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করিতে দ্বিধা বোধ করিল না।···

বড়-বৌ বিবাহের আয়োজন করিতেছে, কিন্তু শাশুড়ীকে একবারও কিছু জিজ্ঞাসা করে না। হাসিকে যোগমায়া ভালবাসেন, তাহার বিবাহের আয়োজন যেন সম্পূর্ণ হয় ইহা তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। বড়-বৌ কি জানে বরণ-ডালায় তুলার প্রদীপ কয়টা জ্বালাইতে হইবে? অধিবাসের সঙ্গে এক বাটী শালি ধানের পিটুলি পাঠানো তাঁহাদের বংশরীতি; বড়-বৌ নিশ্চয়ই জানে না এসব। ইচ্ছা হয় ডাকিয়া বলিয়া দেন। কিন্তু না—গভীর অভিমানে তিনি চুপ করিয়া থাকেন।

বিবাহ হইবে সম্মুখের উঠানে। দুপুর হইতে সেদিকে আয়োজন চলিতেছে। যোগমায়ার অংশটা চুপচাপ। ছেলে মেয়ের দলও আজ নাই; হাসির সখীরা তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, সে-ও আজ আসিবে না।

সন্ধ্যার পর যোগমায়া পুরানো বেতের ঝাঁপিটা হইতে তাঁহার গরদখানা বাহির করিয়া পরিলেন। শনের মত চুলগুলি আঙুল দিয়া চিরিয়া চিরিয়া পরিপাটি করিয়া লইলেন। হাসির বিবাহ-মণ্ডপে যাইতে হইবে যে!

কেহ না ধরিলে এতটা পথ একা যাইতে পারিবেন না, তাই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। লগ্ন তো সকালেই, অথচ কেহ তাঁহার খোঁজে আসিতেছে না। অবশেষে প্রসন্ন আসিল, কহিল—এই শীতের মধ্যে তোমার গিয়ে কাজ নেই মা। রাত্রিতে চোখে কিছু দেখ্‌বে না, তা ছাড়া সবাই যার-যার কাজে ব্যস্ত, তোমার দিকে কে লক্ষ্য রাখ্‌বে বল? তার চেয়ে কাল সকালে জামাই এসে তোমাকে প্রণাম করে যাবে—সেই ভাল।

প্রসন্ন ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল। যোগমায়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন। ভাগ্যে তিনি অন্ধকার দাওয়ায় আসিয়া বসিয়াছিলেন, তাই প্রসন্ন তাঁহার পোষাক লক্ষ্য করে নাই। না হইলে কি লজ্জাটাই না পাইতে হইত!

গরদ খুলিয়া আটপৌরে থান কাপড়খানি পরিয়া বাতি নিভাইয়া যোগমায়া শুইয়া পড়িলেন। বাড়ীটা উৎসবে মাতিয়াছে, তাহারই উৎফুল্ল কোলাহল অন্ধকারে অন্ধকারে তাঁহার কানে ভাসিয়া আসিতেছিল। পুত্র, পুত্রবধূ এবং পৌত্র-পৌত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মূলে যাহার সেবা-নিপুণ হস্তের স্পর্শ রহিয়াছে তাহাকে বাদ দিয়াও উৎসবের আলো বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নাই ইহা ভাবিয়া যোগমায়ার কোটরাগত চক্ষু হইতে কয়েক বিন্দু জল ঝরিয়া পড়িল।

রামায়ণ মহাভারতে যোগমায়া বানপ্রস্থের কথা শুনিয়াছেন। বানপ্রস্থ অবলম্বনের জন্য বনে যাইতে হয় না, সেই প্রথাটা আজও আছে এবং চিরকালই থাকিবে। যোগমায়ারও বানপ্রস্থের দশা চলিতেছে। দরজার বাহিরে আবর্জ্জনার মত তাঁহাকে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, যমদূত কবে আসিয়া তুলিয়া লইবে শুধু তাহারই অপেক্ষায়।...

বিবাহের কলরব যোগমায়ার কানে একটু একটু আসিয়া বাজিতেছে। হাসির যে আজ বিবাহ সে কথা তিনি ভুলিয়া গেছেন। আর একটি মেয়ে তাঁহার চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটি ন' বছরের মেয়ে, পরণে পাছা-পেড়ে শাড়ী, পায়ে রূপার মল, কানে মাকড়ি, মাকে ফুরফুরি। বাসরঘরে শুইতে যাইবে না বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মা ঘুমন্ত মেয়েকে বাসর-শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া গেলেন। হাসির ঠাকুর্দ্দা তাঁহাকে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করাতে কিল চড় পুরস্কার পাইয়াছিলেন। পরে এই ব্যাপার লইয়া তাঁহাদের মধ্যে কত ঠাট্টা তামাসা হইয়াছে। সেই সব পুরানো কথা, স্মরণ করিয়া যোগমায়ার দন্তহীন মুখে একফালি হাসি জাগিয়াই আবার মিলাইয়া গেল।...

নাঃ, যেখানে অনাবশ্যক বলিয়া অবহেলা পাইতেছেন এমন স্থানে যোগমায়া থাকিবেন না। এই বাড়ী ত্যাগ করিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। দীর্ঘ পথ চলিয়া চলিয়া যোগমায়া একটা নদীর পারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নদীর জল কি কালো, দেখিলে ভয় হয়। এই নদী পার হইতে হইবে, কিন্তু কেমন করিয়া? সহসা দেখিতে পাইলেন পরপার হইতে একটি হাত তাঁহাকে ধরিবার জন্য ক্রমশঃ বড় হইয়া হইয়া অগ্রসর হইতেছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর হাতখানা তাঁহার টুঁটি চাপিয়া ধরিবার উপক্রম করিল। যোগমায়া সাহায্যের জন্য চারিদিকে চাহিলেন, কেহ কোথাও নাই। একমাত্র যোগমায়া ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো মানুষ নাই। চীৎকার করিয়া প্রসন্নকে ডাকিতে গেলেন; কিন্তু স্বর ফুটিল না, ভয়ে গলা কাঠ হইয়া গিয়াছে।...

যোগমায়ার ঘুম ভাঙিয়া গেল; শীতের রাত্রিতেও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। উৎসব-ক্লান্ত বাড়ীটা তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কোথাও টু শব্দটি নাই, যেন মৃতের দেশ। একটা অজানিত ভয় তখনও যোগমায়ার বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চাপিয়া রহিয়াছে। মানুষের সান্নিধ্যের জন্য তিনি লালায়িত হইয়া উঠিলেন।

চিরদিনের অভ্যাসানুযায়ী হাসির শূন্য স্থানটায় হাত বাড়াইলেন। নরম উষ্ণ একটা স্পর্শ তাঁহাকে বাঁচাইয়া তুলিল। ছোট-বৌ তাহার তিন বছরের ছেলেটাকে কখন শোয়াইয়া গেছে। যোগমায়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা মহাকাব্যের আন্তর রূপ

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রি-তর্কতীর্থ

প্রকৃত জীবনকে ভিত্তি করিয়া রূপরসময় আদর্শ চরিত্র সৃষ্টিই মহাকাব্যের মূল, খণ্ড তৃপ্ত মানব-হৃদয়ের অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষা যুগযুগান্ত ধরিয়া তাহাকে অব্যক্তের পানে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, ক্ষণিকের আনন্দবেদনা তাহাকে পথের মাঝে স্থির রাখিতে পারে নাই—পরমানন্দময় অজ্ঞাত অনন্ত পূর্ণসমঞ্জস মহাজীবনের গোপন হাতছানি আকুল করিয়া রাখিয়াছে। এই হাসিকান্নার আশানিরাশাময় জীবনের খণ্ড ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর সমন্বয়সাধনও মহাকাব্যে, ইহাতে ব্যক্তিগত ভাবোন্মত্ততা নাই, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাপকভাবে জীবনের অনন্ত সংকেতময়ী ধারণা কবির শিল্পনৈপুণ্যে মূর্ত্ত হয় তাই, জীবনের আন্তর রূপ নিখিল-চেতনায় রসায়িত হইয়া মানবমনে অনাদিকাল হইতেই আনন্দরসলোকের সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। সহৃদয় রসিকসমাজ আনন্দঘন এই রূপরস চেতনার মাধুর্য্য আস্বাদনে পরম তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে।

মহাকাব্যের ভিত্তি সেই জীবন, সেই জীবনের সম্বন্ধ অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যে তেমন ছিল না। মানুষের সহজ ধর্ম্মবুদ্ধিতে তাহার শিল্প-চেতনাকে সঙ্কীর্ণ করিবার ইতিহাস কেবল বঙ্গসাহিত্যের নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেরও গোড়ার কথা। অধ্যাত্মজগতের সহিত বাস্তবজগতের সান্নিধ্য ঘটাইবার নানা প্রকার উপায় প্রাচীন সাহিত্যে পরিদৃষ্ট হয়—তখনকার দিনে কবিগণ আদিষ্ট হইতেন এবং দেবতার পরিতুষ্টিবিধানই ছিল কাব্যরচনার মুখ্য বিষয়। সাহিত্যকারের কোনও আদর্শবাদ কাব্যের মূলে ছিল না, চরিত্রমাধুর্য্য বা স্বাধীন আত্মনিষ্ঠা কাব্যের কোথাও প্রকাশ পাইত না, দেবস্তুতির আবরণেই কাব্যরচনা প্রকাশিত হইত। এইজন্য অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে ধর্ম্মশিক্ষা মুখ্য হওয়ায় প্রকৃত কাব্য এবং কবিমনের স্বাধীন কল্পনাবৃত্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কবির আত্মনিষ্ঠা ও স্বাধীনতার অভাবে এবং দেবপরিতুষ্টির প্রাবল্যে মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শবোধ তখন সাহিত্যে বিলুপ্ত ছিল বলিয়া সাহিত্যলোকের দুই বীর পুরুষ-চন্দ্রধর ও কালকেতুকে হীনতার পঙ্কলিপ্ত করিতেও কবি কুণ্ঠিত হয়েন নাই, এইরূপে বহুকাল ধরিয়া প্রাচীন-বঙ্গসাহিত্যে মনুষ্যত্বের অবমাননা চলিয়া আসিতেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই বঙ্গসাহিত্যে নব নব লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল, মহাপুরুষ রামমোহনের সূচিত কর্ম্মধারা বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার বাস্তবে পরিণত করিয়া ভবিষ্য মহাকাব্যের পটভূমি রচনা করিয়া গিয়াছিলেন—তাহাতেই যেন আমরা মহাশৌর্য্যের প্রতীক মধুসূদনের অমর মহাকাব্য লাভ করিতে পারিয়াছিলাম ; বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃত জীবন ও মনুষ্যত্বের সংস্পর্শ তখন হইতেই ঘটিল, প্রাচীন প্রাণহীন অনুকরণরীতির একঘেয়েমী হইতে, তথা মনুষ্যত্বের ভাববিলাসিতা হইতেও সাহিত্য মুক্তিলাভ করিল—আপনার মুক্ত রসধারার আনন্দ-আলোকের মধুর কিরণসম্পাতেই সাহিত্যে নবজীবনের উদ্বোধন হইল।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের তথা বঙ্গসাহিত্যের অতীত-ভবিষ্যতের যুগসন্ধিক্ষণ মধুসূদনে, তাহাতে যেমন বৈষ্ণবীয় কোমলতা ও শাক্তের কঠোরতা, সম্মিলিত হইয়াছিল, তেমনই তিনি আর্য্য সাহিত্যের প্রাণপুরুষ বাল্মীকি, কালিদাস এবং প্রতীচ্য সাহিত্যের হোমর ভার্জ্জিল দান্তে প্রভৃতিরও ভাবশিষ্য।

এই যুগ বন্ধনমুক্তির যুগ, বিশেষ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনই যেন এই মুক্তির বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। মহাকাব্য রচনার মূলে আত্মার যে অবাধ স্বাধীনতা—ধর্ম্মাদর্শের নীতিবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ও সামাজিক অবস্থা পরিবর্ত্তন—তাহা ফরাসী বিপ্লবের পর ঊনবিংশ শতাব্দীতেই নিখিল-কবিমনে প্রভাব বিস্তার করে। তাহার ফলে পাশ্চাত্য-সাহিত্যে 'চাইল্ড হেরল্ড' ও 'প্রমিথিয়াস আনবাউণ্ড' প্রভৃতির জন্ম, পাশ্চাত্য-সাহিত্যের আদর্শরূপ মধুসূদনকে কেন্দ্র করিয়াই বঙ্গসাহিত্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়, এই পাশ্চাত্য ভাবসঙ্গ মধুসূদনের একমাত্র শিল্পচেতনা ছাড়া অন্য কোন চেতনাকে মুখ্যভাবে জাগাইতে পারে নাই—জাগাইলে, আমরা তাঁহার নিকট হইতে খণ্ড ক্ষুদ্র গীতিকবিতা হয়ত লাভ করিতাম, কিন্তু অমর মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ' লাভ করিতে পারিতাম না। কবির এই অসঙ্গ অলৌকিক শিল্পরসচেতনা ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাকাব্য রচনার মূল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর এই ভাববিবর্ত্তনের ফলে বাঙ্গালীর জীবনেও এক অভিনব পরিবর্ত্তন দেখা গেল। পূর্ব্বাচরিত রীতিনীতি মানুষকে আর তেমন আনন্দ জোগাইতে পারিল না, নিত্য নূতনের সংস্পর্শে আসিবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাও তাহাকে নবরসগ্রাহী করিয়া তুলিল, তাই মধুসূদনের ভাবচেতনাও কোন প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বন করিল না। ভাবে ভাষায় আদর্শে নূতন রসবোধ তাঁহাকে এক অপূর্ব্ব মধুচক্র গঠনে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। অবশ্য একথাও সত্য যে, তিনি এই সময় গ্রীক আদর্শের পক্ষপাতী ছিলেন। বাঙ্গলা সাহিত্যে যে জিনিসটির নিতান্ত অভাব ছিল—সে প্রাণপুরুষ সত্যসৌন্দর্য্যনিষ্ঠা—যাহা ব্যর্থ দেবস্তুতির আবরণে ব্যাহত—তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যে তাহারই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরোক্ষ অলৌকিক জীবনের ধারণা অনেক সময় মানুষকে পঙ্গু করিয়া ফেলে—মানুষের জীবনের দীর্ঘশ্বাসকে ক্ষীণ করিয়া দেয়, তাই তিনি বাল্মীকি-অনুসৃত পন্থা যথাসম্ভব পরিহার করিয়াই চলিলেন, বাল্মীকির নায়ক-নায়িকার কোন বিশিষ্ট রূপ তাঁহার মহাকাব্যে মিলে না—তাঁহার মহাকাব্য একমাত্র পুরুষকারের জয় গানেই মুখর।

মহাকাব্যের মূলে সরল ব্যক্তিজীবন ; মহাজীবনের অনন্তপ্রসারী যে বিভিন্ন অনুভূতি, যে কাব্যরসালাপ ; যে অনন্ত ভাবরাজির সম্মেলন প্রয়োজন—মধুসূদনের জীবনে তাহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় এবং তিনি সেই আন্তর রূপকেই কাব্যরসধারায় সুষমামণ্ডিত করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। কাল্পনিক চরিত্র মানব-মনে তেমন কোন স্থায়ী রেখাপাত করে না, কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় অযথা নির্য্যাতিত কারাগাররুদ্ধ সিংহশিশুর ক্রন্দনের ন্যায় রাবণের ক্রন্দন—যাহা ভাগ্যবিড়ম্বিত মধুসূদনের ক্রন্দন ভিন্ন আর কিছুই নয়—তাহা সহৃদয় পাঠক-সমাজের মনে কেবল চিত্ররূপে নয়, করুণরসের জীবন্ত মানস রূপে প্রমূর্ত্ত হইয়া ওঠে।

আত্মার এই অবাধ ভাবাবেগ তিনি যেমন পাশ্চাত্যের একাধিক কবি হইতে লাভ করিয়াছিলেন, তেমনই প্রাচ্যেরও বহু কবি হইতে অযাচিত পুরস্কাররূপেও পাইয়াছিলেন ; তাই ছন্দের মুক্তগতি ও রচনা-মাধুর্য্যাদি মিল্টন প্রভৃতি কবি হইতে তেমন কাশীরামদাস কৃত্তিবাসাদির অনির্ব্বচনীয় সরলতাও মধুসূদনের কবিপ্রতিভাকে আরও মাধুর্য্যময় করিয়াছিল।

জীবনের উৎপত্তিবীজ হইতে আরম্ভ করিয়া পারলৌকিক ব্যাপার পর্য্যন্ত পূর্ব্বে মহাকাব্যের বিষয়বস্তু ছিল। ভারতীয় কবিগণ উভয় লোকপ্রসারী দৃষ্টিতে কাব্য-বিচার করিতেন, ভারবি মাঘ প্রভৃতি মহাকাব্যের অবলম্বন অংশবিশেষ হইলেও মধুসূদন সে পন্থায়ও যায়েন নাই—তিনি অলোকসামান্য প্রতিভায় রামায়ণের ক্ষুদ্র অংশকে অবলম্বন করিয়াই মহাকাব্য রচনা করিলেন, কারণ মানুষের বহুমুখী কর্ম্মপ্রবণতা কেবল দীর্ঘকাল কাব্য-আলোচনাতেই নিঃশেষিত হইতে পারে না, তাহার অন্য কর্ত্তব্যও উপেক্ষণীয় নয়। অধ্যাত্মবাদের সুদীর্ঘ আলোচনা মানুষের চিন্তাকে যেন জড়তাগ্রস্ত করিয়াছিল। মানুষ যেন এতকাল পর আপনার মধ্যেই স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে চাহিতেছিল, মধুসূদনই যেন পূর্ব্বাচরিত অধ্যাত্মবাদ মুক্তিবাদ প্রভৃতি প্রথম উপেক্ষা করিলেন, প্রকৃত ঐহিক মানবজীবনকেই কাব্যের বিচার করিয়া তুলিলেন, তাঁহার অদৃষ্টবাদ সূক্ষ্ম কর্ম্মফল নহে উহা অচিন্ত্যহেতুক দৈব-ইচ্ছা। পরলোকের প্রতি মানুষের যত দৃষ্টিই থাকুক না কেন, ঐহিক মরজীবনই মানুষের একান্ত প্রিয়, তাহার সর্ব্ববিধ উন্নতিমাহাত্ম্যেই পরম সার্থকতা, তাই মধুসূদনের রাবণ সীতাহরণ করেন অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত, ইহা তাহার রাজনীতি, মনুষ্যসুলভ আত্মগর্ব্বী রাবণের ইহা স্বভাবজাত।

মানবজীবনের অন্তর্বেদনা করুণরসেই মূর্ত্ত হয়, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে মনুষ্যজীবনের আশা-নিরাশা কান্না-হাসি করুণরসে তেমন রূপ পরিগ্রহ করে নাই। সহৃদয়জনের হৃদয় আকর্ষণে কারুণ্যের প্রভাব সমধিক। সমগ্র মেঘনাদবধটি যেন একটি বিরাট হাহাকার, একটি ঘনীভূত ক্রন্দনধ্বনি, অতীত ও বর্ত্তমান জীবনের আনন্দবেদনায় সীতা অশ্রুময়ী, পুত্রহারা চিত্রাঙ্গদা ম্রিয়মানা, স্বামীশোকে অধীরা প্রমীলা, নিষ্ঠুর অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাসে শাখাপত্রহীন মহামহীরুহের মত ক্ষুব্ধ রুষ্ট রাবণের পাষাণভেদী হাহাকার যেন শোকতাপদগ্ধ সাধারণ মানবজীবনের পরিচিত ঘটনা। দুঃখের তাপে মানবের চিত্ত দ্রবীভূত হয়, নিখিল-বিশ্বের প্রতি সহানুভূতিশীল করিয়া তোলে, কিন্তু রাবণের এ ক্রন্দন দীনতার অশ্রুবিসর্জ্জন নয়—আত্মদানের জন্য দুর্ব্বলের হীন বিলাপ নয়, এ ক্রন্দন দৈববিড়ম্বিত মহাশক্তিমানের অশ্রুমুখর আর্ত্তনাদ। এ বিলাপের শেষ কবি করেন নাই—করিলে মহাকাব্যের সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইত, একমাত্র প্রিয়তম অশেষ শক্তিমান পুত্রের চিতাপার্শ্বে ভিখারীর মত দণ্ডায়মান রাবণের ক্রন্দন সর্ব্বহারা বাঙ্গালীজাতির ক্রন্দন, ইহা যুগযুগান্ত স্থায়ী হইয়াই থাকিবে। মধুসূদনের আজন্ম শোকানলদগ্ধ জীবনের এই অশ্রুময় ইতিহাস উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা মহাকাব্যের মর্ম্মরূপ।

একটুকরো

শ্রীউমানাথ সিংহ

আমার মনের সিন্ধু শিয়রে
এ কোন্ ইন্দুলেখা,
জাগিল জোয়ার যৌবন-ভরা
ভাঙিল তটের রেখা।
তরঙ্গদল ছল ছল নাচে,
শাসন বাঁধন কিছু নাহি বাছে,
বাহু পসারিয়া শুধু তারে যাচে
লভিয়াছে যার দেখা।

সে তো থাকে দূর সীমার বাহিরে
কামনার পরপারে
সে তো আসে শুধু বেদনা জানাতে
বিফল অঙ্গীকারে।
বৃথা ক্রন্দনে কাঁদে নভতল
ঝরে শিশিরেতে নয়নের জল
সে ব্যথা ছন্দ জাগে উচ্ছল
কবিতার সুরধারে॥

বৃদ্ধস্য

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

পূজার ছুটিতে যখন তিনজন বন্ধুর সঙ্গে রমেশ ওয়ালটেয়ার যাত্রা করলে, অন্তরালে পিতৃব্য বল্লেন—একটা চর্চ্চা নিয়ে থেক। ঝিনুক সংগ্রহ—সমুদ্রের রঙ—জাহাজের চোঙা—তেলেগু ভাষা—যা হ'ক একটার চর্চ্চা কল্লে জ্ঞানও বাড়বে, দিনও কাটবে আনন্দে।

তারা চারজনে সমস্বরে বল্লে—যে আজ্ঞে।

কিন্তু সাঁতরাগাছি পার হ'য়েই তারা একচিত্ত হ'ল—সকল চর্চ্চার মধ্যে পর-চর্চ্চাই নিরাপদ এবং তার উদার দান—অনাবিল স্ফূর্ত্তি।

ওয়ালটেয়ার গাল-ভরা নাম—বলতে কহিতেও সভ্য। কিন্তু ওয়ালটেয়ারে আমোদ নাই। সুতরাং চার-বন্ধু বাস-স্থান ঠিক করলে ভাইজাগে, পিরোজ ম্যানসনে। সেখানে বসে তারা একবার ভাষা-তত্ত্ব অনুশীলনের প্রয়াস পেলে।

ভাই-জাগের ধাতু-গত কোনো সম্পর্ক নাই—ভাই কিম্বা জাগরণের সঙ্গে। ভিজাগাপটমের সংক্ষিপ্ত নাম ভাই-জাগ। ভিজাগাপটম আবার বিশাখা-পত্তনের রূপ-ভেদ। এতএব প্রত্নতত্ত্ব তথা ভাষা-তত্ত্ব নীরস।

—চুলোয় যাক—বল্লে তারা এক-বাক্যে। তারা আর একবিষয় চর্চ্চা করে ঐক্য হ'ল—দেশের লোকগুলা কালো এবং তাদের ভাষা চীনে ভাষা অপেক্ষা দুর্ব্বোধ্য এবং কাবুলীর ভাষা অপেক্ষা কঠোর।

রমেশ বল্লে—একটা হাঁড়ির মধ্যে ঝিনুক রেখে নাড়লে—তেলেগু গান শোনা যায়।

ভবেশ বল্লে—মাতাল হ'য়ে বাড়ি ফিরে কড়া নাড়লে যেমন শব্দ হয় তেলেগু তেমনি।

যোগেশ বল্লে—মোটেই নয়। টিনের চালে শীলা-বৃষ্টি—

নিমেষ বল্লে—চুপ্। ঐ দেখ্।

আটটি চক্ষু নিবদ্ধ হ'ল বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যার উপর। সুতরাং তারুণ্যের মনোরম চর্চ্চা আরম্ভ হ'ল।

স্বামীর বার্দ্ধক্যে সন্দেহ কর্ব্বার কিছু ছিলনা। কারণ তার মাথার সে সকল অংশে চুল ছিল—সেগুলা সাদা। আর অত টাক পড়ে না মানুষের মাথায়—যৌবনে কিম্বা সদ্য-বিগত যৌবনে।

স্ত্রী যে তরুণী তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ তার হাস্য, তার লাস্য, তার কেশ এবং সর্ব্বোপরি তার বেশ। তার হাসির অন্তর হ'তে একটা নিবিড় কমনীয়তা ফুটে উঠ্‌তো। হাসবার সময় তার কপাল ঈষৎ কুঞ্চিত হ'ত—তার মুক্তার মত দাঁত আত্মপ্রকাশ করত। তার লাস্য তার চলনে।

রমেশ বল্লে—মরাল-গমন ফমন সব বোগাস্।

নিমেষ বল্লে—আর ভোমরা কালো চুল। আসল চুল সোনার বরণ, যার কোঁকড়া পথের ভিতর সূর্য্যের কিরণ পথ হারিয়ে সমস্ত কেশের গোছাকে রাঙিয়ে তোলে।

ভবেশ বল্লে—কিন্তু এর উপর যদি মেমের চোখের তারা কালো না হ'য়ে সাগরের মত নীল হ'ত—

রমেশ বল্লে—আহা!

তখন তারা রমেশকে নিয়ে পড়লো। কিন্তু যে রূপ অন্তর হ'তে শ্রদ্ধালাভ করতে কৃত-সঙ্কল্প, অকেজো বন্ধুর দল সে রূপের উজ্জ্বলতাকে নিষ্প্রভ কর্ত্তে পারলে না। বিজয়ী রমেশ বল্লে—অনেক জন্তু মোট বয়—ধরা পড়েছে গাধা। সবাই বুকে হাত দিয়ে বল—ঐ মেমের হাবভাবে তোমরা মুগ্ধ হ'য়েছ কিনা।

যোগেশ এতক্ষণ মৌন ছিল। সে রেল অফিসে কাজ কর্ত্ত। বাল্য-বন্ধুদের মত রেল-ভাড়া বা হোটেল চার্জ্জ দেবার তার সঙ্গতি ছিলনা। সে পাশ পেয়েছিল ভাই-জাগে আসবার। বন্ধুরা ভাগাভাগি ক'রে খরচ চালাচ্ছিল। যোগেশ কিন্তু তাদের একটু বিব্রত করবার জন্য ঐ কথার আভাস দিয়ে মিত্রদের আঁতে ঘা দিত।

সে বল্লে—বাবা, বাপের পয়সা নেই, কি আর বলব। ও যদি আধুনিক মহিলা হ'ত তো স্নানের পোষাক পরে সমুদ্রে স্নান কর্ত্ত। তারপর বিচার।

তাতে রমেশ অসন্তুষ্ট হ'ল। সে বল্লে—আমরা ওপর ওপর তার রূপের আলোচনা করছি। এতে অভদ্রতা নাই। কিন্তু তা' বলে—

—ঐতো বাবা! বাপের পয়সা নেই তাই। এইমাত্র বুকে হাত দেওয়ার কথা হ'চ্ছিল। বলতো ভাই-সকল' বুকে হাত দিয়ে—মনের কথা টেনে বার করেছি কিনা। যদি দেশী মতে নারীর সম্মান রাখতে চাও—চাণক্য পণ্ডিতের নীতি মান। আর যদি পাশ্চাত্য নীতি মানতে চাও তো ওকে স্নানের পোষাকে দেখে তবে রূপের ব্যাখ্যা।

ভবেশ বল্লে—যোগেশ স্পষ্ট কথার আড়াল থেকে তোমার দারুণ কুরুচি উঁকী মারচে। তোমার মনের ফ্রয়েড-স্তর এই সাগরের মত উদ্বেল হ'য়েছে।

নিমেষ বল্লে—সৌন্দর্য্য-জ্ঞান শ্লীলতাবোধের বিরোধী নয়।

রমেশ বল্লে—যোগেশ অশ্লীল—অভদ্র এবং—এবং—

—পাজি!—বল্লে—যোগেশচন্দ্র। যেহেতু মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম। বাপের পয়সা—

তারা তিনজনে সমস্বরে বল্লে—যেন্দাও ব্রাদার।

(২)

এক এক প্রকৃতির লোক থাকে যারা গালাগালি খেলে কাজে মন দেয়। যোগেশ সেই শ্রেণীর লোক। রমেশ তাকে গালাগালি দিয়েছিল—তার হাতে পায়ে শক্তি এলো। মাথার বিজলি-প্রবাহ নূতন নূতন মতলব প্রবাহ উদ্বুদ্ধ করলে। মেম বেলা-ভূমিতে ঝিনুক কুড়ায় দু'বেলা। প্রভাতের আলোয় তার ঠোঁটের রাঙা জ্বল জ্বল করে। সাঁঝের মলিন কিরণ উজল করে তার লাল-রঙ-মাখা হাত পায়ের নখ। যোগেশের গ্রামের লোকালবোর্ডের সভাপতি হারুণ-মিঞা এক একটা ভোট পেলে যেমন দন্ত-বিকাশ করে, এক একটা ঝিনুক পেলে মেমের তেমনি বিকশিত হয় দশনপংক্তি। অবশ্য তুলনা তুলনা মাত্র—এ-ক্ষেত্রে স্মৃতি-জাগানো। কারণ দাঁতে দাঁতে আকাশ-পাতাল তফাৎ—আর দাড়ি, তেল-গড়ানো কপাল—যাক্।

যোগেশ একটা মুলিয়া ছোকরাকে অনেক হাতমুখ নেড়ে বুঝিয়ে এক পয়সা দিয়ে দু'টা চকচকে হলদে কড়ি-কিনলে। যখন সাগর-নীল পোষাক, আর তুষার-সাদা স্যাণ্ডাল পায়ে দিয়ে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা বালু-বেলায় ঝিনুক কুড়াচ্ছিল—যোগেশ যাদুকরের মত কুশল হাতে একটা কড়ি ফেলে তাকে তুলে—সযত্নে বালি মুছে মেমের সামনে ধরলে।

রমেশ বাসার জানালা থেকে বালি মোছা আর মেমের সম্মুখে হাত-বাড়ানো প্রক্রিয়া লক্ষ্য করলে। লজ্জায় তার মাথা হেঁট হ'চ্ছিল। কী অশিষ্টতা।

কড়ি দেখে মেমসাহেব—কুহু এবং-উহুর মাঝামাঝি একটা ধ্বনি উচ্চারণ করলে। তারপর তার হাত থেকে কড়ি নিয়ে—একমুখ হেসে যোগেশকে ধন্যবাদ দিলে।

যোগেশ বল্লে—এখানে খুঁজলে এ রকম কড়ি আরও পাওয়া যেতে পারে। আমি কত মজার মজার আকার ও প্রকারের ঝিনুক, কড়ি, শাঁক রোজ দেখি বালির মাঝে।

—ওঃ।—বলে মেম ডান পা তুলে বাঁ পায়ের গোড়ালীকে কেন্দ্র ক'রে একপাক ঘুরে গেল। যখন ৩৬০ ডিগ্রির পাক পূর্ণ হল, সে বল্লে—আমি অন্ধ। আমি কিছু খুঁজে পাই না।

যোগেশ এপাশ ওপাশ তাকিয়ে দেখে নিমেষের মধ্যে নিশ্চিন্ত হ'ল যে বৃদ্ধ অনতিদূরে বিদ্যমান নাই। সে তখন হেসে বল্লে—ক্ষমা করবেন। আপনি আর কী খুঁজে বার করবেন—লোকে খুঁজে বার করবে আপনাকে।

মেম এমন একটা মুখের ভাব ক'রে বল্লে—ডোণ্ট বি সিলি—যার মানে আবার বল—ঐ রকম শ্রুতি-মধুর কথা।

যোগেশ বল্লে—সত্যবাদী চিরদিন বোকা।

মেম তুষ্ট হ'ল। বল্লে—আমরা দু'জনে ঝিনুক খুঁজি এস।

যোগেশের সংযম নিবিড়। তার মনের মধ্যে গুমরে উঠ্‌ছিল ছড়া—খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি। কিন্তু সংযমী যোগেশ নির্ব্বাক নিঝুম। সে বক্র-দৃষ্টিতে দেখছিল রমেশকে। বারান্দার রেলের উপর ঝুঁকে সে লক্ষ্য করছিল ক্রিয়াকলাপ নীরব বিস্ময়ে। সত্যই তো যোগেশটা বাহাদুর। কেমন বন্ধুর মত যাচ্চে উভয়ে। মাঝে মাঝে হেঁট হ'য়ে ঝিনুক, শাঁক, কড়ি তুলছে যোগেশ—সোনা হেন মুখ করে স্নেহের দান গ্রহণ করছে বৃদ্ধস্য তরুণী। মাঝে মাঝে উঠন্ত রবির এক একটা কিরণ মেমের মুক্তার মত দাঁতে লেগে বিচ্ছুরিত হ'চ্ছিল।

নিমেষের কণ্ঠস্বরে রমেশের চমক ভাঙ্গলো।

—কি চর্চ্চা হচ্চে খুড়া মশায়ের আদেশে। বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং!

সে দেখিয়ে দিলে বেলাচরদের।

ভবেশ বল্লে—বিউটি এণ্ড দি বীষ্ট্।

রমেশ প্রাণভরে হাসলে। তার রুদ্ধ হিংসা মুক্তি পেলে। রমেশের মন একটু হাল্কা হ'ল।

নিমেষ বল্লে—কিন্তু মাইডিয়ার যোগেশের বাহাদুরি আছে। পাঁচসিকের বেলেঘাটার স্নানের পোষাকে অমন সু-সজ্জিত বৃদ্ধস্য তরুণীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রমেশ নিঃশব্দে চলে গেল।

চার বন্ধু বাস কর্ত্ত পিরোজ ম্যানসানের দক্ষিণের ঘরে—উপর তলায়। বারান্দার উপর দিয়ে সে উত্তর দিকে গেল। বৃদ্ধ ব্রাউন ও তরুণী বাস কর্ত্ত উপরের কোনের ঘরে। রমেশের যাত্রা পথ ছিল অনির্দ্দিষ্ট।

বৃদ্ধের কক্ষের সন্নিকটে এসে সে দারুণ অসন্তুষ্ট হ'ল। বিশেষ যেহেতু তার কৃত্রিম দুপাটি দাঁত পরিস্কৃত হ'য়ে প্রাচীরের উপর শুষ্ক হচ্ছিল। কি ধৃষ্টতা! এই বৃদ্ধের ঐ স্ত্রী। স্ত্রীর সঙ্গে সমুদ্রের জলে নুড়ি ছুড়ছিল যোগেশ।

জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ। কিন্তু জলের কুমীর দূরে। বাঘের বাসা নিকটে। ব্রাউনের দাঁত দু'পাটি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে যাঁতা কল—ইঁদুর ধরবার যন্ত্র।

পৃথিবীতে যত কিছুর উদ্ভব হ'য়েছে তার মূলে আছে—আবেগ। বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কর্ত্তা পরিহাস করে কবিকে। তার নাকি সমস্ত অলীক! কিন্তু আবিষ্কর্ত্তা! আবেগ না হ'লে অর্কমাদী রাজপথে ইউরেকা ইউরেকা বলে চীৎকার ক'রে বেড়াতো না—পাগলের মত।

যে নেঙ্‌টি ইঁদুর অনুসন্ধান করলে—পেলে না। বাগানে পাথরের নিচে একটা তেঁতুলে বিছে ছিল। সে রান্নাঘর থেকে সাঁড়াশী এনে তাকে ধরলে। এদিক ওদিক তাকালে। ত্রিসীমায় কেহ ছিল না। সে একপাটি দাঁত তুলে—দুপাটি দাঁতের মধ্যে বিছাকে রাখলে। তারপর হাল্কা মনে গাহিল—তায়রে নায়রে নায়রে না। বৃদ্ধের তো ব্যবস্থা হ'ল। যোগেশকেও সে যথাকালে শাস্তি দিবে।

নোরা ও ডোরা ডিসুজা সাহেবের কৌতুক-প্রিয় ক্রীড়া-শীল নৃত্য-কলা-পটীয়সী বালির-কেল্লা-গড়া যমজ কন্যা। তারা মাঝে মাঝে নুলিয়া-বালকদের মিষ্ট-ভাবে তুষ্ট ক'রে ঘুড়ি সংগ্রহ কর্ত্ত, আর জননীর সেলাই-কলের সুতা চুরি ক'রে বালু-বেলায় তাদের ওড়াতো। বে-আদব যোগেশ ডিসুজাকে বলত—যশোদা।

ডিসুজা হারবারে ইম্‌পোর্ট চালান পাশ কর্ত্ত। সে কানাগা সুন্দরের সঙ্গে পালাপালি ক'রে কাজ কর্ত্ত। তার ডিউটি সুরু হলে নোরা ডোরারও ডিউটি সুরু হ'ত পিরোজ ম্যানসন ও তন্নিকটবর্ত্তী বাসিন্দাদের বিব্রত কর্ব্বার।

মজার খোঁজে যুগল-ভগিনী পৌঁছিল ব্রাউন-দম্পতির বারান্দায়। দন্ত-যন্ত্রে নিবদ্ধ সরস্বতী-বিছার ছট্‌ফটানি প্রত্যক্ষ ক'রে কাতরা নোরা বল্লে—ও ডোরা!

দরদী ডোরা বল্লে—ওঃ নোরা!

তাদের বালিকা-প্রাণে নারী-সুলভ দয়া জেগে উঠ্‌লো। নোরা বল্লে—পুওর ডিয়ারকে কিছু খেতে দেওয়া উচিত।

ডোরা বল্লে—বাবা রোজ বলেন জীবে দয়ার কথা।

তখন দুই ভগ্নী দাঁতে-পেশা বিছার জন্য খাদ্য সংগ্রহ কর্ত্তে ছুট্‌লো। কিন্তু খাদ্য কোথায় এবং তার কি স্বরূপ সে সম্বন্ধে ডিসুজা-নন্দিনীদের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

শুভ-কাজের সহায়ক বিধাতা। সাগর উদ্দেশে ছুট্‌লো তারা গঙ্গা-যমুনার মত। বালুচরে দুজন নুলিয়া মাছ ভাগ কর্চ্ছিল। যোগেশ ও মিসেস ব্রাউন তাদের প্রক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করছিল। মণ্ডলীর দুই প্রান্তে দাঁড়ালো দুই বোন। তারপর শঙ্খ চিলের মত ছোঁ মেরে তারা দুটা ছোট সারডিন মাছ নিয়ে ছুট্‌লো পিরোজ ম্যানসানের দিকে।

একই কাজ নানা রকম প্রতিক্রিয়া করে বিভিন্ন মনে। নোরা-ডোরার কার্য্য-তৎপরতা হাসালে নুলিয়াদের। যোগেশ মনে মনে বল্লে—বহুৎ আচ্ছা উমনো-ঝুমনো যশোদা-নন্দিনী। কিন্তু মেম বল্লে—শেম্।

—শেম্ কেন মেমসাহেব। ওরা মাত্র শিশু।

বৃদ্ধস্য বল্লে—শিশু! খৃষ্টীয় শিশু!

যোগেশ বল্লে—প্রভু নিজে যে ছেলেদের এবং মেয়েদের ভালবাসতেন। খৃষ্টীয় শিশু—

এবার মেম হেসে বল্লে—তুমিও দুষ্ট।

কিন্তু পরক্ষণে তারা দেখলে গাজর-বরণী খৃষ্টীয় শিশুদ্বয়, ব্রাউনদের বারান্দায় প্রাচীরের কোনো পদার্থে মনোনিবেশ করছে।

এরপর সাগর-কূলে বিচরণ চলে না। মেম সাহেব ক্ষিপ্রগতিতে উপরে গেল। যোগেশ বুঝলে একটা কাণ্ড হবে।

মিসেস ব্রাউন যখন সোপানের চাতালে, নোরা ডোরা তাকে অপাঙ্গে দেখে কর্পূরের গুলির মত উবে গেল উত্তরের বারান্দা দিয়ে।

"ওঃ মাই! ওঃ অ্যালজি!"—ব'লে নাচতে আরম্ভ কল্লে পতি-প্রাণা। স্বামীর দাঁতের মধ্যে কিল্‌বিল্ কচ্চে বৃশ্চিক, আর তার সম্মুখে দুটা শিশু-সার্ডিন। দুর্লভ মানব জীবনে কত অযাচিত অঘটন ঘটে। কিন্তু এ কী!

(৩)

রাত্রে দারুণ হাসির বেগ তাদের দম বন্ধ করলে।

ভবেশ বল্লে—দু'খানা মেডেল—খোক্ খোক্ খোক্—নোরা ডোরাকে—খোক্—

নিমেষ বল্লে—তার দাম দেবে—ফুঃ ফুঃ ফুঃ—ওঃ—বাবা! দম—হুপ্।

যোগেশ বল্লে—বৃদ্ধস্য যখন নোরা-ডোরার মার সঙ্গে ঝগড়া করছিল—বাপ্‌স্—দুলিয়াদের বৌ বলে আমি কোথা আছি রে!

এবার রমেশ অসন্তুষ্ট হ'ল। হ্যাঁ বৃদ্ধস্য ঝগড়া করেছিল বটে—কিন্তু তা বলে মেছুনির সঙ্গে তুলনা।

রমেশের পক্ষ নিয়ে ভবেশ বল্লে—সকল সতী নারী স্বামী-নিগ্রহে ওরকম ঝগড়া ক'রে। সাবিত্রী যমের সঙ্গে লড়েনি?

এদের মতামত গড্ডালিকার মত। নিমেষ বল্লে—আহা! দন্ত-বিহীন তুণ্ডে কাট্‌লেট্-চর্ব্বণ অসম্ভব। তাই সাবিত্রী নেলী ব্রাউন স্বামীকে কাল কাট্‌লেটের সরবত খাইয়েছে।

এ কথায় আর এক কিস্তি হাসির হুল্লোড় উঠ্‌লো।

এবার রমেশ দাঁতের ওপর দাঁত দিয়ে যোগেশের দুটা কাঁধ টিপে ধরে বল্লে—হাসতে লজ্জা করছে না? 'সকল গণ্ডগোলের কর্ত্তা যোগেশ। নির্লজ্জ।

এতে আর এক কিস্তি হাসির প্রবাহ ছুট্‌লো।

যোগেশ বল্লে—বল বাবা যেহেতু বাপের পয়সা নেই। কিন্তু থোকা আমি কিসে দায়ী?

তখন অনুতপ্ত রমেশ দোষ স্বীকার করলে। সে উদার। সে নোরা-ডোরার নিগ্রহে সন্তপ্ত—অভিশপ্তর কাছাকাছি। যদিও একখানা মেডেল তার প্রাপ্য, স্বার্থত্যাগী রমেশচন্দ্র উভয় পদক যুগল-ভগ্নীকে দিতে স্বীকৃত হল এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পদক-নির্ম্মাণের ব্যয়-ভার বহন কর্ত্তে সম্মত হ'ল।

(৪)

চার বন্ধু সেদিন সমাজ-তত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব প্রভৃতি চর্চ্চা করছিল। সকল জাতির ছেলের দল বালির উপর খেলা করছিল। কেহ ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল, কেহ বালির কেল্লা রচনা কর্চ্ছিল, কেহ দিচ্ছিল গড়াগড়ি, কেহ দিচ্ছিল অন্যকে ঝিনুক দিয়ে সুড়সুড়ি। সাগর গর্জ্জন করছিল—তার সারা জীবনের সাধনা।

ক্রীড়া-রত-দের মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য ছিল তিনজন জাপানী নাবিক। প্রথমে তারা নিজেদের মধ্যে যুযুৎসু কর-ছিল। তারপর একজন এক তেলেগু বালকের নিকট হতে তার উড্ডীয়মান ঘুড়ি লাটাই সুতা চার আনায় খরিদ করলে।

অকস্মাৎ বন্ধু তের পয়সা লাভ করলে দেখে, অন্য এক বালক অন্য জাপানীকে সঙ্কেতে তার ঘুড়ি লাটাই বেচবার প্রস্তাব করলে।

—নালগু আনা।

জাপানী তাকে নালগু অর্থাৎ চার আনা দিয়ে সম্পত্তি খরিদ করলে। তখন দুই বন্ধুতে প্যাঁচ খেলবার আয়োজন করলে। যুযুৎসু ছেড়ে ঘুড়ি-যুদ্ধে যুযুৎস হল।

চার বন্ধু পরামর্শ করেছিল সেদিন ব্যাণ্ডি চড়বে। ব্যাণ্ডি টানে গরু। তাতে সামনাসামনি দুখানা বেঞ্চি আছে। প্রকার ছোট—আকার একখানা পালকীকে দুখানা চাকার উপর বসিয়ে গো-যান করলে যে রকম হয়।

ঝট্‌কা সোজাসুজি ছোট টপ্পরওয়ালা গো-যান, কিন্তু তাকে টানে গাধার চেয়ে বড় ঘোড়া।

অবশ্য এ দুই প্রকার গাড়ী ছাড়া ভাই-জাগে কয়েকখানা অতি জীর্ণ মানব-যান আছে। কিন্তু এক এক রিক্সয় এক এক বন্ধু বসলে ব্যয় হয় অধিক এবং মানব-জাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়।

মোটর গাড়ির ভাড়া বেশী।

সুতরাং যখন ঝটকা ও ব্যাপ্তি-সম্বন্ধে তর্ক উঠলো। রমেশ বল্লে—এখানে একটা গবেষণার ক্ষেত্র আছে—চর্চ্চা।

যোগেশ বল্লে—মাথামুণ্ড। এক কথায় এ গবেষণা শেষ হতে পারে। এখানে গরুর-গাড়ি টানে ঘোড়ায়, ঘোড়ার গাড়ি টানে গরুতে।

যখন এই চরম সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করলে যোগেশ, তাদের রুদ্ধ দুয়ারে মধুর কণ্ঠ-ধ্বনি শোনা গেল—যোগেশ।

তারা গবাক্ষ ছেড়ে দ্বারদেশে উপনীত হ'ল।

বৃদ্ধস্য বালু-বেলায় বেড়াতে যাবে। যোগেশ সঙ্গে গেলে সে বাধিত হয়।

রমেশ প্রতিযোগিতা ছেড়েছিল। চারদিনের বন্ধুত্ব, আর তারা থাকবে চারদিন। দুত্তোর! কিন্তু অবশ্য—যাক্।

তারা যখন বালির উপর গেল—আরও মনোরম সব ঘটনা ঘট্‌লো। এক তো জাপানী নাবিকদের ঘুঁড়ির প্যাঁচ। তার পর কতকগুলা কুকুর নিজেদের খেয়ালে সমুদ্রের জলে স্নান করছিল। ছেলেদের খেলা তো আছেই। তদুপরি দূরে দেখা গেল একখানা বড় জাহাজ।

অসীমের ভিতর হ'তে ধীরে ধীরে জেগে উঠ্‌ছিল জাহাজের রূপ। তাকে বন্দরে চালিয়ে আনবার জন্য পাইলটের ক্ষুদ্র জাহাজ তরঙ্গের উপর নাচ্‌তে নাচ্‌তে ছুট্‌ছিল। যদি প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করবার সময় কোনো ঝঞ্ঝাট হয়—বড় জাহাজকে ধাক্কা মারবার জন্য মোটা বেঁটে একখানা জাহাজ প্রণালীর প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে দোল খাচ্ছিল।

সত্যই এহেন কালে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে—জড় ও মানব প্রকৃতিকে অপমান করা হয়। যোগেশ হাত নেড়ে মেম সাহেবকে সকল দৃশ্য দেখাচ্ছিল, সকল কথা বোঝাচ্ছিল।

হঠাৎ রমেশ বল্লে—দেখ দেখ।

তারা দেখলে। অতর্কিতে দুর্বৃত্ত জাপানীর সুতা, তার নিজের অক্ষমতা এবং সাগরকুলের হাওয়া গণ্ডগোল ক'রে এক বিপর্য্যয় ঘটালে। ঘুঁড়ির সুতা মেমের সুবর্ণ কুন্তলের মধ্যে কি রকম ক'রে প্রবেশ করলে। তাকে খুল্‌তে গিয়ে অপ্রতিভ জাপানী আর সুতায় লাট না দিয়ে লাটাইকে অক্রিয় অবস্থায় চেপে ধরলো। বায়ুর চাপে ঘুঁড়ি বেগে সোজা মাথার উপর উঠ্‌লো। মেমের কানে সোঁ সোঁ ক'রে বায়ুর শব্দ হ'চ্ছিল—প্রলয় বিষাণের শব্দের মত।

সকলে নিজ নিজ ভাষায় বিষাদ-ধ্বনি করছিল—কিন্তু ব্যাপারটা মাত্র মুহূর্ত্ত ব্যাপী।

তিন বন্ধু সমস্বরে চীৎকার করে উঠ্‌লো—ভো কাটা।

কারণ কুপিত ঘুঁড়ি মাথার উপর উঠ্‌লো, আর তার টানে সে মেমের সমস্ত সোনার কেশের গুচ্ছকে তার মাথা থেকে টেনে শূন্যে তুল্‌লে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় জাপানী সামলাতে গিয়ে সুতায় নোল দিলে। শূন্যে উড়তে লাগলো মেমের পরচুল। রবি-কর তাকে দীপ্ত করলে, অনিল তাকে কাঁপালে।

নিমেষ বল্লে—ওরে পরচুল!

ভবেশ বল্লে—এ আবার কি? কারণ মাথায় শোনের মত পেঁচিয়ে কাটা পাকা চুল টিপে ধ'রে মেম যখন জাপানের সর্ব্বনাশ কামনা করছিল—অসাবধানতাবশতঃ তার উন্মুক্ত মুখ-বিবর হ'তে টপ্ টপ্ করে পড়লো—দু-পাটি মুক্তার মত দাঁত, স্বর্ণরেণুর মত চক্‌চকে বালির উপর।

রমেশ বল্লে—তাইতো কাকাবাবুর কথা শুনে—তেলেগু ভাষা বা জাহাজের চোঙার চর্চ্চা নিয়ে থাক্‌লে হত। আহা!

ভবেশ বল্লে—ঠিক্ বলেছিস্ বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং।

নিমেষ বল্লে—হ্যাঁ। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা—অল্ বাজে।

বাংলার শিল্পবাণিজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা

শ্রীসুনীলকুমার সেন এম-এ

বাংলা এবং বাঙ্গালী সম্বন্ধে বলতে গেলে বাঙ্গালীর অন্নসমস্যার কথাই প্রথম মনে আসে। আমাদের অন্নসমস্যার কথা নিয়ে খবরের কাগজে, মাসিকপত্রে আজকাল বহু প্রবন্ধ বের হয়—সেজন্য এ ধরণের প্রবন্ধ বড় কেউ একটা মনোযোগ দিয়ে পড়ে না, অথ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা নিয়ে ঘরে-বাইরে খুবই আলোচনা হয়। সাধারণ পাঠককে সেজন্য দোষ দেওয়া চলে না, কারণ মাসিকপত্র মানুষ যখন পড়ে তখন সাধারণত কিছুক্ষণের জন্য মনটাকে হাল্কা রাখবার উদ্দেশ্য নিয়েই পড়ে—মাসিকপত্রে আর আমাদের প্রতিদিনের দৈন্যের এবং ব্যর্থতার কথা শুনতে ভাল লাগে না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি কেবল আমাদের ব্যর্থতার কথাই বলব না, আশার কথাও অনেক বলব—কাজেই এতে একঘেয়েমি লাগবে বলে মনে হয় না। আশা করি, সাধারণ পাঠক এতে যথেষ্ট রস পাবেন।

গত কয়েক বছরের মধ্যে বাংলাদেশের ব্যবসাক্ষেত্রে যে একটা নূতন যুগের সূচনা হয়েছে তা বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করেছেন—বাঙ্গালীর মধ্যে ব্যবসাক্ষেত্রে তাদের যোগ্য স্থান ক'রে নেবার একটা প্রবল ইচ্ছা দেখা দিয়েছে। তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের মধ্যে ব্যবসা করবার প্রবল বাসনা থাকা সত্ত্বেও কার্য্যক্ষেত্রে আমরা আশানুরূপ অগ্রসর হতে পারছি নে—তাতে নিরাশ হবার কারণ নেই। এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের সকলের মধ্যেই চাকুরি করবার খুব বেশী ঝোঁক ছিল—ব্যবসার দিকে যাবার খুব বেশী আগ্রহ ছিল না। এদিকে অন্য লোকেরা আমাদের ব্যবসার দিকে মতি নাই দেখে তাদের সুবিধা করে নিয়েছে। এখন তাদের কাছ থেকে আমাদের যোগ্য স্থান দখল করে নিতেও কিছু সময় লাগবে এবং আমাদের মধ্যে ব্যবসা করবার ইচ্ছা নিয়ে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে সে উত্তেজনা গিয়ে কাজে প্রবেশ করতেও কিছুটা সময় লাগবে। প্রথমে ব্যাঙ্কিং ব্যবসার কথাই বলছি। গত চৈত্র মাসে অন্যত্র 'ব্যাঙ্কিং ব্যবসাতে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব' প্রবন্ধে আমি আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবসা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছিলাম। বর্ত্তমানে বাংলাদেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবসার দিকে লোকে যে খুব ঝুঁকেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ১৯৩৫-৩৬ সালের হিসাব অনুসারে বাংলার ব্যাঙ্কিং ব্যবসার অবস্থা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। নিম্নে ১৯৩৫-৩৬ সালের হিসাব দেওয়া গেল :

	সংখ্যা	ইচ্ছাকৃত মূলধন	স্বীকৃত মূলধন	আদায়ীকৃত মূলধন
ব্যাঙ্কিং কোং	৪৭৬	৮২,৯৭,৯৯,০০০	৬,৯৩,৫১,৯৩২	৩,৬৪,৮০,০৩০
লোন কোং	৫৬৬	৭,৪৪,৭৪,০০০	১,১৫,৭৭,০৩০	৫৯,৪১,৪৮৯

এই হিসাব থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বর্ত্তমানে বাংলাদেশে বহু ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কিং ব্যবসাতে লিপ্ত আছে। এই হিসাবের সঙ্গে বোম্বাই প্রদেশে যে সব ব্যাঙ্ক এ সময়ে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল তার একটা হিসাব নিলে দেখা যায় যে, বোম্বাই প্রদেশে এ সময়ে মাত্র ৬৯টি ব্যাঙ্ক বাংলাদেশে যত আদায়ীকৃত মূলধন আছে তা থেকে অনেক বেশী টাকা নিয়ে ব্যাঙ্কিং ব্যবসা করছে। অনেকে হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন, তা হ'লে আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবসার উন্নতি কি হ'ল? প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভুললে চলবে না যে, বোম্বাই প্রদেশের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া এবং ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ভারতের পাঁচটা বড় ব্যাঙ্কের মধ্যে স্থান! বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং কোঅপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক ফেল হবার পর বাংলার ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে যে দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছিল সে দুর্যোগ কাটিয়ে বাংলার ব্যাঙ্কিং ব্যবসা যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে খুবই আশার কথা। বর্ত্তমানে বাংলাদেশে সাতটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউল ভুক্ত ব্যাঙ্ক আছে। আরও খবর পাওয়া গিয়েছে যে, বাংলাদেশের কয়েকজন কৃতী ব্যবসায়ী মিলে খুব একটি বড় ব্যাঙ্ক খুলবার চেষ্টায় আছেন—ইহা খুবই আশার কথা।

এখন বাংলাদেশের কাপড়ের কলের কথা কিছু বলব। বর্ত্তমানে বাংলাদেশে ছাব্বিশটি কাপড়ের কল আছে। এ সকল মিলে যে কাপড় তৈরী হয় তাতে বাংলাদেশের কাপড়ের চাহিদা মিটাবার পক্ষে যৎসামান্য। আমাদের আরও মিল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। ১৯৩১ সালের হিসাব থেকে দেখা যায় যে বাংলাদেশে মোট তেরটি মিল ছিল, ১৯৩৭ সনে বাংলা-মিলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছাব্বিশটি। এ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, বয়নশিল্পে বাংলাদেশ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। বাসন্তী, লক্ষ্মীনারায়ণ, চিত্তরঞ্জন, বঙ্গশ্রী, বঙ্গোদয়, মহালক্ষ্মী, বঙ্গেশ্বরী, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কটন মিলস্ প্রভৃতি বাংলার নবযুগের প্রথম অবদান—আর এ নবযুগ আরম্ভ হয়েছে ১৯৩০ সনের পর থেকেই। বর্ত্তমানে আরও কাপড়ের কল রেজেষ্ট্রী হয়েছে এবং কয়েকটি মিল শীগগির কাজও আরম্ভ করবে। ১৯৩৭ সনের হিসাব অনুসারে দেখা যায়, বাংলাদেশে চৌত্রিশটি হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী কাজ করছে। বাংলাদেশে যে সমস্ত হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী আছে তার সংখ্যা কেবল পাঞ্জাব ছাড়া ভারতের যে কোন প্রদেশের হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী থেকে ঢের বেশী। পাঞ্জাবে বর্ত্তমানে পঁয়তাল্লিশটি হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী কাজ করছে। হোসিয়ারী শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা খুব লাভজনক কি-না সে বিষয়ে খুব বিশদভাবে আলোচনা করব না; তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে হোসিয়ারী ব্যবসা জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় খুব বেশী সুবিধা করে উঠতে পারছে না। তা ছাড়া, বাংলাদেশের হোসিয়ারী ফ্যাক্টরীর পক্ষে একটি মস্ত অসুবিধা যে গেঞ্জী প্রভৃতি বয়নের জন্য যে সূতার দরকার তা

এখানকার দু-একটি মিল ছাড়া পাওয়া যায় না, সে জন্য তাদের বাইরে থেকে নতুবা মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান থেকে সূতা আনতে হয়; তার ফলে খরচ কিছু বেশী পড়ে যায়। যদি বাংলার কটন্ মিলগুলি হতে বেশী পরিমাণ সূতা পাওয়া যেত, তা 'হলে বাংলাদেশের হোসিয়ারী মিলগুলির পক্ষে ব্যবসার দিক দিয়ে খুবই সুবিধা হ'ত।

বাংলা দেশ যে কেমিক্যাল ব্যবসায়ে অন্যান্য প্রদেশ থেকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে তা সকলেই জানেন। ১৯৩৭ সালের হিসাব হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে বর্ত্তমানে দশটি কেমিক্যাল কোম্পানী কাজ করছে। আমাদের বেঙ্গল কেমিক্যাল, ক্যাল্‌কাটা কেমিক্যাল প্রভৃতি কেমিক্যাল ব্যবসায়ে আমাদের বিজয় অভিযান ঘোষণা করছে। কিন্তু আমরা যা করেছি শুধ্ তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না—বৃহৎ আকারের আমাদের আরও নূতন কেমিক্যাল কোম্পানীর প্রয়োজনীয়তা আছে। আমাদের যে সমস্ত কেমিক্যাল কোম্পানী আছে তাতে কমার্সিয়াল কেমিক্যাল খুব কমই তৈয়ার হয়। বিলাতী ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল কোম্পানীর নাম বোধ হয় অনেকেরই জানা আছে, এই ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে আল্‌কেলী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ নাম দিয়ে আর একটি কোম্পানী গঠিত হয়েছে—এই কেমিক্যাল কোম্পানী Soda Ash প্রভৃতি কমার্সিয়াল্ কেমিক্যাল্ শীগ্‌গিরই প্রস্তুত করবে। তাছাড়া টাটা কোম্পানী বরোদা রাজ্যের ওখা বন্দরে অনেকটা জায়গা নিয়ে একটি বৃহৎ আকারের কেমিক্যাল কোম্পানী খুলছে। কাজেই আমাদের আরও নূতন্ নূতন বৃহৎ কেমিক্যাল কোম্পানী গঠন করা উচিৎ, যাতে আমরা কেমিক্যাল ব্যবসায়ে আমাদের যোগ্য স্থান বজায় রেখে চলতে পারি। বর্ত্তমানে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার হওয়ায় কমার্সিয়াল কেমিক্যালের যথেষ্ট চাহিদা আছে—কিন্তু বেশীর ভাগ কমার্সিয়াল কেমিক্যাল আমরা বিদেশ থেকে আনি—এদিকে বাঙ্গালী অগ্রসর হলে যথেষ্ট লাভবান হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সারা বৃটীশ ভারতে মাত্র চব্বিশটি কেমিক্যাল কোম্পানী আছে, তার মধ্যে বাংলাদেশেই ১৫টী। সাবান-শিল্প সম্বন্ধে এখন কিছু বলব। সারা বৃটীশ ভারতে মাত্র সতেরটি সাবানের কারখানা আছে, তার মধ্যে বাংলাদেশেই এগারটি, বোম্বাই প্রদেশে পাঁচটি, মাদ্রাজে একটিও নেই! কাজেই বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বাংলাদেশ সাবান তৈয়ারীর বিভাগে অন্যান্য প্রদেশকে অনেক ছাড়িয়ে গিয়েছে।

শর্করা এবং লবণ-শিল্পে বাংলাদেশ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে—সে কথাই এখন বলব। বাংলাদেশে যে কয়টি চিনির কল কাজ আরম্ভ করেছে এবং যে সব কল চিনি প্রস্তুত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপিত হয়েছে তার মোট সংখ্যা বর্ত্তমানে তেরটি। অনেকেই হয়ত জানেন যে, ১৯৩২ সনে শর্করা শিল্পকে protection দেবার পর হ'তে এদেশে শর্করা শিল্পের দ্রুত উন্নতি হয়েছে। বর্ত্তমানে আমরা যে চিনি প্রস্তুত করি, তা দিয়ে আমাদের দেশের চিনির চাহিদার সবই মিটাতে পারি—এখন অতিঅল্প পরিমাণেই আমরা চিনি বিদেশ হতে আনি। কিন্তু শর্করা-শিল্পকে protection দিবার আগে বেশীর ভাগ চিনিই আমরা বিদেশ হতে আনতাম্—কিন্তু বর্ত্তমানে তার পরিবর্ত্তে আমাদের দেশে এক বিরাট শর্করা-শিল্প গড়ে উঠেছে—কিন্তু আমরা বাঙ্গালীরা সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারি নাই। বর্ত্তমানে বিহার এবং যুক্তপ্রদেশে একশ তেরোটি চিনির কল আছে। আমাদের বাংলা দেশ শর্করা-শিল্প প্রসারের পক্ষে খুবই উপযোগী। শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন চৌধুরী মহাশয় বাংলাদেশ অন্যান্য প্রদেশ হতে যে সস্তায় চিনি প্রস্তুত করতে পারে তা বিশদভাবে তাঁর 'Prospect of the Cane Sugar Industry in Bengal' পুস্তকে দেখিয়েছেন। এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলতে চাই নে। ১৯৩০ সনে আইন অমান্য আন্দোলনের পর হতে আমরা আমাদের লবণ-শিল্প পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হয়েছি। বাংলাদেশে লবণ প্রস্তুত হতে পারে না, বাঙ্গালাকে এডেন এবং বোম্বাই প্রদেশ হতে লবণ এনে খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে—এ ধরণের অনেক কথাই অনেকেই বলেছেন। গভর্ণমেণ্ট থেকেও অনেক বাধা সৃষ্টির পর বর্ত্তমানে চারিটি কোম্পানী বাংলাদেশে লবণ প্রস্তুত করছে। বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর লবণ বাজারে বেশ চলছে। কিন্তু এ-কয়টি কোম্পানী বাংলাদেশের লবণের চাহিদা মিটাবার পক্ষে মোটেই পর্য্যাপ্ত নয়। তা ছাড়া, যদি লবণ-শিল্প বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করে তা হলে কেমিক্যাল ব্যবসায়েরও যথেষ্ট সুবিধা হয়। পূর্ব্বেই বলেছি যে, আল্‌কেলী কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ বাংলাদেশে শীগ্‌গিরই Soda Ash প্রস্তুত করবে এবং এই Soda Ash প্রস্তুত করতে লবণের যথেষ্ট প্রয়োজন হয়। এই কোম্পানী ঠিক করেছে যে তারা বাংলার বাইরে থেকে লবণ আনবে, কারণ বাংলাদেশে যে কয়টি কোম্পানী আছে এবং তারা যে পরিমাণ লবণ প্রস্তুত করে তাতে বাংলাদেশের চাহিদা মিটাবার পক্ষেই অপর্য্যাপ্ত। কাজেই লবণ-শিল্পের প্রসার হওয়া খুবই প্রয়োজনীয়।

আর একটি বিশেষ শিল্পের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। বর্ত্তমানে সারা বৃটীশ ভারতে রং প্রস্তুত করবার দশটি কারখানা আছে—তার মধ্যে বাংলাদেশেই সাতটি রং-প্রস্তুতের কারখানা আছে। এ থেকেই বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় যে এ শিল্প বিভাগে বাংলাদেশ বেশ এগিয়ে চলেছে। আমরা যে পরিমাণ রং বিদেশ থেকে আনি তার একটা হিসাব দিচ্ছি।

১৯৩৭-৩৮ সনে সারা ভারতবর্ষ ৭৪,৭৫,৫১৫ টাকার নানাজাতীয় রং এবং তার মালমসলা বিদেশ হতে এনেছিল, তার মধ্যে কেবলমাত্র বাংলাদেশেরই ৩৩,১১,৫৬৪ টাকার অংশ ছিল। বাংলাদেশ যদি এবিষয়ে আরও মনোযোগ দেয় তা হলে সুফল পাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

১৯৩৭ সনের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে ছয়টি সিল্ক মিল্‌স, চৌদ্দটি কাঁচের জিনিষ প্রস্তুত করবার কারখানা, ষোলটি রবারের কারখানা, নয়টি চূণ, সিমেণ্ট প্রভৃতি প্রস্তুতের কারখানা এবং কাগজের কল তিনটি আছে—এদিকে সারা বৃটীশ ভারতে আছে যথাক্রমে ৪৬,৬০,২৪,২৭ ও ১১টী কারখানা। এ থেকে বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এসকল শিল্প বিভাগেও বাংলা দেশ পিছিয়ে নেই। আর একটি অতি প্রয়োজনীয় কথা বলা

এখানে আবশ্যক বলে মনে করি। প্রত্যেক দেশেই যখন শিল্প বাণিজ্যের একটা নব যুগ আরম্ভ হয় তখন নানা রকমের শিল্প গড়ে তোলবার জন্য ছোট-বড় অনেক কারখানা স্থাপিত হয় এবং এ সকল কারখানায় অনেক রকমের যন্ত্রপাতি বসান হয় এবং এ সকল যন্ত্রপাতি যদি দেশে তৈয়ারী না হয়, তা হলে বিদেশ থেকে আনতে হয়। আমাদের দেশে এখন শিল্প-বিপ্লব সুরু হয়েছে এবং আমরা এখন বিদেশ থেকে বহু টাকার যন্ত্রপাতি আনি। বাংলা দেশের পক্ষে খুবই গৌরবের কথা যে, শ্রীযুক্ত আলামোহন দাস এদিকে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর ইণ্ডিয়া মেসিনারী কোম্পানীতে বর্ত্তমানে নানা রকমের যন্ত্রপাতি তৈয়ারী হচ্ছে। এদিকে বাংলাদেশ থেকে আরও চেষ্টা হওয়া দরকার।

সংক্ষেপে বাংলা দেশের শিল্প-প্রচেষ্টার শুধু একটা আভাষ দিয়ে গেলাম। উপসংহারে আমি শুধু এ কথাই ব'লব—দেশে যে শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হয়েছে, বাঙ্গালী তার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে না পারলে অবাঙ্গালীরা এর সুযোগ গ্রহণ করে অনেক এগিয়ে যাবে। আমরা বাঙ্গালীরা এখন কেবল ব্যাঙ্ক করা নিয়েই ব্যস্ত—অথচ বাংলার বহির্বাণিজ্য এবং অন্তর্বাণিজ্যে যে টাকাটা খাটছে আমাদের বাঙ্গালীর হাতে যদি তার একটা মোটা অংশও আসত তা হলে চিন্তার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে অবাঙ্গালীর হাতেই আমাদের অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্যের মোটা অংশ রয়েছে। আমাদের বাঙ্গালীদের এখন এদিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের শিল্পপ্রচেষ্টার যে একটা হিসাব দিয়েছি তা দেখে অনেকেরই মনে হতে পারে যে, সবগুলি শিল্পপ্রচেষ্টাই বুঝি বাঙ্গালার মূলধনে হয়েছে—কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয়, অবাঙ্গালীদের অনেক টাকাই এতে আছে। অনেকে আবার সব কিছু না জেনে অনেক সময় বলে থাকেন—বাঙ্গালীরা শিল্পবাণিজ্যে কিছুই অগ্রসর হতে পারছে না; একথাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন—গত দশ বছরে ব্যবসাবাণিজ্যে বাঙ্গালী অনেকটা এগিয়ে এসেছে। মিথ্যা অহঙ্কার অথবা মিথ্যা অপবাদ দূর করবার জন্যই এ প্রবন্ধের সাহায্য নিয়েছি।

রাতের কথা

শ্রীঅমরেশ দত্ত

তারাভরা এই রাতের আকাশ
কি কথা কহিছে শুনিতে পাও ?
শুনিতে চাও ?
উতলা হাওয়ায় কি কথা ছড়ায়
শুনিবে তাও ?
নিশীথ রাতের কালো বুকে তবে পাতিও কান ;
জনহীন পথে চাহিলে নীরবে
শুনিতে পাইবে হাওয়ার গান।

গাছে গাছে চেও ঝাঁকড়া চুলের আবছা মাঝে,
দেখিবে আকাশ মুখ লুকায়েছে ধূসর লাজে,
দেখিবে পাতারা ডাকিয়া কহিছে : 'শুনিয়া যাও ;
সেকথা তুমি কি শুনিতে চাও ?
গভীর রাত্রে দুয়ারে যখন আঘাত করিবে দখিনা বায়,
ঘুম ভেঙে যাবে অবলীলায়
বাহিরে আসিয়া—সুদূরে চাহিও
বিমুগ্ধ-চিত—অবাক প্রায়।
শুনিতে পাইবে কথা—কহিতেছে তারা ও চাঁদ,
দেখিতে পাইবে বহু কথা কয় নীরবতাও,
সেই কথা যদি শুনিতে চাও ?
অলস ঘুমের আবেশে-জড়ানো তোমার চোখে,
দিগদিগন্ত নাচিবে সহাসে স্তিমিতালোকে।
ফুলের গন্ধে ভরিবে পৃথিবী—ঘুম নীরব
কর্ম্মক্লান্ত পৃথিবী সে যেন কালের শব।
মৃত্যুর মাঝে শুনিবে তখন জীবনকথা,
ভাষাহীন দেশে শুনিবে ভাষার অজস্রতা।
দেখিবে তখন গাইতেও জানে—
আলো-ছায়া—আর কুসুমেরাও ;
সে গান কি তুমি শুনিতে পাও ?
সে কথা কি তুমি শুনিতে চাও ?

খাদ্য ও পরিপাক

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য্য ডি-টি-এম্

খাওয়া এবং হজম করা—দু'টোই শারীরিক ক্রিয়া, কিন্তু এই ক্রিয়াদুটির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। একটি কাজ জেনে করি, আর একটি করি না-জেনে। একটি ক্রিয়া ইচ্ছার অধীন, আর একটির সঙ্গে ইচ্ছার কোন সম্পর্কই নেই। ইচ্ছা করলে আমরা খানিকটা মিষ্টিও খেতে পারি, খানিকটা ঝালও খেতে পারি—বাজি রেখে, দু'সের রসগোল্লাও খেয়ে নিতে পারি, কিংবা খানিকটা বালি পর্য্যন্ত গিলে খেয়ে ফেলতে পারি—কিন্তু ইচ্ছা করলেই সেগুলো হজম করতে পারব না। কতটা খাব এবং কেমন জিনিষ খাব, সেটা নির্ভর করে আমাদের খুশীর ওপর, কিন্তু কতটা হজম করব এবং কেমন জিনিষ হজম করতে পারব, সেটা নির্ভর করে পেটের ভিতরকার অজ্ঞাত হজমশক্তির ওপর, সেখানে আমাদের খুশীর কোন অধিকার নেই। অতএব খাওয়া এক কথা, আর হজমকরা আলাদা কথা। কিন্তু তবু একটার ওপর আর একটা নির্ভর করছে। হজমশক্তির দিকে লক্ষ্য রেখেই চিরকাল আমাদের খেতে হবে, তার অন্যথা করতে গেলেই অনিষ্ট হবে, অসুখ করবে। সুতরাং দুদিকে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হয়। বেশী খেলেও চলে না, কম খেলেও না, শরীর রক্ষার জন্যে যতটা প্রয়োজন ততটাই খেতে হয়।

সুতরাং আসল কথা এই যে, শরীর রক্ষার প্রয়োজনের জন্যেই আমাদের খেতে হয়। আমরা যে কেবল খেতে ভাল লাগে বলেই খেয়ে থাকি তাও নয়, কিংবা প্রত্যহ খাওয়া অভ্যাস করে ফেলেছি বলেই প্রত্যহ খেয়ে থাকি তাও নয়—এ বিষয়ে আমরা যতই ভাবি না কেন, কিন্তু আসলে শরীরের প্রয়োজনের জন্যেই আমরা খাই এবং সেই জন্যেই আমাদের ক্ষুধা জাগে; সেই জন্যেই খাবার নামে আমাদের জিহ্বা লালায়িত হয়, তারপর সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই তখন পেটেও জায়গা থাকে না, খাদ্যেও বিতৃষ্ণা আসে, আর রসনাও বিমুখ হয়।

কিন্তু শরীর রক্ষার জন্যে খাদ্যেরই বা প্রয়োজন কেন? এমন কি হ'তে পারত না যে, কিছু না খেয়েই শরীর বেশ টি'কে রইল? মনে হয় তা যদি হ'ত তাহ'লে খুব ভালই হ'ত; তাহ'লে প্রত্যহ খাবার সংগ্রহ করবার জন্যে আমাদের এত প্রাণপাত চেষ্টাও করতে হ'ত না, আর রান্নাবাড়ার জন্যে এত রকম হাঙ্গামাও করতে হ'ত না। কিন্তু তা হয় না। দিনকতক না খেয়ে কোন রকমে থাকা যায় বটে, কিন্তু বেশী দিন নয়। তার কারণ আমাদের প্রত্যেকের শরীর এক একটি চলন্ত মেসিন। এ মেসিন দিবারাত্রই চল্‌ছে, এক মুহূর্ত্তও বিরাম নেই। জন্মাবার প্রথম মুহূর্ত্ত থেকেই এর চলা সুরু, মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এ চলবে। যখন নিজে একটু ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি তখনও আমার শরীরের বিশ্রাম নেই, তার মেসিন তখনও চল্‌ছে—সে তখনও নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে, তার হৃদ্‌পিণ্ড ধক্‌-ধক্‌ ক'রে রক্ত চলাচল করাচ্ছে, তার হজমের কাজও চল্‌ছে। গরমের সময় তার গা দিয়ে তখনও ঘাম বেরুচ্ছে এবং শীতের সময় কুঁকড়ে যাচ্ছে; অর্থাৎ ঘুমের সময় কেবল মস্তিষ্ক আর মাংসপেশীগুলোই বিশ্রাম নিচ্ছে, কিন্তু ভিতরকার অন্যান্য সব কাজই তখন চল্‌ছে। আর যখন আমরা জেগে থাকি তখন ত কোন কথাই নেই, তখন সচেতন হয়েই শরীরকে খাটাই, শরীর তখন একদফা ভিতর দিক থেকে খাটছে তার নিজের প্রয়োজনে, আবার বাইরের দিক থেকে আমার হুকুমে। সুতরাং যখন আমি জেগে থাকি তখন আমার দেহের মেসিন পুরোদমে চল্‌ছে, আর যখন ঘুমোই তখনও ধীরে ধীরে চল্‌ছে। সর্ব্বক্ষণই তার কাজ, একটুও বিরাম নেই।

কিন্তু মেসিন কিসের জোরে চলে? যে-কোন মেসিনই চালাতে গেলে তার জন্যে একটা শক্তি চাই, বিনা শক্তিতে কোন মেসিনই চলে না। এ শক্তি মেসিনের ভিতরে থাকে না, বাইরের থেকে জোগান দিতে হয়। এঞ্জিন চলে বাষ্পের জোরে, মোটরগাড়ি চলে পেট্রোল গ্যাসের জোরে, লোকে সাইকেল চালায় তাও চলে তাদের পায়ের জোরে।

সুতরাং প্রত্যেক মেসিন চালাবারই একটা কিছু শক্তি থাকা চাই, যাকে ইংরেজী ভাষায় বলে এনার্জি। সকল রকমের মেসিনই এই এনার্জির জোরে চলে এবং যতই মেসিন চল্‌তে থাকে, ততই এনার্জি খরচ হয়ে যেতে থাকে। সুতরাং ক্রমাগতই যদি মেসিন চালাতে হয় তা হ'লে ক্রমাগতই এনার্জির জোগান দিতে হয়। একটা এঞ্জিন যতক্ষণ চলবে ততক্ষণই তার বয়লার জ্বালিয়ে রাখ্‌তে হবে, নইলে এঞ্জিন চল্‌বে না। একটা মোটরগাড়ী যতক্ষণ চালাবে, ততক্ষণই তার পেট্রোল পুড়িয়ে যেতে হবে, পেট্রোল ফুরিয়ে গেলেই গাড়ী থেমে যাবে। মেসিন চালাতে গেলেই এনার্জি চাই, সেই এনার্জি উৎপাদন করতে গেলেই আগুন চাই, আর আগুন জ্বালাতে গেলেই তার জন্যে কোন একটা ইন্ধন চাই। এই ইন্ধন মেসিনের ভেতরের জিনিষ নয়, এটা বাইরে থেকে সরবরাহ করতে হয়। তেমনি আমাদের দেহের মেসিন চালাবার জন্যেও বাইরের ইন্ধনের দরকার, আর খাদ্যই হ'ল সেই ইন্ধন।

এঞ্জিনের সঙ্গে শরীরের তুলনা করাটা বোধ হয় শুনতে ভাল লাগ্‌ল না। এঞ্জিনের মধ্যে আগুন জ্বলে, কিন্তু শরীরের মধ্যে তো কই আগুন নেই। কিন্তু শরীরের মধ্যেও আগুন জ্বল্‌ছে, সে আগুন অত্যন্ত ধিকি ধিকি জ্বলে বলে তাই চোখে দেখতে পাই না। আগুন জ্বলা মানে কি? দাহ্য বস্তুর সঙ্গে অক্সিজেন মিশলেই যা হয় তাকেই বলে আগুন জ্বলা! যখন এই রাসায়নিক সম্মিলন খুব বেশী হয় তখন আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে, আর যখন অল্প হয় তখন ধিকি ধিকি জ্বলে, চোখে দেখা যায় না। আগুন সম্বন্ধে এই প্রকৃত সত্যের আবিষ্কার করেছিলেন চিরস্মরণীয় বৈজ্ঞানিক লাভোইসিয়র। অক্সিজেন এবং ইন্ধন—এই দুই বস্তুর একত্র সংযোগ না ঘটলে কোন আগুনই জ্বলবে না, কয়লায় যখন আগুন ধরানো হয় তখন হাওয়ার অক্সিজেনের সঙ্গে কয়লার সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের শরীরের মধ্যেও তাই হয়, বাইরের থেকে আমরা খাদ্য পাই আর নিশ্বাস বায়ুর সঙ্গে আমরা অক্সিজেন নিই, শরীরের মধ্যে গিয়ে এই দুই বস্তুর একত্র সংযোগ ঘটে, তাই থেকেই দাহ ঘটে, শরীরে উত্তাপ জন্মায় এবং তাই থেকেই শরীরে কর্ম্মশক্তি বা এনার্জি জন্মায়। হয়তো ভাবছি যে খাদ্যকে যে আমরা ইন্ধন বলে পাম্পি আর পেট্রোল কিংবা কয়লার সঙ্গে এর তুলনা করে যাচ্ছি—এ কেবল একটা উপমা দিয়ে বোঝাবার জন্যে। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়, খাদ্য বাস্তবিকই শরীরের ইন্ধন। খাদ্য মাত্রই দাহ্য বস্তু অর্থাৎ অক্সিজেনের সঙ্গে তাকে দাহ করলেই একটা তাপ উৎপন্ন হয়—এক রকম যন্ত্রের দ্বারা বাইরের থেকেও খাদ্যকে দাহ করে—এই তাপ মেপে দেখা যায়। কোন্ রকম খাদ্যের দ্বারা কতটা তাপ উৎপন্ন হতে পারে সেটাও জানতে পারা যায়। এই যন্ত্রের নাম—ক্যালোরিমিটার। এতে এক রকমের থার্মোমিটার লাগানো থাকে, আমাদের জ্বর-দেখা থার্মোমিটারের সঙ্গে তার কিছু তফাৎ আছে। এই থার্মোমিটারে ডিগ্রির পরিবর্ত্তে ক্যালোরি নামক এক স্বতন্ত্র রকম নির্দ্দিষ্ট মাপের দ্বারা উত্তাপের পরিমাপ নির্ণয় করা হয়। ক্যালোরি কাকে বলে? এক সের জলের টেম্পারেচার এক ডিগ্রি বেশী বাড়াতে হলে যতটা উত্তাপ লাগা প্রয়োজন ততটাই হ'ল এক ক্যালোরি। অর্থাৎ এক সের জল নিয়ে আগে দেখতে হবে তার কত টেম্পারেচার আছে। মনে করা যাক, পাওয়া গেল—পনর ডিগ্রি। তারপর তাতে উত্তাপ লাগাতে হবে। যেমনি দেখা যাবে জলটার টেম্পারেচার যোল ডিগ্রি হ'ল, অমনি বোঝা যাবে, অতটুকু গরম করতে এক ক্যালোরি উত্তাপ খরচ হয়েছে। এমনি ক'রেই উত্তাপের একটা নির্দ্দিষ্ট মাপ ঠিক করে নেওয়া হয়েছে। মাপ না হ'লে কোন কথাই নিখুঁত করে বলা যায় না, আর বিজ্ঞান কোন কথাই আন্দাজে বলার পক্ষপাতী নয়, সমস্ত কথাই সে মাপজোকের দ্বারা সঠিক ভাবে বলতে চায়। অতএব ক্যালোরিমিটার যন্ত্রের সাহায্যে আমরা জানতে পারি, প্রত্যেকটি নির্দ্দিষ্ট খাদ্যের ইন্ধন-মূল্য কত ক্যালোরি। এই ক্যালোরি যে কেবল উত্তাপেরই মাপ তা মনে করবার কারণ নাই, প্রকৃত পক্ষে এটা এনার্জিরই মাপ। কারণ উত্তাপ হ'ল এনার্জিরই এক রকম অভিব্যক্তি মাত্র, যেমন কর্ম্ম হ'ল তার অন্য রকমের অভিব্যক্তি। উত্তাপকে কর্ম্মে রূপান্তরিত করা যায়, আবার কর্ম্মকে উত্তাপে রূপান্তরিত করা যায়। সুতরাং ক্যালোরির মাপের দ্বারা আমরা এনার্জিরই পরিমাণ নির্ণয় ক'রে থাকি। কিন্তু তা যেন হ'ল—ক্যালোরিমিটার যন্ত্রের সাহায্যে যেন বুঝলাম কোন্ খাদ্য খেয়ে আমরা কতটা এনার্জি পেতে

পারি, কিন্তু যখন কতটা এনার্জি আমাদের শরীরের জন্যে দরকার, অর্থাৎ এই দেহ-মেসিনটাকে চালাবার জন্যে কখন কতখানি কয়লা কিংবা পেট্রোলের দরকার হবে—তা আমরা বুঝব কেমন ক'রে? তাও জানা যাবে ঐ ক্যালোরিমিটার যন্ত্রের সাহায্যে। মোটর গাড়ীতে কত মাইল যেতে হবে জানা থাকলেই আমরা বুঝতে পারি তার কতটা পেট্রোল লাগে। আমাদের দেহের মেসিনেও তেমনি আগের থেকে দেখা যায় কোন্ পরিশ্রমের জন্য কতটা এনার্জি খরচ হয়। সেও ঐ ক্যালোরিমিটার যন্ত্রের দ্বারা। অবশ্য তার জন্য একটা মস্ত বড় ক্যালোরিমিটার দরকার, প্রকাণ্ড একটা ঘরের মত। তার মধ্যে একটা মানুষকে ঢুকিয়ে পরীক্ষা করা হবে। এই রকম পরীক্ষার দ্বারা জানা গেছে যে, আমাদের কোন্ পরিশ্রমের দ্বারা কতটা এনার্জি খরচ হয়। এক ক্যালোরি পরিমাণ এনার্জি কতটুকু পরিশ্রমে খরচ হয়? ধরে নিলাম, একটা দরজার কাছেই কেউ চেয়ারে বসে আছে। দরজাটা ভেজানই আছে, ছিটকিনি লাগান নেই, লোকটি চেয়ার থেকে কেবল উঠে দাঁড়াল, ছিটকিনিটা লাগিয়ে দিয়ে আবার চেয়ারে বসে পড়ল। এতেই তার এক ক্যালোরি এনার্জি খরচ হয়ে গেল। এক ঘণ্টা পথে হাঁটলে কত খরচ হয়? ঘরে বসে থাকলে যত খরচ হয় তার চেয়ে একশত ষাট ক্যালোরি বেশি।

যাক্, বেশি হিসেব-নিকাশের মধ্যে যাবার আর দরকার নেই। মোটের উপর এই কথাটা আমরা বোঝাতে চাই যে খাদ্যে আমাদের প্রয়োজন আছে, যে প্রয়োজন কেবল রসনাতৃপ্তির কিংবা বিলাসের প্রয়োজন নয়, সে প্রয়োজন জীবনধারণের। খাদ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান এখন অনেক উন্নতি করেছে। এখন বিজ্ঞান নির্দ্দিষ্ট ক'রে বলে দিতে পারে যে, কার পক্ষে কোন্ কোন্ খাদ্য কতটা খাওয়া উচিত, কতটা খাদ্য খেলে কম হ'ল এবং কতটা খেলে বেশী হয়ে গেল। খাদ্য সম্বন্ধে এখন আর আগেকার কালের মত অন্ধ সংস্কারের বশে যেমন খুশী বলা চলে না। খাদ্য-বিজ্ঞান এখন জীববিজ্ঞানের অন্তর্গত একটি অত্যাবশ্যকীয় শাখা। খাদ্য নিয়ে অনেক এক্সপেরিমেণ্ট হয়ে গেছে এবং অনেক তথ্যের আবিষ্কার হয়ে গেছে। মানুষের শরীরের জন্যে কোন্ খাদ্যের কি প্রয়োজন, কোন্ খাদ্যের অভাবে কি অনিষ্ট হয়, সমস্তই এখন জানতে পারা যায়।

কিন্তু খাদ্য কি কেবল শরীরের কর্ম্মশক্তি উৎপাদনের ইন্ধনই জোগায়, আর কি তার কোন প্রয়োজন নেই? খাদ্যের আরও একটা মস্ত বড় কাজ রয়েছে—শরীরের ক্ষয় নিবারণ করা। একটা মেসিন থাকলে সেটা যে কেবল চালাতে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় তা নয়, চলতে চলতে সেটা ক্ষয়ে গেল কি-না, সেটার কোন অংশ ভেঙে নষ্ট হয়ে গেল কি-না, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হয় এবং থেকে থেকে তার রীতিমত মেরামতি করতে হয়। লোহার মেসিনে আর আমাদের দেহের মেসিনে এবিষয় তফাৎ আছে। লোহার মেসিনের অংশগুলি রোজ রোজ ক্ষয়ে যায় না। কিন্তু মানুষের শরীরের অংশগুলি সে রকম নয়, এর প্রত্যেকটি অংশ জীবন্ত এবং প্রত্যেকটি জিনিষ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবকোষ দিয়ে তৈরী। জীবন-ক্রিয়ার সংঘর্ষের ফলে এই সকল কোষ প্রত্যহই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভেঙে চুরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একদিক থেকে কোষগুলি ভাঙছে, আর একদিক থেকে সঙ্গে সঙ্গে নতুন কোষ সৃষ্ট হয়ে তার স্থান অধিকার করছে। এটা কিসের দ্বারা সম্ভব হয়? খাদ্যের দ্বারাই জীবন্ত কোষগুলি একে একে পুষ্ট হয় এবং তার থেকেই নূতন কোষ জন্মলাভ করে মৃত কোষের স্থান পূর্ণ করে। এমনি করেই খাদ্য আমাদের শরীরকে নিত্য সমান অবস্থায় রাখে, তার গঠন নষ্ট হতে দেয় না, তাকে শুকিয়ে রোগা হয়ে যেতে দেয় না।

শুধু এই নয়। শরীরের মধ্যে এমন অনেক জিনিষ আছে যেগুলো শরীরের ভিতর থেকে নিত্য বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। যেমন জল। আমাদের শরীরের মধ্যে অনেকখানি জল থাকা চাই, নইলে এর কোন এঞ্জিনই চলবে না, কোন এনার্জিই জন্মাবে না। ঐ জল কিন্তু নিত্যই বেরিয়ে যাচ্ছে মল মূত্র দিয়ে, ঘাম দিয়ে, নিশ্বাস বায়ুর বাষ্প দিয়ে, এমন কি নাকের সর্দ্দি, মুখের থুতু এবং চোখের অশ্রু দিয়ে। শরীরের ময়লা ধুয়ে নিয়ে এই জল বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। খাদ্য পানীয়ের মধ্যে দিয়ে রোজই আমাদের এই জলের ক্ষতি পূরণ করতে হবে। এমনি আরও অনেক জিনিষ আছে, যেমন—নুন, চুণ, লৌহ, পটাসিয়ম ম্যাগ্নিসিয়ম, আইওডিন প্রভৃতি নানা রকম পার্থিব এবং ধাতব পদার্থ। এগুলোও শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, প্রত্যহ তার জোগান দিতে হয়। তা ছাড়া, আরও সূক্ষ্ম বস্তু আছে যা শরীরকে

অক্ষত এবং নীরোগ রাখবার জন্ম খাদ্যের সঙ্গে জোগান দিতে হয়, যেমন কয়েক প্রকারের ভিটামিন।

তা হ'লে এখন আমরা খাদ্য বলতে কি বুঝব, খাদ্যের প্রকৃত সংজ্ঞা কি হবে? যে কোন জিনিষ জীবন্ত দেহের মধ্যে গিয়ে উত্তাপ এবং কর্ম্মশক্তির সৃষ্টি করবে, শরীরের ক্ষয় ও ভাঙাচোরা মেরামত ক'রে নতুন নতুন কোষের গঠন করবে এবং চারিদিকে সামঞ্জস্য বজায় রেখে জীবন ধারণের সমস্ত কাজগুলো চালিয়ে দেবে—তাকেই বলা যাবে খাদ্য।

খাদ্যের যখন অনেক রকমের কাজ, তখন খাদ্য এক-রকমের হতে পারে না। কতকগুলো খাদ্য আছে যা কেবলই উত্তাপ এবং এনার্জির সৃষ্টি করে। সেইগুলো কার্বোহাইড্রেট। কতকগুলো আছে যা প্রধানত শরীরকে গড়বার কাজেই লাগে। সেইগুলো প্রোটিন। কতকগুলো আছে যা প্রধানত শরীরে উত্তাপ এবং চর্ব্বি জন্মায়, সেইগুলো ফ্যাট। কতকগুলো আছে যাতে লবণাদি নানা রকম ধাতব পদার্থ আছে। সেগুলো ধাতু-প্রধান খাদ্য। কতকগুলো আছে যাতে ভিটামিন থাকে—সেগুলো ভিটামিন-প্রধান খাদ্য।

এমনি ক'রে খাদ্যকে কয়েকটা প্রধান প্রধান ভাগে ভাগ ক'রে ফেলা যায়। বলা বাহুল্য, এই খাদ্যবিভাগ কারও মনগড়া নয়, এর প্রত্যেকটির রাসায়নিক অর্থ আছে এবং প্রত্যেক খাদ্যের বিভিন্ন শক্তি দেখেই সেগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এখন খাদ্যগুলোর একটু মোটামুটি পরিচয় দিই। কার্বোহাইড্রেট খাদ্য-তালিকার মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিষ পড়ে? মাটিতে যে সব শস্য এবং বীজ জন্মায়, মাটির নীচে যে সব কন্দ আর মূল জন্মায়, সমস্তই এই তালিকার অন্তর্গত। মানুষের যা প্রধান খাদ্য—কোন দেশে বা ভাত, কোন দেশে বা রুটি, তাও এই বিভাগেই পড়ে। চাল, যব, গম, বার্লি, সাগু, এরারুট, সমস্তই এই শ্রেণীর।

আবার আলু, মূলা, ওল, কচু, মান, গাজর—এই-গুলোও সব এই শ্রেণীর মধ্যে। কথাগুলো একটু মনে রাখা দরকার; কিন্তু সব চেয়ে মনে রাখা দরকার এই যে, দুনিয়াতে যত রকমের মিষ্ট খাদ্য আছে সবই কার্বো-হাইড্রেট। ভাত, রুটি, আলু প্রভৃতি সবই যে একটু একটু মিষ্টি লাগে তাতো সকলেরই জানা আছে। কিন্তু আসল মিষ্টি বলতে যা বোঝায়, চিনি, গুড়, মধু প্রভৃতি—সবই কার্বোহাইড্রেট। চিনি হয় কিসের থেকে? বীট থেকে। গুড় কিসের থেকে হয়? আখের কিংবা খেজুরের রস থেকে। আম, কাঁঠাল, কলা প্রভৃতি ফলগুলো এত মিষ্টি কেন? ওর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট রয়েছে। কার্বোহাইড্রেট মাত্রই মিষ্টিতে ভরা। কার্বোহাইড্রেট মাত্রই এক বিশিষ্ট রকমের স্বতন্ত্র খাদ্য, পেটের মধ্যে গিয়ে তা সমস্তই এক স্বতন্ত্র রকম ভাবে হজম হয়। এই জাতীয় খাদ্যকে হজম করাবার জন্যে প্রকৃতি পেটের মধ্যে কয়েক রকম স্বতন্ত্র পাচক রসের সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। সেগুলো কেবল এই কাজেই লাগে। কার্বোহাইড্রেট মাত্রই হজম হয়ে শেষ পর্য্যন্ত সবই একটি জিনিষে গিয়ে দাঁড়ায়। সেটা কি? সে একরকম চিনি, তার নাম গ্লুকোজ। এই গ্লুকোজই শরীরের প্রত্যেক অংশে গিয়ে প্রকৃত ইন্ধনের কাজ করে অর্থাৎ অক্সিজেনের সংযোগে পুড়তে থাকে, আর কাজ করবার এনার্জি জোগান দিতে থাকে।

এর পর ধরা যাক প্রোটিন। এর তালিকার মধ্যে কোন্গুলো পড়বে? সব চেয়ে সেরা প্রোটিন হচ্ছে মাংস, তা সে যে-কোন জন্তুরই হোক। দেখা গেছে যে, নানারকম জন্তুর মধ্যে মুরগীর মাংস আর ছাগলের মাংসই সব চেয়ে ভাল। মাছের মাংসও উত্তম প্রোটিন। ডিমও উৎকৃষ্ট প্রোটিন। কিন্তু আবার আমিষ প্রোটিন ছাড়া নিরামিষ প্রোটিনও আছে। যেমন দুধের ছানা এবং চীজ্ বা পনির। মাংসের চেয়ে এর প্রোটিন নিকৃষ্ট নয়। দুধ হ'ল একরকম পাঁচমিশালী প্রোটিন খাদ্য, অথচ একেবারে নিরামিষ এবং দুধের ছানাতে ওর প্রোটিন অংশটাই জমাট হয়ে বেরিয়ে আসে। দুধ ছাড়া আরও নিরামিষ প্রোটিন আছে, যেমন ডাল, কলাইশুঁটি, বরবটি, পেস্তা, বাদাম প্রভৃতি। অবশ্য এগুলোর মধ্যে প্রোটিনের অংশ কম। রীতিমত প্রোটিন বলতে মাছ মাংসগুলোকেই বোঝায়। এই প্রোটিন জাতীয় স্বতন্ত্র খাদ্যগুলিকে হজম করবার জ[illegible]ও পেটের মধ্যে স্বতন্ত্র রকমের ব্যবস্থা আছে, তার জন্যে আবার স্বতন্ত্র রকমের পাচক রস আছে, তার ক্রিয়া কেবল প্রোটিনেরই উপর, কার্বোহাইড্রেটের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই। প্রোটিন ভিন্নরকম ভাবেই হজম হবে, তার পরিণতিও ঘটবে ভিন্নরকম। প্রোটিন ভেঙে গিয়ে তখন যা হবে তার নাম য়্যামিনো-এসিড। এই য়্যামিনো এসিড শরীরের

প্রত্যেক অংশে গিয়ে আবার গড়ে উঠবে শরীরের নিজস্ব প্রোটিন রূপে। আমাদের দেহের সেই প্রোটিনই দিনরাত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে এবং বাইরের প্রোটিন এসে হজম হয়ে আবার নতুন শারীরিক প্রোটিন গড়ে তুলছে। সুতরাং প্রোটিনের কাজই হ'ল ঐ, প্রত্যহ নতুন মালমশলা দিয়ে প্রাত্যহিক ভাঙাচোরা মেরামত করে শরীরের গঠন বজায় রাখা।

এর পর ধরা যাক্, ফ্যাট বা চর্বিজাতীয় খাদ্যের কথা। আমরা যত রকমের তেল, ঘি কিংবা চর্বি খাই, সবই এই জাতীয় খাদ্যের অন্তর্গত। তেল আর ঘি-এর মধ্যে বিশেষ কোনও তফাৎ নেই—তেলটা উদ্ভিজ্জ পদার্থ আর ঘিটা জান্তব পদার্থ, এই যা তফাৎ ; কিন্তু শরীরের কাজে দুইই সমান। কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের যা কাজ, চর্বি জাতীয় খাদ্যেরও তাই কাজ, অর্থাৎ—এর দ্বারা শরীরের উত্তাপের সৃষ্টি হয় এবং ইন্ধনের কাজ হয়, আর বেশী পরিমাণে খেলে এর থেকে দেহে চর্বি জন্মায়। কার্বোহাইড্রেট খাদ্যের দ্বারাও তাই হয়, অর্থাৎ—কেবল ঘিমাখন নয়, ভাতরুটিও বেশী পরিমাণে খেলে তার থেকে শরীরে চর্বি জন্মায়। চর্বি খাদ্যে আর কার্বোহাইড্রেটে গুণের তফাৎ এই যে, চর্বি খাদ্যের ক্যালোরি-মূল্য কার্বোহাইড্রেটএর ঠিক্ দ্বিগুণ, অতএব কার্বোহাইড্রেট যতটা পরিমাণে খেলে যে কাজ হয়, চর্বি খাদ্য তার অর্দ্ধেক পরিমাণে খেলে সেই কাজ হয়। যারা কার্বোহাইড্রেট খুব বেশী পরিমাণে প্রত্যহ খায়, যেমন আমরা বাঙ্গালীরা খেয়ে থাকি, তাদের পক্ষে চর্বিজাতীয় খাদ্য বিশেষ না খেলেও চলে। চর্বি খাদ্যের দরকার বেশী শীত-প্রধান দেশে, যেখানে শরীরে অনেক উত্তাপ জমানো দরকার। মেরুপ্রদেশের এস্‌কিমোরা শুধু তিমি মাছের চর্বি আর মাংস খেয়েই বেঁচে থাকে। কিন্তু আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তা চলবে না। বলা বাহুল্য আমাদের পেটের মধ্যে চর্বিখাদ্য হজম করবার প্রক্রিয়া একেবারে স্বতন্ত্র এবং হজম হবার পর সেটা শরীরের মধ্যে সঞ্চারিত হবার রাস্তাও আলাদা।

এর পর আসে ভিটামিনের কথা। এর কথা আমরা পূর্ব্বে জানতাম না। মাত্র পঁচিশ বছর আগে জানা গেছে যে কতকগুলি খাদ্যের মধ্যে এক স্বতন্ত্র রকমের উপাদান আছে, তার নাম ভিটামিন। এটা টাটকা স্বাভাবিক খাদ্যের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম মাত্রাতেই থাকে এবং খুব অল্প মাত্রাতে খেলেই এর কাজ হয়ে যায় ; কিন্তু সেইটুকু আমাদের খাওয়াই চাই, নইলে পেটভরা খাদ্য খেলেও শরীরের পুষ্টি হবে না, আর কয়েক রকমের অসুখ জন্মাবে। বর্ত্তমানে জানা গেছে যে, ছয় রকমের আলাদা আলাদা ভিটামিন আছে, যার অভাবে ছয় রকমের বিভিন্ন জাতীয় রোগ জন্মায়। সুতরাং ঐ সকল রোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে সব রকমের ভিটামিনই কিছু কিছু খাওয়া চাই। ইংরেজী বর্ণমালার এ, বি, সি, ডি, ই অক্ষরগুলি দিয়ে ঐ সকল ভিটামিনের স্বতন্ত্র নাম-করণ করা হয়েছে। কোন্ জাতীয় ভিটামিন কোন্ খাদ্যের মধ্যে আছে, সব কথা জানবার দরকার নেই। মোটের উপর এই জানলেই যথেষ্ট হ'ল যে, টাটকা শাকসব্জী এবং ফলমূল আর দুধ, মাখন, ডিম প্রভৃতির মধ্যে সব রকমের ভিটামিনই থাকে। ভিটামিনের অভাব যাতে না ঘটে সে জন্য বিশেষ ক'রে আমাদের টাটকা শাকসব্জি এবং ফলমূল কিছু পরিমাণে খাওয়া উচিত।

অবশেষে বাকি রইল লবণ প্রভৃতি কতকগুলো পার্থিব এবং ধাতব পদার্থের কথা। এই শ্রেণীর মধ্যে নানারকমের রাসায়নিক বস্তু আছে। কেবল এইটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট যে শাকসব্জির মধ্যে এবং দুধে ও ডিমে এই সকল লবণাদি দ্রব্য প্রচুর পরিমাণেই থাকে, সুতরাং তার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা এগুলো পেয়ে যাই।

যাক্ মোটের উপর বোঝা গেল যে আমরা যে পাঁচ-মিশেলি রকমের খাদ্যগুলো খেয়ে থাকি, তার মধ্যে প্রত্যেকটারই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া আছে। আমরা যে ভাতরুটি এবং মিষ্টি খাই সেগুলো দেয় কাজ করবার শক্তি, মাছ মাংস দুধ এবং ডিম প্রভৃতি থেকে পাই শরীরের গঠন, ঘি তেল প্রভৃতির থেকে পাই শরীরের উত্তাপ, আর শাকসব্জি ফলমূল তরিতরকারী প্রভৃতির থেকে পাই ভিটামিন এবং লবণাদি। ভালো ক'রে বেঁচে থাকতে হ'লে সব রকম খাদ্যই আমাদের খেতে হবে, কোনটাই বাদ দিলে চলবে না। কেউ যে বলবেন আমি দুধ খাব না, ভাত তরকারী খাচ্ছি আবার কচি খোকার মত দুধ খাব কি, তা হ'লে চলবে না। আমরা মাছমাংস কম খাই, প্রোটিন খাদ্য আমাদের খুব কমই পেটে যায়,

অতএব দুধটা আমাদের প্রত্যেকেরই খাওয়া দরকার, বিশেষত আমাদের ছেলেমেয়েদের, নইলে প্রোটিনের অভাবে শরীরের গড়ন হবে না। ভাত তরকারী দিয়ে কখনও প্রোটিনের কাজ হয় না। যে কাজের জন্যে যে খাদ্য নির্দ্দিষ্ট, সেইটি ছাড়া অন্য খাদ্যের দ্বারা সে কাজ আংশিকভাবে হ'তে পারে বটে কিন্তু পরিপূর্ণ ভাবে কখনই হয় না। সেইজন্যে এখনকার বিজ্ঞান বলছে যে, আমাদের balanced diet খাওয়া চাই, অর্থাৎ সকল রকমের খাদ্যগুলিই এমনভাবে অল্পবিস্তর ক'রে খাওয়া চাই—যাতে সব দিক দিয়ে আমাদের শরীরের সামঞ্জস্য রেখে চল্‌তে পারে; কোন দিক থেকে কোন রকম অভাব না ঘটে।

এক বন্ধু সেদিন বলছিলেন যে তোমাদের এ সব বাজে থিওরি। আমি নিরামিষ খেয়ে দিব্য সুস্থ শরীরে রয়েছি, দুধও খাই না, মাছমাংসও খাই না, অথচ রোগাও হচ্ছি না, দিব্যি মোটা হয়ে আছি। আমি অবশ্য হিসেব ক'রে তাঁকে দেখিয়ে দিতে পারতাম যে ছানা এবং ডালের সঙ্গে—ছোলা মটর বরবটি প্রভৃতির সঙ্গে এবং আরও অন্য রকম খাদ্যের সঙ্গে নিশ্চয়ই কিছু কিছু প্রোটিন খাচ্ছেন। কিন্তু তা ছাড়াও আর একটা কথা আছে। কেবলমাত্র বেঁচে থাকা এবং ভালো রকম ভাবে বেঁচে থাকার মধ্যে তফাৎ অনেক আছে। সে তফাৎ স্থূল চোখে ধরা যায় না, একটু পর্য্যবেক্ষণ ক'রে দেখতে হয়। একজন ইংরেজের জীবন আর একজন বাঙালীর জীবনে তুলনা ক'রে দেখলেই এই তফাৎটা ধরা পড়ে যাবে। সমগ্র ইংরেজ জাতির সঙ্গে আর বাঙালী জাতির সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখলে এই তফাৎটাই স্পষ্ট হবে। গাছ ত উর্ব্বরা ভূমিতেও জন্মায়, আবার টবের মাটিতেও জন্মায়। ভূমির গাছও গাছ, আর টবের গাছও গাছ, দুই গাছেরই ডালপালা আছে, দুই গাছেই একই রকমের ফুল ফোটে। কিন্তু তবু কি দুই গাছের মধ্যে তফাৎ নেই? তার তেজে, তার বাড়ে, তার চেহারায় অনেক তফাৎ আছে। বেঁচে থাকতে হলে কোন রকমে ঐ রকম টবের গাছের মত খর্ব্ব হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে উর্বরা ভূমির গাছের মত সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে বেঁচে থাকাই সকলের কাম্য।

সনেট

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্‌-এ

যবে আসি' জীর্ণজরা শুভ্র তুলি ধরি'
রঞ্জি' দিবে মোর মেঘ-কৃষ্ণ এ কুন্তল—
সে দিন কি—সত্য করি, কহলো সুন্দরী!—
তব মৃগ-নেত্র হ'তে ঝরিবে না জল?
যবে—যাবে এ যৌবন যাবে চলি ভাসি'—
তুলিবে কল্লোল-মন্দ্র কালের জোয়ার;
মৃত্যু এসে অবশেষে বাজাইবে বাঁশি
পূরবীতে—জাগাইয়া গূঢ় হাহাকার
রন্ধ্রে রন্ধ্রে; সেদিন কি বসি' বাতায়নে—
রাখিয়া কপোল'পরে চম্পক অঙ্গুলি,—
স্মরিবে বিরলে সখি, ব্যথাতুর মনে
আজি এই যৌবনের মধুলগ্নগুলি?
তোমার ও বুক-ভাঙ্গা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
করিবে কি সেদিনের সন্ধ্যারে উদাস?

প্রেম

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

একদিন প্রেম মোর ছিল সখি মুদিত কমল,
পরম সঙ্কোচ-ভীরু আড়ালের যবনিকা টানি'
দুর্ভেদ্য রহস্য মাঝে সে থাকিত সঙ্গোপনে জানি
সলজ্জ বঁধূর মত—মৃগসম স্বপন বিহ্বল;
অতনুর পুষ্প-শরে ভাঙে তন্দ্রা, পাষাণ-শিকল,
প্রতি অঙ্গে লাগে দোলা অবরুদ্ধ কামনা-আহত,
প্রাণ-বীণা কাঁপে খালি সমুদ্রের তরঙ্গের মত,
বুকে ভাসে ফেনপুঞ্জ দ্রাক্ষারস স্নিগ্ধ ঢল ঢল।
দুর্জ্জেয় বিলাসস্বপ্নে ছিলে বসি নিকুঞ্জ-কাননে
প্রথম-প্রণয়-মুগ্ধ অপরূপ হে মোর সুন্দরী,
দুটি আঁখি-পদ্ম-প্রান্তে ঝলমল অশ্রুমুক্তা ভরি'
তুমি কেন উচ্ছ্বসিত মন-ভোলা কুসুম-চয়নে?
আমি এসেছিনু অয়ি লজ্জারক্তা! স্পর্শ-নিপীড়নে
তোমার নিকটে প্রিয়া,—লয়ে প্রেম-স্পন্দিত-মঞ্জরী।

প্রথম প্রেম

শ্রীইন্দ্রাণী রায়

এমন অপরূপ দেহসৌষ্ঠব যে মেঘনাথের বন্ধুরা তাকে বলে—য়্যাপলো। শুনিয়া মেঘনাথের নিটোল মুখে একটা উল্লাস বেদনার ছায়া ফুটিয়া ওঠে। য়্যাপলো, কন্দর্প, কার্ত্তিক—রূপের এ ব্যাখ্যা শুনিতে ক্রমেই সে হয় অভ্যস্ত। কোন-কোন সময় আক্ষেপের সুরে বন্ধুদের বলে—পুরুষের রূপের মূল্য কিরে? মেয়ে হয়ে জন্মালে হয় ত···না—তাও যে হত না! 'সোনার পাথরবাটি'—লোকে কথায় বলে···

মেঘনাথ যুবক। রাতদিন গানবাজনা আর জলসার সমারোহে তাহার দিন কাটিয়া যায়। মধুচক্র আবেষ্টনের মত বন্ধুর দল সর্ব্বদাই যেন ওকে ছাঁকিয়া আছে। তবে তপন রায়ের কথা আলাদা। মাতৃপিতৃহীন ছেলেটির এ বাড়িতে শুধু অবস্থানই নয়, মেঘনাথের সহোদরতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মেঘনাথের জীবনে সকল সমারোহের মূলেই তপন। সে ছাড়া শুধু বাহিরই নয়, মেঘনাথের ভিতরও যেন অন্ধকার মনে হয়। গানের জল্সায় রাত্রি গভীর হইয়া ওঠে। সুরলালিত্যে তান-লয়ের অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনায়—আলোর চমকে প্রকাণ্ড 'হল'-ঘরটা নৃত্যপরা তরুণীর মতই সজীব ও লীলায়িত হইয়া ওঠে। তার পর এক সময় সভা ভাঙ্গে—বন্ধুর দল চলিয়া যায়। সুরহীন স্তব্ধ কক্ষের আকস্মিক শূন্যতা মেঘনাথকে গভীর বেদনা দেয়। শুভ্র ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া বহুক্ষণ সে নিঃশব্দে পড়িয়া থাকে। তার পর হঠাৎ কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, অভ্যাসবশে বড় ঝাড়ের বাতিটা নিভাইয়া দিয়া এতবড় ঘরটাকে সম্পূর্ণ আঁধার করিয়া বলে—'চল হে তপু, ওপরে চল।' এতক্ষণ ধরে খালি গান—আর গান—ওঃ এতও পারে ওরা!'

মেঘনাথের কণ্ঠস্বর ঔদাস্যে ভরা!

তপন মৃদু হাসিয়া জবাব দেয়—'আজ ত তুমিই গাইলে, ফরমাস অবশ্যি ওদের তরফ থেকেই ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, সবচেয়ে জ্ঞানহারা হও তুমিই। রামচরণ ওপরে যাবার জন্যে তাগিদ দিয়ে গেছে কতবার, তাড়িয়ে দিয়েছ, খেয়াল আছে?'

'তুই অমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি কবে থেকে পেলি রে?' দোতলায় উঠিবার মুখে সিঁড়ির ধাপে দাঁড়াইয়া মেঘনাথ বলে। 'অন্ধ আতুরের প্রতি অমন ধারাল দৃষ্টি দিলে কি উপায় হবে বল্ ত।'

নিঃশব্দে তপন উপরের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। মেঘনাথও পায়ে-পায়ে অগ্রসর হইয়া ঘরে ঢুকিয়াই বসিবার উপক্রম করিয়া কহিল—'আঃ—সোফা একটা পাচ্ছিনে—'

লক্ষ্য করিয়া তপন দেখিল ঘরের আসবাবপত্রগুলো এদিক সেদিক স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। বন্ধুর হাত ধরিয়া যথাস্থানে বসাইয়া দিয়া কহিল—'এই যে, এইখানে রয়েছে।'

মেঘনাথের এমন ধারা কথায় তপন অভ্যস্ত হইয়া গেছে। তবু মাঝে মাঝে নিজেরই অজ্ঞাতে মনটা ভারি হইয়া ওঠে। নিজেকে হাল্কা করিবার উদ্দেশে কথার মোড় ঘুরাইয়া তপন কহিল—'যেতে দাও ওসব কথা এখন। আমার সব কথাই ত তুমি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নাও। একটা কথা বল্‌ছি শোন। বাজনায় যখন তোমার হাত এতটা খুলেছে—ওস্তাদ হাসান আলী—স্বরদ আর সেতার দুটাতেই এক্সপার্ট' তিনি, তাঁকে রাখতে পারলে—'

'খুব বড় ওস্তাদ ব'নে যাব, এই ত!' ক্লান্তস্বরে মেঘনাথ কহিল। 'আর কেন তপু, দুনিয়াই যার কাছে বেমালুম আঁধার ব'নে গেছে, হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে হোঁচট খেয়ে রক্তাক্ত আর সে না-ই বা হ'ল।'

কথা শেষ করিয়া মেঘনাথ গানের কলি টানিল—'কোথায় আলো, কোথায় আলো, আকাশভরা কালোয় কালো—'

কিন্তু এইদিকে রাইটিং টেবিলটার উপর মাথা রাখিয়া তপন চোখের জল সামলাইতে ব্যস্ত। রাত্রির আহারের জন্য তাগিদ দিতে চন্দ্রাবতী ঘরে প্রবেশ করিলেন। মুহূর্ত্তকাল

দুইজনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—'ছাথ্ ছাথ্, পাগল ছেলে দু'টার কাণ্ড! একজন গাইছে, আর একজন মেয়েদের মত আঁচলে চোখ মুচ ছে!

'য়্যাঁ। কি বলছ মা! তপন—কাঁদছে? তা হ'লে আমার চাইতে দুঃখীরও অভাব নেই দেখ্ ছি—'

'মনের দিক দিয়েও যে তুমি অন্ধ ব'নে গেছ তা জান্তাম না। তুমি সবাইকে একই ধারণা দিয়ে বিচার কর, তাতে অন্তের কতখানি লাগতে পারে মুহূর্ত্তের জন্তেও বোধ হয় সেটা কোন দিন ভেবে দেখনি।'

একটু উষ্ণ হইয়াই চেয়ার ছাড়িয়া তপন উঠিয়া দাঁড়াইল।

'আচ্ছা, তোরা কি সব ক্ষেপেছিস্ মেঘু? ধাড়ি ছেলে সব, ছিঃ ছিঃ। তুই আবার চিরকালের জন্ত তপুকে রাখতে চাস্ এ বাড়িতে! না-ই বা আছে ওর সংসারে কেউ, এখানে ওকে আমি কিছুতেই রাখব না—' বাহিরে যাইবার জন্ত দরজার দিকে চন্দ্রাবতী আগাইয়া যাইতেই হাসিমুখে তপন গিয়া পথ রোধ করিয়া কহিল—'কেন আমাদের অপরাধী ক'রে তুলছেন মা। সব সংসারেই ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া অমন হয়েই থাকে, তা নইলে ঝগড়া করতে যাব কি বামুনঠাকুর আর চাকরের সঙ্গে?'

উচ্চস্বরে মেঘনাথ হাসিয়া উঠিল। কহিল—'আমাদের জন্ত মা'র বড্ড ভয়—কোন্ দিন দুজনে খুনোখুনি কাণ্ড করি—অবশ্য আমি কেটে ফেললেও তপু ওয়াণ্ডারফুল নন-ভায়োলেন্সের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দেবে, কাজেই তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার মা!'

'আঃ, আর আমায় জ্বালাস্‌নে বাপু, বারোটা রাত হতে চলল, খেয়ে দেয়ে আমায় উদ্ধার করে দে!'

খাওয়ার ঘরের দিকে চন্দ্রাবতী চলিয়া গেলেন, দুই বন্ধুও প্রসন্নমুখে মায়ের অনুসরণ করিল।

চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে মেঘনাথের পিতামহ রমানাথ চৌধুরীর জমিদারী এক সময় আলোচনার বিষয় ছিল। কিন্তু পিতা অমরনাথ সুশিক্ষিত হইলেও বৈষয়িক বুদ্ধির অভাবে অনেকাংশ খোয়াইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনে বাহির হইয়া পড়েন। মেঘনাথ তখন শিশু। অকালে পিতার মৃত্যু ঘটিল। বহুদিন মাতার সহিত নানা তীর্থে ঘুরিয়া ফিরিয়া দূর-আত্মীয় এবং দাসদাসী পরিবেষ্টিত পিতৃহীন শূন্য প্রাসাদেও একদিন ফিরিয়া আসিল। তপনের সংসার-বিবাগী পিতা তখন অত্যন্ত স্থায়পরায়ণতার সহিত দেওয়ানের কাজ করিয়া মেঘনাথের ভবিষ্যৎ গড়িয়া যান। মাতৃহীন তপন অকস্মাৎ একদিন পিতৃহারা হইল—সেদিন স্নেহময়ী জননীর মত চন্দ্রা ওকে কোলে টানিয়া লইলেন।

এত ঐশ্বর্য্যের অন্তরালে কি গভীর রিক্ততাই না চন্দ্রাকে আকুল করিয়া তোলে! এত বড় বাড়িটা লোকের অভাবে যক্ষপুরীর মত খাঁ খাঁ করিতে থাকে। দুইটি মাত্র ছেলের যতকিছু কলরব-কোলাহল সর্ব্বদা নীচের 'হল'-ঘরের মধ্যেই। দোতলা-তেতলার সুসজ্জিত ঘরগুলি এক এক করিয়া তিনি অতিক্রম করেন—বুকের মধ্যে অসীম দুঃখ গুমরিয়া ওঠে। কর্ত্তা বেহিসাবী ছিলেন, বাড়িঘরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না—তবু—তবু যেন প্রতিটি কক্ষের ধূলিকণারও ছিল জীবন, মূল্য ছিল বাগানের প্রতিটি ফুলের লাবণ্য-বিকাশে। আজ সাত বৎসর মেঘনাথের চক্ষুর সম্মুখে দুনিয়ার আলোই শুধু নয়, গৃহের সকল সুখ-শোভারই যে অকাল মৃত্যু ঘটিয়া গেছে! ওর মনের মৃত্যুও হয় ত এমনই ভাবে হইত, কিন্তু ওকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে ওর অপূর্ব্ব কণ্ঠসঙ্গীত এবং সুর-আলাপন।

*
* *

অপ্রত্যাশিতভাবে এলাহাবাদ হইতে সংবাদ আসিল—সত্যবতী আসিতেছেন কিছুদিনের জন্ত এখানে। নিঃশ্বাস ফেলিয়া মেঘনাথ কহিল—'তপনকেই পাঠিয়ে দিও মা স্টেশনে। কতকাল আগে দেখেছি মাসিমার মুখ। কপালে মস্ত সিঁদূরের ফোঁটা—মোটাসোটা গোলগাল হাত দুখানিতে সোনার চুড়িগুলো ঝলমল করছে। কাল আসচেন থান পরে। দেখতে আর হবে না আমার এ বেশ। তুমিই হয় ত কত বদলে গেছ মা, তাই তো জানিনে।

দুই চোখ চন্দ্রার জলে ভরিয়া আসিল—বারান্দার রেলিং-এ ঝুঁকিয়া পড়িয়া ঝি-চাকরদের তদারক সুরু করিয়া দিলেন। এদিকে রামচরণ আসিয়া সংবাদ দিল, বন্ধুর দল আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে।

প্রভাতী আসিয়াছে তার জেঠাইমার সঙ্গে। প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। গভীর বিস্ময়ে প্রভাতী একদিন উপলব্ধি করিল, এ বাড়িতে কেহ যেন থাকিয়াও নাই। একটি অন্ধ ছেলে এ বাড়ির মালিক; কাজেই তাহার অস্তিত্ব একেবারে বাদ দেওয়াই ভালো। কিন্তু এই যে ভদ্রলোক তপন রায়—সকল ব্যাপারেই দেখা যায় অগ্রগামী,—সেও ত একদিন ভদ্রতার খাতিরে পারত ওর সঙ্গে একটু আলাপ করিতে।

তেতলার ছাদে উঠিবার মুখে ছোট একখানা ঘর প্রভাতীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ঘরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই ওর বন্ধুবান্ধবদের চিঠি লিখিয়া বা বই পড়িয়া কাটে। এমনই একদিন 'জুলিয়াস সীজার' পড়িতে পড়িতে থামিয়া গেছে ও। ডান হাতের তেলোর উপর চিবুক রাখিয়া—নিবিষ্ট মনে ও কি এলাহাবাদের আনন্দোজ্জ্বল গৃহচ্ছবিই ভাবিতেছিল বা ইটালিয়ান সেনাপতির মিশরী রাণীর কাছে আত্মনিবেদন-কাহিনী ওকে আনমনা করিয়া দিয়াছিল—বলা কঠিন। তপন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল দুয়ারের সম্মুখে—কতক্ষণ ও জানে না। একটু সঙ্কোচের সুরেই তপনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'ভেতরে আসতে পারি কি?'

এ ঘরে পর্দ্দার বালাই নাই, কাজেই চমকিয়া মুখ ফিরাইতেই প্রভাতী দেখিল তপন প্রায় ঘরের মধ্যে। মুহূর্ত্তের জন্য ও অপ্রতিভ হইয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া বইটা বন্ধ করিয়া সম্মুখের দিকে একটা চেয়ার আগাইয়া দিয়া কহিল—'এই যে বসুন।'

'আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম না ত?' তপন কহিল।

মৃদু হাসিয়া প্রভাতী কহিল—'পরীক্ষার পড়া ত নয়। সময় কাটানো—এই যা। এলাহাবাদের বন্ধুরা যে-কেউ আমায় এমন অবেলায় বই নিয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়ে থাকতে দেখলে কিরকম আশ্চর্য্য যে হ'ত, আমি নিজেই—ভাবতে পারিনে।'

'এবং এজন্যেই আপনার শরীরটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, আর বাবার জন্যও ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। আপনার সঙ্গে সেদিন স্টেশনেই হ'ল আলাপ, শুনলামও আপনার জেঠাই-মার কাছে বাংলাদেশের এসব অঞ্চল দেখবার অভিপ্রায়েই এসেছেন। আমার একটা অনুরোধ মিস্ মজুমদার, আমাদের তরফ থেকে এ কয়দিন যে সব ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছে, সেটা আমাদের ইচ্ছাকৃত নয়, আপনি ভুল ক'রে আমাদের ভুল বুঝবেন না যেন। হয় ত জানেন, এ বাড়ির মালিক না হ'লেও এ বিষয়সম্পত্তি, বিশেষ ক'রে আমার বন্ধু মেঘনাথকে নিয়ে চিন্তার আমার শেষ নেই। সমস্ত দিন খাতাপত্র দেখে বন্ধুকে দিয়ে নাম দস্তখত করান, প্রত্যেক মহলের কর্ম্মচারীদের কাজ সম্বন্ধে সংবাদ লওয়া—বহু ঝকমারি ব্যাপারে কোথা দিয়ে যে দিন যায়। সন্ধ্যার পর থেকেই আমার বিশ্রাম। অবশ্য সব দিনই যে এত কাজ থাকে তা নয়।'

'আপনারাও আমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা ক'রে অপ্রস্তুত হবেন না।' হাসিয়া প্রভাতী কহিল—'বেড়াবার সখ আমার অবশ্য প্রচুর, কিন্তু তাই বলে যেতেই হবে প্রতিদিন—এমন উৎকট সখও নেই। মাঝে মাঝে আপনাদের চাকর বা পরিচিত কোন লোককে সঙ্গে দিলে ভ্রমণ সময় আমি নিজেই এদিকটা ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারি।'

'ছিঃ ছিঃ, বলেন কি, তা কি হয়! আমার বন্ধু এখানকার মানীলোক, তাঁর অতিথি আপনি! পথে হেঁটে বেড়ান—সে কি শোভন? কাল থেকে অবসর সময়ে আমিই মোটরে বেরুব আপনাকে নিয়ে।'

প্রভাতী মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। এইবার একটু গম্ভীর-মুখে কহিল—'এদেশে লোকের মান-অপমান বোধটা বড্ড বেশী নয়? কই, আমাদের এলাহাবাদে ত অমন কত ধনীমানীর বাস, মোটরও বহুলোকের আছে, তবু মেয়েরা ইচ্ছে ক'রেই হেঁটে যায়, খুশীমত বেড়ায়, এসব প্রশ্ন ওঠে না তো!'

হাসিয়া তপন কহিল—'এটা বাংলাদেশ, বিশেষ এ অঞ্চলের জমিদার আমার বন্ধু; কাজেই ওঁর সঙ্গে শহরের ধনীদের তুলনা—'

'ওঃ, বুঝেছি।' প্রভাতী কথাটার এইখানেই ইতি করিয়া কহিল—'আচ্ছা, কাল যাব না হয়। তবে আপনাদের কাজের ক্ষতি যেন না হয়।'

'কাজ—কাজ—ওঃ! কাজ ত সারাবছর ধরেই করছি, করবও—যতদিন বেঁচে আছি। কিন্তু আপনি ত আর আসবেন না বা আপনাকে বেড়িয়ে দেখাবার সৌভাগ্য আর নাও হ'তে পারে।' গাঢ়স্বরে তপন কহিল।

বিস্ময়ের হাসি হাসিয়া প্রভাতী কহিল—'সৌভাগ্য কি আপনার না আমার? সত্যি, জেঠাইমাকে চ'লে যাবার কথাটা ব'লে এমন বিশ্রী কাণ্ড ক'রে ফেলেছি!' তপন কি একটা জবাব দিতে গিয়া থামিয়া গেল, রামচরণ আসিয়াছে। তপনের হাতে একটুক্‌রা চিঠি দিয়া সে নীচে নামিয়া গেল। চিঠিটায় মুহূর্ত্তকাল দৃষ্টি বুলাইয়া তপন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার মুখে কহিল--'ওঃ, বড্ড দেরী হয়ে গেছে, আজ হাসান আলীকে মোটর পাঠাইবার কথা। আচ্ছা, আজ যাই—' বলিয়া ছোট একটি নমস্কার জানাইয়া ক্ষিপ্রপদে নীচে নামিয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি অত্যন্ত গরম বোধ করায় অতি প্রত্যূষে উঠিয়া প্রভাতী স্নান সারিয়া ফেলিয়াছে। এতবড় বাড়িটা মৃতের মত স্তব্ধ হইয়া আছে, একটি প্রাণীও জাগিয়া ওঠে নাই। প্রভাতীর তরুণ মন কৌতুকরহস্যে সাড়া দিয়া উঠিল। নিঃশব্দে—অত্যন্ত সাবধানে প্রতিটি কক্ষের বারান্দা, জানালা, অলিগলি—অতিক্রম করিয়া দোতলার পূবদিকে গোল-বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল ও। আজ এইখানে প্রভাতী নূতন আসিল। গ্রামের ছবিটি এখান হইতে চমৎকার দেখা যায়। মুগ্ধের মত দূরের পানে অলসদৃষ্টি মেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অসংখ্য অজানা পাখীর কলরব, সদ্যফোটা ফুলের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত —সমস্ত দেহমন তার ভরিয়া উঠিল কেমন একটা অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতায়। হয় ত বহুক্ষণ সে এমনই দাঁড়াইয়া থাকিত। কিন্তু হঠাৎ গভীর বিস্ময়ে চমকিয়া রেলিং হইতে উৎকর্ণ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল প্রভাতী। মেঘনাথের ঘরে সেতারের আলাপ সুরু হইয়া গেছে। অন্ধ ছেলেটির গানে বাজনায় খ্যাতি আছে, ও শুনিয়াছে ওর জেঠাইমা এবং তপনের কাছে। কিন্তু আজ প্রায় পক্ষকাল হইতে চলিল এইখানে আসিয়াছে, বাজনা শোনা দূরের কথা—তার চেহারা পর্য্যন্ত চোখে পড়ে নাই। এতটুকু কৌতূহল ওর জাগে নাই এই ছেলেটি সম্বন্ধে। অথচ ইহারই আতিথ্য গ্রহণ করিয়া পথেঘাটে ওর সম্মানের অন্ত নাই! একটু চঞ্চল হইয়াই অগ্রসর হইয়া গেল সে মেঘনাথের ঘরের সম্মুখে।

মনের মধ্যকার এতকালের দাগ-পড়ে-যাওয়া কত কলরবপূর্ণ মুহূর্ত্ত, উৎসবস্মৃতি, মধুময় বন্ধুপ্রীতি—সব যেন অকস্মাৎ সে হারাইয়া ফেলিল। সমস্ত মনটা যেন কি এক গভীর আনন্দ-বেদনায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল ও চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। শিল্পীর বহু সাধনায় নির্ম্মিত নিখুঁত মর্ম্মর মূর্ত্তি যেন। গাঢ় সবুজবর্ণের কুশান ঢাকা সোফার উপর বসিয়া মেঘনাথ। শ্বেতপাথরের মত মসৃণ-সুন্দর আঙুলগুলা সেতারের গায়ে ওঠা-নামা করিতেছে। দেয়ালের গায়ে গায়ে দর্পণ—সমস্ত ঘরব্যাপী প্রভাতের নূতন আলোয় একই মেঘনাথ যেন বহু হইয়া চতুর্দ্দিক সুরের মায়ায় আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে। সমস্ত ঘরখানিতে মনোরম রুচির যথেষ্ট পরিচয় আছে; কিন্তু তথাপি ঐ যে জয়পুরী পাথরের টেবিলে সাধারণ একটা কাঁচের ফুলদানী, দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য ক্যালেণ্ডার, শুভ্র শয্যার উপর টাঙানো একটা গাঢ় নীলরঙের মশারি—এগুলো চোখে বিঁধিল। ধীরে গিয়া টেবিলটার ধারে দাঁড়াইল—বাসী ফুলদানিতে তখনও সদ্যফোটা ফুল আসিয়া পৌঁছায় নাই। টেবিলের উপর একখানা হাত রাখিয়া প্রভাতী ভাবিতেছিল আলাপ করিয়া যাওয়া উচিত, কিন্তু কি ভাবে! হঠাৎ সেতার রাখিয়া গানের সুর টানিয়া মেঘনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অপ্রত্যাশিত আতঙ্কে প্রভাতী কাঁপিয়া উঠিল। কে বলে ইনি অন্ধ! এমনই গভীর-বন-কালো চোখ—এমন অনুপম চাহনি, মুহূর্ত্তে নিজের চোখ দুটি ওর নত হইয়া আসিল। কয়েক পা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া টেবিলের একটা কোণ্ ধরিয়া মেঘনাথ বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেই চকিতে প্রভাতী আর একদিকে সরিয়া গেল এবং হাতের ঠেলায় ফুলদানিটা সশব্দে নীচে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল। থমকিয়া দাঁড়াইল মেঘনাথ। তারপর শাসনের সুরে কহিল—'কে, মালি বুঝি! আর একদিনও ভেঙেছিস্ ফুলদানি। কতবার বলেছি, তুই দিসনে—দিসনে আমার টেবিলে হাত, ওই খালি টেবিলটায় রেখে গেলেই পারিস্ ফুল—সাজিয়ে রাখতে তপনবাবুই পারেন।' নিঃশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া গেল সোফাটার উপর। ক্লান্ত-কণ্ঠে আবার কহিতে লাগিল—'হতভাগা পালিয়েছে। নাঃ, আমার প্রয়োজনই বা কি ফুলের! তপনের সখ, তা সে ত বাগানে ঘুরলেই কত ফুল দেখতে পারে। অ-দেখার গন্ধে আর আমার মোহ নেই।'

অত্যন্ত সন্তর্পণে বাহির হইয়াই নিজের ঘর তেতলার দিকে উঠিয়া চলিল প্রভাতী। সিঁড়ির মুখে দেখা তপনের সঙ্গে, হাতে তাহার প্রকাণ্ড একটা ফুলের তোড়া।

'এ কি, আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন বলুন ত? সমস্ত মুখ আপনার লাল হয়ে উঠেছে—জ্বরটর কিছু হয়নি ত!'

জোর করিয়া প্রভাতী একটু হাসিয়া কহিল- 'কই, না ত! বাঃ—কি চমৎকার ফুল, বন্ধুর জন্যে নিয়ে চলেছেন বুঝি!'

হাসিয়া তপন কহিল—প্রতিদিন বন্ধুর জন্যে ফুল তোলবার সময় কোথায় বলুন? মালী আছে—ওদেরও ত কাজ দেওয়া চাই! রেখে দিন গিয়ে আপনার টেবিলে।'

তপন মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রভাতীর মুখপানে চাহিয়া তোড়াটা তাহার হাতে তুলিয়া দিল।

আহ্নিক সারিয়া চন্দ্রাবতী সেদিন সবেমাত্র ঠাকুর দালানের বাইরে আসিয়াছেন, দাশুমালী হাত জোড় করিয়া আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল—বড়বাবুর হুকুমে ছোটবাবু ওকে জবাব দিয়াছেন। অপরাধ, একদিন অসাবধানে ও একটা ফুলদানি ভাঙিয়া ফেলিয়াছে, গতকালও নাকি একটা ভাঙা গিয়াছে। কিন্তু দাশু সে সময় বাগানের কাজেই হাত দেয় নাই, অথচ ওর ঘাড়েই গতকালের অপরাধ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

'দুটো ফুলদানির জন্যে তোর কাজ যাবে না, তুই বাগানে যা, কাজ করগে। আমার নাম ক'রে ছোটবাবুকে বলিস্।' ধীরকণ্ঠে একথা বলিয়া চন্দ্রা চলিবার উপক্রম করিতেই দাশু সেখানেই বসিয়া পড়িয়া কহিল—'আমার সাহসে কুলোচ্ছে না বাগানে যেতে,—ছোটবাবু ঐদিকেই মোটর সাফ করাচ্ছেন—'

'আমি বলছি দাশু, এক্ষুনি গিয়ে কাজে হাত দে।' তিনি দাসীমহলে চলিয়া গেলেন কাজের তদারক করিতে। ব্যাপার শুনিয়া সত্যবতী কহিলেন—'এ তোমার কেমন হুকুম চন্দ্রা? বিষয়টা না হয় সামান্য ফুলদানি, কিন্তু জমিদারী রক্ষা করতে গেলে একটু কড়া মেজাজের প্রয়োজন। ছেলেদের আজ তুই খাট ক'রে দিচ্ছিস্ একটা তুচ্ছ মালির কাছে। মেঘু অন্যায় ত কিছু করেনি!'

কষ্টে হাসিয়া চন্দ্রাবতী কহিলেন—'আমায় তোমরা ভুল বুঝ না দিদি। সব ব্যাপারেই সব কিছুর সীমা থাকা চাই—শাসনেরও একটা সীমা থাকা প্রয়োজন। ছেলেদের খাটো আমি করিনি—ভবিষ্যতে খাটো যেন না হয় তাই করলাম। সামান্য ব্যাপার থেকেই বুঝতে পারছি, টাকার জোরেই ওরা শুধু কাজ করিয়ে নিতে পারবে, কিন্তু আসল আন্তরিকতা কারুর কাছ থেকেই পাবে না—আর তাই হবে একদিন সব ছারখার হয়ে যাবার মূল। যারা প্রজার মন জয় করতে পারে, তাদের আর ভাবনা কি, তাদের সব আপনাথেকেই হয়।'

সত্যবতী বোনকে চিনিতেন—চুপ করিয়া গেলেন।

অপরাহ্নের দিকে মালিঘটিত ব্যাপারটা একটু পল্লবিত হইয়াই প্রভাতীর কানে গেল। প্রসাধন-টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া বৈকালিক সজ্জায় ও তখন ব্যস্ত। জরির চৌখুপী ঘন নীল শাড়ীর আঁচলপ্রান্ত মেঝেয় লুটাইতেছে, তখনও ব্রুচে আঁটকানো হয় নাই। মুখে রুজ মাখিতে মাখিতে ও ভাবিতেছিল—আজ বহু দূর পথে যাইবে, যেখানে গ্রামসীমা শেষ হইয়াছে, বিজন প্রান্তর কেবলই আরও দূরত্বের আভাষ দিয়া মনটাকে যেন হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে।…

এলাহাবাদে কোলাহল আছে, পূর্ণতা আছে,—এখানে আছে চতুর্দ্দিকের নীরবশূন্যতা—তবু মনের দুয়ারে আজ যেন নূতন সুরের ছন্দালাপ।

দাসী আসিয়াছে ঘর পরিষ্কার করিতে। তারই মুখে প্রভাতী শুনিল—মালিকে জরিমানা করিয়া মারিয়া ধরিয়া ছোটবাবু তাড়াইয়া দিয়াছে, হুকুম অবশ্য বড়বাবুর। নিজের চক্ষে ও মালিকে কাঁদিতে দেখিয়াছে—ইত্যাদি। প্রসাধন-সরঞ্জামগুলা একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া উদ্বিগ্নমুখে প্রভাতী প্রশ্ন করিল—'ওঁরা ত এখানকার জমিদার। অনেকের মুখে শুনেছি, বাংলাদেশের জমিদাররা অনেকেই নাকি সামান্য ব্যাপারে প্রজাদের মারধর করতে এতটুকু দ্বিধা করেন না। ওঁরাও কি গাঁয়ের ভেতর গিয়ে এইরকম কিছু—আচ্ছা, তুমি ত' বহুকাল ধরে এ বাড়িতে আছ—'

'মনিবের কথা, আমাদের মুখ থেকে না শুনাই ভাল মা।'

দাসী নীচে নামিতেছিল, হাসিয়া প্রভাতী কহিল—'বাঃ! এইমাত্র তুমিই না মালির ব্যাপারটা—'

চোখমুখের কেমন একটু অর্থসূচক ভঙ্গী করিয়া ত্রস্তে সে সিঁড়ি বাহিয়া কয়েক ধাপ নীচে নামিতেই দেখা গেল, তপন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে দরজার সম্মুখে। মুহূর্তে লুটিয়ে-পড়া-আঁচলটা গায়ে জড়াইয়া প্রভাতী কহিল—'আজ আমি বেড়াতে যাব না তপনবাবু!'

'সেই জন্তেই বুঝি আজ এত সুন্দর ক'রে সাজিয়েছেন নিজকে!' হাসিয়া মুগ্ধদৃষ্টি মেলিয়া তপন চাহিল প্রভাতীর অঙ্গরাগের দিকে।

'না—না—ঠাট্টা নয়, আমি যাব না সত্যি।'

মুহূর্তে তপনের মুখ শাদা হইয়া উঠিল, প্রভাতীর মুখে এমন অটল গাম্ভীর্য্য আজ প্রথম দেখিল। খালি পায়েই সিঁড়ির দিকে আগাইয়া গেল প্রভাতী, একটু থামিয়া কহিল—'আপনাদের নীচের জলসা-ঘরে কেউ নেই ত?'

'আজ কেউ আসবে না।' তপন কহিল।

'তা হলে অনুগ্রহ ক'রে আসুন একটু আমার সঙ্গে।' প্রভাতী নীচে নামিয়া গেল।

জলসা-ঘর। অনেকটা স্থান জুড়িয়া শুভ্র ফরাসের উপর সারি-সারি তাকিয়া। টেবিল চেয়ারের বালাই নাই বলিলেই চলে—দুই-একখানা গদি আঁটা চেয়ার ছাড়া। ছাতের বর্গা হইতে ঝুলিয়াপড়া অনেকগুলো রং-বেরঙের স্ফটিকের ঝাড় অপরাহ্নের লাল আলোয় ঝলমল্ করিতেছিল। মেঘনাথ ভাব-বিমুগ্ধ মনে অর্গ্যানে সুর মিলাইয়া গাহিতেছিল—গান শেষ হইয়া আসিতেছিল, তপন আর প্রভাতী নীরবে বসিয়া শুনিল।

"কোন্ আলোতে আশার প্রদীপ
জালিয়ে তুমি ধরায় আসো,
সাধক ওগো প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো—"

মেঘনাথের সঙ্গীত থামিতেই তপন কহিল—'মিস্ মজুমদার এসেছেন—তোমার কাছে বোধ হয় কোন প্রয়োজন আছে।'

'আমার কাছে মিস্ মজুমদার—সে কি? এ ঘরে এসেছেন কি তিনি! নমস্কার জানাচ্ছি। এই বলিয়া মেঘনাথ ঘুরিয়া বসিয়া ব্যর্থ দৃষ্টিপাত করিয়া প্রভাতীর উদ্দেশে কহিল—'আপনার এ বাড়িতে কোনরূপ অসুবিধে হচ্ছে না ত?

'তা হচ্ছে না।'

'সে আমি অনেকটা অনুমান করেছি—তপন রায় যখন রয়েছেন।' মেঘনাথের কথাকে সম্পূর্ণরূপে চাপা দিয়া ও নিজের কথা পাড়িল—'জমিদারী বিচার-আচার সম্বন্ধে আমার অবশ্যি কোন ধারণা নেই, তবু আজ না ব'লে পারছিনে। কালকের ব্যাপারের জন্ম মালিকে বাড়িছাড়া ক'রে যে শাস্তি দিয়েছেন, ন্যায়ত সে শাস্তি আমারই প্রাপ্য।'

মুহূর্তে দুই বন্ধু বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া গেল। খানিক পরে মেঘনাথের মুখ হইতে কথা বাহির হইল—'মায়ের হুকুমে মালি কাজে বহাল হয়েছে কাল থেকেই। আর তাকে মারধর করার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু মালির হয়ে নিজেকে অপরাধী করার মানে…আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে মিস্ মজুমদার!'

'মানে অত্যন্ত সোজা এবং সত্য। কাল আপনার ঘরে গিয়ে আমিই ভেঙে ফেলেছি ফুলদানিটা। ভেবেছিলেম, জমিদার বাড়ি, অমন কত বড় বড় জিনিষ খোয়া যায়; এ সামান্ত ফুলদানি—কারুর নজরেই পড়বে না।'

কথা শেষ করিয়া মুখ টিপিয়া প্রভাতী একটু হাসিল এবং মুহূর্তে মেঘনাথের পানে চাহিয়া দেখিল তার সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সোজা হইয়া বসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে মেঘনাথ কহিতে লাগিল—আমার ঘরে আপনি গিয়েছিলেন অত ভোরে, অথচ আজই আপনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়—কি ক'রে বিশ্বেস করি আপনিই সেই। কিন্তু বিশ্বাস করতে আমি বাধ্য, যেহেতু আপনি বলছেন আপনি গিয়েছেন—আর—আর আমি চোখে দেখতে পাইনে।'

প্রভাতীর মুখের রং সহসা বদলাইয়া গেল—তপনের চোখ ইহা এড়াইল না। হাসিয়া সে কহিল—'ওঃ, তা হ'লে রীতিমত 'ট্রেস্পাস্'—মিস মজুমদার!

প্রভাতী এ হাসিতে যোগ দিল না, শান্ত কণ্ঠে কহিল—'আলাপ করবার উদ্দেশ্যেই গিয়েছিলাম। যাঁর বাড়িতে অতিথি হয়ে এসেছি, তাঁকে একটা ধন্যবাদও ত আজ

পর্য্যন্ত জানানো হয়নি; কিন্তু কে জানত আপনাদের ভেতর এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে যাবে।'

হাসিয়া তপন কহিল—'যাক্ বাঁচালেন। আমার বন্ধুর দিক থেকেও এবার আমি নিশ্চিন্ত হলাম। কতদিন বলেছি আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার কথা। কিন্তু বন্ধু আমার কিছুতেই সম্মত হননি, তাঁর ধারণা অন্ধকে—'

'আজ এসব কথা না-ই বা তুললে তপন। অতর্কিতে আলাপ যখন হ'ল, তখন সে কথা যেতে দাও। আপনি আমার সঙ্গে নিজ থেকে আলাপ করতে গিয়ে অনেকখানি ভুগলেন—আমায় মাপ করবেন মিস্ মজুমদার।'

সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া ঘরের মধ্যে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল প্রভাতী। ভৃত্য আসিয়া 'পেট্রোমাক্স' জ্বালাইয়া দিয়া গেল—তারই ঈষৎ সবুজ আলো আসিয়া পড়িয়াছে মেঘনাথের মুখে। প্রভাতীর হঠাৎ যেন মুহূর্ত্তপূর্ব্বের আত্মস্থ ভাবটুকু কাটিয়া গেল, সে মেঘনাথের অপার্থিব সুন্দর মুখখানার দিকে মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিল। মোটরের হর্ন শুনিয়া তপন হঠাৎ বাহির হইয়া গেল। প্রভাতীও উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—'আচ্ছা, আজ যাই, নমস্কার! আমার সম্বন্ধে আপনি কি ধারণা করেছেন জানিনে, তবে আপনার ভুল একদিন ভাঙবে।'

প্রভাতী বাহির হইয়া গেল।

*
* *

শ্রাবণের ভারাক্রান্ত ছায়া-ঘন মধ্যাহ্ন। বসিয়া বসিয়া প্রভাতী ভাবিতেছিল কি করা যায় এসময়, বিশেষ করিয়া—আজ কি বিষয় পড়িয়া শুনাইবে মেঘনাথকে। আসিয়া অবধি একঘেয়ে গল্প আর কবিতা পড়িয়া পড়িয়া ওর নিজেরই কেমন অরুচি ধরিয়া গেল; অথচ মেঘনাথ ভাব-বিমুগ্ধ হইয়া অক্লান্ত মনে শুনিয়া চলিয়াছে দিনের পর দিন এবং আরও—আরও আগ্রহ তার শুনিতে। আজিকার এই মেঘমেদুর আকাশ পানে চাহিয়া কবিতার ভাবগাথা হয় ত ঘোরালো হইয়া উঠিবে ওর নিজের চোখে, এমন কি মেঘনাথের দৃষ্টিহীন চোখ দুটিও ভাবাবেশে হইয়া উঠিবে স্বপ্নময়। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে আকাশ সচেতন করিয়া এই যে সুরু হইয়া গেছে মেঘের গুরু গুরু—এমন দিনে ঘরের কোণে বসিয়া বিহ্বল চিত্তে কাব্য পাঠ করার মত ভাব-বিলাসিতা ওর মনকে আচ্ছন্ন করিতে পারিল না। মনটা ওর অধীর-চঞ্চল হইয়া উঠিল গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বাংলার বর্ষা-রূপ দেখিবার জন্য।

দাসী নন্দর মাকে দিয়া তপনকে ডাকিয়া পাঠাইল এবং আরাম কেদারায় দেহ এলাইয়া দিয়া দিবাস্বপ্নে বিভোর হইয়া উঠিল; কিন্তু বেশীক্ষণ নয়—অকস্মাৎ আর্দ্র উত্তাল বাতাসে ঘরের সমস্ত দরজা জানালাগুলো কঠিন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেই মুহূর্ত্তে প্রভাতী উঠিয়া গিয়া দাঁড়াইল বাতায়ন সম্মুখে, বারিধারা তখনও সুরু হয় নাই। একটু অধৈর্য্য চঞ্চল হইয়াই টেবিলের উপর হইতে একখানা বই হাতে নীচে নামিয়া গেল, দেখা সেইখানে তপনের সঙ্গে।

'ওঃ মাপ করবেন মিস্ মজুমদার, বড্ড দেরী হয়ে গেছে—এত কাজ ছিল—'

হাসিয়া প্রভাতী কহিল—'এখন ত কাজ নেই, চলুন ঘুরে আসি কয়েক মাইল—'

'বলেন কি! ঝড়বৃষ্টি একাকার হয়ে আস্‌ছে যে!'

'সেই জন্যেই যে যেতে চাইছি, বৈচিত্র্য ত ঐখানেই মিঃ রায়।'

উচ্চ হাসিয়া তপন কহিল—'হাসালেন আপনি। আজ কি কেউ বাইরে যায়! তা ছাড়া, ঘর থেকেই যে আজ বর্ষার রূপ দেখতে হয়। এমন দিনে ঘরের নিরিবিলি কোণে বসে কাব্যপাঠ—ওই ত আপনার হাতেই রয়েছে দেখ্‌ছি, কি বই ওটা?'

বিপর্য্যস্ত খোলাচুলগুলা কুণ্ডলী করিয়া খোঁপা আঁটিতে আঁটিতে উজ্জ্বল-সুন্দর মুখে প্রভাতী কহিল—'বেশ মজার লোক ত আপনি! দৃষ্টিশক্তি রয়েছে দেখ্‌ছি প্রখর, খুঁটিনাটি এতটুকু বাদ পড়ে না যার চোখ থেকে—তাঁকে বই পড়ে শুনানো মানে—অলসতার রীতিমত প্রশ্রয় দেওয়া নয় কি! চলুন তার চেয়ে বরং আপনার বন্ধুর ঘরে—মল্লার অথবা কাজরী গানে বর্ষার দিনটা বেশ উপভোগ করা যাবে 'খন।

'নাঃ, ভাল লাগছে না আজ গান। গান ত রোজই হচ্ছে—হবেও। তার চেয়ে বেড়িয়েই আসি চলুন। হাওয়ার জোর দেখে মনে হচ্ছে সন্ধ্যার আগে বৃষ্টিটা আসবে না হয় ত। সত্যি আপনার আইডিয়া আছে মিস্ মজুমদার। ঝড়বৃষ্টি আসেই যদি পথে—কি চমৎকার যে

হবে—রীতিমত ম্যাড্‌ভেঞ্চার ক'রে ফেরা যাবে। চলুন—আর দেরী নয়—'

'এতক্ষণে আমার আইডিয়াটা পরিষ্কার হ'ল বুঝি!' মৃদু হাসিয়া প্রভাতী কহিল। যে উৎসাহ নিয়ে নেমে এসেছিলাম, তাতে বাধা দিয়েছেন বড় ক'রেই, কাজেই বাইরে যাবার ইচ্ছেটা আপাতত একেবারে চলে গেছে। বই-ই পড়ব আজ, চলুন ওপরে।

মলিন হাসিয়া তপন কহিল—'সেটা আপনার খুশী। কিন্তু আমি এখন আর ঘরে থাকছিনে—দুজনের বেড়ানো একজনেই বেড়াব।' গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বারান্দা অতিক্রম করিয়া তপন চলিয়া যাইতেই প্রভাতী তাকে ডাকিয়া ফিরাইল এবং গভীর ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল—যাবেন না এক্ষুণি, আমি প্রস্তুত হয়ে আস্‌ছি। সত্যি, অত্যন্ত সহজে আপনি আহত হন তপনবাবু। না—না—অমন মুখ গম্ভীর ক'রবেন না।'

দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল প্রভাতী। মুহূর্ত্তকাল তপন সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া দীপ্ত উজ্জ্বলমুখে বাগানের পথে নামিয়া গেল এবং ফুলন্ত গাছগুলা উজাড় করিয়া দুই হাত ভরিয়া ফেলিল অজস্র ফুলভারে।

···মোটর ছুটিয়া চলিয়াছে বহু দূর—দূরের প্রান্তরে। পথিপার্শ্বে ঘন-সবুজ ক্ষীণ বনরেখা নববর্ষায় দেহ বিস্তার করিয়া গাঢ় শ্রী ধরিয়াছে। দূরের প্রান্তসীমা মেঘ-মেদুর আকাশের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া গেছে। নিঃশব্দে ড্রাইভ করিয়া চলিয়াছে তপন, কতদূর—কোথায়—নিজেই জানে না। মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বেও পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধে প্রতি ইন্দ্রিয় ছিল ওর জাগ্রত—উল্লসিত। তাই ত অত্যন্ত সহজভাবেই প্রভাতীকে জানাইয়াছিল ওর অন্তরের সত্য-কামনা। নিষ্ঠুর অবহেলায় প্রভাতী ওকে প্রত্যাখ্যান করে নাই; কিন্তু কাড়িয়া লইয়াছে তপনের মনের সকল ঐশ্বর্য্য—কাঙাল করিয়া দিয়াছে ওকে। হঠাৎ ব্রেক কষিয়া তপন কহিল—'আর তো পথ নেই মিস্ মজুমদার, ফিরে চলুন।'

ঝিরঝিরে বৃষ্টির ছাটে কিংবা অশ্রুজলে বুঝা কঠিন, প্রভাতীর কপোলে, চোখে আর্দ্রতার গাঢ় ছাপ। 'ফিরেই চলুন' প্রভাতী কহিল।—'যত শীঘ্‌গির সম্ভব এলাহাবাদেও ফিরে যেতে হবে আমায়। আমি সব দিক দিয়েই এখন ফেরার পথে মিঃ রায়।'

দুঃখের হাসি হাসিয়া তপন কহিল—'আপনার ফিরে যাবার পথে আমিই বোধ হয় শেষে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু ভুল বুঝবেন না আমায় মিস্ মজুমদার, সর্ব্বকালে সর্ব্বযুগে নর নারীকে ভালবেসে এসেছে। কিন্তু তাদের প্রথম প্রেমকে প্রাণ দিয়েছে চোখ। কিন্তু আজ বুঝতে পেরেছি, মেঘনাথ আপনাকে ভালবেসেছে তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে—যার উপরে বিচার চলে না—ধারণা চলে না। কিন্তু আপনার সম্বন্ধে আমি এতদিন যে ধারণা পোষণ করে এসেছিলাম—তাও হয় ত আমার পক্ষে—অস্বাভাবিক নয়। ভুলের মধ্য দিয়েই মানুষের জীবন, এ ভুলের জন্য মাপ চাইছি আপনার কাছে।'

মোটর হুহু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে বাড়ির পথে। থম্‌থমে আকাশের নীচে আসন্ন দুর্য্যোগময়ী রাত্রির সূচনা। গভীরকণ্ঠে প্রভাতী কহিল—'আপনার বন্ধু সম্বন্ধে কোন কথাই আমার মুখ থেকে শুনত না কেউ। আপনিই আজ উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ালেন। দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছ্‌লাম—কে জানত বাংলাদেশে বেড়াতে এসে এমন অঘটনের মধ্যে পড়ে যাব।

গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল বাড়ির দুয়ারে। তপন সেখান থেকেই প্রভাতীর কাছ হইতে রাত্রির মত বিদায় লইয়া চলিয়া গেল নিজের ঘরের পানে। আর্দ্র পিচ্ছিল পথ পার হইয়া প্রভাতী গিয়া উঠিল জলসা-ঘরে। সেতার মেঘমল্লার আলাপন চলিতেছে। স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত্ত। এখানে আসিয়া মনের দিক হইতে ও যে এ ভাবে দেউলিয়া হইয়া যাইবে—জীবনে এটা ওর স্বপ্নাতীত। অকস্মাৎ দুই চোখ ওর অশ্রুতে ভরিয়া উঠিতেই চঞ্চলপদে মেঘনাথেরই সম্মুখস্থ একটা আরাম কেদারায় ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। অন্যমনা মেঘনাথ হঠাৎ সচেতন হইয়া উৎকর্ণভাবে জিজ্ঞাসা করিল—'কে, প্রভাতী দেবী? এই রেখে দিলাম সেতার—ভাল লাগছে না বাজাতে। তার পর, বেড়ানো হয়ে গেল? এমন বিশ্রী লাগছিল—বাদ্‌লার দিন, বাইরের কেউ আসে নি—ঘরের লোকও সব গেল বাইরে চলে। গান-বাজনা তপু না জানলেও সমঝদার ভাল—সে পর্য্যন্ত আজ একবার এল না।'

অশ্রুভরা হাসিমুখে প্রভাতী কহিল—'আমি কিন্তু রোজই আসি। গান-বাজনা এত ভালবাসি অথচ জীবনে এর কিছুই শিখতে পারলাম না, তাইত আপনাকে আনন্দ দেবার মত আমার আছে শুধু কবিতা, গল্প, আর দেশ-বিদেশের বার্তা শুনানো।'

খুশীর প্রাচুর্য্যে মেঘনাথের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তা হইয়া উঠিল অত্যন্ত করুণ। নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল—'আপনি আমায় যা দিয়ে গেলেন, তা জীবনে আমার অক্ষয় হয়ে থাকবে। গান—গান—গানে গানেই ত জীবনটা বয়ে চলেছে; যাবেও। একদিন হয় ত এতেও পাব আর না প্রাণ—থাকবে সম্বল হয়ে আমার সেতার, তারই মধ্যে সমস্ত জীবনের সুখদুঃখের সুর আনারই হাতের পরশে শুনাবে আমায় কত কথা। জানেন মিস্ মজুমদার, অনেক সময় বসে বসে ভাবি, আপনি আমায় এত দিয়ে গেলেন অথচ দেখলাম না—পারলাম না দেখতে আপনার মুখ। শুনেছি তপনের মুখে প্রভাত আলোর মতই নাকি আপনার রূপ।'

'আচ্ছা, তপনবাবু কি আমার সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলেছেন?' মলিন জিজ্ঞাসুদৃষ্টি মেলিয়া প্রভাতী চাহিল মেঘনাথের মুখপানে। বাহিরে তখন শ্রাবণধারা সুরু হইয়া গেছে প্রবল বেগে। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল মেঘনাথ—বাহিরের বাদল-ঝরঝর যেন সমস্ত মন ভরিয়া সে উপভোগ করিতেছে। তারপর হঠাৎ যেন নিজেরই মধ্যে একটু চম্‌কাইয়া কহিল—'আপনার সম্বন্ধে? হাঁ। তবে কথা হচ্ছে, এ ব্যাপারে আপনাদের, বিশেষত আপনার মা-বাবার মতামতটা আমাদের প্রথম জানা দরকার। আমিও ভেবে দেখ্‌লাম প্রভাতী দেবী, তপুর এখন সংসারী হওয়া দরকার—কারণ মায়ের অভাবে আমাকে তা হ'লে আর ততটা দিশেহারা হতে হবে না। কি, কথা কইছেন না যে বড়!' উদ্‌গ্রীব হইয়া মেঘনাথ জিজ্ঞাসা করে প্রভাতীকে। কথার জবাব দিতে গিয়া কণ্ঠস্বর বুজিয়া আসিল প্রভাতীর, কষ্টে শুধু উচ্চারণ করিল—'তপন—তপনবাবুর কথাই শুধু ভাবছেন—এ কি আপনার অন্তরের আসল কথা? আমরা নিজেরা নিজেদের মনের কাছে সময়ে অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং অসহায়—একথা আপনি হয় ত অস্বীকার করতে পারেন না।'

'অনেক সময় পারি নে।' অভিভূতের মত মেঘনাথ কহিল।

'পারেন না, তবু ত বন্ধুর হয়ে নিজেকে মিথ্যার আবরণে ঢেকে সংসারে আদর্শ পুরুষের স্থান দখল করতে চাইছেন। মিথ্যার আয়ু কিন্তু অত্যন্ত কম মেঘনাথবাবু।'

বেদনায় বিমূঢ় হইয়া উঠিল মেঘনাথ, তারপর গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—'আমার মত কাঙাল বুঝি কেউ নেই প্রভাতী দেবী। তপন, সে যে আমার কতখানি আদরের তা আপনি হয় ত জানেন না। মনে পড়ে, ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি এসে জ্বরে পড়লাম। পনের দিনে ধরা পড়ল টাইফয়েড, জ্ঞান ছিল না কয়েক দিন। শেষে চেতনার সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে একদিন চাইলাম, জিজ্ঞেস করলাম মাকে রাত কত? মা বললেন—রাত কোথায়—এ যে সকাল আটটা। চোখ দুটো রগড়ে দিতে বললাম—দিলেও যেন কে। আহা—হা—কত চেষ্টা—আঁধার, সমস্ত পৃথিবী গভীর কালো হয়ে আমার কাছ থেকে জন্মের মত বিদায় নিলে। কলকাতা থেকে ডাক্তার এসে রায় দিলেন—হোপ্‌লেস। সেদিন তপন আমায় জড়িয়ে ধরে কি যে কাঁদলে—ওরই যেন চোখ গেছে। পশ্চিমে চলে গেল, কত সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে ঘুরেছে ওষুধ মিলে কিনা—সেই তপু—।

'জানি, অনেক কথাই শুনেছি আপনার মায়ের কাছে।' প্রভাতী কহিল। 'আপনাদের বন্ধুত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি, এ ভাব যেন আমার বরাবর বজায় থাকে। যে বিপ্লবের সূচনা হচ্ছে, আমি তা ভেঙে দিলাম মেঘনাথবাবু। পরশুই আমি রওনা হতে চাই এলাহাবাদ, অনুগ্রহ ক'রে ব্যবস্থাটা ক'রে দেবেন।' প্রভাতী উঠিয়া দাঁড়াইল, দরজার দিকে দুই পা অগ্রসর হইয়া সহজ কণ্ঠেই কহিল—'আচ্ছা যাই।'

প্রভাতীর কথা শেষ হইতেই হঠাৎ অনুমানে হাত বাড়াইয়া মেঘনাথ ওর হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া কহিল—'একটা অনুরোধ—'

তার পর আর কিছুই কহিতে পারিল না। প্রভাতী দেখিল, প্রাণহীন গভীর কালো চোখ দুটি যেন বিশ্বের সকল ব্যথা লুইয়া চাহিয়া আছে ওরই মুখপানে। উদ্বিগ্ন মুখে প্রভাতী কহিল—'না—না, কিছুমাত্র ব্যথিত হইনি আমি, আপনি অপ্রস্তুত হবেন না। হয় ত বা অনেক

অসঙ্গত কথা বেরিয়ে গেছে আমার মুখ থেকে আজ, কিন্তু আমি জান্‌তাম না—'

'আজ জেনে যাও—হয় ত কোন দিন জানতে না—থাকতে বাঁধা পড়ে আমার গানে—সুরযন্ত্রে।' মেঘনাথ ওর হাত ছাড়িয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইতেই প্রভাতী দেখিল—ঘন চক্ষুপল্লব সিক্ত করিয়া তার শুভ্র কপোল বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। প্রভাতী মেঘনাথের অত্যন্ত সন্নিকটে গিয়া দাঁড়াইল—কাঁধের উপর একখানা হাত রাখিয়া গাঢ় স্বরে কহিল—'আপনার অন্তরের পরিচয় আজ ত আমার কাছে নতুন নয়—'

'নূতন নয় তোমার কাছে! দু চোখ দিয়ে তুমি পড়ে ফেলেছ আমার অন্তরের ভাষা, কিন্তু তুমি আজ শুধু আমার কাছে নূতন নও—অভিনব। কি ক'রে মনটাকে বোঝাব—কেমন ক'রে বিশ্বাস করাব মহিমান্বিতা নারী, ভালবেসেছে এক দৃষ্টিহীন—অভিশপ্ত—'

'মনকে বুঝাতে বা বিশ্বাস করাতে প্রয়োজন পড়ে না। সে যে আমাদের অজ্ঞাতসারে বহু আগেই সব বুঝে পড়ে নেয়—তারপর বিশেষ কোন অবস্থার মধ্যে এক সময় তার আত্মরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে, বেদনা-বিস্ময়ে সেদিন আমরা এই কথাই শুধু বলতে পারি—'কে জানত এমন হবে—অদৃষ্ট!'

'হয় ত তোমার কথাই সত্য।' গাঢ় স্বরে মেঘনাথ কহিল। 'তা নইলে, পৃথিবীর আলোয়, সুন্দর আকাশের নীচে এক মুহূর্ত্তের জন্যও হ'ল না তোমার সঙ্গে আমার দেখা—তবু হৃদয়ের নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে একদিন মণি দীপ উঠ্‌ল জ্বলে—সেই আলোর বন্যায় আবার দেখ্‌লাম আমার সেই হারিয়ে-যাওয়া-পৃথিবী রূপ-রস-গন্ধে টলমল করছে।'

প্রভাতীর দুই চোখ ভরিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল। আত্ম-দমন করিয়া সংযত কণ্ঠে কথার স্রোত সে ঘুরাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়া কহিল—'কি বৃষ্টিই না সুরু হয়েছে—থাম্‌বার লক্ষণ দেখছি নে, সেতারটাই না হয় হাতে তুলে নিন্, ভাল লাগছে না আর বাইরের ঝম্‌ঝমানি।' মেঘনাথ যেন স্বপ্নাভিভূত ছিল, আচম্‌কা প্রশ্ন করিল—'ভাল কথা, তপন—তপনের কি হবে? তার অন্তর জানতে আমার বাকী নেই, দু চোখ থেকেও যে দুনিয়া তার কাছে গভীর আঁধারে ভরে যাবে।'

'পৃথিবীর চেহারাটা কখন কার কাছে কি মূর্ত্তি নিয়ে প্রকাশ পায়, সেজন্য বসে বসে ভাবার দায়িত্ব অন্যের না নেওয়াই ভাল। আমারই বা কি হবে সে কথা আজ বা ভবিষ্যতে আমি নিজে ছাড়া আর কে ভাববে! সোজা কথায়, যা হবার তাত হয়েই গেছে, কাজেই ভাবনারও ইতি। আমি খুব মনে কষ্ট দিয়ে কথা বলি, নয়?' বলিয়া মেঘনাথের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া অনুতপ্ত স্বরে কহিল—'আসল কথা মাথারই আজ বোধ হয় ঠিক নেই। একখানা ফটো চাইছি আপনার, যাবার সময় নিয়ে যাবো।'

দুঃখের হাসি হাসিয়া মেঘনাথ কহিল—'দু চোখ ভরে তোমরা দেখতে পাও, মনে আঁকা পড়ে কত ছবি, তবু তোমরা চাও ফটো, কিন্তু আমায় দিয়ে গেলে কি বল ত?'

মেঘনাথের হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া প্রভাতী কহিল—'দিয়ে গেলাম প্রকাণ্ড আঘাত—যে আঘাতের ব্যথা আপনাকে আমরণ শুধু কাঁদিয়েই যাবে—আমার সে দেওয়া যে অতুলনীয়!' কান্নায় প্রভাতীর কণ্ঠ ভারি হইয়া উঠিতেই চঞ্চল হইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, দেওয়ালের বড় ঘড়িতে রাত তখন আটটা। 'আচ্ছা আজকের মত যাই।'

প্রভাতী বাহির হইয়া গেল। মেঘনাথ অনুভব করিল তার দেহমনে যেন নামিয়া আসিয়াছে মহাক্লান্তি—এমনই করিয়া বুঝি মৃত্যুর পূর্ব্বে মানুষের দেহ আচ্ছন্ন হইয়া ওঠে বিরাট অবসাদে।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙিলে প্রভাতী সেদিন সোজা চলিয়া গেল বাগানের পথে। বাগানময় ফুলের কেমন একটা ঝাঁজাল গন্ধ। চলার পথে অনেকগুলো ফুল তুলিয়াও চলিয়া গেল বাগানের শেষ সীমায়—যেখানে শুধু করবী, কামিনী আর বকুলের ঘন ছায়ায় বাঁধানো সিঁড়ি নামিয়া গেছে দীঘির কালো জলে। প্রভাতী বসিয়া পড়িল। চঞ্চল আনন্দময়ী প্রভাতী করুণ বিষণ্ণতায় সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেছে যেন। কাল সারাটি রাত ওর কাঁদিয়া কাটিয়াছে, আয়নার চেহারা দেখিয়া নিজেই চমকিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জন্ম-যুগ ভরিয়া মেঘনাথের সম্মুখে বসিয়া কাঁদিলেও সে দেখিতে পাইবে না—কোথায় কতখানি বেদনার ছাপ গভীর।—মেঘনাথকে

ভালবাসা চলে—সে শুধুই ভালবাসা ; কিন্তু নিত্যকালের জন্য সংসার করা চলে না। সংসারে নারীর মান, অভিমান, রূপলাবণ্য তুচ্ছ নয়, কিন্তু মেঘনাথের সংসারে এর কোন অর্থ নেই। যেখানে জীবনের মানে নাই—সেখানে কতকাল জের টানা চলে! কিন্তু তবু সে যে মেঘনাথ—সে আর কেউ নয়, মেঘনাথ—প্রভাতীর জীবনে প্রেমের প্রথম প্রতীক।

'বাঃ, বেশ লোক আপনি যাহোক! যাবার বেলায় একটু দেখা করব, খুঁজে হায়রাণ। মালিটা সন্ধান দিতেই না—'

'এ কি, কোথায় চলেছেন আপনি তপনবাবু?' বিস্ময়ে প্রভাতী উঠিয়া দাঁড়াইতেই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তুলিয়া-আনা ফুলগুলা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ম্লান হাসির সঙ্গে তপন কহিল—'ফুলের সঙ্গে কথা কইছিলেন বুঝি। কবি মানুষ আপনারা, অসম্ভবই বা কি।'

নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল প্রভাতী। মুহূর্ত্তকাল তপন ওর মুখপানে চাহিয়া কহিল—'এ কি—আপনি কেঁদেছেন বুঝি খুব! ভয়ানক অসুস্থ দেখাচ্ছে আজ আপনাকে। আমি অনেক সময় অবিবেচকের মত কথা বলে ফেলি মিস্ মজুমদার, স্বভাবের দোষ, কি করি বলুন। আজ একটা বিশেষ কাজে কলকাতা যাচ্ছি, কবে ফিরি ঠিক কি! আপনি অতদিন নাও থাকতে পারেন, তাই যাবার আগে দেখা করতে এলাম।' পকেট হইতে ছোট্ট একটি ক্যামেরা বাহির করিল তপন। বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া কহিল প্রভাতী—'এ কি, কি হবে এতে মিঃ রায়?'

'বিশেষ আর কি, আপনার অনুমতি পেলে ছবি একখানা তুলে রাখি।'

'না—না, তা হয় না তপনবাবু। এখানে না-ই বা তুললেন ছবি। এলাহাবাদে আমার ফটো আছে বহু, পাঠিয়ে দেব তা।

'তা দেবেন। কিন্তু সেদিন সে ছবির প্রয়োজন আমার নাও থাকতে পারে। আমার প্রয়োজন আজ্‌কে—এই যাবার মুহূর্ত্তে।' মুখের রং প্রভাতীর বদ্‌লাইয়া গেল। চেষ্টা সত্ত্বেও চোখ দুটা যেন বারণ মানে না—জলে ভরিয়া উঠিতেছে। মুহূর্ত্ত পরই হাসিয়া তপন কহিল—'আমার কাজ হয়ে গেছে, বেয়াদপি মাপ করবেন। আচ্ছা—যাই।' নমস্কার জানাইয়া তপন ফিরিবার উপক্রম করিতেই প্রভাতী কহিল—'একটা কথা তপনবাবু। অশুভ মুহূর্ত্তে আপনাদের বাড়ি এসে পা দিয়েছিলাম। আপনাদের দুই বন্ধুর ভিতর যে বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছে আমার জন্যে—আমি তা ভেঙে দিয়ে গেলাম—এখন আর কোন ভয় নেই।'

চমকিয়া তপন ফিরিয়া দাঁড়াইল, হয় ত প্রভাতীকে সে কিছু কহিবে কিন্তু প্রভাতী তখন দ্রুত পায়ে চলিয়া যাইতেছে সম্মুখস্থ পূজার দালানের অভিমুখে।

*
* *

'তপনবাবু নাকি চিঠি লিখেছেন নিজের বিয়ে ঠিক ক'রে?' প্রভাতী কহিল। 'এ কি রকম স্বার্থত্যাগ বন্ধুর জন্যে, বুঝতে পারছিনে।'

গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া উদাস কণ্ঠে মেঘনাথ কহিল—'সে ভাবছে তার অবিবাহিত জীবন বন্ধুর নতুন জীবনের যাত্রাপথে সুখের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে, তাই মনটাকে নতুন ছাঁচে ঢেলে আবার সে আসছে বন্ধুর মত সহোদরের দাবী নিয়ে কিন্তু বুঝলে না সে, বন্ধু তার বেসেছে যাকে ভাল—চায় না তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ব্যর্থ ক'রে দিতে। হৃদয় তার ভরে উঠেছে যে সুরে, সে-ই তার চরম পাওয়া।'

ব্যথিত কণ্ঠে প্রভাতী কহিল—'মনের সত্যকে কি অস্বীকার করার উপায় আছে! তিনি নতুন ছাঁচে ঢেলে জীবন গড়তে যাননি, সত্যকে মিথ্যার এনামেলে ঢেকে—'

'ঠিক বুঝতে পারছ না ওকে—'

'বুঝতে আমি পেরেছি আপনাদের সবাইকেই এবং এই জন্যেই সকলের কথা অগ্রাহ্য ক'রে চলে যাচ্ছি আজই।'

'সে কি, আজ ত যাওয়ার কথা নয়! আমি জান্‌লাম না কিছু—'

'জানাতেই ত এসেছি মেঘনাথবাবু। সমস্ত বন্দোবস্ত মাসিমাই ক'রে দিয়েছেন। আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই রওনা হতে হবে যে!'

সমস্ত দেহভার সোফার উপর এলাইয়া দিয়া মেঘনাথ মুহূর্ত্তকাল দুই চোখ মুদিয়া রহিল; তারপর ক্লান্তস্বরে কহিল—'তাই হয়ো। দুদিনের অতিথি হয়ে এসেছিলে—আজ চলে যাচ্ছ। কিন্তু যে ঐশ্বর্য্য তুমি আমায় দিয়ে গেলে

প্রভাতী, শেষ পর্য্যন্ত সে ভার আমি বইতে পারব ত? মনটা যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে, তাই ভয় হচ্ছে দুকান ভরে-শোনা তোমার হাসি, কথা, চলার ছন্দ—না জানি শেষকালে হারিয়ে যায়, আর সেদিনই মৃত্যু এসে নিভিয়ে দেবে প্রেমের মণিদীপটিকে।'

প্রভাতী নীরবে মেঘনাথের মুখ পানে চাহিয়া বসিয়াছিল। এ মানুষটির কাছে গোপন করিবার কিছু নাই। রৌদ্রালোকের মত নিজকে স্পষ্ট প্রকাশিত করিয়া না ধরিলে কিছুই সে জানিবে না, বুঝিবে না—কেবলই জমাট আঁধারের মধ্যে গুমরিয়া কাঁদিয়া মরিবে। কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করার মধ্যে যে এত গ্লানি এত ব্যথা জমা হইয়াছিল, প্রভাতী তাহা প্রথম বুঝিতে পারে নাই। যতদিন ছিল ও অপ্রকাশিত, প্রশ্ন ওঠে নাই ত এত বড় সমস্যার, —চঞ্চল-বিক্ষুব্ধ হইয়া আহত মন একদিনও ত কাঙালের মত কাঁদিয়া ওঠে নাই! প্রভাতী উঠিয়া দাঁড়াইল, বাতায়নের সম্মুখে গিয়া বাহির পানে মুখ করিয়া দাঁড়াইল। —পশ্চিম আকাশে সূর্য্য ঢলিয়া পড়িতেছে, তারই 'গাঢ় লালিমা' দিগন্তব্যাপী যেন ব্যথার দীপালি জ্বালিয়া দিয়াছে।

হঠাৎ চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া প্রভাতী কহিল—'এ কি, আপনি উঠে এলেন যে!'

নিঃশব্দে মেঘনাথ ওর মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া কহিল—'তুমি কাঁদছ? এই ত আমার হাত ভিজে গেল—কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্ছিনে আমি। যাবার বেলায় তোমার অশ্রুভরা মুখখানিও রয়ে গেল আমার কাছে ঢাকা। এই অশেষ অন্ধকারের মধ্যে—'

'আমি যাই।' অধীর চঞ্চলতায় প্রভাতী কহিল—'অন্তরের মণিকোঠায় যে দীপ জ্বলে, তা নেভে না। কিন্তু আর নয়—এবার আমার বিদায়।'

বাহিরে মোটরের হর্ন বাজিয়া উঠিল। কি যেন কহিতে গেল মেঘনাথ, মুখের উপর হাত চাপা দিয়া প্রভাতী কহিল—'অসমাপ্তই থাক।'

প্রভাতী মেঘনাথের হাতখানি সরাইয়া দিয়া অস্থিরপদে বাহির হইয়া গেল।

প্রেয়সী

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

তোমারে চেয়েছি আমি একান্ত নির্জ্জনে,
নীরব বাসন্তী রাতে মোর কুঞ্জবনে,
আষাঢ়ের বরিষণে মধুর সন্ধ্যায়,
গ্রীষ্মের প্রখর তাপে মোর গৃহছায়।
কখন এসেছ ধীরে মৌন মুগ্ধরূপে
আমার সম্মুখে অয়ি! অতি চুপে চুপে
দিয়েছ সরায়ে বিস্মৃতির যবনিকা
খানি। তারপর ধীরে ধীরে ম্লানশিখা
করেছ উজল। নির্ব্বাক বিস্ময়ে আমি
চাহিয়া ক্ষণিক, তোমারে দিয়েছি আনি
তুচ্ছ অর্ঘ্যখানি। তুমি অভিমান ভরে
কহিয়াছ যত কথা ব্যথাহত-স্বরে
শুনিয়াছে প্রেমমুগ্ধ শান্ত মোর হিয়া
করুণ-উল্লাসে। ওগো সুদূরের প্রিয়া
কঠিন আঘাতে যবে ছিন্ন দেহমন
আসিয়াছ সঙ্গোপনে, ভুলায়ে বেদন
সান্ত্বনা দিয়েছ প্রাণে। যারে লভি নাই—
তোমার পরশ ক্ষণে তারে যেন পাই।
কখনো এসেছ তুমি নগ্নদেহ লয়ে
রূপের উচ্ছ্বাস তুলি অপরূপ হয়ে
আমার নয়ন-পথে; আমি শিহরিয়া
তোমারে আড়াল করি নয়ন মুদিয়া।
বন্দী করি ধীরে ধীরে বাহুর বন্ধনে
তুমি কহিয়াছ কথা মোর কানে কানে—
"ওগো প্রিয় আমি সেই কল্পনার ছবি
মুগ্ধ তুমি যার রূপে, ধন্য তুমি কবি!
সেই আমি নগ্নরূপে আসিয়াছি আজ
পূর্ণ করি সৌন্দর্য্যেরে, তাই এত লাজ?
আমি নহি শৃঙ্খলিত-দেবী মহীয়সী
আমি মুক্ত নিত্যকাল, আমি যে প্রেয়সী।"

বিজ্ঞানে আকস্মিকতা

শ্রীভবেশচন্দ্র রায় এম্, এস্-সি

সুদূর আদিমকালে মানুষ যখন বনে জঙ্গলে ঘুড়িয়া বেড়াইত, যখন না ছিল তার সমাজবন্ধন, না ছিল জীবনযাত্রার জটিলতা, তখন হয়ত সুসংবদ্ধভাবে কোন কাজ করিবার বা কোন কিছু ধারাবাহিকভাবে চিন্তা করিবার তাহার এতটুকু প্রয়োজন ছিল না। প্রকৃতির বুক হইতে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে ফল ও জল খাইয়া হয়ত তাহার জীবন কাটিত, সন্ধ্যার স্নানালোকে বন বা বনান্তরের কোন বিরাট বৃক্ষতলে প্রকৃতির হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া সে নিরুদ্বেগ নিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত করিয়া দিত! প্রকৃতির সহজ নিয়মে ঝড় বৃষ্টির বর্ষণ ও হিংস্র জন্তুর আক্রমণে আদিম মানুষের প্রয়োজন হইল নিরাপদ আশ্রয়—ফলে গড়িয়া উঠিল তাহার গৃহ পাতার আচ্ছাদন ও লতার বন্ধনে। ফল ও জল খাইয়া যে মানব-শিশুর জীবন কাটিয়াছে বিনা উদ্বেগে, বনের বাড়বানলে ভস্মীভূত জীবদেহ তাহার অন্তরে জাগাইয়া তুলিল রসনার লালসা, ফলে তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইল রন্ধনের প্রথা, শিখিতে হইল বনের বাড়বানল জ্বলে কেন? শিখিতে হইল অনিশ্চিত বাড়বানলের উপর নির্ভর না করিয়া দুখানি কাঠের সাহায্যে কি ভাবে আগুন জ্বালান যায়! আহার ও আবাসের অতি আদিম প্রথা গড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে জাগিয়া উঠিল ভোগের স্পৃহা, আরামপ্রিয়তার মোহ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেরণা। এইরূপে লতাপাতার আচ্ছাদন হইতে ক্রমশ গড়িয়া উঠিল সুরম্য দালান-কোঠা। পোড়া জীবজন্তু ছাড়িয়া মানুষ খাইতে শিখিল কত বিভিন্ন সুখাদ্য ভোজ্য—সুপেয় পানীয়। জীবনযাত্রার বিভিন্ন পথের বিভিন্ন সাধনায় কত লক্ষকোটি দ্রব্যসম্ভার গড়িয়া তুলিয়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ কত আবিষ্কারের ফলে আদিম প্রভাতের অপরিসর ক্ষুদ্র বনাংশ ছাড়িয়া বিরাট বিশ্বে মানব আজ যে ক্রমবর্দ্ধমান অভাব, অপরিমেয় সমস্যা ও অগণিত দ্রব্যসম্ভার গড়িয়া তুলিয়াছে, বাস্তব ইহাকেই বলিতে পারি আমরা মানব সভ্যতা। যুগযুগান্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন জাতি বা দেশ নব নব তথ্য আবিষ্কার করিয়া মানব-সভ্যতার নূতন নূতন রূপ দিয়াছেন সত্য কিন্তু সকল সভ্যতার মূলেই রহিয়াছে সুসংবদ্ধ চিন্তাধারা। প্রকৃতির পরিহাস ও উৎপীড়নে আদিম মানুষের মনে যে মুহূর্ত্তে এই সুসংবদ্ধ চিন্তাধারার প্রেরণা জাগিয়াছিল, একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে ঠিক সেই শুভ মুহূর্ত্তে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে চির-নূতন বিজ্ঞান! বিজ্ঞান অর্থ যাহাই ধরা হোক্ না কেন, সুসংবদ্ধ চিন্তাধারাকে সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা দ্বারা ফুটাইয়া তোলাই বিজ্ঞানের লক্ষ্য এবং ইহার সাফল্যেই বিজ্ঞানের জয়।

ইহা হইতে সহজেই বোঝা যায়, বিজ্ঞানে আকস্মিকতার কোন স্থান নাই। অনেকে ইহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলেও বিজ্ঞানে আকস্মিকতার কোন স্থান সত্যই খুব কম। বাহত যে আবিষ্কারটি আকস্মিক মনে হইয়া থাকে, স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে তাহার মধ্যে দেখা যাইবে, বিভিন্ন প্রতিভার সূক্ষ্ম সাধনার ধারা! অগণিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে এ স্থলে কয়েকটি স্থূল দৃষ্টান্তের উল্লেখ চিত্তাকর্ষক হইবে বলিয়া মনে করি।

সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। সোনার মোহে মানুষ তখন আত্মহারা, পরশ পাথর খুঁজিয়া বৈজ্ঞানিক-সমাজ বৃথা সময় নষ্ট করিতেছেন। বিজ্ঞান তখন ধনীর বিলাস—দরিদ্রের যাদুবিদ্যা। কি এবং কেন—চিন্তা না করিয়া বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে-কোন পদার্থ হইতে বা একাধিক পদার্থের সমন্বয় ও প্রতিক্রিয়ার ফলে স্বর্ণ উৎপাদনের বাতুল প্রচেষ্টায় সমগ্র বৈজ্ঞানিক-সমাজ যখন ব্যাপৃত, তখন বৈজ্ঞানিক ব্র্যাণ্ড্ (Brand) বালি এবং মূত্র উত্তপ্ত করিয়া এমন একটি পদার্থ আবিষ্কার করিলেন যাহা বিনা অগ্নিতে জ্বলিতে থাকে। আবিষ্কারের পরই আবিষ্কৃত পদার্থের প্রকৃত মূল্য সেদিনের মানুষ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই—তাই রাজকীয় বিলাসের অন্যতম অঙ্গরূপে একমাত্র রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরেই ইহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত! ব্র্যাণ্ড্ কর্তৃক অকস্মাৎ আবিষ্কৃত ফস্ফরাস্ (Phosphorous) আজ দরিদ্রতম শ্রমজীবীর গৃহেও দেখিতে পাওয়া যাইবে 'দেশলাই'-এর অত্যাবশ্যকীয় মশলা হিসাবে, ফস্ফরাসের আবিষ্কার আকস্মিকতাসম্ভূত হইলেও জনকল্যাণে ইহার ব্যবহার মোটেই আকস্মিক নহে। দেশলাই প্রস্তুত করিতে ফস্ফরাসের ব্যবহার মোটেই আকস্মিক নহে। দেশলাই প্রস্তুত করিতে ফস্ফরাসের ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে মানুষের সুসংবদ্ধ চিন্তাধারার সুনির্দিষ্ট বিকাশ। স্বর্ণ উৎপাদনের সহজ উপায় আবিষ্কার করিতে গিয়া ব্র্যাণ্ড্ এমন একটি পদার্থ আবিষ্কার করিলেন যাহা মানব-সভ্যতাকে দিল গতি, দিল সজীবতা! এইরূপে কোন বিশেষ পদার্থ আবিষ্কার করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিক-সমাজ আকস্মিকভাবে কত অমূল্য জিনিষই না লাভ করিয়াছেন!

ইংরেজ যুবক পার্কিন—রসায়ন-চর্চ্চাই তাঁহার উপজীবিকা, অনন্যসাধনায় পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিলেন কুইনাইন—ম্যালেরিয়ার মহৌষধ! এই উদ্দেশ্যে অ্যানিলিন (Aniline) নামক পদার্থবিশেষের উপর বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের প্রতিক্রিয়া ছিল পার্কিনের পরীক্ষণীয় বিষয়। পার্কিনের ঈষৎ অনবধানতায় একবার একটি পরীক্ষায় মিশ্রিত পদার্থগুলি অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইয়া যাওয়ায় সমস্ত পদার্থগুলি কালো হইয়া পুড়িয়া গিয়াছে মনে হইল। অধ্যবসায়ী পার্কিন স্বীয় অমনোযোগিতায় অনুতপ্ত হইয়া পরীক্ষণীয় পদার্থগুলি ফেলিয়া দিলেন ও বিশেষ মনোযোগ এবং সাবধানতার সহিত নূতন করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। পরের দিন যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করিবার সময় পার্কিন লক্ষ্য করিলেন, পূর্ব্বদিনের পরিত্যক্ত কালো পোড়া জিনিষে জল পড়িয়া এক অতি সুন্দর রং বাহির হইয়া আসিতেছে। তৎক্ষণাৎ কারণনির্ণয়ে

অসমর্থ পার্কিন ফেলিয়া-দেওয়া পদার্থ সযত্নে পুনরায় কুড়াইয়া লইয়া প্রথম কৃত্রিম রং আবিষ্কার করিলেন—সমগ্র বৈজ্ঞানিক-সমাজের সম্মুখে খুলিয়া গেল প্রকৃতির এক রুদ্ধ সমৃদ্ধ প্রকোষ্ঠ! পার্কিনের আবিষ্কার আকস্মিকতাপ্রসূত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার সূত্র ধরিয়া বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণের চিন্তাধারার আশ্রয়ে আজ গড়িয়া উঠিয়াছে বিশ্বের রঞ্জন শিল্প! কুইনাইনের কৃত্রিম প্রস্তুত-প্রণালী আজও আবিষ্কার হয় নাই—কিন্তু আকস্মিকতাপ্রসূত রঞ্জনশিল্প রূপসাধনার ক্ষেত্রে যে নবযুগ আনিয়া দিয়াছে, মানব-সভ্যতার অগ্রগতিতে তাহার মূল্য কে অস্বীকার করিবে?

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কারের কথায় বিশ্ববিশ্রুত দানবীর নোবেলের নাম সকলেই জানেন এবং তাঁহার উপার্জ্জনের উৎস ডিনামাইটের কথাও হয়ত অনেকেই শুনিয়াছেন। এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ মারণাস্ত্র ডিনামাইট সভ্যতার ক্রমোন্নতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় পদার্থ। পাহাড়ের বুকে সুড়ঙ্গ কাটিয়া দুর্গম পথকে সুগম করিতে—খনির বুক হইতে জমাট কয়লা বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিয়া আনিতে ডিনামাইট অপরিহার্য্য ইহা সকলেই জানেন; ডিনামাইটের আবিষ্কারও আকস্মিকতাপ্রসূত। গ্লিসারিন (Glycerine) ও নাইট্রিক য়্যাসিড (Nitric acid) সমন্বয়ে উৎপাদিত নাইট্রো-গ্লিসারিন (Nitro Glycerine) অতি মারাত্মক ও অনিশ্চিত বিস্ফোরক পদার্থ। এত সহজে ইহা বিস্ফোরিত হইয়া থাকে যে, কখন কি অবস্থায় বিস্ফোরণ ঘটিবে তাহা পূর্ব্বাহ্নে অনুমান করা যায় না। নাইট্রো-গ্লিসারিন আবিষ্কারের পরই সুইডিশ রাসায়নিক নোবেল সন্ধান করিতে লাগিলেন এমন একটি শোষক পদার্থ (absorbant) যাহা নাইট্রো-গ্লিসারিনের বিস্ফোরণ ক্ষমতা একটুও না কমাইয়া ইহাকে সহজভাবে ব্যবহার করা সম্ভব করিয়া দিবে।

কোন শোষক পদার্থই আশানুরূপ ফল না দেওয়ায় নোবেল হতাশ হইয়া পড়িলেন! দৈবক্রমে একদিন খানিকটা নাইট্রো-গ্লিসারিন অসাবধানতার ফলে নোবেলের হস্তচ্যুত হইয়া নিকটে রক্ষিত "কিসেল ঘর" (Kissel Ghur) নামক এক প্রকার মাটির উপর পড়িয়া গেল। মেঝেতে পড়িয়া ইতিপূর্ব্বে অনুরূপ অবস্থায় বিস্ফোরণ ঘটিয়া থাকিলেও—এবার সহজে কিছু হইল না! পরীক্ষা করিয়া নোবেল বুঝিলেন, কিসেল ঘরই সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত উপযুক্ত শোষক। এই ভাবেই আকস্মিকতার ফলে ডিনামাইট আবিষ্কার সম্ভব হইল।

আমেরিকান বৈজ্ঞানিক গুডইয়ার নিজের সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া গবেষণা করিতেছিলেন, রবারকে কি করিয়া শক্ত ও অধিকতর কার্য্যকরী করা যায় (Vulcanisation)। চার-পাঁচ বৎসরের নিষ্ফল পরীক্ষার পর গুডইয়ার দেখিলেন, অচিরেই তাঁহাকে দেউলিয়া ঘোষিত হইতে হইবে। দিনের পর দিন সুনির্দ্দিষ্ট পরীক্ষার ফলে গুডইয়ার যাহা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, দুর্ভাগ্যের শেষ প্রান্তে আসিয়া একদা এক সুপ্রভাতে তিনি তাহা অকস্মাৎ লাভ করিলেন। একখানি উত্তপ্ত পাতের (hot plate) নিকট গুডইয়ার পরীক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, আর নিকটেই ছিল একটি পাত্রে কিছু রবার ও গন্ধক গুঁড়ার মিশ্রণ। দৈবক্রমে মিশ্রণটি হঠাৎ গরম পাতখানির উপর পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে হিস্ হিস্ শব্দ করিয়া জিনিষটি গলিয়া গেল ও কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই গলিত পদার্থটি কাল ও শক্ত হইয়া উঠিল। গুডইয়ার লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, এই তাঁহার বহু আকাঙ্ক্ষিত সাধনার ধন—এই সেই ভলকানাইজড্ রবার—যাহার আবিষ্কার-প্রচেষ্টায় তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছেন।

ভারতের নিজস্ব কৃষিসম্পদ নীল আজ রাসায়নিক নীলের প্রতিযোগিতায় একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক ফন বেয়ার প্রথমে থ্যালিক য়্যাসিড হইতে সামান্য পরিমাণ নীল উৎপাদন করেন। কিন্তু পরীক্ষাগারে সামান্য কয়েক তোলা নীল প্রস্তুত করিতে যে অস্বাভাবিক ব্যয় পড়িতে লাগিল, তাহাতে ঐ উপায়ে নীল প্রস্তুত করিবার কল্পনা বাতুলতা মনে হইতে লাগিল। থ্যালিক য়্যাসিড দুর্ম্মূল্য পদার্থ, অতি অল্প ব্যয়ে উহা প্রস্তুত করিতে না পারিলে প্রকৃতিদত্ত নীলকে পরাস্ত করা রাসায়নিক নীলের পক্ষে কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না, ইহা বুঝিতে পারিয়াই রাসায়নিক-সমাজ সহজে থ্যালিক্ য়্যাসিড প্রস্তুতের কৌশল আবিষ্কার করিতে আত্মনিয়োগ করিলেন। কি করিয়া সস্তা ন্যাপথিলিনকে (Napthelene) দুর্ম্মূল্য থ্যালিক য়্যাসিডে পরিণত করা যায় তাহার চেষ্টা চলিতে লাগিল। বিভিন্ন পরিমাণে সালফিউরিক য়্যাসিড ও ন্যাপথিলিন মিশ্রিত করিয়া মিশ্রণটিকে নির্দ্দিষ্ট তাপে উত্তপ্ত করার পর পরীক্ষা করা হইতে লাগিল থ্যালিক য়্যাসিড মোটে উৎপাদিত হইয়াছে কি-না এবং হইয়া থাকিলে কতটুকুই বা হইয়াছে। পরীক্ষার ফল নৈরাশ্যব্যঞ্জক, এক কণা থ্যালিক য়্যাসিডেরও দর্শন মিলিতেছে না। হতাশ বৈজ্ঞানিক উপায়ান্তর অন্বেষণে ব্যস্ত—এমনই সময় হঠাৎ একদিন মুহূর্ত্তের অসাবধানতায় পাত্রমধ্যস্থ তাপমান যন্ত্রটি (Thermometre) ভাঙ্গিয়া যন্ত্রস্থ সামান্য পরিমাণ পারদ মিশ্রণটির সহিত মিশিয়া গেল। পারদের পরিমাণ অতি সামান্য এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে ইহার প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব নাই বলিয়া মিশ্রণটি ফেলিয়া দেওয়া হইল না। যথারীতি পরীক্ষার পর দেখা গেল যে, সামান্য পরিমাণ পারদের সংস্পর্শে সালফিউরিক য়্যাসিড ন্যাপথিলিনকে পরিপূর্ণরূপে থ্যালিক য়্যাসিডে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। এই অতি-আকস্মিক আবিষ্কার যে জগতের একটি বিশিষ্ট আবিষ্কার তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই—সাধনায় যাহা ছিল নৈরাশ্যব্যঞ্জক, আকস্মিকতায় তাহাই হইয়া উঠিল ফলপ্রসূ।

আকস্মিকতার যে কয়েকটি উদাহরণ এখানে দিলাম, সংক্ষেপে সেগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা চলে। ফস্ফরাস্ বা য়্যানিলিন-সঞ্জাত রং আবিষ্কার ব্র্যাণ্ড বা পার্কিনের উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু নাইট্রো-গ্লিসারিনের শোষক রবার ভলক্যানাইজেসনের উপায় বা থ্যালিক য়্যাসিড্ প্রস্তুতের বিধি আবিষ্কার করার জন্য ধারাবাহিকরূপে চেষ্টা করা হইয়াছিল—যদিও একথা নিশ্চিত যে, আকস্মিকতাপ্রসূত না হইলে যথাযথ ক্ষেত্রে কি-সেলঘর, গন্ধকচূর্ণ অথবা পারদ মোটে ব্যবহৃত হইত কি-না সন্দেহ!

ইহা হইতে স্বভাবত মনে হইতে পারে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আকস্মিকতার যথেষ্ট মূল্য আছে। আপাতদৃষ্টিতে ইহা সত্য মনে হইলেও একথা ভুলিলে চলিবে না যে, আকস্মিকতা অদ্যাবধি সফল করিয়াছে তাঁহাদেরই সাধনা, যাঁহারা অনন্যচিত্তে কোন বিশেষ সমস্যা লইয়া গবেষণা করিয়াছেন! বিষয়ান্তরের আলোচনা করিতে গিয়া ফস্ফরাস্ বা য়্যানিলিন-সঞ্জাত রং আবিষ্কার হইয়াছিল সত্য, কিন্তু মানব-সভ্যতায় ইহাদের ব্যবহার কোন মতেই আকস্মিক নহে পরন্তু বৈজ্ঞানিক মনীষিগণের সুনির্দ্দিষ্ট চিন্তাপ্রসূত। স্বর্ণপ্রসূ ভারতযাত্রার পথ খুঁজিতে গিয়া কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার সে আবিষ্কার 'আবিষ্কার' মাত্র—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নহে। ফস্ফরাসের আবিষ্কারও আবিষ্কার মাত্রই—ইহাকেও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বলা চলে না। যদিও ব্রাণ্ড কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে পদার্থটির গুণাবলী বা ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা যাহাই জানিতে পারিয়াছি তাঁহার সবগুলিকেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আখ্যা দিতে হইবে।

রক্ষাকালী

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

এই বিশ্বেরি সব চিত্ত যখন উঠ্‌লো অসুর-রাজ্যে গড়ি',
মাগো, স্বর্গলোকের দেব্‌তা-মনে উঠ্‌লো মা তোর আসন নড়ি'।
ওগো আজ যে আবার সেদিন এলো জাগলো পশুবলের ভয়,
সারা মর্ত্ত্য জুড়ে জাগ্‌লো অসুর করবে নাকি স্বর্গ জয়?
ওগো আমরা যে মা বংশ দেবের আমরা যে মা স্বর্গবাসী,
হেথা পশুর বলে অসুর লীলা করবে কি মা স্বর্গে আসি'?

মাগো, ভারতখানা কাঁপ্‌ল সেবার মহিষাসুরের গর্জ্জনেতে
সারা বিশ্ব যে মা কাঁপছে এবার অসুরদেরি তর্জ্জনেতে
বুঝি ধ্বংস হবে সকল জগৎ, সৃষ্টি হবে রক্তময়,
শেষে কৃষ্টি এবং সভ্যতারে বর্ব্বরতাই করবে জয়?
তুই সইবি কি তা? কক্ষণো নয় আয় মা নেচে খড়্গহাতে,
আজ করছি মোরা মা তোর বোধন ক্রন্দনেরি বন্দনাতে।

তোর দুর্গালীলা চাইনে এবার ফেল্ মা খুলে' রক্ত চেলী,
আজ উলঙ্গিনী আয় মা নেচে লক্‌লকানো জিহ্বা মেলি'।
আয় ডাক্ দে মা তোর কিচ্‌নীদেরে' উঠুক মা তোর অট্টহাসি,
আজ ভূত প্রেতেরে সঙ্গে নিয়ে আয় মা নেচে সর্ব্বনাশী।
সব বর্ব্বরতায় খণ্ড করি' পর মা গেঁথে মুণ্ডমালা,
তোর পায়ের তলায় লোটাক্ মা শিব বিশ্ব হউক শান্তিঢালা।

মাগো গর্জ্জাক্ অমাবস্যা আজি গর্জ্জে উঠুক অন্ধকার,
আজ নৃত্যে মা তোর উঠুক নেচে মর্ত্ত্য এবং স্বর্গদ্বার।
যত ভদ্রবেশী বিজ্ঞানেরি সয়তানীরে জব্দ কর্,
তুই প্রলয় নাচন্ নাচ মা আবার তাথৈঃ তাথৈঃ শব্দ কর্।
আজ আয় মা কালী মঙ্গলা তুই অভয় মোদের শীর্ষে ঢালি',
কর সর্ব্বনাশের সর্ব্বনাশ আজ, ভক্তে রাখো রক্ষাকালী।

আধুনিক জগত ও হিন্দুজাতি *

অধ্যাপক শ্রীমেঘনাদ সাহা ডি-এস্-সি,এফ্-আর-এস্

'বিজ্ঞানের নামে অজ্ঞানের প্রচার'

একথা না বলিলেও চলে যে, আধুনিক জগতে নানা কারণে বিজ্ঞানের বেশ খানিকটা মর্য্যাদা বা prestige—বাড়িয়াছে। য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপানে বিজ্ঞানের দৌলতে গত পঞ্চাশ বৎসরে মানবের জীবনযাত্রার প্রণালী অনেক পরিমাণে উন্নত হইয়াছে; এবং জ্যোতিষ, প্রাকৃত-বিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণি ও উদ্ভিদ্ তত্ত্ব, চিকিৎসা শাস্ত্র, যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে মানবের জ্ঞানের পরিধি অপরিসীম বাড়াইয়া দিয়াছে। সুতরাং ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে, অনেক অ-বৈজ্ঞানিক লোক (অর্থাৎ যাঁহারা কখনও বিজ্ঞানের ধারাবাহিক শিক্ষার—discipline of science—ভিতর দিয়া যান নাই, অতএব যাঁহাদের বর্ত্তমান বিজ্ঞান, সম্বন্ধে জ্ঞান নাই বলিলেও চলে) নানা প্রকারে বিজ্ঞানের বাস্তব কৃতিত্বকে খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পাইবেন?

এই প্রচেষ্টা প্রকাশ পাইতেছে নানা রূপ ধরিয়া। এক শ্রেণীর লোক বলেন যে, বিজ্ঞান আর নূতন কি করিয়াছে? বিজ্ঞান বর্ত্তমানে যাহা করিয়াছে—তাহা কোনও প্রাচীন ঋষি, বেদ বা পুরাণ বা অন্যত্র কোথাও-না-কোথাও বীজাকারে বলিয়া গিয়াছেন। অপর এক শ্রেণীর লোক বলেন যে, বিজ্ঞান মানব-সমাজের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক করিয়াছে, যথা—বিজ্ঞানের প্রসারে মানব-সমাজে যুদ্ধ-বিগ্রহ বাড়িয়াছে, বিষাক্ত গ্যাস, বিস্ফোটক প্রভৃতি নানারূপ মানুষ-মারা জিনিস সৃষ্টি হইয়াছে। অপর এক শ্রেণীর লোক বলেন যে, বিজ্ঞান মানুষের ভোগলিপ্সা বর্ধিত করিয়া তাহাকে আধ্যাত্মিকতা হইতে ভিন্ন পথে লইয়া যাইতেছে। সমালোচক শ্রীঅনিলবরণ রায়ের রচনার মধ্যে এই 'ত্রিবিধ' মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

আমি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধদ্বয়ে প্রথম শ্রেণীর সমালোচকদের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছি। সমালোচক অনিলবরণ রায় বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যে সমুদয় তথ্য, যেমন—'ক্রমবিবর্ত্তনবাদ', 'জ্যোতিষ্ক আবিষ্কার' ইত্যাদি—প্রাচীন শাস্ত্রে কোথাও-না-কোথাও বীজাকারে বা পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সমস্তই যে 'অলীক ও ভ্রান্ত' তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। এক্ষণে বক্তব্য, সমালোচক যদি বাস্তবিকই 'পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে'র সহিত প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা-কার্য্যে ব্রতী হইতে চান, তবে তিনি ভাল করিয়া 'পাশ্চাত্য বিজ্ঞান'-এর সাধনা করুন, নতুবা 'অজ্ঞানকে বিজ্ঞান' বলিয়া প্রচারের অপচেষ্টা করা নিরর্থক এবং আমার মতে তাঁহার কোন 'অধিকার' নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অতি বিরাট জিনিস—প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত শাস্ত্র; ধ্যানে বসিয়া অথবা দুই-একখানা সুলভ বা popular বই পড়িয়া তাহাতে অধিকারী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ঐ বিজ্ঞানের সাধনা করিতে হয় হাতে-কলমে, প্রণিধান করিতে হয় আজীবন স্বাধীন চিন্তায়, 'গুরু' বিজ্ঞানে 'পথপ্রদর্শক' মাত্র, কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক গুরু যদি 'পূর্ণ ও চিরন্তন সত্য' আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন, তাঁহাকে উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। এক্ষেত্রে 'গুরুভক্ত'দের চেয়ে 'গুরুমারা' শিষ্যেরই আদর ও প্রয়োজনীয়তা বেশী। বিজ্ঞান কখনও চিরন্তন সত্য আবিষ্কার করিয়াছে বলিয়া দাবী করে না, কিন্তু সাধকের অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তিকে সজাগ রাখিয়া তথ্য সন্ধানের পন্থা বলিয়া দেয়।

বিজ্ঞানের নামে সমালোচকের দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, মানুষ প্রকৃতিকে জয় করিয়াছে সত্য, কিন্তু সে তাহার অন্তর্নিহিত পাশবিক ভাবকে জয় করিতে পারে নাই। সমালোচক অনিলবরণ রায় বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এই মামুলী অভিযোগ আনিতে ছাড়েন নাই এবং অনেক গান্ধী-পন্থীও 'বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়া

* গত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের 'ভারতবর্ষ-এ' প্রকাশিত 'আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম্ম' শীর্ষক প্রবন্ধের শেষাংশ। —লেখক

চরকা, গরুর গাড়ী ও বৈদিক তাঁতের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু এই সমস্ত সমালোচক একটা অতি স্থূল কথা ভুলিয়া যান। বিজ্ঞান যে 'ব্যক্তিগত জীবন'-কে কতটা উন্নত করিয়াছে তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের মোটেই কোন ধারণা নাই। দুই একটি প্রমাণ দিতেছি।

আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে বিজ্ঞান ব্যক্তিগত জীবনে প্রযুক্ত হয় নাই, তথায় মানুষের গড়পড়তায় জীবনকাল সাড়ে তেইশ বৎসর মাত্র।* মধ্যযুগে অর্থাৎ—বৈজ্ঞানিক যুগের পূর্ব্বে, য়ুরোপেও গড় জীবনকাল ছিল পঁচিশ বৎসর। কিন্তু গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে য়ুরোপ ও আমেরিকায় মানুষের গড়পড়তায় জীবন বাড়িয়া প্রায় দুই গুণ অর্থাৎ—প্রায় ছচল্লিশ বৎসর হইয়াছে। 'বর্ত্তমান বিজ্ঞান'-এর ভারতীয় সমালোচকগণ এই জীবনবৃদ্ধির কারণটা তলাইয়া দেখিবার বোধ হয় অবসর পান নাই। ইহার কারণ এই যে, বিজ্ঞানের প্রসাদে য়ুরোপের অধিবাসীরা প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যকর আবাস, রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা, যথেষ্ট বিশ্রাম প্রভৃতি স্বাচ্ছন্দ্যের (amenities of life) অধিকারী হইয়াছে। কিন্তু ভারত, চীন বা আবিসিনিয়ার গ্রামবাসী দুইবেলা উপযুক্ত আহার পায় না, তাহাদের শীত-গ্রীষ্ম-নিবারক বস্ত্রাদি নাই, বাসস্থান অতীব অস্বাস্থ্যকর, রোগে চিকিৎসক ডাকিবার ও ঔষধ কিনিবার সামর্থ্য নাই; এ জন্য অধিকাংশ স্থলেই তাহারা অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় এবং যতদিন বাঁচিয়া থাকে বেশীর ভাগ অভাব, রোগ ও শোকগ্রস্ত হইয়া আধমরা হইয়াই থাকে।

জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি হিসাব করিয়া দেখিয়াছে যে, এদেশের লোকের বৎসরে মাথা পিছু আয় পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র, কিন্তু বিলাতের লোকের আয় প্রায় মাথা পিছু দুই হাজার টাকা, অর্থাৎ—এখানকার প্রায় ত্রিশ গুণ। অনেকে বিলাতের সহিত তুলনায় আপত্তি করিবেন, কারণ বিলাতের উপনিবেশ আছে, আর আছে ভারত-মাতারূপ একটি কামধেনু। কিন্তু আর একটি পাশ্চাত্য দেশ লওয়া যাক, যেমন সুইডেন্। এই দেশের কোন উপনিবেশ বা অধীন দেশরূপ কামধেনু নাই; তাহা সত্ত্বেও এই দেশের জনপ্রতি বাৎসরিক আয় ভারতবাসীর গড় আয়ের প্রায় বিশ গুণ।* এমন কি, জাপান ভারত অপেক্ষা প্রাকৃতিক সম্পদে ন্যূন হইলেও বিজ্ঞান-সম্মত কার্য্য-পন্থা অবলম্বন করায় তথায় জনপ্রতি আয় গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবাসীর আয় অপেক্ষা চারি হইতে পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চীন, ভারত ও আবিসিনিয়ার দারিদ্র্যের একমাত্র কারণ এই যে, এই সমস্ত দেশ (যে কারণেই হউক—আংশিক পরাধীনতা, আংশিক ভ্রান্ত জনমত পোষণ) বিজ্ঞানকে গ্রহণ করে নাই এবং বৈজ্ঞানিক-প্রণালী অবলম্বনে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিবার এবং জনসাধারণের মধ্যে সেই সম্পদ যথাসম্ভব সমভাবে বিতরণ করিবার চেষ্টা করে নাই। পক্ষান্তরে, ইংলণ্ড ও অপরাপর য়ুরোপীয় দেশ নিজ নিজ যাবতীয় প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বৎসরে জনপিছু প্রায় দুই হাজার ইউনিট কাজ পাইতেছে; কিন্তু ভারতবাসী মোটের উপর নিজের শক্তি এবং দুই একটি গৃহপালিত পশুর শক্তির উপর নির্ভর করে বলিয়া তাহার আয়ও পঁচিশ হইতে ত্রিশ গুণ কম হয়। একজন চরকাপন্থী বর্ত্তমান লেখককে জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের বহুবর্ষব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, সারা বৎসর বিশ্রাম সময়ে চরকা কাটিয়া সাকুল্যে বৎসরে আয় হয় মাত্র চারি টাকা। চরকার নিরর্থকতা সম্বন্ধে ইহার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হইতে পারে? প্রকৃত পক্ষে, বিজ্ঞানের প্রভাবেই প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগাইয়া দেশের আয়বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে; এবং ব্যক্তিগত জীবনকে মধ্যযুগ (বিজ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ) অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উন্নত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করিয়া তোলা সুকর হইয়াছে।

---

* 'জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি'র (National Planning Committee) বোম্বাই অধিবেশনে মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান স্যর এম্. বিশ্বেশ্বরায়া এই সুন্দর যুক্তিটি উত্থাপন করিয়া কুমারাপ্পা মহাশয়কে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন; আমি এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরায়ার যুক্তিটি আরও বিস্তৃত করিয়া দেখাইয়াছি।—লেখক।

* বিগত মহাযুদ্ধের পর কি করিয়া সুইডেন্ পরিকল্পনা করিয়া এত সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে তৎসম্বন্ধে 'ডিমোক্রাটিক প্ল্যানিং ইন্ ?..' নামক পুস্তক, অথবা 'সায়েন্স এণ্ড কালচার' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং ইন্ সুইডেন' প্রবন্ধ পঠিতব্য।—লেখক।

যদি মানুষকে সর্ব্বদা অভাব, অভিযোগ ও দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হয় তবে তাহার ইতরপ্রাণীজীবনের ঊর্দ্ধে উঠিবার অবসর কোথায়? অধিকাংশ ঐতিহাসিক-দিগের মতে যে সমস্ত জাতি বা সমাজ সভ্যতার উর্দ্ধতন শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অপরাপর জাতি বা সমাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল।* দার্শনিক গুরু প্লেটো বলিয়াছেন যে, এথেন্সের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগে, অর্থাৎ—পেরিক্লিসের কালে, প্রত্যেক এথেনীয় নাগরিকের গড়ে চারিজন ক্রীতদাস থাকিত; অর্থাৎ—নাগরিকদের অধীনে এক শ্রেণীর লোক ছিল-যাহারা কৃষি, শিল্প, ভারবহন ইত্যাদি যাবতীয় শ্রমসাধ্য কাজ করিত এবং নাগরিকগণ শুধু তাহাদের কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিতেন। এজন্য নাগরিকগণ সুষ্ঠু শাস্ত্র, দর্শন, স্থপতি ও কলাবিদ্যা, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনার জন্য যথেষ্ট সময় পাইতেন। কিন্তু এথেন্স যখন মাকিদন্-রাষ্ট্রের অধীন হইল তখন এথেন্সবাসী নাগরিকের অর্থ-সমস্যা আরম্ভ হইল এবং যে এথেন্স এককালে সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের সংস্কৃতিপ্রভাবে পৃথিবীকে চমৎকৃত করিয়াছিল তাহা অচিরে, অর্থাৎ এক শতাব্দীর মধ্যে, একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর নগরে পরিণত হইল।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে, অর্থাৎ—প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া তাহার যাবতীয় কাজ করাইয়া লইতে পারে, ক্রীতদাস রাখার প্রয়োজন হয় না বলিলেও চলে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া এই প্রচেষ্টা চলিতেছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইংলণ্ডে বৎসরে জনপিছু কাজের পরিমাণ দুই হাজার ইউনিট—ইহার মধ্যে প্রায় ছয়শত ইউনিট বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে, প্রায় হাজার ইউনিট বাষ্পীয় শক্তি হইতে এবং অবশিষ্ট চারিশত ইউনিট পেট্রোল ও অপরাপর দাহ্য পদার্থ হইতে উৎপন্ন করা হয়। যদি উহার সমতুল্য পরিমাণ কাজ ক্রীতদাস রাখিয়া উৎপন্ন করা হইত, তবে ইংলণ্ডের প্রত্যেক ব্যক্তির অন্যূন দশজন ক্রীতদাসের প্রয়োজন হইত এবং প্রত্যেক ক্রীতদাসকে প্রত্যহ আট ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইত। কারণ, মানুষের কার্য্যকরী ক্ষমতা অত্যন্ত কম। বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে দেখা গিয়াছে যে, একটি ঘোড়া দশজন মানুষের কাজের সমান কাজ করিতে পারে। একটি ঘোড়া এক ঘণ্টা কাজ করিলে $\frac{3}{4}$ ইউনিট কাজ হয়; সুতরাং, একজন লোক আট ঘণ্টা খাটিলে, ত্রৈরাশিক পন্থায় দেখা যাইবে যে, মাত্র $\frac{৩ \times ৮}{৪ \times ১০}$, অর্থাৎ—$\frac{3}{5}$ ইউনিট কাজ করিতে পারে। যদি ধরা যায় যে, ক্রীতদাস বৎসরে তিন শত দিন কাজ করে, তাহা হইলে তাহার সারা বৎসরে কাজের পরিমাণ হয় $\frac{3}{5} \times ৩০০$ অর্থাৎ—একশত আশী ইউনিট। অতএব, দুই হাজার ইউনিট কাজ পাইতে হইলে ইংলণ্ডের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রায় এগার জন ক্রীতদাসের প্রয়োজন হইত।

যদি পাঠকগণ এই সহজ হিসাবটি বুঝিতে চেষ্টা করেন তবে দেখিতে পাইবেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির পক্ষে কতটা সুন্দর পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছে। প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্য্যে বিনিয়োগ করার ফলে প্রতি ইংলণ্ডবাসী কম-বেশ দশটি ক্রীতদাসের পরিশ্রমলব্ধ সম্পদের অধিকারী হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, এই 'ক্রীতদাস'কে বাধ্য রাখার জন্য আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, কার্য্যপন্থা সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া কেবলমাত্র 'সুইচ্' টিপিবামাত্র 'ক্রীতদাস' স্বতস্ফূর্ত্তিতে কাজ করিয়া যায়। বেত্রাঘাতের বালাই নাই, পুলিস বা সিপাহী মোতায়েন রাখিবার আবশ্যকতা নাই। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপান এতটা ঋদ্ধিশালী হইয়াছে এই প্রাকৃতিক শক্তি প্রয়োগের ফলেই, এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনও অনেক উন্নত স্তরে উঠিয়াছে। এক্ষণে বক্তব্য, যদি এদেশের সুমহান্ অধ্যাত্ম-তত্ত্বের সাধকগণ এবং তথা গান্ধী-পন্থিগণ এই সামান্য তত্ত্বটি উপলব্ধি করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন তবে আমাদের দেশ চরকা, গরুর গাড়ী, বৈদিক তাঁত ও প্রাচীন শাস্ত্রের মারাত্মক আধ্যাত্মিকতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া ভবিষ্যতে মহীয়সী সভ্যতার পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে। ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ; যদি একটি

* অনেকের বিশ্বাস, ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা তপোবনে বা অরণ্যে বিকশিত হইয়াছিল শহরে নয়; বর্ত্তমানে লেখকের মতে এই ধারণা বহুল পরিমাণে ভ্রান্ত। সহজেই প্রতীত হইবে যে, ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল তক্ষশীলা, বারাণসী, উজ্জয়িনী, পাটলিপুত্র প্রভৃতি সুবৃহৎ নগরে। প্রকৃত ইতিহাস না জানার ফলে প্রধানত কবি ও দার্শনিকগণ এইরূপ ভ্রান্ত মত সৃষ্টি করিয়াছেন।—লেখক

সুচিন্তিত কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের সর্ব্ববিধ কার্য্যে প্রয়োগ করিবার দেশব্যাপী প্রচেষ্টা হয় তাহা হইলে আশা করা যাইতে পারে যে দশ বৎসরের মধ্যে ভারতের জনপিছু দ্বিগুণ আয় করা কিছু অসম্ভব নয়। 'জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি' সম্প্রতি এই কার্য্যপন্থা নির্দ্ধারণে নিযুক্ত আছেন।

প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে লোকের নিজের দেশ ছাড়া, অন্য দেশ সম্বন্ধে ধারণা অতি অল্পই ছিল, ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন ধর্ম্মী লোককে তাহারা বর্ব্বর, অসভ্য ও পাপাসক্ত বলিয়া মনে করিত ; এক দেশের লোকের পক্ষে অন্য দেশে ভ্রমণ করা বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের প্রসাদে পৃথিবীর অতি দূরতম দেশের মধ্যেও সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে, বিভিন্ন দেশের লোক পরস্পর পরস্পরকে জানিতে শিখিয়াছে। বিজ্ঞান ব্যক্তিগত জীবনকে যতটা সুখী ও উন্নত করিয়াছে তৎসম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য মনে করি।

নূরজাহান

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

আমার কবরে প্রদীপ জ্বেলো না, ঢেলো না ফুলের রাশি—
আমি গরীবের মেয়ে ;
শাহাজাদী নই, কাল-প্রবাহের কুটিল বাহিনী বেয়ে—
তৃণের মতন ভাসি।

জোনাকির আলো সেই মোর ভালো ঝিল্লী-মুখর-রাতে
একটানা একস্বরে—
বাদশা হারেম ছাড়িয়া এলেম ধরার অন্তঃপুরে—
অন্তিম সংঘাতে।

কাঁটার কুসুম মাখি কুঙ্কুম শাহান্ শাহের করে—
হয়েছিনু সুলতানা,
গরীবের মেয়ে ভোলেনি তা পেয়ে দৈন্যের তোষাখানা
ধুলি শয্যার 'পরে।

মাটীর উপরে মেলেনি শান্তি মিলেছে মাটীর নীচে
মিটে গেছে ভুল চুক
ফেলিয়া এসেছি ধিক-ধিক্কার অতীতের সুখদুঃখ
দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব পিছে।

নিঃস্ব আমার নিরাভরণার রূপের ভস্মলেশ—
চিত্রিত শুধু ছায়া—
ঐতিহাসিক হাসিয়া দেখায় এই কাঞ্চন কায়া—
ধূলীভূত নিঃশেষ !

হে কবি, তোমার করুণার কণা নির্ব্বাকে দিল ভাষা
স্নেহের সঞ্জীবনী,
বিস্মরণের মরণ-তোরণ পারায়ে বৈতরণী—
হেথায় বাঁধিনু বাসা।

রূপের আগুনে জাহান পুড়িল আফ্‌শোষে পুড়ি নিজে
মরিল নূরজাহান,
বজ্র নিনাদে গাহিল আকাশ মেঘমল্লার গান
দুঃখে ধরণী ভিজে।

ইরাণ দেশের মরুভূর ফুল ভুল করি সেরগড়ে—
রাখিল বর্দ্ধমান
উথরার পুরী ছারখার করি বাদশাহী ফর্মান
সের খাঁর শিরে পড়ে।

এই মেহেরের মেহেরবাণীর গোলাম জাহাঙ্গীর
মোহরে লিখিল নাম
বড় আদরের সেই মেহেরের শেষের মনস্কাম
মিটাইও পৃথিবীর।

সিংহাসনের সরণির শেষে ধূলার বৃন্দাবনে
সমাধির চত্বরে—
চরণের ধূলা দিতে হে পথিক ! অনুকম্পার ভরে
র'বে কি তোমার মনে ?

আমার কবরে প্রদীপ জেলো না যদি পতঙ্গ পুড়ে—
কেঁদে মরি অন্তরে—
ফুল ভালবাসে জানি বুলবুল মৌমাছি মধুকরে—
সুখে যেন তারা ওড়ে।
তুলো না কুসুম জ্বেলো না প্রদীপ
নূরজাহানের তরে
এই গৃহ-চত্বরে।

প্রেম ও পূজা

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস

হঠাৎ একদিন তল্পী-তল্পা লইয়া একটি বাইশ-তেইশ বৎসরের যুবক হুগলী কলেজের হস্টেলে আসিয়া সমবেত ছাত্রমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'আপনাদের জ্বালাতে এলুম। কৃষ্ণনগর কৃষ্ণের নগর ছিল কি-না জানি না, কিন্তু সে এই অসিতের ভার আর ধারণ করতে পারিল না, শেষে পাড়ি জমাতেই হ'ল—আমায় স'য়ে নিতে পারবেন ত?"—বলিয়া নিজেই নিজের কথায় হাসিয়া উঠিল।

অমল তখন থার্ড ইয়ারে পড়ে। কথা বলিবার সহজ ভঙ্গী ও সাদাসিধা বেশভূষা দেখিয়া প্রথম হইতেই অসিতকে অমলের ভাল লাগে এবং এই ভাল-লাগাটা শেষ পর্যন্ত গভীর অন্তরঙ্গতায় পর্য্যবসিত হয়।

অমল মেধাবী ছাত্র, ক্লাসে প্রথম হয়। সে দেখিল, অসিত অসাধারণ ধীমান্, কিন্তু পাঠে তাহার আদৌ মনোযোগ নাই। সে কবিতা লিখিতে পারিত ও সুন্দর গান গাহিতে পারিত। তাই অমল তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। সাধারণত গুণমুগ্ধ হইলে যাহা হয়, অমলেরও তাহাই হইয়াছিল।

অমলের এক ভগিনী ছিল, নাম স্নেহলতা—বয়স সতের কি আঠার, গৌরবর্ণা, সুশ্রী ও সুকণ্ঠী।

অসিত ছিল সুকণ্ঠ ও শিক্ষিত গায়ক। অমল তাহাকে একদিন বাড়ীতে ডাকিয়া আনিল। অসিত একখানি গান করিল।

অমলের ঠাকুর-মা বলিলেন, 'এরই না তুই নাম করিস? বেশ ছেলে!' তারপর অসিতকে বলিলেন, 'তোমার ভাই যদি সময় হয় তা হ'লে তোমার এই বোনটিকে একটু একটু গান শিখিও।'

অসিত ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

সেই থেকে অসিত স্নেহকে গান শেখায়। প্রথম মাসখানেক তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা অপরিচয়ের সঙ্কোচ ছিল। তারপর কেমন করিয়া যে ধীরে ধীরে সেই সঙ্কোচ বিলুপ্ত হইয়া একটা দ্বিধাহীন সহজ ব্যবহার সেখানে দেখা দিয়া গেল সে একটি মধুর কাহিনী। সে আর একটি গল্প। সে কথা আমরা এখানে বলিব না। তবে একথা জানিয়া রাখা দরকার যে, অসিতের গান গাহিবার অসাধারণ শক্তি ছিল এবং স্নেহ ক্রমশই তাহার ভক্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে এমন হইল, অসিত গান গায়, সে তাহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে; অসিত বাজায়, সে একদৃষ্টে তাহার চঞ্চল অঙ্গুলির লীলায়িত ভঙ্গীর মাধুরী উপভোগ করে। অসিত মধ্যে মধ্যে ধমক দেয়, মধ্যে মধ্যে-বা স্নেহের স্বরে বলে, 'স্নেহ, তুমি ভারি দুষ্টু হ'চ্ছ, গানে মন দিচ্ছ না।' কখনও বা রাগিয়া গিয়া বলে, 'নাঃ, এমন করলে আর পারব না।'

অথচ গান তাহাকে শিখাইতেই হইবে এই ছিল অসিতের পণ।

এইরূপে তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল।

স্নেহ গান গায়, অসিত শোনে এবং অসিত গান গায়, সে অন্যমনস্ক হয়—এইরূপ করিয়া প্রায় মাসখানেক অতিবাহিত হইয়াছে। অসিত একদিন আনন্দবাজারের সাংবাদিক স্তম্ভে বিজ্ঞাপিত "সঙ্গীত প্রতিযোগিতা" দেখিয়া স্নেহকে বলিল, 'নামটা দেব নাকি?'

—কার নাম?

—শ্রীমতী স্নেহলতা বসুর।

—শ্রীযুক্ত অসিতকুমার রায় বাদ যাবেন কেন?—স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই প্রতিযোগী হইতে পারে, একথা বিশেষ ক'রে যখন লেখা রয়েছে।

—আমার নামটা দিয়ে আর কাজ নেই।

—তা বুঝতে পেরেছি, ছাত্রীর সঙ্গে শিক্ষক প্রতিযোগিতায় নাম্‌লে শিক্ষকের অপমান হবে—এই ত? তা ছাড়ছি না—আপনাকে এতে নামতেই হবে। যার যা ক্ষেত্র—সঙ্গীতে আপনার অসাধারণ প্রতিভা এবং সে প্রতিভা বিকাশের পথে এ সুবর্ণ সুযোগ—আপনাকে এ সুযোগ হারাতে দিচ্ছিনে।

অন্তরের কতখানি দরদ মাখাইয়া ও রসনার কতটা সুধা ঢালিয়া স্নেহলতা যে এই কথাগুলি বলিল, অসিত হয় ত তাহাই উপলব্ধি করিতেছিল।

এমন সময় অমল মুখখানি যথাসাধ্য গম্ভীর করিয়া নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে ইহাদের কথার মাঝখানে মূর্তিমান রসভঙ্গের মত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার কণ্ঠস্বরে অভিভাবকত্বের সুর। বলিল, 'স্নেহ, বাবার চিঠি এসেছে শুনেছিস ? আর, কি লিখেছেন জানিস ? শীগ্‌গির দু কাপ চা নিয়ে আয়, বলছি।'

পিঠোপিঠি দুই ভাই-বোন। অমলের সঙ্গে স্নেহের কখনও বনে না। সকল কথার প্রতিবাদ সে করিবেই। বলিল, 'চা-টা না আনলেই নয়, ওটা এনে দিচ্ছি। কিন্তু বাবার খবর শুনতে হবে তোমার কাছে প্রথম ? তোমার চেয়ে আমি ঢের আগে শুনেছি।'

অমলের কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য নিজেরই অট্টহাস্যে কোথায় ভাসিয়া গেল এবং সে হাসির ঢেউ অনেকক্ষণ ধরিয়া বাতাসে খেলিয়া বেড়াইয়া যখন তাহার শেষ রেশটুকু পর্যন্ত মিলাইয়া গেল তখন অসিত কহিল, 'অত হাসির কি হ'ল ?'

অমল ফের্ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—হ'ল কি তোমার ?

দুই হাতে পেটটা চাপিয়া ধরিয়া অমল বলিল, 'Clear হবে এখুনি, ও ফিরে আসুক।'

এমন কি অসংলগ্ন কথা বলিয়া ফেলিয়াছে যাহাতে দাদার গাম্ভীর্য ত ভাঙ্গিলই, অধিকন্তু তাহার এতটা হাসির খোরাক সে জোগাইল—মনে মনে তাহারই আলোচনা করিতে করিতে স্নেহ ঠাকুরমার কাছে গেল এবং অত্যন্ত দ্রুত ভঙ্গীতে বলিল, 'ঠাক্‌মা, বাবার চিঠি কখন এল, কই দেখি না।'

—পরশু ত বাবার চিঠি এসেছে, সে ত তিনবার ক'রে পড়েছিস। আজ আবার চিঠি কখন এল ? অমলটা বুঝি ক্ষেপিয়েছে ? তুই যেমন বোকা, এই সাড়ে নটার সময় পিওন আসে কোন দিন ?

স্নেহ বুঝিল সে মারাত্মক ভুল করিয়াছে। দাদাকে জব্দ করিতে গিয়া সে বলিয়া ফেলিয়াছে যে, সে তাহার আগেই চিঠির কথা জানে এবং সে নিজে তাহা পড়িয়াছে। দাদার অট্টহাস্যের কারণটা বিভীষিকাপূর্ণ অয়েল পেন্টিং ছবির মত এখন চক্ষের সম্মুখে যেন দুই জোড়া বীভৎস গজদন্ত বিকশিত করিয়া তাহাকে মুখ ভেঙ্‌চাইতে লাগিল। চা লইয়া তাহাকে ফিরিতেই হইবে। কি করিয়া মাষ্টার মশায়কে মুখ দেখাইবে সে ? কেন মরিতে সে ও-কথা বলিতে গেল ?

একবার ভাবিল, চায়ের ভারটা ঠাকুরমার উপর দিয়া সে সরিয়া পড়িবে। কিন্তু এই বেলা সাড়ে-নয়টার সুস্পষ্ট আলোকে সে আত্মগোপন করিবেই বা কোথায় ? বাথ্‌রুমে ?

ভাবিল, ঠিক, বাথ্‌রুমেই সে বসিয়া থাকিবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহার এ সংকল্প টিকিল না। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাঠ-গড়ার আসামীর মত তাহাকে দাদার সম্মুখে চায়ের পেয়ালা লইয়া উপস্থিত হইতে হইল। অমল তখন মুখ টিপিয়া টিপিয়া দুষ্ট হাসি হাসিতেছে। অসিত বলিল, 'স্নেহ, আমার নামটাও প্রতিযোগিতায় দেবো ঠিক করলুম।'

স্নেহ চুপ করিয়া অপরাধীর মত অসহায় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল দাদার চেয়ারটি ধরিয়া। অমল বলিল, 'বাবা কি লিখেছেন মাষ্টার মশাইকে বল্, উনি শুনতে চাইছেন।'

অপমানিতের নিরুদ্ধ অভিমান তখন পুঞ্জীভূত হইয়া স্নেহলতার মনে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। চোখে তাহার মর্মান্তিক লাঞ্ছনার দুঃসহ গ্লানির বাষ্প জমাট বাঁধিতেছিল। সে কোনও রকমে নিজেকে সামলাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। সে আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, 'আমি জানি না, যাও।'

অসিত বলিল, 'কি হয়েছে স্নেহ, কাঁদছ কেন ?'

উচ্ছ্বসিত বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া স্নেহ বলিল, 'আমি মিথ্যা কথা বলেছি, আমি মিথ্যুক, আমি খারাপ, আমি…'

আরও কি কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া অসিত বলিল, 'তোমাকে ত দাদা মিথ্যুক বলেন নি, তুমি শুধু শুধু রাগ করছ কেন ?'

এমন সময় বাহিরে কে ডাকিল, 'অমলবাবু বাড়ী আছেন ?'

এক নিশ্বাসে চায়ের পেয়ালাটা শেষ করিয়া টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে অমল বলিল, 'যাই।'

অমল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, এদিকে স্নেহ নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এক অভাবনীয় কাণ্ড করিয়া বসিল। সে অসিতের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে ক্ষমা করুন।'

অসিত তাহাকে জোর করিয়া তুলিতে তুলিতে বলিল,

'আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না স্নেহ, তোমার দাদা যখন হাস্‌ছেন, তুমি তখন কাঁদ্‌ছ—এ তোমাদের হ'ল কি? এ যে আমার কাছে হেঁয়ালির মত ঠেক্‌ছে স্নেহ। আমার কাছে তুমি কিছু ত দোষ করনি, তবে কেন শুধু শুধু মাফ্ চেয়ে আমাকে অপরাধী করছ?'

অসিত ভাবিল, না-বলতে-পারা মেয়েদের একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা। সে স্নেহকে পীড়াপীড়ি করিল না। বলিল, 'আজ তা হ'লে আসি স্নেহ?'

স্নেহ তাহার ডাগর ছল-ছল চক্ষু দুইটি অসিতের চোখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল, 'না।'

অসিত অসীম স্নেহে তাহার মাথায় গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, 'আজ তোমার এ কি হ'ল স্নেহ?'

স্নেহ বলিল, 'আজ বাবার চিঠি আসেনি, কিন্তু পরশু এসেছিল আর আমি তা দাদাকে লুকিয়ে পড়েছি—বাবা লিখেছেন...' বলিয়া সে থামিল।

—বাবা কি লিখেছেন?

—সে দাদার কাছে শুন্‌বেন, আপনি শুধু বলুন যারা মিথ্যা কথা বলে, আপনি তাদের ঘৃণা করেন কি-না।

স্নেহের মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিতে করিতে অসিত বলিল, 'তোমার ব্যথাটা কোথায় এখন বোধ হয় বুঝতে পেরেছি। পাছে আমি তোমায় ঘৃণা করি, এই যদি তোমার ভয় হ'য়ে থাকে তো আমি তোমায় বল্‌ছি, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। মিথ্যাবাদীকে ঘৃণা করি কি-না জিজ্ঞাসা করছিলে? এ প্রশ্নের উত্তর এককথায় দেওয়া যায় না। তবে বলি শোন। আমার একটা ছোট বোন ছিল। সে থাক্‌লে তোমার মতই হ'ত। মিথ্যা কথাগুলো সে জলের মত সহজভাবে অবলীলাক্রমে ব'লে যেতে পারত, কোথাও একটুও বাধত না, এমনি অভ্যাস ছিল তার। আমি তাকে সবচেয়ে ভালবাসতুম। আর শুন্‌লে আশ্চর্য হবে, মিথ্যা কথাগুলো বেমালুম সুন্দর ক'রে চালাতে পারত ব'লে আমি তার তারিফ্ করতুম। হাঁ, সে মিথ্যা বলত বটে, কিন্তু এতটুকু অনিষ্ট সে কোনদিন কারো করেনি। কোন-একটা ক্রূর অভিসন্ধি নিয়ে যে মিথ্যা বলে, তাকে আমি ঘৃণা করি বই-কি।'

অমল ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, 'আর বড় ভাইকে জব্দ করবার জন্যে যে মিথ্যা বলে?'

'—তাকে আমি স্নেহ করি। তাকে আমি এই জন্যে ভালবাসি যে, কোন রকম দুষ্ট বুদ্ধির সাহায্য না নিয়ে, নিছক লঘু আনন্দ-পরিহাসের ভেতর দিয়ে তার বড় ভাইয়ের অনাবশ্যক ছদ্ম গাম্ভীর্যের উত্তুঙ্গ শিখরকে এক নিমিষে ভূমিসাৎ ক'রে দেয়।'

'—অসিত, তুমি ত ছাত্রীর দিকে ওকালতি করবেই। আর তোমার মত নৈয়ায়িক উকিল যে পক্ষে, তার প্রতি-পক্ষের উচিত বিনা বাক্যব্যয়ে আত্মসমর্পণ করা। আমি হার স্বীকার করছি। কিন্তু আমার যে আর একটা আর্জি আছে উকীলবাবু।'

স্নেহ অসিতের মুখের দিকে তাকাইল। তার দৃষ্টিতে ছিল একরাশি কৃতজ্ঞতা আর অভয়ভিক্ষা। অসিতের সহিত তার চোখোচোখি হইল। অসিতের দৃষ্টিতে যেন লেখা ছিল, 'ভয় কি, আমি ত আছি।' সে দৃষ্টির ভাষা স্নেহ বুঝিল। সে বলিল, 'আজ আমার ছুটি?'—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

অসিত বলিল, আর্জিটা কি শুনি?

অমল—আর্জি দুটো আছে। প্রথমটা এখুনি বল্‌ছি, দ্বিতীয়টা বলবার সময় এসেছে কি-না ভাবছি।

—আচ্ছা, প্রথমটাই আগে শুনি।

—সুশীল খবর দিতে এসেছিল বহরমপুরে খেল্‌তে যেতে হবে—ফাইনাল্ গেম্—কাল খেলা, আজ এখুনি ষ্টার্ট করতে হবে।

—ওঃ, আর দ্বিতীয়টা?

—ফিরে এসেই বল্‌ব ঠিক করলুম। হয় ত তার আগেই ঠাকুরমার কাছে শুন্‌তে পাবে।

—বাবার চিঠি-সংক্রান্ত কোন কথা কি?

—কেন, কিছু আভাস পেয়েছ না কি? স্নেহটা বুঝি বলেছে? আচ্ছা বেহায়া মেয়ে ত!

—তোমার একটা ভীষণ দোষ এই যে, তুমি কিছুই না-জেনে-শুনে যে-কোন-বিষয়ে রিমার্ক পাস করতে পার।

—স্নেহ তা হ'লে কিছু বলে নি বলছ?

একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া অসিত বলিল, 'আমার একটা কাজ আছে, আসি এখন।'

অসিত চলিয়া গেলে অমল সরাসর ভিতরে গিয়া

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সতুরুচি প্রহরাজ

কর্ম্মক্ষেত্র

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ঠাকুরমাকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, 'ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রীতি-স্নেহ কোথায়-গেল ঠাকুমা ?'

ঠাকুরমা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, কেন, কি দরকার তাকে ? হ্যাঁ রে, অসিতকে কিছু বলেছিস্ ?

—সে ভারটা ত আপনারই ঠাকুমা ? বিশেষ ক'রে বাবা, মা—এঁরা যখন ছেলেটিকে না দেখে শ্রেফ্ আপনার চিঠির বর্ণনা শুনেই একেবারে দিনস্থির ক'রে ফেল্লেন, পাত্রের দিক্ থেকে যে কোন আপত্তি থাকা সম্ভব, সে কথা ভাববারও প্রয়োজন বোধ করলেন না, তখন সবটুকু কৃতিত্ব আপনারই বই কি ! এতদূর যখন এগিয়েছে, তখন বাকীটাও আর বাকী থাক্‌বে না আশা করি ।

একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় মুখখানা বিষণ্ণ করিয়া ঠাকুরমা বলিলেন, হ্যাঁ রে, অসিত কিছু আপত্তি করবে না কি ?—সত্যি, একথা ত আমার মনে হয়নি একবারও। অথচ তার সম্মতি নেওয়াটাই ছিল আমাদের সবচেয়ে আগেকার কর্তব্য। তারপর—অমলের খুব কাছে সরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'তাই যদি সত্যি হয় অমল, অসিত যদি অমত করে ? তা বোধ হয় করবে না, না ? স্নেহকে সে খুব ভালবাসে।'

এইখানে অমলের পারিবারিক পরিচয় কিছু দেওয়া দরকার !

অমলের পিতার দুই বিবাহ। প্রথমা পত্নী—অর্থাৎ অমল ও স্নেহলতার মাতা জীবিত নাই। অপর স্ত্রী এগারটি পুত্রকন্যাসহ তাঁহার স্বামীর কাছে বাস করেন। স্বামী মধ্যপ্রদেশের হোসেঙ্গাবাদ জেলার মস্ত কন্‌ট্রাক্টার। বেশ দু'পয়সা রোজগার করেন। অমল ও স্নেহ দুর্ভাগ্যবশত বিমাতার স্নেহ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। আর বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রী পুত্রের উগ্রচণ্ডা ভার্যার কবলিতা হইবার দুঃসাহস সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই ; নাতি-নাতিনীকে লইয়া একটির পর একটি করিয়া দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটাইয়া দিতেছেন। পুত্রের অবহেলায় তাঁর কোন ক্ষোভ বা দুঃখ নাই। কাহারও বিরুদ্ধে তাঁহার কোন অভিযোগই নাই।

অসিতের ত সংসার বলিতে কোন বালাই-ই নাই। বীরভূম জেলায় অজয়ের কূলে বাড়ী ছিল তাহাদের। কিছু জমি-জায়গা ছিল। মা ও ছোট ছোট দুইটি ভাইবোনকে লইয়া তাহাদের ছিল একটি ক্ষুদ্র সংসার। সাতাশি সালের বানে মা ও ভাইবোন সমেত তাহাদের কুটীরখানি ভাসিয়া যায়। সেই-ই শুধু একটি ভাসমান বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া কোনও রকমে জীবনরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। তারপর সে কেমন করিয়া কৃষ্ণনগরে আসিয়াছিল ও প্রাইভেট টুইশানি করিয়া ম্যাট্রিক পাশ করিয়া বৃত্তি পাইয়াছিল ও কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্তি হইয়াছিল—সে একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস। আমরা সেকথা বলিব না।

ঠাকুরমা যখন অমলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ রে, অমত করবে না তো অসিত ? তাহার উত্তরে অমল বলিয়াছিল, 'কি জানি বাপু, আপনাদের আদুরে গোপালটিকে আপনি যত চিনেছেন, এমন আর কে চিনেছে বলুন !'

ইহার তিন দিন পরের কথা।

হোসেঙ্গাবাদ হইতে পূর্ব পত্রকে খণ্ডন করিয়া এক সুদীর্ঘ পত্র আসিয়াছে। পত্রে লিখিত বিষয়বস্তুর সারমর্ম এই যে, এ বিবাহ কিছুতেই হইতে পারে না। এক অজ্ঞাত-কুলশীল যুবকের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া পবিত্র পিতা-পিতামহের বংশকে কলঙ্কিত করায় কাহারও পৌরুষ নাই। এ বিবাহ বন্ধ করিতেই হইবে। সম্মুখে গ্রীষ্মাবকাশ, ছুটি হইলেই অমল যেন তাহার ভগিনীকে সঙ্গে করিয়া পিতার কাছে আসে। ছুটি হইতে বোধ হয় দু-তিন দিনের বেশি দেরি নাই। সুতরাং একসপ্তাহের মধ্যে তাহাদের পৌছান অসম্ভব হইবে না।

সমস্ত গৃহটিতে একটি থমথমে ভাব বিরাজ করিতেছে। ঠাকুরমা আজ সত্তর বৎসরের সুদীর্ঘ জীবনের সীমান্তে দাঁড়াইয়া এই নিদারুণ আঘাতটিকে সামলাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। স্নেহ লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া ফেলিয়াছে। অল্পবয়সের গাম্ভীর্যহীনতায় সে কিছুতেই নিজেকে সামলাইতে পারে নাই। অমল শুধু একবার ঠাকুরমার কাছে আর একবার স্নেহের কাছে ছুটাছুটি করিতেছে। আজিকার এতবড় বিপদে সান্ত্বনা দিবার মত কোন ভাষা সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। শুধু অসহায় অভিমানে পিতার এই নিষ্করুণ অবিমৃষ্যকারিতাকে ধিক্কার দিতেছে।

২১ আষাঢ়। ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়িতেছে। হোসেঙ্গাবাদের কুঠিবাজারের বোস ভিলায় আজ আবালবৃদ্ধবনিতার

বিরামহীন কলরব। চারিদিকের ব্যস্ততার সীমালেশহীন জনতার মধ্যে মাত্র দুইটি প্রাণী আজ সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ। অমল ও স্নেহ। স্নেহের ভিতরে কি হইতেছে বাহির দেখিয়া তাহা বুঝিবার উপায় নাই। যেন কিছুই হয় নাই। ভগিনীর এই বাহ্য ঔদাসীন্যই অমলের প্রাণে দারুণ আশঙ্কার সৃষ্টি করিতেছে। স্নেহকে বিমর্ষ দেখিলে তাহার প্রাণে অশান্তির উদ্রেক হইত সত্য, তবু সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিত। ফাঁসিকাষ্ঠের আসামীর মত প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাকে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতে হইত না।

দেখিতে দেখিতে বিবাহের লগ্নও আসিল, স্নেহলতার বিবাহও হইয়া গেল। কেহ জানিতেই পারিল না যে একটি মূল্যবান্ জীবনকে জুলুম করিয়া বলির যূপকাষ্ঠে তুলিয়া দেওয়া হইল। অমল বিবাহের পূর্ব্বে একবার পিতার নিকট ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। উত্তরে পিতা বলিয়াছিলেন, 'মেয়ের অকল্যাণ হবে, এমন কাজ বাপ কখনও করতে পারে না। যার জাত-জন্মের কথা কিছুই জানি না, তার সঙ্গে কিছুতেই স্নেহের বিয়ে দিতে পারি না। তোর বন্ধুর সঙ্গে বিয়ে কেন দিচ্ছি না, এই ত তোর নালিশ? আর তুই বোনের ভাগ্যটা দেখ্‌চিস না? খাট্‌তে-খুট্‌তে হবে না, পায়ের উপর পা দিয়ে দিব্যি আরাম ক'রে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারবে, বাড়ীতে মোটর দুটো, তিনটে ঝি, চাকর চারটে, দুজন রাঁধুনী বামুন, দারোয়ান—রাজার সংসার। হুকুম করবে, প্রভুত্ব করবে—এ কি কম সুখ? নরসিংহপুরের রাজা হবে স্নেহের স্বামী—এ কি কম গৌরবের কথা?'

অমল ইহার উত্তরে শুধু বলিয়াছিল, বাবা, শ্বশুরবাড়ীর ঐশ্বর্য্যের চেয়ে নারীর কাছে স্বামী ঢের বড় জিনিষ, সেই স্বামী-গৌরব স্নেহের কি থাক্‌বে শুনি? শুনেছি সে নিরক্ষর, হৃদয়হীন, তার উপর মাতাল, প্রথম পক্ষের চারিটি ছেলে-মেয়েও আছে—এই কি স্নেহের যোগ্য পাত্র বাবা? হ'তে পারে সে অগাধ সম্পত্তির অধিকারী, কিন্তু ঐশ্বর্য্যই সংসারের সবচেয়ে বড় জিনিষ নয়।

পিতা বলিয়াছিলেন, না, না, না, তাই বোলে তোমার [illegible]-সর্ব্বস্ব [illegible]াল-চুলোহীন বন্ধুটির গলায় আমার সোনার মেয়েকে ঝুলিয়ে দিতে পারব না।

এ বিবাহের ঘটকার্য্য করিয়াছিলেন অমলের বিমাতা স্বয়ং। পাত্রটি তাঁহারই আপন [illegible]াসতুতো ভায়ের ছেলে।

বিবাহের পরদিন স্বামীগৃহে যাইবার পূর্ব্বে দাদার পায়ের ধূলো লইতে আসিয়া স্নেহ কাঁদিয়া ফেলিল। অমল তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল, কিন্তু সান্ত্বনা দিবার মত ভাষা সে খুঁজিয়া পাইল না, শুধু এই বলিল, 'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোকে সহ্য করবার অসীম শক্তি দান করেন।'

ফিরিয়া আসিয়া অমল দেখিল, ঠাকুরমা শয্যা লইয়াছেন। তিনি বলিলেন, 'তোর টেলিগ্রাম যখন পেলুম, মনে হ'ল একবার রতনকে সঙ্গে ক'রে চলে যাই। কিন্তু যেতে ত পারলুম না, ভাবলুম, নিবারণ যখন আমায় যেতে লেখেনি, তখন যাওয়াটা ঠিক হবে না—' এই বলিয়া তিনি চক্ষু মুছিলেন। পরে বলিলেন, 'হ্যাঁরে, স্নেহ ভাল আছে ত? সে খুব কাঁদ্‌ছিল, নয়? তার অদৃষ্ট! হা ঈশ্বর।' এই বলিয়া তিনি গভীর ক্লান্তিতে চক্ষু মুদিলেন।

বাহিরে বন্ধুমহলে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। অমল শুনিল, অসিত রায় গ্রেপ্তার হইয়াছে। একটা স্বদেশী সভায় সে একটি নিষিদ্ধ বিপ্লবাত্মক গান আরম্ভ করিয়াছিল এবং পুলিশের বারম্বার বাধা-দেওয়া সত্ত্বেও সে তাহা হইতে বিরত হয় নাই, তাই পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। কাল তাহার বিচার হইয়াছে—ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

অমলের সহপাঠী জিতেন বলিল, অসিতের মুখের দিকে চাওয়া যাচ্ছিল না, ওর কি হয়েছিল বল্‌তে পার?'

ওর যে কি হইয়াছিল তাহা অমলের অজানা ছিল না; কিন্তু জিতেনকে সে তাহা বলিবে কি করিয়া?

অমল মনে করিয়াছিল এই বিপদের সময়ে অসিতের জেলে-যাওয়ার খবরটা ঠাকুরমাকে আর সে শোনাইবে না। কিন্তু বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেই ঠাকুরমা তাহাকে বলিলেন, 'শুনেচিস, অসিতের নাকি জেল হয়েছে, ভোলার মা এই মাত্র ব'লে গেল।' অমল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, হাঁ, সেও ঐ রকম শুনিয়াছে।

ঠাকুরমা বলিয়া চলিলেন, 'আহা বেচারা, স্নেহকে বড্ড

ভালবাসত, খুব দাগা পেয়েছে কি না; তোরা যাবার পর সে আমার কাছেই ত থাক্‌তো দিনরাত। বলত, ঠাকুরমার একলাটি তো ভাল লাগ্‌বে না, আর আমারও হষ্টেল বন্ধ হ'য়ে গেছে, ভালই হয়েছে—ঠাকুমার কাছে খুব গল্প শোনা যাবে। তোর টেলিগ্রামখানা সে-ই ত পড়লে। আহা, তখন মনে হ'ল বেচারার মুখখানায় কে যেন কালি ঢেলে দিয়ে গেল।

পরদিন সকালে কোথায় বেড়াতে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে বল্‌লে, 'ঠাকুরমা, রাত্রে আমি কিছু খাব না। এক সভায় আমার নেমন্তন্ন আছে, রাতে বোধ হয় ফেরাও হবে না।' এখন মনে হচ্ছে, ধরা দেবে বলে সে তৈরী হ'য়েই গেছ্‌ল। আহা, বাছা আমার কম দাগাটা ত পায়নি!—বলিয়া ঠাকুরমা চক্ষু মুছিলেন।

চিকিৎসা রীতিমতই চলিতেছে, কিন্তু রোগ ক্রমশ বাঁকিয়া দাঁড়াইতেছে। চৌধুরী সাহেব নাম-জাদা ডাক্তার। তিনি অমলকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, 'রোগী কি কোন রকম শক্‌ পেয়েছেন?'

অমল বলিল, 'হাঁ।'

—শক্‌টা একটু বেশিই লেগেছে, বয়স অনেক, তাই ভয় হচ্ছে; আচ্ছা দেখি কতদূর কি পারি—বলিয়া ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলেন।

অমল বলিল, 'বাবাকে টেলিগ্রাম করব ঠাকুরমা?'

—না।

—স্নেহের স্বামীকে?

—শুধু শুধু স্নেহকে কষ্ট দেওয়া হবে, তার স্বামী তাকে পাঠবে না।

পরের দিন রোগিণীর অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল। তার পর দিন আরও। মধ্যে মধ্যে কেবল বলিতেন, কে, অসিত এলি? কখনও বা বলিতেন, 'স্নেহ বুঝি? তুই ভারি দুষ্টু হয়েছিস!'

তার পরদিন রোগিণী সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রহিলেন।

তার পরদিন একত্রিশে আষাঢ়, বুধবার সন্ধ্যা সাতটায় সব শেষ হইয়া গেল।

তারপর দেখিতে দেখিতে কয়মাস কাটিয়া গিয়াছে। অসিত মুক্তি পাইয়া সর্বাগ্রে ঠাকুরমার সহিত দেখা করিতে আসিয়া সদর দরজায় তালা বন্ধ দেখিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। তারপর লোকমুখে শুনিয়াছে, তাহার যেদিন জেল হয়, তাহার ঠিক দশদিন পরে বোস-গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাকে দাহ করিয়া আসিয়া অমল একটা দিন বুঝি বাড়ীতে ছিল। তারপর সে যে কোথায় গিয়াছে, সে-খবর কেহই বলিতে পারে না।

পাঁচ বৎসর পরের কথা।

নরসিংহপুর মধ্যপ্রদেশের একটি বর্ধিষ্ণু শহর এবং হেমন্তকুমার সরকার সেখানকার প্রতাপশালী সম্পন্ন ব্যক্তি।

প্রকাণ্ড ত্রিতল তিন-মহল অট্টালিকা সুন্দর সুসজ্জিত। বাড়ীতে ঝি-চাকর, লোক-লস্কর সব সময় গমগম করিতেছে। আজ বাড়ীতে সকলেই ব্যস্ত। রাণীমা কাশীর বিশ্বেশ্বর দর্শনে যাইবেন। সেখানে নাকি কে একজন পরম সাধু আসিয়াছেন। ভালই হইবে, দেবদর্শন ও সাধুদর্শন এক-সঙ্গে হইয়া যাইবে।

সকলেই তাহাকে রাণীমা বলে, কিন্তু বেশভূষা দেখিলে একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রমহিলা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

বেনারস সিটি-ষ্টেশন।

ফার্ষ্ট ক্লাস রিজার্ভড্‌ কামরা হইতে একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুইটি যুবক, দুইটি মহিলা ও রাণীমা নামিলেন।

যুবক দুইটির মধ্যে একজন বলিল, 'বাবা, মা আপনাকে ডাকছেন।'

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি রাণীমার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'কি বলছ?'

—বলছিলাম, এখান থেকে বাবার মন্দিরে হেঁটে যাওয়া যায় না?

—অসম্ভব! নরসিংহপুরের রাণী যাবে ষ্টেশন থেকে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে হেঁটে? কি বলচ তুমি!

—ভগবানের কাছে আভিজাত্যের গর্ব ভাল নয়। হেঁটে-যাওয়া যদি অসম্ভব হয়, সেটা অন্য কোন কারণে হওয়াই উচিত।

—তুমি সবতাতেই তর্ক কর, এ দোষ তোমার গেল না।

ইতিমধ্যে দশ-বারোজন কুলি আসিয়া রাণীমাকে কেন্দ্র করিয়া এমন একটি ব্যূহ রচনা করিয়া ফেলিয়াছে, যাহাকে ভেদ করিয়া রাণীমার আর একপাও অগ্রসর হবার উপায় ছিল না।

যখন তাহারা বিশ্বনাথের মন্দির-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন আরতির প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে।

পাণ্ডারা তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া সমবেতকণ্ঠে অভ্যর্থনা-আবেদন-নিবেদন-কাকুতি-মিনতি আরম্ভ করিয়া দিল। ইতিমধ্যেই পরম অভিনব কৌশলে তাহারা যে-যাহার খাতা খুলিয়া যাত্রীদিগের ঊর্ধতন দুই পুরুষের নাম-তালিকা বাহির করিয়া বসিয়াছে। সে এক অপরূপ ব্যাপার, এক-একটি নামের সহিত অন্যূন তিন পুরুষের নাম-ধাম-জাতি-পেশা—সে-যেন এক-একটি ছোট-খাট কুল-ঠিকুজী!

বহু আলোচনা-গবেষণার পর পাণ্ডারা প্রৌঢ় ব্যক্তিটির নিকট প্রত্যেকে দুইটি করিয়া রৌপ্যমুদ্রা পুরস্কার লইয়া তাঁহাদিগকে মুক্তি দিল ও সুশৃঙ্খলে দেব-দর্শন করাইয়া তাঁহাদিগকে দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌঁছাইয়া দিল। সেইখানেই বাঙালী সাধু কৃষ্ণানন্দ স্বামী শিষ্যবর্গ পরিবৃত হইয়া ধ্যানাসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

রাণীমা স্বামীজীর পদধূলি লইতে অগ্রসর হইবেন, এমন সময় শিষ্যেরা হৈ হৈ শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল।

স্বামীজী নয়ন-উন্মীলিত করিলেন। রাণীমার সহিত চোখাচোখি হইতেই উভয়েই শিহরিয়া উঠিলেন।

স্বামীজী নয়ন স্তিমিত করিয়া কি-যেন ভাবিতে লাগিলেন। মুহূর্ত মধ্যে তাঁহার অধরে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

স্বামীজীকে দেখিয়া অবধি রাণীমা বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বামীজী বলিলেন,'শান্ত হইয়া উপবেশন কর।'

রাণীমা বসিলেন। পাঁচমিনিট কাল নীরবে কাটিয়া গেল। স্বামীজী চক্ষু উন্মীলিত করিলেন।

রাণীমা বলিলেন,'আপনার কাছে একটি নিবেদন আছে।'

স্বামীজী বলিলেন,'বুঝিয়াছি, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর।'

বাহিরের ভাব দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না যে, রাণীমার অন্তরে তখন ঝড় বহিয়া যাইতেছিল। প্রাণপণ শক্তিতে তিনি আত্মসংবরণ করিবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন।

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি ক্রমশ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলেন। যুবক দুইটি ও মহিলাদ্বয় উৎসুক দৃষ্টিতে শিষ্যদিগের কার্য্য-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী বলিলেন, এইবার তোমার বক্তব্য বলিতে পার।

—শুনেছি আপনি অন্তর্যামী, আপনি ত্রিকালজ্ঞ,··· আপনি···

—ভুল শুনিয়াছ। অন্য কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে ত প্রশ্ন করিতে পার।

—নরসিংহপুরে আমাদের বাড়ী—সেখানে আপনাকে পদধূলি দিতে হবে।

—এ কথা বোধ হয় তোমার জানা নাই যে, সন্ন্যাসীরা কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে না।

—না, তা জানি না। তবে এটুকু জানি যে, প্রকৃত সন্ন্যাসী সংসারের সমস্ত বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে।

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি হঠাৎ ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, 'তুমি কার সঙ্গে কি ভাবে কথা কইচ, নতুন বৌ? সাধুজীকে সম্মান ক'রে কথা বলতে হয়।'

স্বামীজী বলিলেন,'উনি তো আমার অসম্মান করেন নি।'

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি বলিলেন, 'তবু ত তর্ক করেছে—ঐটেই অসম্মান।'

ইহার তিনমাস পরের কথা।

সম্প্রতি নরসিংহপুরের রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন একটি বিশাল হর্ম নির্মিত হইয়াছে। লোক-পরম্পরা শোনা যাইতেছে শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ স্বামী উক্ত অট্টালিকায় অধিষ্ঠিত হইবেন।

মাঘী পূর্ণিমা।

সকাল হইতে রাজবাটীতে বহুলোকজন যাতায়াত করিতেছে। সকলেই শশব্যস্ত।

রাণীমার নিজস্ব কক্ষটি আজ সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে। আজ এখানে জনপ্রাণীরও প্রবেশাধিকার নাই।

রাণীমা কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বহস্তনির্মিত রজতখচিত একখানি বহুমূল্য আসন পাতিলেন ও চন্দনসিক্ত সুবাসিত বারিধারা সিঞ্চনে আসনের সম্মুখস্থ স্থানটিকে সযত্নে মার্জিত করিয়া স্বামীজীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সদ্যস্নাতা পট্টাম্বর-পরিহিতা মহীয়সী রাণীকে আজ অপূর্ব সুন্দর দেখাইতেছে। আজ রাণীমার দীক্ষা।

এদিকে দীক্ষাগ্রহণের নির্দিষ্ট শুভলগ্নটি প্রায় অতিক্রম হইতে চলিয়াছে। স্বামীজীর এখনও দেখা নাই। রাণীমা অত্যন্ত উদ্বিগ্না হইয়া পড়িয়াছেন। রাজবাটীতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে।

এমন সময় স্বামীজীর প্রধান শিষ্য আসিয়া সংবাদ দিলেন, ভোর হইতে স্বামীজীকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

এই নিদারুণ দুঃসংবাদের মুহূর্তে দেখা গেল—রাণীমা পাষাণবৎ নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন।

স্পর্শমণির সন্ধানে

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ বি এস্‌-সি

"অর্দ্ধেক জীবন খুঁজি কোন ক্ষণে চক্ষু বুঁজি
স্পর্শ লভেছিল যার এক পল ভর
বাকি অর্দ্ধ ভগ্নপ্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ পাথর।"

—রবীন্দ্রনাথ

আমরা শুনিতে পাই অতি প্রাচীন যুগে আমাদের দেশের মুনি ঋষিগণ স্পর্শমণির সন্ধান জানিতেন—যাহার দ্বারা কোন ধাতব পদার্থকে স্পর্শমাত্রই তাহা স্বর্ণে রূপান্তরিত হইত। স্পর্শমণি বলিয়া বাস্তবিক কিছু ছিল কি-না বলা যায় না, তবে বহুকাল যাবৎ বৈজ্ঞানিকগণ এই স্পর্শমণির সন্ধান করিয়া আসিতেছেন, যদিও আজ পর্য্যন্ত কেহ এই বিচিত্র গুণসম্পন্ন বস্তুটিকে আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। বাস্তবিক স্পর্শমণি ছিল বলিয়া বদ্ধমূল ধারণা লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ তাহার আবিষ্কারের অভিলাষে জটিল গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন।

য়্যালকেমিষ্টগণ (Alchemists) প্রাচীন দার্শনিকদের মতানুসারে সাধারণ বস্তুকে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং সাধারণ ধাতু হইতে মূল্যবান স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার জন্য স্পর্শমণির সন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের ধারণা ছিল, এই প্রকারের রূপান্তর প্রকৃতির নিয়মানুসারে অতি দীর্ঘকাল পরে সংঘটিত হইয়া থাকে। খনিতে সাধারণ ধাতু সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া পরিশেষে উহাই স্বর্ণে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্পর্শমণির সংস্পর্শে আসিলে এই রূপান্তর অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই সংঘটিত হইতে পারে।

অতি প্রাচীন বৈজ্ঞানিক ডাল্টনের (Dalton) মতানুসারে প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য (indivisible) কণা দ্বারা গঠিত। এই কণাগুলি এত ক্ষুদ্র যে রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে তাহাদের বিভাগ করা অসম্ভব, সেইজন্যই তাহাদের নাম পরমাণু (অথবা atom = indivisible) ; কোন দুইটি মৌলিক পদার্থ বিভিন্ন হইলে তাহাদের নিজ নিজ পরমাণুগুলিও বিভিন্ন হইবে এবং তাহাদের গুরুত্ব (পরমাণবিক গুরুত্ব) কখনই এক হইতে পারে না। গত শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্তও এই মতবাদ সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু আধুনিক গবেষণার ফলে দেখা গেল যে, পরমাণুকে আর অবিভাজ্য বলা চলে না—এই ক্ষুদ্র কণাকেও ক্ষুদ্রতম কণাতে ভাগ করা সম্ভব। ১৯১১ খৃ-অব্দে রাদারফোর্ড (Rutherford) সর্ব্বপ্রথম পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে তাহার মতবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহার মতবাদই সামান্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে।

আধুনিক মতানুসারে প্রত্যেকটি পরমাণুতেই একটি কেন্দ্র বর্ত্তমান এবং উহা ধনাত্মক কণা প্রোটন (Proton) এবং বিদ্যুতবিহীন কণা নিউট্রন (neutron) দ্বারা গঠিত। একটি প্রোটনের গুরুত্ব হাইড্রোজেন (hydrogen) পরমাণুর সমান এবং ইহাতে একটি ধনবিদ্যুত আছে। নিউট্রনের গুরুত্ব প্রোটনের সমান কিন্তু ইহা বিদ্যুত-বিহীন। পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ প্রোটন এবং নিউট্রন কণাগুলিকে কেন্দ্র করিয়া ঋণাত্মক কণা ইলেক্ট্রণ (electron) নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—ঠিক যেমন সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহগুলি নিয়ত ঘুরিয়া থাকে। প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেক্ট্রন কণাগুলির মোট সংখ্যা এরূপ যে, পরমাণুটি মোটের উপর বিদ্যুতবিহীন। একটি প্রোটন, নিউট্রন অথবা হাইড্রোজেন পরমাণুর গুরুত্ব সমান এবং ইলেক্ট্রন কণার গুরুত্ব তাহার আঠার শত পঁয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগের সমান। কাজেই প্রোটন এবং নিউট্রনের মোট সংখ্যাই একটি পরমাণুর গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করে। পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে, পরমাণবিক গুরুত্ব (atomic weight) বিভিন্ন হইলে তাহারা বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের গুণ প্রকাশ করিতে বাধ্য। মোজলে (Mosley) ১৯১৩ খৃ-অব্দে তাহা ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন—তাঁহার মতে কেন্দ্রীন প্রোটনের মোট সংখ্যা (যাহা ঘূর্ণায়মান ইলেক্ট্রনের মোট সংখ্যার সমান) দ্বারাই পরমাণুর পার্থক্য নির্ব্বাচিত হয়। ইহার নাম পরমাণবিক সংখ্যা। কোন একটি মৌলিক পদার্থের প্রত্যেক পরমাণুরই পরমাণবিক সংখ্যা এক হইবে, যদিও তখন তাহাদের পরমাণবিক গুরুত্ব বিভিন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। আবার ইহাও ঠিক যে, দুইটি পরমাণুর গুরুত্ব বিভিন্ন হইতে পারে কিন্তু তাহাদের দুইটির পরমাণবিক সংখ্যা এক হইলে তাহারা একই বস্তু হইতে বাধ্য। আমরা যদি কোন প্রকারে একটি পরমাণুর কেন্দ্রস্থ প্রোটনের মোট সংখ্যার পরিবর্ত্তন করিতে সফল হই, তাহা হইলে মৌলিক পদার্থটির পরমাণবিক সংখ্যা পরিবর্ত্তিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি সম্পূর্ণ পৃথক গুণসম্পন্ন মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হইবে। ইহারই নাম মৌলিক রূপান্তর (*tansmutation of elements*)।

ইতিপূর্ব্বেই ১৮৯৬ খৃ-অব্দে বেকারেল (Bacquerel) ইউরেনিয়াম (Uranium) এবং ১৯১০ খৃ-অব্দে মাদাম কুরি (Mme. Curie) পীচ্‌ ব্লেণ্ড (Pitche Blend) হইতে রেডিয়াম (Radium) আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান জগতে আধুনিক গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান।

ইউরেনিয়াম এবং রেডিয়াম হইতে প্রতিনিয়ত তিন প্রকারের আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ হয়, তাহারা যথাক্রমে আলফা রশ্মি (X-rays), বিটা রশ্মি (B-rays) গামা রশ্মি (V-rays)। ইউরেনিয়াম এবং রেডিয়ামের এই ধর্ম্মকে বলা হয় রেডিও য়্যাক্টিভিটি (Radio activity)। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, কতকগুলি অতিক্ষুদ্র কণা রেডিও য়্যাক্টিভ পদার্থ হইতে আলফা ও বিটা রশ্মিরূপে নির্গত হয়। এই আলফা রশ্মির প্রত্যেকটি কণা আবার দুই গুণ ধনাত্মক বিদ্যুতের সমান এবং প্রত্যেকে হাইড্রোজেন পরমাণুর চারি গুণ ভারী। ইহাদের গতিবেগও নেহাৎ কম নয়—ইহারা প্রতি সেকেণ্ডে দশ হাজার মাইল বেগে ধাবিত হয়। বিটা রশ্মিগুলিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণাত্মক বিদ্যুতযুক্ত কণা। ইহাদের প্রত্যেকটী গুরুত্বে হাইড্রোজেন পরমাণুর আঠার শত পঁয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগ এবং সাধারণ আলোকের সমান গতিতে (সেকেণ্ডে—এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইলবেগে) ধাবিত হয়। কাজেই আমরা দেখিতেছি যে, রেডিয়াম হইতে স্বতঃবিচ্ছুরিত বিটা কণা এবং ইলেক্ট্রণ একই বস্তু। গামা রশ্মি কোনরূপ বৈদ্যুতিক গুণসম্পন্ন নহে। তরঙ্গের সৃষ্টি হওয়ার ফলেই ইহার উৎপত্তি, কাজেই ইহাতে এবং রঞ্জন রশ্মিতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

১৮৯৯ খৃ-অব্দে রাদারফোর্ড এবং সডিআবিষ্কার করেন যে, রেডিয়াম হইতে থোরন নামক একটি মৌলিক গ্যাস উদ্ভূত হয় এবং ইহা বায়ুস্থ আর্গন (Argon) নিয়নেরই (Neon) দলভুক্ত। তাহাতেইসর্ব্বপ্রথম দেখা গেল যে, একটি মৌলিক পদার্থ সম্পূর্ণ পৃথক গুণসম্পন্ন আর একটি মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হইতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণ এতদিন পর্য্যন্ত যাহার স্বপ্ন দেখিয়াছেন তাহাই অবশেষে বাস্তবে পরিণত হইল; কিন্তু কি উপায়ে এইরূপ রূপান্তর হয় তাহার মীমাংসা করা তখনও সম্ভবপর হইল না। ক্রমে আরও দেখা গেল যে, রেডিয়াম হইতে উদ্ভূত রেডন্ (Radon) বিঘটিত (disintegrated) হইয়া হিলিয়াম (Helium) নামক অপর একটি মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করে এবং ১৯০৩ খৃঃ-অব্দে রাদারফোর্ড প্রমাণ করেন যে, রেডিয়াম হইতে বিচ্ছুরিত আলফা কণা দুইটি ধনাত্মক বিদ্যুতযুক্ত হিলিয়াম (Helium) কেন্দ্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই ঘটনাগুলি আপাতদৃষ্টিতে দুর্ব্বোধ্য বটে, কিন্তু পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান থাকিলেই ইহার মীমাংসা অতি সহজ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, একটী মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রে কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেই নূতন মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। রেডিও য়্যাক্টিভ মৌলিক পদার্থগুলি অস্থায়ী, কাজেই তাহাদের কেন্দ্র হইতে সততই একটি আলফা-কণা অর্থাৎ হিলিয়াম কেন্দ্র অথবা একটি বিটা কণা অর্থাৎ ইলেক্ট্রণ নির্গত হইতেছে। এইরূপে পরমাণুর কেন্দ্র হইতে বিদ্যুতযুক্ত যে কোনরূপ কণা নির্গত হওয়ার পরে পরমাণুটি পূর্ব্ববৎ থাকিতে পারে না—ইহাতে কেন্দ্রীন প্রোটনের মোট সংখ্যা অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যা হ্রাস অথবা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সেইজন্যই পূর্ব্ববর্ত্তী পরমাণুটির অপেক্ষা কম অথবা সমান গুরুত্ব সম্পন্ন (কঠিন একটি ইলেক্ট্রনের গুরুত্ব নগণ্য) নূতন একটি পরমাণুর উদ্ভব হয়। এইরূপ মৌলিক রূপান্তর প্রকৃতির বুকে প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে কিন্তু আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এতকাল অন্ধ ছিলাম বলিয়াই তাহা প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হই নাই এবং তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। বৈজ্ঞানিকগণ এই সকল জটিল সমস্যার মীমাংসা করিবার আশায় অজ্ঞান তিমিরে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ প্রকৃত পথের সন্ধান পান, পরমাণুর গঠন এবং বিঘটন সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া তাহাতেই তাহার সকল প্রশ্নের মীমাংসা এবং সকল রহস্যের সমাধান হইয়াছে।

আধুনিক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে প্রধানত তিনটি উপায়ে মৌলিক পদার্থের রূপান্তর সম্ভব—

(ক) রেডিও য়্যাক্টিভ মৌলিক পদার্থগুলি হইতে সতত আলফা অথবা বিটা রশ্মি নির্গত হয় এবং তাহার ফলে তাহারা পৃথক মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। যতদূর জানা গিয়াছে, এগুলি তাহাদের সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই চূর্ণীকৃত হইতেছে। রেডিয়াম বিঘটিত হইয়া ক্রমান্বয়ে নানারূপ মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া অবশেষে এই দুর্লভ পদার্থটি অতি সাধারণ সীসকে (Lead) পরিণত হয়। কিন্তু এই রূপান্তরের ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাহা সমপরিমাণ কয়লা হইতে উদ্ভূত শক্তির দশ লক্ষ গুণ বেশী। ইউরেনিয়াম এবং রেডিয়াম ছাড়া আরও অনেক রেডিও য়্যাক্টিভ পদার্থ ই বর্ত্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলি ছাড়া পটাসিয়াম (Potasium), রুবিডিয়াম (Rubidium) এবং সামারিয়াম (Summerium) নামক মৌলিক পদার্থেও এই ক্ষমতা বিদ্যমান। অন্যান্য মৌলিক পদার্থে এই গুণ সাধারণত দেখা যায় না; তবে ইহাই সম্ভবপর হইতে পারে যে, এই রূপান্তর অত্যন্ত ধীরে ধীরে হইতেছে এবং বহু বৎসর পরে হয়তো ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

(খ) কৃত্রিম পরিবর্ত্তন—পূর্ব্বে যে রূপান্তরের কথা বর্ণিত হইল তাহা প্রকৃতির নিয়মে নিয়ত ঘটিতেছে, মানুষের সাধ্য নাই তাহার ব্যতিক্রম করে। কিন্তু বর্ত্তমানে কৃত্রিম উপায়েও অনুরূপ রূপান্তর করা সম্ভব হইয়াছে। যদি কোন মৌলিক পদার্থকে দ্রুত গতিশীল আলফা কণা, প্রোটন অথবা নিউটন দ্বারা আঘাত করা যায় তবে তাহাতে মৌলিক পদার্থটির পরমাণু চূর্ণীকৃত হয় এবং সম্পূর্ণ পৃথক ও স্থায়ী নূতন পরমাণুর সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। গামা রশ্মি দ্বারাও এইরূপ রূপান্তর সম্ভব। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রাদারফোর্ড নাইট্রোজেন নামক মৌলিক পদার্থকে আলফা কণা দ্বারা আঘাত করিয়া তাহা হইতে অক্সিজেন প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন এবং তিনিই, সর্ব্বপ্রথম এইরূপে কৃত্রিম উপায়ে মৌলিক পদার্থের রূপান্তর সাধিত করিয়া জগতবাসীকে বিস্মিত করিয়া দেন।

(গ) ১৯৩৪ সালে কুরি (মাদাম কুরির কন্যা) এবং জোলিও দেখিলেন বোরন্ (Boron) এবং এলুমিনিয়াম আলফা কণা দ্বারা আঘাত করিলে তাহা হইতে পজিট্রন (Positron) নামক কণা নির্গত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আলফা কণার মূল বস্তুটিকে সেই স্থান হইতে সরাইয়া লইলেও কিছুক্ষণ ধরিয়া বোরন্ এবং এলুমিনিয়াম হইতে পজিট্রন কণা নির্গত হইতে থাকে—যদিও

অল্পক্ষণ পরেই তাহা পুনরায় বন্ধ হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করিয়া স্থির করিলেন যে, সাধারণ বোরন্ এবং এলুমিনিয়াম হইতে রেডিও য়্যাক্টিভ গুণসম্পন্ন নূতন পরমাণু সৃষ্টি হইয়াছিল। কাজেই সেগুলি হইতে রেডিও য়্যাক্টিভ পদার্থের ন্যায় পজিট্রন কণা নির্গত হয় এবং তাহারও রূপান্তরিত হইয়া যথাক্রমে 'নাইট্রোজেন' (Nitrogen) এবং সিলিকন্ (Silicon) এ পরিণত হয়। এই উপায়ে সোডিয়াম্ হইতে ম্যাগনেসিয়াম এবং নিয়ন (Neon) প্রস্তুত করাও সম্ভব হইয়াছে। রাদারফোর্ড কর্তৃক কৃত্রিম উপায়ে মৌলিকপদার্থের রূপান্তর করার পর ইহাই সর্ব্বপ্রধান এবং অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার।

পারদ (Mercury) এবং স্বর্ণের পরমাণবিক সংখ্যার তফাৎ মাত্র এক (পারদ—৮০, স্বর্ণ—৭৯) ; কাজেই যদি পারদ পরমাণুর কেন্দ্র হইতে কোন প্রকারে একটি মাত্র প্রোটন সরাইয়া লওয়া যায় তাহা হইলেই পারদের পরমাণবিক সংখ্যা কমিয়া স্বর্ণের পরমাণবিক সংখ্যার সমান হইবে অর্থাৎ পারদ আমাদের চির-আকাঙ্খিত স্বর্ণে পরিণত হইবে।

বর্ত্তমানে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণার ফলে একটি মৌলিক পদার্থ গঠন করা অসম্ভব নহে। ইহাতে আমাদের আশা আরও বলবতী হইয়াছে এবং এই আশার প্রেরণায় বৈজ্ঞানিকগণ প্রাণপণ যত্ন সহকারে সাধারণ ধাতুকে মূল্যবান ধাতুতে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যে স্পর্শমণির সন্ধানে মানুষ আদিমকাল হইতে ঘুরিয়া মরিয়াছে, সেই চিরবাঞ্ছিত স্পর্শমণির সন্ধান হয়তো কোন বৈজ্ঞানিক শীঘ্রই দিতে পারিবেন—হয়তো এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যখন বৈজ্ঞানিক অনায়াসেই সাধারণ ধাতু হইতে মূল্যবান স্বর্ণ প্রস্তুত করিয়া জগতবাসীকে স্তম্ভিত এবং বিস্ময়বিমূঢ় করিতে সমর্থ হইবেন।

বেদনার বালুচরে

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

বাঁধিয়াছি ঘর বেদনার বালুচরে,
দিবস রজনী অযুত বাসনা নিরাশায় কেঁদে মরে।

ধূ ধূ বালুচর, ধূ ধূ প্রাণ মোর ; আমি শুধু একা থাকি।
শূন্য আকাশে পিয়াসী চাতক মেঘেরে ফিরে সে ডাকি।

আমার এ বালুচরে
দগ্ধ দুপুর তপ্ত নিশাসে অবিরাম কেঁদে মরে।
পথিকের পদ-চিহ্ন পড়ে নি তাহার পথের বুকে,
ধূলাগুলি তাই বাতাসে উড়িয়া কাঁদিছে অসহ দুখে।

ছোট কচি ঘাস নেই পথে সেথা, শ্যামল হয় নি বুক ;
উষর বক্ষে শূন্য বাসনা করে নিতি ধুক্-ধুক্।

বেদনার বালুচরে
সাঁঝের উদাসী মাঝির কণ্ঠ কাঁপিতেছে ক্ষীণ-স্বরে।
দূর-নীড় হ'তে পিয়াসী বিহগ এসেছিল যারা সুখে
শূন্যতা-ব্যথা দিয়ে তারা হায় চলে যায় গৃহ-মুখে।

গোপন-আঁধার বেদনা বহিয়া রজনী নীরবে আসে,
আমার বিরহী পরাণে গভীর বিরহের ছায়া ভাসে।

রাতের আঁধারে কোন্ নিরালায় কাঁদে নিতি কার বাঁশী,
সুরহারা মোর উদাসী পরাণে ঘনায় বেদনারাশি।

অযুত বেদনা ভরে—
সারা দিবানিশি আমি যে কাটাই বেদনার বালুচরে।

ডাকঘর

শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

(৪)

এভিলিন ডাকঘরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই দেখিলেন, চার্লস পভে নামক এক ব্যক্তি ডাকওয়ারার অনুকরণে অর্দ্ধ পেনি খরচে শহরের এক পল্লী হইতে অপর পল্লীতে, এমন কি ওয়েস্টমিনস্টার ও সাউথওয়ার্ক পর্য্যন্ত পত্রাদি পৌছাইবার ব্যবস্থায় বে-সরকারীভাবে এক ডাক সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তবে ডাকঘর বলিতে ইঁহার কিছু নাই। ঘণ্টা বাজাইয়া ধাবকেরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া দ্বারে দ্বারে গিয়া পত্রাদি সংগ্রহ করিয়া আনে। পভে একটি দোকানে বসিয়া ঐ সকল পত্র বাছাই করিয়া দিকে দিকে তাহা বিলি করিতে পাঠাইয়া দেন। ইহাতে একরকম লণ্ডনের অধিবাসীগণ সকলেই ঘরে বসিয়া প্রেরণের সুবিধা পান। এভিলিন কিন্তু ইহার পর আর এই ব্যবস্থার কোন উন্নতি হইতে বা অধিক দুর অগ্রসর হইতে দেন নাই। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহা বে-আইনী ভাবে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ঘোষণা করিয়া পুলিশের সাহায্যে বন্ধ করিয়া দেন এবং পভেকে একশত পাউণ্ড জরিমানার দায়ে অভিযুক্ত করেন।

ইহার পর অর্দ্ধ পেনি পোস্ট ব্যবস্থা যদিও বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু পভের ঐ ঘণ্টাবাদকগণ অব্যাহতি পান নাই। ঐ ব্যবস্থায় পত্রাদি সংগ্রহ করার উপায় এভিলিনের খুব মনোমত হইয়াছিল; এই কারণে তিনি রাজকীয় ডাক-বিভাগের পত্রাদি সংগ্রহর জন্য তাহাদিগকে নিযুক্ত করেন।

১৭১১ খৃষ্টাব্দে কুইন এনের রাজ্যকালে যে সকল নূতন আইন প্রণয়ন হয়· তাহাতে ডাক অধ্যক্ষগণের ক্ষমতা পূর্ব্ব হইতে অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের খরচ জোগাইবার জন্য ডাকমাশুলের হারও এই সময় এক পেনি করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহাতে ডাকমাশুলের হার এইরূপ দাঁড়ায়—

লণ্ডন হইতে ৮০ মাইলের মধ্যে

একফর্দ্দ ৩ পেনি, দুইফর্দ্দ ৬ পেনি

৮০ মাইলের ঊর্দ্ধে, ইংলণ্ডের

মধ্যে „ ৪ „ „ ৮ „

এডিনবরা পর্য্যন্ত „ ৬ „ „ ১২ „

ডাব্লিন পর্য্যন্ত „ ৬ „ „ ১২ „

এডিনবরা হইতে ৫০ মাইলের

মধ্যে „ ২ „ „ ৪ „

„ „ ৮০ „ „ ৩ „ „ ৬ „

৮০ মাইলের ঊর্দ্ধে স্কটল্যাণ্ডের

মধ্যে „ ৪ „ „ ৮ „

ডাবলিন হইতে ৪০ মাইলের

মধ্যে „ ২ „ „ ৪ „

৪০ মাইলের ঊর্দ্ধে আয়রল্যাণ্ডের

মধ্যে „ ৪ „ „ ৮ „

পার্শ্বেলের উপর আউন্স প্রতি উহার দ্বিগুণ, অর্থাৎ—৮০ মাইল পর্য্যন্ত ২২ পেনি, তদূর্দ্ধে ইংলণ্ডের মধ্যে ১৬ পেনি ইত্যাদি।

কিন্তু পত্রাদি না খুলিয়া উহা এক ফর্দ্দ কি দুই ফর্দ্দ তাহা জানিবার বিশেষ অসুবিধা ছিল। অথচ পত্র খোলাও ইতি-পূর্ব্বে নিষিদ্ধ হইয়াছিল; এই কারণে খাম মাত্রেই দুই ফর্দ্দ এবং পোস্টকার্ড একফর্দ্দ কাগজ বলিয়া এই সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

সরকারী পত্র প্রেরণের সুবিধার জন্য রাজকর্ম্মচারীদিগকে বিনা মাশুলে পত্র প্রেরণের যে সুবিধা ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছিল, এই সময় তাঁহারা তাঁহাদিগের বন্ধু, এমন কি, বন্ধুর বন্ধুরা পর্য্যন্ত সকলেই ডাকমাশুল এড়াইয়া চলিবার জন্য ঐ ফ্রাঙ্কিংয়ের সুবিধা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে যখন তখন ইহার অযথা অপব্যবহার আরম্ভ হয়। এভিলিন প্রথম প্রথম এই ভাবে পত্র দিয়া সকলকেই এই অন্যায় হইতে সতর্ক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যথা—

Nov. 1. 1714.

To Mr Culvert

Sir—As the three inclosed letters are directed to you in several places we have reason to think that some persons have presumed to take a liberty of your name. This practice is so great an abuse upon this office and so very prejudical to His Majesty's revenue, that we

must desire you'll be pleased to send such letter inclosed that don't belong to you to the office to be charged; and we are very well-assured you'll discourage the like practice for the future—We are sir, your most humble servants.

T. Frankland

J. Evelyon.

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। শেষে রাণী এই আদেশ প্রচারিত করেন যে, অতঃপর রাজকীয় পত্রাদির উপর কর্ম্মচারিগণ স্বহস্তে স্বাক্ষরিত করিয়া পত্রাদি আদানপ্রদান করিবেন এবং অন্য কেহ যাহাতে তাঁহার নামের সুবিধা গ্রহণ করিতে না পারে সে বিষয়ও সর্ব্বদা সতর্কদৃষ্টি রাখিবেন।

এদিকে ফ্রাঙ্কিংয়ের সুবিধা গ্রহণ করিয়া যেমন একদল মাশুল এড়াইয়া চলিয়াছিলেন, তেমনই অপর একদল ব্যক্তি পাঁচ-ছয় জন করিয়া একত্রে মিলিত হইয়া একফর্দ্দ কাগজের উপর অর্থাৎ—পোস্টকার্ডের উপর পত্র লিখিয়া মাশুল বাঁচাইতে ছিলেন। সাধারণত ব্যবসায়ী মণ্ডলীই ইহার বিশেষ সুবিধা লাভ করিতেছিলেন, কারণ তাঁহাদিগের প্রায় সকলকেই একই স্থানের সহিত আদানপ্রদান রাখিতে হইত এবং বিষয় প্রায় একই রূপ হইত। রাণী এই অন্যায়ের বিরুদ্ধেও এক আইন প্রণয়ন করেন। ইহাতে একফর্দ্দ কাগজের উপর একাধিক ব্যক্তির পত্র লেখা অথবা একাধিক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে উহা প্রেরণ করার যে প্রথা তাহা রহিত হইয়া যায়।

ডাক অধ্যক্ষগণও এই সময় নানা উপায় অবলম্বন দ্বারা ডাকমাশুল চুরি করিতেছিলেন। ইহাদের নিজদিগের মধ্যে স্থির ছিল, মধ্যপথের পত্রাদির হিসাব সরকারী খাতাভুক্ত না করিয়াই তাঁহারা পাঠাইয়া দিবেন। ইহাতে ঐ সকল পত্র বিলি হইয়া যে মাশুল আদায় হইবে তাহা তাঁহারা নিজদিগের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু এভিলিনের সতর্কদৃষ্টি তাঁহারাও এড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। এভিলিন এই ব্যাপার জানিতে পারিয়াই বিভাগীয় ইজারাদারদিগের হস্ত হইতে ডাক পরিচালন-ভার কাড়িয়া লইয়া সম্পূর্ণভাবে নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে ইহার যাবতীয় কার্য্য পরিচালন আরম্ভ করেন।

ডাকঘরের হিসাবের সহিত পত্রাদির সংখ্যা ঠিক আছে কি-না তাহা মিলাইয়া দেখিবার জন্য কয়েকজন চেকার এই সময় নিযুক্ত হন। ইঁহারা যখন তখন যে কোনও ডাকঘরে গিয়া হিসাব পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেন।

এভিলিনের চেষ্টায় ইংলণ্ডের ডাকের একদিকে যেমন এইভাবে উন্নতি হইতে থাকিল অন্যদিকে কর্ম্মচারী সংখ্যাও তেমনই বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। এই সময় লণ্ডনের ডাকঘরের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন পোস্টমাস্টার জেনারল্ —অর্থাৎ ডাকের সর্ব্বাধ্যক্ষ ও তাঁহার সহায়ক ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনার্‌ল্। ইঁহারা দুইজনেই কমিশনার অর্থাৎ —কর্ম্মাধ্যক্ষ থাকায় বাৎসরিক প্রত্যেকে দুই হাজার পাউণ্ড হিসাবে মাহিনা পাইতেন। ইঁহাদিগের নিম্নতম প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন দুই জন সেক্রেটারী অর্থাৎ—সম্পাদক। ইহাদিগের প্রত্যেকের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য চারি জন করিয়া সহায়ক, অর্থাৎ—য়্যাসিস্টেণ্টও নিযুক্ত ছিলেন। এ ছাড়া এক জন রিসিভার জেনার্‌ল্ অর্থাৎ—খাজাঞ্চি, এক জন
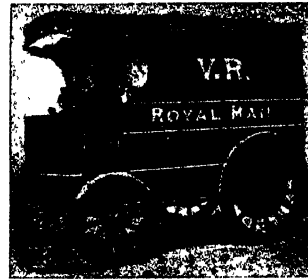
ষ্টীম মোটরচালিত ডাকগাড়ী—১৮৯৭

একাউণ্টেণ্ট অর্থাৎ—হিসাব-পরীক্ষক, এক জন উকিল, এক জন রেসিডেণ্ট সারভেয়ার অর্থাৎ—ঐ ডাকঘরের তত্ত্বাবধায়ক, দুই জন ইন্‌সপেক্টর অর্থাৎ—পরিদর্শক, সাত জন সর্‌টার, ছয় জন ক্লার্ক অফ্ দি রোডস্ ও তাঁহাদের য়্যাসিস্টেণ্ট যাঁহারা পত্রগুলিতে নির্দ্দিষ্ট মাশুলাদি পরীক্ষা ও দিকের দিকের পত্র বাছাই করিতেন, উইন্‌ডো ম্যান্ অর্থাৎ—যাঁহারা জানালার ধারে বসিয়া প্রিপেড্ অর্থাৎ—যাহার মাশুল অগ্রিম দেওয়া যাইতেছে সেই সকল পত্র গ্রহণ করিতেন, এল্‌ফেবেট্ ম্যান্ অর্থাৎ—যাঁহারা ঐ সকল পত্রের হিসাব খাতায় জমা করিতেন, পোস্টম্যান্ অর্থাৎ—পেনি পোস্টের ডাক-পিয়াদাগণ, এক জন কোর্ট মেসেঞ্জার, এক জন কেরিয়ার ফর্ হাউস অফ কমন্স, অর্থাৎ—রাজকীয় এবং হাউস অফ কমন্সের পত্রসকল বহন করিবার জন্য দুই জন পৃথক ডাক-পিয়াদা এবং শহরের

বিভিন্ন পল্লীতে যে ত্রিশটি রিসিভিং হাউস প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই সকল স্থান হইতে পত্র বহন করিয়া আনিবার জন্য উনসত্তরটি হরকরা ছিল।

দিকে দিকে ডাক প্রেরণের যে ব্যবস্থা এই সময় গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহারও একটি তালিকা পাওয়া যায়। নিম্নে তাহাই প্রদত্ত হইল—

দক্ষিণে ও মিডল্যাণ্ড টাউনে	প্রত্যহ যায়	প্রত্যহ আসে
ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র	মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি ;	সোম, বুধ ও শুক্র „
আয়রল্যাণ্ড ও ওয়েলসে	মঙ্গল ও শনি ;	সোম ও শুক্র
ফ্রান্স, স্পেন ও ইটালিতে	সোম ও বৃহস্পতি ;	„
জার্মান, ফ্লাণ্ডার্স, সুইডেন ও ডেনমার্কে	সোম ও শুক্র ;	„
হল্যাণ্ডে	মঙ্গল ও শুক্র ;	„
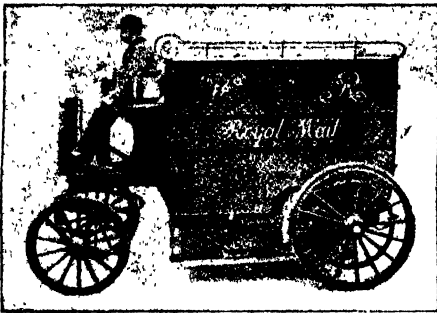
ইলেক্‌ট্রিক মোটরচালিত ডাকগাড়ী—১৮১৮

ইহার পর ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে এভিলিন এবং ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড ডাকঘরের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং চার্লস লর্ড কর্ণওয়ালিস ও জেম্‌স্‌ ক্রাগ তাঁহাদের পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করেন।

র‍্যাফেল এলেন নামক এক বালকও এই সময়ে বাথের ডাকঘরে নিযুক্ত হন। ইঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ফলেই ইংলণ্ডে সর্ব্বত্র ক্রশরোড প্রথার প্রবর্ত্তন হয়। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে ২৬ বৎসর মাত্র বয়সে এই বালক ক্রশরোড প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া দেখিবার জন্য ডাক-পরিচালনভার গ্রহণ করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার সেই আবেদন সেই সময় সকলেই অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। র‍্যাফেল ইহাতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া পরম উৎসাহে লণ্ডনে গিয়া পোস্টমাস্টার জেনারল্‌দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইহার সুবিধা অসুবিধা সকল বিষয় এবং ইহার দ্বারা যে দ্বিগুণ লাভবান হওয়া যাইবে সে বিষয় প্রসঙ্গান্তরে বুঝাইয়া দেন। ইহাতে ১৭২০ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল এলেন ক্রশরোডের ব্যবস্থা পত্তনি করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন ; তবে ইহার জন্য তাঁহাকে এই অঙ্গীকার করিতে হইয়াছিল যে, যে স্থানে ইংলণ্ডের ডাক-অধ্যক্ষগণ মাত্র চারি হাজার পাউণ্ড লাভবান হইতেছেন সেই স্থানে তিনি অন্যূন পক্ষে ছয় হাজার পাউণ্ড উঠাইয়া দিবেন।

এলেন এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়াই প্রথমত নর্থরোডের উপর ডাক-হরকরাদিগকে ঘণ্টায় পাঁচ মাইল করিয়া পথ চলিতে বাধ্য করেন এবং সকল ডাকঘরেই দেশের পত্রাদি বাছাই করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করেন। এই সময় লণ্ডন হইতে পত্রাদি আর বিভিন্ন থলীতে না ভরিয়া, তাড়ায় তাড়ায় বাঁধিয়া সেই সকল তাড়া নিম্নলিখিত চারিটি প্রধান ভাগে চারিটি থলিতে বন্ধ করিয়া পাঠাইবার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়, যথা—

১। প্রধান ডাকঘরের পত্র

২। প্রধান ডাকঘর হইয়া অন্যত্র যাইবার পত্র।

৩। চলতি পথের উপর অবস্থিত ডাকঘরগুলির পত্র।

৪। তেমাথা, চৌমাথা প্রভৃতির উপর হস্ত পরিবর্ত্তন করিবার পত্র।

ইহাতে এই বিশেষ সুবিধা হইল, পূর্ব্বে লণ্ডনে না আসিয়া যে-কোন পত্র কোন ডাকঘরে যাইতে পারিত না, সেই প্রথা রহিত হইয়া সকল ডাকঘর হইতে সকল ডাকঘরেই সোজাসুজি পত্র যাইতে থাকিল ; ডাকহরকরাদিগকেও আর বৃথা ভার বহন করিয়া ফিরিতে হইত না, জনসাধারণও অল্প খরচে শীঘ্র পত্র আদান-প্রদানের সুবিধা পান।

এই প্রথা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম তিন মাসের হিসাবে দেখা যায় যে, পূর্ব্বে ইংলণ্ডের ডাক-অধ্যক্ষগণ যে স্থানে বাৎসরিক তিন হাজার সাতশত কি চারি হাজার পাউণ্ড মাশুল আদায় পাইতেন সেই স্থানে এই কয়মাস মধ্যেই এলেন দুই হাজার নয়শত ছেচল্লিশ পাউণ্ড মাশুল আদায় পাইয়াছিলেন। এই সুবিধা লাভ করার দরুণ জনসাধারণের মধ্যে সে সময়ে যে কি পরিমাণে পত্র আদান-প্রদান সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ঐ হিসাব তাহার সাক্ষ্য

দিতেছে। ইহার পর এলেন সাত বৎসরের জন্ম ঐ কার্য্য পরিচালনভার ইজারা প্রাপ্ত হন। ইহাতে তিনি মনে ভাবিয়াছিলেন, নিজেও ইহার দ্বারা যথেষ্ট লাভবান হইতে পারিবেন। কিন্তু তিন বৎসর কার্য্য পরিচালন করিবার পর, হিসাবের দ্বারা তিনি জানিতে পারেন যে; লাভ হওয়া ত দূরের কথা, যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে তাঁহার দুই হাজার সত্তর পাউণ্ড লোকসান দাঁড়াইতেছে। ইহাতে ডাক-অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হিসাবে কোথাও কোন গোল হইতেছে বলিয়া তাঁহার মনে হয়। তখন তিনি এই বিবেচনায় ডাকমাশুল আদায়ের জন্ম একপ্রকার রসিদ প্রস্তুত করেন এবং যাহাতে এই সকল রসিদ পত্রের গায়ে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয় ও কোথা হইতে কোথায় ঐ পত্র যাইতেছে এবং উহার জন্ম কত মাশুল ধার্য্য হইতেছে তাহা উহার উপর স্পষ্টভাবে লিখিয়া দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করেন। ইহার দ্বারা এই বিশেষ সুবিধা হয় যে, একদিকে যেমন ডাক-অধ্যক্ষগণের হস্তে ঐ পত্র পড়িলে তাঁহারা উহার নির্ভুলতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিতেন, তেমনই আবার এলেনও ডাক-অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হিসাব নির্ভুল কি-না ইহার সহিত মিলাইয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিতেন। ইহার জন্ম মাসান্তে বা ত্রৈমাসান্তে একবার করিয়া তাঁহার নিকট ঐ সকল রসিদ পরীক্ষার্থ পাঠানরও ব্যবস্থা ঐ সঙ্গে হইয়াছিল।

এই ব্যবস্থায় কিন্তু তদানীন্তন ডাক-অধ্যক্ষগণ বেশ খুশী হইতে পারেন নাই; কারণ সেই সময় অধিকাংশক্ষেত্রেই ডাক অধ্যক্ষগণ বিনা-মাহিনায় কার্য্য করিতেন, যাঁহারা কিছু পাইতেন তাঁহারাও বাৎসরিক পাঁচ-সাত পাউণ্ডের অধিক পাইতেন না। এই কারণে তাঁহারা ঘোড়া ভাড়া দিয়া, জনসাধারণকে তাঁহাদের নিজের নামের ফ্রাঙ্ক ব্যবহার করিতে দিয়া, গুপ্তভাবে ধাবক-মারফৎ পত্রাদি প্রেরণ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট ডাকমাশুলের উপর অতিরিক্ত দুই-চারি পেনি মাশুল ধরিয়া ইত্যাদি নানা অসৎ উপায়ে দুই পয়সা রোজগার করিতেন, এই ব্যবস্থার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ঐ সকল জাল-জুয়াচুরি ধরা পড়িয়া যায় এবং তাঁহাদের স্বার্থের হানি ঘটে।

ইহার পরই ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে এলেনের ইজারার সময় অতিবাহিত হইয়া যাওয়ায় তাঁহাকে ঐ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্ম আরও সাত বৎসরের ইজারা দেওয়া হয়। কারণ, তখন কেণ্ট রোড এবং ইয়ার মাউথ রোডের অর্দ্ধাংশের কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া ওঠে নাই। এই সকল কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে এলেনকে সাত করিয়া আরও চৌদ্দ বৎসর সময় লইতে হইয়াছিল। ইহার পর এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে দেখিয়া কান্ট্রী লোটাস পরিচালন ভারও তাঁহার উপর আসিয়া পড়ে। সেই সময়ই ইংলণ্ডে আধুনিক ডাক-প্রথার মূল ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং রবিবার ভিন্ন সপ্তাহের অপর ছয়টি দিনেই লণ্ডন হইতে ব্রিস্টল, নরউইচ ও ইয়ার মাউথে ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। পরে এই ব্যবস্থাও সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ঐ পথগুলিকে উত্তর ও পশ্চিমে আরও বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হয় এবং ব্যাকিংহাম প্রভৃতি
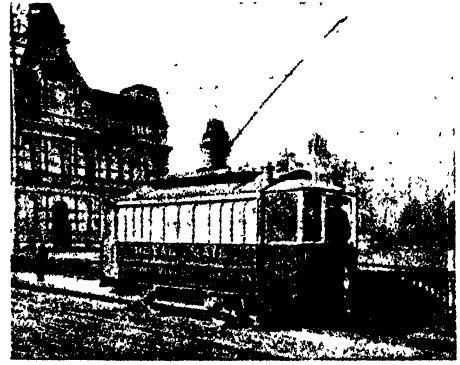
অটোয়াতে ইলেক্‌ট্রিক ডাকগাড়ী

যে সকল অঞ্চলে পূর্ব্বে কোন দিন ডাক যায় নাই, সেই সকল নূতন পথ ধরিয়াও সপ্তাহে তিন দিন ডাক যাইবার ব্যবস্থা হয়। এইভাবে ক্রমশ ডাকপ্রথার উন্নতি হইয়া ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে লিচেস্টার, লিভারপুল, ম্যানচেস্টার প্রভৃতি স্থানে এবং ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে স্কটল্যাণ্ড এডিনবরা পর্য্যন্ত প্রত্যহ ডাক পত্র পৌছানর ব্যবস্থা হয়। এলেন এইভাবে সুদীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসর ডাক-কার্য্য পরিচালন করিয়া ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ইহলীলা সংবরণ করেন।

এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে ইংলণ্ডের ডাকঘরের পোস্টমাস্টার জেনারল্ পদে কে কোন সময় অধিষ্ঠিত হইয়া ছিলেন এবং রাজস্বের হার কি হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, নিম্নের তালিকা দুইটিতে তাহা দেখান হইল।

ইজারাদারদিগের নাম	সময়
এডোয়ার্ড কার্টারেট ও ওয়াল পোলো	১৭২১-২৫
এডোয়ার্ড কার্টারেট ও এডোয়ার্ড হ্যারিসন	১৭২৫-৩২
এডোয়ার্ড কার্টারেট (একাকী) ...	১৭৩২-৩৩
এডোয়ার্ড কাটারেট ও টমাস লর্ড লাভেল	১৭৩৩-৩৯
টমাস লর্ড লাভেল ও স্যার জন্ এলিস্	১৭৩৯-৪৪
টমাস আর্ল অফ্ লিচেস্টার (লাভেল) ...	১৭৪৪-৪৫
টমাস আর্ল অফ্ লিচেস্টার ও স্যার এভার্ড ফকনার ...	১৭৪৫-৫৮
টমাস আর্ল অফ্ লিচেস্টার (একাকী) ...	১৭৫৮-৫৯
উইলিয়ম আর্ল অফ্ বাম্বরো ও অনারেবল্ রবার্ট হেম্পডেন্ ...	১৭৫৯-৬২
জোন আর্ল অফ এগ্‌মণ্ট ও অনারেবল রবার্ট হেম্পডেন ...	১৭৬২-৬৩
টমাস লর্ড হাইড ও অনারেবল রবার্ট হেম্পডেন ..	১৭৬৩

এই রাজস্ব সমস্তই যে রাজকোষে জমা হইত তাহা নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সম্রাট দ্বিতীয় চার্ল্‌স্ এক আইন করিয়া ইহার সমস্ত স্বত্ব তাঁহার ভ্রাতা ডিউক অফ্ ইয়র্ক, পরবর্ত্তী রাজা দ্বিতীয় জেম্‌সের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি ঐ নিয়মে কিছু পরিবর্ত্তন করেন। ইহাতে আরও কতিপয় ব্যক্তি বাৎসরিক বৃত্তি হিসাবে উহার কিয়দংশ প্রাপ্ত হন। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে যে সকল ব্যক্তিকে বৃত্তি দেওয়া হয় তাহার একটি তালিকা পাওয়া যায়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

বৃত্তি গ্রাহকের নাম	মোট টাকা
আর্ল অফ্ রচেস্টার	পা. ৪.০০০
ডাচেস অফ্ ক্লিভল্যাণ্ড	পা. ৪.৭০০
ডিউক্ অফ্ লিড্‌স	পা. ৩.৫০০
ডিউক অফ্ (?)	পা. ৪.০০০
আর্ল অফ্ বাথ	পা. ২.৫০০
লর্ড কিপার	পা. ২.০০০
উইলিয়াম ডকওয়ারা	পা. ৫০০

ট্রামগাড়ীর সঙ্গে লাগান মালগাড়ী

বৎসর	মোট আয়	রাজস্ব
১৭২৪ খৃঃ	পা. ১.৭৮, ০৫১ ১৬ শি. ৯ পে	পা ৯৬, ৩৩৯ ৭ শি. ৫ পে
১৭৩৪ খৃঃ	পা. ১.৭৬, ৩৩৪ ৩ শি. ১ পে	পা ৯১, ৭০১ ১১ শি. ০ পে
১৭৪৪ খৃঃ	পা. ১.৯৪, ৪৬১ ৮ শি. ৭ পে	পা ৮৫, ১১৪ ৯ শি. ৪ পে
১৭৫৪ খৃঃ	পা. ২.১৪, ৩০০ ১০ শি. ৬ পে	পা ৯৭, ৩১৫ ৫ শি. ১ পে
১৭৬৪ খৃঃ	পা. ২.২৫, ৩২৬ ৫ শি. ৮ পে	পা ১.১৬, ১৮২ ৮ শি. ৫ পে

১৬৯৭ খৃষ্টাব্দের পর কেবল উইলিয়ম ডাকওয়ার বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায় এবং কুইনয়্যানের আদেশে ডিউক অফ্ মারল্‌বরো বাৎসরিক পাঁচ হাজার পাউণ্ড করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই ডাকের এই ভাবে ক্রমান্বয়ে উন্নতি হইতে থাকিলেও এলেনের মৃত্যুর পর পুনরায় এই ব্যবস্থার অনেক প্রকার দোষ দেখা যায়। করল ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট এক আইন প্রণয়ন করেন—যাহাতে ফ্রাঙ্কিং প্রথায় ডাকের যে বিশেষ ক্ষতি করিতেছিল তাহা কতকাংশে বাধা প্রাপ্ত হয়। তাঁহারা এই আইনে বলেন, "অতঃপর পার্লামেণ্টের সদস্যবৃন্দ তাঁহাদিগের পত্রের উপর কেবল মাত্র সহি দিলেই চলিবে না, তাঁহারা কোথায় বসিয়া এই পত্র লিখিতেছেন, কবে লিখিতেছেন, কোথায় এবং কাহাকে লিখিতেছেন প্রভৃতি সমস্তই নিজ হাতে লিখিতে বাধ্য থাকিবেন।"

"দুই আউন্সের অতিরিক্ত ওজনের কোন মোড়ক বা পত্রও অতঃপর ফ্রাঙ্কের সাহায্যে যাইতে পারিবে না।" তাহাও "পার্লামেণ্টের অধিবেশনের চল্লিশ দিন পূর্ব্ব হইতে চল্লিশ দিন পরবর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত পারিবেন—অন্য সময় নয়।" ইহাতেও কিন্তু ঐ ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে যে স্থানে মাত্র ৩৪,৭৩৪ পাউণ্ড অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাহা ৬১,০৫৩ পাউণ্ডে পরিণত হয়। ইহার অধিকাংশ পত্রই আয়রল্যাণ্ড হইতে আসিয়াছিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া পোস্ট মাস্টার জেনারল্' ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে 'ডাবলিনের ফ্রাঙ্কিং ইন্সপেক্টরকে আয়রল্যাণ্ডের বাঈ এবং ক্রশ রোড পোস্ট-গুলিতে একবার ঘুরিয়া ঐ সকল স্থানের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া আসিতে বলেন। তাহাতে ফ্রাঙ্কিং ইন্সপেক্টর সাত দিন সাত দিন করিয়া তেষট্টি দিনে নয়টি ডাকঘরের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া এই অভিজ্ঞতা লইয়া ফিরিয়া আসেন যে, এই ফ্রাঙ্কের সাহায্যে সরকারের আবশ্যক যত না পত্র যাইতেছে তাহার অধিক বে-সরকারী পত্র আদান-প্রদান হইতেছে; "ক্লন্ মেলে" থাকিবার কালিন তিনি দেখিতে পান, ঐ সাত দিনে যে কয়খানি পত্র আদান-প্রদান হইল তাহার মধ্যে পাঁচশত' নয়-খানি আসল ও বাকী পাঁচশত ছাব্বিশখানি জাল। গাওরাণেও ঐরূপ একশত পঁচানব্বইখানি আসল ও বাকী দুইশত বারখানি জাল ইত্যাদি।

এছাড়া পার্লামেণ্টের সভ্যদিগকে খবরের কাগজ পাঠাইবার জন্য প্রথম হইতেই "ক্লার্কস অফ দি রোড"-দিগকে ফ্রাঙ্কের যে সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল তাঁহারা সেই সুবিধায় "হোয়াইট হলের" কয়েকজন কর্ম্মচারীর সাহায্যে দেশ-বিদেশে বিক্রয়ার্থে খবরের কাগজ পাঠাইয়া বেশ দু'পয়সা লাভ করিয়াছিলেন। ইহার জন্য যিনি খবরের কাগজ জোগাইতেন তাঁহাকে প্রত্যেক এক ডজন অর্থাৎ বারখানিতে দেড় পেনি হিসাবে দস্তুরী দেওয়া হইত, উপরন্তু প্রত্যেক পঁচিশ খানায় তিনি একখানি করিয়া কাগজও পাইতেন, রাস্তার কর্ম্মচারীগণ এইভাবে খবরের কাগজ পাঠাইয়া ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় আটহাজার পাউণ্ড লাভ করিয়াছিলেন। এই কারণে ইহাও বন্ধ করিবার জন্য এই সময় একটি আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল। তাহাতে বলা হয়, "পার্লামেণ্টের সভ্যদিগের আদেশ মত সর্ব্বত্রই যে পত্র যাইতে পারিবে
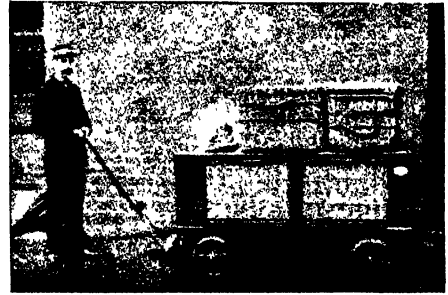
মালপূর্ণ মালগাড়ী

তাহা নহে। তিনি যে পল্লীতে বাস করেন তাহার সীমানা ছাড়াইয়া অন্য স্থানে ইহা যাইতে পারিবে না।" এই ব্যবস্থায় ক্লার্ক অফ দি রোড্‌স্-দিগের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া যায়; কারণ সেই সময় ডাক-কর্ম্মচারীদিগের কোনরূপ পেন্সন্ অর্থাৎ কর্ম্মক্ষম হইয়া পড়িলে ভরণপোষণ জন্য কোনরূপ খরচ পাওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় তাঁহারা ইহার দ্বারা যাহা লাভ করিতেন তাহা হইতে বৃদ্ধ কর্ম্মচারীদিগকে কিছু করিয়া সাহায্য করিতেন। এই আইনের ফলে তাঁহারা পূর্ব্বে যে স্থানে বাৎসরিক প্রায় ছয় হাজার ছয় শত পাউণ্ড করিয়া লইতেন, এক্ষণে তাহা মাত্র দুই হাজার পাউণ্ডে পরিণত হয়।

'প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী অফ্ দি স্টেটের' কর্ম্মচারীবর্গও রাস্তার কর্ম্মচারীদিগের ন্যায় ফ্রাঙ্কিংয়ের ঐ সুবিধা লাভ

করিয়াছিলেন। ঐ আইন প্রণয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগেরও ঐ লাভ বন্ধ হইয়া যায়। তাহাতে পার্লামেণ্ট ইঁহাদিগের খরচের জন্য ডাকঘর হইতে বাৎসরিক দেড় হাজার পাউণ্ড করিয়া পেন্সন দিতে আদেশ করেন। রাস্তার কর্ম্মচারীগণ কিন্তু তাঁহাদিগের ঐ লোকসানের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এরূপ কোন পেন্সন পান নাই।

ডাবলিনেও ফ্রাঙ্কিংয়ের ব্যবস্থায় লণ্ডনের অনুরূপ গোল দাঁড়াইয়াছিল। তথায় ক্লার্কস্ অফ্ রোড্স্-দিগের ন্যায় ক্লার্কস অফ্ দি ক্যাস্‌ল্, অর্থাৎ—দুর্গের কর্ম্মচারীরাও ঐ সুবিধা ভোগ করিতেন। তবে ইঁহাদিগের ব্যবস্থা কিছু অন্যরূপ ছিল। ঐ আইন প্রতিষ্ঠিত হইলে ইঁহাদিগকে তাঁহাদিগের আয় হইতে বাৎসরিক সাড়ে তিনশত পাউণ্ড

প্যারিসের চিঠির বাক্স—১৮৫০

করিয়া সরকারের রাজস্ব হিসাবে ছাড়িয়া দিতে বলা হইয়াছিল। ইহাতে ঐ দেশের ক্লার্ক অফ্ দি রোড্সেরা কোনরূপ আপত্তি না করিলেও, ক্লার্ক অফ্ দি ক্যাসলেরা তাহা মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন, ফলে তাঁহাদের ঐ সুবিধা হাতছাড়া হইয়া যায়।

যাহা হৌক্, ডাকের এই সকল উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাটগুলিরও উন্নতির জন্য একটি আইন এই সময় প্রণয়ন করা হইয়াছিল, ইহাতে রাস্তাঘাটগুলি ভাল করিয়া বাঁধাইয়া তাহাদিগের নামকরণ করা প্রভৃতির জন্য আদেশ দেওয়া হয়। ইহা মুখ্যত ডাকঘরের জন্য না হইলেও গৌণত সেই উদ্দেশ্যই ছিল। অতঃপর আর একটি নূতন কার্য্যের সূচনা হয়—ষ্ট্রীট্ ডাইরেক্টরী প্রণয়ন করা, ইহাতেও ডাকঘরের বিশেষ উপকার হইয়াছিল।

স্কট্‌ল্যাণ্ড এবং আয়রল্যাণ্ডের ডাকেরও এই সময় যথেষ্ট উন্নতি করা হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে স্থানে স্কটল্যাণ্ডের ডাক সপ্তাহে মাত্র তিন দিন করিয়া যাইত এক্ষণে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে তাহা সপ্তাহে পাঁচ দিন এবং এডিনবার্গ হইতে স্কট্‌ল্যাণ্ডের লোকাল মেলে প্রত্যহই বিলির ব্যবস্থা হয়। ইহাতে দেখা গিয়াছিল, খরচ যত না বৃদ্ধি হইয়াছিল রাজস্ব তাহা হইতে অনেক বেশী পাওয়া গিয়াছিল। আয়রল্যাণ্ডেও পূর্ব্বে যে তিন দিন করিয়া ডাক যাইবার ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে এতই অসুবিধা ছিল যে সময় সময় নৌকায় স্থান সঙ্কুলন না হওয়ায় দুই-তিন এমন কি চার-পাঁচ ক্ষেপের ডাকও একদিনে আসিতে দেখা যাইত। যতদিন স্থান সঙ্কুলন না হইত তাহা ডাকঘরে জমা হইয়া পড়িয়া থাকিত। এই সকল দেখিয়া ১৬৬৭তে ঐ নিয়মের পরিবর্ত্তন করিয়া ডাক পারাপারের জন্য আরও কতকগুলি নৌকা নিযুক্ত করা হয়। ইহারা সপ্তাহের ছয় দিনই লণ্ডন--ডাবলিন, ডাবলিন—বেল্‌ফাস্ট এবং ডাবলিন—কর্কের পত্রাদি পারাপার করিত। লণ্ডন হইতেও যে ঐ সময় সপ্তাহে তিন স্থানে ছয় দিন করিয়া প্রধান প্রধান ডাকঘরগুলিতে পত্রপ্রেরণের ব্যবস্থা এলেন করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই আপনাদিগকে জানাইয়াছি। ইহার পর ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে—অর্থাৎ এলেনের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে ঐ ব্যবস্থায় লণ্ডনের চতুপার্শ্বস্থ সকল গ্রামগুলিতেও পত্র যাইবার ব্যবস্থা হয়। প্রত্যহ রাত্রে এই সকল ডাক যাত্রা করিত। শতবর্ষ পূর্ব্বে যেখানে ইংলণ্ডেও মাত্র আটটি ডাকপথ ছিল এক্ষণে সেই স্থানে বাইশটি ডাকপথ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। যথা—

১।	ডোভার	১১।	ইপ্সউইচ
২।	এক্সটার	১২।	রে
৩	ম্যানচেস্টার	১৩	ব্রাইটন্
৪	নরউইচ	১৪	পোর্টস্ মাউথ্
৫	ক্যামব্রীজ	১৫	গ্লচেস্টার
৬	সেরিসবারী	১৬	লিভারপুল
৭	ওয়ারচেস্টার	১৭	গ্লাসগো
৮	লিড্স্	১৮	এডিনবার্গ
৯	টাউন্‌টন	১৯	চেস্টার
১০।	পুল	২০।	বীঠল
২১।	লিচেস্টার	২২।	ইয়র্ক

পত্র সংগ্রহ করিবার জন্য মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনিবার রাত্রে ঘণ্টাবাদকেরা যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া ফিরিত এবং এক প্রধান ডাকঘর অর্থাৎ জেনারল্ পোস্ট অফিস ব্যতীত অন্য কোথাও সপ্তাহের ছয় দিনই পত্র জমা লওয়া হইত না, নইলে তাহার জন্য অতিরিক্ত এক পেনি মাশুল ধরা হইত, এই আইনও ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই সময় এক রবিবার ভিন্ন সপ্তাহের অপর ছয় দিনই ঘণ্টাবাদকেরা পথে পথে ঘুরিয়া যাহাতে পত্র সংগ্রহ করিতে পারে এবং সকল ডাকঘরেই ছয় দিনই পত্র জমা লওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করা হয়।

আয়রল্যাণ্ডে পেনিপোস্ট প্রবর্ত্তনের জন্যও এই সময় এক আদেশ জারি হইয়াছিল। তাহাতে ঐ দেশের অধিবাসীদিগের সুবিধার্থে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর কয়েকটি পেনিপোস্ট রিসিভিং হাউস খোলা হয়। ডাকওয়ারার অনুকরণে এই ব্যবস্থা সত্তর বৎসর পূর্ব্বে কাউণ্টেস অফ্ থান্ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সরকার তখন তাহা কোনও কারণে অনুমোদন করেন নাই।

লণ্ডন, এডিনবরা এবং ডাবলিন ছাড়া পূর্ব্বে সেখানে বাড়ীতে বাড়ীতে পত্র পৌছাইয়া দিবার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না, পৌছাইলে তাহার জন্য ডাক-অধ্যক্ষগণ উপরন্তু দুই-চারি পেনি, এমন কি এক শিলিং পর্য্যন্ত মাশুল ধরিতেন; কারণ ঐ জন্য সে সময় কোন ব্যবস্থা না থাকায় তাহা তাঁহাকেই বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইত। এই ব্যবস্থারও এই সময় পরিবর্ত্তন ঘটে। স্যাণ্ডউইচের ডাকঘরেই সর্ব্বপ্রথম বাটীতে বাটীতে পত্র বিলি করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। অতঃপর ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কোন একজন ডাক অধ্যক্ষ ইহার জন্য পুনরায় মাশুল ধরিতে আরম্ভ করেন; তাহাতে স্যাণ্ডউচ্-বাসীগণ তাঁহার নামে এক মামলা আনয়ন করেন। ঐ মামলার রায়ে বিচারপতি সাব্যস্ত করেন, ডাক-অধ্যক্ষ ঐ খরচে পত্রাদিতে লিখিত ঠিকানায় তাহা পৌছাইয়া দিতে বাধ্য। সাধারণে ইহার জন্য অতঃপর আর কোন খরচ দিবেন না। তাহাতে ডাক-অধ্যক্ষ প্রশ্ন তুলেন, তাহা হইলে পত্র বিলির জন্য কে খরচ জোগাইবেন; সরকার নয় ডাক-অধ্যক্ষগণ যাঁহারা এখনই তাঁহাদিগের অপ্রাচুর্য্যতার জন্য কিঞ্চিৎ পুরস্কারের আশায় সরকারে আবেদন করিতেছেন। হায়! শেষে কি অপ্রাচুর্য্যতার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের এই উপরি পাওনাটুকুও ছাড়িয়া দিয়া দরজায় দরজায় যাহাতে পত্র বিলি হইতে পারে তাহার জন্য ডাকপিয়াদা নিযুক্ত করিতে হইবে! ইহাতে পোষ্টমাষ্টার জেনারল্ মহাশয়েরাও খুব বিব্রত হইয়া ওঠেন। কারণ তখন ঐ দেশের চারশত চল্লিশটি ডাকঘরের মধ্যে বাকিংহাম্, ইয়ারমাউথ প্রভৃতি প্রায় ছিয়াত্তরটি ডাকঘরে পত্র বিলির জন্য সেখানে পূর্ব্বে কোন মাশুল লওয়া হইত না, পরে তথায় আবার পত্র বিলির জন্য খরচ ধার্য্য করা হইয়াছিল; পরে তাহারাও বিচারপতির ঐরূপ রায় শুনিয়া নূতন গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে। কার্য্যত হইলও তাহাই; ইহার সঙ্গে সঙ্গেই ইপস্উইচ্, বাথ, গ্লচেষ্টার প্রভৃতি শহরের অধিবাসীগণও ডাক-অধ্যক্ষদিগকে শাসাইয়া উঠেন।

লণ্ডনের চিঠির বাক্স—১৮৫৫

শেষে এই রাগারাগি হইতেই তাহা বিচারের জন্য মামলা রুজু হয়। থার্লো এই সময় য়্যাটর্ণি জেনারল্ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি এই মামলায় ডাকঘরের পক্ষ সমর্থন করিয়া ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, ডাকঘরে যে খরচ লওয়া হইয়া থাকে তাহা ঐ পত্র ঐ দেশের ডাকঘরে পৌছাইয়া দিবার জন্য; তাহা যদি পুনরায় তথা হইতে ঘরে ঘরে বিলি করিতে পাঠান হয় তাহা হইলে তাহার জন্য পৃথকভাবে পুনরায় ডাক-অধ্যক্ষগণ কিছু খরচ লইতে পারিবেন, এই আইন আছে; এই কারণে হাঙ্গারফোর্ড প্রভৃতি স্থানে আজ প্রায় শতাধিক বৎসর ধরিয়া এই খরচ আদায় হইয়া আসিতেছে। তাহাতে প্রধান বিচারপতি লর্ড ম্যান্সফিল্ড

আশ্চর্য্য হইয়া বলেন—এরূপ কেমন করিয়া হইতে পারে, ইহাতে পার্লামেন্টের সুবিধা থাকিতে পারে কিন্তু জনসাধারণ তাহা শুনিবে কেন। আর তাহাই যদি হয় তাহা হইলে পার্লামেণ্ট তাহার জন্য কোন খরচাই নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহা সরকারের আয়ের মধ্যে ধরেন নাই কেন? অন্যদিকে দেখুন, প্রত্যেকে ডাকঘরে গিয়া যে নিত্য তাঁহার পত্র আছে কি-না খোঁজ করিয়া আসিবেন তাহাও কোন কাজের কথা নহে—ইহা অসম্ভব। কোন মধ্যবিত্ত লোক যে কিছু লাভের আশায় গ্রামের পত্রাদি ডাকঘর হইতে লইয়া বাড়ী বাড়ী বিলি বন্দোবস্ত করিবেন তাহারও উপায় নাই, কারণ আইন বলিতেছেন—ডাক-অধ্যক্ষগণ পত্রোল্লিখিত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহার হাতে ঐ পত্র দিতে পারিবেন না। অতএব ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ডাক-অধ্যক্ষগণ বাড়ীতে বাড়ীতে ঐ খরচের মধ্যেই পত্র পৌছিতে বাধ্য। তবে কতদূর পর্য্যন্ত তাঁহারা পত্র বিলি করিয়া ফিরিবেন তাহা তিনি নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন না, পার্লামেণ্ট তাহা নির্দ্দেশ করিবেন।

বিচারপতিরা এইরূপ রায় দিলে পর, থার্লো ঐ মামলা "হাউস অফ লর্ডসে" আপীল করিবার জন্য বলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন কাজ হইবে না বলিয়া পোষ্টমাষ্টার জেনারল্ মহাশয় মনে করেন। কারণ তখন সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন, "যখন মাশুল দেওয়া হইতেছে তখন সাধারণে ডাকের কৃপার ভিখারী হইয়া থাকিবেন কেন—বরং ডাকঘরই তাঁহাদের কৃপার অপেক্ষায় থাকিবেন। সেই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া ডাক-অধ্যক্ষ মহাশয়েরা আর এই গোল অধিকদূর গড়াইতে না দিয়া পোষ্টমাষ্টার জেনারল্‌কে বলেন, যে-সকল স্থানের অধিবাসীগণ এই সুবিধা চাহিতেছেন কেবল সেই সকল স্থানে ঐ সুবিধা দেওয়া হউক, অন্যত্র নয়। ইহাতে দশ-বার বৎসর মধ্যেই হাঙ্গারফোর্ড, স্যাণ্ডউইচ্, বাথ্, ইপসউইচ্, বারমিংহাম প্রভৃতি স্থানে পত্র বিলি করিবার জন্য ডাকপিয়াদা নিযুক্ত হয় এবং বিনা মাশুলে পত্র বিলি হইতে থাকে।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় আর একটি আইন প্রবর্ত্তিত হয়, যাহাতে ডাকের প্রভূত উন্নতি হইলেও ডাক-অধ্যক্ষগণ পুনরায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ডাক-অধ্যক্ষগণ ১৬০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে এই ১৭৭ বৎসর যাবৎ পথিকদিগকে ঘোড়াভাড়া দিয়া যে লাভ পাইতেছিলেন এই আইনে সে পথও বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর সাধারণে ডাকে ঘোড়া আর ব্যবহার জন্য লইতে পারিতেন না।

রাত্রিশেষ

শ্রীদক্ষিণা বসু

রাত্রির সমাপ্তি-রেখা পড়িয়াছে আকাশের গায়,
শিল্পী-মনে কল্পনার নব নব বিচিত্র বিকাশ;
এই তো হয়েছে শেষ রজনীর প্রমত্ত বিলাস—
আলো-স্নাতা পৃথিবীর হাসিচ্ছটা প্রভাত-প্রভায়
নূতন সৃষ্টির রূপ; ধীরে ধীরে আঁধার হারায়।
বৃদ্ধা এ ধরণী তবু তারে আজি কত ভাল লাগে;
জীবন কত যে প্রিয় আকাঙ্ক্ষার তীব্র অনুরাগে!
স্বপ্ন নয়, স্থির সত্য বুঝিয়াছি আজিকে উষায়।

রাত্রিশেষ: তৃপ্ত-কাম লজ্জানতা বিমুগ্ধা মানবী
অচেতন অবসন্ন, ঘুমে তার দু' আঁখি জড়ায়ে।
দিনের প্রথম আলো, আমি তারে রেখেছি সরায়ে;
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এক গেছে তার সারা দেহ প্লাবি।
গোলাপ ফুটেছে গাছে মোর গৃহে ফুটেছে বকুল,
এ মুহূর্ত্ত মৃত্যুহীন চিরঞ্জীব নিশ্চিত নির্ভুল;
আর তারে জাগাব না—'সে আমার'
এই শুধু দাবী।

পরিবর্ত্তন না মৃত্যু

শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায় বি-এ

বিভা মারা গেল বিয়ের ঠিক পনেরটি দিন পরেই। শ্বশুর-বাড়ীর লোকেরা বল্‌লে—অসুখ কিছু নিশ্চয়ই ছিল। মা বুক চাপ্‌ড়ে হাহাকার করতে লাগলেন, বাপ ডুক্‌রে ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌লেন—বিভার মৃত্যুতে নিজেদের নিঃসন্তান অবস্থার কথা ভেবে। বিভা, তাঁদের আদরের বিভা, তাঁদের একমাত্র সন্তান! বিভাকে কেন্দ্র ক'রেই ছিল তাঁদের সংসার, বিভাকে নিয়েই তাঁরা পরম সুখে সংসারনীড় রচনা করেছিলেন।

ফুলশয্যার রাত্রেই বিভার গা গরম হয়, অশোক তা জান্‌তে পারে নি; বিভাও প্রথম পরিচয়ের আনন্দটুকুকে অব্যাহত রাখ্‌বার জন্য স্বামীকে তা জানায় নি। অনেক রাত, বিয়ে বাড়ীর গোলমালও তখন মিটে গেছে, অবশ্য ঘরের বা'র থেকে ফিস্‌ফিস্ আওয়াজ, চাপা হাসির ছোট ছোট টুক্‌রো অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। অশোক ডাক্‌লে—বিভা! বিভা! দুটি অক্ষর! লক্ষকোটিবার শোনা দুটি অক্ষর বিভার হৃদয়ের তারে তারে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল! অন্ধকার ঘরে বিভার বুকখানা কেঁপে উঠ্‌লো, সে কুঁক্‌ড়ে ছোট হ'য়ে শু'ল। অভিনব প্রত্যাশায় বিভা কাঁপতে লাগ্‌ল দেহে নয় মনে—দেহেও বটে! বিভার মনে প্রগতির ছোঁয়াচ লাগে নি—তাই যে পরিচয় আরম্ভ হ'ল লজ্জায় তা শেষ হ'ল ভাঙ্গা ভাঙ্গা দুটি-চারিটি কথায়। দুটি-চারিটি টুক্‌রো কথায়—হ্যাঁ, হুঁ, না, জানি না, যান—কিন্তু শিক্ষিত অশোক তাতেই টাল সাম্‌লাতে পারল না—ঠোক্কর খেয়ে পড়ে গেল, ডুবে গেল বিভার প্রেম সমুদ্রের অতল তলে। এর ভিতর যুক্তিতর্ক নেই, বৈজ্ঞানিকের বিচার-বিশ্লেষণ নেই, খাঁটি কথা, নিছক সত্যি।

পরের দিন। প্রতিদিনের মত সেদিনও প্রভাত হ'ল, পাখীর কূজনে প্রভাতী সঙ্গীত গীত হ'ল, পূর্ব্বগগন অরুণিমায় রেঙে উঠ্‌ল। অশোকের চোখে সে প্রভাতে সব কিছুই নতুন, সব কিছুই সজীব, সব কিছুই মায়াময়। বিভার ক্লান্ত তনুলতার ভঙ্গিমা, তার আলুলায়িত বেশভূষা, তার নিষ্প্রভ আঁখি অশোকের শিরায় ঢালে মদিরা, আঁখিতে আনে মোহ, দেহে সঞ্চার করে আবেশ। সেজ জা ঠাট্টা করতে এসে কিন্তু চমকে উঠে বলেন—"দেখি বিভা, তোর গা-টা দেখি, তোর মুখচোখ থম্‌থম্ করছে; জ্বর হয়েছে নাকি?"

প্রকাশবাবু, বিভার বাবা, বিভাকে নিয়ে গেলেন—অশোকও গেল। টাইফয়েড্, কঠিন রকমের টাইফয়েড্, তের দিনের দিন বিভাকে নতুন দেশে নতুন সুখের রাজ্যে নিয়ে গেল। অশোক স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। তার বিহ্বল দৃষ্টিতে উৎকট বিভীষিকা, বিশ্রী একটা রুক্ষতা। বিভা চ'লে গেল, অশোককে বাড়ী ফির্‌তে হ'বে একলা। অশোকের চোখের সাম্‌নে নেমে এল অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার, তীব্র অন্ধকার! সে অন্ধকারে চোখ শুধু অন্ধ হয় না, জ্বালা করে! অশোকের বুকের ভিতর মরুভূমি, শাহারার চেয়েও ভীষণ মরুভূমি! সে মরুভূমিতে ওয়েসিস্ নেই, রাত্রিও নেই! চুপ ক'রে থাক্‌তে থাক্‌তে ভাব্‌তে ভাব্‌তে অশোক কেঁদে ফেল্‌লে, বহুদিনের সুপ্ত আগ্নেয়গিরি—হঠাৎ যেন সজীব হ'য়ে উঠ্‌ল, অশোক বুক চেপে কেঁদে উঠ্‌ল; যেন সে অশোক নয়, পুরুষ নয়, দেহে মনে শক্তিতে ভরপুর যুবক নয়! তার মনে হ'ল, পৃথিবী আর সে, মৃত্যু আর বিভা—এ ছাড়া সৃষ্টির আর কিছু নেই, কেউ নেই, কেউ নেই! ক্রমে ক্রমে তার নিজের অস্তিত্বও তার কাছে বিলুপ্ত হয়ে গেল। চিতা জ্বলে উঠ্‌ল, লেলিহান শিখা গ্রাস করে ফেল্‌ল বিভার তনুলতা, রক্তিম চোখে রক্তিমাভার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অশোক স্থির হ'য়ে গেল, নিস্পন্দ!

অশোক বাড়ী এল। বিয়ের আগে যাদের নিয়ে এ বাড়ী পূর্ণ ছিল আজও তাদের সবাই আছে, তবু এ বাড়ী অশোকের কাছে বড় ফাঁকা, বিশ্রী ফাঁকা! ছেলেমেয়েদের কাকলী, কান্নাকাটি, বউদের বকাবকি ঝকাঝকি, কর্ত্তাদের হুমকি, ধমকানি ইত্যাদিতে মুখর গৃহখানি অশোকের কাছে নিস্তব্ধ পাষাণপুরীর মত ভয়ানক, অভিনয় শেষে শূন্য রঙ্গালয়ের মতই বিষণ্ণ, বিমর্ষ, মর্ম্মন্তুদ'! যে

শয্যায়] সে পেয়েছে শান্তি, তার শ্রান্তি যে দূর করেছে মায়ের কোলের মত—একটি রজনীর স্মৃতির অস্পষ্ট দাগ তাকে এমন ক'রে দিয়েছে যে, সে হ'য়ে গেছে কাঁটায় ভরা, যন্ত্রণার আধার—বিষশয্যা। বিভার অয়েল পেন্টিং ফটোখানির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে অশোক হাসে, কাঁদে, গান গায়, আবৃত্তি করে, আবার কাঁদে। কখনও শুনি নৈশ নীরবতা ভঙ্গ ক'রে অন্ধকারের বুক কাঁপিয়ে অশোক আবৃত্তি করছে—

'কেন দিবসেতে ভুলে থাকি সে সকলে
শমন করিয়া চুরি নিয়াছে যাহায়,
কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ ওঠে জ্বলে
প্রাণের দোসর ভাই প্রিয়ার ব্যথায় ?
কেন বা উৎসবে মাতি থাকি কভু দিবা রাতি
আবার নির্জ্জনে কেন কাঁদি পুনরায় ?'

কখনও নাটকীয় সুরে আবৃত্তি করছে—তুমি এসেছিলে কত যুগের সাধনায়, চলে গেলে যুগান্তস্থায়ী বেদনার বোঝা মাথায় তুলে দিয়ে! তোমায় পেয়ে পিছনে চেয়ে দেখেছিলাম দিগন্তবিস্তৃত শ্যামলিমা, তোমায় হারিয়ে আজ দেখি ধূ ধূ মরু উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে উত্তপ্ত বালুকা ছিটিয়ে সেই শ্যামলিমার সঙ্গে নিষ্ঠুর হোলিখেলায় মত্ত! বিভা প্রাণপ্রতিমা আমার, আদরিণী আমার, আর কি কখনও কোথায় তোমায় পাব না? এত বড় পৃথিবীতে এতদিনের পথ চলার মাঝে হঠাৎ কি কোন বনানীর সুবৃহৎ কোন বৃক্ষচ্ছায়ে কিংবা কোন নির্ঝরিণীর তীরে তোমায় দেখ্‌তে পাব না? সত্যই কি তুমি অনন্তকালের কোন একটি মুহূর্ত্তেও আমাকে দেখা দিতে পার না? উঃ! বিভা! বিভা আমার! এই ত ঠোঁট দু'খানি কেঁপে উঠ্‌ছে, ঐ চোখের সেই ম্লান হাসি! কথা কও, কথা কও……

হঠাৎ ডাক আসে—ঠাকুরপো, কি ছেলেমানুষী করছ? ছিঃ! ঘুমিয়ে পড়। যাও শোওগে। সেজবউ আলো নিবিয়ে চ'লে যান। অশোক শুয়ে শুয়ে ভাবে··· সুপ্তি দেবী এসে তার মাথায় অলক্ষ্যে হাত বুলিয়ে দেন।

এমনি করে দিন কেটে যায়। মুছে ফেলার, ভুলিয়ে দেওয়ার শক্তি কালের অসীম। তাই অশোকের শোকোচ্ছ্বাসে অনেকটা ভাঁটা পড়েছে। কিন্তু তা হ'লেও বিভার ফটোখানির প্রতি তার ভালবাসা কমে নি। সেটির সাম্‌নে অপলক-দৃষ্টি, নিথর, নিস্পন্দ অশোককে প্রায়ই দেখা যায়, দেখা যায় তার চোখদুটি থেকে দুটি ধারা গণ্ড বয়ে নেমে আস্‌ছে, তা'রা দুটি যেন কোন মহাদুঃখের রাজ্য থেকে নেমে এসে অশোকের বুকে আশ্রয় চায়, তা'রা শুকিয়ে যেতে চায় না যেন!

যাই হোক, অশোকের শোক মন্দীভূত হ'য়ে আস্‌ছে। প্রথম প্রথম বিয়ের কথায় সে চম্‌কে উঠ্‌ত—এখন শোনে, শুন্‌তে শুন্‌তে উঠে যায়, বোধ হয় বা আত্মগোপনেরই উদ্দেশ্যে। কখনও বা বলে—বেশ কিছু মোটা রকম লভ্য হয় তবে না হয়···

অবশেষে একদিন সত্যিই অশোকের বিয়ের ঠিক হ'য়ে গেল। মনটা কেঁদে উঠ্‌ল, ওকে এতদিন ধরে যা ভেবে এসেছি ও তা নয়—এটা ভাব্‌তে বাস্তবিকই বড় কষ্ট হ'ল। আবার ভাব্‌লাম—না, দোষ কিছু করে নি অশোক, বেচারা! উপদেশ দেওয়া, বাহবা দেওয়া, প্রেম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া সহজ, কিন্তু তুষানলে দগ্ধ হওয়ার বড় জ্বালা, দিক্‌হারা হয়ে ঝড়ের রাতে উদ্দাম স্রোতে কূল খুঁজে বেড়ান বড় ভয়ঙ্কর! আরও দেখ্‌লাম বেচারার মুখে হাসি নেই, চোখ দুটি ছল্‌ছল্ করছে। যাত্রার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে সকলের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি এড়িয়ে অশোক তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করল, বিভার ফটোখানি ঠিক সাম্‌নেই। বিভার চোখ দুটি জ্বলে উঠ্‌ল, পরক্ষণেই সে দৃষ্টি এলায়িত, অবসন্ন। বড় কাতর, বড় বিহ্বল সে দৃষ্টি! বিড় বিড় ক'রে অশোক কি যেন বল্‌লে—বোধ হয় বা ক্ষমা চাইলে। তারপর—তারপর—মুখ তুলে ফটোর দিকে সে আর চাইতে পার্‌লে না।···একসঙ্গে বহু শঙ্খ বেজে উঠ্‌ল, হুলুধ্বনি হ'ল—অশোকও পথে—বিভার ফটো অন্ধকার ঘরে!

আবার ফুলশয্যা! এবার পরিচয়ে অশোককে আর কষ্ট পেতে হ'ল না, কারণ নমিতা হ'ল যাকে বলে আপ্-টু-ডেট্। সে গান জানে, ওরিয়েন্ট্যাল্ ডানসিং জানে, অভিনয়ও করেছে। সুতরাং আলাপের গঙ্গোত্রী এবার উত্তরে না হ'য়ে দক্ষিণেই হ'ল। রাত কেটে গেল, ভোর হ'ল। এবার কিন্তু অশোকের মনে সেবারকার সেই মধুর আমেজ নেই। সেই কিছু-না-বলা এই অনেক-বলার চেয়ে যেন অনেক বেশী মিষ্টি, অনেক বেশী তীব্র ছিল। অশোক

বুঝ্‌তে পারলে না—কারণটা ঠিক কি। যাই হোক্‌ অশোক নিজেকে দৃঢ় ক'রে ফেললে, নমিতাকে ভালবাসতেই হ'বে। দুঃস্বপ্নের বিভীষিকাকে আর স্থান দেওয়া হবে না, তা হ'লে যে নমিতার ওপর অবিচার করা হবে। নমিতা অভিমানের সুরে বলে—তাঁকে কি আর তুমি ভুলতে পেরেছ? একজনের আসনে কি আর একজনকে পরিপূর্ণ সোহাগে প্রতিষ্ঠিত করা যায়? অশোকের কানে বিশ্রী শোনায় এসব কথা! সে বলে—ওসব কথা ছেড়ে দাও নমিতা। অতীতকে টেনে এনে বর্ত্তমানকে ম্লান ক'রে দেওয়ার সার্থকতা কি? তার কথা যখন তুলেছ তখন বলি—বিভাকে আমি ভালবেসে বিয়ে করি নি, সাধারণ বিয়ে যেমন হয় এও তেমনি হয়েছিল। আর তার সঙ্গে আমার পরিচয় মাত্র একটি রাত্রির। অতএব মিছিমিছি ভেবে নিজের জীবনে দৈন্য টেনে এনো না—এই আমার অনুরোধ ও আদেশ। সংসারে কত লোকের সঙ্গেই ত আলাপ হয়, কিন্তু একদিনের আলাপে কে আর মনে চিরস্থায়ী আসন পাত্‌তে পারে? আর একজনের স্থান কি আর একজনের দ্বারা পূর্ণ হয় না? তুমি যা বললে তা নিছক সংস্কারের দিক থেকে। কত বড় বড় কবিও দু'বার বিয়ে করেছেন—উদাহরণ স্বরূপ ধর না শেলীকে। অথচ শেলীর প্রণয়-গীতিতে কে না মুগ্ধ হয়? কে তাঁর ভালবাসায় সন্দেহ করে? নমিতা বলে—কিন্তু যাই বল, আমরা ওরকম ভাব্‌তে পারি না। মহাকাল দুর্দ্দান্ত শক্তিশালী, সকলকেই সে ধ্বংস করে; কিন্তু তার নিজেরই অংশ যে মুহূর্ত্ত—তার কাছে সে অনেকবার পরাজিত হয়েছে। মুহূর্ত্ত মহাকালের বুকে এমন দাগ বসিয়ে দেয় যা কিছুতেই মোছে না; মহাকালের বুকে এমন অনেক দাগই ত রয়েছে, আর সেইজন্য সে অনেক সময় লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদেও।

ঝাঁঝাল সুরে অশোক বলে—রেখে দাও তোমার দার্শনিক আলোচনা! যা বলি শোন। পুরাণো জঞ্জাল ফেলে দাও, এস নতুন জীবন উপভোগ করি। মনে কর আমাদের অতীত নেই, আমরা নতুন, এখান থেকেই আমাদের আরম্ভ।

'কিন্তু ওই ফটোখানা?' নমিতা ব'লে ফেললে। মুহূর্ত্তের জন্য নমিতার মুখের দিকে চেয়ে অশোক ডাক্‌লে 'শক্তি, শক্তি, একবার এদিকে এস ত।' শক্তি অর্থাৎ অশোকের ছোট ভাই এসে দাঁড়াল। নমিতা সরে গেল! অশোক বল্‌লে, 'শক্তি এ ফটোখানা তোমার ঘরে নিয়ে যাও ত।'

অশ্রুসজল চক্ষে শক্তি ফটোখানি বুকে ক'রে নিয়ে গেল। সেখানিকে সে পড়ার টেবিলে রেখেছে; ও তাকে ভালবাসে, অশ্রুমুক্তার মালিকা গেঁথে তার পূজা করে। তবু তাতে প্রাণ নেই! এতদিনে বিভা মরেছে—অশোকও বোধ হয়!

নারী

শ্রীরাখালদাস চক্রবর্ত্তী

দেবীত্বের মোহময় আসন ছাড়িয়া
এসো আজি পৃথিবীর কুটীর-প্রাঙ্গণে;
ভুলে যাও নন্দনের পারিজাত ফুল,
ভুলে যাও মন্দাকিনী—অমিয় নির্ঝর,
পাপিয়ার কুহু-গীতি, মলয় সুবাস।
ব্যথা-দীর্ণ ধরণীর মানুষের মাঝে

এসো আজ মানবীর সত্যের প্রকাশে,
এসো আজ মানুষের বিশাল ধরায়
অর্দ্ধেক আসন তব করি' অধিকার।
নিষ্কাম দেবীরে আজ নাই প্রয়োজন—
পূজা তার শেষ হলো, তুমি দাও সবে
আপন প্রাণের মন্ত্র শক্তির পূজায়,

আনিবে সে তার মাঝে মানুষের সেবা
নিবারি ধরার যতো মৃত্যু-বিভীষিকা।

গীতা ও বাইবেল

শ্রীবিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিপূর্ব্বে আমরা গীতা ও বাইবেলের প্রধান প্রধান উক্তির মধ্যে সৌসাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এবারে ঐরূপ সাদৃশ্যের কারণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। সত্য বটে, মহাকবিদিগের ন্যায় মহাপুরুষদিগের ও চিন্তাধারা একরূপ। কিন্তু যদি পূর্ব্ববর্ত্তীর চিন্তাপ্রসূত উক্তি পরবর্ত্তীর জানিবার সুযোগ সুবিধা থাকে তবে আর ঐরূপ অনুমানের অবকাশ থাকে না। গীতা খ্রীষ্টের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী, এ সম্বন্ধে দ্বিমত হইতে পারে না, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন; বড় বড় খ্রীষ্টান প্রচারকগণও আর উহা অস্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং গীতার উক্তি বাইবেলের উক্তিদ্বারা প্রভাবান্বিত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এখন দেখিতে হইবে, বাইবেলের উক্তি গীতা দ্বারা প্রভাবান্বিত কি-না। এইরূপ দেখাইতে হইলে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে খ্রীষ্টের গীতা পড়িবার বা গীতার বিষয় জানিবার সুযোগ সুবিধা হইয়াছিল কি-না দেখিতে হইবে।

আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, ঈশা যৌবন আরম্ভের সময় হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত তিব্বতে থাকিয়া হিমালয়ের মহাত্মাদিগের সাহচর্য্যে উপনিষদ, গীতা, বেদান্ত, দর্শন প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করত জ্ঞানলাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া ইহুদিদিগের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করেন। অবশ্য ইহা কিম্বদন্তি মাত্র, ইহা প্রমাণ নহে। প্রমাণ ব্যতীত ইহার দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না; তবে মনে হয় ইহার মূলে কি কোন সত্য নিহিত নাই, ইহা কি একেবারেই অমূলক? আর উহার পোষক প্রমাণ পাইলে ঐ কিম্বদন্তিও প্রমাণের স্থানীয় হইয়া পড়ে।

প্রমাণ দুই প্রকার:—(১) প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও (২) অনুমান প্রমাণ। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ঘটনার আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোথায় পাওয়া যাইবে? অনুমান প্রমাণ বা অবস্থা ঘটিত প্রমাণের সাহায্যেই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ খ্রীষ্টের গীতা-জ্ঞান সপ্রমাণিত করিতে হইবে। সৌভাগ্যক্রমে খ্রীষ্ট জীবনীর ইংরেজী অনুবাদ আমাদের নিকট খ্রীষ্টকে পরিচিত করিয়া দিয়াছে। উহাকে মূলের ন্যায় গ্রহণ করিতে না পারিলেও উহা দ্বারাই আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে। আমরা ঐ জীবনীর আভ্যন্তরীণ (internal) অবস্থাঘটিত প্রমাণ দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত কিম্বদন্তি সুদৃঢ় করিতে পারিব আশা করি। ঐ প্রমাণ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে খ্রীষ্টের জীবনের দুই-চারিটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক।

প্যালেষ্টাইনের এক দরিদ্র ইহুদিগৃহে ঈশা জন্মগ্রহণ করেন। ঈশার পিতা যোসেফ সূত্রধরের কাজ করিতেন। ঈশার অলৌকিক জন্মের অব্যবহিত পরেই পূর্ব্ব দেশ হইতে কয়েকজন সাধু আসিয়া শিশুকে দেখেন ও উপহার প্রদান করিয়া চলিয়া যান। যোসেফ পরে স্বপ্নে দেখেন, জুডিয়ার রাজা হেরড শিশুর প্রাণ বধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন; সুতরাং শিশুর নিরাপত্তার জন্য দেশ ত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র যাওয়া উচিত। যোসেফ এই দুঃস্বপ্ন দেখিয়া মাতা মেরী সহ শিশুকে লইয়া মিশর দেশে প্রস্থান করেন। সেখানে কত দিন ছিলেন তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। পরে রাজা হেরডের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া পুনরায় দেশে ফিরিয়া নেজারৎ নগরে বাস করিতে থাকেন। এই সময় একদিন তাঁহারা ঈশাকে লইয়া, তখন ঈশার বয়স বার বৎসর, পর্ব্ব উপলক্ষে ইহুদিদিগের তীর্থস্থান জেরুজিলামে যান। শিশু তাঁহাদের অজ্ঞাতে ইহুদিদিগের মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক ধর্ম্মযাজকদিগের ধর্ম্মালোচনা শুনিতে থাকেন। সেই সময়েই তাঁহার বৈরাগ্যভাব দেখা যায়। মাতা পিতা অনেক অনুসন্ধানের পর শিশুকে পাইয়া বাটী লইয়া আসেন। ইহার পর আর আমরা ঈশার কোন সংবাদ জানিতে পারি না। পরে সতের-আঠার বৎসর পরে হঠাৎ একদিন তাঁহাকে ইহুদিদের দীক্ষাগুরু জনের নিকট দীক্ষা লইবার জন্য জর্ডনে দেখিতে পাই। তখন তাঁহার বয়স প্রায় ত্রিশ (Luke, ৩-২৩)। জন প্রথমে তাঁহাকে দেখিয়া দীক্ষা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন, কিন্তু ঈশা বলেন, 'Suffer it to be so now' "এখন ঐরূপ হইতে দাও" (Math., 3-15)। ঈশা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া চল্লিশ দিন উপবাসী থাকেন ও (বুদ্ধদেবের মারের ন্যায়) শয়তান কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। পরে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বার জন শিষ্য সংগ্রহ করত প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন এবং অনেক অলৌকিক কার্য্যও করিয়াছিলেন, যথা:— অন্ধের চক্ষুদান, খঞ্জের চলচ্ছক্তিদান, বধিরের শ্রবণশক্তি দান প্রভৃতি এবং সমুদ্রের জলের উপর দিয়া পদব্রজে গমন; শ্রীভগবানের অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখানর ন্যায় তাঁহার প্রিয় শিষ্য পিটার প্রভৃতিকে নিজ জ্যোতির্ম্ময় দেহে মহাপুরুষদিগকে দেখাইয়াছিলেন। আচার্য্য ঈশা স্বয়ং প্রচারকার্য্য অধিক দিন করিতে পারেন নাই। তিনি ইহুদিদের ধর্ম্মশাস্ত্র মানিয়া লইলেও এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মুশাকে সর্ব্বদা মান্য করিলেও তাঁহার নিজের যে সমস্ত মতবাদ উহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ—"আমি ঈশ্বর-পুত্র," "আমার পিতা আমার মধ্যে আছেন," "আমি তাঁর মধ্যে আছি", "আমার পিতা ও আমি এক" ইত্যাদি—তাহাতে প্রধান ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পড়েন এবং তিনি ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করেন। অবশেষে ষড়যন্ত্র পূর্ব্বক তাঁহাকে ধৃত করত বিচার-প্রহসন করিয়া তাঁহাকে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে দেখা যায় যে, ঈশা বার বৎসর বয়স হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অজ্ঞাতবাস করিয়া ধর্ম্মপ্রচার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। এ সময় তিনি নিশ্চয়ই দেশে ছিলেন না, থাকিলে

তাঁহার জীবনীলেখকগণ নীরব থাকিতেন না। বার বৎসর বয়সে তাঁহার যেরূপ বৈরাগ্যভাব দেখা গিয়াছে তাহাতে মনে হয়, যেরুজালাম হইতে যাওয়ার পর তিনি আর অধিক দিন গৃহে থাকেন নাই এবং দেশে ফিরিয়াও চিরকুমার ঈশা পিতামাতা ভ্রাতাদের সহিত একত্র বাস করেন নাই। তিনি "অনিকেত" (আশ্রয় রহিত) সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াই দেশে ফিরিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার শ্রীমুখের কথা দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়, যথা : The foxes have holes, the birds of the air have nests, but the son of man has nowhere to lay his head (Matthew, 8-20) "শৃগালের গর্ত্ত আছে, আকাশের পাখীদের বাসা আছে, কিন্তু মানব-কুমারের মাথা রাখিবার কোথাও স্থান নাই।' ইহা তাহার দীক্ষা লইবার অব্যবহিত পরের উক্তি। দীক্ষা লইবার সময়ও তিনি যে নিজগৃহ হইতে আসেন নাই তাহাও তাঁহার কার্য্যের দ্বারা প্রতীয়মান হইবে। তিনি দীক্ষা লওয়ার অতি অল্প দিন পরে তাঁহার বাল্যের বাসস্থান দেখিতে গিয়াছিলেন। সে স্থান হইতে দীক্ষা স্থলে আসিলে তাঁহার চরিত্র-লেখক লুক কখনও এরূপ কথা লিখিতেন না। সে সময় তাহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর ছিল, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ; তখন তেজ পুঞ্জ নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সাধুজন এরূপ অভিভূত হইয়া পড়েন যে সলিল-সংস্কার দ্বারাও তাঁহাকে দীক্ষা দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। পরে ঈশার অনুরোধ উপরোধে জর্ডন নদীর সলিল-সংস্কার করিতে হইয়াছিল, অন্য শিক্ষা আর কি দিবেন। কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ঈশা যদি ধর্ম্মপ্রচারের জন্য এত উপযুক্ত হইয়াই দেশে ফিরিয়াছিলেন তবে আর জনের নিকট দীক্ষার কি প্রয়োজন ছিল? ইহার উত্তর অতি সহজ ; ইহুদী ধর্ম্মে ঐরূপ দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা থাকায় দেশীয় প্রথা ও লৌকিক আচারের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাঁহাকে ঐরূপ করিতে হইয়াছিল। ঐরূপ দীক্ষা না লইলে তাঁহার ইহুদিদের মধ্যে প্রচারকার্য্য কখনই সম্ভবপর হইত না ; অদীক্ষিত আচার্য্যের উপদেশ কেহই গ্রহণ করিত না। আমাদের দেশের অবস্থাও তদ্রূপ। গুরুকরণ না করিলে কেহই শিষ্য হইতে চায় না। কাটোয়ায় আচার্য্য কেশব ভারতীর নিকট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের সময় ঠিক এইরূপই ঘটিয়াছিল।

এখন দেখিতে হইবে, দেশ ছাড়িয়া ঈশা কোথায় গিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি কয়েকজন জ্যোতির্ব্বিদ সাধু পূর্ব্বদেশ হইতে ঈশার জন্মের অব্যবহিত পরে গ্রহনক্ষত্রের গতি লক্ষ্য করিয়া শিশুকে দেখিতে আসেন ও উপহার প্রদান করেন। সে সময় ভারতবর্ষেই জ্যোতিষের চর্চ্চা হইত, সুতরাং ভারতীয় হইবারই কথা। তাঁহারা যে শিশু বড় হইলে আবার তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন এইরূপ ধারণাই ত স্বাভাবিক। ঈশার বাল্যকাল হইতেই বৈরাগ্যভাব, তাঁহাদের সহিত পূর্ব্বদেশে—তিব্বত কি ভারতবর্ষ চলিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। সে সময় এশিয়া মহাদেশে প্রায় সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। তখন বাহির হইতে অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্ব শিক্ষার জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল ভারতে আগমন করিতেন। ঈশার ঐ সমস্ত প্রচারকের সঙ্গে বুদ্ধদেবের জন্মস্থান দেখিতে আসিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল এবং আসিবার কোন প্রতিবন্ধকতাও ছিল না। এ সব অনুমানের কথা। ঈশা-চরিত হইতে এমন কোন আভ্যন্তরীণ প্রমাণ নাই যাহাতে ঐ অনুমান দৃঢ়ীভূত হইতে পারে।

আমরা দেখিয়াছি ঈশা পরম যোগী ছিলেন। তিনি যোগবলে অনেক অলৌকিক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেশে আসিয়াও যৌগিক ক্রিয়া একদিনও পরিত্যাগ করেন নাই। প্রচারকার্য্য করিয়া অবসর পাইলেই তিনি শিষ্যদিগকে রাখিয়া একাকী পাহাড় পর্ব্বত জঙ্গলে গিয়া যৌগিক ক্রিয়া ধ্যানধারণা ও প্রার্থনা করিতেন। অলিভ পর্ব্বতই তাঁহার যোগের প্রশস্ত স্থান ছিল। আমরা আরও দেখিয়াছি, যোগবলে তাঁহার লাঞ্ছনার কথা জানিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বদিন সান্ধ্যভোজনের পর গেথ্‌সিমেন উদ্যানে শিষ্যগণের সহিত উপস্থিত হন। সে সময়ে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং শিষ্যদিগকে দূরে রাখিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে থাকেন। সে সময় তাঁহার লোমকূপ হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত-স্রাব হইতে থাকে। গভীর ধ্যানধারণা কালে যে এইরূপ হইয়া থাকে তাহা আমরা এ দেশেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দেহে দেখিয়াছি। আর যোগবলে যে অলৌকিক কার্য্য হয় তাহা চারিযুগেই ভারতবর্ষে সুবিদিত। অতি প্রাচীনকালের ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজের কথা না হয় নাই বলিলাম ; বর্ত্তমান যুগেও বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ও আমাদের জ্ঞানে ৺তৈলঙ্গ স্বামী ইহার দৃষ্টান্ত।

এখন দেখিতে হইবে, এই যোগের ক্রিয়া তিনি কোথায় শিখিলেন। ইহুদী ধর্ম্মশাস্ত্রে যোগমার্গের কোন কথা নাই। সে সময়ে কেবল ভারতবর্ষেই যোগশাস্ত্রের আলোচনা ছিল ও বড় বড় যোগীরও সৃষ্টি হইত। পাতঞ্জল দর্শন যোগের প্রধান গ্রন্থ ছিল। হিমালয়ে বড় বড় মহাত্মাগণ ঐ যোগশাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। সুতরাং ঈশাকে যোগশিক্ষার জন্য যে ভারতীয় গুরুর আশ্রয় লইতে হইয়াছিল সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। গীতাতেও যোগের উপদেশ আছে।

তারপর ঈশার ধর্ম্মের মূল নীতি—"ত্যাগ ও অহিংসা।" ইহাই বা তিনি কোথায় পাইলেন? তাঁহার জাতীয় ধর্ম্মে (Judaism) ঐ দুটির স্থান মোটে নাই। সেখানে "দাঁতের বদলে দাঁত" ও "চোখের বদলে চোখ"-নীতিই প্রচলিত। তাঁহাদের উপাস্য জিহোবা (Jehova) যতদূর হইতে পারে প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন ; একটু বিরক্ত হইলে আর রক্ষা নাই, দেশ ছারখার করিয়া ফেলিতেন। ত্যাগের ত কথাই নাই, যেহেতু উহা সম্পূর্ণ ভোগের ধর্ম্ম। এইরূপ দৃষ্টান্ত স্থলে ঈশা কিরূপে ত্যাগী ও অহিংসাপরায়ণ হইলেন, ইহাও ত গীতার শিক্ষা। "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং," "ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরং" এ ত গীতারই কথা। ইহা দেখিয়াও কি আমরা বলিব না যে গীতাই খ্রীষ্টের শিক্ষাগুরু এবং গীতাজ্ঞান ভিন্ন কখনই এরূপ হইত না। সুতরাং বলিতেই হইবে যে, তিনি ভারতবর্ষে আসুন বা নাই আসুন, ভারতীয় গুরুর নিকট গীতাশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতীয় মহাত্মাগণ দেশ পর্য্যটন উপলক্ষে ভারতের বাহিরেও যাইতেন। তবে অধিক দিন শিক্ষা করিতে হইলে গুরুর সঙ্গে সঙ্গে থাকারই প্রয়োজন

হইত, সেজন্য গুরুর স্থায়ী আবাস স্থলেও আসিতে হইত। আরও একটি কথা গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রিয় ভক্তের লক্ষণ বলিতে গিয়া যে সকল গুণের কথা বলা হইয়াছে, ঈশার মধ্যে ও তাঁর উপদেশের মধ্যে আমরা সে সমস্ত গুণই দেখিতে পাই। ইহা নিশ্চয়ই বহুদিনের সাধনাসাপেক্ষ, তবে ঈশার স্থায় অসাধারণ পুরুষের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অল্প সময় লাগিতে পারে।

এখন আর একটি কথা বলিয়াই আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব। ঈশা প্রায়ই বলিতেন "I and my father are one" আমি ও আমার পিতা এক। ইহা কি "সোঽহং বা অহং ব্রহ্মাস্মির" প্রতিধ্বনি নয়? ইহা যে বেদের একটি মহাবাক্য, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। বেদান্তীরা এখনও সোঽহং স্বামী সাজিয়া থাকেন। এই মত ইহুদী ধর্ম্মেও নাই, এক বেদ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম্ম শাস্ত্রে আছে বলিয়া আমরা জানি না। তবেই দেখা যাইতেছে, ইহা ঈশার সৃষ্ট মত নহে, এ মত বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত, উহা ঈশা ভারতবর্ষ হইতে আবিষ্কার করিয়াছিলেন মাত্র। এই সমস্ত অবস্থা একে একে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঈশার ধর্ম্মমতের মূল উৎস ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ-বেদান্ত-গীতা প্রভৃতির মধ্যে নিহিত; এই সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার উপায় নাই, এরূপ স্থলে ঐ সিদ্ধান্তই প্রকৃষ্ট প্রমাণের স্থল অধিকার করিয়া আমাদের পূর্ব্বকথিত কিম্বদন্তিকে সুদৃঢ় করিতেছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ঈশা হিব্রু ভাষাভাষী ছিলেন। ভারতবর্ষের সংস্কৃত বা অন্য কোনও ভাষা তিনি জানিতেন না। এ অবস্থায় তিনি কিরূপে ভারতীয় মহাত্মাদিগের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিয়াছিলেন। প্রশ্নটি হাস্যজনক। ঈশার স্থায় অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষের পক্ষে একটি নূতন ভাষা শিখিতে—তাহা সংস্কৃতই হউক বা যে ভাষাই হউক, কত দিন লাগে। আমরা দেখিয়াছি এ দেশের অশিক্ষিত জাহাজের খালাসীরা বিলাত গিয়া এক বছর দু বছরের মধ্যে বিলাতীভাষা শিখিয়া আসে। ঈশার ত কথাই নাই। কেহ হয়ত ইহাই জানিতে চাহিবেন যে, বিদেশী কোন ভাষা শিখিয়া থাকিলে ঈশা-চরিতে তাহার কোন উল্লেখ নাই কেন?

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, প্রথমত দেশে ফিরিয়া ঐ ভাষা ব্যবহার করিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই, কাজেই উহা কাহারও না-জানিবারই সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত আমরা যে চারিখানি ঈশা-চরিত পাইয়াছি তাহার একখানিও ধারাবাহিকরূপে লিখিত নহে। ঈশার জন্ম হইতে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা উহাতে উল্লিখিত হয় নাই। যে-জীবনীতে তাঁহার মিসরবাসের কোন কথা নাই, কত দিন পরে দেশে ফিরিলেন তাহারও উল্লেখ নাই, বার বছর হইতে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত কোথায় কি করিলেন জানা যায় না, সেখানে এমন একটি ক্ষুদ্র বিষয় জানিবার আশা দুরাশা মাত্র।

উপসংহারে আমাদের এই মতের পোষক জন্য 'হিন্দু মিশন' পত্রিকার গত বর্ষের আশ্বিন সংখ্যায় ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ গুহ কর্ত্তৃক লিখিত "যীশুখ্রীষ্টের ভারত আগমন" প্রবন্ধের পোষকে যে দুইখানি গ্রন্থের কতকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে আমরা উক্ত প্রবন্ধ লেখকের উপর নির্ভর করিয়া উহার বঙ্গানুবাদ দিয়ে দিলাম। ঐ পুস্তক পড়িবার সুযোগ আমাদের ঘটে নাই, কাজেই আমরা উহার জন্য দায়ী নই; কাহারও কৌতূহল হইলে মূল পুস্তক আনাইয়া পড়িতে পারেন।

১। রাশিয়ার সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক নিকোলাস নোটোভিচ তিব্বতের হোমস পল্লীর এক প্রাচীন বৌদ্ধমন্দিরে একখানি পুরাতন হস্তলিপিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদবলম্বনে তিনি ১৮৯৪ খ্রীঃ "Lavic Incounne de Jesus" (Unknown Life of Jesus) নামে একখানি পুস্তক ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করেন; উহা আলোচনায় সুলেখক Lowis Evan Norman লিখিয়াছেন—

উক্ত হস্তলিখিত পুঁথিতে এইরূপ লেখা আছে বলিয়া জানা যায় যে, ঈশা পঞ্চনদ দেশে ও রাজপুতানায় আসিয়াছিলেন; জৈনরা তাঁহাকে সেখানে থাকিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু ঈশার তাঁহাদের সহিত মতের মিল না হওয়ায় তিনি জগন্নাথ ধামে চলিয়া যান এবং জগন্নাথের উপাসকগণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, তথায় বেদের ভাষা লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করেন এবং বেদার্থ বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হন।

উল্লিখিত বৃত্তান্ত হইতে আরও জানা যায় যে, অতঃপর ঈশা নেপাল গিয়া ছয় বৎসর অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে পবিত্র সূত্রগ্রন্থসমূহ তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয়। সকলের পিতা চরাচরের স্রষ্টা এক ঈশ্বরের বাণী তিনি সর্ব্বত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

২। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত মঃ সিল্‌ভ্যাঁ লেভি স্বরচিত "The Gospel of Jesus the Christ" নামক গ্রন্থে The Life and Work of Jesus in India শীর্ষক অধ্যায়ে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা হইতেও ঈশার ভারতে আগমন সমর্থিত হইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন—

উড়িষ্যা দেশীয় রাবণ নামক রাজা ইহুদীদের কোন এক উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তথায় ঈশার উপদেশের সারবত্তা গভীর ভাবে তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করে। ঈশা যাহাতে ব্রাহ্মণ্য বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইতে পারেন তদুদ্দেশ্যে তাঁহাকে পূর্ব্ব দেশে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার পিতা মাতার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিছুদিন পরে তাঁহাদের অনুমতি লইয়া সিন্ধু দেশে আসেন এবং তথায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ ইহুদী বালককে প্রসন্ন ভাবে গ্রহণ করেন। পরে জগন্নাথে আসিলে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে ঈশা শিষ্যরূপে গৃহীত হন। এখানে ঈশা বেদ ও মনুর অনুশাসন শিক্ষা করেন।

লেভি সাহেব পরে লিখিয়াছেন—অতঃপর ঈশা বারাণসীতে গিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু ভিষক্ উদ্রকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং মোট চারি বৎসর কাল তিনি জগন্নাথ দেবের মন্দিরে অবস্থান করেন। অনতিকাল পরে তিনি শূদ্র কৃষকগণকে গল্পচ্ছলে নীতিমূলক উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। তারপর আমরা পাই যে, বিহারে ও লাহোরে তিনি উপদেশ দিয়াছেন। বারাণসী অবস্থান কালে তাঁহার পিতার মৃত্যু-সংবাদ

পাইয়া ঈশা তাঁহার মাতা মেরীকে সান্ত্বনা পূর্ণ চমৎকার একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন।* সে সময় প্যালেষ্টাইন ও ভারতবর্ষের মধ্যে সওদাগরগণ দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করিতেন।

৩। সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত স্বর্গীয় বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁহার সুবিখ্যাত গীতাগ্রন্থে "গীতা ও খ্রীষ্টানদিগের বাইবেল" শীর্ষক অধ্যায়ে উভয় গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া যে সমস্ত উক্তি করিয়াছেন তদ্দ্বারাও আমাদের এই মত মোটামুটি সমর্থিত হইতে পারে।

* ঈশার বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমরা ঈশার পিতা যোসেফের সংবাদ পাই; তাহার পর ঈশার দেহত্যাগ পর্য্যন্ত আর তাঁহার কোন সংবাদ পাই না বা তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পাই না। মাতা মেরীকে ঈশার প্রচারকার্য্যের সময় অনেকবার দেখিয়াছি, তাঁহার ভ্রাতাদিগকেও দেখা গিয়াছে—কিন্তু যোসেফকে একদিনও দেখা যায় নাই। যোসেফ সে সময় জীবিত থাকিলে কখনই এরূপ ঘটিত না, অন্তত ঈশার প্রাণদণ্ডের সময়ও তাঁহাকে দেখা যাইত।

হেমন্ত প্রভাতে

শ্রীকালিদাস রায়

হেমন্তের নিশা শেষ। শুনিতেছি শুয়ে শুয়ে ঘরে
টহল বৈরাগী গেল গেয়ে গান তন্দ্রাবিষ্ট স্বরে,
দূর মস্‌জিদ হ'তে উঠিতেছে মোল্লার আজান,
বটশাখা ধরিয়াছে নানা সুরে জাগরণী গান।
পথ দিয়া চলিয়াছে কলরব তুলি পল্লীবালা,
পুণ্য-পুকুরের লাগি ভরিবারে ফুলে শূন্য ডালা।
পেয়েছি হাঁসের সাড়া। শাঁখা চুড়ি লোহার ঝঙ্কার,
পুকুরের ঘাট হ'তে পশিতেছে শ্রবণে আমার।
জলেও উঠেছে ঢেউ। দ্বারে দ্বারে ঝরিতেছে জল
মুক্তির নিশ্বাস ছাড়ে কপাটেরা এড়ায়ে আগল।
বুড়া মৈত্র খুড়া চলে স্তবগান গেয়ে প্রাতঃস্নানে,
তাঁর খড়মের শব্দ তাও মোর পশিতেছে কানে।

মনে করি যোগ দেই—এই হৃষ্ট জাগরণী মাঝে,
পাশ ফিরি পুন ভেবে—লাগিব কি হায় কোন কাজে,

অক্ষমে ক্ষমিবে কেবা? পদে পদে হবে অঙ্গহানি,
দেহে মনে নাহি বল, শ্লথ হস্ত, আঁখি যুগে গ্লানি।
আগ্রহ উদ্যম নাই, মনে হয় সবি ব্যর্থ শ্রম,
প্রভাতের আমন্ত্রণী মনে হয় স্বপ্ন—মায়া—ভ্রম।

এক দিন ছিল বটে—যবে মোর হরিত হৃদয়,
প্রভাতের নদীধারা, মন্দানিল, ভানুর উদয়।
ছিল প্রেম-পরিচয় মধুময় সকলেরি সাথে,
বিশ্বেরে নূতন করি লভিতাম প্রত্যেক প্রভাতে।

ছিল আশা, ছিল লক্ষ্য, উদ্দীপনা, উজ্জ্বল উদ্যম,
সানন্দে বরিতে কর্ম্মে হ'ত নাক কভু ব্যতিক্রম
অরুণের আমন্ত্রণে। নব কর্ম্মে পেতাম আশ্বাস,
অসমাপ্তে সমাপিতে ছিল মর্ম্মে ব্যগ্র অভিলাষ,
প্রভাত সার্থক হ'তো প্রভাতির আশার পরশে
আলোকে, উল্লাসে, গানে, যৌবনের উন্মাদনা-রসে

সে দিন গিয়াছে মোর। গেছে ফুল্ল পুষ্পশ্রী জীবনে
কি দিয়া বরিব আজ আশারক্ত তরুণ তপনে?
কি সংকল্প নিয়ে আমি দাঁড়াইব উষার সম্মুখে?
কর্ম্মপথে যাত্রা করি কোন আশা ভর করি বুকে?
আনন্দের যজ্ঞভূমে বন্ধ আজি মোর আমন্ত্রণ,
রবাহূত হয়ে যেতে সঙ্কোচে যে চলে না চরণ।
জাগরণী আয়োজন বৃথা আজ। রবি আসে যায়,
মোর কাছে ভেদ নাই উদয়াস্তে, প্রভাতে সন্ধ্যায়।

শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান সম্বন্ধে বক্তব্য

মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

(৪)

বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতেছে। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে অপরের নূতন কথাও বক্তব্য। বহুদর্শী ও বহুলেখক প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহোদয় 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র ভূমিকায় (৪০ পৃঃ) লিখিয়াছেন—

বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইনি পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদী ছিলেন। ইনি বৈষ্ণব মতে আসিয়া "তত্ত্বদীপিকা" নামক গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈত-মতের বিরোধিতাচরণ করিয়াছিলেন। ইনি নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌম নহেন।

কিন্তু রাজেন্দ্রবাবু এই নূতন কথা লিখিয়াও কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই এবং উহা সমর্থন করিতে কোন বিচারও করেন নাই। আর সেই বাসুদেব সার্ব্বভৌম কি বাঙ্গালী, অথবা অন্য দেশীয়? ইহাও ত বলা আবশ্যক এবং সে বিষয়েও প্রমাণ আবশ্যক।

বস্তুতঃ নবদ্বীপের বিশারদ-পুত্র নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমই পরে উৎকলবাসী হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের পরম ভক্ত হইয়াছিলেন, ইহা 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে'র মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পাঠ করিলেও স্পষ্ট বুঝা যায়। 'চৈতন্যমঙ্গলে' জয়ানন্দও লিখিয়া গিয়াছেন,—

> "বিশারদসুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
> সবংশে উৎকলে গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য॥"

পরন্তু "অদ্বৈতমকরন্দে"র টীকার প্রথমে উক্ত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নিজেই লিখিয়াছেন—"শ্রীবাসুদেববিদুষা গৌড়াচার্য্যেণ যত্নতঃ। অদ্বৈতমকরন্দস্য ক্রিয়তে পরিশোধনং॥" উক্ত টীকার শেষেও আছে—"ইতি শ্রীমদ্ গৌড়াচার্য্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিতা অদ্বৈতমকরন্দ টীকা সমাপ্তা॥"

নবদ্বীপের বিশারদ-পুত্র উক্ত গৌড়াচার্য্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পরে উৎকলের স্বাধীন রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিতরূপে উৎকলবাসী হইলে কোন সময়ে প্রতাপরুদ্রের রাজ্যরক্ষক মন্ত্রী অদ্বৈতবেদান্তনিষ্ঠ ব্রহ্মবিচারক কূর্ম্মবিদ্যাধরের ইচ্ছানুসারে তাঁহার আনন্দবিধানের জন্য লক্ষ্মীধরকৃত "অদ্বৈতমকরন্দ" গ্রন্থের টীকা করিয়া উহার পরিশোধন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ঐ গ্রন্থের অনেক প্রতিবাদের খণ্ডনপূর্ব্বক গ্রন্থকারের মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহাতে তখন উক্ত কূর্ম্মবিদ্যাধর বিশেষ উপকার ও আনন্দ লাভ করেন। "অদ্বৈতমকরন্দে"র উক্ত টীকার শেষে লিখিত সার্ব্বভৌমের দুইটি শ্লোকের দ্বারাই ইহা বুঝা যায়। শেষ শ্লোকে কর্ণাটের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সহিত প্রতাপরুদ্রের বিরোধের সূচনাও পাওয়া যায়। ঐ শ্লোকটি* ঐতিহাসিকগণের বিশেষ আলোচ্য এবং উহার পাঠনির্ণয়পূর্ব্বক প্রকৃতার্থ বিচার্য্য। পুরীর শঙ্করমঠে বঙ্গাক্ষরে লিখিত ঐ টীকার পুঁথি আছে। উহার সংখ্যা ২৮৫৪। লিপিকাল ১৫৫১ শকাব্দ।

গৌড়াচার্য্য মহানৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য উৎকলে গিয়া পূর্ব্বোক্ত কারণে অদ্বৈতবেদান্তের অধিকতর চর্চ্চা করিয়া "অদ্বৈতমকরন্দে"র টীকা করায় তখন হইতে তিনি অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক বলিয়াও প্রসিদ্ধ হন। কিন্তু তিনি নবদ্বীপের সেই বাসুদেব সার্ব্বভৌম—যিনি প্রথমে মিথিলায় গিয়া নব্যন্যায় পড়িয়া আসিয়াছিলেন এবং নিজেও নব্য ন্যায়ের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জনেশ্বর উৎকল-রাজের নিকটে 'বাহিনীপতি মহাপাত্র' উপাধি লাভ করেন। তিনি পিতার নিকটেই ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া পক্ষধর মিশ্রের "আলোকে"র যে টীকা করেন, তাহার এক পুঁথি কাশীর সরস্বতী ভবনে আছে। উহার

---

* "কর্ণাটেশ্বর কৃষ্ণরায় নৃপতের্গর্ব্বাগ্নি নির্ব্বাপকে
যত্রস্যস্তভরোঽভবদ্ গজপতিঃ শ্রীরুদ্রভূমীপতিঃ।
তস্য ব্রহ্মবিচারচারুমনসঃ শ্রীকূর্ম্ম বিদ্যাধর
স্যানন্দো মকরন্দশুদ্ধিবিধিনা সান্দ্রোময়ানন্দতঃ॥"

লিপিকাল ১৬৭২ সংবৎ (১৫৮৫ খৃঃ)। উক্ত টীকায় তাঁহার পিতা সার্ব্বভৌমের মতেরও উল্লেখ আছে। দ্রষ্টব্য—Saraswati Bhaban Studies, vol. iv, p. 69-70.

উক্ত বাসুদেব সার্ব্বভৌম পূর্ব্বোক্ত কারণে "অদ্বৈত-মকরন্দে"র টীকা করিলেও তিনি ৺পুরীধামেও প্রধানতঃ ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা-করিতেন, ইহা 'চরিতামৃতে'র মধ্য-লীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনার দ্বারাও বুঝা যায়। কারণ, যখন সার্ব্বভৌমের নিকটে তাঁহার ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বয়ং ভগবান্ ঈশ্বর বলেন, তখন—

"শিষ্যগণ কহে ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে ?
আচার্য্য কহে—বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে॥
শিষ্য কহে—ঈশ্বরতত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য্য কহে—অনুমানে নহে ঈশ্বর জ্ঞানে॥"

জানা আবশ্যক যে, নৈয়ায়িকগণই অনুমান প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব সিদ্ধ করেন। অতএব তখন গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত বিবাদকারী সার্ব্বভৌমশিষ্যগণ ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়ী, ইহা নিশ্চিত। তাঁহারা বেদান্তাধ্যায়ী হইলে ঐরূপ কথা বলিতেন না।

বিমানবাবুও উক্ত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে নৈয়ায়িকই বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি রাজেন্দ্রবাবুর 'অদ্বৈতসিদ্ধি-ভূমিকা' পাঠ করিয়া তাঁহার কোন কোন কথার প্রতিবাদ করিলেও উক্ত বাসুদেব সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে রাজেন্দ্রবাবুর ঐ কথার কোন সমালোচনা করেন নাই। তাই এই প্রসঙ্গে আমি রাজেন্দ্রবাবুর ঐ কথারও উল্লেখপূর্ব্বক আলোচনা করিলাম। কারণ সকলের কথার আলোচনার দ্বারা সত্য-নির্ণয় আমাদিগেরও উদ্দেশ্য।

এখানে অন্য একটি পুরাতন কথাও অবশ্য বক্তব্য। অনেকদিন পূর্ব্বে "নবদ্বীপমহিমা" পুস্তকে লিখিত হয় যে, 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে'র টীকাকার দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ উক্ত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পুত্র। "বিশ্বকোষে"ও 'নবদ্বীপ-মহিমা'র সেই সমস্ত কথাই সত্যরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্য নহে।* বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পুত্র মহানৈয়ায়িক জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র।

'রাঢ়ীয়কুল পঞ্জিকা'য়ও লিখিত হইয়াছে—"তৎপুত্রোঽজনি বাহিনীপতিরিতি খ্যাতশ্চ নীলাচলে ধীরঃ শ্রীল জলেশ্বরঃ কবিগুরুঃ শ্রীকালিদাসোঽপরঃ।" 'কুলপঞ্জিকা'য় চন্দনেশ্বরের নাম নাই। বৈষ্ণব গ্রন্থে চন্দনেশ্বরের কথাই পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, জলেশ্বরেরই নামান্তর চন্দনেশ্বর। অনেকে বলেন, চন্দনেশ্বর তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর।

এখন শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ব্বে নবদ্বীপে উক্ত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন কিনা, ইহাও এখানে বিচার্য্য। বিমানবাবু সে বিষয়ে পরে "পরিশিষ্টে" (৮৯ পৃঃ) কেবল 'কোন প্রমাণ নাই' এই কথাই লিখিয়াছেন। কিন্তু অনেক দিন হইতে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিও শ্রীগৌরাঙ্গকে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে রাজেন্দ্রবাবুও পূর্ব্বে "ব্যাপ্তিপঞ্চকে"র ভূমিকায় (২৩ পৃঃ) লিখিয়াছেন,—

"এই বাসুদেব নবদ্বীপে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবেরও গুরু ছিলেন, কিন্তু শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া শেষ বয়সে চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

রাজেন্দ্রবাবু উক্ত ভূমিকায় রঘুনাথ শিরোমণিকে শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া সমর্থন করিতে আপত্তির সমাধানের জন্য পরে (২৫ পৃঃ) লিখিয়াছেন—"রঘুনাথের গুরু বাসুদেব ও চৈতন্যদেবের গুরু বাসুদেবকে ভিন্ন বলিলে এ আপত্তির সমাধান হয়।" বাসুদেব যে চৈতন্যদেবের অধ্যাপক গুরু, ইহা অস্বীকার করিলেই কিন্তু উক্তরূপ কল্পনার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু রাজেন্দ্রবাবু তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কারণ তিনি সেখানে পূর্ব্বেই (২৩ পৃঃ) লিখিয়াছেন—"বাসুদেব যে চৈতন্যদেবের গুরু, ইহা সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য সাক্ষ্য দিবে।"

সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য বলিতে আমরা কোন্ কোন্ গ্রন্থ বুঝিব এবং তাঁহারা কোথায় একবাক্যে ঐরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন ইহা রাজেন্দ্রবাবু লেখেন নাই। গৌড়ীয়

* দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ রাম তর্কবাগীশের পরে মুগ্ধবোধের টীকা করায় তাঁহার পিতা সার্ব্বভৌম সপ্তদশ শতাব্দীর পণ্ডিত, ইহা নিশ্চিত। পরন্তু তিনি ছিলেন গাঙ্গোলীয়জ (গঙ্গোপাধ্যায়)। বোপদেব কৃত "কবিকল্পদ্রুমে"র টীকা "ধাতুদীপিকার" শেষে দুর্গাদাস আত্ম-পরিচয় বর্ণনে লিখিয়াছেন—"গাঙ্গোলীয়জ সর্ব্বদেশবিদিত শ্রীসার্ব্বভৌমাত্মজঃ।" কিন্তু বিশারদপুত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌম বন্দ্যবংশ সম্ভব, (বন্দ্যোপাধ্যায়) ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

বৈষ্ণব সাহিত্যের সেবক আর কেহ যে ঐ কথা লিখিয়াছেন, ইহাও আমি জানি না। আমি কেবল ঈশান নাগরের "অদ্বৈতপ্রকাশে"ই পাইয়াছি যে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথমে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকটে দুই বর্ষে ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া দুই বর্ষ সাহিত্য ও অলঙ্কার পড়েন। পরে বিষ্ণুমিশ্রের নিকটে দুই বর্ষ স্মৃতি ও জ্যোতিষ পড়েন। পরে সুদর্শন পণ্ডিতের নিকটে যাইয়া—

"তাঁর স্থানে ষড়দর্শন পড়িলা দুই বর্ষে।
তবে গেলা বাসুদেব সার্ব্বভৌম পাশে॥
তাঁর স্থানে তর্কশাস্ত্র পড়িলা দ্বিবৎসরে।
এবে তুয়া পাশ আইলা বেদ পড়িবারে॥" ১২শ অঃ।

পূর্ব্বে দেখা যায়—"গৌর কহে শুন গুরু বেদপঞ্চানন। বিদ্যানগর হইতে আইনু তোমার সদন॥" অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্যানগরে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকটে দুই বৎসর ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া তথা হইতে শান্তিপুরে বেদপঞ্চানন অদ্বৈতপ্রভুর নিকটে বেদ পড়িবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাই তিনি তখন অদ্বৈতপ্রভুকে বলেন—

"বিদ্যানগর হইতে আইনু তোমার সদন।"

নবদ্বীপের সংলগ্ন বিদ্যানগরেই উক্ত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোল ছিল, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। কেহ কেহ উহার নাম বলিয়াছেন—'বেদনগর'। সে যাহা হউক, এখন শ্রীগৌরাঙ্গ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় আবির্ভূত হইয়া কোন্ সময়ে কত বয়সে বিদ্যানগরে উক্ত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে দুই বৎসর ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে পারেন, ইহাই বুঝিতে হইবে।

"চৈতন্যমঙ্গলে" জয়ানন্দের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে শ্রীগৌরাঙ্গের অগ্রজ বিশ্বরূপের জন্মের পরে উক্ত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া উৎকলবাসী হন। জয়ানন্দের কথা না মানিলেও 'চরিতামৃতে' কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনার দ্বারাও স্পষ্ট বুঝা যায় যে উক্ত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপ বাসকালে—শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখেন নাই। তিনি ৺পুরীধামে ৺জগন্নাথ মন্দিরেই তাঁহার প্রথম দর্শন লাভ করেন। জগন্নাথ মন্দিরে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রথম দেখিয়া তিনি তাঁহাকে সেই অবস্থাতেই সাদরে নিজ গৃহে লইয়া যান—ইহা ঈশান-নাগরের "অদ্বৈতপ্রকাশে"ও (১৫শ অঃ) বর্ণিত হইয়াছে।

"চরিতামৃতে"র মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন যে, পরে উক্ত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার ভগ্নীপতি নবদ্বীপের গোপীনাথ আচার্য্যকে শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় প্রশ্ন করিলে—

"গোপীনাথ আচার্য্য কহে—নবদ্বীপে ঘর।
জগন্নাথ নাম—পদবী মিশ্র পুরন্দর॥
বিশ্বম্ভর নাম ইহার—তার ইঁহো পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র॥"

অর্থাৎ গোপীনাথ আচার্য্য বলেন যে ইনি নবদ্বীপবাসী জগন্নাথমিশ্রের পুত্র এবং নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র। ইহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম বিশ্বম্ভর। তখন—

"সার্ব্বভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
বিশারদের সমাধ্যায়ী—এই তাঁর খ্যাতি॥
মিশ্র পুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহা পূজ্য হেন মানি॥"

অর্থাৎ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য গোপীনাথ আচার্য্যের নিকটে শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বাশ্রমের ঐ পরিচয় জানিয়া বলেন যে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আমার পিতা বিশারদের সহাধ্যায়ী ছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। আর জগন্নাথমিশ্রও আমার পিতার মান্য ছিলেন, ইহাও আমি জানি। অতএব পিতার সম্বন্ধ বশতঃ তাঁহারা উভয়েই আমার পূজ্য। পরে—

"নদীয়া সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম তুষ্ট হৈলা।
প্রীত হঞা গোসাঞিরে কহিতে লাগিলা॥
সহজেই পূজ্য তুমি—আরে ত সন্ন্যাস।
অতএব জানহ তুমি আমি নিজ দাস॥"

কবিরাজ গোস্বামীর উক্ত বর্ণনানুসারে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অধ্যয়নকালের পূর্ব্বেই উক্ত বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া উৎকলবাসী হন। তিনি পরে নবদ্বীপে আসিয়াও শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখেন নাই। তিনি পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গের কোন পরিচয়ও জানিতেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে তাঁহার নিকটে দুই বৎসর ন্যায়শাস্ত্র পাঠ

করিলে তিনি কখনই তাঁহার সেই মনোমোহিনী মূর্ত্তি ভুলিয়া যাইতে পারেন না।

পরন্তু তখন তাঁহার ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য্যও তাঁহাকে বলেন নাই যে ইনি পূর্ব্বে আপনার ছাত্র ছিলেন। উহা সত্য হইলে তিনি তখন সে কথাও কেন বলিবেন না? আর সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যদেবকে—"জানহ তুমি আমি নিজ দাস" এই কথা বলিলে—"শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণু-স্মরণ।" কিন্তু তিনি তখনও কেন বলেন নাই যে আমি আপনার সেই শিষ্য। উহা সত্য হইলে তিনি তখনও কি সেই সত্য গোপন করিতে পারেন?

পরন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ যে নবদ্বীপে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকটে ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন, ইহা মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি কেহই লেখেন নাই। উহা সত্য হইলে কেন তাঁহারা ঐ কথা লিখিবেন না? অবশ্য "চৈতন্যমঙ্গলে" জয়ানন্দ লিখিয়াছেন,—"স্মৃতি তর্ক সাহিত্য পড়িল একে একে।" কিন্তু জয়ানন্দও বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকটে—শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায়শাস্ত্র পাঠের কথা লেখেন নাই। পরন্তু জয়ানন্দের সকল কথাই যে ঐতিহাসিক সত্য নহে, ইহা বিমানবাবুও বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি (২২৫ পৃষ্ঠা হইতে) বৈষ্ণব সমাজে জয়ানন্দের গ্রন্থ অনাদৃত হইবার যে সমস্ত কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অবশ্য পাঠ্য।

পরন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার ঈশ্বরত্ব বা সর্ব্বজ্ঞতাবশতঃই সকল শাস্ত্রের কথাই বলিতেন এবং সকলকেই পরাস্ত করিতেন। তিনি সরস্বতীপতি, এজন্যই সরস্বতীর বরপ্রাপ্ত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতও নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহার নিকটে সহজেই পরাস্ত হইয়াছিলেন—এইরূপ বর্ণনাই "চৈতন্যভাগবতে" বৃন্দাবনদাস করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ লৌকিক রীতিতে অধ্যাপকের নিকটে কোন্ শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপনা করিয়াছেন—এ বিষয়ে বৃন্দাবনদাসও বর্ণন করিয়াছেন যে, তিনি কলাপ ব্যাকরণ ও তাহার 'বৃত্তি' ও 'পঞ্জী' প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া তখন হইতে তাহারই অধ্যাপনারম্ভ করেন। তাঁহার অধ্যাপনাকালে কোন দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকটে পরাস্ত হইলে—

> "দুঃখিত হইলা বিপ্র চিন্তে মনে মনে।
> সরস্বতী মোরে বর দিলেন আপনে॥
> ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা দর্শন।
> বৈশেষিক বেদান্তে নিপুণ যত জন॥
> হেন জন না দেখিল সংসার ভিতরে।
> জিনিতে কি দায় মোর সনে কক্ষা করে॥
> শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণ পড়ায়ে ব্রাহ্মণ।
> সে মোরে জিনিল হেন বিধির ঘটন॥"

চৈতন্য ভা—আদি ৯ম অঃ।

দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের পরাভব বর্ণনে—পরে "চরিতামৃতে" কবিরাজ গোস্বামীও দিগ্‌বিজয়ীর কথা লিখিয়াছেন—

> "ব্যাকরণীয়া তুমি—নাহি পড় অলঙ্কার।
> তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার॥"

তদুত্তরে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়াছিলেন—

> "নাহি পড়ি অলঙ্কার করিয়াছি শ্রবণ।
> তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ গুণ"॥

আদি—১৬শ পঃ

শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যাকরণাদি পাঠের পরে যথানিয়মে টোলে উপস্থিত হইয়া অধ্যাপকের নিকটে অলঙ্কার শাস্ত্র পাঠ না করিলেও পূর্ব্বে অনেক সহাধ্যায়ীর অলঙ্কার গ্রন্থ পাঠকালে তিনি তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং তখন নবদ্বীপে অন্যত্র অলঙ্কার শাস্ত্রের অনেক বিচারও তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, ইহাও কবিরাজ গোস্বামীর উক্তরূপ বর্ণনার দ্বারা তাঁহার বক্তব্য বুঝা যায়। নচেৎ ঐস্থলে তাঁহার "নাহি পড়ি অলঙ্কার" ইত্যাদি পয়ার লেখার প্রয়োজন কি? যাহা হউক, শ্রীগৌরাঙ্গ গুরুর নিকটে অলঙ্কার শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন কি না, ইহা এখানে আমার আলোচ্য নহে। কিন্তু তিনি উক্ত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকটে অথবা অন্য কোন নৈয়ায়িকের নিকটে ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন কিনা, ইহাই এখানে আলোচ্য। বিমানবাবু লিখিয়াছেন,—

"বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, শ্রীচৈতন্য ন্যায়-শাস্ত্রের কিছু অংশও পড়িয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে গদাধরের সহিত বিশ্বম্ভরের ন্যায়ের বিচারের উল্লেখ আছে।" ৩৪৮পৃঃ।

গদাধরের সহিত বিশ্বম্ভরের কিরূপ ন্যায়ের বিচারের উল্লেখ আছে, ইহা ব্যক্ত করিয়া লেখাই উচিত ছিল।

আমরা "চৈতন্যভাগবতে" দেখিতে পাই যে একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ গদাধরকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া—

"হাসি দুই হাথে প্রভু রাখিল ধরিয়া।
ন্যায় পড় তুমি আমা যাও প্রবোধিয়া॥
জিজ্ঞাসহ গদাধর বোলয়ে বচন।
প্রভু বোলে কহ দেখি মুক্তির লক্ষণ॥
গদাধর বোলে আত্যন্তিক দুঃখনাশ।
ইহারেই শাস্ত্রে কহে মুক্তির প্রকাশ॥
নানারূপে দোষে প্রভু সরস্বতী পতি।
হেন নাহি তার্কিক যে করিবেক স্থিতি॥"

চৈঃ ভা আদি ৮ম অঃ

কিন্তু এখানেও বৃন্দাবনদাসের ঐ কথার তাৎপর্য্য এই যে—সরস্বতীপতি শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্বজ্ঞতাবশতঃ সকল শাস্ত্রের কথাই জানিতেন। সকলকেই তিনি নিরস্ত করিয়া দিতেন। তাঁহার নিকটে কোন তার্কিকই নিজ পক্ষ স্থাপন করিতে পারিতেন না।

বস্তুতঃ ন্যায়শাস্ত্রসম্মত মুক্তির লক্ষণ বিষয়ে গদাধরের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের ঐরূপ আলোচনাকে ন্যায়শাস্ত্রের বিচার বলা যায় না। ন্যায়শাস্ত্র না পড়িয়াও—অন্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও ন্যায়মতে মুক্তির লক্ষণ কি? এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন এবং সেই মুক্তির লক্ষণে তাঁহার নিজ বুদ্ধি অনুসারে দোষ বলিতেও পারেন।

পরন্তু বৃন্দাবনদাস দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের পরাভবের পরে নবদ্বীপে নিমাইপণ্ডিতের পাণ্ডিত্য খ্যাতির বর্ণন করিতে পরে কি লিখিয়াছেন, তাহাও দেখা আবশ্যক। তিনি আদিখণ্ডের নবম অধ্যায়ের শেষে লিখিয়াছেন—

"দিগ্‌বিজয়ী হারিয়া চলিলা যার ঠাঞি।
এত বড় পণ্ডিত আর কোথাও শুনি নাঞি॥
সার্থক করেন গর্ব্ব নিমাঞি পণ্ডিত।
এবে সে তাহান্ বিদ্যা হইল বিদিত॥
কেহো বোলে এ ব্রাহ্মণ ন্যায় যদি পড়ে।
ভট্টাচার্য্য হয় তবে কখন না নড়ে॥"

বৃন্দাবনদাসের এই কথায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে তাঁহার মতেও শ্রীগৌরাঙ্গ কোন অধ্যাপকের নিকটে ন্যায়শাস্ত্র পড়েন নাই। তাই বৃন্দাবনদাস শ্রীগৌরাঙ্গের ঐরূপ পাণ্ডিত্য ও দিগ্‌বিজয়ীর পরাভব জন্য ঐরূপ খ্যাতির বর্ণন করিয়াও শেষে ইহাও লিখিয়াছেন—"কেহো বলে এ ব্রাহ্মণ ন্যায় যদি পড়ে।", অর্থাৎ তখন শ্রীগৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিচারশক্তির পরিচয় পাইয়া কেহ বলিয়াছিলেন যে ইনি যদি ন্যায়শাস্ত্র পড়েন, তাহা হইলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভট্টাচার্য্য হইতে পারেন। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পরে আবার একথা লেখার প্রয়োজন কি ইহাও চিন্তনীয়।

আমরা জানি, তৎকালে নবদ্বীপে ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপকগণ পাণ্ডিত্যের জন্য ভট্টাচার্য্য পদবী লাভ করিতে পারিতেন না। তাই শ্রীগৌরাঙ্গের অধ্যাপক মহাবৈয়াকরণ গঙ্গাদাস পণ্ডিত এবং সুদর্শন পণ্ডিত প্রভৃতিও ভট্টাচার্য্য পদবী লাভ করিতে পারেন নাই। দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের পরাভবকারী নিমাই পণ্ডিত বিদ্যাসাগর হইলেও ভট্টাচার্য্য নামে কথিত হন নাই। তাই তখন কেহ আক্ষেপ করিয়া বলিতে পারেন যে নিমাই পণ্ডিত এখনও ন্যায় পড়িয়া ন্যায়ের অধ্যাপনা করিলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভট্টাচার্য্য হইতে পারেন। কিন্তু তখন কেহ কেহ বলেন যে আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে 'বাদি সিংহ' উপাধি দিব। তাই বৃন্দাবন দাস পূর্ব্বলিখিত পয়ারের পরেই লিখিয়াছেন, -"কেহো কেহো বোলে ভাই মিলি সর্ব্বজনে। 'বাদি সিংহ' বলিয়া পদবী দিব তানে॥" আদি ৯ম অঃ।

বিমানবাবু পরে লিখিয়াছেন—"বৃন্দাবন দাস বলেন যে, বিশ্বম্ভর ব্যাকরণের টিপ্পনী লিখিয়াছিলেন; কিন্তু ঈশান বলেন, তিনি তর্কশাস্ত্রের এবং ভাগবতের টীকাও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু পাছে তাঁহার টীকা পড়িয়া যথাক্রমে রঘুনাথের ও শ্রীধরের টীকার আদর কমিয়া যায়, সেই ভয়ে তিনি উহা নষ্ট করিয়া ফেলেন।" ৪৪৫ পৃঃ

কিন্তু ঈশান ঐরূপ বলেন নাই। তিনি রঘুনাথের নাম করিয়া তাঁহার টীকার কথা বলেন নাই। ১৩১১ সালের 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত লেখক প্রখ্যাত বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়ই ঈশান নাগরের "অদ্বৈত প্রকাশ" অবলম্বন করিয়া প্রথমে ঐকথা লেখেন। কিন্তু সেই সময়ে পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক ঐতিহাসিক নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় সেই প্রবন্ধের শেষে নিম্নে মন্তব্য লিখিয়া দেন যে,

"অদ্বৈতপ্রকাশে" রঘুনাথ শিরোমণির নাম নাই।" বিমানবাবু "অদ্বৈত প্রকাশে"র বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াও কেন উহা লক্ষ্য করেন নাই, ইহা বুঝিলাম না।

বস্তুতঃ 'অদ্বৈত প্রকাশে' (১৯শ অঃ) এইরূপ বর্ণন পাওয়া যায় যে একদিন গঙ্গা পারে 'এক দ্বিজ' শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎকারে তাঁহার নিকটে এক গ্রন্থ দেখিয়া ইহা কোন্ গ্রন্থ এইরূপ প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন,—ইহা ন্যায়শাস্ত্রের টীকা। পরে সেই দ্বিজের ইচ্ছা বুঝিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে সেই টীকা পড়িতে দেন। পরে—

"দ্বিজ সেই টীকা দেখি করে হাহাকার।
কহে মোর পরিশ্রম হৈল ছারখার॥
ইহা দেখি মোর টীকার হৈবে অনাদর।
শ্রীগৌরাঙ্গ কহে ভয় নাহি দ্বিজবর॥"

পরে দয়ানিধি শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার নিজকৃত সেই টীকা গঙ্গা মধ্যে ফেলিয়া দিলে মহানন্দে সেই দ্বিজ বলেন—

"তুমি হ নিশ্চয় সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার।
তোমার চরণে মোর কোটি নমস্কার॥
এত কহি দ্বিজ হর্ষে করিলা গমন।
গোরাচাঁদের যশ জ্যোৎস্নায় পূরিল ভুবন॥"

কিন্তু সেই দ্বিজ কে? তিনি রঘুনাথ শিরোমণি হইলে এবং শ্রীগৌরাঙ্গের সহাধ্যায়ী হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় 'দ্বিজবর' বলিয়া সম্বোধন করিবেন কেন? আর ঈশান-নাগর সেই সময়ে শান্তিপুরে অদ্বৈত-প্রভুর গৃহে বাস করিয়াও তাঁহার নামটি জানিতে পারিবেন না কেন? পরন্তু রঘুনাথ শিরোমণি নিজের টীকা হইতে শ্রীগৌরাঙ্গকৃত টীকার অত্যুৎকর্ষ বুঝিয়াই "হাহাকার" করিবেন কেন? তিনি সেই টীকা গ্রহণ করিয়া তাহার টীকা করিলেই ত তাঁহার প্রতিষ্ঠা আরও বর্দ্ধিত হইত। তিনি ত টীকা গ্রন্থেরও টীকা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। পরন্তু তিনি তখন শ্রীগৌরাঙ্গকে "তুমি হ নিশ্চয় সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার"—ইহা বুঝিয়াও তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন না, কিন্তু নিজের ঐ ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষায় হৃষ্ট হইয়া তখনই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, ইহাও কি সম্ভব? তিনি কি ঐরূপ 'দ্বিজবর'ই ছিলেন? আর তিনি ঐরূপ নীচ স্বার্থপর হইলে তাঁহার নিজকৃত টীকার উৎকর্ষ সাধনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গকৃত সেই টীকা লইয়া তখনই সেখান হইতে পলায়ন করেন নাই কেন? তিনি সেই টীকা দেখিয়াই 'হাহাকার' করিয়া নিজ মর্য্যাদা নষ্ট করিবেন কেন?

আমরা কিন্তু তখন কোন দ্বিজের পক্ষেই ঐরূপ 'হাহাকার' এবং শ্রীগৌরাঙ্গকে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার বুঝিয়াও তাঁহার সঙ্গত্যাগ সম্ভব বুঝি না। আর পরে প্রকাশিত "অদ্বৈত-প্রকাশে"র ঐ সমস্ত অংশও যে প্রাচীন ঈশান-নাগরেরই ভাষা, ইহাও আমরা বুঝি না। বিমানবাবু পরে "অদ্বৈতপ্রকাশে"র অকৃত্রিমতা বিষয়ে সংশয় প্রকাশই করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"অদ্বৈতপ্রকাশ যে কৃত্রিম ও প্রক্ষিপ্ত, জোর করিয়া ইহা বলা যায় না। তবে যে পাঁচটি প্রধান কারণে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিলাম।" (৪৬৪ পৃঃ)

কিন্তু 'অদ্বৈত প্রকাশে'র প্রামাণ্য বিষয়ে বিমানবাবুর সংশয়ই থাকিলে শ্রীগৌরাঙ্গের বাসুদেব সার্ব্বভৌমের শিষ্যত্ব বিষয়ে 'কোন প্রমাণ নাই'—ইহা তিনি নিশ্চয়পূর্ব্বক লিখিতে পারেন না। আমরা কিন্তু 'কেবল প্রমাণ নাই' এই কথাই বলি না। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি যে, শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্যানগরে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকটে দুই বৎসর ন্যায়শাস্ত্র পড়েন নাই। তিনি ন্যায়শাস্ত্রের টীকাও করেন নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গের সহাধ্যায়ী ভক্ত মুরারি গুপ্ত ও শ্রীগৌরাঙ্গের অধ্যাপকগণের নাম বলিতে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নাম বলেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—"ততঃ পপাঠ স পুনঃ শ্রীমান্ শ্রীবিষ্ণু পণ্ডিতাৎ। সুদর্শনাৎ পণ্ডিতাচ্চ শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতাৎ॥" শ্রীগৌরাঙ্গ পরে অন্য কোন বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকটে ন্যায়শাস্ত্র পড়িলে মুরারি গুপ্তও কেন তাহা লিখিবেন না? বিমানবাবুও পূর্ব্বে (৩৪৮ পৃঃ) লিখিয়াছেন—"বিশ্বম্ভরের অধ্যয়ন অধ্যাপনা সম্বন্ধে মুরারির উক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য, কেননা তিনি শ্রীচৈতন্যকে ছাত্র হিসাবে জানিতেন।"

নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের যে কোন পরিচয় ছিল, ইহাও মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি লেখেন নাই। কিন্তু রঘুনাথ যে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। বিমানবাবু সে বিষয়েও 'কোন প্রমাণ নাই'—এই কথাই লিখিয়াছেন। পরে সে কথারও আলোচনা করিব।

শ্রীচৈতন্যদেব যে তামিল ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন, এ বিষয়েও কোন প্রমাণ নাই। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ কালে "কথন তামিল বুলি বলে গোরা রায়" এবং "সর্ব্বমত দূষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড" এই সমস্ত কথা তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার প্রমাণ রূপে কেহ বলিতে পারেন। কিন্তু "শ্রীচৈতন্যের (নানাশাস্ত্রে) বিদ্যাশিক্ষা"র সমর্থনে উহা প্রমাণ হয় না।

ক্রমশ

বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণের উৎপত্তি

ডকটর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি-এচ্-ডি

ভাইস্-চ্যান্সেলার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণপঞ্চকের আগমনে পূর্ব্বে এদেশে যে সমুদয় ব্রাহ্মণ ছিলেন কুলগ্রন্থে তাঁহারা সাতশতী ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই সাতশতী ব্যতীত অন্য যে সমুদয় ব্রাহ্মণ আছেন কোন কোন কুলাচার্য্যের মতে তাঁহারা সকলেই উক্ত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশোদ্ভূত। প্রাচীন কুলাচার্য্য মহেশ মিশ্র রচিত 'নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকা' এই মতের সমর্থন করেন। পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম ক্ষিতীশের পাঁচ পুত্র দামোদর, শৌরি, বিশ্বেশ্বর (অথবা বিশ্বম্ভর), শঙ্কর ও ভট্টনারায়ণ সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে নিম্নলিখিত বচন আছে :

"দামোদর বরেন্দ্রদেশে বাসহেতু বারেন্দ্র বলিয়া বিখ্যাত, শৌরি দাক্ষিণাত্য, বিশ্বম্ভর বেদপারগতা হেতু বৈদিক, শঙ্কর পাশ্চাত্য, ভট্টনারায়ণ রাঢ়দেশে বাস হেতু রাঢ়ী।"

উক্ত ব্রাহ্মণপঞ্চকের অন্যতম মেধাতিথির অধস্তন অষ্টম পুরুষ দিব্যসিংহ মধ্যদেশী বলিয়া উক্ত গ্রন্থে অভিহিত হইয়াছেন। (১)

প্রাচীন কুলাচার্য্য মহেশ মিশ্রের এই মত কোন কোন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় গ্রহণ করেন নাই। পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক এবং গ্রহবিপ্রগণের কুলগ্রন্থে তাঁহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। সুতরাং রাঢ়ী ও বারেন্দ্র, সপ্তশতী, বৈদিক ও গ্রহবিপ্রগণের উৎপত্তি পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করিতেছি।

(ক) রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীবিভাগ

আজকাল বঙ্গদেশে যে সমুদয় ব্রাহ্মণ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র বলিয়া পরিচিত তাঁহারা সকলেই যে আদিশূর আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশ হইতে উদ্ভূত এ বিষয়ে সকল কুলগ্রন্থই একমত। কিন্তু রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীবিভাগ কেন হইল তদ্বিষয়ে গুরুতর মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে যে তিনটি বিশিষ্ট মত সাধারণে প্রচলিত প্রথমে তাহাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। (২)

১। কালক্রমে পঞ্চব্রাহ্মণের সন্তানগণ মধ্যে যখন অন্তর্বিচ্ছেদ ঘটিল তখন (মতান্তরে রাজাদেশে) কতক বরেন্দ্রভূমে বাস করিতে লাগিলেন। পরে বাসস্থানের নাম অনুসারে তাঁহারা রাঢ়ীয় অথবা বারেন্দ্র নামে অভিহিত হইলেন।

২। পঞ্চব্রাহ্মণ গৌড়ে অবস্থান করার পর আদিশূর বিবেচনা করিলেন যে, রাঢ়দেশস্থ সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা যদি ইঁহাদিগকে কন্যা সমর্পণ করেন তাহা হইলে ইঁহারা আর স্বদেশে যাইতে ইচ্ছুক হইবেন না। সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা রাজাজ্ঞায় উক্ত ব্রাহ্মণদিগকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। ভট্টনারায়ণ প্রমুখ ব্রাহ্মণেরা শ্বশুরালয়ের সন্নিকটে ধান্যশালী রাঢ়দেশে বসতি করিলেন।

ক্রমে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির মৃত্যু হইলে কান্যকুব্জ দেশবাসী তাঁহাদের পূর্ব্বপক্ষীয় পুত্রেরা তাঁহাদের শ্রাদ্ধ করিলেন, কিন্তু গ্রামবাসী ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের দান গ্রহণ কি অন্নভোজন না করাতে অপমানিত বোধ করিয়া স্ত্রীপুত্রসহ আদিশূরের নিকট আসিলেন। তাঁহারা বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের সহিত রাঢ়দেশে বসতি করিতে অসম্মত হওয়ায় আদিশূর বরেন্দ্রদেশে তাঁহাদের বাসের ব্যবস্থা করিলেন।

৩। আদিশূরের পুত্র ভূশূরের রাজ্যকালে ধর্ম্মপাল গৌড়রাজ্য জয় করায় ভূশূর রাঢ়দেশে আসিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই সময় পঞ্চব্রাহ্মণের যে যে বংশধরগণ রাঢ়দেশে আসিয়া বাস করিলেন, তাঁহারা রাঢ়ীয়—আর যাঁহারা পূর্ব্বনিবাস বরেন্দ্রভূমে রহিলেন তাঁহারা বারেন্দ্র নামে পরিচিত হইলেন।

প্রথম মতটি রাঢ়ীয় এবং দ্বিতীয় মতটি বারেন্দ্র কুলজ্ঞগণের। তৃতীয় মতটি ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর। ৺বসুমহাশয় প্রমাণস্বরূপ ব্রাহ্মণডাঙ্গানিবাসী ৺বংশী বিদ্যারত্ন ঘটকের

(১) ৺নগেন্দ্রনাথ বসু কৃত নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকার বচন (বসু—২, পৃঃ ৪)। 'রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলতত্ত্ব'-এ এডু মিশ্র ও বাচস্পতি মিশ্রের অনুরূপ বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (তত্ত্ব—পৃঃ ১০৩)।

(২) বসু—১ (১১২—৪)

সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ
নাম্নাপি দেশভেদৈস্তু রাঢ়ীবারেন্দ্রসপ্তশতী।"

এবং পাদটীকায় লিখিয়াছেন, 'শ্রীজয়ন্তসুতেন চ' ইহার পরিবর্ত্তে 'আদিশূরসুতেন চ' এইরূপ পাঠান্তর লক্ষিত হয়। (৩)

৺বসুমহাশয় নানাভাবে জয়ন্ত ও আদিশূর যে একই ব্যক্তি তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ৺বংশীবিত্তারত্নের বাটী হইতে সংগৃহীত অন্য একখানি পুঁথিতে যে বসুমহাশয়ের সিদ্ধান্তের সমর্থক নূতন শ্লোক যোজনা করা হইয়াছিল এবং 'আদিশূরসুতেন চ' এইরূপ পাঠান্তর যে পাওয়া যায় নাই তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। (৪) সুতরাং বর্ত্তমানক্ষেত্রে বসুমহাশয়ের উদ্ধৃত শ্লোকটির উপর বিশেষ নির্ভর করা চলে না।

কুলতত্ত্বার্ণব গ্রন্থে যে বিবরণ আছে তাহা ৺বসুমহাশয়ের মতের সমর্থক। (৫) ৺বসুমহাশয় এই গ্রন্থের নাম করেন নাই। এই গ্রন্থখানির হস্তলিখিত পুঁথি বিংশ শতাব্দীর প্রথমে নবদ্বীপে আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯২৭ সনে ইহা মেদিনীপুর ব্রাহ্মণসভা কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে কুলশাস্ত্রসম্বন্ধে যে কয়টি বিষয় লইয়া বাদানুবাদ হয় তাহার মধ্যে অনেকগুলি সমস্যার সমাধানই এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয় এবং তাহা ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর মতের অনুকূল। বিশেষত, এই কুলগ্রন্থে বহু ঘটনারই সঠিক তারিখ দেওয়া আছে। সাধারণত কুলগ্রন্থে এইরূপ ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসৃত হয় না। এই সমুদয় কারণে যদি কেহ এই গ্রন্থের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন তবে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। এই গ্রন্থখানির মূল পুঁথির বিচার আবশ্যক।

যাহা হউক, ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর মত গ্রহণ করিলে আদিশূর খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে বর্ত্তমান ছিলেন ইহা স্বীকার করিতে হয়। এ বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচনা করা গিয়াছে। যত দিন আদিশূরের প্রকৃত কালনির্ণয় না হয় তত দিন ৺বসুমহাশয়ের বা কুলতত্ত্বার্ণবের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। বারেন্দ্রকুলজ্ঞগণের মত স্পষ্টই পক্ষপাতিতাদোষে দুষ্ট—রাঢ়ীয়গণ যে সপ্তশতীকন্যার সন্তান ইহা প্রমাণ করাই তাঁহাদের স্পষ্ট উদ্দেশ্য। এমত স্থলে তাহাও গ্রহণ করা বিধেয় নহে। সুতরাং বর্ত্তমানে প্রথম মতটিই সমীচীন ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কুলগ্রন্থমতে বল্লাল সেনই বাসস্থান অনুসারে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই দুই নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী বিভাগ করেন।

(খ) সাতশতী ব্রাহ্মণ

কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আদিশূরের নিমন্ত্রণে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের ইতিহাস পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিবৃত হইল। কিন্তু এই ব্রাহ্মণেরা আসিবার পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের ইতিহাস সম্বন্ধে কুলগ্রন্থ হইতে বিশেষ কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। কেবল সপ্তশতী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ কুলগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

কান্যকুব্জ-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া কিরূপে ছলে ও কৌশলে আদিশূর তাঁহাকে পরাজিত করেন পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বাচস্পতি মিশ্রকৃত কুলরাম গ্রন্থ হইতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি। (৬)

"দূত বীরসিংহের পত্র আনিয়া আদিশূরকে প্রদান করিলে রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধসজ্জার আদেশ দিলেন। তখন দূত রাজাকে বলিল, 'আমার এই যুক্তি যে আপনি কতকগুলি ব্রাহ্মণকে বৃষে আরোহণ করাইয়া যুদ্ধে পাঠাইয়া দিন। তাঁহারা বীরসিংহের রাজ্য আক্রমণ করিলেও গোব্রাহ্মণে ভক্তিপরায়ণ রাজা বীরসিংহ কখনই তাঁহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইবেন না।' তখন রাজা নিজদেশস্থ নিরগ্নিক ব্রাহ্মণদিগকে বীরসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, 'গবারোহণ শাস্ত্রসঙ্গত নহে, সুতরাং আমরা এই কার্য্যে সম্মত হইতে পারি না।' তখন রাজা বলিলেন যে, 'আপনারা যদি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে পারেন তবে আপনাদিগকে এই দোষ হইতে মুক্ত করিয়া দিব ইহা অঙ্গীকার করিতেছি।'

(৩) বসু—১ (১১৪)
(৪) ভারতবর্ষ—১৩৪৬ বঙ্গাব্দ, কার্ত্তিক পৃঃ ৬৬০
(৫) শ্লোক ৯৪—৯৭

(৬) বসু—১ (৮০—৮২)

কার্য্যসিদ্ধি করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে এই সাতশত ব্রাহ্মণ সাতশতী নামে খ্যাত হন।"

কোন কোন কুলগ্রন্থকার বলেন যে, আদিশূর অস্পৃশ্য ও হীনজাতীয় সাত শত লোককে ব্রাহ্মণবেশে গো বাহনে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া যুদ্ধে প্রেরণ করেন। পরে আদিশূর কৃতকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাহারা সংখ্যা অনুসারে সাতশতী ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হইল। (৭)

এড়ুমিশ্র বলেন যে, বল্লাল সেন চণ্ডীকে আরাধনায় তুষ্ট করিয়া এই বর প্রার্থনা করেন যেন তিনি ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিতে পারেন। চণ্ডী তাঁহাকে বর দিলেন, 'এখন হইতে দুই প্রহরের মধ্যে তুমি যাহাকে ইচ্ছা ব্রাহ্মণ করিতে পার, আমার বরে তাহারা ব্রাহ্মণ-সমাজে গৃহীত হইবে।' রাজা দেবীর বরে সপ্তশত ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিলেন। (৮)

৺লালমোহন বিদ্যানিধি (৯) ও ৺নগেন্দ্রনাথ বসু (১০) বলেন যে আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়ন কালে গৌড়ে সাতশত (বিদ্যানিধির মতে সাড়ে সাতশত) ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের বেদাধিকার ছিল না। সুতরাং কনোজগত ব্রাহ্মণদের সহিত পার্থক্য রাখিবার জন্য তাঁহাদের সাতশতী এই আখ্যা হয়। কিন্তু পরে ৺বসুমহাশয় এই মত পরিবর্ত্তন করেন। ৺বংশী বিদ্যারত্ন ঘটকের সংগৃহীত কুলপঞ্জিকাধৃত

'ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ
নাম্নাপি দেশভেদৈস্ত রাঢ়ীবারেন্দ্র সাতশতী।'

এই শ্লোকটির উপর নির্ভর করিয়া তিনি বলেন যে, কনোজ ব্রাহ্মণগণ যেমন রাঢ়ে ও বারেন্দ্রে বাস করায় রাঢ়ী ও বারেন্দ্র আখ্যা লাভ করেন, বঙ্গের সারস্বত ব্রাহ্মণগণও সেইরূপ রাঢ় দেশের পূর্ব্বাংশে সপ্তশতিকা নামক জনপদে বাস করায় 'সপ্তশতী' বা 'সাতশতী' নামে আখ্যাত হইলেন। বসু মহাশয় বলেন এই সপ্তশতিকা জনপদের কতকাংশ এখন বর্দ্ধমান্ জেলায় 'সাতশতকা' বা 'সাতশইকা' পরগণায় পরিণত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান সীমা উত্তরে ব্রহ্মাণী নদী, দক্ষিণপূর্ব্ব সীমা ভাগীরথী ও পশ্চিমে সাহাবাদ পরগণা।(১১) যে শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া বসুমহাশয় উপরোক্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন পূর্ব্বেই তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। বিশেষত দানসাগরে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, বল্লাল সেনের গুরু বারেন্দ্রবাসী অনিরুদ্ধ ভট্টও সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং বসু মহাশয়ের মতে বরেন্দ্রেও সাতশতী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। (১২)

বসুমহাশয়ের মতে এই সাতশতী ব্রাহ্মণগণ পুরাকালে সরস্বতী নদীর তীরে বাস করিতেন, সেখান হইতে গৌড়-মণ্ডলে আগমন করেন। (১৩) অবশ্য আর্য্যজাতি মাত্রেই এককালে সরস্বতী নদীর তীরে বাস করিতেন, পরে বঙ্গে আসেন ইহা একটি ঐতিহাসিক মত। কিন্তু তদনুসারে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ মাত্রেই সারস্বত বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য। কিন্তু কেবল এক শ্রেণীর প্রাচীন ব্রাহ্মণগণই কি বিশেষ কারণে সারস্বত বলিয়া গণ্য হইলেন বসুমহাশয় তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই বা তাহার সমর্থনকল্পে কোনরূপ প্রমাণ দেন নাই।

কিন্তু এখানেও নগেন্দ্রবাবুর সিদ্ধান্তের সমর্থক কতকগুলি শ্লোক কুলতত্ত্বার্ণবে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে পুরাকালে অপুত্রক অঙ্গরাজ শূদ্রক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার জন্য রমণীয় সারস্বত দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া ব্রাহ্মণ-বর্জ্জিত বঙ্গদেশে স্থাপিত করিয়াছিলেন। (১৪) কিন্তু সপ্তশতী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি বিষয়ে কুলতত্ত্বার্ণবে বাচস্পতি মিশ্রের কাহিনীই সমর্থিত হইয়াছে। (১৫)

সুতরাং কুলতত্ত্বার্ণব মতে সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণও আদিতে শূদ্রক রাজা কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে আনীত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের বহু পূর্ব্বে ঠিক একই কারণে সারস্বতগণও অন্য এক রাজা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণবর্জ্জিত বঙ্গদেশে আনীত হইয়াছিলেন।

---

(৭) ধ্রুবানন্দ (বসু ১, পৃঃ ৭৮)
(৮) বসু—১ (৭৯)
(৯) সং নিং (৫১, ২৮৪)
(১০) বসু—১ (৮৪)
(১১) বসু—১ (১১৪—৫)
(১২) বসু—১ (৯২)
(১৩) বসু—১ (১১৫)
(১৪) শ্লোক ১১—২
(১৫) শ্লোক ৩৭—৪৯

'ব্রাহ্মণ-বর্জ্জিত' এই বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া কুলগ্রন্থকার সারস্বতের পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় অন্য কোন ব্রাহ্মণের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা করিবার দায় হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

নুলো পঞ্চাননের নিম্নলিখিত উক্তি হইতে অনুমিত হয়—যে সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ খুব আচার ও নিষ্ঠাবান ছিলেন না এবং শূদ্রের যজনযাজন করিতেন।

'সাতশতী দ্বিজগণে পটু শূদ্রের যাজনে
নাহি যাতে বেদ অনুষ্ঠান ॥
বিধিসিদ্ধ ক্রিয়াদায় শূদ্রেও যে গোত্র পায়
যে যায় চরণে লয় স্থান ॥
... ...
সাতশতী দ্বিজ যারা আগে শূদ্রজাতি ধারা
যেহেতু ব্রাহ্মণ্যে ছিল বাম ॥" (১৬)

আদিশূর পালবংশের অবসানকালে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন—এই মত গ্রহণ করিলে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে সুদীর্ঘ বৌদ্ধ রাজত্বের ফলে বাংলার ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আচার ও জাতিভেদের কঠোরতা অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়াছিল।

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই সাতশতী ব্রাহ্মণের প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব্ব হয়। প্রকৃতিও যেন আদিশূরের সহিত যোগ দিয়া তাঁহাদের সহিত শত্রুতা সাধিয়াছেন। একদিকে পাঁচ জন ব্রাহ্মণের সন্তান সন্ততি অনতিকাল মধ্যে রাঢ় দেশ ছাইয়া ফেলিল, অন্যদিকে সাতশত ব্রাহ্মণ যেন ক্রমশ নির্ব্বংশ হইয়া ধরাধাম হইতে লুপ্তচিহ্ন হইল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ'-প্রণেতা বলেন—'যদি ভট্টনারায়ণ প্রমুখ বিপ্রপঞ্চক অথবা তাঁহাদের সন্তানেরা সপ্তশতী কন্যা গ্রহণ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে এত অল্প সময়ে এতাদৃশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া সম্ভবপর বলা যাইতে পারে না। বারেন্দ্র কুলজ্ঞেরা অবিশেষে সমুদয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকে সপ্তশতী দৌহিত্র কহেন; তাহা অত্যুক্তি বলিয়া স্বীকার করিলেও কিয়ৎ পরিমাণে সপ্তশতী দৌহিত্র রাঢ়ীয় দলে যে আছেন তৎপ্রতি আপত্তি হইতে পারে না।' একথা সত্য হইলেও ইহা সাতশতী ব্রাহ্মণের লোপ হওয়ার সুসঙ্গত কারণ বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না। উক্ত গ্রন্থকার আরও বলেন যে, 'অনেক সপ্তশতী ব্রাহ্মণ রাঢ়ীয় কুলে প্রবেশ করিয়াছেন; অদ্যাপি তাহাদিগকে চেনা যায়'। (১৭)

৺লালমোহন বিদ্যানিধিও এই মত পোষণ করেন। তিনি আরও বলেন যে, 'বৈদিকদিগের গোত্রের সঙ্গে সাতশতীদিগের গোত্রের সাদৃশ্য ও প্রথার ঐক্য থাকায় অনেক স্থলে বৈদিক কুলে মিলন সহজ হইয়াছিল।' (১৮) ইহাই সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের লোপের প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ ধীরে ধীরে তাঁহারা রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক, শাকদ্বীপী প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের সমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছেন।

বারেন্দ্র ঘটকেরা বলেন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা সাতশতীর কন্যা বিবাহ করিয়াছেন; আবার রাঢ়ীয় ঘটকেরা বলেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা সাতশতীর কন্যা বিবাহ করিয়াছেন। (১৯) বিদ্বেষপ্রসূত হইলেও এই উভয় উক্তিই সত্য বলিয়া মনে হয়। সাতশতী ব্রাহ্মণের প্রকৃত ইতিহাস অজ্ঞাত থাকিলেও একথা সহজেই গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, তাঁহারাই বঙ্গের আদিম ব্রাহ্মণ এবং ক্রমে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদের সহিত আদান-প্রদান করিয়া অনেকাংশে তাঁহাদের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। স্বল্পসংখ্যক যে কয়ঘর ব্রাহ্মণ এরূপে মিশিতে পারেন নাই তাঁহারাই এখনও সাতশতী নামে পরিচিত। এ বিষয়ে নুলো পঞ্চাননের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি প্রণিধানযোগ্য। (২০)

'শুন রাঢ়ী বারেন্দ্রে সাতশতী বিচার।
কেহ আগে কেহ পাছে এই মাত্র সার ॥
কহে সাতশতীগণে সে ব্রাহ্মণ্য পেয়ে।
কান্যকুব্জের বিবাহে সাতশতীর মেয়ে ॥
অতএব সাতশতী হেয় নয় মান্য।
সুবুদ্ধিতে এই কথা নাহি গণে অন্য ॥
...

(১৬) বসু—১ (৯৫)

(১৭) গৌ—ব্রা (৫৮—৫৯)
(১৮) সং নিঃ (৫২, ২৮৪—৮৮)
(১৯) বসু—১ (৮৯—৯৩)
(২০) বসু—১ (৮৫)

কান্যকুব্জ তেজীয়ান নয় সাতশতী।
মূর্খ নিন্দুক দেখুক তায় যে কি ক্ষতি ॥
সাতশতীর প্রভা।
কান্যকুব্জের আভা ॥
...
এরা আদান প্রদানে সাতশতী দলে।
মিশে বৈদিক বারেন্দ্রে আর উত্তরে বলে ॥
...
পঞ্চ দ্বিজ সপ্তশতী মিশে উত্তরেতে।
উত্তরে বারেন্দ্র তারা রৈল দক্ষিণেতে ॥'

ঢুলো পঞ্চানন লিখিয়াছেন যে, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণের অধস্তন চতুর্দ্দশ পর্য্যায়ভুক্ত অর্জ্জুন মিশ্র এক সাতশতী কন্যার রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। সেই অবধি সাতশতীরা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের দলে মিশিতে থাকে। (২১)

দেবীবরের মেলবন্ধনকালে অনেক কুলীনই সপ্তশতীর কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। দেবীবর সেই সকল দোষকে গুণ বলিয়া গণ্য করেন। কুলচন্দ্রিকাকার লিখিয়াছেন—

'শুদ্ধ হতে অতি শুদ্ধ সপ্তশতী ভাব।
যাহা হতে মেল সব পাইল স্বভাব ॥' (২২)

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের ন্যায় সাতশতী ব্রাহ্মণদেরও গাঞি আছে—অর্থাৎ তাঁহারাও রাজদত্ত গ্রাম লাভ করিয়া তন্নামে পরিচিত হইয়াছেন। ৺লালমোহন বিদ্যানিধি বলেন, ইহারই আদর্শে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণকে পৃথক্ পৃথক্ গ্রাম দেওয়া হয়। বিদ্যানিধি বলেন যে, সাতশতীগণের চল্লিশটি গাঁই এবং প্রত্যেক গাঁই প্রায় পৃথক পৃথক গোত্রসম্ভূত। প্রমাণস্বরূপ বিদ্যানিধি ঢুলো পঞ্চানন ও বাচস্পতি মিশ্রের উক্তি উদ্ধৃত করেন।(২৩) কিন্তু ৺নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, 'সম্বন্ধনির্ণয়কার', বাচস্পতি মিশ্রের নাম দিয়া যে ৪০টি গাঞি উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম প্রভৃতি গ্রন্থে ২৮ ব্যতীত অবশিষ্টগুলির সন্ধান পাইলাম না।' ৺বসু মহাশয় বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম হইতে একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—তাহার সারমর্ম্ম এই যে, বৃষারোহণাদি কুকর্ম্মের ফলে সাতশত ব্রাহ্মণের অনেকেরই মৃত্যু হইয়াছিল, কেবল ২৮জন মাত্র জীবিত ছিলেন এবং রাজা সেই ২৮জনকে গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ৺বসু মহাশয় বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম ও দেবীবরের মেলপর্য্যায় গণনা হইতে এই ২৮খানি গ্রামের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (২৪) সাতশতী ব্রাহ্মণগণের গাঞির সংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের সমাধানকল্পে ৺বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, 'আমাদের বিশ্বাস প্রথমে ২৮টি গাঞিই ছিল; পরবর্ত্তীকালে তাহাদের বংশধরগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিয়া রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণের অনুকরণে স্ব স্ব বাসস্থানের নামানুসারে গাঞি স্বীকার করেন, তাহাতেই সপ্তশতীগণের মধ্যে গাঞির সংখ্যা বাড়িয়া যায়।' (২৫) এই অনুমান অসঙ্গত নহে, কিন্তু বাচস্পতি মিশ্রের দুই বিভিন্ন উক্তির সামঞ্জস্য করিতে হইলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে প্রসিদ্ধ কুলাচার্য্যের নামে অনেক আধুনিক প্রক্ষিপ্ত উক্তি কুলগ্রন্থে প্রবেশলাভ করিয়াছে। ৺বসু মহাশয় পরবর্ত্তীকালে পূর্ব্বমত পরিহার করিয়া বলেন, সপ্তশতীগণ বহু পূর্ব্বেই রাজা আদিশূরের নিকট শাসন গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই পরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগকে যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া স্ব স্ব অধিকার মধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। (২৬)

(গ) বৈদিক ব্রাহ্মণ (২৭)

বঙ্গদেশীয় বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও রাঢ়ী ও বারেন্দ্র বহু প্রসিদ্ধ বংশের গুরুপদে অধিষ্ঠিত থাকায়

(২১) বসু—১ (৯৫)

(২২) বসু—১ (৯৩)

(২৩) সং নিং (২৮৫—৮৮)

(২৪) বসু—১ (৮২, ৮৭)। কিন্তু অন্যত্র ৺বসুমহাশয় লিখিয়াছেন যে,'আদিশূর বা তৎপুত্র ভূশূরের সময় সাতশতীগণের গাঞি নিরূপিত হয় নাই। ক্ষিতিশূরের সময় তাঁহারই যত্নে প্রথমে ২৮টি এবং তাঁহার মৃত্যুর বহু শতবর্ষ পরে আরও কতকগুলি গাঞির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। (বসু—১, পৃঃ ১২৫)।

(২৫) বসু—১ (৮৮)

(২৬) বসু—২ (১১—১২)। বিভিন্ন কুলগ্রন্থে এইরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত মতের উল্লেখ থাকায় কুলগ্রন্থের ঐতিহাসিকতায় বিশ্বাস করা যে কঠিন—আশা করি সকলেই তাহা স্বীকার করিবেন।

(২৭) বৈদিক ব্রাহ্মণদের কুলগ্রন্থের মধ্যে ৺নগেন্দ্রনাথ বসু নিম্নলিখিতগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রথম দুইখানি গ্রন্থই

তাঁহারা বিশেষ সম্মানভাজন। বৈদিকেরা দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য এই দুই ভাগে বিভক্ত। ইঁহাদের কোন গাঁই নাই—ইঁহারা নির্গাই বলিয়া পরিচিত।

দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের মতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা উৎকল দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশ হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে বসবাস করেন। ইঁহারা বলেন যে, আর্য্যাবর্ত্তে মুসলমানদিগের রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইলে সেখানে বেদাদি শাস্ত্রচর্চ্চার ক্রমশ হ্রাস হইল, কিন্তু দ্রাবিড়াদি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বেদের বিলক্ষণ চর্চ্চা থাকায় বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে সাদরে স্বদেশে বাস করাইলেন। এই উক্তির সমর্থনকল্পে হলায়ুধ-কৃত 'ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব'-এর নিম্নলিখিত উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

'তত্র কলৌ আয়ুং প্রজোৎসাহশ্রদ্ধাদীনামল্পত্বাদ্ উৎকল-পাশ্চাত্যাদিভির্বেদাধ্যয়নমাত্রং ক্রিয়তে। রাঢ়ীয়বারেন্দ্রৈস্তু অধ্যয়নাদ্বিনা কিয়দেকবেদার্থকর্ম্মমীমাংসাদ্বারেণ যজ্ঞে ইতি-কর্ত্তব্যতাবিচারঃ ক্রিয়তে।'

দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ বেদশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু তৎকালে বঙ্গদেশে তান্ত্রিকমত প্রবল হওয়ায় তাঁহারা বৈদিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানেরও প্রচলন করেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে তন্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইয়াছিলেন এরূপ প্রবাদ আছে এবং এইজন্যই ইঁহারা রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের গুরুপদ লাভ করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন যে কালক্রমে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের ফলে ইঁহাদের মধ্যে বেদচর্চ্চা ও বৈদিক অনুষ্ঠানের হ্রাস হওয়ায় আর এক শ্রেণীর বৈদিক ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আগমন করেন। পশ্চাদ্বর্ত্তীকালে অথবা পশ্চিম দেশ হইতে আগমন করেন বলিয়াই ইঁহারা পাশ্চাত্য বৈদিক নামে অভিহিত হন।

পাশ্চাত্য বৈদিকগণের কুলগ্রন্থে তাঁহাদের বঙ্গদেশে আগমন ও বাস স্থাপন সম্বন্ধে যে আখ্যান লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা সংক্ষেপত এই:

গৌড়দেশের রাজা শ্যামল বর্ম্মা বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময় কান্যকুব্জে (মতান্তরে কাশীতে) রাজা হরিহরের পুত্র মহারাজ নীলকণ্ঠ রাজত্ব করিতেন। শ্যামল বর্ম্মা নীলকণ্ঠের কন্যাকে বিবাহ করেন।

একদিন শ্যামল বর্ম্মার রাজপ্রাসাদে একটি শকুনি আসিয়া পড়ায় এই অমঙ্গল ক্রিয়ার জন্য শান্তি-যজ্ঞ করার আবশ্যক হইল। গৌড়বাসী ব্রাহ্মণগণ নিরগ্নিক, তাই শ্যামলবর্ম্মা সস্ত্রীক শ্বশুরের নিকট গিয়া কর্ণাবতীবাসী শুনক গোত্রীয় যশোধর মিশ্র ও অন্য চারিজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া ১০০১ শকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই ব্রাহ্মণগণের নাম বেদগর্ভ, গোবিন্দ, জিতমিশ্র (মতান্তরে জিতামিত্র অথবা বিশ্বজিৎ) ও পদ্মনাভ। ইঁহারা যথাক্রমে শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ গোত্রীয়। যজ্ঞ সমাপনান্তে শ্যামল বর্ম্মা গ্রামাদি দান করিয়া তাঁহাদিগকে এই দেশে প্রতিষ্ঠা করাইলেন।

মোটামুটি বিবরণটি এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন কুলগ্রন্থে অনেক বিষয়ে মতভেদ আছে। ইহার মধ্যে যে কয়টি গুরুতর তাহা বিষয়ানুক্রমে পৃথকভাবে আলোচিত হইল।

১। শ্যামল বর্ম্মার পরিচয় (২৮)

১। চন্দ্রবংশে ত্রিবিক্রম রাজার পুত্র বিজয় সেন। বিজয় সেন রাণী মালতীর গর্ভে মল্ল ও শ্যামল নামে দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। মল্ল বর্ম্মা পিতৃরাজ্য লাভ করেন। শ্যামল বর্ম্মা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বহু রাজাকে পরাজিত

১। ঈশ্বর বৈদিক—পাশ্চাত্য কুলপঞ্জী

২। রাঘবেন্দ্র কবিশেখর—ভবভূমি বার্ত্তা বা কোটালিপাড়া সমাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৩। নীলকণ্ঠ—যশোধর বংশমালা (শুনকবংশকারিকা)

৪। রামদেব বিদ্যাভূষণ—বৈদিক কুলমঞ্জরী

৫। রামভদ্র বাচস্পতি—পাশ্চাত্য বৈদিক কুলদীপিকা

৬। লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতি—সদ্বৈদিক কুলপঞ্জিকা

৭। পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকা

৮। (বিক্রমপুরের) সদ্বৈদিক কুলপঞ্জিকা

এই সমুদয় কুলগ্রন্থ ব্যতীত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ শ্যামল বর্ম্মার একখানি তাম্রশাসনের উল্লেখ করেন। এই তাম্রশাসনে শ্যামল বর্ম্মা কর্ত্তৃক যশোধরের আনয়ন সম্বন্ধে কুলগ্রন্থোক্ত আখ্যান সমর্থিত হইয়াছে, এমন কি প্রাসাদোপরি শকুন পতনের জন্য যজ্ঞ বিধানের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। 'বৈদিক কুলপঞ্জিকায়' এবং 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' নামক গ্রন্থে (২১১—১৪) এই লিপির পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে। 'সামন্তচূড়ামণি-মুখ নির্গত তাম্রশাসন শ্লোক' এই নামে সম্বন্ধনির্ণয়ে (৪৮—৫০) ইহার কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। মূল তাম্রশাসনখানির সন্ধান না পাইলে এই সমুদয় পাঠের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

করেন এবং গৌড়ের অন্তর্গত বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করেন।

—নগেন্দ্রনাথ বসু ধৃত রামদেবের বৈদিক কুলমঞ্জরী।

২। ঈশ্বর কৃত বৈদিক কুলপঞ্জীতে ত্রিবিক্রমের রাজধানী স্বর্ণরেখ নদীতীরে কাশীপুরী সমীপে বলিয়া উল্লিখিত। তাঁহার মহিষীর নাম মালতী এবং বিজয় সেনের মহিষীর নাম বিলোলা। শ্যামল বর্ম্মা বঙ্গদেশীয় শত্রু জয় করিয়া রাজ্যলাভ করেন।

৩। পাশ্চাত্য বৈদিক কুলদীপিকায় শ্যামল বর্ম্মার পিতৃপুরুষের কোন পরিচয় নাই। তিনি গৌড়দেশের রাজা বলিয়া উল্লিখিত।

৪। পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকা মতে শ্যামল বর্ম্মা শূরবংশীয় বিজয়ের পুত্র এবং ৯৯৪ শকাব্দে রাজা হইয়াছিলেন।

৫। গঙ্গার পূর্ব্বে, মেঘনার পশ্চিমে, লবণ সমুদ্রের উত্তর এবং বারেন্দ্রের দক্ষিণে শ্যামল বর্ম্মা সেনবংশীয় নৃপতির আশ্রয়ে করদরূপে রাজ্যশাসন করিতেন।

—নগেন্দ্রনাথ বসু ধৃত সামন্তসারের বৈদিক কুলার্ণব।

ব্রাহ্মণগণের আগমন

ব্রাহ্মণ আনয়নের কারণ এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম ও গোত্র সম্বন্ধে প্রায় সকল কুলগ্রন্থই একমত। (২৯) তবে ঈশ্বর বৈদিককৃত কুলপঞ্জীমতে শ্যামল বর্ম্মার বিবাহের পরই তাঁহার শ্বশুর যশোধর নামক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে তাঁহার সহিত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যশোধর যজ্ঞ সমাপন করিলে রাজা তাঁহাকে সামন্তসার গ্রাম দান করেন। পরে যশোধরের পুত্র কন্যাদির বিবাহের জন্য তাঁহার অনুরোধে রাজা আরও চারিজন ব্রাহ্মণকে আনাইলেন। (৩০)

মহাদেব শাণ্ডিল্যকৃত 'সম্বন্ধ তত্ত্বার্ণব' অনুসারে শ্যামল বর্ম্মা কেবলমাত্র যশোধরকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহার দ্বারাই যজ্ঞাদি সম্পন্ন করেন। অতঃপর যশোধরকে বঙ্গদেশে বাস করিতে অনুরোধ করিলে তিনি এদেশে অন্য সাগ্নিক ব্রাহ্মণ নাই এইজন্য অমত করেন। তখন রাজা সাগ্নিক ব্রাহ্মণদের বসবাসের জন্য স্থান দিতে অঙ্গীকার করায় যশোধর বহু প্রলোভন দেখাইয়া অন্য চারিজন ব্রাহ্মণকে স্ত্রীপুত্রসহ ১০০২ শাকে এদেশে আনয়ন করেন। (৩১)

রামভদ্রের বৈদিক কুলদীপিকা অনুসারে যশোধর মিশ্র একাকীই শ্যামল বর্ম্মার যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া কিছুকাল গৌড়ে বাস করিয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু গৌড়দেশে আগমন হেতু দেশবাসীর নিকট অনাদৃত হওয়ায় নিজ ভ্রাতা ও অপর চারি গোত্রের চারিজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় গৌড়ে আসিলেন। (৩২)

ঈশ্বর বৈদিকের প্রাচীন কুলপঞ্জীমতে শেষোক্ত চারিজন ব্রাহ্মণ বিক্রমপুরে উপস্থিত হইলে শুষ্ক কাষ্ঠ পল্লবিত ও ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়াছিল। (৩৩)

বৈদিক ব্রাহ্মণ আগমনের সময়

অধিকাংশ কুলগ্রন্থমতে ১০০১ শাকে যশোধর বঙ্গে আগমন করেন। কিন্তু ঈশ্বরের বৈদিক কুলপঞ্জীতে উল্লিখিত হইয়াছে যে শ্যামল বর্ম্মা ১১৬৪ শাকে কনোজস্থিত ব্রাহ্মণ-দিগকে এদেশে আনিয়া ধনরত্ন, বসনভূষণ ও গ্রাম প্রভৃতি দিয়া তাঁহাদিগকে বাস করাইয়াছিলেন। ৺নগেন্দ্রনাথ বসু এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, এখানে ১১৬৪ শাককে শকাব্দ না ধরিয়া বিক্রমাব্দ ধরিলে অন্যান্য কুলগ্রন্থের সহিত সামঞ্জস্য থাকে। অর্থাৎ ১০০১ শাকে যশোধর এদেশে আসেন এবং ১০২৯ শাকে (১১৬৪ বিক্রম সংবতে) তাঁহার পুত্রকন্যারা বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অপর চারি গোত্রের চারিজন ব্রাহ্মণ আনয়নের ব্যবস্থা হয়। (৩৪)

এদেশে বৈদিক ব্রাহ্মণের আগমন সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে যে বিবরণ পাওয়া যায় উপরে তাহার আলোচনা করা হইল। কিন্তু ৺নগেন্দ্রনাথ বসু 'রাঘবেন্দ্র কবিশেখর কর্ত্তৃক ১৫৮২ শকে রচিত 'কোটালিপাড়া সমাজের বিবরণ' নামক এক নূতন গ্রন্থের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া এ সম্বন্ধে নূতন তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন। এই নূতন গ্রন্থে প্রাপ্ত রাঘবেন্দ্রের বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি :

---

(২৯) কিছু কিছু মতভেদও আছে। বসু—৩, পৃঃ ৩৯ দ্রষ্টব্য

(৩০) বসু—৩ (১৬)

(৩১) বসু—৩ (২৮)

(৩২) বসু—৩ (৩০—৩৩)

(৩৩) বসু—৩ (৪০)

(৩৪) বসু—৩ (৩৯)

'আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা সরস্বতী তীর আশ্রয় করিয়া যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে রত থাকিতেন। তৎকালিক রাজার প্রতিই তাঁহাদের ভরণপোষণের ভার ন্যস্ত ছিল। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ ব্রাহ্মণগণ রাজার বিঘ্ন উপস্থিত এবং যবন আগমনের আশঙ্কা জানিতে পারায় অনেক ব্রাহ্মণই সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করিলেন। কর্ণাবতী-নিবাসী গঙ্গাগতি বৈষ্ণবমিশ্র স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা ও ভৃত্যাদি সহ বারাণসী গয়া প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া বঙ্গদেশে আসিলেন এবং কোটালিপাড়ায় ঘর্ঘর নদের তীরে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন।

'এইখানে গঙ্গাগতির একটি কন্যা জন্মিল। এই কন্যার বয়স যখন আটবৎসর হইল তখন গঙ্গাগতি পাত্রানুসন্ধানে কান্যকুব্জে গমন করিয়া যশোধর মিশ্রের সহিত কন্যার সম্বন্ধ স্থির করিলেন। কোটালিপাড়া ফিরিবার পথে তিনি বঙ্গ-দেশের রাজা হরি বর্ম্মের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং হরি বর্ম্ম কোটালিপাড়ায় তাঁহার বাসস্থান ও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি তাঁহাকে দান করেন। কিয়দ্দিন পরে যশোধর ও গুরু পুরোহিতাদি সহ কোটালিপাড়ায় উপস্থিত হইলেন এবং গঙ্গাগতির কন্যাকে বিবাহ করিলেন। তৎপর যশোধর কান্যকুব্জে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে মাতা, পুরোহিত, বন্ধু ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন ও তাহাদের পুত্র-কন্যাদি সহ কোটালিপাড়ায় ফিরিয়া আসিলেন। ইঁহারা সকলেই কোটালিপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। যশোধরের আগমনের অষ্টম বর্ষে তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কান্যকুব্জ ও অন্যান্য দেশ হইতে যে সমুদয় ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারাও কোটালিপাড়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিলেন। এইরূপে কোটালিপাড়া গ্রাম বৈদিক ব্রাহ্মণের বৃহৎ আবাস-স্থান হইয়া উঠিল'। (৩৫)

৺নগেন্দ্রনাথ বসু প্রচলিত কুলগ্রন্থের বিবরণ অগ্রাহ্য করিয়া উল্লিখিত বিবরণই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে রাজা হরিবর্ম্মার সময়েই পাশ্চাত্যবৈদিক ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন। 'যবনাগমন আশঙ্কা' এই উক্তি হইতে বসু মহাশয় অনুমান করেন যে—যে সময় সুলতান মামুদ কান্যকুব্জ জয় করেন সেই সময়েই গঙ্গাগতি বঙ্গদেশ অভিমুখে প্রস্থান করেন। গঙ্গাগতি হরিবর্ম্মদেবের সভায় বাচস্পতি মিশ্রকে দেখিয়াছিলেন। বসু মহাশয় বলেন, এই বাচস্পতিই ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তির রচয়িতা বাচস্পতি এবং তিনিই ৮৯৮ শকে ন্যায়সূচী নিবন্ধ রচনা করেন। কোন কোন কুলগ্রন্থে কাশী অথবা কান্যকুব্জ রাজার নাম জয়চন্দ্র লিখিত আছে। ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে এই জয়চন্দ্রই কান্যকুব্জরাজ জয়পাল। ১০১৯ খৃষ্টাব্দে মামুদ কান্যকুব্জ জয়ে অগ্রসর হন। বসু মহাশয় অনুমান করেন যে ১০২১ খৃষ্টাব্দে (৯৪৩ শাকে) গঙ্গাগতি বৈষ্ণবমিশ্র বঙ্গদেশে আগমন করেন। (৩৬)

বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আগমনের কারণ ও সময় সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা করিতে হইলে আদিশূরকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়নের সময় নির্দ্ধারণ করা দরকার। কারণ যদি একথা বিশ্বাস করা যায় যে, আদিশূর শকাব্দের দশম শতাব্দীর শেষভাগে কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, তাহা হইলে তাহার অনতিকাল পরেই (এমন কি তিন-চারি বৎসরের মধ্যেই) বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাবে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়নের আবশ্যকতা স্বীকার করা কঠিন। সুতরাং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাবে রাজা শ্যামলবর্ম্মা অথবা হরিবর্ম্মা কর্ত্তৃক বৈদিক ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনীত হইয়াছিলেন এই মত যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়ন ইহার তিনশত বৎসর পূর্ব্বে (বাচস্পতি মিশ্র ও বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা অনুযায়ী ৬৫৪ শকে) হইয়াছিল, ইহাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

শ্যামলবর্ম্মা কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চ গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণেরা কালক্রমে বেদজ্ঞানবিমূঢ় হওয়াতে ১১০২ শকাব্দে অন্য ষড় গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা আসিয়া বৈদিককুলে মিলিত হন। (৩৭)

পরে ১৪০৩ শকাব্দে কান্যকুব্জ হইতে অন্য ছয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালাদেশে বসতি করেন। (৩৮)

শাকদ্বীপীব্রাহ্মণ (৩৯)

বঙ্গদেশে গ্রহবিপ্র নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন।

(৩৫) বসু—৩ (পৃঃ ৩/—৬৷৶০)

(৩৬) বসু—৩ (পৃঃ ৬৸৶—৭৲)

(৩৭) গৌ-বা (২০৫)

(৩৮) গৌ-বা (২০৬)

(৩৯) শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের নিম্নলিখিত কুলগ্রন্থগুলি ৺নগেন্দ্র-নাথ বসু উল্লেখ করিয়াছেন। ১। রাঢ়ীয় শাকলদীপিকা ২। কলানন্দের কারিকা ৩। মহাদেব কারিকা ৪।

তাঁহারা শাকদ্বীপবাসী বলিয়া পরিচিত। কোন্ সময়ে তাঁহারা শাকদ্বীপ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে বঙ্গদেশে তাঁহাদের বসতিস্থান বিষয়ে কুলগ্রন্থে কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়।

এই গ্রহবিপ্র সমাজ প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত—রাঢ়ীয় ও নদীয়া-বঙ্গ সমাজ।

৺নগেন্দ্রনাথ বসু ধৃত রাঢ়ীয় শাকলদ্বীপিকার উক্তি অনুসারে শাকদ্বীপে মার্কণ্ডাদি আটজন মুনি ছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ গ্রহচালনা করিতেন এবং গ্রহদানগ্রহণ করায় গ্রহবিপ্রনামে খ্যাত হইয়াছিলেন। গরুড় শাকদ্বীপে গিয়া বরাহাদি আটজন গ্রহবিপ্র আনয়ন করিয়াছিলেন। এই অষ্ট ব্যক্তির বংশধর পৃথু ইত্যাদি দশজন মধ্যদেশ হইতে গৌড়ে আগমন করেন, ইঁহাদের বংশধরগণ গৌড়ীয় গ্রহবিপ্র বলিয়া খ্যাত। (৪০)

কোন্ সময়ে পৃথু প্রভৃতি দশজন গৌড়ে আগমন করেন কুলগ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই। তবে ৺নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, 'কুলগ্রন্থ হইতে পৃথু, নৃসিংহ ও লোকনাথ এই গ্রহবিপ্রত্রয়ের বংশাবলী আলোচনা করিলে এখন হইতে প্রায় পাঁচ শত বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহাদের গৌড়াগমন কাল ধরিয়া লওয়া যায়।' (৪১)

নদীয়াবঙ্গ সমাজের কুলপঞ্জিকায় উক্ত হইয়াছে যে, গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক রোগাক্রান্ত হইয়া বৈদ্যগণের চিকিৎসায় সুফল না পাওয়ায় সরযূনদীর তীরবাসী জপযজ্ঞপরায়ণ বিষ্ণু সনাতন প্রভৃতি দ্বাদশজন ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহাদের দ্বারা গ্রহযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া রোগমুক্ত হন। অতঃপর রাজার আদেশে ঐ বিপ্রগণ সপরিবারে গৌড়দেশে বাস করেন। তাঁহাদের জ্যোতিঃশাস্ত্রপরায়ণ তনয়গণ এই গ্রহের দান গ্রহণ করিয়া গ্রহবিপ্রনামে কথিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা রাঢ় ও বঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। এবং স্থানভেদে তাহাদের কতিপয় সমাজ হইয়াছে।

—উমেশচন্দ্রশর্ম্মাধৃত মহাদেবকারিকা, উমেশচন্দ্রের কারিকা ও রামদেবের কুলপঞ্জী। (৪২)

বারেন্দ্র শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ সমাজের কুলপরিচায়ক পাতড়া হইতে তাহাদের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা উল্লিখিত বিবরণের অনুরূপ। সুতরাং ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, নদীয়া-বঙ্গ সমাজ ও বরেন্দ্র সমাজের শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ মূলত একই বংশ হইতে উদ্ভূত। ইদানীং নদীয়া-বঙ্গ সমাজস্থ কোন কোন ব্রাহ্মণ নিজেকে শাকদ্বীপী হইতে ভিন্ন ও সরযূপারী নামে এক স্বতন্ত্র শাখার গ্রহবিপ্র বলিয়া পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছেন। (৪৩)

শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও কৌলীন্য প্রথা আছে।

---

(৪০) বসু—৪ (৮৫)
(৪১)
(৪২) বসু—৪ (৮৮, ৯০)
(৪৩) বসু—৪ (১৩৪)

প্রথম প্রণয়

শ্রীরামরতন চৌধুরী

জীবনের অরুণ প্রভাতে,
তোমার সে প্রেম সিন্ধুনীরে—
অবগাহি জোছনার রাতে,
যবে প্রিয়ে উঠিলাম তীরে—
রোমাঞ্চিত হ'ল তনুমন,
চিত্ত হ'ল পুলক-বিভোর ;
দিঠি বিনিময়ে তুমি মোর—
সর্ব্ব গ্লানি করিলে হরণ,
বন্দী করি মোরে আমরণ
দিয়ে পূত প্রেম রাখি ডোর ॥

ভূস্বর্গ-চঞ্চল

শ্রীদিলীপকুমার রায়

উপসংহার

শ্রীমান্ শচীন্দ্র!

সেই মধুপুরে তুই উদয় হয়েছিলি ষ্টেশনে—তোর রূপে তথা টর্চে আলো ক'রে। সেই থেকে ভূস্বর্গ-চঞ্চলের সুরু। সারাও হওয়া উচিত তোর তর্পণে। এই ভেবে হায়দ্রাবাদ কাহিনীকেই বিষয়বস্তু ক'রে তোকে ত্যাগ ক'রে ছাড়ি আমার উনশেষ পত্র। কাশ্মীরের শেষ হায়দ্রাবাদেই হওয়া সাজে from Nature to the Palace—যেহেতু বৈচিত্র্যই জীবনের রোচনা, কবিবাক্য। টীকা: আমি আজ নিজামঅতিথিশালায় সার আকবর তথা নিজাম বাহাদুরের মেহমান।

হায়দ্রাবাদ দর্শনের ইচ্ছা ছিল অনেক দিন থেকেই, বিশেষ এলোরা। কিন্তু হ'য়ে ওঠেনি। তার একটা কারণ, যখন ভ্রাম্যমান হ'য়ে গান ও ওস্তাদদের খুঁজে সারা ভারত চ'ষে বেড়াতাম, তখন সার আকবরের সঙ্গে আলাপ হয়নি। ইনি গানের—মানে সত্যি গানের, ভক্তির গানের—খেয়াল-ধ্রুপদ প্রমুখ কণ্ঠবাদনবর্গীয় গানের নয়—বড়ই ভক্ত—অনেক ক'রে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। গত বছর যাব ব'লে কথা দিয়েও যেতে পারিনি তুই জানিস। তাই এ বছর পণ করলাম—যেতেই হবে। অথ গৌরচন্দ্রিকা শেষ। ইতি মে মাস, পাঁচই তারিখ, বিংশ শতকের উনচল্লিশ সাল।

শ্রীঅরবিন্দ এ বৎসর দর্শন দিলেন চব্বিশে এপ্রিল। বেরুলাম তারপরই। প্রথমে যাত্রাভঙ্গ—মান্দ্রাজে, আমার বন্ধু অবিনাশচন্দ্র বসুর ওখানে। ইনি ওখানকার য়ুনিক অ্যাশোরান্স কোম্পানির ম্যানেজার। অতি সদাশয় মানুষ। সম্প্রতি গ্রামোফোনে আমার "বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম" কীর্তনটি শুনে এঁর মনে হয়েছে সঙ্গীত জিনিষ ভালো। এ-গানটি শোনার আগে এঁর মনে হ'ত সংসারে একমাত্র ভালো জিনিষ—দেশোদ্ধার। মাঝে মাঝে আমার ওখানে হানা দিতেন মান্দ্রাজ থেকে তাঁর সৌখীন মোটরে, আর গদ্‌গদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করতেন:

'দেশ যে ডুব্‌ল!—শ্রীঅরবিন্দ কবে আসবেন উদ্ধারিতে?
যত বাজে লোক—লোভে ছিনে জোঁক—কাজের বেলায়
নারে টিঁকিতে!
ধর্ম সরেস?—হুম্—শুধু, দেশ-উদ্ধারো চাই—বিলক্ষণ!
কবে যোগিবর হ'তে এডিটর দেশে করবেন পদার্পণ?'

এ কথার উত্তরে 'জানি না' বললে তিনি বেজায় ক্ষুণ্ণ হতেন। ভগবান্ দেশের চেয়ে বড় বললে আরো মিইয়ে যেতেন বাসি মুড়ির মতন। কিন্তু বাংলাদেশের ফুটন্ত নায়কদের fighting programme-এর কথায় ফের চাঙ্গা হ'য়ে উঠতেন ফুল্‌কো লুচির মতন। সত্যি দেশোদ্ধারের কথায় এমন টগ্‌বগে হ'য়ে উঠতে খুব কম লোককেই দেখেছি। সত্যিই খাঁটি দেশভক্ত। এঁর ওখানে রাতে গান হ'ল খুবই ঘটা ক'রে। মান্দ্রাজের বাঙালী বাঙালিনীরা কত যে এলেন দলে দলে—বাংলা গান, কীর্তন, ভজন শুনতে!

ভালো লাগল দেখে—যে ভক্তিরসাত্মক গানে বাঙালী বাঙালিনীরা এখনো সাড়া দেন। বিখ্যাত নর্তকী বালাসরস্বতী এসেছিল। সে-ও গাইল। মেয়েটি বড় ভালো। অতবড় নর্তকী কিন্তু কোনো চাল নেই, না ঢঙ, না ঠাটঠমক। মান্দ্রাজেই ওর নাচ দেখেছিলাম গত বৎসর বন্ধুবর শ্রীমননকুমার মৈত্রের ওখানে। তারপর ও আরো ভালো ক'রে ওর নাচ দেখাবার জন্যে নিয়ে গেল ওর বাড়িতে। ওর ওস্তাদ ন্যাড়ামাথায় কাঠি বাজালেন খট্ খটা খট্, খট্ খটা খট্—আর ও নাচল। এ নাচকে নাকি বলে "ভারতনাট্যনৃত্য", তার মানে যা-ই হোক। তবে টীকা নিয়ে যারা মাথা ঘামায় তাদের দলে তুইও না, আমিও না। কাজেই ওর নাচের কথাটাই সেরে নিই এই ফাঁকে।

বছর বার আগে তাঞ্জোরে এ জাতীয় নাচ দেখেছিলাম আমার এক ধনী বন্ধুর বাগানবাড়িতে। দুটি তাঞ্জোর নর্তকী এসে নেচেছিল। ভালো লেগেছিল—তবে "খু-ব বিশেষণটি নাই বা জুড়ে দিলাম। তাঞ্জোর নৃত্যের নানা ভঙ্গি সুন্দর। কিন্তু হ'লে হবে কি, অসুন্দর ভঙ্গিও আছে। বাংলাদেশের মেয়েদের নাচ উদয়শঙ্কর ও মণিপুরী প্রভাবে যেভাবে সুসমঞ্জস হ'য়ে উঠেছে, দক্ষিণী নাচ সেভাবে মনোহর হ'য়ে ওঠেনি। এদের নাচ কেমন যেন শুক্‌ন শুক্‌ন। তা ছাড়া, নৃত্যের বোলচালে এরা এত ব্যস্ত যে নৃত্যের রসরূপটি ঠিকমতন ফুটিয়ে তুলতে ফুর্সৎ পায় না। তবু ভালোই বলতে হবে এ-নৃত্যকে।

বালাসরস্বতীর নাচ আরো উচ্চাঙ্গের। বলতে কি, দক্ষিণী নাচ এত ভালো দেখিনি। কী নিখুঁৎ তাল, কতরকম অঙ্গ-উৎক্ষেপ। কিন্তু দেহলতাকে দক্ষিণী নর্তকীরা খুব যে সুন্দর ক'রে রেখায়িত ক'রে তোলে এমন কথা বলতে পারি না। কেমন যেন—(কি বলব ?)—ডিস্‌কন্টিনুয়াস্—আকস্মিক মতন। নৃত্য যত বেশি ঢেউয়ের মতন কন্টিনুয়াস্ হয় ততই মনোহর হ'য়ে ওঠে—যেমন গানে মিড়। যারা গানে মিড় দিতে চায় না, শুধু তানের বাহাদুরী দেখায়, তাদের কণ্ঠব্যায়ামে যেমন চমক লাগে অথচ মন ভরে না—অনেকটা তেম্‌নি। তা ছাড়া, দক্ষিণী নৃত্যে কেমন যেন প্রাণের অভাব। ওজস্বিতা আছে কিন্তু মাধুর্য কম, দক্ষতা আছে কিন্তু সুষমা কম, ভঙ্গি আছে কিন্তু রঙ্গ কম। আমরা বাঙালী, বুঝলি না ? রঙচঙ মাধুরী লাবণ্য সুষমা এই সব নিয়ে ঘর করতেই ভালোবাসি বেশি। অবশ্য বালাসরস্বতীর নৃত্যে রসও যথেষ্ট। কিন্তু তবু কেমন যেন খাপছাড়া খাপছাড়া লাগে সময়ে সময়ে। যেন ঠিক নারীনৃত্য নয়। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ বেশ বলেছেন যে মেয়েরা শিল্পে তাদের রমণীসুলভ বাণীই প্রচার করবে—পুরুষদের নকল করবে কেন ? খুব ঠিক কথা। বালাসরস্বতী আজকাল ভাবছে উদয়শঙ্করের দলে ভরতি হবে। তা হ'লেই সোনায় সোহাগা হবে। অসামান্য প্রতিভা এ মেয়েটির, কিন্তু ঠিক্ দিশারি পায় নি এ পর্যন্ত। ওর গুরু শুধু তাল তাল ক'রেই অস্থির। এ পথে নৃত্যের মুক্তি নেই—না থাঁটি গানের। নৃত্য যতক্ষণ না আন্তর আনন্দের উচ্ছ্বসিত রেখাচিত্রে ফুটে উঠবে, ততক্ষণ তার চরম বাণীটি আমাদের কাছে নিজেকে জানান দিতে পারবে না, পারবে না, পারবে না। বড় বড় বুলি কপ্‌চে বা শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত ক'রে থ করা যায় কিন্তু প্রাণ কাড়া যায় না। নৃত্যকে আমি মনে করি দেহের আত্মনিবেদন—ছন্দদেবতা ও রেখাদেবীর পায়ে। নৃত্যের মধ্যে দিয়ে তনু নিজের অতনু-বারতা বহন ক'রে আনে। যুগ যুগ ধ'রে দেহের ভার ও জড়তা আমাদের গগনতৃষাকে ক'রে এসেছে নামঞ্জুর। নৃত্য হ'ল দেহের বিদ্রোহ, সৌন্দর্যের বিদ্রোহ—গ্লানির বিরুদ্ধ। পাখির পাখা আছে, মানুষের নেই। দেহ যে চায় পাখা। নৃত্যই হ'ল এই পাখা। তারই বরে দেহ উপলব্ধি করে

স্বপন রাঙে আকাশে যার
ধূলায় যায় হারায়ে
নৃত্য পাখা আনে যে তার
অসীমা—ধূলি পারায়ে।

বালাসরস্বতীর কণ্ঠকৃতিত্বও অসামান্য। ওর দিদিমা—৺বীণা ধনম্ ছিলেন মাদ্রাজের একজন মস্ত বীণাবাদিনী। বালা তাঁর কাছ থেকেই গান শেখে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, হিন্দুস্থানি গানেও এর কৃতিত্ব কম নয়। ধর্ না কেন, আবদুল করিমের 'যমুনাকে তীরে' বা 'পিয়া বিণ নাহি আওত চৈন'-র প্রতি তান মিড় দোলন ও তুলেছে কণ্ঠে। এ কম কথা নয়—বুঝতেই তো পারিস। এ হেন বালাসরস্বতীকে বাংলা গানে উচ্ছ্বসিতা হ'য়ে উঠতে দেখে যদি আত্মপ্রসাদের ঈষৎ মাত্রাধিক্যই হ'য়ে থাকে, তবে কি সুধীবৃন্দ রাগ করবেন খুব ? তবে এতে আমার আনন্দ হয়েছিল ব্যক্তিগত কারণে তত নয়, যত এইটে দেখে যে বাংলা গানের এমন কি কথা না বুঝেও সুরের ভঙ্গিতে এরা এতটা রস পায়। আমাদের দেশে শুনি বাঙালীরা সত্যি গাইয়ে নয়, যেহেতু তাদের গানে নাকি অমার্জনীয় বাংলা ঢঙ প্রায় আসেই। 'অমার্জনীয়'—ওস্তাদিপন্থীদের কাছে হিন্দি বলতে যাঁদের চোখ উল্টে যায়—কিন্তু আমাদের কাছে বাংলা গান এমন অপূর্ব লাগে তার এই বাংলা ঢঙের অপরূপ বৈশিষ্ট্যের জন্যেই। বাঙালী যেন হিন্দুস্থানী গানকে সমৃদ্ধ করে তার বাঙালী কল্পনায়, সুন্দরপ্রিয় বাঙালী এই-ই চেয়েছে বরাবর। চাওয়া উচিতও তো বটেই। কারণ অনুকৃতিতে নেই

মুক্তি। মুক্তি হ'ল নব সৃষ্টিতে। যে কথা বলেছেন মণীষী এমার্সনও: "Because the soul is progressive it never quite repeats itself, but in every act attempts the production of a new and fairer whole. Thus in our Fine Arts—not imitation but creation is the aim." বটেই তো—কোন্ সত্য বাঙালী না চান—বাঙালী হিন্দুস্থানী গানকেও বাংলা ছাঁচে ঢালাই ক'রে তাকে নতুন রূপমূর্তি দিক? নিশ্চয় তুই-ও চাস্। আজকাল আমি হিন্দুস্থানী গানেও আঁখর ভঙ্গিতে পদ জোগাই। হিন্দি ভালো জানি না ব'লে বাধা পাই। তবে এই আঁখরের দিকে গানের একটা বড় বিকাশ আসন্ন, এই-ই আমার বলবার কথা—তা কী বাংলা গানে, কী হিন্দুস্থানী গানে। মানে, অবশ্য কাব্যসঙ্গীতে, ওস্তাদি হুহুঙ্কারী কণ্ঠবাদনে নয়—যেখানে কণ্ঠ সাড়ে পনের আনা ক্ষেত্রেই হ'য়ে ওঠে স্বেচ্ছাচারী, বাক্য—ব্যর্থ বাহন। যাক্।

হায়দ্রাবাদে এসে পড়া গেল। উঠলাম প্রথমে—১লা মে—এক চমৎকার মুসলমান পরিবারে। কী সুন্দর জায়গায় যে তাঁর বাড়ি। ইনি গভর্মেণ্টের একজন পদস্থ কর্মচারী। এঁর স্ত্রী ছিলেন আমাদের আশ্রমে অনেক দিন। নামকরণ হয়েছিল—শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছিলেন—সুধীরা। মেয়েটি যেমন স্বভাবে কোমলা তেম্নি রূপে অমলা। এমন সুন্দরী মেয়ে কমই দেখা যায়। কিন্তু আরো মিষ্ট ওর স্বভাব। ঠিক ছোট বোনের মত স্নেহময়ী। আর গান যা ভালোবাসে! সকালে ঘুম থেকে উঠেই গ্রামোফোন বাজিয়ে তবে করবে জলগ্রহণ। ওর স্বভাব আসলে কবিনীর। পাখী হাঁস ময়ূর (চুপি চুপি, শ্রীরামারিবৃন্দ)—এই সব পুষেছে। ময়ূর পেখম মেলে যখন নাচে গ্রামোফোনের গান শুনে—তখন কী চমৎকার যে লাগে! সুধীরা পশুও ভালবাসে। ওদের বাড়িটা প্রায় একটা চিড়িয়াখানা। ওর স্বামী বলল, কিছু দিন আগে একটা বাঘের বাচ্চাও ছিল। ভাগ্যে এখন নেই। না শচীন, ওতে আমি নেই ভাই, যে কথা বহুবারই বলেছি, আমার এ বিষয়ে বক্তব্য:

খাই দাই আর কাঁশি বাজাই,
সিংহী বাঘ আর গরিলা
দূর থেকে গড় করি—ওসব
বাসুক ভালো মহিলা।
ময়ূর আমার থাকুন বেঁচে
হরিণ পাখী কোকিলা
সরলা প্রাণবীথি কেন
কাঁটায় করা জটিলা?

নক্শাপুরে আলি ও আলিমের বাঘ শিকার

এদের বাড়িটিও বড় সুন্দর জায়গায়। কাছেই পুষ্পক-রথরা কুচকাওয়াজ করে দানবীয় ভোমরার মতন সগর্জনে। প্রকাণ্ড মাঠ। গাছপালারও বাহার আছে। সাম্নে বাঙ্গারা পাহাড়ে রাতে ঝিকমিক করে আলোর দেয়ালি। প্রকাণ্ড ছাদে শুই রোজ—

তারাভরা আকাশের তলে
চাঁদের নয়ন রয় চেয়ে:
নগরের উৎসব জলে
প্রাণ ধায় দীপতরী বেয়ে।

* *

সাম্নে থাকেন কিষণ রাও। ইনি যোগে উৎসাহী। তাই আরো ভাব হ'য়ে গেল। বড় অমায়িক। এখানকার

সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদ্যুত এঞ্জিনিয়ার। গানভক্ত বিষম। কাজেই বুঝতে পারছিস, দুদিনেই জমিয়ে নেওয়া গেল—কারণ—

গান দরদী কাছে যদি আসে,
অবধি কি থাকে খুশির ওরে?
আমি যা চাই তা যে ভালোবাসে
সে-ই সহজে বাঁধে প্রণয়ডোরে।
যে যাই বলুক, গান নয়ক সোজা
প্রাণ কাড়ে সে এমন অবহেলে
ধূসরতার ছায়াগ্লানির বোঝা
ধায় গগনে উধাও পাখা মেলে।

* *

কিন্তু গানের অন্য একটা দিকও আছে। নিরালায় থাকা ভার হ'য়ে ওঠে গানেরই করুণায়:

গান গাওয়া আর স্বপনতরী বাওয়া বিজন নিরালায়
এ-দুটোতে মিল কোথা ভাই?—গান ঢেউ চায় জনতায়।

কিন্তু বাজে জনতা নয় তা ব'লে। দরদী শ্রোতার জনতা। কিন্তু মুস্কিল এই যে, এমন কোনো ছাঁকনি নেই যার মধ্যে দিয়ে শুধু দরদী শ্রোতাই বাছাই ক'রে মেলে। ঐ সঙ্গে বে-দরদীরাও হানা দেয় অহরহ—বিশেষ ক'রে সমজদার ওস্তাদিপন্থী বে-দরদী। এই দুঃখেই ভাই আজকাল সভা ক'রে হৈ চৈ ক'রে পাঁচজনকে গান শোনাতে আর তেমন উৎসাহ পাই নে। পাছে এই ধরণের ভিড় জোটে, ওই ভয়েই হায়দ্রাবাদে সার আকবর হায়দরিকে খবর না দিয়েই ও-অঞ্চলে গিয়েছিলাম ইন্‌কগ্‌নিটো—কিন্তু তবু ওঁরা ভারি গানভক্ত ব'লে বন্ধুগৃহ ছেড়ে রাজগৃহে আতিথ্য স্বীকার করতে হ'ল। রাজ-রথ এল আমাকে রাজ-অতিথিশালায় নিয়ে গিয়ে রাজকীয় সম্মান দেখাতে। বন্ধু ও বান্ধবীকে ছেড়ে আসতে সত্যিই ইচ্ছা করছিল না—কিন্তু তাঁরা বললেন, রাজনিমন্ত্রণ না রাখাটা ওখানকার বা-কায়দা চাল নয়, কাজেই বেকায়দা হ'য়ে আসতে হ'ল নিজাম বাহাদুরের সুন্দর অতিথিশালায়। একটা কৌতূহলও ছিল অবশ্য মুসলমান আতিথেয়তার পরিচয় পেতে। বন্ধুগৃহে পেয়েছিলাম এর ঘরোয়া স্বাদ। রাজকীয় অতিথিশালায় দেখলাম এর জড়োয়া সাজ।

এ সাজসজ্জা মন্দ লাগল বললেও সত্যের বিলক্ষণ অপলাপ হবে। এতে খানিকটা আরামও আছে বই-কি। কিন্তু সে বর্ণনা থাক। এখানে শুধু কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখি নিজাম বাহাদুরকে, সার আকবর হায়দরিকে, তাঁর পুত্র বন্ধুবর আলিকে ও তার ফরাসী পত্নী বান্ধবী আলিসকে। জানিস তো সার আকবরের পরিবারের সবাই শ্রীঅরবিন্দর মহাভক্ত। আলি ও আলিস বিশেষ ক'রে। এরা দুজন শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমাকে এত ভক্তি করে যে দেখলে ঈর্ষা হয়। কারণ জীবনে ভক্তির চেয়ে বড় নজর কী আছে বল্?

আলি আমার থাকবার সুবন্দোবস্ত প্রভৃতির দিকে খরদৃষ্টি রাখায় আরো আরামে আছি। সারাটা দিন থাকি রাজভবনে, রাতটা কাটাই বন্ধুগৃহে নিরালায় খোলা ছাদে

চাঁদের নয়ন তলে তারার চরণে।
স্বপন আরতি করে গগন-বরণে।

আবার ভোরে মোটর আসে, ফিরে আমি রাজগৃহে ও নানা দর্শন হর্ষণ কর্ষণ চলে গানের কথায় গল্পের আলাপের।

* *

নিজাম বাহাদুরের অতিথিশালাটি চমৎকার। বিশেষ এই জন্যে যে, চারদিকে খুব গাছপালা। সকালে পাখী ডাকে। থাকারও আরাম কম নয়। সাহেবরা বলছে যে আজকাল অল্প স্বল্প টাকা থাকলে মানুষ যে-আরাম পায়, গত যুগের রাজারাজড়ারাও সে-আরামের কথা কল্পনা করতে পারত না। কথাটা মিথ্যা নয়। মানুষের প্রকৃতি হয়ত সহজে বদলায় না, কিন্তু তার সুখ-সুবিধার ধরণ-ধারণ বদলায়। আজকের মানুষ সুখকে যে ভাবে চায়, আরামকে যে ভাবে কামনা করে, সাবেক কালে ভোগকে সে ভাবে খুঁজত না। দিল্লী আগ্রা ঝাঁসি গোয়ালিয়র শহরে রাজপ্রাসাদ-বাগানবাড়ি স্বর্গীয় বিলাস-নিকেতন দেখলে একথা আরো বোঝা যায়। বেগমরা সে সময়ে গোলাপ জলে স্নান করত, নবাবদের কাঁধকে দাঁড় ক'রে বসত পায়রা। আতর গুলাব ফরসী ও ফরাস এই সবই ছিল সে সময়কার বিলাস। তখনকার সেরা বিলাসী-বিলাসিনীরা এসবে নিশ্চয়ই আরাম পেত। কিন্তু তুই আমি গরীব মানুষ বটে তো? তবু আমাদেরও সে ধরণের আরাম যে বরদাস্ত হবে না একথা হলপ ক'রে বলতে পারি। না শচীন, জগতে মানুষের স্বভাবের হয়ত বিশেষ উন্নতি হয় নি, কিন্তু

আমাদের বাসভঙ্গির উন্নতি নিশ্চয়ই হয়েছে। বিজলি বাতি, মোটরকার, কলের জল, ফাউণ্টেন পেন, মশারি, বড় বড় জানলা, সুন্দর সুন্দর আসবাব—এসব নিশ্চয় এখন আমাদের পক্ষে শুধু বিলাস নয়—প্রয়োজন এবং বেশি উপভোগ্য সরঞ্জাম। যতই বলিস না কেন, চৌঘুড়ি বা হস্তীযান দেখতে জাঁকালো হ'লেও বাহন হিসাবে ভালো মোটর বা ট্রেনের কাছেও আসতে পারে না। নাঃ—কালিদাসের কালে ফিরে জন্মাবার সাধ আমার নেই। আমার একালই বেঁচে বতে থাকুক—তোর আমার সিঁথের সিঁদুর অক্ষয় ক'রে। নিজাম বাহাদুরের জয় হোক, দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তানকে এত আদর যত্নে রেখেছিলেন ব'লে। গরিবের টাকায় এত আরাম করা হয়ত ভালো না (হয়ত বলছি, কেন না, সংসারে কোন্‌টা যে ভালো আর কোন্‌টা মন্দ এ তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আজ পর্যন্ত হয় নি) কিন্তু আয়েষের পায়েষ যে সুস্বাদু এবিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই।

এখানেও কিন্তু ফের দায়ে পড়তে হয়েছিল সাইটসীইং নিয়ে। আলি, আমার বন্ধু প্রফেসর ঘোষ, তাঁর সুইস-পত্নী মিসেস ঘোষ আমাকে সমাধি দুর্গ প্রভৃতি দেখাতে চাইলেন। কিন্তু আমি এমন মুখ কাঁচুমাচু করলাম যে, বোধ হয় দয়া হ'ল তাঁদের। বললাম—দেখতে যেতে রাজি—কিন্তু সুন্দর জিনিষ, ঐতিহাসিক কোনো মনুমেণ্ট, যাদুঘর প্রভৃতিকে দণ্ডবৎ করি আমি দূর থেকেই। সংসারে দ্রষ্টব্য জিনিষ অঢেল। কে দেখবে অত শত? তা হ'লে আয়েষ করবার ফুর্সৎই বা পাব কোথায়! না না, ঠাকুরকে ডাকি

ওগো ঠাকুর দয়া কোরো—অলসতার সুখ-আবেশে
চাই চলতে ইচ্ছা মতন—ব্যর্থ ঢেউয়েই ভেসে ভেসে।
জগৎটা ব্যস্ততায় ভরা, কর্মীও তো আছে প্রচুর,
আমায় কোরো অকর্মণ্য—দিয়ে সাথী সুর-বন্ধুর।
একটুখানি স্বপ্নমোড়া জাগরণের রঙিন রেশে
স্নিগ্ধ রাঙা কোরো এ-মন স্নেহ-প্রীতির মধুর দেশে।

* *

কিন্তু সানন্দেই গেলুম কাল সকালে বার মাইল দূরে ওশমান ও হিমায়ৎ সাগরে। এ হ'ল হ্রদের দেশ। হায়দ্রাবাদে রয়েছে হুসেন সাগর। হ্রদ হিসেবে এমন কিছু অপূর্ব নয়। সুইজর্লণ্ড ও কাশ্মীরের হ্রদ যেন স্বপ্ন। তাদের সঙ্গে তো তুলনাই হয় না। এখানেও সাওগরের আবু পাহাড়ের বা উদয়পুরের হ্রদের সঙ্গে হায়দ্রাবাদটী হ্রদের তুলনা হয় না। অথচ হ্রদগুলি সত্যিই সুন্দর। কিন্তু এক একটি মেয়ে দেখা যায়—যার মুখ চোখ গড়ন সবই ভালো অথচ মন টানে না। চটক—চটক—চটক। ইউরেকা!—এই কথাটাই খুঁজছিলাম। রূপের গোড়াকার কথা চটক, যাকে ইংরজীতে বলে চার্ম, সংস্কৃতে—হ্লাদিনী শক্তি। হায়দ্রাবাদী হ্রদের নেই এই শক্তি। তাই ভালো হ'য়েও ও ভালোবাসায় না।

আলিম ও হত ব্যাঘ্র

রূপসীকে 'ভালো লাগে' : 'ভালোবাসি'—শ্রীমস্তিনী
সাজসজ্জা নয় মন্দ, হায় শুধু সে নয় মোহিনী।
চোখের পথে মনকে যে ছোঁয় চাই তো তাকেই সম্ভাষণে
খুঁজি যারে হায় রে তারে পাওয়া সহজ নয় ভুবনে।

* *

তাই এদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও নিজাম সাগরে যাচ্ছি না আর। কে যাবে?—আশি মাইল দূরে। অবশ্য রাজরথ রয়েছে—উড়ে যাবে হাওয়ার মতন। কিন্তু একশো ষাট মাইল মোটর চড়তে আমার সাধ যায় না। মোটর ভালো—দশ বিশ মাইল—বড় জোর ঘণ্টা দুই। তার বেশি নয়। সত্যি বলতে কি, খুব দূরে পাড়ি দেব ভাবতেই কেমন যেন ভালো লাগে না—যদি না পথটা অপূর্ব সুন্দর হয়। তা ছাড়া, নিজাম সাগর কী রকম অনেকটা আন্দাজ ক'রে নিয়েছি। এই ওশমান সাগরের খুড়ো বা জোর জ্যাঠা। বেশ দীর্ঘকায়, ঝিমিয়ে-পড়া, মনমরা। এছাড়া আর কিছু নয়।

আমার দিদিমা বলতেন: 'আমার মন ভগবান্, জানি আমি।' ডিটো। নাঃ—এসব সাইট সীইং আর না ভাই। দোহাই আমাকে আর যন্ত্রণা দিস্ নি ভ্রমণকাহিনী শুনতে চেয়ে।

* * * *

তবু যেতে হ'ল আজ ওশমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে। প্রকাণ্ড বিলডিং। খুব, খু—ব, খু—ব প্রকাণ্ড। আর কী বলব? ভালো? হ্যাঁ, খাসা ভালো। বড় বড় ঘর ক্লাস রীডিং রুম তৈরি করছে মিস্ত্রীরা। শেষ হ'লে সম্ভবত ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় হবে। কিন্তু

বেল বলে: 'আমি পেকেছি।'
কাক বলে: 'আমি দেখেছি।'

* *

কিন্তু একটি মোটর-বিহার খুব ভালো লাগল। কাল গেলাম নক্সাপুর ব'লে এক জঙ্গলে। আলি ও আলিস নিমন্ত্রণ করেছিল সেখানে জঙ্গলের মধ্যে ওদের বাংলোয়। আমার বন্ধু-দম্পতী ঘোষ ও ঘোষজায়া আর বন্ধু মাহমুদ নিয়ে গেল। পূর্ণিমা। চন্দ্রগ্রহণ দেখলাম সেখানে। তোরাও নিশ্চয়ই দেখেছিলি? চমৎকার ব্যাপার। দুরন্ত রাহু কেন যে নাকি বছর বছর বেচারি চাঁদকে ঘণ্টা দুই ধ'রে গিলে উগ্‌রে ফেলে! বোধ হয় হজম করতে পারে না ব'লে। করবেই বা কী ক'রে বল্? দৈত্য বা বেপরোয়া হ'লেও শুধু কাটামুণ্ড বেচারী পাকস্থলীর কাজ সারে কী ক'রে?

কিন্তু সে দার্শনিক গবেষণা থাক্। মোটর-বিহারের কথাই বলি সংক্ষেপে। সকালে আলি এক মস্ত সাড়ে তিন গজী বাঘ মেরে পাঠাল।

সবাই বলল ধন্য ধন্য ছলতে এসেছে
নইলে কি আর এমন হেলায় ব্যাঘ্র মেরেছে?
নয় যে সে বাঘ—নির্জলা এ বেঙ্গল টাইগার
সহজ তো নয় একে মারা—থাক না হাতিয়ার।

* *

এ-হেন আলি নিমন্ত্রণ করল ওদের জঙ্গলে গিয়ে সান্ধ্য-ভোজন করতে। মাহমুদ খুব উৎসাহী—বলল চলো। মাহমুদ ভারি চমৎকার ছেলে। এখানকার একজন পদস্থ কর্মচারী। রক্ কাস্‌ল্ হোটেলে বাস করে—দারুণ বই ভালোবাসে। মোটরও। এ দুয়েরই ব্যবসা করে। এমন যোগাযোগ ভুবনে কমই দেখা যায়—নয় কি? এর বইয়ের দোকান থেকে এক মস্ত রাজাকে গত ছয় বৎসরে তিন লক্ষ টাকার বই বিক্রয় করেছে। সে রাজার লাইব্রেরি দেখলাম। সত্যি, এত ভালো প্রাইভেট লাইব্রেরি দেখিনি এযাবৎ। রাজা আবার ওখানকার একজন মন্ত্রী। (কাঁঠালের আমসত্ত্ব হয় তা হ'লে!) কলিযুগের সবই উল্টো—মন্ত্রীই হয় রাজা, রাজাই হয় মন্ত্রী। যেমন ধরা যাক্ সার আকবর। শুনলাম এখানে এসে যে আসলে হায়দ্রাবাদের রাজা ইনিই। সর্বেসর্বা। যাই হোক, এহেন মন্ত্রী-রাজার ওখানে গানও গাইতে হ'ল মহারাণী খুব ভক্তিমতী ব'লে। মীরাবাঈয়ের গান শুনে এমন বিগলিত হ'তে দেখেছি কম লোককেই। মহারাণী সত্যি ভারি চমৎকার লোক। মহারাজ একটু চাপা—তবে অমায়িক। বই খুব ভালোবাসে। তাই ভাব হবার একটা সুযোগ হ'ল। এক গানে—দুই বইয়ে। মাহমুদ এঁর পার্সনাল সেক্রেটারি। ওরই তো বোলবোলা। ওকে দেখলেই মনে পড়ে ৺পিতৃদেবের গান:

'সত্যি খাসা আছি
হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি।'

মাহমুদ শুধু কর্মিষ্ঠ নয়—ভাগ্যবান্ লোক। সবার কাছেই ওর ভারি প্রতিপত্তি। তার উপরে মোটেই গোঁড়া নয়। আরো আছে। জন গাণ্টার-এর 'ইন্‌সাইড্ ইউরোপ" ব'লে একটি অতি অপূর্ব বই বেরিয়েছে হাল আমলে। প্রকাণ্ড বই, পাঠার্থে ধার চাইতেই ও বলল: 'বন্ধুবর, আমি বই বেচি—না হয় উপহার দেই, ধার দেই না—' ব'লে বইটি তৎক্ষণাৎ আমাকে উপহার দিল। এ-হেন সদাশয় সজ্জনের সঙ্গে ভাব হবে না তো কি হবে জেনেরল গোরিঙের সঙ্গে।

এই বইটি ভারি চমৎকার বই। এতে স্ট্যালিনের কীর্তিকলাপ প'ড়ে সত্যিই মনে হ'ল, ও মানুষটিকেও বিধাতা অবিকল হিট্‌লারের ছাঁচেই ঢালাই করেছেন, শুধু ও চুপটি ক'রে আছে ওৎ পেতে—সুযোগ পেলেই দেখা যাবে ও-ও ঠিক তেম্‌নি শক্তিপিপাসু—যেমন হিটলার।

একথা শুনলে আধুনিক সোশ্যালিস্টরা হয়ত আমাকে মারতে উঠবেন; কিন্তু কি জানি কেন—আমার মনে হয় স্ট্যালিনের শক্তির মূলে আসুরিক নিষ্ঠুরতা আছে। অন্তত স্ট্যালিনের পুলিশ যে অতি নৃশংস ও নির্বিচারী এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। গান্টার এ সম্বন্ধে বেশ একটি গল্প বলেছে:

পোলাণ্ডের প্রান্তে পড়ে খরগোষরা লাফিয়ে লক্ষ শত,
আশ্রয় চায় পোলদের, ওরা অবাক্, শুধায়:
'ব্যাপারখানা কি হে?'
বলল ওরা: 'রুষ পুলিসে নোটিস দিল—শেয়ালবংশ বধো।'
—'তোমরা তো নও শেয়াল!'—'সেটা রুষ-পুলিশে
কে বোঝাবে গিয়ে?'

* *

এখানে আরো কয়েকটি চমৎকার লোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। একজন হ'লেন অধ্যাপক ঘোষ। এঁর পত্নী সুইস-ফরাসী। দুজনেই ভারি মিশুক। ঘোষ সাহেব বাংলা ভুলেছেন বটে কিন্তু উর্দু শিখেছেন চোস্ত্। ক্লাসে উর্দুতেই অনর্গল বক্তৃতা দেন। পাহাড়ির উর্দু মনে পড়ে—দেখতাম এ দুই উর্দু ভাষী দেখা হ'লে উর্দু ধমকে কে জেতে! যাই হোক্, এ দম্পতী আমাকে মহা হৈ চৈ ক'রে হায়দ্রাবাদের যত কিছু দ্রষ্টব্য দেখালেন ও শ্রোতব্য শোনালেন।

এ-হেন দম্পতীকে হায়দরি-পরিবার বলেছিলেন নিয়ে যেতে নকৃশাপুরে—যেখানে আলি বাঘ শিকারে ব্যস্ত। কাজেই যেতেই হ'ল সেখানে।

হ'লাম তো উধাও বিকেলের দিকে। মোটরে মাহমুদের সঙ্গে ঘোষ-দম্পতির বেধে গেল তর্ক। জর্মনরা ভালো জাত নয়—বললেন দম্পতী। ওরা অসামান্য জাত—বলল মাহমুদ। ফল কী হ'ল? যা হয় তর্কমল্লে (পিতৃদেবের ভাষায়) অনুষ্টুপ ছন্দে:

পরিশেষে সভাস্থানে উভয়েই অপরাজিত
দিলে এই বক্তৃতচোটে উড়াইয়া পরস্পরে।

দিক্। তবু এ সন্ধ্যার শোভা ভুলব না। অস্তরবির মাঝামাঝি মেঘের একটি কালো স্নিবন মেখলার মতন কী অপূর্ব যে দেখাচ্ছিল! পাহাড়ের আভার এখানে ওখানে। গাছপালা খানিকটা সন্ন্যাসী এখানে—পত্রাভাব। শুনলাম বর্ষায় ওরা ফের বিলাসী হয়ে ওঠে। কিন্তু রাঙা রবির আলোয় পাড়াগেঁয়ে রাঙামাটির পথ যে কী অপূর্ব লাগছিল! বললাম ত্রয়ীকে যে এ দেখলে কি মনে হয় না ওয়র্ডসওয়র্থের

'What man has made of man?'

সত্যি শচীন, কাগজে-যুদ্ধের ঘনঘটা যতই ঘনিয়ে আসে, ততই মনে পড়ে শেক্ষপীয়রের—'The pity of it, Iago!' কী অগ্নিকাণ্ড যে বাধতে পারে যে-কোনো মুহূর্তে!...

খেদ না হ'য়ে পারে? এমন সুন্দর পৃথিবী আমাদের! এখানে আমরাই তো বসিয়েছি হিংসার রাজ্য। প্রেম প্রীতি এ সবকে বলি স্বপ্ন—যেন এই হিংসাতাণ্ডবই একমাত্র বাস্তব। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় অস্তরবির রাঙা আলোয় যখন প্রতি গাছ উঠেছিল স্বপ্নরঙে রাঙিয়ে তখন কেবলই মনে

নকৃশাপুরের গ্রামবাসীদের নৃত্য

হচ্ছিল শান্তিই তো সবচেয়ে বড় সত্য, সৌন্দর্যই তো সব চেয়ে বাস্তব। অথচ তবু জাপান, হিটলার, মুসোলিনি—এঁদের কৃপায় কী কাণ্ডই না ঘটছে জগতে। কেউ বাদ যাবে না—'সব লাল হো জায়গা'—রণজিৎ সিংহের ভাষায়। রক্তস্রোত বইবে সর্বত্র। অথচ যা এত সহজে নিবারণীয়, তাই হয়েছে সব চেয়ে অনিবার্য। কেন? শুধু লোভ—শুধু আত্মসুখ—শুধু শক্তিমোহ। অথচ এসবে সুখ কতটুকু? খৃষ্টের কথা মনে পড়ে—কী হবে তিন ভুবন জিতে নিয়ে—যদি আত্মার ঐশ্বর্যই গেল খোয়া? আরো দুঃখ যে, এ ধরণের ক্ষণিক্ আস্ফালনের রণতাণ্ডবে চিরন্তন সত্য-গুলির চাহিদাই ঝাপ্সা হ'য়ে যায় মানুষের মনোরাজ্যে!

* *

যাই হোক, পৌছলাম তো নকসা পুরে—চৌত্রিশ মাইল মোটর হাঁকিয়ে। আলি, আলিস ও আরো কয়েকজন ছিলেন। বনের মাঝে সারি সারি খাট পাতা। আলিকে সুখ্যাতি করতে হয় এমন সৌন্দর্যনিকেতনে ডেরা করেছে ব'লে। চারদিকে গাছপালা। আর কী নিস্তব্ধ! আহা মনপ্রাণ জুড়িয়ে গেল বনের মাটির গন্ধে।

মোগল আতিথ্য। নিখুঁৎ। আলিসও বড় চমৎকার মেয়ে। শ্রীঅরবিন্দর প্রতি যে কী ভক্তি! মনটা ভ'রে গেল। তাঁর কথাই হ'ল বহুক্ষণ তাতে আমাতে। সেই চিরন্তন সত্য-প্রসঙ্গ!—ভক্তি প্রেম ভগবান্! বিদেশিনী মহিলার মধ্যে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় ও গুরুবাদে এ-হেন সহজ বিশ্বাস দেখে মুগ্ধ হ'লাম। অথচ বাইরে পুরুষ-বেশ। কারণ অরণ্যে মহিলা বেশে অসুবিধে তো বটেই—বিশেষ বাঘ-শিকারে। আলিস খুব ভাবিত—'বাঘ-মারা ভালো না, মন্দ?' এ-সরল প্রশ্নের উত্তর দারুণ জটিল ব'লে এ প্রসঙ্গটিকে পাশ কাটিয়েই যাই, কি বলিস? ইতি।

তোর মণ্টুদা

স্নেহের শিবানী!

হয়ত কানাঘুঁষোয় তোর কাছে পৌছে থাকবে আমি এখন কোথায়। শচীনকে যে-চিঠি লিখেছি তাতেও জানতে পারবি হায়দ্রাবাদে কী ভাবে হৈ চৈ করা গেছে। গানের এ-সুবিধা কম নয়। শেক্সপীয়র বলেছেন, 'Misery acquaints us with strange bedfellows.' তানসেন বলতে পারতেন:

যাদের সাথে নেই কোনো মিল গান তাদেরো কাছে টানে।
সুরের স্রোতেই দিল্ হয় ভাই দরিয়া আনন্দের উজানে।
সেই জোয়ারের দীপ্ত দোলে ক'রে ওঠে ঝিকিমিকি
প্রাণের আলো ধূলার কালোয়—তাই না প্রীতির
মন্ত্র লিখি।

অনেক দিন আগে রবীন্দ্রনাথ একথা আমাকে বলেছিলেন একবার: যে গানের এমন কোনো জাদু আছে—যা নেই অন্য কোনো শিল্পের, যা

আনে তাদের প্রাণের কাছে যাদের সাথে নেই ক' চেনা
শুধু গানের গুণেই যারা ছেড়ে শুষ্ক বেচাকেনা
ফুটিয়ে তোলে প্রীতির প্রসূন—বিনি সুতোয় মালা গাঁথে
অসম্ভবো হয় সম্ভব—সন্ধি নিশার ঊষার সাথে।

অন্তত গানের মাধ্যস্থতা বিনা সার আকবর-পরিবারের সঙ্গে এমন সহজ বন্ধুত্ব যে হ'ত না এ ধ্রুব। সত্যি, ওঁরা আমার সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ ব্যবহার করতেন সবাই মিলে—আমি যে ওঁদের পরিবারের একজন নই একথা কখনো মনেই হ'ত না। আর এ অসম্ভব সম্ভব হ'ল যে গানের নিজস্ব ইন্দ্রজালে, আমার কোনো গুণে নয়—একথা বলাই বেশি। তাই আরো ভালো লেগেছিল রাজ-আতিথ্য।

কিন্তু আরো ভালো লাগল কাল যা দেখলাম। এখানেও—ঔরাঙ্গাবাদ-অতিথিশালায়—আমি আজ রাজ-অতিথি। কাল দেখে এলাম এলোরা। প্রায় বিশ মাইল দূরে এলোরার পার্বত্যগুহাগুলি। দেখে যে কী গভীর আনন্দ পেয়েছি কি বলব?

কী অজস্র দেবদেবীর মূর্তি সে-যুগের শিল্পীরা পাথরে খোদাই ক'রে গিয়েছিল! দেখতে দেখতে একটা কথা মনে হচ্ছিল: যে নেই, যে কোনো দিন ছিল না, তাকে নিয়ে কি যুগ যুগ ধ'রে মানুষ এমন অফুরন্ত উৎসবে মেতে থাকতে পারে?—পারে চোখে এমন স্বপ্নের নেশা নিবিড় ক'রে রাখতে অনপনেয় দিব্যজ্ঞানের মতন? যে শুধু ছায়ার কল্পনা, জলের আল্পনা, তাকে নিয়ে কী ক'রে রঙিয়ে উঠল এত রঙ, এত ঢঙ, এত ফুলের মেলা, রূপের খেলা? এ-প্রশ্ন আমি কোনো যুক্তি-হিসেবে পেশ করছি না—কেন না, আমি জানি যে এ-ধরণের কথার কোনো যৌক্তিক গুরুভারই নেই। এসবের সাক্ষ্য কাটতে পারে এক ধারে, ভারে নয়। মানে, এ-ধরণের কথার আলো ফলতে পারে এক তাদের প্রাণে যাদের স্বধর্ম অলক্ষ্য-তৃষ্ণা—সংসার-সাফল্য নয়। ঐহিকতার ঘোর খানিকটা না কাটলে বিশ্বাসের সরল আস্তিক্যবুদ্ধি হৃদয়ে গাঢ় স্বচ্ছ হ'য়ে উঠতে পারে না। তা ছাড়া, যারা স্বভাবে নাস্তিক, স্বধর্মে সংশয়ী, তাদের ইহবাদের স্বপক্ষে আর যারই অভাব হোক না কেন, যুক্তির অভাব হবে না এ নিশ্চয়। শ্রীঅরবিন্দ প্রায়ই বলেন—আমাদের মন হ'ল স্বভাবে-উকিল—যে-কোনো প্রতিজ্ঞা তাকে দিয়ে করাবে সে তারই স্বপক্ষে স্তূপাকৃতি ক'রে তুলবে যুক্তি যত চাও। কাজেই নাস্তিক্য বুদ্ধির

কাছে ভক্তির স্বপক্ষে যুক্তি দেওয়া হবে জলে দাগ কাটার চেষ্টা।

কিন্তু মজা এই, ভক্তির প্রবণতা থাকলে এ-সব যুক্তি মনে উদয় হয় যুক্তি হ'য়ে নয়, দীপ্তি হ'য়ে। অন্তত আমার মনে হয়েছিল কালকে একথা হলপ ক'রে বলতে পারি। তাই তো এলোরার অসংখ্য দেবদেবীর অপরূপ মূর্তি দেখতে দেখতে সম্ভ্রমে বিস্ময়ে প্রণামে উচ্ছ্বাসে মন গাঢ় হ'য়ে এসেছিল।

একটা কথা বড় বেশি মনে হচ্ছিল।

এ-যুগে প্রায়ই একটা বুলি শুনতে পাই শিক্ষিতম্মন্যদের মুখে—যে ধর্ম মানুষের ক্ষতিই করেছে বেশি। কিন্তু সত্যিই কি তাই? মানি ধর্মের আনুষ্ঠানিক, আচারের দিকটা মানুষকে ঠাঁই ঠাঁই করেছে অনেক ক্ষেত্রেই, কিন্তু গভীর চিত্ততত্ত্বদর্শীরা সবাই মানেন—তাঁদের গভীর দৃষ্টিতে দেখেছেন ব'লে—যে ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকটা সত্যিই বাহ্য। ধর্মের পরম মহিমার দিক হ'ল তার উপলব্ধির দিক, প্রেরণার দিক। যে-আলো সর্বদাই আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হ'তে চায় আমরা তো তাকে আবাহন করি না মর্ম লোকে। আমরা মেতে থাকি তুচ্ছতার কাড়াকাড়ির মধ্যে। ধর্মের আন্তর সন্ধানই এই আলো-কে আকর্ষণ করে—যেমন চুম্বক করে লোহাকে। তাই তো যুগে যুগে দেশে দেশে ধর্মের উচ্ছ্বাস-পরিমণ্ডলেই জাগরূক হয়েছে মহতী সৃষ্টি—কি শিল্পে, কি সঙ্গীতে, কি দর্শনে, কি কাব্যে, কি ভাস্কর্যে। চিত্রে ও ভাস্কর্যে অজন্তা ও এলোরা ভারতের কী আশ্চর্য কীর্তি বল্ দেখি? বিশেষ ক'রে এলোরা।

সত্যি, এলোরার গুহাগুলিতে ঢুকতে না ঢুকতে মনে জাগে সম্ভ্রম। কী অগণ্য দেবদেবীর মূর্তি! আর কী সুন্দর! দেবতাই বটে। গেটের কথা মনে হয় ফিডিয়াসের রচিত জিউস-দেবের মূর্তি সম্বন্ধে:

"So konnte Phidias den Gott bilden,
ob er gleich nichts sinnlich
Erblickes nachamte, sondern sich
einen solchen in den Sinn faszte,
wie Zeus selbst erscheinen würde,
wenn er unsern Augen begegnen möchte.

দেবের শ্রীবিলাস মূরতি ফিডিয়াস
রচিল মর্মরে—ধেয়ানে তার
কল্পি'—বসুধায় কী রূপে প্রতিমায়
অতনু চাহিতেন তনুবিহার।

কথাটা গভীর। প্রতি বিকাশের শ্রেষ্ঠ রূপরঙই তো ভগবানের দিব্য বিভূতি—গীতায় বলেন নি কি শ্রীকৃষ্ণ? তাই দেবতার রূপও তো এম্‌নই হওয়া চাই—নইলে তাকে দেবতা ব'লে মন মেনে নেবে কেন? নগণ্য মানুষও দেবতাকে কল্পনা ক'রে দেবতা হয় যে। আমাদের দর্শনে একেই বলে 'উপাধি'—যেমন স্ফটিকের কাছে রক্তজবা আনলে স্ফটিকে লাগে ঐ রাঙা ছোঁয়াচ—উপাধি। সান্নিধ্যের যাদুও তো এইখানেই। এই জন্যেই এলোরার মূর্তিগুলি দেখতে দেখতে মনে জাগে দিব্য ভাবের উপাধি। বিপুল পাষাণ কেটে কী অমানুষিক পরিশ্রমই না এরা করেছিল! আর সে কি দু-চার দশ বৎসরে! শতাব্দীর পর শতাব্দী চলেছিল এই মূর্তি গড়ার সাধনা—ধারাপর্যায়ে। আমি প্রকৃতিতে না-প্রত্নতাত্ত্বিক, না-ঐতিহাসিক। কাজেই এই সব গুহার ঐতিহাসিকতা নিয়ে একটুও মাথা বকাই নি। শুনেছিলাম জৈন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য স্থাপত্যের সমাবেশ রয়েছে এই পঁয়ত্রিশটি গুহায়। কিন্তু আমার মনে অভিভূতি এসেছিল এসব ভেবে না। আমার মন বিস্ময়ের অতলে তলিয়ে গিয়েছিল ভাবতে, এ-পূজাশিল্পীদের প্রেম ও ভক্তির নিঃশেষহীন উৎসবের কথা—যার প্রেরণায় তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে সুন্দরের আরাধনা ক'রে চলেছিল অক্লান্ত পূজাধর্মের অবিশ্বাস্য আনন্দে! চোখে না দেখলে এ বিশ্বাস হয় না যেন। এক একটি মূর্তি কী বিরাট—অতিকায়! অথচ পাহাড়-কেটে-খোদাই-করা! বুদ্ধের, মহাবীরের, শিবের, পার্বতীর, গঙ্গার, যমুনার—আরও কত দেবদেবী মহা-মানুব-মানবীর! রামায়ণ মহাভারতের কত কাহিনীই যে তারা এই ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎকীর্ণ ক'রে গেছে। তা ছাড়া ফুল, ঘোড়া, হাতি, হাতিয়ার, রথ, রথী—এদেরও অভাব নেই। চালচিত্র—তা-ই বা কত রকম! God's plenty যাকে বলে।

ধর্ম শুধু কুসংস্কারের ও তামসিকতারই উদ্গাতা—এই ধরণের একটা জাঁকালো বুলির নামডাক হয়েছিল বৈজ্ঞানিক

যুক্তিবাদের প্রথম অভ্যুদয়ের সময় থেকে। হাল আমলে এ-বুলির কৌলীন্য-মর্যাদায় কিছু ভাঁটা পড়েছে—তবু আমাদের দেশে অনেক স্বাধীন-চিন্তাবীরের মুখে এখনো একথার প্রতিধ্বনি সময়ে সময়ে বেশ গম্ভীর ভাবেই আসর সরগরম রাখবার চেষ্টা করে। কিন্তু এ-হেন স্পর্ধার পিছনে সত্যের আলো কম ব'লেই গায়ের-জোরের তাপ বেশি। গায়ের-জোর বলছি এই জন্যে যে, এ-বুলি যে অসত্য তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অগুন্তা। প্রতি অবতার বা মহাপুরুষের অভ্যুদয়ের পরেই এক একটা জাতির প্রাণলোকে জ্বলে উঠেছে সাত্ত্বিক ও রাজসিক আলো: শ্রীকৃষ্ণের পরে —ভারতে, বুদ্ধের পরে—চীনে, জাপানে, খৃষ্টের পরে—সমগ্র য়ুরোপে রেনেসাঁসে, মহম্মদের পরে আরবে, পারস্যে, স্পেনে, চৈতন্যের পরে কীর্তনে—আরো কত ধর্মবীরের প্রেরণায় কত ভক্ত গেয়েছে সৃষ্টির আলো-আনন্দের প্রেরণায়। ধর্ম যুগে যুগে বিশেষ ক'রেই জোগান দিয়েছে সুন্দরের প্রেরণা। তামসিকতা এসেছে ধর্মের প্রগতির যুগে নয়—অবনতির যুগে, গ্লানির আবহাওয়ায়। কল্পনা কর—জগত কত হারাত যদি কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট এ জগতে অবতীর্ণ না হ'তেন—যদি এখানে শুধু নীরো, চেঙ্গিস খাঁ, নাদির শা, হিটলার, স্ট্যালিনেরই জয়জয়কার হ'ত। যুগে যুগে ধর্মের মহতী গ্লানির সময় যদি যুগাবতারদের জন্ম না হ'ত—তাহ'লে সমাজে শুভ ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠাভূমি যে কত দুর্বল হ'ত সে কি বলবার দরকার আছে? মানি—ধর্মের ব্যভিচার ব'লেও একটা জিনিষ এসেছে যার ফলে জীবনে সুন্দরের ছদ্মবেশে দেখা দিয়েছে অসুন্দর। দেবতার মুখোষ প'রে হানা দিয়েছে দৈত্যদানা। কিন্তু তাতে কি? কোনো বড় ঊর্দ্ধশক্তির অপপ্রয়োগ দিয়ে তার মহিমার মূল্যনিরূপণ হয় না। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কী নারকীয় প্রয়োগই হচ্ছে ধ্বংসলীলায়—কিন্তু তাই ব'লে কি বলতে হবে যে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির মূল হ'ল পাশবিকতা?

এলোরা দেখতে দেখতে মনে না হ'য়েই পারে না যে, এসব শিল্পীর প্রেরণা ছিল জ্বলন্ত। নইলে এমন জীবন্ত সৃষ্টি হয় না। তারা ছিল সুন্দরের ধ্যানী। তাই অন্তরের নিভৃত আনন্দরূপকেই মূর্ত ক'রে তুলতে পেরেছিল এমন অপরূপ সব দেবকায়ার সাগরকল্লোলে। দশ নম্বর গুহায় বুদ্ধের সমাধিমূর্তির সামনে দাঁড়ালে বোধ হয় অবিশ্বাসীরও মনে জাগবে সম্ভ্রম। কৈলাস গুহার স্থাপত্যে ভাস্কর্যে দেবদেবীদের প্রসন্নাত্মার উল্লাস উঠেছে দীপ্ত হ'য়ে। জৈনগুহাগুলিও অপরূপ। এক কথায় এলোরার বর্ণনা হয় না, তুলনা নেই। ওর কীর্তি হ'ল মানুষের অন্তরের দিব্য সাধনার কীর্তি। তাই তো মানবিক আঁধার-আধারে নেমেছিল দৈবী জ্যোতি, ধূসর পাহাড়েও তারা জ্বেলেছিল রূপের মশাল, পাষাণেও বইয়েছিল গাঙ্গধারা সুন্দরের ভাগীরথী আবাহনে। কী তপস্যা ছিল তাদের!

এহেন তাপস সভ্যতার বংশধর আমরা—ভাবতেও গৌরব: বিশেষ এ-যুগে—যখন মানুষের সবচেয়ে বড় আরাধনা হ'ল দেহবিলাস, শক্তিমদ, শক্তিমদ, পরস্বাপহরণ ও অর্থসিদ্ধি। মনে হয়, সে-যুগের মানুষকে হয়ত বিধাতা একটু অন্য ছাঁচে ঢালাই করেছিলেন, তাই তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী হয়েছিল এহেন দিব্যসুন্দরের নির্মাণশিল্পী। নীটশের একটা কথা গভীর! মানুষের মানবতা কৃতার্থ হ'তে পারে না, যদি না সে নিজের মানবিকতাকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। এ অসাধ্যসাধনের জোর দেয় তাকে কে? না, ধর্মের ঊর্ধ্বগতি। অন্য কোনো প্রেরণা দিতে পারে না এ-অধ্যাত্মশক্তি—এমন নিবিড়ভাবে, ব্যাপকভাবে, স্থায়ীভাবে।

এইসব কথার গভীর উচ্ছ্বাসেই কাল সন্ধ্যায় আমি লিখেছিলাম এলোরা সম্বন্ধে:

অন্তরের উদ্দীপনা
যে-আকুল বর্ণরাগে উঠিল উজ্জ্বলি'
নিরন্ত মূর্তির ভঙ্গিমায়—যেন অসাঙ্গব্যঞ্জনা:
যাহাদের কূবে—কোন্ কালে—কোন সুদূরের পটভূমিকায়
এঁকেছিলে ভক্ত শিল্পী! আনন্দে সঞ্চলি'
বসন্তের আল্পনায়
হৃদয়ের মন্দির-মূর্ছনা-স্নাত পাষাণের উন্মুখর তানে:—

সে সুন্দর ডাকে
ভগ্নস্বপ্ন প্রাণ আজ ফিরে চায় অতীতের পানে
অচঞ্চল অনুরাগে
যেথা চিরভাস্বর প্রত্যয়
সৃজি' স্বচ্ছ প্রণতি-প্রণয়
অভয়-মুকুরে তার নিরখিত আপনার অন্তঃলীলা লহরীর ছবি।

গোপন প্রাণের সুর ওগো রেখাকবি !
পাষাণে ফুটালে তুমি স্ফটিকের ছন্দিত আঁখরে
সংখ্যাহারা সংকীর্তনে !
তাই তো পাথর
সুষমার অপরূপ অঙ্গরাগে আজিও কোমল
ঢলঢল
সে-স্মৃতিতর্পণে।
নাম গেছে মুছে, তবু নামীর স্বপ্নের কোথা শেষ ?
সে যে পেল লক্ষ্যের উদ্দেশ
চিররূপতীর্থঙ্কর হ'য়ে।
তাই আজো গভীর সম্ভ্রম জাগে মর্মতলে
কম্প্র শ্রদ্ধা আপনারে অঞ্জলি অক্ষয়ে,
নিবেদিতে চায় সেই স্মরণীয় স্বপ্নবেদীমূলে
কল্লোচ্ছলে
রুদ্ধস্রোত আশা যেথা কূল পায় আঁধার-অকূলে।
কত প্রেম, কত তৃষ্ণা, কত পূজা, কত না প্রাণের
পেয়েছে আশ্রয় হে দেবাদিদেব ! দিনে দিনে তিলে তিলে
তোমার অসীম রূপপ্রতিমার চিরচরণের
শান্তিবাহ কান্তির অনিলে !
তাই তো এ নীরন্ধ্র গুহায়
রচেছিল তাহারা সে-যুগে
প্রকাশমালায়
আকাশের জয়ধ্বনি আরতির সুখে।

সত্য নির্মল আকাশ
পাষাণ কারায় যেন লভিল বিলাস
ব্যাপ্তি-মহীয়ান্ রাগে যতিহীন তরঙ্গ কল্লোলে
অশ্রান্ত আবেগে।
তাই উচ্ছলিত কলরোলে
উঠিল দুর্বার ভঙ্গে আত্মহারা আলোছন্দ শিলাগাত্রে জেগে।
আপনারে বাঁধিতে সে পারে নি সেদিন :
তাই অন্তহীন অন্তর্লীন
ধ্যানস্বপ্ন এঁকে গেল পর্বতের আতিথ্য-ফলকে

সান্দ্র ইন্দ্রজালে যেন নিশীথের ছায়াভ অলকে
নবারুণরাগে
রবির কবরীখানি বাঁধিল সোহাগে।
না মানিয়া হার
কুরূপের অগৌরবে—
অক্লান্ত উদ্যমে তারা নেপথ্যে নীরবে
দিনে দিনে প্রাণসাধনায়
রূপহীনে দিতে নিত্য রূপশ্রীসম্ভার
ঐকান্তিক তপস্যায়
উৎকীর্ণ করিয়া গেল ইন্দুস্বপ্ন দীপালি-অনিন্দ্য-সমারোহ
অসাধ্য সাধনী প্রতিভায়।

ছিল না তাদের চক্ষে আশু খ্যাতি মোহ
চায় নাই জয়ধ্বনি, করতালি,
যশোমান-প্রতিষ্ঠা-মিতালি,
নামধাম উপাধি তাদের
কোনো স্তম্ভে লিখে রেখে যায় নাই,
কীর্তির গৌরব-গরবের
বরণমালিকা তারা পায় নাই :
অজ্ঞাত অখ্যাত কর্মে শুধু আপনারে তারা নিঃশেষে
করিয়া গেল দান,

তাই বুঝি তাদের আত্মার গান
আজিও ঝঙ্কৃত করে নিস্বর পাষাণ !
তারা তো ছিল না দিশাহীন, জ্যোতীহারা,
প্রেমের মশাল্ তারা জ্বেলেছিল্ জনে জনে
নিহিত স্বপ্নের কল্লোলে,
তারি তো উচ্ছ্বাসছটা উদ্ভাসিল তাহাদের অলক্ষ্য-অচিনে।

অন্তরের সুধা অগোচর
বাহিরেও ঝরাল নির্ঝর
ললিত লাবণ্য কলরোলে
দুরাশার গূঢ় মন্ত্র উদ্বেলিয়া তুলি'
তাদের সে-আশ্চর্য অঙ্গুলি
অরূপে দীপিল অনির্বাণ রূপশিখা
কঠিনে কোমল :
আঁধার ললাটে ললাটিকা
দিল তারা বরণ বিহ্বল।

যুগে যুগে হে দেবতা !
ধ্রুব বুকে অধ্রুবের বাণী, মুগ্ধ বুকে বীর্যের বারতা
তুমিই এনেছ বহি' দেশে দেশে
নির্বলে করেছ বীর,
কৃপণেরে—দাতা, বিনিঃশেষে
সর্ব নিবেদন তাই অকস্মাৎ করে সে তোমারে।
নিঃস্ব দীন লক্ষ্যহীন বিশ্বের মানব
প্রার্থিয়া তোমার স্নিগ্ধ শ্রীচরণতীর
নির্দিশা তুফানে পেল তারকা নির্ভর ;
তোমারি বৈভব
তারে যে করিল ধনী ওগো বিশ্বেশ্বর !

তবু হায়, আজো কলহাস্যে কহে কত জনা—তুমি
উঠেছিলে এমনি কুসুমি'
অহেতুক আত্মলিপ্ত মিথ্যা শিল্পরণে
কল্পনায়—
যেদিনে মানব ছিল অন্ধপ্রায়
শুধু সেই অন্ধকার যুগে
শূন্য হয়েছিল ধন্য লুব্ধ পূজারীর পুণ্য পণে।
তোমার ওঙ্কার
তাই বারম্বার
রটেছিল আর্তকণ্ঠে শঙ্কিতের বুকে।
যে নেই—যে ছিল না—তাহারে ল'য়ে হায়
কেমনে হৃদয় গান গায় ?
কেমনে অলীক কালো হয় আলো মিথ্যা মন্ত্র তালে ?
বহ্নি বিনা কে গগনে জ্বালে
তারকার দীপালিকা আন্দোলিত গতির স্পন্দনে
শ্রান্তিহারা আবর্তনে ?

তুমি আছ, তাই আজো মোরা চিরসুন্দরের মাঝে
তোমারি তর্পণ করি জীবনের লক্ষ শুদ্ধ কাজে
তোমারি আভাষ চাই মাধুরীর মরুত হিল্লোলে
অনন্তের বন্দনায় তাই হিয়া দোলে।

তুমি যদি হ'তে শুধু অসম্ভব কায়াহীন ছায়া
সুন্দরের নাটমঞ্চ হ'ত মায়া।
দেবদেব রূপে তুমি গরলের কলুষিত লোকে
যদি না গাহিতে নিত্য অমৃত অশোকে
দীন পঙ্গু লভিত কি এ শৌর্য শকতি
তপস্যা মহতী ?

তুমি অন্তরাল হ'তে
আমাদের প্রতি শুভব্রতে
ধরো দীপ
প্রাণাধিপ !
ফুটায়ে কুসুম ভরো নৈবেদ্যের সাজি
রূপে রঙে গন্ধে রাগে মূর্তি ধরি'—তাই ওঠে বাজি'
শব্দে সুর অবর্ণে রঙ্গিমা
নিস্তরঙ্গ নিশাপটে রেখাঢেউয়ে হৈমবতী ঊষার প্রতিমা :
তাই সীমা চিরদিন আনন্দনিধানে
ধূলিকা পারায়ে লভে নীহারিকা আপনার প্রাণে।
তাই নিত্য এ-মাটির দেহ
মরণের ভূমিকম্পে নিত্য রচে বৈদেহীর বিনিষ্কম্প গেহ
তাই রূপে সমুজ্জ্বল আজো যুগযুগান্তের অরূপ পাষাণ
কালজয়ী—নক্ষত্র-অম্লান।

সমাপ্ত

জন্ম.—২৮শে মাঘ, সন ১২৮৫ সাল | রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক | মৃত্যু.—২৮শে কার্ত্তিক, সন ১৩২৭ সাল

রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক

দেখিতে দেখিতে বিশ বৎসর হইয়া গেল, ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ২৮শে কার্ত্তিক চল্লিশ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক লোকান্তরিত হইয়াছেন। ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ২৮শে মাঘ রবিবার কলিকাতা পটলডাঙ্গার প্রসিদ্ধ বসু-মল্লিক পরিবারে সুবোধচন্দ্রের জন্ম হয়। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় এবং তিনি তাঁহার পিতৃব্য হেমচন্দ্র বসু-মল্লিক মহাশয়ের স্নেহে ও শিক্ষায় বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। কলিকাতায় তৎকালীন শিষ্ট ও ধনী সমাজে হেমচন্দ্রের নাম কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। এই বসু-মল্লিক পরিবার গঙ্গার কূলে জাহাজ-সংস্কারের বিরাট কারখানা (ডক) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উহা আজও বাঙ্গালীর ব্যবসাবিমুখতার প্রতিবাদ করিতেছে। বর্ত্তমানে মার্টিন কোম্পানী উহার পরিচালন ভার পাইয়াছেন। ইউরোপীয়-দিগের অনেক আচার-ব্যবহারের প্রতি হেমচন্দ্রের অনুরাগ থাকিলেও তাঁহার স্বজাতিপ্রীতি ও দেশপ্রেম কখনও শিথিল-মূল হয় নাই। তখন এই পরিবারের সহিত প্রসিদ্ধ সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল এবং হেমচন্দ্রের ইংরেজী সাহিত্যানুরাগ এতই প্রবল ছিল যে, মূল্যবান বহু ইংরেজী পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তিনি আনাইতেন। লর্ড কার্জনের শাসনে যখন বাঙ্গালা উত্যক্ত হয়, তখন যাঁহারা তাহার প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কথা আজও বাঙ্গালীর স্মরণীয়। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক যখন রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হন, তখন বাঙ্গালা হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থনার্থ ব্যারিষ্টার বোম্বায়ে পাঠান হইয়াছিল। সেই ধনভাণ্ডারে হেমচন্দ্রের দান উল্লেখযোগ্য। তিনি সঙ্গীত-সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

পিতৃব্যের যত্নে বর্দ্ধিত হইয়া সুবোধচন্দ্র ইংরেজী ১৯০০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শিক্ষালাভার্থ বিলাতে গমন করেন। কয় বৎসর তথায় অবস্থিতিকালে তাঁহার স্বাভাবিক জাতীয়তার ভাব অনুশীলন-তীক্ষ্ণ হয় এবং তিনি যখন একবার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গলায় যে জাতীয় আন্দোলন হইতেছিল, তাঁহাদিগের নেতৃগণের মধ্যে তিনি আপনার উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করেন। তিনি অকাতরে অর্থব্যয় না করিলে ঐ আন্দোলনের দ্রুত ব্যাপ্তিতে হয়ত কিছু বিঘ্ন ঘটিত। যে বন্দেমাতরম্ পত্র জাতীয় দলের মুখপত্র রূপে কেবল বাঙ্গালায় নহে, পরন্তু সমগ্র ভারতেই নবভাব প্রচার করিয়াছিল—যাহা শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তা প্রচারের বেদী হইয়াছিল, সুবোধচন্দ্রের অর্থে তাহার প্রতিষ্ঠা এবং সুবোধচন্দ্রই তাহাকে নিজগৃহে স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহারই বন্ধুত্বের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া অরবিন্দ বরোদায় গায়কোয়ারের কাজ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং প্রথমে জাতীয় বিদ্যালয়ের ও পরে বন্দেমাতরমের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সুবোধচন্দ্রের গৃহেই তিনি বাস করিতেন এবং তিনিই সুবোধচন্দ্রের রাজনীতিক জীবন পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত করিতেন। যখন বাঙ্গালার ছাত্রগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বর্জ্জন করিয়া জাতীয় শিক্ষা লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, তখনই একদিন কাহারও সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়াই সুবোধচন্দ্র জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ টাকা দান ঘোষণা করেন। যে দিন কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে পান্তির মাঠে এই ঘোষণা হয় সে দিনটি নবভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া থাকিবে। এইরূপে এক লক্ষ টাকা দান করিবার মত সম্পদ তখন সুবোধচন্দ্রের ছিল না এবং সেই দান ও তাঁহার পরবর্ত্তী দানে তিনি ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি কখনও সরকারের প্রীতিভাজন ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসীরা তাঁহাকে যে 'রাজা' উপাধি দিয়াছেন তাহার গৌরব কত অধিক তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এই দানের জন্য শেষ জীবনে তাঁহার আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাবও ঘটিয়াছিল, কিন্তু সে অভাব তিনি দেশমাতৃকার আশীর্ব্বাদ বলিয়াই সানন্দে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গলা হইতে যাঁহাদিগকে বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল, সুবোধচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে জার্মান কবি ও দার্শনিক গেটের উক্তি মনে পড়ে। গেটে বলিয়াছেন—

"ভগবান কোন কোন লোককে বিশেষ কার্য্যের জন্য সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবার পর ইহলোকে তাঁহাদিগের অবস্থানের আর কোন কারণ বা সার্থকতা থাকে না।" সেই নিয়মেই সুবোধচন্দ্র অন্তর্হিত হইয়াছেন। কিন্তু যতদিন বাঙ্গালীর জাতীয় সাধনা সিদ্ধিতে পরিণত না হইবে, ততদিন বাঙ্গালী তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া বলিবে,

"চলেছি তোমারই পথে
তোমার ভাবেতে বুঝিব তোমায়
ধরি এই মনোরথে।"

তাহার পর যখন বাঙ্গালী এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবে, তখনও সুবোধচন্দ্রকে—

যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে।

ব্যক্তিদের সাহায্যে ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার কথা আর উঠিতে পারে না। তাহার ভিত্তিও এতখানি গণতান্ত্রিক হইত না।

তবে মহাত্মার এই প্রস্তাবও যে একেবারে ত্রুটিহীন তাহা বলা যায় না। তিনি গণভোটে পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থায় সম্মত হইয়াছেন, বিশেষ করিয়া মুসলমানদের ক্ষেত্রে। আবশ্যক হইলে অর্থাৎ অন্যান্য সম্প্রদায়ও যদি তদনুরূপ দাবী করে তাহা হইলে তাহাদের ক্ষেত্রেও পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থায় তিনি সম্মত আছেন। পরে স্বাধীন ভারতে কি ব্যবস্থা চলিবে তাহা গণ-পরিষদ নির্ণয় করিবে। পৃথক নির্ব্বাচনব্যবস্থা গণতন্ত্রানুমোদিত নয়। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ইহাতে কি পরিমাণ বাড়িতে পারে, আমরা গত কয়েক বৎসরেই তাহার অভ্রান্ত এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি। যাঁহারা পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থায় গণ-পরিষদে আসিবেন তাঁহাদের পক্ষে পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থার অনুকূলে মত প্রকাশ করাই স্বাভাবিক। সুতরাং এই ভাবে গঠিত গণ-পরিষদের নির্দ্দেশে পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার আশঙ্কাই বেশী।

সেই সঙ্গে আমরা ইহাও উপলব্ধি করিতে পারি, মহাত্মাজি কেবল মুসলীম লীগকে খুশী করিবার আগ্রহেই ইহাতে সম্মত হইয়াছেন। তিনি নিজে পৃথক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থার বিরোধী। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেন কি-না জানি না। কিন্তু ইহাতে বোঝা যাইবে, ভারতের সম্বন্ধে সুবিচার করার আগ্রহ তাঁহাদের কতখানি।

সাহিত্যাচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন—

সাহিত্যাচার্য্য রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় গত ২০শে নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় ৭৩ বৎসর বয়সে ৬ পুত্র ও ৪ কন্যা রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। দীনেশচন্দ্র যৌবনে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন এবং শিক্ষকের কার্য্য করার সঙ্গে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস রচনা করেন। পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুগ্রহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। তাহাতেই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার পথ উন্মুক্ত হয়। ১৯১৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাসে বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইলে দীনেশচন্দ্রকেই প্রধান অধ্যাপকের পদ প্রদান করা হইয়াছিল এবং প্রায় ১৪ বৎসর কাল তিনি সে কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ও তিনি বহুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার থাকিয়া বঙ্গভাষার সেবা করিয়াছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক ছিলেন এবং পরিণত বয়সে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া 'বৃহত্তরবঙ্গ' নামক বাঙ্গালা ভাষার উপকরণ সম্বলিত এক সুবৃহৎ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। দীনেশবাবু সারাজীবন বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত অসাধারণ পরিশ্রমী
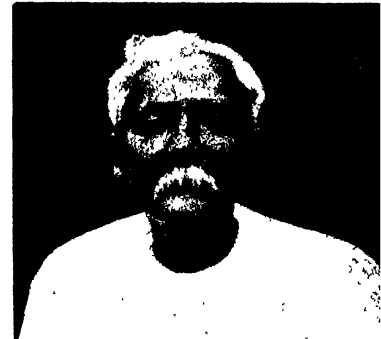
দীনেশচন্দ্র সেন

সাহিত্যিকগণের মধ্যে অতি অল্পই দেখা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ যে বিমাতার মন্দিরে মাতার স্থান হইয়াছে, তাহার জন্য দীনেশবাবুর যে চেষ্টা ছিল, তাহার জন্যই শুধু তিনি বাঙ্গলার ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবেন। দীনেশচন্দ্রের মৃত্যুতে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা কখনও পূর্ণ হইবে কি না সন্দেহ। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

রাখালানন্দ ঠাকুর—

বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্মসাধনার অন্যতম কেন্দ্র বর্দ্ধমান কাটোয়ার শ্রীখণ্ড গ্রামের সুপণ্ডিত রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী মহাশয় গত ২৬শে আশ্বিন নবদ্বীপধামে গঙ্গাতীরে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নাম স্মরণ করিতে করিতে সাধনোচিত
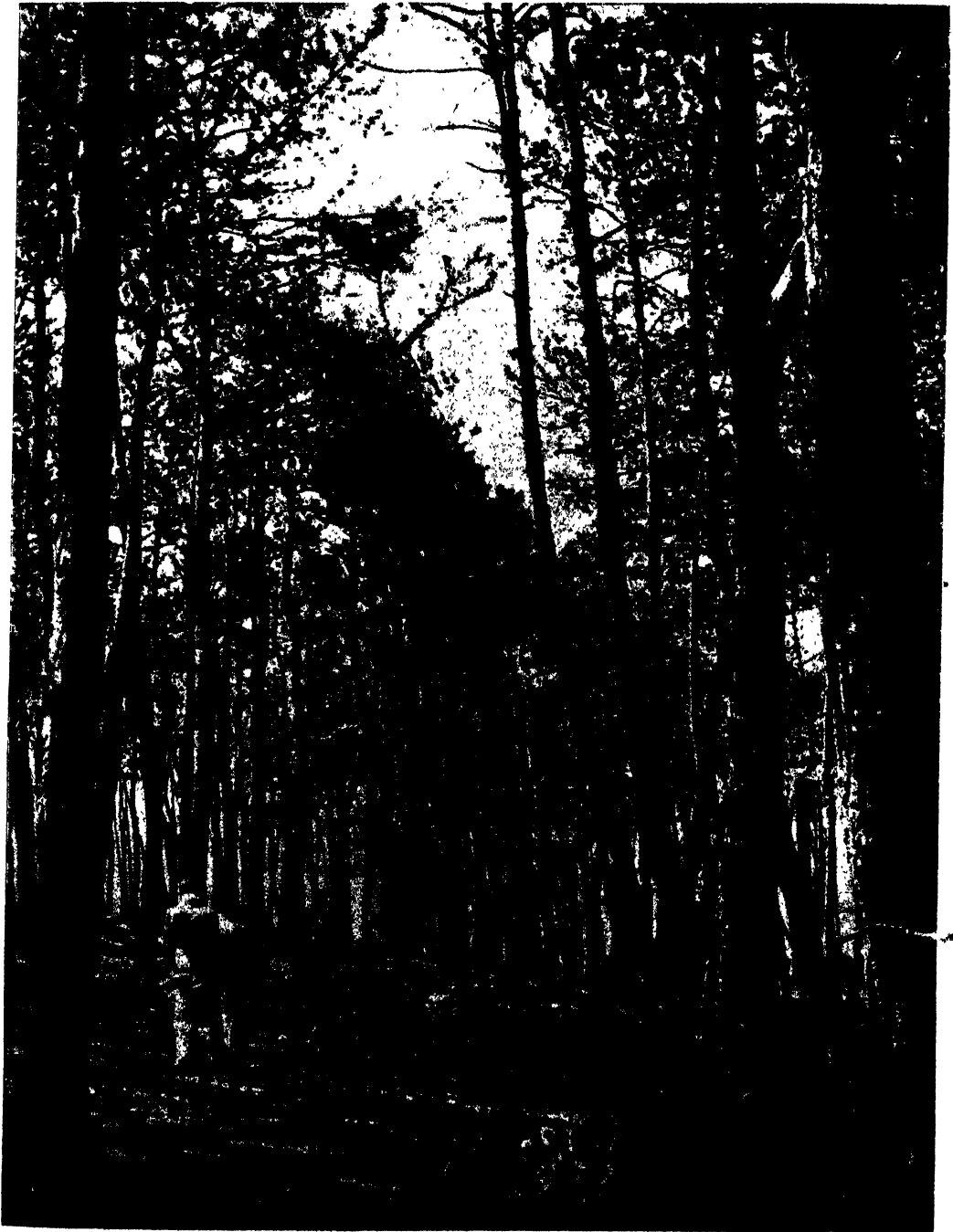
পাইন বনে

শিল্পী—নিরোদ রায়, গৌহাটী

নিরা

শিল্পী—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারভাঙ্গা

ধামে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বাল্যকাল হইতে সংস্কৃত শিক্ষায় উপযুক্ত শিক্ষিত হইয়া স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। ৪০ বৎসর কাল তিনি তথায় অধ্যাপনা করার পর শেষ বয়সে নবদ্বীপবাসী হইয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীখণ্ড হইতে প্রকাশিত শ্রীগৌরাঙ্গমাধুরীর সম্পাদক ছিলেন এবং

রাখালানন্দ ঠাকুর

বাঙ্গালা ভাষায় বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১২৭৪ সালের ৮ই অগ্রহায়ণ শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ নরহরি ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঘুনন্দনের বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল এবং মৃত্যুকালে প্রায় ৭২ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ সত্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্—

বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ ভারতের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভের জন্য সম্প্রতি ভারতে আগমন করিয়াছেন। কোনো দেশ বা জাতির সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাহার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি থাকা আবশ্যক। সুখের বিষয়, স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের তাহা আছে। তাঁহাকে আমরা স্বাগত জানাইতেছি।

বিলাতের শ্রমিক এবং উদারনৈতিক দলের সহানুভূতির পরিচয় আমরা মাঝে মাঝে পাইয়া থাকি। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা ভারতের দাবী সমর্থন করেন। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল এবং রক্ষণপন্থীদের সম্বন্ধেও কি উহা সত্য। রক্ষণপন্থীদের সম্বন্ধে সেরূপ কোন প্রমাণ এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

কুমারী রেণুকা সাহা—

গত শারদীয়া অবকাশে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে ভারতের শ্রেষ্ঠ

রেণুকা সাহা

সেতারী স্বর্গীয় এনায়েৎ খাঁর শিষ্যা কুমারী রেণুকা সাহা সেতার বাদ্যে তাঁহার অসামান্য কলানৈপুণ্য ও প্রতিভা দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচান্সেলারের অনুরোধে তাঁহাকে আর একদিন সেতার বাজাইতে হইয়াছিল। আমরা কুমারী রেণুকার সাফল্য কামনা করি।

বাঙ্গালীর উচ্চসম্মান লাভ—

যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের গভর্ণমেণ্টের কেমিকেল একজামিনার ডাক্তার এস্-এন্-চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি এস্-সি ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ভারতীয়গণের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে মাত্র আর একজন এই সম্মানলাভ করিয়াছিলেন—ডক্টর চক্রবর্ত্তী দ্বিতীয়। ডক্টর চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্বে কোন রাসায়নিক এই ডিগ্রী লাভ করেন নাই। তিনি কিছুদিন মান্দ্রাজের অন্নমালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের কার্য্যও করিয়াছেন। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।
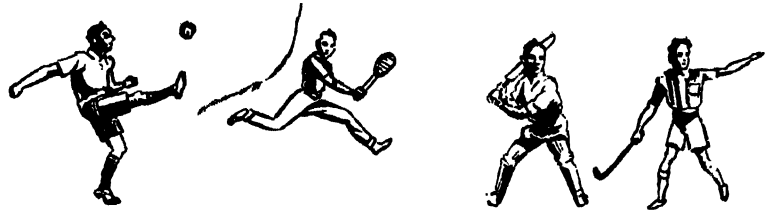
পেণ্টাঙ্গুলার ফাইনাল ঃ

হিন্দু ঃ—১৫৯ ও ২২১ (পাঁচ উইকেট)

মুসলীম ঃ—১৯৯ ও ১৮০

হিন্দু ৫ উইকেটে জয়ী হ'য়েচে।

পেণ্টাঙ্গুলার ফাইনাল খেলা সুরু হ'ল। দর্শক সমাগম হ'য়েচে তিরিশহাজার। মেজর নাইডু এবারও টসে জিততে পারলেন না। এবারের পেণ্টাঙ্গুলার খেলার টসে নাইডু একবারও জিততে পারেন নি। জয় খেলতে পারবে না; তার স্থানে নেবেছে উদয় মার্চ্চেণ্ট।

মাস্তক আর কাদ্রি মুসলীমদের ব্যাটিং সুরু ক'রলে। ব্যানার্জ্জি আর অমর সিং বল ক'রতে লাগলো। ব্যানার্জ্জির বলে রান বেশী উঠচে দেখে তার স্থানে অমরনাথকে দেওয়া হ'ল। কিছু লাভ হ'ল না; রান উঠতে লাগলো। নাইডু, অমরসিং ও অমরনাথের বদলে জগদ্দল ও বিজয় মার্চ্চেণ্টকে বল ক'রতে দিলেন। একটু পরেই বল ক'রতে এলো সি এস নাইডু ও অমরনাথ। এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে ছজন বোলারকে দিয়ে বল করান হ'ল। একঘণ্টা খেলে মুসলীমদের ৪২ রান উঠল। মেজর নাইডু নিজে অমরনাথের স্থানে বল ক'রতে এলেন। ৫৪ রানের মাথায় মুসলীমদের ১ম উইকেট পড়লো। মাস্তক, সি এস এর বলে ক্যাচ তুলতেই মানকাদ চমৎকার ভাবে লুফে নিলে। দিলওয়ার কাদ্রির সঙ্গে যোগ দিলে। সি এস নিজের বলে কাদ্রির একটা সহজ ক্যাচ ফেলে দিলে। সি কের স্থানে অমর সিং বল ক'রতে এলো; অমর সিংএর বলে দিলওয়ারের একটা সোজা ক্যাচ অমরনাথ লুফতে পারলে না। ৯৫ মিনিট খেলে কাদ্রি ২৬ রানের মাথায় অমর সিংএর বলে বোল্ড হ'ল। মুসলীম ক্যাপ্টেন ওয়াজির দিলওয়ারের সঙ্গে যোগ দিলে। দিলওয়ার আবার একটা ক্যাচ তুললে, কেউ ধরতে পারলে না। মুসলীমদের ৮০ রান পূর্ণ হ'ল। ওয়াজির খুব সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে; অমর সিংএর একটা বল 'ষ্টপ' করার পর বলটা গড়িয়ে গিয়ে উইকেটে লাগলো কিন্তু বেল পড়লো না। লাঞ্চের সময় মাত্র দুটো উইকেট গিয়ে রান সংখ্যা হ'ল ১০৬; দিলওয়ার ও ওয়াজির যথাক্রমে নট আউট ৩৪ ও ১১। হিন্দু দর্শকরা একটু অধীর হ'য়ে পড়েচে। লাঞ্চের পর আবার খেলা সুরু হ'য়েচে; বল ক'রচে অমর সিং আর ব্যানার্জ্জি। কিছুক্ষণ খেলা চলার পর সি এস নাইডু ব্যানার্জ্জিকে বিশ্রাম দিলে আর সি কে অমর সিংএর যায়গায় বল ক'রতে এলেন। ফল ভালই হ'ল; মেজর নাইডু ১৪১ রানের মাথায় ওয়াজিরকে বোল্ড ক'রলেন। খেলার গতি একটু ঘুরে গেলো; সি এস একই রানের ভেতর দিলওয়ারকে নিজের বল দিয়েই লুফে নিলে। ব্যাট ক'রতে লাগলো জাহাঙ্গীর খাঁ ও নাজির আলি। জাহাঙ্গীর বেশীক্ষণ থাকতে পারলে না, সি কের বলে হিন্দেলকারের হাতে আটকে গেলো। মেজর নাইডু আবার অমরসিংকে বল করিতে দিলেন। ব্যানার্জ্জি স্লিপে সি এসের বলে এক

সি কে নাইডু
(ক্যাপ্টেন—হিন্দু)

ওয়াজির আলি
(ক্যাপ্টেন—মুসলীম)

হাতে চমৎকার ভাবে নাজিরকে লুফে নিলে। আমীর ইলাহি ২ রান ক'রে সি এসের বলে আউট হ'ল। নিসারও তারই বলে অমরনাথের কাছে ধরা দিলে। মজহরকে সি এস মাত্র ১ রান করার পর বোল্ড করলে। ১৯৯ রানে মুসলীমদের প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল। সি এসের গুগ্‌লি বলই মুসলীমদের বিপর্য্যয়ের কারণ। সি এস মাত্র ৭৮ রান দিয়ে ৭টা উইকেট পেয়েচে। গুগ্‌লি নিখুঁত ভাবে পড়লে একজন বোলার সমস্ত টীমের পক্ষে যে কতখানি মারাত্মক হ'তে পারে সি এস নাইডু তার প্রমাণ দিয়েচে।

এস ব্যানার্জ্জি

চায়ের একটু আগেই হিন্দুরা ব্যাটিং সুরু ক'রলে। মেজর নাইডু হিন্দেলকার ও মানকাদকে ব্যাট ক'রতে পাঠালেন। আরম্ভ মোটেই ভাল হ'ল না; ১৬ রানের মাথায় নিসার হিন্দেলকারকে বোল্ড ক'রলে অমরনাথ ব্যাট ক'রতে এলো। সৈয়দ আমেদের স্থানে আমীর ইলাহি বল ক'রতে এসে খেলার গতি ঘুরিয়ে দিলে; পর পর দু'বলে সে মানকাদ আর সি কে নাইডুর উইকেট পেলো। দিনের শেষে হিন্দুদের ৩ উইকেটে ৪৭ রান হ'য়েচে; ব্যানার্জ্জি আর অমরনাথ যথাক্রমে নট আউট ১ ও ২০। অমরনাথের খেলা ভালই হ'চ্চে; একাধিকবার সে নিসারকে বাউণ্ডারীতে পাঠিয়েচে।

বিজয় মার্চ্চেণ্ট

দ্বিতীয় দিনের খেলা আরম্ভ হ'য়েচে। দর্শক সমাগম হ'য়েচে কুড়ি হাজার। নিসারের ২য় ওভারে জাহাঙ্গীর ফাইন লেগে অমরনাথকে ধরে ফেললে। ৬৪ রানের সময় মজহর, নিসারের স্থানে বল ক'রতে এলো কিন্তু অতিরিক্ত রান দেওয়ার জন্য পুনরায় নিসারকে আনা হ'ল। অমরনাথের মত ব্যানার্জ্জিও তার বলে জাহাঙ্গীরের কাছে ধরা দিলে। হিন্দুদের ভাঙ্গন সুরু হ'ল। সি এস নাইডুকে কোন রান হবার আগেই নিসারের বলে ফিরে যেতে হ'ল। হিন্দুদের ৬টা উইকেট গিয়ে রান উঠেচে মাত্র ৮০।

১৪০ মিনিট খেলা হবার পর বিজয়, সৈয়দকে পর্দ্দার ধারে পাঠিয়ে শতরান পূর্ণ ক'রলে। দর্শক সংখ্যা বেড়ে ৪২ হাজারে দাঁড়িয়েচে। ১১৭ রানের মাথায় জগদ্দল ওয়াজিরের কাছে ধরা দিলে। অমরসিং নামলো। ১২৩ রানের মাথায় মার্চ্চেণ্ট নিজস্ব ৩২ রান ক'রে নিসারের বলে এল বি ডবলিউ হ'ল। বিজয় ৯৭ মিনিট ব্যাট ক'রেছিলো, চার ছিলো তিনটে। অমরসিং খুব পিটিয়ে খেলতে সুরু ক'রলে। লাঞ্চের ঠিক আগেই রঙ্গনেকার নিসারের বলে আউট হ'ল। ১৫৯ রানে হিন্দুদের প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল। অমরসিং আউট হ'ল ২২ রান ক'রে। নিসার মাত্র ৫২ রানে ৬টা উইকেট পেয়েচে।

৪০ রানে এগিয়ে থেকে মুসলীমরা তাদের দ্বিতীয় ইনিংস সুরু ক'রলে। ব্যাট ক'রতে নাবলো মাস্তক আর কাদ্রি। ব্যানার্জ্জি আর অমরসিং বল ক'রচে; ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত মাস্তক মোটেই রান তুলতে পারলে না। ব্যানার্জ্জি লেগে তিনজন লোক দিয়েচে। ১৬ রানের মাথায় ব্যানার্জ্জির বলে মাস্তকের অফ্ ষ্টাম্প ছিট্‌কে বেরিয়ে গেলো। আব্বাস খাঁ এসে ১০ রান ক'রে ব্যানার্জ্জির বলে উদয় মার্চ্চেণ্টের কাছে ধরা দিলে। ওয়াজির কাদ্রির সঙ্গে ব্যাট ক'রতে নাবলো। ওয়াজির আর কাদ্রি বেশ জমিয়ে ফেললে; ঘন ঘন বোলার পরিবর্ত্তন ক'রে ও কোন ফল হ'ল না। ৮০ রানের মাথায় অমরসিং পুনরায় বল ক'রতে এসে কাদ্রিকে বোল্ড ক'রলে।

: মানকাদ

প্রথম ইনিংসে অমরসিং তাকে বোল্ড ক'রেছিলো। ৯৩ রানের মাথায় সি এস নাজির আলিকে বোল্ড ক'রে দ্বিতীয় ইনিংসে তার প্রথম উইকেট পেলো। দিলওয়ার ওয়াজিরের সঙ্গে

যোগ দিলে। ১১৬ মিনিটে ১০০ রান পূর্ণ হ'ল। চায়ের সময় ৪টে উইকেট গিয়ে রান উঠেছে ১০৭।

১২৭ রানের সময় ব্যানার্জ্জি অমরসিংয়ের স্থানে বল ক'রতে এলো। ব্যানার্জ্জির বল খুব নিঁখুত হ'চ্চে আর এত জোর যে নিসার-কেও হার মানায়। ১২৫ মিনিট খেলে ওয়াজির নিজস্ব ৫০ রান পূর্ণ ক'রলে। ব্যানার্জ্জির একটা বল দিলওয়ারের মাথায় লাগায় দিল-ওয়ার সেদিনের মত অবসর গ্রহণ ক'রলে। সৈয়দ আমেদ এসে কোন রান করার আগেই ব্যানার্জ্জির বলেই আউট হ'ল। ব্যানার্জ্জির পরের বলেই জাহাঙ্গীরের বেল উড়ে গেল। এদিকে ওয়াজিরকে হিন্দেলকার রান আউট ক'রলে আর নিসার ১ রান ক'রে আউট হ'ল সি এসের বলে। দিনের শেষে মুসলীমদের ৮টা উইকেট পড়ে গেলো মাত্র ১৪১ রানে।

সি এস নাইডু

তৃতীয় দিনের খেলা সুরু হ'য়েচে। দিলওয়ার আবার খেলতে নেবেচে; আমীর ইলাহির সঙ্গে। ১৯ রান ক'রে আমীর ইলাহি, সি এসের বলে তারই হাতে ধরা দিলে। দিলওয়ারকে লুফলে রঙ্গনেকার, সি এসেরই বলে। মুসলীমদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হ'ল মাত্র ১৮০ রানে। ব্যানার্জ্জি ও সি এস নাইডু প্রত্যেকে চারটে ক'রে উইকেট পেয়েচে যথাক্রমে ৫৭ আর ৬৪ রান দিয়ে।

[illegible] ২২[illegible] রান তুলতে পারলেই হিন্দুদের জয় হবে। মেজর নাইডু মানকাদ ও হিন্দেল-কারকে ব্যাট ক'রতে পাঠালেন। সূচনা মোটেই ভাল হ'ল না; হিন্দেলকার ১৩ রান ক'রে নিসারের বলে সৈয়দের কাছে ধরা দিলে আর অমরনাথ মাত্র ৫ রান ক'রে সৈয়দ আমেদের বলে আউট হ'য়ে দর্শকদের হতাশ ক'রলে। বিজয় মার্চ্চেণ্ট মানকাদের সঙ্গে যোগ দিতে খেলার গতি ঘুরে গেলো। লাঞ্চের পর দর্শক সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজারে দাঁড়িয়েচে। আব্বাস খাঁ মুসলীমদের উইকেট রক্ষা ক'রচে আর তার

জায়গায় ফিল্ডিং ক'রচে সেখ। মানকাদের পায়ে আঘাত লাগার জন্য ব্যানার্জ্জি 'রানার' হ'য়েচে। ৮৮ মিনিট খেলে মানকাদের নিজস্ব ৫০ রান পূর্ণ হ'লো। রান ধীরে ধীরে উঠতে লাগলো। মার্চ্চেণ্টের নিজস্ব ৫০ রান পূর্ণ হ'লো, 'চার' ছিলো চারটে। ১৫০ মিনিট খেলার পর হিন্দুদের ১৫০ রান উঠলো কিন্তু ৭৩ রান ক'রে মানকাদ, আমীর ইলাহির বলে বৌল্ড হ'লো। নিসার, জাহা-ঙ্গীর খাঁ ও আমীর ইলাহির মত বোলারের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ নির্ভুল-ভাবে খেলে তরুণ খেলোয়াড় মানকাদ হিন্দুদের বিজয়ের পথ যেরূপভাবে প্রশস্ত ক'রেচে তা সত্য সত্যই প্রশংসনীয়। তার খেলায় 'চার' ছিলো ৯টা। তৃতীয় উইকেটে হিন্দুদের রানসংখ্যা ওঠে ১২১। মেজর নাইডু নিজে ব্যাট ক'রতে এলেন কিন্তু ১৮ রান ক'রে আমীর ইলাহির বলে বোল্ড হ'লেন। সি এসও মাত্র ১৪ রান ক'রে আউট হ'য়ে গেল। ব্যানার্জ্জি এসে মার্চ্চেণ্টের সঙ্গে যোগ দিলে। প্রত্যেকটি রান তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বাড়তে লাগলো। শেষ ওভারে ২১৫ রানের মাথায় আমীর ইলাহি বল দিতে এলো। মার্চ্চেণ্ট প্রথমেই তিন রান ক'রলে। পরের বলেই ব্যানার্জ্জি ক'রলে ১। বিজয় ২ রান ক'রে হিন্দুদের

সৈয়দ আমেদ

বিজয় ঘোষণা ক'রলে। বিজয়ের খেলা হ'য়েচে নিখুঁত ও নির্ভুল; সে শেষ পর্য্যন্ত ৮৮ রান ক'রে নট আউট রইলো। শুধু ফাইনালেই নয় এবারের সমস্ত পেণ্টাঙ্গুলার খেলা মিলিয়ে ব্যাটিংয়ে মার্চ্চেণ্ট আর মান-কাদের কৃতিত্বই বেশী। তবে মার্চ্চেণ্টই শ্রেষ্ঠতম। এবারের পেণ্টাঙ্গুলার খেলায় মার্চ্চেণ্টের সবশুদ্ধ রানসংখ্যা ৩১৬ আর মানকাদের ২৫৮। বোলিংয়ে সি এস নাইডু অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়ে ৩১টি উইকেট পেয়েছে। তারপরই নিসার আর ব্যানার্জ্জি; তারা যথা-ক্রমে ১৩ ও ১২টি উইকেট পায়। ফাইনালে এদের খেলাও

নিসার

অভিমান | শিল্পী—অজয় সেন, কলিকাতা
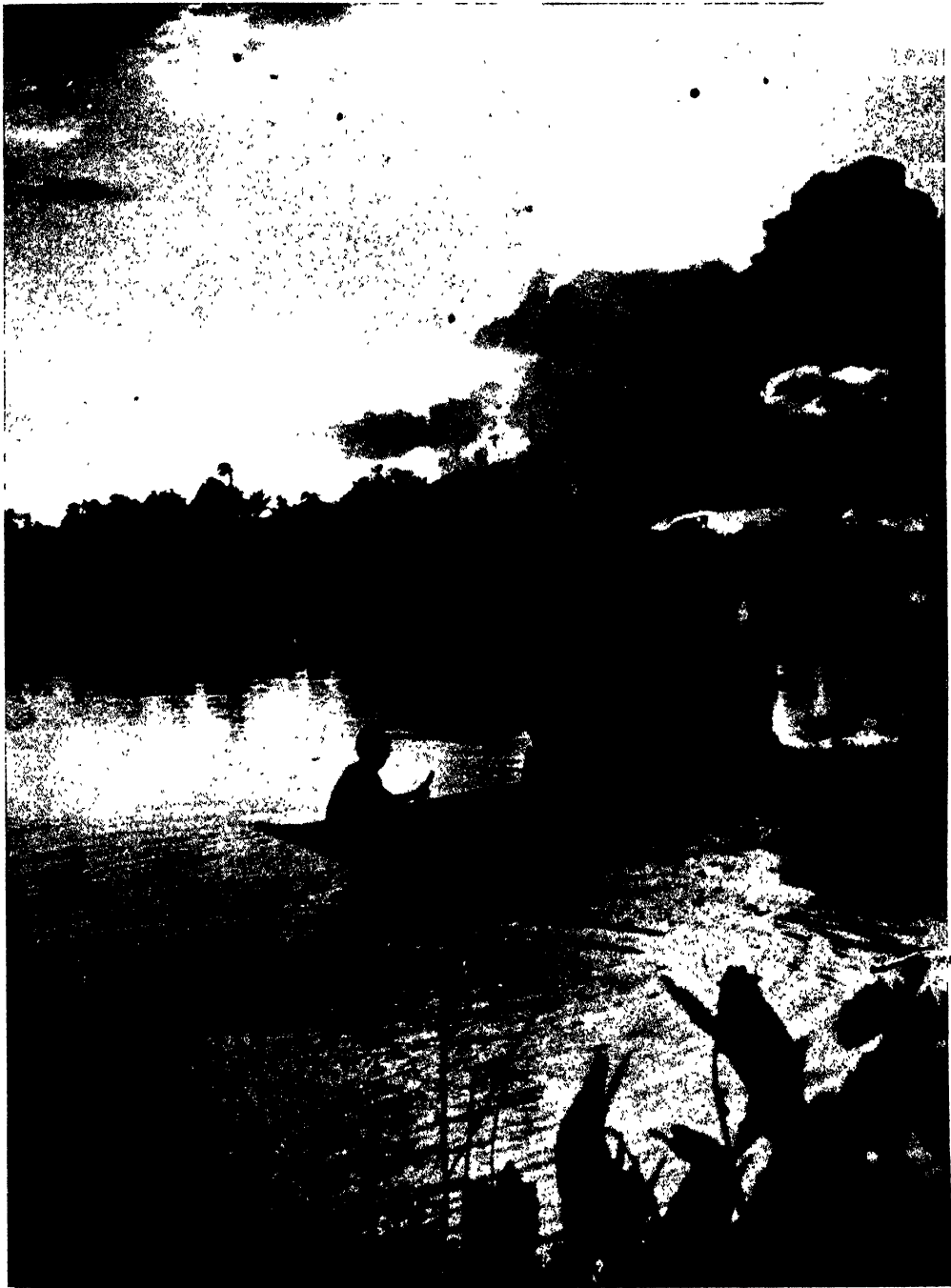
রাঁচীর জোহান প্রপাত

শিল্পী—সুশীল মুখার্জ্জী, গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব্ আর্টস, মাদ্রাজ

বিশেষ প্রশংসনীয় হ'য়েছিল। অমরনাথ, মাস্তক ও অমরসিং এবার দর্শকদের হতাশ ক'রেচে।

মুসলীম—প্রথম ইনিংস

মুস্তাক আলি···কট মানকাদ, ব সি এস নাইডু	৩৪
এস এম কাদ্রি···ব অমর সিং	২৬
দিলওয়ার হোসেন···কট ও ব সি এস নাইডু	৪৫
ওয়াজির আলী···ব সি কে নাইডু	৩৩
নাজির আলি···কট ব্যানার্জ্জি, ব সি এস নাইডু	১৮
জাহাঙ্গীর খাঁ···কট হিন্দেলকার, ব সি কে নাইডু	১৩
সৈয়দ আমেদ···কট অমরনাথ, ব সি এস নাইডু	০
আব্বাস খাঁ··· নট আউট	১৯
আমীর ইলাহী···এল-বি, ব সি এস নাইডু	২
নিসার···কট অমরনাথ, ব সি এস নাইডু	২
মজহর মামুদ···ব সি এস নাইডু	১
অতিরিক্ত	৬
মোট	১৯৯

বোলিং :—	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
এস ব্যানার্জ্জি	৯	০	৩৭	০
অমর সিং	৩১	১৪	৫০	১
অমরনাথ	৬	৩	৭	০
বিজয় মার্চ্চেণ্ট	৪	১	৩	০
জগদ্দল	৩	০	৫	০
সি এস নাইডু	৩০·১	৪	৭৮	৭
সি কে নাইডু	৯	২	১৩	২

হিন্দু—প্রথম ইনিংস

হিন্দেলকার···ব নিসার	৪
মানকাদ···ব আমীর ইলাহী	১৯
অমরনাথ ··কট জাহাঙ্গীর খাঁ, ব নিসার	২৮
সি কে নাইডু···ব আমীর ইলাহি	০
এস ব্যানার্জ্জি···কট জাহাঙ্গীর খাঁ, ব নিসার	১৭
বিজয় মার্চ্চেণ্ট···এল-বি, ব নিসার	৩২
সি এস নাইডু · কট মুস্তাক আলী, ব নিসার	০
জগদ্দল কট ওয়াজির আলি, ব আমীর ইলাহী	১৭
অমর সিং···এল-বি, ব সৈয়দ আমেদ	২২
রঙ্গনেকার···এল-বি, ব নিসার	১৪
ইউ এম মার্চ্চেণ্ট··· নট আউট	০
অতিরিক্ত	৬
মোট	১৫৯

বোলিং :—	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
নিসার	২০	৩	৫২	৬
মজহর মামুদ	৫	১	১৯	০
সৈয়দ আমেদ	১৭·৩	৭	৩৭	১
জাহাঙ্গীর খাঁ	২	০	৯	০
আমীর ইলাহী	১১	৩	৩৬	৩

মুসলীম—দ্বিতীয় ইনিংস

মুস্তাক আলী · ব এস ব্যানার্জ্জি	৩
এস এম কাদ্রি···ব অমরসিং	৩৩
আব্বাস খাঁ···কট বিজয় মার্চ্চেণ্ট, ব ব্যানার্জ্জি	১০
ওয়াজির আলী··· রান আউট	৫২
নাজির আলী · ব সি এস নাইডু	৩
দিলওয়ার হোসেন···কট রঙ্গনেকার, ব সি এস নাইডু	৪৫
সৈয়দ আমেদ এল-বি, ব ব্যানার্জ্জি	০
জাহাঙ্গীর খাঁ·· ব ব্যানার্জ্জি	০
আমীর ইলাহী···কট ও ব সি এস নাইডু	১৯
নিসার···ব সি এস নাইডু	১
মজহর মামুদ নট আউট	৪
অতিরিক্ত	১০
মোট	১৮০

বোলিং :—	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
এস ব্যানার্জ্জি	১৪	২	৫৭	৪
অমরসিং	২৫	৭	২৮	১
সি এস নাইডু	২৫·১	৩	৬৪	৪
সি কে নাইডু	৫	২	৭	০
মানকাদ	৪	২	[illegible]	[illegible]
অমরনাথ	২	০	৯	০

হিন্দু—দ্বিতীয় ইনিংস

হিন্দেলকার···কট সৈয়দ আমেদ, ব নিসার	১৩
মানকাদ···ব আমীর ইলাহি	৭৩
অমরনাথ এল-বি, ব সৈয়দ আমেদ	৫
বিজয় মার্চ্চেণ্ট নট আউট	৮৮
মেজর সি কে নাইডু, ব আমীর ইলাহি	১৮
সি এস নাইডু—এল-বি, ব নাজির আলী	১৪
এস ব্যানার্জ্জি নট আউট	২
অতিরিক্ত	৮
মোট (৫ উইকেট)	২২১

বোলিং :—	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
নিসার	৯	০	৫৮	১
জাহাঙ্গীর খাঁ	১২	২	২৪	০
সৈয়দ আমেদ	১৫	৫	২৫	১
নাজির আলী	৭	১	২০	১
মজহর মামুদ	৩	০	২০	০
আমীর ইলাহী	১৯	২	৮০	২
মুস্তাক আলী	১	০	৬	০

পেণ্টাঙ্গুলার ঃ

হিন্দু ঃ—৫৯১

ইউরোপীয়ান ঃ—১৬৮ ও ১০৬

হিন্দু ১ ইনিংস ও ৩১৭ রানে বিজয়ী।

আর এ্যাসলে
(ক্যাপ্‌টেন—ইউরোপীয়ান)

ইউরোপীয়ানরা প্রথমে ব্যাট ক'রে ১৬৮ রানে ইনিংস শেষ করে। সি এস নাইডু ৩১ রানে ৫টা আর ব্যানার্জ্জি ৬১ রানে ৪ উইকেট পায়। হিন্দুদের প্রথম ইনিংসে রান ওঠে ৫৯১। কোয়াড্রেঙ্গুলার ও পেণ্টাঙ্গুলারে ইতিপূর্ব্বে এত রান কখনও ওঠে নি। মার্চ্চেণ্ট ১৯২, মানকাদ ১৩৩, জয় ৬৪ ও অমরনাথ ৫৭ রান ক'রে। মার্চ্চেণ্ট মাত্র ৮ রানের জন্য ডবল্ সেঞ্চুরী ক'রতে পারলে না, 'চার' ছিলো ২৫টা। ইউরোপীয়ানদের দ্বিতীয় ইনিংস আরও কম রানে শেষ হয়। সি এস নাইডু মাত্র ৩৩ রানে ৭টা উইকেট পেয়েছে।

ডি. মেলো
(ক্যাপ্‌টেন—রেষ্ট)

মুসলীম ঃ—২৯০

রেষ্ট ঃ—১৫৩ ও ১২৬

মুসলীম ১ ইনিংস ও ১১ রানে বিজয়ী।

রেষ্ট প্রথমে ব্যাট ক'রে ১৫৩ রান করে। মুসলীমরা তার উত্তরে ২৯০ রান করে। মাস্তক ৬১, দিলওয়ার ৩৮, নাজির ৩৬ ও ওয়াজিরের ৩৩ রান উল্লেখযোগ্য। রেষ্টদলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় মাত্র ১২৬ রানে; নিসার ২৯ রানে ৫টা উইকেট পায়। হাজারী নট আউট ৫৭।

হিন্দু ঃ—৩২০ ও ১৩১
(২ উইকেট)

পার্শী ঃ—২২০ ও ২৮৩
(৮ উইকেট)

হাজারী

প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী থাকায় হিন্দু বিজয়ী হ'য়েছে।

পার্শীরা প্রথমে ব্যাট ক'রে ২২০ রান করে। ভায়া নট আউট ৮২। হিন্দু তার উত্তরে ৩২০ রান করে; হিন্দুদের আরম্ভ ভাল হয়নি; ৭টা উইকেট পড়ে যায় ১৫৩ রানে। তার পর সি এস নাইডু ও ব্যানার্জ্জি মিলে ১২৮ মিনিট খেলে ১৫২ রান তুলে পেণ্টাঙ্গুলার খেলায় অষ্টম উইকেটের রেকর্ড স্থাপন করে।

কোয়াড্রেঙ্গুলারে ১৯৩৫ সালে লালসিং ও বিজয় মার্চ্চেণ্ট ১৩২ তুলে রেকর্ড ক'রেছিল। নাইডু ১২৬ আর ব্যানার্জ্জি ৫৬ রান করে। দ্বিতীয় ইনিংসে আরো ভালো খেলে পার্শীরা ৮ উইকেটে ২৮৩ রান তোলে। ভায়া এবারও চমৎকার ভাবে খেলে স্বীয় দলের ৮৪ রান করে। সি এস নাইডু ৫টা উইকেট পায় ১২৭ রানে। হিন্দুদলের দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ১৩১ রান হবার পর সময়াভাবে খেলা শেষ হ'য়ে যায়। ভাণ্ডারকার ৬০ রান করে আর অমরনাথ নট আউট ৪১।

রঞ্জি ক্রিকেট ঃ

বরোদা—১২৭ ও ১৬৬

গুজরাট—১০০ ও ১৪১

বরোদা ৫২ রানে বিজয়ী হ'য়েছে।

গুজরাটের প্রথম ইনিংসে খেলায় বরোদার বি নিম্বলকার ১৬ রানে ৩ উইকেট এবং অধিকারী মাত্র ২ রানে ৩টি উইকেট পায়। গুজরাটের বালোচ প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ৫২ রানে ৪ এবং ৫৬ রানে ৭টি উইকেট পেয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়

দেয়। গুজরাটের ঠাকুর সাহেবের ৫০ উভয় দলের সর্ব্বোচ্চ রান। বরোদা পশ্চিম অঞ্চলের ফাইনালে নওনগরের সঙ্গে খেলবে।

এ, হোসেন, দিল্লীতে ৫২½ ঘণ্টা অবিরাম সাইকেল চালিয়ে নূতন রেকর্ড স্থাপন ক'রেছে

হায়দ্রাবাদ— ৪৪৩

মাদ্রাজ— ২৬২ ও ১৭৯

হায়দ্রাবাদ ১ ইনিংস ও ২ রানে মাদ্রাজকে পরাজিত ক'রেছে।

হায়দ্রাবাদের হাদি ১০৬, আসাদুল্লা ৮৯ ইউ আমেদ ৬৬, হোসেন ৫৪ ও প্যাটেলের ৫০ রান উল্লেখযোগ্য।

হায়দ্রাবাদের মেটা মাদ্রাজের ২ ইনিংসে মাত্র ৪৯ রানে ৬টি উইকেট পায়। ভাদুড়ী (মাদ্রাজ ২য় ইনিংস) দলের সর্ব্বোচ্চ ৬৬ রান ক'রে নট্ আউট থাকে।

পশ্চিম ভারতীয় ষ্টেট—২৬৬ ও ২১০ (৩ উইকেট)

সিন্ধু—১২৭ ও ৯২ (৩ উইকেট)

পশ্চিম ভারতীয় ষ্টেট প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী থাকায় বিজয়ী হয়।

পশ্চিম ভারতীয় ষ্টেট প্রথমে ব্যাট ক'রতে নেবে মাত্র ৯৯ রানে ৮টা উইকেট হারায়, কিন্তু নবম উইকেটে সৈয়দ আমেদ ও রাথোদের সহযোগিতায় ১৫৯ রান যোগ হয়। সৈয়দ করে ১০১ আর রাথোদ ৭১। সিন্ধুর প্রথম ইনিংস শেষ হয় মাত্র ১২৭ রানে। সৈয়দ মাত্র ২৩ রানে ৫টা উইকেট পায়। পশ্চিম ভারতীয় ষ্টেটের ২য় ইনিংসে ৩ উইকেটে ২১০ রান উঠে। রাথোদ ও মানভাদারের চিফ্ যথাক্রমে নট আউট ৯১ ও ৮৮ থাকে। সিন্ধুর ৩ উইকেটে ৯২ রান হয়। দীপচাঁদ করে ৪৯।

বাঙ্গলা—২৯৭

বিহার—১৩৫ ও ১১১

বাঙ্গলা বিহারকে ১ ইনিংস ও ৫১ রানে পরাজিত ক'রেছে।

কোন ইউরোপীয়ানরা এ বৎসর বাঙ্গলার হ'য়ে খেলেনি। রঞ্জি ক্রিকেট খেলায় কার্ত্তিক বসু এ বৎসর প্রথম বাঙ্গলার ক্যাপটেন হ'লেন।

বিহারের প্রথম ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ রান এস ব্যানার্জ্জির ৪৮; বাঙ্গলার এস দত্ত মাত্র ৩২ রান দিয়ে ৬টা উইকেট পায়। নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জির ২ রানে ২ উইকেটও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গলার প্রথম ইনিংসে রেঞ্জার্সে'র এস হ্যামণ্ড দলের সর্ব্বোচ্চ ৭২ রান করে, ৮টা 'চার' ও ৩টা 'ছয়' ছিলো। কে বসুর ৬৭, নির্ম্মল চ্যাটা-

কে. বোস (ক্যাপ্টেন—বাঙ্গলা) এন চ্যাটার্জ্জি
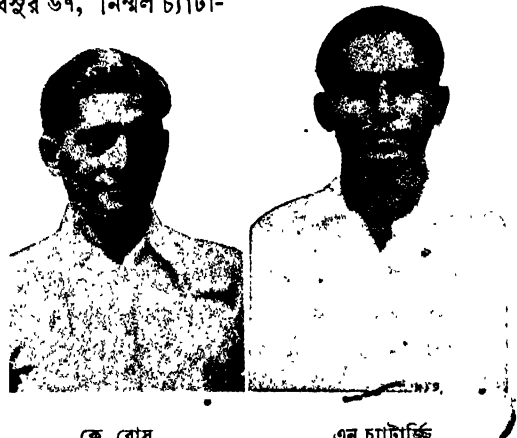
র্জ্জির ৪২ ও কে রায়ের ৪০ রানও উল্লেখযোগ্য। খাম্বাটা ১০৯ রানে ৫ উইকেট পান।

বিহারের দ্বিতীয় ইনিংসে নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জি মাত্র ৬ রানে ৩ উইকেট নিয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

টেনিস্ঃ

সাউথ ক্লাবের তত্ত্বাবধানে বাজ, ভাইন্স, টিলডেন প্রভৃতির ভারত-ভ্রমণের ব্যবস্থা যে বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য সম্ভব হয় নি তা পূর্ব্বেই প্রকাশিত হ'য়েছিলো। উপস্থিত

আবার জানা গেলো চীনের ১নং খেলোয়াড় খো-সিন-কী, যাঁর আসা নাকি সুনিশ্চিত ছিলো, তিনিও আসবেন না। পুনসেকের জাপান থেকে ১৫ই আর মিটিকের জাগ্রেব থেকে ২৩শে এখানে আসবার কথা। সাউথ ক্লাব থেকে মিটিককে এক সপ্তাহ আগে আসবার জন্য অনুরোধ করা হ'য়েচে।

অল্ ইণ্ডিয়া টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপে খেলবার জন্য কোন্ কোন্ প্রদেশ কোন্ কোন্ খেলোয়াড়কে মনোনীত ক'রেচে তার তালিকা দেওয়া হ'ল।

পাঞ্জাব :—সোহানী, সোনী, প্রেম পান্ধী ও ইফ্‌তিকার আমেদ।

দিল্লী :—ডাঃ ভদ্র।

সিন্ধু :—বি টি ব্লেক, ফ্রজার, কুমারী দিনশা ও কুমারী ডুবাস।

বোম্বাই :—কুমারী লীলা রাও ও ভাণ্ডারী।

মান্দ্রাজ :—রামনাথম্, শিবস্বামী, জানকী রামাইয়া, ববজী ও সাবুর।

ডবলস্—রমা রাও ও নারায়ণ রাও; রামনাথম্ ও মুলার; সাবুর ও কৃষ্ণস্বামী।

ইউ পিঃ—গাউস মহম্মদ, যুধিষ্ঠির সিং, কাপুর, ইসলাম আমেদ ও ভগবন্ত সিং।

বাঙ্গলা :—দিলীপ বসু, মদনমোহন, মিচেলমোর, সি এল মেটা, শ্রীমতী বোলাণ্ড, শ্রীমতী ইডনি, শ্রীমতী ফুটিট ও শ্রীমতী হার্ভেজনষ্টোন।

ডবলস্—দিলীপ বসু ও মিচেলমোর।

মিক্সড্ ডবলস্—সি এল মেটা ও শ্রীমতী হার্ভেজনষ্টোন।

উত্তর ভারত টেনিস ফাইনাল ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলসে—ইফতিকার আমেদ ৬-৩, ২-৬, ৭-৫, ৮-৬ গেমে সোহনলালকে পরাজিত ক'রেছেন।

পুরুষদের ডবলসে—এস সোহানী ও এইচ সোনী ৭-৫, ৯-৭, ৯-৭ গেমে ইফতিকার আমেদ ও প্রেম পান্ধির নিকট বিজয়ী হ'য়েছেন।

মিক্সড ডবলসে—ইফতিকার আমেদ ও মিস্ উডব্রিজ ৬-৪, ৬-৪ গেমে এস সোহানী ও মিস ডুবেশকে পরাজিত ক'রেছেন।

পেশাদার সিঙ্গলসে—সিরজুল হক ৬-০, ২-৬, ৬-২, ৬-৩ গেমে আল্লাবক্সের নিকট জয়ী হ'য়েছে।

মিস্ লীলা রাও এস্ সোহানী

মহিলাদের সিঙ্গলসে—মিস্ লীলা রাও ৬-১, ৬-৩ গেমে মিস্ উড্‌ব্রিজকে পরাজিত করেন।

বালকদের সিঙ্গলসে—নরেন্দ্রনাথ ৬-০, ৯-৭ গেমে এম থাপুরকে পরাজিত ক'রেছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী "জীবন-প্রবাহ"—৩৲
শ্রীসুরেশ বিশ্বাসের কবিতার বই "কলহংস"—১।•
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বই "কুটীরের গান"—১।•
শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষের সচিত্র ভ্রমণ "দক্ষিণ ভারত-পথে"—২৲
শ্রীকরুণাকণা গুপ্তার উপন্যাস "মহানগরীর উপাখ্যান"—১॥•
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের উপন্যাস "সাধের কাজল" ২৲
শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদের কবিতা "প্রবর্ত্তিকা"—৷৴•
মির্জ্জা সোলতান আহ্‌মদের শিশু উপন্যাস "রমা"—॥•
শ্রীঅম্বিকাচরণ চৌধুরী প্রকাশিত "দেববাণী", ১ম খণ্ড—॥৵•
শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের "ভারতের মুসলমান—হিন্দুমার সন্তান"—৷৴•
শ্রীমতী তুষারমালা দেবীর "কাটছাট : বুনন : ছুঁচের কাজ"—১৲
শ্রীহীরালাল ভট্টাচার্য্যের "আয়ুবৃদ্ধির উপায়", ১ম ভাগ—১৲
শ্রীসুনির্ম্মল বসুর শিশু কবিতা "মন ছোটে মোর তেপান্তরে"—॥•
শ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ব্যাখ্যাত "মন্ত্র ও পূজারহস্য" (ধর্ম্মগ্রন্থ)—॥৵•

সম্পাদক
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ || শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons,
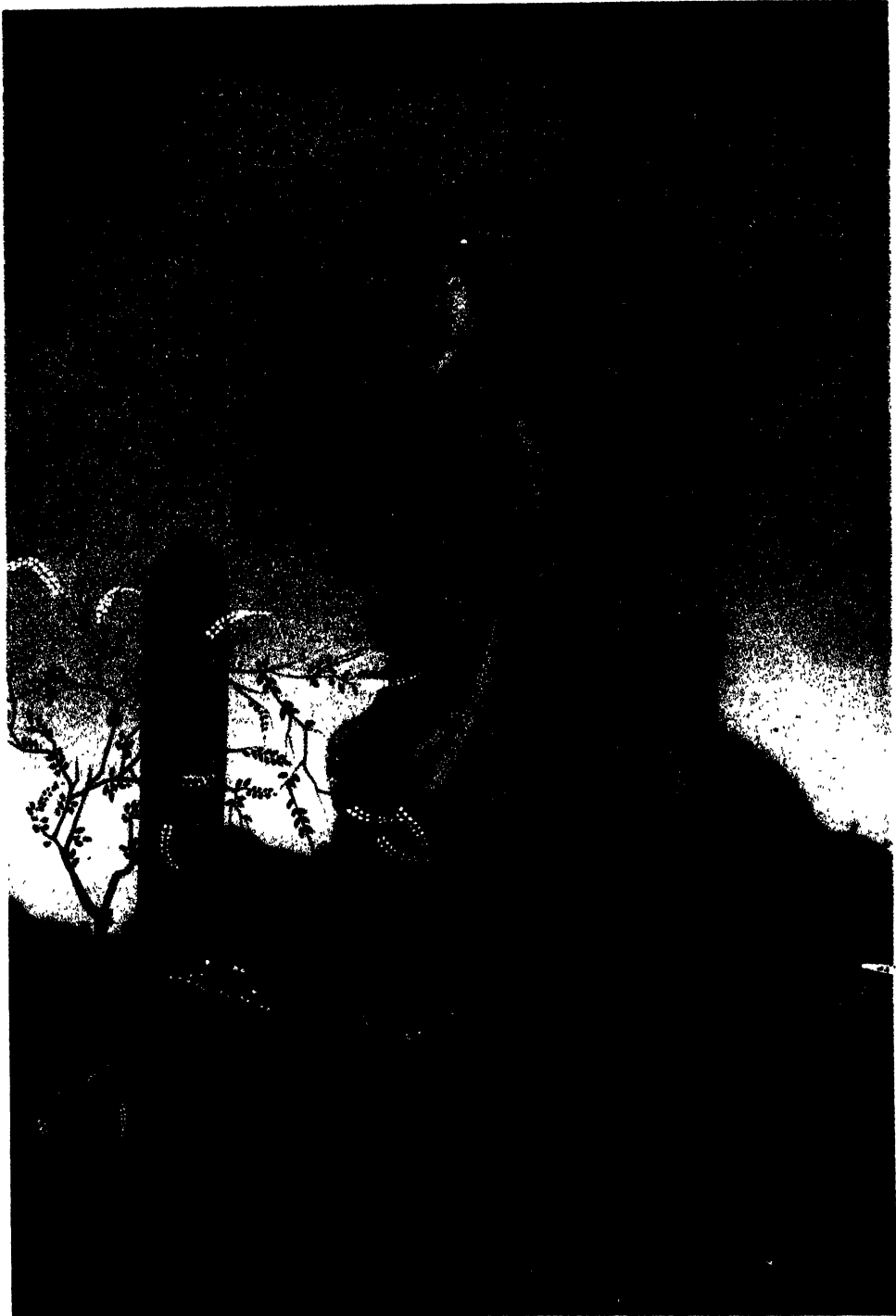
শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভুবন বর্ম্মা   অবিচ্ছিন্ন প্রেম   ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

মাঘ—১৩৪৬

দ্বিতীয় খণ্ড | সপ্তবিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

বাহিরের বিশ্ব

ডক্টর শ্রীসুরেশ দেব ডি-এস্‌সি

বিজ্ঞানের সূত্রপাত গোড়ায় মানুষের জীবনধারণের দৈনন্দিন তাড়নায় হ'য়েছিল বা বিনা প্রয়োজনে, অর্থাৎ নিজের অন্তরের নিছক কৌতূহলপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার তাড়নায় হ'য়েছিল—তা ঠিক ক'রে বলা কঠিন। বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানচর্চ্চা যদি সেই প্রথম কালের বিজ্ঞানচর্চ্চারই বিকশিত অবস্থা বলে ধরা যায়, তবে বলতে হয় যে বিজ্ঞান-চর্চ্চার মূলে ওই ছুটো ব্যাপারই সুগুপ্ত রয়েছে। তাই যারা বিজ্ঞানচর্চ্চা করে, তারা তা থেকে যে জ্ঞানলাভ করে তাকে তারা নিজের কাজেও লাগায়—আর তা নিয়ে নিজের অমূল্য সময় আর ততোধিক অমূল্য মস্তিষ্ক দুই-ই নষ্ট করতে লেগে যায়। অন্তরের অহেতুক কৌতূহলপ্রবৃত্তি, যে প্রবৃত্তি সব জিনিষের ভিতরের কথা খুঁজে বের করবার জন্য তাকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করায়, ঐশ্বর্য্যকে সম্মানকে তুচ্ছ করতে শেখায়, সর্ব্ববিধভাবে অন্যাধীন অবস্থার মাঝে থেকেও তার মনে অপরিমিত দুঃসাহস এনে দেয়, তার তাড়নায় বৈজ্ঞানিকও তার নিজের চারিদিকের সব কিছুর অর্থ খুঁজে পেতে চায়। সে যা দেখে, যা শুনে, যা নেড়ে চেড়ে পায়—তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তার দেখা, শুনা, নাড়াচাড়ার মধ্যে সে সম্বন্ধ দেখবার চেষ্টা করে। তার দেখার অন্তরালে যে রয়েছে—সে চায় তার সন্ধান পেতে। সে পাবার চেষ্টা করে সেই প্রথম মূল রহস্যটি, যাকে জানতে পারলে তার যখনই যে রকম কৌতূহলই মনে জাগুক না কেন, তা তৎক্ষণাৎ আপনাআপনিই চরিতার্থতা লাভ করবে।

বৈজ্ঞানিকের বিচরণ ক্ষেত্র হল বাইরের জগৎ। তার 'আমি' ব'লে একটা বোধ আছে। এই 'আমি'টাকে

বাদ দিয়ে বাদবাকী সব কিছুই তার বাইরের জগতের অন্তর্গত। এই বাইরের জগতের যা সব থেকে কঠিনতম-ভাবে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে আসে, তাকে আমরা বলি জড়পদার্থ। তাই বিজ্ঞানের প্রধান কাজ এই জড়-পদার্থের মূল অন্বেষণ করা। জড়পদার্থ নিয়ে বৈজ্ঞানিক তার চর্চ্চায় লেগে গেল। কিন্তু ফলস্বরূপ এই পেল যে, বাইরের যা কিছু জড় তা বাইরের বাহিরটা মাত্র। ভিতরে সে অতিশয় চঞ্চল, অসম্ভব অস্থির। সে অস্থিরতার মুহূর্ত্তমাত্রও বিরাম নেই। শুধু তাই নয়। সে দেখলে যাকে সে জড় বলে দেখছে তা বিদ্যুণ্ময়—তেজ দিয়ে তৈরী। তার সামনের অনু থেকে বৃহৎ পর্য্যন্ত সবই স্বভাবতঃ চাঞ্চল্যময়—বিদ্যুৎ দিয়ে তৈরী, তেজ দিয়ে পরিপূর্ণ। সে মনে করলে এইবার একটা কিছু গোড়ার কথা পাওয়া গেল। একটা মূল রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন হ'ল।

বিশ্বপ্রকৃতিকে বলে থাকে সে অনন্ত রহস্যময়ী। তার হৃদয় বলে কিছু বোধহয় নেই—তাই সে বধিরা, নিষ্ঠুরা। আমি কিন্তু অনেক সময় তাকে কল্পনা করি অন্যভাবে। চিনবার আর চেনাবার যে দুর্ব্বলতা নিয়ে মানুষ তার চারিদিক দিয়ে পরিবেষ্টিত, বিশ্বপ্রকৃতিকেও সেই দুর্ব্বলতা দিয়ে মণ্ডিতভাবে কল্পনা করতে আমার অনেক সময় ভাল লাগে। মানুষের আপ্রাণ চেষ্টায় বিগলিত হ'য়ে কোন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে সে এক কণা করুণা বিতরণ করে ফেলেছে। এই করুণা বিতরণের দুর্ব্বলতা ঢাকতে গিয়েই সে বোধ হয় আরও অনেক বড় রহস্যের সন্ধান জানিয়ে গেল। সে বলে দিল যাকে জড় দেখছ তা জড় নয়—জড়ের বিপরীত, যা তোমার বাইরে রয়েছে দেখছ—তার মূল রহস্য রয়েছে বাইরে নয়—তোমারই মধ্যে। আর এইবার হয়ত সে বলবে যে, ধরা না দেওয়াই যার স্বভাব বলে জেনে রেখেছ সে প্রথমে এসে ধরা দিয়েছে।

এই যে তিনটা কথা বলা হ'ল, এর প্রথমটা সম্বন্ধে আজকাল অনেকেরই কোনও সন্দেহ নেই। শেষটার সন্ধান পেলে বৈজ্ঞানিকের মত নীরস ব্যক্তিও এত আত্ম-সমাহিত হ'য়ে পড়বে যে তার কাছ থেকে আর কোনও কথা বার করা সম্ভব হবে না—অতএব এর কোনও আলোচনা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। আমার বক্তব্য ওই মাঝের কথাটা নিয়ে। সে কথাটা এই—যা কিছু আমার বাইরে বলে আমি দেখি, বুঝতে পারি, নাড়াচাড়া করি, তার সমস্তেরই মূল রয়েছে আমার পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই। আমার অভিজ্ঞতার জগৎ গঠিত হয়েছে আমাকে দিয়েই। আমার দৃশ্যমান জগতে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছি—আমিই। যাকে সত্যিকারের বাহির বলা যেতে পারে, সে সর্ব্বরকম ভাবে আমারই অন্তরালে গা ঢাকা দিয়ে আত্ম-গোপন ক'রে আছে। "অভিজ্ঞতার বাহিরে" (objective reality) চর্চ্চায় "সত্যিকারের বাহির" (ultimate realityকে) পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। বিজ্ঞান কেমন ক'রে কিসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে এই আপাতঃ অবৈজ্ঞানিকের মত কথা বলতে আরম্ভ করেছে, আমার এই আলোচনার তাই প্রধান বক্তব্য বিষয়।

বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় প্রধানতঃ আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের ভিতর দিয়ে। অথচ এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকের পরস্পরের সঙ্গে স্বভাবতঃ যোগ নেই। তারা প্রত্যেকেই নিজে নিজের ক্ষেত্রে পূর্ণ। গন্ধ পেলে তা থেকে তার রূপের পরিচয় আমরা পাই না, শব্দ শুনেই তার গন্ধ পাওয়া যায়—একথা বিজ্ঞানে অচল। অতএব আমাদের এই পাঁচটা ইন্দ্রিয় আমাদের কাছে পাঁচটা বিভিন্ন—অথচ নিজের মধ্যে নিজে পূর্ণ—জগতের সঙ্গে পরিচিত করায়। জগতের সত্য পরিচয়ের পক্ষে এ একটা অন্তরায়। তাই বিজ্ঞান পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের কাজই একটা মাত্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নেবার পক্ষপাতী। এতে ক'রে তার আর একটা সুবিধা হবারও সম্ভাবনা। যে জ্ঞান পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পাঁচটা স্বতন্ত্র রূপ প্রাপ্ত হ'য়ে পাঁচটা বিভিন্ন জ্ঞান হ'য়ে আমাদের কাছে প্রকাশ পেত, তা এইভাবে শুধু একটা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেলে পাঁচগুণ হ'য়ে উঠবার সম্ভাবনা। তা যাই হোক না কেন, আমরা জানি যে আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয়ই নানাভাবে আমাদের ভ্রান্ত করবার চেষ্টা করে। সকলে অবশ্য সমানভাবে করে না, কোনওটা বেশী করে আর কোনওটা কম। বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের বিশেষ অভিজ্ঞতা থেকে স্থির করেছেন যে পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমরা আমাদের চোখেরই ওপর সবচেয়ে নির্ভর করতে পারি। তাই বিজ্ঞানের যা কিছু অভিজ্ঞতা তা সমস্তই পর্য্যবসিত করবার

চেষ্টা হয় চোখে দেখার মধ্যে। বিজ্ঞান কিভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কাজ চোখে-দেখায় নিয়ে যায় তা কৌতূহলের ব্যাপার হ'লেও তার আলোচনা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।

এই চোখে দেখার প্রধান বাহক হ'ল আলো বা প্রকাশ। কাজেকাজেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগতের সঙ্গে পরিচিত হবার প্রধান আর বোধহয় একমাত্র উপায় হ'ল আলো। এই আলো ব্যাপারটির একটি অদ্ভুত আচরণ আছে। এই আচরণটি তার নিজস্ব, জগতের আর কিছু তার এই আচরণটিকে নিজের বলে স্বীকার করে কিনা সন্দেহ। একটা উদাহরণের মধ্য দিয়ে আলোর এই আচরণটিকে বলবার চেষ্টা করি। এ যুগে বিমান যুদ্ধই হ'ল সব থেকে আধুনিক যুদ্ধ। একটা বিমানকে সামনে আর পিছন থেকে দুটো বিমান তাড়া করেছে, আর সে পালাচ্ছে তার সুমুখের বিমানটার দিকে। সামনের আর পিছনের দুটো বিমানই তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। দুটো গুলিই এসে তার গায়ে লাগল। এটা বোঝা বোধহয় কঠিন হবে না যে—যে বিমানটার দিকে সে উড়ে চলেছে সেখান থেকে যে গুলিটা তার গায়ে লাগবে তার জোর অন্য গুলিটার চেয়ে বেশী হবে। আর বাস্তবিক পক্ষে এমনি হয়ও। তার সামনের যে বিমান তার দিকে এগিয়ে আসছে, তার গুলির বেগ বা গতি অন্যটার থেকে তার কাছে অনেক বেশী বলে মনে হবে। কিন্তু গুলির পরিবর্ত্তে তেড়ে আসা বিমান দুটো যদি সে বিমানটার প্রতি আলো ফেলে আর এই আলোর গতি সে যদি কোন রকমে মাপতে পারে তবে সে তাতে কোন রকমের তফাৎ পাবে না। দুটো বিমান থেকেই সে সমান গতিতে আলো আসতে দেখতে পাবে। তার নিজের চলবার গতি যেমনই হোক না কেন, যে আলো তার কাছে এসে পৌচুচ্ছে তার গতি তার কাছে সব সব সময়েই এক রকমের হ'য়ে দেখা দেবে।

আমরা যত জোর বা যত আস্তেই চলি না কেন, আলোর গতি আমাদের কাছে সব সময় সকল ক্ষেত্রে একই রকম পাওয়া যাবে। আধুনিক বিজ্ঞানের এইটি একটি খুব বিস্ময়কর আর ততোধিক অবিচলিতভাবে নির্দ্ধারিত তথ্য। তার সমস্ত ইমারতের ভিত্তি হ'ল এই। আপাতঃ দৃষ্টিতে এতে বিস্ময়ের কিছু আছে বলে মনে হয় না, কিন্তু এই সাধারণ কথাটির অন্তরালে কি অদ্ভুত ব্যাপার লুকিয়ে আছে তা এর পর প্রকাশ পাবে।

মাঝের বিমান-চালক আলোর গতি থেকে জানতে চেষ্টা করে—কার দিকে সে চলেছে আর কার কাছ থেকে সে পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এভাবে তা জানা অসম্ভব, কারণ তার কাছে দুজনকারই আলোর গতি এক। অথচ সে জানে যে এই রকম এক হ'য়ে যাওয়া সম্ভব নয়—কারণ তা যুক্তি আর তার সাধারণ অভিজ্ঞতার বিপরীত। অথচ কেন এমন হয়। এর একমাত্র সমাধান এই যে—যে যন্ত্রটি দিয়ে সে আলোর গতি নির্দ্ধারণ করছে এ মাপতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এমনভাবে বদলে যাচ্ছে যে আলোর গতি সব সময়েই সমান থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ তার চলার বেগের অল্প হওয়ার আর বেশী হওয়ার ওপর তার মাপবার যন্ত্রটির আকার নির্ভর করছে। এ একটা অবিশ্বাস্য সিদ্ধান্ত। কিন্তু আলোর গতির একই রকম হওয়া স্বীকার করলে এ ছাড়া আর অন্য পথ নেই।

গতি মাপবার যন্ত্রটিকে অবশ্য আমরা আমাদের গতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আকারে পরিবর্ত্তন হ'তে দেখি না। তাকে ত সমাকারে সব সময় পাই। তার উত্তর—শুধু যে মাপবার যন্ত্রটি বদলাচ্ছে তাই নয়, আমার সম্পর্কিত সব কিছুই আমার গতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হচ্ছে—মায় আমার চোখের রেটিনা পর্য্যন্ত, যেখানে মাপবার যন্ত্রটির ছবি এসে পড়ে তাকে আমরা দেখতে পাই। সবই সমান ভাবে এক তাল রেখে বদলাচ্ছে তাই আমার নিকটের কোনও কিছুকে পরিবর্ত্তিত হ'তে পাওয়া যাচ্ছে না। আকারের এই পরিবর্ত্তন দেখতে পাওয়া যায় দূরের জিনিষের মধ্যে। দূরের জিনিষ মানে—যে জিনিষ আমার সঙ্গে সমান ভাবে চলছে না, আমার সম্পর্কে যার গতি কখনও বাড়ছে বা কখনও কমছে। দূরের জিনিষের আকার গতির হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হতে থাকে।

এই সিদ্ধান্তটি আমাদের সাধারণ ধারণার এতই বিপরীত যে এ নিয়ে আরও একটু আলোচনা না করলে তা হয়ত পরিষ্কার হবে না। সিদ্ধান্তটি এই—আমার চলবার গতির সঙ্গে সব জিনিষের আকার পরিবর্ত্তিত হয়। অর্থাৎ আমার চারি পাশের সব জিনিষের আকার নির্ভর করে আমার গতির ওপর। অতএব আমার দৃশ্যমান

জগতের মধ্যে আকার বলে যে ব্যাপারটি রয়েছে তার মূল রয়েছে আমারই গতি নামক এক অবস্থার মধ্যে—বাইরের জগতের মধ্যে নয়।

বলা যেতে পারে যে বাইরের জগতের নিজের একটা সত্যিকারের আকার আছে। তবে এই সত্যিকারের আকারের ওপর আমার নিজের গতি দিযে আরোপিত আকার মিশে আমরা যে আকার দেখতে পাই তা হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তাও হবার সম্ভাবনা নেই। বাইরের জগতের একটা সত্যিকারের আকারের সঙ্গে সঙ্গে আমারও একটা সত্যিকারের নির্দ্ধারিত গতি থাকার প্রয়োজন। অথচ আমার সত্যিকারের গতি কত, তা পাওয়া যায় না। এই পৃথিবী মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে। তার এই ছুটে চলার একটা গতি আছে। সে গতি কত তা জানবার উপায় নেই। সে গতির পরিমাণ কিছু না থেকে অসীম অর্থাৎ আলোর গতির কাছাকাছি পর্য্যন্ত সবই হওয়া সম্ভব। এটা যে কত তা জানা আমাদের সাধ্যের বাইরেও এটা তাই unknowableএর পর্য্যায়ে গিয়া পড়ে। এ একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত যে, যা unknowable তার অস্তিত্বও নেই—অর্থাৎ non-existance, তাই বলতে হয় শূন্যের তুলনায় আমাদের গতির কোনও অর্থ হয় না। কাজেকাজেই বাইরের জগতের নিজস্ব সত্যিকারের আকারের কোনও অর্থ হয় না।

তবে "আকারটা কি" এই প্রশ্ন এসে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। আকার একটা সম্পর্ক মাত্র। সব সম্পর্কই আমার অবস্থার ওপর-নির্ভর করে। কাজে কাজেই আকার যে আমার নিজের অবস্থার ওপর নির্ভর করবে এতে বিস্মিত হবার স্থান নেই। শুধু আকার কেন, বাইরের যা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মধ্যে ধরা পড়ে সমস্তই মূলে সম্পর্ক মাত্র। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ দিয়ে গঠিত যে জগৎ আমাদের বাহির বলে পরিচিত, তার সবটাই সম্পর্ক মাত্র। এই সম্পর্কের সমস্তই নির্দ্ধারিত হয়েছে আমাকে দিয়েই। অতএব বাইরের জগতের সব কিছুর মূল নিহিত হয়েছে আমার কাছে, আমারই অবস্থার মধ্যে। তাই বলতে হয় আমার জগৎকে তৈরী করেছি আমি নিজেই। সত্যিকারে যা "বাহির" তা সর্ব্ব অবস্থায় অজানিত। তাই কবির কাছ থেকে ভাষা ধার করে বলতে হয়—

যত ছল করে যত ঘুরে মরি জগতের পিছু পিছু
কোনদিন কোন গোপন খবর নূতন মিলে না কিছু।

আমরা আমাদের বাইরে যা আছে তার অন্বেষণে বেরিয়েছিলাম। পরিদৃশ্যমান জগতের মাঝে তাকে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখলাম। "বাইরের" (reality) সন্ধান তা থেকে পাওয়া গেল না। যাকে বাহির বলে মনে করতাম কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে তা আমারই অবস্থার রূপান্তর মাত্র। অন্য আর একভাবে তারই সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। দেখা যাক্ এবারে তাকে ধরতে পারা যায় কিনা।

বাইরের জগৎ সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা আছে যে তা অসীম। জগৎ যে ক্ষেত্রে অসীম, সেখানে তার মাঝে "সত্যিকারের বাইরের" সন্ধান পাওয়া হয়ত সম্ভব। জগতের এই অসীমত্বকে নিয়ে বিচার ক'রে দেখা যাক, তা থেকে কি উদ্ধার করতে পারি। দূরত্ব যখন সীমা লঙ্ঘন করে তখন আমরা অসীমের সন্ধান পাই। দূরত্বের একটা বিশেষ অর্থ আছে। যে আমার সঙ্গে এক তালে পা ফেলে চলছে সে আমাদের দূরের বস্তু নয়। যে আমার গতির তুলনায় ভিন্ন গতিতে চলছে সেই হ'ল আমাদের দূরের বস্তু। যার গতি যত বেশী সেই তত দূরে চলে যাবে—আর শেষ পর্য্যন্ত আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে। এই ক্ষুদ্র ভূমিকার পর এইবার আবার আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত বিমান তিনটিকে নিয়ে আসা যাক। সেবারে মাঝে যে বিমানটি রয়েছে শুধু সেই তার চারিদিক থেকে যে আলো আসছে তার গতি মেপেছিল। সে পেয়েছিল যে যেদিক দিয়েই আলো আসুক না কেন, আর তার নিজের যে রকমই গতি হোক না কেন, তার কাছে আলোর গতি সর্ব্বদা সমান থাকে। অর্থাৎ তার কাছে তাকেই কেন্দ্র ক'রে সমস্ত জগৎ তার চার পাশে ছড়িয়ে রয়েছে। সে নিজের এই বিশেষ গৌরবের অবস্থার কথা তার দুইজন আক্রমণ-কারী প্রতিবেশীকে জানাল। একথা শুনতে পেয়ে দুইটি বিমান থেকে একই উত্তর এল—"তোমার নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হ'য়েছে। আমিই আছি সকলের কেন্দ্রস্থানে, কারণ

আমার কাছে যে সব আলো যেদিক দিয়েই আসুক না কেন, সকলের গতিই সমান রয়েছে। আমার কাছেই যখন সব আলোর গতি অপরিবর্ত্তিত তবে তা তোমার কাছে কিছুতেই অপরিবর্ত্তিত থাকতে পারে না।" শুধু তিনটি বিমানই নয়। জগতের প্রত্যেক বিন্দুই বলে আমিই জগতের কেন্দ্রে বর্ত্তমান—কারণ আমারই কাছে আলোর গতি সব অবস্থাতেই এক রকম। প্রত্যেকেই বলছে আমিই ঠিক আর অন্য সকলে ভুল। এ এক আশ্চর্য্য পরিস্থিতি।

এই থেকে মনে হয় বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে পক্ষপাতিত্ব দোষ নেই। তার কাছে সকলেই সমানভাবে বর্ত্তমান। বলবার কোনও উপায় নেই যে একের কথাই ঠিক, আর দুইএর কথা ঠিক নয়; যদিও তারা পরস্পরকে অপরে ভুল করছে বলে দোষ দেয়। কিন্তু কোথাও পক্ষপাতিত্ব দেখা দিলে যেন আমাদের পক্ষে সুবিধা হ'ত। অন্ততঃ তাকে ধরে, তার সাহায্যে বিশ্ব প্রকৃতির নিজের রাজ্যে প্রবেশ করার পথ পাওয়া যেত। কিন্তু তা ত হবার নয়। এখানে প্রত্যেকেই বলে আমিই কেন্দ্র স্থানে, আর আমারই কথা নির্ভুল। অথচ প্রত্যেকের এই কথা সমানভাবে সত্য। এ বিরোধের মীমাংসা কোথায়?

এ বিরোধের মীমাংসা করতে হ'লে আমাদের কল্পনাকে সচেতন ক'রে তুলতে হবে। সমাধান খুবই সরল, খুবই স্পষ্ট—কিন্তু মুস্কিল এইখানে যে শুধু যুক্তি দিয়ে সেখানে পৌছান যায় না। ধরা যাক একটা প্রকাণ্ড বলের পিঠের ওপর সমস্ত বিশ্ব ছড়িয়ে রয়েছে। বর্ত্তুলটির স্বাভাবিক নিয়মেই তার পিঠের প্রত্যেক বিন্দুই সম্পূর্ণভাবে একই অবস্থার অধীন। প্রত্যেক বিন্দুই মনে করে তারই চতুর্দ্দিকে সমানভাবে সব কিছু ছড়িয়ে রয়েছে, আর সেই তার কেন্দ্রে রয়েছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রেও ঠিক এই ব্যাপার বর্ত্তমান। যে বিরোধ সামনে এসে উপস্থিত হ'য়েছিল তার একমাত্র সমাধান রয়েছে এই কল্পনার মধ্যে। বিশ্বজগৎ বেঁকে চুরে গিয়ে একটা বর্ত্তুলের মত হ'য়ে গিয়েছে। আর গোল জিনিষের পিঠের ওপরে যেমন কোনও কিছুর কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে না, সকলকারই অবস্থা একই রকম হয়, তেমনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক দ্রষ্টারই অবস্থা একই রকম। এক যেভাবে অপরকে দেখতে পায়, প্রত্যেক অপরেই ঠিক সেইভাবে সেই এক আর অন্য অপরকে দেখে। এইভাবে দেখলে আলোর গতি প্রত্যেকের কাছে, ব্রহ্মাণ্ডের নিজের স্বভাবেই, একই রকম হ'তে হবে।

অতএব আমরা পেলাম যে বাহিরটা স্বভাবতঃ একটা প্রকাণ্ড বর্ত্তুলের মত। বর্ত্তুল অর্থাৎ 'বলে'র মত হলেও আমাদের খেলার মাঠের পরিচিত ফুটবলের থেকে তার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ফুটবল খেলার বলের পিঠটা তল (Surface) দিয়ে তৈরী। ব্রহ্মাণ্ডরূপী যে ফুটবলটাকে আমরা এইমাত্র আবিষ্কার করলাম, তার পিঠটা তৈরী হয়েছে Surface দিয়ে নয় Volume (আয়তন) দিয়ে। এই জিনিষটার ঠিক কল্পনা হওয়া আমাদের সম্ভব নয়। আমরা সেই সব জিনিষই কল্পনায় আনতে পারি, যা আমরা কোনও সময়ে আমাদের পাচটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানতে পেরেছি। আয়তনকে (Volume) তল (Surface) ভাবে আচরণ করতে যাওয়া আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্ষমতার বাইরে। কাজে কাজেই তা আমরা ঠিক মত কল্পনাতেও আনতে পারি না। যদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত কোনও ইন্দ্রিয়ের সাহায্য পেতে পারতাম, তবে হয়ত আয়তনকে যেমন আমরা স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারি তেমনি স্পষ্ট চার মানের জগৎকেও আমরা অনুভবের মধ্যে পেতাম। সে যা হোক না কেন, বাহ্যজগতের চতুর্ম্মানের ধর্ম্ম আমাদের বর্ত্তমানের বক্তব্য বিষয় নয়। তাই যত মনোহারিত্বই থাক না কেন, তাকে ছেড়ে আমাদের বর্ত্তমানের বক্তব্য বিষয়—বাহ্য জগতের অসীমত্ব কোথায়—তাই দেখা যাক।

বাইরের জগৎকে আমরা জানলাম যে তা একটা প্রকাণ্ড গোলাকার জিনিষ যদিও সে গোলাকৃতি আমাদের অতি পরিচিত গোলাকৃতি থেকে কিছু স্বতন্ত্র ধরণের। গোল জিনিষের আদিও নেই অন্তও নেই। অথচ তা পরিপূর্ণ ভাবে সীমাবদ্ধ। আমাদের বাইরের জগতেরও অবিকল সেই অবস্থা। তার আগা আর গোড়া খুঁজতে চেষ্টা কর তা পাওয়া যাবে না। অথচ তা পরিপূর্ণভাবেই নিজেই নিজের সীমানা রচনা করে নিয়েছে। বৈজ্ঞানিকের জগৎকে তাই বলা হয় Unbound হ'লেও তা finite। তা অসীম নয়, সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ। সে যে সীমাবদ্ধ এ ধারণা তার স্পষ্ট নয়, কারণ ব্রহ্মাণ্ডের Unbound ধর্ম্মটাই

তার কাছে প্রধান ভাবে সামনে আসে। আর একেই সে সীমাহীন বলে ভেবে নেয়। তাই Hamletএর কথায় বলতে হয় I could be bound in a nut shell and count myself a king of infinite space.

বৈজ্ঞানিক জগতের অভ্যন্তরিক গঠনই এমন, যে তা থেকে 'অসীম'কে পাওয়া সম্ভব নয়। জগতের মধ্যে থেকে জগৎকেই অবলম্বন করে তার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া একটা বৃত্তের চতুর্দ্দিকে ঘুরতে ঘুরতে সেই বৃত্তকে ছাড়িয়ে যাবার মতই অসম্ভব কাজ। কাজে কাজেই এই ভাবেও সত্যকারের যা বাহির তা বাহিরেই থেকে যায়। কিছুতেই কোন মতেই তার নাগাল পাওয়া যায় না। এর প্রধান কারণ জগতের বক্রতা। বাহ্য জগৎ সর্ব্বত্র বেঁকে গিয়ে নিজের শেষকে নিজের আরম্ভের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে। তাই তার প্রতি বিন্দুতেই 'আরম্ভ' আর 'শেষ' থাকা সত্বেও সে "আরম্ভ" আর "শেষ" গোপনেই থেকে যায়। তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া যায় না। নিজেকে দিয়েই নিজের সীমা তৈরী করে নেওয়ার চেষ্টা কত গভীর ভাবে এই জগতের মধ্যে বর্ত্তমান, তা যে কোন দিক দিয়ে আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়। সেই জন্যেই কোনও কোনও চিন্তাশীল আজকাল বলতে আরম্ভ করেছেন যে এই জগতের কোনও কোথাও যদি শেষ পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে যে কোথাও ভুল হয়েছে। ন্যায় শাস্ত্র যতই তারে অযুক্তিকর বলুক না কেন, জগতের মধ্যে "Argument in a circle"টাই হ'ল জগতের গঠন অনুযায়ী স্বাভাবিক। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য তাই দাঁড়াচ্ছে "সত্যিকারের বাহির" (Ultimate realityর) অন্বেষণ নয়, বরং তা যুক্তির এই বৃত্তটিকে সম্পূর্ণ করা। এর থেকে বেশী কিছু করা তার অসাধ্য।

আর এক নতুন ভাবে চেষ্টা করা যাক জগৎকে অবলম্বন করে জগতের বাইরে যাওয়া যায় কি না। আমাদের আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল প্রত্যেক বস্তুর গতি বা বেগকে অবলম্বন করে। স্বয়ং বস্তুটাকে ধরে দেখা যাক তাকে অবলম্বন করে জগতের বক্রতাকে অতিক্রম করতে পারা যায় কিনা। জগতের বক্রতাকে অতিক্রম করতে পারলেই যে Ultimate realityর সাক্ষাৎ পাবই তা জোর করে বলছি না, কিন্তু এই বক্রতাকে অতিক্রম করতে পারলে হয়ত বা তা সম্ভব হ'তে পারে। যে কোন কিছুকে ধরে আমার আলোচনা এখন চলতে পারে, বিমানযুদ্ধের মত বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার টেনে আনবার আর প্রয়োজন নেই। জগতের বস্তুতাই তারমধ্যে আমাদের কাছে সব থেকে প্রকট জিনিষ। অতএব এই বস্তুকে নিয়েই আপাততঃ আমাদের আলোচনা সুরু করা যাক। জিজ্ঞাস্য হ'ল "বস্তু" কি—"বস্তু" তাই, যা এসে ধাক্কা দিলে আমি বেদনা বোধ করি। এই বাক্যটির মধ্যে "বেদনা বোধ" আর "ধাক্কা" এই দুটো কথা কি তা জানা দরকার। বেদনা বোধ অনুভবের বিষয় বলে তাকে বাদ দেওয়া গেল, রইল "ধাক্কা"। এখন প্রশ্ন "ধাক্কা" কি? বিজ্ঞানে "ধাক্কা" সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণ আছে অতএব ও প্রশ্নতে সে কহিল হবে না। তৎক্ষণাৎ উত্তর দেবে—"বেগ" বাধা পেলে তা থেকে ধাক্কা উৎপন্ন হয়। প্রশ্ন হয়—"তা ত না হয় বুঝলুম, কিন্তু ওই 'বেগ'টি কি বল ত।" উত্তর—"ব্যবধানকে অতিক্রম করবার চেষ্টায় বেগের উৎপত্তি।" আবার প্রশ্ন হ'ল—"ব্যবধান" কি বোঝাও। উত্তর—"ব্যবধান" ত খুবই সোজা ব্যাপার, এ আর বুঝতে পারলে না। জগতের মধ্যে যে কোন দুটো ঘটনার এমন একটা সম্পর্ক যার জন্যে আমরা গজকাঠি ব্যবহার করি। আবার প্রশ্ন হল—"খুবই পরিষ্কার কথা, কিন্তু ওই 'গজকাঠি'টা যেন জানিনার মধ্যে পড়েছে। ওটা কি বোঝাও।" উত্তর—"একটা কঠিন বস্তু—।" এর পর বৈজ্ঞানিক গজকাঠি কি ভাল করে বোঝাবার জন্যে আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তা তাকে তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে বলল—"থাম, থাম—ওই 'বস্তুকেই' যে আমি বুঝতে চেয়েছি এটা মনে রেখ।"

আমাদের এই বৈজ্ঞানিকটির অবস্থা দেখলে কষ্ট হয় কিন্তু সে বেচারীর কোনও অপরাধ নেই। এই জগতের প্রকৃতিই এই রকম যে—সে যেখান থেকে আরম্ভ করেছে আবার সেইখানেই তাকে ফিরে গিয়ে চক্র পূর্ণ করতে হবে। সে তাই শুধু করেছে। বস্তু কি? তার উত্তরে সে দিল এই এক চক্রাকার সম্পর্ক—বস্তু→ধাক্কা→বেগ→ব্যবধান→গজকাঠি—বস্তু। তার বাহাদুরী এই যে সে চক্রটা পূর্ণ করতে পেরেছে, না পারলে তার বলা অসম্পূর্ণ থাকত। সে হয়ত বেগ ও ধাক্কার মাঝে আরও চার পাঁচটা ব্যাপার বলে ফেলতে পারত, কিম্বা ব্যবধান থেকে গজকাঠিতে না

গিয়ে অন্য পথে চলে যেত, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোথাও না কোথাও তাকে ওই বস্তুতেই ফিরে আসতেই হ'ত। পূর্ব্বেই বলেছি এ করা ছাড়া তার অন্য গত্যন্তর আর নেই।

তবে বিজ্ঞান সত্যকার বাহির বলে যা আছে তার সন্ধান কখনই পাবে না। এর উত্তর সোজা আর স্পষ্ট। যে বাহিরের সঙ্গে আমাদের নিত্যকারের পরিচয় আর যাকে নিয়েই সম্পূর্ণতঃ বিজ্ঞানের কারবার—বিজ্ঞান তাকে ছাড়িয়ে কখনও উঠতে পারবে না। কিন্তু এখন প্রশ্ন ওঠে "সত্যিকারের বাহির" বলে যাকে নির্দ্দেশ করা হচ্ছে তার সন্ধান কোনও উপায়েই যদি সম্ভব না হয়—তবে তা যে আছেই এ কথা মানব কেন, আর তা নিয়ে আমাদের এত শিরঃপীড়ার প্রয়োজনই বা কেন। এ কথার উত্তরে বলতে হয় যে তার প্রয়োজন আছে। আজকালকার বিজ্ঞান বলে দৃশ্যমান জগতের সব কিছুই সম্পর্ক মাত্র। সম্পর্ক মূলতঃ দুইটা কিছুর মধ্যে সেতুস্বরূপ। এই দুইটা কিছুর একটার, অর্থাৎ সম্পর্ক ব্যাপারটির এক প্রান্তে রয়েছে সেই জিনিযটি —যাকে পরিভাষিক ভাষায় বলে "দ্রষ্টা"। এই 'দ্রষ্টাকে' আমরা সম্পূর্ণভাবে জানি, যদিও কি রকম জানি তা ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করা হয়ত অসম্ভব হবে। এই দ্রষ্টা সম্বন্ধে একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এর বিষয়ে আমাদের মনে কোনও সন্দেহ কখনও উদয় হয় না। দৃশ্যমান জগৎ যে মিথ্যা হওয়া সম্ভব এ ধারণা আমাদের মনে উঠতে পারে, দৃশ্যমান জগতের পরপারে যে অদৃশ্য অব্যক্ত রয়েছে তাকে ত পুরোপুরি সন্দেহ করা যায়—কিন্তু এই "দ্রষ্টা"র সম্বন্ধে কখনও কোন আপত্তিই ওঠে না। এখন কথা ওঠে যে সম্পর্কমূলক দৃশ্যমান জগতের অন্য প্রান্তে নিশ্চয়ই কিছু থাকা প্রয়োজন, তা না ত সম্পর্ক অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বিজ্ঞান বলে যে সমস্ত দৃশ্য, দ্রষ্টা আর আর একটা কিছুর মাঝে, সম্পর্কার্থক।

এই "আর একটা কিছুকে"ই আমি এতক্ষণ ধরে "সত্যকারের বাহির" বলেই reality বলে নির্দ্দেশ করে আসছি। বিজ্ঞানের বিচরণ ক্ষেত্র যতদিন পর্য্যন্ত এই দুইয়ের সম্পর্ক ব্যাপার অর্থাৎ দৃশ্যমান জগতের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে, ততক্ষণ সে এই "সত্যিকারের বাহিরের" সন্ধান পাবে না। কিন্তু বিজ্ঞানের চিরদিনের অঙ্গীকার এই যে সে তার বিচরণভূমি দৃশ্যজগতের মধ্যেই আবদ্ধ রাখবে। তার আশঙ্কা এর বাইরে পা বাড়ালে হয় ত তার বিজ্ঞানত্ব নষ্ট হবে, তার নিজ অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সামনে পুরোপুরি ভাবে এ সমস্যা এখনও দেখা দেয় নি। কিন্তু আমার বিশ্বাস শীঘ্রই বিজ্ঞানকে তার সম্মুখীন হতে হবে। হয় তাকে তার এতদিনকার পথ পরিত্যাগ করতে হবে, না হয় ত তাকে "সত্যকারের বাহিরের" সন্ধানের ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিতে হবে।

ব্যবধান

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

যেদিন বুঝিনু আমি তারে ভালবাসি
কাছে থাকি হ'ল সে প্রবাসী,
এল ব্যবধান
অনুত্তীর্য্যসিন্ধু সম, রহিবে যা চিরবহমান্
দেশকাল কবলিত করি ;
পাবনা সে তরী
অলঙ্ঘ্যের অন্তরাল উত্তরিব আনুকূল্যে যা'র,
বন্ধ হেথা খেয়া পারাপার।
সে আসিয়া বসে কাছে কত কথা কয়,
আঁখি মোর শুধু চেয়ে রয়
দিক্ চক্রবালে,
ফেনিল তরঙ্গ ভঙ্গ সাগরের কলরোল ঢালে
সমুৎসুক শ্রবণে আমার,
জাগে তোলপাড়
শব্দহীন অন্তর্লীন নিথর তিমির পারাবারে
পাই তারে সেই হাহাকারে।

চির বিরহের মাঝে ফুলশয্যাখানি
আছে পাতা। তবু ধন্য মানি
এ বাসর ঘর
চিরন্তন বধূবর নিত্য যেথা রহে স্বতন্তর,
দেহ যেথা সীমারেখা দিয়া
একটি মাত্র হিয়া
দ্বিধাকরি রচে তট, অবিভিন্ন প্রাণ ধারাটিরে
নিয়া যায় সাগর গভীরে।
নিতান্ত যে আপনার তার পরিচয়
শুধু কি বিচ্ছেদ মাঝে রয় ?
এ আড়াল যদি
না রহিত, তাহ'লে কি খুঁজিতাম তারে নিরবধি
সীমাতীতে সে নিরবকাশে
বল কোন্ আশে
রচিতাম সেতুবন্ধ উত্তরিতে জন্ম জন্মান্তর,
প্রবাহিনী হ'ত কি পুষ্কর ?

বনফুল

১৭

শৈল চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

শঙ্করকে আজ সে খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছে, কিন্তু কই, শঙ্কর এখনও পর্য্যন্ত আসিল না তো। ভুলিয়া গেল না কি। না, শৈলর নিমন্ত্রণ শঙ্কর ভুলিয়া যাইবে একথা শৈলর মন মানিতে প্রস্তুত নয়। যদি সে না আসিতে পারে তাহা হইলে অন্য কোন কারণ ঘটিয়াছে। শৈল ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিল—পৌনে আটটা বাজিয়াছে। রাত তো বেশী হয় নাই, অথচ শৈলর মনে হইতেছে সে যেন যুগযুগান্ত বসিয়া রহিয়াছে। শঙ্করদার এত দেরি করিবারই বা কারণ কি? আজ একটু বকিয়া দিতে হইবে, এত আড্ডা দেওয়া ভালো নয়। চিরকাল শঙ্করদার এই স্বভাব, একপাল ছেলে জুটাইয়া দঙ্গল পাকানো।...আজ উনি বাড়ি নাই, কোথায় দুই দণ্ড বসিয়া গল্পসল্প করা যাইবে; তা নয়, কোথায় আড্ডা দিয়া বেড়াইতেছে। রাত দুপুরে হয় তো হুড়মুড় করিয়া আসিয়া তাড়াহুড়া করিয়া খাইয়া চলিয়া যাইবে। আক্কেলকে বলিহারি যাই—খাওয়ার নিমন্ত্রণ শুধু যেন খাওয়াব জন্যই!...সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। উৎকর্ণ শৈল উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে দ্বারের পানে চাহিল, শঙ্কর আসিল না, আসিল বাড়ির ঝি-টা।

সে বলিল, বেয়ারা বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। বলিতেছে আম-সন্দেশ পাওয়া গেল না, এ তল্লাটের সব দোকান সে খুঁজিয়াছে।

শৈল আগুন হইয়া উঠিল। বলিল, তাকে বল যেখান থেকে পারে খুঁজে নিয়ে আসুক। এ তল্লাটে না পাওয়া যায় অন্য তল্লাটে গেলেই হ'ত, তল্লাটের তো অভাব নেই কোলকাতা শহরে। গাড়িটা নিয়েই যেতে ব'ল না হয়! শঙ্করদা আম-সন্দেশ খাইতে ভালবাসে।

ঝি চলিয়া গেল, শৈল আবার বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শঙ্করদা কি এখনও কবিতা লেখে, স্কুলে যখন পড়িত তখন ঘরে খিল বন্ধ করিয়া দিনরাত কবিতা লিখিত, ইহার জন্য জ্যেঠামশায়ের কাছে বকুনিও কি কম খাইয়াছে! শৈলকে ডাকিয়া কত কবিতাই যে শুনাইত লুকাইয়া লুকাইয়া—এই তো সেদিনের কথা—দেখিতে দেখিতে কয়েকটা বছর চলিয়া গিয়াছে, মনেই হয় না। অত শক্ত শক্ত কথা-ওলা কবিতা শৈল বুঝিতেই পারিত না, কথার মানে বুঝিত না বটে কিন্তু আসল অর্থটা তাহার কাছে মোটেই অস্পষ্ট ছিল না। সে কথা স্বীকার করিতেও এখন লজ্জা করে। ছি, ছি, যত সব ছেলেমানুষী! কিন্তু—

শঙ্কর আসিয়া পড়িল।

কি রে শৈল, ব্যাপার কি, হঠাৎ নেমন্তন্ন?

কেন নেমন্তন্ন করতে নেই নাকি, ভুলেও তো খোঁজ নাও না একবার, বাধ্য হয়ে নেমন্তন্ন করতে হ'ল!

শঙ্কর খাটের উপর বসিয়া প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে বলিল, তা বেশ করেছিস!

বেশ করেছি, মানে?

আচ্ছা, বেশ করিস নি—শঙ্কর হাসি ঢাকিতে মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

রাগিও না আমায় বলছি শঙ্করদা, নিজে আসবে না একবারও ভুলে, নেমন্তন্ন করেছি বলে আবার খোঁটা দেওয়া হচ্ছে!

আলুর চপ করেছিস?

ভারি বয়ে গেছে আমার, সমস্ত সন্ধেটা বাইরে বাইরে আড্ডা দিয়ে এখন এসে রাত ন'টার সময় আলুর চপের ফরমাস হচ্ছে!

সত্যি করিস নি?

করেছি গো করেছি, আচ্ছা পেটুক লোক বাপু তুমি, এসে থেকে আর কোন কথা নেই, কেবল খাওয়ার কথা!

বোস সায়েব কোথা? ক্লাবে বুঝি?

না, তিনি এখানে নেই, দিল্লী গেছেন।

দিল্লী? হঠাৎ দিল্লী কেন? লাড্ডুর চেষ্টায়?

শৈল হাসিয়া ফেলিল। বলিল, লাড্ডুর চেষ্টাতেই বটে,

কে এক সায়েব আছে না কি সেখানে, তার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। সেই সায়েব যদি ইচ্ছে করে, ওঁকে নাকি আরও ভাল একটা পোস্টে দিতে পারে।

শঙ্কর বলিল, ভালই তো।

ভাল না ছাই, চাকরির তদ্বির করতে করতেই নাকাল, বিয়ে হয়ে থেকে তো দেখছি কেবল ছুটোছুটি আর ছুটোছুটি।

শঙ্কর কিছু বলিল না। পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইতে লাগিল। শঙ্করের মুখে সিগারেট দেখিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে শৈল বলিল, এ কি শঙ্করদা, তুমি সিগারেট ধরেছ না কি!

ধোঁয়া ছাড়িয়া সহাস্যমুখে শঙ্কর বলিল—হ্যাঁ, বেশ সুন্দর লাগে! খাবি? খেয়ে দেখ্ না একটা, বেশ লাগবে!

আস্পর্দ্ধা তোমার তো কম নয়!

শঙ্কর হাসিতে লাগিল।

ক্ষণপরেই কিন্তু মুখ গম্ভীর করিয়া শৈল বলিল, সিগারেট খাওয়া ভারি খারাপ শুনেছি, ওতে না কি বুক খারাপ হয়ে যায়।

আমার বুক কি অত অপলকা ভেবেছিস যে সিগারেটের ধোঁয়ায় খারাপ হয়ে যাবে! ছেলেবেলায় কত এক্সার্‌সাইজ্ করতাম মনে নেই, তোদের বাড়ির পেছন দিকের সেই মাঠটায়?

বাহাদুরী আর করতে হবে না, কখন যে কার কি হয় বলা যায় কিছু! মেজদার কথা মনে নেই? কত গায়ে জোর ছিল তার। দুদিনের জ্বরেই সব শেষ হয়ে গেল!

উৎপলের ভাই পঙ্কজের কথা শঙ্করের মনে পড়িল। মৃত পঙ্কজের স্মৃতি ক্ষণিকের জন্য উভয়ের মনে ছায়াপাত করিল, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শৈল বলিল, আচ্ছা দাদার কোন চিঠিপত্তর পাও তুমি শঙ্করদা? আমাকে সেই যা গিয়ে একখানি চিঠি লিখেছিল, আর লেখে নি!

উৎপলের চিঠি শঙ্করও অনেকদিন পায় নাই।

বলিল—কই, আমাকেও তো লেখে না বড় একটা।

শৈল মুচকি হাসিয়া বলিল, বৌদিকে খুব লিখছে নিশ্চয়!

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, ওই ভয়েই তো বিয়ে করব না! তোরা সব রাক্ষসী—

তবু তো রাক্ষসীদের মায়া এড়াতে পারো না!

মানে?

আজকাল আর আস না কেন বল তো?

পড়াশোনা নিয়ে ভারি ব্যস্ত থাকতে হয়।

পড়াশোনা নিয়ে? ডাহা মিছে কথাটা আর ব'ল না তুমি! এত মিছে কথাও বলতে পার!

মিছে কথা, মানে?

আমি সব জানি গো, সব জানি। তোমার সোনাদিদির সঙ্গে সেদিন দেখা হয়েছিল এক চায়ের পার্টিতে।

তুই আবার পার্টিতে যাস্ না কি? লায়েক হয়ে উঠেছিস তা হ'লে বল্!

শৈল হাসিল। বলিল, সত্যি ভাল লাগে না আমার ও সব পার্টি-ফার্টিতে যেতে! কেবল ওঁর জেদে পড়ে যেতে হয়।

কোথায় চায়ের পার্টি ছিল, কিসের জন্যে পার্টি?

উনিই পার্টি দিয়েছিলেন একটা ওঁদের ক্লাবে। সোনাদির স্বামীও তো রেলেতে চাকরি করেন দিল্লীতে, সেইজন্যে সোনাদিকেও নেমন্তন্ন করেছিলেন উনি।

সোনাদিদির সঙ্গে আলাপ ছিল না কি তোর?

ছিল বই কি, দাদার সঙ্গে প্রফেসার মিত্রের বাড়ি আমিও যে গেছি দু-একবার। মিষ্টিদিদি রিণি সবাইকে চিনি আমি।

শৈল শঙ্করের দিকে একবার চাহিয়া হাসিয়া বলিল—রিণি মেয়েটি বেশ, নয় শঙ্করদা?

শঙ্কর গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিল।

গম্ভীরভাবেই বলিল, ওরকম মেয়ে আমি আর দেখি নি।

শৈল সহসা দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, যাই আমি একবার দেখি কতদূর কি হ'ল, তুমি একটু বস।

অনাবশ্যক দ্রুতবেগে শৈল বাহির হইয়া গেল, শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—শৈলর কথা নয়, রিণির কথা। আজ তাহার সহিত ক্লাউড্‌স্ কবিতাটা পড়িবার কথা ছিল। শৈলর নিমন্ত্রণের ধাক্কায় সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। বাজে নিমন্ত্রণ ও লৌকিকতা রক্ষা করিতে গিয়া জীবনের কত পরম লগ্ন যে নষ্ট হইয়া যায় তাহা তো কেহ বোঝে না। নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিলে

লোকে অভিমান করে। বিশেষত শৈলর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করা তো অসম্ভব। অথচ আজ এমন সুন্দর সন্ধ্যাটা কতকগুলা দুষ্পাচ্য আহার গলাধঃকরণে কাটিয়া যাইবে ভাবিতেও দুঃখ হয়। রিণি বেচারি আমার অপেক্ষায় হয় ত বসিয়া থাকিবে। তাহাকে খবর দিয়া আসিবার সময়ও ছিল না।

শৈল ফিরিয়া আসিল।

খিদে পেয়েছে শঙ্করদা? রান্না তৈরি।

মোটেই না।

তা হ'লে এস একটু গল্প করা যাক। জান শঙ্করদা, মিত্তিরদের বাড়ির সেই ফলসা গাছটা ওরা কেটে ফেলেছে।

শঙ্কর অন্যমনস্ক ছিল।

কোন্ ফলসা গাছটা?

মিত্তিরদের বাড়ির সেই ফলসা গাছটা, এর মধ্যেই ভুলে গেলে সব! কি ভাবছ তুমি?

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, না, কিছু না। বুঝেছি, কেটে ফেলেছে গাছটা? ভারি অন্যায় তো; কে কাটলে, চণ্ডী বুঝি? তা না হ'লে অমন বুদ্ধি আর কার হবে!

শঙ্কর আবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। সহসা শৈল বলিল, আমি কেমন সোয়েটার বুনতে শিখেছি দেখবে শঙ্করদা?

কই, দেখি!

শৈল একটি অর্দ্ধসমাপ্ত সোয়েটার বাহির করিয়া পরম আগ্রহে শঙ্করকে দেখাইতে লাগিল।

এই নীল রঙটার সঙ্গে কি রঙ মানাবে বল তো?

কোন লাইট রঙ্। কমলা কিম্বা সাদা—সাদাই দে না, বেশ হবে দেখতে।

শঙ্কর আহারাদি শেষ করিয়া চলিয়া গেল। শৈল একা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার নূতন কৃতিত্ব সোয়েটার বোনা, পটলের দোর্মা কিছুই যেন শঙ্করদাকে তেমন মুগ্ধ করিতে পারিল না।... অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শৈল সহসা উঠিয়া পড়িল এবং স্বামীকে অকারণে পত্র লিখিতে বসিল। কালই লিখিয়াছে, আজ আর লিখিবার দরকার ছিল না। বারবার একটা কথাই নানাভাবে লিখিল—আমার একা একা একটুও ভাল লাগিতেছে না, তুমি শীঘ্র চলিয়া এসো। দেরি করিও না—একা ভারি ভয় করে আমার।

১৮

শঙ্কর হস্টেলে ফিরিয়া দেখিল তাহার অপেক্ষায় একটি মোটা খাম মেজেতে পড়িয়া রহিয়াছে, কপাট খুলিতেই চোখে পড়িল। কলেজ হইতে শঙ্কর হস্টেলে ফিরিতে পারে নাই, প্রফেসার গুপ্তের বাড়ি গিয়াছিল। বয়সের এবং বিদ্যার অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও প্রফেসার গুপ্তের সহিত শঙ্করের হৃদ্যতা জন্মিতেছিল। উভয়ের প্রকৃতিতে কোথায় একটা মিল ছিল, হয় ত তাহা সাহিত্য-প্রীতি—হয় ত সৌন্দর্য্য-লিপ্সা—ঠিক বলা শক্ত। উভয়ের মন কিন্তু বয়স এবং বিদ্যার প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। রিণির অধ্যাপনা করিবার জন্য অধ্যাপক গুপ্তের সাহায্য লওয়া শঙ্করের প্রয়োজন এবং সেজন্য প্রায়ই কলেজ হইতে সে প্রফেসার গুপ্তের বাসায় গিয়া হাজির হয়। আজও সে সেখানে গিয়াছিল এবং সেখানেই তাহার সহসা মনে পড়িয়া যায় যে শৈলর ওখানে তাহার নিমন্ত্রণ আছে।

শঙ্কর খামখানা তুলিয়া দেখিল সুরমার চিঠি। সুরমা ছোট চিঠি লেখে না, দীর্ঘপত্র। শঙ্কর কপাটটা বন্ধ করিয়া দিয়া ভাল করিয়া বিছানায় বসিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলে এ পত্রের অমর্য্যাদা করা হইবে।

সুরমা লিখিতেছে,

শঙ্করবাবু,

আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি কিন্তু আপনার চিঠির উত্তর দেওয়ার উপযুক্ত আবহাওয়া মনের মধ্যে ছিল না বলে উত্তর দিতে দেরি হ'ল। এখনও যে আবহাওয়াটা খুব মনোরম হয়ে উঠেছে তা নয়, ঝঞ্ঝা বিদ্যুতের উৎপাতটা কমেছে মাত্র। মনের যে সাম্য থাকলে সুন্দর চিঠি লেখা যায়, তা এখন আমার নেই। তবু আপনাকে চিঠি লিখছি এই জন্যে যে, চিঠির উত্তর না পেলে আপনি হয় ত অকারণে অনেক কিছু ভেবে বসবেন। অকারণে একটা কিছু ভেবে বসা আপনাদের স্বভাব, মাঝে মাঝে মনে হয় ওইটেই আপনাদের বিশেষত্ব। আপনারা ঝোঁকের মাথায় একটা কিছু করে বসেন—অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই। আপনাকে

চিঠি লেখার দ্বিতীয় কারণ, চিঠি লেখার অজুহাতে আপনাকে সামনে বসিয়ে (অবশ্য কল্পনায়) কলমের মুখে খানিকটা বক্‌বক্ করব, মনের ভার তাতে হয় ত অনেকটা কমবে। এত লোক থাকতে এবং এত স্বল্প-পরিচয় সত্ত্বেও আপনাকেই হঠাৎ কেন এসব কথা বলতে যাচ্ছি তা ঠিক বুঝতে পারছি না; হয় ত আপনি আমার স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে, কিম্বা হয় ত আর কিছু—ঠিক জানি না। জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, আপাতদৃষ্টিতে যা অঘটন বলে মনে হয়, যার আকস্মিকতা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বাঁধা ফরমুলার সঙ্গে খাপ খায় না। কিন্তু ঘটনাটাকে তো অস্বীকার করা যায় না। যা প্রত্যক্ষ তা অবশ্য-স্বীকার্য্য, হেতুটা পরে আবিষ্কার করতে হয়।

যাক্, যে কথাটা অতি প্রবলভাবে এখন মনে জাগছে এবং যার তাড়ায় আজ কাগজ কলম নিয়ে আপনার উদ্দেশ্যে এই আবোল-তাবোল প্রলাপগুলো লিপিবদ্ধ করছি সেইটেই বলে ফেলা যাক। সেটা হচ্ছে এই, কথাটা অতি পুরাতন—আমরা নারীরা বড় অসহায়। বিধাতা কিন্তু অসহায় ক'রে আমাদের পৃথিবীতে পাঠান নি, তিনি এমন সব অমোঘ অস্ত্রশস্ত্র আমাদের দিয়েছেন যা সুনিপুণভাবে প্রয়োগ করতে পারলে পৃথিবীর বড় বড় বীরপুরুষরাও কাবু হয়ে পড়েন। কিন্তু আমাদের, অর্থাৎ—সভ্য শ্রেণীর নারীদের মুস্কিল হয়েছে এই যে, বিধিদত্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমরা মানুষ-মনিবদের মুখ চেয়ে আছি। তাঁদের হুকুম এবং সমর্থন না পেলে আমরা কিছুই করতে পারি না। তাঁরা বলে দেবেন কোন্‌খানে কখন্ এবং কতক্ষণ আমরা রণ-কৌশল দেখাতে পাব। কেউ কেউ হয় ত আজীবন সে অনুমতি পায় না। শুধু পায় না তাই নয়, বেচারিকে সমস্ত বাণ তূণে পুরে রেখে আজীবন অহিংসার গুণ গাইতে হয়। আর যে সব সৌভাগ্যশালিনী কোন এক বিশেষ ব্যক্তিকে তাগ্ করবার অনুমতি পেলেন, তাঁরাও যে সব সময়ে চরিতার্থ হয়ে গেলেন তা মনে করবেন না। প্রায়ই দেখা যায়, যে লোকটিকে সম্মোহিত করবার সামাজিক সমর্থন পাওয়া গেল তিনি এ সম্মানের অনুপযুক্ত। অর্থাৎ হয় তিনি ইতিপূর্ব্বেই আর কারো দ্বারা জখম হয়েছেন, নয় তিনি এতই নিরীহ অথবা এতই হীন যে অস্ত্রশস্ত্রের কোন প্রয়োজনই হয় না তাঁর জন্যে। এঁদের ক্ষেত্রে অস্ত্রশস্ত্র হয় নিরর্থক, না হয় অপমানিত। বিধাতা যাকে বিজয়িনী হবার সাজসরঞ্জাম দিয়ে সৃষ্টি করলেন, মানুষ-বিধাতার পাকে-চক্রে তার সমস্ত কলা-কৌশল এমন একটা পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছল যে তার জন্যে সে সর্ব্বদাই শঙ্কিত। সত্যিই আমাদের বড় মুস্কিল। ইচ্ছে করলেই আমরা আমাদের আয়ুধ সম্বরণ ক'রে রাখতে পারি না, কখন যে তা কাকে গিয়ে অতর্কিতে আঘাত ক'রে বসে, তা অনেক সময় আমরা বুঝতেই পারি না। আহত ব্যক্তি কখনও আত্মপ্রকাশ করেন, কখনও করেন না। যখন করেন—তখন দেখা যায় সামাজিক বিধি-নিয়ম অনুসারে লজ্জা পাবারই কারণ ঘটেছে, অহঙ্কৃত হবার নয়। সুতরাং জীবনযাত্রার সুবিধার জন্য বিধাতা যে বশীকরণবিদ্যা আমাদের প্রকৃতির মধ্যে ওত-প্রোতভাবে সন্নিবিষ্ট করেছেন সেটাকে নিয়ে আমাদের আশঙ্কা অস্বস্তির সীমা নেই। বস্তুত এই বশীকরণশক্তি যার মধ্যে যত প্রকট, সমাজে সে তত নিন্দিত, বিশেষ ক'রে মেয়ে-মহলে। অথচ ভেবে দেখুন, সে বেচারির দোষ কি! তার মাধুর্য্য সে অবলুপ্ত করবে কি ক'রে! ফুল রূপরসগন্ধের ঐশ্বর্য্যে সকলের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এই তো স্বাভাবিক নিয়ম; কিন্তু তার সুষমার জন্য তাকেই লজ্জিত ক'রে যে অদ্ভুত বিধানের জবরদস্তি, আমরা তারই চাপে আজ ম্রিয়মান। কি করব বলুন, যে সমাজে বাস করি সে সমাজের নিয়ম মেনে না চললেও শান্তি নেই, মেনে চলতেই হয় এবং নিয়মানুবর্ত্তিতার দিকে সভ্য মহিলাদের একটু বেশী রকম প্রবণতাও আছে। এই প্রবণতার কথা চিন্তা করলে হাসিও পায় দুঃখও হয়। মেয়েদের নিয়ম-নিষ্ঠা সমাজকে অর্থাৎ পুরুষকে খুশি করবার জন্যে ছাড়া আর কি। হায় রে, যার বিজয়িনী হওয়ার কথা, সে-ই হয়েছে আজ চাটুকার! আর সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার—সে যে চাটুকার তা বোঝে না, জানে না, বুঝিয়ে দিলে রাগ করে। মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু কারা জানেন? মেয়েরাই। সম্ভবত হিংসার তাড়নায় একজন আর একজনের শত্রুতা করে। পুরুষেরা মেয়েদের এই হিংসা প্রবৃত্তিটাকে কাজে লাগিয়েছে। প্রকৃতির মোহিনী অস্ত্রগুলোকে মেয়েরা যাতে যথেচ্ছ ব্যবহার না করে তার ব্যবস্থা করেছে এবং সে ব্যবস্থা যথাযথ প্রতিপালিত হচ্ছে কি-না তা দেখবার

ভার পড়েছে মেয়েদের ওপর। মা, দিদি, পিসি, জ্যেঠর দলই পাহারার কাজে সবচেয়ে দক্ষ।

আজ অকস্মাৎ আপনাকে এত কথা লেখবার কি কারণ ঘটল, আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষণ সবিস্ময়ে সেকথা ভাবছেন। কারণ একটা আছে বই কি। কিছুদিন পরে আপনিও হয় ত তা জানতে পারেন। আমি বলতে পারলাম না। সে সব কথা বলতে আমার আত্মসম্মানে বাধে, যে কোন মেয়েরই বাধে, সেজন্য সেগুলো আমার কলমের মুখে আত্মপ্রকাশ করতে কুণ্ঠিত। সুতরাং ও প্রসঙ্গের উপর আপাতত যবনিকাপাত করা যাক।

আপনার খবর কি বলুন। মিষ্টিদিদির সেদিন একখানা চিঠি পেয়েছি। তিনি তো আপনার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। শুনলাম রিণির পড়াশোনার তদারক ক'রে অত্যন্ত যশস্বী হয়ে উঠেছেন। নিজেরও তদারক করবেন একটু। কবিতা লেখা একেবারে বন্ধ ক'রে দিলেন না কি? ও দেশের সব কাগজ এদেশে এসে পৌছয় না। কোন কাগজে যদি আপনার লেখা বেরোয় সেটা আমার পাওয়া চাই কিন্তু। বোম্বেতে চাকচিক্যশালী ব্যক্তি আছেন অনেক, কিন্তু তাঁদের চাকচিক্য প্রায়ই লক্ষ্মীর প্রসাদে। ভারতীর বীণার খবর বড় একটা মেলে না। মনের দিক থেকে একরকম নিঃসঙ্গ কারাবাস চলছে। মাঝে মাঝে এই নিস্তব্ধতা যদি ভঙ্গ করেন কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার বন্ধুর কোন চিঠি পেয়েছেন কি? অনেকক্ষণ বকবক ক'রে আপনার মূল্যবান সময়ের অনেকখানি হয় ত নষ্ট করলাম, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে বকবক সুরু করেছিলাম তা সফল হ'ল না দেখছি। মনের মেঘ একটুও কাটল না। সময় করে উত্তর দেবেন ত? সময় যদি কম থাকে ছোট উত্তর হলেও চলবে, কিন্তু একেবারে যেন নিরুত্তর হবেন না। ইতি

সুরমা

পত্র পাঠ শেষ করিয়া শঙ্কর কিয়ৎকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে ধীরে ধীরে সুরমার মুখখানি সজীব হইয়া দেখা দিল। হাওড়া ষ্টেশনে চলন্ত ট্রেনের জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া সুরমা বলিতেছে, চিঠি লিখবেন, ভুলবেন না কিন্তু। দুয়ারে টোকা পড়িতেই শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল, কপাট খুলিয়া দেখিল, সুপারিন্টেন্‌ডেণ্ট একটি টেলিগ্রাম হস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাহারই টেলিগ্রাফ, শঙ্কর খুলিয়া পড়িল—মায়ের অসুখ খুব বাড়িয়াছে, বাবা অবিলম্বে বাড়ি যাইতে বলিয়াছেন।

১৯

গঙ্গার তীরে নির্জ্জন বালুচরে একটি ছোট খড়ের ঘর। সেই ঘরের মধ্যে ইটের উনানে একটি ছোট মালসা চাপাইয়া ভন্টুর মেজকাকা ভাত রাঁধিতেছিলেন। ঘুঁটেগুলা সম্ভবত ভিজা ছিল, উনুন ভাল ধরিতেছিল না। সুতরাং যুগপৎ উবু এবং হেঁট হইয়া ভন্টুর মেজকাকা ওরফে মুক্তানন্দ ব্রহ্মচারী কয়েকটি সবল ফুৎকার চুল্লি মধ্যে প্রেরণ করিলেন। আশানুরূপ ফল ফলিল না। শিখার পরিবর্ত্তে ধূমই প্রবলতর বেগে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। আরক্ত সজল চক্ষু দুইটি মার্জ্জনা করিতে করিতে মুক্তানন্দ অবশেষে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বস্তুত বাহির না হইয়া উপায় ছিল না, সমস্ত ঘরটি ধূম পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। বাহিরে ঈষৎ স্থূল ভক্তগোছের একটি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভন্টুর মেজকাকা বাহিরে আসিতেই তিনি সবিনয়ে বলিলেন, স্বামিজি কেন আপনি এমন ক'রে কষ্ট পাচ্ছেন, আমাদের বাসায় ভাল বামুন দিয়ে আপনার রান্নার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়ে দিচ্ছি আমি! এখানে এই তেপান্তরের মাঠে থাকবার দরকার কি আপনার?

অজ্ঞ বালকের নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন করিয়া হাসেন, ভন্টুর মেজকাকা সেই জাতীয় একটি হাসি হাসিলেন। ঈষৎ স্থূল ভদ্রলোক একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, আপনার কিছু হবে না তা জানি, কষ্ট আমাদেরই হয়। তাছাড়া—কথা তিনি শেষ করিতে পারিলেন না। ভন্টুর মেজকাকা হাত তুলিয়া এবং মাথা নাড়িয়া ব'লিয়া উঠিলেন, অসম্ভব! ওসব অনুরোধ করবেন না। সন্ন্যাসী ব্রত যখন গ্রহণ করেছি তখন তার নিয়ম পালন করতে হবে—যতই দুরূহ হোক সে নিয়ম। তা ছাড়া, আপনারা যতটা দুরূহ বলে মনে করেন—তত দুরূহ এ নয়, এতে আনন্দও আছে যথেষ্ট।

একশ' বার।

অপ্রস্তুত মুখে ভদ্রলোক পুনরায় চুপ করিলেন। কিন্তু

সন্ন্যাসী দেখিলে সর্ব্বেশ্বরবাবু বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। ইহা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। সুতরাং ক্ষণপরে তিনি পুনরায় কথা কহিলেন, এতে আপনার অগৌরব কিছু নেই, আমাদেরই অগৌরব।

একটু কৃপানরম কণ্ঠে মুক্তানন্দ বলিলেন—আপনি তো বড় নাছোড়বান্দা লোক দেখছি, বেশ, কি করতে হবে বলুন? ভদ্রলোক যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন। মুক্তানন্দ পুনরায় বলিলেন, আপনি সজ্জন ভদ্রলোক, আপনার মনে কষ্ট দিতে চাই না আমি, তবে নিয়ম ভাঙতে পারব না—

আমাদের ওখানে চলুন, স্বপাকেরই সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেব। আলোচাল ঘি তরিতরকারি সমস্তই আনিয়ে রেখেছি। এখান থেকে বাজার কি কম দূর, কত কষ্ট হচ্ছে আপনার!

আমাদের আবার কষ্ট!

একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া ভনুটুর মেজকাকা অবশেষে বলিলেন, দেখুন, যাচ্ছি বটে আপনার কথায় কিন্তু ঝামেলা জোটাবেন না যেন। আমি একা নির্জ্জনে থাকতে ভালবাসি, সেইজন্যেই এই নিরালা জায়গাটি বেছে নিয়ে ছিলাম।

না, না, কোন গোলমাল হবে না আপনার। আমার কোয়ার্টার এখন একদম খালি, পরিবার-টরিবার সব দেশে।

বেশ, চলুন তা হ'লে।

মুক্তানন্দ ঘরের ভিতর ঢুকিয়া মালসাটা উনানের উপর উল্টাইয়া দিলেন ও পুঁটুলি লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। জাহাজঘাটের বড়বাবু সর্ব্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী এই সাফল্যে উল্লসিত হইয়া আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিলেন।

•

সর্ব্বেশ্বরবাবুর সন্ন্যাসী-বাই আছে। গেরুয়াধারীর সন্ধান পাইলে তাহার সেবা না করিয়া তিনি ছাড়েন না। ইহা তাঁহার বাতিকবিশেষ। অনেক লোকের অনেক রকম বাতিক থাকে—কেহ মদ খায়, কেহ জুয়া খেলে, কেহ টিকিট সংগ্রহ করে, সর্ব্বেশ্বরবাবু সন্ন্যাসীর সেবা করিয়া থাকেন। বহুপ্রকার সন্ন্যাসীর সেবা তিনি করিয়াছেন। বদরাগী, মৌনী, ঊর্দ্ধবাহু, উলঙ্গ, অঘোরপন্থী—সর্ব্বেশ্বরবাবুর অভিজ্ঞতা বৈচিত্র্যময়। সর্ব্বেশ্বরবাবুর বাছবিচার নাই, সন্ন্যাসী হইলেই হইল। সব সন্ন্যাসী সেবা লইতে রাজিও হন না। কিন্তু অনিচ্ছুক সন্ন্যাসীদের উপরই সর্ব্বেশ্বরবাবুর বিশেষ করিয়া ঝোঁক। কথিত আছে, একবার এক ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহাকে চিমটা পেটা পর্য্যন্ত করিয়াছিল, তথাপি সর্ব্বেশ্বরবাবু তাঁহাকে ছাড়েন নাই, সেবা করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। অথচ সর্ব্বেশ্বরবাবু কখনও কোন সন্ন্যাসীর নিকট কোন জিনিস প্রার্থনা করেন না, কাহাকেও হাতটা পর্য্যন্ত দেখান নাই। সন্ন্যাসীর খবর পাইলেই অনিবার্য্য টানে সর্ব্বেশ্বরবাবু সেখানে যান, সাধ্যমত তাঁহার সেবা করেন, সুবিধা হইলে বাড়িতেও টানিয়া আনেন। ভনুটুর মেজকাকা দিন তিনেক পূর্ব্বে ওই খড়ের ঘরটিতে আশ্রয় লইয়াছিলেন, খবর পাইবামাত্র সর্ব্বেশ্বরবাবু আসিয়া হাজির হইয়াছেন। নিকটেই যে জাহাজঘাট আছে সেই ঘাটেরই তিনি বড়বাবু। যেখানে ভনুটুর মেজকাকা ছিলেন সেখানে কিছুকাল পূর্ব্বেই একটা মেলা হইয়া গিয়াছিল এবং যে ঘরটাতে তিনি ছিলেন সে ঘরটা মেলারই যাত্রীদের জন্য নির্ম্মিত একটা চালা। অল্প দূরেই জাহাজ ঘাট, সুতরাং মুক্তানন্দের সংবাদ সংগ্রহ করিতে সর্ব্বেশ্বরবাবুকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। মুক্তানন্দ সর্ব্বেশ্বরবাবুর পিছু পিছু চলিতে লাগিলেন।

•

ভনুটুর মেজকাকা ওরফে মুক্তানন্দ ব্রহ্মচারীর আসল নাম উমেশচন্দ্র। ইনি ভনুটুর বাবার বৈমাত্রেয় ভাই। বাল্যকাল হইতেই উমেশের সাংসারিক ব্যাপারের প্রতি অনাস্থা দেখা গিয়াছিল। লেখাপড়ার দিকে মন তো ছিলই না, অন্যান্য সাংসারিক ব্যাপারেও কোন আগ্রহ প্রকাশ পাইত না। ছেলেবেলায় নদীর ধারে, মাঠে অথবা বন-বাদাড়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানোটাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান বিলাস ছিল। আর কিছু নয়, একা একা টো টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো। এই বেড়াইয়া বেড়ানোর নেশাতেই বোধ হয় এককালে তিনি এক যাত্রাদলের সঙ্গে ভিড়িয়া যান এবং কিছুকাল তাহাদের সঙ্গে কাটান। সেই সময়ে গান-বাজনাটা শিখিয়াছিলেন। কিন্তু যাত্রার দলের জীবনও তাঁহার বেশী দিন ভাল লাগে নাই, তিনি বাড়ি ফিরিয়া আসেন এবং মনোযোগ দিয়া আবার লেখাপড়া

সুরু করেন। সেই মনোযোগের যুগেই তিনি এণ্ট্রান্সটা পাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং আরও হয় ত অগ্রসর হইতেন—যদি না তাঁহার ছোটভাই রমেশ অকস্মাৎ বিসূচিকায় মারা যাইত। রমেশ মারা যাওয়ায় উমেশের জীবনে সহসা যেন ছন্দপতন ঘটিয়া গেল। উমেশ অনুভব করিলেন, সংসারে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন; সংসারের সাধারণ পথে স্বচ্ছন্দে তিনি চলিতে পারিবেন না। অনুভব করিলেন বটে কিন্তু অসাধারণ পথও তিনি সহজে খুঁজিয়া পাইলেন না, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাধারণ পথেই তাঁহাকে আরও কিছুকাল চলিতে হইল। একটা চাকরি জুটিল, বড়দার ছোট ছেলে ভন্টুটা ক্রমশঃ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিতে লাগিল। বড়দার বড় ছেলে বিষ্ণুচরণের সাতিশয় সঙ্কীর্ণ সাংসারিকতার জন্য তাহাকে উমেশ সহ্য করিতে পারিতেন না। বিশেষত বিবাহ হইবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিষ্ণুচরণ যখন কয়েকটি পুত্রকন্যার পিতা হইয়া জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন তখন উমেশ আর তাহা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। প্রকাশ্যেই তাহাকে 'ঘুণ' 'কীট' প্রভৃতি নানা আখ্যায় অভিহিত করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুচরণ ও উমেশ সমবয়সী ছিলেন। এইভাবেই চলিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একদিন ঠাকুরের সহিত তাঁহার দেখা হইয়া গেল। পরিচয় হইতে উমেশ হৃদয়ঙ্গম করিলেন, ভগবান ইঁহাকেই তাঁহার পারের কাণ্ডারি করিয়া পাঠাইয়াছেন।

উমেশ আকুল অন্তরে ঠাকুরের শরণাপন্ন হইলেন। এই ঠাকুর নামক ব্যক্তিটি যদি সাধারণ শিষ্যলোলুপ ব্যবসায়ী গুরু হইতেন তাহা হইলে সমস্যার সমাধান সহজে হইয়া যাইত, তিনি উমেশকে যথারীতি জীর্ণ করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু এই ব্যক্তিটি সম্ভবত সত্যসত্যই সংসারবিরাগী বলিয়া তাহা পারিলেন না। অতিশয় সহজভাবে উমেশকে বলিলেন, আমি তো কিছুই জানি না, তোমাকে কি বলব।

ইহাতে উল্টা ফল হইল। উমেশের ভক্তি বৃদ্ধি পাইল। না, আপনাকে রাস্তা বলে দিতেই হবে, কিছু ভাল লাগছে না আমার।

কি ভাল লাগছে না?

সংসার।

বেশ তো, সংসার ত্যাগ কর

সে তো এখুনি করতে পারি, তারপর কি করব?

কি করতে চাও?

ভগবানের নাম করতে চাই।

বেশ তো তাই কর না, বাধা কিসের?

আপনি উপদেশ দিন।

ভগবানের অনেক নাম আছে যেটা তোমার পছন্দ হয় বেছে নিয়ে তাই জপ কর কোন নির্জ্জন স্থানে বসে। উপদেশ আর কি দেব—

আপনি একটা মন্তর দিন আমাকে।

মন্তর? মন্তর নিয়ে কি হবে? তুমি কি মনে কর সংস্কৃত ভাষায় না বললে ভগবান তোমার কথা বুঝতে পারবেন না! যিনি কীটের ভাষা বোঝেন তিনি তোমারও ভাষা বুঝবেন।

সহসা উমেশ ঠাকুরের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

আহা, ও কি কর, পা ছাড়, কি মুস্কিল, কি চাও তুমি?

মুক্তি চাই, আনন্দ চাই—

উমেশ হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বেশ, মুক্তানন্দ নাম তোমার দেওয়া গেল, তুমি পছন্দসই একটা জায়গা বেছে নিয়ে ভগবানের নাম কর গিয়ে, মুক্তি আনন্দ সব পাবে।

কি কি বিধিনিয়ম পালন করতে হবে ব'লে দিন তা হ'লে। চক্ষুজল মুছিয়া উমেশ উন্মুখ হইয়া বসিলেন।

ঠাকুর দেখিলেন কিছু একটা না বলিলে নিস্তার নাই। অপরের মুখনিঃসৃত একটা উপদেশের ভেলা না পাইলে এ লোকটি নিছক নিজের জোরে ভাসিয়া থাকিতে পারিবে না। উমেশের অসহায় মুখচ্ছবি তাঁহাকে বিচলিত করিল। একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, মাছমাংসের প্রতি কি তোমার খুব বেশী লোভ আছে?

আজ্ঞে না, মোটেই নেই।

তা হ'লে নিরামিষ আহারই কোরো, স্বপাক।

ঘি দুধ?

ঘি দুধ খাবে বই কি, কিন্তু গব্য। গেরুয়াও পর, সুবিধে হবে।

কোথা যাব বলে দিন।

ঠাকুরের হাসি পাইতেছিল। তথাপি কিন্তু তিনি

গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, কাশী যাও, সেখানে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের নাম জপ ক'র।

আবার কবে আপনার দর্শন পাব ?

আমি কোথায় কখন থাকি তার তো ঠিক নেই, আপাতত আমি ভাগলপুর যাচ্ছি।

ঠিকানাটা আমাকে দিন।

একটু ইতস্তত করিয়া একটা ঠিকানা অবশেষে তিনি দিলেন এবং চলিয়া গেলেন। উমেশও চাকরি পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে আত্মগোপন করিয়া মুক্তির সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিন কাশীবাসের পর উমেশের ভব-ঘুরে মন আবার উসখুস করিতে লাগিল। কেবলমাত্র বিশ্বেশ্বরের নাম জপ করিয়া তিনি কেমন যেন তৃপ্তি পাইতেছিলেন না। ঠাকুরের নিকট নূতন একটা কিছু প্রেরণা লাভ করিবার আশায় তিনি ভাগলপুরে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন ঠাকুর যশোহরে গিয়াছেন, কিছুদিন পরে আবার ফিরিবেন। ভাগলপুরেই ফিরিবার কথা আছে। ভাগলপুরের গঙ্গার ঘাটে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া মুক্তানন্দ সহসা স্থির করিলেন—একবার কলিকাতাটা ঘুরিয়া আসা যাক, ভন্টুটা কেমন আছে কে জানে, অনেক দিন তাহার কোন খবর পাওয়া যায় নাই। কলিকাতায় আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহাকে বিচলিত হইয়া পড়িতে হইল। মুক্তানন্দের জীবনের এই অংশটুকুর পরিচয় আপনারা ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছেন। মুক্তানন্দ দেখিলেন যে, সংসারের ব্যাপার যেরূপ ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে তাহাতে হয় তাঁহাকে রীতিমত সংসারী হইতে হইবে, না হয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। চলিয়া যাওয়াই তিনি শ্রেয় মনে করিলেন এবং চুপি চুপি একদিন সরিয়া পড়িলেন। পুনরায় ভাগলপুরে আসিয়া শুনিলেন ঠাকুর আসিয়া একদিন মাত্র থাকিয়া কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে আর তাঁহার সাহস হইল না আবার যদি জড়াইয়া পড়েন। ঠাকুরের কাছে গিয়াই বা কি হইবে। তিনি যাহা করিতে বলিয়াছেন তাহা তো করা হয় নাই, কাশীতে বসিয়া বিশ্বেশ্বরের নাম একমনে জপ করিতে পারিলাম কই। কিন্তু অত ভীড়ের মধ্যে মনঃসংযোগ করা যে অসম্ভব। ঠাকুর অবশ্য যে কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া নামজপের ব্যবস্থা দিয়াছেন। মুক্তানন্দ গঙ্গার ঘাটে বসিয়াছিলেন। সহসা দেখিলেন একটা মাল-বোঝাই নৌকা ছাড়িতেছে। মুক্তানন্দ দাঁড়াইয়া মাঝিকে ডাকিলেন। মাঝি আসিতে তাহাকে অনুরোধ করিলেন তাহারা যদি তাঁহাকে কোন গ্রামের কাছে নদীতীরে একটু নির্জ্জন জায়গায় নামাইয়া দেয় তাহা হইলে বড় ভালো হয়। এখনও এদেশে গৈরিক বসনের সম্মান আছে, ইহারই জোরে প্রায় নিঃসম্বল মুক্তানন্দ এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিলেন। মাঝিরা তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইল এবং কিছুদূর গিয়া একটি জাহাজ ঘাটের নিকট বালুচরে নামাইয়া দিল। চরটি নির্জ্জন।

কিন্তু কিছুদূরেই জাহাজ ঘাট ছিল এবং জাহাজ ঘাটে সর্ব্বেশ্বরবাবু ছিলেন, সুতরাং মুক্তানন্দকে বেশীদিন নির্জ্জনতা উপভোগ করিতে হইল না।

এই অবসরে ঠাকুরেরও একটু পরিচয় দেওয়া যাক। ঠাকুর আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত মুকুজ্যে মশায়। মুকুজ্যে মশায়ের বন্ধনহীন চলা-ফেরা, সহজ সহৃদয় ব্যবহার, থান কাপড়, খালি পা, একমাথা বড় চুল, একমুখ দাড়ি, শিক্ষিত-জনসুলভ কথাবার্ত্তা, পরোপকারপ্রবৃত্তি—সমস্তটা মিলিয়া এমন একটা অসাধারণ যোগাযোগ যাহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অনিবার্য্যভাবে কতকগুলি ভক্ত জুটিয়া যায়। এই ভক্তের দল মুকুজ্যে মশাইকে ঠাকুর আখ্যা দিয়াছে। মুকুজ্যে মশাই কিন্তু এই ভক্তদের বড় ভয় করেন এবং যথাসাধ্য এড়াইয়া চলেন। ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই তিনি যাহোক একটা ব্যবস্থা বাতলাইয়া দিয়া নিজেকে যথাসম্ভব দূরে রাখেন। নানাস্থানে মুকুজ্যে মশায়ের গতিবিধি, সুতরাং একটি ভক্ত সম্প্রদায় তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্রমশ গজাইয়া উঠিয়াছে এবং বহমান নদীস্রোতে খড়কুটার মতই সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছে। মুকুজ্যে মশায় ইহাদের লইয়া নানা কৌতুক বিদ্রূপ করেন, ভর্ৎসনা করেন, কিন্তু ইহারা নাছোড়বান্দা। মুকুজ্যে মশায়ের ভর্ৎসনা যত তীব্র হয় ইহাদের ভক্তিও তত প্রগাঢ় হইয়া ওঠে। দেখিয়া শুনিয়া মুকুজ্যে মশাই হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন, বুঝিয়াছেন ইহাদের সহিত অভিনয়

না করিয়া উপায় নাই। ইহারা সত্য মানুষটাকে চায় না, একটা ছদ্ম কল্প-মূর্ত্তি পাইলেই ইহারা সন্তুষ্ট। সুতরাং অভিনয় করিতে হয়। এই জাতীয় কোন ভক্তের সহিত দেখা হইলে (যথাসাধ্য চেষ্টা করেন যাহাতে দেখা না হয়) তিনি ঠাকুরোচিত গুরু-গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং উপদেশ প্রার্থনা করিলে তাহাকে যাহোক একটা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া দেন। কাহাকেও বলেন—তেল মাখিও না, কাহাকেও বলেন—নেপালে পশুপতিনাথ দর্শন করিয়া এস, কাহাকেও কিছুদিন নির্ব্বাক থাকিতে আদেশ করেন। তাহারাও যথাসাধ্য আদেশ পালন করে। ভক্তদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার আর কোন সদুপায় তিনি ভাবিয়া পান নাই। মুকুজ্যে মশায়ের আসল কর্ম্মক্ষেত্র নানা দুঃখপীড়িত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং সেখানেও তাঁহার অন্তরঙ্গ ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা।

সর্ব্বেশ্বরবাবুর বাসায় পৌঁছিয়া মুকুজ্যে মশাই ভোজ্য দ্রব্যগুলি পরিদর্শন করিলেন। সর্ব্বেশ্বরবাবু আহারের ভাল জোগাড়ই করিয়াছিলেন। আলো চাল, মুগের ডাল, আলু পটল, দুধ ঘি।

ওটা গাওয়া ঘি তো?

আজ্ঞে না, ভঁয়সা, তবে খুব উৎকৃষ্ট জিনিস।

হাজার উৎকৃষ্ট হোক, ভঁয়সা চলবে না।

যে আজ্ঞে।

গব্য ঘৃত পাওয়া যাবে না এখানে?

পাওয়া শক্ত, আচ্ছা দেখছি তবু চেষ্টা ক'রে।

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সর্ব্বেশ্বরবাবু বাহির হইয়া গেলেন এবং ক্ষণপরেই একবালতি জল, একটি ঘটি এবং গামছা স্বহস্তে বহিয়া আনিয়া বিনীতকণ্ঠে বলিলেন, আপনি ততক্ষণ হাত-পাটা ধুয়ে ফেলুন। আমি ঘিয়ের চেষ্টায় বেরুচ্ছি।

সর্ব্বেশ্বরবাবু চলিয়া গেলেন এবং মুক্তানন্দ হস্তপদ প্রক্ষালনের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ক্রমশঃ

অবিনশ্বর

শ্রীগোপাল ভৌমিক

রাতের পাখার ভর দিয়ে গেছে চ'লে'
আমার মনের সোনালী বনের পাখী,—
আসিবে কি ফিরে', তারে স্মরি' যদি কাঁদে
বাসা বেঁধেছিল যার বুকে, সেই শাখী?
বহুদিন হ'ল লুকোচুরি খেলা শেষ—
মন-ঠকানোর পালা হ'ল অবসান
একদিন ছিল, সে কথা ত ভাল জানি;
তাইত রচিলা করুণ বিষাদ গান!
স্মৃতির পরিখা একদা ভরাট ছিল—
একদা সেখানে ছিল বহু বীরবর,
এখন সেখানে নাই অসি-ঝন্‌ঝন্—
মাটির পরিখা, শুধুই বালুর চর।
ধূ-ধূ করা সেই বালুচরে তবু শুনি—
দূরাগত কোন নিশীথের কলরব,—
আমার জীবনে সে মহা লগন ভাবি—
যখন সেখানে চলেছিল উৎসব!
সে-দিন এখন বাতাসে মিলায়ে গেছে
কালের কোঠায় জমা আছে তার ফল,
তাই আমি কভু গাহি না বিষাদ-গীতি-
তাইত ফেলিনা করুণ আঁখির জল!

কৌলীন্য প্রথা

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্‌-এ, পি-এইচ্‌-ডি

ভাইস্‌-চ্যান্‌সেলার, ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়

রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণের মতে কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চ-ব্রাহ্মণের যে সমুদয় সন্তান রাঢ়ে বাস করিলেন রাজা ভূশূরের পুত্র ক্ষিতিশূরের সময় তাঁহাদের মোট সংখ্যা হয় উনষাট। রাজা ক্ষিতিশূর তাঁহাদের বাসের জন্য উনষাট-খানি গ্রাম দেন। এই সমুদয় গ্রামের নাম হইতেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের গ্রামী বা গাঞির উৎপত্তি হইয়াছে। অর্থাৎ যিনি যে গ্রামে গিয়া বাস করিলেন তিনি এবং তাঁহার বংশধরেরা সেই গ্রামের নাম অনুসারে অমুক গাঞি বলিয়া পরিচিত হইলেন। কিন্তু গাঞি বা গ্রামের সংখ্যা লইয়া একটু মতভেদ আছে। ৺নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, হরি-মিশ্রের মতে এই গ্রামের সংখ্যা ছাপ্পান্ন। 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' প্রণেতা বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটকের নির্দ্দেশ অনুসারে ইহার সংখ্যা ধরিয়াছেন উনষাট। ৺নগেন্দ্রনাথ বসু এই প্রসঙ্গে বংশী বিদ্যারত্ন-সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যারত্নের মতে গাঞির সংখ্যা যে উনষাট এ বিষয়ে কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। বাচস্পতি মিশ্রের মতে গাঞির সংখ্যা উনষাট এবং তিনি যে গ্রামের তালিকা দিয়াছেন তাহার সহিত হরি মিশ্রের তালিকার অনেক বৈষম্য আছে। বাচস্পতি মিশ্রের মতই বর্ত্তমান কালে ঘটকদিগের মধ্যে প্রচলিত। (১)

গাঞি সম্বন্ধে যেরূপ কৌলীন্য-প্রবর্ত্তন বিষয়েও সেইরূপ। বাচস্পতি মিশ্র ও অন্যান্য পরিচিত কুলাচার্য্যগণের মতের সহিত ৺নগেন্দ্রনাথ বসু-উদ্ধৃত হরি মিশ্রের মতের অনেক প্রভেদ। কেবলমাত্র কুলতত্ত্বার্ণব গ্রন্থে ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর মতের সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রচলিত মত এই যে, রাজা ক্ষিতিশূরের পুত্র ধরাশূর উনষাট গ্রামী ব্রাহ্মণদিগকে মুখ্যকুলীন, গৌণকুলীন এবং শ্রোত্রিয় এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করেন। (২) ৺নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, প্রাচীন কুলপঞ্জিকা অনুসারে ধরাশূর ক্ষিতি-শূরের পুত্র নহে, প্রপৌত্র এবং এই ধরাশূরের রাজ্যকালে রাঢ়ীয়গণ কেবল কুলাচল ও সচ্ছোত্রিয় এই দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন। ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ মাত্রেই শ্রোত্রিয় নামে খ্যাত হইতেন। এই বিধি অনুসারে কুলাচলেরা রাঢ়ীয় হিন্দুসমাজে সচ্ছোত্রিয় অপেক্ষা অধিক সম্মানিত হইতেন, আবার সচ্ছোত্রিয়েরা সাধারণ শ্রোত্রিয় সাতশতী বিপ্র অপেক্ষা বেশী সম্মান পাইতেন। (৩) কুলতত্ত্বার্ণব ৺নগেন্দ্র বসুর অন্যান্য মতের ন্যায় এই মতের সপক্ষে। (৪)

এই মতে বল্লাল সেনই প্রথমে কুলাচলের মধ্য হইতে বাইশটি কুল বাছিয়া তাহাদের আটটি গাঞিকে মুখ্যকুলীন ও চৌদ্দটি গাঞিকে গৌণকুলীন করিলেন। এই বাইশটি গাঞির সকলেই নহেন—তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা গুণসম্পন্ন ছিলেন তাঁহারাই মুখ্য ও গৌণ কুলীন হইলেন। (৫)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রচলিত রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য মতে ধরাশূর এবং ৺নগেন্দ্রনাথ বসু-ধৃত হরি মিশ্র প্রভৃতি প্রাচীন কুলপঞ্জিকা এবং কুলতত্ত্বার্ণব মতে রাজা বল্লাল সেন। কুল-তত্ত্বার্ণবের বিবরণ এইরূপ :

'রাজা বল্লাল সেন তদীয় মতাবলম্বী বাইশ গ্রামী ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষরূপে অর্চ্চনা করিয়া কুলীন করিলেন এবং তাম্রফলকে বহু শাসন লিখিয়া পরম হর্ষে তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে বল্লাল নৃপতি সেই বাইশ গ্রামী ব্রাহ্মণদিগকে পুনর্ব্বার আনাইয়া তাঁহাদিগের গুণদোষ বিচারপূর্ব্বক কুলকে গৌণ ও মুখ্যরূপে বিশেষভাবে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। রাঢ়দেশ নিবাসী যে ব্রাহ্মণের নবগুণের অল্পতা ছিল সে-ই চৌদ্দ গ্রামী ব্রাহ্মণকে

(১) বসু—১ (১১৫-১৬, ১২৮)। গৌ—ব্রা (৫৭-৫৯)।
(২) গৌ—ব্রা (৫৯)।
(৩) বসু—১ (১৩৪)।
(৪) কুল (শ্লোক ১৩৬-৮)।
(৫) বসু—১ (১৩৫)।

গৌণকুলীন করিলেন।… যে অষ্টগ্রামী পূর্ণ-গুণান্বিত ছিলেন, রাজা তাঁহাদিগকে মুখ্যকুলীন করিলেন। বল্লাল নৃপতি পুনরায় তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া গুণদোষ বিচার-পূর্ব্বক দোষীদিগকে উপেক্ষা করিলেন। যিনি বিরুদ্ধপথে পদার্পণ করিয়াছেন, রাজা তাঁহাকে পাদ্যমাত্র প্রদান-পূর্ব্বক অবরকুল নাম দিয়া নিন্দিত করিলেন। যিনি স্বপদ ও বিরুদ্ধপদ এই উভয় পদারূঢ় হইয়াছেন, তাঁহাকে গৌণবংশ নাম দিয়া মধ্য করিলেন এবং যিনি স্বপদমাত্রারূঢ় আছেন তাঁহাকে মুখ্যবংশ নাম দিয়া শ্রেষ্ঠ করিলেন। রাজা স্বয়ং ১০৯৭ শাকে কুলকে মুখ্য, গৌণ ও অবর এই তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন।'—১৯৮—২০৯ শ্লোক।

৺নগেন্দ্রনাথ বসু 'কুলমঞ্জরী' হইতে যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে উক্ত বিবরণ সমর্থিত হয়, এমন কি কুলতত্ত্বার্ণবের কোন কোন শ্লোক ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে উহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে।(৬)

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে, বল্লাল সেন তিনবার রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে কৌলিন্য মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন। কুলগ্রন্থ অনুসারে তখন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের মোট সংখ্যা ছিল সাড়ে সাত শত (মতান্তরে সাড়ে চারি শত) তন্মধ্যে তিনি প্রথমবারে মোট উনিশ জনকে মুখ্যকুলীন ও চৌদ্দ জনকে গৌণকুলীন করেন। (৭)

৺নগেন্দ্রনাথ বসু-ধৃত হরি মিশ্রের কারিকা ও বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম অনুসারে বল্লাল সেন রাঢ়ীয় কুলীনদের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করেন যে, 'কুলীন ভিন্নগোত্রীয় কুলীনে কন্যার আদান-প্রদান করিবেন, না করিলে কুলভঙ্গ হইবে। কুলীন শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন, শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিলে তাঁহার কুলক্ষয় হইবে।" (৮)

রাঢ়ীয় সমাজে যাহাই হউক, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠাতা যে বল্লাল সেন এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই।

রাজা বল্লাল সেন সাড়ে তিন শত ঘর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্য হইতে প্রথমে মাত্র সাত জনকে কুলীন বলিয়া মর্য্যাদা দেন, পরে রাঢ়ীয় কুলীনগণের সহিত সংখ্যার সমতা রক্ষার জন্য আরও একজনকে কুলীন করেন। (৯)

রাজা বল্লাল সেন গুণ অনুসারে কৌলীন্য মর্য্যাদা দেন। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি (মতান্তরে আবৃত্তি) তপ, দান এই নয়টি কুললক্ষণ ধরিয়া নবগুণে যাহাকে পাইলেন তাহাকে করিলেন কুলীন। অষ্টগুণে যাহাকে পাইলেন তাহাকে করিলেন সিদ্ধশ্রোত্রিয়। সপ্তগুণে যাহাকে পাইলেন তাহাকে করিলেন সাধ্যশ্রোত্রিয়।' অবশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা কষ্টশ্রোত্রিয় নামে অভিহিত হইলেন। 'কিন্তু কুলীনের কন্যা শ্রোত্রিয়েতে লন। শ্রোত্রিয়ের কেন্যা কুলীনেতে লন। তার কিছু বিশেষ্য-বিশেষণ করিলেন না।' (১০)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বল্লাল-দত্ত মর্য্যাদা অনুসারে কুলীন, শ্রোত্রিয় ও কাপ (বা বংশজ) এই তিন ভাগে বিভক্ত।… ইঁহারা শ্রোত্রিয় শব্দের পরিবর্ত্তে মৌলিক শব্দ ব্যবহার করেন এবং ভঙ্গকুলীনকে কাপ অর্থাৎ বংশজ শব্দে নির্দ্দেশ করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে একশত গাঁই আছে। (১১)

কুলগ্রন্থ মতে বল্লাল সেনই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই দুই নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ করেন। (১১ক) অবশ্য দীর্ঘকাল রাঢ়ে ও বরেন্দ্রে বসতিই এই বিভাগের মূল কারণ এবং বল্লালের পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ বিভাগের গোড়াপত্তন হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

বল্লাল কৌলিন্যপ্রথার প্রবর্ত্তন করিলেন কেন, তদ্বিষয়ে কুলগ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রাচীন কুলাচার্য্য এডু মিশ্র বলেন যে, বল্লাল সপ্তশতী ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করায় (ইহার সবিশেষ বিবরণ সপ্তশতী ব্রাহ্মণ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) অপর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ কুপিত হইয়া অভিশাপ দ্বারা রাজার বংশনাশ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন রাজা ভীত হইয়া নানা উপচারে তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করিয়া বলিলেন যে, 'আমি অন্যান্য ব্রাহ্মণদেরও উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীবিভাগ করিব।' ব্রাহ্মণগণ ইহা শুনিয়া

(৬) বসু—১ (১৪৮)। বিশ্বকোষ—কুলীনশব্দ।

(৭) গৌ—ব্রা (৫৮)। তত্ত্ব (৮৮) বিশ্বকোষ—৪।৩১১।

(৮) বসু—১ (১৪৫)।

(৯) বসু—২ (৩২)।

(১০) বসু—২ (৩২)।

(১১) সং নিঃ—(৩০)।

(১১ক) বসু—২ (৩১)।

নিবৃত্ত হইলেন এবং রাজা বল্লাল সেনও কুলবিধির প্রবর্ত্তন করিলেন। (১২)

কুলগ্রন্থ অনুসারে এড়ু মিশ্র বল্লাল সেনের পৌত্রের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি বল্লাল সেনের কৌলীন্যপ্রথা সম্বন্ধে যখন উক্ত গল্প অপেক্ষা কোন অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ দিতে পারেন নাই, তখন তাঁহার প্রাচীনত্ব অথবা বর্ত্তমানকালে তাঁহার নামে প্রচলিত কুলগ্রন্থের অকৃত্রিমতা অথবা তাঁহার বুদ্ধি ও বিচারশক্তি—ইহার কোন একটির প্রতি যথেষ্ট সন্দেহ জন্মে এবং কুলগ্রন্থকে ঐতিহাসিক উপাদানরূপে ব্যবহার করিতে স্বতঃই কুণ্ঠা হয়।

কুলতত্ত্বার্ণবে এ বিষয়ে নিম্নলিখিত বিবরণ আছে।

'বল্লাল সেন কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের বংশধরদিগকে অতি গুণবান (এমন কি) আদিশূর নৃপতির মূর্ত্তিমান যশোরূপে বিরাজমান দেখিয়া (চিন্তা করিলেন) আদিশূরের কীর্ত্তির পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী হইয়া আমার কীর্ত্তি যাহাতে ক্রমে সজ্জনগণের গৃহে বিস্তৃত হয়, আমি তাহা করিব। একদা বৈদ্যবংশজ বল্লাল এইরূপ চিন্তা করিয়া দ্বিজগণের কুলবন্ধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।'—শ্লোক ১৪৯—১৫১।

কি কি গুণ দেখিয়া বল্লাল ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হইতে কুলীন নির্ব্বাচন করিলেন প্রাচীন কুলাচার্য্যগণ সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। পূর্ব্বোক্ত যে নবগুণের উপর কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, তাহার বিবরণ ষোড়শ শতাব্দীতে বাচস্পতি মিশ্র বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। (১৩) সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, কোন ধরাবাঁধা নিয়ম না করিয়া সাধারণভাবে জ্ঞান, বুদ্ধি, আচার, ব্যবহার ও চরিত্রের উৎকর্ষ বিবেচনা করিয়াই বল্লাল সেন ব্যক্তিবিশেষকে কৌলীন্য-মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী লেখকগণের কল্পনায় ইহা একটি বিশিষ্ট বিধিবদ্ধ নিয়মপ্রণালীতে পরিণত হইয়াছে। রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, 'কুলবিধি সংস্থাপনের জন্য বল্লাল সেন ভাগীরথীতীরে যোগিনীঘট্টে একবর্ষকাল দেবীর আরাধনা করেন। দেবী তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিয়া অন্তর্হিত হন। নৃপতি প্রত্যাদিষ্ট হইয়া ও কুললক্ষ্মীর পূজা করিয়া আচারাদি নয় প্রকার কুললক্ষণ প্রকাশ করেন।'(১৪)

আধুনিক কুলাচার্য্যগণের মতে যে প্রণালীতে বল্লাল সেন ব্যক্তিগত গুণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ণয় করিয়াছিলেন তাহাতে যদি কেহ বল্লাল সেন অথবা উক্ত কুলাচার্য্যগণের মস্তিষ্কের বিকৃতি ছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করেন তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। প্রচলিত বিবরণটি ৺লালমোহন বিদ্যানিধির 'সম্বন্ধনির্ণয়' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :

'এরূপ প্রবাদ আছে যে, রাজা বল্লাল সেন কৌলীন্য-মর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের দিন স্থির করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে রাজসভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। তাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ এক প্রহরের সময়, কতকগুলি দেড় প্রহরের সময় উপস্থিত হন, তাঁহারাই কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন; যাঁহারা দেড় প্রহরের সময় তাঁহারা শ্রোত্রিয়, আর যাঁহারা এক প্রহরের সময়, তাঁহারা গৌণকুলীন হইলেন।'(১৫)

ইহার তাৎপর্য্য ঘটকেরা এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, ব্রাহ্মণের নিত্যক্রিয়া পূজা-অর্চ্চনা করিতে অনেক সময় লাগে; সুতরাং যাঁহারা যত দেরীতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা নিত্যক্রিয়াদি অধিকতর নিষ্ঠাসহকারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সুতরাং অধিকতর সদাচারসম্পন্ন ছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত করাই সমীচীন। এই উপাখ্যান ও তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যার উপর টীকা অনাবশ্যক।

রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী অনুসারে রাজা বল্লাল সেন কুলব্যবস্থার সময় সকল ব্রাহ্মণকেই আহ্বান করিয়া কৌলীন্যপ্রথার নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করেন। বিকর্ত্তনাদি ব্রাহ্মণগণ রাজার প্রস্তাবে প্রতিবাদ করায় তিনি রুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি চলিলাম, আপনারা এখন শ্রোত্রিয় হইয়া অবস্থান করুন।' অন্য যে দ্বাবিংশতি ঘর রাজার মতানুবর্ত্তী ছিলেন, রাজা তাঁহাদিগকে যথাবিধি সৎকার করিয়া কুলীন করিলেন।(১৬)

(১২) বসু—১ (১৩৫)।
(১৩) বসু—১ (১৩৬)।

(১৪) বসু—১ (১৩৮), বসু—২ (৩১)।
(১৫) বসু—১ (১৩৭)। গৌ—বা (৬৫)। সং নিং (৩৪৪-৫) তত্ত্ব (৬)।
(১৬) বসু—১ (১৪৬-৭)। কুল (শ্লোক ১৮২—১৯৭)।

বংশজ ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়:

'ব্রাহ্মণদিগের কুলনির্দ্ধারণ হইবার কিয়ৎকাল পরে বল্লাল সেন উত্তম উত্তম ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া একটি মহৎ যজ্ঞ করিলেন। যজ্ঞের শেষে ব্রাহ্মণদিগকে একটি স্বর্ণময়ী ধেনু দক্ষিণা দিলেন। ব্রাহ্মণগণ সেই স্বর্ণময়ী ধেনুকে খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং যিনি যেরূপ পাইবার যোগ্য তদনুসারে ভাগ করিয়া লইলেন। ইহা দেখিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং যে পঁচিশজন ব্রাহ্মণ স্বর্ণময়ী ধেনুকে কাটিয়া লইয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণদিগকে কুল হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন।...সম্বন্ধে, ভোজনে, দানে, যজ্ঞে ও শ্রাদ্ধকালে এই সকল বংশজ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা বর্জ্জনীয় হইলেন।'(১৭)

—কুলতত্ত্বার্ণব, ২৩০-২৪০ শ্লোক
—নগেন্দ্রনাথ বসু—ধৃত কুলার্ণব

৺নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, 'মহাবংশপ্রসূত ব্রাহ্মণদিগের অংশ, বংশ ও দোষাদোষ অবধারণ করিবার জন্যই মহারাজ বল্লাল সেন বহু বিবেচনাপূর্ব্বক উপযুক্ত কুলাচার্য্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন।'(১৮) এ বিষয়ে তিনি হরি মিশ্রের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে সাধারণভাবে ঘটকগণের কি কি গুণ থাকা উচিত তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু বল্লাল সেন যে এইরূপ ঘটক নিয়োগ করিয়াছিলেন এমন কথা নাই। বস্তুত, বল্লাল সেনের সমসাময়িক কোন কুলাচার্য্যের গ্রন্থের কোন উল্লেখ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ইহাও বিবেচ্য যে, যদি বল্লাল সেন কোন উপযুক্ত ঘটক নিযুক্ত করিতেন তবে তৎপ্রবর্ত্তিত কৌলীন্যপ্রথা সম্বন্ধে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ প্রচলিত থাকিত।

মোটের উপর সমুদয় ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হইবে না যে, বর্ত্তমান কালে গভর্ণমেণ্ট যেমন মহামহোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি দান করিয়া ব্যক্তিবিশেষকে সম্মানিত করেন বল্লালও কৌলীন্যপ্রথা দ্বারা তদতিরিক্ত কিছুই করেন নাই। পরবর্ত্তী কালে যখন কৌলীন্য বংশানুক্রমিক হইয়া সমাজে বিশিষ্ট মর্য্যাদা ও সম্মানের ভিত্তিস্বরূপ হইল তখন তাৎকালীক কুলাচার্য্যগণ ইহার উৎপত্তি ও ইতিহাস বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং কতক ঐতিহাসিক উপকরণের অভাবে এবং কতক ব্যক্তিগত স্বার্থের প্ররোচনায় নানারূপ কাল্পনিক ঘটনা ও ব্যাখ্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। বল্লাল সেনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ঘটনার সম্বন্ধেও এইমত প্রযোজ্য। এক্ষণে আমরা সংক্ষেপে কুলগ্রন্থ অনুসারে ইহার বর্ণনা করিতেছি, কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। ধ্রুবানন্দের বংশাবলী সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে, কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্ত্তনের অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালের ঘটনা পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর লেখকেরা জানিতেন না, অনেকটা কল্পনার আশ্রয় লইয়া লিখিয়াছেন।

বল্লাল সেনের কৌলীন্যপ্রথা ব্যক্তিগত গুণের উৎকর্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত, বংশানুক্রমিক ছিল না। এই প্রথা অনুসারে গৌণ ও মুখ্যকুলীন শ্রোত্রিয়ের কন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন। তিনি মাত্র উনিশজনকে মুখ্যকুলীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এই উনিশজনের মধ্যে কোন পদমর্য্যাদার তারতম্য করেন নাই।

বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সনের সময়ে এই দুইটি বিষয়েই নিয়মপ্রণালী বিধিবদ্ধ হইয়া কৌলীন্যপ্রথাটিকে জটিল করিয়া তুলিল। লক্ষ্মণ সেন নিয়ম করিলেন যে, কুলীনকন্যা যে ঘরে প্রদত্ত হইবে আবার সেই ঘর হইতে কন্যাগ্রহণ করিতেও হইবে। ইহার নাম বংশপরিবর্ত্ত। দ্বিতীয়ত কুলীনগণের মধ্যে কে কিরূপ উচ্চনীচ কুলে আদান-প্রদান করিয়াছে তাহা নির্ণয় করিয়া কুলীনগণের পদমর্য্যাদার সমতা স্থির করা হইবে। ইহার নাম সমীকরণ।(১৯) রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে ইহার প্রচলন হয়, বারেন্দ্রসমাজে এই ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই।(২০) প্রথম সমীকরণে সাতজন কুলীন সমান বলিয়া গণ্য হইলেন। দ্বিতীয় সমীকরণে চৌদ্দজন সমান বলিয়া গণ্য হইলেন। ইঁহারাই কুলীনগণের মধ্যে

(১৭) বসু—১ (১৫০)।
(১৮) বসু—১ (১৩৮)।
(১৯) বসু—১ (১৫১)।
(২০) বসু—২ (৩৯)।

শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এতদ্ব্যতীত লক্ষ্মণ সেনের সময়েই জটিল দার্শনিক তত্ত্বের দ্বারা কৌলীন্যের ব্যাখ্যা হয় এবং সূক্ষ্ম ন্যায়ের তর্ক দ্বারা কৌলীন্যের উৎকর্ষ স্থির করার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়।(২১) সাধারণ পাঠকের পক্ষে এগুলি অতিশয় দুর্বোধ্য এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধের পক্ষে অনাবশ্যক বলিয়া তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না।

কুলগ্রন্থ অনুসারে পঞ্চদশ শতাব্দীতে দেবীবর ঘটক কর্ত্তৃক মেল-বন্ধনের পূর্ব্বেই শতাধিক বার সমীকরণ হইয়াছিল। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীতে একশত সত্তর বার সমীকরণের উল্লেখ আছে।

প্রথম দুইটি সমীকরণ লক্ষ্মণ সেন করেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কুলগ্রন্থ-মতে দনৌজামাধব নামক রাজার সময় তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ এই চারিবার সমীকরণ হইয়াছিল।

এই রাজা দনৌজামাধব সম্বন্ধে ৺নগেন্দ্রনাথ বসু কুলাচার্য্য এডু মিশ্রের যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এই যে, লক্ষ্মণ সেনের পুত্র কেশব যবনের ভয়ে গৌড়রাজ্য পরিত্যাগ করায় পুনরায় ব্রাহ্মণগণের মর্য্যাদা স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। সেনবংশের অবসানের অব্যবহিত পরে দনৌজামাধব জন্মগ্রহণ করেন।—হরিমিশ্র। (২২)

রাজা কেশব সেন পিতামহ প্রতিষ্ঠিত বিপ্রগণ ও স্বজনবর্গ লইয়া সেই রাজার নিকট গমন করিলেন। সেই বিখ্যাত নরপতি কেশবের সম্মান করিলেন এবং তাঁহার ও অনুচর পারিষদবর্গের জীবিকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।—এডু মিশ্র।

৺নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, তাঁহার সংগৃহীত এডু মিশ্রের অসম্পূর্ণ পুঁথিখানিতে কেশবের আশ্রয়দাতা রাজার নাম নাই; তবে কোন কোন কুলাচার্য্য বলেন, এই রাজার নাম মাধব সেন, আবার কেহ বলেন ইঁহারই নাম দনুজমাধব।(২৩)

৺নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, এই দনৌজামাধব সেনবংশীয়। হরি মিশ্রের যে শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই—

'প্রাদুরভবৎ ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরম্।
দনৌজামাধবঃ সর্ব্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ॥'

৺বসুমহাশয় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, 'অনন্তর সেনবংশে দনৌজামাধব জন্মগ্রহণ করেন, সকল নৃপতিই তাঁহার পদসেবা করিত।' এই প্রকার অর্থ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। 'সেনবংশাদনন্তরম্' এই পদের অর্থ সেনবংশের অব্যবহিত পরে। রঘুবংশের 'পুরাণপত্রাপগমাদনন্তরম্' (৩।৭) ইহার সহিত তুলনীয়। সুতরাং সেনবংশ ধ্বংসের পর দনৌজামাধব রাজা হইয়াছিলেন। মীনহাজ উদ্দিনের তবকাৎ-ই-নসিরি যখন সমাপ্ত হয়, তখনও লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন একথা উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং দনৌজামাধব ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রাজত্ব করিতেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। তারীখ-ই-ফিরুজসাহী নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ অনুসারে ১২৮০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে দনুজ রায় নামে এক রাজা সোনারগাঁয় রাজত্ব করিতেন। কুলগ্রন্থোক্ত দনৌজামাধব সম্ভবত এই রাজা দনুজ রায়। বিক্রমপুরের অন্তর্গত আদাবাড়ি নামক গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে দেববংশপ্রসূত অরিরাজ-দনুজমাধব-দশরথদেবের নাম পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে ইনিই কুলগ্রন্থোক্ত দনৌজামাধব এবং মুসলমান ইতিহাসে বর্ণিত দনুজ রায়। (২৪) ৺ননীগোপাল মজুমদার (২৫) ও ডঃ হেমচন্দ্র রায় (২৬) এই মত সমর্থন করিয়াছেন। রাজা দশরথদেব তাঁহার প্রকৃতনামের পরিবর্ত্তে 'অরিরাজ-দনুজমাধব' এই সমাসবদ্ধ বিশেষণের এক অংশ (যাহার পৃথকভাবে কোন সুসঙ্গত অর্থ হয় না) দ্বারা পরিচিত হইলেন—তাহার সঙ্গত ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্য্যন্ত এই মত গ্রহণ করা কঠিন। কিন্তু কুলগ্রন্থোক্ত দনৌজামাধব ও সোনারগাঁয়ের রাজা দনুজ-রায়কে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(২১) বসু—১ (১৫২-৫৪) কুল (শ্লোক ৩১৮-৩৩৮)।

(২২) বসু—১ (১৫৬)। সং নিং (১১১) অন্যত্র বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, 'প্রাচীন কুলাচার্য্য হরি মিশ্রের কারিকায় দনৌজামাধব কেশব সেনদেবের পৌত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন'—বিশ্বকোষ, ৪।৩৪৩।

(২৩) বসু—১ (১০৬-৭)।

(২৪) ভারতবর্ষ—১৩৩২ (৭৮-৮১)।

(২৫) Inscriptions of Bengal, vol. III, p. 182.

(২৬) Dynastic History of Northern India, p. 383 f. n. 1.

কুলতত্ত্বার্ণব গ্রন্থে দনৌজামাধব ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কৌলীন্ত-মর্য্যাদার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ইহার সারমর্ম্ম নিম্নে বিবৃত হইল :

'লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর কেশব সেন রাজা হইলেন কিন্তু যবনকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সময়েই দনৌজামাধব নামক নৃপতির আবির্ভাব হয়। তিনি সৎকুলোদ্ভব ধার্ম্মিক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া পাঁচশত আটজন ব্রাহ্মণকে কুলীন করিলেন।

'কেশব ব্রাহ্মণগণ সহ মাধব নৃপতির সভায় উপস্থিত হইলেন এবং মাধব তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। মাধব কেশব সেনের নিকট বল্লাল-প্রতিষ্ঠিত কৌলীন্যের নিয়মাবলী শ্রবণ করিতে চাহিলেন এবং কেশবের আদেশ-ক্রমে তাঁহার কুলপণ্ডিত এডু মিশ্র তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। রাজা দনৌজামাধব তাহা শুনিয়া পুনর্ব্বার কুলবন্ধন-বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং চারিবার সমীকরণ করিয়া চব্বিশ জন ব্রাহ্মণকে কুলীন করিয়া পূজা করিলেন। যে ধর্ম্মশীল কুলীন সন্তানের তিন পুরুষের মধ্যে যথারীতি আদান-প্রদান নাই তিনি বংশজ বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেন। গুণ ও দোষ উভয় বিশিষ্ট যে ব্রাহ্মণগণ সেই সভায় আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে রাজা মাধব শ্রোত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তিনি বিচারপূর্ব্বক সেই শ্রোত্রিয়কে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন, যথা—সৎশ্রোত্রিয় ও কষ্টশ্রোত্রিয়। আবার সেই সৎশ্রোত্রিয়কে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন, যথা—সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি। কুলীনগণ প্রথম তিন শ্রেণীর শ্রোত্রিয়ের কন্যা বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু অরি শ্রোত্রিয় (অর্থাৎ কুলীন পুত্র হইয়াও যাঁহারা গুণসম্পর্করহিত তাঁহারা) সর্ব্বদা কুলীনের ত্যাজ্য। যাঁহারা অকুলীনসুত, পতিতসুত বা পতিতের সহিত যাঁহাদের সম্পর্ক ঘটিয়াছে তাঁহারা কষ্টশ্রোত্রিয় ; কুলীনগণ ও অরি ব্যতীত অন্য শ্রোত্রিয়গণ তাহাদের কন্যা গ্রহণ করিবেন না। এইরূপে ব্রাহ্মণগণের কুলাচারাদি নির্দ্ধারণ করিয়া 'রাজা দনৌজামাধব ১২১১ শকাব্দে পরলোক গমন করিলেন।' (২৭)

কুলতত্ত্বার্ণবের এই উক্তি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলা কঠিন। যাহা হউক, ইহার পর প্রায় দেড়শত বৎসর কাল মধ্যে কুলাচার্য্যগণের কৃপায় কৌলীন্যপ্রথা ক্রমে বংশানুক্রমিক হইয়া পড়িল এবং কুলীন নামে পরিচিত ব্রাহ্মণগণ নানা দোষাশ্রিত হইয়া পড়িলেন। প্রচলিত কুলগ্রন্থ-মতে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে দত্তখাস উপাধিধারী মুসলমানরাজার এক হিন্দুমন্ত্রী সপ্তপঞ্চাশত্তম সমীকরণ করেন। কুলতত্ত্বার্ণবকার বলেন যে, এই দত্তখাস রাজা কংসনারায়ণের অমাত্য ছিলেন এবং এই রাজার সময় পাঁচ বার সমীকরণ হয়।(২৮) দেবীবর বলেন যে, এতদিন পর্য্যন্ত গৌণকুলীনের সহিত গৌণদিগের পরিবর্ত্ত চলিতেছিল, কখন কখন মুখ্যের সহিতও আদান-প্রদান হইতেছিল ; কিন্তু রাজা দত্তখাস শ্রোত্রিয়ের সধর্ম্মত্বহেতু গৌণদিগকেও শ্রোত্রিয় করিলেন। প্রচলিত কুলগ্রন্থ মতে এই দত্তখাসের সভাতেই রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয়গণ সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হন।(২৯) কুলতত্ত্বার্ণবকারও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা দনৌজামাধব সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ব-উক্তির বিরোধী। কুলতত্ত্বার্ণব-মতে দত্তখাস ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে কুলীন করেন এবং ১৩২৫ শাকে শ্রীশোভাকরকে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলাচার্য্যের পদে নিযুক্ত করিলেন।(৩০)

ইহার অনতিকাল পরেই দেবীবর রাঢ়ীয় কুলীনের মেল-বন্ধন করেন। কি কারণে দেবীবর মেলবন্ধন করেন তদ্বিষয়ে ঘটকেরা এক বিস্তৃত উপাখ্যানের বর্ণনা করেন।(৩১) তাহার সারমর্ম্ম এই যে, দেবীবরের মাসতুতো ভাই যোগেশ কুলমর্য্যাদায় তাঁহার অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন এবং তাঁহার গৃহে অন্ন গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। যোগেশকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে তিনি দেবী আদ্যাশক্তির আরাধনা করিয়া বাক্‌সিদ্ধ হইলেন। তিনি দেখিলেন, কুলীনদিগের অধিকাংশই নবগুণবিহীন হইয়াছে। সুতরাং তিনি সমুদয় ঘটকচূড়ামণিগণকে আহ্বান করিয়া কৌলীন্য-মর্য্যাদার পুনঃসংস্কারের প্রস্তাব করেন এবং ঘটকেরা

(২৭) কুল—শ্লোক ৩৪৮-৩৭৯।

(২৮) শ্লোক ৩৮৫-৩৮৬।

(২৯) বসু ১ (১৮২-১৮৫)।

(৩০) শ্লোক ৩৮৫-৫৭৬।

(৩১) বসু—১ (১৯৮-৯)। সং নিং (২৯৩)।

ইহাতে সম্মত হইলে সভার দিন স্থির করেন। নির্দ্ধারিত দিনের কিছু পূর্ব্বে অকস্মাৎ দৈববাণী হইল, 'বৎস দেবীবর, তুমি সভার নির্দ্ধারিত দিবসে দশদণ্ডমাত্র কাল কুলমর্য্যাদা প্রদান বিষয়ে অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী থাকিবে।' তদনুসারে উক্ত সময় মধ্যে দেবীবর নূতনভাবে কৌলীন্য-মর্য্যাদা স্থাপন করেন। বলা বাহুল্য, তিনি যোগেশকে প্রথমে নিষ্কুল করিলেন, পরে যোগেশ তাঁহার বাড়ীতে অন্নগ্রহণ করিলে তাঁহার পূর্ব্ব উক্তির অন্য ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে কুলীন করিলেন। সভামধ্যে দেবীবরের গুরু শোভাকর উচ্চ আসনে বসিয়াছিলেন, এইজন্য দেবীবর তাঁহাকে নিষ্কুল করিলেন। শোভাকরও ক্রুদ্ধ হইয়া দেবীবরকে 'নির্ব্বংশ হও" বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন।

'ডাক দিয়ে বলে দেবীবর, নিষ্কুল শোভাকর।
ডাক দিয়ে বলে শোভাকর, নির্ব্বংশ দেবীবর।'

এই আষাঢ়ে গল্প অপেক্ষা কুলতত্ত্বার্ণবে দেবীবর সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। নিম্নে ইহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

'চতুর্দ্দশশত শাকে একজন হিন্দুধর্ম্ম-প্রিয় যবন ভূপতি গৌড়রাজ্য অধিকার করেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগের প্রার্থনায় দেবীবরকে কুলাচার্য্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। যবনেরা কুলগ্রন্থ ও বংশাবলী দগ্ধ করিয়াছিল, দেবীবর কোন উপায়েই তাহা উদ্ধার করিতে পারিলেন না। তখন দেবীবর কামরূপে কামাখ্যাদেবীর আরাধনা করেন। দেবী প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন, 'দেবীবর, তুমি ব্রাহ্মণদিগের কুলবন্ধন বিষয়ে ত্রিকালজ্ঞ হও।' পরে দেবীবর কুলাচার্য্যগণের সহিত নানা প্রকার মন্ত্রণা করিয়া ১৪০২ শাকে মেলবন্ধন আরম্ভ করিলেন। (৩২)

দেবীবরকৃত 'মেলবন্ধ' ও 'দোষনির্ণয়' এবং অন্যান্য বহু কুলগ্রন্থে মেলবন্ধনের বিস্তৃত বিবরণ আছে।(৩৩) আধুনিক কুলীনসমাজে এই প্রথা প্রচলিত থাকায় বর্ত্তমান কালেও অনেক গ্রন্থকার ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। মেলবন্ধন সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষভাবে জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা এই সমুদয় গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন। আমরা সংক্ষেপে ইহার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিতেছি।

দেবীবর দেখিলেন, সকল কুলীনই অল্প বিস্তর দোষাশ্রিত। যাঁহাদের বেশী দোষ ছিল অথবা যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ ছিলেন—দেবীবর তাঁহাদিগকে নিষ্কুল করিলেন, তাঁহারা দেবীবরের ছাটা বংশজ বলিয়া গণ্য হইলেন। অল্পদোষাশ্রিত অন্য কুলীনগণকে দেবীবর ছত্রিশ ভাগ অথবা মেলে বিভক্ত করিলেন। মহারাজ বল্লাল সেন গুণ অনুসারে কৌলীন্য-মর্য্যাদা দিয়াছিলেন, আর দেবীবরের বিধানে যে দোষী তিনি প্রধান কুলীন বলিয়া গণ্য হইলেন।(৩৪) এক এক প্রকার দোষে দুষ্ট কুলীনদিগকে লইয়া এক এক মেল সৃষ্টি হইল। 'দেবীবর প্রতি মেলে দুই দুই জনকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করিলেন। যাঁহা হইতে মেলের উৎপত্তি তিনি প্রকৃতি এবং তাঁহার সহিত কুল করিয়া যিনি সমমর্য্যাদাপন্ন হইয়াছিলেন তিনি পালটি।'(৩৫) দেবীবর নিয়ম করেন, প্রত্যেক মেলের মধ্যে যে যাহার প্রকৃতি, যে যাহার পালটি—তাঁহাদেরই মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান বা কুলকার্য্য চলিতে পারিবে। তাহার বাহিরে কেহ কুলকার্য্য করিতে পারিবে না, করিলে কুল নষ্ট হইবে।(৩৬)

ইহার ফলে অনেক সময় পাত্রপাত্রীর অভাবে বাধ্য হইয়া এক মেলের কুলীন অন্য মেলে গিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। তখন কুলাচার্য্যেরা প্রত্যেক মেলের আবার এক একটি প্রতিযোগী মেল স্থির করিলেন। নিয়ম হইল, কোন মেল তাহার প্রতিযোগী মেলের সহিত কুলকার্য্য করিলে সেই মেলভুক্ত হইবেন, আবার পরে ইচ্ছা করিলে তাহার পূর্ব্ব মেলে কার্য্য করিয়া সেই মেলে আসিতে পারিবেন। কিন্তু প্রতিযোগী ভিন্ন অপর মেলে কার্য্য করিলে আর তাহার পূর্ব্বমেলে উঠিবার পথ থাকিবে না; তিনি সেই সেই মেলের দোষাদি গ্রহণ করিয়া সেই সেই মেলভুক্ত হইয়া যাইবেন।(৩৭)

কেহ নূতন মেলে প্রবেশ করিলে নূতন দোষাশ্রিত হইতেন এবং নূতন মেলেও বিশেষ সম্মানলাভ করিতে

(৩২) শ্লোক ৫৮২-৫৯২।
(৩৩) বসু—১ (২০০-২৪০)।
(৩৪) বসু—১ (২৫৯)।
(৩৫) বসু—১ (২৩৫)।
(৩৬) বসু—১ (২৬১)।
(৩৭) বসু—১ (২৬১)।

পারিতেন না। সুতরাং সহজে কেহ মেলত্যাগ করিতেন না।(৩৮) ইহারই ফলে কুলীন সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ, কন্যার অনূঢ়তা অথবা বৃদ্ধবয়সে সর্ব্বথা অনুপযুক্ত বরে সম্প্রদান প্রভৃতি বহু গর্হিত আচার প্রবেশ করিয়াছে। দেবীবর যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিয়াছিলেন, বাঙ্গালার কুলীন সম্প্রদায়ের প্রতি ঘরে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া বাঙ্গালার আকাশ ও বাতাস কলুষিত করিতেছে। কুলশাস্ত্রমতে দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লাল সেন যে উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কৌলীন্য-মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বিংশ শতাব্দীতে তাহার অপরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, 'কালের বিচিত্র গতি, সমাজের কি শোচনীয় পরিণাম!' আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি নবগুণ যে কৌলীন্যের মানদণ্ড ছিল পরবর্ত্তীকালে তাহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে :

'আর গুণ যার গুণ তার সঙ্গে যায়।
কুলগুণ মহাগুণ পুরুষক্রমে পায়॥
রণ্ড পিণ্ড বলাৎকার বিপর্য্যায় পাই।
ঘটকেতে বলে তার দোষ নাই গাই॥
অসৎ করয়ে সৎ কুলের এই কর্ম্ম।
লোহারে করয়ে সোনা পরশের ধর্ম্ম। (৩৯)

অর্থাৎ—যে সমুদয় পাপকার্য্য করিলে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে জাতিচ্যুত ও সমাজচ্যুত হইতে হয়, আধুনিক কুলাচার্য্যগণের মতে সে সমস্ত গর্হিত কার্য্য করিলেও কুলীনত্বের কোন হানি হয় না। ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক। এই গ্লানিকর প্রসঙ্গ আর বাড়াইবার আবশ্যক নাই, সুতরাং এখানেই উপসংহার করিলাম।(৪০)

(৩৮) বসু—১ (২৬৩)।

(৩৯) বসু—১ (২৭৫)।

(৪০) রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের কৌলীন্যপ্রথা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিবার পরে বাহুল্য ভয়ে এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধের পক্ষে অনাবশ্যক বোধে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের কৌলীন্যপ্রথা সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ দেওয়া হইল না। কারণ উভয় সমাজেই কৌলীন্যপ্রথার বিবর্ত্তন প্রায় একই প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে।

বল্লাল সেনের সময় হইতে বারেন্দ্র সমাজে কুলীনে = শ্রোত্রিয়ে আদান-প্রদান হইত। পরবর্ত্তী কালে উদয়নাচার্য্য নিয়ম করিলেন যে, কুলীনের পুত্রকন্যা কুলীনেই গ্রহণ করিবে; এ বিষয়ে ছোটবড় বলিয়া কোন কুলীন আপত্তি করিতে পারিবেন না। সিদ্ধ ও সাধ্য শ্রোত্রিয়েরা কুলীনপুত্রে কন্যাদান করিতে পারিবেন—(বসু—২, পৃঃ ৫০)। রাঢ়ীয় সমাজে যেমন দেবীবর মেলবন্ধন করিয়া আদান-প্রদানের নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন, বারেন্দ্রসমাজেও তেমনি দোষগ্রস্ত কুলীনগণ কাপ ও পটিতে বিভক্ত হইয়াছেন। (বসু—২, পৃঃ ১০৪)।

সময়

শ্রীসুভদ্রা রায়

সীমাহীন পথে চল অবিরাম
আলো ও ছায়ার নিশান তুলে,
ফিরে নাহি চাও কথা নাহি কও
অনাদি অতীতে থাক যে ভুলে।
আমার বেদনা মনের কুটিরে
বন-লতা ঢাকা কেহ না জানে,
তোমার আলোক দূরে স'রে যায়
আমি চেয়ে রই সুদূর পানে।

তুমি পৃথিবীর পথ-সহচর
বাঁধিব তোমারে সকল কাজে,
পলাতক তুমি কেমনে পালাও
দেখিব আজিকে সকাল সাঁঝে।
মধুময় দিন দিয়েছি তোমায়,
তুষিবারে ওই চঞ্চল মন;
যা আছে আমার সব দিয়ে যাব
তবু কি হবে না ক্ষণ-মিলন?

ওগো সুন্দর! তুমি র'য়ে যাবে
আদিহীন পথে মৌন একা
আমি ধীরে ধীরে ধরার ধূলায়
মিশে যাব ক্ষীণ দীপ্তি রেখা।

বিফল প্রসাধন

শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়

অনেক ভেবে চিন্তে হরিচরণবাবু ঠিক করলেন যে, বিয়ে তাঁকে আর একটা করতেই হবে। বিয়াল্লিশ বছর বয়সটা আর এমন বেশী কি! এ বয়সে এখন অনেকে প্রথমবার বিয়ে করছে, আর তিনি ত করবেন দ্বিতীয় পক্ষ। আর তাঁর যখন অর্থ ও সামর্থ্য দুই-ই আছে, তখন তিনি বিয়ে করলে এমন কিছু দোষের হবে না।

বিয়ে হয়ে গেল—বাঙলা দেশের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের মধ্যে একজন আরামের নিশ্বাস ফেললেন।

নববধূ পদ্মা স্বামীর ঘরে এসে চমকে উঠল। এতবড় বাড়ী সে জীবনে চোখে দেখেনি। নিজেকে এতবড় বাড়ীর মালিক ভেবে সে একটু গর্ব্বও অনুভব করল। ভুল তার ভাঙল দু-এক দিনের মধ্যেই; এ বাড়ী তার নয়, এ বাড়ী জমিদারের—আর তার স্বামী পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আদায়ের মহলের নায়েব। জমিদার থাকেন কলকাতায়, তাই এ বাড়ীতে বাস করেন নায়েব মশাই।

সাতদিনের মধ্যেই তার বিয়ের আনন্দ ফুরিয়ে এল। সে এই নিরালা পুরীতে হাঁপিয়ে ওঠে—একটা কথা বলার লোক পর্য্যন্ত নেই। ভোরবেলা উঠেই নায়েব মশাই চলে যান কাছারী বাড়ীতে, ফেরেন বেলা দুটোয়; আবার তিনটে না বাজতেই তাঁকে কাছারী বাড়ী ছুটতে হয়, ফিরতে রাত্রি এগারোটা বাজে, কোন কোন দিন বারটাও বেজে যায়। সমস্ত দিনটা পদ্মা ছটফট্ করে। অর্দ্ধভগ্ন পূজোর দালানের আলসেতে বসে পায়রাগুলো খেলা করে, সে আপন মনে চেয়ে চেয়ে দেখে। ওর মনে হয় ও যদি একটা পায়রা হ'ত তা হ'লে ওর জীবন হ'ত কত সুখের। আবার সন্ধ্যাবেলায় যখন চামচিকের দল ভাঙা ঘরগুলোর মধ্যে উড়ে উড়ে বেড়ায় তখন তাদের পাখার শব্দে ওর সমস্ত শরীর ভয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যা না হতেই বুড়ি ঝি দুলে-বৌ ঘুমে ঢুলে পড়ে, পদ্মার শত আহ্বানেও তার ঘুম ভাঙতে চায় না। এক এক দিন—যেদিন সন্ধ্যাবেলায় হাওয়া ওঠে সেদিন বৃহৎ জমিদার বাড়ীর কাটালে কাটালে অশরীরী আত্মার দল হু হু করে কেঁদে ওঠে। সেই শব্দে পদ্মার বুকের রক্ত শুখিয়ে যায়, সে ঘুমন্ত দুলে-বৌএর গা ছুঁয়ে বসে বসে রাম নাম জপ করে।

পদ্মা এ সম্বন্ধে দু-এক দিন নায়েব মশায়ের কাছে অভিযোগ করেছে; কিন্তু উত্তরটা মোটেই সুবিধাজনক পায়নি। নায়েব মশাই বলেন যে, পনেরো-ষোল বছর বয়সে পদ্মার এ খুকিপনা শোভা পায় না; আর এ বাড়ীতে তিনি তাঁর কোন আত্মীয়কে এনে রাখবেন এও সম্ভব নয়।

পদ্মা ম্লানমুখে বলে, যে কেউ একজন থাকলেই আমি বেশ থাকতে পারব।

উষ্ণভাবে নায়েব মশাই জবাব দেন, তিনকুলে আমার যদি কেউ থাকত তা হ'লে আর এ বয়সে তোমাকে বিয়ে ক'রে আনতাম না, আর দুলে-বৌ ত রাতদিনই আছে…

পদ্মার মুখে আর কথা আসে না, শুধু তার চোখের কোণে ফুটে ওঠে দু'ফোটা আঁখিজল।

সময়ের পাখায় ভর ক'রে দু'বছর উড়ে গেল। পদ্মার জীবনে কোন পরিবর্ত্তনই আসেনি—কেবল পিতৃকুলে একমাত্র পিতা বর্ত্তমান ছিলেন, তিনিও মাস ছ'এক পূর্ব্বে অন্য জগতে যাত্রা করেছেন। আগের মত পদ্মার আর তত কষ্ট হয় না। অভিশপ্ত পাতালপুরীর অবরুদ্ধা রাজকন্যার মত সে নীরবে দিন কাটিয়ে চলে। তার কৈশোরের স্বপ্ন যৌবনে সফল হ'ল না। দিন দিন সে একটু একটু ক'রে শুখিয়ে যায়—বিফলতার হাওয়া লেগে তার মুকুলিত যৌবন অকালে শুখিয়ে ওঠে।

দুলে-বৌ এক একদিন বলে, আগের বৌটার ছেলেপুলে হ'ল না, দিন দিন সে একটু একটু ক'রে শুখিয়ে মরে গেল। আর তোরও হ'ল বৌ সেই দশা—দিনের পর দিন তুইও শুখিয়ে যাচ্ছিস।

পদ্মা একটু ম্লান হেসে বলে, দিদির পায়ের ধুলো পেলে আমি ত বেঁচে যাই।

* * *

নায়েব মশায়ের কাজের ভীড় অত্যন্ত বেড়ে উঠেছে। সাতদিনের মধ্যে লাটের টাকা সদরে পাঠাতে হবে, তার

এখন জোগাড় হয়নি। তার উপর হাইকোর্টের থেকে একজন উকিলবাবু আসছেন, তাঁকে গাজীপুর মহল নিয়ে যে মামলা চলছে, সেই সম্বন্ধে কাগজ-পত্র বুঝিয়ে দিতে হবে। নায়েব মশাই অন্দরে আসা একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। মুহুরী হরিদাস দু'বেলা তার খাবার কাছারী ঘরে এনে দেয়—নায়েব মশাই কাছারী-ঘরেই খাওয়া দাওয়া শেষ করেন, আর রাতের দু-তিন ঘণ্টা ঘুম তিনি দলিলের খাতা মাথায় দিয়ে সেরে নেন্।

উকিলবাবু আজ এসে পৌছাবেন, সেই জন্যে নায়েব মশায়ের ব্যস্ততা আজ চরমে উঠেছে। দীঘিতে জাল পড়েছে—বড় মাছ আজ একটা চাই-ই। ওদিকে চারা বাগানের নারকেল গাছ থেকে কাঁদি কাঁদি ডাব আসছে। হারু বাগদী তার পিতলের তকমাটা ছাই দিয়ে মেজে পরিষ্কার করতে লেগে গেছে—দুপুর বেলায় তাকে বরকন্দাজের দল নিয়ে চার ক্রোশ দূরে ষ্টেশনে যেতে হবে। অনেককাল পরে আজ বরকন্দাজদের লাঠিতে তেল পড়ছে।

চার দিন পরে আজ নায়েব মশাই দ্বিপ্রহরে একবার অন্দরে প্রবেশ করলেন। পদ্মাকে ডেকে বললেন, তুমি ভাল রাঁধতে পার ত? আজ কলকাতার হাইকোর্ট থেকে উকিলবাবু আসছেন, দেখো রান্না যেন আজ বেশ ভাল হয়।

পদ্মা মাথা হেঁট ক'রে জবাব দিল, আচ্ছা, চেষ্টা করব। নায়েব মশাই একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমার আজ আর মরবার সময় নেই, তুমি একটু পরে আমার খাবার কাছারী-বাড়ীতে পাঠিয়ে দিও।

যতই বেলা পড়ে আসতে লাগল, ততই নায়েব মশায়ের চঞ্চলতা বেড়ে ওঠে। উকিলবাবুর আসার সময় উৎরে গেল, তবুও তিনি এসে পৌছালেন না কেন? তিনি এর মধ্যে আরও তিনজন লোক পাঠিয়েছেন, তারাও কেউ ফিরল না। একটু পরেই হারাধন বাগ্দী এসে খবর দিল, উকিলবাবু হেঁটেই আসছেন, তিনি পাল্কী কিম্বা গরুর গাড়ীতে উঠেন নি।

নায়েব মশায়ের বুকটা একটু কেঁপে ওঠে, নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি হয়েছে। সদর দেউড়ীতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নায়েব মশাই প্রতীক্ষা করতে থাকেন। একটু পরেই কোট প্যাণ্ট পরা উকিলবাবু বরকন্দাজদের সঙ্গে এসে উপস্থিত হলেন। নায়েব মশাই একেবারে হতভম্ব হয়ে যান। তিনি কি করবেন কিছুই ঠিক করতে পারেন না। নমস্কার কিম্বা প্রণাম একটা কিছু করা দরকার; কিন্তু তিনি কি করবেন কিছুই ঠিক করতে পারেন না।

নায়েব মশায়ের কিছুই করা হ'ল না, তিনি শুধু তাঁর গলার চাদরটা হাতে জড়াতে লাগলেন। এদিকে উকিলবাবু এসে সটান নায়েব মশায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললেন, বেশ ভাল আছেন ত?

নায়েব মশাই একেবারে অবাক হয়ে যান, তাঁর মুখ থেকে একটা কথাও বার হয় না। তিনি উকিলবাবুর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন।

উকিলবাবু মাথার টুপিটা খুলে বললেন, আমি যে ভানু, আমাকে চিনতে পারছেন না হরিদা?

নায়েব মশায়ের চেতনা ফিরে আসে। তিনি উকিলবাবুকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন—আরে তুই, আমি ভাবছি না জানি কোন্ বড় উকিল এল। আর তোকে দেখেছি কতটুকু, এখন কত বড় হইচিস, একনজরে কি আর চিনতে পারি। নায়েব মশাই এবার আমলা-গোমস্তাদের দিকে চেয়ে বললেন—এ উকিলবাবু আমার মামাতো ভাই, মানে আপন মামাতো ভাই—আমার বড় মামার ছেলে।

সকলে আর একবার উকিলবাবুকে হাত তুলে নমস্কার করলে।

নায়েব মশাই গলাটা একটু পরিষ্কার করে বললেন, তার পর কত দিন উকিল হয়েছিস?

উকিলবাবু উত্তর দিলেন, এই বছর তিনেক হ'ল। এখন হাইকোর্টে মিষ্টার রায়—মানে যার হাতে আপনার এই মামলা আছে—তারই জুনিয়ার হয়ে আছি।

নায়েব মশাই বললেন, বেশ, বেশ, চল্ ভেতরে গিয়ে গল্প করি গে।

উকিলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে নায়েব মশাই একেবারে অন্দরমহলে এসে ঢুকলেন। রান্নাঘরের কাছে এসে তিনি চেঁচিয়ে ডাকলেন, ওগো দেখে যাও কে এসেছে। তুমি ভাব যে দুনিয়ায় আমার কেউ নেই, এই দেখ আমার সব আছে, আমার সব আছে।

পদ্মা একবার রান্নাঘরের দুয়োর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কোট-প্যাণ্টধারী ভানুকে দেখে ভিতরে লুকিয়ে গেল।

নায়েব মশাই চীৎকার করে উঠলেন, আরে ছি, ছি, তুমি কাকে দেখে লজ্জা করছ, এ যে ভানু, আমার মামাতো ভাই, ওকে এতটুকু দেখেছি—কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি।

হলুদের ছোপলাগা ছিন্ন কাপড়টাকে পদ্মা জোর ক'রে গায়ের সঙ্গে চেপে ধরে। না, সে কিছুতেই এ অবস্থায়—বা'র হ'তে পারবে না।

হঠাৎ হরিদাস এসে বললে, বাবু মশাই, এখুনি একবার কাছারী-বাড়ী আসতে হ'চ্ছে, কাপাশতলার গোয়ালারা মারামারি করে সব আপনার কাছে এসেছে—চারটে লোকের মাথা একেবারে চৌচির হয়ে গেছে, আপনি এখুনি আসুন।

নায়েব মশাই বিরক্ত হয়ে বললেন, আর পারি নে। দুদণ্ড যে একটু সুস্থ হয়ে কথা বলব সে অবসরও আমার নেই। ওগো, তুমি ভানুকে একটু খাবার-টাবার দাও, আমি হারামজাদাদের থানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করি।

নায়েব মশাই কাছারী-বাড়ীর দিকে পা বাড়াতেই ভানু বলে উঠল, দাদা আমার স্যুটকেশটা পাঠিয়ে দেবেন, আমার এই সাহেবী পোষাকের জন্যে বৌদি বোধ হয় কথা বলতে রাজী হচ্ছেন না।

নায়েব মশাই চলতে চলতে বললেন—আচ্ছা পাঠিয়ে দিচ্ছি; তুই ততক্ষণ খাবার-টাবার খা, আমার আসতে বোধ হয় দেরী হবে।

নায়েব মশাই চলে যাওয়ার পর ভানু বললে—বৌদি, আমি তোমার অতিথি। তুমি যদি আমার সঙ্গে কথা না-ই কও, বেশ আমি এখুনি কলকাতায় চলে যাচ্ছি।

বিপদে পড়ে পদ্মা কথা বলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তার মুখ দিয়ে একটা কথাও বার হ'ল না—শুধু তার ঠোঁটটা একটু কেঁপে উঠল।

হরিদাস স্যুটকেশটা রকের উপর নামিয়ে রেখে বললে, বাবু আপনার পেঁটরা থাকল।

পদ্মার কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে ভানু একটু মুস্কিলে পড়ে। সে স্যুটকেশ খুলে একটা কাপড়, তোয়ালে, সাবান ও পাঞ্জাবীটা বার ক'রে নিল; তার পর র'কের বালতি থেকে জল নিয়ে হাত মুখ ধুয়ে পোষাকটা পরিবর্ত্তন করে ফেলল।

পদ্মা ওদিকে ময়দা নিয়ে বসেছিল। হাত মুখ ধোয়ার পর ভানুর একটু চা খেতে ইচ্ছা করে। সে এবার শেষ চেষ্টা করল। সটান্ রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে সে বললে, বৌদি, তোমার ও খাবার আমি এখন খাব না, আট মাইল হেঁটে পা ব্যথা করছে, তুমি একটু চা ক'রে দাও।

পদ্মাকে এবার কথা বলতে হ'ল। সে আস্তে বললে, এ বাড়ীতে ত চায়ের পাট নেই।

ভানু বললে, এই ত কথা ফুটেছে, কুচপরোয়া নেই, আমার স্যুটকেশে 'ওভালটীন' আছে, তুমি তাই আমাকে একটু ক'রে দাও।

ভানু স্যুটকেশ খুলে 'ওভালটীনের' টীনটা এনে বললে—দাও একটু তৈরী ক'রে দাও।

লজ্জিত স্বরে পদ্মা বলে, আমি ত তৈরী করতে জানিনে।

—আচ্ছা, তুমি একটু জল গরম কর, আমি একবার তোমার সামনে তৈরী করলেই তুমি শিখে নিতে পারবে। কিন্তু অতটা ঘোমটা আমার সহ্য হবে না, তোলো, আর একটু তোলো।

পদ্মা একটুখানি ঘোমটাটা তুলে দিল।

ভানু বলে ওঠে, আর একটু।

পদ্মা আর একটু তুলে দিল।

ভানু আশ্চর্য্য হয়ে সে মুখের দিকে অপলক চোখে চেয়ে থাকে। তার সাতাশ বছর জীবনে এত সুন্দর মুখ তার লক্ষ্যের মধ্যে আসেনি। লজ্জায় আর আগুনের তাপে সমস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠেছে, মনে হয় একটুকরা সিঁদুরে মেঘের ছায়া পড়েছে ঐ সুন্দর মুখের উপর।

ভানুর মুখের দিকে চেয়েই পদ্মা চোখ নামিয়ে নিল।

জল ফুটে উঠতেই ভানু বললে, দাও, ঐ পাথরের গ্লাস্ দুটো। তারপর বললে, এই দেখো, দু চামচে 'ওভালটীন' দু চামচে চিনি, আর ছ চামচে দুধ। ব্যাস্, ঠিক হয়ে গ্যাছে। একটা গ্লাস পদ্মার দিকে আগিয়ে দিয়ে বললে, নাও, এটা তুমি খাও।

পদ্মা বললে, ও আমার খাওয়া অভ্যাস নেই, ও আমি খেতে পারব না।

ভানু বলে ওঠে, বেশ থাক পড়ে, আমিও খাব না।

পদ্মাকে বিপদে পড়তে হয়। সে একটা গ্লাস টেনে নেয়।

'ওভালটীন' খেতে খেতে ভানু বললে, তুমি সারাদিন ধরে কত রান্না রেঁধেছ—এত খাবে কে?

পদ্মা একটু হেসে জবাব দিল, কলকাতার হাইকোর্টের উকিলবাবু।

একটু একটু ক'রে সন্ধ্যা নেমে আসে। বাড়ীর চারধার থেকে ঝিঁঝি পোকার একটানা সুর ওঠে।

পদ্মার রান্না শেষ হতেই ভানু বলে ওঠে, যাও এবার গা ধুয়ে এসো—সমস্ত শরীর তোমার ঘামে ভিজে গেছে।

রান্নাঘর বন্ধ ক'রে রকে আসতেই ভানু বললে, এই দেখ আমার স্যুটকেশটা এখানেই অন্ধকারে পড়ে রয়েছে; আচ্ছা, আমি এটা নিচ্ছি, তুমি ঐ সাবানের কৌটোটা নাও।

আলো ধরে পদ্মা ভানুকে দোতলার একটা ঘরে নিয়ে এল। বড় খাটটার উপর বসে পড়ে ভানু বললে—এই নাও, আমার মনিব্যাগটা তোমার কাছে রাখ, আর এখুনি গা ধুয়ে ফিরে আসবে।

পদ্মা বলল, এই সাবানটা কি স্যুটকেশের মধ্যে রেখে দেব?

ভানু বিছানার উপর শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বললে, বা রে, তা কেন, ওটা তুমি নিয়ে যাও, ফরাসীদেশের সাবান—কি সুন্দর মিষ্টি গন্ধ, একবার মাখলে আর ভুলতে পারবে না।

পদ্মা জড়সড় হয়ে বলে, সাবান আমি মাখিনে।

ভানু বলে ওঠে—আচ্ছা, অতিথির অনুরোধে একদিন না হয় মাখলেই, তাতে বিশেষ কিছু দোষের হবে না।

সাবানটা নিয়ে পদ্মা নীচে নেমে এল, আর বিছানার মধ্যে শরীর ডুবিয়ে ভানু ভাবতে লাগল অনেক কথা।

প্রায় আধঘণ্টা পরে পদ্মা ফিরে এলো। হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় তার মুখটা ঝল্‌মল্‌ করছে। সমস্ত ঘরটা ফরাসী সাবানের মিষ্টি গন্ধে ভরপুর হয়ে উঠল।

ভানু মাথাটা একটু তুলে বললে, এবার দেখ দিকি তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে?

ওদিক থেকে উত্তর এল—ছাই দেখাচ্ছে।

ভানু মাথাটা টিপে ধরে বললে—আমার স্যুটকেশের ওপরেই একটা সাদা শিশি আছে, ওটা থেকে দুটো বড়ি বার ক'রে আমায় দাও ত। ভয়ানক মাথাটা ধ'রে উঠেছে।

ভানু দুটো 'সেরিডন' খেয়ে আবার শুয়ে পড়ে। দীঘির ধারের জানলাটা দিয়ে ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো এসে পড়েছিল। পদ্মা জানলাটা ধরে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। তার আনমনা দৃষ্টি চলে যায়—দূরে—অনেক দূরে।

ঘরের মধ্যে একটা থমথমে নিস্তব্ধতা। একটু পরে ভানু বললে, তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কেন, এখানে এস, একটু গল্প করা যাক।

পদ্মা ভানুর মাথার কাছে এসে জড়সড় হয়ে বসে। আজকের সন্ধ্যাটা তার কি রকম লাগে সে বুঝে উঠতে পারে না। এ রকম সন্ধ্যা তার জীবনে কোন দিন আসে নি। এই অভিনব সন্ধ্যাটাকে সে প্রাণ দিয়ে অনুভব করে।

ভানু বালিসটাকে একটু নিবিড় ক'রে মাথার উপর চেপে ধরে বলেল, তোমার এখানে ভয়ানক কষ্ট, নয়?

পদ্মার প্রাণের মাঝে গিয়ে কথাটা বাজে। সে উদাস কণ্ঠে বললে, সে কথা আর বলে লাভ কি। তবে তার জন্যে আমি নিজের অদৃষ্ট ছাড়া আর কারও ওপরে দোষ দিইনে। কথা বলার জন্যে প্রাণ এক এক সময় হাঁপিয়ে ওঠে; মনে হয়, কথা না বলে বলে আমি হয় ত বোবা হয়ে যাব; কিন্তু···

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে ভানু বলে, তুমি যেন অশোক বনের অবরুদ্ধা সীতা।

পদ্মা বলে ওঠে—সীতা তবু একদিন মুক্তি পেয়েছিলেন, কিন্তু আমার মুক্তি না মলে হবে না।

ভানু মাথাটা টিপে ধরে বললে—বাইরে এত হাওয়া বইছে, কিন্তু ভিতরে তার একটুও প্রবেশ করছে না। একটু হাওয়া লাগলে আমার মাথাটা ছেড়ে যেত।

পদ্মা তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে, আমি একটা পাখা দিয়ে তোমার মাথায় বাতাস দেই, তা হ'লে হয় ত আরাম হতে পারে।

আপত্তি জানিয়ে ভানু বলে, না, না, তার প্রয়োজন নেই, ওষুধ খেয়েছি, এখুনি ছেড়ে যাবে। একটু থেমে সে আবার বললে, আচ্ছা, ছাতে ওঠা যায় না?

পদ্মা বিস্মিত হয়ে বলে, ও বাবা, ছাদের নাম ক'র না!

—কেন? ছাদে কি হয়েছে?

—সে অনেক কথা। সিঁড়িতে ভয়ানক ভয় আছে।

—ভয়! কিসের ভয়?

—এখন যে জমিদার আছেন, তাঁর ঠাকুরদাদার সময়ে একবার ও বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছিল। সেই সময় একটা ডাকাত ঐ সিঁড়ির মধ্যে মারা পড়ে, সে এখনও ভূত হয়ে ওখানেই আছে, তাই ছাদে কেউ যায় না।

ভানু লাফ দিয়ে উঠে বসে বললে, ভূত! আচ্ছা আমি দেখব কি রকম ভুত, তুমি আমার সঙ্গে এস।

চোখে মিনতি এনে পদ্মা বললে—না, না, তুমি যেও না, শেষে কি একটা সর্ব্বনাশ হবে।

ভানু কোন কথাই শুনলে না। সে তার স্যুটকেশ থেকে টর্চ্চটা বার ক'রে নিয়ে বললে, চলে এস আমার সঙ্গে, তোমার কোন ভয় নেই।

পদ্মাকে অগত্যা ভয়ে ভয়ে যেতে হয়। সিঁড়ির ধাপে ধাপে অজস্র ধূলা জমে উঠেছে, তারই ওপর দিয়ে ভানু একটু একটু ক'রে অগ্রসর হয়, আর পদ্মা কম্পিত বুকে ভানুর গায়ের সঙ্গে মিশে মিশে চলে। ওরা সিঁড়ির প্রায় শেষ ধাপে এসে পৌঁচেছে, এমন সময় দুটো লক্ষ্মী পেঁচা বিশ্রামের ব্যাঘাত পেয়ে ওদের কানের পাশ দিয়ে ফট্‌ফট্‌ আওয়াজ ক'রে ছাদের উপর উড়ে চলে যায়। সেই শব্দে ভীত হয়ে পদ্মা একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে ভানুকে জড়িয়ে ধরে।

ভানু বলে ওঠে—ভয় কি, দেখতে পেলে না ও দুটো পাখী।

পদ্মার মুখ থেকে আর কথা বার হয় না। তার দেহের সমস্ত স্নায়ুতে নেমেছে অবসাদ, তার বুক কাঁপছে থর থর ক'রে।

ভানু পদ্মার বুকের প্রতিটি স্পন্দন নিজের বুকে অনুভব করতে লাগল। সে কি করবে প্রথমে ঠিক করতে পারে না, তার পর সে পদ্মাকে তুলে নিয়ে এল ছাদের উপর।

ছাদের খোলা হাওয়ায় প্রায় পাঁচ মিনিট পরে পদ্মার অবচেতন ভাবটা অনেকটা কমে আসে। সে বুকের উপর হাত দিয়ে দেখিয়ে বললে, যন্ত্রণা··

ভানু পদ্মার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে—হঠাৎ ভয় পেয়েছ, তাই ও রকম হয়েছে। আর কোন ভয় নেই, তুমি আমার কোলের উপর মাথাটা রেখে চোখ বুজে আর একটু শুয়ে থাক, তা হ'লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সময়ের সমুদ্র থেকে আরও পাঁচটা মিনিট ঝরে গেল। ভানু ডাকলে, এবার যন্ত্রণা কমেছে?

পদ্মা চোখ চেয়ে বললে, হাঁ কমেছে।

ভানু একটু হেসে বললে—তুমি আর একটু হ'লে আমাকেই ভয় লাগিয়ে দিয়েছিলে আর কি।

পদ্মা বললে—তুমি আচ্ছা দুষ্টু, শুধু শুধু কি কাণ্ডটা বাধালে বল ত?

ভানু বলল, ওটা আমার স্বভাব।

আবার খানিকটা সময় কাটে চুপচাপে।

হঠাৎ পদ্মা ভানুর হাতের আংটীটার দিকে চেয়ে বলে ওঠে—দেখ, দেখ, চাঁদের আলো পড়ে তোমার আংটীর ঐ পাথরটা কি রকম জ্বলছে।

ভানু হাতের আংটীটা খুলতে খুলতে বললে, রাতে হীরে জ্বলে। তার পর পদ্মার হাতটা কোলের উপর টেনে নিয়ে সে আংটীটা পরিয়ে দিল।

পদ্মা আপত্তি জানিয়ে বললে, কেন তুমি শুধু শুধু এটা আমাকে দিচ্ছ?

ভানু জবাব দিল, শুধু শুধু নয়। তোমার সঙ্গে আমি বন্ধু পাতালাম, আর এই আংটীটা রইল আমার বন্ধুত্বের নিদর্শন। যখনই তুমি এই আংটীটার দিকে তাকাবে তখনই তোমার বন্ধুকে মনে পড়বে।

পদ্মা কোন কথা বললে না, শুধু তার বুক বেয়ে বার হয়ে গেল একটা তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস।

একটু পরে পদ্মা বললে—নীচে চল, আমার বুকের যন্ত্রণাটা আবার যেন একটু একটু হচ্ছে।

ভানু বললে চল, নীচে গিয়ে তোমাকে একটা ওষুধ দেব, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমার সব দুর্ব্বলতা চলে যাবে।

নীচে নেমে এসে ভানু জলের সাথে খানিকটা ওষুধ মিশিয়ে পদ্মাকে খাইয়ে দিয়ে বললে, তিন মিনিটের মধ্যে তোমার বুকের যন্ত্রণা সেরে যাবে।

নীচের থেকে নায়েব মশায়ের গলার আওয়াজ ভেসে এল—কি রে ভানু, শুয়ে পড়েছিস না কি?

ভানু টর্চ্চটা নিয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল।

পরের দিন সকালে ভানু নায়েব মশায়ের সঙ্গে কাছারী-বাড়ী এসে কাগজপত্র দেখে 'নোট' লিখতে আরম্ভ করল। নায়েব মশায়ের হাঁকডাকে সমস্ত আমলা-মুহুরী কেঁপে কেঁপে উঠছে। বেলা বারটা বেজে গেল, তবুও সব কাজ শেষ হ'ল না, অথচ বিকেলেই ভানুকে চলে যেতে হবে। বেলা সাড়ে বারটার সময় ভানু বললে, দাদা, এবেলা থাক, আবার ওবেলা কাজ করা যাবে।

নায়েব মশায় জবাব দিলেন—তাই থাক, তুই এক কাজ করিস্, রাতে বাকী কাজটা সেরে কালকে সকালে সাতটার ট্রেনে চলে যাস্। আমি তোকে ঠিক রাত চারটের সময় তুলে দেব।

রাতে বাকী কাজ শেষ করতে দশটা বেজে গেল। যাবার সময় নায়েব মশাই পদ্মাকে বললেন, তুমি ভোর রাতে উঠে ভানুকে একটু খাবার ক'রে দিও, ও ত পালকীতেও চাপবে না, আর গাড়ীতেও উঠবে না —অতখানি পথ চলতে হবে, পেটে একটু ভার থাকার দরকার।

ভানু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—বৌদি, 'ওভালটীন' তৈরী ক'রে তারপর আমাকে জাগাবে।

আধ-ঘোমটার মধ্য থেকে পদ্মা শুধু একটু ঘাড় নাড়ল।

রাত্রি চারটের সময় নায়েব মশাই পদ্মাকে জাগিয়ে দিয়ে বললেন, ভানুর সঙ্গে যে সব কাগজপত্র পাঠাতে হবে সেগুলো আমি বেঁধে ছেঁদে ঠিক করতে চললাম, তুমি এখুনি ওকে একটু খাবার করে দাও।

নায়েব মশাই নীচে চলে যাওয়ার পর পদ্মা এল ভানুর ঘরে। চাঁদের আলো পড়েছে ভানুর সর্ব্বাঙ্গে—সে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। পদ্মার ডাকতে মায়া হয়। সে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ভানুর মুখের দিকে। কিন্তু আর দেরী করা চলে না, গাড়ী যদি না পাওয়া যায়। পদ্মা বলে ওঠে—এবার উঠতে হবে, আর ঘুমুলে গাড়ী পাওয়া যাবে না।

অপর পক্ষ থেকে কোন জবাবই আসে না।

পদ্মা মুস্কিলে পড়ে। সে ভানুর মাথায় হাত দিয়ে বলে, রাত্রি চারটে বেজে গেছে, এবার উঠতে হবে।

ভানু চোখ মেলেই পদ্মার হাতটা চেপে ধরে বলে, বল, বন্ধু জাগ।

পদ্মা বলে, আমাকে এখুনি খাবার ও 'ওভালটীন' করতে হবে, আমি নীচে যাই।

ভানু বালিসের তলা থেকে ঘড়িটা বার ক'রে দেখে নিয়ে বললে, মাত্র চারটে বেজে সাত মিনিট হয়েছে, এখনও অনেক দেরী আছে; আর খাবার তোমাকে করতে হবে না, এই শেষ রাতে আমার পক্ষে কিছু খাওয়া একেবারেই অসম্ভব—শুধু একটু 'ওভালটীন'ই খাব। তুমি একটু ব'স।

দীঘির ধারে বাঁধান ঘাটের বকুল গাছটায় একটা নাম-না-জানা পাখি প্রভাতী গাইতে সুরু করে দিয়েছে! পাকুড় গাছের মাথায় শুকতারাটা জ্বল্‌জ্বল্ করছে। পদ্মা আর ভানু কেউই কথা বলে না—ওদের সব কথার যেন শেষ হয়ে গেছে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে পদ্মা বলে উঠল—আর দেরী করলে গাড়ী পাওয়া যাবেনা। আমি 'ওভালটীন' ক'রে এনে তোমার স্যুটকেশটায় কাপড়-চোপড় গুছিয়ে দেব, তুমি ততক্ষণ শুয়ে থাক।

পদ্মা ভানুর হাতের মধ্যে থেকে নিজের হাতটা খুলে নিয়ে নীচে চলে আসে। আর ভানু পদ্মার কথায় কোন জবাব না দিয়ে চেয়ে থাকে পাকুড় গাছের মাথার পানে।

'ওভালটীন' তৈরী ক'রে এনে পদ্মা ভানুর স্যুটকেশ গোছাতে বসে। 'ওভালটীনে'র গ্লাসটা শেষ ক'রে ভানু বলে, স্যুটকেশটা এদিকে একবার আন।

পদ্মা স্যুটকেশ নিয়ে এলে ভানু তার মধ্য থেকে বার করল একটা স্নো, একটা এসেন্স, আর সেই ফরাসি সাবানটা; তারপর সেগুলো পদ্মার দিকে আগিয়ে দিয়ে বললে, এইবার স্যুটকেশটা বন্ধ কর।

পদ্মা আপত্তি জানায়।

ভানু কোন কথা শোনে না।

কেশ বেশ ঠিক ক'রে নিয়ে ভানু বললে, এবার তা হ'লে চলি।

পদ্মা জবাব দিতে পারে'না, তার চোখ ছল্ ছল্ ক'রে ওঠে।

অন্দরমহলের আঙিনা পার হয়ে ভানু পূজোর দালানের পাশে গলির পথটায় ঢুকবার সময় একবার পিছন ফিরে চাইলে, সে দেখতে পেলে পদ্মা তার দিকে ছুটতে ছুটতে আসছে। ভানু সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল। পদ্মা কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, একটা কথা বলব।

—বলো

—তুমি আবার কবে আসবে?

একটু চিন্তা করে ভানু বললে, পরের শনিবারে আসব।

—নিশ্চয়ই আসবে?

—হাঁ, এই আমি তোমার গাঁ ছুঁয়ে দিব্বি ক'রে বলছি, নিশ্চয়ই আসব, তবে হয় ত রাত হয়ে যেতে পারে।

পদ্মার নয়ন-কোণে জল আসে—ভানু কাছারী-বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়—

* *
*

সোমবার থেকে শনিবার পর্য্যন্ত পদ্মা কি ক'রে কাটিয়েছে সে নিজেই জানে না। সে জাগরণে স্বপ্ন দেখেছে—সকল কাজে ভুল করেছে। আজ শনিবার। সকাল হতেই পদ্মা স্বপ্ন দেখছে। সে গা ছুঁয়ে দিব্বি ক'রে গেছে, সে আজ নিশ্চয়ই আসবে।

দুপুর বেলায় নায়েব মশাই লাটের টাকা নিয়ে কলকাতায় চলে গেলেন। যাবার সময় পদ্মাকে ব'লে গেলেন, ফিরব কাল সকালের গাড়ীতে।

সন্ধ্যার মধ্যে পদ্মা রান্নার কাজ শেষ ক'রে নিয়ে স্নান ক'রে নিল, তারপর রত হ'ল প্রসাধনে। বিয়ের সময়ের সেই ভাল নীলাম্বরী শাড়ীটা আজ সে পরলে; আয়নার সম্মুখে বসে স্নো মাখলে, গায়ে ঢালল ভানুর দেওয়া খানিকটা এসেন্স। রাত যত বেড়ে ওঠে, পদ্মার ব্যস্ততা তত যায় বেড়ে, সে ওপরের জানলা দিয়ে কেবলই পথের পানে চায়। রাত আর একটু বেড়ে উঠলে পদ্মা ভানুর খাবার নিয়ে দুলেবৌর সাথে ওপরে এসে উঠল।

ওদিকে ভানুর কোর্ট থেকে বা'র হতে আড়াইটে বেজে গেল। তারপর কতকগুলো প্রয়োজনীয় কাজ সেরে সে যখন বাসায় এল তখন বেলা চারটে বেজে গ্যাছে। টাইমটেব্ল খুলে দেখল, ঠিক চারটের একটা গাড়ী ছিল, এর পরের গাড়ী রাত ন'টায়—যেটায় যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। সে মনে মনে একটা হিসেব করলে: এখান থেকে বর্দ্ধমান দু'ঘণ্টা আর বাকী পথটা লাগবে ঘণ্টা দেড়েক। সাড়ে সাতটায় সে ঠিক পৌঁছে যাবে। সে আর দেরী না করে মটরসাইক্লে বার হয়ে পড়ল।

বর্দ্ধমান পৌঁছানর পূর্ব্বে কালবৈশাখীর ঝড় উঠল। ভানুকে প্রায় একঘণ্টা সেখানে অপেক্ষা করতে হ'ল। ঝড় শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে আবার তার গাড়ী পূর্ণগতিতে চালাতে আরম্ভ করল। গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড হতে যেখানে কাঁচা পথে নামতে হবে সেখানে এসে সে একবার ঘড়িটা দেখে নিল: সাড়ে আটটা বেজেছে আর মিনিট পনেরোর পথ বাকী। গেঁয়ো পথের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ একটা তেঁতুল গাছের শিকড়ে লেগে মটর-বাইক্‌টা লাফিয়ে উঠল, আর ভানু ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল তেঁতুল গাছটার গুঁড়ির উপর। মটর বাইকটা খানিকটা ভট্‌ভট্‌ করে আওয়াজ করলে তারপর সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

··নীচের ঘরে খুটখাট শব্দ হয়। পদ্মা দুলেবৌকে বলে, নীচে কে যেন এল না?

দুলে-বৌ চোখ বুজেই বলে না, না, ও কিছু নয়। রাত যতই বাড়ে, পদ্মার ভাবনা ততই বেড়ে যায়। মন বলে, সে নিশ্চয়ই আসবে। সে কথা দিয়ে গেছে, সে গা ছুঁয়ে দিব্বি করেছে—সে নিশ্চয়ই আসবে।

নীচের আঙিনায় মানুষের পায়ের শব্দ হয়। পদ্মা বিছানা ছেড়ে উঠে এসে ডাকে—দুলে-বৌ, শীগ্‌গীর নীচে চল্, কে এসেছে, দরজা খুলে দিতে হবে।

দুলে-বৌ নাকি সুরে বলে, তুই কি আজ পাগল হয়ে গেলি বৌ, ঘুমিয়ে পড়্, রাত অনেক হয়েছে।

পদ্মার আশার প্রদীপ একটু একটু ক'রে নিভে আসে। রাত অনেক হয়ে গেছে, আর তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই সে কোন জরুরী কাজে আটকা পড়েছে, সেইজন্যে সে আসতে পারলে না।

হঠাৎ ভানুর ডাক পদ্মার কানে এলো: বন্ধু, আমি এসেছি, দরজা খোল। ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে পদ্মা লজ্জিত হয়ে নিজেকে গালাগালি দিল, তারপর আলু থালু বেশে ছুটতে ছুটতে এসে বড়দালানের জানলা খুলে বলে উঠল, বন্ধু, তুমি এলে···

নীচে থেকে কোন সাড়া এল না।

পদ্মা আবার ডাকলে—বন্ধু, তুমি এসেছ?

এবারও কোন সাড়া এল না।

* *
*

ভানু বাঁচেনি।

তারপর তিন বছর চলে গেছে। পদ্মাকে দেখলে এখন আর চেনা যায় না। কঙ্কালের উপর একটা সাদা চামড়া দিয়ে ঢাকা মূর্ত্তি। উঠতে বসতেও এখন তার কষ্ট হয়। যেদিন তার মন অত্যন্ত খারাপ হয়, সেদিন সে তার বাক্সের তলা থেকে বার করে ভানুর দেওয়া সেই প্রসাধনের জিনিষ-গুলো, তারপর সেগুলোর দিকে চেয়ে থাকে, অপলক চোখে। আংটীটার জন্যে তার মধ্যে মধ্যে দুঃখ হয়। যেদিন ভানুর মৃত্যুসংবাদ এসে পৌছেছিল, সেদিন সন্ধ্যাবেলা পদ্মা দীঘির জলে আংটীটাকে ফেলে দিয়ে এসেছিল। এখন ওর মনে হয়, বন্ধুত্বের সেই নিদর্শনটুকু ফেলে না দিলেই ভাল হ'ত।

দুলেবৌ এক একদিন পদ্মার দিকে চেয়ে বলে, বৌ, তোর দিন শেষ হয়ে এসেছে, আগের বৌএরও শেষ দিকে এই রকম অবস্থা হয়েছিল। এই শাপ-লাগা বাড়ীতে কেউ আর বাস করতে পারবে না।

সন্ধ্যায়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সন্ধ্যা—জীবন সন্ধ্যা আমার
স্বর্ণ সন্ধ্যা হোক,
রবির কিরণ মিলাবার আগে
উঠুক চন্দ্রালোক।
গগনে ভূতলে কনকের রাগ,
পুঞ্জিত প্রীতি আদর সোহাগ,
কুঞ্জে ফুটুক রজনীগন্ধা
চম্পা আর অশোক।

প্রখর রৌদ্র বহেছি মাথায়,
সহেছি ঝঞ্ঝা ঝড়
কঠিন যাত্রা, কর মা আমার
পরিণাম মনোহর।
জুড়াইয়া দাও পথিকের দুখ,
কনকাঞ্চলে মুছাও এ মুখ,
সবল করুক দুর্ব্বল বুক
তব মঙ্গল কর।

দেউলে দেউলে দেউটি জ্বলুক
বাজুক সন্ধ্যারতি,
উজল করিয়া উজ্জ্বল পথে—
হউক আমার গতি।
ধরণী যতই দূরে সরে যায়,
স্নেহ কোল তব যেন মা আগায়,
তুমি নাম ধরে ডেকো মা আমায়
আমি ভুলে যাই যদি।

দুখ সাগরের অবগাহনেতে
হয়েছি সুনির্ম্মল
রেখ মা মিনতি প্রাণের কামনা
কর নাক নিস্ফল।
কাঁদিয়া ডাকিনু—সার্থক ডাক
জননী বলিল নির্ভয় থাক'
ললাটে আমার টিকা পরাইল
রঙায়ে নভঃস্থল।

সেই হতে শত ব্যথা অনটন
দেয় নাক পীড়া আর,
এ জীবন সুধাসিক্ত করিছে
মায়ের স্তন্য ধার।
কেশরী কনক কেশর বুলায়,
মরণের ভয় বেদনা ভুলায়,
ধরার দুয়ার বন্ধ না হতে
খুলিছে স্বর্গদ্বার।

সঙ্গীতরত্নাকরে রাগবিবেকাধ্যায়

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

সঙ্গীতরত্নাকরের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবিধ রাগ আলোচিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে প্রথমত নাদ হইতে শ্রুতি, শ্রুতির সমবায়ে স্বর ও তাহাদের বাদী সংবাদী অনুবাদী বিবাদী বিভাগ, গ্রামনির্ণয়, মূর্চ্ছনা, ক্রম, তান, গ্রাম-সাধারণ ও জাতি-সাধারণ নির্ণয়পূর্ব্বক বর্ণ অলঙ্কার নিরূপণ করা হইয়াছে। তৎপর এই সকল উপকরণের নানাবিধ ব্যবহারে বিবিধ জাতি নিরূপিত হইয়াছে। গান্ধর্ব্ব ও গানভেদে গীতির যে দুইটি অমৃতময়ী ধারা প্রবাহিত তাহার মূল উৎস হইতেছে এই জাতি। জাতি হইতে একদিকে যেমন গান্ধর্ব্ব গীত উদ্ভূত, অপরদিকে লোকমনোহারী গানও এই জাতি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং শার্ঙ্গদেব গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, সন্ন্যাস, বিন্যাস, তার, মন্দ্র, বহুত্ব, অল্পত্ব ও অন্তর মার্গ প্রভৃতি যাবতীয় উপকরণের বিস্তৃত বর্ণনায় এই জাতিপ্রকরণটি সহজবোধ্য ও সুগম করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। তৎপর এই জাতি হইতে উৎপন্ন বিবিধ রাগ-নির্ণয়ের পূর্ব্বে কপাল কম্বল নামক দুই প্রকার গীতি উদাহরণসহ বর্ণনা করিয়া মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা নামে চারিপ্রকার গীতি নির্ণয় ও তাহার উদাহরণ প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বরাধ্যায় পরিসমাপ্ত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় নানাবিধ রাগ। শার্ঙ্গদেব রাগাধ্যায়ে সর্ব্বসমেত ২৬৪ প্রকার রাগের আলোচনা করিয়াছেন। শার্ঙ্গদেবের রাগ-সংখ্যানির্দ্দেশক শ্লোকটি এই—

সর্ব্বেষামিতি রাগাণাং মিলিতানাং শতদ্বয়ম্।
চতুঃষষ্ঠ্যধিকং ব্রূতে শার্ঙ্গীশ্রীকরণাগ্রণীঃ।

এই সংখ্যার সঙ্কলন প্রণালী নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(১)	গ্রামরাগ	৩০	গান্ধর্ব্ব গীত (মার্গী) (জাতি কপাল কম্বল প্রভৃতিও গান্ধর্ব্ব গীতেরই অন্তর্গত)
(২)	উপরাগ	৮	
(৩)	রাগ	২০	
(৪)	ভাষা	৯৬	
(৫)	বিভাষা	২০	
(৬)	অন্তরভাষা	৪	
	পূর্ব্ব প্রসিদ্ধ		গান (দেশী)
(৭)	রাগাঙ্গ	৮	
(৮)	ভাষাঙ্গ	১১	
(৯)	ক্রিয়াঙ্গ	১২	
(১০)	উপাঙ্গ	৩	
	অধুনা প্রসিদ্ধ		
(১১)	রাগাঙ্গ	১৩	
(১২)	ভাষাঙ্গ	৯	
(১৩)	ক্রিয়াঙ্গ	৩	
(১৪)	উপাঙ্গ	২৭	
		২৬৪	

আমরা নিম্নে এই ২৬৪ প্রকার রাগের লক্ষণ যথাক্রমে লিপিবদ্ধ করিতেছি। চতুর কল্লিনাথ রাগের সাধারণ লক্ষণ নিম্নলিখিত শ্লোকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

যোঽসৌ ধ্বনি বিশেষস্তু স্বর-বর্ণ বিভূষিতঃ।
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগঃ কথিতো বুধৈঃ॥

গ্রামরাগ

স্বর-বর্ণ ইত্যাদি বিভূষিত যে ধ্বনিবিশেষ শ্রবণে লোকের চিত্ত অনুরক্ত হয়, তাহাকেই সঙ্গীতাচার্য্যগণ রাগ বলেন। এই রাগ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বহুপ্রকার; তন্মধ্যে শুদ্ধা, ভিন্না, বেসরা প্রভৃতি পাঁচপ্রকার গীতির আশ্রয়ে ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামে যে রাগ উৎপন্ন হয় তাহাই গ্রামরাগ। পাঁচপ্রকার গীতির আশ্রয়ে এই রাগ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা প্রথমত পাঁচপ্রকার।

শুদ্ধাদি পাঁচপ্রকার গীতি

শুদ্ধাদি গীতি পাঁচপ্রকার, যথা—(১) শুদ্ধা, (২) ভিন্না, (৩) গৌড়ী, (৪) বেসরা ও (৫) সাধারণী।

(১) শুদ্ধাগীতি—সরল ও ললিত স্বরে নিবদ্ধ গীতিকে শুদ্ধাগীতি বলা হয়।

(২) ভিন্না গীতি—বক্র ও সূক্ষ্মস্বরে নিবদ্ধ মধুর গমকযুক্ত গীতির নাম ভিন্না গীতি।

(৩) গৌড়ী গীতি—মন্দ্র, মধ্য ও তার—এই তিন স্থানেই গাঢ় গমকযুক্ত, তিন স্থানেই অবিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত গীতিই গৌড়ী গীতি নামে পরিচিত। এই গীতির স্বরসমূহ উহাটী-যোগে মধুর হইয়া থাকে। (চিবুক হৃদয়ে স্থাপন করিয়া 'উ' ও 'হ' এই দুইটি বর্ণের অনুকরণে শব্দ উচ্চারণ করিয়া ধারাবাহিক কম্পিত ও দ্রুততর মন্দ্রস্বর উচ্চারণের প্রয়াসকে "উহাটী" বলা যায়।)

(৪) বেসরা গীতি—স্থায়ী আরোহী প্রভৃতি চারিপ্রকার বর্ণেই অতিশয় রক্তিযুক্ত যে গীতি শীঘ্রই প্রয়োগের জন্য বেগযুক্ত স্বরে রচিত হয়, তাহাকেই 'বেগস্বরা' নামের অপভ্রংশে বেসরা গীতি বলা হয়।

(৫) সাধারণী গীতি—পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার গীতির রচিত তাহাকে সাধারণী গীতি বলে।

এই পাঁচপ্রকার গীতির মধ্যে যে রাগ যখন যে গীতির আশ্রিত, তখন সে রাগ সেই নামে পরিচিত হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে গীতিভেদ

আমরা পূর্ব্বে মাগধী, অর্দ্ধমাগধী প্রভৃতি যে চারিপ্রকার গীতির উল্লেখ করিয়াছি উহা ভরতসম্মত। এখানে যে পাঁচপ্রকার গীতি বলা হইল ইহা দুর্গামতের। মাগধী প্রভৃতি চারিপ্রকার গীতিপদও তালের আশ্রিত, আর শুদ্ধা ভিন্না প্রভৃতি পাঁচ প্রকার গীতি প্রধানত স্বরের আশ্রিত। মতঙ্গ-মতে শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা, সাধারণী ভাষা, বিভাষা নামে গীতি সাত প্রকার।

যাহা হউক, শুদ্ধাদি পাঁচ প্রকার গীতির আশ্রয়ে যে গ্রামরাগ রচিত হয় তাহা ত্রিশ প্রকার; যথা—শুদ্ধাগীতির আশ্রয়ে শুদ্ধরাগ সাত প্রকার; যথা—ষড়জগ্রাম সমুৎপন্ন (১) ষড়জ কৈশিক (২) মধ্যম (৩) শুদ্ধ সাধারিত ও (৪) ষড়জ গ্রামরাগ। মধ্যমগ্রামসমুৎপন্ন (৫) পঞ্চম (৬) মধ্যম গ্রামরাগ (৭) শুদ্ধ কৈশিক।

ভিন্না গীতির আশ্রয়ে গ্রামরাগ পাঁচপ্রকার; যথা—(১) কৈশিক মধ্যম ও (২) ভিন্ন ষড়জ (এই দুইটি ষড়জ-গ্রামোৎপন্ন) (৩) তাল (৪) কৈশিক (৫) ভিন্ন পঞ্চম (এই তিনটি রাগ মধ্যমগ্রামোৎপন্ন)

গৌড়ী গীতির আশ্রিত গ্রামরাগ তিন প্রকার; যথা—ষড়জগ্রামে (১) গৌড় কৈশিক মধ্যম ও (২) গৌড় পঞ্চম; মধ্যমগ্রামে (৩) গৌড় কৈশিক।

বেসরা গীতির আশ্রয়ে গ্রামরাগ আট প্রকার; যথা—ষড়জ গ্রামে (১) টক্ক (২) বেসর ষাড়ব (৩) সৌবীরী; মধ্যম-গ্রামে (৪) বোট্ট (৫) মালব কৈশিক (৬) মালব পঞ্চম (৭) টক্ক কৈশিক ও (৮) হিন্দোল।

সাধারণ গীতির আশ্রিত গ্রামরাগ সাত প্রকার; যথা—ষড়জ গ্রামে (১) রূপ সাধারণ(২) শক (৩) ভম্মান-পঞ্চম। মধ্যম গ্রামে (৪) নর্ত্ত (৫) গান্ধার পঞ্চম (৬) ষড়জ কৈশিক ও (৭) ককুভ। এইরূপে (৭+৫+৩+৮+৭ =৩০) গ্রামরাগ ত্রিশ প্রকার। উপরাগ আট প্রকার; যথা—(১) তিলক (২) শকাদি (৩) টক্ক সৈন্ধব (৪) কোকিলা (৫) পঞ্চম (৬) রেবগুপ্ত (৭) পঞ্চম ষাড়ব ও (৮) ভাবনা পঞ্চম।

রাগ বিংশতি প্রকার; যথা—(১) নাগ গান্ধার (২) নাগ পঞ্চম (৩) শ্রীরাগ (৪) নট্ট (৫) বঙ্গাল (৬) ভাস (৭) মধ্যম ষাড়ব (৮) রক্তহংস (৯) কোহ্লহাস (১০) প্রসব (১১) ভৈরব ধ্বনি (১২) মেঘরাগ (১৩) সোমরাগ (১৪) কামোদ (১৫) অভ্র পঞ্চম (১৬) কন্দর্প (১৭) দেশাখ্য (১৮) ককুভান্ত (১৯) কৈশিক (২০) নট্ট নারায়ণ।

পূর্ব্বোক্ত রাগসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত পঞ্চদশ প্রকার রাগ হইতে বিভিন্ন প্রকার ভাষা রাগ উৎপন্ন হয়; সুতরাং নিম্নলিখিত পঞ্চদশটি রাগকে ভাষাজনক রাগ বলে। (১) সৌবীর (২) ককুভ (৩) টক্ক (৪) পঞ্চম (৫) ভিন্ন পঞ্চম (৬) টক্ক কৈশিক (৭) হিন্দোল (৮) বোট্ট (৯) মালব কৈশিক (১০) গান্ধার পঞ্চম (১১) ভিন্ন ষড়জ (১২) বেসর ষাড়ব (১৩) মালব পঞ্চম (১৪) তান (১৫) পঞ্চম ষাড়ব।

এই রাগগুলি পূর্ব্বোক্ত রাগের মধ্যে অন্তর্ভূত, সুতরাং ইহাদের সংখ্যা পৃথক করা হইল না।

সৌবীর রাগের ভাষা চারিটি; যথা—সৌবীরী, বেগ মধ্যমা, সাধারিতা ও গান্ধারী।

ককুভ রাগের ভাষা ছয়টি; যথা—(১) ভিন্ন পঞ্চমী (২) কাম্বোজী (৩) মধ্যম গ্রামা (৪) রগন্তী (৫) মধুরী ও (৬) শকমিশ্রা।

ককুভ রাগের বিভাষা তিনটি; যথা—(১) ভোগ বর্দ্ধনী (২) আভীরিকা (৩) মধুকরী।

ককুভের অন্তর ভাষা একটি—শালবাহনিকা।

টক্ক রাগের ভাষা একুশটি; যথা—(১) এবণা (২) এবণোদ্ভবা (৩) বৈরঞ্জী (৪) মধ্যম গ্রামদেহা (৫) মালব বেসরী (৬) ছেবাটী (৭) সৈন্ধবী (৮) কোলাহলা (৯) পঞ্চম লক্ষিতা (১০) সৌরাষ্ট্রী (১১) পঞ্চমী (১২) বেগরঞ্জী (১৩) গান্ধার পঞ্চমী (১৪) মালবী (১৫) তানবলিতা (১৬) ললিতা (১৭) রবিচন্দ্রিকা (১৮) তানা (১৯) বাহেবিকা (২০) দোহ্যা ও (২১) বেসরী।

টক্ক রাগের বিভাষা চারটি; যথা—(১) দেবার বর্দ্ধনী (২) আন্ধ্রী (৩) গুর্জ্জরী ও (৪) ভাবনী।

পঞ্চম রাগের ভাষা দশটি; যথা—(১) কৈশিকী (২) ত্রাবণী (৩) তানোদ্ভবা (৪) আভীরী (৫) গুর্জ্জরী (৬) সৈন্ধবী (৭) দাক্ষিণাত্যা (৮) আন্ধ্রী (৯) মাঙ্গলী (১০) ভাবনী।

পঞ্চম রাগের বিভাষা দুইটি; যথা—(১) ভম্মানী ও (২) অন্ধালিকা।

ভিন্ন পঞ্চম রাগের ভাষা চারিটি; যথা—(১) শুদ্ধা (২) ভিন্না (৩) বারাটী (৪) বিশালা।

ভিন্ন পঞ্চমের বিভাষা একটি—কৌশলী।

টক্ক কৈশিক রাগের ভাষা দুইটি—(১) মালবা (২) ভিন্ন-বলিতা। ইহার একটি মাত্র বিভাষা—দ্রাবিড়ী।

হিন্দোল রাগের ভাষা নয়টি; যথা—(১) বেসরী (২) চুতমঞ্জরী (৩) ষড়্জ মধ্যমা (৪) মধুরী (৫) ভিন্ন পৌরালী (৬) গৌড়ী (৭) মালব বেসরী (৮) ছেবাটী (৯) পিঞ্জরী। বোট্ট রাগের একটি মাত্র ভাষা—মাঙ্গলী।

মালব কৈশিক রাগের ভাষা তেরটি; যথা—(১) বাঙ্গালী (২) মাঙ্গলী (৩) হর্ষপুরী (৪) মালব বেসরী (৫) খঞ্জিনী (৬) গুর্জ্জরী (৭) গৌড়ী (৮) পৌরালী (৯) অর্দ্ধ বেসরী (১০) শুদ্ধা (১১) মালবরূপা (১২) সৈন্ধবী (১৩) আভীরিকা।

মালব কৈশিকের বিভাষা দুইটি; যথা—(১) কাম্বোজী (২) দেবারবর্দ্ধনী।

গান্ধার পঞ্চম রাগের ভাষা একটি—গান্ধারী।

ভিন্ন ষড়্জ রাগের ভাষা সতেরটি; যথা—(১) গান্ধার বল্লী (২) কচ্ছেল্লী (৩) স্বরবল্লী (৪) নিষাদিনী (৫) ত্রবর্ণ (৬) মধ্যমা (৭) শুদ্ধা (৮) দাক্ষিণাত্যা (৯) পুলিন্দিকা (১০) তুম্বুরা (১১) ষড়্জ ভাষা (১২) কালিন্দী (১৩) ললিতা (১৪) শ্রীকণ্ঠিকা (১৫) বাঙ্গালী (১৬) গান্ধারী (১৭) সৈন্ধবী।

ভিন্ন ষড়্জ রাগের বিভাষা চারিটি; যথা—(১) পৌরালী (২) মালবী (৩) কালিন্দী (৪) দেবার বর্দ্ধনী।

বেসর ষাড়ব রাগের ভাষা দুইটি—(১) বাহ্যা (২) বাহ্য ষাড়বা। এই রাগের বিভাষাও দুইটি; যথা—(১) পার্ব্বতী (২) শ্রীকণ্ঠী।

মালব পঞ্চম রাগের ভাষা তিনটি; যথা—(১) বেদবতী (২) ভাবিনী (৩) বিভাবিনী।

তান রাগের ভাষা একটি মাত্র—(১) তানোদ্ভবা।

পঞ্চম ষাড়ব রাগের ভাষাও একটি—(১) পোতা।

কেহ কেহ রেবগুপ্ত নামক রাগকেও একটি ভাষাজনক রাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং তাঁহারা বলেন—রেবগুপ্তের ভাষা (১) ভাষাং শকা। ইহার বিভাষা—(১) পল্লবী। ইহার অন্তর ভাষা তিনটি; যথা—(১) ভাষ বলিতা, (২) কিরণাবলী ও (৩) শকাত্যা বলিতা। শার্ঙ্গদেবের মতে এইরূপে ভাষা ছিয়াম্নব্বইটি। বিভাষা বিংশতিটি; অন্তর ভাষা চারিটি।

মতঙ্গ মতে ভাষা চারি প্রকার; যথা—(১) মুখ্যা (২) স্বরাখ্যা (৩) দেশজা ও (৪) উপরাগজা। তন্মধ্যে শুদ্ধা, অভীরী, রগন্তীও তিন প্রকার—মালব, বেসরী, মুখ্যা ভাষা নামে কথিত। স্বরের নামে বিখ্যাত ভাষাকে স্বরাখ্য ও দেশের নামে বিখ্যাত ভাষাকে দেশজ ভাষা বলে; আর অন্য উপরাগ হইতে উৎপন্ন ভাষাকে উপরাগজ ভাষা বলে। পূর্ব্বলিখিত কতগুলি ভাষা বিভাষা নামে সাম্য থাকিলেও উহাদের লক্ষণ পৃথক, এইজন্যই ইহাদের নামে পুনরুক্তি থাকিলেও গীতিতে পুনরুক্তি ঘটে নাই।

রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ

শার্ঙ্গদেব এইরূপে (গ্রামরাগ ৩০ + উপরাগ ২০ + রাগ ২০ + ভাষা ৯৬ + বিভাষা ২০ + অন্তর ভাষা ৪) সর্ব্ব-সমেত ১৭৮ প্রকার গ্রামরাগাদি নির্ণয়পূর্ব্বক রাগ-বিবেকাধ্যায়ের প্রথম প্রকরণ পরিসমাপ্ত করিয়া দ্বিতীয় প্রকরণে রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ, উপাঙ্গ নামে চারি প্রকার দেশী রাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু যাহাদের মত-পয়োনিধি মন্থন করিয়া শার্ঙ্গদেব রত্নরাজি

সঙ্কলনে রত্নাকর রচনা করিয়াছেন, রাগাঙ্গাদি তাঁহাদের অনুমোদিত নহে, শার্ঙ্গদেব কেষাঞ্চিন্মতমাশ্রিত্য অর্থাৎ পরবর্ত্তী কোন কোন সঙ্গীতাচার্য্যের মত অনুসরণ করিয়াই রাগাঙ্গাদি দেশী গীত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন প্রসিদ্ধ গ্রামরাগাদির মধ্যেও কতকগুলি রাগ তৎকালে দেশীরূপে প্রচলিত হইয়াছিল, দেশী রাগের মধ্যে তাহাদেরও পরিচয় দান করিয়াছেন।

শার্ঙ্গদেবের নির্ণীত রাগাঙ্গাদি দুই প্রকার;—পূর্ব্ব-প্রসিদ্ধ ও অধুনাপ্রসিদ্ধ। শার্ঙ্গদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে যে রাগাঙ্গাদি প্রচলিত ছিল, তাহাই পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ নামে অভিহিত; আর শার্ঙ্গদেবের সময়ে যে রাগাঙ্গাদি প্রচলিত, তৎসমুদয় অধুনাপ্রসিদ্ধ নামে কথিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-প্রসিদ্ধ রাগাঙ্গ ৮+ভাষাঙ্গ ১১+ক্রিয়াঙ্গ ১২+উপাঙ্গ ৩= মোট ৩৪ প্রকার। আর অধুনাপ্রসিদ্ধ রাগাঙ্গাদি (রাগাঙ্গ ১৩+ভাষাঙ্গ ৯+ক্রিয়াঙ্গ ৩+উপাঙ্গ ২৭)=মোট ৫২ প্রকার।

পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ রাগাঙ্গ

১। শঙ্করাভরণ ২। ঘণ্টারব ৩। আহংস ৪। দীপক ৫। গোল্লী ৬। নাদান্তরী ৭। নীলোৎপলী ৮। ছায়া ৯। তরঙ্গিনী ১০। গান্ধার গতিকা ১১। রঞ্জ।

ভাষাঙ্গ

(১) ভাবক্রী (২) স্বভাবক্রী (৩) শিবক্রী (৪) মরুবক্রী (৫) ত্রিনেত্রক্রী (৬) কুমুদক্রী (৭) দম্ভক্রী (৮) ওজক্রী (৯) ইন্দ্রক্রী (১০) নাদকৃতি (১১) ধন্তকৃতি (১২) বিপায়ক্রী।

উপাঙ্গ

(১) পূর্ণাট (২) দেবাল (৩) গুরুঞ্জিকা।

অধুনাপ্রসিদ্ধ রাগাঙ্গ

(১) মধ্যমাদি (২) মালবশ্রী (৩) তোড়ী (৪) বঙ্গাল (৫) ভৈরব (৬) বরাটী (৭) গুর্জ্জরী (৮) গৌড় (৯) কোলাহল (১০) বসন্ত (১১) ধান্যাসী (১২) দেশী (১৩) দেশাখ্য।

ভাষাঙ্গ

(১) আসাবরী (২) বেলাবলী (৩) প্রথম মঞ্জরী (৪) আড়িকা (৫) নাগধ্বনি (৬) শুদ্ধ বরাটিকা (৭) নট্টা (৮) কর্ণাট (৯) বঙ্গাল।

ক্রিয়াঙ্গ

(১) রামকৃতি (২) গৌড়কৃতি ও (৩) দেবক্রী।

উপাঙ্গ

(১) কৌন্তলী (২) দ্রাবিড়ী (৩) সৈন্ধবী (৪) স্থানবরাটী, হতস্বর বরাটী, মহারাষ্ট্র বরাটী, সৌরাষ্ট্র দক্ষিণ বরাটী, দ্রাবিড় বরাটী, এই ছয় প্রকার বরাটী (৫) চারি প্রকার গুর্জ্জরী (৬) ভুঞ্জিকা (৭) স্তম্ভ তীর্থিকা (৮) ছায়া বেলাবলী (৯) প্রতাপ বেলাবলী (১০ ভৈরবী) (১১) কামোদা (১২) সিন্ধলী (১৩) ছায়ানট্টা (১৪) রামকৃতি (১৫) বল্লাতিকা (১৬) মল্লারী (১৭) গৌড় (১৮) কর্ণাট (১৯) দেশবাল (২০) তৌরুষ্ক (২১) দ্রাবিড়।

শার্ঙ্গদেব এইরূপে ২৬৪ প্রকার রাগের নাম উল্লেখ করিয়া কতকগুলি গ্রামরাগের লক্ষণ বলিয়াছেন। যে সকল গ্রামরাগ হইতে নানাপ্রকার দেশী রাগ উদ্ভূত হইয়াছে তাহাদেরও লক্ষণ দেশী রাগের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন। আমরা অতঃপর রত্নাকর-বর্ণিত বিভিন্ন রাগের লক্ষণ উল্লেখ করিব।

শুদ্ধ সাধারিত রাগ

শুদ্ধ সাধারিত রাগ ষড়জ মধ্যমাজাতি হইতে উদ্ভূত; তার ষড়জ ইহার গ্রহও অংশস্বর। এই রাগে নিষাদ ও গান্ধারের ব্যবহার অল্প। মধ্যম ইহার ন্যাসস্বর। ইহা একটি সম্পূর্ণ রাগ। ইহার মূর্চ্ছনা ষড়জাদি উত্তরমন্দ্রা, অবরোহি বর্ণে প্রসন্নান্ত—অলঙ্কার। সূর্য্য এই রাগের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। দিনের প্রথম প্রহরে বীর ও রৌদ্র রসে এই রাগ গেয়। মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি—নাটকের এই পাঁচটি সন্ধি, তন্মধ্যে গর্ভসন্ধিতে এই রাগ প্রয়োগ করিতে হয়।

রাগালাপ

রাগের লক্ষণ আলোচনার প্রসঙ্গে শার্ঙ্গদেব রাগালাপ প্রভৃতিরও লক্ষণ বলিয়াছেন—গ্রহ অংশ মন্দ্রতার ন্যাস,

অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব ষাড়ব ঔড়ুব প্রভৃতি যেরূপ স্বর-সন্নিবেশে স্পষ্ট রাগ পরিলক্ষিত হয়; তাহাকে রাগালাপ বলে।

রূপক

রাগালাপের ন্যায় রূপকেও গ্রহ অংশ প্রভৃতির স্পষ্ট অভিব্যক্তি থাকে, বিশেষ এই রূপকে বিদারী বা গীতখণ্ড-গুলিকে বার বার বিচ্ছেদ দিয়া পৃথক প্রদর্শিত হইয়া থাকে। অপন্যাস বিরাম দান না করিয়া গীত প্রযুক্ত হইলে তাহাকেই বলে রাগালাপ, আর প্রত্যেকটি অপন্যাসে বিরামযুক্ত গীত প্রয়োগ করিলে তাহাকে রূপক বলা হয়।

আক্ষিপ্তিকা

পূর্ব্বোক্ত চঞ্চৎপুট, চাচপুট প্রভৃতি মার্গতালে নিবন্ধ চিত্র বার্ত্তিক প্রভৃতি মার্গত্রয় বিভূষিত স্বর বিন্যাসযুক্ত পদ-সমূহে রচিত গীতি আক্ষিপ্তিকা নামে অভিহিত হয়। করণ ও বর্ত্তিনী নামে আরও দুই প্রকার গীতি আছে, তাহা প্রবন্ধ-গীতির অন্তর্গত বলিয়া রত্নাকরের রাগবিবেকাধ্যায়ে ইহাদের উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়া থাকিলেও ইহাদের বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় নাই;—ইহাদের বিশেষ পরিচয় রহিয়াছে প্রবন্ধাধ্যায়ে। শার্ঙ্গদেব এই অধ্যায়ে মতঙ্গাদি মতানুসারে ভাষা, বিভাষা ও অন্তরভাষা এই তিন প্রকার রাগেরই আলাপ, রূপক, করণ, আক্ষিপ্তিকার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্নে শুদ্ধ সাধারিত রাগের আলাপ, করণ ও আক্ষিপ্তিকার উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

সা পা ধা রী পা পা ধা রী পা ধা সা সা
পা ধা নী ধা পা মা মা | রীপা ধা রী পা ধা রী
পা ধা পা ধা পা পা সা সা মা | স´া গা র´ী মা।
ম গ রি সা সা স রি গ পা ধা রী পা ধা রী পা
ধা পা ধা সা সা সা রী গা মা ধা পা নী
ধা পা নী ধা পা সী সী। ইতি আলাপ।

স স প প ধ ধ রি রি প প ধ স সা ম্ ২ রি রি প প
ধ নি প প রি প ধ স সা সা ২ ধ ধ ম ম গা রী
গ ম রি গ ম ম ম গ রি গ সা সা ২ স স ধ স রি গ
সা সা পা ধা নি ধ প ম ম। ইতি করণম্।

সা সা ধা নী পা পা পা পা
উ দ য় গি রি শি খ র

ধা ধা নী না রী রী পা পা
শে খ ০ র তু র গ খু

রী পা পা পা ধা নী পা মা
র ০ ক্ষ ত বি ভি ০ ম্র

ধা মা ধা সা সা সা সা সা
ঘ ন তি মি রঃ ০ ০ ০

ধা ধা সা ধা সা রী গা সা
গ গ ন ত ল স ক ল

রী গা পা পা পা পা পা পা
বি লু লি ত স হ ০ স্র

ধা মা ধা মা সা সা সা সা
কি র ০ ণো জ্ব য় ০ তু

পা ধা নিধ পা মা পা মা মা
ভা ০ ০০ ০ নুঃ ০ ০ ০

জাতি প্রকরণের প্রদর্শিত নিয়মে আক্ষিপ্তিকার স্বর পদগুলিও আট কলায় পরিসমাপ্ত এবং প্রত্যেকটি কলা অষ্টলঘুযুক্ত। পাঠক উপরিলিখিত স্বরচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলেই আটটি কলা ও তাহার প্রত্যেকটি কলায় অষ্টলঘু কিরূপে যোজিত হইয়াছে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, সুতরাং এজন্য আমরা বিবৃতি অনাবশ্যক মনে করিলাম।

মোহ-মুক্তি

নাটক

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রয়োদশ দৃশ্য

স্থান—রমণ মিত্রের অন্দরমহল

সময়—বেলা নয়টা

উপস্থিত—রাধারাণী ও মিত্রজা

আহারান্তে রমণ মিত্র দণ্ডায়মান

রাধারাণী। (হাতে পান দিয়ে) দাঁড়াও, যেও না—আসছি, একটা কথা আছে।

রমণ। আমার মাথায় হাজারো কাজ, নতুন বাড়ীতে সভা প্রতিষ্ঠা। এখন কি আমার বাজে কথা শোনবার সময় আছে—সে হবে'খন।

রাধা। না—না—দাঁড়াও, বাজে নয়—এলুম বলে—

গমন ও পরক্ষণেই একখানি পত্রহস্তে প্রবেশ

রমণ। ও আবার কি? ওসব এখন থাক্। বড্ডো তাড়া। মাথারই ঠিক নেই। বুঝ্চো না—দু'দিন মাত্র সময়। সংকীর্ত্তন আসবে দলে দলে দশ জায়গা থেকে। ভাট্পাড়া, কলকেতার চাঁপাতলা, নেবুতলা, শিবপুর, চক্রবেড়ে, হাওড়া সর্ব্বত্র থেকে। তোমরাও নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না রাধা। লাহিড়ী-বউকে আনতে পাঠাও না—অনেক কাজ পাবে, বুঝলে?

রাধা। তোমার জন্যে নিশ্চিন্ত থাকার জো আছে কি! ননীর ট্রাঙ্কের চাবি—একমাস ধরে, তোমার দরকারটা কি ছিল বল দিকি? তাকে মাসাবধি যেতে দিলে না, তার পর সে গাড়ীতে উঠলে চাবি বেরুলো—

রমণ। (রাগতভাবে) হাঁ, তাতে হ'য়েছে কি? খুঁজে না পেলে কি হবে—

রাধা। সেখানে গিয়ে ননী যে এখন অনেক কিছু খুঁজে পাচ্ছে না! টাকাকড়ির জন্যে সে ভাবচে না, দরকারি কাগজপত্তোর, চেক বই, তাতে দু'খানা সই করা চেক্ ছিলো—ব্যাঙ্ক বই, বিষয়ের দলিলপত্তোর—কিছুই যে পাচ্ছে না। দমদমায় জামায়ের নামে যে নতুন বাগান কেনা হয়েছে তার কাগজ, কর্জ্জি হ্যাণ্ডনোট্

রমণ। জামায়ের সম্পত্তিতে তাদের কি? সে তো ননীর। তারা তাকে দেবে?

রাধা। দেবে কি না দেবে—সে তারা ভাববে, তাদের বউ

রমণ। আর আমার মেয়ে নয়! আমার চেয়ে তাদের দরদ বেশী কি-না! ওকে ওই সব রাখতে দিয়ে ভুলিয়ে রাখা! তোমরা বুঝবে কি?

রাধা। তার পর ওর শ্বশুরের উইল্? তাও যে পাওয়া যাচ্ছে না—

রমণ। আমার পরিবার হ'য়ে এতো মুখ্খু হ'লে কি করে? অ্যাঃ? ননীকে দেখিয়ে রেখেছ—এই হাতী দিলুম, এই ঘোড়া দিলুম, এই রাজ্য দিলুম। আরে ওর শ্বশুর যে এখনও বেঁচে! সে দশখানা উইল্ ছিঁড়ে আবার দশখানা করতে পারে। ও উইল্ গেলেই বা কি, থাকলেই বা কি? তা জানো?

রাধা। জেনে আমার দরকার! যদি কিছুই নয় তো ফেলে দিলেই তো হয়। আর যদি কিছুই হয় তো আমরা রাখি কেনো? তুমি রেখেছ কেনো?

রমণ। মেয়েটার আখের ভেবে, আর কেনো! ওর মধ্যে অনেক কথা আছে, তুমি বুঝবে না—

রাধা। আমার বুঝে কাজ নেই। এই ছাখো সে কি লিখ্চে—

লিখচে (পাঠ)—তাঁকে হাতজোড় করে', মিনতি জানিয়ে তিনখানা পত্র দিয়েছি। একখানিরও জবাব দিলেন না। এখানে এঁদের কাছে আমার মুখ দেখাতে মাথা কাটা যাচ্ছে। টাকা কাজ নেই আর যা সব কাগজপত্তোর, চেক্ বই, ব্যাঙ্ক বই প্রভৃতি রেখেছেন, তা এই হপ্তার মধ্যে না

পেলে—আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। আমি এঁদের বলেছি, তাড়াতাড়িতে ট্রাঙ্ক গোছাতে ঘরেই রয়ে গেছে। আমি লিখচি, বাবা পাঠিয়ে দেবেন।

রমণ। অ্যাঃ আমার মেয়ের এই বুদ্ধি! "ঘরে চোর ঢুকেছিল, কি কি গিয়েছে বলতে পারি না, মায়েরও ক'খানা গয়না পাওয়া যাচ্ছে না—দেখে এসেছি।" এই বললেই তো হোতো। এই বুদ্ধিটে আসেনি! ভিন্ন গোত্রে গেলেই গোল্লায় যায়! সেটা এখন আমাকেই বলতে হবে দেখছি। যা চাই না—সংসারে থাকলে তাই করতে হয়! বললুম কাশী কি বৃন্দাবন যাই, সৎ সঙ্গের অভাব হবে না—সেখানে সবাই উপস্থিত। শুনলে? তোমারি মেয়ে তো?

রাধা। তবু তাদের জিনিষগুলো পাঠিয়ে দেবে না? এই সবই বক্‌বে। মেয়েটা আত্মহত্যে করে সেও ভালো?

রমণ। বিধবা মেয়ে দেখার চেয়ে…

রাধা। (উত্তেজিত কণ্ঠে) কি—কি বললে!

রমণ। সে সব আমি বুঝবো'খন, তোমার ভুর্ভাবনা কেনো? আমি কি মানুষ নই? রোসো, কাগজগুলো আগে ভালো করে' দেখি—মেয়েটা না পথে বসে। তারপর যা হয় করবো। মরবার ফুরসৎ পাচ্ছি না—এখন—

রাধা। মেয়েটা পথে বসবেই বা কেনো? এসব তোমার কি কথা? তারা কত বড় [illegible]—ননীকে কত আদরে রেখেছেন। সর্ব্বস্ব তার হাতে। তা না তো ওই সব কাগজ—না—(কান্নার সুরে) আমার মরণ হ'লে বাঁচি।

এই দ্যাখো তার পর কি লিখ্‌চে—

আজ আমার ভাসুর বললেন—মা, তোমার এই পত্রের উত্তরের অপেক্ষা ক'রে পরে উকিলের নোটিস্ দেবো। আরও কিছু করতেও পারি। তাই, বলে রাখ্‌ছি মা—তা না ত আমাদের যে পথের কাঙাল হ'তে হয়। তুমি ভয় পেওনা বা মনে কিছু কোর না মা। আমরা জীবন-মরণের অবস্থায় গিয়েছি। এখন তুমি যা বলো। তাঁর এই কথা শুনে আর এখানে বাবার মনের অবস্থা দেখে—আর লজ্জায় আমাকে বাধ্য হ'য়ে তাঁর কথায় সায় দিতে হ'য়েছে।

ভাসুর ভেতরে ভেতরে সব খবর নিয়েছেন, বোধ হয় একদিন রাতে অভিরামপুর গিয়েও ছিলেন। বাড়ী আসেন নি, ছটফট্ ক'রে বেড়াচ্ছেন। কোন্ এক বিধবার বাড়ী বাগান দান ধর্ম্মের নাম করে নেওয়া হ'চ্ছে—বললেন। নন্দ ডাক্তার হয়েছেন, ওই বাড়ীতে ওষুধ দান করা হবে ব'লে তাঁর ডাক্তারখানা খোলা হবে নাকি। সত্যি মিথ্যে জানি না, উনিই বললেন। এসব আর শুনতে পারি না, শোনা যায় কি! মড়ার মত শুনে যাচ্ছি।

রমণ। বলেছিলুম তো এখানে থাকতে, তা শোনা হ'ল কি?

রাধা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) তার পর লিখ্‌ছে—

ভাসুর নিজে য়্যাটর্নি বলচেন—"যদি আমাদের সব কিছু ফিরিয়ে না দেওয়া হয়, তা হ'লে ব্যাপার অল্পে মিটবে না। বউমা, তোমাকেও খুব শক্ত হ'তে হবে। আর তা হ'লেই মা—আমি যা বলেছি—আমার অদৃষ্টে তাই আছে। যেখানে ছিলুম সর্ব্বে-সর্ব্বা, সেখানে আমি ঠিক চোরের মতো দিন কাটাচ্ছি। মা, তোমার পায়ে পড়ি, তাঁকে বলে—এই হপ্তার মধ্যে সব ফিরিয়ে দিও। আর পত্রের উত্তরে লিখতে বোলো—"যা যা ফেলে গিয়েছিলে পাঠালুম। আমার মা মাথার ঠিক নেই। সকলে আমার প্রণাম নিও, আর আমাকে বাঁচিও।

রাধা। (ক্রন্দন স্বরে) শুনলে? আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপছে! তোমার পায়ে পড়ি—(পায়ে পড়া)

রমণ। তুমি যে খেপলে দেখচি, পাগল আর কাকে বলে? আমি না দিলে, তারা আমার কি করতে পারে? আমি অমন্ ঢের য়্যাটর্নি দেখেচি। এইটুকু বোঝ না—কিছু করতে হলে তাদের বউকে আগে আদালতে দাঁড় করাতে হবে। তারা কলকেতার নামী সম্ভ্রান্ত লোক, প্রতিপত্তি সম্মান আছে। তারা কি তাদের বাড়ীর বউকে, ভাদ্দোর বউকে, হাজার লোকের মাঝে, আদালতের কাট্‌গড়ায় দাঁড় করাতে পারে? এইটে বোঝ না? যাও—যাও—কাজকর্ম্ম দেখগে—

রাধা। মেয়েটা যে মরে!

রমণ। (তাচ্ছিল্যের হাসিসহ) থামো না, অমন অনেকে বলে। মলেই হ'ল আর কি! কিচ্ছু ভেব না! মরা চারটিখানি কথা আর কি। উৎসবটা সমাধা হয়ে বাড়ীটে পাকা হয়ে যাক্, তার পর ধীরে-সুস্থে, দেখে শুনে, অকেজো যা—তা ফেরত দেবো—

রাধা। (শক্ত হয়ে) না—দেরি করা হ'তেই পারে না, তা হ'লে মেয়েকে আর পাব না। তোমরা মেয়েদের একটু চেন না—বুদ্ধির বড়াই এতো কোর না। মেয়েদেরও মানসম্মান আছে, সেটা তুমি জান না—

রমণ। (বিদ্রূপ ভঙ্গীতে) তোমারো আছে নাকি! কই গলায় দড়ি তো দাওনি!

রাধা। বেঁচে থাকতুম তো দিতুম্।

রমণ। (সরোষে) বস্—চুপ্, ঢের সয়েছি। একথা নিয়ে যদি ফের্ কথা কও—গোলমাল করো—দু'টুকরো করে ফেলবো—

সবেগে প্রস্থান

রাধা। (ক্রোধে) আচ্ছা—দেখি, আমিও কি করতে পারি। চিরদিনই জ্বালিয়েছে। কোথায় সব রেখেছে—দেখি। নিজে সব নিয়ে—সোজা বেই বাড়ী ছুটবো। তার পর যা অদেষ্টে আছে—হবে।

দ্রুত প্রস্থান

চতুর্দ্দশ দৃশ্য

স্থান—রমণ মিত্রের বাড়ী

সময়—অপরাহ্ণ

উপস্থিত—রমণ মিত্র, চন্দ্রবাবু, আশু বিশ্বাস বারাণ্ডায় গা ঢাকার মত রয়েছে।

রমণ। সব তো শুনলে, কি বলো। আমি আপনাকে মন্ত্র দিলে, গুরুকে সর্ব্বস্ব দেওয়া বাধে না। (সহাস্যে) ওরা এখনও আমার জাত নিয়ে দ্বিধা করে চন্দর—সব পাগল। সমাধিতে, তোর সঙ্গে যখন এক হয়ে যাই—আশ্চর্য্য—ঠিকই করতে পারি না তিনিই আমি, কি আমিই তিনি! এ কথা কাকে বোঝাবো?

চন্দ্র। ও সব কথায় কান দেবেন না। আপনার জাত নিয়ে কথা উঠতেই পারে না।

রমণ। তুমি সেটা বুঝিয়ে দিও। তোমায় বলি—আমার তাড়া পড়েছে চন্দোর, আমি আর বিষয়-সংশ্রবে থাকতে পারছি না। তবে নন্দ আমার একমাত্র ছেলে, তার একটা ব্যবস্থা না করলে কর্ত্তব্যের হানি হয়, শাস্ত্রও সে কথা বলে। তাই সে কাজটা সত্বর শেষ করতে পারলে বাঁচি···

আশু ঘরে ঢুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে

চন্দ্র। এসো এসো আশু।

আশু। আমি আসবার জন্ম ছটফট্ করছিলুম। দিনরাত গুরুদেবের কথা ভাবছি কি-না—একটা কথা হঠাৎ বিদ্যুতের মত মাথায় খেলে গেল। সব তো ঠিকই হ'য়ে রয়েছে, এখন বউকে মন্ত্র দিলেই তো সব কাজ, সব সন্দেহ, সব খুঁৎ মিটে যায়। তাঁর এমন সিদ্ধগুরু আর মিলবে কোথায়? ভাগ্যবতী বটে! শাস্ত্রে খোলসা রয়েছে—গুরুকে অদেয় কিছুই নাই। সে সব শ্লোক তাঁর নিত্য-পাঠ্য করে দেওয়া চাই···

চন্দ্র। (অবাক দৃষ্টিতে আশুর দিকে চেয়ে) এ সব তাঁরই লীলা। এই আলোচনাই তো হচ্ছিল।

রমণ। (উৎফুল্ল কণ্ঠে) একে বলে সঙ্গপ্রভাব—ধাত হিসেবে ফোটে! একটু চেষ্টাতেই তোমার খুলে যাবে।

আশু মিত্রের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলে

তোমার বুদ্ধির জন্মেই তোমাকে এত ভালবাসি। বয়সে তুমি ছোট হলেও তোমার সঙ্গেই পরামর্শ করি। মন্ত্রের কথাই আমরা ভাবছিলুম, কিন্তু ওই কদম মেয়েটি—

আশু। (সহাস্যে) যতই চতুর হোক্ (স্বভাব যায় না মলে) মেয়েমানুষ তো। আপনাকে আমি আর কি বোলবো!

রমণ। তা ঠিক্ কথা, তবে আমার অবস্থা যে কেবল বারদিকে ঠেলছে আশু।

আশু। না গুরুদেব, একটু চেপে যান। নন্দর ভবিষ্যৎ পাকা না ক'রে বেরুলে দেখবেন আপনার নিজের সাধনভজন কোথাও আপনাকে শান্তি দেবে না—আপন আত্মা যে! তা ছাড়া এখন আপনার কাশী-বৃন্দাবন সর্ব্বত্রই—

রমণ। (আনন্দ-বিস্ময়ে) য়্যাঁ, এ সব গুহ্য কথা তুমি জান্‌লে কি কোরে আশু?

আশু। সবই ঐ চরণকৃপায়—কে যেন বলে' দেয়—

রমণ। শুনচো চন্দোর, এই হোলো সুলক্ষণ! ওটা তোমার কথাতেও মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করি।

নেত্য গয়লানীর প্রবেশ

নেত্য। (মিত্রের প্রতি) আপনি না বাঁচালে আমি

গেলুম। আমি আর দুধ যোগান দিতে পারছি না বাবা! গরুর জন্যে খড় কেনবার পয়সা নেই। যাঁর কাছে চাই—

রমণ। ওইটি তোমার ভুল—মানুষের কাছে চাও কেনো? যা চাইবে—ভগবানের কাছে···

নেত্য। দুধ খাবে মানুষে, আর টাকা চাইবো ভগবানের কাছে! তা হ'লে আমি যে ধনে প্রাণে গেলুম! এ কথা তো কেউ আগে বলেন নি!

আশু। প্রভু সব বলেছেন। সভায় আসিস না তো, এ সব খাঁটি কথা শুনবি কি কোরে? কেবল টাকা আর টাকা! মা ভগবতী ছেলেদের জন্যে দুধ দেন, লোকে যে টাকা দেয় সে কেবল তোদের পরিশ্রমের জন্যে। এলে—ও সব গুহ্য কথা বুঝতে পারতিস। আবার তোদের সুবিধের জন্যে, তোদের কষ্ট কমাবার জন্যে, জলের কল আনাবার সঙ্কল্প করেছেন। চাঁদার খাতা নিয়ে তরফদার ঘুরছে; এখনো দেখা হয়নি বুঝি! রমণি পুকুরটা দিয়ে এত বড় পুণ্য কাজটা করতে পারলে না! সেই জন্যেই তো গুরুদেবের জেদ্ পড়েছে এখন ঘরে বসে যত ইচ্ছে জল পাবে—

নেত্য। এত জলের আমার দরকার? গঙ্গার দেশে জলের মন্বন্তর পোড়লো নাকি! আবার চাঁদা দিয়ে!

আশু। জলের দরকার নেই—বলিস কি! তামাকের কারবারে মাটী, আর দুধের কারবারে জল—এ যে শাস্ত্র-কথা নেত্য। তোদের জন্যে এত করেও—

নেত্য। দাম চাইলেই ওই সব কথা? আমার দরকার দুধের দামটা, সেইটে পেলেই বাঁচি। না পেলে জলের দরকার হবে বটে—

আশু। কেনো—শুনি?

নেত্য। ডুবে মরবার জন্যে—আর কেনো?—বাবা যে কথা কইছ না! আমি যে আর পারি না।

রমণ। নেত্য, ভগবানের নাম কর—ভগবানের নাম কর—আখেরের কাজ কর। আমাকে আর টাকাকড়ির কথা, বিষয়ের কথা শুনিও না। তিনিই সব মিটিয়ে দেবেন।

নেত্য। আপনিই আমার ভগবান। গরীবের সতেরো গণ্ডা টাকা দয়া কোরে মিটিয়ে দিন—আমি মরে যাচ্ছি বাবা। নফর তেলি, খোল বিচুলির দামের তাগাদায় আমাকে খেয়ে ফেল্লে যে। আমি তাই মায়ের কাছে গিয়েছিলুম।

রমণ। আচ্ছা—এখন যা, শনিবার সন্ধ্যে বেলা আসিস।

নেত্য। আপনি তো তখন বেহুঁসের মত থাকেন শুনেছি, আমার কথা শুনবে কে?

রমণ। তুই আসিস তো।

আশুর প্রতি

আচ্ছা আশু, আমি এখন উঠি।

রমণ মিত্রের প্রস্থান

আশু। ব্রজ লাহিড়ীর বাড়ি দুধ দিতে যাস্ তো?

নেত্য। দুধ খাবে কে? দুটো খেতে হয় তাই দুটো ভাতে ভাত খায়। অমন মেয়েরও এমন দুর্দ্দশা হয়!

আশু। যা হবার তা তো হয়েইছে; এই বয়েস থেকে মিছে আর এ কষ্ট ক'রে দুর্দ্দশা বাড়ানো কেনো? এ তো দু-দশ দিনের কথা নয়। পয়সা আছে, ভালো খান্ দান্—থাকুন। কতদিন থাকতে হবে তার কিছু ঠিক আছে কি? কোনো ফল্ তো নেই, কেবল কষ্ট বাড়ানো।

নেত্য। সব মেয়ে তো সমান নয়, ওঁর যদি ওইতেই মনটা ভালো থাকে—করুন না। কারুর মন্দ করছেন না তো—

আশু। হ্যাঁ—নতুন নতুন কিছুদিন ওটা হয় বটে! বয়েস বড় কাঁচা বলেই বলছি। ভগবানের দেওয়া শরীর অমন কোরে নষ্ট করতে নেই। শুনলে কষ্ট হয়, তাই—

নেত্য। কি করতে বলেন? কি হ'লে ভাল হয় শুনি?

আশু। না—আমি আর কি বল্‌বো···জানই তো বড় কঠিন কথা নেত্য। থাকতে পারলেই ভালো—

নেত্য। তবে? ব্রাহ্মণের মেয়ে পারবেন নাই বা কেনো? এ সব নিয়ে ভদ্রলোকদের এতো মাথা ব্যথা কেনো!

আশু। তুমি মিত্তির মশাইকে চেন নি; ওঁর কাছে এখন যে সব সমান হ'য়ে গিয়েছে, কারুর কষ্ট সইতে পারেন না।

নেত্য। কেবল এই গরীব নিতি গয়লানির কষ্ট ছাড়া! সতেরো গণ্ডা টাকা—তুমি কি বলো গো!

আশু। ও টাকা পাবে—পাবে। হ্যাঁ—যে কথা হচ্ছিল, বয়েস হিসেবে কষ্ট রকম রকম হয়—এ কথা স্বীকার করো তো? বউয়ের ও বয়সে টাকার কষ্ট কষ্টই নয়—স্বীকার করো কি-না?

নেত্য। ভদ্দোর লোকের ধর্ম্মসভায় বুঝি এই সব কথাই হয়? ছি ছি ছি!

মুখ বেঁকিয়ে যেতে উদ্যত

আশু। যেও না নেত্য, শোনো শোনো। উল্টো বুঝো না। বড়রা যদি লোকের মঙ্গল চিন্তা না করেন তো করবে কারা! সত্যকে জোর কোরে চাপালেই তো তা মিথ্যে হয়ে যায় না। সেই জন্যেই তো ওঁর দুর্ভাবনা। শরীর শুদ্ধ আর মনটা পাকা হয়ে গেলে আর থাকবে না। সিদ্ধ গুরুর কাছে মন্ত্র পেলে দেহশুদ্ধি হয়, আর সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ ঘটলে মনের মলা মুছে যায়। সেই কথাই গুরুদেব ভাবছেন। বউয়ের আশ্রয়ের অভাব নেই—ব্রজর বাগান বাড়ী রয়েছে, সেখানে গুরুদেব সর্ব্বক্ষণ থাকবেন—সাধন-ভজন করবেন—এ সুযোগ ভাগ্যে ঘটে। আর ওঁর চেয়ে যোগ্য গুরুই বা মিলবে কোথায়! যোগাযোগ সবই রয়েছে, কেবল থাকা চাই বিশ্বাস। মন্দ লোকে কুপরামর্শ দিতে শতমুখ—তায় তাঁর কাঁচা বয়েস; সেই কথাই ভাবছেন, এর মধ্যে মন্দ ভাব আনো কেন। দুনিয়াটা দেখচো তো—পাছে মন্দ লোকের পাল্লায় পড়েন, তাই ওঁর দুর্ভাবনা—

নেত্য। দুনিয়া আর দেখতে চাই না—গরুকে যাঁরা ভগবতী বলেন—সেই ভগবতী খেতে পাচ্ছেন না সেটা দেখেন না, তাঁদের কথা এখন আমার কানে যাবে না—আমি চললুম—

আশু। বললুম তো তার উপায় আমি করছি। শোনো, উনি বলেন—যদি ভার নিতেই হোলো, তখন ষোলো আনাই নেওয়া উচিত। তা না হ'লে কোন্ ফাঁকে কে সর্ব্বনাশ করবে সে পাপ আমারি উপর চাপবে। তাই বউকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে, সেই সঙ্গে তাঁর বাগানবাড়ী তাঁরি হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চান। এখন বুঝলে? একে নির্ব্বোধ মেয়েমানুষ; তার বয়স কম, চিন্তার বিষয় কি সামান্য? যতটুকু পারো বউকে সুযোগ মত বুঝিয়ে, গুরুদেবকে সাহায্য করা চাই নেত্য। তাতে তোমারও পুণ্য আছে। এখন এর চেয়ে বেশী কথার সময় নয় নেত্য, আমি তোমার সঙ্গে দেখা কোরবোখোন। বিধবার যাতে ভালো হয়, সে চেষ্টা করাই চাই।

নেত্য। চাই বইকি, ভদ্দোর লোকের কাজই তো তাই!

বক্র হাসি টেনে নেত্য চলে গেল।

চন্দ্রবাবু কখন চলে গিয়েছেন কেউ লক্ষ্য করে নি। আজ আশুর উপর ভরন্তরটা বেশী দেখে তিনি কোনো কথায় যোগ দেন নি। ক্রমে তাঁর অন্তরে বিরক্তি আসছিল, কিন্তু অগ্রসর হ'য়ে পড়েছেন বহুদূর। মিত্রের সিদ্ধিতে সন্দেহ না করলেও সকল কাজ মনেপ্রাণে করলেও সরবার পথ রাখেন নি।

পঞ্চদশ দৃশ্য

স্থান—৺ব্রজ লাহিড়ীর বাড়ীর বহির্দ্দেশ

বাহিরের ঘরের পাশে ভিতরের একখানি ঘরের এক অংশ দেখা যাইতেছে, একটি জানালা অর্দ্ধেক খোলা।

সময়—রাত এগারটা বেজে গেছে

উপস্থিত—ধীরপদে রমণ মিত্রের বিচরণ

পট্টবস্ত্র, সিল্কের উত্তরীয়, বার্নিশ চটি

রমণ। (আপনা আপনি) বড় কথাটাই হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। এতদিন মনে হ'লে এ কাজ কবে করে' ফেলতুম্। আজই সারতে হয়েছে। বয়স বাইশ-তেইশ, এ কথাটাও আগে শুনিনি।

আচ্ছা, আগে মন্তোর দেওয়াটা সারি। গুরুকে কিছুই অদেয় থাকে না—মন, প্রাণ, দেহ—সবই। বোঝাবো—বাগান-বাড়ীখানা তো রাধারাণীকে দিয়েইছো, এখন তাঁর প্রতিনিধি গুরুকে দান করলুম—এই বলে উভয় পুণ্যের ভাগী হও। তার পর ক্রিয়াদি লও, জন্ম সার্থক করো। একবার বলিয়ে নিলে, তার আর নড়চড় নেই। ও জাতের এ গুণটি আছে। (সহাস্যে) হুঁ...তারপর য়্যাটর্নির বিদ্যেবুদ্ধি দেখা যাবে!

জানালায় উঁকি

কদম। (সদা সতর্ক কদম—দেখতে পেয়ে—চীৎকার করে') পোড়ার-মুকো, চোর নাকি? বরদা বাবু। বরদা বাবু! উঠুন তো একবার!

রমণ। কি করো কদম্‌? আমি।

কদম। ও-আপনি। তা বলেন নি কেনো? এতো রাতে?

রমণ। তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে কদম। বড় গোপনীয়—

কদম। (বাইরের দরজা খুলে, নিজে তা আগলে দাঁড়িয়ে) এত রাতে স্ত্রী-লোকের সঙ্গে গোপন পরামর্শ চলবে না মিত্তির মশাই, মাপ্ করবেন। কাল দিনে বলবেন।

রমণ। তোমার দিদিমণির সঙ্গে যে বিশেষ কাজ রয়েছে কদম। এই রাত সাড়ে বারোটায় মহেন্দ্রক্ষণ পড়বে কি-না—

পাশের ঘরের খোলা জানালা-পথে দেখা গেল—অপর্ণা ধীরে ধীরে সরিয়া আসিয়া ইহাদের অলক্ষ্যে কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন

কদম। কাজটা কি শুনি?

রমণ। বড় গুহ্য কথা যে!

কদম। আমি যা শুনতে পারি না, দিদিমণিকেও তা শুনতে দিতে পারি না। আমি এখানে রয়েছি যে ওই জন্যে—

রমণ। তুমি বুঝতে পারচো না কদম। আমার অবস্থা তো দেখেইচো। ও অবস্থা হ'লে আর তো বিষয় কর্ম্ম থাকে না, সে জ্ঞানও থাকে না। তখন ঊর্দ্ধে তাঁর কাছে চলে যাই। সে অবস্থায় জগৎ ভুলে যাই। আবার যখন জগতে নেবে আসি—তখন মানুষের মঙ্গল চিন্তা ছাড়া, আর কিছুই আসে না। চেষ্টা করলেও আসে না—

কদম। তা এতো রাত্রে মেয়েমানুষের জন্যে হঠাৎ এমন কি মঙ্গল চিন্তাটা আপনার চাগ্‌লো?

রমণ। সবই তাঁর ইচ্ছা—সবই তত্ত্বকথা। তা তুমি যখন ওঁর শুভাকাঙ্খিনী, তোমার শোনবার অধিকার আছে, বুঝতে চেষ্টা করো। ওঁর মতো অত বড়ো ভক্তিমতী, যিনি রাধারাণীর প্রত্যাদেশ পরম শ্রদ্ধার সহিত পালন করছেন, তাঁর প্রতিও যে আমার মস্তো বড় কর্ত্তব্য রয়েছে। তা না করলে যে দেবীর কাছে মহা অপরাধী হবো। ওঁকেও ক্রমশ উচ্চে তুলতে হবে তো, সালোক্য-সালোক্য। বুঝলে? তার পরই সাযুজ্য। এইটি চাই। তিনি মনে ক'রে দিলেন—ছুটে এসেছি—বুঝলে!

কদম। কর্ত্তব্যটা কি?

রমণ। আধিভৌতিক বিষয়—বুঝবে কি? তাঁকে তাঁর আত্মার উন্নতির জন্যে কিছু কিছু গূঢ় যৌগিক ক্রিয়া দিতে হবে। তাতে শরীর, স্বাস্থ্য, মন ভালো থাকবে, শান্তিও আসবে, আর পারলৌকিক মঙ্গল তো আছেই। এসব গুহ্য বিদ্যা—গোপন, তৃতীয় কারুর জানা নিষিদ্ধ, কেবল গুরু আর শিষ্যা। আজ কেবল আসনটা অভ্যাস করিয়ে যাব। দেবীর যখন আদেশ, বুঝলে কদম—

কদম। সব বুঝচি; দুঃখের বিষয় তিনি এখানে নেই।

রমণ। (চোম্‌কে-বিস্ময়ে) নেই! কোথায় গেলেন?

কদম। তাঁর বোনের বাড়ী।

রমণ। কেনো?

কদম। যাবেন না? এ অবস্থা হবার পর—কোথাও তো যাননি। বোন নিজে এসে নিয়ে গেছেন।

রমণ। (অন্যমনস্কভাবে) সে কোথায়? কতদিনে ফিরবেন?

কদম। সে সব বলেন নি—বোধ হয় কলকেতায়।

রমণ। ঠিকানা রাখনি? এখানে কাজ রয়েছে—এমন ভুল করলে? তবে বোধ হয় শীগ্‌গিরই আসবেন।

কদম। হ্যাঁ—তাই আসবেন—আপনি এখন যান।

রমণ। তাই তো—সঙ্কল্প ক'রে বেরুন'ই ভুল হ'য়েছে (চিন্তা)

কদম। তবে আমি দোর দিলুম, আর দাঁড়াতে পারছি না।

রমণ। এমন সুযোগ হয় না কদম্, এর পরে—

কদম। এইবার চেঁচাবো কিন্তু। রাত দুপুরে ভদ্দোর-লোকের বাড়ীতে—

রমণ। সর্ব্বনাশ, এ যে আমার সমাধির লক্ষণ দেখছি—একটু বসি, কি জানি!

কদম। ওইখানেই বসুন—

কদম দ্রুত দোর বন্ধ করিয়া দিল। জানালায় এবার কদম ও অপর্ণা দুইজনকেই দেখা গেল, অপর্ণা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে বাহিরের দিকে দেখাইলেন; উভয়েই ভীত, উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে দেখিলেন।

রমণ। (ক্রুর বীভৎস মুখভঙ্গী) আচ্ছা থাকো! (চারদিক্ চেয়ে,—এক এক পদ অগ্রসর হতে হতে চিন্তা) বেটি জানে, বলবে না। কলকেতায় কেনো? ননীর ভাসুর··· না। জানতে হ'য়েছে—মন্তোরটা হয়ে গেলে আর—আচ্ছা কোথায় যাবে—

ক্রমে অদৃশ্য

পঞ্চদশ (ক) দৃশ্য

স্থান—৺ব্রজ লাহিড়ীর বাড়ীর বহির্দ্দেশ

উপস্থিত—রমণ মিত্র, অপর্ণা, কদম।

রমণ মিত্র গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় ধীরে ধীরে উঠে এক্‌পা এক্‌পা কোরে অগ্রসর হ'চ্ছেন। মুখে দুরভিসন্ধি মাখানো এবং মুখভঙ্গী ক্রুর প্রতিশোধপরায়ণ। কদমের কাছে বৃথা exposed ও আশাহত হওয়ায় ভীষণ ক্ষিপ্তের মত।

অপর্ণা কদমের অজ্ঞাতে ভিতরের ঘরের আধ-ভেজানো জানলার পাশে এসে দাঁড়ায় এবং রমণ মিত্র ও কদমের কথাবার্ত্তা শুনতে থাকে। কদম তাকে দেখতে না পেলেও অডিটোরিয়াম্ থেকে তাকে দেখা যাচ্ছিলো। কদম সদর দরজা বন্ধ কোরে অন্যমনস্ক অবস্থায় বিক্ষিপ্ত মনে দ্রুত ঘরে ঢুক্‌তে গিয়ে অপর্ণার পায়ের উপর এসে পড়ে চম্‌কে যায়।

কদম। এ কি! তুমি এখানে কতক্ষণ!

অপর্ণা। (কদমের হাত দুটি চেপে ধরে) সব তো শেষ হয়ে গেল কদম!

অপর্ণা যেন যন্ত্রচালিতের ন্যায় কদমকে রমণ মিত্রের অস্বাভাবিক গতির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কোরে দেখায়। উভয়েই তা ভীত দৃষ্টিতে দেখে। অপর্ণার হাত কেঁপে উঠে শিথিল হয়ে আসছে দেখে কদম তাড়াতাড়ি তাকে ধোরে—"ওকি দিদিমণি! এসো, কদম তবে রয়েছে কেনো?" বোলতে বোলতে বারাণ্ডায় খোলা বাতাসে অর্থাৎ ষ্টেজের সামনে তাকে নিয়ে এলো

"ওকি দিদিমণি! এসো, কদম তবে রয়েছে কেনো?"

কদম। এতো ভয় পাচ্ছ কেন দিদিমণি, হয়েছে কি?

অপর্ণা। (হতাশভাবে) এ ভয় আমার আজকের নয় কদম! স্বামীর ভিটে ত্যাগ করতে পারব না ব'লেই না সব কষ্ট সব অশান্তি সব ক্ষতি স্বীকার ক'রে তাঁর ঘরটিতে পড়ে থাকবার জন্তে তাঁর অত টাকার সম্পত্তি সত্যিই খড়কুটোর মত ভেবে নিয়েছিলুম। কিন্তু কি হোলো কদম—

কদমের বুকে মুখ গুঁজলেন

কদম। তুমি বেশ জেনো দিদিমণি, কদম থাকতে মিত্তির আর এ মুখো হতে পাচ্ছে না—কেবল ঐ পিশাচের নামের সঙ্গে তোমার নাম করতে হবে বলেই আজ তাকে সমানে যেতে দিয়েছি—ঐ ভণ্ডকে ভয়টা কিসের?

অপর্ণা। সন্দেহ যে আর সন্দেহ রইল না কদম। গ্রামের সবাই যে ওঁর ভক্ত—উনি যে তাঁদের দেবতা! নিজেকে এত অসহায় বোলে যে কোনো দিনই মনে হয়নি। এবার কি কোরবো—আর আমার কোন্ পথ রইল কদম!

অপর্ণা কাঁদতে লাগলেন। কদম এতক্ষণ বিমূঢ় অবস্থায় ছিল, অপর্ণাকে সাহস দেবার মত তার দু-একটা কথা বেরুচ্ছিল মাত্র। অপর্ণার কান্নায় তার পূর্ব্বজ্ঞান ফিরে এলো। অপর্ণার পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলুতে বুলুতে বললে—

কদম। নতুন কিছু তো ঘটেনি দিদিমণি—নতুন আর কি হয়েছে! তুমি এতদিন নিজের যথাসাধ্যি যা করবার সবই করছিলে, বাকিটা এইবার ভগবান করবেন। আমাদের শক্তি শেষ হ'লে শুনেছি, তাঁর কাজ আরম্ভ হয়—ভয় কি? আমি এসব ভেবেই তো মিত্তিরকে বলেছি—তুমি এখানে নেই।

অপর্ণা। (ছেলেমানুষের মত) তাতে কি হবে!

কদম। কমলাকে তো আনিয়েই রাখা হয়েছে। ভোরেই তাকে নিতে নৌকো আসবে, আর তুমি তার সঙ্গে দিন কয়েকের জন্তে চলে যাবে! এখানকার বাকি সব ভার আমার উপর থাকবে—

অপর্ণা। (কান্নার সুরে) আমার যে—

কদম। আমি সব জানি, তোমার দেবতার ঘর আগলে কদম পড়ে থাকবে। এক দণ্ডও কোথাও নড়বে না। আমি তো একা থাক্‌ব না—তোমার প্রাণও যে ওর মধ্যে থাকবে।

অপর্ণা। (কাতরভাবে) তবে যাব কদম?

কদম। যাবার দরকার আছে, নইলে বলতুম না। হপ্তা দু-একের তরে বই ত নয়—এতে অমত কোরো না দিদিমণি।

অপর্ণা। তুই যখন বলছিস্—

কদম। হ্যাঁ দিদিমণি। আর একটা কথা, কমলা ও-ঘরে ঘুমুচ্ছে, এসব কথা তাকে না জানালেই ভালো; জানিয়ে কাজ নেই, বুঝলে?

অপর্ণা। আমারো ইচ্ছে তাই।

কদম। হ্যাঁ, কোনো লাভ তো নেই। এখন শোবে চল। ঘুম যা হবে তা তো জানি! গড়িয়ে একটু মাথা ঠিক করা—মিছে কিছু ভেব না। সকালেই মাঝির আসবার কথা। সকলে না জাগতে ভোরেই বেরিয়ে পড়া ভাল। জেনো দিদিমণি, কদমের যতক্ষণ প্রাণ আছে—কেউ তোমার অনিষ্ট করতে পারবে না।

অপর্ণা। আমার আর কে আছে কদম—ভগবান আর তুই—

কদম। এখন একটু গড়িয়ে নেবে চল দিদিমণি।

অপর্ণার হাত ধরে নিয়ে চলে গেল

(আগামী বারে সমাপ্য)

গান

আজকে গানের বান এসেছে আমার মনে।
যাক্ না নিশি গানে গানে জাগরণে ॥
মন ছিল মোর পাতায় ছাওয়া,
হঠাৎ এলো দখিন হাওয়া,
পাতার কোলে কথার কুঁড়ি ফুটল অধীর হরষণে ॥

সেই কথারই মুকুলগুলি সুরের সুতোয় গেঁথে গেঁথে,
কারে যেন চাই পরাতে কাহারে চাই কাছে পেতে।
জানি না সে কোন বিজনে
নিশীথ জেগে এ গান শোনে,
না দেখা তার চোখের চাওয়ায় আবেশ জাগায়
মোর নয়নে ॥*

কথা ঃ—কাজি নজরুল ইস্‌লাম

সুর ও স্বরলিপি ঃ—শ্রীনিতাই ঘটক

II গা -মা জ্ঞরা | সরা রমা -া I রা -মা মা | পা মপা -ধণা I
আ জ্ কে০ গা০ নে০ র্ বা ন্ এ সে ছে০ ০০

I দা পা -র্দা | পা মা -া I মা র্সা র্সা | -া র্সর্রা র্সা I
আ মা র্ ম নে ০ যা ক্ না ০ নি০ শি

I ধা ণধা -র্সণা | দা পা -দা I মপা মপা -দণা | ধা ণা -া I
গা নে০ ০ গা নে ০ জা০ গ০ ০০ র্ ণে ০

I রা মা মা | পা মপা -ধণা I দা পা -র্দা | পা মা -পা II
বা ন্ এ সে ছে০ ০০ আ মা র্ ম নে ০

[ধর্সা -র্জ্ঞা র্র্সা | ণর্সা ধণা -পধা] I
II {র্সা -া না | র্র্সা ণধা -ণা I র্সা র্সা -না | নর্রা -র্সা -ধণা I
ম ন্ ছি ল মো র্০ পা তা র্ ছাও য়া ০০

* এই গান খানি কুমারী যূথিকা সেন কর্তৃক 'এইচ্-এম্-ভি' রেকর্ডে গীত হইয়াছে। —স্বরলিপিকার।

I র্রা র্রা -া | র্জ্ঞা র্মর্গা র্মা I র্জ্ঞা র্রা -র্জ্ঞা | র্রা -র্সা -া} I
হ ঠা ৎ এ৽ ল৽ ৽ দ খি ণ হাও য়া ৽

I র্সা র্সা -র্সা | ণধা ণা -া I পণা র্সর্রা -ণর্সা | দা পা -দা I
পা তা ৽র্ কো৽ লে ৽ ক৽ থা৽ ৽র্ কুঁ ড়ি ৽

I মা দা পমা | জ্ঞমা রজ্ঞা -সরা I গা মা গা | পমা -া -া II
ফু টু ল৽ অ৽ ধী৽ ৽র্ হ র ষ ণে ৽ ৽

II গা -া গা | মা মা -া I মা মণদা -ণদা | পা মা -া I
সে ই ক থা রি ৽ মু কু৽৽ ল্ গু লি ৽

I মা ধা -া | ধা ণধা -ণা I পা ণর্সণা দা | পা -া -া I
সু রে র্ সু তো৽ য়্ গেঁ থে৽৽ গেঁ থে ৽ ৽

I পা দা -পা | মপা জ্ঞমা -া I সজ্ঞা -মপা জ্ঞা | মা মঋজ্ঞা সা I
কা রে ৽ যে৽ ন৽ ৽ চা৽ ৽ই প রা তে৽ ৽

I সরা রমা মা | পদা -পদা -ণর্সা I পা ণদা পা | মা -া -া I
কা৽ হা৽ রে চা৽ ৽৽ ৽ই কা ছে পে তে ৽ ৽

I র্সা র্সা -া | নর্সা ধা -ণা I র্সা -া না | র্রা র্সা -ধণা I
জা নি ৽ না৽ সে ৽ কো ন্ বি জ নে ৽৽

I র্রা র্রা -া | র্রা র্জ্ঞর্রা র্জ্ঞা I র্সর্রা ধর্সা -র্রর্মজ্ঞা | র্রা র্রর্জ্ঞা র্সা I
নি শী থ্ জে গে৽ ৽ এ৽ গা৽ ৽৽৽ন্ শো নে৽ ৽

I ধা -র্সা র্সা | র্সা র্সর্রর্গা -র্সর্রা I র্গা র্মর্গা -র্মা | র্জ্ঞা র্রা -া I
না ৽ দে খা তা৽৽ ৽র্ চো খে৽ র্ চাও য়া র্

I র্রা র্জ্ঞা -র্সর্রর্সা | ণধা ণা -া I পণা -র্সর্রা ণর্সা | দা পা -া II II
আ৽বে ৽শ্ জা৽ গা য়্ মো৽ ৽র্ ন৽ য় নে ৽

গ্যাস ও তাহার প্রতীকার

অধ্যাপক শ্রীযামিনীমোহন কর

যুদ্ধে 'গ্যাস' বলতে আমরা বুঝি এমন যে-কোন রাসায়নিক দ্রব্য, ঘন, তরল অথবা বাষ্পীয়—যার দ্বারা মানুষের দেহে 'বিষাক্ত' অথবা প্রদাহজনক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সাধারণত গ্যাসকে আমরা দুই শ্রেণীতে ভাগ করি, অস্থায়ী এবং স্থায়ী।

অস্থায়ী গ্যাস হাওয়ায় ছেড়ে দিলে ধোঁয়ার মত দেখায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই হাওয়ায় মিশে যায়, সেইজন্য তার ক্ষতি করবার ক্ষমতাও কমে যায়। বায়ুর বেগ থাকলে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

স্থায়ী গ্যাস সাধারণত তরল। ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত হয় এবং বাতাসকে বিষাক্ত করে তোলে। মাটীর উপর তরল অবস্থায় থাকে বলে হাওয়ার সঙ্গে ভেসে যেতে পারে না। বড় বড় ঘাস, স্যাঁতসেঁতে জমি ইত্যাদিতে এর প্রভাব বহুদিন পর্য্যন্ত থাকে।

গ্যাসের কার্য্যকরী শক্তি আবহাওয়ার উপর অনেকটা নির্ভর করে। জোর বাতাস থাকলে গ্যাসকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে—অবশ্য, কেবল অস্থায়ী এবং বাষ্পীয় স্থায়ী গ্যাসকে। তরল অবস্থায় ঘাসের মধ্যে কিংবা জমিতে মিশে গিয়ে থাকলে কোন ফল হবে না। গরমের দিনে বাষ্প হাওয়ার সঙ্গে তাড়াতাড়ি মেশে, আবার তেমনি তাড়াতাড়ি উড়েও যায়। টিপ টিপ বৃষ্টিতে বিশেষ কোন কার্য্য হয় না, কিন্তু খুব বেশী বৃষ্টিতে অনেক সময় গ্যাস ধুয়ে যায়। বাতাস ও জমি দু-ই পরিষ্কার হয়। গ্যাস সবচেয়ে বেশী অনিষ্ট করতে পারে শুষ্ক ও শান্ত ঋতুতেই—শীতও নেই গরমও নেই, হাওয়া আর্দ্রও নয় শুষ্কও নয়।

মনুষ্যদেহের উপর প্রভাব হিসাবে গ্যাসকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। (ক) ফুসফুস প্রদাহকারী (খ) নাসিকা প্রদাহকারী (গ) অশ্রু ও (ঘ) ফোস্কা।

(ক) ফুসফুস প্রদাহকারী গ্যাস—শ্বাসনালী ও ফুসফুসে আক্রমণ করে। নিশ্বাসের সঙ্গে বেশী পরিমাণে ভেতরে গেলে মৃত্যু ঘটিতে পারে। অনেক সময় ইহাদের 'শ্বাস-রোধকারী' গ্যাসও বলা হয়।

(খ) নাসিকা প্রদাহকারী গ্যাস—নাসিকা, গলা এবং শ্বাসনালীতে অসহ্য বেদনা হয়, কিন্তু বিশুদ্ধ হাওয়ায় কিছুক্ষণ থাকবার পর তাহা দূর হয়।

(গ) 'অশ্রু' গ্যাস—অতি অল্প পরিমাণ বাতাসে মিশ্রিত থাকলেও চোখের উপর প্রভাব বিস্তার করে। চোখ জ্বলে, ফুলে ওঠে এবং ক্রমাগত জল পড়তে থাকে—যার জন্য কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ হাওয়ায় কিছুক্ষণ থাকলেই কুফল দূর হয়ে যায় এবং চোখের কোন ক্ষতি হয় না।

(ঘ) ফোস্কা গ্যাস—ঘন, তরল এবং বাষ্প তিন অবস্থাতেই এরা থাকতে পারে। পায়ের চামড়ায় লাগলেই অত্যন্ত প্রদাহকারী ফোস্কা হয়ে ওঠে। সারতে অনেকদিন লাগে। চোখ এবং ফুসফুসেই এর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

গ্যাসের তালিকা

গ্যাসের নাম	বিশেষ গুণ	ফল
	(ক) ফুসফুস প্রদাহকারী	
ফসজীন (অস্থায়ী)	বাষ্প—দেখা যায় না। ধাতু ক্ষয় করে। পচা খোপড়া খড়ের গন্ধ। বেশী বৃষ্টিতে কার্য্যকরী শক্তি কমে যায়।	অত্যন্ত ক্ষতিকর, কারণ ফুসফুস নষ্ট হয়ে যায়। উপসর্গ—কাশি, চোখ দিয়ে জল পড়া।
ক্লোরীন (অস্থায়ী)	বাষ্প—সবুজে রঙের। ধাতু ক্ষয় করে। জলের সাথে দ্রবীভূত হয় ও কাপড়জামা নষ্ট করে। ব্লীচিং পাউডারের মত গন্ধ।	

গ্যাসের নাম	বিশেষ গুণ	ফল
	(খ) নাসিকা প্রদাহকারী	
ডি, এ (অস্থায়ী)	পীত দানাদার ঘন পদার্থ। গরম করলে প্রায় অদৃশ্য ধোঁয়া বেরোয়। হাওয়ায় মিশে গেলে একেবারে দেখা যায় না কিন্তু কার্য্যকরী থাকে।	ঘন ঘন হাঁচি। বুকে, গলায়, নাকে এবং মুখে অসহ্য জ্বালা। বিমর্ষ ভাব।
	(গ) অশ্রু	
সি, এ, পি (অস্থায়ী)	ঘন পদার্থ। বাষ্পীয় অবস্থায় প্রায় দেখা যায় না।	নাক চোখ জ্বালা করে। চোখ দিয়ে বিগলিত ধারা বেরোয়। ঈষৎ গাত্রদাহও হয়। চোখের পাতা পিট পিট করে।
কে, এস, কে (স্থায়ী)	গাঢ় বাদামী রঙের তরল পদার্থ। বাষ্পীয় অবস্থায় দেখা যায় না।	সি, এ, পির অনুরূপ, কিন্তু গাত্রদাহ হয় না।
	(ঘ) ফোস্কা	
মাস্টার্ড গ্যাস অথবা এইচ, এস (অতি স্থায়ী)	গাঢ় বাদামী থেকে পীতাভ অবধি সব রকম রঙই হতে পারে। তেলের মত তরল পদার্থ। তেল এবং স্পিরিটে দ্রব হয়। ব্লীচিং পাউডার দিয়ে অকার্য্যকরী করা যায়। সরিষা ও পেঁয়াজের মত গন্ধ। তরল অবস্থায় দেখা যায়। বাষ্পীয় অবস্থায় দেখা শক্ত।	(১) তরল অবস্থায় (অ) চোখে—তৎক্ষণাৎ প্রদাহ আরম্ভ হয় এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চোখ বন্ধ হয়ে যায়। (আ) ত্বকে—জ্বালা হয় না। প্রায় দু'ঘণ্টায় লালচে হয়ে ওঠে, আর বারো থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফোস্কা হয়। (২) বাষ্পীয় অবস্থায় (অ) চোখে—প্রদাহ হয়, ফোলে এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অস্থায়ীভাবে দৃষ্টিহীনতা ঘটে। চোখ দিয়ে জলও পড়ে। (আ) ত্বকে—জ্বালা, লাল হওয়া এবং ফোস্কা পড়া। চোখে গেলে দৃষ্টিহীনতা ঘটতে পারে। খাদ্যের সঙ্গে পেটে গেলে ক্ষতি করে। (ই) ফুসফুসে—ফোলে। ব্রঙ্কাইটিস এবং পরে ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া হতে পারে। সর্দ্দি হয় এবং গলা ভেঙে যায়। অনেক সময় গলা দিয়ে মোটে আওয়াজ বার হয় না।

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুধীরনাথ মুস্তী

শীতের সকাল

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

গ্যাসের নাম	বিশেষ গুণ	ফল
লিউইসাইট (স্থায়ী খুবই কিন্তু মাস্টার্ড গ্যাসের মত অতটা নয়)	তরল পদার্থ, কোন রঙ নেই। বাষ্পীয় অবস্থায় অদৃশ্য। জল এবং ক্ষার দ্বারা শক্তি-হীন করা যায়। জিনিষপত্র ছেঁদা করে দেয়। একজাতীয় ফুলের মত গন্ধ।	(১) তরল অবস্থায় (অ) চোখে—তৎক্ষণাৎ প্রভাব বিস্তার করে এবং স্থায়ীরূপে ক্ষতি করে। (আ) ত্বকে—দেখতে দেখতে ফোস্কা পড়ে যায়। (২) বাষ্পীয় অবস্থায় অসহ্য নাক জ্বালা। ফুসফুস নাক চোখে স্থায়ী ক্ষতি করে। ত্বকে মাস্টার্ড গ্যাসের চেয়ে এর প্রভাব কিছু কম।

আকাশমার্গে গ্যাস আক্রমণ দুরকমে হতে পারে। উড়ো জাহাজ থেকে গ্যাসপূর্ণ বম্‌ ফেলা যায়, অথবা পিচকারীর মত গ্যাস ছড়িয়ে দেওয়া যায়। কোন স্থানে গ্যাস আছে কি-না দূর থেকে ধরা খুব শক্ত। গ্যাস আক্রমিত স্থান ধরবার উপায় হ'ল (ক) গন্ধে (খ) প্রদাহ ফলে (গ) চোখে দেখে (ঘ) রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা। বিভিন্ন গ্যাসের বিশিষ্ট ধর্ম্ম এবং ফলাফলের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্যাস থেকে যাতে কম ক্ষতি হয় সে জন্যে এ নিয়ম কয়টি পালন করা দরকার:

(১) সঙ্কেত পাওয়া মাত্রই গ্যাস থেকে আত্মরক্ষার জন্যে নির্ম্মিত স্থানে আশ্রয় নেওয়া। অতি প্রয়োজনীয় কারণ ছাড়া বার না হওয়া।

(২) সঙ্গে শ্বাসবাহী যন্ত্র রাখা।

(৩) 'গ্যাস-মুক্ত' সঙ্কেত না পেলে স্থান ত্যাগ না করা।

(৪) যদি কার্য্যগতিকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার সুবিধা না হয় তবে শ্বাসবাহী যন্ত্র সঙ্গে রাখা এবং আত্মরক্ষার উপযুক্ত পরিধানে আবৃত থাকা।

গ্যাস ত্রাণকারী সাধারণের স্থান না থাকলে নিজের গৃহকেই উপযুক্ত ক'রে নেওয়া যেতে পারে। দরজা জানলাগুলি খুব ভালভাবে ফিট হওয়া দরকার। কোথাও কোন ছেঁদা কিংবা ফাঁক থাকলে চলবে না। সার্সীগুলির পিছনে মোটা কাগজ আটকে দেওয়া ভাল। প্রত্যেক দরজায় মোটা মোটা পর্দ্দা বা কম্বল টাঙ্গিয়ে দিলে মোটের ওপর কাজ চলে যায়। তবে বেশ ভালভাবে দরজার সঙ্গে লেগে থাকা চাই। তলায় কোন ভারী লাঠি আটকে দিলে সুবিধা—কুঁচকে থাকতে পারে না।
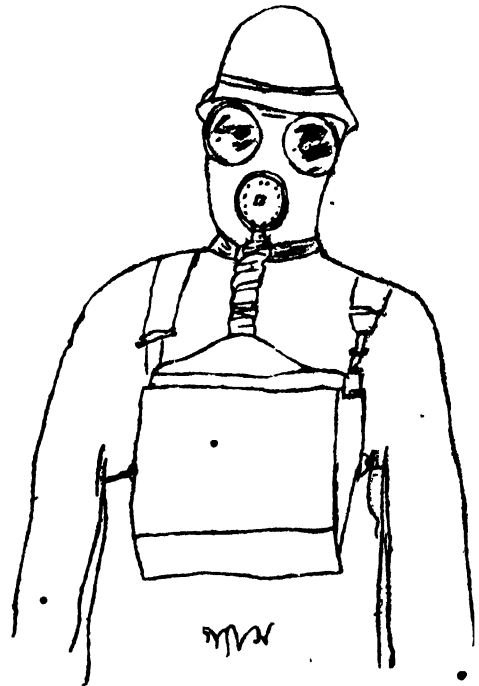
গ্যাস থেকে বাঁচবার জন্যে শ্বাসবাহী যন্ত্র সবচেয়ে দরকারী। এই যন্ত্রটির তিনটি ভাগ:

(১) গ্যাসশোষণ ও ছাঁকবার জন্যে একটা পাত্রবিশেষ।

(২) নাক মুখ চোখ ঢাকবার জন্যে মুখোস।

(৩) মুখোস ও পাত্র জুড়বার নমনীয় নল।

(১) লোহা ও টিন মিশ্রিত একটি পাত্র। ভেতরে গ্যাসশোষণ ও ছাঁকবার জন্য কাঠ কয়লা। পাশে হাওয়া যাবার রাস্তা। তুলো ছাঁকবার কার্য্যে সাহায্য হয়।

পাত্র
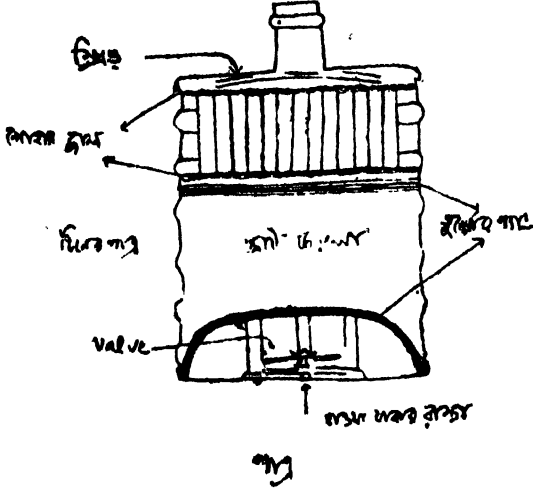
(২) মুখোসটা রবারের তৈরী! ওপরটায় খাকী স্টকিনেট দিয়ে মোড়া। চোখের জন্যে দুটো গগল্‌স্‌। নাকের কাছে শ্বাস বার করবার জন্যে একটা ছেঁদা আছে।
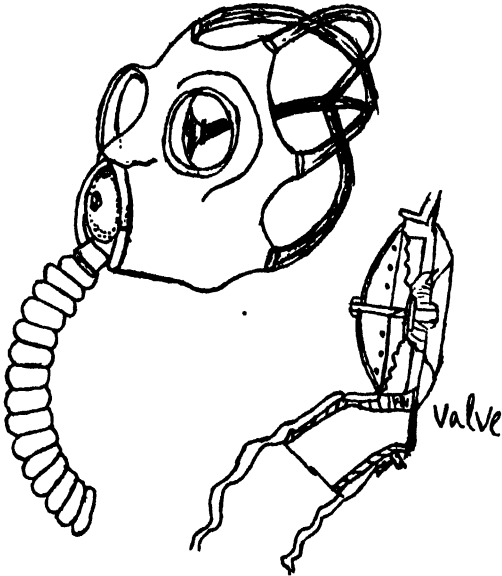
মুখোস ও নল

আর মুখের কাছে শ্বাস নেবার জন্যে একটা চাকতি আছে। তাতে অনেকগুলি ছেঁদা আছে, যা দিয়ে শ্বাস বাইরে যায়। সেখানে একটি ভালভ্‌ আছে যা কেবল বাইরের দিকে খোলে।

পাত্রের মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ হয়ে তিন নম্বর রবার পাইপের মধ্যে দিয়ে একটি ভালভ্‌ পার হয়ে বিশ্রাম নেবার হাওয়া আসে। ভালভ্‌টি কেবল ভিতর দিকে খোলে।

(৩)। নলটি রবারের তৈরী এবং খাঁজ কাটা। তাতে রবার আটকে যেতে পারে না। নলের একটি দিক মুখোসে ও অপরদিক পাত্রে খুব ভালভাবে আটকান থাকে।

প্রত্যেক যন্ত্রের সঙ্গে একটি ডিমিং পেষ্ট দেওয়া থাকে। চোখের কাছে সামান্য একটু লাগিয়ে ফ্ল্যানেল দিয়ে পুঁছে ফেললে আর ঝাপসা হতে পায় না।

এই যন্ত্র ওয়াটার প্রুফ ব্যাগে ভরে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। সেই ব্যাগের তলায় হাওয়া যাবার জন্যে তিনটি জাল দিয়ে ঢাকা ছিদ্র আছে। যন্ত্রটি খুব সাবধানে রাখা দরকার। বিশেষ করে দেখা উচিত যেন (১) পাত্রে জল না ঢোকে। তাতে কয়লার ও তুলো ছাঁকবার কার্য্য ভালরূপ হতে পায় না।

(২) বহির্মুখী ভালভ্‌ নষ্ট না হয়। তাতে বাইরের হাওয়া এমনি নাকে মুখে ঢুকে যাবে। পাত্রের মধ্যে দিয়ে না যাওয়ার দরুণ শোধিত হবে না।

(৩) মুখোসের রবার নষ্ট বা ঢিলে না হয়ে যায়।

(৪) মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করা দরকার। নচেৎ নল এবং মুখোস দুই খারাপ হয়ে যায়।

মনে রাখা দরকার যে, ফুসফুস প্রদাহকারী, নাসিকা প্রদাহকারী ও অশ্রু গ্যাসে শ্বাসবাহী যন্ত্র পরলেই সম্পূর্ণ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু 'ফোস্কা' গ্যাসে এই যন্ত্র কেবল ফুসফুস, নাক, মুখ ও চোখকে রক্ষা করে। অন্যান্য অঙ্গ অরক্ষিত থাকে। সেইজন্য রক্ষাপ্রদ কাপড়জামার প্রয়োজন। অয়েল স্কিন, ফুল প্যাণ্ট, গলাবদ্ধ কোট, টুপী, দস্তানা ও পায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা রবারের জুতো পরলে তবে এই বিষাক্ত গ্যাসের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়, অবশ্য শ্বাসবাহী যন্ত্র পরতে হবেই।

এই শেষোক্ত গ্যাসে কোন লোক আক্রান্ত হলে যত শীঘ্র সম্ভব চিকিৎসা প্রয়োজন। বিলম্বে মৃত্যু ঘটতে পারে। প্রথমেই সমস্ত কাপড় জামা খুলে ফেলতে হবে। ত্বকে তরল গ্যাস লেগে থাকলে আক্রান্ত অংশগুলিতে

জলে স্থলে ব্লীচিং পাউডারের পেস্ট লাগিয়ে দেওয়া উচিত। বাষ্পীয় গ্যাস হ'লে খুব ভাল ক'রে গরম জল আর সাবান দিয়ে স্নান করা বিধেয়। সব সময়েই চোখ নাতিশীতোষ্ণ জলে ধুয়ে ফেলা কর্ত্তব্য।

গ্যাস থেকে বাঁচবার জন্য ঘরখানি এরকম হওয়া উচিত। (১) ঘরখানি মাটীর তলায় হ'লে ভাল হয়। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে জল না ঢোকে এবং বাইরে যাবার একটির বেশী পথ থাকা দরকার। যদি মাটীর তলায় ঘর না পাওয়া যায় তবে একতলায় কোন প্রশস্ত ঘর বেছে নেওয়া উচিত।

(২) ঘরের জানলাগুলি ছোট হওয়া চাই এবং জানলার কাঁচগুলিকে কাঠ দিয়ে ঢেকে দেওয়া প্রয়োজন। কারণ হঠাৎ কাঁচ ভেঙ্গে গেলে ভেতরে গ্যাস ঢুকতে পারে।

(৩) সেই ঘরের জানলা-দরজা খুব ভাল ক'রে যেন বন্ধ করা হয়। হাওয়ার বেগ ও চাপে অনেক সময় ছোট্ট একটু ফাঁক দিয়ে অনেকটা গ্যাস ঢুকে যেতে পারে।

একটা দশ ফুট লম্বা, দশ ফুট চওড়া এবং আট ফুট উঁচু ঘরে পাঁচ জন লোক বার ঘণ্টার ওপর থাকতে পারে।

সাধারণত শ্বাসবাহী যন্ত্র তিন সাইজের পাওয়া যায়। সাধারণ সাইজ হ'ল প্রায় সব পুরুষের ও কোন কোন মহিলাদের জন্য। বড় সাইজ হল বিশেষ পুরুষদের জন্য, আর ছোট সাইজ হ'ল মেয়েদের ও ছেলেদের জন্য। যন্ত্রগুলি সব একই, কেবল আয়তন ছোট-বড়। ঠিক সাইজের যন্ত্র না হলে বিষাক্ত হাওয়া ঢুকে যেতে পারে।

ব্যাগে পুরে এই যন্ত্রটি কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। 'প্রস্তুত' সঙ্কেতে ব্যাগটিকে সামনে এনে বাঁ হাতখানি গলিয়ে বার ক'রে নিতে হয়। তারপরে এক টানে ব্যাগের বোতাম খুলতে হয়। ব্যাগটিকে উঁচু ক'রে ব্যাগস্থিত একটি দড়ি পিছন থেকে ঘুরিয়ে ভালভাবে ফাঁস দিয়ে বাঁধতে হয়।

'গ্যাস' সঙ্কেতে মুখোসটি বার ক'রে রবারের ফিতাগুলি ঢিলে ক'রে মুখোসের দাড়ীর কাছটায় নিজের দাড়ী এনে মাথাটা গলিয়ে দিতে হয়। পরে ফিতেগুলি টাইট ক'রে দিলেই ঠিক ফিট হয়ে যায়। খুব সতর্ক থাকা চাই, যেন ফাঁক না থেকে যায়।

'সব পরিষ্কার' সঙ্কেতে ডান হাতের দুটো আঙুল চিবুকের নীচে দিয়ে টানলেই মুখোস আপনা হতেই খুলে
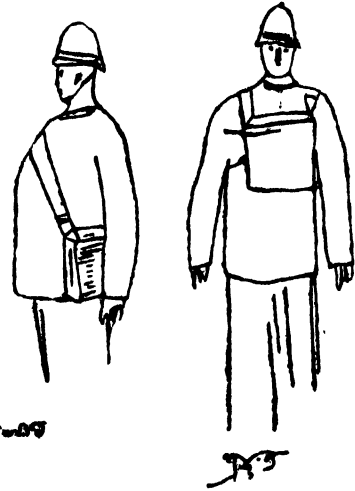
বেরিয়ে আসে। তারপর মুখোসটার ভিতরটা বেশ ভালভাবে মুছে ফেলতে হবে। গগল্‌স্ দুটোর মধ্যে ডান হাতের তর্জ্জনী চেপে ব্যাগের মধ্যে পুরে ব্যাগ বন্ধ ক'রে দিতে হবে।

ব্যাগ থেকে যন্ত্র বের করবার সময় যেন টিনের পাত্রের ওপর ঝাঁকানি না পড়ে। তাতে নলে আর পাত্রে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মুখোস খোলবার আগে সামান্য একটু ফাঁক ক'রে নিশ্বাস নিয়ে দেখা উচিত—বাতাস দূষিত না বিশুদ্ধ। জোরে নিশ্বাস নিলেই বোঝা যাবে।

মায়া-মুকুর

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

কি ভাবিছ সখি,
অপরূপ রূপচ্ছায়া বিস্ময়ে নিরখি
বিম্বিত আমার কাব্য-কনক-দর্পণে?
রক্তিম অধরপ্রান্তে-ও দুটি নয়নে
লাবণ্যের গর্ব্বদীপ্ত সকৌতুক হাসি
চকিতে চপল লাস্যে উঠিছে উদ্ভাসি'
ক্ষণে ক্ষণে। ভাবিছ কি, এই তব কায়া
ফেলিয়াছে ওই দিব্য অপরূপ ছায়া
কবিতা-মুকুরে মোর? নহে তাহা নহে;
এ মায়া-মুকুর সখি মিথ্যাকথা নহে!

আহরিয়া তিলে তিলে বিশ্বের সুষমা
রচনা করেছি আমি ওয়ি নিরুপমা
তিলোত্তমা মানসী আমার, ওই ছবি
রূপ-দগ্ধ অন্তরের অতনু সুরভি
জ্বলিতেছে লাবণ্যের উর্দ্ধশিখা মেলি
সুন্দরের বেদীমূলে। রহস্য কুহেলি
আবেষ্টিয়া কায়াহীন ওই ছায়াতনু
রচিয়াছে মায়াজাল, যথা ইন্দ্রধনু
তনুহীন বর্ণচ্ছটা শুধু, শুধু শোভা,
হাসি-অশ্রু বিরচিত স্বপ্ন মনোলোভা
মুগ্ধ দিক্-বালিকার, ফুটে উঠি ক্ষণে
সজল আয়ত তার নীলিম নয়নে,
ক্ষণে পুন চকিতে মিলায়; যথা রবি
সপ্তবর্ণ তুলিকায় সেই স্বপ্নছবি
যতনে রঞ্জিয়া তোলে; মেঘ তারে যথা
সিঞ্চিয়া সজল তার স্নেহ-শ্যামলতা
করে কান্ত করুণ মধুর; নীলাকাশ,
বরিষণ ক্লান্ত মেঘ, তপন, বাতাস—
সকলে মিলিয়া চায় লইবারে লুটি'
অশরীরী সে সৌন্দর্য্য; অমনি সে টুটি'
বিচ্ছুরিয়া বর্ণে বর্ণে পলকে মিলায়
স্বচ্ছ সরসীর বুকে লহরী লীলায়
চূর্ণ পূর্ণ চাঁদিমার ছায়াবাজি যথা
ভয়-ত্রস্তা তরঙ্গ-আহতা।

তেমনি ও ছবি
মোর স্বপ্ন-কামনার কলেবর লভি
ফুটিয়া উঠেছে মায়া-মুকুরের পটে।
কৃতাঞ্জলি বসুমতী ও চরণ-তটে
সমর্পিয়া আপনার সৌন্দর্য্যসম্ভার
ধন্য মানে। স্তুতিগান মেনকা রম্ভার
বহি আনে নীহারিকা কোটি কল্প-ধরি
সীমাহীন শূন্যপথে। সে সুরে শিহরি'
সংখ্যাতীত গ্রহতারা জ্বলিছে নিভিছে
ক্ষীণাভ খদ্যোতসম।

হায় মুগ্ধে হায়,
বৃথা আত্ম-প্রতারণা মিথ্যা ছলনায়!
অমর্ত্ত-সম্ভব স্বপ্ন ও রূপ মদির
নহে তব, নহে কোন মর্ত্ত্য মানবীর।
বিথারিয়া বিমোহন ইন্দ্রজাল মায়া
মায়াবী এ মন মোর ওই রূপছায়া
কবিতা মুকুর-পটে করেছে সৃজন।
মানবের ক্ষীণতম নিশ্বাস বীজন
লাগিলে তাহার অঙ্গে অমনি পলকে
বিচ্ছুরিয়া সচকিয়া বিজলি ঝলকে
নয়নের অন্তরালে হবে অন্তর্ধান।
বিমুক্ত-বিহঙ্গ শূন্য পিঞ্জর সমান
মুকুর রহিবে পড়ি; তুমি পড়ে র'বে
হৃত-রূপ, গত-গর্ব্ব, রিক্ত অগৌরবে।

টেলিফোন, রেডিও এবং টেলিভিসান

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ বি-এস্‌সি

বর্ত্তমান সভ্যজগত কালের গতির সহিত দ্রুত তালে পা ফেলিয়া উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হইতে বদ্ধপরিকর ; তাই নবীন যুগের মণীষিগণ তাঁহাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও বিচারশক্তির প্রাচুর্য্যের সহায়তায় এমন সকল অভিনব পন্থার উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহার সূক্ষ্ম কর্ম্মপদ্ধতি আমাদের সাধারণ জ্ঞান ও বোধশক্তির অনেক ঊর্দ্ধে। বর্ত্তমান যুগে যাঁহারা দুনিয়ায় সভ্য বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক লোকই আছেন যাঁহারা টেলিফোনের নাম শোনেন নাই বা ইহার সহায়তায় দূরবর্ত্তী আত্মীয় বন্ধুর সহিত দূরত্বের ব্যবধান ঘুচাইয়া আলাপ পরিচয় করেন নাই।

মাত্র ষাট বৎসর পূর্ব্বে টেলিফোন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং দূরদেশের গান-বাজনার রসমাধুর্য্য উপভোগের নিমিত্ত তারের সহায়তা লওয়া হইয়াছে। এই দুইটি যন্ত্রের প্রয়োজন এবং গুরুত্ব যে কতখানি—তাহা আধুনিক জনসমাজ কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। মানব মাত্রেই তাহার সংক্ষিপ্ত জীবন কর্ম্মব্যস্ততায় পরিসমাপ্ত করে। সুতরাং পৃথিবীর সকলের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলা তাহার পক্ষে দুরূহ। কিন্তু আমাদের এই কষ্ট-সাধ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে টেলিফোন ও বেতার যন্ত্র। এই কারণেই বেতারের অভাবে সংবাদপত্র অচল এবং ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ে লোকসান। আজ পৃথিবীর একপ্রান্তে কোন ঘটনা ঘটিলে পরমুহূর্ত্তে তাহা পৃথিবীর অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছায়। অবস্থাপন্ন গৃহের অনেকেই বেতারের সহায়তায় শত শত যোজন দূরবর্ত্তী স্থানের সঙ্গীতাদি স্বগৃহে বসিয়াই শ্রবণ করিয়া থাকেন। বেতারে আমরা ঠিক অন্ধের ন্যায় কেবল গান বাজনা বা কথাবার্ত্তার অদৃশ্য ধ্বনি শুনিতে পাই ; শিল্পী আমাদের দৃষ্টিশক্তির অন্তরালেই থাকিয়া যান। এই দৈন্য ঘোচানই টেলিভিসানের বিশেষত্ব। ইহার সহায়তায় আমরা হাজার হাজার মাইল দূরবর্ত্তী কোন লোকের কথাবার্ত্তা যে শুনিতে পাই-ই, উপরন্তু তাঁহাকে আমাদের চোখের সম্মুখে জীবন্ত দেখিতে পাই। এই ব্যবধান বা দূরত্বের অস্তিত্ব আমরা ক্রমে ভুলিয়া যাই। এখন আমরা ইচ্ছা করিলেই পৃথিবীর অপর প্রান্তস্থিত যে-কোন লোককে চোখের সম্মুখে সজীব মূর্ত্তিমান উপস্থিত দেখিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে পারি।

প্রাচীন যুগে বিপদকালে সুদূরে দ্রুত সংবাদ প্রেরণ করিবার প্রয়োজন হইলে একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ড জ্বালা হইত এবং তাহা দেখিয়াই পূর্ব্বের নির্দ্দেশানুসারে অপরে তাহার বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিত। স্পেনদেশীয় 'আর্মাডা' ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে রওনা হইলে তাহার আগমন-সংবাদও এই প্রথায় অতি দ্রুত প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইহাকে 'বেকন্ ফায়ার' বলা হইত। আজ পর্য্যন্ত অনেক গির্জ্জা এবং প্রাসাদে ইহার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে 'হিলিওগ্রাফ্' নামক আর একটি যন্ত্র দ্বারাও অতি দ্রুত সংবাদ প্রেরণ করা হইত। ইহাতে একটি আয়না দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত করা হইত। ইহার একটি সুবিধা ছিল এই যে, গোপনীয় সংবাদও নির্ব্বিচারে অতি দ্রুত প্রেরণ করা চলিত, অথচ 'বেকন্ ফায়ারের' ন্যায় অপরে ইহার আভাষ জানিতে পারিত না। তবে বাদলার দিনে ইহা একেবারেই অকর্ম্মণ্য ছিল। আফগান যুদ্ধের সময় মাত্র একটি 'হিলিওগ্রাফ্' যন্ত্র দ্বারা সত্তর মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে একটি সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল। আফ্রিকা এবং আমেরিকার নিভৃত বনের অসভ্যরা তাহাদের বিপদকালে সাঙ্কেতিক ঢাক বাজাইয়া অনেক দূরবর্ত্তী গ্রামবাসীদেরও সতর্ক করিয়া দিত। এই উপায়ে দ্রুতগামী অশ্ব অপেক্ষাও দ্রুত সংবাদ অন্যত্র পৌঁছিত। প্রাচীনকালে আলো অথবা সাঙ্কেতিক শব্দের সাহায্যেই লোক দূরদেশে সংবাদ আদান-প্রদান করিত, কিন্তু তাহাতে তাহারা নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি সংবাদ ছাড়া নূতন কোন সংবাদ প্রেরণের প্রয়োজন হইলেই অশ্বারোহীর সাহায্য লইতে বাধ্য হইত। ইহাতে অধিক সময় লাগিত, সুতরাং সংবাদ পৌঁছিত অনেক বিলম্বে। অথচ সকল প্রকার মনোভাবের আদান-প্রদানও অসম্ভব ছিল।

বৈজ্ঞানিকদিগের অদম্য প্রচেষ্টার ফলে ক্রমে বিদ্যুতের আবিষ্কার হইল। বৈজ্ঞানিক অরষ্টেড্ সর্ব্বপ্রথম দেখেন যে, বিদ্যুতের গতি অতিশয় দ্রুত, কাজেই ইহাকে দ্রুত সংবাদ-প্রেরণের কাজে লাগান যাইতে পারে। তিনি আরও দেখিলেন যে, একটি তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রেরণ করিলে নিকটস্থ একটি চুম্বক স্থানচ্যুত হয় ইহার পর কুক্স্ এবং হুইট্‌ষ্টোন নামক বৈজ্ঞানিকদ্বয় ইহার সত্যতা নিরূপণ করেন এবং টেলিগ্রাফ্ যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। এই যন্ত্রে পাঁচটি চুম্বক ছিল এবং প্রত্যেকটির অবস্থান ইত্যাদি অনুসারে অক্ষর বোঝা যাইত এবং তাহা হইতেই যে-কোন সংবাদ পাওয়া যাইত। ইহার পাঁচটি চুম্বকের জন্য পাঁচটি তারের প্রয়োজন হইত, কিন্তু মর্স্ দেখিলেন যে, মাত্র একটি তারের সাহায্যেই সংবাদ প্রেরণ করা সম্ভব, তবে তাহাতে 'টরে' 'টক্কা' অর্থাৎ Dot and dash দ্বারা A, B, C, D, ইত্যাদি বুঝাইতে হয়। ইহাই আধুনিক টেলিগ্রাফ যন্ত্রের কার্য্যপ্রণালী। মানুষ শেষ পর্য্যন্ত ইহাতেও সম্পূর্ণ খুশী হইতে পারিল না, তাই নানারূপ গবেষণার ফলে গ্রাহাম বেল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে টেলিফোন আবিষ্কার করিলেন। ইহার প্রেরক যন্ত্রের সম্মুখে কোন কথা বলিলে বায়ুস্তরে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তাহা একটি

ধাতব পর্দ্দায় আঘাত করে এবং তাহাতে পর্দ্দাটিতে শব্দের অনুরূপ কম্পনের সৃষ্টি হয়। এই কম্পনের জন্যই যন্ত্রের পশ্চাৎ ভাগে অবস্থিত অঙ্গার চূর্ণ, সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। এই সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে তাহার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহের পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। কাজেই আমরা দেখিতেছি যে, কথা বলার সময় বায়ুস্তরে বিভিন্ন তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং সেই সঙ্গে টেলিফোন যন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন শক্তির বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। আবার গ্রাহক-যন্ত্রে একটি চুম্বক থাকে, তাহার চারিদিক দিয়া যদি বিদ্যুৎ চালনা করা যায় তবে তাহা একটি ধাতব পর্দ্দাকে আকর্ষণ করে। সুতরাং তারের ভিতর দিয়া বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতে থাকিলে চুম্বকটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শক্তিতে পর্দ্দাটিকে আকর্ষণ করে। ফলে ধাতব পর্দ্দাটিতে একটি কম্পনের সৃষ্টি হয়। প্রেরক-যন্ত্রের সম্মুখে শব্দ করিলে বিভিন্ন শক্তির বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতে থাকে এবং তাহাকে যদি শব্দ-গ্রাহক যন্ত্রের মধ্য দিয়া চালনা করা যায় তবে পর্দ্দাটি অনুরূপ শক্তিতে আকৃষ্ট হইবে, ফলে গ্রাহকযন্ত্রের পর্দ্দাটিতে যে কম্পনের সৃষ্টি হইবে তাহাতেই শব্দটি পুনঃ প্রকাশিত হইবে। এই অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্রটির সম্বন্ধে যখনই চিন্তা করা যায় যে অন্যান্য আবিষ্কারের মতই ইহা আশাতীত সহজ এবং চমকপ্রদ, ততই আনন্দ হয়।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মার্কনি বেতার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। বেতারের সাহায্যে সংবাদ-প্রেরণের প্রণালীও অনুরূপ। একটি লোকে শব্দ-গ্রাহক যন্ত্রের সম্মুখে দাঁড়ায় এবং সে যে শব্দ করে তাহা টেলিফোনের মতই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বহুকম্পনযুক্ত দোলায়মান তড়িৎপ্রবাহে রূপান্তরিত হয়। এই পরিবর্ত্তন খুব সামান্য, কাজেই 'প্রসারক যন্ত্রের' সাহায্যে ইহাকে প্রসারিত করা হয় এবং তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা ইথরে একপ্রকার দ্রুত কম্পমান বিদ্যুত-তরঙ্গের সৃষ্টি করা হয়। টেলিফোনে পরিবর্ত্তনশীল বিদ্যুত-প্রবাহে গ্রাহক-যন্ত্রে প্রেরণের জন্য একটি তারের প্রয়োজন হয়, কিন্তু বেতার যন্ত্রে বিদ্যুতের পরিবর্ত্তে ইথর-সমুদ্রে তরঙ্গের দ্বারাই শব্দ বাহিত হয়। এই তরঙ্গ এক মুহূর্ত্তেই সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করে, কাজেই এই বেতার-তরঙ্গ যদি কোন তরঙ্গ-গ্রহণোপযোগী সহ-ধ্বনিত বার্ত্তাগ্রাহক যন্ত্রের বায়ুস্থ তারে আঘাত করে, তবে এই তারেও বহুকম্পনযুক্ত দোলায়মান বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। মানুষ যখন বার্ত্তা-প্রেরক যন্ত্রের সম্মুখে কথা বলে তখন প্রেরক-যন্ত্রের বায়ুস্থ তারে যে দোলায়মান বিদ্যুতের সৃষ্টি হয় তাহার স্পন্দন পরিমাণ কথার প্রকার-ভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তনের ফলে যে নূতন তরঙ্গের উৎপত্তি হয় তাহার নাম বাগাশ্রিত তরঙ্গ। এই বাগাশ্রিত তরঙ্গ গ্রাহক-যন্ত্রের বায়ুস্থ তারে সমভাবের দোলায়মান বিদ্যুতের সৃষ্টি করে বলিয়াই সেই কথাটি গ্রাহক-যন্ত্রে পুনরুৎপাদিত টেলিফোনের গ্রাহক-যন্ত্রে পরিবর্ত্তনশীল বিদ্যুৎ-প্রবাহদ্বারা একটি পাতলা পর্দ্দা কম্পিত হয় এবং আমরা শব্দটি শুনিতে পাই। কিন্তু বেতারে এই বিদ্যুৎ-প্রবাহ স্থিরভিমুখী এবং ইহার স্পন্দন-সংখ্যাও অত্যন্ত বেশী (দশ হাজার হইতে তিন কোটী)—কাজেই এ ক্ষেত্রে পাতলা পর্দ্দাটি স্থির থাকিবে অর্থাৎ কোন শব্দই উৎপাদিত হইবে না। এই জন্য বেতার-বিদ্যুৎ লাউড স্পীকার-এ পাঠাইবার পূর্ব্বে "কার্ব্বোরাণ্ডাম স্ফটিকের" মধ্য দিয়া পাঠাইয়া একাভিমুখী করিয়া লওয়া হয়। এই স্ফটিকের নাম 'ডিটেক্টার'। এখন যদি এই একাভিমুখী বিদ্যুতকে লাউড স্পীকার-এ পাঠান যায়, তবে পর্দ্দাটি কাঁপিয়া উঠিবে এবং যে কথার ফলে বাগাশ্রিত তরঙ্গের উদ্ভব হইয়াছিল সেই কথাটিই লাউড স্পীকার-এ পুনরুৎপাদিত হইবে। বেতারযন্ত্রেও টেলিফোনের অনুরূপ গ্রাহক-যন্ত্র ব্যবহার করা যায়—ইহার নাম 'হেড ফোন'। তবে ইহার ব্যবহারে বেতারবার্ত্তা কেবল একজনেই শুনিতে পায়, কিন্তু লাউড স্পীকার ব্যবহার করিলে একসঙ্গে অনেকে একই কথা শুনিতে পারে। তাই সকলের সুবিধার্থ সাধারণতঃ লাউড স্পীকারই ব্যবহার করা হয়।

বেতারের কথা জানা গেল, এইবার 'টেলিভিসান' সম্বন্ধে সকল কথা বুঝিতে মোটেই অসুবিধা হইবে না। কোন লোক যদি 'টেলিভিসান' যন্ত্রের সম্মুখে দাঁড়ায় তবে তাহার মুখের প্রতিবিম্ব কয়েকটি 'ফোটো ইলেকট্রিক' যন্ত্রের উপর পড়ে। যন্ত্রটার ধর্ম্মই এই যে, তাহার সম্মুখের আলোক-শক্তির ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহার মধ্যস্থ বিদ্যুৎ-প্রবাহের অনুরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। কাজেই, এই যন্ত্রের সাহায্যে লোকটির মুখের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন শক্তির আলোক হইতে বিভিন্ন শক্তির বিদ্যুৎ সৃষ্ট হয়। তারপর বেতার-যন্ত্রের মতই এই বিদ্যুৎ হইতে তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া তাহাই প্রেরিত হয় এবং তদ্দ্বারা অন্য যে-কোন স্থানে লোকটির অবয়ব পুনঃ প্রকাশিত হইতে পারে। বেতারের ন্যায় টেলিভিসানেও প্রকৃতপক্ষে কোন লোকের অবয়বের আলো-ছায়া প্রেরিত হয় না; ইহাদের সাহায্যে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকৃতির তরঙ্গ প্রেরিত হয়। এইরূপ তরঙ্গের কথা পূর্ব্বেও বর্ণিত হইয়াছে—ইহার নাম ইলেকট্রোম্যাগনেটিক্ ওয়েভ্স্।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বেয়ার্ড টেলিভিসান যন্ত্রের আবিষ্কার কার্য্যে পূর্ণ সফলতা লাভ করেন। পূর্ব্বে তিনি যন্ত্রটির সম্মুখে একটি পুতুল বসাইয়া দেখিয়াছিলেন যে, গ্রাহক-যন্ত্রে পুতুলটির যথাযথ প্রতিকৃতি পরিস্ফুট হয়। একদিবস তিনি কৌতূহলবশত পুতুলটিকে সরাইয়া তাহার এক কর্ম্মচারী বালককে যন্ত্রটির সম্মুখে বসাইয়া তাহার অবয়ব প্রতিফলিত হয় কি-না পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। কিন্তু প্রথমবারে তিনি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখেন বালকটি তীব্র আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া যন্ত্রটির সম্মুখ হইতে মুখ ঘুরাইয়া রাখিয়াছে এবং ইহারই ফলে তিনি নিরাশ হইয়াছেন। তিনি তখন উত্তেজনার বশে তাঁহার সেদিনের সম্বল অর্দ্ধক্রাউনটি বালককে দিয়া তাহাকে আলোকের সম্মুখে কয়েক মিনিট বসিতে সম্মত করেন এবং ছুটিয়া গ্রাহক-যন্ত্রের সম্মুখে গিয়া স্বীয় কর্ম্মসাফল্যে আনন্দে আত্মহারা হইলেন। অস্পষ্ট হইলেও বালকটির যথাযথ প্রতিকৃতি গ্রাহক-যন্ত্রের পর্দ্দায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

এই যন্ত্রটির কর্ম্মপদ্ধতি অতীব বৈচিত্র্যপূর্ণ। যে ব্যক্তি, বস্তু অথবা দৃশ্যের প্রতিচ্ছবি টেলিভিসানে প্রেরিত হইবে তাহা প্রেরক-যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুতে রূপান্তরিত হয়। এই যন্ত্রের সম্মুখে যে ধাতব-

পর্দ্দাটি ঘুরিতে থাকে তাহাতে ত্রিশটি ছিদ্র চক্রাকারে সজ্জিত থাকে। প্রেরক-যন্ত্রের সম্মুখে স্থাপিত বস্তুটি তীব্র আলোক দ্বারা আলোকিত করা হয়। এখন ইহার সম্মুখে অবস্থিত চক্রটি ঘুরাইলে চক্রটির ছিদ্রপথে তাহার সম্মুখের বস্তুটি হইতে আলোকরশ্মি আসিয়া চক্রের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত একটা আয়নার উপর আসিয়া তথায় প্রতিফলিত হইয়া অবশেষে 'ফটো ইলেট্রিক' যন্ত্রের উপর পতিত হয়। এই চক্রের ছিদ্রগুলি একই বৃত্তের উপর অবস্থিত নয়। প্রত্যেকটি ছিদ্র পূর্ব্ববর্ত্তীটি অপেক্ষা একটু কেন্দ্রের দিকে অবস্থিত। কাজেই চক্রটি ঘুরানর ফলে বিভিন্ন ছিদ্রপথে আগত বিভিন্ন অংশের আলোকরশ্মিই আয়না দ্বারা প্রতিফলিত হইতে পারে। ইহা কতকগুলি আলোকিত অংশের সমষ্টি মাত্র, কারণ বিভিন্ন ছিদ্রপথে আসে বলিয়া প্রকৃত পক্ষে আলোকরশ্মিগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। যদি কোন মানুষ বা বস্তুকে পর্দ্দার সম্মুখে রাখা যায় তবে তাহাকে চক্রটি দ্বারা কতকগুলি আলোকিত ক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়। যে-কোন ক্ষেত্রেই আলোকরশ্মি পড়ুক না কেন, তাহা হইতে কিছুটা অংশ প্রতিবিম্বিত হয় এবং যে পরিমাণ রশ্মি প্রতিবিম্বিত হয় তাহা নির্ভর করে সেই ক্ষেত্রটির প্রকৃতি অনুসারে। যেমন চুল হইতে যতটা রশ্মি প্রতিফলিত হইবে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী রশ্মি প্রতিফলিত হইবে কপাল হইতে, কাজেই কপালের অংশটুকুতে থাকে আলোক এবং চুলে অন্ধকার। যে-কোন বস্তু তীব্র আলোক এবং চক্রটির সহায়তায় আয়নায় প্রতিফলিত হইয়া পরিশেষে 'ফটো ইলেকট্রিক' যন্ত্রের উপর পতিত হয়। এই যন্ত্রের ধর্ম্মানুসারে তথায় আলোকের তীব্রতা অনুপাতে বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়। বেতার যন্ত্রে মাইক্রোফোন্ দ্বারা যে কাজ সম্পাদিত হয় এখানে ফটো ইলেকট্রিক যন্ত্র সেই কাজই করিতেছে—কাজেই আমরা ইহাকে লাইট মাইক্রোফোন্ বলিতে পারি।

কেবল যে এইরূপ একটি ব্যক্তি বা দৃশ্যের চিত্রই এইরূপে প্রেরণ করা সম্ভব তাহা নহে। যে-কোন প্রসারিত দৃশ্যকেও এইরূপে প্রেরণ করা যায়। এমন কি, নাটক অভিনয় করিয়া তাহার চিত্রও এইরূপে দেশবিদেশে মুহূর্ত্তে প্রেরণ করা সম্ভব—এই সঙ্গের কথাবার্ত্তা এবং সঙ্গীতাদি অবশ্য বেতার যন্ত্র সাহায্যেই প্রেরিত হয়।

এইবার টেলিভিসানের গ্রাহক-যন্ত্র সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ক্রুক্স্ সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, একটি বায়ুশূন্য কোষে বিদ্যুৎ চালনা করিলে 'কেথোড্ রশ্মি' উৎপত্তি হয়; ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যে-কোন গ্যাস হইতেই এই অদ্ভুত রশ্মিটি পাওয়া যায়। এই রশ্মিকে রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা তৈরী একটি বিশেষ পর্দ্দার উপর ফেলিলে সেই স্থানটি অন্ধকারেও উজ্জ্বল হইয়া ওঠে।

টেলিভিসানের চিত্রগ্রাহক-যন্ত্র দ্বারা বেতার যন্ত্রের ন্যায় সর্ব্বপ্রথম ইথরতরঙ্গকে একাভিমুখী বিদ্যুত-প্রবাহে পরিণত করা হয়। বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুতের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকারের 'কেথোড্ রশ্মি' সৃষ্টি করিয়া সেগুলিকে পর্দ্দার উপর ফেলা হয়। কেথোড্ রশ্মির পরিবর্ত্তে অনেক সময় 'নিয়ন ল্যাম্প' ব্যবহার করা হয়। ইহার গুণ এই যে, ইহার মধ্যে বিভিন্ন শক্তির আলোকরশ্মির উদ্ভব হয়। তফাৎ এইটুকু যে নিয়ন ল্যাম্প ব্যবহার করিলে সাধারণ পর্দ্দাতেই কাজ চলিয়া যায়। পূর্ব্ব বর্ণিত চক্রটির অনুরূপ আর একটি চক্রের সহায়তায় আলোক এবং ছায়াযুক্ত কয়েকটা রেখা পর পর পর্দ্দার উপর ফুটিয়া ওঠে। এই কাজটি এত দ্রুত সম্পাদিত হয় যে, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন রেখাগুলিই একত্রিত হইয়া সম্পূর্ণ চিত্রটি ফুটাইয়া তোলে—ঠিক যেমন চলচ্চিত্রে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ছবি পর পর পর্দ্দার উপর ফেলা হইলেও সে সবগুলি মিলিয়া আমাদের নিকট জীবন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

প্রথম প্রথম টেলিভিসান দ্বারা চিত্র প্রেরণ করিতে হইলে তীব্র আলোক ব্যবহার করা হইত, কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে 'ইনফ্রা রেড' নামক অদৃশ্য রশ্মি দ্বারাও এই কাজ অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। কাজেই এখন একটি লোক সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকিলেও টেলিভিসান দ্বারা তাহার চিত্র দেশেবিদেশে প্রেরণ করা সম্ভব।

নানারূপ পরীক্ষা এবং গবেষণার ফলে এখন আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় হইতে মাত্র দুইটি উপলব্ধি—দর্শন এবং শ্রবণসমগ্র জগৎব্যাপী মুহূর্ত্তমধ্যেই প্রেরিত হইতেছে। হয়তো এমন দিন আসিবে যখন আমাদের বাকী তিনটি উপলব্ধিও, অর্থাৎ— স্বাদ, গন্ধ এবং স্পর্শ এইরূপে দেশ দেশান্তরে প্রেরণ করা সম্ভব হইবে। সেদিন যখন আসিবে তখন আমাদের সম্পূর্ণ সত্তাই প্রেরিত হইবে আমাদের বিরহকাতর বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়জনের কাছে—বাস্তব জগতের যতখানি ব্যবধানই আমাদের মধ্যে বিরাজ করুক না কেন। বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা দ্বারা বর্ত্তমানে কত অসম্ভবকে যে সম্ভবে পরিণত করিতেছেন তাহার তুলনা নাই। দিন দিন এই পথে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা আরও যে কত শত অত্যাশ্চর্য্য তত্ত্বের সন্ধান দিবেন তাহার পরিকল্পনা এ ছার নশ্বর জগতে কে করিবে?

পল্লী প্রান্তে

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

১

সাঁঝের আকাশে রাঙা মেঘমালা
মিলায়ে গিয়েছে ধীরে,
চাঁদের আলোর হাসি লেগে যায়
ওপারের তরুশিরে।
শুভ্র বালুকা 'পরে
দাগ এঁকে থরে থরে
গ্রামের তরুণী জল নিয়ে যায়
কলসী বাহুতে ঘিরে'
আঁচল ধরিয়া চলিয়াছে শিশু
গাঙিনীর তীরে তীরে।

চাঁদের আলোয় হাসিছে কুটীর,
বনছায়া কাঁপে পাশে
মায়ে ছেলে মিলে সেই পথে চলে,
পরাণ উছলি' হাসে।
অদূরে বাঁশের বনে
মর্ম্মরধ্বনি শোনে,
চমকিয়া চাহে পিছন ফিরিয়া,
রাখালিয়া বুঝি আসে,
ডিঙি খুলে দিয়ে দুষ্ট ছেলেটা
রোজ রাতে গাঙে ভাসে।

৩

ডাল পালাগুলি ছায়া ফেলিয়াছে
পল্লী পথের 'পরে
করবীর ফুল ঝরিয়াছে তলে
কাঁপিছে হাওয়ার ভরে;
চকিত চাহনি হানি'
ঘোমটা ঈষৎ টানি'
স্বামীরে হেরিয়া শরমে তরুণী
দাঁড়ালো একটু সরে',
মৃদুল হাসিটি এড়ালো না চোখ
ধীরে সে পশিল ঘরে।

৪

মাটির প্রদীপ উস্‌কায়ে দিয়ে
যতনে শয্যা পাতি'
জানালা দুয়ার খুলে দিলো সব,
—হাসিছে জ্যোৎস্না রাতি।
গল্পে গল্পে ভুলি'
মা'র কোলে দুলি' দুলি'
দুরন্ত শিশু ঘুমায়ে পড়িল,
অমনি রাতের সাথী
স্বপন-শিশুরা চোখে নেমে এলো
ঘুম-পথে জেলে বাতি

৫

গৃহকাজ সারি' গুরুজনে সেবি'
আঁখি আসে ঘুমে ঢুলে'
মাঝে-মাঝে কোন্ স্মৃতি-স্বপনের
মায়ার দুয়ার খুলে।
রাত্ হ'ল নিঝ্‌ঝুম্
চারিদিক্ ঘুমঘুম
প্রদীপ নিবায়ে চলে শয্যায়—
আঁচল বাতাসে দুলে,
ঘরের পাশে ফুলগাছগুলি
ভরিয়াছে আজ ফুলে

৬

ঘুমে-জাগরণে প্রতীক্ষা-ভরা
ক্লান্ত নয়নতলে
বিবাহ-দিনের স্মৃতি দীপমালা
রঙীন্ শিখায় জ্বলে।
—মনে হয় আজ রাতে
নিরমল জ্যোৎস্নাতে,
মর্ত্ত্যমায়ের যে রূপ-মহিমা
জাগে নিতি পলে পলে
সারা প্রাণখানি মোহিছে আমার
বিছায়ে মায়াঞ্চলে

অহিংসা

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পিনাকীলাল ক্রমশই বিলাতপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্র-সমাজের কৌতূহল ফেনাইয়া তুলিতেছিল। প্রায় সমবয়স্ক আটত্রিশটি ছেলের মধ্যে সে ছিল সকলের চেয়ে মাথায় খাটো, গায়ের জোরেও সে সবার পিছনে গিয়া পড়িত, রূপের লালিমা তাহাকে দেখিয়া মুখ ভ্যাংচাইয়া টিটকারী দিত; কিন্তু বিতর্কের সময় এই খর্ব্বাকৃতি ছেলে সভাজনের দৃষ্টি এমন ভাবে আকৃষ্ট করিত যে তখন তাহাকে আর পিছনে ফেলিয়া রাখা চলিত না। পিনাকীর চেহারার খর্ব্বতা ও উক্তির উগ্রতা লক্ষ্য করিয়া অ-বাঙালী ছেলেরা বলাবলি করিত, 'কৌন্ য়্যাজ মাষ্টার্ড!' বাঙালী ছেলেরা বলিত, 'মাথায় খাটো হ'লে কি হবে, ঝাঁঝে কিন্তু ধানি লঙ্কা!' ইংরেজ ছেলেরা রুক্ষ স্বরে কহিত, Beware of 'Indian tongue-wagger!' পিনাকী তাহার সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য কান পাতিয়া শুনিত, শুনিয়া মনে মনে খুশীই হইত।

তথাপি ছেলেদের সহিত পিনাকীর বনিবনাও হইত না; কতকগুলি কারণে পিনাকীকে তাহারা মোটেই বরদাস্ত করিতে পারিত না। অধিকাংশ ছেলেই যে-পথ ও মত মানিয়া লইত, পিনাকী তাহার ঠিক উল্টা দিকটা ধরিয়া বিরোধ বাধাইতে চাহিত। কিন্তু বিরোধ-সূত্রে দলপুষ্ট বিরোধীদিগের প্রকৃতি যেই হিংস্র হইয়া উঠিত, পিনাকীলাল তৎক্ষণাৎ অহিংসার দোহাই দিয়া প্রতিযোগীদের নিকট এমন কায়দায় আত্মসমর্পণ করিত যে, তাহার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

এই সাঁইত্রিশটি প্রতিযোগীর মধ্যে পিনাকীর নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল সত্যব্রত ব্যানার্জ্জী। বয়স চব্বিশ বছর পূর্ণ না হইতেই এই ছেলেটি ছয় ফিট লম্বা মাপের ফিতাটির সীমারেখা পার হইয়া গিয়াছিল; তাই বলিয়া তাহার দেহটি প্রস্থকে সঙ্কীর্ণ করিয়া শুধু খাড়া হইয়া ওঠে নাই, বুকের ছাতিটিও সেই অনুপাতে বিস্তৃত ও পুষ্ট হইয়া অঙ্গের সৌষ্ঠবকে সুষ্ঠু ও সুশোভন করিয়া তুলিয়াছিল। সমবয়স্ক ইংরেজ সহপাঠীরাও হাতেকলমে নানা সূত্রেই এই গৌরকান্তি বলিষ্ঠকায় বাঙালী যুবাটির দৈহিক শক্তির পরিচয় পাইয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল—টাইগার অফ্ বেঙ্গল।

সুরেন্দ্রনাথ তখন বাঙলার নেতা, ভারতের মুকুটহীন সম্রাট; সেই বৎসরই পুনায় কংগ্রেসে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া অগ্নিগর্ভ অভিভাষণে ভারতবাসীর যে দাবী তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার রেশ তখনও ভারতের আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; সারা ভারতের জনমত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ভারত-রাষ্ট্রনায়কের প্রশস্তি গাহিতেছে, বিলাতী সংবাদপত্রগুলির পৃষ্ঠাতেও ভারতবর্ষ সংক্রান্ত আলোচনার স্তম্ভটি মিষ্টার এস-এন ব্যানার্জ্জীর কার্য্যধারার সবটুকু দখল করিয়া রাখিয়াছে। এ অবস্থায় বিলাতের ছাত্রসমাজ তাহাদের সহপাঠী মিষ্টার এস-ধি-ব্যানার্জ্জীকেও ইণ্ডিয়ার বিখ্যাতনামা লিডার মিষ্টার ব্যানার্জ্জীর পরিজন সাব্যস্ত করিয়া লইয়া কত প্রশ্নই করে। মিষ্টার ব্যানার্জ্জী তোমার কে হন? তাঁর প্রাইভেট লাইফটা কি রকম? কোথায় তিনি থাকেন? কি তাঁর প্রিয়? এমনই কত সঙ্গত ও অসঙ্গত প্রশ্ন।

কি ভাবিয়া পিতামাতা সন্তানের নামের আগে 'সত্য' শব্দটির সংযোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভিন্ন অন্যের পক্ষে তাহা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। কিন্তু নামের সহিত হুবহু ঐক্য রাখিয়া কথা কহিতে সত্যব্রতর কোন আগ্রহই দেখা যাইত না। সুতরাং ভারত ও ভারতের বিখ্যাত লীডারটির সহিত নিজের একটা কল্পিত যোগসূত্র রচনা করিয়া কত চমকপ্রদ উপাখ্যানই সে ইংরেজ সহপাঠীদিগকে শুনাইয়া চমৎকৃত করিয়া দিত। এ সম্বন্ধে সত্যব্রত তাহার ডাইরীতে এইরূপ কৈফিয়ৎ লিখিয়া রাখিত, 'বুদ্ধিমান কল্পিত বিষয়বস্তু সাজাইয়া অপরকে শুনায়, তাহাই গল্প হইয়া দশের মনের খোরাক জোগায়, রচয়িতা যশ পায়, অর্থলাভ করে। আমার দেশ ও নেতাকে আমিও যদি

এইভাবে বাড়িয়ে বিদেশীর কাছে বড় ক'রে দেখাই, সেটা কি দোষের ?

এইখানেই পিনাকীর সহিত সত্যব্রতর ঠোকাঠুকি বাধিত ; সে সত্যব্রতর কথার ছিদ্র ধরিয়া তাহাকে বিব্রত ও অপ্রস্তুত করিতে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইত ; প্রতি কথায় প্রতিবাদ তুলিয়া বলিত—প্রমাণ কোথায় ? কিন্তু সত্যব্রতও সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বভাবসিদ্ধ কল্পনাশক্তি ফেনাইয়া এমন কায়দায় তাহার গল্পের শাখা-প্রশাখা বাহির করিত যে পিনাকীর প্রতিবাদ অধিকাংশ স্থলেই চাপা পড়িয়া যাইত।

কথা গুছাইয়া বলিবার ও বক্তব্য কথায় শ্রোতাদের আস্থা আকর্ষণ করিবার কৌশলটুকু জানিত বলিয়া, সত্যব্রতর সকল কথাই বিদেশী সহপাঠীরা স্বীকার করিয়া লইত। তাহারা বলিত, হবে না কেন, মিষ্টার এস-এন-ব্যানার্জ্জীর নেফিউ ত !

এদিকে পিনাকী দল পাকাইয়া প্রচার করিতে চাহিত,—সব বাজে কথা, আসলে হচ্ছে এ ছোকরা মিষ্টার ব্যানার্জ্জীর স্পাই, তাঁকে প্রচার করছে। মিষ্টার ব্যানার্জ্জী ইণ্ডিয়ার লীডার না ছাই; লীডার হচ্ছে—মিষ্টার গোখ্‌লে।

কথাটা সত্যব্রতর কানে যাইবামাত্রই সে গোখ্‌লের একটা বিখ্যাত বক্তৃতার অংশ সকলকে শুনাইয়া দিল। সবাই তখন জানিতে পারিল যে, মিঃ গোখ্‌লে বাঙালা ও বাঙালীর উদ্দেশে মুক্তকণ্ঠে কি প্রশস্তিই গাহিয়াছেন! প্রতিবাদটার পরিণাম যে এমন সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইবে—কেঁচো নামক কৃমি-জাতীয় প্রাণীটিকে বাহির করিতে গিয়া সহসা সরীসৃপ-শ্রেণীর জন্তুটি ফণা তুলিয়া দেখা দিবে, পিনাকী তাহা কল্পনাও করে নাই। বাঙলার সম্বন্ধে গোখ্‌লের কথাটা তাহার বুকে যেন বুলেটের মত বিঁধিল।

ইংরেজ সহপাঠীরা পিনাকীর নাম রাখিয়াছিল—'পিনেস্'। পিনাকী কথাটার অর্থ তাহারা বুঝিত না এবং উচ্চারণেও বাধিত। কিন্তু পিনেস্ (Pinnace) শব্দটি তাহাদের সুপরিচিত ; মধ্যে মধ্যে তাহারা 'পিনেস বা পান্‌সী' চড়িয়া টেম্‌স্ নদীর বুকে পাড়ী দিত। কাজেই পিনাকীলালকে পিনেস বলিয়া ডাকিতে তাহাদের সুবিধাই হইত।

টম নামে ছেলেটি বিদ্রূপের সুরে কহিল, মিষ্টার ব্যানার্জ্জীর নজিরটা নিষ্ঠুর হয়ে আমাদের প্রিয়তম পিনেস্‌কে দেখছি বানচাল ক'রে দিলে !

ল্যরেন্স নামে আর একটি ছেলে পিনাকীর পানে তাকাইয়া গোখ্‌লে মহাশয়ের বিখ্যাত উক্তিটি পুনরাবৃত্তি করিল, What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow.

সত্যব্রত এই কথাটা যখন তাহার কথার উপসংহারে বিশেষ জোর দিয়া সুর করিয়া বলে, মিষ্টার ল্যরেন্স সেটা তাহার খাতায় টুকিয়া লইয়াছিল।

কিন্তু বাঙলা ও বাঙালীর দুর্ভাগ্য, এখানেও বিরোধটির নিষ্পত্তি হইল না। পিনাকী যতই খর্ব্বাকৃতি হউক এবং তাহার জন্মভূমির অন্তর্গত প্রদেশটি প্রগতি সম্পর্কে যত তফাতেই পড়িয়া থাকুক, বাঙলাকে সে ভারতের জঞ্জাল বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছিল এবং এই জঞ্জাল হইতে যাঁহারা জাহির হইয়া জগতের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসন দখল করিয়া বসিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করাই ছিল পিনাকীর লক্ষ্য। কিন্তু তাঁহার এই নিবিড় বিদ্বেষের মূলে যে বিষয়-বস্তুটি প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিত, তাহা যেমন সে প্রকাশ করিত না, পক্ষান্তরে সেই গূঢ় বিষয়টি আবিষ্কার করিবার জন্য সত্যব্রতর আগ্রহেরও অন্ত ছিল না।

সত্যব্রতর মনটি যে পরিমাণে খোলা ছিল, পিনাকীর মনের ভিতরটা সেই অনুপাতেই চাপা থাকিত। এ সম্বন্ধে চাণক্য পণ্ডিতের বিখ্যাত নীতিবাক্যটি সে আত্মস্থ করিয়া লইয়াছিল—মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম, বচসা ন প্রকাশয়েৎ।

কিন্তু নানা সূত্রে সত্যব্রতর উপর পিনাকীর বিদ্বেষ ক্রমশই এরূপ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল যে, তাহার প্রসঙ্গ উঠিলেই সে সহপাঠীদিগের প্রতি তাকাইয়া বিড় বিড় করিয়া বলিত, মনুমেন্ট্যাল লায়ার—মিথ্যার জাহাজ !

সত্যব্রতও ইহার পাল্টা উত্তরে পিনাকীর নামকরণ করিয়াছিল—seeker after truth—সত্য-সন্ধানী !

পিনেসের সম্বন্ধে সত্যব্রতর এই কথাটিও ইংরেজ-নন্দনদের বেশ মনে ধরিয়াছিল। ইহার পিছনে একটা কাহিনীও পূর্ব্ব হইতেই রসসৃষ্টি করিয়াছিল। সেটি এইরূপ :

বিলাতের এক বিখ্যাত অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে পলিটিক্স সম্বন্ধে লেকচার দিতেন। তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ এবং অকৃতদার। তাঁহার আচরণ ও চালচলনে পাদ্রীসুলভ মনোবৃত্তির প্রচুর পরিচয় পাওয়া যাইত। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার বিরাগ ও বিরক্তির বিষয় ছিল রঙ্গালয় ও অভিনেত্রী। ছেলেরা তাঁহার ক্লাসে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা তুলিলে তিনি এরূপ চটিয়া যাইতেন যে, তাঁহার পদোচিত সংযম তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িত। অতঃপর এই বিষয়টি লইয়া ছেলেদের পরামর্শ ও পরিকল্পনা চলে এবং তাহার ফলে একদা রঙ্গমঞ্চের এক রূপসী অভিনেত্রীর বিচিত্র ভঙ্গীপূর্ণ আলেখ্যটি অধ্যাপক ক্লাসে আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার টেবিলটি দখল করিয়া বসে। উদ্যোক্তারা সে সময় ক্লাসের সকল ছাত্রকেই সতর্ক করিয়া দিল—হুঁসিয়ার, পাদ্রী-সাহেব যতই তম্বী করুক, সবাই বলবে—জানি না কে রেখেছে।

পিনাকীও ক্লাসে ছিল। সত্যব্রত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—ওকে আগে সামলাও, মিষ্টার পিনেস 'গডের' এজেন্ট, ও সব ফাঁশ ক'রে দেবে।

তৎক্ষণাৎ ডজন খানেক লাল মুখ পিনেসের কালো মুখখানার দিকে ঝুঁকিল; সঙ্গে সঙ্গে হুমকি উঠিল, Beware Pinnace! সাবধান!

পিনাকী মুখটি বুজাইয়া কান দুটি খাড়া করিয়া সবই শুনিতেছিল; এবার মুখ খুলিল, কণ্ঠ হইতে স্বর কঠিন-ভাবেই বাহির হইল, স্যরী! আই কাণ্ট্; ট্রুথ ইজ মাই গড—ইজ টু মী দি য়ুনিভারসেল ল্য অফ লাইফ্—সত্য আমার ঈশ্বর, তারই সন্ধানে আমি এসেছি এখানে—মিথ্যা বলব আমি? নেভার!

কিন্তু ছেলেরা পিনাকীর এই সত্যনিষ্ঠার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই প্রফেসর ক্লাসে প্রবেশ করিলেন। উদ্যোক্তারা অমনই প্রসঙ্গটি পরিত্যাগ করিয়া ভালমানুষের মত যে-যাহার স্থানে গিয়া বসিল।

এদিকে প্রফেসর তাঁহার চেয়ারে বসিয়াই তড়িৎস্পৃষ্টের মত লাফাইয়া উঠিলেন! কি সর্ব্বনাশ! তাঁহার টেবিলে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীর তসবীর! আবার যেমন তেমন ছবি নয়—বেহায়া ছুঁড়ীটা অঙ্গ দুলাইয়া লাস্যলীলা দেখাইতেছে! কি স্পর্দ্ধা!

তর্জ্জনের সুরে প্রশ্ন করিলেন—কে করেছে এ কাজ? কে এনেছে এ ছবি? কে এখানে রেখেছে?

ছেলেরা চুপ, কাহারও মুখে কথা নাই, সমস্ত ক্লাস স্তব্ধ। কেবল পিনাকী নির্দ্দিষ্টভাবে তাহার উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তী প্রশ্ন ও সেই সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত সুযোগটির প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহার ভাবভঙ্গীতে ইহাই ঈষৎ প্রকাশ পাইতেছিল।

কণ্ঠের স্বর উচ্চগ্রামে তুলিয়া অধ্যাপক কহিলেন, প্রকৃত দোষীকে আমি তোমাদের ভেতর থেকে আবিষ্কার করবই।

তাহার পর তিনি ছেলেদের দিকে গিয়া এক এক জনকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তুমি জানো? তুমি? তুমি—

একে একে সকলেই উত্তর দিল, জানি না স্যর!

কিন্তু সত্য প্রকাশ করিবার জন্য সত্যাশ্রয়ী পিনাকী এতক্ষণ চুলবুল করিতেছিল। এবার আসিল তাহার পালা। যেই তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি জানো?

পিনাকী অমনই তড়াক করিয়া জবাব দিতে উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আর এক অভিনব পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়া তাহারই সত্য প্রকাশের পথে বিষম বাধার সৃষ্টি করিল।

'হ্যাঁ' কথাটি বলিবার জন্য যেমন পিনাকী হাঁ করিয়াছে এবং তাহার দুইটি কোটরগত চক্ষু অদূরবর্ত্তী সহপাঠীদের দিকে বিস্ফারিত হইয়াছে, অমনই তাহাদের যুগপৎ শাসানি সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে স্তব্ধ করিয়া দিল। সামনের বেঞ্চ-খানির লালমুখ ছেলেগুলি অধ্যাপকের পিছন হইতে শুধুই যে তাহাকে চোখ রাঙাইয়া শাসাইতেছিল—তাহা নহে, পরন্তু সত্যপ্রকাশ করিলেই যে তাহারাও সশস্ত্র অভিযান করিয়া প্রতিশোধ তুলিবে—হাতে-কলমেই তাহা দেখাইতে-ছিল। ঘুসী বাগাইয়া, ছুরীকে ছোরার মত ভাঁজিয়া, অটোমেটিক রিভলভারের চকচকে নলিটি নিসানা করিয়া তাহারা সত্যকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিবার যে নির্দ্দেশ দিল, তাহাতে পিনাকী মুখটি বুজাইয়া ও দুই চক্ষু মুদিত করিয়া ধুপ করিয়া নিজের সীটে বসিয়া পড়িল। হায়, সত্যসন্ধানী পিনাকীর চক্ষুর উপর সত্য এমন অপ্রত্যাশিত-ভাবে ধরা দিতে আসিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য পিনাকী মারের ভয়ে তাহাকে ধরিতে পারিল না; অবাক-বিস্ময়েই সে

সত্যের এই লাঞ্ছনা দেখিল! পিনাকীর পরবর্ত্তী জীবনে অনুরূপ ঘটনা আরও কতবারই ঘটিয়াছে! পাঠক-পাঠিকাগণ ধৈর্য্য-সহকারে এই চমকপ্রদ চিত্রটির অনুসরণ করিলে সে সকল চিত্র-রেখাও তাঁহাদিগের চক্ষুর উপর প্রতিফলিত হইবে।

সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে এই ছেলেটির উপর অধ্যাপকের বিশেষ আস্থা ছিল। অবশেষে ইহাকেও ঝাঁকে মিশিতে দেখিয়া অগত্যা তাঁহাকে অপরাধী আবিষ্কারের দুশ্চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া দুর্নীতির প্রভাব সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা খাড়া করিতে হইল। বলা বাহুল্য, ছেলেরা ইতিমধ্যেই অভাগিনী অভিনেত্রীর আলেখ্যটি টেবিল হইতে তুলিয়া অধ্যাপকের সীটের পশ্চাতে হ্যাট-র‍্যাকে ঝোলানো টুপীটির ভিতর অতি সন্তর্পণেই চালাইয়া দিয়াছিল।

এই অধ্যাপকের পিরিয়ড শেষ হইবার পর ছেলেরা পিনাকীকে লইয়া পড়িল। কিন্তু পিনাকী দমিল না। সে বেশ গম্ভীরভাবেই কহিল—অহিংসাও ঈশ্বরের আর একটা রূপ; পেছন থেকে হিংসা কামড়াবার জন্তে মুখ বাড়াচ্ছে দেখে মুখ আর খুললুম না, চুপ ক'রেই গেলুম।

সত্যব্রত কহিল, কথাটার মানে কিন্তু বুঝতে পারলুম না।

পিনাকী কহিল, মানে খুবই সোজা; আমি যদি অধ্যাপকের কাছে কথাটা স্বীকার করতুম, ক্লাসশুদ্ধ তোমাদের সবারই সাজা হত; তার মানেই হিংসা পেতো প্রশ্রয়। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে জানিয়ে দিলেন, সেটা ঠিক নয়। তাই দিলুম তখনই হিংসাকে গলাধাক্কা; জয় হ'ল অহিংসার। অধ্যাপকের সামনে মুখ বুজিয়েছিলুম ঐ জন্তই; তোমাদের ঘুসী দেখে নয়, ছুরিছোরার জন্তও নয়, রিভলভারের গুলীর ভয়েও নয়।

পিনাকীর যুক্তি শুনিয়া ছেলের দল একেবারে অবাক। তাহারা স্বীকার করিল, হ্যাঁ, এ একটা লজিক বটে।

সত্যব্রতই কেবল অধ্যাপকের মত মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল, আমার মতে, কতকটা লজিক, কতকটা ম্যাজিক।

ছেলেরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পিনাকী দুই চক্ষু পাকাইয়া সত্যব্রতর দিকে চাহিয়া কহিল, বাঙ্গালী জাতটাই ম্যাজিসিয়ান।

সত্যব্রত পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবেই জানাইল, শুধু তাই নয়, রীতিমত লজিসিয়ান; তাই আসল-নকল চেনে, ম্যাজিক দেখে চমকায় না।

পিনাকী তখন রুদ্ধরোষে ভবিষ্যদ্বাণী করিল, একদিন চমকাবে।

এবার সত্যব্রতর ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির রেখা ফুটিল, মৃদুস্বরে উত্তর দিল, দেখা যাবে।

ইহার পরও সত্য এবং অহিংসা সম্পর্কে কতবারই কত আলোচনা ও বিতর্ক হইয়াছে; ঈশ্বরের এই দুইটি আসল রূপের ওকালতি করিয়া পিনাকী ছেলেদিগকে কত নূতন কথাই শুনাইয়া তাক লাগাইয়া দিতে চাহিয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এইটুকু যে, সত্যব্রত কোনও দিনই তাহাতে অভিভূত হয় নাই এবং পিনাকীর নূতন নূতন কথায় শুধু সে সায় না দেওয়াতেই ছেলেরা সেগুলি স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। সত্য ও অহিংসা সম্বন্ধে যে তথ্যটি পিনাকী নূতন বলিয়া প্রচার করিতে প্রয়াস পাইত, সত্যব্রত তৎক্ষণাৎ তাহাতে প্রতিবাদ তুলিয়া বলিত, বাঙলার ম্যাজিসিয়ানরা পঞ্চাশ বছর আগেই এ সব কথা বলে গেছেন। শুধু মুখের কথা নয়, সত্যব্রত প্রমাণ পর্য্যন্ত দাখিল করিবার দাবী জানাইত।

কিন্তু পিনাকী উপেক্ষার ভঙ্গীতে হাসিয়া তর্কের গতি রুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে উত্তর দিত, সত্য ও অহিংসার রূপ মিথ্যাবাদীর যুক্তির বাতাসে আকাশে মিশে যায় না।

অন্তান্ত ছেলেরা সেদিন তর্কের উপসংহারটি দেখিয়া হতাশ হইয়াই বলিল, জবাবটা কিন্তু ঠিক হ'ল না মিষ্টার পিনেস! ব্যানার্জ্জী বলেছেন, তোমার কথাগুলো সব চুরি করা, আর চুরি করেছ ব্যানার্জ্জীর দেশ বেঙ্গল থেকেই।

টম নামে দুর্মুখ ছেলেটি কথাটায় সায় দিয়া খোলা-খুলি ভাবেই কহিল, অর্থাৎ তুমি বাঙালীর পকেট মেরে, যে বস্তুটি নিজের পকেটে পুরেছ, সেইটিই একটু বদলে-সোদলে আমাদের চোখের ওপর তুলে তাক্ লাগাতে চাইছ!

পিনাকীর দুইটি চক্ষুই যেন জ্বলিয়া উঠিল, সেই সঙ্গে তাহার মুখ দিয়া যে জ্বালাময় কথাটা সশব্দে বাহির হইয়া আসিল, তাহারি তাপটা কেহই অস্বীকার করিতে পারে নাই, এমন কি ইংরেজ ছেলেরা পর্য্যন্ত। টমের কথাটায়

উত্তরে সে থপ করিয়া বলিয়া ফেলিল, সত্য ও অহিংসা যেখানে নেই, সেখানে কোন পকেটই থাকতে পারে না।

আরউইন নামে নিরীহ প্রকৃতির একটি ছেলে সত্যব্রতর দিকে সকৌতুকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল, শুনছ মিষ্টার ব্যানার্জ্জী, কত বড় লজিকের কথা মিষ্টার পিনেস শুনিয়ে দিলে!

হেন্‌রী নামে ছেলেটি পিনাকীর উদ্দেশে প্রশ্ন করিল, তা হ'লে কথাটার মানে কি বুঝব?

পিনাকী গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল, ম্যাকলে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতায় মানেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এর ওপর আর কথা নেই।

সকলেই সত্যব্রতর দিকে চাহিল। কিন্তু এই সাংঘাতিক কথাটা যে তাহাকে কিছুমাত্র আঘাত দিয়াছে, তাহা বুঝা গেল না। অবিচলিত কণ্ঠেই সে কহিল, কথা একটু আছে। মৌমাছি ফুলের ভেতরে ঢুকে সত্যের সন্ধান করে, শকুনী পচা মড়ার ওপর পড়ে ঠোঁটের ঠোকর দিয়ে সত্য খোঁজে, কুকুর হাড় চিবিয়ে সত্য বার করে, মাছিগুলো শুকনো ঘায়ের ওপর মুখ ঘ'সে চাপা সত্যকে খুঁচিয়ে তোলে। যদিও এদের রূপ আলাদা, কিন্তু মনোবৃত্তি এক; কোন তফাত নেই; সবাই সত্যের সন্ধানী—অর্থাৎ seeker after the truth.

টম কহিল, তা হ'লে তুমি বলতে চাইছ মিষ্টার ব্যানার্জ্জী, মিষ্টার পিনেস্ ঐ কয়টি প্রাণীর সম্মিলিত সংস্করণ?

সত্যব্রত কহিল, বড় দুঃখেই আমাকে বলতে হচ্ছে, এই মনোবৃত্তি নিয়েই মিষ্টার পিনেস যদি ভারতবর্ষে ফিরে যায়, আর সেখানে ওর এই মনগড়া সত্যটির প্রচার করে, তা হ'লে এমন সর্ব্বনাশ ভারতবর্ষের হবে—সে-যুগের জেঙ্গিস খাঁ, নাদীর শাহ্, কালাপাহাড় প্রভৃতির আমলেও তেমনটি হয় নি, আর এযুগে বৃটিশ কনজারভেটিভ পার্টি তার ধারেও এখনো যায় নি!

ক্লেভারিং নামে একটি ভারতবিদ্বেষী ছেলে উৎসাহের সুরে কহিল, তা হ'লে মিষ্টার পিনেসের অতি সত্বরই সিবিলিয়ান হয়ে ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়া উচিত। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

কিন্তু যাহাকে লইয়া কথা চলিয়াছিল, সে তখন পাস কাটাইয়া বুদ্ধিমানের মত স্থানত্যাগ করিয়াছে। পিনাকী ভাবিয়াছিল, সত্যব্রত আজ রীতিমতই ঘায়েল হইয়াছে, সে আর মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সাহস করিবে না। কিন্তু নিদারুণ আঘাত পাইয়াও আজ যেরূপ ধীরতার সহিত সে এক সাংঘাতিক শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিল এবং তাহা এমনই অব্যর্থভাবে পিনাকীর মর্ম্মস্থলে আসিয়া বিঁধিল যে, তাহার আর টুঁ শব্দটি করিবার উপায় ছিল না।

এদিনের দ্বন্দ্বের পরিণতি যাহাই হউক, সত্যব্রতর আবিষ্কৃত নামটি কিন্তু প্রত্যেকেরই প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। এমন কি, পিনাকীও তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। প্রতি সায়াহ্নে লোকচক্ষুর অন্তরালে শহরের নিভৃত অংশে সহপাঠীদের অজ্ঞাত এক কক্ষে সংগোপনে ও অতি সন্তর্পণে যখন সে রোজ-নামচা লিখিত, এদিনের ঘটনাটির বিবরণ তাহাতে এই ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল—উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে যদিও সত্যব্রত আমার সাংঘাতিক অন্তরায়, তথাপি আমি তাহার দূরদৃষ্টির তারিফ করিতেছি। তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক।

যে সময়ের চিত্র আমরা আঁকিতে বসিয়াছি, তখন সাম্প্রদায়িক বিরোধ অথবা প্রাদেশিকতা নামক সমস্যার ছায়াও বিশাল ভারতবর্ষের সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের কোন অংশেই পড়ে নাই; অথচ ভারতের বাহিরে বারণার্ড ষ্ট্রীটের একটি মেসের মধ্যে ভারতীয় জনসাধারণের অগোচরে ইহা ধোঁয়ার আকারে কুণ্ডলীকৃত হইতেছিল। ভারতবর্ষে বসিয়া যে সকল মণীষী সে সময় বৃটিশ সরকারের নিকট দৃপ্তকণ্ঠে ভারতের দাবী ঘোষণা করিতেছিলেন, তাঁহারা তখন কল্পনাও করেন নাই যে, তাঁহাদের অজ্ঞাতে বৃটিশ রাজধানীর বুকে বসিয়া ভারতের এক সুবিধাবাদী সুসন্তান অদ্ভুত পরিকল্পনায় যে ধূম্রজাল রচনা করিতেছে, তাহাই একদিন নিবিড় মেঘে পরিণত হইবে এবং সেই মেঘনিঃসৃত বজ্রই তাঁহাদেরই কঠোর সাধনালব্ধ একতা ও সদ্ভাব ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবে।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে বার্ণার্ড ষ্ট্রীটের 'ইণ্ডিয়া কটেজ'টি তখন এমনই সুপরিচিত ও প্রশংসিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভারতীয় ছাত্রদিগের অভিভাবকগণ বিলাতী মেলের টিকিট কিনিবার পূর্ব্বেই এই কটেজের স্বত্বাধিকারিণী

মিসেস ফ্লাওার্স এলায়ের সহিত ছেলেদের অবস্থিতি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা পাকা করিয়া ফেলিতেন। আহার সম্পর্কে ছেলের রুচি ও অভ্যাস, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সব কথাই চিঠিতে অভিভাবকগণ খুলিয়া লিখিতেন। ছেলে যথাসময় লণ্ডনে পৌঁছাইয়া ও ইণ্ডিয়া কটেজে আশ্রয় লইয়া আনন্দ সহকারেই চিঠিতে লিখিত যে, ব্যবস্থার কোন নড়-চড় হয় নাই, বাড়ীর সুখ-সুবিধাই পাইয়াছে, সুতরাং পরিজনদের চিন্তা বা উদ্বেগের কোন কারণ নাই।

ইণ্ডিয়া কটেজের ইহাই ছিল বৈশিষ্ট্য এবং এই জন্যই ভারতীয় ছাত্রগণ এখানে ঢুকিবার জন্য হুড়াহুড়ি বাধাইত। ভারতীয় ছাত্র ব্যতীত কতকগুলি ইংরেজ ছাত্রও এই কটেজে থাকিয়া পড়াশুনা করিত। এই সকল ছাত্রের অভিভাবকগণ বিলাতের বনেদী বড়লোক ও অভিজাতবংশীয় হইলেও এই উদ্দেশ্যে ছেলেদিগকে ইণ্ডিয়া কটেজের আবেষ্টনে রাখিয়াছিলে যে, ভারতীয় ছাত্রদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা ও সাহচর্য্যের ফলে তাহারা ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টিগত ভাবধারার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইবে; —সিবিল সার্ভিসে সাফল্যের তিলক পরিয়া ভারতবর্ষে কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করাই ইহাদের লক্ষ্য ছিল।

মিসেস ফ্লাওার্স এলাই নিজের নিখুঁত ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধানে এই কটেজটি এমন শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করিতেন যে, ইংরেজ বা ভারতীয় ছেলেদের মধ্যে অভিযোগ তুলিবার কোন অজুহত কখনই আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাইত না। মিসেস ফ্লাওার্স ফরাসী দেশের মেয়ে, ইঁহার স্বামী ছিলেন ইংরেজ, খাস লণ্ডনের বাসিন্দা; কিন্তু ইঁহাদের দাম্পত্যজীবনের অধিকাংশ কাল ভারতবর্ষেই অতিবাহিত হয়। বিলাতের কোন এক বিখ্যাত সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট রূপে মিষ্টার ফ্লাওার্স এলাই সস্ত্রীক ভারতবর্ষে প্রবাস-জীবন যাপন করেন। ভারতের প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীগুলিতে তাঁহাদিগকে অবস্থিতি করিতে হয়, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির সহিত কর্ম্মসূত্রে ইঁহাদের মিলিবার মিশিবারও প্রচুর সুযোগ ঘটে। ভারতবর্ষেই ইঁহাদের একমাত্র কন্যা এলিজাবেথ জন্মগ্রহণ করে এবং ভারতবর্ষেই মিষ্টার ফ্লাওার্সের কর্ম্মজীবনের অবসান হয়। কন্যা এলিজাবেথ তখন দশ বছরের বালিকা। স্বামীর মৃত্যুর পর মিসেস ফ্লাওার্স বিলাতে ফিরিয়া অনেক মাথা খেলাইয়া ভারতবর্ষের সহিত তাঁহাদিগের কর্ম্মস্মৃতি বজায় রাখিতে ইণ্ডিয়া কটেজ খুলিয়া বসেন। ইনিই এই কটেজটির সর্ব্বময় কর্ত্রী এবং সর্ব্বজনপ্রশংসিতা ল্যাণ্ড-লেডী। যে আটত্রিশটি ছেলের কথা আমরা গোড়াতেই বলিয়াছি, তাহারা সকলেই এই কটেজে মিসেস ফ্লাওার্সের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিয়া সন্নিহিত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পড়াশুনা করিতেছিল।

ইণ্ডিয়া কটেজে থাকিয়া প্রত্যেক ছেলেই যে বাড়ীর সুযোগ-সুবিধা পাইত, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মিসেস ফ্লাওার্স প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের রীতিনীতির সহিত আধুনিকতার লোভনীয় পদ্ধতির সংযোগ করিয়া এমন কতকগুলি ব্যবস্থা এখানে চালু করিয়াছিলেন যে, ছেলেদের নিকট তাহা অত্যন্ত প্রীতিকর ও উপভোগ্য হইয়াছিল।

একটা প্রকাণ্ড হলে পাশাপাশি টেবিলে এক সঙ্গে এই ছেলেগুলির ভোজের ব্যবস্থা, নিত্য নূতন ভোজ্যের তালিকা এবং ভোজনকারীদের বয়স ও রুচি অনুযায়ী গান বাজনার সহিত নানারূপ আলোচনা—ছেলেদিগকে উল্লাসমুখর করিয়া তুলিত। মিসেস ফ্লাওার্স সময় সময় নিজেও আলোচনায় যোগ দিতেন এবং ভারতবর্ষ সংক্রান্ত তাহার অভিজ্ঞতালব্ধ নানাবিধ চমকপ্রদ কথা ও কাহিনী ছেলেদের খুবই উপভোগ্য হইত।

ছেলেদের আর একটি আকর্ষণের বস্তু ছিল—মিসেস্ ফ্লাওার্সের কিশোরী কন্যা মিস ফ্লাওার্স এলাইয়ের সাহচর্য্য। মেয়েটির নীল চক্ষু, একরাশি সোনার বরণ চুল ও নিখুঁত সুন্দর মুখের একটানা হাসি ছেলেদিগকে নিরতিশয় আনন্দ দিত। ভারতবর্ষের মেয়েদের বয়সের অনুপাতে অসঙ্কোচেই তাহাকে কিশোরী বা নবযুবতী বলা চলে, কিন্তু প্রতীচ্যের মাপকাঠিতে সে এখনও বালিকা মাত্র। চৌদ্দ-পনেরো বছরের কোন মেয়েকে কেহ এদেশে যুবতীর পর্য্যায়ে ফেলিলে তাহাকে জনসমাজে উপহাসের পাত্র হইতে হয়। আমাদের পিনাকীলালও এই মেয়েটির সম্বন্ধে এইরূপ একটা ভুল করিয়া যে কাণ্ড বাধাইয়া বসে, সেটিও তাহার প্রবাস-জীবনের আখ্যায়িকাটিকে সরস ও উপভোগ্য করিয়া রাখিয়াছে এবং এই চিত্রটির উপর মিস এলাইয়ের প্রভাবও বড় অল্প নহে।

এই মেয়েটি প্রজাপতিটির মত সাজিয়া গুজিয়া ছেলেদের

সহিত অবাধ মেলা-মেশা করিত ; ছেলেরাও তাহার সহিত হাসি, ঠাট্টা, কথা কাটাকাটি ও হুল্লোড় করিতে ছাড়িত না। মেয়ের মা এ সব দেখিয়া শুনিয়াও উপেক্ষা করিয়া বা এড়াইয়া যাইতেন। বিলাতের দৃষ্টিতে নিজের সুন্দরী মেয়েটিকে তিনি নাবালিকার পর্য্যায়ে ফেলিয়া রাখিলেও তাহার জন্মস্থান যে ভারতবর্ষ ও জীবনের অধিকাংশই যে সেই রৌদ্রতপ্ত দেশটিতে কাটাইয়া সে যে অতিরিক্ত চতুর ও কথাবার্ত্তায় পাকা হইয়া উঠিয়াছে, ইহাও তিনি গ্রাহ্য করিতেন না বা এ সম্বন্ধে কোন চিন্তাই তাঁহার চিত্তপটে কোনরূপ সংশয়ের আঁচড় টানিত না। বরং ইহাদের ক্রীড়া-কৌতুকের উচ্ছ্বাস ও চটুল হাস্য-পরিহাস তিনি সকৌতুকেই উপভোগ করিতেন।

প্রথম হইতেই মিস এলাইকে দেখিয়া পিনাকীর কি লজ্জা! এই মেয়েটিকে দেখিলেই সে কেঁচোর মত কুঁচকাইয়া পড়িত ; চোখোচোখী হইলে সে বুঝি মুখখানাকে নত করিয়া মেঝের কার্পেটটির সঙ্গে মিশাইয়া দিতে চাহিত। ইহাতে অবশ্য পিনাকীকে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না। কেননা, ভারতের যে প্রদেশটির সে অধিবাসী, সেখানে কন্যার বয়স নয় পার হইলেই সে বধূর মর্য্যাদা লইয়া স্বামীগৃহে অধিষ্ঠিতা হয়। পিনাকীও এমনই এক বধূর সহিত দাম্পত্য-বন্ধন দৃঢ় করিয়া তাহার পিতার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া আসিয়াছে ; তাহার বয়স এখনও নয় বৎসর পূর্ণ হয় নাই। এ অবস্থায় পঞ্চদশী কন্যার অবাধ সাহচর্য্য কেমন করিয়া সে বরদাস্ত করিবে ?

কিন্তু তাহার এই লজ্জাচ্ছন্ন অবস্থা ছেলেদের দৃষ্টি এড়াইত না, মিস্ এলাইয়েরও নয়। তাহাদের চোখে-চোখে বিদ্যুৎ খেলিত এবং কাঁচা মাথাগুলির মধ্যে দুষ্ট বুদ্ধি জাল পাকাইতে থাকিত।

মিস এলাই ভোজের টেবিলে যেই কোন কিছু খাদ্য পরিবেশন করিতে আসে, অন্যান্য ছেলেদের মুখে তখন কত কলরবই ওঠে, তাহার হাতের খাদ্য লইতে যেন কাড়াকাড়ি কাণ্ড। ঘটনাচক্রে এই রকম এক কাণ্ডের মধ্যেই একদা এক অবাক-কাণ্ড ঘটিয়া গেল। অবশ্য তাহার সহিত একটা পূর্ব্বরচিত চক্রান্তও ছিল।

দলের মধ্যে পিনাকীই একমাত্র নিরামিষ ভোজী এবং তাহার টেবিলটি সারির শেষে একটু আলাদাভাবেই থাকিত। এই টেবিলে বসিয়া সেদিন পিনাকী মুখখানা নীচু করিয়াই অধিকাংশ সময় খাইতেছিল। হঠাৎ সে সুযোগমত অতি সন্তর্পণে একটি চক্ষু তুলিয়া ও তাহা একটু বাঁকাইয়া মিস এলাইয়ের ফুলের মত মুখখানি ও সোনালি রঙ্গের ছড়ানো চুলগুলির শোভাটুকু টুক্ করিয়া দেখিয়া লইত। কিন্তু এমনই পিনাকীর দুর্ভাগ্য, তাহার এই লুকোচুরি মেয়েটির চোখে তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সে মুচকি হাসিয়া এবং মনে মনে কি একটা মতলব ঠিক করিয়া রন্ধনশালার দিকে ছুটিল।

পিনাকী এই ফুরসতে মুখখানা তুলিয়া ও অতিশয় গম্ভীর করিয়া চাপা কণ্ঠে তর্জ্জন তুলিল, ভারী অন্যায়।

ছেলেদের ভিতর হইতে সত্যব্রতই প্রথমে প্রশ্ন করিল, কিসে ?

পূর্ব্ববৎ চাপাকণ্ঠে পিনাকী নির্দ্দেশ দিল, দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।

টম দুই চক্ষু পাকাইয়া প্রশ্ন করিল, দুর্নীতিটা কি ?

পিনাকী জানাইল, সাঁইত্রিশটা রোমিও একটা জুলিয়েটকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করছে, এটা দুর্নীতি নয় ?

উত্তেজনার দমকে এবার কথাগুলি পিনাকী কণ্ঠে জোর দিয়াই বলে, কাজেই ভেজিটেবল চপের ডিস লইয়া মিস এলাই প্রবেশ করিতেই তাহার কানে মোটরের হর্নের মতই কথাগুলি বাজিয়াছিল। হলে ঢুকিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

সত্যব্রত তৎক্ষণাৎ বিখ্যাত অভিনেতা স্যর বীরভুম ট্রির অভিনয়ভঙ্গী ও আবৃত্তির নকল করিয়া কহিল, এ ডেনিয়েল্ হ্যাজ ক্যাম্ টু জাজমেণ্ট!

টমও সঙ্গে সঙ্গে কহিল, জুলিয়েট টু প্রেজেণ্ট!

এলাইকে দেখিবামাত্রই পিনাকীর উত্তেজনাপূর্ণ মুখখানি একনিমেষে লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল এবং সামনের ডিস-খানার উপর সে এমনই ঝুঁকিয়া পড়িল যে মিস এলাই তাহার সামনে আসিয়া হাতের ভোজ্যবস্তুটি পিনাকীর ডিসে চালান করিবার কোন রাস্তাই পাইল না। তখন সে এক কাণ্ড করিয়া বসিল ; ডিসের বস্তুটি অতি সন্তর্পণে পিনাকীর মাথার উপরেই ঢালিয়া দিল। উক্ত ভোজ্যবস্তুটি সদ্যভর্জ্জিত অবস্থায় ডিসে উঠিয়াছিল ; সুতরাং সহসা একটা উত্তাপ অনুভব করিয়া পিনাকী এমনভাবে লাফাইয়া উঠিল যে,

এলায়ের হাতের ডিসখানা ঠিকরাইয়া টেবলের মাঝখানে গিয়া পড়িল এবং এলাইয়ের চিবুকটির সহিত পিনাকীর টিকোলো নাসিকার নিদারুণ সংঘর্ষ রীতিমত একটা রোমান্সের সৃষ্টি করিল।

এমন বিপদে পিনাকী বুঝি আর কখনও পড়ে নাই? আসল ব্যাপারটি ত সে জানিতে পারে নাই; যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া লইয়া সে ক্ষণকাল পুতুলের মতই খাড়া হইয়া রহিল। একে নারীর অঙ্গের সহিত তাহার নাসিকার প্রচণ্ড সংঘর্ষ, আবার সেই নারী তখনও প্রায় তাহার বক্ষলগ্ন হইয়াই স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এখন সে কি করিবে?

টেবিল হইতে একাধিক কণ্ঠের স্বর হাসিয়া উঠিল, কলিশ্যন বিটুইন পিনেস এণ্ড এলাই!

এলাই তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদের ভঙ্গীতে কহিল, নো; কলিশ্যন বিটুইন রোমিও এণ্ড জুলিয়েট!

পিনাকী এবার মুখখানি তুলিয়া এবং মনে ও কণ্ঠে প্রচুর শক্তি সঞ্চার করিয়া কহিল, স্যরি, মিস্ ব্যাটারফ্লাই!

হো-হো করিয়া ছেলেরা এবার হাসিয়া উঠিল। সত্যব্রত কহিল, পিনাকী আমাদের জিনিয়াস, কে বলে ও পাদ্রী সাহেব, আসলে বর্ণচোরা আম, ভেতরটা রসে ভরপুর।

ভবানীশঙ্কর নামে এক মারাঠি ছেলে কহিল, তা হ'লে মিস এলাই আজ থেকে হলেন ব্যাটারফ্লাই?

টম এলায়ের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, মিস্, তুমি রাজী? নূতন নামটা স্বীকার ক'রে নিচ্ছ ত?

মিস্ এলাই কহিল, নিশ্চয়ই, আমাদের ভেতর এতদিন ছিল আড়ি, আজ থেকে ভাব হয়ে গেল। এর পর আপনারা আমাকে মিস্ এলাই-এর বদলে মিস্ ব্যাটারফ্লাই ব'লেই ডাকবেন।

সত্যব্রত কহিল, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই, যদিও এই লম্বা নামটা ডাকতে সেকেণ্ড দুই সময়ের অপব্যয় হবে, তা হোক; মিষ্টার পিনাকীর জন্য আমরা এই কষ্টটুকু স্বীকার করব।

অন্যান্য ছেলেরাও কথাটার সমর্থন করিল।

সত্যব্রত পুনরায় কহিল, কিন্তু মিস্ ব্যাটারফ্লাই, মিষ্টার পিনাকীর চপখানা যে মাঠেই মারা গেল!

মিস্ কহিল, যেতে দিন ওখানা, এরপরও আর ওঁকে অমন আলাদা হতে দিচ্ছি কি না! এই দেখুন না কি করি—কথার সঙ্গে সঙ্গে খাবার ঘরের এক ধারে একটা মারবেল পাথরের টিপয়ের উপর ডিসেভরা যে সব ভোজ্য ছিল, মিস্ এলাই তাড়াতাড়ি সেখান হইতে খান কয়েক চপ আনিয়া পিনাকীর ডিসের উপর রাখিল ও খপ করিয়া তাহার হাতখানা টানিয়া কহিল, বসুন, খেতে হবে।

পিনাকী সেই যে উঠিয়াছিল, এ পর্য্যন্ত বসে নাই। পুনরায় তাহার হাতে নারীর হাতের পরশ, মধুর আহ্বান। অভিভূতের মত পিনাকী তাহার আসনে বসিল বটে, কিন্তু মৃদু স্বরে আপত্তি তুলিল, খাবার আর ইচ্ছা নেই।

এলাই কহিল, খেতেই হবে, নইলে মা রাগ করবে; আপনি কি শেষে আমাকে সবার সামনে বকুনি খাইয়ে কষ্ট দিতে চান?

পিনাকীর সারা অন্তরটি বুঝি অমনি টন্‌টন্ করিয়া উঠিল; আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, কারুর মনে কষ্ট দেওয়া মানে হিংসাকে প্রশ্রয় দেওয়া; আমি অহিংসার উপাসক। আচ্ছা, না হয় খাচ্ছি।

তিনখানা চপ পিনাকী কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

এবার পিনাকীর ব্যাটারফ্লাই মুচকি হাসিয়া কহিল, হিংসাকে আজ থেকে আপনি ইণ্ডিয়া কটেজ থেকে তাড়িয়ে দিলেন; আমার মাও বেঁচে গেলেন, তাঁর একটা ভয়ঙ্কর কষ্ট ও অসুবিধা কেটে গেল।

কথাগুলির অর্থ বুঝিতে না পারিয়া পিনাকী মেয়েটির হাসিভরা মুখখানির দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল।

মিস এলাই অর্থটা পরিষ্কার করিতে বলিল, কাল থেকে মাকে আর ভেজিটেবল ডিস্ সাজাতে হবে না।

—কেন? আমি যখন ভেজিটেরিয়্যান—

—কিন্তু ঐ ভেজিটেবল চপখানার দুর্গতি দেখে তিনখানা মাছের চপ এনে আপনার ডিসে দিয়েছিলুম, তা বুঝি টের পান নি?

—মাছের চপ? আমার ডিসে? মছ্‌লী, বাঙালীরা না তারিফ ক'রে খায়? কি সর্ব্বনাশ!

—বা-রে! আপনিও ত তারিফ করে খেলেন, আর খেয়ে যে খুশী হয়েছেন, আপনার মুখ দেখেই তা বোঝা গেছে!

—কাজটা ভারি অন্যায় হয়েছে, আমি মিসেস ফ্লাওয়ার্সের কাছে নালিশ করব।

মুখখানি ম্লান করিয়া এলাই কহিল, তার মানে—মায়ের কাছে আপনি আমাকে বকুনি খাওয়াবেন, এই ত? কিন্তু এই বয়সে মেয়েরা বকুনি খেলে কি করে তা বোধ হয় আপনার জানা নেই?

পিনাকী নির্ব্বাক দৃষ্টিতে মেয়েটির ম্লান মুখখানির দিকে চাহিল, অমনি তাহার ছলছল চোখ দুটির সহিত পিনাকীর অর্থপূর্ণ দৃষ্টির সংযোগ ঘটিল। এলাই তাহার কণ্ঠের স্বর গাঢ় করিয়া কহিল, মার কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করবার আগে আপনি আমাকে খানিকটা পটাসিয়াম সায়োনাইড আনিয়ে দেবেন, এইটুকুই আমার রিকোয়েষ্ট।

সভয় বিস্ময়ে পিনাকী কহিল, সর্ব্বনাশ! অন্যের ওপর রাগ ক'রে আপনি হিংসাকে প্রশ্রয় দেবেন? আপনার আত্মাকে হত্যা করবেন?

মিস্ এলাই কহিল, এ ছাড়া আর উপায় কি?

পিনাকী দৃঢ়স্বরে কহিল, উপায় আছে। হিংসাকে ঠেকাবার জন্য আমি করব আত্মত্যাগ, আপনাকে আত্মহত্যা করতে হবে না। অহিংসার খাতিরে আমার আহার সম্বন্ধে যা-কিছু বিধিনিষেধ, আজ থেকেই আমি সে সব ভুলে দিলুম।

ছেলেরা উল্লাসের সুরে সমস্বরে কহিয়া উঠিল—ব্রাভো! Birds of a feather flock together.

পিনাকী ভাবিল, তাহার এই আত্মত্যাগে অহিংসার জয় হইল। ছেলেরা জানিল, তাহাদের চক্রান্তই জয়যুক্ত হইল।

সভাভঙ্গ

শ্রীমতী গীতা দেবী আচার্য্য চৌধুরী

ভাঙ্গল চাঁদের বিদায়সভা,
পূর্ব্বালোকের আভাস পেয়ে,
মন-ভুলান আকুল সুরে
কি গান তারা যায় যে গেয়ে!
ব্যথায় ভরা মালাখানি
কণ্ঠ 'পরে দিল আনি,
গ্রহতারার বিদায়বাণী
ছড়িয়ে গেল আকাশ ছেয়ে।

কোথাও কারা দেয় না সারা
সুপ্ত নিশার স্বপনঘোরে,
তখন চাঁদের বিশ্বসভা
সুদূর অসীম গগন পরে।
তখনো ত হয়নি সারা,
যায় নি নিভে গ্রহতারা,
বিগলিত জ্যোৎস্নাধারা,
রূপের আলো পড়্ছে ঝরে'।

সভা যখন ভাঙ্ল তখন
জাগল করুণ বিদায়গীতি,
তখনো তার আভাস ছিল
কতই মধুর মিলনস্মৃতি।
চাঁদের তরী ভেসে ভেসে
চলেছে কোন্ সুদূর দেশে,
মোদের দেখে হেসে হেসে
রেখে গেল নীরব প্রীতি।

ভাঙ্ল ঘুম জাগল ধরা
তরুণ রবির পরশ নিয়ে,
নিভল ধীরে আকাশবাতি
চাঁদের সভা ভেঙ্গে দিয়ে।
মরণ-ঘুমে ছিল যারা
স্বপন-ঘোরে আপনহারা,
জাগরণের পড়্ল সাড়া
তারা গেল বিদায় নিয়ে।

জৈব রসায়নের জন্ম ও গঠন

শ্রীসুবর্ণকমল রায়

১৮২৮ সন রাসায়নিক-জগতে এক চিরস্মরণীয় বৎসর। ঐ বৎসর রাসায়নিক সর্ব্ব প্রথম জীব ও উদ্ভিদ জগতে প্রবেশ লাভ করেন। তাহার পূর্ব্বে উহারা কেবল অজৈব (Inorganic) রসায়নে আবদ্ধ ছিলেন। এ পর্য্যন্ত উহাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, মনুষ্য, জীবজন্তু ও উদ্ভিদ গঠন-প্রক্রিয়ায় একটি প্রাকৃতিক শক্তি খেলা করে, মানুষের সাধ্য কি উক্ত রহস্য উদ্ঘাটন করে! বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক মহাত্মা উলার (Wohler) (১৮০০—১৮৮২) উক্ত আজন্ম বদ্ধমূল ধারণায় কুঠারাঘাত করেন। তিনিই ১৮২৮ খৃঃ ২৮ বৎসর বয়সে ইউরিয়া (Urea) নামক রাসায়নিক জৈব (Organic) পদার্থটি গবেষণাগারে তৈয়ার করেন। ইউরিয়া মূত্রের মধ্যে বর্ত্তমান, অর্থাৎ ইহা জীবশরীরজাত। উলার মহা আশ্চর্য্য হইলেন—এমোনিয়া সায়ানেট (Ammonia Cyanate) নামক একটি সাধারণ অজৈব পদার্থকে তিনি কি বলিয়া জৈব পদার্থে পরিণত করিলেন? যে জিনিস সজীব শরীরের উপকরণ, তাহা আবার অজীব পদার্থের দ্বারা তৈয়ার হইল—বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার। তিনি নিজেকেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। টেষ্ট টিউব বিকার (beaker), ফ্লাস্ক (flask)-এর এতই প্রতিপত্তি! প্রাকৃতিক শক্তি আর্জ রসাগারে আবদ্ধ হইল! তিনি ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু সেদিন সত্য সত্যই জৈব (Organic) ও অজৈব (Inorganic) রাজত্বের ভেদাভেদ ঘুচিয়া গেল। দুইটিই এক রাসায়নিক আইন-কানুনের আওতায় আসিয়া হাত-ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইল। উলারের রাসায়নিক প্রতিভা পৃথিবীর এক বিরাট অদৃশ্য রহস্যভেদ করিয়া ফেলিল। উহার পরে আজ একশত বৎসরব্যাপী যে কর্ম্মসাধনা চলিয়াছে তাহাতে তিন লক্ষের উপর জৈব পদার্থ একমাত্র রসায়নাগারেই তৈয়ার হইয়াছে। পণ্ডিত উলারের হাতে ভগবান চাবিকাঠিটি দিয়াছিলেন—তিনি নূতন রাজ্যের দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন, বৈজ্ঞানিক-জগৎ দলে দলে প্রবেশ লাভ করিল। আজ রাসায়নিক অভিধানে স্থান সঙ্কুলন হয় না—গ্রন্থপ্রণেতা যত পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করেন তত জৈব পদার্থ আসিয়া দলে দলে ভিড় করিয়া দাঁড়ায়, উহাদের স্থান দিতে হইবে। গ্রন্থকার মিষ্টার গেমেলিন সত্য সত্যই একদিন ভগ্নহৃদয় হইয়া বলিয়াছিলেন, "অয়ি রাসায়নিকগণ, এখন ক্ষান্ত হও, আমার পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় যে আজও পৌঁছিতে পারিলাম না!" জার্মান বৈজ্ঞানিক গ্রন্থকার বাইলষ্টিন রসায়নের জন্য দুইখানি পুস্তিকা রচনা করেন, তাহা উলারের পরে একশত বৎসরের মধ্যে তেইশখানা বিশাল পুস্তকে পরিণত হয়।

উলার ইউরিয়া তৈয়ার করিয়া একটা নূতন রাসায়নিক সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটা সুন্দর গঠন-সূত্র আবিষ্কার করিলেন। একই সংখ্যক ইট কাঠ ইত্যাদি দ্বারা বসাইবার ভঙ্গি বদলাইয়া যেমন বিভিন্ন আকারের ইমারত তৈয়ার করা যায়, সেইরূপ একই সংখ্যক বিভিন্ন পরমাণু দ্বারা বসাইবার রকম বদলাইয়া একের অধিক রাসায়নিক পদার্থ তৈয়ার হইতে পারে, এ কথার যথার্থতা উলার উপলব্ধি করিলেন।

এদিকে ঐ সময় জার্মানীর একজন ধুরন্ধর পণ্ডিত উলারের পিছনে আসিয়া দাঁড়ান। ইনি মহাত্মা লিবিগ, (১৮০৩—১৮৭৩) জার্মানীর গেসেন (Gassen) গবেষণাগারে জৈব রসায়ন সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করেন এবং কয়েকজন বিখ্যাত ছাত্র উহার পতাকাতলে আসিয়া দাঁড়ায়। ইনিই ক্ষেত্রের উর্ব্বরতার জন্য সর্ব্বপ্রথম অজৈব পদার্থ ব্যবহার করেন; আজও তাহার ঐ পন্থা অনুসরণ করিয়া সকলেই সফলকাম হইতেছেন। উহাকে বর্ত্তমান জীব-রসায়নের জনক বলা যায়। এই দুইটি রাসায়নিক রসায়নে নূতন প্রাণ দান করিলেন। ইহাদের আর একটি দান র‍্যাডিকাল। পদার্থগুলি বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, উহাদের গঠন ভঙ্গিতে কতকগুলি পরমাণু স্থানে স্থানে সঙ্ঘবদ্ধ অবস্থায় থাকে, ঐ সঙ্ঘ সহজে বিভক্ত হয় না; অথচ উহাদের নিজেদের কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। উক্ত সঙ্ঘগুলিকে উহারা র‍্যাডিকাল নামে অভিহিত করেন।

ইহাদের সমসাময়িক কালে ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক ডুমাস্ (Dumas) প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ডুমাস্ ছিলেন একজন রাজনৈতিক ও রাসায়নিক। তিনি দেখিলেন, মোমের রাসায়নিক গঠনে হাইড্রোজেন আছে, সেই হাইড্রোজেনকে ক্লোরিন দ্বারা স্থানচ্যুত করা যায়। এই আবিষ্কার সুইডিস বৈজ্ঞানিক বার্জিলিয়াসের একটি নামকরা সূত্রের মূলে কুঠারাঘাত করে। ঐ একই বৎসর ইটালিয়ান পণ্ডিত ও বাগ্মী কালিজারো মহাত্মা এভোগাড্রোর প্রকল্পের (hypothesis) সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং আর একজন জার্মান ধুরন্ধর প্রথিতযশা কেকেউলী (১৮২৯—১৮৯৬) জৈবরসায়নের প্রধান সমস্যা—উহাদের গঠনভঙ্গি হইতে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দান করিয়া থাকেন। জৈবরসায়নে কেকেউলীর দান অতুলনীয়। তিনিই প্রথম বলেন, জৈব পদার্থগুলির প্রাণ ঐ অঙ্গার পরমাণুগুলি। কল্পনা রাজ্যের সম্রাট কেকেউলী বলিলেন, জৈব পদার্থগুলি গঠনভঙ্গিতে অঙ্গার-পরমাণুগণ প্রায়শঃ হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। জৈব পদার্থের রাসায়নিক গঠনে উহাই মস্ত বড় বৈশিষ্ট্য। অঙ্গার পরমাণুগুলি হাত ধরাধরি করিয়া যখন দাঁড়ায়, তখন সুন্দর সুন্দর নানা প্রকার আকৃতিবিশিষ্ট শৃঙ্খল তৈয়ার হইয়া পড়ে। এজন্যই জৈব পদার্থের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জটীল গঠন দৃষ্ট হয় যাহা এতদিন বৈজ্ঞানিক কল্পনার

অতীত ছিল। অজৈব রসায়নে এ ধারা—রাসায়নিক সংঘটন-ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট হয় নাই, কাজেই কেকেউলী-উলার প্রভৃতি জৈব পণ্ডিতগণ সত্য সত্যই এক আশ্চর্য্য নূতন রাসায়নিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কেকেউলী সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "কোন সুন্দর গ্রীষ্ম বৈকালে আমি শেষ বাস্‌খানায় বাড়ী ফিরিতে-ছিলাম, তখন লণ্ডনের রাস্তা প্রায় জনশূন্য। বসিয়া বসিয়া আমি এক স্বপ্ন সাগরে ডুবিয়া গেলাম। বাঃ, আমি দেখিলাম পরমাণুগুলি আমার সম্মুখে নৃত্যপরায়ণ। অনেক দিন আমি উহাদের চঞ্চলতার কথা ভাবিয়াছি, কিন্তু এখানে উহাদের চঞ্চলতা বা গতির নমুনা দেখিয়া অবাক হইলাম। দেখিলাম, ছোট ছোট পরমাণুগুলি জোড়া হইয়া যাইতেছে, বড়গুলি ছোট জোড়াগুলিকে ধরিতেছে এরূপ জড়াজড়ি করিয়া উহারা নাচানাচি আরম্ভ করিয়াছে। আবার দেখি, বড় বড় পরমাণুগুলি হাত ধরাধরি করিয়া নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খল রচনা করিতেছে, ছোটদের আশে পাশে বাঁধিয়া রাখিতেছে। হঠাৎ যান-চালকের ডাকে আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। বাড়ী পৌঁছিয়া আমি স্বপ্নের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। এ সময় কেকেউলী কার্য্যব্যপদেশে লণ্ডনে আসিয়াছিলেন এবং ক্লাপহাম রোডে বাস করিতে-ছিলেন। তাহার উক্ত স্বপ্ন হইতেই আমরা শৃঙ্খল গঠন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাইয়া থাকি। অঙ্গার পরমাণুগুলি হাত-ধরাধরি করিয়া ছোট-বড় অনেক প্রকার শৃঙ্খল তৈয়ার করিতে পারে। নিম্নে একটি নমুনা দেওয়া গেল—

$$\begin{array}{ccccccc} & & H & & H & & H \\ & & | & & | & & | \\ H & — & C & — & C & — & C & — H \\ & & | & & | & & | \\ & & H & & H & & H \end{array}$$
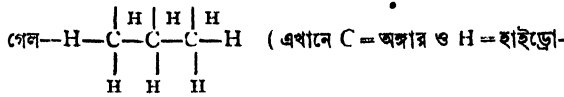
(এখানে C = অঙ্গার ও H = হাইড্রোজেন)। অঙ্গারের চারিটি হাত বা ভ্যালেন্সি (valency)। ঐ হাত দ্বারা উহারা সুন্দর হাত-ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়াছে, অবশিষ্ট হাত দ্বারা হাইড্রোজেনকে ধরিয়াছে। হাইড্রোজেনের পরিবর্ত্তে অপর কোন র‍্যাডিকেলও উহারা ধরিতে পারে। এরূপ তিনটি, চারিটি, পাঁচটী, ছয়টি ··· ও বেশীসংখ্যক অঙ্গারশৃঙ্খল বিশিষ্ট জৈব পদার্থ প্রভৃতির রাজ্যে বহু পাওয়া যায়। এ হেন হাইড্রোজেন অঙ্গার-যোগিকগণই (হাই-ড্রোকার্ব্বন) আমাদের পেট্রোল, প্যারাফিন (Paraffin), কেরোসিন, বেঞ্জিন (Benzene) নামে পরিচিত।

অঙ্গার পরমাণুগুলি সব যৌগিকে সরলভাবে হাত ধরিয়া দাঁড়ায় না—দাঁড়াইবার ভঙ্গির বা শৃঙ্খলের আবার বৈচিত্র্য আছে। যেমন—ঐ ষষ্ঠ ভুজ শৃঙ্খলটির বহু প্রতিপত্তি আছে। মহাত্মা কেকিউলীই এরূপ অদ্ভুত শৃঙ্খল গঠনের আবিষ্কর্ত্তা। ইহাও তাহার একটি স্বপ্নের রূপ। তিনি যখন জার্ম্মেনীর ঘেণ্টে (Ghent) অধ্যাপক ছিলেন, তখন আর একটি স্বপ্ন দেখেন। তিনি নিজে লিখিয়াছেন, "আমি আমার টেবিলে একটি পাঠ্য পুস্তকপ্রণয়নে নিবিষ্ট ছিলাম, আমার কাজ মোটেই অগ্রসর হইতেছিল না, আমার চিন্তা অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল, আমি আমার কেদারাখানা ঘুরাইয়া আগুনের পাশে আনিলাম এবং ঝিমাইতে লাগিলাম। আবার সেই পরমাণুগুলি আমার চোখের সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিল। এবার ছোট দলগুলি দূরে পেছনে থাকিতে লাগিল। আমার মানসিক চক্ষু এ সমস্ত দেখিতে বিশেষ অভ্যস্ত হওয়ায় এবার আমি বড় বড় জটিল গঠনভঙ্গি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিলাম। ঘনসন্নিবেশিত অথচ লম্বা অঙ্গারের সারি, সর্ব্বাকারে ঘুরপাক খাইতেছে, মোচড়াইতেছে। হঠাৎ দেখি একটি সর্প তাহার নিজের লেজ মুখে দিয়াছে এবং ঐভাবে আমার চোখের সম্মুখে ঠাট্টাচ্ছলে ঘুরিতেছে। বিদ্যুৎ চমকে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং এবারও আমি অবশিষ্ট স্বপ্নটি লিপিবদ্ধ করিতেই কাটাইয়া দিলাম।" এই দ্বিতীয় স্বপ্ন হইতে কেকিউলী ধীরে ধীরে তাঁহার বেঞ্জিনের ষষ্ঠভুজ অঙ্গুরীয়-গঠন বিকাশ করেন (১৮৬৫)। বেঞ্জিনের উক্ত রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কেহ দ্বিমত প্রকাশ করিতে পারেন নাই, সময়ও উহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে।

এস্থলে গঠনভঙ্গি সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিয়া এ যাত্রা আমার বক্তব্য শেষ করিব। মনুষ্য শরীর কতকগুলি হাড়, মাংস, পেশী ধমনীর সমষ্টি। উহাদের আভ্যন্তরীণ গঠন কিরূপ, ডাক্তারগণ অনেকটা খবর রাখেন—আমরা সাধারণ লোক মাত্র—উপরের চেহারা দেখিয়াই সুখী, কোথায় কোন হাড়টি, কোন মাংসটি, কোন পেশীটি আছে তাঁহারা তাহা বলিয়া দিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে শরীরাভ্যন্তরের হাড় মাংসের আকারভঙ্গি উহারা জানেন। সেরূপ বস্তুমাত্রই মৌলিক পরমাণুর সমষ্টি। সেখানে উহারা যদৃচ্ছা বসিয়া থাকে না, তাহাদের মধ্যেও বসবাস করিবার একটা শৃঙ্খলা বা ভঙ্গি আছে। বস্তুজগতে পরমাণুগুলি কি ভঙ্গিতে আছে তাহা কেকুলির মত রাসায়নিক ডাক্তারগণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। আজ উঁহারা বলিতে পারেন, বেঞ্জিনের নেপথালিন, কেরোসিন, চিনি, লবণ, জল প্রভৃতির পরমাণবিক অঙ্গভক্তি কিরূপ।

অনুকর্ষ

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

৭

বিস্তৃতহৃদয়া নদী বহিয়া যাইতেছে, কূলে একটি অর্দ্ধ-শহর বা জেলার মহকুমা। একখানি নৌকা আসিয়া নদীর কূলে ভিড়িলে দুইটি উদাসীন মূর্ত্তি তটে অবতরণ করিলেন। এক জন অতি তরুণ, কিশোর বলিলেও চলে, অন্যটি পূর্ণ যুবা। উভয়েরই বৈষ্ণবের বেশ! কিশোরটি বয়োজ্যেষ্ঠকে বলিলেন, 'এ যে শহরে এনে ফেল্‌লেন ব্রহ্মচারী! এইখানে আপনার গুরুদেবের বাস? এত লোক সংঘটের মধ্যে?'

'গিয়ে দেখ্‌বে চল, এই লোকালয়েও কেমন সব ব্যক্তি বাস করেন। তোমার সঙ্গীত আর সুরের দিকে যে রকম ঝোঁক, তাঁকে পেয়ে তুমিও সুখী হবে, আর তাঁকেও তোমাকে একটু পাইয়ে দিই। আমি তো তাঁর উপযুক্ত শিষ্য হ'তে পারিনি।'

'রক্ষা করুন, ও রকম কথা বললে আর আমি একপাও এগোবো না!"

'কি কর কমলাক্ষ! চল, ভাল, আর কিছু বল্‌ব না।'

'মনেও ভাব্‌বেন না বলুন! মনে পাপ থাক্‌লেই কোন সময়ে প্রকাশ পাবে।'

'আচ্ছা তাই হবে, চল!'

উভয়ে অনতিবিলম্বে একটি গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ—ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত যুবক, অগ্রসর হইয়া কাহার নাম ধরিয়া আহ্বান করিতেই একটি সুদর্শন যুবক বাহির হইয়া আসিল এবং ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া সহর্ষে 'আসুন দাদা, কতদিন পরে' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে করিতে সঙ্গের তরুণটিকে দেখিয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল—পৌর্ণমাসী বা প্রতিপদের চাঁদ প্রভাত অরুণোদয়ে যেমন মুগ্ধ ও রুদ্ধগতি হইয়া ক্ষণকাল পশ্চিমাকাশে দাঁড়ায়। ব্রহ্মচারী বুঝিয়া সহাস্যে বলিলেন, 'এটি আমার ছোট ভাই বলেই জেন। বাবাকে দর্শন করাতে এনেছি।'

'আসুন আসুন' বলিয়া যুবক ব্যস্তভাবে অভ্যাগত-দিগকে পথ দেখাইয়া অগ্রসর হইল এবং গৃহমধ্যস্থ একটি কক্ষমধ্যে পৌঁছিল। সেখানে একজন বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি উপবিষ্ট, ব্রহ্মচারী তাঁহার নিকটস্থ হইয়া আভূমি নত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বয়ঃকনিষ্ঠও প্রণাম করিতে করিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ যেন একবার চমকিত হইয়া উঠিল। বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া নিকটে বসিতে বলিলেন।

গম্ভীর প্রশান্তমূর্ত্তি! শ্বেত কেশজাল স্কন্ধ বহিয়া প্রায় পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিতেছে, শ্বেতশ্মশ্রুতে বক্ষোদেশও আচ্ছন্ন। কারুণ্যপূর্ণ চক্ষু দুটিতে কি যেন একটি আলো মাঝে মাঝে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আবার তখনই ক্ষেত্র দুটিকে স্নেহ তরলতায় ভরিয়া দিতেছে। কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, গৈরিকবাসে আবৃত দিব্য তেজোময় অবয়ব! নবাগত তরুণ স্থিরচক্ষে সেই মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিলেন। বর্ষীয়ান্ ব্রহ্মচারীকে কুশল প্রশ্ন করিয়া প্রীত সহাস্যমুখে তরুণের দিকে লক্ষ্য করিয়া শিষ্যকে প্রশ্ন করিলেন, 'এ বস্তুটিকে কোথায় পেলে বাবা? আজ প্রভাতকে সুপ্রভাতই বল্‌তে হবে, যে প্রভাতে আমাদের গৃহে এমন অরুণের উদয়!'

ব্রহ্মচারী নতমুখে বলিলেন, 'কিছুদিন হ'তেই এঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।'

'বাবাজীবনের কি এর মধ্যে দীক্ষাও হয়েছে নাকি?'

'না প্রভু। ইনি সম্প্রতিই গৃহত্যাগ করেছেন। এর পূর্ব্বে নিবাস যে গ্রামে ছিল, কয়েক বৎসর সেই স্থানে যাতায়াতেই এঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। ইনি মহাত্মা দর্শনে উৎসুক, তাই শ্রীচরণে উপস্থিত করিয়েছি।'

'বয়স অতি অল্প, তাতে এই অলোকসামান্য রূপ! দীক্ষা যদি না হয়েছে তবে এই বৈষ্ণবের বেশ কে দিলে?'

'এঁর গৃহস্থাশ্রমই বৈষ্ণবাচরণের অনুকূল ছিল। সে গৃহে বিষ্ণু বিগ্রহসেবা নিত্য নিয়মিত, এঁর মন এবং সংস্কারটিও সেইভাবে অনুপ্রাণিত বুঝে পথে বার হবার সময় এই বেশই উপযুক্ত বলে আমরা মনে কর্‌লাম।'

প্রবীণ ব্যক্তি ঈষৎ যেন চিন্তা করিয়া অম্লান প্রফুল্লমুখেই

বলিলেন, 'তোমার বৈষ্ণবী দীক্ষার গুরুদেবের কাছেই আগে একবার নিয়ে গেলে না কেন? তাতেই বোধ হয় এঁর বেশী উপকার হ'ত। প্রথম জীবনের আরম্ভে ভাবের অনুকূল পুষ্টিই সমধিক প্রয়োজনীয়।'

তরুণ উদাসীন এতক্ষণ নত মস্তকেই বসিয়াছিলেন, এইবার মুখ তুলিয়া বক্তার দিকে চাহিলেন। যেন প্রভাতের আলোকে রক্ত কোকনদ ফুটিয়া উঠিল। নয়ন কমল ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া বক্তার উদ্দেশে ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত বলিতে লাগিলেন, 'আমি কোন ভাবকেই এখনো দৃঢ় ক'রে অনুভব করতে পারিনি প্রভু। আমার এ বেশ নিতান্তই একটি বেশ মাত্র। উনিই এ বিষয়ে আমার পরামর্শদাতা।'

বর্ষীয়ান প্রীতভাবে বলিলেন, 'কণ্ঠস্বরটিও আকৃতির অনুরূপ! এ বেশটি তোমার আকৃতির অনুরূপই হয়েছে বাবা, এ বিষয়ে আমাদের ব্রহ্মচারীর বেশ রুচি আছে। আমি যেন সম্মুখে তরুণ নবদ্বীপচন্দ্রকেই দেখ্‌ছি।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উভয়হস্ত জোড় করিয়া ললাটের উপর ধরিলেন, শ্রোতারাও সেই সঙ্গে সেইরূপ ভাবে প্রণত হইল। তরুণ উদাসীনের আরক্ত আভাময় শুভ্রোজ্জ্বল মুখ দ্বিগুণ আরক্ত হইয়া তাহা হইতে কুণ্ঠিতভাবে এই কথা কয়টি মাত্র বাহির হইল, 'আমি জানি, আমি এ বেশের নিতান্তই অনুপযুক্ত।'

'না বাবা, হয় ত তুমিই এ বেশের উপযুক্ত! লক্ষণই যে তোমার অনন্যসাধারণ!' তরুণ উদাসীন ব্রহ্মচারীর পানে চাহিলেন। যেন তাঁহার নয়নসঙ্কেতেই প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'এঁর যিনি প্রতিপালক, তিনি অতি মহদাশয় গূঢ় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন! তিনি নাকি আদর ক'রে শৈশবে এঁকে বলেছিলেন যে, 'এই কপালে এই নাসিকায় তিলক দিয়ে বৈষ্ণবের বেশ কেমন দেখায় দেখ্‌তে আমার এক একবার সাধ হয়!' এঁর মুখে সেই কথা শুনে তাঁর নিষ্ক্রমণের সময় সেই বেশ ধরাই আমার উচিত মনে হয়েছিল।'

গৃহস্বামী একইভাবে প্রসন্নমুখে বলিলেন, 'এরা যে বেশ ধরবে সেই বেশই ধন্য হয়ে যাবে, সুন্দরতর হয়ে উঠ্‌বে, এমনি লক্ষণযুক্ত এঁর মূর্ত্তি! তবে এই কথার সঙ্গে এ বেশের যৌক্তিকতা আছে বটে! বাবার নামটি কি?'

'কমলাক্ষ!'

'নামটিও তেমনি, কিন্তু মাত্র একটি বিশেষণে তো সবটা বলা হ'ল না এঁর, সর্ব্বাঙ্গই যে কমলে গঠিত, অথচ তার মধ্যে বজ্রাদপি কঠোর প্রাণের অস্তিত্বও প্রকাশ পাচ্চে। এঁর প্রতিপালক জীবিত অবস্থাতেই কি ইনি গৃহত্যাগ করে এলেন?'

তরুণকে একটু বিচলিত হইতে দেখিয়া ব্রহ্মচারী সংক্ষেপে 'না' মাত্র বলিয়া একথার উপসংহার করিতে চাহিলেন। তরুণ একটু অগ্রসর হইয়া জোড়হস্তে বর্ষীয়ান্‌কে বলিলেন, 'প্রভুকে কি এর আগে আমি কখনো দেখেছি?'

গৃহস্বামী ঈষৎ বিস্মিত এবং ব্যগ্রভাবে তাঁহার দিকে সরিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, 'কই, না বাবা, তোমাকে কখনো দেখার আনন্দলাভ করেছি বলে তো মনে হয় না! তা হ'লে কি তা ভুলতে পারতাম! আমাকে 'প্রভু' কেন বল্‌ছ বাবা! দেখ্‌ছ তো আমি গৃহী! মনের সাধ মেটাবার জন্যই গৈরিকখানা পরেছি মাত্র।'

'আপনাকে এ সম্বোধন আপনা হ'তেই আমার মনের মুখে আস্‌ছে! শৈশবকালে অর্থাৎ—সাত-আট বৎসর পূর্ব্বে আপনারই মত একজন মহাপুরুষের ক্ষণিক সঙ্গলাভ অদৃষ্টে ঘটেছিল। এমনি মহাদেবের মত মূর্ত্তি, তবে আপনার অপেক্ষা তিনি যেন একটু খর্ব্বাকার ছিলেন মনে হচ্চে। তাঁকে আমি মনে মনে কেবলই খুঁজি! তিনি যেন আমায় পুনর্দর্শনের আভাসও দিয়েছিলেন এমনি আমার মনে হয়!'

'না বাবা, দেখ্‌ছই তো আমি পুত্রকলত্রযুক্ত গৃহী! চিরদিন একস্থানেই বদ্ধ। যাক্, তোমরা পথশ্রমে ক্লান্ত, আমার ভাগ্যে যখন এ গৃহে অতিথি হয়েছ তখন আশা করি কিছুদিন আমার কাছে থাকবে! কি বল ব্রহ্মচারী, আপত্তি নাই তো কিছু?'

ব্রহ্মচারী জোড়হস্তে মাথা নত করিয়া উত্তর দিলেন, 'প্রভুর অনুগ্রহ।'

বর্ষীয়ান্ একটু জোরের সহিত হাসিয়া উঠিলেন, 'তোমার এই নবীন বৈষ্ণব-জীবনের বিনয়ের জ্বালায় তো আর বাঁচি না। ও জিনিষটা আমাদের বাবাজী মশায়দের জন্য রেখে আমার সঙ্গে তুমি ও তোমরা আমার সন্তানের মতন ব্যবহারেই চল!'

ব্রহ্মচারী পুনশ্চ সেইভাবেই উত্তর দিলেন, 'সন্তানও কি

বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে শিষ্যোচিত ব্যবহারেই পিতার কাছে চল্‌বে না ?'

'কিন্তু সদাসর্ব্বদার সঙ্গে তা কি ঘটে ?'

'দাস তো অনেকদিনই শ্রীচরণ ছাড়া !'

'তোর কাছে আমি হার্‌লাম বাবা! যা এখন আমাদের এই নতুন ধনটিকে আদর যত্ন কর্।' পুত্রের দিকে চাহিয়া আদেশ দিলেন, 'এঁদের ভিতরে নিয়ে উপযুক্ত পরিচর্য্যাদি কর।'

পূর্ব্বোল্লিখিত যুবক এতক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ইঁহাদের বাক্যালাপ শুনিতেছিল। এইবার আনন্দপূর্ণ মুখে অগ্রসর হইয়া তরুণ উদাসীনকে হস্তে ধরিয়া আসন হইতে তুলিলেন এবং ব্রহ্মচারীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'দাদা, উঠুন !'

'ওঁকে নিয়ে তুমি যাও ভাই, আমি একটু পরে যাচ্ছি।'

অল্পক্ষণেই উভয় তরুণের মধ্যে যেন একটি বিমল সখ্যভাব স্থাপিত হইয়া গেল। গৃহস্বামীর পুত্র একটু বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও অপেক্ষাকৃত তরুণের গাম্ভীর্য্যেই এ সখ্যভাব কিছুমাত্র বিসদৃশ বোধ হইল না। বহু কথোপকথনের মধ্যেই তরুণ উদাসীনের স্নানাদি শেষ হইলে একটি ক্ষুদ্রতর কক্ষের নিকটে লইয়া গিয়া গৃহস্বামীর পুত্র বলিলেন, 'এই ঘরে বাবা স্বরসাধনা করেন। এইখানে তাঁকে শিবশ্যামা দর্শন দেন্ !'

উভয় মস্তক একসঙ্গে সেই গৃহের দ্বারদেশ স্পর্শ করিল।

৮

প্রদোষে সেই কক্ষমধ্যে কথোপকথন চলিতেছিল।

'বাবা কমলাক্ষ ! কি আনন্দেই যে আছি এ ক'দিন ! জানি তুমি চিরদিন আমার কাছে থাকবে না, কোন বন্ধনই তোমায় হয় ত বাঁধ্‌তে পারবে না, তবু মনে হয় আর কিছুদিন থাক।'

'ঠাকুর, অনেক দিনই তো হ'ল ! এ আনন্দের স্মৃতি হয় ত চিরকালই আমার মনে থাক্‌বে, তবু তো একদিন এর শেষ হবেই, একদিন—'

'যেতে তো হবেই—এই কথা বল্‌তে চাও ? সে তো একদিন সব জিনিষের শেষ আছেই, কিন্তু আমি ভাব্‌ছি, তুমি যে আমার কাছে এলে আমি তোমায় কি দিলাম !'

'অনেক, অনেক। সে কথা তো আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না, তা ছাড়া দাদাদের স্নেহে আদরে—'

বলিতে বলিতে তরুণ উদাসীন যেন নিজ মনেই একটু চমকিয়া উঠিলেন ; কিন্তু গৃহকর্ত্তা তাহা লক্ষ্যমাত্র না করিয়া বলিয়া চলিয়াছেন, 'সন্ধ্যাটা বড় আনন্দেই কাটে, সে আনন্দ-মেলাটা ভঙ্গ হ'য়ে যাবে।'

'ঠাকুর, আপনার সে আনন্দ তো কারও অপেক্ষা রাখে না। আমি আমার এই অনুভবটি অনুচার্য্যই রাখ্‌তে চাইছি। আপনার এই নিত্যকার সাধনায় আমার মত ব্যক্তিকেও যে সঙ্গী করেছিলেন এ সৌভাগ্য কখনো ভুলব না। সাক্ষাৎ মহাশিবের স্বর-সাধনানন্দই যে আমাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়েছেন।'

গভীর আবেগভরা দৃষ্টিতে তরুণের মুখের পানে চাহিয়া বর্ষীয়ান্ বলিলেন, 'না না, তোমাকে দিয়ে যে আমার সাধ মেটেনি, কমলাক্ষ ! মনে হয়, বুকটা উজাড় ক'রে যা আমার আছে সব তোমায় ঢেলে দিই।'

তরুণের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, দেহ যেন ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল, তখনই সে ভাবটিকে সংযত করিয়া অকম্পিত স্বরে উদাসীন বলিলেন, 'আপনার এমনি কৃপার অনুভব পেয়েই আমার মন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ছে যে ! আপনার এই স্নেহে আমার পূর্ব্বজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বন্ধনের কথাই কেবল মনে আসে, আপনার আলিঙ্গনের মধ্যে সেই বক্ষের সাদৃশ্য অনুভব ক'রেই আমি চমকিয়া উঠি, মনে হয়—আপনি ত্যাগ করলেও বুঝি এর পরে আমি আর যেতে পারব না, তাই—'

'তাই তুমি এ বন্ধনকেও শীঘ্র কাটতে চাও ! বাবা, তোমার কথা ব্রহ্মচারীর মুখে কিছু কিছু শুনেছি। সংসারে যা লোকে কামনা ক'রে তোমার তা এমন প্রচুর ছিল যে তাই নাকি তোমার বিরক্তির কারণ হ'য়ে উঠেছিল ! রাজবেশ ছেড়ে তুমি চীরখণ্ড প'রে আনন্দে অধীর হয়েছ ! ভিক্ষান্নে তোমার পরমানন্দ ! আমার মনে হয়েছিল তোমাকে কাশী যেতেই পরামর্শ দিই, কিন্তু—'

'আমারও তাই ইচ্ছা, কিন্তু প্রভু কি আমাকে তার অনুপযুক্ত মনে করেন ?'

'অনুপযুক্ত ! যাঁদের যথার্থ বেদান্ত পাঠের অধিকার আছে, তোমাতে তাঁদেরই সহধর্ম্মিত্ব আমি লক্ষ্য করেছি। এই সুতীক্ষ্ণ মেধা, এই বয়সে এতখানি শাস্ত্রজ্ঞান, তার

উপরে বৈরাগ্য! এই মাথায় সেই ব্রহ্মদর্শন যে কি ভাবে স্ফুরিত হবে সে শোভা দেখার বড়ই সাধ জন্মাচ্ছিল। তোমার অভিভাবক তোমায় মালা তিলকধারী বৈষ্ণববেশে দেখার ইচ্ছা জানিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, তোমায় কাষায় বস্ত্রপরা মাথা মুড়ানো যতির বেশে দেখি। এই 'ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল' দেহের সে শোভা আমি কল্পনার চোখে দেখেও আত্মহারা হই। সাধে কি সেদিন শ্রীচৈতন্যপ্রভুর নাম তুলনার স্থলে মনের মুখে এসেছিল? তুমি কুণ্ঠিত হয়ো না—আর তোমার সাক্ষাতে উচ্চারণ করব না—মনেই থাক্।' বলিয়া বর্ষীয়ান সস্নেহে হাসিলেন।

তরুণ উদাসীন জোড়হস্তে নতমুখে বলিলেন, 'আশীর্ব্বাদ করুন। কিন্তু তবুও অন্য কিছু যেন বল্‌তে চাচ্চেন মনে হচ্চে? আদেশ করুন অসঙ্কোচে!'

'আদেশ নয় কমলাক্ষ! ভাব্‌ছি। শুন্‌লাম তুমি ভিক্ষা আহরিত কদন্ন নারায়ণকে নিবেদন করতে গিয়ে নাকি এক একদিন চোখের জল ফেল? ক্ষীর সর নবনীত যাঁকে নিবেদন করেছ তাঁকে কদর্য্য অন্ন নিবেদনে ক্লেশবোধ কর! এ ভাবটা যে একটু অন্য বস্তু! তাই আমার এখন মনে হয়েছে, তুমি আমার ব্রহ্মচারী বাবার পরবর্ত্তী গুরুদেব বাবাজী মহাশয়ের কাছে গেলেও মন্দ হয় না! ব্রহ্মচারী আমার কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁর মর্ম্মের অনুকূল বস্তু পান্‌নি, তাই তাঁকে আবার দীক্ষান্তর, সাধনান্তর নিতে হয়েছে। তাই মনে হয়, তোমার এই নবীন সাধনোন্মুখ জীবনে বেশী কিছু হাঙ্গামা না ঘটে! তুমি যেন—'

'ঘটুক, তাতে আমি ভীত নই, তবু যেন যা চরম ও পরম সত্য তা থেকে চরম বঞ্চিত না হই! তার জন্য যত ঝঞ্ঝা, যত হাঙ্গাম ঘটে ঘটুক!'

বর্ষীয়ান্ গভীর আবেগে সহসা উদাসীনকে আলিঙ্গন করিলেন। গাঢ়স্বরে বলিলেন, 'এ উদ্যমের কখনো পরাজয় ঘটে না, এমনি সাহসই তো চাই। এক সত্যই যে ভুবনে কত ভাবে প্রকাশিত হয় তাও যে অনুভব করার প্রয়োজন। আমি যেন দেখ্‌তে পাচ্চি তুমি—' বলিতে বলিতে তিনি সহসা থামিয়া গেলেন। ক্ষণিক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'চল সময় হয়েছে।'

সেই ক্ষুদ্রতর কক্ষে পৃথক পৃথক আসনে তিনজনেই উপবিষ্ট। বর্ষীয়ানের হস্তে একটি বাদ্যযন্ত্র। তাহা হইতে তিনি এক অদ্ভুত শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করিতেছিলেন। এমন শব্দসৃষ্টি শ্রোতারা বোধ হয় কখনও শোনেন নাই, তাই তাঁহারা নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মতই বসিয়া শুনিতেছিলেন। যন্ত্রের অভ্যন্তর হইতে এক অপূর্ব্ব ধ্বনি উঠিয়া কক্ষের আকাশ বাতাসকে এক উদাত্ত গম্ভীর শব্দে পূর্ণ করিতেছিল। গায়কের কণ্ঠ হইতেও তাহার যেন প্রতিধ্বনি জাগিয়া সেই শব্দকে দ্বিগুণ গভীর করিয়া তুলিতেছে। শ্রোতাদের ভাবকণ্টকিত দেহের মধ্য হইতে একটি কণ্ঠ হইতে এই শব্দটি ফুটিল—নাদব্রহ্ম!

ভাবের আবেগে সাধকও সহসা উচ্চারণ করিলেন—'মা—মা!' আবার তিনি সেই শব্দের মধ্যেই যেন ডুবিয়া গেলেন। শ্রোতা দুইজনও নিজ নিজ আবেগে পূর্ণ!

তরুণ উদাসীন সহসা সেই ভাবমগ্নতার মধ্য হইতে নিজেকে টানিয়া তুলিলেন। কণ্ঠকে ঈষৎ পরিষ্কার করিয়া লইয়া বর্ষীয়ানের সঙ্গে স্বর মিলাইতে গেলেন, এই একবার চেষ্টার পরই সেই উদাত্ত কণ্ঠের সঙ্গে স্বর মিলাইতেই সাধকের কণ্ঠ ও যন্ত্র যেন দ্বিগুণ বেগে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়া একটা গভীর ওঁকার ধ্বনিকে অতি পরিস্ফুট করিয়া তুলিল।

এমনই গাম্ভীর্য্যময় পূর্ণতার মধ্যে তরুণের দৃষ্টি সহসা কক্ষের ভিত্তিগাত্রে আকৃষ্ট হইতেই তিনি চমকিত হইলেন। সে গৃহের ভিত্তিতে একখানি অতি সাধারণ চিত্র—একখানি কালিকামূর্ত্তির ছবি বিলম্বিত ছিল। ঠিক্ তাহারই সম্মুখে বসিয়া সাধক তাঁহার সুরসাধনা করিতেন। সেই ছবিখানির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তরুণ উদাসীন দেখিলেন, সে ভিত্তিগাত্র আর নাই, সমস্তই একেবারে খোলা, যতদূর দৃষ্টি পড়িতেছে সব একেবারে শূন্য, দৃষ্টি একেবারে অব্যাহত, আর তাহারই মধ্যে সেই ছবিটি শূন্যেই যেন লম্বিত এবং ক্রমশ বর্দ্ধিত আয়তন হইয়া দুলিতে দুলিতে তাঁহাদের নিকটস্থ হইতেছে। চারিদিকে কি ঔজ্জ্বল্য! তীব্র মধ্যাহ্ন সূর্য্যের আলোকে সব যেন ভরিয়া উঠিয়াছে। সেই আলোকের কেন্দ্রস্থিতা সেই মূর্ত্তি যেন সজীব, যেন মানবের মতই দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্না! বুঝি বাক্‌শক্তিও এখনি স্ফুরিত হইবে, ওষ্ঠে ও অধরে এমনি হাসির আভাস! উদাসীনের মনে হইল যেন চরাচর সমস্তই সেই ছবির সঙ্গে দুলিতেছে।

সাধক এক ভাবেই ওঁকার নাদে মগ্ন রহিয়াছেন, ব্রহ্মচারীও ধীর স্থির মূর্ত্তি! কেহই তো কোন ভাবান্তর

প্রকাশ করিতেছে না, কেবল তাঁহারই কি এই ইন্দ্রজাল অনুভব হইতেছে? উদাসীন যেন নিজের উপরে একটা সচেতনত্বের দৃঢ়তা আনিয়া স্থিরভাবে সেই মূর্ত্তির পানে চাহিলেন। দৃশ্যের কিছুই পরিবর্ত্তিত হইল না, সেই মধ্যাহ্ন রৌদ্রোজ্জ্বল নির্মেঘ নীলাম্বরের মত বর্ণদ্যুতি হইতে সেই অপূর্ব্ব আলোকের সৃষ্টি হইয়া চলিতেছে। সেই আলোতে যেন চরাচর গলিত রৌপ্যধারার মত গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে, তীব্রোজ্জ্বল সে ধারা! তরুণ তাঁহার দৃষ্টিকে সেই নীলোজ্জ্বল বর্ণদ্যুতির মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া সহসা আবিষ্টের মত গাহিয়া উঠিলেন—

"এরূপ কোথায় পেলি নবনীরদবরণি!
তোর ঐ বরণ দেখে (আমার) হৃদয় কাঁপে ভুবনমোহিনী।"

সাধকের যন্ত্র আবার সবেগে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘন গম্ভীর মা মা ধ্বনি গৃহকোণকে পূর্ণ করিয়া তুলিল। ব্রহ্মচারী যিনি এতক্ষণ নিঃশব্দে একভাবেই বসিয়াছিলেন তিনি সহসা কক্ষতলে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে একটি শব্দ ক্ষণে ক্ষণে উচ্চারিত হইতে লাগিল 'নীরদবরণ, নবনীরদবরণ!' তরুণ উদাসীন দেখিলেন, তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, ললাটের শিরাগুলি স্ফীত, সর্ব্বাঙ্গ কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে স্বেদজলে পূর্ণ, ক্ষণে ক্ষণে সে দেহ কণ্টকিত স্তম্ভিত হইয়া উঠিতেছে, চক্ষুযুগল নিমিলিত। সাধক এক ভাবেই শব্দব্রহ্মে লীন, মাঝে মাঝে তাঁর দেহ যেন ঝাঁকিয়া উঠিতেছে, কণ্ঠ হইতে এক একবার সেই 'মা—মা' শব্দ বহির্গত হইতেছে, সম্মুখে সেই আলোক ও আলোক-মধ্যস্থা অপরূপ-মূর্ত্তি!

ব্রহ্মচারীর মুখ ক্রমে শবের মত বিবর্ণ হইয়া উঠিল। বেতসলতার মত কম্পিত দেহ ক্রমে কাষ্ঠ কঠিন, মুখের সেই অর্দ্ধ স্খলিত বাক্য 'নব নীরদবরণ' শব্দও ক্রমে থামিয়া গেল। ব্রহ্মচারী একেবারে সংজ্ঞাহীন।

সকলের এই অবস্থার মধ্যে তরুণ উদাসীন স্থির উন্নত দেহে একমাত্র দ্রষ্টা, একমাত্র সাক্ষীর মত অটলভাবে বসিয়া রহিলেন। ভাবের সমুদ্র তরঙ্গে তরঙ্গে "উথাল পাথাল' হইয়া আবার ক্ষণে ক্ষণে অসীম স্তব্ধতার সঙ্গে ঘন আনন্দের সমাধিতে যেন মগ্ন হইয়া পড়িতেছে, তার মধ্যে তিনিই একায়েক সংসক্ত সম্বিতযুক্ত, যেন সেই সমুদ্রে রাজহংসের মত।...

বহুক্ষণ পরে সাধক উঠিয়া তরুণ উদাসীনকে একটা বেগের সহিতই গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গিত ব্যক্তিকে যেন নিজের অন্তর হইতে নিজেকেই দান করিয়া ফেলিয়া আবিষ্টভাবে বলিলেন—

'তোমায় যিনি পথ দেখাবেন তিনি এখনো তোমাকে খুঁজে পান্‌নি! কোথায় তিনি বুঝি তোমার অপেক্ষাতেই আছেন! নিজেই তিনি তোমায় খুঁজে নেবেন, তুমি নিজের মনে কেবল অগ্রসর হ'য়ে চল! নিজেই বুঝি তুমি তোমার পথ-প্রদর্শক, এর বেশী আর কিছু বলতে পারছি না। তুমি আমায় তো প্রশ্ন করনি, নিজের মনের মধ্যে এই কথাগুলো যেন আমি কুড়িয়ে পাচ্ছি আর সেই আনন্দে বলে যাচ্ছি! আর কিছু না।'

ক্রমশঃ

এই পথে

কাদের নওয়াজ বি-এ, বি-টি

এই পথে গেলে এসো হে পথিক।
মঙ্গলকোট[১] গ্রামে,
দক্ষিণে এর অজয় র'য়েছে
কুন্থর ছুটেছে বামে।

এক্তশত এক, মন্দির রাজে,
এই পল্লীরি বুকে,
সাহ্‌জাহানের মস্‌জিদ আছে
ঠিক রাস্তারি মুখে।
সাধু ছিল হেথা পীর ও তাপস
ছিল যে আঠারোজন,

(১) মঙ্গলকোট—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পল্লী। রাজা বিক্রমকেশরীর এই স্থানেই রাজধানী ছিল।

আজিও তাঁদের সমাধি নেহারি
প্রাণ কাঁদে অনুখন।
সুরমণি সতী পতির চিতায়,
মরণ লভিল যেথা—
সতী-মন্দির স্মারক হইয়া
আজিও রয়েছে সেথা।
আছে চাঁদ-দীঘি, মাইনে-পুকুর
ছাগ-চরাণীর মাঠ,
সাদা ধপ্‌ধপে বালুচরে আছে
কুনুর নদীর ঘাট।
এই ঘাটে বাজে গ্রামের বধূর
পাঁয়জোর চরণের,
রূপ্‌-ছটা লাগি কাঠের তরীও
সোনা হয় মাঝিদের,
জেঁয়স্‌-কুণ্ড অতীতের মৃত-
সঞ্জীবনী সে কূপ,
আছে বটে—নেই শক্তি তাহার,
পুড়ে গেছে যেন ধূপ।
গাজি সাহেবের দালান-বাড়ির
ঠিক পশ্চিম ভাগে,
গ্রামের মোড়ল তাহের শেখের
ঘরখানি আজো জাগে।
মরেছে তাহের বেহারী নোটন
কারো দেখা নাহি পাই,
পর উপকারে প্রাণ দিত যারা,
আজ তারা কেহ নাই।
গ্রামের প্রান্তে বুড়ো বটগাছ,
অতীতে তাহারি তলে,
তাল ও বেতাল দৈত্য থাকিত
গ্রামের লোকেতে বলে।
তারি কাছে আছে কালী-মন্দির
রঙ্কাকালীর ঠাঁই,
পার্শ্বে তাহার ঘোড়া-শহীদের
দরগা দেখিতে পাই।
এই ঠাঁই হ'তে কিছু দূরে গেলে,
দেখিবে কবরভূমে,
গ্রামের চাষীর বাপ্‌-পিতামহ,
ঘুমায় অঘোর ঘুমে।

সেখান হইতে কিছুদূরে এক
ভাঙা মস্‌জিদ রাজে,
বৃদ্ধ মোল্লা দীপ জ্বালি সেথা,
নেমাজ পড়ে যে সাঁঝে।

এ ঠাঁই হ'তে দক্ষিণে, ঘর
আছে কুড়ানীর মা'র
ম'রে গেছে বুড়ী, শিয়াল ডাকিছে,
ভগ্ন ভিটায় তার।

মঙ্গলকোট প্রাচীন পল্লী
ভগ্ন ভিটায় ভরা,
জানি সেথা আজ কিছু নেই—আছে
শুধু জীর্ণতা জরা।

নিভে গেছে দীপ ভবন আঁধার,
সকলি কালিমাময়,
পুড়িয়াছে তেল আছে সে স্মৃতির,
সলিতাটি সঞ্চয়।

ধ্বংসের মাঝে কালীদহ রাজে
কমলকাননে ঢাকা,
ছায়া সুশীতল বট ও পাকুড়
হেথায় করুণা মাখা।

হে পথিক, তুমি বিদেশ হইতে
এই পথে যদি যাও,
বারেক মোদের পল্লী-কুটীরে,
পদধূলিকণা দাও।

গ্রামের সরল চাষীর মমতা,
ছায়া হয়ে সাথে সাথে
ফিরিবে তোমার, পুলক-অশ্রু
জমিবে নয়ন-পাতে।

কাঞ্চন থালি মিলিবে না বটে,
পদ্মপত্র আছে,
ফলাহার তুমি তাতেই করিও
কবি এ করুণা যাচে।

গ্রীসদেশের প্রাগৈতিহাসিক শিক্ষাপ্রণালী

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম-এ

ইওলকাস্-রাজ্যের স্থাপয়িতা ছিলেন ঈয়োলাস্-বংশ-সম্ভূত ক্রীথিয়াস্। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈসন্ মনে মনে বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর দুর্দান্ত বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পীলিয়াস্ পিতৃরাজ্য আত্মসাৎ ক'রবার জন্য অশেষ চেষ্টা ক'র্‌বে। হ'লোও তাই—নানা ষড়যন্ত্র ক'রে সে ঈসন্‌কে রাজ্যচ্যুত ক'র্‌লে এবং ঈসন তাঁর শিশুপুত্র জেসনকে নিয়ে অন্য দেশে পালিয়ে গেলেন। ঈসনের মৃত্যুর পর জেসন্‌ই রাজ্যের উত্তরাধিকারী। জেসন কোথায় আছে সন্ধান পেলে পীলিয়াস্ তাকে নিশ্চয়ই হত্যা ক'র্‌বে। অতএব ঈসন ভাব্‌লেন জেসনকে এমন স্থানে লুকিয়ে রাখ্‌তে হবে, যাতে পীলিয়াস্ তার খোঁজ না পায়।

জেসনকে সঙ্গে নিয়ে ঈসন সমুদ্র-তীর ত্যাগ করে, উপত্যকা ও পার্বত্য নদীসমূহ পার হয়ে থেসেলী-প্রদেশের উত্তরস্থিত উচ্চ পীলিয়ন্ পর্বতে আরোহণ ক'র্‌লেন এবং শৃঙ্গের নিকট এক গুহার দ্বারে পুত্রসহ উপস্থিত হ'লেন। এই গুহার সানুদেশের পর্বতগাত্র তুষারপাতে শুভ্র হ'য়ে যায়। গুহার দ্বারদেশের বাইরে অনতিদূরে পর্বতপৃষ্ঠে সুন্দর সুন্দর ফলপুষ্পশোভিত অরণ্যানী এবং সম্মুখে বিস্তীর্ণ খোলা ময়দান।

এই গুহায় কাইরণ নামক এক সেণ্টর বাস ক'র্‌তেন। সেণ্টরদের মাথা হ'তে কোমর পর্যন্ত আকৃতি মানুষের মত এবং কোমর হ'তে পা পর্যন্ত ঘোড়ার মত। অর্থাৎ বুদ্ধিতে ও কার্যক্ষমতায় তারা মানুষের সমান এবং শক্তিতে ও ক্ষিপ্রগতিতে অশ্বের সদৃশ।

অতি প্রাচীনকালে সুশিক্ষক ও মহাজ্ঞানী বলে কাইরণ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর প্রকৃতিটি বড় সুন্দর ছিল—সহাস্য বদন, অন্তরে বিরক্তির লেশমাত্র নাই—ছাত্রদের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন। তাঁর শিক্ষাধীন থাকায় পুরাকালে বড় বড় বীরেরা অসাধারণ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তখনকার শিক্ষাপ্রণালী এখনকার শিক্ষা-প্রণালী হ'তে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তখনকার লোকেরা লেখাপড়ার আবশ্যকতা অনুভব ক'র্‌তেন না। যে শিক্ষা পেলে ছাত্রেরা ভবিষ্যতে যথার্থ মানুষ হ'তে পা'র্‌বে, তাই শেখান হ'ত। এই প্রণালীতে শরীরকে বলিষ্ঠ, কর্মক্ষম ও কষ্টসহিষ্ণু এবং মনকে নির্ভীক ও ধৈর্যশালী ক'র্‌বার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হ'ত। দিবাভাগে দলবদ্ধ হয়ে ছাত্রেরা বনে বনে শিকার করে বেড়াত। তাতে তারা শারীরিক শ্রমে ও কষ্টে অভ্যস্ত হ'ত, ধনুর্বাণ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে নিপুণ হ'ত, তাদের লক্ষ্য অব্যর্থ হ'ত, অশ্বচালনে তারা পারদর্শিতা লাভ ক'র্‌ত এবং যা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন—তারা নির্ভীক হ'ত। এ ছাড়া গুহার বাইরের ময়দানে তারা নানা শারীরিক ব্যায়াম অভ্যাস ক'র্‌ত—লম্ফন ও দৌড়াদৌড়ির প্রতিযোগিতা, মল্লযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ এবং ব্যবহারিক-ভাবে অসি ও বর্শা-চালনা।

যে শিক্ষা দ্বারা মনের ও হৃদয়ের বৃত্তিগুলির পুষ্টি হয়, তা প্রদান ক'র্‌বার ব্যবস্থা ছিল রাত্রিতে। সন্ধ্যার পর গুহার মধ্যে নিজের চারিদিকে ছাত্রদের বসিয়ে কাইরণ তাদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতিকল্পে গল্পচ্ছলে মৌখিক উপদেশ দিতেন—মস্তিষ্ক-চালনায় সতর্কতা অবলম্বন ক'র্‌তে হবে, নিজের প্রতি এবং নিজ শক্তির প্রতি বিশ্বাস রাখ্‌তে হবে, বিপদে ধৈর্য অবলম্বন ক'র্‌তে হবে, পৃথিবীর উপকারের জন্য কোনো মহৎ কার্য ক'রবার প্রতিজ্ঞা ক'র্‌তে হবে, সেই কার্যটী সম্পন্ন ক'র্‌তে প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'র্‌তে হবে, সাধুচরিত্র ও সত্যপরায়ণ হতে হবে, দুর্বলের প্রতি সদয় ও ক্ষমাশীল হ'তে হবে এবং মানবমাত্রের প্রতি সদ্ভাব-সম্পন্ন হতে হ'বে। কাইরণ মাঝে মাঝে বীণা বাজিয়ে তার সুরে সুর মিলিয়ে অতীত বীরগণের কীর্তিগাথা গান করতেন, যাতে করে তাঁর ছাত্রেরা উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। এ ছাড়া তিনি ছাত্রদের বীণাবাদন ও সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন এবং যাতে তাঁরা আহত ও পীড়িতদের উপকার ক'র্‌তে পারে, তজ্জন্য তাদের গাছগাছড়ার গুণাগুণও শেখাতেন। মোট কথা, পিতা যেমন নিজ পুত্রকে সস্নেহে মানুষ ক'রে তুল্‌তে চান, সেইভাবে কাইরণ নিজ ছাত্রদের মানুষ ক'রে দিতেন।

ঈসন ও জেসন অপরাহ্ণে গুহাদ্বারে উপস্থিত হ'য়েছিলেন। সেখান থেকে তারা দেখ্‌তে পেলেন যে গুহার মধ্যে একখানা ভালুকের চামড়ার উপর অধ্যাপক কাইরণ বসে আছেন এবং বীণাযন্ত্র হাতে নিয়ে সঙ্গীত-চর্চার উদ্যোগ ক'র্‌ছেন। ক্ষণকাল সোনার মেজ্‌রাব দিয়ে বীণার তারগুলিতে ঝঙ্কার তুলে তিনি গান ধ'র্‌লেন। তিনি গাইলেন—সৃষ্টির পূর্বে মহাশূন্য ছাড়া আর কিছু ছিল না, প্রথমে কালের উদ্ভব হ'ল তার পরে কেমন ক'রে আকাশ, নক্ষত্রমণ্ডল ও পৃথিবীর উৎপত্তি হল তার পরে তিনি গাইলেন অগ্নির, বায়ুর ও সমুদ্রের জন্মকাহিনী। তার পরে গাইলেন বসুন্ধরার লুক্কায়িত ঐশ্বর্যের কথা, বনস্পতিগণের অভ্যন্তরস্থ রোগাপহা ও অপরাপর নানা শক্তির কথা, পশু-কীট-পতঙ্গগণের নানা বৈচিত্র্যের কথা, পক্ষিগণের বায়ুতে সন্তরণের ও মনোহর কণ্ঠস্বরের কথা। অবশেষে তিনি গাইলেন কালত্রয়ের এবং অনাগত ভবিষ্যতের গূঢ় রহস্যের কথা।

গান থাম্‌ল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত সেই মধুর স্বরলহরী গুহাগাত্রে বারম্বার প্রতিধ্বনিত হ'য়ে গুহামধ্যস্থ বায়ুমণ্ডলে এক অপূর্ব গুঞ্জনে

সৃষ্টি ক'র্লে এবং বহুকাল পরেও থেকে থেকে শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহরে আবির্ভূত হ'তে লাগ্ল।

অবসর পেয়ে ঈসনের আদেশে জেসন কম্পিত চরণে কাইরণের নিকটে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন ক'র্লে। কাইরণ ঈষৎ হেসে ব'ল্লেন, 'জেসন, তোমাদের অ'সার কথা আমি আগেই টের পেয়েছি। তোমার পিতা ঈসনকে ডাকো।'

ঈসন তাঁর নিকট উপস্থিত হ'লে কাইরণ বললেন, 'আপনি নিজে আমার নিকট না এসে, ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন কেন?'

ঈসন—আমরা দুরবস্থায় প'ড়ে এখন আপনার কৃপার ভিখারী। ভা'ব্লাম, তাকে একা দেখে অসহায় ব'লে তার উপর আপনার দয়া হবে। আরো, আমার দেখ্বার ইচ্ছা ছিল সে নির্ভীক কি-না—বীরের সন্তানের ন্যায় ব্যবহার ক'র্তে পা'র্বে কি-না।"

কাইরণ—আমি আপনাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

ঈসন—হে দেব, আপনি ত্রিকালজ্ঞ, আমাদের মনের বাসনা আপনার অবিদিত নাই। এক্ষণে আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমার এই পুত্রটীকে আপনার চরণে আশ্রয় দিয়ে আপনার পুণ্য আশ্রমের অতিথি ব'লে গ্রহণ করুন এবং অন্যান্য বীর-সন্তানদের সঙ্গে একেও এর উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে মানুষ ক'রে দিন।

কাইরণ প্রফুল্লমুখে বালককে বল্লেন, 'জেসন, তুমি আমার শিষ্য হ'তে চাও? তবে আমার পাশে এসে ব'সো। আমার ঘোড়ার খুর দেখে তোমার ভয় হ'চ্ছে না তো?'

জেসন—আপনার মত ঘোড়ার খুর পেয়ে আমি যদি আপনার মত গান ক'র্তে প'র্তাম, তা হ'লে আমি নিজেকে ধন্য মনে ক'র্তাম।

কাইরণ—জেসন, তুমি ভাল ছেলে ব'লে বোধ হচ্ছে। আমার অন্যান্য ছাত্রদের মত তুমিও রাজা হ'য়ে কেমন ক'রে রাজ্য-শাসন ক'র্তে হয়, তার উপযুক্ত শিক্ষা পাবে।

ঈসন—আপনার অনুগ্রহ থাক্লে, আমি সে আশাও ক'র্তে পারি।

কাইরণ—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি আজ আমার আতিথ্য গ্রহণ ক'রে এখানে রাত্রি যাপন করুন। কাল প্রাতে আপনার অভীষ্ট স্থানে গমন ক'র্বেন। যে দিকে বাতাসের গতি সেই দিকে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। আপনার পুত্র যত দিন ঈয়োলাস্ বংশের গৌরব ফিরিয়ে আন্বার মত শিক্ষা না পাবে, ততদিন পর্যন্ত আমি তাকে আমার আশ্রম ত্যাগ ক'র্তে দেবো না।

তার পরে তাঁর বীণাটী জেসনের হাতে তুলে দিয়ে কাইরণ তাকে দেখিয়ে দিতে লাগ্লেন—কি ক'রে তারগুলির উপর দিয়ে আঙুল চালাতে হয় এবং কি ক'রে সাতটা সুর বার ক'র্তে হয়।

সূর্যাস্ত হতে তখনো অনেকটা বিলম্ব আছে। গুহার বাইরে হর্ষ-কোলাহল শুনতে পাওয়া গেল। ঈসন ও জেসনকে নিয়ে কাইরণ বেরিয়ে এলেন এবং দেখ্লেন তাঁর ছাত্রেরা মৃগয়া থেকে ফিরে আজকার সফলতার জন্য আনন্দ প্রকাশ ক'র্ছে। একজন তাঁকে ব'ল্লে, 'গুরুদেব, আজ আমি দুটো হরিণ মেরে এনেছি।' আর একজন বল্লে, 'আজ আমি একটা প্রকাণ্ড বনবিড়াল মেরেছি।' আর এক জন একটা বিরাট পাহাড়ে ছাগলের সিং দুটো ধরে তার দেহটা টেনে আন্তে আন্তে বল্লে, 'দেখুন, এটা কত বড়—আমি এটাকে একটা পাথরের স্তূপের পেছনে পেয়েছি।' আর একজন দুটো ভালুকের বাচ্চা দু বগলের নীচে দাবিয়ে ধ'রে আন্বার সময় তারা তাকে আঁচড়ে কামড়ে দিচ্ছিল দেখে হেসেই অজ্ঞান।

খুশী হ'য়ে কাইরণ তাদের যথাযোগ্য প্রশংসা ও আদর ক'র্লেন।

এর পর বালকেরা সন্নিহিত জঙ্গল থেকে কাঠ এনে চেলা ক'রে ফেল্লে এবং কাষ্ঠখণ্ডগুলি সাজিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে। কিছুক্ষণ পরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে লা'গ্ল। ওদিকে কতকগুলি বালক হরিণ দুটোর ও ছাগলটার ছাল ছাড়াতে লেগে গেল। ছাল ছাড়ান হ'লে মুণ্ড তিনটা, পাগুলা, দাব্নাগুলা, পাঁজরাগুলা, শিরদাঁড়াগুলা আলাদা আলাদা ক'রে রা'খ্লে। তার পর সবগুলি থরে থরে সাজিয়ে আগুনের তাতে ঝলসাতে দিলে। তখন তারা নিকটবর্তী জলস্রোতে স্নান করতে গেল এবং স্নিগ্ধ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে ফিরে এল।

স্নান সেরে তারা তাড়াতাড়ি খেতে ব'স্ল। সকাল থেকে তাদের কিছুই খাওয়া হয় নি—বনের মধ্যে কোনো গাছে দু-একটা ফল যদি পেয়ে থাকে, তাই খেয়েছে—হয় তো তাও পায় নি। এখন তারা কুঁচ্কি-কণ্ঠা ক'রে প্রচুর ভোজন ক'র্লে এবং ভোজনান্তে ঝর্ণার নির্মল বারি পান ক'র্লে। তার পর তারা অগ্নিস্তূপের চতুর্দিকে হরিণের বা ভালুকের বা নেকড়ে বাঘের চামড়া পেতে কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিলে এবং পর পর বীণা নিয়ে বাজালে ও গান ক'র্লে। তার পর তারা উঠে প'ড়্ল এবং সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে কিছুক্ষণ দৌড়াদৌড়ি, ঘুসোঘুসী ও মল্লযুদ্ধ ক'র্লে।

অবশেষে কাইরণ বীণা হাতে নিয়ে বাজাতে লাগ্লেন এবং বালকগণ হাত ধরাধরি করে তালে তালে নৃত্য করতে লা'গ্ল।

বালকদের খাবার সময় কাইরণও আহার করেছিলেন এবং ঈসন ও জেসনকেও খাইয়েছিলেন। কাইরণের আদেশে জেসনও বালকদের নৃত্যে যোগ দিয়েছিল।

রাত্রিতে সকলে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে প'ড়্ল। জেসনও নিদ্রাসুখ অনুভব ক'রে পরদিন প্রত্যুষে গাত্রোত্থান ক'র্লে এবং স্নান করে এসে বালকদের দৈনিক কাজে যোগ দিলে।

বিদায় গ্রহণের সময় তার পিতা রোদন ক'র্তে লাগ্লেন। জেসন কিন্তু কাঁদলে না—এই অপূর্ব গিরিগুহা, এই অদ্ভুত শিক্ষক, এই বালকবৃন্দ এবং এখানকার সুন্দর কার্যক্রম তাকে মোহিত ক'রে ফেলেছে। এখানকার বালকদের খেলার সাথী হয়ে থা'ক্বার ইচ্ছা তার প্রবল।

ইওল্কাসের কথা ক্রমশ জেসন ভুলে গেল এবং তার অতীত জীবনের স্মৃতি ছায়ার মত ম্লান হতে লা'গ্ল। পীলিয়ন পর্বতের স্বাস্থ্য-প্রদ হাওয়ায় সে বলবান্ হয়ে উঠ্ল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই সকল ব্যায়ামেই সে দক্ষ—সে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কর্মঠ ও নির্ভীক হল। সঙ্গীতবিদ্যায় ও চিকিৎসাবিদ্যায়ও সে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল।

'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' সম্বন্ধে বক্তব্য

মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

(৫)

রাঢ়ীয় ঘটকঠাকুর চট্টোপাধ্যায় নুলো পঞ্চানন তাঁহার কোন কারিকায় বলিয়া গিয়াছেন—"বাসুদেবের তিন শিষ্য নিমে রঘোদ্বয়।" অর্থাৎ নিমে (নিমাই গৌরাঙ্গ) এবং রঘোদ্বয় অর্থাৎ রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র। এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, নুলো পঞ্চানন ও উক্ত কারিকায় আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দের নাম বলেন নাই। তাঁহার কথা তৃতীয় প্রবন্ধে বলিয়াছি।

এখন বক্তব্য এই যে, যদিও নুলো পঞ্চাননের নিন্দার্থ ঐ সমস্ত শ্লোকের প্রামাণ্য নাই, তথাপি তিনি যে প্রবাদের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহার সত্যতার পরীক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ ঐ প্রবাদ অনুসারেই অনেকদিন হইতে অনেকে শ্রীচৈতন্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দনকে সহাধ্যায়ী এবং বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে ঐ প্রবাদ বদ্ধমূল হইয়া অনেকের মনে ইতিহাসমূর্ত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু মুরারি গুপ্ত প্রভৃতির গ্রন্থের দ্বারা আমরা বুঝিয়াছি যে, শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকটে অধ্যয়ন করেন নাই। বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে তাঁহাকে দেখেন নাই। এ বিষয়ে অন্যান্য বক্তব্য পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি যে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র, এ বিষয়ে পণ্ডিতসমাজে কখনও মতভেদ নাই। তাঁহার কথা পরে বলিব। এখন প্রথমে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের কথাই বক্তব্য।

রঘুনন্দন তাঁহার "জ্যোতিস্তত্ত্ব"গ্রন্থে সংক্রান্তি গণনায় লিখিয়াছেন,—"নবাষ্ট-শক্র হীনেন শকাব্দাঙ্কেন 'পূরিতাঃ।" ইন্দ্রবোধক শক্র শব্দের দ্বারা চতুর্দ্দশ সংখ্যা বুঝা যায়। সুতরাং "নবাষ্ট-শক্র" বলিলে "অঙ্কস্য বামাগতিঃ"—এই নিয়মানুসারে ১৪৮৯ বুঝা যায়। রঘুনন্দন "জ্যোতিস্তত্ত্বে" সংক্রান্তি গণনার জন্য ১৪৮৯ শকাব্দাঙ্ক গ্রহণ করায় বুঝা যায় যে, তিনি ১৪৮৯ শকাব্দেই "জ্যোতিস্তত্ত্ব" রচনারম্ভ করেন। তাহা হইলে বুঝা যায়, তাঁহার "জ্যোতিস্তত্ত্ব" গ্রন্থ—১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে।

রঘুনন্দন যে ১৪২১ শকাব্দে (১৪৯৯ খৃঃ) "জ্যোতিস্তত্ত্ব" রচনা করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝি না। কারণ তিনি মিথিলার স্মার্ত্ত বাচস্পতি মিশ্র ও বিদ্যাপতির গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু তিনি তাঁহার প্রথম গ্রন্থ "মলমাসতত্ত্বে" মলমাস বিষয়ে রঘুনাথ শিরোমণিকৃত "মলিম্লুচবিবেক" গ্রন্থের অনেক কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন।* কিন্তু রঘুনন্দন পঞ্চদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদের প্রথম ভাগে "মলমাস-তত্ত্ব" রচনা করিয়া তাহাতে রঘুনাথ শিরোমণির মতের প্রতিবাদ করিলে শিরোমণির ঐ গ্রন্থ তৎপূর্ব্বেই রচিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু আমরা তাহা সম্ভব বুঝি না। কারণ, আমরা বুঝিয়াছি যে, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদেও গ্রন্থকার হইতে পারেন না। তাই আমরা রঘুনন্দনের 'জ্যোতিস্তত্ত্ব'-রচনার কাল ১৪৮৯ শকাব্দ, ইহাই বুঝিয়াছি।

অনেকদিন পূর্ব্বে কান্তিচন্দ্র রাঢ়ি মহোদয় ও নবদ্বীপের বৃদ্ধ পণ্ডিতগণের নিকটে শুনিয়া "নবদ্বীপমহিমা" পুস্তকে রঘুনন্দনের "জ্যোতিস্তত্ত্বে"র "নবাষ্ট-শক্র হীনেন শকাব্দাঙ্কেন পূরিতাঃ" এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়াই তাঁহার "জ্যোতিস্তত্ত্ব"—রচনার ঐ সময়ই লিখিয়াছিলেন। রাধানগরে বঙ্গীয়

---

* পূর্ব্বস্থলীনিবাসী নানাশাস্ত্রগ্রন্থকার মহামহোপাধ্যায় ৺কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় তৎকৃত মলমাসতত্ত্ব-টীকায় ইহা বিশদ রূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণির ঐ সুদুর্লভ গ্রন্থখানি পূর্ব্বস্থলীতে তাঁহারই বাড়ীতে ছিল, ইহা আমি তাঁহার নিকটেই শুনিয়াছিলাম। ঐতিহাসিক ৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহারই নিকটে জানিয়া "মধ্যযুগের বাঙ্গলা" নামক পুস্তকে সেই কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এখনও পূর্ব্বস্থলীতে সেই গ্রন্থ আছে, ইহাও আমি জানি। কিন্তু আমি সেখানে গিয়াও কোন কারণে উহা দেখিতে পাই নাই।

সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণে বহু বিজ্ঞ মঃ মঃ ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও লিখিয়া গিয়াছেন, রঘুনন্দনের "জ্যোতিস্তত্ত্ব" রচনার সময় ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ।

রঘুনন্দনের 'জ্যোতিস্তত্ত্ব' রচনাকালে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত হইতে পারে, ইহাই বৃদ্ধ পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল। কোন পণ্ডিত লিখিয়া গিয়াছেন—'রঘুনন্দনের জন্ম ১৪৩০ শকাব্দে। শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব ১৪০৭ শকাব্দে ইহা নিশ্চিত আছে। ১৪৩০ শকাব্দে রঘুনন্দনের জন্ম হইলে ১৪৮৯ শকাব্দে (১৫৬৭ খৃঃ) ৫৯ বৎসর বয়সে তাঁহার 'জ্যোতিস্তত্ত্ব' রচনা অবশ্যই সম্ভব হয়। কিন্তু "জ্যোতিস্তত্ত্ব" রচনাকালে রঘুনন্দনের বয়স ৬৭ বৎসর পর্য্যন্ত হইলেও অর্থাৎ ১৫০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইলেও তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সহাধ্যায়ী হইতে পারেন না। কারণ ১৫১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, ইহা নিশ্চিত। ঐ সময়ের অনেক পূর্ব্ব হইতেই তিনি অধ্যয়ন ত্যাগ করেন।

রঘুনন্দন যে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের শেষ অবস্থায় ৺পুরীধামে গিয়া তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এ বিষয়েও কোন প্রমাণ নাই। পরন্তু তাহা হইলে তখন তিনিও গুরু সার্ব্বভৌমের ন্যায় শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গলাভ করিয়া পরে নিজ গ্রন্থে অবশ্যই তাঁহার কোন কথা লিখিতেন। তিনি "পুরুষোত্তমতত্ত্ব" গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহাতে শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্যাদি ও তথায় কর্ত্তব্যের ব্যবস্থাও লিখিয়াছেন। কিন্তু তথায় মহাপ্রসাদ ভক্ষণ সম্বন্ধে কোন কথা তিনি বলেন নাই। আরও অনেক কারণে বুঝা যায় যে, শ্রীক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যদেবের অবস্থানকালে রঘুনন্দন সেখানে বাস করেন নাই।

কেহ কেহ কল্পনা করিয়া বলেন যে, তখন রঘুনন্দনও সার্ব্বভৌমের জামাতার ন্যায় শ্রীচৈতন্যদেবের বিরোধী ছিলেন। তাই তিনি তাঁহার কোন কথা লেখেন নাই এবং তিনি ভক্তি-শাস্ত্রের কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহার মত, 'স্মার্ত্তমত' নামেই খ্যাত। বৈষ্ণব মত উহা হইতে বিশিষ্ট মত। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বৈষ্ণব ছিলেন না, তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্রও জানিতেন না ইত্যাদি।

কিন্তু রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্যদেবের বিরোধী হইলে তিনি নিজ গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ের নিন্দা করেন নাই কেন? নিন্দা করা ত সকলেরই সুসাধ্য। মহাভক্ত কবি-কর্ণপূরও 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের প্রারম্ভে নৈয়ায়িক-দিগের অনুচিত নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরে নবদ্বীপের জগদীশ গদাধর প্রভৃতি কোন নৈয়ায়িকই তাঁহার নিন্দার্থ ঐরূপ কোন শ্লোক রচনা করেন নাই। শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়েরও নিন্দা করেন নাই।

পরন্তু কবিরাজ গোস্বামী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতার নাম করিয়াই তাঁহার কুকীর্ত্তির বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও রঘুনন্দনের নাম করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। সার্ব্বভৌমের জামাতার সম্বন্ধে কিরূপ বর্ণন হইয়াছে—তাহাও সংক্ষেপে এখানে বক্তব্য।

একদিন সার্ব্বভৌম-গৃহে শ্রীচৈতন্যদেবের ভোজনকালে —"অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন।" 'চরিতামৃতে' (২।১৫) কবিরাজ গোস্বামী সেই নিন্দার বর্ণন করিয়াছেন—

"এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বারজন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন?"

বিমানবাবু লিখিয়াছেন,—

"কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন যে—সার্ব্বভৌমের জামাতা অমোঘ শ্রীচৈতন্যের আহারের পরিমাণ দেখিয়া বক্রোক্তি করিলে সার্ব্বভৌম বলিয়াছিলেন—ষাটি বিধবা হউক।" (৫৭৪ পৃঃ)। কিন্তু আমরা দেখি, কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"শুনি ষাঠীর মাতা বুকে শিরে হাত মারে।
'ষাঠী রাঁড়ী হৌক্' ইহা বোলে বারে বারে॥

—মধ্য, ১৫শ পঃ।

সার্ব্বভৌমের কন্যার ডাক নাম ছিল, ষাঠী, (ষাটি নহে) এবং তাঁহার জামাতার নাম অমোঘ। সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যদেবের আপত্তিসত্ত্বেও তাঁহার নিকটে ভোজনার্থ অধিক অন্ন দিলে তখন অমোঘ তাহা দেখিয়া কটূক্তি করেন—"একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন?" তাই তখন ষাঠীর মাতা অর্থাৎ সার্ব্বভৌমের পত্নীই ঐ কথা শুনিয়া অসহ্য দুঃখে বলেন—ষাঠী বিধবা হউক, অর্থাৎ ঐরূপ মহাপাপী দুর্জ্জন জামাতা মরিয়া যাউক। কিন্তু সার্ব্বভৌম নিজে ঐ কথা বলেন নাই। তথাপি বিমানবাবু কেন ঐরূপ লিখিয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

যাহা হউক, এখন রঘুনন্দনের কথায় দুঃখের সহিত ইহাও লিখিতে বাধ্য হইতেছি যে, বর্ত্তমান বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে অনেকেই স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের কোন পরিচয় জানেন না। অনেকে তাঁহার গ্রন্থ না দেখিয়াও তাঁহার উপরে খড়্গাহস্ত। কিন্তু বঙ্গের বাহিরে বম্বের ব্যবহারাজীব সুপ্রসিদ্ধ কাণে মহোদয় ইংরেজীতে স্মৃতিশাস্ত্রের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়া বঙ্গের সুবিশাল স্মৃতিনিবন্ধকার রঘুনন্দনের সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, ইহাও দেখা আবশ্যক।

রঘুনন্দন ও তাঁহার গ্রন্থের সম্পূর্ণ পরিচয়বর্ণন এই প্রবন্ধে সম্ভব নহে। কিন্তু এখানে সংক্ষেপে তাঁহার পরিচয়-বর্ণনে প্রথমে বক্তব্য এই যে, তিনিও ভগবৎ কৃপা প্রাপ্ত মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার নিন্দাও নামাপরাধ। বঙ্গে ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবস্থায় তাঁহার প্রভাব কেন এত প্রবল হইয়াছে, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। তিনি কোন রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন না। কিন্তু রঘুনন্দনের পাণ্ডিত্য ও পুণ্য প্রভাবে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজা গণেশের সভাপণ্ডিত রায় মুকুট বৃহস্পতির স্মৃতিনিবন্ধ এবং রঘুনন্দনের অধ্যাপক শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির স্মৃতিনিবন্ধও প্রচলিত হয় নাই।

সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী রঘুনন্দন মীমাংসাদি দর্শনে ব্যুৎপন্ন হইয়া স্মৃতিশাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। তিনি কোন সাম্প্রদায়িক স্মার্ত্ত বা বৈষ্ণব ছিলেন না। তিনি শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলের সম্বন্ধেই শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বিচারপূর্ব্বক ধর্ম্মব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মুমুক্ষুকৃত্য লিখিতে অদ্বৈতবেদান্তমতেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্যত্রও শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তভাষ্যাদি গ্রন্থের অনেক কথা লিখিয়াছেন। তিনি বঙ্গের প্রাচীন স্মার্ত্ত"ধর্ম্মরত্ন"কার সুপ্রসিদ্ধ জীমূত-বাহনের 'দায়ভাগে'র টীকাও করিয়াছেন এবং তাঁহার আরও অনেক গ্রন্থ আছে।

রঘুনন্দন "মলমাসতত্ত্ব" প্রভৃতি যে ২৮খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা "অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব" নামে কথিত হয়। তাহাতে তিনি তিন শতের অধিক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে "গোবিন্দমান সোল্লাস", "বৈষ্ণবামৃত" এবং "হরিভক্তি" প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থও আছে। বৃন্দাবনে রচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব স্মৃতি নিবন্ধ "হরিভক্তি বিলাস" তিনি দেখিতে পান নাই।

রঘুনন্দন ধর্ম্মব্যবস্থানির্ণয়ে বহুস্থানে শ্রীমদ্ভাগবতের বহু শ্লোকও প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠা ছিল। তিনি "একাদশী-তত্ত্বে" "বিষ্ণুপূজাবিধি" প্রকাশ করিতে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তির উল্লেখপূর্ব্বক অতি শ্রদ্ধার সহিত ভক্তি ও ভক্তের মাহাত্ম্য বর্ণনের জন্য অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনানুসারে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে প্রেমিক ভক্ত যে,—"রোদিত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ। বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ,"—ইহা রঘুনন্দনও জানিতেন এবং তিনিও সেই ভক্তের মহাপূজা করিতেন। এখানে রঘুনন্দনের "একাদশী তত্ত্ব" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"অন্যাপি ভক্তি রাবশ্যকী। তথা চ শ্রীভাগবতে—
"নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বা সুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনং॥"
"ভক্তিশ্চ নবধা—
"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা॥
তথা—"কথং বিনা লোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ।

"বাগ্ গদ্গদা তু দ্রবতে যস্য চিত্তং
রোদিত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তি যুক্তো ভুবনং পুনাতি"॥

বরাহ পুরাণে—

"সংস্মৃতঃ কীর্ত্তিতোবাপি দৃষ্টঃ স্পৃষ্টোঽথবা প্রিয়ে।
পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া॥
এতজ্জ্ঞাত্বাতু বিদ্বদ্ভিঃ পূজনীয়োজনার্দ্দনঃ।
বেদোক্তবিধিনা ভদ্রে আগমোক্তেন বা সুধীঃ॥"
সুধীরিতি পৃথিবী সম্বোধনং। তথা—
"যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবোনোপজায়তে।
তাবদেব মুপাসীত বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ"॥

হরিবংশে বলিং প্রতি ভগবদ্বাক্যং—

"পুণ্যং মদ্দ্বেষিণাং যচ্চ মদ্ভক্তদ্বেষিণাং তথা।
তৎসর্ব্বং তব দৈত্যেন্দ্র! মৎপ্রসাদাদ্ ভবিষ্যতি॥"

অত্র্যঙ্গিরসৌ—

"সর্ব্বপাপপ্রসক্তোঽপিধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতং।
পুনস্তপস্বীভবতি পঙ্‌ক্তি পাবন পাবনঃ"॥

গারুড়ে—

"যদ্‌দুর্লভং যদপ্রাপ্যং মনসো যন্ন গোচরং।
তদপ্যপ্রার্থিতং ধ্যাতো দদাতি মধুসূদনঃ॥"

বিষ্ণুপুরাণং—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি, তদাপ্নোতি কলৌ সকীর্ত্ত্য কেশবং" ॥

......শ্রীভাগবতে—...

"নানা তন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু।"
"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্ট দোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যং।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণত পালভবাব্ধি পোতং
বন্দে মহাপুরুষ! তে চরণারবিন্দম্" ॥ ইত্যাদি

রঘুনন্দনের পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গীয় স্মৃতি নিবন্ধকারগণ এবং পূজাপদ্ধতিকারগণও বিষ্ণুপূজাবিধির সবিস্তর বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। কারণ,—আমাদিগের সমস্ত বৈধকর্ম্মের পূর্ব্বে বিষ্ণুপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিষ্ণুপূজন সর্ব্বাশুভ-নাশক ও সর্ব্বশান্তিকর। রঘুনন্দনও এ বিষয়ে শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"সর্ব্বাশুভানাং পরিমোক্ষকারি সম্পূজনং দেববরস্য বিষ্ণোঃ"। "সর্ব্বশান্তিকরঃ শ্রীমান্ তুলস্যা পূজিতো হরিঃ"। তাই 'হরয়ে নমঃ' এই মন্ত্রের দ্বারা শালগ্রাম শিলায় তুলসীদান বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র চিরপ্রচলিত স্বস্ত্যয়ন।

তুলসীমাহাত্ম্য বর্ণন করিতে রঘুনন্দনও শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"যঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবো লোকে মিথ্যাচারোঽপ্যনাশ্রমী।
পুনাতি সকলান্ লোকান্ শিরসা তুলসীং বহন্" ॥

তুলসীমালা ধারণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা সমর্থন করিতেও পরে শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"ন ধারয়ন্তি যে মালাং তুলসীকাষ্ঠ সম্ভবাং।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ॥"

প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গের আস্তিক সমাজে সর্ব্বত্র শাক্ত ব্রাহ্মণগণও প্রত্যহ শালগ্রাম শিলায় তুলসীর দ্বারা বিষ্ণু-পূজা করিয়াছেন এবং এখনও অনেকে তাহা করিতেছেন। যে ব্রাহ্মণের গৃহে শালগ্রামশিলাদি কোন বিষ্ণুবিগ্রহ নাই, তাঁহার অন্ন অভক্ষ্য। এ বিষয়ে রঘুনন্দনও শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"কেশবার্চ্চা গৃহে যস্য ন তিষ্ঠতি মহীপতে।
তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতং॥"

কিন্তু শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে নবদ্বীপের অবস্থা বর্ণন করিতে 'শ্রীচৈতন্য ভাগবতে'র আদি খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন,—

"নানাদেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহিক সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥
রমাদৃষ্টি পাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে॥
কৃষ্ণনাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্মকর্ম্ম লোকে সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধনে॥
ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়ে।
এইমত জগতের ব্যর্থকাল যায়ে॥
যে বা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাঁহারা হো না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পঢ়াইয়া সভে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম পাশে বন্ধি মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন।
যে বা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা'সভার মুখে হ নাহিক হরিধ্বনি॥

অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
'গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥

কিন্তু ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যাদি করিতেও সর্ব্বপ্রথমে আচমন ও শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিতে হয়। "অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ"—এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। তাই বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয়ের বর্ণনা পাঠে প্রশ্ন হয় যে, তখন কি নবদ্বীপের লক্ষ কোটি অধ্যাপক ব্রাহ্মণও নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা-পূজাও করিতেন না?

—এই অভিনব প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলিতে পারেন যে, তাঁহারা নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যাপূজাও কিছু করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের কৃষ্ণভক্তি ছিল না। তখন "কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।" কিন্তু আমি প্রথম প্রবন্ধেই বলিয়াছি,—বাঙ্গালীর কৃষ্ণভক্তি স্বাভাবিক। তাই বাঙ্গালীর বহুদিনের ভাগ্যে বঙ্গদেশেই নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গৌরহরি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

চিরকাল হইতেই বঙ্গদেশে শালগ্রাম শিলায় নারায়ণকে প্রণাম করিতে মন্ত্র পাঠ করা হইতেছে—"জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।" পূর্ব্বকালে বঙ্গের সর্ব্বত্র সম্ভ্রান্ত হিন্দু গৃহস্থের বাড়ীতে সমস্ত শিশু সন্তানকেও নারায়ণের ঐ প্রণামমন্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত। শিশুগণও তখন হইতে ভক্তিলাভ করিত। কিন্তু সেই যে অনির্ব্বচনীয় প্রেমভক্তি, তাহা ত চিরকালই সুদুর্লভ। "ভক্তিরসামৃত সিন্ধু" গ্রন্থে শ্রীপাদ্ রূপ গোস্বামীও শাস্ত্রবচন বলিয়াছেন—"জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি র্ভুক্তি র্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ। সেয়ং সাধন সাহস্রৈ র্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥" উক্ত বচনানুসারে "চরিতামৃতে" (১।৮) কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

বিমানবাবু তাঁহার গ্রন্থের ১৭৫ পৃষ্ঠা হইতে ২২২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'র বহু কথার সমালোচনা করিয়াও উদ্ধৃত পয়ারগুলির সম্বন্ধে কোন সমালোচনা করেন নাই। পরন্তু উপসংহারে তিনিও লিখিয়াছেন,—"ঐতিহাসিকের বহির্মুখি দৃষ্টির নিকট খুঁটি নাটি ঘটনায় বৃন্দাবন দাসের সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়িলেও ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার ধর্ম্ম সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে শ্রীচৈতন্যভাগবত ঐতিহাসিক তথ্যের আকর স্বরূপ।"

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে "ধর্ম্মকর্ম্ম লোকে সভে এই মাত্র জানে", ইত্যাদি কথাও কি সর্ব্বত্রই ঐতিহাসিক তথ্য? আর তখন অতি বড় সুকৃতি ব্যক্তিই কেবল স্নানের সময়ে 'গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারণ করিতেন, এবং যে সমস্ত অধ্যাপক ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত পড়াইতেন, তাঁহারাও ভক্তির ব্যাখ্যা করিতেন না, ইহাও কি ঐতিহাসিক তথ্য? স্মার্ত্ত রঘুনন্দন "একাদশীতত্ত্বে" ভক্তির ব্যাখ্যা করিতে শ্রীমদ্‌ভাগবতে'র যে সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও কি শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে নবদ্বীপের কোন পণ্ডিত সত্যই জানিতেন না?

আমরা কিন্তু জানি যে, তখনও মহামান্য শ্রীধর স্বামিপাদের টীকানুসারে নবদ্বীপের বহু পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগতের ব্যাখ্যা করিতেন। এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদাবলীও গান করিতেন। অনেক টোলে 'গীতগোবিন্দে'রও পঠন-পাঠনা হইত। আর তখনও বঙ্গে অনেক পৌরাণিক পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহারা "শ্রাবয়েচ্চতুরোবর্ণান্" এই শাস্ত্রবিধি অনুসারে নানা স্থানে বঙ্গভাষার দ্বারা চতুর্ব্বর্ণের নিকটে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণের ব্যাখ্যা করিতেন। কারণ পুরাণশ্রবণ সকলেরই কর্ত্তব্য। "পুরাণপঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।" বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যে (১।২।৩৮) আচার্য্য শঙ্করও বলিয়া গিয়াছেন,—"শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্' ইতি চ ইতিহাস পুরাণাধিগমে চাতুর্ব্বর্ণ্যস্যাধিকারস্মরণাৎ"।

অবশ্য যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত পুরাণ শ্রবণের বিধি অনুসারে শাস্ত্রোক্ত সেই বিশিষ্ট ফললাভের জন্য সংকল্প পূর্ব্বক পুরাণ শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা মূল সংস্কৃত পুরাণই শ্রবণ করিবেন। তাই ঐ তাৎপর্য্যেই পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে কথিত হইয়াছে,—"ন দেশভাষা-রচিতং গ্রন্থং শ্রুত্বা ফলং লভেৎ।" কিন্তু পুরাণপাঠক চতুর্ব্বর্ণের নিকটে সেই পুরাণের যে ব্যাখ্যা করিবেন, তাহা ত দেশভেদে বিভিন্ন দেশভাষার দ্বারাই তাঁহার কর্ত্তব্য। নচেৎ চতুর্ব্বর্ণের সমস্ত শ্রোতাই সেই পুরাণের অর্থ কিরূপে বুঝিবেন? তাই পদ্মপুরাণে পূর্ব্বোক্ত বচনের পরার্দ্ধে কথিত হইয়াছে,—'ব্যাখ্যা

যা কাপি কাকুৎস্থ! পুরাণস্ত হিতাহি সা'। অর্থাৎ যে-কোন ভাষার দ্বারা পুরাণের ব্যাখ্যা হিতকরী। আর উক্ত বচনের অব্যবহিত পূর্ব্বে স্পষ্ট বিধান হইয়াছে,—

"পুরাণস্থং পঠেদ্‌গ্রন্থং ব্যাখ্যায়াচ্চ বিচারয়ন্।
যয়া কয়াপি বা রাম! ভাষয়া দেশ ভেদতঃ" ॥

পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে (৭০ম অঃ) যে শিব-রাঘব সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে পৌরাণিকগণ ও পুরাণ ব্যাখ্যাদি সম্বন্ধে বহু উপদেশ আছে। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বচনের দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, শিব, রাঘবকে বলিয়াছেন,—হে রাম! পৌরাণিক পণ্ডিত বিচার করতঃ দেশভেদে যে কোন ভাষার দ্বারা তাঁহার পঠিত পুরাণ গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিবেন অর্থাৎ শ্রোতৃবর্গের পুরাণার্থবোধের জন্য তাঁহাদিগের স্বদেশ ভাষার দ্বারাই তাঁহাদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাইবেন।

মহাভারতেও কথিত হইয়াছে,—"শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণ মগ্রতঃ।" এবিষয়ে বেদান্তভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং পূর্ব্বকালেও যে, বঙ্গদেশে শাস্ত্রবিধি অনুসারে বঙ্গভাষার দ্বারাই চতুর্ব্বর্ণের নিকটে শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতি পুরাণের ব্যাখ্যা হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও তাহা শ্রবণ করিয়াছেন ইহা নিশ্চিত। পূর্ব্বকালে এদেশে ব্রাহ্মণগণ যে, বঙ্গভাষায় রামায়ণ ও পুরাণ শ্রবণ করিতেন না, তাঁহারা উহাকে রৌরব নরকজনক বলিয়া বঙ্গভাষার প্রতি ঘৃণাই প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির পরিপন্থী শত্রু ছিলেন, এইরূপ মন্তব্য কোন রূপেই গ্রহণ করা যায় না।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের পূর্ব্বেই রাঢ়ীয় মহাকুলীন ব্রাহ্মণ কৃত্তিবাস পণ্ডিত বঙ্গভাষায় অপূর্ব্ব রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি কখনও ব্রাহ্মণসমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হন নাই। পরন্তু সেজন্য তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজেও অসাধারণ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। পরে ঐ গ্রন্থের প্রচার হইলে বঙ্গের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের গৃহেও অপরাহ্নে স্বরযোগে উহার পাঠ হইয়াছে। তখন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই রৌরব নরকের ভয়ে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করেন নাই।* পরন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ উহা পাঠ করিবার জন্য ছাত্রদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়াছেন, ইহাও আমরা জানি।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যে, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে "সর্ব্বনেশে" বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন, ইহা আমরা কখনও শুনি নাই এবং কখনও ঐ কথা বিশ্বাস করা যায় না। এদেশে ব্রাহ্মণেরা বঙ্গভাষায় মহাভারত-রচনার জন্য 'কাশীদাসকে শাপ দিয়াছিলেন' ইহা পরে একজন নবাগত সাহেবের কোন উদ্দেশ্যমূলক কথা। কোন ব্যক্তিবিশেষের উক্তি বা নিষ্প্রমাণ অপ্রসিদ্ধ প্রবাদবিশেষকে আশ্রয় করিয়া ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা যায় না।

পরন্তু বঙ্গের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যে, বঙ্গভাষার প্রতি ঘৃণা-বশতঃ পূর্ব্বে সংস্কৃতভাষার দ্বারাই অধ্যাপনা করিতেন, ইহাও সত্য নহে। কারণ, দেশভাষার দ্বারা যে অধ্যাপনা কর্ত্তব্য, ইহা স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি "ব্যবহারতত্ত্ব" গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"অতএব অধ্যাপনেঽপি; তথোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্ব্বাক্যৈ র্যঃ শিষ্যমনুরূপতঃ।
দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ ॥"

এখন যাহাকে মাতৃভাষা বলা হইতেছে, তাহাই উদ্ধৃত পুরাণবচনে "দেশভাষা" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। আরও অনেক শাস্ত্রবচনে "দেশভাষা" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশজভাষাই দেশভাষা। আমাদিগের বঙ্গদেশে বঙ্গভাষাই দেশভাষা। পূর্ব্বে পণ্ডিতগণ ঐ দেশভাষা অর্থে কেবল "ভাষা" শব্দেরও প্রয়োগ করিতেন। তাই তাঁহারা দেশভাষা রচিত গ্রন্থকে বলিতেন, 'ভাষাগ্রন্থ'। বেদান্তের "সিদ্ধান্তলেশ" গ্রন্থে অপ্যয়দীক্ষিতও ঐরূপ গ্রন্থকে বলিয়াছেন "ভাষানিবন্ধ।"

রঘুনন্দনের উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত পুরাণ বচনে পরে কথিত

---

* ব্রাহ্মণ দিগকে তিরস্কার করিবার জন্য কোন কোন খ্যাতনামা সাহিত্যিক একটি অমূলক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥" কিন্তু বঙ্গের স্মৃতি নিবন্ধকার পণ্ডিতগণও উক্ত বচন জানিতেন না। অন্য দেশে তুলসীদাসের রামায়ণ পণ্ডিতসমাজেও কিরূপ সমাদৃত, ইহাও জানা আবশ্যক। এবিষয়ে পদ্মপুরাণের বচন পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড, বঙ্গবাসী সং, ৩৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে,—"দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ ॥" অর্থাৎ যিনি দেশভাষাদি উপায়ের দ্বারাও শিষ্যকে বুঝাইবেন, তিনি গুরু। রঘুনন্দন "জ্যোতিস্তত্ত্বে"ও বিদ্যারম্ভ প্রকরণে উক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া সেখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "আদিগ্রন্থ করণাদিঃ।" অর্থাৎ উক্ত বচনে "দেশভাষা" শব্দের পরে প্রযুক্ত আদি শব্দের দ্বারা গ্রন্থ রচনাদি বুঝিতে হইবে। কিন্তু সেই গ্রন্থ রচনা যে, কখনও দেশভাষার দ্বারা কর্ত্তব্য নহে, কেবল সংস্কৃতভাষার দ্বারাই কর্ত্তব্য, ইহা তিনি বলেন নাই।

বস্তুতঃ রঘুনন্দন যে উদ্দেশ্যে দেশভাষার দ্বারা অধ্যাপনার কর্ত্তব্যতা সমর্থন করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্যে কেহ বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা করিলে তাহা তিনি অকর্ত্তব্য বলিতে পারেন না। আর সে বিষয়ে কোন নিষেধবচনও শাস্ত্রে তিনি পান নাই। পরন্তু তাঁহার উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত 'বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে'র বচনে "দেশভাষা" শব্দের পরেই 'আদি' শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় তদ্দ্বারা দেশভাষায় গ্রন্থ রচনাও বুঝা যায়। অতএব রঘুনন্দনের ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহার মতেও এদেশে বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনাও কর্ত্তব্য। এবং তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই যে এদেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বঙ্গভাষার দ্বারা অধ্যাপনা করিয়াছেন, ইহাও নিশ্চিত। তাই রঘুনন্দন লিখিয়াছেন,—"অতএব—অধ্যাপনেঽপি।"

—ক্রমশঃ

শাশ্বতী

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

এও সত্য নয়—
হাসি-অশ্রু-কল্পনার পুঞ্জ পুঞ্জ এত যে সঞ্চয়
আত্ম-প্রতিষ্ঠার লাগি দ্বারে দ্বারে এই মাধুকরী
পর্ণপুট ভরি'
যা-কিছু চেয়েছি বন্ধু, যতটুকু লভিয়াছি তার,
অলব্ধের পথে পথে লক্ষ্যহারা এই অভিসার
ছায়াঘন অরণ্যের দিগন্ত-বিস্তারে
আলেয়ার দীপ-দীপ্ত প্রান্তরের পারে
যে জীবন ছুটিয়াছে অনির্দ্দেশ চক্রবাল লাগি।
তপস্যায় রহে যারা বেদনার দীর্ঘ রাত্রি জাগি;
তাহাদের সেই জয় সেই পরাজয়
জানি বন্ধু, সেও সত্য নয়॥

নক্ষত্রের দীপশিখা শিহরিছে নিশীথ আকাশে
তমোমগ্ন ধরিত্রীর মূর্চ্ছাতুর শান্ত অবকাশে
অকস্মাৎ দেখিলাম চাহি
অপহৃত সঞ্চয়ের অর্ঘ্যথালা বাহি'
চলিয়াছে চিরন্তনী ভবিষ্যের পূজাবেদী পানে,
কেহ নাহি জানে
কবে সৃষ্টি-তোরণের তীর্থদ্বার হ'তে
শাশ্বতী বহিয়া চলে অন্তহীন সময়ের স্রোতে।
তাহারি যাত্রার ছন্দে অকস্মাৎ উদ্দাম কল্লোল
ফাল্গুনী অরণ্যসম মর্ম্মে মোর জাগাইল দোল।
দেখিলাম : অমাকীর্ণ প্রান্তরের প্রেতচ্ছায়া তলে
শব্দহীন অন্ধকারে শোভাযাত্রী চলে দলে দলে।
উন্মত্ত কালের নৃত্যে রক্ত মোর নাচিল উত্তাল—
দেখিলাম : সারি সারি চলিয়াছে আমারি কঙ্কাল

আজিকার এই ধ্বনি, এই প্রতিধ্বনি,
অনন্ত ইথারবক্ষে নিত্যকাল ওঠে রণরণি'—
মৃত্যুহীন ক্ষয়হীন রাত্রি সম অতীত আমার
ভবিষ্যতে বর্ত্তমানে বিথারিয়া কৃষ্ণপক্ষ তার
আমারে ঘিরিছে বন্ধু, যুগান্তের অগণ্য-সঞ্চয়,
তবু তারা কিছু সত্য নয়?

আলরিকের প্রেম

শ্রীকালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল

বুড়ো পেরারের মনে সবচেয়ে কষ্ট হ'ত যখন সে দেখত যে গ্রামের মধ্যে কোনও যুবক-যুবতী বয়স হ'লেও অবিবাহিত রয়েছে। বুড়ো ভাবত যে, সে কি গ্রামের পিতৃতুল্য নয়? তার কি উচিত নয় দেখা যে তার গ্রামের ছেলেমেয়েদের ভাল বিয়ে হয়? আর ভালই হোক মন্দই হোক, বিয়েটা ত দরকার। প্রত্যেক নাগরিকের কি বিবাহ কয়র স্থষ্টি রক্ষা করা এবং তদ্দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করা কর্ত্তব্য নয়? বুড়ো পেরার ব'সে ব'সে এই সব ভাবত। বুড়ো ছিল ভাবুক এবং দয়ালু।

বুড়ো একদিন তার ঘরে আলরিককে পেয়ে বলল, "আলরিক, তোমার বয়সে আমার দুটি ছেলে ও এক মেয়ে হয়েছিল। তুমি আমার মেয়েকে দেখনি আলরিক, সে ছিল বড়ই সুন্দর ও মধুর। আমরা তাকে মারিয়া বলতুম।" এই কথা ব'লে বুড়ো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তার বিয়ারের গেলাস তুলে নিয়ে তার আড়ালে মুখ লুকাল।

আলরিক তার পাইপের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলে, "ছোট্ট ছেলেমেয়ে বাড়ীতে থাকলে বেশ মজা হয়, না? আমি বড় ভালবাসি ছোট ছেলেমেয়েদের।"

বুড়ো তাকে অনুরোধ করল, "তুমি এবার বিয়ে কর। এটা তোমার কর্ত্তব্য। ঈশ্বর তোমায় যথেষ্ট সম্পত্তি দিয়েছেন, সুতরাং তোমার উচিত নয় এই নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করা। অবিবাহিত লোক কোনও কাজের নয়, কারণ তার দায়িত্ববোধ থাকে না।"

আলরিক ঘাড় নেড়ে বললে, "কথাটা ঠিক। আমি নিজেও একথা প্রায়ই ভাবি। এটা মনে করতে নিশ্চয় আনন্দ হয় যে আমি শুধু নিজের জন্তই পরিশ্রম করছি না।

পেরার বলে চলল, "এলসাকে দেখ। ও মেয়েটি বড়ই ভাল এবং হিসেবী। এমন মেয়ে পাওয়া ভার।"

আলরিকের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল। সে বললে, "হ্যাঁ, যা বলেছ। এলসা মেয়েটি ভাল। আচ্ছা, তুমি কখনও ওর সুন্দর ও নরম হাতের দিকে লক্ষ্য করেছ?"

বুড়ো তার নিজের মনে বলতে লাগল, "আমি জানি তার আপত্তি হবে না। তার মাকে আমি বুঝিয়ে বলব।" বলতে বলতে বুড়োর মন আনন্দে ভরে উঠ্‌ল। সেই আনন্দের আভাষ ফুটে উঠ্‌ল তার মুখে চোখে; বুড়ো যে চিরকাল একজন পাকা ঘটক। বিয়ের জোগাড় করতেই যে তার সবচেয়ে উৎসাহ বেশী।

আলরিক একটু দমে গিয়ে বললে, "দেখি একটু ভেবে। ভালবাসা না হ'লে বিয়ে করা উচিত নয়। তা নইলে মেয়ের উপর অন্যায় করা হয়।"

পেরার তার একটি হাত চেপে ধরে বললে "তুমি মিস্ হেড্‌উইগ্‌কে ভালবাস, না? গত সপ্তাহে দুবার তোমায় তার সঙ্গে যেতে দেখেছি।"

আলরিক কৈফিয়তের সুরে জবাব দিলে যে, মেয়েটি অতটা পথ একা যেতে ভয় পায় ব'লে সে পৌঁছে দিয়েছিল।

বুড়ো একটু ভেবে নিয়ে বললে, "তা, মন্দ কি? হেড্-উইগ্‌ও মেয়ে মন্দ নয়। একটু ছট্‌ফটে, তা হোক, পরে শুধরে যাবে। তা, তুমি কি কথা পেড়েছ?"

"না।"

"কবে চলচে ভাবছ।" আবার আলরিকের মুখে চোখে বিষাদের ভাষা ফুটে উঠ্‌ল। সে একটু ঢোক গিলে বলল, "আচ্ছা, মানুষে কি ক'রে বুঝতে পারে যে সে কাউকে ভালবাসে, কি ক'রে সে স্থির করতে পারে যে সে আর কাউকে ভালবাসে না?"

বুড়ো পেরার এখন মোটা এবং সাধারণ, কিন্তু চিরকাল এমন ছিল না। সে যৌবনোপযোগী স্বরে বলল, "সে তোমার নিজের চাইতেও প্রিয়তর মনে হবে। তার সামনে তোমার কাছে আর সব জিনিষ নিরর্থক বলে মনে হবে এবং তার জন্ত তুমি নিজের প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হবে।"

কিছুক্ষণ তারা চুপ ক'রে ব'সে রইল। বুড়ো পেরার ভাবছিল, অতীতের হারানো দিনের কথা, আর যুবক আলরিকের মনে হ'ল, ভবিষ্যতের রঙীন ছবি।

ঘটনাচক্রে সেদিন বাড়ী ফেরবার সময় পথে আলরিকের দেখা হ'ল এলসার সঙ্গে। তাকে দেখে তার মনে হ'ল যে, হাঁা, এলসাকে বিয়ে করা চলে। সে তাকে ভালবাসে। সে কি এলসার জন্য তার জীবন বলি দিতে পারবে না? সে অনুভব করলে, হাঁা, এলসার জন্য তার মনে আছে অফুরন্ত প্রেম।

কিন্তু পরদিন সকালে মিস মারগট্‌কে দেখেই তার মত বদলে গেল। সেই হাস্যমুখী মারগট্‌—তার শৈশবের ক্রীড়াসঙ্গিনী সে। মারগটের বিপদে সে কি ছুটে যাবে না তাকে রক্ষা ক'রতে?

সেদিন সমস্ত দিনটা কেটে গেল এই ভাবনায় যে, সে সত্যি কাকে ভালবাসে। এলসা, মারগট্‌, হেড্‌উইগ্‌—কাকে সে চায়? সে ত সকলকেই ভালবাসে। গ্রামে এমন কে মেয়ে আছে যাকে সে ভালবাসে না? এমন কে আছে যার বিপদে সে ছুটে যাবে না? আলরিকের মনে হ'ল, এও কি সম্ভব যে মানুষে একজনকে অপরের চেয়ে বেশী ভালবাসতে পারে? সে আবার গেল বুড়ো পেরারের কাছে এই সমস্যার সমাধানের জন্য। বুড়ো মাথা নেড়ে বললে "এ প্রেম নয়। তুমি সত্যিকারের ভালবাসতে পার মাত্র একজনকে।"

"কিন্তু পেরার, তুমি নিজে যে দুবার বিয়ে করেছ?"

"সেটা আলাদা কথা, একজনের মৃত্যুর পর আর একটি বিয়ে করেছি।"—বললে পেরার।

আলরিক ভাবতে লাগল কেন সে জগতের সকলকেই ভালবাসতে পারবে না। ভালবাসা এক অপূর্ব্ব জিনিষ। প্রেমহীন মনুষ্য অপদার্থ।

আলরিক একদিন নদীর ধারে ব'সে তার কুকুর ও বাচ্চাদের খেলা দেখছিল। সে ভেবে দেখল, সে সমস্ত গ্রামকেই ভালবাসে। আচ্ছা এ কি সম্ভব নয় যে সে গ্রামের সমস্ত কুমারীকেই বিয়ে করবে? আবার তার মনে হ'ল, "না এ কি সম্ভব? এ তার এক বোকামী?"

বসন্তের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশে বেজে উঠ্‌ল রণ-দামামা। নেপোলিয়ানের দুর্জ্জয় বাহিনী ছুটে আসছে তাদের দেশ গ্রাস করতে। জার্মানেরাও তৈরী হ'তে লাগল তাদের বাধা দেবার জন্যে। যে আলরিকের মনে নারীর প্রেম প্রভাব বিস্তার ক'রতে পারেনি তার মনেও দেশপ্রেম জেগে উঠ্‌ল। সৈন্যদলে যোগ দিয়ে তার দেশকে রক্ষা করবার আগ্রহ জেগে উঠল।

কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল, দেশকে ভালবাসবার সৌভাগ্য থেকেও সে বঞ্চিত। একদিন সে নিজের কার্য্য-ব্যাপদেশে এক দূর গ্রামে গিয়েছিল। সেখান থেকে এক জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফেরবার সময় সে দেখতে পেল পাঁচজন লোক ধরাশায়ী। তাদের মধ্যে দু'জন জার্মান ও তিনজন ফরাসী। চারজন মৃত, কিন্তু এক ফরাসী সৈন্যের দেহে তখনও প্রাণ ছিল। আলরিক তাকে নিজের কাঁধে তুলে নিল। দুজনে কেউ কারু ভাষা জানে না। কিন্তু যখন লোকটি মৌন ভাষায় তাকে মিনতি জানাল—সেটা বুঝতে তার দেরী হয়নি। সে জানত যে গ্রামে নিয়ে গেলে সে লোকটিকে মরতেই হবে গ্রামবাসীদের হাতে, তাই তাকে গভীর বনের মধ্যে নিয়ে গেল। রাত্রে লুকিয়ে সে তার জন্যে খাবার নিয়ে আসত। সেখানে এক সপ্তাহ ধরে তার সেবা-শুশ্রূষা ক'রে তাকে ভাল ক'রে তুললে। তারপর তারা পরস্পরের কাছে বিদায় নিলে।

এর পর আলরিকের আর গ্রামে ফেরা হ'ল না। কারণ এতদিনে তার যুদ্ধের ইচ্ছা মিটে গেছে। কিন্তু লজ্জায় গ্রামে গিয়ে একথা সে জানাতে পারল না। সে ভাবল যে যদি সে অন্য জায়গায় থাকে তবে গ্রামের লোক মনে ক'রবে সে যুদ্ধে গেছে।

অনেক জায়গায় ঘুরে ফিরে একদিন সে আবার তার গ্রামের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলের ধারে এসে উপস্থিত হ'ল। তার ইচ্ছা ছিল, রাত্রিকালে সে একবার তার গ্রামকে দর্শন করবে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে। কিন্তু সে দেখ্‌ল যে সেখানে সে একা নয়। আর একজন লোক গ্রামের দিকে মুখ ক'রে নতজানু হ'য়ে ব'সে রয়েছে। আলরিক তার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌ল—সেই বুড়ো পেরার হাঁটু গেড়ে ব'সে প্রার্থনা করছে। আলরিক তার কাঁধে হাত দিতেই সে লাফিয়ে উঠে পড়ল এবং তার প্রথম বিস্ময় কেটে গেলে সে তাকে শোনাল তার দুঃখের কাহিনী।

তাদের গ্রামের ধারে আস্তানা পেতেছে একদল ফরাসী সৈন্য। কিছুদিন আগে তাদের মধ্যে দু'জনকে কে হত্যা করে। গ্রামের লোকেদের ওপর নানাপ্রকার অত্যাচার ক'রে ওরা তার শোধ নিয়েছে। আবার

একদিন আর একজন ফরাসী সেনা নিহত। কাপ্তেন বলেছে যে যদি প্রকৃত অপরাধী ধরা না দেয় তবে চব্বিশ ঘণ্টার পর সমস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে হত্যা করা হবে। পেরার গিয়েছিল দয়া প্রার্থনা করতে, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি।

"এ ত ভাল কাজ হয়নি" বলল, আলরিক।

"লোকে ফরাসীদের উপর ঘৃণায় পাগল হ'য়ে উঠেছে। কয়েকজনে মিলে হয়ত ওদের হত্যা করেছে। ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করুন।" পেরার এই জবাব দিলে।

"তারা কি গ্রামবাসীদের রক্ষার জন্য নিজে থেকে ধরা দেবে না?"

"তুমি কি ক'রে এমন আশা করতে পার? গ্রামবাসীদের রক্ষার আমি কোনও উপায় দেখছি না।"

এ কথা সত্যি। আলরিকের মনে ভেসে উঠ্‌ল ফরাসীদের অত্যাচারের কথা—যা সে গ্রামান্তরে দেখে এসেছে। পেরার তাকে ছেড়ে গ্রামবাসীদের খবর দিতে গেল তাদের শাস্তির জন্য তৈরী হ'তে।

আলরিক একা সেখানে দাঁড়িয়ে চাঁদের আলোয় তার রূপ দেখ্‌তে লাগল। তার মনে পড়ল বুড়ো পেরারের কথা, "সে তোমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় হবে। তার জন্য তুমি অম্লানবদনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত থাকবে।" আলরিক বুঝতে পারল ভাল ক'রেই যে সে গ্রামের সকলকেই ভালবাসে। সকলের জন্যই তার মনে আছে অগাধ প্রেম।...

* * * *

ফরাসীরা তাকে এক শুকনো গাছে ফাঁসীতে লট্‌কে দিলে গ্রামের দিকে মুখ ক'রে—যাতে গ্রামের সকলে তার শাস্তি দেখে ভবিষ্যতে সাবধান হয়।

গ্রামের লোকেরা তার অবস্থা দেখে কেউ করল প্রশংসা, কেউ বা করল নিন্দা। কিন্তু বুড়ো পেরার চুপ ক'রে রইল। সে যেন ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছিল না।

কিছুদিন পরে একজন ফরাসী তার মৃত্যুকালের সব কথা ব'লে গেল। সকলে বুঝতে পারল আলরিকের অপূর্ব্ব আত্মদানের কথা।

তখন গ্রামের লোকে মাটি খুঁড়ে তার কফিন বার করলে। শোভাযাত্রা ক'রে গ্রামে নিয়ে গেল তাদের গির্জ্জার মধ্যে কবর দিতে—যাতে সে সারাক্ষণ তাদের মধ্যেই থাকতে পারে।

তার কবরের উপর গ'ড়ে উঠ্‌ল স্মৃতিসৌধ। তার উপর মর্ম্মর প্রস্তরে খোদাই করা হ'ল—"এর চেয়ে বেশী ভালবাসতে জগতে আর কেউ পারেনি।"*

* "জেরোম কে-জেরোমে"র ছায়াবলম্বনে।

মূর্ত্তি পূজা

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার

মাটীর পুতুল গড়িয়া পূজিস্‌
ত্রাণদাতা বলি' তায়
তারি আশে ব'সে রহিলে কখনো
মুক্তি কি মিলে হায়!

জনম জনম পূজ' যদি তারে
কথাটিও নাহি কবে,
অন্ধের কাছে এ ধরার ছবি
কভু না প্রকাশ হ'বে।

কবীর দেখিছে এ ধরার সবে
তারি পিছে শুধু ঘুরে,
দেখিল না কভু রয়েছে দেবতা
আপন হৃদয় পুরে।

দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম

রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল,

সমগ্র ভারতবর্ষকে বাঙলা যে দান করিয়াছে তাহার বিবরণ জানিতে হইলে বাঙ্গালীর বিগত শত বর্ষের সাধনার কথা অবগত হওয়া সকলের আগে দরকার। এই একশত বর্ষ ভারতবর্ষ কোথায় ছিল, আর বাঙ্গালী কি করিয়াছিল? ভারতবর্ষ ছিল নিদ্রায় অভিভূত, পরাধীনতাকে দাসজীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। আর বাঙ্গালী আলোকবর্ত্তিকা হাতে লইয়া চারিদিকে জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়াছে স্বাধীনতার আদর্শকে উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া। রুশো-ভলটেয়ারের মত জনসাধারণের মনের দৈন্য, হীন মানসিকতা ও ভীরু স্বভাবকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত একটা অপার্থিব সাহসে তাহাদের অন্তরকে পরিপ্লাবিত করিয়াছে। এই একশত বৎসরে বাঙ্গালীর মধ্য হইতে এমন কতকগুলি মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে যাঁহাদিগকে যুগান্তকারী বলা যাইতে পারে। তাঁহারা সাহিত্যে, ধর্ম্মে, সমাজে ও শিক্ষায় এমন সব বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিলেন যাহার প্রভাব আজিও অনুভূত হইতেছে। মধুসূদন, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, নবীনচন্দ্র, গিরীশচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রভৃতি যুগান্তকারী ব্যক্তিগণ বাঙ্গালীর শিরোভূষণ। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল ইঁহাদেরই পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য। ভারতের নব-জাগরণের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলালের দান ইঁহাদের কাহারও অপেক্ষা কম নহে। দ্বিজেন্দ্রলাল যাহা দিয়াছেন তজ্জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহার অভাবে বাঙ্গালীর সংস্কৃতির এক অংশ অপূর্ণ থাকিত। তিনি বাঙ্গালীকে হাসাইয়াছেন, কাঁদাইয়াছেন, নব নব ভাবধারা প্রচার করিয়া মাতাইয়াছেন, ডুবাইয়াছেন। সেই সঙ্গে তিনি আর একটা কাজ করিয়াছেন, জাতীয়তা ও স্বদেশ মন্ত্রের একটি মূর্ত্ত আদর্শ তিনি দেশের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সে আদর্শ কখনও ম্লান হইবে না, সে আদর্শ চিরকাল স্বাধীনতাকামী জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে থাকিবে।

দ্বিজেন্দ্রলালের বহুমুখী প্রতিভার সকল দিক আলোচনা করা এক্ষেত্রে সম্ভব হইবে না। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল ও হাসির গানের দ্বিজেন্দ্রলালের সম্যক্ আলোচনা বাদ দিয়া এক্ষণে কেবল স্বদেশ প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ-প্রীতির গভীরতা সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলিব। তিনি তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থে স্বদেশ-প্রীতির যে আদর্শ দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অনুকরণীয় ও অনুপম। "দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু কবি নন, হাস্যরসসমুজ্জ্বল মধুর গানের রচয়িতা নহেন—তিনি আমাদের জাতীয়তার পুরোহিত, তিনি বাঙ্গালীর পথপ্রদর্শক, তিনি স্বদেশী-তন্ত্রের কবি। তিনি একনিষ্ঠ ভগীরথের মত বাঙ্গালীর অবদান হিমাচলে অধিষ্ঠিত দেশাত্মবোধ মহাদেবের জটাজুট হইতে দেশ-ভক্তি ভাগীরথীর পবিত্র প্রবাহ আনিয়া কোটি কোটি ভারত সন্তানের জীবমুক্তির সাধন দান করিয়া গিয়াছেন। এ ঋণ কি জাতি কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে?" (সুরেশচন্দ্র সমাজপতি)। অন্য একজন সমালোচক বলিয়াছেন—"সকলগুলি রচনার মধ্য দিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের দেশ জননীর প্রতি অচলা ভক্তি, দেশবাসীদের জন্য অকৃত্রিম প্রীতি প্রকাশিত হইয়া কবিবরের অনাবৃত মস্তকটিকে লোকলোচনের সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে। বঙ্গ আমার জননী আমার বলিয়া এমন করিয়া আর কে গাহিয়াছে তাহা জানি না। 'সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি' হৃদয়ের অন্তস্তলগত ভক্তিমন্দাকিনী উচ্ছ্বসিত জলতরঙ্গে দেশ-জননীর রাতুল চরণখানি কে এমন প্রক্ষালিত করিয়া দিয়াছে বলিতে পারি না। 'অতুল চির-বিমোহন তুমি সুন্দর সুরধাম, শত নির্ঝর-ঝর্ঝর-ঝঙ্কারিত অবিরাম' বলিয়া দেশ-জননীর অতুলন শোভাসম্পদের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধমন হইয়া কে আর এমন করিয়া সকল অন্তর দিয়া গাহিয়া উঠিয়াছে জানি না ত।' (মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়)। এস্থলে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার স্বদেশভক্তিমূলক পুস্তকাদি রচনা করেন, সে যুগে স্বদেশ-প্রীতির কথা প্রচার করা অপরাধের মধ্যে গণ্য ছিল। স্বদেশ-ভক্তির কথা প্রকাশ করিয়া বলা, স্বাধীনতার কথা চিন্তা করা, স্বাধীনতা লাভের উপায় অন্বেষণ করা, এসব বিষয় সে যুগে সাধারণ লোকের জন্যই বিপজ্জনক ছিল। সরকারী কর্ম্মচারীদের ত কথাই নাই। অথচ বীরহৃদয় দ্বিজেন্দ্রলাল নির্ভীকভাবে স্বদেশ, স্বাধীনতা ও পরাধীনতার অভিশাপের কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। চাকুরীতে উন্নতি হইবে না, হয়ত অধোগতি কিম্বা পদচ্যুতি হইতে পারে।—এসব ভয় তাঁহাকে দিনেকের তরে তাঁহার আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি উপরিওয়ালাদের তোয়াক্কা না করিয়া আপনার মনে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছেন—স্বদেশ-প্রীতির বন্যায় দেশ ভাসাইয়া দিয়াছেন। সঙ্গীতে ও নাটকে এমন কি বহু প্রহসনে তিনি দেশ-প্রীতির অবারিত উৎস শত ধারায় উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি সেই সব বীরের চিত্র আঁকিয়াছেন—যাঁহারা দেশকে স্বাধীন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই সব মহাপুরুষের চিত্র আঁকিয়াছেন—যাঁহারা বীরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সাহস দিয়াছেন, অভয় দিয়াছেন এবং পরিশেষে বিজয়ের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন। পরাজয়ে যাহারা হতাশ হয় না, প্রলোভনে যাহারা নিপতিত হয় না, স্তোকবাক্যে যাহারা প্রলুব্ধ হয় না, একটার পর একটা করিয়া সেইরূপ বহু চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ত্যাগের, মহত্ত্বের, আত্মবলিদানের আদর্শচিত্রসমূহ দেশের অধিবাসীর নয়নপথে উপস্থাপিত করিয়া তাহাদিগকে সেই আদর্শে দীক্ষিত হইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

অন্যান্য স্বদেশভক্ত নেতাদের আদর্শ হইতে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ-

ভক্তির আদর্শের একটা প্রধান পার্থক্য এই যে, তিনি যেমন ছিলেন স্বদেশ-প্রেমিক, সেইরূপ ছিলেন বিশ্ব-প্রেমিক। জাতীয়তা ও বিশ্ব-মানবতা এই দুই আদর্শের তিনি ছিলেন ধারক ও বাহক। স্বদেশকে ভালবাসিলেই অন্য দেশকে ঘৃণা করিতে হইবে—অথবা বিশ্বকে ভালবাসিলেই যে স্বদেশের প্রতি উদাসীন থাকিতে হইবে এরূপ আদর্শ তাঁহার ছিল না। তিনি একাধারে স্বদেশ-প্রেমিক ও বিশ্ব-প্রেমিক ছিলেন। স্বদেশের উপর অপরে করিবে কর্ত্তৃত্ব, স্বদেশের ধনরত্ন অপরে আসিয়া লুটিয়া লইবে, আর স্বদেশের লোক অনাহারে থাকিয়া অপরের ভোগের উপকরণ জোগাইবে এরূপ বিশ্ব-মানবতার তিনি সমর্থক ছিলেন না। তিনি চাহিয়াছিলেন সকলের আগে স্বদেশকে স্বাধীন করিতে। স্বাধীন জাতিই বিশ্ব-প্রেমিক হইতে পারে। পরাধীনের মুখে বিশ্ব-প্রেমের কথা পরিহাস মাত্র। দ্বিজেন্দ্রলাল ইহা জানিতেন, তাই তিনি জোর গলায় প্রচার করিয়াছেন দেশ-প্রেম ও স্বাধীনতার বাণী। কিন্তু তাঁহার মত বিশ্ব-প্রেমিক কবি কেবল স্বদেশের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। তাই তিনি স্বদেশকে ভালবাসিয়াও বিশ্বকেও হৃদয়ের আলিঙ্গন দিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার স্বদেশ-ভক্তির আদর্শ অত্যন্ত উন্নত, অত্যন্ত মহান; ইহাতে হিংসা বা পরনিপীড়নের ভাব নাই—আছে মহত্ব ও গরিমার সমাবেশ।

তাঁহার স্বদেশ-ভক্তিমূলক নাটকের মধ্যে প্রতাপ সিংহের স্থান সর্ব্বোচ্চে। এই নাটকে কবি স্বদেশ-প্রীতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। রাজ্য-বিতাড়িত প্রতাপ প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট আকবরের ভ্রুকুটি ভয়ে ভীত হইলেন না। আকবর চাহিলেন প্রতাপের বশ্যতা। প্রতাপ সে প্রস্তাবে পদাঘাত করিয়া আপনার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া আকবরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। আকবর প্রতিহিংসাপরায়ণ কম ছিলেন না। তিনি একে একে প্রতাপের লোককে হাত করিলেন। মানসিংহ, টোডরমল্ল ও অন্যান্য রাজপুত বীর আকবরের বশীভূত হইলেন। এমন কি, প্রতাপের সহোদর ভ্রাতা শক্তসিংহ আকবরের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। ইঁহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে প্রতাপ হলদি ঘাটে হারিয়া গেলেন, তাঁহার সাধের জন্মভূমি চিতোর বিদেশীর করতলগত হইল। আর প্রতাপ? মুকুটহীন রাণা প্রতাপ বনে বনে মরুতে মরুতে স্ত্রীপুত্র লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও বিদেশী সম্রাটের নিকট আত্মসর্পণ করিলেন না। স্বদেশের মর্য্যাদা রক্ষা ও স্বদেশ উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ করিয়া আয়োজন করিতে লাগিবেন। অবশেষে স্বীয় রাজ্যের কিঞ্চিৎ অঞ্চল জয় করিলেন। কিন্তু চিতোর উদ্ধার করিতে পারিলেন না। সেই দুঃখে চিরজীবনের জন্য সুখভোগ পরিত্যাগ করিলেন। স্বর্ণ পালঙ্ক, স্বর্ণ থালিকা বিসর্জ্জন দিয়া ঘাসের শয্যা ও মাটির থালা ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে পৃথিবীর একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক তিলে তিলে আত্মবলিদান করিলেন। কিন্তু তবুও বিদেশীর নিকট মাথা নত করেন নাই।— রাজপুত বীর প্রতাপসিংহের কাহিনী দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে পড়িয়া কি সুন্দরই না হইয়াছে। স্বদেশ-প্রেমের সহিত উচ্চতর আদর্শ মিশ্রিত করিয়া কবিবর নাটকখানিকে সুমহান করিয়া তুলিয়াছেন। এই নাটকে ইরার মুখে তিনি যে কথা বলিয়াছেন তাহা বিশ্বমানবতার বিজয় দুন্দুভি ঘোষণা করিতেছে। ইরা তাহার পিতাকে বলিতেছে—না বাবা, এ পৃথিবীই একদিন যে স্বর্গ হবে—যেদিন এ বিশ্বময় কেবল পরোপকার, প্রীতি ও ভক্তি বিরাজ কর্ব্বে, যে দিন অসীম প্রেমের জ্যোতিঃ নিখিলময় ছড়িয়ে পড়বে, যে দিন স্বার্থত্যাগেই স্বার্থলাভ হবে। সম্রাট মনুষ্যত্ব খুইয়ে যদি চিতোর নিয়ে সুখী হন, হোন; তাঁকেও যেতে হবে। চিতোর তাঁর সঙ্গে যাবে না, কিন্তু মনুষ্যত্বটুকু সঙ্গে যেতো। আমার দেশ—আমায় নিয়ে দিবারাত্র এ ভাবনা, এ দ্বন্দ্ব কেন, পৃথিবীতে আমার কি আছে বাবা?'

স্বদেশ-প্রেম ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে কেমন করিয়া মহান আদর্শে উপনীত হইতে পারে, আমরা তাহার আভাষ পাইয়াছি প্রতাপসিংহে। কিন্তু 'দুর্গাদাস' ও 'মেবার পতন' হইতেছে এই আদর্শের জ্বলন্ত নিদর্শন। দুর্গাদাস নাটকখানি তাঁহার পিতৃদেবের চরিত্রের আদর্শে অঙ্কিত হইয়াছে। দুর্গাদাস নিঃস্বার্থ প্রভুপরায়ণতা ও কর্ত্তব্যপালনের উজ্জ্বল চিত্র। নাটকখানি পড়িতে পড়িতে হৃদয়ে উচ্চ ভাবের উদয় হয়। নীচতার ঊর্দ্ধে—বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়। এই মরজগতে এমন একটি মহৎ বিষয় পাইয়া হৃদয় ও মন আনন্দে ভরিয়া যায়। (দুর্গাদাসে মুসলিম চরিত্র ভালভাবে ফুটান হয় নাই বলিয়া যে অভিযোগ উঠিয়া থাকে তাহার আলোচনা পরে করিব।) এ সম্বন্ধে সে যুগে 'নব্যভারত' কি লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য:—'দ্বিজেন্দ্রলাল আজ মানববেশে আমাদের নিকট উপস্থিত নহেন। তাঁহার লেখনী দ্বারা আজ এক স্বর্গীয় প্রভা বাঙ্গালা সাহিত্যাকাশ উজ্জ্বল করিয়াছে—দুর্গাদাস সেই স্বর্গীয় প্রভা। পুস্তক দেশে দেশে অনেক হইয়াছে, আরও হইবে। যত পুস্তকের কথা বল—অনেকেই মৃত মানুষের পূতিগন্ধময় কথায় পূর্ণ। প্রেমের কাহিনী, প্রণয়ের গাথা—রিপুর উত্তেজনা, বাঙ্গলা সাহিত্য ব্যাপিয়া কেবল পরাধীনতা ও কাপুরুষতার ছবি—কেবল আসার ছবি—এতদিন পরে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাণে স্বর্গীয় প্রভা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রুশো ও ভলটেয়ারের ন্যায় বঙ্গে দেবত্ব ও অমরত্ব লাভ করিবার যোগ্য। দু-এক স্থান ব্যতীত দুর্গাদাসের সর্ব্বত্র রুচি মার্জ্জিত, ভাব বিশুদ্ধ, লিপিচাতুর্য্য সুন্দর, কবিত্ব অসাধারণ—পড়িবার সময় মনে হয় যেন ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতেছি; মনে হয় যেন আত্মত্যাগ মন্ত্রের এক জীবন্ত ইতিহাস পড়িতেছি; মনে হয় যেন স্বদেশ-ভক্তির এক উজ্জ্বল কাহিনী পড়িতেছি। এমন তেজঃপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাটক বাঙ্গলা ভাষায় এ জীবনে আর পড়ি নাই, পড়িব কি-না তাহাও জানি না। পুস্তকখানি কি কবিত্ব, কি স্বদেশপ্রাণতা, কি নিঃস্বার্থতা, কি পবিত্রতা, কি দয়া, কি ক্ষমা—এ সকলের যেন আদর্শ। যাহা চাই তাহাই পাইয়াছি। বাস্তবিকই বলিতেছি দ্বিজেন্দ্রলাল এই একখানি পুস্তক লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।' (নব্যভারত, চৈত্র, ১৩১৩ সাল)।

দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে 'মেবার পতন'-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, এই নাটকে তাঁহার বিশ্বপ্রীতির আদর্শ বাস্তব রূপ

ধরিয়া প্রকটিত হইয়াছে। তাঁহার বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বমানবতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'মেবার পতন'। এই নাটকের ভূমিকায় তিনি যে আদর্শের ইঙ্গিত দিয়াছেন, নাটকের গর্ভেও তিনি তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি ভূমিকায় বলিতেছেন: 'এই নাটকে আমি একটি মহানীতি লইয়া বসিয়াছি। সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম ও বিশ্ব-প্রেমের মূর্ত্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্ত্তিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। আমিত্ব হইতে যতদূর প্রেমকে ব্যাপ্ত করা যায় ততই সে ঈশ্বরের কাছে যায়। ঈশ্বরে লীন হইলে সে প্রেম পরিপূর্ণতা লাভ করে।' 'এই নাটকে কবি ইহাই বুঝাইয়াছেন যে জাতিকে উন্নত করিতে হইলে মনের সঙ্কীর্ণ ভাব ঘুচাইতে হইবে। দেশপ্রীতির নামে মনকে খর্ব্ব করিলে চলিবে না। হৃদয়কে উদার করিতে হইবে, মানবতা লাভ করিতে হইবে। তিনি স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে মনের সমস্ত শক্তি, প্রাণের গভীর আবেগ দিয়া বলিয়াছেন—'আবার তোরা মানুষ হ'—এবং কি করিয়া সেই মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে তাহার পথও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।—(নবকৃষ্ণ ঘোষ কৃত 'দ্বিজেন্দ্রলাল')।

যে উচ্চভাব এই নাটকে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার দু-একটি নমুনা পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। মেবারের পতন লইয়া চারিদিকে যখন হা-হুতাশ উঠিয়াছে তখন আবেগ ভরে কবির অপরূপ সৃষ্টি মানসী বলিতেছেন: মেবার গেল বলে' ক্রন্দন করলে কি হবে মা? আমাদের বড় সান্ত্বনা এই যে, মেবার গিয়াছে যাক, তার চেয়ে বড় সম্পদ আমাদের হোক। আমি চাই যে, আমার ভাই নৈতিক বলে শক্তিমান হোক, সে দুঃখে, নৈরাশ্যে, ঝঞ্ঝার অন্ধকারে ধর্ম্মকে জীবনের ধ্রুবতারা করুক। যদি সে তা না করে, ত সে উচ্ছন্ন যাক। আমি ক্ষুব্ধ নহি।' মানসী আর একস্থানে বলিতেছে: 'সে ধর্ম্ম ভালবাসা। আপনাকে ছেড়ে ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাসতে শিখতে হবে। তার পরে আর তাদের নিজের কিছুই কর্ত্তে হবে না। ঈশ্বরের কোন অজ্ঞেয় নিয়মে তাদের ভবিষ্যৎ আপনিই গড়ে উঠবে। জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয় মা, জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে। যে পথ বঙ্গের শ্রীচৈতন্য দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথে চল মা, নইলে নিজে নীচ, কুটিল স্বার্থসেবী হ'য়ে রাণা প্রতাপসিংহের স্মৃতি মাথায় রেখে অতীত গৌরবের নির্ব্বাণ প্রদীপ কোলে করে চিরজীবন হাহাকার কর্ত্তেও কিছু হবে না। শত্রু মিত্র জ্ঞান ভুলে যাও! বিদ্বেষ বিসর্জ্জন কর—নিজের কালিমা, দেশের কালিমা, বিশ্বপ্রেমে বিধৌত করে দাও। দ্বিজেন্দ্রলালের একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গান 'আবার তোরা মানুষ হ' এই নাটকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গানে মনুষ্যত্বের প্রতি এমন একটা আবেদন আছে যে, আমাদের প্রত্যেকের মনে মনুষ্যত্ব লাভের প্রতি আগ্রহ জাগে।

স্বদেশপ্রীতি ও বিশ্বপ্রীতির এমন সুমধুর সমাবেশ খুব কম কবির মধ্যেই পরিদৃষ্ট হইবে। তিনি স্বদেশী ভাবের স্রষ্টা, চিন্তায় কল্পনায় ধ্যানে ধারণায় স্বদেশই তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র। কিন্তু তাঁহার স্বদেশ ভক্তির ভিত্তি হিংসায় নহে, ঘৃণায় নহে, শত্রুদলনে নয়; সে ভিত্তি সার্ব্বজনীন দয়া, মৈত্রী, ভালবাসা ও শুভেচ্ছায়। প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, মেবার পতন, চন্দ্রগুপ্ত বাঙ্গালীকে দেশাত্মবোধ মন্ত্রে উদ্বোধিত করিয়াছে। তিনি উহাদের সাহায্যে জাতীয়তা ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু এইখানে তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই। স্বদেশের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তিনি আরও উর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছিলেন এবং তিনি সেই উর্দ্ধস্থানে থাকিয়া জগৎবাসীকে আহ্বান করিতেছেন:—

"ভুলিয়ে যাবে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন কর,
বিশ্ব তোর নিজের ঘর—আবার তোরা মানুষ হ।
জগৎ জুড়ে দুইটি সেনা পরস্পরে রাঙায় চোক,
পুণ্যসেনা আপন কর্—পাপের সেনা শত্রু হোক।
ধর্ম্ম যেথায় সেদিকে থাক্—ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ,
স্বজনদেশ ডুবিয়া যাক্—আবার তোরা মানুষ হ।'

পরিশেষে স্বর্গীয় শশাঙ্কমোহন সেন তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। পরিব্যাপ্ত মহত্ব ও পরিপ্লাবী হৃদয়োচ্ছ্বাসের ঘটনায় স্বদেশের এবং জাতীয় সাধনার ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্র শীলারকেও অতিক্রম করিয়াছেন। এই কাব্যের 'মেবার পাহাড়' হইতে আরম্ভ করিয়া 'আবার তোরা মানুষ হ' বলিয়া পরিশেষের মধ্যে এমন একটি হৃদয়োচ্ছ্বাস এবং ঐ উচ্ছ্বাসের পাকে পাকে এমন অপরূপ আলোকমধুর তরঙ্গভঙ্গ এবং সমগ্র শিল্প-সমাধানের মধ্যে এমন একটা সুমার্জ্জিত দীপ্তি আছে যে, ভারতীয় জাতীয় ব্যাধি এবং উহার প্রতীকার নিরূপণ আছে যে, সকল দিক বিবেচনা করিলে, উহাকে তাঁহার এই যুগের সর্ব্বগুণঘনীভূত 'শ্রেষ্ঠ প্রকাশ' বলিয়া নিঃসন্দেহে উল্লেখ করিতে পারা যায়। আমাদের জাতীয় জীবন-সাধনার চিরস্থায়ী সাহিত্য-ভাণ্ডারে উহার নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা হয়। (বঙ্গবাণী, —শশাঙ্কমোহন সেন)। উনবিংশ শতাব্দীর সাধকগণ বাঙ্গালীকে যে আদর্শ দিয়াছিলেন তাহা যেন বাঙ্গালী আজ হারাইতে বসিয়াছে। অথচ এই সব আদর্শ পাইয়া একদিন বাঙ্গালী সকলের আগে জাগিয়াছিল; সকলকে পথ দেখাইয়াছিল। আজ স্বাধীনতা-যজ্ঞের পুরোভাগে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় নাটক লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এস বাঙ্গালী, সেই আদর্শ গ্রহণ করিয়া আবার আমরা বাঙ্গালী হই, ভারতবাসী হই, মানুষ হই!

শুক্তি ও শঙ্খ

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ঝিনুক ও শাঁখ এদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ না হ'লেও দৈনন্দিন জীবনের শুভক্ষণে এদের সাহচর্য্য ভিন্ন আমাদের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সকল অঙ্গই অশোভন বলে মনে হয়; অথচ এদের জীবন-ইতিহাসের কতটুকুই বা আমরা খবর রাখি! নির্জীব শাঁখের মুখে কৃত্রিম গুরুগম্ভীর শব্দ শুনে শ্রদ্ধায় মাথা নত করি—কিন্তু তাদের সজীব অবস্থার কথা কোনদিন ভাবি না। ঝিনুক ও শাঁখের নিকট আমরা প্রভূত পরিমাণে উপকৃত।

ঝিনুকের অভিনব বিচিত্র সমাবেশ

যে সকল জন্তুর দেহ অভিন্ন, (unsegmented) প্রাণীতত্ত্ববিদগণ তাদের শম্বুকাদি খোলা বিশিষ্ট জীবের (mollusca) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই শ্রেণীর জীবের মধ্যে কেহ কেহ দেহের উপরিভাগে এক প্রকার শক্ত আবরণ দ্বারা শত্রুর হাত হ'তে নিজেদের রক্ষা করে। এই আবরণ চূণ মিশ্রিত একপ্রকার শক্ত উপাদানে গঠিত। শম্বুকাদি খোলা-বিশিষ্ট জন্তুদের তিনভাগে ভাগ করা হ'য়েছে। তাদের মধ্যে Gastropoda এবং Lamellibranchiata এই দুই শ্রেণীই প্রধান। আমাদের আলোচ্য বিষয় ঝিনুক ও শাঁখ এবং কড়ি, শামুক প্রভৃতি শম্বুকাদি খোলা বিশিষ্ট জীবের অন্তর্গত। এই শ্রেণীর নিরীহ অসহায় জীবকে বহু শত্রুর হাত হ'তে রক্ষা পাবার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা এদের উপরিভাগে পূর্ব্বোক্ত শক্ত আবরণে আবৃত করেছেন।

সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে ঝিনুক ও তাদের মৃত স্বজাতিদের খোলা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। গঠন ও বর্ণ বৈচিত্র্যই এদের প্রধান আকর্ষণ। এদের সংগ্রহ করবার লোভ সহজে সংবরণ করা যায় না। খোলার এবং গঠনের তারতম্য হেতু ঐ জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণীদের প্রাণীতত্ত্ববিদগণ প্রধান দুইভাগে ভাগ করেছেন। ঝিনুকের খোলার উপরিভাগ চ্যাপটা এবং সাধারণত ডিম্বাকৃতি; শাঁখের দৈহিক গঠন সম্পূর্ণ অন্যরূপ, দেহের উপরি অংশ কুণ্ডলী আকারে গঠিত।

শাঁখ, শামুক প্রভৃতি যাহাদের দেহ কুণ্ডলী আকার, তারা Gastropoda শ্রেণীর; আর ঝিনুক Lamellibranchiata শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। শাঁখ জাতীয় প্রাণীদের মুখের দিকে একটি ঢাকনি থাকে। শত্রুর স্পর্শ পেলেই ঐ ঢাকনি দ্বারা তারা আক্রমণের পথ রুদ্ধ করে। শরীরের উপরিভাগে শক্ত আবরণ থাকায় সহজে কেহ ক্ষতি করতে পারে না।

সামুদ্রিক শাঁখের গঠন ও বর্ণচ্ছটা বিশেষ দর্শনযোগ্য। কুণ্ডলী আকার এবং এই জাতীয় প্রাণীর অপর সকল বৈশিষ্ট্যই 'রক্ত শাঁখে'র মধ্যে রূপায়িত হ'য়েছে। এই জাতীয় শাঁখের চূড়া কুণ্ডলীকৃত হ'য়ে ক্রমশ সূচাগ্র হ'য়েছে। দেহের উপরিভাগ মসৃণ। কয়েক জাতীয় শাঁখের খোলার উপরিভাগ আবার অসমতল। গাত্রদেশ বহু উঁচু নীচু চূড়া দ্বারা সজ্জিত এবং বিচিত্র বর্ণ বিশিষ্ট। কোন কোন জাতীয় শাঁখের উঁচু চূড়াগুলি আবার বিপরীতভাবে সুসজ্জিত। পাংশু বর্ণ ও গুম্বজ আকৃতির শাঁখের মধ্যে এইরূপ গঠন-

বৈচিত্র্য দেখা যায়। শাঁখসংগ্রহকারীদের নিকট কয়েক জাতীয় শাঁখ বিশেষ আদরের। বিশেষত 'পেলিকেনের পা' নামক শাঁখই বিশেষ দর্শনযোগ্য। ইহাদের নীচের দিকের একদিক থেকে চার পাঁচটি মুখ বার হ'য়ে এর গঠন-সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করেছে। আমাদের দেশে ইহারা 'পঞ্চমুখী' শাঁখ নামে পরিচিত।

কয়েক জাতীয় সামুদ্রিক শঙ্খ

শম্বুকাদি খোলাবিশিষ্ট প্রাণীদের মধ্যে কড়ি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। শাঁখের ন্যায় ইহাদের দেহ সেরূপ কুণ্ডলীকৃত নয়। সেইজন্য সাধারণে ইহাদের Gastropoda শ্রেণীর অন্তর্গত নয় বলে ধারণা করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহারা ঐ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য প্রথমে কোনরূপ মুদ্রার প্রচলন ছিল না। সে সময় কড়ির বিনিময়ে দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করা হ'ত। আদিম অধিবাসীদের বেশভূষা বিচিত্র: বর্ণের কড়ি দ্বারা সুসজ্জিত করার প্রথা ছিল। মেয়েদের অলঙ্কার রূপেও ইহাদের ব্যবহার করা হ'ত। আমাদের দেশে আজও লক্ষ্মীপূজায় কড়ির উপস্থিতি লক্ষ্য হয়। পূর্ব্বেকার ন্যায় হিন্দুদের নিকট আজও কড়ি ও শাঁখ শ্রদ্ধার পাত্র। ব্যবসায়ে ইহাদের প্রয়োজন যথেষ্ট। শাঁখের শাঁখা হিন্দু রমণীদের অতি পবিত্র অলঙ্কার। শঙ্খ শিল্পে বাঙ্গলা এক সময় খুব উচ্চ স্থান অধিকার করেছিল। ইহা ছাড়া শাঁখ হ'তে প্রস্তুত চুণের ব্যবসা আমাদের দেশে বহুদিনের। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—ব্যবসা-ক্ষেত্রে শাঁখের প্রয়োজনীয়তা কতখানি। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহাদের উপকারিতার উল্লেখ আছে। কড়ি, শঙ্খ, প্রবাল, মুক্তা প্রভৃতিকে আয়ুর্ব্বেদ মতে শোধন করে মারাত্মক রোগের ঔষধরূপে বহুদিন থেকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এইবার Lamellibranchiata শ্রেণীর প্রাণীদের কথা বলা যাক। ঝিনুকই এই জাতীয় জীবের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর প্রাণীরা বালুকার মধ্যে নিজেদের আত্মগোপন করে রাখে। জীবিত অবস্থায় ইহাদের আবির্ভাব সচরাচর চোখে পড়ে না। ককলস, স্কালোপস এবং রেজার ঝিনুকের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্কালোপস ঝিনুকের খোলা হলুদে ও গোলাপী রংয়ের সংমিশ্রণে রঞ্জিত। খোলার উপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত নালার মত অগভীর খাঁজ কাটার দাগ। দাগগুলি বিচিত্র বর্ণের এবং দর্শনযোগ্য।

ককলস নামক ঝিনুক আকারে স্কালোপ্সের মতই। তবে খোলার উপরিভাগস্থ দাগগুলি নালার মত গভীর।

'রেজার' ঝিনুক
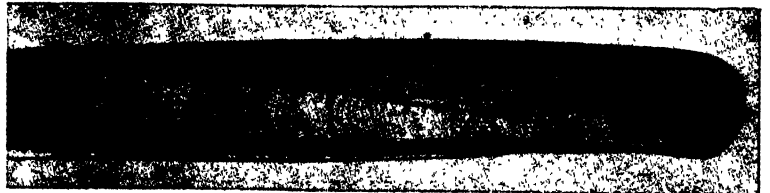
উভয় জাতীয় ঝিনুকের গাত্রদেশে ক্রমঃবৃদ্ধির চিহ্ন লক্ষিত হয়। ইহার দ্বারা প্রাণীতত্ত্ববিদগণ ইহাদের বয়স নির্দ্ধারণ

করতে পারেন। ঝিনুক বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রেণী বিভাগ অনুসারে ইহাদের গঠনের তারতম্য এবং বর্ণ-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। হার্ট ককলস নামক ঝিনুকই আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ক্ষুদ্র শ্রেণীর কয়েক জাতীয় ঝিনুক বালুকা অপেক্ষা কঠিন পাথরের গর্ত্ত মধ্যে বাস করা নিরাপদ মনে করে।

সাধারণে ঝিনুকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রাণীদের সমুদ্র-জাতীয় জীব বলে অভিহিত করেন। কিন্তু কয়েক শ্রেণীর ঝিনুককে পল্লীগ্রামের জলাতে বাস করতে দেখা যায়। কোন কোন দেশের পল্লীবাসীরা উহাদের খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। প্রাণীতত্ত্ববিদগণের মতে এইরূপ পুষ্করিণীবাসী ঝিনুক সমুদ্রবাসী ঝিনুকের আদি বংশধর। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা যায় ইহাদের সহিত সমুদ্রের কয়েক জাতীয় ঝিনুকের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। তবে সকল শ্রেণীর সমুদ্রবাসী ঝিনুকের বংশধর সাধারণ জলাতে পাওয়া যায় না।

রোমানদের সময় থেকে ঝিনুকের ব্যাপক ব্যবসা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চলে আসছে। ঝিনুকের বোতামের সহিত আমরা বহুদিন থেকে বিশেষভাবে পরিচিত। কয়েক জাতীয় ঝিনুক মানুষের উপাদেয় খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। ওস্‌টার নামক ঝিনুক মানুষের খুব লোভনীয়। ইহাদের দেহ ডিম্বাকৃতি, খোলা মসৃণ। উপরিভাগের রং পাঁশুটে এবং শরীর মধ্যে মানুষের বহু আকাঙ্ক্ষিত অতি লোভনীয় 'মুক্তা' বিদ্যমান। খাদ্য সংগ্রহ কৌশল ঝিনুকের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জলের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণের সময়ে উদরে প্রচুর পরিমাণে জল ভর্ত্তি করে এবং এক অদ্ভুত কৌশলে খাদ্য এবং অক্সিজেন অংশ নিষ্কাশন করে। দুইটি খোলা অর্থাৎ ঢাকনির মধ্যে ঝিনুকের দেহ সুরক্ষিত। খোলা দুটি একেবারে জোড়া নয়। উভয় খোলার একদিকের কিছু অংশ পরস্পর সংযুক্ত থাকায়

কয়েক জাতীয় ঝিনুক পাথরের উপর গর্ত্ত তৈয়ার ক'রতে সক্ষম। তাদের মধ্যে (বাঁদিকের) 'পিড্ডক' অন্যতম। (ডানদিকে) পাথরের উপর ঐ জাতীয় ঝিনুক কর্ত্তৃক গর্ত্ত খননের ছবি

ঝিনুক ইচ্ছানুযায়ী খোলা দু'টিকে ফাঁক এবং বন্ধ করতে পারে। খোলা দু'টিকে ফাঁকা অবস্থায় রেখে জল মধ্যে ইহারা অবস্থান করে। কাহারও স্পর্শ পেলেই খোলা দুটি বন্ধ করে দেয়। কেহ সহজে খুলতে পারে না। ঝিনুক আশ্রয় স্থানের সহিত নিজেকে সংযুক্ত করে প্রবল স্রোতের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে। ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ইন্দ্রিয় "yellowish foot"। এই ইন্দ্রিয়ের উপরিভাগে "Byssus" মাংসগ্রন্থি অবস্থিত। এই শ্রেণীর জীব উক্ত
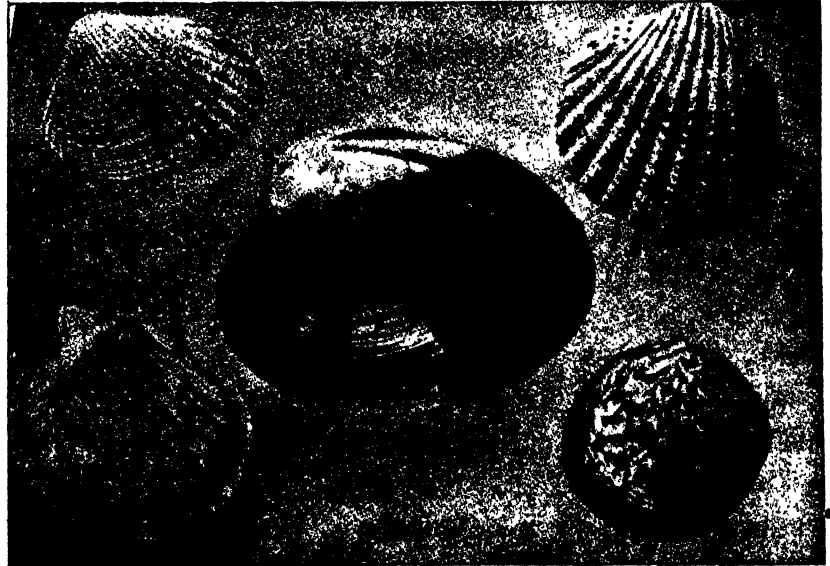
বৃটিশদ্বীপপুঞ্জের পাঁচ শ্রেণীর ঝিনুক

মাংসগ্রন্থি থেকে একপ্রকার চুলের মত সূক্ষ্ম আঁস প্রস্তুত করে। ইহারই বৈজ্ঞানিক নাম "Byssus"। জলের সংস্পর্শে ঐ

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের 'রেড্‌হোয়েলক'। ইহাদের উপরিভাগ মসৃণ

আঁশের ন্যায় বস্তু শক্ত আকার ধারণ করে এবং ঝিনুক পাথর কিম্বা অন্য কোন শক্ত পদার্থকে আশ্রয় স্থানরূপে স্পর্শ করলেই উক্ত আঁশের সাহায্যে উহার সহিত দৃঢ়রূপে সংযুক্ত করে। পুষ্করিণীবাসী ঝিনুক অপেক্ষা সমুদ্রবাসী ঝিনুকদের মধ্যে এই ইন্দ্রিয় সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। এমন কি কোন কোন জাতীয় ঝিনুকের মধ্যে এই ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হয়। প্রবল ঝটিকা, খরস্রোত, পর্ব্বত প্রমাণ ঢেউ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ঝিনুককে তার আশ্রয়স্থল হ'তে বিচ্যুত করতে পারে না। ঝিনুকের খোলার ভিতর-ভাগ সাদা, নীলাভ, উজ্জ্বল বর্ণের।

কয়েক জাতীয় ঝিনুকের বৈচিত্র্য আছে। ইহাদের যে কেহ ডিম প্রসবে এবং বংশধরদের জন্মদানে সক্ষম হয়। আবার কয়েক শ্রেণীর মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের শ্রেণী বিভাগ আছে। স্ত্রী-ঝিনুক প্রায় ৩০০,০০০ ডিম প্রসবে সমর্থ। পুত্তলি (Larval) অবস্থায় ইহারা মাছের উপর পরগাছারূপে জীবনধারণ করে।

মাত্র কয়েক জাতীয় ঝিনুকের অভ্যন্তরে সাদা সাদা দানা গঠিত হয়। ইহাই মুক্তা নামে পরিচিত। আর ঐ সমস্ত ঝিনুক বা শুক্তিকে মুক্তা-শুক্তি (Pearl mussel) বলে। মুক্তার বর্ণ নীল-লোহিত, সাদা এবং কাল।

মুক্তা-শুক্তির খোলার সঙ্গে পুষ্করিণীবাসী দুই জাতীয় ঝিনুকের খোলার সাদৃশ আছে। খোলাগুলির আকার ডিমের আকারের মত এবং উহার গাত্রদেশে অর্দ্ধবৃত্তাকারে বহু চিহ্ন দেখা যায়। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের কয়েক জাতীয় ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা পাওয়া যায়। তবে উহারা সেরূপ মূল্যবান নহে। আমাদের দেশে ভারত সমুদ্রের উপকূলে প্রাপ্ত ঝিনুকে মুক্তা পাওয়া যায়। প্রাণীতত্ত্ববিদগণ বলেন, শম্বুক জাতীয় প্রাণীদের ন্যায় ঝিনুকও টাইফয়েড্‌ রোগের বীজাণু বহন করে।

ইটালীতে প্রাচীন রোমীয় প্রণালী অনুযায়ী ঝিনুকের চাষ এখনও চলছে। বর্ত্তমান অবস্থায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঝিনুকের চাষের যে প্রভূত উন্নতি দেখা দিয়েছে তার জন্য কয়েকটি দেশের কৃতিত্ব বেশী। পুত্তলিকা অবস্থায় ইহাদের সমুদ্র হ'তে সংগ্রহ করা হয় এবং বিশেষভাবে নির্ম্মিত জলাশয়ে তাদের রাখা হয়। সেখানে তারা পূর্ণ-ঝিনুক অবস্থায় পরিণত হয়। ঝিনুক-চাষের প্রথম অবস্থায় বহু দোষ ত্রুটি ছিল এবং বিভিন্ন দেশে চাষের প্রণালীও ভিন্নরূপ ছিল। বর্ত্তমানে চাষের প্রণালী সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়েছে। দেশকাল ভেদে চাষের প্রণালীর তারতম্য কিছু থাকলেও ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, জাপান ও আমেরিকায় ঝিনুক-চাষের প্রণালী বিজ্ঞানসম্মত এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃটেনের হোয়াইট ষ্টেবল্‌, কোলচেষ্টার এবং ব্রাইটলিংসী-তে ঝিনুক চাষের ব্যবসা রয়েছে। ফ্রান্সে 'পর্ত্তুগীজ' নামক ঝিনুক প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। সুস্বাদু খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় ইহাদের চাহিদা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

ঝিনুককে আত্মরক্ষার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা যেমন অভিনব কৌশল তাদের দিয়েছেন আবার ধ্বংসের নিমিত্ত বহুবিধ শত্রুর ব্যবস্থাও করেছেন। ঝিনুকের শত্রু অনেক। 'ষ্টারফিস' নামক একপ্রকার মাছ ইহাদের বাসস্থান

তিন শ্রেণীর শাঁখের ছবি

আক্রমণ ক'রে মহাবিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে। আমেরিকার স্লিপার লিম্পেট এবং অক্টোপোডাস উভয়ই ঝিনুকের মহাশত্রু।

পৃথিবীর বহুদেশে মুক্তা-শুক্তির ব্যবসা আছে। কিন্তু জাপানের ব্যবসার সহিত অন্য কাহারও তুলনা হয় না। জাপানে সুশৃঙ্খল প্রণালীতে মূল্যবান মুক্তার চাষ করা হয়। ঐ সকল ব্যবসার প্রতিষ্ঠাতা এবং স্বত্বাধিকারী মিঃ কে মিকিমোটো কি ভাবে প্রচুর পরিমাণে মুক্তার চাষ করা যায় তার প্রণালী আবিষ্কার করেছেন। প্রণালীটি সহজ হ'লেও মিঃ মিকিমোটোর উহা আবিষ্কার করতে দীর্ঘ কুড়ি বৎসর লেগেছিল। পরীক্ষাগারে বহুদিন তাঁকে এক কল্পনা-লোকের পিছনে ঘুরে বেড়াতে হ'য়েছিল। বহু অর্থব্যয় এবং লক্ষ লক্ষ ঝিনুককে এই পরীক্ষায় অকালে প্রাণ দিতে হ'য়েছিল। মিঃ মিকিমোটো জাপানের একজন প্রসিদ্ধ ঝিনুক ব্যবসায়ী। তাঁর আবিষ্কৃত ঝিনুক-চাষের প্রণালী অন্যদেশে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। যদিও চাষের বহু প্রণালী সাধারণের নিকট এখনও অজ্ঞাত।

খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক হ্যারোল্ড জে সিফষ্টোন, এফ-আর-জি-এস এক যায়গায় বলেছেন "বৈজ্ঞানিক তার পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিক উপায়ে হীরক এবং রুবী তৈয়ার করতে পারে। উহা আকারে খুব ছোট এবং নিকৃষ্ট হ'লেও—খাঁটি হীরক। কিন্তু মুক্তা তৈয়ারের ক্ষমতা তাহার অসাধ্য।"

মানুষের এই বহু আকাঙ্খিত লোভনীয় বস্তুটির খোঁজে পৃথিবীর কত শত শত নরনারী বিশেষ পরিচ্ছদে ভূষিত হ'য়ে সমুদ্রের অতল গর্ভে পাড়ি দেয়। সহস্র সহস্র ঝিনুক সংগ্রহ করেও সময়ে সময়ে তাদের নিরাশ হ'তে হয়; তবুও মুক্তা লাভের এই অদম্য নেশা তাদের দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রেরণা জাগায়।

আমার স্থিতির মাঝে চিরদিন তুমি বেঁচে রও

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এ

তোমারে সম্মুখে রাখি—কবে যাত্রা সুরু হ'ল মোর,
আগাইয়া আসে সন্ধ্যা, ঘনাইয়া আসে রাত্রি-ঘোর।
কোথায় আমার জন্ম? বিরাট বিশ্বের এই মহাশূন্যতলে
ছিল না অস্তিত্ব মোর কোনখানে বায়ু-জলে-স্থলে;
রূপহীন শূন্যতায়—অবাস্তব বাস্তবতা মাঝে,
কায়াহীন দেহ ছলে, তুমি শুধু পরিপূর্ণ সাজে
সগৌরবে ছিলে বিদ্যমান; আমি ছিনু চিন্তাতে তোমার—
যে চিন্তা প্রকাশ মাগি ব্যথায় কাঁপিত অনিবার।

তোমার চিন্তার ধারা মুক্তি পেল এ বিশ্বের সজীব প্রকাশে,
অসম্পূর্ণ ছন্দে মোর আমিও দাঁড়ানু আসি তাহাদের পাশে।
সেদিন ছিলাম ক্ষুদ্র—মোর মাঝে ছিল নাকো বৃহতের আশা,
বিশ্বের ভগ্নাংশরূপে যদিও ভুভার মাঝে বাঁধিলাম বাসা।
সেদিন চিনি নি মোরে—ক্ষুদ্র-চিত্তে ভাবিলাম ঠিক
চিরন্তন তুমি—আর আমি শুধু অতিথি ক্ষণিক।

অনন্তের যাত্রী তুমি—তুমি মোর যাত্রা-পথ-গুরু,
যেখানে আমার যাত্রা শেষ—সেখানে তোমার যাত্রা সুরু।

আজ আমি ক্ষুদ্র নই, লভিয়াছি বৃহতের দেখা,
বিশ্বের অস্তিত্বখানি মোর মাঝে ধ'রে আছি একা!
তোমাতে আমার জন্ম—তবু আমি বিদ্রোহী মানব—
আমার শক্তির কাছে তব শক্তি মানে পরাভব।

আমি ছাড়া বিশ্ব মিথ্যা, বিশ্ব ছাড়া তুমি সত্য নও,
আমার স্থিতির মাঝে চিরদিন তুমি বেঁচে রও।
পথশ্রমে ক্লান্ত দেহে ধূলিজীর্ণ বিমলিন বেশে,
যাত্রা শেষ হবে মোর হয় তো তোমারই কাছে এসে।
সেদিন আমার যদি প্রয়োজন নাহি থাকে আর,
তুমিও র'বে না পড়ি—রবে শুধু ঘোর অন্ধকার।

আসামের জঙ্গলে

মহারাজকুমার শ্রীসুধাংশুকান্ত আচার্য্য

বেশী দিনের কথা নয়, বৈশাখের ঘটনা। পূর্ব্বেও এখানে অনেকবার শিকার করেছি। মাঝে তিন-চার বছর আর শিকারে যেতে পারিনি। এবার নেশাটা পুরোদমে চেপে ধরায় আসাম বনে ফের রওনা হলুম। চিরপরিচিত স্থানে এতদিন পর এসে সত্যই বড় আনন্দ হল।

দারং জেলার কালাইর্গাতে আমাদের চা-বাগান। বাগানের চার ধারেই জঙ্গল। কোথাও গভীর দুর্ভেদ্য, কোথাও বা ছন, তারাবন ইত্যাদির ছোট-বড় ঝোপ্। এর ভেতরে হাতী বাঘ ভাল্লুক থেকে আরম্ভ ক'রে ছোটবড় নানা জন্তুর বাস। কদাচিৎ গণ্ডারও নাকি দেখা যায়; তবে আজও আমার চোখে পড়েনি। চা-বাগানের গায়ে কতকটা জায়গায় আখ ক্ষেত থাকায় সন্ধ্যাবেলা প্রায়ই হাতী আসে, তখন কুলীর চীৎকার, টীন বাজান, আগুন জ্বালা ও বন্দুক ছোঁড়ার ধুম পড়ে যায়।

শিকারের নিশ্চিত খবর না পেলে সকালের দিকে আমরা প্রায়ই বের হতাম না। তবে বিকালে চা পানের পর সঙ্গীদের নিয়ে মোটরে বা ট্রাকে বের হতাম।

৫ই বৈশাখ, ১৩৪৬ সাল—এ দিনটি আমার জীবনে চিরস্মরণীয়। প্রতিদিনের মত সেদিনও কয়েকজন বন্ধু ও হাগ্ড়া মিস্ত্রীকে নিয়ে ট্রাকে বের হলাম। উদ্দেশ্য—তিতির, বনমোরগ ইত্যাদি শিকার করা; আর যদি ভাগ্যে থাকে তা হ'লে ফেরবার পথে বড় জানোয়ার মারা।

গভীর বনের বুক চিরে রাজপথ। আমরা বাগান থেকে বের হয়ে—বেলা বেশী না থাকায়—ঠিক করলাম, আজ সামনের বাগান পর্য্যন্ত যাব। এই বাগান সাত-আট মাইলের বেশী নয়। শিকার যদি নাও মিলে—খানিকটা বেড়ান হবে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যাবে। অবশ্য প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য বর্ণনা করতে পারে একমাত্র কবি বা চিত্রকর। আমি এ দুয়ের কোনটাই নই। আমার সাধ্যাতীত—তবে এক কথায় বল্‌তে পারি—অপূর্ব্ব!

পূর্ব্বেই বলেছি রাজপথের দুধারে বন, কোথাও গভীর—এমন কি মধ্যাহ্নের তীব্র সূর্য্যকিরণও সেখানকার রহস্য প্রকাশ করতে অক্ষম। আবার কোথাও বা ছোট-বড় ঘাসের ঝোপ্। ট্রাকের উপরে আমি, হাগ্ড়া ও দু-তিনজন বন্ধু, অন্য সবাই ড্রাইভারের পাশে। আমার বন্ধুদের কাজ ভরা বন্দুক বা গুলি দিয়ে আমায় সাহায্য করা।

গাড়ী ধীরে ধীরে চলেছে, আমার দৃষ্টি পথের দু ধারে নিবদ্ধ। কয়েকটি পাখী শিকার করলাম। বেলা ক্রমেই পড়ে আস্‌ছে, সন্ধ্যা তখনও হয়নি—তবে বনপথে তার আভাষ পৌছে গেছে। সবে সূর্য্য অস্ত গেছে, স্বল্পালোকে সাম্‌নের পথটা তখনও দেখা যাচ্ছে। দিনের শেষে পাখীদের ঘরে ফেরবার কলগুঞ্জন কানে আস্‌ছে, কখনও বা দু-একটি পাখীর দল গাছপালার ফাঁক দিয়ে বায়োস্কোপের দৃশ্যের মত চোখে আঘাত করে অদৃশ্য হচ্ছে, রাতের আঁধার ঘনীভূত হবার পূর্ব্বেই নিজ নিজ নীড় পাওয়া চাই—তাই এত তাড়া। নিশাচর পাখী এবং জানোয়ারদের ভেতরও সাড়া পড়েছে—সমস্ত দিন বিশ্রামের পর আহারের অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন। পাখীর পাখার ঝাপ্‌টা ও জানোয়ারের চলার খসখসানি শব্দ মাঝে মাঝে কানে আস্‌ছে। দূরে একটা হোক্‌ড়া (barking deer) ডেকে উঠ্‌ল। বোধ হয় আসন্ন বিপদ থেকে তার সঙ্গীকে সাবধান করছে। অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হয়ে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীদের কাছ থেকে ফেরার তাগাদা উঠ্‌ল। ড্রাইভারকে গাড়ী ঘুরোতে বলে বন্দুক রেখে রাইফেলটা হাতে নিলাম। চোখ ও কান সজাগ রাখলাম—যদি কোন জানোয়ারের দেখা বা সাড়া পাই।

কতটা পথ এসেছি খেয়াল নেই, এমন সময় সাম্‌নের একটা খোলা জায়গায়, মনে হল কালো একটা বড় জানোয়ার। যেই রাইফেলটা তুলেছি, অম্‌নি হাগ্ড়া হাত চেপে ধরে বল্‌ল—"ডাডা না মারবি, উটা কারও পালা কয়ড়া হয়," তার কথায় কান না দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অস্পষ্ট আলোতে যতটা সম্ভব লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার ক'রে সোজা হয়ে দাঁড়াল—প্রকাণ্ড এক ভাল্লুক! আমি তখনই দ্বিতীয়বার গুলি করলাম।

ভাল্লুকটি পড়ে চীৎকার ও গড়াগড়ি দিতে লাগ্‌ল। সঙ্গীদের কাছে বন্দুক বা গুলি চাইলাম, কিন্তু ওরা যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল, কিছুই দিল না। ভাল্লুকটি অন্ধকারে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গীদের বকাবকি ক'রে গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম, খোঁজ ক'রে খানিকটা রক্ত ছাড়া আর কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না। রাত্রে জঙ্গলে আহত হিংস্র জানোয়ারের অনুসরণ করা ঠিক নয়, পরদিন সকালে রক্তের চিহ্ন ধরে খোঁজ করব স্থির ক'রে বাংলোয় ফিরে এলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভাল্লুকটি গুরুতররূপে আহত; বেশী দূর যেতে ত পারবেই না, হয় ত বা মৃতাবস্থায় কাছে কোথাও পাওয়া যাবে। এ ভুল বিশ্বাসের প্রায়শ্চিত্ত আমায় করতে হয়েছে।

রাতটা কোন রকমে কাটিয়ে সকাল বেলায় চা পান করে আমার শিকারী-বন্ধু পচাবাবুকে নিয়ে মোটরে বেরিয়ে পড়লাম, সঙ্গে হাগ্‌ড়া ও জনকয়েক কুলী নিলাম। ভাল্লুকটাকে যে স্থানে গুলি করেছিলাম সোজা সেখানে গিয়ে গাড়ী থেকে নেমে রক্তের দাগ ধরে চল্‌তে সুরু করলাম। কিন্তু কোথায় ভাল্লুক! লতাগুল্মে সমাচ্ছন্ন দুর্গম কুটিল বনের মাঝ দিয়ে রক্তের দাগ ধরে চলেছি—এ চলার আর শেষ নেই! এ চলা যে কি, তা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ জানে না। শিকারের নেশা যাদের পাগল ক'রে তুল্‌তে না পারে তারা যতই শক্তিমান্ হোক্ না কেন—এ কষ্ট সহ্য করার শক্তি তাদের নেই। আহত জন্তু পালিয়েছে প্রাণরক্ষার জন্য, আর উন্মাদ শিকারী চলেছে তার অনিশ্চিত সাফল্যের সুনিশ্চিত নিদর্শন অন্বেষণে—এ যেন জানোয়ার ও মানুষের লুকোচুরি খেলা!

চলেছি—রক্তের চিহ্ন কখনও সোজা লতাগুল্ম বেষ্টিত দুর্ভেদ্য স্থান ভেদ ক'রে, কখনও বৃত্তাকারে ঘুরে ফিরে কোনও গর্ত্তের ভেতরে যেন খানিকটা বিশ্রাম ক'রে অন্যদিক্ দিয়ে চলে গেছে। এম্‌নি ক'রে চার পাঁচ মাইল পথ চলবার পর সাম্‌নে একটা ছোট নালা পড়ল, প্রায় শুষ্ক—তবে বৃষ্টির জল এখানে সেখানে জমা হয়ে আছে। আশা নিরাশায় দাঁড়িয়েছে, এতটা পথ ভারী রাইফেল নিয়ে এইভাবে হেঁটে বেশ পরিশ্রান্ত বোধ করছি। রাইফেলটা একটা কুলীর হাতে দিলাম। বৈশাখ-সূর্য্যের তীব্র কিরণে ও ক্ষুৎপিপাসায় শরীর অবসন্ন। এ অবস্থায় আর অগ্রসর হওয়া উচিত কি-না চিন্তা করছি, এমন সময় একজন বললে, 'চলুন, নালাটা পার হয়ে সাম্‌নের ঝোপটা দেখেই ফেরা যাক।' রাজী হলাম।

ঝোপ্‌টার সাম্‌নে এসে দেখি, রক্তের দাগ একটা বড় গর্ত্তের ভেতর ঢুকেছে। একজন কাছে গিয়ে দেখ্‌ল—ভাল্লুক নেই, তবে রক্তের চিহ্ন ভেতরে গিয়ে ঘুরে ফের ঝোপের মধ্যে গিয়েছে। আমি ঝোপ্‌টায় আগুন দিতে বল্‌লাম; কিন্তু হাগ্‌ড়া বাধা দিয়ে বল্‌ল, যদি ভাল্লুক সেখানে না থাকে ত রক্তের দাগ নষ্ট হয়ে যাবে, আর খোঁজ করা যাবে না। ঝোপটা কেটে পথ করে ঢোকার কথা হল—ভগবানের অভিপ্রায় না আমার দুষ্টবুদ্ধি জানি না—তাতেই সম্মতি দিলাম।

সাম্‌নে দু'জন কুলী পথ করে চলেছে, তারপর আমি, আমার পেছনে রাইফেল নিয়ে আর একজন কুলী, তারপর অন্য সবাই। এমন সময় সাম্‌নের কুলীটা বল্‌ল, 'ঝোপের মধ্যে কাল কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে।' ওর কথা শুনেই আমি হাত বাড়িয়েছি বন্দুক নিতে, এমন সময় বিকট গর্জ্জন ক'রে আহত ভাল্লুক আমাদের আক্রমণ করল। মুহূর্ত্তের মধ্যে কি যেন হয়ে গেল! আমি এক পা পেছনে গেছি বন্দুক নেব বলে, অম্‌নি পেছনের কুলীটার সঙ্গে ধাক্কা লাগায় চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম, ভাল্লুকটা লাফিয়ে এসে আমার বাঁ উরুতে তার প্রতিহিংসার কামড় বসিয়ে দিল। আমিও তৎক্ষণাৎ ওটার মুখে ডান পা দিয়ে এক লাথি মারলাম, ওটা ছিট্‌কে খানিকটা দূরে গিয়ে পড়্‌ল; সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ কানে এল। আমিও উঠে একটা গুলি করলাম; কিন্তু কোন দরকার ছিল না। পচাবাবুর গুলিতেই ওর বন্য-জীবনের সমাপ্তি ঘটেছিল। মৃত ভাল্লুকটার কাছে গিয়ে দেখি যে পাশেই হাগ্‌ড়া মিস্ত্রী পড়ে আছে—দেহ অক্ষত, শুধু হাতের জলের ঘটিটা ভাল্লুকের কামড়ে "ঘটীত্ব" হারিয়েছে। অন্য সব কুলীরা যারা গাছের আশ্রয় নিয়েছিল—এতক্ষণে এসে হাজির হ'ল। সবার মুখে এক কথা—আমার কিছু হয়নি ত? শিকারের উন্মাদনায় ভাল্লুকের কামড়ের কথা এতক্ষণ খেয়াল ছিল না—ওদের কথায়, মনে হতেই দেখি উরুতের কাছে ব্রিচেস্‌টা খানিকটা ছেঁড়া ও কতকটা জায়গায় রক্তের দাগ। তাড়াতাড়ি ব্রিচেস্‌টা খুলতেই খানিকটা রক্ত একসঙ্গে পড়ে গেল এবং

ক্ষত স্থানটি গভীর বলেই মনে হ'ল। একটা কুলীর পাগ্‌ড়ি দিয়ে জোরে বেঁধে দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে ট্রাকের দিকে রওনা হলাম। যদিও সাথীদের ইচ্ছা ছিল—গাছের ডাল দিয়ে ষ্ট্রেচার বেঁধে আমাকে তাতে ক'রে নিয়ে যায়—আমি রাজী হলাম না।

ঐ অবস্থায় এই তিন-চার মাইল পথ কোন রকমে হেঁটে এসে মটরে উঠ্‌লাম। যাবার বেলায় এই সুদীর্ঘ পথ যে কি উন্মাদনায় গিয়েছিলাম তা বল্‌তে পারিনে, তবে ফেরার পথে যতই এগুতে লাগ্‌লাম—পা ততই ভারী হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, এ পা যেন আমার নয়—চোখে সব ঝাপসা হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। ভগবানের অসীম দয়ায় এবং বন্ধুদের শুভেচ্ছায় আজ আমি সুস্থ। বাংলোয় ফিরে স্থানীয় ডাক্তার দিয়ে তখনকার মত ব্যবস্থা ক'রে পরদিনই কল্‌কাতায় রওনা হলাম। ভাল্লুকটি ছিল ছ'ফুট চারি ইঞ্চি—আমার ভোগ ছ'মাস।

এ পর্য্যন্ত শিকার অনেক করেছি। বহু বিপদের সম্মুখীন হয়েছি ও বিপদের হাত এড়িয়েছি, কিন্তু এবারকার ভাল্লুক শিকারে যা ভুল করেছি—এতদিন শিকার করার পর এ ভুল হওয়া অত্যন্ত অন্যায়। কোন শিকারী বনের ভেতরে প্রবেশ করবার সময় হাতের বন্দুক যেন অন্যের কাছে না দেয়। আমার হাতে বন্দুক থাক্‌লে হয় ত এ কাহিনী লিখ্‌বার প্রয়োজন আজ হ'ত না। ভগবানের ইচ্ছাতেই ভুল করেছি ও তাঁরই আশীর্ব্বাদে পুনর্জ্জীবন লাভ করেছি—তাঁর চরণে অসংখ্য প্রণাম।

দুঃখ

শ্রীস্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

দুঃখ কখনো পাইনি।
সেই অমোঘ দান পেলাম তোমার হাতে।
পুড়িয়ে পুড়িয়ে জুড়িয়ে দিলে।

মরুভূমি কেমন ক'রে হ'ল, বিজ্ঞান বলে।
বিজ্ঞান মানি না।
সিংহের ছদ্মবেশে সে বুনোদের ভয় দেখায়,
শেয়াল হাসে।
মানুষ হয়ে মানুষের মনই বুঝ্‌ল না,
বুঝবে ধরিত্রীর অন্তর, নক্ষত্রলোকের অন্তর!
চোখের দেখাটা ফলিয়ে দেখলেই বুঝি দেখা হ'ল?
আঙুল গুণে আঁক্ ক'সে করবে সৃষ্টির মর্ম্মোদ্ধার?
খোল্-করতালের জগঝম্পে কীর্ত্তন জমে,
ভক্তরা 'দশা' পান,
রক্ত-চক্ষু হয়ে কাছা গুঁজতে গুঁজতে ওঠেন।
তারপর, সে কথা বলে কাজ নেই,
যে পান্নালাল, সেই পান্নালাল!
আমি বলি মরুভূমি হ'ল ধরার দুঃখ।
কেমন ক'রে বুঝ্‌লুম?
অনুভূতিতে।
ধূলির সন্তান মৃণ্ময়ীর দুঃখ বুঝ্‌বে না?
'মাটির স্তন্যপান করে যে হ'ল মানুষ,
সে মাটির মর্ম্মবাণী বুঝ্‌বে না ত বুঝ্‌বে কে?
সবাই ত মাটির ঘট।
হ'লে হবে কি? দুয়োরাণীর ছেলে হ'ল সুয়োরাণীর পুষ্যি।
স্বেচ্ছায় তাকে মা বলে ডাক্‌লে,
গর্ভধারিণী হলেন দাসী, রইলেন ঢেঁকিশালে।
ছেলে হ'ল সুখের দুলাল, ভোগের বরপুত্র।
চাল্ বোল হ'ল আমীরি,
মাতৃভাষা পর্য্যন্ত গেল বিষিয়ে।
আমিও ছিলুম্ আর পাঁচ জনের মত।
কুঁড়ে ছেড়ে উঠ্‌লুম প্রাসাদের চন্দ্রশালায়।
পাখীর ডাকে আর ঘুমভাঙে না,
ভাঙে রশনচৌকির বাদ্যে।
নৈবেদ্যের অন্ন মুখে রোচে না,
চাই চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের চতুর্ভোজ।

চলেছিলাম স্বয়ম্বর সভায়, বরমাল্যের প্রত্যাশায়।
পথে দেখা তোমার সঙ্গে।
থামালাম রথ, বল্লাম এস, বস পাশে,
ফিরুক রথ ঘরে।
তুমি বল্‌লে—নেমে এস।
এলাম নেমে।
বনের পথ দেখিয়ে বল্‌লে—সঙ্গে চল।
চল্লাম তোমার সাথে, রৈল রথ রাজপথে পড়ে।
বনের গভীরে যখন পৌছালাম তোমার হাত ধরে,
বল্‌লে, হাত ছাড়, আমি ঘরে যাব,
রইব তোমার প্রতীক্ষায়, তুমি পথ খুঁজে এস।
তদবধি আমি বনচারী।
খুঁজ্‌ছি তোমাকে, তুমি নিরুদ্দেশ।

কোথায় তোমার কুটীর, আজিও সন্ধান পাইনি।
পেয়েছি দুঃখ, যে দুঃখ অভিভূত করে না,
মুক্তির পথ অন্বেষণ করায়।
তাই জানি, তোমায় আমি পাবই পাব।

গীতার উপদেশ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

গীতার মতে সংসারে সুখ অপেক্ষা দুঃখই বেশী—"পুনর্জন্ম দুঃখালয়-মহাশাশ্বতং"। গীতা—৮।১৫, অর্থাৎ—জন্ম দুঃখের আলয় এবং অনিত্য।

"জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনং"।—১৩।৮, অর্থাৎ—জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদা চিন্তা করেন যে সংসার জন্ম মৃত্যু জরা ও ব্যাধির দুঃখে পরিপূর্ণ।

সংসারের দুঃখ হইতে নিস্তার লাভের একমাত্র উপায় হইতেছে ঈশ্বর লাভ—

> মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতং।
> নাপ্নুবন্তি মহাত্মনঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ৮।১৫

মহাত্মাগণ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া দুঃখপূর্ণ সংসারে আর জন্মগ্রহণ করেন না এবং সম্যক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।

কি উপায়ে ঈশ্বর লাভ করা যায়, এ বিষয়ে গীতা বলিয়াছেন, মৃত্যুর সময় যদি ঈশ্বরের চিন্তা করিয়া দেহত্যাগ করিতে পারা যায় তাহা হইলে ঈশ্বর লাভ করা যায়।

> অন্তকালে চ মামেব স্মরণ্মুক্ত্বা কলেবরং।
> যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৮।৫

—মৃত্যুর সময় আমাকে (ঈশ্বরকে) স্মরণ করিয়া যে দেহত্যাগ করে সে আমাকে প্রাপ্ত হয়।

জীবনের অধিকাংশ সময়ে যে চিন্তা প্রবল থাকে মৃত্যুর সময় স্বভাবতই সেই চিন্তা মনে উদয় হয়। মৃত্যুর সময় শরীর ও মন উভয়ই অবশ হইয়া যায়, তখন ইচ্ছানুরূপ চিন্তা করা যায় না। কেহ যদি ইচ্ছা করেন যে মৃত্যুর সময় আমি ঈশ্বর চিন্তা করিব, তাহা তিনি পারিবেন না—যদি জীবনের অধিকাংশ সময় অন্য চিন্তায় তিনি অতিবাহিত করেন। যদি অধিকাংশ সময় সংসারের চিন্তা প্রবল থাকে তাহা হইলে মৃত্যুর সময় সংসারের চিন্তাই মনে উদয় হইবে এবং তাহার ফলে পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

> যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
> তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৮।৬

—যে যে ভাব স্মরণ করিয়া মৃত্যুর সময় দেহত্যাগ করা যায় মৃত্যুর পর সেই ভাব প্রাপ্ত হইয়া যায়।

এজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, জীবনের প্রতিমুহূর্তে ঈশ্বরের চিন্তা করিবার চেষ্টা করা উচিত—তাহা হইলে মৃত্যুর সময় আপনা হইতে ঈশ্বরের চিন্তা উদয় হইবে এবং মৃত্যুর পর ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারা যাইবে।

> অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
> তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ৮।১৪

—যে ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া সর্বদা আমার স্মরণ করে, সেই নিত্যযুক্ত যোগী সহজেই আমাকে প্রাপ্ত হয়।

তাহা হইলে কি গীতার উদ্দেশ্য এইরূপ যে, কোনও কর্ম করিবার প্রয়োজন নাই, সর্বদাই ঈশ্বরকে স্মরণ করাই উচিত? না, গীতার এরূপ উদ্দেশ্য নহে। প্রথমত, সকল কর্ম ত্যাগ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে, জীবন ধারণের জন্যও কিছু কর্ম করা প্রয়োজন।

> ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ। ১৮।১১

—দেহধারী জীবের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে কর্ম ত্যাগ করা সম্ভব নহে। কেবল তাহাই নহে। আমাদের স্বভাব বা প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া প্রতিমুহূর্তেই আমরা কর্ম করিতেছি।

> ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
> কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৩।৫

—কোনও ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। সকলেই স্বভাবজাত গুণের প্রভাবে অবশ হইয়া কর্ম করে।

আমি মনে করিলাম, আমি ঈশ্বরের চিন্তাই করিব, অন্য চিন্তা করিব না। ভাবিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। অল্পক্ষণ পরে আমার অজ্ঞাতসারে আমার মনের মধ্যে নানারূপ সংসার চিন্তা উদয় হইল। তাহাতেই আমার কর্ম করা হইল। কেবল যে শরীর দ্বারাই কর্ম করা যায় তাহা নহে, মনের দ্বারাও কর্ম করা যায়। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যে আমাদের মন নানাবিধ চিন্তা করে, তাহার কারণ এই যে আমাদের মন নির্মল নহে। কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি হইতেছে আমাদের মনের মলিনতা। আমরা ইহজন্মে বা পূর্বজন্মে যে অন্যায় কর্ম করিয়াছি তাহার ফলে আমাদের মন মলিন হইয়াছে। আমাদের মনের মলিনতা দূর করিতে হইলে আমাদের সৎকর্ম করা প্রয়োজন। সৎকর্ম অথবা কর্তব্য কর্ম কি? এ বিষয়ে গীতা বলেন,

> তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্য ব্যবস্থিতৌ। ১৬।২৪

—কোন্ কর্ম কর্তব্য, কোন্ কর্ম কর্তব্য নহে এবিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ।

আমাদের বুদ্ধির দ্বারা সকল সময় ঠিকমত কর্তব্য নির্ণয় করিতে পারা যায় না। কারণ আমাদের বুদ্ধি অনেক সময় নির্মল থাকে না। বুদ্ধিতে যদি তমোগুণ প্রবল থাকে তাহা হইলে ধর্মকে অধর্ম বলিয়া মনে হয়, অধর্মকে ধর্ম বলিয়া মনে হয়।

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ১৮।৩২

—যে বুদ্ধিতে অধর্মকে ধর্ম বলিয়া মনে হয়, সকল বস্তু বিপরীত স্বভাবের বলিয়া প্রতীত হয়, সেই তমোগুণাবৃত বুদ্ধির নাম তামসী বুদ্ধি।

শাস্ত্রবিধান কখনও ভুল হইতে পারে না, কারণ শাস্ত্রে ঈশ্বরের আদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রুতিস্মৃতি মমৈবাজ্ঞে
(বিষ্ণুসহস্র নামস্তোত্র ভাষ্যে শঙ্করাচার্য উদ্ধৃত পুরাণ বাক্য)

ভগবান বলিতেছেন—"শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞা।"

গীতায় ভগবান ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির কর্তব্য কর্মের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছি এই বুদ্ধিতে নিজ বর্ণবিহিত কর্ম করিলে ঈশ্বর লাভ করা যায়।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততং।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ১৮।৪৬

—যে ঈশ্বর হইতে সকল প্রাণীর উৎপত্তি, যিনি সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, নিজ বর্ণবিহিত কর্মের দ্বারা তাঁহাকে আরাধনা করিলে মানব সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

আমরা অনেক সময় কর্তব্য কর্ম করি—কিন্তু ঠিক যেভাবে করা উচিত সেভাবে করি না, তাহার ফলে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হয়। মনে করুন, গ্রামে একটি স্কুল লইয়া দলাদলি বা মারামারি হইতে পারে। এজন্য কোন্ কর্ম কর্তব্য শুধু তাহাই জানিলে হইবে না, কর্ম ঠিকমত করিবার প্রণালী জানা প্রয়োজন। এ বিষয়ে গীতার উপদেশ অমূল্য। গীতা বলিয়াছেন যে, কর্মফলের জন্য আমাদের আকাংখা থাকিবে না, অর্থাৎ—নিষ্কাম হইয়া কর্ম করিতে হইবে।

'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'—তোমাদের কর্মেই অধিকার আছে, কর্মফলে অধিকার নাই।

বেদ যজ্ঞ করিতে বলিয়াছেন। বেদ ইহাও বলিয়াছেন যে, যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ হয়। গীতা বলিয়াছেন যে, যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ হয় ইহা সত্য, কিন্তু স্বর্গলাভের আকাংখায় যজ্ঞ করা উচিত নহে। কারণ স্বর্গে কেহ চিরকাল থাকিতে পায় না, পুণ্য ফুরাইলেই পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়, পৃথিবীতে আসিলেই দুঃখভোগ অনিবার্য। গীতা বলিয়াছেন, যজ্ঞ করা উচিত—কিন্তু স্বর্গভোগের আশায় যজ্ঞ করা উচিত নহে, নিষ্কাম ও অনাসক্তভাবে ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতেছি এই বুদ্ধিতে যজ্ঞ করা উচিত। অধিকন্তু ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া এবং অহংকার ত্যাগ করিয়া কর্ম করা উচিত। এইভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্ম করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, অর্থাৎ—কাম ক্রোধ প্রভৃতি মলিনতা দূর হয়। ইহাই গীতাবিহিত কর্মযোগ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোক এই প্রণালীতে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিবে—শিষ্য গুরুর সেবা করিবে, পুত্র পিতা-মাতাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে, রমণী পাতিব্রত্য ধর্ম পালন করিবে; এইভাবে সমাজে ধর্মভাব বৃদ্ধি পাইবে, দেশ বহিঃশত্রু এবং দস্যু তস্করের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবে, কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতিতে ধনাগম হইবে এবং বেকার-সমস্যা নিবারিত হইবে, গৃহে শান্তি ও পবিত্রতা বিরাজ করিবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিবে। রাজা রাজত্ব করিবে—নিজের সুখের জন্য নয়, সমাজের কল্যাণের জন্য। বৈশ্য ধন সঞ্চয় করিবে, তাহারও উদ্দেশ্য হইবে সমাজের সেবা, সমাজের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের সেবা। যে বিষয়ভোগ শাস্ত্রবিরোধী নহে, অনাসক্তভাবে এবং ইন্দ্রিয়সংযম পূর্বক সে বিষয় ভোগ করিবে। মনে রাখিবে যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগ প্রথমে সুখকর হইলেও পরিণামে দুঃখপ্রদ। নিজ নিজ কর্ম অনুসারে জীব কখনও সুখ কখনও দুঃখ পাইয়া থাকে। সুখ দুঃখ উভয়ই অনিত্য। ইহা উপলব্ধি করিয়া সবদা ঈশ্বর চিন্তা এবং কর্তব্য সম্পাদন করিবে। গীতা-নির্দিষ্ট প্রণালীতে কর্ম করিলে সমাজে সুখ শান্তি ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য হয়। কিন্তু তাই বলিয়া বিষয়সুখভোগকে জীবনের উদ্দেশ্য করা উচিত নয়। ভোগকে জীবনের উদ্দেশ্য করা গীতার শিক্ষার বিরোধী।

এইভাবে কর্মযোগে চিত্ত শুদ্ধ করিয়া শিষ্য তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর নিকট গিয়া প্রণিপাত এবং সেবার দ্বারা জ্ঞানোপদেশ লাভ করিবে (৪।৩৫) বৈরাগ্য এবং অভ্যাসের দ্বারা চিত্ত স্থির করিয়া নির্জনস্থানে একাকী বসিয়া যোগসাধন করিবে (৬ অধ্যায়)। ঈশ্বরে ভক্তিপূর্বক এইভাবে সাধন করিলে ক্রমে ক্রমে গুরুপদিষ্ট তত্ত্ব সকল প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারিবে (৭ অধ্যায়)। তখন বুঝিতে পারিবে যে, ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে অবস্থান করিতেছেন। সংসার দুঃখ হইতে মোক্ষলাভ করিবার জন্য ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সাধন করিতে করিতে ক্রমশ সিদ্ধিলাভ করিবে (৮ অধ্যায়)। মান, কপটতা, হিংসা, ক্রোধ প্রভৃতি বর্জন জ্ঞানলাভের সহায়ক (১৩ অধ্যায়), দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অন্তঃস্থিত আমাদের যে জ্ঞানস্বরূপ আত্মা আছে সাধনার দ্বারা তাহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় (১৩।২৪)। আত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু, সর্বভূতের মধ্যে এক ব্রহ্মই বিরাজিত (১৮।২০), এইরূপ অনুভব হয় বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানীর দ্বেষহিংসাক্রোধঘৃণা কিছুই থাকে না।

অধিকার

শ্রীনির্ম্মল সুর

ছায়াচ্ছন্ন রাজপথ এলায়িত দেহে পড়িয়া আছে। উহারই বুকের জন-চলাচল শহরটিকে মুখর করিয়া রাখিয়াছে। রাস্তার ধারেই বাজার। বিচিত্র লোকের সমাগম সারাদিন ধরিয়া স্থানটিকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখে।

এধারে সারি বাঁধিয়া পর পর তিনখানি ছোটবড় মনোহারী দোকান; তাহার পাশে খাবার ও মুদিখানার কারবার চলে। মনোহারী দোকান তিনখানির সামনে একটু নাতিপ্রশস্ত জায়গা পড়িয়া আছে। একটা পুরাতন অশ্বত্থ-বৃক্ষ স্থানটিকে ছায়াবহুল করিয়া রাখিয়াছে।

উহারই নীচে একটি কুষ্ঠগ্রস্ত অন্ধ ভিখারী আজ কয়েকমাস যাবৎ পথিকের করুণা ভিক্ষা করে। অক্ষম অঙ্গগুলিতে বিচিত্র ছেঁড়া কাপড় জড়াইয়া সামনের দিকে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া রাখে। তাহার করুণ আর্ত্তনাদ কাহারও কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে; তাহাতেই তার দিন চলে। কেহ বা হয় ত তাহার বিছানো কাপড়ের উপর একটি পয়সা ফেলিয়া তাহার বীভৎস দশা নিরীক্ষণ করে। পণ্যবিক্রয়ার্থিনী কোন কোন গ্রামাগতা দরিদ্রা কখনও বা আপন দরিদ্রাবস্থা ভুলিয়া মানব-মনের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিকে জাগরূক করিয়া তোলে। শাকবিক্রয়লব্ধ দুই আনার পয়সা হইতে কখনও একটি পয়সা ভিখারীর অঞ্চলে পতিত হইয়া দাত্রীকে আশীর্ব্বাদ ফিরাইয়া দেয়।

সন্ধ্যার কিছু পরে ভিখারী ধীরে ধীরে লাঠি ভর করিয়া ওঠে। ভিক্ষা-লব্ধ অর্থ সারাদিনের বিচিত্র গোঙানির ক্লেশ ঢাকিয়া মুখে কিঞ্চিৎ তৃপ্তি ফুটাইয়া তোলে। এইরূপেই যায় ওর দিন।

কয়দিন কোথা হইতে একটি অন্ধ ভিখারিণী তাহার দশ বৎসরের ছেলের হাত ধরিয়া উহারই কিঞ্চিৎ দূরে আসন পাতে। পথিকের দৃষ্টি সপুত্র ভিখারিণীর প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়। কেহ বলে—তোমার কি আর কেউ নেই? ভিখারিণীর শীর্ণ গণ্ড বহিয়া জল গড়াইয়া পড়ে; বলে—ভগবান আছেন মা, আর আপনারা আছেন আমার মা-বাপ।

দিনশেষে ভিখারীর অঞ্চল আর উহার মুখে হাসি ফুটাইতে পারে না। ভিখারিণীর শিশুপুত্র উহারই সামনে বলে, 'আমাদের অনেক পয়সা হয়েছে মা! এখানকার লোকেরা খুব ভাল, নয়?'

দিনের খেয়া শেষ হয়। একজনের হাসি অন্যের মুখের হাসি কাড়িয়া লয়—ইহাই বুঝি জগতের নিয়ম। ভিখারীর কপালের চামড়া বুঝি এই কয়দিনেই বেশী ঝুলিয়া পড়ে।

ছুটির বারের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। একটুখানি ভুল বোঝা, একটি মাত্র অবহেলার বাণী যেমন আনন্দোচ্ছল মুখমণ্ডলে বিষাদের কালিমা ঢালিয়া দেয়—তেমনই ঘনাইয়া আসে রাত্রির অন্ধকার। ওর কোন রূপ নাই, ও শুধু রূপহীনতারই প্রতীক। বাহিরের আঁধার অন্তরের আঁধারের সহিত মিশিয়া একাকার হইয়া যায়—লুপ্ত সেথায় আলোকজ্জ্বল প্রসারতা, লুপ্ত সত্যকে শিবকে সুন্দরকে চিনিবার দৃষ্টি। রাস্তার পথিক পাতলা হইতে আরম্ভ করে—আসে অসাড়তা, প্রাণহীনতা, মৃত্যু।

ভিখারিণী পুত্রকে ডাকিয়া অঞ্চল গুটাইতে বলে। দিনের আশা হয়তো তাহার পূর্ণ হইয়াছে। ভিখারীকে ডাকিয়া সহানুভূতির সুরে সে বলে, 'ওগো, শুনছ? রাত হ'ল যে, বাড়ী যাবে না?' ভিখারীর অপূর্ণ আশা ঝঙ্কার দিয়া ওঠে, 'আমি বাড়ী যাই না যাই, তাতে তোমার কি গা? ভারী আমার দরদী গো! বলি এতদিন ছিলে কোথায়? উড়ে এসে জু'ড়ে বসে আমার ভাত মারবার মতলব? সর্ব্বনেশে মেয়েমানুষ কি আর সাধে বলে! হায় ভগবান!'

ভিখারিণীর আনন্দিত আনন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে—ওখানে যেন মুহূর্ত্তে রাত্রির অন্ধকার নামে। তথাপি মনের তেজ কথা কহিয়া ওঠে, 'আমি উড়ে এসে কি তোমার বুকে জুড়ে বসেছি গা? ভালকথা বললাম—রাত হ'ল, বাড়ী যাবে না? তা নয়, বুকে যেন ওঁর শেল বিঁধল। ভিক্ষের জায়গা কারুর কেনাকালি নাকি?'

—'কেনাকাটি নয় তো কি? এতদিন কোথায় ছিলেন মহারাণী শুনি? কতদিন ধরে মাটী কামড়ে থেকে থেকে যেই দুপয়সা পাবার রাস্তা হ'ল, অমনি শকুনির মত উড়ে এসে বসলেন। আজ সারাদিনে তিনটে পয়সা মোটে। বাড়ীওয়ালী কি আজ থেতে দেবে? আর একজনের পেটের ভাত মারলে ভগবান বিচার করবেন।'

—'মা, চল আমরা যাই। ও লোকটা ভাল নয়, জোচ্চোর। দেখছ না কি রকম করছে?'—

—'লোককে গাল দিতে নেই বাবা। চল, আমরা বাড়ী যাই বাদল।'—ভিখারিণী কণ্ঠ হইতে বিষাদ ঝরিয়া পড়ে।

ভিখারী ক্ষুব্ধ রোষে গর্জ্জন করিয়া ওঠে, 'আমি ছোটলোক? হ্যাঁরা, আমি তোর বাড়া ভাতে ভাগ বসিয়েছি, না তুই বসিয়েছিস্ ইতর মেয়েমানুষ কোথাকার।'

—'বাদল! বাদল! জিজ্ঞেস ক'রত···না না থাক।' ভিখারিণীর অন্ধ নয়ন হইতে নীরবে অশ্রু ঝরিয়া পড়ে। দৃষ্টি শুকাইয়া গিয়াছে কিন্তু বুকভাঙা অশ্রু তো শুকায় না। অশ্রু-সিঞ্চিত ক্ষীণ কণ্ঠ প্রতিবাদ জানায়, 'দেখ বাপু, ভাল হবে না বলছি। বাপ-চোদ্দপুরুষকে ছোটলোক বলো না।'

—'নাঃ বলবে না!' ভিক্ষুক টানিয়া টানিয়া বলে—'ভারী ভদ্দোর লোকের ঝি এসেছেন ভিক্ষে করতে! ভদ্দোর লোকের ঝি—তো ভিক্ষে করিস্ কেন রে মাগী?'

ভিখারিণীর ক্ষণিক-নীরব কণ্ঠ আবার উত্তেজিত হইয়া ওঠে, 'হ্যাঁ রে মুখপোড়া মিনসে, তার তুই কি জানবি? কপাল মন্দ ব'লেই না তোর মত ছোটলোকের সঙ্গে আজ কথা বলতে হচ্ছে? নইলে তুই যেতিস্ আমার দুয়ারে —ভিক্ষে দিয়ে বিদেয় করতুম—সেলাম জানিয়ে চলে যেতিস্। সবই কপাল রে, সবই কপাল।' ভিখারিণীর কণ্ঠ বারেক রুদ্ধ হইয়া আসে। অন্তরের ক্ষোভ তথাপি বাধা মানে না, বলে, 'ভিক্ষে করি কেন?'—আপন সন্তানটির মস্তকে হাত রাখিয়া বলে, 'তিনকুলে তোর আর কেউ আছে যে বুঝবি? বাদল, চল বাবা।'—ভিখারিণী স্নেহভরে বাদলকে জড়াইয়া ধরে।

ভিখারী স্বল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া তাচ্ছিল্যের সহিত বলে, 'তোর ছেলে আছে তো আমার কি? দুদিন পরে তুইই বসে বসে খাবি। আমারও ছেলে ছিল রে ছিল।'—উদাস দৃষ্টি মেলিয়া ও আকাশের দিকে কি যেন খুঁজিয়া বেড়ায়। মনের গহনস্তরের স্মৃতির যে সকল রেখা নিয়ত কাঁপে তাহারাই বুঝি মূর্ত্তি ধরিয়া আকাশে, বাতাসে, দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া হাজির হয়।—আটমাসের শিশু; সুন্দর নধর দেহ। মনশ্চক্ষু আজিও তাহার ছবি দেখিতে পায় সেদিন-কারের মতই স্পষ্ট। ভিখারীর উদ্ধত তাচ্ছিল্যভরা কণ্ঠ কে যেন রোধ করিতে চায়। মন ঝিমাইয়া আসে; মনে হয় তুচ্ছ সারাদিনে রোজগার তিন পয়সা। কিয়ৎ পরে কোমলকণ্ঠে নিজেই প্রশ্ন করে, 'কিন্তু এক ছেলে কি বাঁচে? হয় তো সে মরে গেছে। আর বেঁচে থাকলেই বা আমার কি? হ্যাঁগা বুড়ি, বলতে পারো এক ছেলে বাঁচে কি-না।'

মুহূর্ত্তমধ্যে ভিখারিণীর ক্ষোভ দূর হইয়া যায়। সন্তানবতী ভিখারিণী জননী নিমেষে বুঝিতে পারে সন্তানহারা জনকের ব্যথা। ব্যথার বুঝি জাত নাই, দরদেরও নয়। আপন পুত্রের মস্তকে হাত রাখিয়া ভিখারিণী সহানুভূতিসূচক স্বরে বলে, 'ভগবানের দয়া থাকলে বাঁচে বই কি বাবা। আমার বাদলকে তাঁর পায়েই তো ফেলে রেখেছি। কোথায় তোমার বাড়ী বাপু?'

ভিখারীর কণ্ঠে নিরাশা উপচাইয়া পড়ে, 'আর বাড়ী! সব নিজের দোষেই খুইয়েছি। আমার পাপের ফল আমি ছাড়া আর কে ভুগবে বল?'—নিরাশা আবার তাহার কণ্ঠকে চাপিয়া ধরে। ভিখারিণী কি যেন ভাবিয়া পায় না।

গভীর নিস্তব্ধতা চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। অশ্বত্থবৃক্ষের কম্পমান শিথিল পাতাগুলি অদৃষ্টের মত অলক্ষিতে ঝরিয়া পড়ে। আঁধার সমুদ্রে যেন বান ডাকিয়া গিয়াছে এখন পূর্ণ জোয়ার। ভিখারীর অন্তরের নিষ্পেষিত দিনগুলির স্মৃতি মাথা তুলিয়া সাপের মত দুলিতে থাকে; উহারা যেন নিজেকেই ক্ষত বিক্ষত করিতে চায়।

—'বাদল!'—ভিখারী ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকে। সে ডাক ভিখারিণীর অন্তরে তৃপ্তি-সুধা বর্ষণ করে।

—'বাদল, তোমায় উনি ডাকছেন বাবা; উত্তর দিতে হয় যে।'—ভিখারিণী আদরের সুরে বলে। ঐ অন্ধ, কুষ্ঠগ্রস্ত, উদ্ধত ভিখারীর প্রতি সহানুভূতিতে তাহার অন্তর গলিয়া গিয়াছে।—'ওঁর আচলে এই পয়সা চারটে রেখে এস, কেমন?'—চুপি চুপি বলিয়া ভিখারিণী চক্ষু দুইটিকে মেলিয়া

ধরিবার চেষ্টা করে। এই তৃপ্তি যেন শুধু অনুভব করিবারই নহে, চক্ষু দিয়া দেখিবারও বটে।

—'বাদল!'—ভিখারীর ম্রিয়মান কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হইয়া ওঠে, 'বাদল, তোমার বাবা বেঁচে নেই, নয়? আহা তিনি যদি থাকতেন! কেন তিনি তোমাদের পথে বসিয়ে গেলেন বল ত! তোমাদের জন্যে আমার, হ্যাঁ এই পাজী অন্ধ কুষ্ঠগ্রস্ত উদ্ধত ভিখারীরও যে কান্না পায় বাদল! কেমন তুমি দেখতে?, খুব ভাল? টানা টানা চোখ? কোঁকড়ান চুল?—' বলিয়া সে নিজেই শিহরিয়া ওঠে: গায়ের উপর দিয়া যেন কোন সরীসৃপ পদচারণা করিয়া বেড়ায়।

ভিখারিণী আপন পুত্রকে মধ্যস্থ রাখিয়া বলে, 'বল বাদল—তোমার বাবা বেঁচে আছেন। হ্যাঁ তিনি সুখেই আছেন! সুন্দর ভদ্দোর লোকের চেহারা—অনেক টাকা হয় ত বা। তবু আমরা ভিক্ষে করি—পেটের দায়েই বাপু, পেটের দায়েই।'—ভিখারিণীর অন্তর যেন কাঁদিতে গিয়া হাসিয়া ফেলে, 'তবু বাদল তার মাকে নিয়ে ভিক্ষে করে গো—ভগবান জানেন, বাদল ভিখিরীর ছেলে নয়—তবু তবু তাকে ভিক্ষে করেই খেতে হয়। তিনি বেঁচে থাকুন, সুখে থাকুন, ভুলে থাকুন, তবু বাদলের বাবা বেঁচে থাকবেন।—ভিখারিণী যেন হাঁফাইয়া ওঠে।

ভিখারীর মন কৌতুক খুঁজিয়া পায় বোধ হয়; 'এ বড় আশ্চর্য্য ত! তিনি সুখে আছেন, তবু তোমাদের ভিক্ষে করতে হয়?'

—'হ্যাঁ বাবা, তবু করতে হয়। তিনি যে আমাদের ভিখিরীই ক'রে গেছেন। তাতেই তিনি হয় তো আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন। কি-না ছিল আমার? যথাসর্ব্বস্ব ঢেলে দিয়েছিলাম তাঁর পায়ে। তবু সইল না গো, সে চাওয়া ছ'মাসের বেশী সইল না; শুধু বাদলকে দিয়ে আমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে তিনি উধাও হলেন। মরেই সকল অশান্তি মেটাতাম বাবা, কিন্তু বাদলকে একলা ফেলে যাই কি করে বল ত? বল না, তা কি পারা যায় কখনও?'—ভিখারিণীর কণ্ঠে নীরবতা ধারণ করে। সে নীরবতা যেন, রাত্রির অন্ধকারকে গাঢ়তর করিয়া তোলে। দুই জোড়া অন্ধ নয়নে জল ঝরে, না অগ্নিবর্ষণ হয়, কে বলিবে? কে বলিবে এই গাঢ় অন্ধকারের ওড়না উড়াইয়া কোন্ অপদেবতা উহাদের অন্তরে নৃত্য করিয়া ফেরে। দুইজন ভিখারীর ভারাক্রান্ত হৃদয় আকাশ-বাতাসকে অধিকতর ভারী করিয়া তোলে—নহিলে পাতাটিও নড়ে না কেন? বিষণ্ণ আকাশ কোটী কোটী আঁখি মেলিয়া সন্তর্পণে ইহাদের জীবন-কাহিনী শুনিয়া যায়।

—'বাদল, এদিকে আসবে একবার? আজ যেন একেবারেই দেখতে পাচ্ছি না। আমার পয়সা কটা·· যদি এধার ওধার দুই-একটা···' ভিখারীর কণ্ঠে মিনতি ও আশা ঝরিয়া পড়ে।

—'যাও বাবা, পরের উপকার করতে হয়—নইলে ভগবান আমাদের খেতে দেবেন কেন।'—ভিখারিণী পুত্রকে আগাইয়া দেয়।

সন্ত্রস্ত বাদল ভিখারীর নিকট আসিয়া আঁচল গুটাইতে থাকে। ভিখারীর দুর্দ্দমনীয় লোভ বাদলকে স্পর্শ করে। তাহার গায়ে মুখে হাত বুলাইয়া ভিখারী তৃপ্তি পাইতে চায়।

—'বাদল, কপালে এটা কি? পড়ে গিয়েছিলে বুঝি? আহা!'

বাদল ভিখারীর পয়সার সন্ধান করে—আর ভিখারিণী উত্তর দেয়, 'ওর বাবা ওকে আছাড় মেরেছিলেন আমার শেষ গহনাটি নেবার জন্যে।'

ভিখারী আতঙ্কে শিহরিয়া ওঠে বলে, 'এ্যাঁ! এমন বাপও আছে নাকি? বাদল তোমার বাবা ভারী নৃশংস—'

ভিখারিণী উত্তর দেয়, 'দেবহাটার বৈষ্ণবরা দয়ার অবতার ছিলেন বাবা। শুধু কুসঙ্গই, তাঁর বিবেক হরণ-করেছিল।'

—'দেবহাটার বৈষ্ণবরা? খুলনার দেবহাটা?'

—'হ্যাঁ বাবা, জান দেখছি—'

—'হরিদাস বৈষ্ণবের ছেলে নিবারণ দাস?'

—'তুমি কি ক'রে জানলে বল ত?'

—'আমি? আমি যে তাকে চিনতুম।' ভিখারীর শুষ্ককণ্ঠে অট্টহাস্য ফুটিয়া ওঠে, 'সে যে মদ খেয়ে, লম্পট-গিরি ক'রে চোখের মাথা খেয়েছে···সে এখন···'

—'বেঁচে আছেন?'

—'হ্যাঁ বাদলের মা, সে এখনও বেঁচে আছে। বেঁচে আছে কুষ্ঠ নিয়ে, বেঁচে আছে অন্ধ চক্ষু নিয়ে, বেঁচে আছে···'

—'তুমি চুপ কর গো চুপ কর—আমি শুনতে চাইনা সে কথা। তুমি জান না নিশ্চয়। গোঁসাই, তুমি মিথ্যাবাদী।'

—'মিথ্যাবাদী আমি? তোমাদের যে পথে বসিয়েছে সেই নিবারণদাও আজ পথের ভিঁখারী, তার স্ত্রী অন্ধ ভিখারিনী, তার ছেলে ভিক্ষে মেগে বেড়ায়।'—ভিখারী সোজা হইয়া দাঁড়ায়। হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া ভিখারিনীর নিকট আগাইয়া আসিয়া বলে, 'বাদলের মা, ময়না! শুনছ? নিবারণ দাস আজও বেঁচে আছে। আছে ভগবান, আছে তাঁর বিচার, আছে পেটের জ্বালাকে ছাপানো বুকের দহন, হাসির পর কান্না আছে, আছে কুষ্ঠ, আছে ভিক্ষা, নেই শুধু নিজের স্ত্রীকে স্পর্শ করার অধিকার, নেই বাদলকে দেখবার দৃষ্টি, নেই মৃত্যু—'

সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে আর একটি হাত হাঁতড়াইয়া ফেরে সে বাদলের মা'র।

এই আকস্মিকতার মধ্যে বসিয়া বাদল শুধু হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে।

সর্ব্বহারা মা

শ্রীমানকুমারী বসু

সেই দিন
অমানী যামিনী ঠেলি
কেন এলে উষা তুমি!
হেথা যে আমার বাছা
নীরবে ছিল রে ঘুমি।
তোমার পরশ পেয়ে
কেন গো সে জাগিল না,
চাঁদমুখে সুধা মেখে
'মা, মা' বলি ডাকিল না।
কত রক্ষা, কত মন্ত্র
কত সঞ্জীবনী দিয়ে,
তার শিরে উপাদানে,..
শয়নে রাখি যে নিয়ে
কোন ভয় র'বে নাকো
দেবতা রক্ষিবে তারে,
বড় যে ভরসা বল
কি হইল সে আঁধারে!
বিশ্ব বুঝি ঢেলে দিল
বুক ফাটা অশ্রুধারা,
কি দুর্য্যোগ অমানিশা
প্রকৃতি সর্ব্বস্বহারা!
নিখিল ডুবিয়া গেল
কি যে আকুলতা বানে
সমস্ত অবনী যেন
বেঁচে ছিল না কো প্রাণে।
তাই বড় ভয়ে ভয়ে—
বুকে লইলাম টানি,
তবু সে যে জাগিল না
প্রাণের প্রতিমাখানি!

কেন রে সে হাসিল না
কেন খুলিল না আঁখি,
কাঙালের ধন সে যে
তাও ভুলে গেল নাকি!
কোথা গেল কেন গেল
কেমনে রহিল ভুলি,
হেথা যে আকুল তার
সাধের পুতুলগুলি?
গঠিত সংসার তার
নীরব আঁধারে কাঁদে,
চিরকাল তরে রাহু
গরাসিল মোর চাঁদে!
জনমের মত নাকি,
হারায়েছি আঁখিতারা,
ওরে সরবস্ব ধন
তোর মা যে সর্ব্বহারা!

জড়বিশ্বের স্বরূপ

শ্রীকানাইলাল মণ্ডল এম-এস-সি

জড়জগতের প্রকৃতি জান্‌বার জন্য প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত একদিকে অনেকে যেমন দৃষ্টি প্রদান করেছেন তাঁদের অন্তরের দিকে এবং বিশ্বকে কল্পনা করেছেন মনের সৃষ্টিরূপে, অন্যদিকে তেমনই বহির্জগত জ্ঞাতার অনুভূতি-নিরপেক্ষ এবং একান্ত সত্য বলেও অনেকের বিশ্বাস জন্মেছে, শেষোক্ত মনোভাবের উপরই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন যুগেও দেখা যায়, ডেমোক্রিটাস ও লুক্রিসিয়াস—সকল বস্তুই অপরিবর্ত্তনীয় এবং সৃষ্টি ও ধ্বংসের অতীত, পরমাণুর দ্বারা গঠিত—বলে ধারণা করেছিলেন। ঐ পরমাণু দর্শনে বস্তুর নিত্যতা অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে বস্তুর পরিমাণ একরূপ আছে এবং বাহিরের সহিত গতিবিধি না থাক্‌লে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে বস্তু পরিমাণে সকল সময়ে সমান থাকে একথাও মেনে নেওয়া হয়েছে। বিশ্ব সেখানে পরিকল্পিত হয়েছে এক বিরাট মঞ্চরূপে, যার উপরে জগতের একমাত্র আদি দ্রব্য—পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন ভিন্ন দলে এবং বিভিন্ন বেশে অভিনয় করে চলেছে, নিজত্ব না হারিয়ে। বিশ্বরঙ্গমঞ্চের পরমাণুরূপী যে সকল অভিনেতার উপর অমরত্ব আরোপ করা হয়েছে তাদের অবস্থিতি অনুমিত হয়েছে স্থানে ও কালে।

বিজ্ঞানের নবযুগে প্রাকৃতিক জগতে নিয়মানুবর্ত্তিতা সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর বস্তুকণাই বিশ্বে প্রধান বলে স্বীকৃত হতে থাকে এবং যন্ত্রবৎ ক্রিয়ার ফলেই জগতের ঘটনাবলী—এই ধারণার জন্ম হয়। নিউটনের জগতে একমাত্র বাস্তব ছিল—স্থান, কাল, বস্তুকণিকা ও শক্তি। নিউটনের মতে বিশ্বব্যাপী স্থানে বস্তুকণিকার গতি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং বস্তুর গতি থেকেই জগতের যা কিছু ঘটনা ঘটে থাকে। এরপর সমগ্র জড়জগত যে যন্ত্র ভিন্ন কিছু নয়, এই ধারণা বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যেরূপ জোরের সঙ্গে প্রকাশ পেতে থাকে—ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত তার কোনরূপ কম্‌তি দেখা যায় না। পদার্থবিদ্যাবিদ্‌ হেল্‌মহোজ ঘোষণা করেন, "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য—মেকানিকাল্‌ বা বলবিদ্যায় তার পরিণতি লাভ। লর্ড কেলভিনও স্পষ্ট স্বীকার করেন, যন্ত্রের আদর্শের খোঁজ যে সকলের মধ্যে তিনি পান না সেই সমুদয়ই তাঁর কাছে দুর্ব্বোধ্য ঠেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের বিশ্ব-প্রকৃতির কার্য্যকে যান্ত্রিক ক্রিয়ারূপে দেখাবার প্রয়াস বিশেষভাবে সফল হয়। ওয়াটারষ্টন, ম্যাক্‌স্‌ওয়েল্‌ এবং আরও অনেকে ঘূর্ণ্যমান অসংখ্য বস্তুকণার কল্পনায় গগনের ক্রিয়াদি ব্যাখ্যায় সমর্থ হন। জীবনের ক্রিয়া পর্য্যন্ত যান্ত্রিক ব্যাখ্যা লাভ করে। সমস্ত বিশ্বই যদি যন্ত্রের নিয়মে চলে, জীবনই বা কেন তার বাইরে পড়বে? এই যুক্তিতে স্থির করা হয়, নিউটনের মনের সঙ্গে একটা মুদ্রাযন্ত্রের পার্থক্য কেবল জটিলতায়। দুইয়েরই কাজ বাইরে থেকে পাওয়া প্রেরণায় সাড়া দেওয়া।
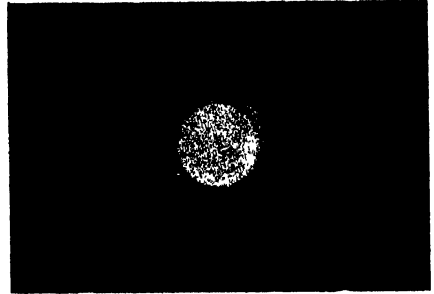
আলোকরশ্মির দ্বারা উৎপন্ন ডিফ্র্যাকসন চক্র

আণবিক ও যান্ত্রিক প্রণালী গ্রহণে বাধা ঘটে আলোকের বর্ণনা দানের সময়। প্রথম যুগের বৈজ্ঞানিকেরা স্বভাবত ধারণা করেছিলেন, বন্দুক থেকে যেভাবে গুলি বার হয়—আলোকমূল হতেও সেইরূপ কণিকার প্রবাহ চলে থাকে। আলোকের সরল গতি, প্রতিফলন, প্রতিসরণ প্রভৃতি ক্রিয়া নিউটন কণিকা-নির্গমনের নিয়মে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু কণিকা-প্রবাহের দ্বারা আলোকের ক্রিয়া ব্যাখ্যায় ত্রুটি ধরা পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে আলোকের সরল গতির ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায়, ক্ষুদ্র দুই আলোকরশ্মিপুঞ্জের প্রত্যেকটা পর্দ্দার আলোকচিহ্ন অঙ্কিত করে বটে, কিন্তু যদি একটা অপরটার উপর গিয়ে

পড়ে তবে আলোক অংশত অন্ধকারে পরিণত হয়, তা ছাড়া আলোকের সম্মুখভাগে বৃহৎ কোন বস্তু রাখলে স্পষ্ট যেমন তার ছায়া পড়ে, বস্তুর আকার ছোট হ'লে সেরূপ ছায়া উৎপন্ন হয় না। তেমনি আবার কোন বৃহৎ ছিদ্রের ভিতর দিয়ে আলোকের প্রবাহ চল্‌লে পর্দ্দার উপর একটা আলোকময় দাগ পড়ে—কিন্তু ছিদ্র ছোট হ'লে পর্দ্দার উপর আলোছায়ার সমকেন্দ্রীয় চক্রশ্রেণী সৃষ্টি হয় (১নং চিত্র)। আলোককে জলের তরঙ্গের অনুরূপ কিছু কল্পনা করলে তবে ঐ সকল ক্রিয়ার ব্যাখ্যা হয়। জলের মধ্যে তরঙ্গ যেমন সম্মুখের বাধা ঘুরে অপর পাশে মিলিত হয় অথবা সঙ্কীর্ণ স্থানের ভিতর দিয়ে বয়ে যাবার পর উন্মুক্ত স্থান পেলে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়, উপরের ক্ষেত্রেও সেইরূপ ঘটছে। কাজেই সমগ্র বিশ্বে আলোকবাহী এক সূক্ষ্ম বস্তু—ইথারের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে আলোককে সেই ইথার-

ইলেকট্রন দ্বারা উৎপন্ন ডিফ্র্যাকসন-চক্র
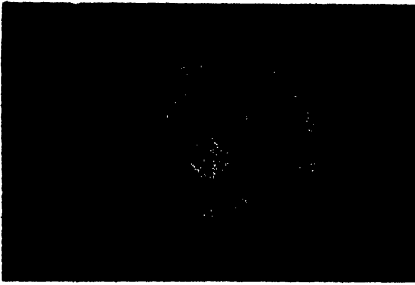
সমুদ্রে তরঙ্গ বলে ভাবাই সুবিধার মনে হয়। সপ্তদশ শতাব্দী আলোককে কণিকাবৃষ্টি বলে ভেবেছিল, পরের যুগ তাকে তরঙ্গ-প্রবাহ মনে করে; আলোকের ন্যায় তড়িত সম্বন্ধেও কণিকার ধারণা পরিত্যাগ করতে হয় এবং গত শতাব্দীর শেষভাগে আলোক পর্য্যন্ত তড়িত-চৌম্বক তরঙ্গ বলে স্বীকৃত হয়। মোটের উপর উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিতে বৈজ্ঞানিকেরা এই জেনে নিশ্চিন্ত হন যে, বিশ্ব জগতের আদিতে একদিকে আছে—বস্তুর বিচ্ছিন্ন কণিকা এবং অপরদিকে নিরবিচ্ছিন্ন শক্তি-তরঙ্গ।

উনবিংশ শতাব্দী প্রায় শেষ হওয়ার সঙ্গে জড়জগত সম্বন্ধে চিন্তাধারার অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটতে আরম্ভ হয়। ক্রমে জানা যায়, পরমাণু আদি-বস্তুকণা নয়। ইলেকট্রন, প্রোটন, পজিট্রন, নিউট্রন—এই সকল মূল কণিকার সমবায়ে তার গঠন। স্থূল পরীক্ষায় যা সত্য বলে মনে হয়েছিল, সূক্ষ্মতর পরীক্ষায় ক্রমে তার ভুল ধরা পড়তে থাকে। একদিকে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের পরীক্ষায় এই যুগান্তকারী ধারণা পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে আসে যে, বস্তুই শুধু অবিভাজ্য কণিকাসমূহের দ্বারা গঠিত নয়, বিকীর্ণ শক্তি অতি ক্ষুদ্র রশ্মিকণাসকলের সমষ্টি এবং ঐ শক্তিকণা অবিভাজ্য। ১৯০৯ সালে আইনষ্টাইন বিকীর্ণ শক্তিকে কণিকার সঙ্গে স্পষ্টভাবে জড়িত ক'রে কণিকাবাদকে নূতন রূপে প্রকাশ করেন। ঐ মতের মূল কথা এই যে, জলধারায় যেমন জলকণাসমূহ বর্ত্তমান থাকে, গ্যাসের স্তূপে পৃথক পৃথক অণু ঘুরে বেড়ায়, রশ্মির মধ্যেও তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা মিলে থাকে। ঐ রকম আদি রশ্মিকণার নাম দেওয়া হয় ফোটন। তরঙ্গের ধারণা অবশ্য বাদ পড়ে না। আলোকের ফুটো ইলেকট্রিক এফেক্ট বা তাড়িতক্রিয়া তার কণিকারূপের প্রকৃষ্ট পরিচয় দেয়। কম্‌টনের পরীক্ষার ফলও কণিকার পক্ষ সমর্থন করে। আলোকের তরঙ্গ রূপের পক্ষে প্রমাণ দেয় ডিফ্র্যাকসন প্রভৃতি ক্রিয়া। কেবল আলোকই নয়, সকল রকম রশ্মিকেই এখন 'কণিকা-তরঙ্গ' অর্থাৎ কণিকা ও তরঙ্গের মিলিত রূপ বলে কল্পনা করা প্রয়োজন হয়েছে। অন্য পক্ষে, জড় বস্তুর ক্ষেত্রে ধরা পড়ছে যে ইলেকট্রন ও প্রোটন—এই দুই আদিকণা অবস্থা বিশেষে তরঙ্গের আকার ধারণ করতে পারে। বিকীর্ণ রশ্মির ন্যায় ইলেকট্রনও বিকীর্ণ রশ্মির জন্ম দেয় (২নং ছবি)। উইল্‌সন্ চেম্বারে ইলেকট্রনের ফটো তুললে তাকে কণিকা বলে বোধ হয় সত্য, কিন্তু সোনার সূক্ষ্মপাতে তার প্রতিফলন ও প্রতিসরণের আলোকচিত্র গ্রহণ করলে তার তরঙ্গরূপ ধরা পড়ে। তবে কি কণিকা ও তরঙ্গের মধ্যে কোন ভেদই নেই, কণিকা তরঙ্গের এবং তরঙ্গ কণিকার রূপ গ্রহণ করতে পারে? অনেক বৈজ্ঞানিক এখন গণিতের প্রতীকে এই বস্তুতরঙ্গ সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত আছেন এবং কণিকা ও তরঙ্গের মিলন সাধন ক'রে পদার্থ বিজ্ঞানের নূতন বিভাগ—wave mechanics-এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। একটা উপমা দিলে বস্তুতরঙ্গের মোট কথাটা ধারণা করা সহজ হবে। চলন্ত গাড়ীর চাকায় একটা সাদা দাগ থাকলে গাড়ীর বেগ যখন বাড়তে থাকে, ঐ বৃত্তকে তখন একটা ঝাপসা বৃত্তের আকার ধারণ করতে

দেখা যায়। বৃত্তের কিনারার দিকে ঝাপসা ভাব বেশী হয়। আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্য হয়ে গেলেও চিহ্নটা তার মধ্যে বর্ত্তমান
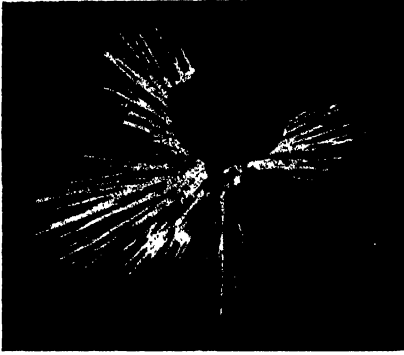
দ্রুতগামী আল্‌ফা কণিকার প্রবাহ

আছে বলে আমাদের জানা থাকে। ঝাপ্‌সা বৃত্তটীকে ঘূর্ণ্যমান তরঙ্গপুঞ্জের এবং মূল দাগটীকে ইলেকট্রন-কণার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীয় প্রোটনের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রনের তরঙ্গরূপে বৈজ্ঞানিক বোরের নিরেট ইলেকট্রন ও তার কক্ষ লোপ পেয়েছে। সকল দিকের বিচারে বস্তু ও শক্তির দ্বৈতরূপ অস্বীকার করবার উপায় এখন দেখা যায় না। জড় ও শক্তি প্রকৃতিতে যে ভিন্ন নয়, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়—একটী যে ভাবে অপরটীতে পরিবর্ত্তিত হয় তার থেকে। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণ মিলছে যে, জড়বস্তু শক্তিতে এবং শক্তি বস্তুতে পরিণত হতে পারে। দ্রুতগামী আল্‌ফা কণিকার সাহায্যে লিথিয়াম পরমাণু ভাঙবার কালে বস্তুর কতক অংশ শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হয়ে থাকে এবং উইল্‌সন্‌ চেম্বারের পরীক্ষাবিশেষে বিকীর্ণ শক্তি থেকে বস্তুকণার জন্ম হতে দেখা যায়। বিশ্বব্যাপী স্থানে দুই প্রকার পরিবর্ত্তনই ঘটে চলেছে। এতে ভাববার কারণ আছে। বর্ত্তমানে কেবলমাত্র শূন্য স্থান এবং তড়িত চৌম্বক তরঙ্গকে বিশ্বের আদি বলে গণ্য করে; সেই দুইটীর ভিত্তিতে সমগ্র সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা চলে।

পরমাণুর ক্ষুদ্র জগতে ইলেকট্রনের অনিশ্চিত আচরণ এবং রেডিয়ামধর্ম্মী পরমাণুর আপনা আপনি ভঙ্গ হবার অনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া থেকে অনিশ্চয়তাবাদ নামে আর এক সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর এই ধরণের পর্য্যবেক্ষণ থেকে অনেকে সিদ্ধান্ত করেছেন—আমরা মোটামুটিভাবে দেখি বলেই প্রকৃতির মধ্যে নিয়মের সন্ধান পাই। প্রকৃত-পক্ষে প্রকৃতি যে স্বাধীন পথে চলে সূক্ষ্ম ধরণের পরীক্ষায় তা ধরা পড়ে, আইনষ্টাইন-প্রবর্ত্তিত আপেক্ষিকতাবাদও বিংশ শতাব্দীর জগতকে নূতনভাবে দেখাচ্ছে। পূর্ব্বযুগে স্থানকে গণনার মধ্যে না এনে বস্তুকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নিউটন বস্তুসমূহের মধ্যে আকর্ষণী শক্তির কল্পনা করে তার সাহায্যে গ্রহাদির গতি ব্যাখ্যায় সমর্থ হয়েছিলেন। আপেক্ষিকতাবাদ শক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করে বস্তুর উপস্থিতিতে স্থানের যে বক্রতা ঘটে তার জন্য বস্তুপিণ্ডের গতির জন্ম হয় এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে। সময়কে স্থানের সঙ্গে মিলিত করে নিউটন পর্য্যন্ত দেখেন নাই। আপেক্ষিকতাবাদ জড়িত স্থানকালের চার উপাদানের কাঠামোর উপর বিশ্বের প্রতিষ্ঠা করে তার গঠনকে ইন্দ্রিয়াতীতভাবে উপস্থাপিত করেছে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং সেই আবিষ্কারজাত নূতন অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের বাস্তব জগত-সংক্রান্ত চিন্তাধারার কেবলই পরিবর্ত্তন ঘটছে দেখা যাচ্ছে। জাততত্ত্বের

আইনষ্টাইন

ব্যাখ্যায়, বিশেষত গণিতীয় ব্যাখ্যাও পরিচিত বিশ্বের ধারণা চারিদিক থেকে ব্যাহত হচ্ছে। সাধারণের বিচারে

টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি যা-কিছু আমরা চারিপাশে দেখতে পাচ্ছি, সে সকলই একান্তরূপে বাস্তব। বার্কলির ন্যায় দার্শনিকের মতে বস্তুর অনুভূতি যতক্ষণ, ততক্ষণ মাত্র তার অস্তিত্ব। আলেকজাণ্ডারের ন্যায় আধুনিক বাস্তবপন্থী দার্শনিক কিন্তু জগতের বস্তুনিচয়ের স্বাধীন অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। বৈজ্ঞানিক মতবাদই এক্ষেত্রে আলোচনার বিষয়। বর্ত্তমানে দেখা যায়, বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও কেহ কেহ বহির্জগতকে অস্বীকার করে মনোজগতের আশ্রয় গ্রহণ করবার দিকে চলেছেন। কারণ তাঁরা মনে করেন, বাস্তবের খোঁজে বিজ্ঞানের পথে অগ্রসর হয়ে অবাস্তবের মধ্যে গিয়ে তাঁরা পড়েছেন। শেষ পরিণতিতে তাঁরা বস্তুর সন্ধান পাচ্ছেন না, সূক্ষ্ম জগতের চিন্তাই সেখানে প্রধান
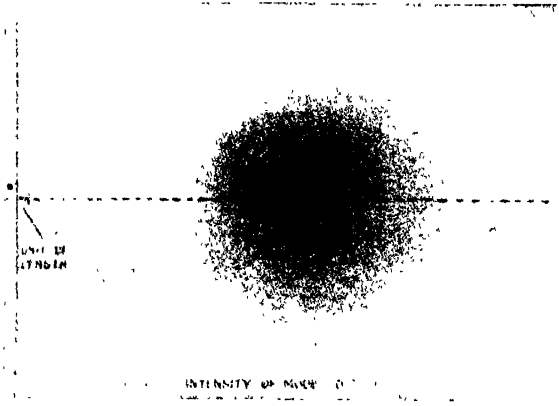
হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রকৃতি

হয়ে উঠেছে। অপরপক্ষে, নিজের থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে নিয়ে জড়জগতকে পরীক্ষা করবার ও তার সত্য নিরূপণ করবার পক্ষে কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি বলেও অনেকের বিশ্বাস, জড় জগতের প্রকৃতি সম্বন্ধে দুই বিপরীত মতের মূল কথা কি এখন দেখা যেতে পারে। 'পদার্থবিদ্যা ও দর্শনে' এডিংটন "আমাদের অভিজ্ঞতায় মনই প্রথম ও প্রত্যক্ষ" এই মত প্রকাশের পর মন্তব্য করেছেন যে, জড়বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের কথাকে কঠোর বাস্তব ও আনুমানিক সিদ্ধান্ত এরূপ ভাগে বিভক্ত করা চলে না। নক্ষত্র ও ইলেকট্রন এ দুটীর মধ্যেও তিনি তুলনা করেছেন এবং যে চিহ্নের দ্বারা আমরা উহাদের বিষয় অবগত হই সে কথা উত্থাপন করে দেখিয়েছেন যে, নক্ষত্রটী ইলেকট্রন অপেক্ষা বেশী বাস্তব একথা সত্য নয়। 'বস্তু জগতের প্রকৃতি' নামক পুস্তকের এক অধ্যায়ে এডিংটন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য যেভাবে আমাদের মনকে মুগ্ধ করে তার বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের দিক থেকে ব্যাপারটী মাত্র এই। ইথার-তরঙ্গ চোখে পড়বার পর ফটো ইলেকট্রিক ক্রিয়ায় চক্ষুস্নায়ুতে যে সাড়া জাগে, সেই সাড়া মস্তিকের কেন্দ্রদেশে পৌঁছে। এই ইথার-তরঙ্গে আনন্দ জন্মাবার কি আছে? আনন্দের উপাদান অন্তরে। মনই ঐ তুচ্ছ ব্যাপারকে মায়ায় আবৃত করে আমাদের খুশী করে তোলে। সত্যের সন্ধানে যাঁর বিশেষ আগ্রহ এমন কোন ব্যক্তি যদি ভাবেন—সমস্ত বৃথা কল্পনা সরিয়ে ফেলে সার বস্তুর খোঁজ করি, তবে তিনি দেখবেন যে সেই সার বস্তুও মনের দ্বারা বহির্জগতে প্রক্ষিপ্ত কল্পনামাত্র। কঠিন বস্তু থেকে তরল অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রথমে আসা যায় পরমাণুতে, পরে ইলেকট্রনে। তার পর আর কোন দিশা মিলে না। ঐ উপায়ে আমরা বাস্তবে আসি না, বাস্তবের কঙ্কালকে মাত্র অনুসরণ করি। শেষ সীমায় যাকে পাওয়া যায় তাকে বাস্তব করে তুলতে হ'লে আবার কল্পনার জাল বুনতে হয়। মায়া থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বাস্তবের পরিচয় নিতে যাওয়া বৃথা। মায়ার মধ্যেই বাস্তব নিহিত—ধূমের মধ্যে যে আগুন। জীন্স একখানি পুস্তকে লিখেছেন—প্রাকৃতিক জগত সম্বন্ধে দুই প্রকার মতবাদ আছে—মনোবাদ ও জড়বাদ। আমি বিশ্বাস করি, অতীন্দ্রিয় দর্শনের সাহায্যে বিশ্বের সকল কার্য্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব এবং একথাও বলা যায় যে, বিশিষ্ট সীমার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান মনোবাদের সমর্থন করে। সংক্ষেপে এই মতবাদের অর্থ—প্রকৃতির অনুসন্ধানের সূচনা মনের পথে, সুতরাং সমাপ্তির সম্ভাবনাও তার সেই পথে। পূর্ব্বে মনঃসক্রান্ত ছিল না এমন অনেক কিছু আধুনিক বিজ্ঞান হ'তে দূর হয়েছে এবং নূতন বিজ্ঞানে এমন কিছু আসে নি মনের সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই।

জীন্স ও এডিংটনের সমালোচনা-প্রসঙ্গে ডক্টর ইঙ্গে বলেছেন—এডিংটন, জীন্সের ন্যায় এক প্রণালী অবলম্বন করেছেন, অর্থাৎ—মনোজগতের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। জীন্স বলেন, গণিত প্রকৃতির রহস্যমোচনে সমর্থ হয়েছে। সৌন্দর্য্য, ধর্ম্মনীতি ও কাব্য—এদের কোনটাই এমন সাফল্য অর্জ্জন করতে পারেনি। তার মানে যদি হয় চারিপাশের

সকল বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা, তবে তিনি অভিজ্ঞতার দৈন্যের পরিচয় দিয়েছেন বলতে হয়। তিনি মনোরাজ্যের আশ্রয় নিয়েছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তার রচিত বিশ্বের চিত্রে মনোময় চিন্তাব্যতীত সকলই লোপ পেয়েছে। আমার বক্তব্য এই, গণিত বাস্তবের সংস্পর্শশূন্য হতে পারে বটে কিন্তু পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের পক্ষে সেরূপ হওয়া সম্ভবপর নয়। বিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবেই বাস্তব এবং শেষে সূক্ষ্ম অবস্থায় উপনীত হলেও জড়জগত ত্যাগ করে মনোজগতে প্রবেশ করেনি। বস্তু ও মানসিক চিন্তা এ দুয়ের মধ্যে যাতায়াতের কোন পথ নেই। বারট্র্যাণ্ড রাসেলও গণিতের প্রতীকে বিশ্বের প্রকাশ সম্ভব, ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে নয়—জীন্সের এই মতের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন।

জীবনের ক্রিয়া হুবহু যন্ত্রের ক্রিয়া—এ বিশ্বাস অনেক বৈজ্ঞানিকই পোষণ করেন না। হারবার্ট ডিঙ্গল লিখেছেন, ধূমকেতুর গতি ও মক্ষিকার গতি—প্রকৃতিতে ভিন্ন। কারণ শেষেরটা জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। পরিমাণমূলক পদার্থবিদ্যার সীমায় উহাকে আবদ্ধ করা চলে না। জড়প্রকৃতি ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন—ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ও আইনষ্টাইন উভয়েই এই ধারণার বিরোধী এবং স্থান ও কালের পৃথক অস্তিত্ব অনেকেই স্বীকার করেন। মোটের উপর বলা যায়, আধুনিক বিজ্ঞানের সৃষ্ট সকল সন্দেহ সত্ত্বেও বস্তুজগতকে সম্পূর্ণ সত্য বলে মেনে নিয়ে তার পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ চালাবার মত বৈজ্ঞানিকের এখন অভাব নেই।

চিরন্তনী

শ্রীযতীন্দ্র সেন

দুগ্ধ-শুভ্র সিন্ধু-তটে, স্বপ্নাতুর সৈকত-সীমায়—
নীরবে ঘুমায়েছিল পরিশ্রান্ত তরঙ্গ-শিশুরা ;
নিশীথিনী তন্দ্রালাস, মূর্চ্ছাহত পাণ্ডু জ্যোছনায়,
ধরণীরে মনে হ'ল রোমাঞ্চিত, বিহ্বল, বিধুরা।
দুজনে দাঁড়ায়েছিনু স্তব্ধবাক্, নয়নে নয়ন,
শোণিতে ধ্বনিতেছিল কি মদির সুরের ঝঙ্কার !
অনাদি তমিস্রা ছিল ঘিরি তব কুন্তল গহন,
নিমীল নয়ন-আঁকা মুখে তব দ্যুতি চন্দ্রমার।
মনে হ'ল, বহু শত বর্ষ আগে প্রথম নিশীথে
অকূল জলধি ভেদি জেগে-ওঠা নব পৃথ্বী-বুকে—
প্রথমা নারীর স্পর্শে আদি-নরদেহে আচম্বিতে
এমনি রোমাঞ্চ ঘন জেগেছিল রসাঞ্চিত সুখে।
মোদের মিলন-লগ্নে লুপ্ত হয় লোকারণ্য সব ;
মনে হয়, সিন্ধু-তটে মোরা আদি-মানবী মানব ॥

কবির জন্ম

শ্রীমণ্টুরাণী ঘোষ বি-এ

যেদিন মেলিলে আঁখি ধরণীর 'পরে,
সেদিন তোমার কবি জন্মদিন নয়।
তোমার জনমলীলা, যুগ যুগ ধরে
গীতিময় ধরাতলে অনন্ত বিস্ময় !
নানা রঙে প্রস্ফুটিত হৃদয়ের ছবি,
প্রকাশিলে তুমি যবে কাব্য-তনু দিয়া
সেদিন তোমারি জন্ম, হে উদাসী কবি,
কত রূপে, কত ছন্দে, প্রীতি উৎসারিয়া !
তোমার জনম দিনে শত শতদল
ফুটে ওঠে আঁখি মেলি—তাই তো সেদিন
বাতাসের প্রাণ হয় সৌরভ-চঞ্চল,
নূতনের মাঝখানে হারায় প্রাচীন।
ধরার নূতন রূপ মূর্ত্ত বার বার,
কবির জনম, যবে জন্ম কবিতার।

প্রাচীন ইতিহাসের একপৃষ্ঠা

শ্রীতারানাথ রায়চৌধুরী

অনেকে মনে করেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বাঙ্গলার হিন্দুর এমন কোন প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ নাই যে জন্য বাঙ্গালা গৌরব করিতে পারে। বাঙ্গালায় মুসলমান্ অভিযানের পরে অনেক শৌর্য্যশালী বাঙ্গালীর ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাও অনেকে মনে করেন অতিরঞ্জিত। প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় খৃষ্ট-জন্মের পরে এই বঙ্গদেশের কোন কোন বীর সন্তান্ দূর দেশে অভিযান্ করিতে বহির্গত হইত এবং জয়োল্লাসে দেশেও ফিরিয়া আসিত। বাঙ্গালার বাহিরে এমন সব কীর্ত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, আধুনিক বাঙ্গালী হিসাবে তাহা স্মরণ করিতেও আমরা গৌরব বোধ করি। বাঙ্গালার সেনবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজগণ এক সময়ে যে বীরত্বে ও ঐশ্বর্য্যে ভারতবর্ষে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে যে সামান্য ইতিহাসের সূত্রও পাওয়া যায়, সেই সূত্র ধরিয়াই আলোচনা করিলে আমরা এমন একটা বিরাট ঐতিহাসিক কাহিনীর সন্ধান্ পাই যে তাহাতে আমাদিগকে দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের এক অচিন্তনীয় বীরত্বের কাহিনীতে জয়গর্ব্বে উল্লসিত করিয়া তোলে।

ঐতিহাসিকদের হিসাবে দেখা যায় ১২০৩ খৃষ্টাব্দে—কারো কারো মতে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে—বক্তিয়ার খিলিজী বঙ্গদেশ জয় করে। এই ইস্‌লামীয় বীর সমগ্র বঙ্গদেশ কিন্তু জয় করিতে পারে নাই; বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী নবদ্বীপে যখন রাজা লক্ষ্মণ সেন—কেহ কেহ বলেন রাজা লাক্ষ্মণেয়—রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন বক্তিয়ার খিলিজী নবদ্বীপ আক্রমণ করে; সপ্তদিবসব্যাপী তুমুল সংগ্রামের পরে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় বঙ্গাধীপ পরাজিত হইয়া নৌকাযোগে পলায়ন করেন এবং পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া সুবর্ণগ্রামে রাজ্য স্থাপন করেন। ঐতিহাসিক মিনাহজুদ্দীন তাঁহার লিখিত ইতিহাসে এই ঘটনার ষাট বৎসর পরে এই ঘটনাকে কতকটা অতিরঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করে। অষ্টাদশ জন অশ্বারোহী মাত্র লইয়া বক্তিয়ার প্রথমে নবদ্বীপে প্রবেশ করেন, ইহাই কিম্বদন্তী। যাহা হৌক, এই মুসলমান বিজয়ের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের এই সেন রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণের একটা অভিযানের ইতিহাসই আমি এখানে বর্ণনা করিব। ইতিহাস অলোচনা করিলে দেখা যায়, সেই সুপ্রাচীন কালে বাঙ্গালার এই ক্ষাত্রবংশ গৌরবের সহিত বহু শতাব্দী বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন এবং পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার উপকূলভাগই তাঁহাদের রাজধানী ছিল; তখনও গৌড়দেশের জন্ম হয় নাই, ইতিহাসে উহাকেই বঙ্গদেশ বলা হইত। যে কাহিনী অবলম্বনে আমি এই ইতিহাসের কথা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিতেছি, সেই ইতিহাসের কাহিনী বাঙ্গালীর লিখিত কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না সত্য, পরন্তু তখনও উত্তরভারতের ঐতিহাসিকগণ খণ্ড খণ্ড ভাবে সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের তথ্য অনুসন্ধান করিয়া লিপিবদ্ধ করিত; তাহার অনেক বিবরণ রাজপুতানার এবং উত্তর-ভারতের অনেক ঐতিহাসিকের লিখিত গ্রন্থে পাওয়া যায়।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কিছুদিন আমি বীরভূম জেলার মোল্লারপুর ষ্টেশনের সন্নিকটে বাস করিয়াছিলাম; সেই সময় পণ্ডিত রাঘবাচারী অগ্নিহোত্রী নামক একজন মন্দ্রদেশীয় সাধক সেই স্থানে আশ্রম করিয়া বাস করিতেন। তিনি বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারই মুখে বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে অনেক বিস্ময়কর কথা শুনিতে পাই। ঐ সকল বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বইখানি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে অন্যান্য পুস্তকের সঙ্গে পুলিশ লইয়া যায়। তবুও আমি অনুসন্ধান্ করিতে থাকি, যদি পূর্ব্বের ন্যায় কোন প্রাচীন তথ্য পাওয়া যায়।

অল্প সময়ের জন্য একবার রাজপুতানা গিয়াছিলাম; তখনও প্রাচীন পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীর প্রাচীন ইতিহাস কিছু জানা যায় কি-না তাহারই চেষ্টা করি। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে আর্য্য-সমাজের কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তির সহিত কাশীতে পরিচয় ঘটে এবং সেই পরিচয়ের ফলে স্বামী দয়ানন্দ কৃত সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থ সংগ্রহ করি। স্বামী দয়ানন্দ কেবল একজন সাধক ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন না; তিনি ভারতীয় আর্য্যজাতির বিভিন্ন সময়ের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াও তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যখন শ্রীনাথদ্বার দর্শন করিতে যাই তখন সত্যার্থপ্রকাশের উত্তরার্দ্ধের একাদশ সমুল্লাসে আর্য্যাবর্ত্তের রাজগণের বংশাবলী দৃষ্টে নাথদ্বারে প্রাচীন গ্রন্থের অনুসন্ধান করি। কিন্তু সেই দেশের ভাষা না জানা থাকায় বিশেষ কোন ফল লাভ হয় না। কাজেই সত্যার্থপ্রকাশের লিখিত সংখ্যানুযায়ী—আর্য্যরাজগণের যে বিবরণ পাই, তাহাই আলোচনা করিয়া পরম বিস্মিত হই।

মহারাজ যুধিষ্ঠির হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা যশপাল পর্য্যন্ত একশত চব্বিশ জন রাজা ৪১৫৭ বৎসর ৯ মাস ১৪ দিন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেন। এই রাজন্যবর্গের বিস্মৃত ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত কেহ সংগ্রহ করে নাই। বহুদিন পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আমি একবার আলোচনা করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই আলোচনায় কোন ফল হয় নাই। পুনরায় এই প্রবন্ধের সূচনা করিলাম। এবার যদি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ এই লুপ্ত ইতিহাসের সন্ধান করেন তাহা হইলে বিশেষ আনন্দের কথা হয়।

১৭২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত একখানি প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ—১৮৮২ খ্রীঃ অব্দের সমসাময়িক সময়ে শ্রীনাথদ্বার হইতে 'হরিশ্চন্দ্রচন্দ্রিকা' ও 'মোহনচন্দ্রিকা' নামক দুইখানি পাক্ষিকপত্র প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯ সংবতের মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষে উক্ত পত্রিকা মুদ্রিত হইয়াছিল। সেই দুইখানি পত্রিকা শ্রীনাথদ্বারের বিরাট লাইব্রেরীতে এখনও আছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় ১৭৮২ সংবতের লিখিত একখানি প্রাচীন পুথি হইতে সংগ্রহ করিয়া ভারতীয় আর্য্য-রাজগণের একটি বিস্তৃত রাজ্য-শাসনের

তালিকা প্রকাশ করেন; স্বামী দয়ানন্দজী ঐ পত্রিকা অবলম্বনেই আর্য্যাবর্ত্তের রাজগণের একটি বিবরণী স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমি নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

যুধিষ্ঠিরের বংশ ত্রিশ পুরুষ ১৭৭০ বর্ষ ১১ মাস ১০ দিন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেন। রাজা ক্ষেমক এই বংশের শেষ পুরুষ। ইনি ৪৮ বৎসর ১১ মাস ২১ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহারই প্রধান মন্ত্রী বিশ্রবা রাজাকে হত্যা করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন দখল করেন এবং ১৪ পুরুষ ৫০০ বৎসর, ৩ মাস, ১৭ দিন রাজত্ব করেন। বিশ্রবা বংশের শেষ রাজা বিরসাল সেন, ইনি ৪৭ বৎসর ১৪ দিন রাজত্ব করার পর প্রধান মন্ত্রী বীরমহারাজাকে হত্যা করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন দখল করেন; বীরমহার বংশ ১৬ পুরুষ মোট ৪০৫ বৎসর ৫ মাস ৩ দিন রাজত্ব করেন।

এই বংশের শেষ পুরুষ আদিত্যকেতু—ইনি ২৩ বৎসর ১১ মাস ১৩ দিন রাজত্ব করার পরে প্রয়াগের রাজা ধন্ধর আদিত্যকেতুকে সংহার করেন। আদিত্যকেতু মগধ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে মগধের রাজাও বলা হইত। রাজা ধন্ধর ৪২ বৎসর ৭ মাস ২৪ দিন রাজত্ব করেন। ইঁহার বংশে ৯ পুরুষ ৩৭৪ বৎসর ১১ মাস ২৬ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষ রাজা রাজপাল। সামন্ত মহানপাল রাজপালকে হত্যা করিয়া ১৪ বৎসর রাজত্ব করেন। ইঁহার কোন বংশধর ছিল বলিয়া জানা যায় না। উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য ইন্দ্রপ্রস্থ আক্রমণ করেন এবং মহানপালকে হত্যা করিয়া ৯৩ বৎসর রাজত্ব করেন; পৈঠনের যোগী রাজা সমুদ্রপাল কর্তৃক বিক্রমাদিত্য নিহত হন। এই রাজা সমুদ্রপাল শালিবাহনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন; রাজা সমুদ্রপাল ৫৪ বৎসর ২ মাস ২০ দিন রাজত্ব করেন এবং ইঁহার বংশ ১৬ পুরুষ ৩৭২ বৎসর ৪ মাস ২৭ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষ পুরুষ বিক্রমপাল ২৪ বৎসর ১১ মাস ১৩ দিন রাজত্ব করেন।

এই সময়ে মলুকচন্দ্র নামক একজন বণিক পশ্চিম দেশে অর্থাৎ রাজপুতানার কোন এক অংশে রাজত্ব করিতেন। এই বণিক রাজা বিক্রমপালকে যুদ্ধে নিহত করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন দখল করেন; মলুকচন্দ্র নিজে ৫৪ বৎসর ২ মাস ১০ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষ রাণী পদ্মাবতী—রাজা গোবিন্দচন্দ্রের বিধবা পত্নী—১ বৎসর রাজত্ব করিয়া অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। পদ্মাবতীর মন্ত্রীগণ পরামর্শ করিয়া হরিপ্রেম বৈরাগী নামক এক ব্যক্তিকে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে বসাইয়া দেন। এই হরিপ্রেম ৭ বৎসর ৫ মাস ১৬ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের ৪ পুরুষ ৫০ বর্ষ ২১ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। মহাবাহু এই বংশের শেষ রাজা; তিনি মাত্র ৬ বৎসর ৮ মাস ২৯ দিন রাজত্ব করিয়া রাজ্য ত্যাগ করেন এবং তপস্যা করিবার জন্য বনে গমন করেন। এই সময়ে বাঙ্গালাদেশের সেন রাজারা প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন শূন্য রহিয়াছে শুনিয়া রাজা আধিসেন সসৈন্যে ইন্দ্রপ্রস্থে অভিযান করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন দখল করেন। আমি অনুমান করি যে এই আধিসেন খুব সম্ভব রাজা লক্ষ্মণসেনের আদি পুরুষ কেহ হইবেন। রাজা আধিসেন ১৮ বৎসর ৫ মাস ২১ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন; এই সেনবংশে ১২ জন রাজা ছিলেন; উঁহারা ১৫১ বৎসর ১১ মাস ২ দিন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেন।

আনুমানিক ৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বা ঐ সময়ের মধ্যে আধিসেন ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন দখল করেন। এই বংশের শেষ পুরুষ রাজা দামোদর সেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ইনি অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন, আপনার মন্ত্রীগণকেও ইনি প্রভূত কষ্ট দিয়াছিলেন, ইনি মাত্র ১১ বৎসর ৫ মাস ১৯ দিন রাজত্ব করেন।• এই বঙ্গবীর ইন্দ্রপ্রস্থের শেষ বাঙ্গালী রাজা দামোদর সেনকে তাঁহার মন্ত্রী দীপসিংহ সসৈন্যে আক্রমণ করিয়া প্রকাশ্য যুদ্ধে রাজাকে হত্যা করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন দখল করেন। দীপসিংহ ১৭ বৎসর ১ মাস ২৬ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই দীপসিংহের বংশে ৬ পুরুষ ১০৭ বর্ষ ৬ মাস ১২ দিন রাজত্ব করেন; এই বংশের শেষ রাজা জীবনসিংহ আর্য্যাবর্তের উত্তরাংশ দখলের জন্য অভিযান করেন। এই সময়ে বিরাটের রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান্ জীবন সিংহকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে নিহত করেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন দখল করেন। এই পৃথ্বীরাজ ১২ বৎসর ২ মাস ২৯ দিন রাজত্ব করেন। এই বংশে ৫ পুরুষ ৮৬ বৎসর ২০ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে গজনী হইতে সুলতান সাহাবুদ্দীন গৌড়ী ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া পৃথ্বীরাজের বংশের শেষ রাজা যশপালকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ১২৪৯ সংবতে প্রয়াগের দুর্গে বন্দী করেন। খুব সম্ভব এই সময়েই ইন্দ্রপ্রস্থের নাম দিল্লী হয়। সাহাবউদ্দীন ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে আরোহণ করেন—খুব সম্ভব ১১৮২ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে।

ইন্দ্রপ্রস্থে যে ১২ জন বাঙ্গালী রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, নিম্নে তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিলাম।

১।	রাজা আধীসেন	··	১৮।৫।২১ দিন
২।	রাজা বিলাবসেন	···	১২।৪।২ দিন
৩।	কেশবসেন		১৫।৭।১২ দিন
৪।	মাধবসেন	···	১২।৪।২ দিন
৫।	ময়ূরসেন		২০।১১।২৭ দিন
৬।	ভীমসেন	···	৫।১০।৯ দিন
৭।	কল্যাণসেন	···	৪।৮।২১ দিন
৮।	হরিসেন	···	১২।০।১৫ দিন
৯।	ক্ষেমসেন	···	৮।১১।২৫ দিন
১০।	নারায়ণসেন		২।২।২৯ দিন
১১।	লক্ষ্মীসেন	···	২৬।১০।০ দিন
১২।	দামোদরসেন		১১।৫।১৯ দিন

মহাভারতের সময় হইতে সুলতান্ সাহবউদ্দীনের দিল্লী আক্রমণ পর্য্যন্ত যে সকল আর্য্য রাজা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সগৌরবে রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন, সেই সকল রাজগণের ঐতিহাসিক জীবনী সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন; যে সকল রাজা মহাভারতের সময় হইতে মুসলমানের আগমন সময় পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, একটু ধৈর্য্য সহকারে অনুসন্ধান করিলে মনে হয় তাহারও অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আমি পুনরায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি; আমার সুবিধা থাকিলে আমিই এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান করিতাম, কাহারও উৎসাহ পাইলে এই অনুসন্ধানে অগ্রসর হইতে প্রস্তুতও আছি।

বৃন্দাবনে শ্রীউদ্ধব

ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অক্রূর যেদিন সেই চির-কিশোর বৃন্দাবনচন্দ্রকে বৃন্দাবন হইতে লইয়া চলিয়াছিলেন, সেদিন ব্রজের দেবদেবীগণ

…দয়িতং কৃষ্ণং অনুব্রজ্যানুবঞ্জিতাঃ।
প্রত্যাদেশং ভগবতঃ কাঙ্ক্ষন্ত্যশ্চাবতস্থিরে॥

—ভা, ১০।৩৯।৩৪

সেই প্রাণপ্রতিম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে কিছুদূর অনুগমন করিয়া যখন ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলেন তখন তাঁহাদিগের মহার্ত্তি ও রোদনাদি সহ্য করিতে না পারিয়া সেই দয়িত রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং সকলকে প্রিয় সম্ভাষণ আলিঙ্গনাদি দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া পুনরায় রথে যখন আরোহণ করিলেন তখন সেই বিরহকাতরা ব্রজবল্লভীগণ হাহাকার রোদনে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন এবং তথা হইতে এক পাদও গমনে অসক্ত হওয়ায় কেবল সেই মুখপানে চাহিয়া 'প্রত্যাখ্যান কি করিয়া কর' এইটুকুই যেন জানাইবার জন্য সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। এ দৃশ্য সেই পরম প্রেমময়ের সহ্য করিবার সামর্থ্য ছিল না, তথাপি কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহাকে যাইতেই হইবে।

তখন—

তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ।
সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈবায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ॥

—ভা, ১০।৩৯।৩৫

তখন সেই যদুশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই শোকসন্তপ্তা গোপীদিগকে প্রত্যুত্তরের আকাঙ্ক্ষিণী মনে করিয়া নানা-প্রকার শপথাদি করিয়া জানাইয়া দিলেন, 'শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।' (আয়াস্যে) এই কথাটিও তাঁর প্রিয়জনদিগকে নিজে বলিবার মত অবস্থা তাঁর ছিল না; তাই কোন এক বন্ধু বালক দ্বারা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জানাইয়া দিয়াই অক্রূরকে শীঘ্র রথ চালাইতে বলিয়া যেন সেদিন নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু এই 'আয়াস্যে' ধ্বনি তাঁহার ও ব্রজ গোপগোপীর মধ্যে প্রাণ-সূত্ররূপে রহিয়া গেল।

তাই কংসবধ এবং কংস-বন্ধুদিগকে পরাজিত করিতে বহু বৎসর অতিবাহিত হইলেও সেই 'আয়াস্যে' তাঁর নিকট অতি মধুর স্বপ্ন সৃষ্টি প্রতিদিনই করিয়া আসিয়াছে। এদিকে ব্রজের প্রতি জীব, লতা বৃক্ষাদি এবং যমুনা গোবর্দ্ধনাদি যাবতীয় চেতনাচেতন বৃন্দাবন এই ধ্বনি পোষণ করিয়া পরমানন্দে সেই নিরানন্দ বিরহোৎসব মুখর করিয়া রাখিয়াছে—কালের ব্যবধান সেথায় অন্তর্হিত। এইভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন প্রেমিক ভগবান একদিকে, অপরদিকে তাঁর প্রেয়সীগণ—যন্ত্রের তারতম্যে শব্দের পার্থক্য হইলেও সঙ্ঘবদ্ধ তান যেমন একই তাল বাজায়, সেই মত ব্রজরমণী-গণের পৃথক ভাব থাকিলেও মূল কৃষ্ণবিরহ সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছে। এই ধ্বনির প্রতিধ্বনি সেই দূরগত 'প্রিয় দয়িত সখা' কতদিন রোধ করিতে পারেন? তাই আজ সকালে উঠিয়াই তিনি তাঁর সেই নর্ম্মসখা উদ্ধবকে স্মরণ করিলেন। এই উদ্ধবের বর্ণনা শ্রীশ্রীশুকদেব করিতেছেন

বৃষ্ণীনাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা।
শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ॥

—ভা, ১০।৪৬।১

শ্রীশুক বলিতেছেন, ইনি বৃষ্ণিগণের শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা এবং কৃষ্ণের প্রিয়সখা বৃহস্পতির শিষ্য, বুদ্ধিমানদের মধ্যে অন্যতম এবং সাক্ষাৎ উৎসবময়—তাই তাঁর নাম উদ্ধব। এই পরম পবিত্র কৃষ্ণসখা উদ্ধবকে নিকটে পাইয়া গোপীবিরহ-ব্যথায় কাতর ভগবান তাঁহার হাতখানি নিজ হাতে লইয়া বলিতে লাগিলেন—

গচ্ছোদ্ধব! ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নঃ প্রীতিমাবহ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎ সন্দেশৈর্বিমোচয়॥

অর্থাৎ—হে পরম মনোজ্ঞ উদ্ধব, একবার ব্রজে যাও, গিয়া আমার পিতামাতা এবং তৎস্থানীয় যাঁহারা তাঁহাদের নিরানন্দ হৃদয়ে আনন্দের উৎস জোর করিয়া খুলিয়া দিয়া

আইস এবং আমার বিচ্ছেদ ব্যথায় মুহ্যমানা সেই ব্রজ-রমণীগণের মর্ম্মবেদনায় আমার কথা 'আমি আবার আসিব'—এই কথারূপ অমৃত সেচনে সুস্থ করিয়া আইস। হে উদ্ধব, তুমি বোঝ কি যে—

ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ।
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ! বিমুহ্যন্তি বিরহোৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ॥

আর তাহারা আমায় দূরে পাঠাইয়া আজ বিরহোৎকণ্ঠায় মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতেছে। আমার কথা স্মরণ মাত্রেই মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতেছে 'স্মরন্ত্যঃ বিমুহ্যন্তি' এবং তাহারা 'ধারয়ন্তি অতি কৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন' অতি কষ্টে তাহাদের বহির্গমনোন্মুখ প্রাণকে 'কৃষ্ণ আসবেন' 'আয়াস্যে' এই মন্ত্রবলে ধরিয়া রাখিয়াছে। ইহার পর আর কদিন বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হইবে? হে উদ্ধব, তাহাদের এমত হইবার কারণ কি জান?

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।

এই ব্রজবাসীগণ তাহাদের সমস্ত সুখচেষ্টা আমাকে কেন্দ্র করিয়া সমাধান করে; তাহাদের প্রাণে ও আমার প্রাণে এমনি গ্রন্থি, প্রেমের ফাঁসি পড়িয়া গিয়াছে যে, অসম্ভব বিচ্ছেদ আজ উৎকণ্ঠারূপ হৃদয়বিদারণ ব্যাপারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আর তাহারা আমার প্রতি অনবকাশময়ী চিন্তার ফলে পতি পুত্র পিতা আত্মীয়বান্ধব কিম্বা নিজ দেহ-চর্চ্চা, যথা—শয়ন ভোজন পানাদি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছে। আমি যেন স্পষ্ট দেখিতেছি, তাহারা কি কষ্টেই না জীবন ধারণ করিতেছে—আর তাহারা পারে না—এই সময় যদি তুমি না যাও, তাহা হইলে তাহারা এই অসহ্য বিরহ-উৎকণ্ঠায় প্রাণত্যাগ করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ-সখা উদ্ধবও এই চতুরের কথার ভঙ্গিমায় কোন ছল আছে কি-না বুঝিতে পারিলেন না। সহজ সরলভাবে তিনি ব্রজবাসীদিগের যথাবর্ণিত অবস্থার চিত্র নিজ মানসপটে আঁকিয়া ফেলিলেন।

শ্রীমান উদ্ধব চিরদিন মথুরায় বাস করিয়া মথুরার ভাবধারা, মথুরার ঐশ্বর্য্যময়ী জ্ঞানগরিমা এবং মথুরার বিচারবুদ্ধির আবর্ত্তে পড়িয়া আছেন—ব্রজের ভাব ব্রজের মাধুর্য্য ব্রজের সরল সাধনা তাঁহার নিকট অপরিচিত। এই মাধুর্য্য রসের সহিত পরিচিত করিবার জন্যই বোধ হয় শ্রীগুরু তাঁহাকে আজ বৃন্দাবনে পাঠাইতেছেন। শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—

ইত্যুক্ত উদ্ধবো রাজন্! সন্দেশং ভর্ত্তুরাদৃতঃ।
আদায় রথমারুহ্য প্রযযৌ নন্দগোকুলম্॥

মহামতি উদ্ধব রথে চাপিয়া বৃন্দাবন গেলেন—যখন বৃন্দাবনে পঁহুছিলেন তখন 'নিম্লোচতি বিভাবসৌ' সূর্য্যদেব অস্তাচল আশ্রয় করিয়াছেন। শ্রীমান উদ্ধব মহাশয় তাঁহার ধূলি-ধূসরিত রথখানি লইয়া যখন বৃন্দাবনের পথে—তখন সেই গোধূলি লগ্ন এই অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় ব্রজধামের বিচিত্র শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের এক অভিনব অধ্যায় প্রকাশ করিবার জন্যই যেন ব্যস্ত, ইহাই ক্রমাগত অনুভব করিতে লাগিলেন।

শ্রীমান উদ্ধব বিরহকাতর বৃন্দাবনের যে চিত্র মথুরা হইতে চিত্তে আঁকিয়া আনিয়াছিলেন তাহার কিছুই ত তাঁর চক্ষে পড়িতেছে না—তিনি দেখিতেছেন

বাসিতার্থেঽভিযুদ্ধ্যদ্ভির্নাদিতং শুষ্মিভির্বৃষৈঃ।
ধাবন্তীভিশ্চ বাস্রাভিরূধো ভারৈঃ স্ববৎসকান॥

কোথাও প্রমত্ত বৃষ পুষ্পবতী গাভীর প্রতি সশব্দে ধাবিত হইতেছে ও বিবাদ করিতেছে, কোথায় বা স্তনভারপীড়িতা গাভী তাহার বৎসকে দেখিতে পাইয়াই পরম প্রেম-ভরে হাম্বা রবে তাঁহার প্রতি দৌড়াইয়া যাইতেছে। আরও দেখিতেছেন—

ইতস্ততো বিলঙ্ঘদ্ভি র্গো বৎসৈর্ম্মণ্ডিতং সিতৈঃ।

সাদা সাদা গো বৎসগুলি পরস্পর ঠেলাঠেলি করিয়া খেলিতেছে। ক্রমে তিনি ব্রজপুর মধ্যে যতই অগ্রসর হইতেছেন ততই সেই নন্দব্রজের অপূর্ব্ব শব্দাদি তাহাকে অভিভূত করিতেছে।

গো দোহ-শব্দাভিরবৈর্বেণূনাং নিঃস্বনেন চ॥

আজন্মমুগ্ধ উদ্ধব শুনিতেছেন ব্রজের এই মুখর সন্ধ্যায় অপূর্ব্ব গো-দোহন শব্দ—মনে মনে ভাবিতেছেন এত ব্যস্ততা কেন এদের? পথের ক্রীড়ারত ব্রজবালককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এ আবার কি? তাহারা পুলক-বিস্ফারিত নেত্রে বলিতেছে, 'তুমি কোথাকার গা?' জান না কি এখনই আমাদের কানাইবলাই আসিবে, সত্যি আসিবে; আর যদি এখনই আসিয়া পড়ে ও কাহারও কাছে 'দুধ

দাও' বলিয়া দাঁড়ায়, তখন কি হবে ভাব দেখি। তোমার কি কান নাই, শুনিতে পাইতেছ না ঐ বেণু রব—আমাদের কানাই যখনই লুকায়, আমরা বাঁশী বাজাই—সে বাঁশীর স্বর তার কানে পঁহুছিতে যা দেরী, তৎক্ষণাৎ সেই চিরচপল কোথা হতে যেন আসিয়া হাজির হয়, কেহই আমরা বুঝিতে পারি না। ঐ যে বাঁশী বাজিতেছে—আর কি সে লুকাইয়া থাকিতে পারিবে, তুমি একটু দাঁড়াও না, এখনই দেখিবে আমাদের কৃষ্ণ এখনই আসিবে। মথুরার উদ্ধব ভাবিতেছে, এ ত বড় মজা—রথ হইতে নামিয়া দেখা যাক ইহাদের এ কেমন ভাব। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যানুচর উদ্ধব আগে গিয়া শুনিতেছেন

'গয়ন্তীভিশ্চ কর্ম্মাণি শুভানি বলকৃষ্ণয়োঃ।
স্বলঙ্কৃতাভির্গোপীভি গোপৈশ্চ সুবিরাজিতং॥'

ব্রজগোপীরা গান গাহিতেছেন—এ কার গান—কান পাতিয়া শুনিলেন এ যে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বাললীলা! তাহারা সুর· করিয়া গাহিয়া যাইতেছে—নিকটে গিয়া দেখেন পরম মনোহরা ব্রজগোপীগণ অতি সুন্দর অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া গান গাহিতেছে ও বারে বারে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতেছে। তাহাদের একজনকে উদ্ধবজী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'তোমাদের এত সাজপোষাক কেন গো—তোমরা নাকি কৃষ্ণবিরহে মূর্চ্ছিত হইয়াই পড়িয়া থাক—তোমাদের দেহ চিন্তা একেবারেই নাই—এখন ত দেখিতেছি তোমরা বেশ আনন্দে বেশভূষা করিয়া দিন কাটাইতেছ।' ব্রজরমণী উত্তর করিতেছেন, 'এ কি গো? তুমি কি জান না কৃষ্ণ নন্দ মহারাজের মারফত বলিয়া· পাঠাইয়াছেন যে, এখনই আসিতেছি। কি জানি কখন আসিবেন। আমায় তিনি যেমনটি সাজাইয়া দিতেন ও সাজাইয়া আনন্দিত হইতেন আমায় যে সেই মতই সাজিয়া থাকিতে হয়; কারণ যদি তিনি.আমার মুখে নিরানন্দের ছায়াও দেখেন তাহা হইলে যে বঁধুর মুখখানি তখনই মলিন হইয়া যাইবে। আমি যদি ফুলের মালা ফুলের হার না পরি তিনি যে ব্যথা পাইবেন, তাহা আমার সহ্য করার সাধ্য নাই। উদ্ধব ভাবিতেছেন, চমৎকার যুক্তি! সম্মুখে দেখেন ব্রজের প্রৌঢ়গণও বেশ সাজসজ্জা করিয়া যেন কাহার অপেক্ষায় দরজার নিকটে বিরাজ করিতেছে। সকলেরই মুখে একই আনন্দের ও আশার ছবি—এখানে আর উদ্ধব মহারাজের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। অগ্রসর হইয়া কোন ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'হে বিপ্ররাজ, আপনি এত ব্যস্ত কেন?' উত্তর শুনিলেন—সন্ধ্যা সমাগত, দেবার্চ্চনাদি করিতে হইবে তাই আমাদের অবসর নাই।' ইহাতে উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'আপনারা কি নিত্য-কর্ম্মাদি পঞ্চযজ্ঞ যথাযথ পালন করিতেছেন?' ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, 'নিশ্চয়ই—কারণ যদি এখনই শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম আসেন ও জানিতে পারেন যে, আমরা নিত্য-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার চিন্তায় ও বিরহে কাতর হইয়া পড়িয়াছি তিনি অত্যন্ত ব্যথা পাইবেন—এ ব্যথা দিবার সাধ্য আমাদের নাই, কারণ সে যে আমাদের প্রাণের প্রাণ। অতএব 'ওগো মহাশয়, আপনি দেখুন এই ব্রজভূমি 'অগ্ন্যর্কাতিথি-গো-বিপ্র-পিতৃদেবার্চ্চনান্বিতৈঃ' পূর্ব্ববৎ কর্ম্মপরায়ণ হইয়া রহিয়াছে। উদ্ধব মহারাজ ক্রমশই ভাবে বিহ্বল হইতেছেন, কিন্তু এভাব নিজস্ব করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে; কারণ তাঁহার মনবুদ্ধি মথুরার বিচার গন্ধে ঐশ্বর্য্যময় হইয়া রহিয়াছে। এখনই কি করিয়া তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়?

সম্মুখে দেখিতেছেন বিচিত্র 'গোপাবাস'গুলি মনোরম হইয়া বিরাজ করিতেছে, তাহাদের দ্বারের নিকটে ব্রজ-গোপীগণ ধূপদীপমাল্যচন্দনাদি লইয়া রহিয়াছেন—যেন কাহার অপেক্ষায়—কে যেন আসিতেছে—এখনই আসিয়া গোপীর পূজার আয়োজন সার্থক করিবে, তাই তাহারা পূজার ডালা সাজাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। নিকটে গিয়া উদ্ধব মহারাজ জিজ্ঞাসা করিতেছেন,'কেন গো—তোমরা এই ভাবে রহিয়াছ?' উত্তর পাইলেন, 'তুমি কে গো—ব্রজের কানাইর আগমনবার্ত্তা তোমার নিকট পঁহুছায় নাই? তুমি কি পাষাণ নাকি গো—তুমি কি জান না—গোপাল আমাদের যে এখনই আসিবে·—সে যে যাবার সময় ক্রমাগত ফিরিয়া ফিরিয়া বলিয়া গিয়াছে—শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব—তা না হ'লে কি আমরা তাঁহার রথচক্র ছাড়িতাম। কিন্তু সেই চতুর ত ব'লে গেল না কবে ও কখন আসিবে, তাই আমরা প্রাতঃকাল হইতে মালা গাঁথিয়া চন্দন ঘসিয়া ধূপ দীপ জ্বালাইয়া বসিয়া থাকি—কিন্তু ক্রমে ধূপ ও দীপ নিবিয়া যায়, চন্দন শুখাইয়া যায়, মালা মলিন হইয়া পড়ে, তাই আমরা আবার দীপ জ্বালি, চন্দন ঘসি, আবার মালা গাঁথি, আবার

শুধায়, আবার এই করি—এইভাবে দিনের পর দিন আমরা করিয়া আসিয়াছি। তার জন্ম এই আয়োজন আমরা ভবিষ্যতেও করিতে থাকিব—যতদিন না সে আবার আসে।

শ্রীমান উদ্ধব অবাক হইয়া তাহাদের এই অপূর্ব্ব পূজা-ব্যাপার শুনিতেছেন আর ভাবিতেছেন—এই কথা কি সত্য! তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, না হয় তোমাদের কথাই ঠিক; কিন্তু কি জন্যই বা তোমরা প্রত্যেকে সাজসজ্জা করিয়া ধূপ মালা লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ? উত্তর পাইলেন—আমরা কেহই ত জানি না আমাদের প্রাণ কানাই কার ঘরে ঢুকিয়া পড়িবেন। গোপী কাঁদিতেছে ও বলিতেছে, যখন সে বৃন্দাবনে খেলিয়া বেড়াইত, আমরা দিবারাত্র সকলেই শশব্যস্ত থাকিতাম—কখন যে কাহার ঘরে ঢুকিয়া কি চাহিবে তাহার ত স্থিরতা ছিল না—সেই চপলের জন্য সর্ব্বদাই সকলকে প্রস্তুত থাকিতে হইয়াছে। আজও আমরা তাই সর্ব্বদা প্রস্তুত। ঘর সাজাইয়া ননী তুলিয়া চন্দন ঘসিয়া মালা গাঁথিয়া বসিয়া আছি, যখনই তিনি আসিবেন আমাদের সর্ব্ব উপচারই প্রস্তুত দেখিবেন। শ্রীউদ্ধব ভাবিতেছেন—ইহাই কি চরম সাধনা? গোপী ভাবিতেছে—ইহা সাধনা কি না জানি না, কিন্তু ইহা ব্যতীত আমরা ত অন্য ব্যবহার জানি না। উদ্ধব বলিতেছে, চমৎকার! গোপী বলিতেছে, তুমি আমাদের কি অবাক হইয়া দেখিতেছ—দেখগে যাও—

সর্ব্বতঃ পুষ্পিত বনং দ্বিজালিকুলনাদিতম্।
হংসকারন্ডবাকীর্ণৈঃ পদ্মষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্॥

বিস্মিত উদ্ধব আগে চলিয়াছেন—দেখিতেছেন গাছে গাছে ফুলভার, ফুলে ফুলে ভ্রমর-ভ্রমরীর গুঞ্জন, ডালে ডালে কোকিলাদির কুজন, সরোবরে রাজহংসের মরাল ভঙ্গিমা, স্বচ্ছ জলে জলপক্ষীর ক্রীড়া—আর কোথাও বা প্রস্ফুটিত পদ্ম-শোভায় সরোবরের অপূর্ব্ব শ্রী—

শ্রীমান উদ্ধবের মনে এখন স্থির ধারণা হইয়াছে যে, এই বৃন্দাবনের সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণাগমন প্রতীক্ষা। এই বৃন্দাবনের পশুপক্ষী বৃক্ষলতা গুল্মাদিও যেন বলিতেছে—জান না কি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পাঠাইয়াছেন—'জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্।' এ কথা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। তুমিও কি সেই কথা জানাইতে আসিয়াছ। উদ্ধব চীৎকার করিয়া বনানীকে জানাইল, 'শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন'—কিন্তু প্রতিধ্বনি উত্তর দিল সেই একই কথা, 'কৃষ্ণ আসিতেছেন।' উদ্ধব ভাবিলেন—আমার কথার নূতনত্ব কোথায়, বৃন্দাবন উত্তর দিতেছে? 'এখানে সবই নূতন।' এ নূতনের দেশে আর নূতন আমদানি করিতে কাহাকেও হয় না। শ্রীউদ্ধব ভাবিতেছেন, আমি আজ শ্রীকৃষ্ণকৃপায় ধন্য হইলাম—তাই বুঝি আমায় এত অনুনয় বিনয় করিয়া বৃন্দাবন দেখিতে পাঠাইয়াছেন।

বাঙ্গালী কোথায়?

শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাহি পশে রশ্মিকণা—অন্ধকার গেহ,
শোকদুঃখদৈন্যভরা জীর্ণশীর্ণ দেহ;
ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে চলিতেছে হায়
সুজলা সুফলা বঙ্গে বাঙ্গালী কোথায়?

নামিয়া আসিছে সন্ধ্যা—ঘিরেছে আঁধার,
ধীরে নিভিতেছে দীপ—জাগে হাহাকার!
নির্জ্জন আঁধার পথ—ভগ্ন দেবালয়,
আপন জননী ক্রোড়ে বাঙ্গালী কোথায়?

শূন্যাদরে চর্চা করে গালভরা কথা,
প্রকাশে সঙ্গীত গাহি' দেশতরে ব্যথা;
দুর্ভিক্ষ বন্যার স্রোতে দেশ ভেসে যায়,
বিলাস লাস্যের তবু ক্ষান্তি নাহি হায়!

কোটী কোটী টাকা নাড়ে অপরের তরে,
নাহি কিন্তু কাণাকড়ি আপনার ঘরে;
গুর্জর মাড়োয়ার আসি' অন্ন লুটি' খায়
আপনার বাসভূমে বাঙ্গালী কোথায়?

বাঙ্গালী চালাক ভারী! অবাঙ্গালী তাই
সুখে লুটিতেছে, দিয়া দেশের দোহাই
অভাগা এ বঙ্গদেশে; বাঙ্গালীর তায়
ক্ষতিবৃদ্ধি নাহি কিছু—সুখে নিদ্রা যায়।

বাঙ্গালীর চিন্তা যত ভারতের তরে,
নাহি-বা রহিল অন্ন আপনার ঘরে,
কাঁদেই যদি বা ভাই—ক্ষতি কিবা তায়?
এমন উদার জাত জগতে কোথায়?

ভারতের সব জাতি নিজ দেশ হ'তে
বিদূরিত করিতেছে বাঙ্গালীকে পথে।
তাতে কিবা ক্ষতি বল? মোরা মহাপ্রাণ,
অপরে উদারভাবে করি অন্নদান।

বঙ্গের মরণে যদি জাগে এ ভারত
বাঙ্গালীর তাতে কভু হবে কি অমত?
অপরে লুটিছে অন্ন?—ক্ষতি কিবা তায়?
আমরা গাহিব উচ্চে—'ভারতের জয়'!

ভারতে গড়িতে চাহি ভারতীয় জাতি,
বিভিন্ন জাতিরে তাই করিতেছি সাথী
আপন ভাইরে ফেলি—হেন গুণময়,
আমাদের স্থান তবু বিশ্বে নাহি হয়।

বাঙ্গালী লেগেছে আজ বড় বড় কাজে,
ছোট কথা নিয়ে থাকা আর না কি সাজে?
জননীর উপবাস?—কে শুনিতে চায়?
বড় ব্যস্ত! তবু কেহ নাহি মানে, হায়!

অন্নাভাবে নিজ ভাই ধুলাতে লুটায়,
মায়ের ক্রন্দনধ্বনি বাতাসে মিলায়;
কাঁদিব তাদের তরে? কোথা সে সময়?
এত ব্যস্ত! তবু বিশ্বে স্থান নাহি হয়!

জননী কাঁদিছ তুমি?—কাঁদিতেছ বৃথা,
এরা ব্যস্ত আছে লয়ে' ভারতের কথা;
বুঝিবে তোমার ব্যথা?—সে সময় নাই,
ভারতের তরে প্রাণ কাঁদিছে সদাই।

কেঁদ না জননী তুমি, কেঁদ না ক' আর।
আপন সন্তান যবে বেদনা তোমার
বুঝিতে চাহে না—তবে কাঁদিয়া বৃথায়
কি লাভ হইবে বল?—হা, জননী, হায়!

তব অন্নে পুষ্ট হয়ে' ছাড়িয়া তোমারে,
ভারত-উদ্ধার তরে ভ্রমিছে আঁধারে
যে সব সন্তান—তব ক্রন্দনের ধ্বনি
তাদের জাগাতে কভু পারিবে জননি?

পারিবে না, পারিবে না—কাঁদিও না আর
বৃথায় তাদের তরে;—জননী আমার।
আমরা রয়েছি পিছে দীনহীন যারা
পারি যদি মুছাইব তব অশ্রুধারা।

—মোদের দুর্ব্বল হাতে—কর আশীর্ব্বাদ,
পারি গো তোমার যেন ঘুচাতে বিষাদ;
সতত বেদনা তব হৃদে যেন জাগে,
তোমা তরে কাঁদি যেন জগতের আগে;

পুরাণ দিনের মত, জগত মাঝারে
তোমার সুবর্ণ দীপ ঘন অন্ধকারে
আবার জ্বালিতে যেন পারি গো জননী
জগতের আগে যেন তোমারেই মানি।

বিদেশী সঙ্গীত

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ওস্তাদিপন্থী জনকয়েক সেকেলে মানুষ ছাড়া আজকের দিনে সুকুমারমতি সঙ্গীতজ্ঞরা প্রায় সবাই স্বীকার করেন যে আমাদের সঙ্গীতের ভাঁটায় এখন সবচেয়ে বেশি দরকার নতুন প্রাণের জোয়ার আনা। এর একটি পথ হচ্ছে বিদেশী সঙ্গীতের ঢেউ আমাদের গীতসিন্ধুতে তোলা—আমাদের প্রাণশক্তির ছন্দে ও তালে। গ্রামোফোনে সম্প্রতি দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েছি এ-শ্রেণীর আমদানির। একটি 'অকূলে সদাই'—যেটি আমি ও শ্রীমতী উমা বসু ডুয়েটে গেয়েছি *—আর একটি 'বুলবুল'—এটি শ্রীমতী উমা গেয়েছেন। এ দুটি গানই দুটি রুষ গান থেকে নেওয়া হয়েছে—কিন্তু এদুটি গানের খুব আদর হয়েছে ব'লে স্বরলিপি দিচ্ছি অনেকে অনুরোধ করেন ব'লে। এ দুটির সঙ্গতে গিটার বাজানো হয়েছে কিন্তু বাংলা ঢঙে—সুরশিল্পী শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ যে ভাবে মিড়গুলি দিয়েছেন তাতে এর রস গভীরতর হয়েছে। 'অকূলে সদাই' গানটিতে কল্যাণ ও বেহাগ ঢঙ এসেছে খানিকটা বিলিতি ওজস্ নিয়ে, বিশেষ ক'রে তালগুলিতে ও 'ধাও প্রাণ'... ধুয়ায়। বুল্‌বুলের গানটি ভৈরবী কালাংড়া ও কল্যাণজাতীয় রাগিণী 'সা' বদ্‌লে এমন মিশে গেছে যে, লক্ষ্য না করলে অনেকে বুঝতেই পারেন না। এই ভাবে সা বদ্‌লে আমাদের গানে অনেক নূতনত্ব আনাই সম্ভব। এ গান দুটির মূল গান ও স্বরলিপি আমার 'সাঙ্গীতিকী' বইটিতে দ্রষ্টব্য। 'অকূলে সদাই' গানটি অবাঙালীদের মধ্যেও যথেষ্ট আদর পেয়েছে এই জন্যে যে, এতে আছে বিলিতি গতিশক্তি। আর বুলবুল গানটি সম্প্রতি পারিসে রেডিওতে বাজানো হয়েছিল ও আমার বন্ধু চন্দননগরের ভূতপূর্ব গভর্ণর Charles Francois Baron জানিয়েছেন যে, সেখানকার ফরাসী সঙ্গীতজ্ঞরা উমার কণ্ঠমাধুর্যে ও গীতিলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে এ-শ্রেণীর গান আরো চাইছেন। প্রাণশক্তির আবেদন বিশ্বজনীন—তার তো জাত নেই। 'অকূলে সদাই' গানটি আলাদা লিখে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বুলবুল গানটি নীচে দিলাম :—

বুলবুল মন ! ফুলসুরে ভেসে
চল্ নীল মঞ্জিল উদ্দেশে
অম্বর বাঁশরী ঐ ডাকে আয়
পিঞ্জর পাসরি' চল্ অধরায়
(অধরায়—অসীমায়—প্রাণ চায়
এ ধরায় দে বিদায়, অধরায় প্রাণ চায়)

ঐ শোন্ আলো গায় ভালো বেসে :
'ফিরে আয়, নীড়ে আয় দিন শেষে,
চল্ দূর বন্ধুর উদ্দেশে—
চিরচরণের শরণের বেশে।'
(চরণে— শরণে—
জীবনে— মরণে)

\+ ০ + ০
র্জ্ঞা -া র্রা র্জ্ঞর্রা | র্সা -া র্জ্ঞর্রা র্জ্ঞর্রা | পা দপন্ধা পা না | র্সা -া -া -া |
বু ল্ বু ০ল্ ম ন্ ফুল্ - সু রে ভে - সে - - -

ণা ধা র্সণা ধণা | পা -া র্সণা ধণা | মপা ০দা পা মা | জ্ঞা -া -া -া |
চ ল্ নী ল ম ন্ জি ল্ উ- দ্ দে - শে - - -

জ্ঞা -া মা পা | ধা ণা র্সা র্রা | পা র্জ্ঞা র্রা র্সা | ণা -া -া -া |
অ ম্ ব র্ বাঁ শ রী - ও ই ডা কে আ - - য়

ধা ণা র্রা র্সা | ণা ধা দা পা | ক্ষা পা দা না | র্সা -া না র্সা |
পি ন্ জ র পা শ রি - চ ল্ অ ধ রা য় অ ধ
চ র

নর্সা র্জ্ঞা রর্সা নর্সা | নর্সা র্জ্ঞা র্মজ্ঞা র্জ্ঞা | র্রা -া -া -া | । । র্রা জ্ঞা |
রা - - - - - - - - - - য় অ সী
ণে - - - - - - - - - - - - - শ র

র্জ্ঞা র্মপা র্মজ্ঞা র্জ্ঞা | র্পমা জ্ঞর্রা র্সনা র্সর্রা | জ্ঞা -া -া -া | -া -া র্রা জ্ঞা |
মা - - - - - - - - - - য় - - প্রা ণ
ণে - - - - - - - - - - - - - জী র

নর্সা র্জ্ঞা র্রর্সা নর্সা | নর্সা র্জ্ঞা র্রর্সা নর্সা | নর্সা র্জ্ঞা র্রর্সা নদা | পা -া র্সনা র্সা |
চা - - - - - - - - - - - - য় এ ধ
লে - - - ম - - - র - - - ণে - চ র

র্না -া -া -া | -া -া র্রর্সা র্রা | র্মজ্ঞা -া -া -া | -া -া র্মা র্পা | র্মজ্ঞা র্মর্রা র্সা না |
রা - - - - য় দে বি দা - - - - য় অ ধ রা - - -
ণে - - - - - শ র ণে - - - - - জী ব নে - - -

র্সনা র্সা র্রা জ্ঞা | র্রর্সা -া -া -া | -া -া II র্সনা র্সা | জ্ঞা -া র্রা জ্ঞর্রা |
- য় প্রা ণ চা - - - - য ও রে বু ল্ বু ॰ ল্
- - ম র ণে - - - - - -

র্সা -া র্নর্না র্সা | র্রর্মা জ্ঞজ্ঞা র্রা জ্ঞর্রা | র্সা -া র্সনা র্সা | র্রর্পা র্মর্মা র্রর্মা জ্ঞজ্ঞা |
ম ন ও রে বু ॰ ল্ বু ল্ ম ন ও রে বু ॰ ল্ বু ॰ ল্

র্রসা -া জ্ঞা পা | দা পক্ষা পা না | র্সা -া -া -া | -া -া -া -া II
ম ন ফু ল স্থ রে ভে - সে - - - - - - - -

* 'অকূলে সদাই' গানটি স্বরলিপি সমেত গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। ভাঃ—সঃ

জন্ম—চৈত্র, ১২৬৮ সাল — মহামহোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি — মৃত্যু—অগ্রহায়ণ, ১৩৬০ সাল

মহামহোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি

শ্রীকালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়

দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা ও অধিরথের সুত (কুন্তীপুত্র) কর্ণের মধ্যে সেনাপত্য লইয়া যেদিন কুরুসভায় যোগ্যতা নির্দ্ধারণের আলোচনা উঠিল এবং বাধিল অশ্বত্থামা ও কর্ণের মধ্যে অতিশয় বাগবিতণ্ডা—সেদিন কর্ণ যে সকল কথা তীব্রকণ্ঠে বলিয়াছিল, তাহার মধ্যে এই কথাটি-ই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান—'দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং তু পৌরুষম্ ।'

বাস্তবিক জন্মটা কাহারও স্বেচ্ছাধীন নহে, কিন্তু পৌরুষ থাকে সকলের আয়ত্তে। জন্ম যদি কাহারও আয়ত্তাধীন হইত তবে বোধ করি কেহ দরিদ্র পরিবারে জন্ম-গ্রহণ করিত না। নির্ধন জীবন কেহ চাহেও না। কিন্তু বিধাতার-বিচার এমনি যে, লক্ষ্মী যে পুরুষকে কৃপা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন, ষষ্ঠী সেখানে স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া আগমন করেন ও তাহার সংসার ভরাইয়া তোলেন। আজ যাঁহার জীবন লইয়া সামান্যভাবে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এ দৃষ্টান্ত তাঁহার কাছে খাটিয়াছে—হুবহু।

ইংরেজি ১৮৬৭ খৃঃ ও বাঙ্‌লা ১২৭৪ সালে চৈত্র মাসের কোন এক দিন নবদ্বীপের আম্পুলিয়া পাড়ায় মহামহোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণি—যিনি তৎকালোচিত জ্ঞানে উন্নত অথচ অর্থে অত্যন্ত হীনাবস্থাগ্রস্ত। পূর্বেই বলিয়াছি, ধনী নির্ধনী দেখিয়া কেহ জন্মায় না, কাজেই পূর্ব-জাতক এই দুস্থ পরিবারে আসিয়াই জন্ম-গ্রহণ করিলেন এবং এ-কথাও বলিয়াছি, লক্ষ্মীর যেখানে কৃপা কম ষষ্ঠীর সেখানে অনুগ্রহ বেশী, অতএব জন্মসূত্রে জাতকের সাথী হইয়াছিল অনেকগুলি ভাই-বোন, সংখ্যায় দশ এগারটি।

গল্পে শুনিয়াছি, বিশেষ আমার ঠাকুরমার কাছে, যিনি আজও জীবিত আছেন, বয়স একশত চার-পাঁচ বৎসর, জ্ঞান এখনও তাঁর স্বাভাবিকই আছে, নাম গিরিবালা দেবী:

তিনি যখন এখানে এসেছিলেন (নবদ্বীপে), তখন তাঁহার বয়স ছিল বড় জোর দশ কি এগার। সেটি তাঁহার বিবাহের বছর। তখন এদেশে আজকালকার মত এত লোক, এত বাড়ীঘর তো ছিলই না—ছিল কেবল বাঁশ বাগান, আম বাগান, কাঁঠাল বাগান, ডোবা—আর তাহার মাঝে বাস করিত দেশের লোকেরা ছোট-বড় নানা ধরণের একতালা পাঁজা পোড়ান ইঁটের কোঠা বাড়ী, খড়ের চাল ও মাটির দেওয়াল দেওয়া বাড়ী—এই রকম। ঘন বাস এ অঞ্চলে এক রকম ছিলই না, যা একটু ছিল তা ওই পোড়ামা-তলা, শিবতলা, শ্রীবাস-অঙ্গনের ধার, আগমেশ্বরী—এই সব অঞ্চলে।

কাজেই ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণির বাড়ীটি ছিল যে অঞ্চলে—তাহা ছিল ডোবা, আম-কাঁঠালের বাগান ও বাঁশ বাগানের মধ্যে। অতীত নবদ্বীপের সে শোভা আজিও এ অঞ্চলে আছে; এমন কি দেশের অনেক স্থানেই আছে। তখন ঘন-বাস এখানে ছিল না; কেবল দু-পাঁচ ঘর প্রতিবেশী তাঁহার ছিল, যেমন: দিননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ন্যায়ভূষণ (আমার ঠাকুরদাদা), মধুসূদন চক্রবর্ত্তী, গোপাল ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণ সাণ্ডেল, যাদব পাল—এই রকম কয়েক ঘর।

চূড়ামণি মহাশয় প্রতিভাবান পণ্ডিত হইলেও প্রতিষ্ঠাবান বিশেষ ছিলেন না। তখন তাঁহার অপেক্ষা অধিক প্রতিভাবান বহু পণ্ডিত বাস করিতেন এবং তাঁহারা ছিলেন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ। প্রতিষ্ঠা একবার হইয়া গেলে তাহা যেমন নষ্ট করা শক্ত, প্রতিষ্ঠিত অনেকের মাঝে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চেষ্টা করিয়া জয়যুক্ত হওয়া তদপেক্ষাও শক্ত। চূড়ামণি মহাশয় আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। তখনকার নিয়মমত নিজেও একটি টোল-বাড়ী রাখেন, অন্ন দিয়া পড়ুয়াদের অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন, কিন্তু দরিদ্রের পক্ষে ইহা একটি প্রহসন মাত্র। ছাত্র কিছু জুটিল, অথচ বৃত্তি নাই; অবস্থাও সচ্ছল নহে, উদ্দেশ্য বজায় রাখা অত্যন্ত দুরূহ। তিনি বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কি করিয়া স্বীয় অবস্থার উন্নতিসাধন করিবেন তাহার উপায় অন্বেষণ করিতে

লাগিলেন, অথচ শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া টোলটিও হাতছাড়া করা সঙ্গত নহে—টোলটিও রহিল। চূড়ামণি মহাশয় নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, অথচ ঠিক্ বুনো রামনাথ* ছিলেন না; কাজেই প্রতিষ্ঠা ও অবস্থার সাচ্ছল্য আনিতে বাহিরে যত উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন—অন্তরে তেমনই উপায় ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিতে আপন আরাধ্য দেবীর শরণ গ্রহণ করিলেন।

মানুষের যাহা আত্যন্তিক কামনা, তাহা কখনও বৃথা হয় না। অচিরেই চূড়ামণি মহাশয়ের একটি কাজ জুটিল, নবদ্বীপ মিশনারী স্কুলে এবং কয়েকটি শিষ্যও হইল।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নবদ্বীপের তথা বঙ্গদেশের শিক্ষার ধারা প্রাচীনপন্থী ছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের প্রথম ভাগে শিক্ষা বিষয়ে বিপর্যয় সাধিত হয়। ১৮৩২ খৃঃ নবদ্বীপে ডীয়ার্ সাহেবের অধীনে দুইটি মিশনারী স্কুল স্থাপিত হয়(২)। এই ডীয়ার্ সাহেব ছিলেন বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাল্না কেন্দ্রের মিশনারী। তিনি তখন বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়াছিলেন কৃষ্ণনগরে।

রেভারেণ্ড হাসেল্ সাহেব যখন বঙ্গদেশের মিশনারী-গণের মধ্যে ছিলেন প্রধান, কৃষ্ণনগর ক্রমে তাঁহাদের একটি প্রধান প্রচার-কেন্দ্র হইয়া ওঠে। ডীয়ার্ সাহেব নবদ্বীপে যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন তাহা তখন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয় নাই; উহা ছিল তখন প্রাথমিক ইংরেজী বিদ্যালয়; পরে সম্ভবত ১৮৫০ খৃঃ কিম্বা তৎসমকালে (ঐ বৎসর কৃষ্ণনগর মহকুমার অধীন চাপড়া থানায় মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়) ঐ প্রাথমিক বিদ্যালয় দুইটির একটি মাধ্যমিক ইংরেজী বিদ্যালয় রূপে গঠিত হয়। রেভাঃ হাসেল্ সাহেবের পর রেভারেণ্ড মেলিন সাহেব, তৎপরে রেভারেণ্ড শো-এর সময় একটি মিশনারী স্কুল উচ্চ ইংরেজী স্কুলে পরিবর্ত্তিত হয়। জনৈক দেশীয় খৃষ্টান শ্যামাচরণ ঘোষ তখন ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন এবং ভারতচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় হন প্রধান পণ্ডিত।

১৮৬০ খৃঃ বা তৎ-সমকালে কোন একটি বিষয় লইয়া ঘোষ মহাশয় ও বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মধ্যে অত্যন্ত বচসা হয়; ফলে ছাত্রেরা একযোগে সাহেবের নিকট অভিযোগ করে, তাহাতে ঘোষ মহাশয় ও তাঁহার পক্ষের সমর্থনকারী কয়েকটি শিক্ষকের চাকরী যায়; সেই স্থলে কৃষ্ণনগর-নিবাসী নবকৃষ্ণ গাঙ্গুলী ও স্থানীয় ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণি, দিননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ন্যায়ভূষণ প্রভৃতি কয়েকজন নিযুক্ত হন। এই ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণি মহাশয় ও দিননাথ গঙ্গো-পাধ্যায় ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের মধ্যে ছিল অত্যন্ত সম্প্রীতি। উভয়েই ছিলেন নিকট-প্রতিবেশী।

কি কারণে বলা যায় না, উক্ত মিশনারী উচ্চ-ইংরেজী স্কুলটির সেক্রেটারী সাহেব ও প্রধান শিক্ষকের (নবকৃষ্ণবাবুর) মধ্যে ১৮৭০ খৃঃ এক বিরোধের সূত্রপাৎ হয়; ফলে নবকৃষ্ণবাবু স্থানীয় জনসাধারণের সহিত

---

* ইঁহার প্রকৃত নাম রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। তৎকালে নবদ্বীপে আরও একজন রামনাথ বাস করিতেন। তাঁহারও তর্কসিদ্ধান্ত উপাধি ছিল। কাজেই গ্রামের অধিবাসীগণ এই দুইজনকে দুইটি বিশেষ বিশেষণের দ্বারা লক্ষণা করেন। ন্যায়ের পণ্ডিত রামনাথ তর্ক-সিদ্ধান্ত 'বুনো'—যেহেতু গ্রামের বাহিরে তাঁহার বাস ও স্মৃতির পণ্ডিত রামনাথ তর্ক-সিদ্ধান্ত 'গেঁয়ো'—যেহেতু গ্রামের মধ্যে তাঁহার বাস। এই বুনো রামনাথ ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি অতিশয় দুঃখী।

নবদ্বীপের প্রত্যন্ত প্রদেশে যেখানে বুনো রামনাথের বাস ছিল, (যেখানে পুরাতন পাকা-টোল ছিল এবং যেখানে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যাপীঠ এক্ষণে স্থাপিত হইয়াছে) একদা সেখানে উপস্থিত হইলেন নদীয়া-রাজ শিবচন্দ্র। তিনি রামনাথকে মাসিক অর্থ সাহায্য ও টোলগৃহাদি নির্মাণ ও আয়সংস্থান উদ্দেশ্যে কিছু জমি দান করিতে ইচ্ছা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রাহ্মণ! আপনার কোন বিষয়ে অনুপপত্তি আছে? রামনাথ তখন ছাত্রগণকে পাঠ দিতেছিলেন, মহারাজের কথার উত্তর তিনি বলিলেন, মহারাজ! চারি খণ্ড চিন্তামণিশাস্ত্রের উপপত্তি করিয়াছি, কৈ আমার তো অনুপপত্তি কোথাও আছে বলিয়া বোধ করিতেছি না।' মহারাজ বিস্মিত হইলেন, স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, আপনাকে কিছু বিত্ত সাহায্য করিতে চাহি। রামনাথ তাহা অস্বীকার করেন। আর একবার কলিকাতার রাজা নবকৃষ্ণকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

(২) In 1832, a Mr. Deerr, who was then stationed at Kalna in the Burdwan district, went to Krishnagar for a change of air, and while there, opened two Schools in the town of Nabadwip and one at Krishnagar itself.

—Vide, Bengal District Gazetteer, Nadia, p. 136

মিলিত হইয়া—'তাহারা (মিশনারীরা) যে অবৈতনিক বিদ্যাদান ও চিকিৎসাদানের সুযোগ লইয়া দেশের মস্ত বড় ক্ষতি সাধন করিতেছে ও উত্তরকালে করিবে, দেশের জাতীয় সভ্যতা কৃষ্টি বলিয়া কোন কিছু রহিবে না'—ইত্যাদি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন। ক্রমে ১৮৭৩ খৃঃ দেশবাসীগণের সহযোগে তদানীন্তন নসীবাবুর বৈঠকখানায় (বর্তমান রাধারমণ বাগে) মিশনারীগণের হস্ত হইতে দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে নবতর এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহার নাম হয় নবদ্বীপ হিন্দুস্কুল।

এই সময়ে মিশনারী ও নবদ্বীপবাসিগণের মধ্যে এক গুরুতর সংঘর্ষ হইতে থাকে। ফলে হিন্দু স্কুলটি টিকিয়া যায় ও মিশনারী স্কুলটি অল্পদিনের মধ্যে উঠিয়া যায় এবং ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণি মহাশয় ও দিননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ন্যায়-ভূষণ মহাশয় হিন্দু স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন।

যাহা হউক, দেশের এইরূপ বিপর্যয় অবস্থার মধ্যে ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণির পঞ্চম সন্তান শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয় তাঁহার শৈশব জীবন অতিক্রম করেন। নয় বৎসর বয়সে তাঁহার উপনয়ন হয় ও দশ বৎসর বয়সে সংস্কৃত ব্যাকরণ (মুগ্ধবোধ) শিক্ষা করিতে তাঁহাদের বাড়ীর পাশেই লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের টোলে প্রবিষ্ট হন। যথাকালে ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট কাব্য পাঠ করিতে থাকেন। অনুমান ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি কাব্যতীর্থ পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হন। কাব্য-পাঠ গ্রহণ কালেই ইনি আরও একটি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে একদিন অন্তর মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়-পঞ্চাননের নিকট উপস্থিত হইতেন। এই শাস্ত্র স্মৃতি। কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের টোল ছিল নবদ্বীপ হইতে অনুমান ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে পূর্বস্থলী নামক গ্রামে। নিত্য এই দীর্ঘ পথ যাওয়া শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয়ের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না বলিয়াই বোধ হয় তিনি একদিন অন্তর যাইতেন। ১২৯২ সালে তিনি 'বঙ্গবিবুধজননী সভা' (নবদ্বীপ) হইতে বাচস্পতি উপাধি লইয়া স্মৃতিশাস্ত্রেরও পাঠ উদযাপন করেন। অতঃপর তিনি চাকরীর চেষ্টা করেন, কিন্তু কোন সুযোগ না পাওয়ায় পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত টোলে অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন।

যখন তাঁহার বয়স বিশ কি একুশ বৎসর তখন তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার স্ত্রী ব্রজবিদ্যারত্নের পুত্র মথুর পদরত্নের তৃতীয়া-কন্যা। ঐ বৎসরই ফাল্গুন মাসে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয় এবং পরবৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার পিতার মৃত্যু ঘটে।

পিতার মৃত্যুর পর পিতৃ-পরিত্যক্ত গৃহখানি ও অল্প-মাত্র নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি ব্যতিত অপর কোন বস্তুই তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পান নাই। কিন্তু তাহাতে কি যায় আসে! পিতার অন্তর্নিহিত সম্পদ তিনি লাভ করিয়াছিলেন। কঠোর অধ্যবসায়, দারুণ সহিষ্ণুতা ও অশ্রান্ত কর্ম-প্রচেষ্টায় অল্পকাল মধ্যেই তিনি ভাগ্য-পরিবর্তনে সক্ষম হইয়াছিলেন। পিতৃ-টোলের ছাত্রগণ বৃত্তি পাইলে তাহাদের অন্নসংস্থান তাহাকে আর করিতে হয় নাই। এই অবসরে তাঁহার সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সূচনা হয়। তাঁহার পিতার কোন এক স্বর্থবান অপুত্রক শিষ্য তাঁহার গৃহে তীর্থ-দর্শন বা তীর্থ-বাস উদ্দেশ্যে আগমন করে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। এই সূত্রে তিনি কিছু অর্থও লাভ করেন।

অতঃপর প্রায় বিশ বৎসর টোলে অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী থাকিয়া ১৯০৭ খৃঃ বর্দ্ধমান-রাজের চতুষ্পাঠীতে স্মৃতির প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু এ পদে তাঁহাকে বেশী দিন অতিবাহিত করিতে হয় নাই। ১৯১১ খৃঃ তিনি কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজের টোল-বিভাগে স্মৃতির অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসর তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পেন্সন লাভ করেন। এই সময়ে তিনি 'অলঙ্কার দর্পণ' 'ভারতের দণ্ডনীতি' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পেন্সন প্রাপ্তির পরও তিনি কর্ম-জীবন হইতে বিশ্রাম খুঁজিয়া লইতে চাহেন নাই, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৯২৮ খৃঃ তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন।

কর্মব্যস্ত জীবনের তালে পা ফেলিয়া চলিতে তাঁহার শেষ জীবনের বহু বৎসরই প্রবাসে কাটিয়া গেলেও স্বদেশের প্রতি তাঁহার ছিল অত্যন্ত মমত্ব-বোধ। তিনি বহুদিন স্থানীয় "বঙ্গবিবুধজননী" সভার সম্পাদক এবং স্থানীয় এডোওয়ার্ড য্যাংলো সংস্কৃত লাইব্রেরী, পূর্ণিমাসাহিত্য-সম্মেলন ও অন্যান্য অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ছিলেন যোগ্য পদে অধিষ্ঠিত। বাগ্মিতা, কবিত্ব, অমায়িকত্ব, স্বদেশপ্রেমিকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ছিলেন অলঙ্কৃত। দেশকে তিনি এত ভালবাসিতেন যে কলিকাতা, রাঁচি, যেখানেই তিনি থাকুন না কেন, বৎসরে দুই-তিন বার তিনি এখানে আসিয়া বাস করিয়া যাইতেন। সব কয়টি গুণের মধ্যে তাঁহার আরও একটি বড় গুণ ছিল যে, তিনি একনিষ্ঠ ভক্ত। দেবীপূজা বা দেবপূজায় তাঁহাকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, একথার সম্পূর্ণতা তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন।

১৯৩৬ সালের ৯ ডিসেম্বর তিনি যখন তাঁহার কলিকাতাস্থ নিজ-ভবনে (বাচস্পতি-ভবন, পার্ক সার্কাস্) পরলোক গমন করেন নবদ্বীপ সেদিন সত্যই তাহার নিজস্ব একটি উজ্জ্বল রত্ন হারাইয়াছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল উনসত্তর বৎসর। তাঁহার এগারটি সন্তানের মধ্যে এক্ষণে ছয় পুত্র ও একটি কন্যা বর্তমান। ইঁহারা সকলেই ইংরেজি শিক্ষায় কৃতবিদ্য। •

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও বাংলার কীর্ত্তন

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র রায় বাহাদুর, এম্‌-এ

আপনাদের এই নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলনে আমাকে কীর্ত্তনের কিছু পরিচয় দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন তজ্জন্য শুধু আমি নয়, সমস্ত কীর্ত্তন-সমাজ আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ। কীর্ত্তন গানকে আপনাদের উচ্চ সঙ্গীতের আসরে স্থান দিতে অনেকেই কুণ্ঠিত, তাহা আমি জানি। সেই জন্যই শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও আপনাদের আমন্ত্রণ আমি সানন্দে গ্রহণ করিয়াছি। বাংলার সঙ্গীত-সম্মেলনে কীর্ত্তন গানের স্থান না থাকিলে সম্মেলনের উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকে বলিয়া আমি মনে করি। এই সম্মেলনে বঙ্গের এবং বঙ্গের বাহিরের বহু গুণী, বহু ওস্তাদ সমবেত হইয়াছেন। এই সম্মেলনে বাংলার সঙ্গীত-সম্পদকে উপেক্ষা করিলে তাহা কখনই শোভন হইত না।

আমি জানি, এই সমস্ত সঙ্গীত-সম্মেলনে মার্গ সঙ্গীতকেই উৎসাহ দান করা হয়। আপনারা এই মার্গ সঙ্গীতের সাধনায় যশস্বী হইয়াছেন। সুতরাং আপনাদের পক্ষে এই মার্গ সঙ্গীত বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কীর্ত্তনের জন্ম এই বঙ্গদেশে, কাজেই ইহা প্রাদেশিক সঙ্গীত। অনেকের মনে এইরূপ ধারণা আছে যে, মার্গ সঙ্গীত ভারতের সকল প্রদেশেই একরূপ। আমার বোধ হয় সে ধারণা ঠিক নহে। মার্গ সঙ্গীতেও যথেষ্ট প্রাদেশিক বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। সে যাহাই হউক, একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে সঙ্গীতের ইতিহাসে বাংলার কীর্ত্তনের ন্যায় আর কোনও প্রদেশের এত বড় অবদান আর নাই। কি জনপ্রিয়তায়, কি অভিনবত্বে, কি কলাকৌশলে (technique) কীর্ত্তনের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে, এরূপ আর কোনও প্রাদেশিক সঙ্গীত-পদ্ধতির নাম করা যায় না। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতে যে সঙ্গীত-রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে বর্ত্তমান উত্তর-ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত তাহারই ধারা রক্ষা করিতেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাতে কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিলে অনেকের সঙ্গীত-সাধনা কৃতকৃতার্থ হয়, ইহাও সত্য। কিন্তু এখানে বাংলার স্থান কোথায়, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন? বাংলার মনের কোনও ছাপ এই সঙ্গীতে পাওয়া যায় কি? আমাদের এই সোনার বাংলার যে স্বতন্ত্র প্রতিভা আছে, সে সম্বন্ধে অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে বোধ হয়। এই প্রতিভাকে অস্বীকার করা সমীচীন হইবে না। প্রতিভা কাহাকে বলে? যাহা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহারই পুনরাবৃত্তি? অথবা সেই নব নবোন্মেষশালিনী শক্তি—যাহা প্রাচীনের মধ্যে প্রাণের স্পর্শ আনিয়া দিতে পারে এবং নূতনের মনোমোহন রূপ উদ্‌ঘাটিত করিতে পারে? বাঙ্গালীর প্রতিভা একদিন প্রাচীনের ভিত্তিতে সঙ্গীতের নূতন প্রমোদকানন নির্মাণ করিয়াছিল। আমি বাঙ্গালী গায়ক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করিতে চাই।

কীর্ত্তন-সঙ্গীত একদিন বাংলাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, বাঙ্গালীকে পাগল করিয়াছিল। সরস্বতীর বরপুত্র আপনারা, এই সম্পদকে উপেক্ষা করিবেন? সারা ভারতে আপনাদের গানের সুরের আসন পড়িয়াছে, আপনারা সেই সুরের সাধনা করুন, কোনও ক্ষতি নাই। কিন্তু বাংলার সাধকদের পূত পদ-রজঃ মাখিয়া ধন্য হইবেন না? বাংলা মায়ের আহ্বান সন্তানের কানে যে মধু বর্ষণ করে, এমন আর কিছুতে হয় কি? উত্তর ভারতের ক্ষীরের খাবার খাইয়া যখন রসনা পরিপূর্ণ তৃপ্তি প্রাপ্ত হইবে, তখন একবার বাংলার ছানার সন্দেশ খাইয়া দেখিবেন—ইহার তুলনা কোথাও পাইবেন না।

আপনারা হয় ত বলিবেন যে সঙ্গীতের প্রশস্ত রাজপথ (মার্গ) পরিত্যাগ করিয়া প্রাদেশিক সঙ্গীতের অলিতে গলিতে ঘুরিয়া মরিতে যাইব কেন? বর্ত্তমানে যে প্রণালীতে কীর্ত্তন গান হয়, তাহা যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত হইতে অনেকটা পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু কীর্ত্তন যে মূলধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সে দোষ কাহার? আমার বোধ হয় সঙ্গীতজ্ঞ-গণের ঔদাসীন্যই এই পরিস্থিতির কারণ। এমন একদিন

ছিল যখন বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্‌গণ এই কীর্ত্তন-সঙ্গীতের অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিতেন এবং নূতন নূতন সুর ও তাল সৃষ্টি করিয়া সঙ্গীতের সম্পদ্ ও সুষমা বৃদ্ধি করিতেন।

পাশ্চাত্য জগতে এখনও সঙ্গীতে নূতন সৃষ্টি হয়, নূতন নূতন ছন্দ, নূতন নূতন সুর-সমাবেশের দ্বারা সঙ্গীতের প্রাণশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশের মার্গ-সঙ্গীত গতানুগতিকতাকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। নিঃশঙ্ক শার্ঙ্গদেবের সময় (ত্রয়োদশ শতাব্দী) হইতে এই সাত শত বৎসর সঙ্গীতের ধারা একই খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। কীর্ত্তন গান তাহারই ছায়াতলে এক নূতন অনুভূতিপুষ্ট নীড় বাঁধিল। এই নূতন সৃষ্টি সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং বন্যার মত সারা দেশের উপর ছড়াইয়া পড়িল। কীর্ত্তনের সুবর্ণ যুগে শ্রেষ্ঠ সুর-শিল্পীরা অদ্ভুত প্রতিভাবলে দেশী সুরের বুনিয়াদে রাগ-রাগিণীর নূতন সমাবেশে এক নূতন ঠাটের সৃষ্টি করিলেন। প্রাচীন সাহিত্যে এই সৃষ্টির ইতিহাস আমরা যেরূপ ভাবে দেখিতে পাই তাহার সহিত বৈঠকী সঙ্গীতের অনেকখানি যোগ আছে। বরঞ্চ বর্ত্তমান কীর্ত্তন-পদ্ধতির সঙ্গে তাহার তেমন মিল দেখা যায় না। খেতরির মহোৎসবের যে বর্ণনা ভক্তিরত্নাকরে পাই তাহা প্রায় দুইশত বৎসরেরও প্রাচীন। সে বর্ণনা এইরূপ :

খেতরিতে কীর্ত্তন হইতেছে—বিশাল জন সংঘট্ট। নরোত্তম দাস ঠাকুরের সঙ্গিগণ কীর্ত্তন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে গোকুল দাস একজন প্রধান গায়ক ছিলেন। তিনি গান ধরিলেন—অনিবদ্ধ সঙ্গীত। অনিবদ্ধ সঙ্গীতে 'কথা' অনাবশ্যক।

অনিবদ্ধ গীতে বর্ণন্যাস স্বরালাপ।
আলাপে গোকুল কণ্ঠধ্বনি নাশে তাপ॥

—ভক্তিরত্নাকর

সঙ্গে দেবীদাস শ্রীখোলে করাঘাত করিতেছেন। 'অমৃত অক্ষর প্রায় বাদ্য সঞ্চারয়ে।' এ সকল কবিকল্পনা নহে। খেতরির মহোৎসবে দেশের সমস্ত বড় বড় গায়ক, বাদক, বড় বড় ভক্ত, বড় বড় কবি সকলেই যোগদান করিয়া ছিলেন। বাংলার বাহির হইতেও গুণী জ্ঞানী রসিক সজ্জনগণ আসিয়া জুটিয়াছিলেন। ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা। সুতরাং এই মহোৎসবে কীর্ত্তনের যে ছবি আমরা পাইতেছি, তাহা উপেক্ষা করা চলে না। শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর খেতরির রাজকুমার—গৃহত্যাগী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব। তাঁহার পরিকরগণ সকলেই গীতবাদ্যে বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁহাদের কীর্ত্তনের বর্ণনা এইরূপ :—

বার বার প্রণমিয়া সবার চরণে।
আলাপে অদ্ভুত রাগ প্রকট কারণে॥
রাগিণী সহিত রাগ মূর্ত্তিমন্ত কৈলা।
শ্রুতি স্বর গ্রাম মূর্চ্ছনাদি প্রকাশিলা॥

—ভক্তিরত্নাকর

এইভাবে গোকুলাদির অনিবদ্ধ সঙ্গীত হইবার পরে শ্রীনরোত্তম দাস নিবদ্ধ সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন।

নরোত্তম গণসহ তাঁরে প্রণময়।
নিবদ্ধ গীতের পরিপাটী প্রচারয়॥

—ভক্তিরত্নাকর

সুতরাং এই কীর্ত্তন গানের যে বর্ণনা পাই, তাহার সহিত বর্ত্তমান কীর্ত্তন গানের বড় একটা সামঞ্জস্য দেখিতে পাই না। ইহার কারণ কি? আমার মনে হয় যে, কীর্ত্তন ধর্ম-প্রাণ সঙ্গীত। অর্থাৎ ধর্ম্মের প্রয়োজনে ইহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সঙ্গীতের জন্য সঙ্গীত না হইয়া, আমোদের জন্য নিযুক্ত না হইয়া, ইহা একটি প্রয়োজন-বিশেষের সেবায় নিয়োজিত হইয়াছিল। যতদিন বাঙ্গালীর জীবনে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব সুপ্রচুর ছিল, ততদিন এই গানেরও উন্নতি দ্রুত হইতে লাগিল। কিন্তু জগৎ পরি-বর্ত্তনশীল। একভাবে চিরদিন কিছুই স্থির থাকে না। বাঙ্গালীর জীবন হইতে ধর্ম্মের তুলসীমঞ্জরী যেমন শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, কীর্ত্তনের স্রোতও তেমনি রুদ্ধ হইয়া আসিল। মধ্যযুগে ইউরোপের ইতিহাসেও আমরা এইরূপ ব্যাপার দেখিতে পাই। মধ্যযুগে ইউরোপের দর্শনশাস্ত্র ধর্ম্মের পরিচর্য্যায় চার্চের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল, কাজেই অল্পদিনের মধ্যে তাহারও গতি রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। কীর্ত্তনের ইতিহাসও কতকটা এইরূপ; তারপরে এমন এক সময় আসিল, কীর্ত্তন শ্রাদ্ধবাসরে কোণঠাসা হইয়া পড়িয়া আছে! এইরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয় আমাদের দেশে আরও অনেক ললিতকলার পক্ষে ঘটিয়াছে। ফল হইয়াছে এই যে, বাংলা দেশের সংস্কৃতি জানিতে হইলে

এখন প্রাচীন পুথির মলাটে, প্রাচীন পটে, মন্দিরগাত্রে, কীটদষ্ট পুথির পাতায় খুঁজিতে হয়।

আমি বলি যে এইদিকে আপনারা দৃষ্টি করুন। দিল্লী লক্ষ্ণৌর শলমা-চুমকীর পাগড়ী বাঁধিতে কোনও বাধা নাই, কিন্তু তার সঙ্গে পরিধানে শান্তিপুরে ধুতি, ঢাকাই মসলিন্ থাকিলে আরও সুন্দর হইবে না কি? আপনাদের নিকট সত্যই এই আবেদন লইয়া আজ আমি উপস্থিত হইয়াছি। আপনারা বাংলার সুরশিল্পী-সমাজ বাংলাকে ভালবাসেন বলিয়াই আমার এই আকুতি।

কীর্ত্তনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, বাংলার সাঙ্গীতিক অবদানকে বাংলার বাহিরে প্রচার করিতে হইলে, আপনাদের দ্বারাই তাহা হইবে। এ কাজের ভার আপনারা গ্রহণ না করিলে কে করিবে? আমি যদি আজ বাংলা ভাষায় না বলিয়া ইংরেজিতে বক্তৃতা করিতে পছন্দ করি, তবে আপনারা কি আমাকে ক্ষমা করিবেন? মাতৃভাষারই মত বাংলার এই সঙ্গীত কলা। এত মিষ্ট, এত ভাবসমৃদ্ধ, এত বৈচিত্র্যশালী সঙ্গীত পৃথিবীতে খুব কমই আছে। আপনারা তাহার গৌরব বাড়াইবেন না? আপনাদের সাধনা, আপনাদের প্রতিভা এবং আপনাদের সুরলয়ের আরাধনা এদিকে প্রযুক্ত হইলে কীর্ত্তন-সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি শতগুণে বাড়িবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। সমস্ত শিল্পকলার প্রাণ হইতেছে বৈচিত্র্য। বাংলাদেশ সঙ্গীত-জগতে কি অদ্ভুত বৈচিত্র্য কি অভাবনীয় অভিনবত্ব আনয়ন করিয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

প্রথমত কীর্ত্তনে সঙ্গীত মুক্তির স্বাদ পাইল। বৈঠকী সঙ্গীতের ঠাট ছাড়াইয়া সে এক নূতন পন্থা দেখাইল। শুধু তাহাই নহে, সঙ্গীতের আভিজাত্যের হিমালয় ত্যাগ করিয়া জাহ্নবী ধারার মত সে জনসাধারণের বিশাল সমতলে নামিয়া আসিল। আমরা আজকাল যাহাকে mass music বলি, তাহা কীর্ত্তনেই দেখিতে পাওয়া যায়। কীর্ত্তনের মধ্যে নামকীর্ত্তন বলিয়া যে বিভাগটি আছে, তাহাতে শতসহস্র লোক যোগদান করিতে পারে। মহাপ্রভু যখন পুরীতে জগন্নাথদেবের রথাগ্রে নৃত্যগীত করিতেন, তখন তাহাতে আপামরসাধারণ সকলেই যোগদান করিতে পারিত। Parlour music বা বৈঠকী সঙ্গীতে এই প্রাণমাতানো দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

তারপরে বৈঠকী সঙ্গীতে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অবকাশ অল্প। স্বরের বিস্তারে, মীড় মূর্চ্ছনায় যতদূর কারুকার্য সম্ভব, তাহা বৈঠকী রীতিতে আছে। কিন্তু কথার আবেদনে হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভাবপ্রকাশের ভঙ্গী কেবল কীর্ত্তনেই দেখা যায় —পৃথিবীর অন্য কোনও সঙ্গীতে ইহা দেখি নাই। গায়কের বৈশিষ্ট্য, পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও প্রতিভা কীর্ত্তনের অলঙ্কার বা আঁখরে যেমন প্রকাশ পায়, তেমন আর কোনও সঙ্গীতে হয় কি? এই ভাব ও ব্যঞ্জনা প্রকাশের জন্য কীর্ত্তনের স্রষ্টারা নূতন সুর ও নূতন তালের সৃষ্টি করিয়াছেন। রাগরাগিণীর বিবিধ সংস্থানে এবং মাত্রা ও ছন্দের নানা গতিবৈচিত্র্যের বন্ধনে ইহাঁরা যে আবিষ্কার করিয়াছেন, সঙ্গীতের ইতিহাসে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। শুধু তাহাই নহে, ইহাঁরা অন্য কোনও মূল্যবান যন্ত্রের উপর নির্ভর না করিয়া খোল করতালমাত্র সম্বল করিয়া সঙ্গীতকে জনসাধারণের পক্ষে সুপ্রাপ্য করিয়া তুলিলেন। খোল ও করতাল বা কাংস্যতাল আগে খুব অল্পমূল্যে পাওয়া যাইত। এই বাদ্য অবলম্বন করিয়া যে-কেহ যে-কোনও অবস্থায় সঙ্গীতের আনন্দ উপভোগ করিতে পারিত। জনশিক্ষার ইতিহাসে এইরূপ সংস্কৃতি-প্রচারের মূল্য যে কত বেশী, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতে এই খোল করতাল আবিষ্কৃত হইয়াছে:

শ্রীপ্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল করতাল।
তাহে স্পর্শাইলা শ্রীচন্দন পুষ্পমাল॥

বহু বাদ্যযন্ত্র আছে, কিন্তু 'শ্রী'শব্দ মাত্র খোলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যদিও ইহা মৃদঙ্গেরই রূপান্তর, তথাপি শ্রীমৃদঙ্গ বা শ্রীমাদল কেহ বলে না; শ্রীখোলই বলে। তাহার কারণ আমাদের এই বাংলাদেশের প্রেমাবতার প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের অবদান এই বাদ্যযন্ত্র।

এইখানেই আমার বক্তব্য শেষ করি। আপনাদের করুণাকিরণসম্পাতে কীর্ত্তন-সঙ্গীত উজ্জ্বল হইয়া উঠুক, এই আবেদন লইয়া আমি উপস্থিত হইয়াছি। যদি তাহাই হয়, তবেই এই সম্মেলন সার্থক হইবে। কারণ এইরূপ মিলনকে সার্থক করিতে হইলে চাই উদ্ভাবনী, সৃজনী শক্তি, চাই কল্পনার অব্যাহত স্বৈরগতি, চাই নূতনের সঙ্গে পুরাতনের নিবিড় সংযোগ। বাংলার সঙ্গীত-রত্নপেটিকায় ইহার সবগুলি না হউক, কতকগুলি আপনারা যে পাইতে পারিবেন, সে বিষয় আমার সন্দেহ নাই। *

* নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলনে প্রদত্ত অভিভাষণ।

ভালবাসা

শ্রীসরোজকুমার বাগচী

পনের বছরের তরুণ—কিশোর, ছাদে ঘুড়ি ওড়ায়। হাতে তার অন্যমনস্ক লাটাই, দূরে উড়ছে লাল ঘুড়ি, কিশোরের চোখেমুখে অস্বাভাবিক উদাসভাব। চাঁপার কলির মত রং, মাথাভরা তার কালো কোঁকড়ানো চুল, হৃদয়-খুঁজে-বেড়ানো-চোখ, সব কিছুতেই যেন আজ ব্যক্ত হয়ে পড়েছে কি যেন নিবিড় ব্যথা, কি যেন সে পায় নি—তাই তার অভিমান!

কিশোরের জন্ম-ইতিহাস কিছু বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়, গরীবের ঘরের ছেলে সে। নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, চারদিকের সঙ্গে যেন তার কিছুই মিল নেই। কি যেন তার ভেতর দেখি, সচরাচর যা দেখতে পাই না—পৃথিবীর ভালবাসার জন্য তার করুণ অন্তরের অবিরল কান্না সত্যিই বিরল। সে-অন্তর এতই কোমল যে সামান্য ঝড়-ঝাপটায় যেন তা নুয়ে পড়ে, আবার আদর্শে এতই দৃঢ় সে—যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিরও ক্ষমতা নেই তাকে ভাঙে। কিশোর কাঁদে, সত্যিই কাঁদে। সন্ধ্যার মোহভরা অন্ধকারে নদীর তীরে ঘাটে-বাঁধা খেয়াতরীর স্বপ্নালোকে কতদিনই ত দেখেছি তার চোখভরা জল। দুঃখ করে প্রায়ই সে আমায় বল্‌ত, 'দেখ্ সুষেণ, কল্পনায় ইচ্ছা করে পৃথিবীর তিরিশ-কোটি নরনারীর অন্তরের সাথে মিশে যাই, তাদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ একসঙ্গে বেঁটে নিই, নিজেকে যেমন ভালবাসি, তাদেরও তেমনি যেন ভালবাস্‌তে পারি; কিন্তু বাস্তব-জগতে এরকম মেলামেশায় যেন কত বাধা; আমি বুঝি না ভাই, ভালবাস্‌তে গেলে মানুষ কেন স্বার্থ দিয়ে অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে তোলে—লাভালাভের মাপকাঠি দিয়ে সমস্ত জিনিষ এরা বিচার করতে চায়!' কত দিন কিশোর গভীর রাত্রে নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়েছে; পিছু পিছু তার সঙ্গে গিয়ে দেখেছি শ্মশানে তাকে বসে থাকতে—সম্মুখে তার জ্বলেছে চিতা, আল্‌কাত্‌রার মত রাত্রির বুকে পাগল অগ্নিশিখার দিকে নিবদ্ধ তার বিভ্রান্ত দৃষ্টি—কি-যে দেখেছে, আর মনে মনে কি-যে ভেবেছে কিছুই তার বুঝিনি।

পাখী-শীকার করতে যেদিন তার বন্ধুর দল সিরোলের জঙ্গলে চলে গেল, তাকে তারা নিয়ে যেতে পারে নি, সে সেদিন ছিল বিমর্ষ হয়ে বসে। জীবহত্যা করা দূরে থাক্, কিশোর সে কথা ভাবতেও পারত না। বন্ধুরা তাকে উপহাস করে বল্‌ত, 'তুই ভারি ভীরু।' গ্রামের লোকের দুঃখকষ্টে কিশোরই ছিল তাদের আশ্রয়। গদাই নমুর যেদিন কলেরা হ'ল সেই বিপদের সম্মুখে ডাক্তার ডেকে এনে সমস্ত রাত তার সেবা-শুশ্রূষা ক'রে তাকে সে বাঁচিয়ে তুলেছিল। ক্ষেন্তি-পিসির দীর্ঘ দুইমাস টাইফয়েড রোগে কিশোর আর তার সঙ্গীরা কত রাত যে জেগেছিল তার হিসাব নেই। কিশোরের অর্থবল ছিল না, তার জনবল ছিল। সকলেরই সে কিশোরদা, সে কিনেছিল সকলকেই ভালবাসা দিয়ে, তার জন্যে সকলেই কঠিনতম বিপদের মধ্যে দিয়ে যেতেও কুণ্ঠিত হ'ত না।

মাঠের মধ্যে গাছ-পাতা-ঘেরা ছোট্ট একটি পড়ো কুঁড়ে-ঘর ছিল—সেখানে কত দিন একলাটি গিয়ে সে চুপ ক'রে বসে থাকত; ভেতর থেকে দরজাটা এঁটে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিত, ঘরের ছোট জানলা দিয়ে দেখা যেত বাইরের একফালি আকাশ। ঘরের ভেতর আসবাব সামান্যই, একটা ছোট সতরঞ্চি, একটা ভাঙা চেয়ার, ঘরের এককোণে একটা কোসাকুসি ও বাঘের ছাল—কিশোর বামুনের ছেলে, ইদানিং নিভৃতে সন্ধ্যা-পূজো আরম্ভ করেছিল। বৃষ্টির দিনে এই ঘরটিই ছিল তার সবচেয়ে প্রিয়। কালবোশেখীর ঝড় যখন বাইরে ধূলি উড়াত, এলোমেলো বৃষ্টির-ধারা কুঁড়ে-ঘরের মাথার ফুটো দিয়ে পড়ে যখন ঘর ভাসিয়ে দিত, কিশোর ঘরের এককোণে

ভাঙা-চেয়ারটাকে নিয়ে বস্‌ত, বাইরের আকাশের বিদ্যুৎ দেখ্‌ত, গায়ে তার এসে পড়ত মৃদু মৃদু বৃষ্টির ছাট্‌। কখন বা উল্লাসে আবৃত্তি করত তার চেনা কবিতার কয়েক লাইন, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'; কখনও আকাশের দিকে চেয়ে চম্‌কে উদাস হ'য়ে যেত থম্‌থমে মেঘের সমারোহ দেখে।

কিশোর স্কুলে পড়ত—নদীর তীরে তাদের বাড়ী, নদীর ওপারে তাদের স্কুল—প্রত্যহ সকাল দশটায় সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে খেয়াতরী বেয়ে ওপারে যেতে হ'ত। সঙ্গে স্কুলের মাষ্টারমশায়রাও থাক্‌তেন, এপারে যাঁদের বাড়ী। কিশোরই দাঁড় বাইত সমস্তক্ষণ, গায়ে তার অসামান্য জোর। বিকেলবেলা আবার ওপার থেকে এপারে আস্‌তে হ'ত। যেদিন ঝড় উঠ্‌ত, কিশোরের সে কি আনন্দ; নদী দুল্‌ছে, মাঝদরিয়ায় তাদের নৌকাও দুল্‌ছে, সকলের মুখে ভয়, কিশোর কিন্তু নির্ভীক, পাকামাঝির মত সকলকে সে অভয় দিচ্ছে। সাঁতারে কিশোরকে হারানো বড় কঠিন কাজ, সে স্কুলে সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় কয়েকবার পুরস্কার পেয়েছে। নদীর উল্টা স্রোত কোথায়, কোথায় বাঁক, সব খবরই তার নখদর্পণে।

একটু ভালবাসলে বা দুটা মিষ্টিকথা বল্‌লে এমন কাজ ছিল না যা কিশোরকে দিয়ে করানো যেত না, যতবড় দুঃসাধ্যই তা হোক না কেন। নিবারণবাবুর মা'র সেদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ হিক্কা উঠা আরম্ভ হ'ল। বরফ চাই। গ্রামে বড়-একটা বরফ পাওয়া যায় না। ট্রেনের আইস-ভেণ্ডরের কাছ থেকে ষ্টেশনে ট্রেন আস্‌লে কিনে নিতে হয়। নিবারণবাবু কাঁদ কাঁদ হয়ে কিশোরের কাছে ছুটে গিয়ে বল্‌লেন, 'বাবা, একটা ব্যবস্থা কর।' রাত-বারটার সময় অমাবস্যার অন্ধকারে হাতে ছোট একটি টর্চ্চ নিয়ে সাইকেলে কিশোর রওনা হ'ল ষ্টেশনের দিকে—তিনমাইল দূরে ষ্টেশন। ষ্টেশনের কাছে এলে দূর থেকে সে দেখ্‌তে পেল ট্রেন দাঁড়িয়ে। গেট বন্ধ ছিল, লোহার গরাদের উপর লাফিয়ে পড়ে সে যখন ট্রেনের সম্মুখে উপস্থিত হ'ল, ট্রেন তখন আস্তে আস্তে চলা সুরু করেছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে আইস-ভেণ্ডরের গাড়ীতে চড়ে বরফ কিনে পয়সা দিয়ে যখন সে নামতে যাবে তখন দ্যাখে প্লাটফরম ছাড়িয়ে ট্রেন অসমতল ক্ষেত্রে চলে এসেছে। বরফ না নিয়ে গেলে নিবারণবাবুর মা মারা যেতে পারেন, এই চিন্তার কাছে তার নিজের বিপদের চিন্তা তুচ্ছ। বরফের চাঁই হাতে নিয়ে টপাং করে চোখ বুজে সে দিল একলাফ। ভগবান তাকে সেদিন রক্ষা ক'রেছিলেন, সে যাত্রা তাই সে বেঁচে গেল। হাতে মাত্র একটা চোট লেগেছিল। বরফ আনা সত্ত্বেও নিবারণবাবুর মা সেই রাতেই মারা গেলেন, কিশোর ঘাড়ে গামছা নিয়ে শ্মশানে চলল।

২

পাঁচ বছর কেটে গেছে। কিশোরের দেহে এখন দুরন্ত যৌবন—উদাস কিশোর একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কিন্তু ভালবাসা পাবার সেই দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্খা একটুও কমে নি। বর্ষার ভরানদীর ধারে ধারে নিতান্ত অকারণেই সে ঘুরে বেড়ায়, জেলেদের মাছ ধরবার জন্য পাতা জালের চারপাশে মাছেদের সন্ত্রস্ত আনাগোনা আনমনে লক্ষ্য করে, সন্ধ্যা হ'লে মাঝিদের নৌকা থামিয়ে লাল লণ্ঠন-জ্বেলে ভাতরান্না করা চেয়ে চেয়ে দেখে—আরও কত কি তুচ্ছ জিনিষকে ঘিরে তার কল্পনা অবশ হ'য়ে যায়। গাছের দিকে তাকিয়ে নূতন পাতার ভেতরকার অগ্নিশিখা তাকে পাগল করে, নেবু-ফুলের গন্ধে রাতে তার ঘুম আসে না, রাস্তায় জমে-থাকা জলের উপর মৃদু মৃদু বৃষ্টিধারা পড়ে ঢেউ তোলে, কিশোরের শরীর শিউরে ওঠে। রাতে বিছানায় শুয়ে কত কি মধুর চিন্তা আসে মনে, বেশ ভাল লাগে, কল্পনায় কাকে যেন সে বুকে টেনে নেয়, ভালবাসে, অভিমান করে, আবার ভয় পায়—কেউ বুঝি তাকে ভালবাস্‌ল না। একদিন কিশোর রায়েদের পুকুরের পাড়ে বসে আছে, সন্ধ্যা হয়-হয়, দূরে একটা ভাঙা শিবমন্দিরের পাশে নারকেল গাছের মাথায় একটা পাখী করুণভাবে ডাক্‌ছে, জলে শ্যাওলার দিকে তাকিয়ে কিশোর অন্যমনস্ক। পিছন থেকে কে-যেন হঠাৎ তার চোখ দুটো চেপে ধরে মাথাটা বুকের মধ্যে একটু টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'বলত কিশোরদা, আমি কে?'

কিশোরের ছেলেবেলার সাথী—রিণা। রিণা অসামান্য সুন্দরী, চোখে কিশোরের মতই বিভ্রান্ত দৃষ্টি—সমস্ত দেহ ঘিরে প্রথম যৌবনের অপরূপ স্বপ্নাবেশ। রিণার হাতে ছিল, অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত দুটো রক্ত পদ্ম—পাপড়িগুলো একটু

একটু খোলা, বাড়ীর সামনে পুকুরে পাঁকের মধ্যে নেমে ঐ দুষ্টু মেয়ে কিশোরের জন্য তুলে এনেছে।

'কিশোরদা, ফুল দুটো তুমি নিও।' এই বলে রিণা যেমন ত্রস্তে এসেছিল, তেমনি চলে গেল। কিশোরের সমস্ত দেহমন একটু শিউরে উঠ্‌ল আনন্দে—রঙীন সূর্য্যোদয়ের প্রথম রোমাঞ্চময় কয়েকটি মুহূর্ত্তের মতই তা নির্ম্মল।

কিশোর ভালবাস্‌ত রিণাকে। পূজারী যেমন ভালবাসে তার শ্যামকিশোরকে, আকাশ যেমন ধরণীর পানে চেয়ে থাক্‌তে ভালবাসে, কিশোরের এ ভালবাসাও তেমনি। এ ভালবাসায় কোথাও একটু ফাঁকি ছিল না, খুঁত ছিল না, তবুও কিশোর চির-অতৃপ্ত, চির-অশান্ত, সে যা চাইত পেত না। সব সময়ই তার দুরন্ত আদর্শবাদী মন ভাবত, ঠিক ভালবাস্‌তে পারছি না, এর চেয়েও ভাল ক'রে ভালবাসা যায়। রিণার অন্তরটুকু কেউ যদি কেটে এনে কিশোরের অন্তরে বসিয়ে দিত, তবুও বোধ হয় তার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হ'ত না। দৈহিক ভালবাসার উপর কিশোরের বড় অশ্রদ্ধা ছিল, যদিও অনেক সময় তাদের প্রভাব তার মনকে ছোট ক'রে ফেল্‌ত, কিশোরের লোলুপ দৃষ্টি ছিল মানুষের অন্তরের প্রতি।

সেদিন বিকেল বেলা কিশোর তাদের বাড়ীর পাশে একটি অজস্র-ফুল-ফোটা চাঁপা গাছ থেকে কয়েকটি চাঁপা তুলে নিয়ে এল। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে—চারিদিকের আকাশে যেন একটা ঘুমের মত ভাব। চাঁপা ফুল ক'টা নিয়ে কিশোর চল্‌ল রিণাদের বাড়ী। রিণা স্নান ক'রে একটা সুন্দর শাড়ী পরে তাদের বাড়ীর ছাদে ঘোরা-ফেরা করছে, অলস-আকাশ তার মনকেও যেন অলস ক'রে তুলেছে। বাড়ীর সমুখে গিয়ে কিশোর ডাক্‌ল 'রিণু!'

'কিশোরদা, যাই' রিণা নীচে নেমে এল। রিণার সঙ্গে কিশোর উঠে এল তাদের ছাদে।

কিশোর বললে, 'রিণু, তোমার জন্যে একটা জিনিষ এনেছি, বল ত কি।'

আগ্রহ সহকারে রিণা বল্‌ল—'কি কিশোরদা, কি এনেছ?'

পকেট থেকে সযত্নে চাঁপা ফুলগুলো বের ক'রে কিশোর একে একে রিণার খোঁপার মধ্যে সেগুলো গুঁজে দিতে লাগ্‌ল। রিণা বল্‌ল 'কিশোরদা, আমিও তোমায় একটা উপহার দেব।' রিণা তার দুই হাত দিয়ে নিবিড়-ভাবে কিশোরের গলা জড়িয়ে ধরে তার গালে একটি চুমু দিল, তার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগ্‌ল। 'কিশোরদা, আমায় তুমি ভালবাস?' রিণার অস্থির কণ্ঠস্বর। কিশোরের চোখ মুখ সমস্তই যেন একসঙ্গে বলে উঠ্‌ল, 'ভালবাসি।'

সেদিনকার ছাদের উপরকার আকাশ দুটি অন্তরের মিলনের আকুলতা উপভোগ ক'রে তাদের আশীর্ব্বাদ করেছিল জানি। নবীন আনন্দে কিশোরের সে রাতে ঘুম হয়নি, সে আরও উদাস হয়ে রইল।

একে তুমি কোন্ পর্য্যায়ে ফেল্‌বে বিধাতা, এ কি প্রেম না পশুত্ব, এ কি ভাল, না মন্দ? দুটি অন্তরের আকুলতা—দেবত্বের সোপানে এ কি মানুষকে তুল্‌বে, এ কি উচ্ছন্নের পথে মানুষকে নিয়ে যাবে? রিণার এই যে প্রেম এতে অন্তরের দাবী আছে, দেহের দাবীও আছে। হে দেবতা, কোন্ দাবীটি তোমার অভিপ্রেত, কোন্ দাবীটিকেই বা তুমি ঘৃণা কর? সংসারে সমস্ত জিনিষ যদি অন্তরের বিশুদ্ধতা দিয়েই বিচার কর, তবে রিণার প্রেমের কিছু সম্মান তোমায় দিতেই হবে। তুমি তা ত দিলে না, হে মূক বধির দেবতা, কত দুর্ব্বোধ্য তোমার মন!

বৈরাগী গান গেয়ে চলে গেল, 'সব ঝুটা, সব ঝুটা!' কিশোর বসে আছে তার ভাঙা কুঁড়ো ঘরে, ভাবাকুল। কি হ'তে তার কি হ'ল—তা কে জানে! বোধ হয় ভাব্‌ছে বসে, কাল বিকালে সেই রিণার ব্যবহার তার যোগ্য কি না—যতখানি ভালবাস্‌লে সে কিছু দাবী করতে পারে ততখানি রিণাকে সে ভালবাসে কি-না? যে বিরাগী পুরুষ তার মনের মধ্যে বসে আছে সে কোন অপমান সহ্য করে না, কাউকে অপমান করে না, বিশেষত ভালবাসার অপমান—কথনই না। তাই কালকের ব্যবহার, তার সূক্ষ্ম-বুদ্ধি আর অন্তর, একসঙ্গে ন্যায্য বলে সায় দিতে পারছে না। বুঝি অন্যায় হ'য়ে গেল, এই আশঙ্কা। কিশোর বুঝেছে, যে-ভালবাসা সে চায়, তা বুঝি এ জগতের নয়। সে-ভালবাসা দেহের কি অন্তরের, তা সে ঠিক বোঝে না, তবে বোঝে তা এ জগতের নয়। নিঃস্বার্থ ভালবাসা, তার স্বরূপ কি, কোন্ জগতে তা আছে, সে তা জানে না, তবুও জানে এ জগতের তা নয়। কথনও বা ভাবে—মানুষকে সে ভালবাস্‌বে না;

বের্ফিন্ উপসাগরের তীরে বা হিম-শীতল গ্রীনলাণ্ডের এস্কিমোদের বরফের ঘরে বসে, একলা মনুষ্য লোকালয়ের বাইরে সে প্রহরগুলো কাটিয়ে দিয়ে জগত থেকে ছুটি নেবে, কিন্তু সে চিন্তাতেও সে শিউরে ওঠে।

কিছুদিন পর একদিন ওদের বাড়ীর রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কিশোরের খোঁজ করলাম। শুনলাম কিশোর সংসার ত্যাগ করেছে। শক্তিমান্ কিশোর, ভালবাসা-পাগল কিশোর–হয় ত ভেবেছে যে, সেই দুর্গম পথ—যার দুইপাশে সযত্নে-ফোটা নাগকেশরের ফুল আর ফণী-মন্সার কাঁটা—নিরন্তর যে পথে চড়াই-উত্‌রাই, সেই বৈরাগ্যের পথ—যার চরম-প্রান্তে পরম-ভালবাসা লুকিয়ে আছে, দুঃখকেই সহ্য করে সেই পথের দিকে এগিয়ে গিয়ে ভালবাসার খোঁজ করা বরং ভাল, স্বার্থপূর্ণ সংসারের ভালবাসা পাবার প্রবোধ দিয়ে প্রতিনিয়ত মনকে ভুলিয়ে রাখার চাইতে। এ পথেও হয় ত ভালবাসা নাও মিলতে পারে। যদি নাই মেলে, দুর্গম পথের কষ্ট ভোগ করার যে অখণ্ড আনন্দ আছে তাও ত মিলবে; মিথ্যা দিয়ে প্রতিনিয়ত মনকে স্তোক দেওয়ার গ্লানি আর ভোগ করতে হবে না। কিশোরের এ পরিবর্ত্তন দেখে আমরা হাস্‌ব, আমরা—যারা অফিসের শেষে গঙ্গার ইলিস হাতে নিয়ে বাড়ী ফিরি, যারা অবসর সময় শেয়ার মার্কেটে ঘোরা-ফেরা করি, আমরা হাস্‌ব;—একটা লাইফ মার্ডার হ'ল বলে; কিন্তু কিশোর কাঁদবে সমস্ত পথ, তার বিরাট আদর্শও কাঁদবে, যতক্ষণ না তার সঙ্গে সে এসে মিশ্‌তে পার্‌ছে।

কিশোরের সেই পড়ো-ঘরে বাতাস মাঝ রাত্রে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে—তার কোসাকুসি ও বাঘের ছাল সযত্নে সেই ঘরের মাটিতে পড়ে আছে।

খুঁজিয়া পাবে কি মোর আজিকার অশ্রুলিপি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

যে পথে চলেছে বাণী প্রতিটী মুহূর্ত্ত মাঝে
মানবের মর্ম্ম হ'তে উঠি'
তিমির গুণ্ঠনময়ী অতীতের সঙ্গ লভি'
ভাবীকাল অন্বেষণে ছুটি—
সে পথে পাঠায়ে দিনু লাবণ্যপ্রভাতে মোর
অন্তরের স্বপ্ন-কপোতীরে,
কৌতুক রহস্যভরা অসীম বিস্ময় পারে
জীবনের অজানা সমীরে।

সে বুঝি গিয়াছে ভুলি' চিরস্নিগ্ধ স্নেহ নীড়
ধ্যান শান্ত মোর চিত্তকূলে,
সে কি আর ফিরিবে না! স্মৃতি তার ক্ষণে ক্ষণে
দুলে-দুলে উঠিতেছে ফুলে
গঙ্গার প্রবাহ সম। বিরহ বেদনা তার
গেলনা ক অশ্রু বরিষণে,
দিবসের ভাঁটা-শেষে রাত্রির জোয়ার আসে
বাদলের ম্লান সন্ধ্যাসনে।
সঙ্গোপনে ওঠে মেঘ, নিবে যায় সন্ধ্যা তারা
ঝটিকার দুরন্ত আঘাতে,
সে মেঘ আমারি মত সহে ব্যথা সুদূরের
শিখিনীর বিরহ-সম্পাতে
শ্রাবণের শ্রোণি বুকে উড়াইয়া উত্তরীয়
অভিসারে চলেছে যামিনী,
দাদুরী ডাহুকী ডাকে মর্ম্ম-গ্রন্থে ছিঁড়ে যায়,
নভোলোকে চমকে দামিনী।
বহিতেছে রসধারা, শিহরিছে কুঞ্জবীথি
কলাপীরা ঊর্দ্ধপানে চাহে,
গগনে মৃদঙ্গ বাজে, বিরহের পদাবলী
ভাবোচ্ছ্বাসে কীর্ত্তনিয়া গাহে।

যে পথে ফিরিবে বাণী, আমি জানি, একদিন
ধরণীর সুবর্ণ লগনে,
প্রভাতী কুসুম গন্ধে বন্দিবে কাদম্বশ্রেণী
হর্ষোৎফুল্ল সুনীল গগনে
সে পথে সে যদি ফিরে বহু যুগ যুগান্তরে
মোর গেহে আসে নবরূপে,
খুঁজিয়া পাবে কি মোর আজিকার অশ্রুলিপি
মৃত্যুম্লান কঙ্কালের স্তূপে!

কলিকাতায় নিখিল-ভারত হিন্দু-মহাসভা

গত ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর কলিকাতায় দেশবন্ধু পার্কে নিখিল-ভারত হিন্দু-মহাসভার একবিংশতি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এ বৎসর হিন্দু-মহাসভার অধিবেশন কেন

বীর বিনায়ক সাভারকর

সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং ইহার প্রয়োজনীয়তাই বা কি ছিল, তাহা মহাসভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহের আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। তিনদিন ধরিয়া প্রত্যহ প্রায় লক্ষাধিক করিয়া লোক মহাসভার অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন এবং সমগ্র বাঙ্গালায় যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল তাহা সাধারণত দেখা যায় না।

আমরা সর্ব্বপ্রথমে যে প্রস্তাবটি আলোচনা করিব, তাহাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় ছিল। প্রস্তাবটি ছিল এইরূপ :

বাঙ্গালার মন্ত্রীমণ্ডলীর নীতির নিন্দা

'বাঙ্গালার হিন্দুদের অধিকার ও স্বাধীনতা হরণ এবং অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য দমন কল্পে বাঙ্গালার

সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার আইন-প্রণয়ন ও শাসন-ব্যবস্থাদি অবলম্বনের মধ্যে যে প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতি প্রকট হইয়াছে, এই সম্মিলন তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলিতে এই নিন্দনীয় মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে—

(১) কলিকাতা মিউনিসিপাল সংশোধন আইন প্রণয়ন—ইহা কেবল হিন্দু-বিরোধী নহে, ইহা জাতীয়তা বিরোধী,

(২) সরকারী চাকরিতে, এমন কি বিশেষজ্ঞ নিয়োগে মুসল-

মানদের অনুকূলে সাম্প্রদায়িক হার প্রবর্ত্তন, (৩) সাম্প্রদায়িক বিবেচনায় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য,

শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(৪) সরকারী চাকরিতে হিন্দু কর্ম্মচারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার, (৫) সাম্প্রদায়িক সুবিধার্থে সরকারী কর্ম্মচারীদের নিয়োগ, (৬) জেলাবিশেষে অতিরিক্তসংখ্যক মুসলমান কর্ম্মচারী স্থাপন, (৭) কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্যচ্যুতির প্রতিবিধানে অবহেলা; ইহার ফলে স্থানীয় মুসলমান জনসাধারণের মনে মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে এবং তাহারা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিতে উৎসাহিত হইয়াছে, (৮) কয়েকটি চাকরি, বিশেষ করিয়া শিক্ষা বিভাগের চাকুরী মুসলমান-প্রধান করণ, (৯) শিক্ষা বিভাগের সদস্য ও বৃত্তিদান এবং স্কুল স্থাপন সম্পর্কে হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা, (১০) স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকসংঘ প্রভৃতিতে মনোনয়ন সম্পর্কে হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা, (১১) নিম্নতম যোগ্যতার নীতি প্রবর্ত্তন করিয়া শাসন-ব্যবস্থার ক্ষমতা ও দক্ষতার অবনতি, (১২) সরকারী তহবিল হইতে দুর্গতদের সাহায্য এবং কৃষি ও শিল্প ঋণদান সম্পর্কে হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা, (১৩) লাইসেন্স ও কনট্রাক্ট সম্পর্কে হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা, (১৪) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে হিন্দুদের ধর্ম্ম, জাতীয়তা ও সংস্কৃতি-বিরোধী পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট করিয়া এবং অর্দ্ধ সত্য ও অসত্য ঘটনা সন্নিবিষ্ট ইতিহাস পুস্তকের ব্যবস্থা করিয়া বাঙ্গালা ভাষা ও হিন্দু-সংস্কৃতি বিকৃত করিবার অপচেষ্টা, (১৫) হিন্দু মন্দির, বিগ্রহ, আরাধনাস্থানসমূহের ধ্বংস ও কলুষিত করা সম্পর্কে আনুপূর্ব্বিক ঔদাসীন্য, (১৬) হিন্দুদের শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠানে অহেতুক বাধা, (১৭) হিন্দুদের বক্তৃতা ও সভা সমিতি করিবার অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ—অথচ মন্ত্রিসভার সমর্থকদের হিন্দু-বিরোধী বক্তৃতা ও প্রচারকার্য্যের কোন প্রতিবিধান ব্যবস্থার অভাব, (১৮) সাম্প্রদায়িকতার প্রচার করিবার জন্য সরকারী তহবিল হইতে মুসলমান সংবাদপত্রকে সাহায্য দান, (১৯) হিন্দু রমণীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবিধান ও মুসলমান গুণ্ডামির হস্ত হইতে হিন্দুদের ধনসম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থায় অক্ষমতা ও (২০) নোয়াখালী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, মালদহ প্রভৃতি যে সব অঞ্চলে মুসলমানদের অত্যাচার বেশী সেই সব অঞ্চলে মুসলমানদের অত্যাচার হইতে হিন্দুদিগকে রক্ষা করার ব্যবস্থার অভাব। এই সভা বাঙ্গালার হিন্দুগণকে
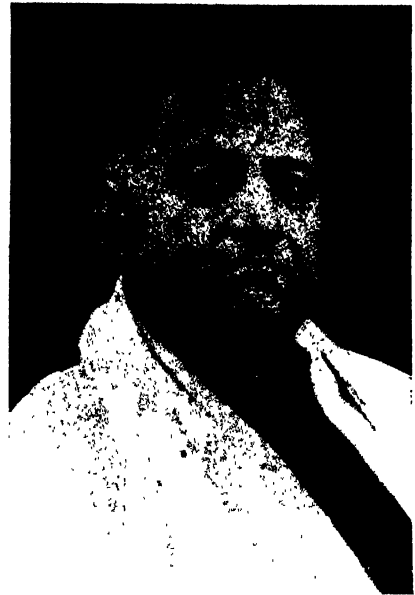
ভাই পরমানন্দ

বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার আক্রমণাত্মক নীতির বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার, স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি রক্ষাকল্পে হিন্দু মহাসভার

পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হইতে আহ্বান করিতেছে। এই সভা ভারতের হিন্দুদিগকে বাঙ্গালার হিন্দুদের জন্য দাবী ও স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে সাহায্য করিতে আহ্বান করিতেছে।'

শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাসভার প্রকাশ্য অধিবেশনে এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়াছিলেন শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। শ্যামাপ্রসাদবাবু শুধু খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার নহেন, তিনি বাঙ্গলার পুরুষসিংহ স্বর্গীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলার। তিনি বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দুদের দুরবস্থা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারেন নাই; তাঁহাকে হিন্দুদের এই জাতীয় আন্দোলনে নামিতে হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে তিনি হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার জন্য বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তীব্র বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কয়দিন মাত্র পূর্ব্বেও তিনি এবং খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালার হিন্দু জনগণের পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রীর উক্তির জবাব দিয়া বাঙ্গালায় হিন্দু নিগ্রহের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেদিন হিন্দুসভায় উপরোক্ত প্রস্তাবের পক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে বাঙ্গালার হিন্দু জাগরণের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদবাবু বলিয়াছিলেন, প্রস্তাবটিতে মন্ত্রীদের অনাচারের উনিশটি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—ঐরূপ উনিশটি কেন, নিরানব্বইটি উদাহরণ দেওয়াও কষ্টকর নহে—শুধু নমুনাস্বরূপ ঐ উনিশটি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার বসু, ব্যারিষ্টার শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহারাষ্ট্র-নেতা শ্রীযুত ভোপৎকার ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি যে শুধু ঐ প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য বাঙ্গালা দেশে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণের ফলে অধিবেশন সার্থক হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

ইহার পরই আমরা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কিত প্রস্তাবটি উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। কারণ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলেই বাঙ্গালার বর্ত্তমান শাসনব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। গত কয় বৎসর ধরিয়া আমরা সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র
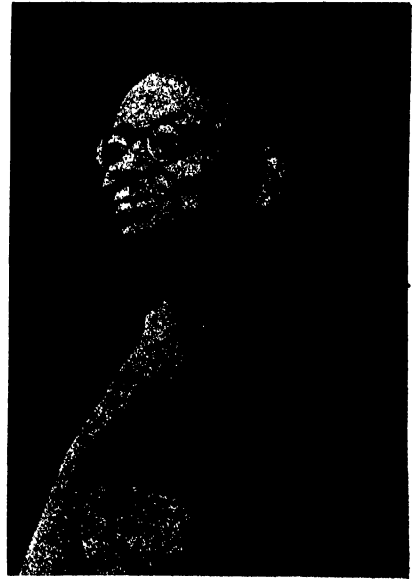
মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য (মৈমনসিংহ)

এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ব্যবস্থার নিন্দা করিয়াছে এবং আমাদের বিশ্বাস, এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত বাঙ্গালার হিন্দুরা শান্তিতে নিদ্রা যাইতে পারিবে না। এই

প্রস্তাবটি মহাসভার অধিবেশনে উপস্থিত করিয়াছিলেন—ব্যারিষ্টার শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি আজ এই আন্দোলনে নূতনভাবে যোগদান করিলেও জাতীয় আন্দোলনে যোগদান তাঁহার নূতন নহে—তিনি এককালে কংগ্রেস আন্দোলনের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি হিন্দু মহাসভার বর্ত্তমান অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ-সম্পাদকরূপে বাঙ্গালার হিন্দুদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহার

সাভারকর সম্বর্দ্ধনার দৃশ্য

কথা বাঙ্গালী হিন্দু কোনদিন বিস্মৃত হইবে না। তিনি যে প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম—

'নিখিল-ভারত হিন্দু-মহাসভা পুনরায় দৃঢ়তার সহিত ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন-তন্ত্রের ভিত্তিস্থানীয় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার নিন্দা করিতেছে এবং অন্যান্য কারণের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণেও ইহা রদের জন্য সমস্ত ভারতবাসীকে দেশব্যাপী আন্দোলন চালাইতে অনুরোধ করিতেছে—(১) ইহা সর্ব্বপ্রকার গণতান্ত্রিক নীতিবিরোধী এবং ভারতের জাতীয়তার ভিত্তিমূলোচ্ছেদক, (২) একমাত্র জাতীয়তার ভিত্তির উপরেই দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে; কিন্তু পৃথক নির্ব্বাচন-প্রথা জাতীয়তার বিরোধী। অথচ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় পৃথক নির্ব্বাচক প্রথা কায়েম করিয়া রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে, (৩) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় কোন সম্প্রদায়কে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও কোন সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘিষ্ঠ আখ্যা দিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ইহা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং ইহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়। (৪) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে আইন সভায় আর্থিক ও সামাজিক কর্ম্মপন্থার উপর ভিত্তি করিয়া দল গঠন করা অসম্ভব, অথচ তাহা না করিলে শাসনতন্ত্রও সম্ভব নহে, (৫) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে দেশের জনসাধারণ ও নির্ব্বাচকগণ আঠারটি পৃথক ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তাহারা পৃথকভাবে নিজেদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে; ফলে তাহারা জাতীয় মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে না। নীতি ও কর্ম্মপন্থায় তাহাদের মধ্যে ঐক্যমত সম্ভব নহে। (৬ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় হিন্দুদের প্রতি ঘোর অবিচার করা হইয়াছে; বিশেষত কেন্দ্রীয় পরিষদে এবং বাঙ্গালা, পাঞ্জাব ও আসামের আইন সভায় হিন্দুদের উপর ঘোর অবিচার করা হইয়াছে। জনসংখ্যা অনুসারে হিন্দুরা যতটি আসন পাইবার অধিকারী, বাঁটোয়ারার ফলে তাহারা ততটি আসন লাভে বঞ্চিত হইয়াছে, (৭) উহাতে হিন্দুদিগকে বঞ্চিত করিয়া ইউরোপীয়ানদিগকে, বিশেষত বাঙ্গালা ও পাঞ্জাবের ইউরোপীয়দিগকে, অতিরিক্ত সদস্যপদ দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু মহাসভা ঘোষণা করিতেছে যে, যতদিন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা রদ না হইতেছে, ততদিন এইদেশে কিছুতেই শান্তি স্থাপিত হইবে না।'

পাঞ্জাবের ডাক্তার সার গোকুল চাঁদ নারাং, বাঙ্গালার খ্যাতনামা পণ্ডিত ও মনীষী অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও তপশীলভুক্তজাতিসমূহের প্রতিনিধি শ্রীযুত অগ্নিকুমার মণ্ডল এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল।

নানাকারণে হিন্দু মহাসভায় গৃহীত আরও দুইটি প্রস্তাব

আমরা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। প্রস্তাব দুইটি পরপর নিম্নে প্রদত্ত হইল :

প্রাদেশিক সীমানার পুনর্গঠন

হিন্দু-মহাসভার মত এই যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সীমানা জাতিগত, ভাষাগত, সংস্কৃতিগত ও আচার-অনুষ্ঠানগত স্বাভাবিক ভিত্তিতে নির্দ্ধারিত হয় নাই। মহাসভা দাবী করিতেছে যে, উপরোক্ত স্বাভাবিক ভিত্তিতে প্রদেশগুলির সীমানা পুনর্বণ্টন করা উচিত। হিন্দু-মহাসভা উহার ওয়ার্কিং কমিটিকে বিভিন্ন প্রদেশের সীমানা সম্পর্কে যত্ন সহকারে তদন্ত করিয়া এই ব্যাপার সম্বন্ধে ছয় মাসের মধ্যে একটা রিপোর্ট দাখিল করিতে নির্দ্দেশ দিতেছেন।

শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী

হিন্দুদের সংখ্যাগণনা সম্বন্ধে প্রস্তাব

হিন্দু-মহাসভা সমস্ত হিন্দুকে লোকসংখ্যা গণনার সময় যাহাতে হিন্দুদের সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায় তজ্জন্য যথেষ্ট যত্ন লইতে ও আদমসুমারী কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করিতেছে। লোকগণনা কালে বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে গণনাকারী লইবার ব্যবস্থা করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যার গণনা যাহাতে সঠিক হয় তদুদ্দেশ্যে যথোচিত ব্যবস্থা করার জন্য মহাসভা গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে। মহাসভা আদমসুমারীর কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইতেছে যে, যে সকল লোক নিজদিগকে হিন্দু বলে ও বরাবর হিন্দুধর্ম্মের অনুশাসন মানে তাহাদিগকে হিন্দু বলিয়া রেজেষ্টারী না করিয়া অন্য নামে রেজেষ্টারী করিলে হিন্দুদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইবে।

শোক প্রস্তাব

প্রথম দিনের অধিবেশনে হিন্দু-মহাসভা যে সকল নেতৃবৃন্দের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে কয়েকজন খ্যাতনামা বাঙ্গালীর নামোল্লেখ দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আমাদের আরও শ্লাঘার বিষয় এই যে, ঐ সঙ্গে 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয়ের নামও উল্লিখিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত সতর জন হিন্দু নেতার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হইয়াছে—ভিক্ষু উত্তম, লালা হরদয়াল, বরোদার গাইকোয়াড়, গিরিশচন্দ্র বসু, জলধর সেন, দীনেশচন্দ্র সেন, স্বামী অভেদানন্দ, ভীদে শাস্ত্রী, ডাক্তার পটবর্দ্ধন, মীরাজের রাজা, রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, তরুণরাম ফুকন, এল্-আর-টাঁয়াসে, ভগৎকুমার রাম, লালুভাই গোবর্দ্ধনদাস, রামদেব ও রজনীকান্ত আইচ।

মেজর পি, বর্দ্ধন

রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি

হিন্দু মহাসভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটিও গৃহীত হয়—'হিন্দু মহাসভা এই অধিবেশনে দাবী করিতেছে যে, অবিলম্বে ও বিনাসর্ত্তে সমস্ত রাজনীতিক বন্দীর মুক্তি দেওয়া হউক এবং রাজনীতিক কারণে বিদেশে নির্ব্বাসিত সমস্ত ভারতীয়কে ফিরাইয়া আনা হউক।' বাঙ্গালা দেশবাসী রাজনীতিক বন্দীর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং অনেকে ভারতের বাহিরে থাকিয়া দেশে ফিরিবার অনুমতি পাইতেছেন না—সেইজন্য বাঙ্গালী হিসাবে আমরা এই প্রস্তাবের পূর্ণ সমর্থন করি।

মন্দির পুনরুদ্ধারের দাবী

'নিখিল-ভারত হিন্দু-মহাসভা এইরূপ দাবী করিতেছে যে, হিন্দুদের যে সমস্ত মন্দির মসজিদে পরিণত হইয়াছে এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে, সেই সমস্ত মন্দির হিন্দুদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। এই সম্পর্কে প্রাদেশিক হিন্দু-সভাসমূহকে তাহাদের স্ব স্ব এলাকায় অবস্থিত এইরূপ মন্দিরসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহের নিকট মন্দির প্রত্যর্পণের দাবী পেশ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।' বাঙ্গালায় এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বীর সাভারকর

এবার নিখিল-ভারত হিন্দু-মহাসভার একবিংশ অধিবেশনে কলিকাতায় যিনি সভাপতিত্ব করিতে আসিয়াছিলেন, সেই বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর মহাশয়ের জীবনী প্রকৃতই অদ্ভুত। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বায়ের অন্তর্গত নাসিক শহরে মারাঠী ব্রাহ্মণগণের প্রসিদ্ধ চিৎপাবন বংশে সাভারকর জন্মগ্রহণ করেন। এই বিখ্যাত বংশে বহু দেশপ্রাণ বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে প্রথম পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ, বাজীরাও, সৈন্যাধ্যক্ষ নানা ফড়নবীশ, কূটরাজনীতিক নানা সাহেব, গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে, বিচারপতি রাণাডে ও লোকমান্য তিলকের নাম সর্ব্বজনবিদিত। মাত্র দশ বৎসর বয়সেই সাভারকর মারাঠী কবিতা লিখিতেন ও সেই সকল কবিতা প্রসিদ্ধ মারাঠী সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইত। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যখন লোকমান্য তিলককে গ্রেপ্তার করা হইল এবং য়ারবেদায় চাপেকার ভ্রাতৃবৃন্দ ও রাণাডের ফাঁসি হইল, তখন সাভারকর তাঁহার গৃহদেবতার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—ভারতের মুক্তির জন্য তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিবেন। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনিই প্রথম বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব আরম্ভ করেন। এই সময়ে লণ্ডনে পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবাজী-বৃত্তি লাভ করিয়া সাভারকর ইংলণ্ডে গমন করেন। লণ্ডনে বসিয়াই তিনি ভারতীয় প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করেন এবং তাহাতে তিনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহকে মিথ্যাপ্রচারকার্য্য বলিয়া উল্লেখ করেন। ১৯০৭ সালে ইংরেজগণ লণ্ডনে যখন ১৮৫৭ সালের সংগ্রামবিজয়ের ৫০তম উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তখন সাভারকরও নানা সাহেব, ঝান্সীর রাণী এবং তাস্তিয়া তোপী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন। ঠিক সেই সময়ে তৎকালীন ভারতসচিব লর্ড মর্লির এডিকং সার কার্জ্জন ওয়ালীকে লণ্ডনে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হয় ও শ্রীযুত সাভারকরের সহচর মদনলাল ধিংড়াকে উক্ত হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। ঐ সময় লণ্ডনে এক জনসভায় মদনলালের কার্য্যের নিন্দাসূচক প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে সাভারকর তাহার বিরুদ্ধে

নিজ মত প্রকাশ করেন। সেজন্য সভাস্থলেই সাভারকরকে প্রহৃত হইতে হইয়াছিল; তিনি কিন্তু কিছুতেই কর্ত্তব্যচ্যুত হন নাই ও শেষ পর্য্যন্ত স্বমতে দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯১০ সালের মার্চ্চ মাসে তাঁহাকে লণ্ডনে গ্রেপ্তার করা হয় ও ইংরেজের আদালতের বিচারে তাঁহাকে লণ্ডন হইতে বিতাড়িত করিয়া ভারতে পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিয়াও উক্ত আদেশ নাকচ করিতে পারেন নাই। সেই সময় মার্সেলিস বন্দরের নিকট তিনি ষ্টীমারের শৌচাগারে প্রবেশ করিয়া পোর্ট-হোলের মধ্য দিয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন ও সমুদ্রে সাঁতার দিতে দিতে ফরাসী উপকূলে গিয়া ওঠেন। ঐ সময়ে তাঁহাকে গুলী করিয়া মারিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ফরাসী পুলিসের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহাকে পরে বৃটীশের হস্তে অর্পণ করা হয়। স্পেশাল ট্রাইবিউনালের বিচারে তাঁহার বিভিন্ন দফায় ৫৫ বৎসরের কারাদণ্ড হয়। তাঁহাকে তখন আন্দামানে প্রেরণ করিয়া তথায় ১৪ বৎসর আটক রাখা হইয়াছিল। পরে তাঁহাকে বোম্বায়ের রত্নগিরির জেলে স্থানান্তরিত করিয়া তথায় ১৪ বৎসর আটক রাখা হইয়াছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে ও সেই সময় হইতে তিনি হিন্দু-মহাসভা আন্দোলনে যোগদান করিয়া দেশসেবা করিতেছেন। ১৯৩৭ সালে আমেদাবাদে হিন্দু-মহাসভার উনবিংশ অধিবেশনে ও ১৯৩৮ সালে নাগপুরে বিংশ অধিবেশনেও তাঁহাকেই সভাপতি করা হইয়াছিল।

হিন্দু-মহাসভার ইতিহাস

১৯১০ সালে হিন্দু-মহাসভা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানতঃ হিন্দুগণকে সংঘবদ্ধ করা এবং মুসলেম লীগের অনিষ্টকর জাতীয়তা-বিরোধী নীতি ও কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার উদ্দেশ্যেই হিন্দু-মহাসভার উৎপত্তি হইয়াছিল। আজ হিন্দু-মহাসভা ৩০ বৎসরকাল যাবৎ নানাবিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া হিন্দুদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্গত দেশনেতা লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় হিন্দু-মহাসভার অষ্টম অধিবেশন হইয়াছিল। সে সময়েও বাঙ্গালার হিন্দুগণ মহাসভার আহ্বানে তেমন সাড়া দেন নাই। ১৯২৯ সালে সুরাটে দ্বাদশ অধিবেশনে শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আশন গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার হিন্দুদের দুরবস্থার কথা সকলকে জানাইয়াছিলেন। ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে আমেদাবাদ ও নাগপুরে হিন্দু-মহাসভার উনবিংশ ও বিংশ অধিবেশনে বীর বিনায়ক সাভারকরই সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এবার কলিকাতায় একবিংশ অধিবেশনেও তাঁহাকেই সভাপতি করা হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে বীর বিনায়ক সাভারকরের পরিচয় প্রদান করিয়াছি। তাঁহার মত

১১ শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নির্ভীক ও ত্যাগী নেতার পক্ষে পর পর তিন বৎসর এই সম্মান লাভ যেমন যোগ্য হইয়াছে, তাঁহার মত নেতাকে পাইয়াও ভারতবাসী হিন্দুরা তেমনই লাভবান হইয়াছেন।

সাভারকারের অভিভাষণ

গত ১২ই পৌষ কলিকাতায় মহাসমারোহে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সাভারকার এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। আমরা লক্ষ্য করিতেছি, হিন্দু মহাসভার প্রভাব ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহার একটা কারণ মুসলীম লীগের সাম্প্রদায়িক প্রচারকার্য্যের ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনেও

সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রতিক্রিয়া অনিবার্য্য। আর দ্বিতীয় কারণ, মুসলমানদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা হারাইবার ভয়ে সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে কংগ্রেসের উদাসীন নীতি। জাতীয় জীবনে ইহার ফলাফল লক্ষ্য করিবার বিষয়।

কিন্তু সভাপতি সাভারকর হিন্দু নামের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা মুক্ত এক নূতন সংজ্ঞা। তিনি বলিয়াছেন, হিন্দু আন্দোলনের মূল জ্ঞাতব্য তথ্য এই যে, সিন্ধুনদ হইতে সাগরচুম্বিত এই ভারতভূমিকে যিনি তাঁহার পিতৃভূমি, তাঁহার ধর্ম্মের উৎপত্তিভূমি এবং তাঁহার ধর্ম্মের লীলাভূমি বলিয়া মনে করেন, তিনিই হিন্দু। এই সংজ্ঞা অনুসারে শুধু শিখ, বৌদ্ধ, জৈনই নয়, পার্শী এবং ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ও হিন্দু মহাসভার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। বলিয়া রাখা ভাল, ভারতের বাহিরে হিন্দু শব্দ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সেখানে ভারতীয় মাত্রেই হিন্দু বলিয়া পরিচিত। হিন্দু সেখানে ধর্ম্মবাচক নয়, জাতিবাচক। এই অর্থে হিন্দুরা একটা জাতি।

শ্রীযুক্ত সাভারকরের এই সংজ্ঞার ফল সুদূরপ্রসারী হইতে পারে বলিয়া আশা হয়। ভারতের বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় ও মতের বিভিন্নতা স্বীকার করিয়া সাড়ে বত্রিশ ভাজার মত যে ভারতীয় 'নেশন' গঠনের প্রয়াস চলিতেছে, তাহার চেয়ে এই সংজ্ঞা সকলকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করিবে বলিয়াই বিশ্বাস।

বাঙ্গালার দুর্দ্দশা

হিন্দু-মহাসভার অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গলার হিন্দুদের যে সকল দুর্দ্দশার কথা বিবৃত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত গুরুতর। ডক্টর মুখোপাধ্যায় ইহার জন্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এবং বাঙ্গলার মন্ত্রীমণ্ডলকে অংশত দায়ী করিয়াছেন। বাঙ্গলার শাসনকার্য্যে এবং চাকুরী-বণ্টনে কি ভাবে সাম্প্রদায়িকতা চলে তাহার বহু দৃষ্টান্তও তিনি দিয়াছেন। সেই সকল অভিযোগ অত্যন্ত গুরু। এমন কি, এই নীতি শিক্ষাবিভাগেও অত্যন্ত কদর্য্যভাবে অবলম্বিত হয় বলিয়া তিনি অভিযোগ করিয়াছেন। কোন পদে বাঙ্গালী মুসলমান না পাওয়া গেলে, পাঞ্জাব হইতে যোগ্য মুসলমান আমদানি করার কথা হয় এবং বি সি এস পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মুসলমান উত্তীর্ণ হইতে না পারায় তাঁহাদিগকে ঠেলিয়া পার করিয়া দেওয়ারও নাকি চেষ্টা চলিতেছে।

এই দুইটি অভিযোগই অত্যন্ত ভীষণ। ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিবার জন্য শ্যামাপ্রসাদবাবু মন্ত্রীমণ্ডলকে আহ্বান করিয়াছেন। মন্ত্রীমণ্ডল কি উত্তর দেন তাহা দেখিবার বিষয়।

তবু নাচে কালী

শ্রীরাখালদাস চক্রবর্ত্তী

নাচে চামুণ্ডা পৃথ্বীর বুকে রক্ত-পিয়াসী ভীমা
কত যে মরিল অসুর-দৈত্য নাই ক' তাহার সীমা।
তবু সে নাচিছে ভৈরবী-নারী বিশ্বের বুক 'পর
বুক পাতি' দিল কত শিব তায়, কত শত সুন্দর।
তবু নাচে কালী শ্মশানে মশানে, দোলে সে মুণ্ড-মালা
ধরণীর বুক ফুঁড়িয়া উঠিছে যত সব দুখ-জ্বালা।

নাচে তার সাথে রঙ্গিণী যত ধ্বংস-রঙ্গে মাতি'
তাদের হুতাশে ছাইয়া আসিল আঁধারিয়া ঘন রাতি।
জ্বলে শুধু জ্বলে সেথা মহা-চিতা ধ্বংস করিয়া সব
জাগে তারি সাথে সকল ছাপায়ে হাহাকার-কলরব।
আমরা হেথায় জগতের যত নর-নারী সবে মিলে
হাঁপায়ে উঠেছি এসবের মাঝে, মরিতেছি তিলে তিলে।

আর নাহি চাহি ধ্বংসের লীলা, চাহি শুধু শিব-শান্তি
কালিকা চাহি না, চাহি যে জননী ঘুচুক যতেক ভ্রান্তি।

লর্ডসভায় ভারত সচিব—

গত ১৪ই ডিসেম্বর লর্ড সভায় ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড ভারত-প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহা মোটামুটি সেই পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি। 'ওয়ার্কিং কমিটির সর্ব্বশেষ বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে কংগ্রেসের দাবী পূরণ করিতে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উঠিতে পারে না। আমি মনে করি, কংগ্রেসের এই বিশ্বাস আন্তরিক। কিন্তু সম্রাটের গবর্ণমেণ্ট তাহা মানিয়া লইতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়দের সমর্থন না পাইলে কোন গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র চলিতে পারে না।' সেই সমর্থন কংগ্রেসকেই সংগ্রহ করিতে হইবে। কারণ, লর্ড জেটল্যাণ্ড বলিয়াছেন, 'আমরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়-সমূহের উপর কোনরূপ চুক্তি চাপাইয়া দিতে পারি না। ভারতীয়গণ নিজেরাই নিজেদের মধ্যে সর্ব্বসম্মত চুক্তি করিতে পারে।'

লর্ড জেটল্যাণ্ড এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন যে, ভারতের শাসনভার কংগ্রেস যদি মুসলীম লীগের হাতে তুলিয়া দিতেও সম্মত হন তাহা হইলেও ভারতের বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বসম্মত চুক্তি অসম্ভব। কারণ সম্প্রতি দেশীয় রাজন্যবর্গকেও সংখ্যালঘিষ্ঠের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্রীড়নক। কিন্তু সর্ব্বসম্মত চুক্তি সম্ভব হইলেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের দাবী পূরণ করিবেন বলিয়া ন্যায়পরতার যে ধ্বজা উড়াইয়া থাকেন, তাহাও যে কত বড় ধাপ্পা তাহা বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের এক সভায় ভারতের বিশিষ্ট উদারনৈতিক নেতা স্যার হরিসিং গৌর ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। তিনি এই যুক্তি তাঁহাদের মুখের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিয়াছেন, তৃতীয় গোল টেবিলে বৈঠকে তাঁহারা প্রত্যেক প্রতিনিধির স্বাক্ষরিত সর্ব্বসম্মত দাবীও পেশ করিয়া দেখিয়াছেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

ইহার পরে "সর্ব্বসম্মত" চুক্তির দাবী যে ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ না করিবার একটা অজুহাত মাত্র, তাহাতে আর কাহারও সংশয় থাকে না। লর্ড জেটল্যাণ্ড নিজেও সে কথা ভাল করিয়াই জানেন। তাই একই নিশ্বাসে এ কথাও বলিয়াছেন যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আইন সভায় যতদিন রাজনৈতিক ভিত্তিতে দল না থাকিয়া সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দল থাকিবে ততদিন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইতে পারে না।

আমাদের প্রশ্ন, তাহার পরেও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দলগঠন প্রশ্রয় পায় কেন? সর্ব্বসম্মত চুক্তির অছিলায় তাঁহারা ভারতের ভবিষ্যৎ মিঃ জিন্না ও তাঁহার দলের উপর সমর্পণ করিলেন কেন? বিলাতের ইহুদীরা যদি সংখ্যা-লঘুতার ধূয়া তুলিয়া ভারতের মুসলীম লীগের মত অন্যায়, অসঙ্গত ও গণতন্ত্রবিরোধী দাবী উত্থাপন করে, তাহারা কি এমনি প্রশ্রয় পাইবে? ভারতে যে সংখ্যালঘিষ্ঠের সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহার মূল কারণ ইহার উপর আবশ্যকের অতিরিক্ত জোর দিয়া শাসন শক্তি ইহাকে অসঙ্গত প্রশ্রয় দিয়াছেন। ফলে আজ মেজরিটির ভাগ্য মাইনরিটির উপর নির্ভর করিতেছে এবং মাইনরিটির দোহাই দিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মেজরিটির উপর অবিচার করিতেছেন।

বিদ্যাসাগর স্মৃতিবার্ষিকী—

মেদিনীপুরবাসীগণের উদ্যোগে এ বৎসর অত্যন্ত সমারোহের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জন্মোৎসব এবং সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পৌরহিত্য করায় উৎসবের গাম্ভীর্য্য সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। পণ্ডিত হিসাবে,

সংস্কারক হিসাবে, শিক্ষাব্রতী হিসাবে এবং সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার দান অসামান্য। চরিত্রের দৃঢ়তায়, হৃদয়ের কোমলতায় ও চিত্তের অপরূপ ঐশ্বর্য্যে তিনি জাতীয় জীবনের একটা সম্পদ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া এই ব্রাহ্মণপণ্ডিত মতবাদের উদারতায় ও দৃষ্টি-ভঙ্গির ব্যাপকতায় যে যুগের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন আমরা এতকাল পরেও তাহা অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ হই নাই। তাঁহার যুগ এখনও শেষ হয় নাই। তাঁহার সাহিত্য আমাদের জাতীয় জীবনে নূতন স্পন্দন আনিয়াছে। সেই মহাপুরুষের জন্মদিবসে আমরা তাঁহার কল্যাণময় আবির্ভাবকে স্মরণ করিয়া অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

পরলোকে পি-এন-জি—

'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সহযোগী সম্পাদক প্রিয়নাথ গুহ মহাশয়ের মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশ হইতে একজন প্রধান সাংবাদিকের অভাব ঘটিল। সাংবাদিক মহলে তিনি পি-এন-জি নামেই সুপরিচিত ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই সাহিত্য ও সংবাদপত্র সেবার যে ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জরাজীর্ণ অবস্থায় তাহা হইতে অবসরগ্রহণ করেন। নিরহঙ্কার চরিত্র, অমায়িক ব্যবহার, মার্জ্জিত রুচি ও দানশীলতার জন্য তিনি সকলেরই প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গবেষণা—

ন্যাশনাল ইন্সটিট্যুট অফ্‌ সায়েন্সের বার্ষিক অধিবেশনে (মাদ্রাজ) কর্ণেল আর-এন-চোপরা ভারতের জাতীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করিবার একটা পরিকল্পনা দিয়াছেন। অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী হইয়াও ভারতের জাতীয় শিল্পের কোন উন্নতিই হয় নাই। তাহার ছুকুলপ্লাবী নদ-নদী হইতে প্রচুর বৈদ্যুতিক শক্তি সংগৃহীত হইতে পারে। তাহার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, অন্ধকার খনিগর্ভে ও দুর্গম অরণ্যে যে সম্পদ লুকাইত আছে, আমেরিকা ও রুশিয়া ছাড়া তত সম্পদ পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই।

আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টে নামমাত্র একটা করিয়া শিল্পবিভাগ আছে বটে, কিন্তু তাহার সহিত বৈজ্ঞানিকদের কোন যোগাযোগই নাই। অবৈজ্ঞানিক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সেই সকল বিভাগ পরিচালিত হওয়ার ফলে শিল্পের উন্নতি আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট একটা আপত্তি করিতে পারেন যে, বৈজ্ঞানিকদের উপর কোন সরকারী বিভাগের ভার দিলে দস্তুরমাফিক বিভাগ পরিচালনা সম্ভব নয়। কিন্তু অফিস পরিচালনায় সুদক্ষ বৈজ্ঞানিকেরও এ দেশে অভাব নাই।

কর্ণেল চোপরা প্রস্তাব করিয়াছেন, গ্রেট বৃটেনের শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগের অনুরূপ ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টেও একটি পৃথক বিভাগ খুলিতে হইবে এবং অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকদের হাতে তাহার কর্ত্তৃত্বভার ন্যস্ত করিতে হইবে। তাঁহার মতে জাতীয় শিল্প-পরিকল্পনায় বিজ্ঞানের উপযোগিতা সম্বন্ধে যাঁহাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহারা আফিসের কাজ সুশৃঙ্খলে পরিচালনায় দক্ষ হইতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে শিল্পের উন্নতি সাধিত হইবার আশা নাই। আমরা আশা করি, ভারত সরকার তথা বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ কর্ণেল্ চোপরার মত একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির এই সমীচীন প্রস্তাব সম্বন্ধে সুবিবেচনা করিবেন।

সিন্ধুতে সামরিক বিদ্যালয়—

সিন্ধুর প্রসিদ্ধ ধনী রায় বাহাদুর নারায়ণদাস সিন্ধু প্রদেশে একটি সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এক লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ভারতের আরও কয়েকটি প্রদেশে ইতিমধ্যেই সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন যে জাতির জীবনে আজ একান্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা বৃটিশ রাজনীতিকগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সেই প্রয়োজন অসামরিক জাতি বলিয়া নিন্দিত বাঙ্গালীর জীবনে আরও বেশী। বাঙ্গালায় লক্ষ টাকা দান করিবার মত দাতার অভাব নাই। অথচ এদিকে কাহারও বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না, ইহা গভীর ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয়।

বর্ম্মার দাবী—

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ‍্স্‌ রেঙ্গুনের নিখিল-বর্ম্মী মুসলীম সম্মেলনে বলিয়াছেন, আমি যতদূর জানি, বর্ম্মার স্বাধীনতা

খেলার সাথী

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে শিল্প-প্রদর্শনী

কমল না কণ্টক শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্র মজুমদার

শিক্ষিতা (মূর্ত্তি) ভাস্কর—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় এ-আর-সি-এ

পুরীর সমুদ্রতটে শ্রীচৈতন্যের কীর্ত্তন শিল্পী—আচার্য্য শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর

সম্পর্কে কি বৃটিশ জনসাধারণ, কি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কাহারও কোন মতামত নাই। বৃটেনে ভারতের দাবী সম্বন্ধে যথেষ্ট কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু বর্ম্মার দাবী সম্বন্ধে কোন আলোচনাই ওঠে না, যদি বা ওঠে তাহা নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু ইহাতে বর্ম্মাবাসীর দুঃখ করিবার কি আছে? সে আশঙ্কা স্বীকার করিয়াই ত তাঁহারা বর্ম্মাকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার আন্দোলন চালাইয়াছেন!

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক-নিয়োগ—

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগের ধ্বনি মিলাইতে না মিলাইতেই অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শিক্ষা বিভাগে অধ্যাপক নিয়োগের আর একটি কলঙ্ককর কাহিনী প্রকাশ করিয়া দিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক পদে একজন যোগ্যতর বাঙ্গালী প্রার্থীর দাবী উপেক্ষা করিয়া দুইজন ইংরেজ নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই বাঙ্গালী প্রার্থী সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন এবং শূন্যপদের জন্য তিনি বিলাতের হাই কমিশনারের সুপারিশও লাভ করিয়াছিলেন। তিন জনের গুণাবলীর যে ফিরিস্তি পাওয়া যায়, তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকে না যে বাঙ্গালী প্রার্থীই যোগ্যতম ব্যক্তি। অথচ সিলেকশন কমিটি এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন কেন তাঁহাকে তৃতীয় স্থান দিলেন সে রহস্য সত্যই দুর্জ্ঞেয়। মৌলবী ফজলুল হক সাহেবের অনুপস্থিতিতে মিঃ তমিজুদ্দিন খাঁ এই ব্যাপারের সমস্ত দায়িত্ব সোজা সিলেকশন কমিটির উপর ফেলিয়া দিয়াছেন। কেন এইরূপ অন্যায় সংঘটিত হইল সে সম্বন্ধে আমরা শিক্ষামন্ত্রীর নিকট হইতে বিস্তৃত সংবাদ জানিতে চাই।

বঙ্গীয় সমবায় আইন—

বঙ্গীয় সমবায় আইন সংশোধনের জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট যে বিল প্রণয়ন করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিবার আছে। প্রথমত ১৯১২ সালের সমবায় আইনের সুবিধা-অসুবিধা ও ফলাফল সম্বন্ধে বিশেষ তদন্তের পর তবে গবর্ণমেণ্টের সংশোধন কার্য্যে নামা উচিত ছিল। সে সব কিছুই তাহারা করেন নাই। সিলেক্ট কমিটি প্রথম খসড়ার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাও পর্য্যাপ্ত নয়।

দ্বিতীয়ত, বাঙ্গলার সমবায় সমিতিগুলি সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের চাপে এমনই ক্লিষ্ট এবং পঙ্গু যে উহারা স্বাধীন ভাবে বাড়িয়া উঠিবার মোটেই অবকাশ পায় না। যাহাতে তাহাদের সমিতির উন্নতি সাধনের স্বাধীন প্রেরণা জাগে, বিলে তাহার বিধান থাকা আবশ্যক।

তৃতীয়ত, সমিতির হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। এ বিষয়ে ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন:

> 'সমবায় সমিতির বর্ত্তমান বিভাগীয় (departmental) হিসাব-পরীক্ষার ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। কারণ ইহার দ্বারা হিসাব-পরীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, ইহাতে প্রকৃত অবস্থা সঠিক প্রকাশিত হয় না এবং জনসাধারণের মনেও বিশ্বাস জাগে না। ব্যবসায়ী ফার্ম্মের হিসাব পরীক্ষার জন্য যেমন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে, এখানেও তদনুরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তথাপি যদি সরকারী হিসাব পরীক্ষার প্রচলিত ব্যবস্থা বলবৎ রাখা অপরিহার্য্য হয়, তাহা হইলেও বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের অধীনতা হইতে হিসাব-পরীক্ষকগণকে মুক্ত করা প্রয়োজন। বিভাগীয় বাধ্য-বাধকতায় পড়িয়া যাহাতে প্রকৃত অবস্থা উদ্ঘাটন ও প্রকাশ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত না হন, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি সরকারী হিসাব পরীক্ষার রীতি বজায় থাকে, তাহা হইলে সমবায় বিভাগ ও জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহের হিসাব পরীক্ষার জন্য একটা স্বতন্ত্র হিসাব-পরীক্ষক বিভাগ স্থাপন করা প্রয়োজন।"

ইহা ছাড়াও সমবায় সমিতির দায় সীমাবদ্ধ হইবে কি না, কিরূপ ব্যক্তিকে রেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত করিতে হইবে, তাঁহার কার্য্যপ্রণালীই বা কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধেও বিশেষ ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

মহম্মদ আলি স্মৃতি-দিবস—

গত ৪ঠা জানুয়ারী ভারতের বিভিন্ন স্থানে মৌলানা মহম্মদ আলির নবম মৃত্যু-দিবস অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, কলিকাতার জনসভায় যথেষ্ট লোকসমাগম হয় নাই। একদা অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের সময় আলি-ভ্রাতৃদ্বয় ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রতীকরূপে খ্যাত

হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার মতের এবং পথের পরিবর্ত্তন হইলেও তাঁহার সেই জলন্ত স্বদেশ প্রেম মৃত্যুর মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও অবিচল ছিল। বস্তুত পক্ষে রুগ্নদেহ লইয়াও গোলটেবিলে যোগদানের জন্য যেভাবে তিনি বিলাত যাত্রা করেন, তাহা সেই দেশপ্রেমেরই প্রেরণায়। আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য—

গত ২৭শে ডিসেম্বর নাগপুরে নিখিল ভারতীয় খৃষ্টান সম্মেলনের কার্য্যকরী পরিষদের অধিবেশনে সভাপতি অধ্যাপক হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় যে সুচিন্তিত অভিভাষণ দিয়াছেন, তাহা ভারতের দেশীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অভিমত বলিয়া গৃহীত হইবে। কংগ্রেসের দেশপ্রেমের সুযোগ লইয়া মুসলীম লীগ অসঙ্গত দাবী করিয়া যে অন্যায় করিতেছে এবং কংগ্রেস পুনঃ পুনঃ তাহারই নিকট নতি স্বীকার করিয়া যে ভুল করিতেছে, খৃষ্টান-নেতা সেই দুইটি পন্থারই তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

তাঁহার মতে,

> তৃতীয় পক্ষের প্রশ্রয় পাইয়াই মুসলীম লীগ ও কয়েকজন মুসলমান ভাই যে অসঙ্গত দাবী করিতেছেন তাহাই অন্যান্য কারণ অপেক্ষা মিলনের প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে।

এবং

> যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ও যুক্ত রাষ্ট্রের পক্ষপাতী অন্যান্য সম্প্রদায় একত্র হইয়া সকলের ন্যায্য দাবী ও ধর্ম্মমত অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন, কেবলমাত্র তখনই এই সমস্যার সমাধান হইবে। বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের দিন গত হইয়াছে।

তিনি আরও বলিয়াছেন,

> সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার যে পর্য্যন্ত না উচ্ছেদ হইবে সে পর্য্যন্ত যেন তাঁহারা (খৃষ্টান সম্প্রদায়) উহার প্রতিবাদ করিয়া যান। তবেই তাঁহারা আদর্শচ্যুত হইবেন না।

সত্যকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলিতে যাঁহাদের বোঝায়, শিখ, পার্শী, বৌদ্ধ, জৈন ও খৃষ্টান সকলেরই অভিমত এই প্রকার।

সর্দ্দার প্যাটেলের চৈতন্য—

মুসলীম লীগ-তোষণের নীতি যে ব্যর্থ হইয়াছে সে বিষয়ে এতদিন পরে কংগ্রেসেরও বোধ হয় চৈতন্য হইতেছে। পণ্ডিত জওহরলাল জিন্না সাহেবের সহিত আপোষের জন্য যে ব্যাকুলতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা শেষ হইয়াছে। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কণ্ঠেও অনুতাপের সুর। সাম্প্রদায়িক মিলনের আগ্রহে তাঁহারা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মত একজন সর্ব্বজনবরেণ্য নেতার প্রতিও একদা যে অসৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অনুতাপের অবসরে তাহাও তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইয়াছে।

এত করিয়াও কিন্তু লীগের নাগাল তাঁহারা কোন দিনই পান নাই। বরং পুনঃ পুনঃ দাবী পূরণের দ্বারা একদিকে যেমন লীগের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন, অন্য দিকে তেমনি তাহার উদগ্র সাম্প্রদায়িক ক্ষুধাকে শাণিত করিয়া তুলিয়াছেন। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসায় ভুল অনেক করিয়াছে। কিন্তু এখনও তাহা সংশোধনের অতীত হইয়া যায় নাই। কংগ্রেসের এখনও চৈতন্যোদয় হইয়া থাকিলে তাহা আশার কথা সন্দেহ নাই।

স্যার রাধাকৃষ্ণনের অভিভাষণ—

গত ২৭শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌতে নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে সভাপতি স্যার রাধাকৃষ্ণন তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণের এক স্থানে বলিয়াছেন :

> অতীতে জাতীয়তাবাদের যে সার্থকতাই থাকুক না কেন বর্ত্তমানে উহা মুমূর্ষু। শিল্পবিপ্লবের দ্বারা সংঘটিত পরিবর্ত্তনের ফলে আমাদের পক্ষে পৃথিবীকে অখণ্ড ভাবে দেখা ও সকল মানুষের এক যথার্থ সমাজগঠন সম্ভব করা আবশ্যক। নূতন জগতে পুরাতন জীবনযাপনপদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখার ফলেই পৃথিবীর বর্ত্তমান শোচনীয় ঘটনাসমূহ ঘটিতেছে।... আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে রুগ্ন পুঁজিবাদী সমাজের সহিত, বিশৃঙ্খল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহিত এবং আন্তর্জ্জাতিক অসঙ্গতির সহিত।

কথাটা ভাবিয়া দেখিবার। কিন্তু ইউরোপ তথা অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা সত্য হইলেও পরাধীন জাতির জীবনে এখনই এই সত্য উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে কি না, তাহাও সেই সঙ্গে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

কবিগুরুর বাণী—

শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের উৎসবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্নলিখিত বাণী দিয়াছেন :

> দুঃখের প্লাবন বইল আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। ইতিহাসের কত স্থায়ী চিহ্ন দিল ভাসিয়ে, সভ্যতার কত পুরাতন সীমানা দিচ্ছে লোপ করে, প্রচ্ছন্ন বর্ব্বরতার আবরণ বিদীর্ণ হয়ে দেখা দিচ্ছে তার নগ্ন বীভৎস মূর্ত্তি। স্পর্দ্ধিত হয়ে প্রকাশ পেল তার বিলাসমত্ততার নির্লজ্জ ব্যঙ্গ সমস্ত মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে। মানুষের পীড়িত চিত্ত হতে প্রশ্ন উঠছে এমন হয় কেন। ক্রুদ্ধ স্বরে বলছে, বিশ্ববিধানে এই দারুণ অগ্ন্যুৎপাতের মধ্যে কল্যাণ স্বরূপকে স্বীকার করি কেমন করে।

> যদা পশ্যতি অন্যম্ ঈশং অস্য মহিমানম্ ইতি বীতশোকঃ। ঈশের মহিমা, আত্মকর্তৃত্বের সুপ্রকাশ মহিমা যে দেখেছে নিজের মধ্যে তার ভয় কিসের, তার শোক কিসের, সংকটে পড়লে সে কার কাছে কিংবা কার নামে নালিশ করতে যাবে। ঈশের এই মহিমা যারা আত্মার মধ্যে দেখেছে তারাই অকাতরে এবং আনন্দে প্রাণপণ ক'রে আপনার সমস্ত কিছুকে উৎসর্গ করে মানুষের ইতিহাসকে উত্তীর্ণ করে সাধারণ জীবধর্ম্মের কার্পণ্য থেকে অমরাবতীতে।

পৃথিবীর বর্ত্তমান জিঘাংসু রূপে বিশ্বকবির মনে যে বেদনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে, এই বাণীতে তাহাই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

স্বাধীনতার স্বরূপ—

'হরিজন' পত্রে মহাত্মাজী লিখিয়াছেন :

> ভারতবর্ষ যখন তাহার স্বাধীনতার সমস্ত সংঘবদ্ধ বিরূপ শক্তির আক্রমণ প্রতিহত করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তখনই ভারতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

প্রবল রাষ্ট্রের আশ্রয়ে ও অনুগ্রহে স্বাধীনতা ভোগ করার যে আসলে কোন মূল্য নাই, তাহা যে নিতান্তই অন্তঃসারশূন্য, ইউরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সে বিষয়ে কাহারও সংশয় থাকে না। সত্যকার স্বাধীনতা নিজের শক্তিতে অর্জ্জন করিতে হয় এবং নিজের শক্তিতেই রক্ষা করিতে হয়। ভারতের দাবী সম্বন্ধেও উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :

> কংগ্রেস বৃটেনের নিকট স্বাধীনতা প্রার্থনা করে নাই, বৃটেনের যুদ্ধ ঘোষণার উদ্দেশ্য জানিবার দাবী করিয়াছে মাত্র। স্বাধীনতা যখন আসিবে, তখন ভারত উহা পাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে বলিয়াই আসিবে।...স্বাধীনতা কারবারের জিনিস নয়।

এই কথায় মহাত্মা শুধু তাঁহার নিজের অভিমতই বিবৃত করেন নাই। সমগ্র কংগ্রেসের মর্ম্মকথা বিবৃত করিয়াছেন। লর্ড জেটল্যাণ্ড ইহাকে তাঁহার সদম্ভ ঘোষণার উত্তর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন।

গণ-পরিষদ—

ওয়ার্কিং কমিটির বিগত ওয়ার্দ্ধা বৈঠকেও সংগ্রাম-মূলক কোন কর্ম্মপন্থা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কমিটি কর্ম্মীগণকে শান্ত ও সংযতভাবে শক্তি সংগ্রহের উপদেশ দিয়াছেন। সেই সঙ্গে বর্ত্তমান যুদ্ধে বৃটেনের উদ্দেশ্য ঘোষণার দাবী ও গণ-পরিষদের সাহায্যে ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার দাবীর পূর্ব্ববৎ জোর দিয়াছেন।

গণ-পরিষদ সম্বন্ধে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব এখনও অজ্ঞাত। বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বক্তৃতায় যতদূর আভাষ পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় তাঁহারা গণ পরিষদের হাতে ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার সম্পূর্ণ ভার ছাড়িয়া দিতে বিশেষ উৎসাহী নন। এদিকে স্যার মরিস গায়ার, স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ, ভারতীয় উদার নৈতিক দল, এমন কি ভারত-বন্ধু *"ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পর্য্যন্ত সম্প্রতি গণ-পরিষদের* পরিবর্ত্তে ভূতপূর্ব্ব গোলটেবিলের অনুরূপ বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি ছোট কমিটির দ্বারা শাসনতন্ত্র রচনার পক্ষে মতপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁর প্রস্তাবের উত্তরে বলিয়াছেন, ইহাতে ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার শেষ ক্ষমতা বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের হাতে গিয়াই পড়িবে।

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়া ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে দুইবার হইয়াছে। কিন্তু, কি সর্ব্বদল সম্মেলন, কি গোলটেবিল বৈঠক, উভয় ক্ষেত্রেই তাহা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। ছোট কমিটির দ্বারা কাজ ভাল হইতে পারে, কিন্তু কমিটির সদস্য-মনোনয়নের ভার যদি বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের হাতে থাকে তাহা হইলে এবারেও গোলটেবিল বৈঠকেরই পুনরাবৃত্তি হইবে। তাহার চেয়ে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটের সাহায্যে যদি একটা

গণ-পরিষদ গঠিত হয় এবং সেই পরিষদ বিভিন্ন কমিটিতে বিভক্ত হইয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে শুধু যে গণতন্ত্রের মর্যাদাই সম্যক রক্ষিত হইবে তাহা নয়, কাজও ভাল হইবে এবং তাহাতে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের পিছন হইতে দড়ি টানিবার সুযোগও কম থাকিবে।

আসাম মন্ত্রিমণ্ডল—

গণ-পরিষদ একটা বৃহৎ ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি কানাডা কিম্বা অষ্ট্রেলিয়ার মত বিরাট দেশেও তাহা সম্ভব হইয়া থাকে, ভারতেও তাহা অসম্ভব হইবে না। যাঁহারা গণ-পরিষদের বিরোধিতা করিতেছেন, তাঁহাদের যুক্তি আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

আসামে স্যার মহম্মদ সাদুল্লা তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলকে কায়েম করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত নয়জন মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন এবং উপযুক্ত আরও একজনের জন্য অনুসন্ধান চলিতেছে। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রূপনাথ ব্রহ্ম ও শ্রীযুক্ত রবিচন্দ্র কাছাড়ীর নাম শোনা যাইতেছে। প্রকাশ, শীঘ্রই দশজন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীও নিযুক্ত হইবেন। পরিষদের মোট ১০৮জন সদস্যের মধ্যে ২০জন সরকারী দপ্তরখানাতেই থাকিবেন। কিন্তু তাহাতেও শেষ রক্ষা হইবার আশা দেখা যাইতেছে না। ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে পরিষদ বসিলে প্রথম দিনের বৈঠকেই অনাস্থা প্রস্তাব উঠিবে এবং পাস হইবারও আশা আছে।

সাক্কার দাঙ্গা—

সিন্ধু প্রদেশের সাক্কারে মুষ্টিমেয় অসহায় হিন্দু অধিবাসীদের উপর মুসলমানগণ যে অত্যাচার করিয়াছে তাহা শুনিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। দূরবর্ত্তী গ্রামাঞ্চলেও হিন্দুগৃহ লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত এবং হিন্দু অধিবাসী নিহত হইয়াছে। বেলুচী পাঠান, এমন কি, মুসলমান পুলিশ এবং সরকারী কর্ম্মচারীদেরও কেহ কেহ ইহাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগ দিয়াছিল। মঞ্জিল গাহ্ সমস্যা লইয়া এই অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা একদিনের কার্য্য নয়। যতদূর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, অনেক দিন ধরিয়াই মুসলীম লীগের লোকেরা এই সম্পর্কে গ্রামে গ্রামে বিদ্বেষমূলক প্রচারকার্য্য চালাইয়াছে। সিন্ধু গবর্ণমেণ্ট ইহার যথাযোগ্য প্রতীকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অবস্থা এখন আয়ত্তাধীনে আসিলেও হতভাগ্য হিন্দু অধিবাসীদের ধনে-প্রাণে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ হইবার নয়।

সম্প্রতি খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্স হিন্দুদের দূরবর্ত্তী গ্রাম ত্যাগ করিয়া শহর অঞ্চলে আসিবার উপদেশ দিয়াছেন। গ্রামের হিন্দুদের ধনপ্রাণ রক্ষা করিতে তিনি অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। দুঃখের সহিত আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি, এই উক্তি সুদৃঢ় ও শক্তিমান গবর্ণমেণ্টের উপযুক্ত হয় নাই। ইহাতে দায়িত্বজ্ঞানেরও পরিচয় সূচিত হয় নাই। কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রজারক্ষার দায়িত্ব অস্বীকার করা নিতান্ত লজ্জাজনক। আমরা আশা করি, আল্লাবক্স গবর্ণমেণ্ট এই দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিতে সক্ষম হইবেন।

বাঙ্গলা পরিষদে সমর প্রস্তাব—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মৌলবী ফজলুল হকের উত্থাপিত যে সমর প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা কংগ্রেসের সমর প্রস্তাব নয়, মুসলীম লীগের সমর প্রস্তাবও নয়—তাহা বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার মন্ত্রীমণ্ডলেরই সমর প্রস্তাব। বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে জিন্না সাহেবের যে অভিমত, স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ অথবা মৌলবী ফজলুল হক তাহার সহিত একমত নহেন। মুসলীম লীগ বিনাসর্ত্তে বর্ত্তমান যুদ্ধে বৃটেনকে সাহায্য করিবার নীতি এখনও পর্য্যন্ত গ্রহণ করে নাই। মৌলবী ফজলুল হক লীগের মুখরক্ষার জন্য এই পর্য্যন্ত ভরসা দিয়াছেন যে, তাঁহার প্রস্তাবটি ত পাস হইয়া যাক, তারপরে লীগ যদি ভিন্ন মত ব্যক্ত করে, তখন তিনি পদত্যাগ করিবেন। অর্থাৎ নিম্ন আদালতের রায়ে ফাঁসী হইয়া যাক, ইতিমধ্যে আপীলে যদি রায় পরিবর্ত্তন হয় তখন নিম্ন আদালতের জজ সাহেবের পদত্যাগ করিলেই চলিবে।

মন্ত্রিমণ্ডলেরও ইহা সর্ব্বসম্মতি প্রস্তাব নয়। অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এই প্রস্তাবের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তিনি এই প্রস্তাবে ভোট দেন নাই এবং ইহার বিরোধিতা করিয়া বক্তৃতাও দেন। মন্ত্রিমণ্ডলের সহ-সভাপতির এই বিরোধিতা সমর-প্রস্তাবের গুরুত্ব অনেকখানি হ্রাস করিয়াছে।

অর্থ সচিবের পদত্যাগ—

সমর প্রস্তাব সংক্রান্ত মতভেদের ফলে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মন্ত্রি-মণ্ডলের সহকর্ম্মীগণ তাঁহাকে রাখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেও কোয়ালিশন দলের সদস্যগণ তাঁহার পদত্যাগ দাবী করিয়াছিলেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম, তাঁহার পদত্যাগে দেশব্যাপী একটা চাঞ্চল্য ও উৎসাহের সৃষ্টি হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। এমন কি, মৌলবী নৌসের আলির পদত্যাগের সময়েও জনসাধারণের মধ্যে যে উৎসাহ দেখা গিয়াছিল, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহা দেখা যায় নাই। তাহার একটা কারণ সম্ভবত এই যে, মৌলবী নৌসের আলি অথবা মৌলবী সামসুদ্দিনের পদত্যাগের সময় বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের উচ্ছেদের যে আশা জনসাধারণের মনে জাগিয়াছিল, তাহা আর নাই। মন্ত্রিমণ্ডল হইতে কাহাকেও পদত্যাগ করিতে দেখিলে এখন আর কাহারও মনে উদ্দীপনা জাগে না।

পদত্যাগের কারণ বিবৃত করিয়া নলিনীবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, গত এক বৎসর হইতে তাঁহার সহিত মন্ত্রিমণ্ডলের বনিবনাও হইতেছিল না। দ্বিতীয়ত, যে আশা বুকে করিয়া তিনি মন্ত্রিমণ্ডলে যোগ দিয়াছিলেন, পুনঃ পুনঃ আঘাতে তাহার সমাধি হইয়াছে। তৃতীয়ত, ভারতের শাসনতন্ত্র সংখ্যালঘিষ্ঠদের সম্মতির উপর নির্ভর করিবে, সমর প্রস্তাবের মাত্র এই অংশ তিনি সমর্থন করিতে পারেন নাই। মন্ত্রিমণ্ডলের অন্যান্য সদস্যদের সহিত কেন তাঁহার বনিবনাও হইতেছিল না তাহা আমরা জানি না। কিন্তু বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলে যোগ দিবার সময় যদি তিনি কোন মহৎ আশা বুকের মধ্যে পোষণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমরা বলিব, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে লোকের যে ধারণা আছে, তাহা ভ্রান্ত। সম্পূর্ণভাবে এক-মতাবলম্বী কংগ্রেস সদস্যদের লইয়া গঠিত কংগ্রেস মন্ত্রীগণও বিশেষ আশা পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার মত বিচক্ষণ লোকের গোড়াতেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করা উচিত ছিল। সর্ব্বশেষে যে ব্যাপার তাঁহার পদত্যাগের আপাত কারণ, সেই ব্যাপারেও তিনি যেমন প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিমণ্ডলের সহিত একমত হইতে পারেন নাই, তেমনি কংগ্রেসের অভিমতের সহিতও সম্পূর্ণ একমত হইতে পারেন নাই। জনসাধারণের মনে যে উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, সম্ভবত ইহাও তাহার অন্যতম কারণ।

পরলোকে অতুলচন্দ্র ঘোষ—

গত ২১শে পৌষ শনিবার খ্যাতনামা জীবন-চরিত লেখক শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়ের পিতা অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ৮১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। ১২৬৬ সালের ২৮শে কার্ত্তিক কোন্নগরে সাধু শিবচন্দ্র দেবের গৃহে তাঁহার জন্ম হয়। শিবচন্দ্র তাঁহার মাতামহ ছিলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্রদ্বয়ের প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন অতুলচন্দ্রের পিতা। অল্পবয়সে পিতৃহীন হইয়া তিনি প্রথমে মাতুলালয়ে থাকিয়া ও পরে মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীনাথ ঘোষের নিকট থাকিয়া শিক্ষালাভ করেন। বি-এ ও বি-এল পাশ করিয়া তিনি কিছুদিন আলিপুরে ওকালতি করেন ও পরে সরকারী কার্য্য লাভ

অতুলচন্দ্র ঘোষ

করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সাবজজ অবস্থায় তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানা ভাষায় অতুলবাবু সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় পদ্য রচনা করিতে পারিতেন। মাইকেল মধুসূদনের দুষ্প্রাপ্য ইংরেজী গ্রন্থ Captive Ladyর তিনি বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়া 'অবরুদ্ধা' নামে প্রকাশ করেন। জয়দেব-কৃত সংস্কৃত প্রসন্নরাঘব নাটকও তিনি বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল। আমরা মন্মথবাবুকে তাঁহার এই দারুণ শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

জিন্না-নেহেরু পত্রাবলী—

নিজেকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য জিন্না সাহেব তাঁহার ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মধ্যে যে সকল পত্র-

বিনিময় হইয়াছিল তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি, যে সময় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পণ্ডিতজী মিলনের জন্য আগ্রহান্বিত, এমন কি বোম্বাই যাইতে উদ্যত, ঠিক সেই সময়েই "মুক্তি দিবস" ঘোষণার এক আঘাতে সেই অসীম আগ্রহের সমাধি রচনা করিয়াছে। "মুক্তি দিবস" ব্যর্থ হইয়াছে, মিলনের আয়োজনও ব্যর্থ হইল। পত্রাবলী প্রকাশ করিয়া জিন্না সাহেব নিজের মামলাই খারাপ করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক মিলনের ব্যর্থতার সকল দায়িত্ব তাঁহারই উপর পড়িয়াছে।

খাদ্য ও পুষ্টি প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথ

খাদ্য ও পুষ্টি প্রদর্শনী—

গত ২৯শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার অপরাহ্নে কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্সিয়াল মিউজিয়ামের উদ্যোগে তথায় একটি 'খাদ্য ও পুষ্টি প্রদর্শনী' হইয়া গিয়াছে। কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঐ প্রদর্শনীর উদ্বোধন-উৎসবে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রদর্শনী এ দেশে এই প্রথম। কাজেই জাতির পক্ষ হইতে আমরা এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পুরাতন কথা হইলেও চিরনূতন। তিনি বলিয়াছেন—"যখন ভারতীয় সকল জাতির খাদ্যবিশ্লেষণ তালিকায় দেখা যায় বাঙ্গালীর খাদ্য পুষ্টিকরতার গুণে প্রায় সকলের নীচের কোঠায়, তখন সে জন্যে লজ্জিত না হয়ে থাকতে পারি নে। * * যে আহারের প্রথা জীবনীশক্তির অনুকূল নয়, যা সমস্ত জাতিকে অক্ষমতার পথে শনৈঃ শনৈঃ নিয়ে চলেছে, জেনে শুনেও সেই আত্মঘাতী অভ্যাসকে পরিত্যাগ করতে না পারার মতো মূঢ়তা কি কম ভর্ৎসনার যোগ্য? জেনে শুনে নয় ত কী? আজ বাঙ্গালা দেশে কে না জানে যে চোখ ভোলানো সাদা রঙের ছেলেমানুষী মোহে আমরা যে কলের চালের ভাতে আকৃষ্ট হই, তার পরিত্যক্ত অংশই খাদ্য হিসাবে মূল্যবান। আমরা তার যে অংশকে দাম দিয়ে কিনি, সে অংশে বাস করে মৃত্যু। চালের সেই ছাল বিদেশে রপ্তানী হয়ে থাকে। আহার্য সম্বন্ধে যাদের বুদ্ধি সজাগ এবং নির্বাচনশক্তি সতর্ক, তারা আমাদের ভোজ্যের সেই অনাদৃত আবর্জনাকেই সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করে। আজ কে না জানে ভাতের ফেনের সঙ্গে বাঙ্গালীর প্রাণশক্তির ধারা প্রতিদিন গড়িয়ে যাচ্ছে রান্নাঘরের নর্দমায়। আজ কে না জানে আমাদের খাদ্যে যে কলের সর্ষের তেল ও অপাচ্য মসলা ব্যবহার করে থাকি, তা অজীর্ণ রোগের মারাত্মক বাহন। কিন্তু স্বজাতির আয়ুক্ষয় নিবারণ লক্ষ্য করে নিজের অভ্যাসের সঙ্গে রুচির সঙ্গে লড়াই করবার মতো বুদ্ধির দৃঢ়তা নাই যাদের, তারা বিদেশী শত্রুভাগ্য নিয়ে বিলাপ করতে যেন লজ্জা বোধ করে।"

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

বিনা মেঘে বজ্রপাত হইয়াছে। গত ২৪শে পৌষ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে এগারটার সময় আমাদের সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে সকলের মায়া কাটাইয়া সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের ও মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের কি ছিলেন তাহা বর্ণনা করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই এবং তাঁহার এই অকাল বিয়োগে ভারতবর্ষ ও মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহা ধারণা করিবার সময় এখনও আসে নাই। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশক স্বর্গত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তিনি ছিলেন দ্বিতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র।

যৌবনে
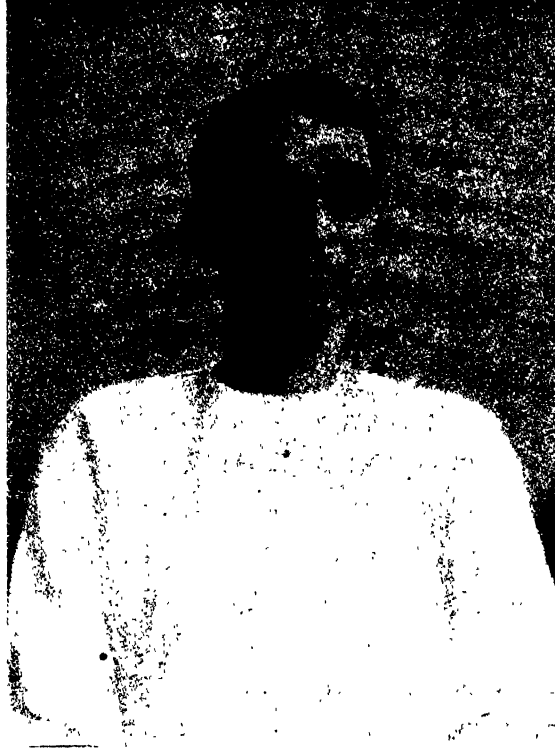
বাল্যে বিদ্যাশিক্ষার পর অল্প বয়সেই তিনি পিতৃ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং প্রথমে পিতার ও পরে অগ্রজ শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ব্যবসা-কার্য্য দেখিতে থাকেন। যাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টা ও অবিশ্রাম পরিশ্রমের ফলে 'ভারতবর্ষ' তাহার বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাঁহাদের উদ্যম ও অধ্যবসায়ে মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান প্রকাশক বলিয়া গণ্য হইয়াছে, সুধাংশু বাবু তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। ভারতবর্ষের প্রকাশকাল হইতেই তিনি ভারতবর্ষ-পরিচালনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া ছিলেন। তিনি শুধু ভারতবর্ষের অর্থ-ব্যবস্থার দিকই দেখিতেন না, তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য কখনও তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তিনি নিজে সুলেখক ছিলেন এবং তাঁহার লেখা বহু প্রবন্ধাদি বহুদিন হইতেই ভারতবর্ষে স্থান লাভ করিয়া আসিতেছে।

তাঁহাকে ব্যবসা পরিচালনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইত বলিয়া তিনি এই কার্য্যে অধিক সময় দিতে পারিতেন না।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বিশেষ ক্রীড়ানুরাগ ছিল,

বাল্যে

কৈশোরে

তিনি নিজে শুধু ভাল খেলোয়াড় ছিলেন না—খেলোয়াড়-দিগকে নানা প্রকারে উৎসাহিত করিতেন। তাঁহারই একান্ত চেষ্টার ফলে গত কয়েক বৎসর নিয়মিত ভাবে ভারতবর্ষে 'খেলাধূলা' প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে এবং তিনি নিজেই ঐ সমস্ত বিষয় পরিপাটিভাবে লিখিয়া ও সাজাইয়া দিতেন। আজ দেশে খেলাধূলা যে এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জন্য একদিকে ভারতবর্ষে প্রকাশিত 'খেলাধূলা'র সংবাদ ও অন্যদিকে সুধাংশুবাবুর ক্রীড়ানুরাগ অনেকাংশে সাহায্য করিয়াছে। ভারতবর্ষের 'খেলাধূলা'র সংবাদপাঠক সাধারণের নিকট কিরূপ জনপ্রিয় হইয়াছে, তাহা আজ আর কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।

পুস্তক-প্রকাশ কার্য্যেও তাঁহার অসাধারণ বিচক্ষণতা ও দক্ষতা ছিল। তিনি বহু নূতন সাহিত্যিকের সন্ধান করিয়া তাঁহাদের পুস্তক প্রকাশ দ্বারা তাঁহাদিগকে উৎসাহিত না করিলে তাঁহাদের প্রতিভা স্ফুরণে হয় ত বিলম্ব হইত। তিনি লেখকগণের লেখা পড়িয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উৎসাহ দান করিতেন এবং তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দান করিয়া তাঁহাদিগকে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতেন। তাঁহার সরল, অমায়িক ও সহৃদয় ব্যবহারের কথা বাঙ্গলার লেখকগণ কখনও বিস্মৃত হইবেন না। যিনিই তাঁহার সহিত গভীরভাবে মিশিয়াছেন, তিনি তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই।

হয় ত তাঁহার কর্ম্মজীবনের অবসান হইয়াছিল, কাজেই তাঁহাকে অকালে আমাদের মায়া ত্যাগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু যাঁহাদিগকে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহা-দিগকে তাঁহাদের এই গভীর শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। তাঁহার বৃদ্ধা জননী এখনও বর্ত্তমান—এই অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধার শোক, এক ভগবান ভিন্ন, আর কে নিবারণ করিবে? তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর হরিদাসবাবু পিতার ন্যায় স্নেহে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বড় করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিই বা কি বলিবার আছে? সুধাংশুবাবুর বিধবা পত্নী শ্রীমতী প্রভা দেবীর এই নিদারুণ শোকে সমবেদনা জ্ঞাপনেরও ভাষা নাই। তিনি তিন পুত্র—শ্রীমান শৈলেনকুমার, শ্রীমান রমেনকুমার ও শ্রীমান দীপেনকুমার, তিন কন্যা—শ্রীমতী জ্যোৎস্না, কুমারী রেখা ও কুমারী সীমা এবং একমাত্র দৌহিত্রী কুমারী মঞ্জুলাকে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই প্রায় অপ্রাপ্তবয়স্ক। তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত সরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের এসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার।

সুধাংশুবাবুর পরলোকগমনে আমাদের যে ক্ষতি হইল, তাহা আর কখনও পূরণ হইবে না।

অবসান

ফটো—অজয় সেন (কলিকাতা

চাঁদনী রাতে ফটো—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্বারভাঙ্গা)
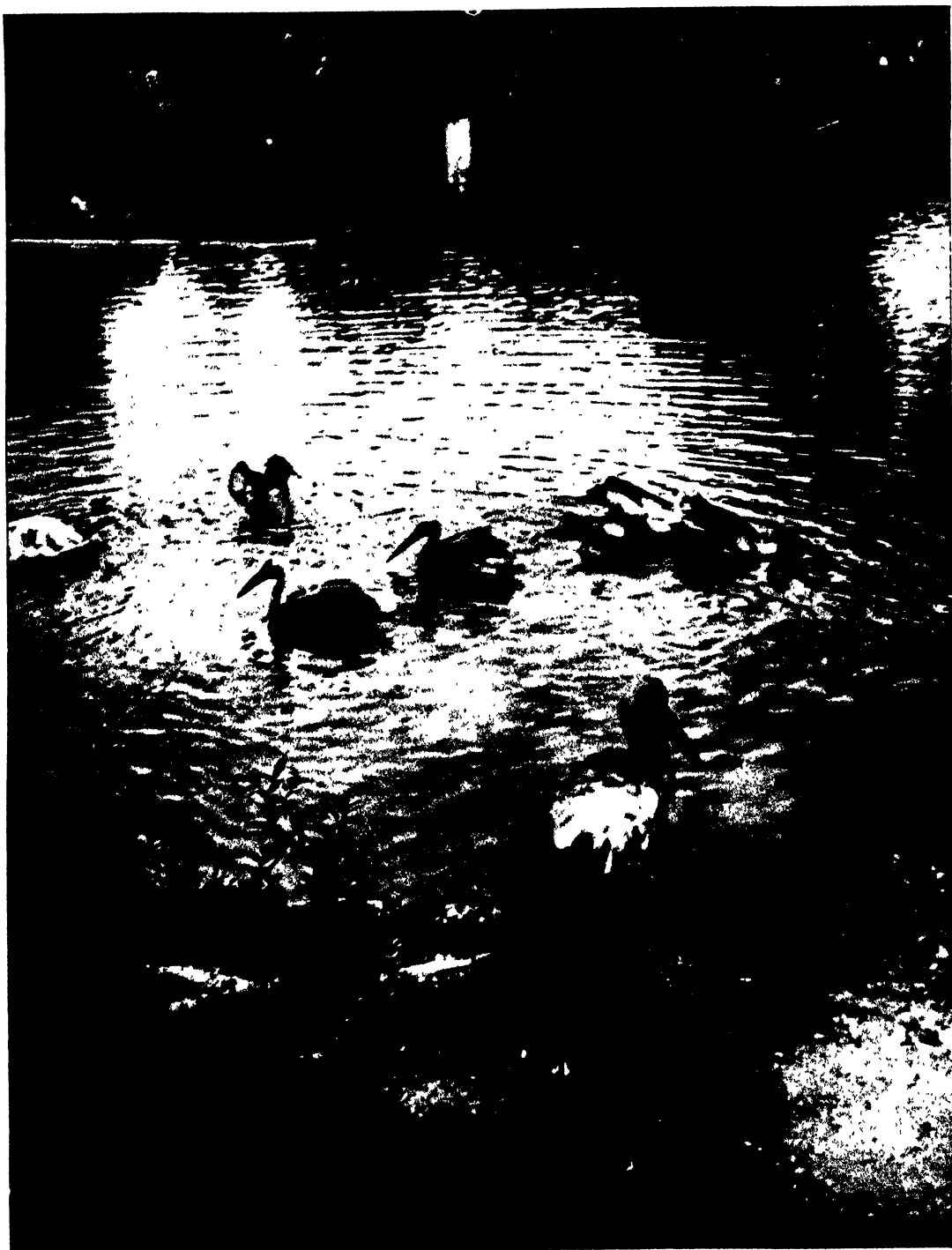
অকার

শ্রীভোলানাথ ঘোষ

ফুসফুসের বায়ু কণ্ঠস্থ বাগ্‌যন্ত্রে (larynx) আহত হইয়া বাহিরে আসিলেই আমরা ধ্বনি শুনিতে পাই—কণ্ঠধ্বনি। ইহা স্বর, ইহা স্বতঃ-উচ্চারিত অবাধ ধ্বনি। মুখ অনায়াসে একটুমাত্র খুলিয়া ফুসফুসের বায়ুকে বিন্দুমাত্র বাধা না দিয়া বাগ্‌যন্ত্রের ভিতর দিয়া সহজে অনায়াসে বাহিরে আসিতে দিলে যে ধ্বনি হয় তাহা এই ধ্বনি, তাহাই অ (সংস্কৃত অ বা cut-এর u, বাংলা অ নহে; বাংলা অ উচ্চারণ করিতে গেলে ওষ্ঠকে কিছু সংবৃত করিতে হয়)। এই ধ্বনি কণ্ঠে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহা কণ্ঠ্য স্বর, ইহাই আদি স্বর।

এই স্বর বা ধ্বনি কণ্ঠ হইতে ওষ্ঠ পর্যন্ত স্থানের কোথাও বাধা বা আঘাত পাইয়া উচ্চারিত হইলে ব্যঞ্জন ধ্বনি হয়, নতুবা তাহা স্বর। এই বাধা বা আঘাত স্থল পাঁচটি—কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ। এই অবস্থান ক্রমিক, এই ক্রমেই বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জন-মাতৃকা বিন্যস্ত। এই বিন্যাস বিজ্ঞানানুকূল; রোমক গ্রীক আরবী ফারসী প্রভৃতি মাতৃকার কোনওটির বিন্যাস এমন নয়। যে ধ্বনিগুলি প্রথম বাধাস্থল কণ্ঠে আহত হইয়া সৃষ্ট হয় তাহা কণ্ঠ্য বর্ণ (ক-বর্গ) * বলিয়া খ্যাত, যেগুলি পরবর্তী বাধাস্থল তালুতে আহত হইয়া সৃষ্ট হয় তাহা তালব্য (চ-বর্গ) নামে খ্যাত; ইত্যাদি। ওদিকে স্বরধ্বনির বেলাও তাহাই। উপরে বলিয়াছি, অ কণ্ঠে উচ্চারিত হয় বলিয়া তাহা কণ্ঠ্য বর্ণ (আ বর্ণও কণ্ঠ্য, কারণ আ অ-এরই দ্বিমাত্র উচ্চারণ) এবং তাহা আদ্য স্বর। এই আদ্য স্বরকে কণ্ঠের পরবর্তী বাধাস্থল তালুতে বাধার উপক্রম (বাধা নহে) সৃষ্টি করিয়া উচ্চারণ করিলে রূপান্তরিত করা যায়; এই রূপান্তরিত স্বর—ই। মূর্ধায় বাধার উপক্রম সৃষ্টি করিলে যে রূপান্তর হয় তাহা ঋ; ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্যঞ্জনের ন্যায় স্বরও কণ্ঠ্য তালব্য প্রভৃতি পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

স্বরধ্বনি উক্ত বাধাস্থলের কোথাও বাধা পাইলেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে। যখন আমরা 'অক' বা 'দিক্' বলি তখন উভয়ত্র ক্-এর পূর্ববর্তী অ বা ই-স্বরকে কণ্ঠে আবদ্ধ করিয়া দিই—ক্! তাহার পর আর কোনও ধ্বনি শোনা যায় না। স্বরধ্বনি কণ্ঠে বাধা পাইলে ক্ রূপে বদ্ধ হইয়া যায়, তালুতে বাধা পাইলে চ্ রূপে বদ্ধ হইয়া যায়—ইত্যাদি। কণ্ঠে বাধা দিয়া অ উচ্চারণ (ক্+অ) করিলে 'ক' পাই, ই উচ্চারণ (ক্+ই) করিলে 'কি' পাই—ইত্যাদি; তালুতে বাধা দিয়া অ উচ্চারণ (চ্+অ) করিলে 'চ' পাই, ই উচ্চারণ (চ্+ই) করিলে 'চি' পাই—ইত্যাদি। বদ্ধ ক্+মুক্ত ধ্বনি অ=ক; অর্থাৎ ক্+অ=ক।

অ আ ক খ প্রভৃতি বর্ণগুলি উক্ত স্বর বা ব্যঞ্জন-ধ্বনিদ্যোতক সংকেতচিত্র মাত্র। আমরা যখন কথা বলি, বরং শব্দ উচ্চারণ করি, তখন কতকগুলি স্বর বা ব্যঞ্জন ধ্বনি পর পর উচ্চারণ করি। যখন আমরা 'পিন' বলি, তখন ধ্বনির ক্রম এইরূপ হয়—প্‌ইন্। ধ্বনির এই ক্রম অনুযায়ী ধ্বনির সংকেতচিত্রগুলিকেও বিন্যস্ত করিয়া লিখিলে অর্থাৎ 'প্‌ইন্' বা এই আদর্শেরই আর কোনও রূপে লিখিলে তাহা বিজ্ঞানসম্মত হইত। ইংরেজী প্রভৃতি শব্দে তাহার ধ্বনির সংকেতবিন্যাসে ক্রম ঠিক থাকে, যেমন—pin। কিন্তু বাংলায় প্‌ইন্ লেখার নিয়ম নাই, ব্যঞ্জনবর্ণ যে স্বরবর্ণকে আশ্রয় করে বাংলায় তাহার কার নামক এক সাংকেতিক রূপ হয়, যেমন—ইকার (ি), উকার (ু) ইত্যাদি; এবং আশ্রিত ব্যঞ্জনে এই কার সংলগ্ন হইয়া থাকে। * সংস্কৃতে ক্=ইংরেজী k এবং ক=ka। শেষস্থলে ক অকারাশ্রিত। ইংরেজীতে k সর্বদাই ক্, কদাপি ক নহে; সংস্কৃতে ক্ সর্বদাই k, কদাপি ka নহে—ক দেখিলেই সংস্কৃতে তাহাকে অকারযুক্ত মক্ষ্ন

---

* সংস্কৃতের তুল্য বাংলা মাতৃকায় ক-বর্গীয় বর্ণ কণ্ঠ্য বলিয়া খ্যাত বটে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহারা আলজিহ্বের সম্মুখবর্তী স্থানে আহত হইয়া উচ্চারিত হয়।

* আকার ইকার ইত্যাদির মানে আ ই ইত্যাদি বর্ণও বটে, ই ইত্যাদি চিহ্নও বটে। অকার মানেও তাহাই—বর্ণও এবং চিহ্নও। এই প্রবন্ধে অকার ইকার ইত্যাদি শব্দ সাধারণতঃ চিহ্নের সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

করা নিয়ম। অর্থাৎ দেখিলাম, দুই ভাষাতেই ইকার উকার প্রভৃতির সঙ্গে তাহাদের অকারও আছে।

কিন্তু বাংলা ভাষায় ভিন্ন ব্যবস্থা। 'বন' লিখি অথচ 'বন্' পড়ি, অর্থাৎ প্রথমটিকে অকারযুক্ত মনে করি, কিন্তু দ্বিতীয়টিকে করি না। আবার অন্যত্র 'ঘন' লিখি, কিন্তু 'ঘন' পড়ি না, দুই বর্ণকেই অকারযুক্ত মনে করি। 'টলমল' শব্দে প্রথম বর্ণটি অকারযুক্ত অথচ দ্বিতীয়টি নয় এবং তৃতীয়টি অকারযুক্ত অথচ চতুর্থটি নয়। 'ধন, জন, ধরণ, করণ' দেখুন; সংস্কৃতে শব্দগুলির সকল বর্ণই অকারযুক্ত, কিন্তু বাংলায় তাহা নহে। বাংলায় বর্ণগুলির সকলেরই এক রূপ, অথচ উচ্চারণে কেউ অকারযুক্ত,কেউ অকারমুক্ত। অর্থাৎ অকারের অস্তিত্ব আমাদের কণ্ঠে আছে, কিন্তু কোনও লৈখিক আকারে বা রূপে নাই। আমরা অকার লিখি না, কিন্তু পড়িবার সময় তাহাদের স্বীকার করি; অর্থাৎ হাতকে বাদ দিয়া হাতাহাতি করি।

মোট কথা, বাংলায় অকার নাই। অ স্বরবর্ণের আদ্য ও প্রধান ধ্বনি। বাংলায় আর সকল স্বরবর্ণেরই সাংকেতিক চিহ্ন (া ি ী ইত্যাদি) আছে, কিন্তু এই প্রথম ও প্রধান স্বরেরই কিছু নাই। বর্ণের ব্যঞ্জনান্ত রূপ দেখাইতে সংস্কৃতের তুল্য বাংলায় হস্‌চিহ্নের নিয়মিত ব্যবহার থাকিলেও অকার আছে বলা চলিত। কিন্তু বাংলায় হস্‌চিহ্নের ব্যবহার লোপ পাইতে বসিয়াছে, তাহা আর পুনরাবৃত্ত হইবে না। সংস্কৃতে হস্‌চিহ্ন প্রয়োগের যেমন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল, তেমনি তাহাতে হসন্ত বর্ণকে পরবর্তী বর্ণের সহিত যুক্ত করিয়া লিখিবার বিধি ছিল (যাহার ফলে যুক্তাক্ষরের উদ্‌ভব); তা ছাড়া সংস্কৃতে প্রায় সকল শব্দই অকারান্ত। কাজেই সেখানে হস্‌চিহ্নের ব্যবহার ছিল দৈবাৎ। কিন্তু হসন্তোচ্চারণপ্রধান বাংলা ভাষায় অকার দেখাইতে হস্‌চিহ্নের প্রবর্তন অসংগত এবং বিড়ম্বনার বিষয়। সংস্কৃত ব্যতীত পৃথিবীর আর কোনও প্রতিষ্ঠিত ভাষায় হস্‌চিহ্নের তুল্য ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণজ্ঞাপক কোনও চিহ্নাদি নাই, ব্যঞ্জনবর্ণ মাত্রই সেখানে হসন্ত। বাংলা বানান অজ্ঞাতে এই রীতির দিকে স্বচ্ছন্দে ঝুঁকিয়াছে এবং ইহা শুভ লক্ষণ। কারণ, ব্যঞ্জনবর্ণ মাত্রই হসন্ত হইবে এবং তাহাতে স্বর যোগ করিলে তবে তাহা স্বরান্ত হইবে, ইহা বিজ্ঞানসম্মত রীতি, প্রকৃষ্ট রীতি। কিন্তু গোড়াতেই যদি গলদ থাকে, যদি আদি ও প্রধান স্বরটিরই কোনও সংকেত-আকার না থাকে, অর্থাৎ তাহার ব্যঞ্জনে যোগ করিবার কোনও উপায় ভাষায় না থাকে, তাহা হইলে বিভ্রাট ও সংকট নিশ্চিত। বস্তুতঃ এই সংকট ও বিভ্রাট বাংলা ভাষায় বর্তমান রহিয়াছে।

অনেক বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষায় নবাগত হইতেছে। তাহাদের অন্তর্গত অকারযুক্ত বর্ণের বানান দেখাইতে মুশকিলে পড়িতে হয়। By law লিখিতে 'বাই-ল' না লিখিয়া 'বাইল' লিখিলে লোকে 'বাইল্' পড়িবে। সেদিন পরশুরামের একটি গল্পে 'ফিলসফি' দেখিয়া একজন শিক্ষিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ফিল্‌সফি'টা কোন্ জিনিস?' বোধ হয় বলা বাহুল্য নয়, 'ফিল্‌সফি'টা philosophy। বিদেশে বাংলা সাহিত্যের আদর বাড়িতেছে; পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বাংলা পড়ানো হয়। বানানে অকারেরই অভাব দেখিয়া বিদেশী ভাষাবিদ্, পণ্ডিত প্রভৃতির বিস্ময় ও উচ্চারণসংকট কল্পনা করুন। 'টলমল' দেখিলে তাঁহারা talamala, talmala, talmal, talamla, talmla, talml প্রভৃতি বহুরূপ উচ্চারণের ফাঁপরে পড়িবেন। কোনও বাংলা অভিধান তাঁহাদিগকে উচ্চারণ শিখাইবে না, কোনও শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট উচ্চারণ শিখিবার সৌভাগ্য, ধরিয়া লই, যদি বা দৈবাৎ সম্ভব হয়, তো সেখানেও সংশয়মুক্তি নাই। কারণ, অকারের অভাবে উচ্চারণের একাধিকরূপতা অস্থৈর্য ইত্যাদি বাংলা ভাষার স্বতঃই বর্তমান।

সেইজন্যই বলিতেছিলাম, বাংলা বানানে অকার নাই, বাংলা বানানের গোড়াতেই গলদ। অকারের অভাব যে বানানের কত বড় দোষ, অকার প্রয়োগের নিরাকার আন্দাজী ব্যবস্থায় আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি বলিয়া তাহা সহজে আমাদের বোধেই আসে না। দেশের লোকে ও লেখকদের অনবধান অবহেলা ও অজ্ঞতার জন্য বাংলা বানান সমস্যাসংকুল। সেই সব সমস্যার সমাধান জন্য দেশের পণ্ডিতগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাথা ঘামাইতেছেন। তাঁহাদের তথা দেশের চিন্তাশীল সুবোধগণের দৃষ্টি বানানের এই ত্রুটিটারও দিকে সাগ্রহে আকর্ষণ করিতেছি।

রঞ্জি ক্রিকেট ঃ

নওনগর ঃ—২৩৩ ও ১৮৯

বরোদা ঃ—৩৯৯ ও ২৫ (কোন উইকেট না হারিয়ে)

বরোদা ১০ উইকেটে বিজয়ী হ'য়েচে।

নওনগর যে প্রথমশ্রেণীর টীমগুলির মধ্যে বেশ শক্তিশালী সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নেই তবে সি এস নাইডুর মারাত্মক বোলিংএর জন্যই নওনগরকে এইরূপ শোচনীয় ভাবে পরাজিত হ'তে হ'য়েচে। নওনগরের ফিল্ডিং অতি নিকৃষ্টশ্রেণীর হওয়ার জন্য বরোদা এত বেশী রান ক'রতে সক্ষম হয়। নওনগরের প্রথম ইনিংসে অমরসিং ১১৩ রান ক'রে নটআউট থাকেন। তাঁর খেলা খুব দর্শনীয় হ'য়েছিলো। নাইডু ৮৩ রানে ৫টা উইকেট পান। বরোদার প্রথম ইনিংসে ৩০৯ রান ওঠে। অধিকারীর ১৬০ ও বি নিম্বলকারের ৮৫ রান উল্লেখযোগ্য। ব্যানার্জ্জি ৫টা উইকেট পান ১২২ রানে। নওনগরের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১৮৯ রানে শেষ হয়। নাইডু ৮টা উইকেট পেয়েচেন। বরোদা কোন উইকেট না হারিয়েই প্রয়োজনীয় রান তুলতে সক্ষম হয়।

সি এস নাইডু

'হেড অব্ দি লেক ট্রপি' ঃ

ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব এইবার নিয়ে পর পর তিন বছর 'হেড অব্ দি লেক' ট্রপি বিজয়ী হ'য়েচে। ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের এই বিজয় খুব কৃতিত্বের ও গৌরবের সন্দেহ নেই। তারা চারটি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার ক'রেচে। লেকক্ল্যাবের রবিদত্ত এন পি সেনের সহযোগিতায় সিনিয়ার পেয়ার্স বিজয়ী হন। 'সিনিয়ার স্কাল্‌সে ক্যালকাটা রোয়িংক্লাবের উইলস্ ইউনিভারসিটির পারাথকে নিশ্চিত জয়লাভ থেকে বঞ্চিত ক'রেচেন। পারাথ গোড়া থেকে এগিয়ে থেকেও ফিনিসিংএর সময় উইলসের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। ইউনিভারসিটি রোয়িংক্লাব 'সিনিয়ারফোরস্' ছাড়া সবকটি বিষয়েই দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রেচে।

অমরসিং

লাহোর ব্যাডমিন্টন ডবলস্ বিজয়িনী শ্রীমতী ইসডন ও কুমারী হলওয়ে

ভারসিটি ক্রিকেট ঃ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ—২৭৬

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ঃ—১২৪ ও ১০৩

কলিকাতা এক ইনিংস ও ৪৯ রানে বিজয়ী।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দুইদিনব্যাপী প্রীতি সম্মেলন খেলায় আলীগড়কে শোচনীয় ভাবে পরাজিত ক'রেচে। দুঃখের বিষয় খুব শক্তিশালী টীম থাকা সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষের অব্যবস্থার ফলে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইণ্টার ভারসিটি টুর্ণামেণ্টে নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন থেকে বঞ্চিত হ'ল। আলীগড়, ভারসিটি টুর্ণামেণ্টের সেমি ফাইনালে বোম্বাইএর সঙ্গে খেলবে। স্থানীয়দল প্রথমে ব্যাট ক'রে ২৭৬ রান তুলে।

সর্ব্বোচ্চ রান করেন ডি দাস ৬৩; তারপর ডি' সেনা ৬২ ও কল্যাণ বসু ৫০। এ ছাড়া সাধুর ২৫ ও আর ভট্টাচার্য্যের নট্ আউট ২১ রানও উল্লেখযোগ্য। আলীগড়ের প্রথম ইনিংস ঐ দিনই মাত্র ১২৪ রানে শেষ হয়। সালাউদ্দিন দলের সর্ব্বোচ্চ ৪৪ রান করেন, আর টি সান ৩২ রান ক'রে নট আউট থাকেন। অনিল দত্ত ৪৫ রানে ৫, আর এন চ্যাটার্জ্জি ১৬ রানে ৩ উইকেট পান। আলীগড় ১৫২ রানে পিছিয়ে থাকার জন্ম 'ফলো :অন্' ক'রতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। এক সালাউদ্দীন ছাড়া আর কোন খেলোয়াড় ৭ মিনিটের বেশী উইকেটে দাঁড়াতে পারে নি। সালাউদ্দীন নির্ভীক ভাবে খেলে দ্বিতীয় ইনিংসেও স্বীয় দলের সর্ব্বোচ্চ ৫৩ রান করেন। অনিল দত্তের বল এবারও খুব কার্য্যকরী হ'য়েছিলো। দত্ত ২৪ রানে ৪ এবং এন চ্যাটার্জ্জি ও সাধু যথাক্রমে ৫০ ও ২৪ রান দিয়ে তিনটে ক'রে উইকেট পান।

এন চ্যাটার্জ্জি

বেঙ্গল এথ্‌লেটিক স্পোর্টসের ২৫ মিটার দৌড়ে প্রথম—উমা বোস, দ্বিতীয়—নমিতা পাল, তৃতীয়—ইলা সেন ছবি—পান্না সেন

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় অনুশীলনের জন্ম এখানে অনেক টীমের সঙ্গে খেলেচে। তাদের ব্যাটিং খুব উচ্চাঙ্গের ব'লে মনে হ'ল না। তবে বোলিংয়ে তাদের টীম যথেষ্ট শক্তিশালী এবং ফিল্ডিং দর্শনীয়।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ও অল-ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

যুগোশ্লেভিয়ার একনম্বর খেলোয়াড় পুনসেক ১১—৯, ৬—৪ ও ৭—৫ গেমে যুধিষ্ঠির সিংকে পরাজিত ক'রে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ও অল-ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ ক'রেচেন। এই নিয়ে তৃতীয়বার বৈদেশিক খেলোয়াড় অল-ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ ক'রলে। গতবারের বিজয়ী ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় গাউস মহম্মদ, বিজিত রামনাথন এবং তরুণ খেলোয়াড় জিমি মেটা প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নি। তা' হ'লেও প্রতিযোগিতা বেশ সাফল্যমণ্ডিত হ'য়েছে এবং বহু দর্শনযোগ্য খেলা অনুষ্ঠিত

পুনসেক

হ'য়েচে। প্রবীণ খেলোয়াড় মহম্মদ স্লীম অতি ধীর ভাবে খেলে মিটিককে পরাজিত করেন; অবশ্য পরের ম্যাচে কাপুর তাঁকে হারান। ইফতিকার আমেদ ভারতবর্ষের দু' নম্বর খেলোয়াড় সোহানীকে পরাজিত ক'রে সেমিফাইনালে পুনসেকের কাছে অতি শোচনীয় ভাবে হেরে যান। বাংলার উদীয়মান খেলোয়াড় দিলীপ বসুর খেলা এবার ভাল হয়নি। নমু সেন তাঁকে অতি সহজে পরাজিত করেন। পুনসেক ও মিটিক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর বিখ্যাত পাঞ্জাব জুটী সোহানী ও সোনীকে পরাজিত ক'রে পুরুষদের ডবলস্ বিজয়ী হন্। কুমারী লীলা রাও, মেয়েদের সিঙ্গলসে কুমারী উডব্রিজকে ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত ক'রে সিঙ্গলস বিজয়িনী হ'য়েচেন। ছোটদের খেলায় সেন ভ্রাতৃদ্বয় খুব কৃতিত্ব প্রদর্শন ক'রেচেন। প্রবীণদের খেলায় মির্জ্জা বিজয়ী হন। আর পেশাদারদের খেলায় মুরাদ খাঁ জয়লাভ করেন।

লীলা রাও　　যুধিষ্টির সিং

নমু সেন

ইফতিকার আমেদ ও কুমারী উড্‌ব্রিজ (ডানদিকে) ইষ্টইণ্ডিয়া টেনিস খেলায় সোহানী ও কুমারী হার্ভেজনষ্টোনকে (বামদিকে) পরাজিত করে মিক্সড ডবলস বিজয়ী হয়েছেন

বিভিন্ন ফাইনাল্‌স-খেলার ফলাফল ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলসে—পুনসেক ১১—৯, ৬—৪ ও ৭—৫ গেমে যুধিষ্ঠির সিংকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলসে—পুনসেক ও মিটিক ৬—৩, ১১—৯, ৩—৬, ৭—৫ গেমে সোহানী ও সোনীকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে—কুমারী লীলা রাও ৬—৩, ৬—২ গেমে কুমারী উডব্রিজকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলসে—কুমারী উডব্রিজ ও শ্রীমতী ফুটিট ৭—৫ ও ৬—২ গেমে কুমারী লীলা রাও ও কুমারী ক্রুচকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে—ইফতিকার আমেদ ও কুমারী উডব্রিজ ৬—৩, ৩—৬ ও ৬—২ গেমে সোহানী ও কুমারী হাভেঞ্জনষ্টোনকে পরাজিত করেন।

ছোটদের সিঙ্গলসে—খসু সেন ৪—৬, ৬—৩ ও ৬—১ গেমে নরীন্দ্রনাথকে পরাজিত করেন।

ছোটদের ডবলসে—খসু সেন ও নসু সেন ৬—২ ও ৮—৬ গেমে পান্ধী ও মিশ্রকে পরাজিত করেন।

প্রবীণদের সিঙ্গলসে—মির্জ্জা ৬—৪ ও ৬—৩ গেমে মিশ্রকে পরাজিত করেন।

প্রবীণদের ডবলসে—মিশ্র ও সীম ৩—৬, ৬—৪ ও ১০—৮ গেমে মেয়ার ও ক্রুককে পরাজিত করেন।

পেশাদারদের সিঙ্গলসে মুরাদ খাঁ ৬—১, ৬—২, :—৬ ও ৬—৪ গেমে এস হককে পরাজিত করেন।

পেশাদারদের ডবলসে—মুরাদ খাঁ ও তমাস খাঁ ৬—২, ৬—০ ও ৬—২ গেমে রামসেবক ও আল্লাবক্সকে পরাজিত করেন।

আন্তর্জ্জাতিক টেনিস ঃ

আন্তঃর্জ্জাতিক টেনিস খেলায় ভারতবর্ষ ৩-২ ম্যাচে যুগোশ্লেভিয়াকে পরাজিত ক'রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েচে। যুগোশ্লেভিয়া ডেভিসকাপের ইউরোপীয়ান জোন বিজয়ী হয়, আর মিটিক ও পুনসেক উভয়ে যুক্তরাজ্যে অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইণ্টার জোন ফাইনালে খেলেছিলেন। এইসব বিষয় বিবেচনা ক'রলে ভারতবর্ষের এই বিজয় যে খুব গৌরব ও কৃতিত্বের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকেনা। যুগোশ্লেভিয়া পরাজিত হ'লেও পুনসেক দু'টি সিঙ্গলস খেলায় বিজয়ী হ'য়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েচেন; অপর দিকে তাঁর সহযোগী মিটিক অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক খেলা দেখিয়েচেন। ডবলসে

সোহানী

ইফতিকার আমেদ

সোহানীর অদ্ভুত ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্যই ভারতবর্ষ জয়লাভ ক'রতে সক্ষম হ'য়েচে; সিঙ্গলসের খেলায় উভয় দেশের খেলা সমান সমান হয়। পুনসেকের মতে ব্যক্তিগত-ভাবে চ্যাম্পিয়ানসীপ পাওয়ার চেয়ে আন্তঃর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা বেশী গৌরবের। খেলার শেষে পুনসেক ব'লেচেন যে তাঁদের দেশের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি ব'লে তাঁরা দুঃখিত। আর এ কথাও স্বীকার ক'রেচেন যে, ভারতবর্ষ সত্য সত্যই বিজয়ী হবার যোগ্য খেলেচে। ডবলসে সোহানীর খেলার তিনি খুব উচ্চ প্রশংসা ক'রেচেন। পুনসেক, রিগস্‌ এবং ব্রোমউইচকে পরাজিত ক'রতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। তাঁর মতে তিনি এ পর্য্যন্ত যে সব খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলেচেন তাঁদের ভেতর ডোনাল্ডবাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সাউথক্লাব কোর্ট সম্বন্ধে তিনি ব'লেচেন যে, উইম্বলডনের পরই এর স্থান।

অল-ইণ্ডিয়া টেবিল টেনিস ঃ

পাঞ্জাবের আয়ুব পুনরায় অলইণ্ডিয়া টেবিল টেনিসে সিঙ্গলস বিজয়ী হ'য়েচেন। সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে

আন্তঃপ্রাদেশিক টেবিল টেনিস খেলায় বাঙ্গলার প্রতিযোগীগণ (বাম দিক থেকে)
এল সোম, ভাসিন, চ্যাটার্জ্জি, ঘোষ এবং ব্যানার্জ্জি

বাংলার এ ঘোষ এবং ডবলসে ভাসিন ও গাঙ্গুলী এবং এ মুখার্জ্জি ও এ সরকার পরাজিত হ'য়েচেন।

টেবিল টেনিস ঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় বোম্বাই সব খেলায় জয়লাভ ক'রে প্রথম স্থান অধিকার ক'রেচে। দ্বিতীয় হ'য়েচে বাংলা। পাঞ্জাব ও মাদ্রাজ তৃতীয় স্থান অধিকার ক'রেচে।

ফাইনাল খেলার ফলাফল ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলসে—আয়ুব (পাঞ্জাব) ১৮-২১, ২১-১৭, ২১-১০, ১৫-২১ ও ২১-১৯ গেমে কে কাপাদিয়াকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলসে—ডি কাপাদিয়া ও কে কাপাদিয়া (বোম্বাই) ২১-১৫, ২১-১৮, ২১-১৭ গেমে আয়ুব ও অওয়ানকে (পাঞ্জাব) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে—কুমারী ডেলিমা ১৯-২১, ২১-১৮, ২১-১৯, ২১-১২ গেমে কুমারী ডিসুজাকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে—আয়ুব ও কুমারী দারুআলা ১৫-২১, ২১-১৪, ২১-১৮, ১৯-২১, ২১-১৮ গেমে কে কাপদিয়া ও কুমারী মাদোনকে পরাজিত করেন।

অল-ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন ঃ

জি লুই এবারও অল-ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ান-সীপের সিঙ্গলস বিজয়ী হ'য়ে স্বীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ক'লকাতার ইষ্ট ইণ্ডিয়ান চ্যাম্পিয়ান টি, ব্যানার্জ্জি সেমি ফাইনালে কর্ত্তার সিংএর কাছে পরাজিত হন।

ফাইনাল খেলার ফলাফল ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলসে—লুই ১৫-১০ ও ১৫-৬ গেমে কর্ত্তারসিংকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলসে—জহুর ও হরনারায়ণ ১২-১৫, ১৫-৪ ও ১৫-৫ গেমে লুই ও কর্ত্তারসিংকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে—শ্রীমতী এসডন ১১-৮ ও ১১-৫ গেমে কুমারী কুককে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলসে—শ্রীমতী এসডন ও কুমারী হলোওয়ে ১৮-১৫ ও ১৫ ৮ গেমে কুমারী কুক ও কুমারী মারসেলাইনকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে—কর্ত্তারসিং ও শ্রীমতী এসডন ১১-১৫, ১১-৫ ও ১৮-১৬ গেমে হরনারায়ণ ও হলোওয়েকে পরাজিত করেন।

প্রবীণদের ডবলসে—রস ও ওয়েব ১৮-১৫, ৫-১৫ ও ১৫-৬ গেমে হেসাম ও নাগলকে পরাজিত করেন।

দিল্লীতে মহিলাদের ব্যাডমিণ্টন লীগ প্রতিযোগিতায় ডবলস বিজয়িনী কুমারী এস থাকার (বামদিকে) ও কুমারী এইচ আরনোল্ড

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "নিশিকান্তের প্রতিশোধ"—২৲
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস "ধাত্রী দেবতা"—৩৲
শ্রীঅমলা দেবীর "মনোরমা"—১৲
শ্রীগোপাল হালদারের "একদা"—২৲
শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষের "সাগরপারের কথা গুচ্ছ"—২৲
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম-প্রকাশিত "গৌরীমা"—১॥০
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়ের "পুরুষকারের পুরস্কার"—৸০
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "জমিদার"—১॥০
শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবীর "নীলিমার অশ্রু"—২৲
শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়ার "বিনীতাদি"—১৷০
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহার নাটক "জননী জন্মভূমি"—১৷০
শ্রীমতী আশালতা দেবীর "সাথী"—১৷০
শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সেতারের অতিরিক্ত গৎ"—॥৵০
শ্রীপ্রমোদকুমার সেন প্রণীত "শ্রীঅরবিন্দ" (জীবন ও যোগ)—২৲
শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত "অতুলচন্দ্রের জীবনী"—৷০

সম্পাদক
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons,
at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী | মিনি ও কাবুলিওয়ালা | ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ফাল্গুন—১৩৪৬

দ্বিতীয় খণ্ড | সপ্তবিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

কর্ম্ম-জ্ঞান ও শঙ্করাচার্য্য

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

কর্ম্ম দ্বারা মুক্তি হইবে অথবা জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হইবে কিম্বা এই দুইয়ের সহানুষ্ঠান দ্বারা মুক্তি হইবে, এ সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্কর এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ যথেষ্ট আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তথাপি এ বিষয়ের কোন মীমাংসা আজও হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। কারণ, বর্ত্তমান কালেও কেহ কেহ বলিতেছেন, জ্ঞানের দ্বারা যদি জীবের মুক্তি হইতে পারে, কর্ম্মের দ্বারাই বা কেন হইবে না? কেহ কেহ বলিতেছেন, কর্ম্ম-জ্ঞান উভয়ের সমুচ্চয়েই মুক্তি সম্ভব, অতএব উভয়েরই সহানুষ্ঠান করিতে হইবে। এক পক্ষে যেরূপ পক্ষীর উড্ডীয়ন সম্ভব নহে, সেইরূপ মাত্র জ্ঞানের দ্বারায় মুক্তিও সম্ভব নহে; অতএব আচার্য্য শঙ্কর যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন উহা সমীচীন নহে।

বর্ত্তমান কালে প্রচলিত উপনিষদের, বেদান্ত দর্শনের ও গীতার যে শাঙ্করভাষ্য পাওয়া যায় এবং তাঁহার মৌলিক গ্রন্থ বিবেকচূড়ামণি, উপদেশসহস্রী, আত্মানাত্মবিবেক প্রভৃতি হইতে তাঁহার মতবাদ সম্বন্ধে আমাদের একটা বেশ পরিষ্কার ধারণা হয় যে, তিনি মুক্তিকামীদের জন্যই ঐ সকল শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। যাঁহারা ইহলোক পরলোক-স্বর্গাদি সুখভোগে বীতস্পৃহ, যাঁহারা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি চান, তাঁহাদের জন্যই আচার্য্যের ঐ সকল শাস্ত্রপ্রণয়ন। যাঁহারা জাগতিক সুখভোগ করিতে চান, দুঃখের ঐকান্তিক নাশ চান না, তাঁহাদের জন্য আচার্য্যের দর্শন নহে। যাঁহারা স্বর্গসুখ ভোগ করিতে চান, তাঁহাদিগকে তথাকথিত যজ্ঞ-দানাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেই হইবে। তাঁহাদের জন্য জ্ঞানমার্গ-রূপ মুক্তিমার্গ বিধান তিনি করেন নাই। কেবলমাত্র তাঁহারাই জ্ঞানের অধিকারী, যাঁহারা কাম্য-

নিষিদ্ধ বর্জ্জনপুরঃসর ইহামুত্রফলভোগ বিরাগ হইয়া শম-দমাদিগুণযুক্ত সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়াছেন। আচার্য্য বলেন, বাসনাবর্জ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্তের স্থৈর্য্য আসিতে পারে না, চিত্ত স্থির না হইলে জ্ঞান প্রতিভাত হইতে পারে না। আলোক না আসিলে যেরূপ অন্ধকার নাশ হয় না, সেইরূপ জ্ঞান না হইলে অজ্ঞান নাশ হইতে পারে না। অজ্ঞান নাশ না হইলে জীবের মুক্তি অসম্ভব। অতএব, যাঁহারা ইহলোক পরলোক ভোগের বাসনা করেন, অথবা ইষ্টের সহিত বৈকুণ্ঠাদি লোকে নানাভাবে বিহার করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদের তাহা হইলে মুক্তি সুদূরপরাহত। বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর দ্বারী জয়-বিজয়কেও যদি স্বস্থানচ্যুত হইয়া মর্ত্ত্যে জীবের দুঃখকষ্টভোগস্বীকার করিতে হইয়া থাকে তাহা হইলে বৈকুণ্ঠাদি লোকে গিয়াও জীব যে মুক্ত হয় না তাহা বেশ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। অতএব সখ্য-বাৎসল্য-মধুর-দাস্যাদিভাবেও আত্যন্তিক মুক্তি সম্ভব নহে; দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি—দ্বিতীয় হইতে ভয় হয়। 'নিজ হস্তে রজ্জু যাহে আকর্ষণ'রূপ বন্ধন হইতে মুক্তি অন্যত্র নহে। আত্মজ্ঞান দ্বারাই মুক্তি সম্ভব। শ্রুতি বলেন, স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি, য এবং বেদ। সেই এই মহান্ অজ আত্মা জরা-মরণ-বর্জ্জিত, অতএব অমৃত অভয় দ্বৈতভয়শূন্য ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে অভয় তাহা প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি এই অভয় ব্রহ্মকে জানে সে নিজেও অভয় ব্রহ্ম হয়।

"অপাম সোমমমৃতা অভূম।" আমরা সোমরস পান করিয়াছি, সেইজন্য অমর হইয়াছি; "অক্ষয্যং হ বৈ চতুর্ম্মাস্য যাজিনঃ সুকৃতং ভবতি।" চাতুর্ম্মাস্য যাজীর অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। "নিষেকাদি শ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ।" গর্ভাধান হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত যাঁহাদের মন্ত্রের দ্বারা সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, তাঁহাদেরই এই শাস্ত্রে অধিকার, অপরের নহে। শ্রুতি স্মৃতি এই সকল বাক্যের দ্বারা অবিদ্বান্-সংসারানুরাগী ব্যক্তিকেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে বলিতেছে। বিবিদিষু বা বিদ্বানের জন্য উহা উপদিষ্ট হয় নাই। কারণ শ্রুতি-স্মৃতি ন্যায় প্রভৃতিতে কর্ম্মের নিন্দাও যথেষ্ট করা হইয়াছে। "অন্ধং তম প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।" যাহারা অবিদ্যার—কর্ম্মের উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ করে। "তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্য চিতোলোকঃ ক্ষীয়তে।" ইহলোকের কর্ম্ম সঞ্চিত অর্থ শস্যাদি যেরূপ ভোগের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেইরূপ পুণ্যাচিত স্বর্গাদি লোক ও ভোগের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। "তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি, নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" সেই আত্মাকেই জানিয়া ইহলোকে অমৃত হয়; মুক্ত হইবার আর অন্য পথ নাই। "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।" কর্ম্মের দ্বারাও নহে, প্রজার দ্বারাও নহে, ধনের দ্বারাও নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। "প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ।" এই সংসার সমুদ্র পার হইবার পক্ষে যজ্ঞরূপ ভেলা সমর্থ নহে। "কর্ম্মনা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে।" কর্ম্মের দ্বারা জীব বদ্ধ হয় বিদ্যার দ্বারা বিমুক্ত হয়। উগ্রৈস্তপোভির্বিবিধৈর্দ্দানৈর্নানাবিধৈরপি। ন লভন্তে তথাত্মানং লভন্তে জ্ঞানিনঃ স্বয়ম্॥" নানাবিধ উগ্র তপস্যা ও দানাদি দ্বারা সেই আত্মবস্তু লাভ করা যায় না, জ্ঞানীরা নিজ জ্ঞানের দ্বারা তাহা লাভ করেন। "যৎ কৃতকং তদনিত্যং" যাহা কৃতক অর্থাৎ ক্রিয়া-দ্বারা উৎপন্ন তাহা অনিত্য। ভগবদ্গীতাও স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতেছে কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ—"জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মনস্তে মতাবুদ্ধি র্জনার্দ্দন।" হে জনার্দ্দন কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধিই যদি তোমার মতে শ্রেষ্ঠ, তবে কেন বহুবিঘ্নসঙ্কুল কর্ম্মে আমায় নিয়োজিত করিতেছ? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অন্যত্র বলিতেছেন, "সর্ব্বং-কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" হে পার্থ নিঃশেষরূপে সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞানেই পরিসমাপ্তি লাভ করে। জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা। জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম্মকে ভস্মীভূত করে।

মহাভারত শান্তি পর্ব্বে, দুইশত চল্লিশ অধ্যায়ে শুকদেব ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বেদ বাক্য মধ্যে "কর্ম্ম কর" এবং "কর্ম্ম পরিত্যাগ কর" এই যে বিধি নিষেধ আছে, তাহার মধ্যে বিদ্যা দ্বারা মনুষ্যগণ কোন স্থানে গমন করে, এবং কর্ম্ম দ্বারাই বা কোন স্থানে গমন করে, আপনি দয়া করিয়া আমার নিকট তাহা বলুন; পরস্পরবিরুদ্ধ এই দুই পথ বিদ্যমান রহিয়াছে। পরাশর-তনয় বেদব্যাস, শুকদেব কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—বৎস! কর্ম্ম ও জ্ঞানময়, নশ্বর ও অবিনশ্বর পথদ্বয় বলিতেছি শ্রবণ কর। বেদ সকল যাহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই পথ দুই প্রকার, প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম এবং নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম। জীব কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ

হয় এবং বিদ্যাদ্বারা বিমুক্ত হয়; অতএব তত্ত্বদর্শী যতিগণ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয় না। কর্ম্মশীল মানব, কর্ম্মদ্বারা বারংবার জন্মমরণরূপ শরীর পরিগ্রহ করে, আর বিদ্বান্ ব্যক্তি জ্ঞান দ্বারা নিত্য অব্যয় স্বরূপে অবস্থান করে। কোন কোন অল্পবুদ্ধি মানব কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাঁহারা স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গে আসক্ত হইয়া কর্ম্মেরই উপাসনায় রত হয়। কর্ম্মাস্পদী মানব কর্ম্মের ফল সুখ-দুঃখ-জন্ম-মরণ লাভ করে। আর জ্ঞানী ব্যক্তি বিদ্যা দ্বারা এমন স্থান লাভ করে, যথায় গমন করিলে শোক করিতে হয় না, জন্ম নাই মৃত্যু নাই—যেখানে নানা জ্ঞান থাকে না বলিয়া জীবের জীবত্ব বিলয় প্রাপ্ত হয়—যথায় অব্যক্ত, অচল, নিত্য, অক্লেশ অমৃত অবিয়োগী পরমব্রহ্ম বিরাজমান রহিয়াছেন। তথায় সর্ব্বভূতে সমদর্শী সর্ব্বভূত-হিতে রত মহাত্মাগণ অবস্থান করেন।

এই সকল শাস্ত্র প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণরূপ দ্বিবিধ ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছে। যাঁহারা ইহজগতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিকামী স্বর্গাদি লোক ভোগ করিতে চান, তাঁহারা যজ্ঞ-দানাদি দ্বারায় তাহা প্রাপ্তির অনুষ্ঠান করুন। অপরে শম-দম-উপরতি তিতীক্ষা সমাধান শ্রদ্ধা প্রভৃতি দৈবী সম্পদ সহায়ে জ্ঞান লাভের অধিকারী হইয়া মোক্ষ লাভে সমর্থ হউন। এই সকল শাস্ত্রের ইহাই গূঢ়ার্থ। আচার্য্য শঙ্কর গীতাভাষ্যের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—স ভগবান্ সৃষ্ট্বেদং জগৎ তস্য চ স্থিতিং চিকীর্ষুর্ম্মরীচ্যাদীনগ্রে সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ প্রবৃত্তি লক্ষণং ধর্ম্মং গ্রাহয়ামাস বেদোক্তম্। ততোঽন্যাংশ্চ সনক-সনন্দাদীনুৎপাদ্য নিবৃত্তি ধর্ম্মং জ্ঞান-বৈরাগ্য লক্ষণং গ্রাহয়ামাস। সেই পরম পুরুষ ভগবান এই জগত সৃষ্টি করিয়া ইহা স্থায়ী করিবার ইচ্ছায় প্রথমে মরীচ্যাদি প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিয়া বেদোক্ত প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছিলেন। তদনন্তর অন্য সনক সনন্দনাদিকে উৎপন্ন করিয়া জ্ঞান বৈরাগ্যরূপ নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছিলেন।

বেদান্ত দর্শনের শারীরিক ভাষ্য লিখিবার সময়, আচার্য্য শঙ্কর "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের অথ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—তত্র অথ শব্দ আনন্তর্য্যার্থঃ পরিগৃহ্যতে নাধিকারার্থঃ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায়া অনধিকার্য্যত্বাৎ। অথ শব্দ অনন্তর অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে; অধিকার অর্থে নহে। ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা যেরূপ বেদ পাঠানন্তর হইয়া থাকে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাও তদ্রূপ বৈরাগ্য, শম, দম, তিতিক্ষানন্তর হইয়া থাকে (১)। অভ্যুদয়ফলং ধর্ম্মজ্ঞানং তচ্চানুষ্ঠানাপেক্ষম্। নিশ্রেয়স ফলং তু ব্রহ্মবিজ্ঞানং ন চানুষ্ঠানান্তরাপেক্ষম্। ভব্যশ্চ ধর্ম্মো জিজ্ঞাস্যো ন জ্ঞানকালেঽস্তি পুরুষব্যাপার তন্ত্রত্বাৎ। ইহ তু ভূতং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যং নিত্যত্বান্ন পুরুষ-ব্যাপার তন্ত্রম্। ধর্ম্ম জ্ঞানানন্তর তাহার সম্যগনুষ্ঠান দ্বারাই জাগতিক সুখ স্বরূপ অভ্যুদয়স্বরূপ ফললাভের সম্ভাবনা; অনুষ্ঠানের কিঞ্চিৎ মাত্র ত্রুটী হইলে ফললাভের সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্ম বিজ্ঞানের ফল নিশ্রেয়স, উহা কোনরূপ অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ নহে। ভ্রান্তি জ্ঞান দূর হইলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে। উৎপন্ন হয় যে ধর্ম্ম, তাহা জ্ঞানকালে থাকে না, সম্যক্ অনুষ্ঠানান্তর তাহা উৎপন্ন হয়। কিন্তু ব্রহ্মসিদ্ধ বস্তু বলিয়া তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ হইলেই অর্থাৎ অজ্ঞান নাশ হইলেই মোক্ষ। উহা নিত্য বলিয়া পুরুষ ব্যাপারের অধীন নহে এবং সিদ্ধ বস্তু বলিয়া অনুষ্ঠানসাপেক্ষ নহে। আর ধর্ম্ম অনুষ্ঠানানন্তর উৎপন্ন হয় বলিয়া পুরুষ ব্যাপারের অধীন, অতএব পুরুষ তন্ত্র। পুরুষ ইচ্ছা করিলে গমন করিতে পারে, না ও করিতে পারে, যাগযজ্ঞ দানাদি কার্য্য পুরুষ ইচ্ছা করিলে করিতে পারে, নাও করিতে পারে। কিন্তু বিষয়েন্দ্রিয়ের যোগ হইলে জ্ঞান হইবেই। পুরুষের ইচ্ছার অধীন উহা নহে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হইবামাত্র জ্ঞান আপনিই প্রতিভাত হয় বলিয়া জ্ঞান বস্তুতন্ত্র। আর গমন ক্রিয়া বা যাগযজ্ঞ, ব্রতোপবাস, দানাদি কার্য্য পুরুষেচ্ছাসাপেক্ষ বলিয়া পুরুষতন্ত্র।

আত্মজ্ঞান লাভেই মোক্ষ, উহাও জ্ঞান বলিয়া বস্তুতন্ত্র। ঐ মোক্ষ অন্য কোন প্রকারে লাভ হইতে পারে না বলিয়াই প্রজাপতি, দেবরাজ ইন্দ্রকে ও অসুররাজ বিরোচনকে ভোগৈশ্বর্য্য ত্যাগ করাইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করাইয়াছিলেন। প্রজাপতি যদি জানিতেন ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত অন্য কোন সাধন দ্বারাও সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হওয়া সম্ভব, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই তাহা উপদেশ করিতেন। অতএব

(১) তস্মাদেবং বিচ্ছান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃসমাহিতোভূত্বাত্মণ্যে-বাত্মানং পশ্যতি সর্ব্বমাত্মানং পশ্যতি। বৃহদারণ্যক ৪।৪।২৩

আচার্য্য শঙ্কর যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাই অভ্রান্ত। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য্য বা শম দমাদি গুণ নিশ্চয়ই আবশ্যক। কোনরূপ কর্ম্মই তাহা লাভ করাইতে পারে না। কর্ম্ম মাত্রই উৎপাদ্য-আপ্য সংস্কার্য্য বিকার্য্য এই চারি প্রকারের মধ্যে কোন না কোন এক প্রকার নিশ্চয়ই হইবে। উৎপাদ্য—মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন, আপ্য—বস্তু অন্যত্র ছিল, সম্প্রতি পাওয়া গেল; সংস্কার্য্য—অভ্যুক্ষণাদি দ্বারা ব্রীহ্যাদি দ্রব্য যজ্ঞোপযোগী করিয়া লওয়া; বিকার্য্য—দুধ বিকৃত হইয়া দধিতে পরিণত হওয়া। আত্মজ্ঞান বা মোক্ষ বস্তু ঐরূপ নহে। অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান যেন সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল; গ্রীবাস্থ গ্রৈবেয়ক, ভ্রমবশতঃ মানুষ মনে করে যেন উহা নাই এবং তজ্জনিত দুঃখে অধীর হইয়া গলায় হাত দেয় এবং যখন তাহা প্রাপ্ত হয় তখন দুঃখ দূর হইয়া আনন্দানুভব করে সেইরূপ। "অপ্রাপ্তমিব প্রাপ্নোতি" যেন অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি। স্বরূপ সম্বন্ধীয় অজ্ঞানের নাশই মুক্তি।

বিরুদ্ধমতাবলম্বী বলিতে পারেন আচার্য্য যে সকল যুক্তি দেখাইলেন তাহা কাম্য কর্ম্মের প্রতি প্রয়োজ্য হইতে পারে। নিষ্কাম কর্ম্ম সন্ধ্যাবন্দনাদি বা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে কার্য্য করিতে বাধা কি? তাহাই মোক্ষের সাধন হউক না কেন?

আচার্য্য বলেন নিষ্কাম কর্ম্ম সকলের প্রয়োজন ততক্ষণ—যতক্ষণ পর্য্যন্ত বৈরাগ্য—শম দম প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন না হয়। কারণ শম দমাদি ষট্ সম্পত্তি সহায়েই জ্ঞানলাভ হইলে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের কি প্রয়োজনীয়তা? নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে হইলেও কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ এই ত্রিবিধ কারক ভেদের জ্ঞান থাকা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। শ্রুতি কিন্তু সর্ব্বপ্রকার ভেদের নিষেধ করিয়াছে। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব।" "অথ তস্য ভয়ং ভবতি"। নানা প্রকার বস্তু নাই একমাত্র পরমাত্মাই রহিয়াছে; যে নানা বস্তু দেখে সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ পুন পুন জন্মমরণরূপ সংসার প্রাপ্ত হয়। অল্প মাত্রও যাহার ভেদবুদ্ধি রহিয়াছে তাহাকেই সংসারে গতায়াত করিতে হইবে। বেদব্যাস ও "সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ" "শম দমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ।" এই দুইটী সূত্রে দেখাইয়াছেন, কর্ম্মের একেবারেই প্রয়োজনীয়তা নাই তাহা নহে, উহা মুক্তির জন্য প্রয়োজন না হইলেও মুক্তি লাভের সাধন শম দমাদিতে উহার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে; অশ্ব যেরূপ হল চালনে প্রয়োজন না হইলেও গাড়ী টানিতে প্রয়োজন হয় তদ্বৎ। জ্ঞানলাভে শমদমাদির সাক্ষাৎভাবে প্রয়োজনীয়তা অতএব শম দমাদি অবশ্যানুষ্ঠেয়। কারণ ঐগুলি জ্ঞানলাভের অঙ্গ স্থানীয়।

আচার্য্য শঙ্কর দেখিয়াছেন চিত্তশুদ্ধি পর্য্যন্তই কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা, তাই মুক্তি পথের পথিকের পক্ষে—নিষ্কাম কর্ম্ম বা জ্ঞানকর্ম্ম সহানুষ্ঠান, নিত্য কর্ম্ম প্রভৃতি অবশ্যানুষ্ঠেয় বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—

> বোধোঽন্য সাধনেভ্যো হি সাক্ষান্মোক্ষৈক সাধনম্।
> পাকস্য বহ্নিবজ্ জ্ঞানং বিনা মোক্ষো ন সিধ্যতি॥
>
> (আত্মবোধঃ)

অগ্নি ভিন্ন যেরূপ রন্ধন কার্য্য হওয়া অসম্ভব, সেইরূপ জ্ঞান ভিন্ন মোক্ষও অসম্ভব—যেহেতু অন্য সাধনসকল হইতে জ্ঞানই সাক্ষাৎ মোক্ষের সাধন।

একমাত্র আত্মজ্ঞান দ্বারাই মুক্তি তাহা শ্রুতি বারংবার উপদেশ করিয়াছেন। "ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি" এই একাত্ম প্রত্যয়ের—অদ্বৈতজ্ঞানের উপদেশ শ্রুতি পুনপুন করিয়াছেন। "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা।" "য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ," এই সকল শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত কোন ভেদই যে তাহাতে নাই তাহাই জানাইয়াছেন। অতএব একমাত্র জ্ঞপ্তিস্বরূপ তিনি কোনরূপ কর্ম্মসাধ্য বস্তু হইতে পারেন না। জীবন্মুক্তের সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন

> আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ অয়মস্মীতি পুরুষঃ।
> কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনু সংজ্বরেৎ॥

জীব যদি নিজেকে সর্ব্ব সংসারধর্ম্মবর্জ্জিত, পরমপুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহা হইলে কিসের ইচ্ছায় এবং কাহার জন্যই বা সে আর শরীরের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখানুভব করিবে? জীবন্মুক্ত পুরুষ, সর্ব্ব সংসারধর্ম্মবর্জ্জিত হন বলিয়া তিনি সমস্ত বিধি নিষেধের পারে চলিয়া যান।

তিনি কিরূপ আচার আচরণ করিবেন? তদুত্তরে শাস্ত্র বলে—যথা কামো যথাচারো ভবতি যেমন ইচ্ছা তেমন আচার করিবেন। তাঁর ইচ্ছা হইলে তিনি কর্ম্ম করিতেও পারেন, আবার নাও পারেন। জনক অশ্বপতি প্রভৃতি নৃপতিগণ জীবন্মুক্ত হইয়াই কর্ম্ম করিয়াছিলেন। লোকশিক্ষার্থ তাঁহারা কর্ম্ম করিতেন।

জ্ঞানলাভের পরও জীবন্মুক্ত পুরুষ লোক-কল্যাণের নিমিত্ত কর্ম্ম করেন—অনেকেই ইহা স্বীকার করেন না। কিন্তু জীবন্মুক্ত অবস্থা স্বীকার না করিলে ব্রহ্মজ্ঞান শব্দই ব্যর্থ হইয়া যায়। কারণ জীবিত অবস্থায় যদি কোন পুরুষই তাহা অনুভব না করেন তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রমাণাভাব হইয়া যাইবে। সিদ্ধ পুরুষাভাবে উপদেষ্টাভাব হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ শ্রুতি স্মৃতির বৈয়র্থ্য হইয়া যাইবে, শাস্ত্র বৈয়র্থ্যে সমস্ত জগতের স্বেচ্ছাচার প্রসঙ্গ হইবে। তাহা কাহারও অভীপ্সিত হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি জনককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—অভয় প্রাপ্ত হইয়াছ ত? জনক বলিতেছেন, ভগবন্ আপনার কৃপায় আপনার নিকট হইতে লব্ধবিদ্য হইয়া আপনাকে সমস্ত বিদেহ রাজ্য দান করিতেছি এবং দান কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত আমাকেও সমর্পণ করিতেছি। ইহার দ্বারা বুঝা যায় মানুষ ইহজীবনেই কৃতকৃত্য হইতে পারে। শ্রুতি স্বয়ং উপদেশ করিতেছেন—যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ এই জীবনে মরণধর্ম্মী মানব অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে, হৃদয়স্থিত কামনাসমূহ ত্যাগ করিলেই। "বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে" বলিয়া শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন জ্ঞানলাভ করিয়া যে পুরুষ মুক্ত হয় সেই আবার দেহত্যাগ পূর্ব্বক বিশেষরূপে মুক্ত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যং লব্ধা চাঽপরং লাভং মন্যতে নাঽধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাঽপি বিচাল্যতে॥ ইত্যাদি যে অবস্থা লাভ করিয়া পুরুষ ততোধিক অবস্থা আর আকাঙ্ক্ষা করে না। যেখানে অবস্থিত হইলে অর্থাৎ যদবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীব গুরুতর দুঃখেও বিচলিত হয় না। ইহার দ্বারা ভগবান পূর্ণজ্ঞান লাভানন্তর মানুষ কিরূপ সন্তুষ্ট হইয়া যায় তাহাই দেখাইয়াছেন। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে মানুষ ইহজীবনেই মুক্ত হইয়া অবস্থান করিতে পারে।

শাস্ত্রসকল যাহা উপদেশ করিতেছে তাহা যদি ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে স্বর্গলোকপ্রাপ্তি নিমিত্ত বহুকষ্ট-সাধ্য অর্থ ব্যয় করিয়া যজ্ঞ দানাদি সকলই অনর্থক হইয়া যাইবে। মানুষ শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করে বলিয়াই ঐ সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। শাস্ত্রবিধিনিষেধ অনর্থক হইলে কে আর বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া ব্রতোপবাস বা নৈসর্গিক নিয়মের উল্লঙ্ঘন করিয়া অহরহ রিপু সকলের সহিত যুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদি পালনে যত্নবান হইবে? শাস্ত্রবিধির সার্থকতা না থাকিলে ব্যভিচার অনাচার অত্যাচারে লোকসকল ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। তাহা কেহই ইচ্ছা করেন না। শাস্ত্রোপদিষ্ট বিধিনিষেধ বাক্যের সার্থকতা থাকিলে পূর্ব্বোক্ত জীবন্মুক্তিসূচক বাক্য সকলেরও নিশ্চয়ই সার্থকতা রহিয়াছে। শাস্ত্রোপদিষ্ট বাক্য সকলের কোন অংশের বৈয়র্থ্য হইলে অপর অংশের সার্থকতায় সন্দেহ হইবে। অতএব সমস্ত বাক্যেরই সার্থকতা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নাই। এই জীবনে মানুষ যদি অপরোক্ষানুভূতিসম্পন্ন হইতে না পারে তাহা হইলে শরীরান্তে কি হইবে তাহা কে বলিতে পারে? "যা মুক্তি পিণ্ডপাতেন সা মুক্তি শুনি শূকরে।" শরীর ত্যাগের পর যে মুক্তি হয় তাহা ত কুকুর শূকরের ও হয়।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য আচার্য্য শঙ্কর শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াই কর্ম্মকে জ্ঞান লাভের সহায়রূপে স্থান দিয়াছেন। সাক্ষাৎভাবে মুক্তির সাধনরূপে জ্ঞানকেই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কারণ তাঁর দর্শনে অজ্ঞান নাশ একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব। তাঁর সিদ্ধান্তানুযায়ী যদি কেহ সমস্ত শ্রুতিস্মৃতির একার্থতা চিন্তা করেন, তাহা হইলে উহা না মানিয়া উপায় নাই। বর্ত্তমান যুগের যুগাচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন "কর্ম্ম কতদিন যতদিন না তাঁর প্রতি ব্যাকুলতা আসে।" "গৃহস্থের বধুর পেটে ছেলে হ'লে শাশুড়ী তার কাজ কমিয়ে দেয়।" "ফল হলে ফুল আপনি খসে পড়ে যায়।" জীবন্মুক্তের কর্ম্ম করার দৃষ্টান্তে বলিতেন—কূয়া খুঁড়া হয়ে গেলে কেউ ঝোড়া কোদাল কূয়ার মধ্যেই ফেলে দেয়, আবার কেউ কেউ অপরের কাজে লাগবে বলে রেখেও দেয়। এই সকল বাক্যে মনে হয় যদি কেহ ভগবানের জন্য তন্ময় হইতে পারেন তাঁর পক্ষে কর্ম্মের কোনই প্রয়োজন নাই। আবার জোর করে অনধিকারীর কর্ম্মত্যাগ করাও সমীচীন নহে। ভগবান লাভ করাই যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহাদের পক্ষে ব্যাকুলতা তন্ময়তা প্রভৃতির প্রতি একান্ত দৃষ্টি রাখাই কর্ত্তব্য। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণের যুক্তি বা মতবাদের নিন্দা করিয়া কোনই লাভ হইবে না। "ভুক্তয়ে নতু মুক্তয়ে।" অপরের মতালোচনা বা শাস্ত্র ব্যাখ্যা কৌশলের সম্বন্ধে আচার্য্যের ইহাই অভিমত।

শিকারে রাজসংসর্গ

শিল্পী- শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী এম, বি, ই।

পরিচয়

গৌরবাবু কেটা মিস্—ক তরুণজমিদার আমি

ভোর না হইতেই হাতীর চীৎকারে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মনে পড়িল, গত রাত্রে বাঘের খবরের কথা। বিছানার পাশেই ব্রিচেস্ রাখিয়াছিলাম, পরিয়া রাইফেলের নল ও ঘোড়া পরীক্ষা করিয়া লইলাম। তাড়াতাড়িতে সিগারেটের টিন লইতে ভুল হইয়াছিল। ফিরিয়া দেখি টিনটি স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে মনে আসিল দুশ্চরিত্র কেটার কথা। রূপার সিগারেট কেস, সোনার বোতাম—তাহার অত্যাচারে ব্যবহার করা ছাড়িয়া দিয়াছি। উক্ত দ্রব্যগুলির অন্তর্দ্ধানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বলিত—চল্ গিয়া। জড়পদার্থ ইচ্ছামত চলাফিরা করিতে পারে অবিশ্বাস করিবার সাহস ছিল না—হয় সে চাকরি ছাড়িয়া দিবার ভয় দেখাইবে, নয় সময় মত চা খাইতে পাইব না। কত দিন তাহাকে জবাব দিবার জন্য মনকে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সফল হইতে পারি নাই। প্রতি দিনের সব কাজে তাহাকে না হইলে আমার চলিত না। দোষ যথেষ্ট থাকিলেও তাহার গুণও ছিল অনেক। কতবার সে বিপদ হইতে বাঁচাইয়াছে। চায়ে ভদ্রলোকদের নিমন্ত্রণ করিয়া ভুলিয়া গিয়াছি এবং সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, এমন সময় কেটা এপয়েণ্টমেণ্ট কার্ড দেখাইয়া ভদ্র আইনের দণ্ড হইতে রক্ষা করিয়াছে।

কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে কতবার তাহাকে এক মাসের পুরা মাহিনা বকশিস দিয়াছি, তথাপি অন্দার ধৌতকরণের ফলাফল এড়াইতে পারি নাই।

বাহারী কামিজ কিম্বা জুতা বেশী দিন ব্যবহার করিবার উপায় ছিল না। হঠাৎ যে-কোন সময় তাহার পছন্দমত একটি পরিয়া সেলাম ঠুকিলে আশ্চর্য্য হই না। জুতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইবার পর সন্দেহ করিতেছি ভাবিলে সে নির্ব্বিকার চিত্তে বলিত—জুতা ফটুগিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারি কায়দায় গোড়ালীতে গোড়ালী ঠুকিয়া সেলাম দিত। নিজের অজ্ঞাতে দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিত, কিছু বলিতাম না।

সামান্য ভৃত্য এতটা প্রশ্রয় পায় কেন, প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কারণ ছিল যথেষ্ট।

প্রথম কারণ, আমাকে চালাইয়া লইতে পারেন এমন অভিভাবক কেহ ছিলেন না।

দ্বিতীয় কারণ, বিবাহের বাজারে আমার দাম ওঠে নাই। কেন বলিতেছি। বাল্যকাল হইতেই শিকার, কুস্তি ও ফুটবলে শরীরটি এমন আকার ধারণ করিয়াছিল যাহার খ্যাতি কাটখোট্টার উপরে উঠিতে পারে নাই। তদুপরি সময়ের আগেই বয়স নোটিস পাঠাইয়াছিল—মাথার মধ্যস্থলে বিরাট টাকের দখল লইয়া।

বোতলের পর বোতল ভিটেক্স্ শেষ করিয়াছি, কিন্তু টাকের ন্যায্য দখল হটাইতে পারি নাই। দুই-এক গাছি নূতন চুল যে গজায় নাই তাহা বলিতে পারি না কিন্তু বন্ধুর দল অত অল্পসংখ্যা ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনিতে রাজি হন নাই। আমি দোষ দেই না, কারণ তাঁহারা খালি চোখে দেখিতেন।

চুল আমার নিজের, সুতরাং উঠিতেছে কি-না দেখিবার জন্য বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলাম—সামনে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো রাখিয়া পিছনে সাদা কাপড় ঝুলাইয়া তাহার পর ঈষৎ মাথা হেলাইয়া ম্যাগনিফাইং গ্লাস

ধরিলেই যে-কোন নিরপেক্ষ বিচারক দেখিতে পাইতেন, নবদূর্ব্বাদলসম কচিরা আগমনীর আশ্বাস দিতেছে। কিন্তু এমন হতভাগার দেশ যে, কাহারও সহানুভূতি দেখাইবার সাহস নাই, পাছে কিছু একটা প্রস্তাব করিয়া ফেলি।

বানপ্রস্থ অবলম্বন কিম্বা পণ্ডিচারীর আশ্রমে ঢুকিবার ইচ্ছা আমার কখনও আসে নাই। পাণিগ্রহণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু বাঙালী শুকনো তরুণদের উৎপাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। অস্থিসার শরীর, সাহেবী অনুকরণে বাঙলা শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও সন্ধ্যাবেলায় ভোরের সুরের উপর অমানুষিক অত্যাচার তন্বীদের এমন ভাবেই আকর্ষণ করিত যে আমার মত প্রাচীনপন্থীর সেখানে ভিড়িবার উপায় ছিল না। অগত্যা নিরুপায় হইয়াই কেটার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম।

বালিশের নীচে টাকা খুঁজিয়া না পাইলে কেটা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে তিরস্কার করিয়াছে—যদিও আমি নিশ্চয় জানিতাম, টাকার বেগমান-গতি কোন্ দিকে ধাবিত হইয়াছিল। তথাপি কেটা ভিন্ন গতি নাই। তাহাকে মিনতি করিয়া বলিলাম সিগারেটের টিন পাইতেছি না। যে ভাবে বলিয়াছিলাম, তাহাতে পাথর পর্য্যন্ত গলিয়া যাইত—নেতারা এই টেক্‌নিক জানিলে রাজনৈতিক আন্দোলনে কাজে লাগাইতে পারিতেন। উপস্থিত পাথর গলিল না বটে কিন্তু কেটার মন ভিজিল। এদিক ওদিক তাকাইয়া টিনটি আমার সামনে রাখিয়া দ্রুত অন্য কাজে চলিয়া গেল। ভয়ে ভয়ে ঢাকনি খুলিলাম, যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে—টিন প্রায় শূন্য। কিছু বলিলাম না—ইহার শোধ জঙ্গলে লইব ঠিক করিলাম। সেখানে বংসকে বোলতার চাক, বিছুটি লতা ও চোরকাঁটার সহিত নূতন করিয়া পরিচয় করাইয়া দিব।

হাতীতে উঠিয়াই বলিলাম, 'মাইলং'। ইচ্ছা ছিল তাড়াতাড়ি উঠিবার সময় কেটা যাহাতে আছাড় খায়, কিন্তু সে অবলীলাক্রমে লেজ ধরিয়া নারিকেল গাছে উঠার মত পৃষ্ঠদেশ অতিক্রম করিল এবং 'রামা' বলিয়া নিশ্চিন্তভাবে পিছনে গুছাইয়া বসিল। দুঃখ হইল, এই অকাল কুষ্মাণ্ডকে হাতী চড়া ঘোড়ায় চড়া হইতে আরম্ভ করিয়া আর কত কি অশোভনীয় বিষয় শিখাইয়াছিলাম কেন? অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছি, নিজের সখের নানা দ্রব্য আমার বিনা অনুমতিতে তাহাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছি—অবশেষে নেশার সামগ্রীর উপরও তাহার দৃষ্টি! একটা ভাল রকম শিক্ষার ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলাম না।

গৌরবাবুকে ঝুলাইয়া উঠাইবার সময়ও মাথা হইতে হাত নামাইলেন না

কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি, পূর্ব্বদিক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের সঙ্কেত করিতেছে, এমন সময় 'রোখ রোখ' চীৎকার শুনিতে পাইলাম। ফিরিয়া দেখি গৌরবাবু ক্ল্যারীয়নেটের বাক্স বগলদাবা করিয়া মাথার উপর এক হস্ত রাখিয়া প্রাণপণ শক্তিতে আমাদের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার সহিত মাত্র কয়দিনের আলাপ। শিকার পার্টির তিনি একজন দর্শক। বয়স প্রায় আধ-পাকার দিকে। মুখের আঁকাবাঁকা রেখাগুলি তাহার প্রমাণ দিতেছে।

চুলের পারিপাট্যে তাঁহার অসামান্য দুর্ব্বলতা ছিল। মেয়েদের মত পার্মানেণ্ট কার্ল্‌স্-এর সহিত অনেক দেশী

স্টাইল যোগ লাগাইতেন। একদিকে ময়ূরপঙ্খী পাখনা—যাহা ধীরে ধীরে পাতা কাটায় আসিয়া কপালের অনেকটা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। অপরদিকে খানিকটা ব্যাক ব্রাশ্ থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহার পরই ঢেউ-এর পর ঢেউ—যাহা কানের কাছে সমুদ্রতটের মত সমতল হইয়া গিয়াছে। সিঁথি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইত, কতখানি ধৈর্য্য ও সহজ-লব্ধ সময় থাকিলে মানুষ এতটা সাফল্য লাভ করিতে পারে। মহাশিল্পী বটিসেলিও তুলির সূক্ষ্ম কাজে এত ভাল effect আনিতে পারেন নাই। গৌরবাবু ছোট্ট একটি লাইন টানা রুলার, একপাত্র জল ও একটি মাত্র চিরুণীর সাহায্যে এই অসাধ্য সাধনে সফল হইয়াছিলেন। রাত্রে ঘুমাইবার সময় তিনি নাকি মাথায় গামছা বাঁধিয়া শুইতেন। কতকটা পাতিয়ালার যোদ্ধাদের মত।

দ্রুত অগ্রসরকালীন মাথায় হাত রাখিয়াছিলেন কেন অনুমান করিতে পারিলাম। ভদ্রলোক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হাতী থামিতে চায় না, কারণ সামনেই কুনকী চলিতেছিল। অবশেষে সামনের হাতী দাঁড় করাইতে বলিলাম। আমাদের হাতী টাঙ্স খাইয়া বসিল বটে, কিন্তু লেজের এমন উত্থান-পতন আরম্ভ হইল যে পিছন হইতে উঠায় বিপদের আশঙ্কা ছিল। পাশ হইতে উঠিতে বলিলাম। বাঁশীর বাক্সটা আগাইয়া দিলেন, কিন্তু মাথা হইতে হাত নামাইলেন না। এক হাতের সাহায্যে উপরে উঠা অসম্ভব জানিয়া ভদ্রলোককে বাধ্য হইয়া ঝুলাইয়া তুলিলাম; দোদুল্যমান অবস্থাতেও তিনি চুল হইতে হাত নামাইলেন না। হাওদায় বসিয়া ভদ্রলোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, এমন জানলে কে আসত।

জীবনে এই প্রথম তিনি হাতীতে উঠিলেন। জঙ্গল বলিতে ইডেন গার্ডেন্স ও কলিকাতার আশে পাশের বাঁশঝাড় ছাড়া আর কিছু দেখেন নাই। আমার হাতীতে অব্যবসায়ী ওঠাতে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। দাঁড়াইবার পূর্ব্বে হাতী সামনের দুই পা সোজা করিতেই এমন একটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন যাহা মুমূর্ষু রোগীর শেষ কথা বলিয়া ভ্রম হয়। সমস্ত পৃষ্ঠের ভার হাওদায় ঠেসান থাকিলেও হেলান দেওয়া রাইফেল এবং আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। জঙ্গলে ঢুকিবার পূর্ব্বেই এই ঘটনা আমাকে দমাইয়া দিল; সেফটি ক্যাচ্ থাকিলেও গুলীভরা বন্দুক লইয়া ভদ্রলোকের সহিত কি ভাবে শিকার করিব চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। হাতী দাঁড়াইতে ভদ্রলোক আমাকে ছাড়িয়া সোজা হইয়া বসিলেন, একটু নিরাপদ বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জঙ্গলে ত বাঘ থাকে?"

উত্তর করিলাম, "বাঘ শিকারেই ত যাচ্ছেন।"

কি ভাবিয়া আবার প্রশ্ন করিলেন, "চিড়িয়াখানার বাঘের চেয়ে বড়?"

বিরক্ত বোধ করিতেছিলাম, বলিলাম, "কেমন ক'রে জানব, ঘর থেকে মানুষ টেনে নিয়ে গেলে বুঝতে হবে মানুষ-খেকো বাঘ আরও বড়ো হতে পারে।"

বিরক্তিপূর্ণ উত্তর শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন,

নূতন প্রশ্নের জন্ম প্রস্তুত হইতেছেন মনে হইল। লক্ষণ খারাপ বুঝিয়া বলিলাম, "যৌনপুরীটা বাজান। এখন রোদ ওঠে নি, জমবে ভাল।" উত্তর না পাইয়া অনুমান করিলাম—অজানা বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার তালু শুকাইয়া গিয়াছে। কেটাকে সোডা খুলিতে বলিলাম। সোডা পান করিয়া তিনি অনেক সুস্থ বোধ করিলেন, তাহার পর জোড় তাড়া দিতেই বাক্সের অভ্যন্তরস্থিত যন্ত্রটি একটি পূর্ণাকার বাঁশীর রূপ পরিগ্রহ করিল। বাল্যকাল হইতেই দেশী রাগ-রাগিণী শুনিয়া আসিতেছি—বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও যান্ত্রিক আমাদের বাড়ীতে বহুবার জলসা করিয়াছেন, সুতরাং আমার দেশী সুরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আসা স্বাভাবিক।

ডাইনামোর কল-কব্জার মত চাবীগুলির ঘাট বাঁধা থাকা সত্ত্বেও কি ভাবে সুরের ক্রমবিকাশ হইবে বুঝিতে পারিতেছিলাম না। ধীমার তিনি আলাপ ধরিলেন, তানগুলি নির্ভুল সুরের ঢেউ তুলিল। মুগ্ধ হইলাম, মন উধাও হইল বন্দী রাজকন্যার সন্ধানে। পাষাণপুরী ভেদ করিয়া দেখিলাম মানসসুন্দরীকে প্রাণ ভরিয়া, প্রেমের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল, ভুলিয়া গেলাম আমার গন্তব্যস্থান, ভুলিয়া গেলাম পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর কথা। প্রত্যক্ষ করিলাম রাজকন্যার দেহের পূর্ণতা—নীলাভ ওড়নার সচ্ছলতা প্রকাশ করিয়া দিল নিটোল স্তনাগ্রচূড়ার আভাষ, নিতম্বের অপূর্ব্ব লীলায়িত রেখা। ইতিমধ্যে কখন সোম আসিয়া পড়িয়াছে জানিতে পারি নাই। গৌরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন লাগল ?"

আমি সশ্রদ্ধভাবে তাঁহার দিকে তাকাইলাম। কেমন লাগিল, ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করি কেমন করিয়া—তুলনায় ভাগ্যহীনা বাঙলার কথা মনে আসিল। আধুনিক তথা-কথিত মার্জ্জিতের দল কি ভাবে কৃষ্টির এত বড় অঙ্গকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে।

কথার প্রাধান্ত সুরের নিজস্ব প্রকাশ-ভঙ্গীকে কি ভাবে নিস্তেজ করিয়া আনিতেছে, ফ্যাসানের প্রতাপ ছোটকে বড় করিবার জন্ম কি ভাবে তার বিষাক্ত লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া চলিয়াছে, মনে আসিল বাঙলার International শিক্ষাপীঠের কথা—যেখানে শক্তির অভাবে আর্টের আদর্শকে করে বীভৎস, সাধনার অভাবে সুরকে করে সোজা। শিল্পে ব্যভিচারিতা সম্বন্ধে একের পর এক নির্লজ্জ আচরণ মনকে পীড়ন করিতেছিল।

গৌরবাবু ঠেলা মারিয়া বলিলেন, "আমরা এসে পড়লাম যে, অত কি ভাবছেন ?"

তাঁহার কেশবিন্যাসের দিকে লক্ষ্য করিয়া কি ভাবিতেছিলাম বলিলাম না। দেখিলাম অদূরে একরাশ তাঁবু পড়িয়াছে—ছোট গ্রামের আয়তন জুড়িয়া।

এক হাত মাথায় রাখিয়া গৌরবাবু বলিতেছেন—রোখো রোখো

হাতী বসিবার পূর্ব্বেই মনে পড়িল গৌরবাবুর আলিঙ্গনের কথা—এবার কিছু করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিলাম। এখানে মই ছিল, নামিতে বিশেষ অসুবিধা বোধ করিলেন না। মাটিতে নামিয়া তিরস্কারের সুরে প্রশংসা করিলেন, "ইস্, আপনার গায়ে ভয়ানক জোর ত, কাঁধটা ভেঙেছিল আর একটু হলে !'

স্নান জলযোগ ইত্যাদি শেষ করিয়া আমরা রাজা-

বাহাদুরের ক্যাম্পে উপস্থিত হইলাম। মাটি হইতে উঁচু প্ল্যাটফর্‌ম্‌, তাহার উপর তাঁবু চড়ান হইয়াছে। চার ধারে লোহার শিক্‌ ঘেরা বারান্দা। তাঁবুটি ছোট-খাট কাপড়ের বাঙলো বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা বারান্দা পার হইয়া আসরে উপস্থিত হইলাম। কাঠের প্ল্যাটফর্মের উপর পারস্য দেশীয় গালিচা। এই ধরণের এত বড় গালিচা সুলভ নয়। কারুকার্য্যে কি অপূর্ব্ব নিপুণতা। কারপেটের দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। সামান্য মাদুরের মত ব্যবহৃত হইতেছে। গালিচার উপর দুগ্ধফেননিভ ফরাস পড়িয়াছে। মধ্যস্থলে তানপুরা, দীলরুবা, সারেঙ্গ, পাখোয়াজ, বাঁয়া-তবলা ইত্যাদি যন্ত্র—একটি হারমোনিয়ামেরও স্থান হইয়াছে।

আতরের গন্ধে ঘর ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। বহুদিন পরে জুঁইএর রু মনকে কাঁচা করিয়া আনিতেছিল। মোটা জরির আচকান পরিয়া খানসামারা আতর, সোনালি তবকযুক্ত পান ও সিগারেট সরবরাহ করিতেছিল। তাহাদের নম্রতায় প্রভুর পুরান চালের পরিচয় পাওয়া যায়। তেল অথবা লোহা বেচিয়া হঠাৎ টাকা-ওয়ালাদের বাড়ীতে সচরাচর এই ধরণের খানসামা চোখে পড়ে না।

আমার পাশেই বসিয়াছিলেন রাজ-মাতুল ও সদ্য বিলাত-প্রত্যাগত এক তরুণ জমিদার।

রাজ-মাতুলের শিকারে কোন স্পৃহা নাই। ভাগিনা বাহাদুরকে হিংস্র জন্তুর গ্রাস হইতে আগলাইবার জন্য সঙ্গে আসিয়াছেন। রাজাবাহাদুরের পিতা স্বর্গীয় মহারাজা জীবিত অবস্থায় তাঁবুতে বসিয়া এত মরা বাঘ দেখিয়াছেন যে জঙ্গলে তাহাদের পিছনে ঘোরা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। মামাবাবু আসলে লোকটি মন্দ নয়, কিন্তু নিরি-বিলিতে কাহাকেও একবার পাইলেই নিজের থায়েন দায়েন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা আরম্ভ করিতেন এবং একবার আরম্ভ হইলে তাহা থামান যাইত না। আমি এই বিপদে একদিন পড়িয়াছিলাম, তাহার পর একলা তাঁহার সামনে আর আসিতে সাহস পাই নাই।

জমিদার সাহেব বিলাতবাস-কালীন শ্রীযুক্ত কলের পারাবত মারিয়া হাত পাকাইয়াছিলেন। ফলে লক্ষ্য এমন অব্যর্থ হইয়াছিল যে, বেগবান মোটর গাড়ী হইতে বিপরীত দিকে ধাবমান মৃগকে টেলিস্‌কোপিক রেঞ্জ হইতে বধ করিতে পারিতেন।

ফাঁকা রাস্তায় মোটরগাড়ী ঘণ্টায় অনায়াসে চল্লিশ মাইল ছোটে, মৃগের গতিও তদপেক্ষা কম নয়। হরিণ মারা সাধারণ টোটা সেকেণ্ডে একহাজার গজ অতিক্রম করিতে পারে। সব কয়টির একত্র মিলন করাইতে হইলে দশমিক ভগ্নাংশের নির্ভুল হিসাবে কুলায় কিনা সন্দেহ। তথাপি তরুণ জীবটি এদিক দিয়া বহুবার কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ভাবিতেছিলাম, মহাভারতের অর্জ্জুনের অসম্পূর্ণ শিক্ষার কথা, ভদ্রলোক বাঁচিয়া থাকিলে জমিদার সাহেবের নিকট আরও কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন।

এতক্ষণ সকলেই রাজাবাহাদুরের অপেক্ষা করিতে-ছিলাম, তিনি প্রবেশ করিতেই আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম। উঠিলেন না মহিলাটি। মিতাক্ষরা আইনের মত জন্মস্বত্ব লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, স্বত্বটি উপস্থিত সম্মানের দাবী। নির্ব্বিচারে নারীকে এই সম্মান দেওয়ার পিছনে অবলা অথবা দুর্ব্বলের প্রতি দয়া লুকাইয়া নাই ত?

নিমন্ত্রিতদের বসিতে বলিয়া রাজা বাহাদুর ওস্তাদকে ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিতের পিছনে আদেশ ছিল না—ছিল সশ্রদ্ধ অনুরোধ।

সঙ্গীত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে স্বহস্তে সোনার আতর-দানি শিল্পীর সামনে ধরিলেন। মেঘ রাগের সহিত পাখোয়াজের গুরুগম্ভীর বোলে সমস্ত তাঁবু ধ্বনিত হইয়া উঠিল। যাদুকরের সুর আমাকে মন্ত্রমুগ্ধের মত অভিভূত করিয়াছিল। উপলব্ধি করিলাম, নোংরা আমোদের সহিত ধ্রুপদের যোগ নাই। ঠুংরি গজল মনকে নাড়া দেয় বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী চঞ্চলতা মাত্র। ওস্তাদের গান থামিতেই তরুণ জমিদার কালবিলম্ব না করিয়া অত্যন্ত রসাল সুরে বলিলেন, এইবার মিস্‌ ক একটা গাইবেন। মিস্‌ ক স্থানীয় দেশী কলেক্টর-দুহিতা, সবে তখন তিনি বাগ্দত্তা। ফিয়াঁসে সহ শিকার দেখিতে আসিয়াছেন। প্রথমে তিনি দেহবস্ত্র যথাসম্ভব অসংযত করিয়া লইলেন, তাহার পর ভ্রু উত্তোলন করিলেন। নিমিষে উহা আঁকিয়া বাঁকিয়া উদরশকরের মত নাচিয়া লইল। বলিলেন, "গান, দেখুন, আমি জানি না।" আমি মানিতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু যে ভাবে তিনি হারমোনিয়ামের দিকে

হেলিতেছিলেন তাহাতে বুঝিলাম ভগ্নোক্তিতে মহিলার নিজেরই বিশ্বাস নাই। গান অর্থে কতকগুলি শব্দের সমাবেশ ও শিল্পীর রসোপযোগী করিয়া প্রকাশ। শব্দ কি ভাবে দেখা যাইতে পারে বুঝিতে পারিতেছিলাম না, তবে আধুনিক আর্টের স্রষ্টারা অনেক কিছুই নূতন করিতেছেন। প্রাচীন ও নূতনের টানা-পোড়েনে গান ও সুর প্রত্যক্ষ করা যাইবে তাহাতে আতঙ্কিত হইবার কি আছে। আমি কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। মহিলা গান ধরিলেন—'সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে···'

খাস দিল্লীর তবলচি, আধুনিকাদের সহিত কখনও সঙ্গত করে নাই, বাজাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সঙ্কেতে রাজাবাহাদুর প্রয়োজন নাই জানাইলেন, কিন্তু তবলচি সঙ্কেত বুঝিতে পারিল না। অথচ কি বাজাইবে ঠিক করিতে পারিতেছিল না। অবশেষে বেপরোয়া হইয়া কাহারবার আশ্রয় লইল। গানের প্রাণবান গতি ইচ্ছামত চলিয়াছে, মাত্রার বন্ধনে সে বন্দী হইতে চায় না। যদিও বা হঠাৎ গায়িকার অজ্ঞাতে তাল মিলিয়া যায়—পরমুহূর্ত্তে ভাব তেজিয়ান হইয়া ওঠে, ফলে সুর তাল ও কথার মাঝে বিপ্লব আসিয়া পড়িল, কেহ কাহাকেও অধীনে আনিতে পারে না।

একবার, দুইবার, তিনবার কপাল মুছিয়াও তবলচি সুর ও তালের দ্বন্দ্ব মিটাইতে না পারিয়া হতাশায় জিজ্ঞাসার সুরে বলিল, "ইয়ে কেয়া সুর হ্যায়?" তাহার পরই একগ্লাস জল চাহিয়া বসিল।

মিস্ ক গানও থামাইতে চান না, আমিও উঠিবার ফাঁক পাই না।

সঙ্গীতে যথেষ্ট আকর্ষণ থাকিলেও শিকারে অভিজাত-সুলভ গোলমাল আমি কখনও পছন্দ করিতাম না। একটা বাঘ মারিতে পনেরটা হাতী, তাহার উপর যত রাজ্যের লোক, যেন বরযাত্রী হইয়া আসিয়াছি। আমার মত বুনোর পক্ষে এই জাতীয় মৃগয়া সমর্থন করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তথাপি রাজাবাহাদুরের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই। মেঘ রাগ আমার হিংস্র প্রকৃতিকে প্রায় ঠাণ্ডা করিয়া আনিয়াছিল—বনের হরিণ শুনিতেই অন্তরের বুনো সজাগ হইয়া উঠিল। ওৎ পাতিয়াছিলাম, একবার গান থামিলে হয়। হঠাৎ এক্সেলেন্ট ইত্যাদি বিশেষণের বন্যা হইতেই বুঝিলাম, গান থামিয়াছে; কিন্তু ভয় ছিল, আবার ধরিতে কতক্ষণ। রাজাবাহাদুর অভ্যাগতদের লইয়া এত ব্যস্ত যে তাঁহার নিকটে যাওয়া অসম্ভব। অগত্যা তাঁহার অনুমতি না লইয়া ক্যাম্পের বাহিরে আসিলাম। খবরী অপেক্ষা করিতেছিল। কেটা এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া মৃত ব্যক্তিকে দেখিতে যাইব ঠিক করিলাম।

আমার জন্য নির্দিষ্ট হাতীতে উঠিলাম। পিঠে গদি ছাড়া কিছু নাই। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই জঙ্গল দেখিতে

বলিত জুতা ফট্ গিয়া

পাইলাম, অধিকাংশই শাল ও দৈত্যের মত বটগাছ, নীচে উলু ঘাস ও আগাছা। ঘাস শুকাইয়া একেবারে বাঘের গায়ের রং হইয়াছে। হাতীকে বেশীক্ষণ জঙ্গল ভাঙিতে হইল না, ভিতরে প্রবেশ করিতেই শকুনি উড়িতেছে দেখিলাম—বাঘে খাওয়া মানুষটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সময় লাগিল না। অর্দ্ধভুক্ত মৃত ব্যক্তিটি যে ভাবে ফাঁকায় পড়িয়াছিল তাহাতে বাঘের উপস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহ

আসিল। বাঘ ত কখনও নিজের শিকার শকুনি ও শিবার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য বাহিরে রাখিয়া যায় না। তবে কি জঙ্গল ছাড়িয়া পলাইয়াছে? অথচ খবরী বলিতেছে, কাল রাত্রে এখানকার লোক বাঘের গর্জ্জন শুনিয়াছিল। থাবার দাগ খুঁজিলাম, কিছুই দেখা যায় না—কাঠফাটা শুকনা মাটির জন্য। সবই কেমন অদ্ভুত লাগিতেছিল। যাহাই হউক, শবের নিকটে ডোবার দিকে মুখ করিয়া বসিবার জন্য একটি গাছ ঠিক করিয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম; তখন সকলেই মধ্যাহ্ণ ভোজনে বসিয়াছেন। এ দিকটা বাদ পড়া ঠিক নয়, আমিও একটা কোণে বসিয়া পড়িলাম।

বেলা দ্বিপ্রহর হইবে, আমরা জঙ্গলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে শিকার-নীতি লঙ্ঘনের অপরাধ স্বীকার করার সুযোগ পাইলাম। রাজাবাহাদুর আমার দিকেই আসিতেছিলেন; সমস্ত শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'আপনিই আসল শিকারী। তা দরকার হলে গাছেই থাকবেন; ও অভ্যাসটা ত আপনার অনেক দিনের পুরান।" আমি উত্তর করিলাম,"রাজসংসর্গে আমার চরিত্র ও প্রকৃতির অনেক উন্নতি হয়েছে।" তিনি নিতান্ত বালকের মত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অকস্মাৎ কলেক্টর-দুহিতা দর্শনে যেন চাবুক খাইয়া নিজেকে সংযত করিলেন। কি দুরবস্থা, ভদ্র আইন প্রাণ খুলিয়া হাসিতেও দেয় না। রাজাবাহাদুর মিস্ ক-কে তাঁহার হাতীর দিকে লইয়া গেলেন। পাশ ফিরিয়া দেখি গৌরবাবু ঠিক আমার পিছু লইয়াছেন। কি কারণে জানি না, আমার সম্বন্ধে অকপট বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। হয়ত ভাবিয়াছিলেন, প্রয়োজন হইলে আমি দৈহিক শক্তির সাহায্যেই বাঘকে কাবু করিতে পারিব, কিন্তু বাঘের এক থাবায় বুনো মহিষের স্কন্ধ যে দেহচ্যুত হইতে পারে এ খবর তিনি জানিতেন না। আমার নিকটে আসিয়া এমন গদগদভাবে চাটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন যে, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলাম—যদিও জানিতাম গাছে উঠিবার সময় তাহার কবল হইতে মুক্তি পাইব।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁবুর নিকটেই আসল জঙ্গল। অল্প সময়ের ভিতর আমরা গন্তব্য স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। 'জঙ্গল ভাঙ্গার দরকার নাই' রাজা বাহাদুরকে আগেই বলিয়াছিলাম। তিনি নিজেও তাহা জানিতেন, তথাপি বহুদূর হইতে বিটিং-এর হুকুম দিলেন। আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার দিকে তাকাইলাম। সোজা কথায় দাঁড়ায়, বাঘ আমার জন্যই ছাড়িয়া দিলেন—জঙ্গল ভাঙ্গা অপর নিমন্ত্রিতদের আমোদ দেওয়ার অছিলা মাত্র। মনে মনে রাজাবাহাদুরকে সশ্রদ্ধ নমস্কার করিলাম। তিনি নিজে ভাল শিকারী। শিকারীর মন জঙ্গলে ঢুকিলে কি হয় আমি জানি।

তথাপি এই উদারতা! নিজেকে স্বার্থপর মনে হইতেছিল। একবার ভাবিলাম, রাজাবাহাদুরকে ডাকিয়া আনি, তাঁহার জঙ্গলের বাঘ তিনিই মারুন; আবার ভাবিলাম, এখন সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তনের সময় নাই।

আমরা গাছের নিকটে আসিয়া আশ্চর্য্য হইলাম—শব সেখানে নাই। ভুতুড়ে কাণ্ডের মত লাগিল। দূরবীণ চোখে লাগাইয়া স্থানটি পরীক্ষা করিলাম, শবের পাশে উলুঘাস খানিকটা থেতলাইয়া গিয়াছে, অথচ বাঘের থাবার চিহ্ণ নাই। আমি নামিতে যাইতেছিলাম, কেটা আমাকে স্পর্শ করিল, সে জানিত উত্তেজনায় আমি কতটা মরিয়া হইতে পারি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দিনের বেলা এত লোকের গণ্ডগোল সত্ত্বেও যে বাঘ খাদ্যের আশে পাশে ঘোরে, সে কোথায় লুকাইয়াছে তাহা বলা শক্ত। তাহার উপর আটদশ ফুট খাড়াই ঘাস। মৃত মানুষটির লুক্কায়িত স্থান বাহির করিতে না পারিলে নির্দ্দিষ্ট গাছে ওঠার কোন মানে হয় না। বেলাও পড়িয়া আসিতেছিল। জঙ্গল ভাঙ্গা সুরু হইয়াছে কিন্তু কোন স্টপ্ স্ গাছে ওঠে নাই। স্থানীয় লোকের ধারণা, নরখাদকটি নাকি যাদু জানে। দূরে ছোট গাছ সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—মাহুতের ছেলে, ধৎ ইত্যাদি আদেশ শুনিতে পাইতেছি অথচ বাঘের সাড়া নাই। ভাল ঠেকিতেছিল না।

রাইফেল ভরিয়া দৃঢ়ভাবে গৌরবাবুকে কেটার সহিত বসিতে বলিলাম। নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তিনি আদেশ মানিলেন। কেটাও দো-নলা লইয়া প্রস্তুত হইল।

মাহুতের অভিজ্ঞতা ছিল, সে হাতীকে উলুখড়ের দিকে আগাইয়া দিল। সামান্য অগ্রসর হইতেই সে মাটিতে শুঁড় ঠুকিতে আরম্ভ করিল। তাহার সমস্ত দেহে কম্পন অনুভব করিলাম। হঠাৎ বিকট চীৎকার করিয়া শুঁড় উঠাইল, তাহার পর পা ঝাড়িতে আরম্ভ করিল—সামনেই দেখি মৃত ব্যক্তি পড়িয়া আছে—কিছুক্ষণ আগে ঊর্দ্ধ অঙ্গ প্রায় গোটা

ছিল, এখন দেখি একদিককার পাঁজরা একেবারে নাই—কিছু আগেই বাঘ এইখানে খাইতে বসিয়াছিল—মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া চার পাশ ভাঙ্গিতে বলিলাম। অনতিবিলম্বে বেশ খানিকটা জায়গা পরিষ্কার হইয়া গেল, অথচ বাঘের কোন চিহ্ন নাই, হাতী কিন্তু নিশ্চিতভাবে তাহার উপস্থিতি সঙ্কেত করিতেছে। ফিরিয়া আবার আমাদের নির্দ্দিষ্ট গাছের নিকট আসিলাম—সেখান হইতে পরিষ্কৃত জঙ্গল চমৎকার দেখা যায়। কেটাকে সব সরঞ্জাম লইয়া গাছে উঠিতে বলিলাম। সে বিনা দ্বিরুক্তিতে আজ্ঞা পালন করিল। উঠিবার সময় দেখিলাম সে পুরান কায়দায় অটোমেটিক পিস্তল ও কুকরি যথাস্থানে রাখিয়াছে। পিছনে মোটা ওভার কোট ও পানীয়, কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। গৌরবাবু তাঁহার বিরাট গোঁফ একেবারে আমার গালে ঠেকাইয়া শিশুর মত কাতর স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিও কি গাছে উঠবেন? এ কি কাণ্ড! আমাকে একলা ফেলে আপনারা কি করছেন।" কিছু না বলিয়া হাওদা হইতে হোরাইজেন্ট্যাল্ বারে ঝোলার মত ডাল ধরিয়া এক দোলায় যখন কেটার উপর ডালে উঠিয়া গেলাম তখন গৌরবাবু আমাকে কি ভাবিতেছিলেন জানি না, ডালে বসিয়া দেখি তাঁহার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে—একটি কথা উচ্চারণ না করিয়া হাওদার পাদানিতে নামিয়া বসিলেন। তাহার পর পাঞ্জাবী খুলিয়া মাথা ঢাকিলেন—হাতী একটু নড়িতেই ক'নে বৌ-এর মত মুখ নত করিলেন। আমার মজা লাগিতেছিল—রাজ-সংসর্গে আসিলে কতরকম জীবের সহিত পরিচিত হইবার সুবিধা পাওয়া যায়। ইসারায় মাহুতকে লাইনে হাতী লইয়া যাইতে আদেশ করিলাম। অপর দিক হইতে তখনও জঙ্গল ভাঙ্গার শব্দ শুনিতে পাইতেছি। ইতিমধ্যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে—ঝড় উঠিবার পূর্ব্ব লক্ষণ। দিনের শেষ আলো প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যার আলো-আঁধারী আমাদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিতে আরম্ভ করিল। ভরসা ছিল, শীঘ্রই পূর্ণিমার চাঁদ উঠিবে। মাঝে মাঝে জোনাকির ক্ষীণ আলো; দাদরী জলো হাওয়ার সুরে সুর মিলাইয়াছে। জঙ্গল ভাঙ্গার শব্দ আর শুনিতে পাইতেছি না। হঠাৎ ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক থামিয়া গেল, শুকনা পাতার উপর মস্ মস্ আওয়াজ। উভয় শব্দ লক্ষ্য করিয়া বামে তাকাইলাম—একজোড়া খরগোস। কিছুক্ষণ বাদে আবার খস্ খস্ শব্দ—পাতার উপর গুরুভার জানোয়ারের পদবিক্ষেপ মনে হইল—রাইফেল ঠিক করিতে দেখি প্রকাণ্ড বরাহ, বিরত হইলাম। কেটা জানিত আমরা বরাহ শিকারে আসি নাই।

দুই-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কেটা ওভারকোট আমার পিঠে ফেলিয়া দিল, সঙ্কেতে জানাইলাম এখন নড়া চড়া ভাল নয়। চাঁদের আলো ও কোয়াসায় একটি ঘোলাটে পর্দ্দার সৃষ্টি হইয়াছে। চলন্ত জানোয়ার দেখিবার পক্ষে ইহা মস্ত সহায়। আমরা একভাবে বসিয়া রহিলাম। বাঘের আচরণ ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না। কেটাকে বলিলাম যে সমস্ত রাত গাছে থাকতে হইবে, পালা করিয়া জাগিতে হইবে। যে ঘুমাইবে সে ডালের সহিত নিজেকে বেল্ট দিয়া বাঁধিয়া লইলে অনেকটা নিরাপদ হইবার সম্ভাবনা আছে। সময় ক্রমে রাত্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টিও পড়িতেছে; শীতকালের ঠাণ্ডা হাওয়া গরম শার্ট ভেদ করিয়া কাঁপুনি লাগাইতেছিল। কেটাকে ইসারা করিতেই ফ্লাস্ক খুলিয়া ব্র্যাণ্ডি দিল। তাহাকেও খাইতে বলিলাম। হঠাৎ কেটা সজোরে আমার পিঠে এক চড় মারিল—সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথার খুলি উড়াইয়া দিব ভাবিলাম—সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমার পায়ের তলার ডাল দেখাইল—প্রকাণ্ড সাপ—ছিপ্ ছিপে আকার দেখিয়া অনুমান করিলাম লাউডগা। কেটার চড় খাইয়া আমার পিঠ হইতে ছিটকাইয়া নিচের ডালে পড়িয়াছে এবং তথা হইতে নীচের দিকে নামিবার চেষ্টা করিতেছে।

ভয়, উত্তেজনা ইত্যাদির একত্র যোগে সময়ের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। নিকটবর্ত্তী গাছের নীচুডালে একটি পেচক বসিতে গিয়া উড়িয়া পালাইল; পাখার আওয়াজে নিস্তব্ধতায় ব্যাঘাত পড়িতেই মনে হইল, শেয়ালের সহজ ডাক শুনি নাই। খটকা লাগিল, তবে বাঘ নিকটেই আছে নাকি। সন্দেহ হইল—থাকিলে নিশ্চয় এতক্ষণ আসিয়া পড়িত—কারণ জল খাইবার একটি মাত্র ট্র্যাক—আমরা সেই মহড়াই আগলাইয়া আছি। বাঘের অদ্ভুত চরিত্র আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল—কেটাকে আর খানিকটা ব্র্যাণ্ডি দিতে বলিলাম। সমস্ত জঙ্গলে একটি পোকার পর্য্যন্ত সাড়া নাই—ঝিঁ ঝিঁ হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে। অতি নিকটে ফেউ-এর ডাক শুনিলাম, কেটা আমার গাত্র স্পর্শ করিল, দেখিলাম

পাশের আগাছা ভীষণ ভাবে নড়িতেছে। কই, কিছু তো দেখা যায় না। নীচের দিকে মুখ নামাইতে দেখিলাম, বাঘ একেবারে আমাদের গাছের তলায় আসিয়াছে—কখন কি ভাবে এবং কোন্ দিক দিয়া আসিল ভাবিবার সময় ছিল না। চোখ দুইটি যেন জ্বলন্ত টিকা, উপর দিকে তাকাইয়া আছে। বুঝিলাম, গন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হয় নাই, আমাদের উপস্থিতি অনেক আগেই জানিতে পারিয়াছে। এমন জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ভাইটেল পার্ট আন্দাজ করা শক্ত। শবের দিকে অগ্রসর হইলে সমস্ত শরীরটি দেখিতে পাই, কিন্তু ও দিকে তার চেষ্টা মাত্র নাই। হঠাৎ সামনের দুই পা গাছের উপর তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, মনে হইল উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। কিছুক্ষণ আঁচড়াইয়া নীচে নামিল। গাছটি একবার প্রদক্ষিণ করিল। ইহার ভিতর এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে সুবিধা মত পাইলাম না। হয় গাছের ডাল আসিয়া বন্দুকের নলের সামনে পড়ে, নয় এক গুলিতে শেষ করিবার মত উপযুক্ত স্থান দেখিতে পাই না। ভুল জায়গায় গুলি করিয়া এত বড় বাঘকে ক্ষেপাইয়া তুলিবার ইচ্ছা ছিল না। হঠাৎ সমস্ত জঙ্গল প্রতিধ্বনিত করিয়া বাঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল—তাহার পরেই লাফ মারিয়া সামনের ঝোপে চলিয়া গেল। এই বিচিত্র আচরণের কারণ অনুমান করিতে পারিলাম না।

সাপ দেখিয়া বাঘ ভয় পায় না ত?—লাউডগা সাপটিই হইবে। দুই-এক মিনিট এইভাবে কাটিল। ভাবিলাম, বাঘ আর এদিকে আসিবে না। অকস্মাৎ বজ্রনাদের মত হুঙ্কার দিয়া বাঘ ঝোপ হইতেই লাফ মারিল। এবার তার থাবা কেটার পায়ের ঠিক এক হাত তলায় পড়িল। আবার নিমেষে কোথায় লুকাইল। অনেক মানুষ-খেকো বাঘ দেখিয়াছি, কিন্তু ইহার চরিত্রের সহিত তাহাদের মিল নাই। আমরা ছাড়া আর কোন দিকে তার লক্ষ্য নাই—আচরণ দেখিয়া মনে হইতেছিল, গোড়া হইতে গাছে ওঠা পর্য্যন্ত সব কিছুই সে দেখিয়াছে—অথচ দুপোর বেলা আক্রমণ করে নাই কেন? অমন সুবিধা পাইয়া ছাড়িয়া দিল কেন? আবার সামনেই ফেউ, উত্তেজনায় উন্মাদের মত হইয়া উঠিলাম। বাঘের পিছু লইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কেটা জোরে হাত ধরিল। আমি সজোরে তাহার গণ্ডে এক চড় বসাইয়া দিলাম। এক মুহূর্ত্তের জন্য বেহুঁসের মত হইয়াছিল, সামলাইয়া লইয়া আমার পা ধরিল—সেদিকে দৃকপাত করিলাম না, মাটিতে নামিব ঠিক করিলাম। হয় বাঘ মরিবে, না হয় আমি মরিব। কোন কথা না বলিয়া নামিবার সময় কেটার কোমর হইতে পিস্তল ছিনাইয়া লইলাম। এবার আপত্তি করিল না। সে জানিত কোন ফল হইবে না। নিজেও দো-নলা লইয়া আমার সহিত মাটিতে নামিল। এক সেকেণ্ডও অতিবাহিত হয় নাই দেখিলাম, সামনের ঝোপ নড়িয়া উঠিল—বাঘ আমাদের সামনে দাঁড়াইয়া—তাহার গর্জ্জনে সমস্ত জঙ্গল কম্পিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, বধীর হইলাম, হৃদয়ের স্পন্দনক্রিয়া বন্ধ হইবার মত হইল, চক্ষুর পলক পড়িবার পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিলাম, বাঘ মাটিতে নাই—শূন্যে উঠিতেছে।

এই সব ঘটনা মুহূর্ত্তের ভিতর ঘটিতেছিল। বাঘ লাফ মারার সঙ্গে সঙ্গে কেটা পরের পর দুই নালার গুলি চালাইল। লক্ষ্য করিবার অবস্থা আমার ছিল না, সম্পূর্ণ যে জ্ঞান ছিল তাহাও বলিতে পারি না, যতটুকু মনে পড়ে তাহাতে পিস্তলের ঘোড়া বহুবার টিপিয়া ছিলাম, তাহার পর কল্পনাতীত ওজনের ধাক্কা সামলাইতে পারি নাই। অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলাম।

তখন রৌদ্র উঠিয়াছে, আমি ক্যাম্প খাটে শুইয়া আছি—পাশে চেয়ারে আসীন ডাক্তার ও রাজাবাহাদুর। রাজাবাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছেন?" প্রশ্নটা অদ্ভুত লাগিল—আমার হইয়াছে কি যে কেমন আছি! পাশ ফিরিতে গিয়া পিঠে অত্যন্ত বেদনা বোধ করিলাম। ধীরে ধীরে গত রাত্রের ঘটনা মনে আসিতে লাগিল। কেটার জন্য মন অস্থির হইয়া উঠিল। উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেটা কোথা—সে কেমন আছে?"

রাজাবাহাদুর উত্তর করিলেন, "তাকে হাসপাতালে পাঠান হয়েছে—জখম গভীর না হলেও সেপটিক হবার ভয় থাকায় এখানে রাখা হয় নি।" প্রথমটা মন বিশ্বাস করিতে রাজি হইল না। ভাবিলাম আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গল্প বানাইয়া বলিলেন—কেটা হয়ত বাঁচিয়া নাই। রাজাবাহাদুরের দুই হস্ত নিজের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আবার প্রশ্ন করিলাম, "সে...বেঁচে আছে ত?"

উত্তর—"আমি মিথ্যা বলি নি—তবে সে হাতে আঁচড়

খেয়েছে। এখানে ফার্ষ্ট এ্যাড সব দেওয়া হয়েছে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।” তাহার পর কি ভাবে মৃত ব্যাঘ্রসহ আমাদের জঙ্গল হইতে আনিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করিলেন। বাঘের ঘন ঘন গর্জ্জনের সহিত একাধিকবার বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া রাত্রেই সার্চ পার্টি লইয়া খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন। কোন্ গাছে উঠিয়াছিলাম মাহুত জানিত—দিকভ্রম হয় নাই। সঙ্গে অনেক উজ্জ্বল সার্চ লাইট থাকায় অল্প সময়ের ভিতর আমাদের বাহির করিতে পারিয়াছিলেন। বিবরণ শেষ করিয়া বাঘ আনিতে আদেশ করিলেন। প্রায় আট-দশ জন লোক তিনটি বাঁশে ঝুলাইয়া বাঘকে আনিল—দেখিলাম, মৃত রাক্ষসের অসাড় মূর্ত্তি। আমাকে থাবার মধ্যে পাইলেও অক্ষত অবস্থায় ছিলাম কেন—অনুমান করিলাম। লাফ মারিবার সময় শূন্য পথেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল—যে ধাক্কায় আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম তাহার পিছনে ছিল মাত্র প্রাণহীন মাংসপিণ্ডের অকর্ম্মণ্য বেগ।

এত বেলা পর্য্যন্ত ছাল ছাড়ান হয় নাই কেন জিজ্ঞাসা করিতে রাজাবাহাদুর হাসিয়া উত্তর করিলেন, “আপনার নিজের হাতের শিকার, সম্পূর্ণ জন্তুটি আপনাকে না দেখিয়ে খালপোষ করাতে পারি নি।” কোথায় গুলি লাগিয়াছে জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলাম—বাঘের দেহটা নিকটে আনিতে দেখিলাম, বন্দুক ও পিস্তলের গুলি মাথার তিন-চার জায়গায় এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া দিয়াছে, পিছনের একটি পা প্রায় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন—কেবল চামড়ায় ঝুলিতেছে। লক্ষ্য করিলাম, কেটার কুকি প্রভুকে বাঁচাইবার শেষ চেষ্টার প্রমাণস্বরূপ তখনও বাঘের পিঠে আমূল বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অস্থি ভেদ করিয়া সমস্ত অস্ত্রটি আমূল প্রবেশ করাইতে কতখানি মরিয়া হইতে হইয়াছিল, বোঝা শক্ত নয়। প্রাণের প্রতি সামান্য মমতা থাকিলে কেহ এতটা সাহস দেখাইতে পারিত না। নিজের অজ্ঞাতে চোখে জল আসিয়া পড়িল। চক্ষু মুদিত করিলাম—ক্লান্তিও লাগিতেছিল।

তিন-চার দিনের বিশ্রামে বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলাম। কেটার সংবাদ রাজাবাহাদুর সওয়ার দ্বারা আনাইয়াছিলেন। সে ভালই আছে। আজ তার স্বহস্তে লিখিত চিঠি পাইয়াছি—আমাকে দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে—আমি যে বাঁচিয়া নাই, একথা সে লিখিতে পারে নাই; কিন্তু সন্দেহের আভাষ অনেক স্থলেই সুস্পষ্ট।

সপ্তাহ প্রায় শেষ হইতে চলিল, রাজাবাহাদুর ক্যাম্প উঠাইতে আদেশ দিয়াছেন। একদিন সকালে ব্রেকফাষ্ট শেষ করিয়া আমরা হাতীতে উঠিলাম। এবার হাওদা ছিল না—সেগুলি গরুর গাড়ীতে পাঠান হইয়াছে—সাথী হইলেন গৌরবাবু ও তৎসহ তরুণ জমিদার। হিন্দু সমাজে জন্মিয়াছি সুতরাং সংস্কারগুলি বাদ দিয়া শিক্ষা পাই নাই। যত অঘটনের জন্য গৌরবাবুকেই নিমিত্ত করিলাম। পিছু ডাক কোন সমাজেই মঙ্গলজনক মনে করে না। গৌরবাবু ইচ্ছা করিয়া এই কার্য্যটি করিয়াছিলেন। শিকারে বাহির হইবার সময় এক ঘণ্টা ধরিয়া চুল আঁচড়াইতে কে মাথার দিব্যি দিয়াছিল। প্রতিশোধ লইবার জন্য সুযোগ খুঁজিতেছিলাম।

সন্ধ্যার প্রারম্ভেই আমরা রাজপ্রাসাদ দেখিতে পাইলাম। আর কিছু দূর অগ্রসর হইতে পারিলেই জলার পচা পাঁক অতিক্রম করিয়া পাকা রাস্তায় উঠিতে পারি—এমন সময় সামনের হাতীর সহিত আমাদের হাতীর কি মনোমালিন্য ঘটিল। দুই হাতী ফিরিয়া দাঁড়াইতেই আমাদেরটা এমন গা ঝাড়া দিল যে, তরুণ জমিদার ও গৌরবাবু চারজামা হইতে (নীচু তক্তপোষের মত বসিবার আসন) ছিটকাইয়া পাঁকে পড়িলেন। ভাগ্যক্রমে পিছনে পড়িয়াছিলেন তাহা না হইলে বিপদের সম্ভাবনা ছিল। ইতিমধ্যে অপর হাতী রণে ভঙ্গ দিয়া লাইনে যোগ দিল। আমাদের হাতী ঠাণ্ডা হইয়াছে। ফিরিয়া দেখি ডুব জল না হইলেও গৌরবাবু হাবুডুবু খাইতেছেন, আর তরুণ জমিদার ‘বাঁচান বাঁচান’ বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। আমি বেশ খুশী হইয়া উঠিলাম। এই জাতীয় নব্য তরুণদের উপর জাতক্রোধ ত ছিলই, অধিকন্তু গৌরবাবু পাঁকে হাবুডুবু খাইতেছেন দেখিয়া ভারী একটা পাশবিক আনন্দ বোধ করিতেছিলাম। বেশীক্ষণ এভাবে রাখা সুবিধার নয় ভাবিয়া মাহুতের পাগড়ী পাক দিয়া নীচে নামাইয়া দিলাম। উহার সাহায্যে দুইজনকেই পরে পরে ঝুলাইয়া তুলিলাম। গৌরবাবু হাওদায় উঠিয়াই তরুণ জমিদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার চুলটা ঠিক আছে ত?” আমি দেখিলাম, চুল যে অবস্থাতেই থাক, উহা ডেকোরেশন লইয়া উঠিয়াছে। বলিলাম, “গৌরবাবু, আপনার মাথায় জোঁক—” বলিতেই তিনি প্রায় অজ্ঞান হইবার জোগাড় করিতেছিলেন। আমি পাগড়ীর সাহায্যে সেগুলি ফেলিয়া দিলাম। তাহার পর গৌরবাবু কর্ণ ও নাসিকা মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। আমার মনে হইল, নাক এবং কানও জোঁক বাদ দেয় নাই—জিজ্ঞাসা করিলাম, “বড্ড জ্বালা করছে?” তিনি উত্তর করিলেন, “জ্বালা—জ্বালা না মশাই, এই নাক কান মলছি—আর কখনও আপনাদের সঙ্গে শিকারে আসব না।” আমি বলিলাম, “আপনার আসা উচিত নয়, কারণ জঙ্গলের মধ্যে চুল সামলান কষ্টসাধ্য ব্যাপার।” তরুণকে বাইরে কিছু বলিলাম না, কিন্তু মনে মনে বলিলাম, “তোমরা চিড়িয়াখানায় আরাম কেদারায় বসিয়া শিকার অভ্যাস করো না কেন?”

মোহ-মুক্তি

নাটক

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ষোড়শ দৃশ্য

স্থান—ব্রজ লাহিড়ীর বাড়ী

সময়—বৈকাল

উপস্থিত—অপর্ণা, কদম, কমলা (অপর্ণার ছোট বোন) আজ দু'দিন হ'ল এসে রয়েছে।

অপর্ণার দিকে চাইলেন

কদম। (কমলার প্রতি) দুদিন দেখচো তো দিদিমণি, দল বেঁধে তোমার দিদিকে সব দেখতে আসবার আর বাহবা দেবার ঘটা! অ্যাতো আপনার লোক যে কোথায় ছিল জানতুম না! আবাগিরে পাগল করলে—

কমলা। সত্যি, কদমদি—এ কি! দুদিনেই যে পালাই পালাই ডাক্ ছাড়িয়েছে। দু'দণ্ড স্থির হয়ে নিজেদের দু'টো সুখের দুঃখের কথা কইবার ফুরসৎ দেখি না! মাঝির আজ আসবার কথা (অপর্ণাকে) চলো দিদি, দিনকতক খড়দায় থেকে, শ্যামসুন্দর দেখে, একটু শান্ত হবে চলো। এ যে অসহ্যি! এক্ তরপের মিষ্টি কথার ছড়াছড়ি, আর এক তরপের মিষ্টি মুখ করাবার বাড়াবাড়ি, এ কি বারোমাস চলবে নাকি? রক্ষে করো—

কদম। আমিও তো বলচি দিদিঠাকরুণ। মানুষ না খেয়ে বরং বাঁচতে পারে, কিন্তু নিত্যি বোকা বানানো সইতে পারে না। তার চেয়ে দু'দিন হয়ে এসো—

কমলা। না দিদি, এতে শরীর তো যায়ই গঙ্গামণ্ডলও বিকিয়ে যায়। উনি কিছু কিছু শুনেই তো তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে বিশেষ ক'রে আমাকে পাঠিয়েছেন। তুমি যেদিন বলবে সরোজ রেখে যাবে।

মাঝি। (বাইরে থেকে ডাক্) মাঠাকরুণ, আমি নৌকো নিয়ে এসেছি। দেরি করবেন না।

কমলা। একটু দাঁড়াও ময়েশ, আমরা এলুম বলে'—

অপর্ণার দিকে চাইলেন

অপর্ণা। কদম, তবে (চোখে জল ছলছলিয়ে এলো) আমি··

এই বলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে স্বামীর ফটোর নীচে গলবস্ত্র হ'য়ে দীর্ঘক্ষণ প্রণাম ক'রে সজল নেত্রে করজোড়ে স্বামীর অনুমতি প্রার্থনা

কদম কমলাকে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখালে। কমলা ও কদম উভয়েই চোখ মুছলে এবং অপর্ণা উঠতেই সরে এলো। অপর্ণা বাইরে আসতেই কমলা তাঁর হাত ধরে

কমলা। এসো দিদি, বেলা হয়ে যাবে। যেদিন বলবে আমি সেই দিনই তখুনি নিজে সঙ্গে এসে রেখে যাবো—এসো।

এক পা এক পা করে এগুতে এগুতে কদমকে দেখে তার চক্ষু জলে ভেসে গেল

কদম। ওকি' দিদিমণি? শ্যামসুন্দর দেখবার কথা না হলে আমি কি তোমায় যেতে দি?

অপর্ণা। (সাশ্রুনেত্রে) কদম—ও ঘরটি

আর বলতে পারলেন না, কান্না কণ্ঠ রোধ করলে

কদম। (অঞ্চলে চক্ষু মোছাতে মোছাতে) দিদিমণি, তুমি কিছু ভেব না, ও-ঘর আমারও ঠাকুর-ঘর। ওর সব ভার আমার ওপর রইলো···

অপর্ণা। কদম্, তোকে আর যেতে হবে না, তুই বাড়ীতেই থাক্।

কদম উভয়কে প্রণাম করলে। তারা চলে গেল। কদম উদাস্ দৃষ্টিতে, যতক্ষণ দেখতে পেলে, দাঁড়িয়ে রইলো।

সপ্তদশ দৃশ্য

স্থান—ননীর শ্বশুর বাড়ী (কলিকাতা)

সময়—বৈকাল

উপস্থিত—ননীবালা (নন্দর ভগ্নী) ও নন্দ

নন্দ ভগ্নীকে দেখতে মধ্যে মধ্যে আসে। ডাক্তারী পাশের খবর বেরিয়েছে ভগ্নীকে সংবাদ দিতে এসেছে

নন্দ। আজ কয়দিন হ'ল পাশের খবর বেরিয়েছে—পাস হ'য়েছি ভাই। বাড়ী যাব যাব করছি, তোকে খবরটা দিতে এলুম। ভাবছি, তোকেও নিয়ে যাই। বাবা, মা কত খুসী হবেন। তোর ভাসুরকেও সেই কথা জানাতে এলুম।

ননী। (মুখে হাসি ও আনন্দের ভাব এনে) এর চেয়ে আনন্দের খবর আর কি আছে ভাই। এইবার কিন্তু বে করতে হবে, আর না বলতে পারবে না দাদা। সেই সময় যাব—নিয়ে যাবার কথা এখন তুলনা ভাই। আমার এখন যাওয়া হবে না দাদা। এই মাস দুই আগে গিয়েছিলুম। এক হপ্তার জন্যে গিয়ে একমাস কাটিয়ে আসতে হ'য়েছে।

নন্দ। কেনো, অসুখ করেছিল বুঝি ?

ননী। না—সে অনেক কথা দাদা, এর পর শুনোখন্। নিয়ে যাবার কথা এখন বলা হবে না···

নন্দ। কেন রে, পাঁচ-সাত দিনের জন্যে যাবি, আবার সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবো।

ননী। (আর চাপতে না পেরে) আমার যাওয়া বোধ হয় শেষ হ'য়ে গিয়েছে দাদা, আমি যে কোথায় যাবো, এখনো—

নন্দ। (বিচলিত হ'য়ে) কি বলছিস ননী, আমি যে বুঝতে পারছি না! আমাকে সব খুলে বল্ ভাই—

ননী। সে শোনবার কথা নয় দাদা। তুমি তো জানো, আমাকে এঁরা কতো ভালোবাসেন। ভাসুর আমার দেবতা। সর্ব্বস্ব আমার হাতে দিয়ে রেখেছেন—যা কোরবো—আমি। বিষয়-সম্পত্তির দলিলপত্র, লেন্-দেন্—সব বুঝিয়ে আমার হাতে ফেলে দিয়েছেন। আমার দিনরাত তাই নি কাটে। এমন সময় ছিল না যে নিজের কথা ভাবি। বাবা সে সব জানতেন। দু'মাস আগে তিনি আমাকে এক হপ্তার কড়ারে নিয়ে যান। এঁদের হাতে সে সব বুঝিয়ে সুজিয়ে দেবার সময়ও দিলেন না; বললেন, কটা দিনের জন্তেই বা যাওয়া, সব সঙ্গেই থাক্, হুটোপাটি ক'রে বিশৃঙ্খল করিস্নি। এর মধ্যে কি এমন দরকার পড়তে পারে ?

এঁরা পাঠিয়ে দিলেন, কেবল বললেন, "বৌমার হাতে আমাদের সংসার, সাত দিনের দিন গাড়ী নিয়ে লোক যাবে আনতে।" এক হপ্তার জায়গায় একমাস কাটলো, পাঠাবার নাম করেন না। লোক দু'বার গাড়ী নিয়ে গিয়ে ফিরে এলো। আমাকে পাঠাবার মতলব বাবার ছিল না। কিন্তু আমার ট্রাঙ্কে যে-সব দলিল, কাগজপত্র, চেক্ বই, কোম্পানীর কাগজ, গিনি, টাকা ছিল, কিছুই নেই! এঁদের পথে বসিয়েছি! বিষ পেলে তখুনি খেতুম···আমার সেদিনের কথা, সে অবস্থা বুঝতে পারবে না দাদা···

নন্দ। তার পর ?

ননী। আমি যেন ভুলে ফেলে এসেছি, এই বলে' এরা ভদ্রভাবে সে সব চেয়ে পাঠান, অনেক চেষ্টা পান। শেষে, সর্ব্বস্ব যায় দেখে, আমার মত নিয়ে আইনের সাহায্য নিয়েছেন। সম্মতি না দিয়ে আমার উপায় ছিল না—এঁদের পথে বসিয়ে বেঁচে থাক···

চোখে আঁচল দিয়া কান্না

নন্দ। ও ছাড়া তোমার আর কোন্ পথ ছিল ভাই, —তুমি ঠিকই করেছ—

ননী। আমি অনেক অনুনয় বিনয় করে বাবাকে লিখেছিলুম—না দিলে আত্মহত্যা ছাড়া আমার উপায় নেই। সত্যিই নেই দাদা! বাবা কিন্তু কোনো কথায় কান দিলেন না—

নন্দ। (দাঁড়িয়ে উঠে) আমি আজই বাড়ী চললুম
ননী। ওসব কথা মাথায় এনো না—শচীন্দ্রবাবু তো কোনোদিন কিছু···

ননী। তিনি দেবতা, তা না তো···

নন্দ। ওসব মাথায় ঢুকিও না, আমার অপেক্ষা ক'রো ভাই—লক্ষীটি—

সহসা ননীর ভাসুর এটর্ণি শচীন্দ্রবাবু হাসি মুখে বারান্দা হতে হলে প্রবেশ করলেন

শচীন্দ্র। আমি সব শুনেছি নন্দভায়া, না খেয়ে যাবে বৈকি? (ননীর প্রতি) "বৌমা, কি দেবে আমাদের দাও।" (নন্দর প্রতি) তুমি যখন কিছু জান না, তখন ও-সব জেনেও কাজ নেই, কারণ তাতে মনোকষ্ট পাওয়া বা মাথা খারাপ করা ছাড়া ফল যখন নেই। ও যাদের জ্বালা তারাই ভুগুক্। তুমি ডাক্তার হয়েছ, তোমার ভাবনা কি ভাই। তোমার সম্মতি নিয়ে

একটা কথা বলে রাখছি—যদি ইচ্ছা করো—আমাদের দার্জ্জিলিংয়ের চা বাগানে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হ'য়ে দেখা-শোনা কর গিয়ে, অন্তত এ নোংরামির বাইরে থাকতে পারবে।

মানুষে ওরকম ভুল চুক্ লেগেই আছে, আমরা এটর্ণি, আকসর্ দেখছি। তুমি ওতে মাথা দিও না, দিলেও বাপ্‌কে বোঝাতে পারবে না। বোঝানই আমার ব্যবসা—আমি নিজে গিয়ে অনেক বুঝিয়েছি। দেখলুম, তিনিও কম বুদ্ধি ধরেন না। শুধু এটাই নয়—তেরস্পর্শ জুটিয়েছেন—কে চন্দ্র চৌধুরী আছেন, তাঁর মহাল্, ব্রজ লাহিড়ীর বিধবার সম্পত্তি—এট্‌সেট্‌রা রে ভাই!

নন্দ। (দুঃখের হাসির সঙ্গে) যা শুনতেই হবে, যিনি সত্য আমাকে ভালবাসেন—তাঁর মুখেই শোনা ভালো—

শচীন্দ্র। ব্রজ লাহিড়ীর সম্বন্ধী নাগপুরে থাকেন, নামী উকীল। তিনিও সব শুনে কলকেতায় এসেছিলেন। মিত্র মশায়ের বিরুদ্ধে কি কি ক'রে গিয়েছেন শুনলুম। ওঁর জীবনের ইতিহাস, সঙ্গ, সংস্রব সব সংগ্রহ করিয়েছেন, আদালতে প্রকাশের জন্যে। তাতে অনেক কিছু ব্যাপার আছে যা কোনো মতেই বেরুনো উচিত নয়। তাঁর সঙ্গে আমার অল্পক্ষণের দেখা, a most intelligent and determined chap—আমার ভয়, তাঁকেই। আমি তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছি, কার্য্যোদ্ধারের অতিরিক্ত কিছু না করেন, সেটা তাঁর ছেলেমেয়েকে affect করবে—যারা এ সব কিছুই জানে না এবং সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। কি করব নন্দ, সব যায় দেখে আমাকেও যে শেষে আদালতের সাহায্য নিতে বাধ্য করলেন! তাঁর তেমন কিছু অভাব নেই—অথচ এ মতিগতি কেন যে তাঁর মাথায় ঢুকলো—ভেবেই পাই না—

যাক্, সে যা হয় হবে, যা ঘটবার কেউ তা রোধ করতে পারবে না। চলো, এখন বাড়ির ভেতর চলো, আমার খিদে পেয়েছে।

এই বলে' নন্দর হাত ধরে শচীনবাবু অন্দরে প্রবেশ করলেন। নন্দর শরীরের রক্ত যেন কোথায় সরে গিয়েছে—মুখ যেন মৃতের মুখ।

আদুরী ঝি আর নোটো খানসামার প্রবেশ

আদুরী। আহা, দাদাবাবু হাসতে হাসতে খুশীর খবর দিতে এলেন, তাঁর কি অবস্থাই হোলো! এমন ছেলের অমন পোড়ার মুকো বাপ্! অমন রূপ পাঁচ মিনিটে যেন বদলে গেছে! দেখা হোলো—একটা কথা কইতেও পারলেন না। দেখে আমার বুকটা যেন ফেটে গেলো! সে হাসি, সে মিষ্টি কথা…

নোটো। থাম্ থাম্ আদুরি, তোদের কেবল অন্যের রূপ আর মিষ্টি কথার ওপরেই দিষ্টি…

আদুরী। না—তা কেনো হবে! দিনরাত হাঁ কোরে তোর ওই মালদোয়ে মুখ দেখি—

নোটো। (মাথার তোয়ালেটা খুলে সহাস্যে) এই দ্যাখ্, নগদ চারগোণ্ডা নেছে! পয়সা ফেললে আবার রূপ ফেরাতে কতক্ষণ!

আদুরী। দেখি—দেখি—সত্যি বটে। তোর এমন ছিরি তবে লুকিয়ে রাখিস কেনো? (পেছনটা প্রায় কামানো দেখে সচিন্তভাবে) আবার কে মোলো! দ্বিতীয় পক্ষের সম্পর্ক বুঝি? আদ্দেক কামালি যে বড়ো!

নোটো। পাড়াগেঁয়ে পেত্নী কি-না—এর কদর কি বুঝবি। নে, শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর ঝাড়-পোঁছ সেরে নে। এখুনি সব এসে পড়বেন।

আদুরী। তা সত্যি, দাদাবাবু যা খাবেন তা তো বুঝতেই পারছি—আহা…

নোটো। তোর এতো আহা উহু কেনো বল্ দিকি! ছোকরাদের ওপর দরদ যে ভারি! (ব্যস্তভাবে) ওরে চল্ চল্ ওই আসছেন সব—

উভয়ের প্রস্থান

শচীন্দ্রবাবু নন্দর সঙ্গে কথা কইতে বাইরে এলেন

শচীন্দ্র। তুমি তাঁর শিক্ষিত সাবালক ছেলে, তোমার কথার শক্তি ও মূল্য স্বতন্ত্র। তুমি ধীরভাবে তাঁকে এসব ব্যাপার থেকে নিরস্ত করতে পারবে। তোমার কথা শুনতে তিনি বাধ্য, নিশ্চয় শুনবেন।

নন্দ। চেষ্টা পাবো…আপনারা ননীকে দেখবেন—সে বেচারী—

স্বর বন্ধ হয়ে গেল

শচীন্দ্র। বউমার জন্যে কিচ্ছু ভেব না ভাই, তিনি

আমার মা। আমাকে কোনো কষ্ট দেবেন না, দিতে পারেন না। ভয় নেই…

নবী দরজার অন্তরালে দাঁড়িয়ে ছিল। আঁচলটা
দুহাতে চোখে চেপে ধরলে
শচীন্দ্র বাবুকে নমস্কার ক'রে জড়িত পদে
নন্দ বেরিয়ে পড়লো।

অষ্টাদশ দৃশ্য

স্থান—নন্দর বাসা

সময়—বৈকাল

উপস্থিত—শ্রীপতি, নন্দর জন্যে অপেক্ষা করছে। খবরের কাগজ নাড়াচাড়া করছে।

নন্দর প্রবেশ

নন্দ। (শ্রীপতিকে দেখে) এ কি! দাদা কতক্ষণ?

শ্রীপতি। (নন্দর চেহারা দেখে চমকে) এই মিনিট কয়েক হবে। তোমার পাসের সংবাদ পেলুম…তোমার অসুখ নাকি নন্দ—চেহারা এমন দেখছি কেনো?

নন্দ। (দুঃখের হাসির সঙ্গে) পাসের খবর পেয়ে…

শ্রীপতি। না, তা ঠিক্ নয় ভাই। তোমার পাস হওয়া সম্বন্ধে আমার সন্দেহই ছিল না। তবু শুনে আনন্দও যে খুব অনুভব করছি সেটাও ঠিক্। এলুম একটা অপ্রীতিকর কথা তোমাকে জানাতে আর তোমার পরামর্শ নিতে…

নন্দ। (ম্লান হাসি টেনে) দেখছি রাজ্যের অপ্রীতিকর কথাই আজ আমার জন্যে যেন অপেক্ষা করেছিলো—

শ্রীপতি। আবার কি শুনলে?

নন্দ। সে অনেক কথা দাদা! অনেকদিন যাইনি, তাই ননীকে দেখতে গিয়েছিলুম। এই সেখান থেকেই আসছি। আমি আজই বাড়ী যাবো। আপনি আগে চা আর কিছু খান।

শ্রীপতি। সে হচ্ছে। আমিও তো যাবো, এক সঙ্গেই খাওয়া যাবে। ট্রেন্ তো সেই রাত আটটার পর।

নন্দ। হ্যাঁ—কি শোনাবেন বলছিলেন…

শ্রীপতি। তোমাকে দেখে আর আমার সে ইচ্ছে নেই ভাই। চুলোয় যাক্—যা হবার হবে…

নন্দ। আপনি বলুন না, আমি proof হ'য়ে এসেছি দাদা। যা কোনো ছেলে শুনতে পারে না, আমি তা সহজে শুনে চলেছি। ভাবছি, কত আশা-আকাঙ্খা নিয়ে মানুষ জীবন আরম্ভ করবে ভাবে, সে সব কেমন অভাবনীয়-ভাবে এক মুহূর্ত্তে শেষ হ'য়ে যায়! মরে' যাওয়া স্বতন্ত্র কথা—ঢের ভালো; কিন্তু একি miserable end! যাক্ আপনি বলুন্—

শ্রীপতি। তোমাকে দেখে, তোমার কথা শুনে আমারই বা আশা-আকাঙ্খার লোভ কেনো থাকবে ভাই! এটা তোমার একটা ভীষণ পরীক্ষার অবস্থা। দুর্ব্বল বা হতাশ হলে চল্‌বে না ভাই। কাকাকে সব খোলাখুলি ভাবে অসঙ্কোচে জানাতে হবে—

নন্দ। চেষ্টা করবো বটে—কিন্তু তাঁকে তো চিনি। কোনো ফল হবে ব'লে মনে হয় না এবং সে exposure-এর পর আর কি আমার এখানে থাকা বা কিছু করা সম্ভব হবে? যাক্—সে যা হবার হবে। আপনার কথাটা বলুন তো—

শ্রীপতি। এর পরে সে কথা নিজের কানেই মন্দ শোনাবে; যাই হোক্, কথাটা এই—আমি ভাড়াটে বাড়িতে রয়েছি—তা বোধ হয় শুনে থাকবে। নতুন প্রাক্‌টিস্, তাতে কষ্টে সংসার চালিয়ে বাড়িভাড়া দেওয়া অসম্ভব দাঁড়াচ্ছে—দু'মাসের বাকি পড়ে গিয়েছে। আর বাকি পড়লে দিতেই পারবো না, উঠে যাওয়ার নোটিসও পাবো। তাই কাকার কাছে অবস্থা জানিয়ে থাকবার জন্যে দু'খানা আর বাইরের একখানা ঘর চেয়েছিলুম—যা তাঁর ব্যবহারে নেই। শুনলুম, বাবা আপিসের ক্যাস্ ভাঙায় হাজার দেড়েক্ টাকা দিয়ে কাকা তাঁকে বাঁচান। বাবা তাই তাঁর অংশ কাকাকে দিয়ে গিয়েছেন—

নন্দ। (ম্লান হাসিয়া) সবই তো দেখছি—এক সুরে বাঁধা! এতোগুলো আশ্চর্য্য যোগাযোগ হোলো যে কেনো আর কি কোরে সেইটে বুঝতে পারছি না! যাক্—এটা তেমন গুরুতর নয়—

শ্রীপতি। আমার দিক্ থেকে গুরুত্ব আছে বই কি ভাই। কাকার বন্ধু চন্দ্র চৌধুরী মশাই আমাকে আশ্বাস

দিয়ে বললেন—ওটা তাঁর আসল আপত্তির কথা নয়। শুনলুম—ব্রজ লাহিড়ীর বাড়ির ঝি কদম আমার কাছে আসে, দরকারেই আসে বটে, সে নাকি দুশ্চরিত্রা। কাকা তাই আমার চরিত্রে সন্দেহ করেন, যেহেতু তাতে বংশের ও তাঁর সম্মানের ক্ষতি হ'চ্ছে। আমি ও সংস্রব ছাড়লে তিনি ক্রমে তুষ্ট হতে পারেন। সে সংস্রব আমার ছাড়া চাই। যাক্, এর মধ্যে অনেক কদর্য্য কথা আছে...

নন্দ। থাক্ দাদা, শুনতে আর ইচ্ছে নেই—

শ্রীপতি। ইচ্ছা আর কার আছে ভাই, কিন্তু যেরকম দেখছি—কারো না কারো কাছে তোমাকে শুনতেই হবে। আমারও স্বার্থের কথা ভুলতে আর প্রবৃত্তি নেই। এখন তোমার কথাই ভাবছি ভাই। এসব কথা অন্যের মুখে না শুনে—এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে—যতই অপ্রিয় হোক, দু'ভায়ের মধ্যে থাকাই ভালো—

নন্দ। মাথাটা কেমন করছে—আপনি আগে খাওয়া দাওয়া করুন্, তার পর পারি তো শুন্‌বো।

শ্রীপতি। তা হলে আজ রাত্রে আর গিয়ে কাজ নেই ভাই। তোমার সব শোনাও দরকার; নিদ্রারও দরকার।

নন্দ। তবে তাই ভালো দাদা, উঠুন্।

উভয়ে উঠে পড়লেন

ঊনবিংশ দৃশ্য

স্থান—রমণ মিত্রের অন্দর

সময়—রাত আটটা

রমণ মিত্র একাকী গম্ভীর চিন্তামগ্ন।
সহসা নন্দ ঢুকে প্রণাম করলে

রমণ। নন্দ? এসো বাবা, এসো। কখন এলে? (নন্দর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ) লক্ষপতি হও—আমি দেখে যাই। সেই জন্যেই অপেক্ষা করে রয়েছি। তুমি ভাল ভাবে পাস্ হবে—সে কথা আমি আসনে বসেই জেনেছিলুম। তুমি আমার লক্ষ্মচাঁদা ছেলে! তোমার যোগ্য একটি Medical Hall, Laboratory, Dispensary-র ব্যবস্থা নিয়েই ব্যস্ত রয়েছি বাবা। অথচ আসল কাজ বজায় রেখে সব করতে হচ্ছে। আসনের সময় হ'য়েছে ব'লে চঞ্চল হচ্ছিলুম। আচ্ছা তুমি একটু বিশ্রাম করো, তোমার মাকে এইখানেই পাঠিয়ে দিয়ে আমি একান্তে যাচ্ছি। কথাবার্ত্তা পরে হবে—

নন্দ। এখন তো বাড়ীতেই আছি, তাড়াতাড়ি নেই, আপনি ব্যস্ত হবেন না বাবা—আপনার নিত্যকর্ম্ম সারুন—

রমণ মিত্র চলে গেলেন। নন্দ না ব'সে মা'র প্রতীক্ষায়
দোরের কাছে এসে দাঁড়াতেই

রাধা। (দ্রুত আসতে আসতে) নন্দ, কেমন আছিস বাবা? শরীর ভালো আছে তো? পড়ার খাটুনি আর একজামিনের ভাবনা কি কম গিয়েছে! নারায়ণ মুখ রক্ষা করেছেন, ভালো ভাবে পাশ হ'য়েছো শুনেছি। এখন বাবা দিনকতক আমার কাছে থাক্ নন্দ। আমি নিজে রেঁধে খাওয়াই।

নন্দ। (মাকে প্রণামান্তে পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে সহাস্যে)—বেশ তো মা, তাই করো—এখন তো বাড়ীতেই থাকবো।

মা। নারায়ণ তাই করুন, আমি আর ভাবতে পারি না বাবা। নিত্য তোর পথ চেয়ে দিন কেটেছে (দীর্ঘনিশ্বাস)

নন্দ। কেনো মা, এত কাতর হ'লে চলবে কেন?

মা। থাক সে কথা—এখন কি খাবি বল্ তো, আমি চড়িয়ে দিগে। রাত হয়ে যাবে, তোর ঘুমুনো দরকার। আমার ঘরেই বিছানা করি, আমার কাছেই শুবি নন্দ—

নন্দ। (নন্দ বুঝলে মা খুবই কাতর অবস্থায় কাটাচ্ছেন, মনটা ব্যথায় ভরে উঠলেও মুখে একটু হাসি টেনে এনে বললে) তাই করো মা, আমারও তাই ইচ্ছে। বাড়ি যেন বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে, স্বর্ণ ঝি আছে তো?

মা। বল্ দিকি বাবা, এত বড় বাড়ীতে একা একা এমন ক'রে আর কি থাকা যায়! স্বর্ণ আছে বোলে আজও পাগল হইনি নন্দ (দীর্ঘনিশ্বাস পোড়লো), উনি সর্ব্বক্ষণ বাইরেই থাকেন! এইবার তুই বে কোরে বউ না আনলে আমি আর থাকতে পারব না কিন্তু। হ্যাঁ, আমার ননীর খবর-টবর পাস্ তো?

নন্দ। ননীর সঙ্গে দেখা করেই তো এলুম মা... আগেকার চেয়ে একটু যেন গম্ভীর হয়েছে—বললে ভালই আছে—

মা। (চোখ মুছতে মুছতে) তার আর ভালো থাকা! কিছু শুনেই থাকবি—আচ্ছা একটা কথা বল্ তো নন্দ—কলকেতায় ডাক্তারখানা করলে ঘরভাড়া তো করতেই হয়। এখানেও তেমনি লাহিড়ী-বউয়ের ওই বাগান-বাড়ী ভাড়া নেওয়া চলে না কি?

দেখা গেল রমণ মিত্র গোপনে থেকে ছেলের সঙ্গে মায়ের কথাবার্ত্তা শুনছেন

নন্দ। কেনো চলবে না মা—খুব চলে—

রাধা। তবে এতো গোলমালে যাওয়া কেন বাবা! এ, আমার বড় খারাপ লাগছে—

নন্দ। তুমি অতো ভাবচো কেনো মা! কে যাচ্ছে গোলমালে—

রাধা। হ্যাঁ—ওকে বুঝিয়ে তাই কর্ বাবা। (চিন্তাকুল-ভাবে) কোন্‌টা বল্‌বো—একটা কি! কেনো যে ওঁর এ ভাব এলো! শ্রীপতিকে মানুষ করেছি—সে তোর দাদা! এতো ঘর পড়ে রয়েছে—

নন্দ। আমি সব শুনেছি মা। বাবা যে কেনো এসব করছেন, কি দরকার বুঝতে পারছি না। ওসব যেন মিটতে পারে কিন্তু ননীর জন্যেই...তার কাগজ-পত্তোর নাকি তাকে দেওয়া হয়নি, সে সব কোথায় আছে জানো?

রাধা। তা কি জানি বাবা! (কান্নার স্বরে) প্রাণ বোঝে না—রোজই এক জায়গা হাজার বার খুঁজি! কখন্ কি ঘটবে জানি না বাবা। পিওনের ডাক শুনলে আমার রক্ত শুকিয়ে যায় নন্দ! সে কাগজপত্তোর পেলে—

হঠাৎ ভীষণ মূর্ত্তিতে মিত্রের প্রবেশ—সকলে চমকে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন

রমণ। (হাত মুখ নেড়ে) পেলে কি করা হোতো শুনি। তোমার সেই (নন্দ রয়েছে দেখে) তাঁকে, কুটুমকে খুসী করতে দিয়ে আসতে? কেটে ফেলতুম না দু'খানা কোরে। নন্দ তোমার কেউ নয়—ননীর ভাসুর হোলো আপনার। নন্দ ননীকে খেতে পরতে দেবে না! সেখানে তার কোন্ সুখে থাকা? হাতে পাওয়া জিনিষ ফেরৎ না দিলে—মেয়ে বিষ খাবেন? খান্ না দেখি। বলা আর খাওয়া এক কথা নয়...

রাধা। তুমি তার বাপ হয়ে এই সব কথা কি কোরে ...তার অপরাধটা কোথায়? এমনিই তো তার কপাল পুড়েছে...

রমণ। সে তার বাপের বাড়ী—নন্দর কাছে এসে থাকুক না! এখানে তার দুঃখু কি?

রাধা। স্বামী না থাকলেও সেই তার আপন বাড়ী—সেইখানেই তার জোর...

রমণ। (রোষ কটাক্ষে) এই শিক্ষাই দেওয়া হ'য়েছে বুঝি?

নন্দ। মা, তুমি চুপ করো...ওঘরে যাও

রাধা। (নিজেকে কষ্টে সামলাতে সামলাতে) করছি বাবা—

চলে গেলেন

রমণ। কাল সাপিনী! তুমিই তাকে এসব শিক্ষা দিয়েছ—এসব মন্ত্র তোমারি কাছে সে পেয়েছে দেখছি! তার অংশের আড়াই লাখ টাকা তার ভাসুর ভোগ করুক, আর ননী সেখানে থেকে পেট-ভাতায় দাসীবৃত্তি করুক! রমণ মিত্তির বেঁচে থাকতে তা হোতে দিচ্ছে না! তার কাগজ-পত্র রমণ মিত্রের এই বজ্রমুষ্টির মধ্যে—বৌ-বাজারের দু'খানা দোতলা বাড়ী ননীর অংশে পড়ে—তার ভাড়া কতো জানো!

নন্দ। আমি বাড়ী এলুম কি বাবা এই সব দেখতে শুনতে! আপনি ঠাণ্ডা হোন্—মার উপরেই বা এতো রাগ করছেন কেনো? যা করবেন আপনি করবেন, মা এসবের কি বোঝেন? ননীর ভাগের বাড়ী ভাড়া কতো—মার সে সব জানবার দরকার কি বাবা। মা স্নেহবশেই কথা কইছেন মাত্র।

রমণ। তুমি চুপ করো নন্দ। এখনও তোমার সংসারের অভিজ্ঞতা আসবার অনেক দেরি।

নন্দ। (মৃদু হাস্যে) ওতে আমার লাভালাভটা কোথা? তা থাকলে মা কি সে কথা না ভাবতেন—

রমণ। থামো নন্দ! একটা বিধবা এত টাকা নিয়ে করবেই বা কি? বংশে কলঙ্ক আনার সম্ভাবনাই স্বাভাবিক।

নন্দ। (সহজ হাসিমুখে) কেনো বাবা?

রমণ। বস্ আর নয়। আমি থাকতে এ সব সম্বন্ধে কথা কইবার অধিকারী নও—

নন্দ। (বাধা পেয়ে নন্দ স্তব্ধ হয়ে গেল, বোধ হয় একটু অপমানও অনুভব করলে)

কিন্তু বাবা, আমরা বুদ্ধির বড়াই যতই করি না, ননীর অদৃষ্ট খণ্ডাতে পারি কি—পেরেছি কি? তাহলে তার স্বামীকে রাখতে পারলুম না কেনো?

রমণ। এর সঙ্গে মরা-বাঁচার কথা আসে না, বাঁচাবার চেষ্টা ডাক্তার বৈদ্যে পারে। কে কার অদৃষ্টে মরে, সেটা কেউ জানে কি? তোমাকে লক্ষপতি দেখে আমি যেতে চাই, সে জন্যে আমার জীবন পণ। ননীর স্বামীর মৃত্যুটা তো এই জন্যেও ঘটে থাকতে পারে। জগতে একদিক ভাঙে, আর একদিক গড়ে—এই নিয়ম। আমি থাকতে তোমার এ সবের মধ্যে থাকবার দরকার নেই, ভাববার দরকার নেই।

নন্দ। বাড়ী আসবার আগে ননীকে দেখতে গিয়েছিলুম। তার ভাসুর শচীন্দ্রবাবুর সঙ্গেও দেখা হয়। তাঁরা সম্ভ্রান্ত আর ধনী লোক—নিজে তিনি বড় এটর্ণী। তাঁরও জীবনপণ শুনলুম—

রমণ। (সহাস্যে) বটে! আচ্ছা—সে বোঝা যাবে—

নন্দ। না বাবা, এর সঙ্গে আরো অনেক কিছু রয়েছে—যা আমি আপনার সামনে—

রমণ। হাঁ—হাঁ, সে সব আমি শুনেছি—ওই তোমার হিতৈষিণী মা তোমার কাছে যা লাগাচ্ছিলেন—

নন্দ। না বাবা, আমি সে সব শচীন্দ্রবাবুর কাছে পূর্ব্বেই শুনে এসেছি—

রমণ। অর্থাৎ শত্রুর মুখে—

নন্দ। তা হতে পারে। কিন্তু তাঁরা লোক পাঠিয়ে সকল বিষয়ই অনুসন্ধান করিয়ে জেনেছেন। এমন কি নাগপুর থেকে লাহিড়ী মশার সম্বন্ধীকেও আনিয়েছিলেন। তিনি শচীন্দ্রবাবুর উপর লেখাপড়া কোরে সব ভার দিয়ে গিয়েছেন। শচীনবাবু অতি দুঃখের সঙ্গে বললেন—কি করি নন্দ—সর্ব্বস্ব যায়! পায়ে পড়ি বাবা, ও সঙ্কল্প ত্যাগ করুন, ভীষণ বদনাম, অপমান আর কেলেঙ্কারী ছাড়া কোনো ফল নেই, বরং অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। তাতে আমার ভবিষ্যৎ যে কি হবে ভাবতেও শিউরে উঠি বাবা। আপনি আমার মুখ চেয়ে নিরস্ত হোন্।

রমণ। ছাখ্ নন্দ—এসব আমার অনেক দিনের চিন্তা আকাঙ্ক্ষা। সব গোড়া বেঁধে রেখেছি। এ আমি করবই—কেউ বাধা দিতে পারবে না। যাক্, আমি থাকতে তোমার এখন ও সব কিছু ভাববার বা ওসবে থাকবার দরকার নেই। তুমি কেবল যে-কোনো কৌশলে একবার ননীকে এখানে নিয়ে এসো—তাকে আনা চাই-ই।

বাহিরে হারু ভট্‌চায্যির ডাক শুনে

রমণ। আসছি—দাঁড়াও—

মিত্রের প্রস্থান। নন্দ হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল।
ভিতরের দরজা দিয়া রাধারাণী প্রবেশ করিলেন

রাধা। বোঝাতে পারলি নন্দ! কি বললেন?

নন্দ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) যা শুনছি ও শুনেছি তা সবই সত্য ব'লে আমার বিশ্বাস, আমার ভয় হয় মা! অথচ তিনি দেখছি নিজের মনকে বুঝিয়েছেন এ সব তিনি আমার ভালর জন্যে, আমার ভবিষ্যৎ সুখের জন্যে করছেন। এতে যে আমার কতটা অনিষ্ট করা হ'চ্ছে, এতে যে চিরদিন আমার জীবন সকলের কাছে ঘৃণা আর উপহাসের বস্তু হ'য়ে থাকবে সে কথা তিনি একবারও ভাবছেন না মা! আমি তাঁকে চিনি—কারো সাধ্য নেই তাঁর সঙ্কল্পে বাধা দেয়। তাঁকে নিরস্ত করি কি উপায়ে? (চিন্তা) আজ রাত্তিরটা বুঝিয়ে দেখি—তার পর যা হয় কোরবো।

চিন্তিত ও উদভ্রান্তভাবে নন্দর প্রস্থান, রাধারাণী সেই দিকে ব্যথিত উৎকণ্ঠিত মুখে চাহিয়া রহিলেন

বিংশ দৃশ্য

স্থান—গ্রামের ক্লাব ঘর

সময়—সন্ধ্যা

তিনকড়ি, হিমাংশু, অনাথ, সুকেশ, বিমল প্রভৃতি উপস্থিত

বাপের সঙ্গে কথার পর অর্থাৎ রমণ মিত্রকে তাঁর দুরভিসন্ধি হতে নিরস্ত করবার চেষ্টার পর নন্দ প্রায় হতাশ হ'ল। তবু রাত্তিরটা থেকে আর একবার চেষ্টা কোরবে ভাবলে। তাতেও কোনো ফল হ'ল না।

আশা উৎসাহ না থাকায় সারাদিন বাড়িতেই মায়ের কাছে কাটালে। এখন কেবল মায়ের জন্য চিন্তা, কষ্ট, বেদনাই তাকে ঘিরে রইলো। শেষ দুঃসহ বোধ হওয়ায় বৈকালে একবার বেরিয়ে পড়লো—তখন সন্ধ্যাদীপ জ্বালা হ'য়েছে।

উদাস, মনমরাভাবে অনির্দ্দেশ পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে গ্রামের ছেলেদের ক্লাব-ঘরের নিকট এসে পোড়লো। ক্লাবে তখন কয়েকজন উপস্থিত হয়ে কথাবার্ত্তা কইছে। তর্কও চলছে যেমন হয়ে থাকে। সকলেই নন্দর পরিচিত ও দু-এক বা দু চার বছরের সিনিয়ার। নন্দ তাদের সম্মান দিলেও তাঁরা কথাবার্ত্তা প্রায় সমবয়সীর মতই ক'য়ে থাকেন।

তিনকড়ি। তা মন্দ কি, তাতে গ্রামের উন্নতিই হবে তো—ম্যালেরিয়ায় লোক মরে গাঁ উজাড় হ'তে বসেছে—

হিমাংশু। শেষ উলোর মত ভূতের গাঁ না হ'য়ে যায়—

সুকেশ। 'হ'য়ে যায়' মানে? It is already! ব্রজর ওই বাগান-বাড়িটিই তো তাদের আস্তানা! শোননি?

তিনকড়ি। ও সব গুজোব কথা—

সুকেশ। (আশ্চর্য্য হ'য়ে) তা হ'লে তুমি সাধুর কথা বিশ্বাস করো না!

বিমলের প্রবেশ

এই বিমল এসেছে—ওকে জিজ্ঞাসা করতে পারো—he is a believer—

বিমল। কি, ব্যাপারটা কি?

সুকেশ। ব্রজর ওই বাগান-বাড়িটি ভূতগ্রস্ত নয় কি এবং সেই হেতু মিত্র মশাই ও বাড়ী শোধন করবার জন্যেই একাধারে ওতে দাতব্য চিকিৎসালয় ও ভজনালয় প্রতিষ্ঠা কোরচেন, দেখে নাও out of evil কি ক'রে cometh good! ভূতের দ্বারাই বা দেশে ভূত থাকায় দেশের কত বড় লাভ হচ্ছে! নয় কি?

বিমল। বেশ তো—ভালই ত হচ্ছে, তা নিয়ে—

সুকেশ। সে কি হে। ভুল ক'রচো কেনো? আমাদের কোনো কর্ত্তব্য নেই? যার যা প্রাপ্য তা তাঁকে দিতে হয়—give Cæaser his due—

হিমাংশু। হাজার বার—অভিরামপুরের এ আরাম কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। এতে গরীব দুঃখী মধ্যবিত্ত সকলেই উপকৃত হবে—

অনাথ। আর নন্দও খুব সুখ্যাতির সঙ্গে ভালো রকম পাশ করে বেরিয়েছে। ভাল চিকিৎসক পাওয়াও ভাগ্যের কথা—

বিমল। সব কটা gold medal সেই পেয়েছে।

তিনকড়ি। বাঃ বেঁচে থাকুক! গ্রামের শ্রী—

হিমাংশু। তার স্বভাবচরিত্র বরাবরই মধুর—দয়াও প্রচুর।

সুকেশ। মাথায় কবিতা ঢুকে রয়েছে বুঝি—ক্ষ্যামা দে হিমাংশু। আর কথা বাড়াসনি, এইবার মতিচুর না হয় কচুর বলা ছাড়া তো উপায় নেই—

অনাথ। কেনো ওকে দমিয়ে দাও। "বেগুসরাই" পত্রিকায় ওর "রঘু মুদী" বলে যে কবিতা বেরিয়েছে তা দেখেছ কি?

'পার হয়ে অম্বুধী,
বিলাত গেল রঘু মুদী'

তিনকড়ি। তুমি থামো অনাথ, সে যে-বিষয়ের রসিক নয়, তার সে সম্বন্ধে—

সুকেশ। তিনকড়িদা, আমাদের চেয়ে দু-চার বছরের বড় হয়ে মুস্কিল হয়েছে, ক্লাবে বাজার-দর ছাড়া অন্য কথার প্রবেশ নিষেধ!

তিনকড়ি। তা নয় সুকেশ, কারো নবীন উদ্যম—

সুকেশ। হিমাংশু আমাদের বন্ধু, আমরা তার কথা উপভোগ করছিলুম মাত্র, যাক্। গুড়ের চালান নিয়ে আলোচনাই চলুক—

তিনকড়ি। বেশ, তোমাদের যা ভালো লাগে আমার তাতে আপত্তি নেই। নন্দ এসেছে শুনেছি, দেখা হয়েছে কি?

বিমল। সে এখন নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত, তাই বোধ হয়—

অনাথ। (নন্দকে পথে দেখতে পেয়ে) ঐ না নন্দ! এই দিকেই বোধ হয় আসছে—

সকলেই উদ্‌গ্রীব

বিমল। এসো, এসো নন্দ, আমরা শুনে কি সুখীই হয়েছি—

ধীরভাবে নন্দর প্রবেশ ও সকলকে নমস্কার

সুকেশ। Our hearty congratulation, take your seat please, বোসো। ভারি আনন্দ দিয়েছ নন্দ—

তিনকড়ি। আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করো। ভগবান তোমাকে দীর্ঘ জীবন ও সুস্বাস্থ্য দিন। গ্রাম তোমার কাছে অনেক কিছু আশা করে।

(নন্দকে নীরব দেখে) তোমাকে এমন দেখছি কেনো, অসুস্থ নাকি ?

নন্দ। না—এমনি—

অনাথ। চিন্তা আছে বই কি—সঙ্কল্প,তো ছোট নয়—Medical Hall-টা grand scaleএ করবার ব্যবস্থা এখন মাথায় ঘুরছে—

তিনকড়ি। চিন্তা কি! মিত্তির মশাই সে সব কি না ভেবে রেখেছেন। একটা কথা বলে রাখি—এ শুভকার্য্যে আমাদের সাহায্য যদি দরকার হয়—অসঙ্কোচে জানিও। এ-তো এক রকম Public-এরই কাজ—

হিমাংশু। তদ্ভিন্ন ধর্ম্ম কর্ম্ম—

অনাথ। মিত্র মশায় যা করছেন, এ যে কত বড় sacrifice—এ যুগে এর তুলনা খুঁজে পাই না। নন্দ তাঁর একমাত্র ছেলে, কত আশার জিনিষ। তাকেও দানখাতে ফেলে দিলেন। একেই বলে ত্যাগ—

সুকেশ। সব ঠিক, আমার কিন্তু বড় গায়ে লাগে। এ যেন দাতাকর্ণের স্বহস্তে বৃষকেতু বধ। হোক না ধর্ম্ম কর্ম্ম। শুনতে পাই, এর জন্ম কত দিন থেকে কত গোপন সাধনা ক'রে আসছেন! সমাধি পর্য্যন্ত দেখাতে হয়েছে। কিন্তু নন্দর কি হোলো—

তিনকড়ি। সে নন্দ বুঝবে সুকেশ। ওর মত বুদ্ধিমান ছেলে বাপের ধর্ম্মকর্ম্মের শুভেচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে নাকি। তা ছাড়া, গ্রামের শুভ কাজ, সে যদি ক্ষতি না ভাবে, যদি বাইরের call-এই সন্তুষ্ট থাকে।

বিমল। Exactly—বাপের গুণ ছেলেতে বর্ত্তানো খুবই স্বাভাবিক আর সেটা true, logically and scientifically—

সুকেশ। Of course, যদি নন্দর power of adaptability keen হয়—"মহাজন যেন গত সঃ পন্থা"—(নন্দর মুখের দিকে চেয়ে) আশা করি নন্দর তা আছে—

তিনকড়ি। (নন্দর মুখের ভাব লক্ষ্য কোরে) কি সব যা-তা বোকচো সুকেশ! নন্দকে পেলুম, ওর কাছে কিছু শুনি। ও সব আলোচনায় ফল কি ?

সুকেশ, অনাথ ও হিমাংশু স্বতন্ত্র গ্রুপের মত বসেছিল। একটু চাপা গলায় তাদের মধ্যে শেষের এই কথাগুলি হচ্ছিল

হিমাংশু। শুনছি Indoorও নাকি থাকবে। তাহলে ত' নার্স নিশ্চয়ই দরকার—

অনাথ। মিত্তিরমশাই Medical Hall-টিকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করবার জন্যে ভাবতে কসুর করেন নি। To begin with ব্রজ-বধূর ঐখানেই থাকবার ব্যবস্থা কোরে দিচ্ছেন—ধর্ম্ম এবং দাতব্যের যুগপৎ inspiration—

সুকেশের মুখ থেকে Hear Hear উচ্চারিত হতে গিয়ে মিয়িয়ে গেল।

তিনকড়ি। (ক্রোধ কটাক্ষে) অনাথ!

নন্দ দ্রুত বেরিয়ে গেল, বিমলও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো
কিন্তু নন্দ তখন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে পড়েছে।

তিনকড়ি কেবল "ছি" "ছি" বলে আর কোনো কথা কইলে না, কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে থেকে, ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

ক্রমশঃ

তারা একদিন ভালোবেসেছিল

ডক্টর নবগোপাল দাস পি-এইচ্-ডি, আই-সি-এস্

সুশান্ত আর শিপ্রা।

বিধাতাপুরুষের অলক্ষিত হাতের স্পর্শকে তাহারা কেহই প্রথম জীবনে মানিতে চায় নাই, কিন্তু তাঁহার বিধান যে সাধারণ মানুষের অনধিগম্য তাহা তাহাদের জীবনে যতখানি প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল বোধ হয় আর কাহারও জীবনে কখনও ততখানি হয় নাই।

তাহাদের প্রথম পরিচয় হয় অনেকটা গতানুগতিকভাবে, অর্থাৎ—কুড়ি বছর আগে। যদিও এইভাবে পরিচয় হওয়াটা গতানুগতিক ছিল না, আজকালকার রোম্যান্সের বাজারে ইহাকে নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার ছাড়া আর কোন পর্য্যায়ভুক্ত করা বোধ হয় চলে না!

সুশান্ত মামার বাড়ীতে মানুষ। তাহার মামীমা এবং শিপ্রার মা ছিলেন অন্তরঙ্গ সখী। তাই উভয়ের বাড়ীতেই ছেলেমেয়েদের আনাগোনা ছিল অব্যাহত।

সুশান্ত অধিকাংশ সময়ই তাহার কলেজ নিয়ে ব্যস্ত থাকিত। সেখানকার তর্কসভায় সে ছিল মস্ত বড় একজন পাণ্ডা। তাহার অবসর মিলিত রবিবারে, আর ছুট্‌কোছাট্‌কা ছুটির দিনে।

এমন একটা ছুটির দিনে সে শিপ্রাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল, তাহার মামীমার সন্ধানে।

চাকরের নির্দ্দেশমত ঘরের পুরানো মলিন পর্দ্দাটা সরাইয়া দিয়া ঢুকিতে যাইবে এমন সময় সে থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল। কোলের কাছে একটা মাসিক কাগজ নিয়া উদাসভাবে বাইরের খোলা আকাশের দিকে তাকাইয়া ছিল শিপ্রা। প্রশান্ত দেখিতে পাইয়াছিল শুধু তাহার গ্রীবাভঙ্গী, আর সেই গ্রীবাকে আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল যে অলকগুচ্ছ তাহারই যেন একটা ছায়া।

ঘরে অপরিচিতা একটি মেয়ে বসিয়া রহিয়াছে এবং তাহার মামীমা সেখানে নাই দেখিয়া সুশান্ত ফিরিয়া যাইতেছিল।

এইখানেই হয়ত আমাদের গল্পের যবনিকাপাত হইত, কিন্তু সুশান্ত এবং শিপ্রার জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী সকলকে শুনিতে হইবে বলিয়াই বোধ হয় সেই সময় সুশান্তর মামীমা পাশের বাড়ী হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

—সুশান্ত নাকি? আমার খোঁজে এসেছিলি বুঝি? তা চলে যাচ্ছিস্ কেন?

সুশান্ত থতমত খাইয়া বলিতে যাইতেছিল সে চলিয়া যায় নাই, কিন্তু মামীমা তাহার জবাবের অপেক্ষা না রাখিয়াই বলিয়া চলিলেন, বিনির সাথে দেখা করতে এসেছিলাম, শিপ্রা বল্‌লে পাশের বাড়ীতে আছে, তাই সেখানেই চলে গিয়েছিলাম। ওদের ছেলেটির বড্ড অসুখ, বিনিকে আবার ছোটমা বলে ডাকে, কিছুতেই চলে আস্‌তে দিচ্ছে না।

বিনি অর্থাৎ বিনোদিনী শিপ্রার মা, সুশান্তর মামীমার সখী।

—তা শিপ্রা কোথায় গেল? একটা পান অন্তত মুখে দিতে পার্‌লে বড্ড ভালো লাগ্‌ত!

বলিতে বলিতে তিনি শিপ্রা যে ঘরে ছিল সেখানে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং পরক্ষণেই সুশান্তকে ডাকিয়া বলিলেন, তুই বাইরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ভেতরে আয় না?

বলা বাহুল্য, সুশান্তকে শান্ত সুবিনীত ছেলের মত শিপ্রার ঘরে ঢুকিতে হইল।

এই প্রথম সে শিপ্রাকে মুখোমুখি দেখিল। চেহারার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু নাই, কিন্তু মুখখানি অত্যন্ত কোমল। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম, হাত দু'খানি নিটোল, বেশভূষা আড়ম্বরবিহীন।

শিপ্রা ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ে।

সুশান্তর শিপ্রাকে ভালো লাগিল।

সুশান্তর মামীমা উভয়ের পরিচয় করাইয়া দিলেন।—

এ হচ্ছে আমার ভাগ্নে সুশান্ত, সব সময় কলেজ আর বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত ; আর এ হচ্ছে শিপ্রা, যে ক্লাশের বই-এর ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষ্‌তে চায় না, তবে অত্যন্ত লক্ষী মেয়ে, তা' স্বীকার করতেই হবে।

সুশান্ত ছোট্ট একটি নমস্কার করিল। শিপ্রা যে প্রতিসম্ভাষণ করিল তাহাকে নমস্কার বলিলে ভুল করা হইবে। সে যেন সুশান্তকে আহ্বান করিয়া বলিল, ওঃ আপনি সুশান্তবাবু, যার কথা মাসীমার মুখে রাতদিন লেগেই আছে ?

সুশান্তই প্রথমে কথা বলিল।

—আপনি অন্যমনস্কভাবে বাইরের দকে তাকিয়ে ছিলেন, বাড়ীতে আর কেউ ছিল না, তাই আপনাকে বিরক্ত না ক'রেই চলে যাচ্ছিলাম।

শিপ্রা জবাব দিল :

—পড়ায় আমার মন বসে না কিছুতেই, এসব নীরস জিওমেট্রি আর ধাতুরূপ শব্দরূপের যেন শেষ নেই। আদিহীন, অন্তহীন স্রোতে চলেছে এরা, আমরাও ভেসে চলি এদের সাথে।···আনন্দ পাই নে।

—আপনার প্রতি আমার সহানুভূতি আছে। পরীক্ষার বিভীষিকা যে কি জিনিষ তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউই বুঝ্‌তে পারে না। আমার এখনও একটা পরীক্ষা বাকী—তবে এটাই শেষ, অন্তত আমার দৃঢ় সংকল্প, এর পর আর কোন পরীক্ষার দুয়ার মাড়াব না !

আপনারা আশা করি বুঝিয়াছেন, সুশান্ত এম্‌-এ ক্লাশে পড়ে।

এই ভাবে তাহাদের প্রথম পরিচয়। ইহার পর প্রতি ছুটির দিনেই সুশান্ত আসিতে সুরু করিল শিপ্রার পড়া বলিয়া দিতে। তাহাদের পরস্পরের সম্বোধন সহজ হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল সুশান্তদা ও শিপ্রাতে।

যতদিন শিপ্রার পরীক্ষার তাড়া ছিল ততদিন সময়টা একরকম ভালই কাটিয়াছিল। শিপ্রা মেধাবী ছাত্রী নয়, তবু তাহাকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করাইতেই হইবে, সুশান্তর এই সংকল্প ছিল। তাহার অধ্যবসায়ে এবং শিপ্রার চেষ্টায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিপ্রার নামও দেখা গেল।

কিন্তু পরীক্ষা শেষ হইবার পর অখণ্ড অবসর যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখনই জটিলতার সৃষ্টি হইতে সুরু করিল। যে সুশান্ত এতদিন কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষকের মত শিপ্রাকে জ্যামিতির দুরূহ তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল সে শিপ্রার সাথে আরম্ভ করিল কাব্যচর্চ্চা। আর শিপ্রাও পরীক্ষার প্রহেলিকা হইতে ক্ষণিক নিষ্কৃতি পাইয়া গভীর উৎসাহে কাব্যালোচনায় যোগ দিল।

কাব্য সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই সঙ্কীর্ণ ; সত্য কথা বলিতে কি, কাব্যরসের মধুর আস্বাদ আমি কোন দিনই উপভোগ করিতে পারি নাই, কিন্তু কবিতার বিরুদ্ধে আমার কয়েকটি তীব্র অভিযোগ আছে, যাহা আমি সুশান্ত-শিপ্রার জীবন হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। আমার মনে হয় ইতিহাস বা দর্শনের মধ্যে যে একটা আভিজাতিক ছন্দ আছে, কাব্যের মধ্যে তাহা নাই : কাব্য হইতেছে স্ফটিক স্বচ্ছ স্রোতস্বিনীর মত ; ইহার স্পর্শে তরুণতরুণীর অঙ্গে লাগে মাতলামি, ইহার আবর্ত্ত তাহাদিগকে পরিণত করে অতি তুচ্ছ ক্রীড়াবস্তুতে।

সুশান্ত-শিপ্রার অবসর জীবনেও কাব্য এই অনর্থের সৃষ্টি করিল। ব্রাউনিং-এর সনেট্ আর শেলীর লিরিক্-এর মধ্য দিয়া তাহারা পরস্পরকে পরস্পরের কাছে ধরা দিয়া বসিল। সুশান্তর কোলে মাথা রাখিয়া শিপ্রা বলিল, আমি সুন্দর হব শুধু তোমার জন্য, আমার অন্তর-নিংড়ানো সুখদুঃখের গরিমা বাড়্‌বে তোমারি পায়ের ধুলোর আশ্রয়ে। আর সুশান্তও শিপ্রাকে আদর করিয়া জবাব দিল, তুমি আমায় দেখিয়েছ নূতন জীবনের আলো, আনন্দিত তোমার মাধুরী, তোমাকে সাথী পেয়ে আমি জীবনের পটভূমির সব কিছু সংশয় জয় ক'রে নিতে পারব এই আমার বিশ্বাস।

আমরা আশা করিয়াছিলাম সুশান্ত শিপ্রার জীবন-নাট্যের রোমান্টিক অংশটার সমাপ্তি হইবে এইখানেই—প্রজাপতির অনুগ্রহে।

কিন্তু বিধাতা পুরুষ বাদ সাধিলেন।

শিপ্রার মা এবং সুশান্তর মামীমার মধ্যে এতদিন যে নিবিড় সখীত্ব-বন্ধন ছিল তাহা ছিঁড়িয়া গেল সুশান্ত-শিপ্রার অনর্থ সৃষ্টিকারী কাব্যচর্চ্চার ফলে।

সুশান্তর মামীমা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই সুশান্তর সাথে শিপ্রার বিবাহে তাহার মা'র কোন আপত্তি থাকিতে

পারে। সুশান্তর মত জামাই যে-কোন মেয়ের মা'র কাম্য —এই ছিল তাঁহার বিশ্বাস।

শিপ্রার মা'র লক্ষ্য ছিল অন্যদিকে। সুশান্তকে যে তাঁহার ভাল লাগে নাই এমন নয়, কিন্তু জামাই হিসাবে তাহাকে পাইবার জন্য তিনি আদৌ উদ্‌গ্রীব ছিলেন না। তাঁহার লক্ষ্য ছিল আর একটি ছেলের দিকে, সে সবেমাত্র দুইটা বিলাতি ডিগ্রী এবং ব্যারিষ্টারীর ছাপ লইয়া দেশে ফিরিয়াছে। শিপ্রাদের রক্তে ছিল কৌলিন্যের ধারা, তাহার উপর তাহাদের ছিল অর্থ, যাহা পৃথিবীর সব পিপাসা মিটাইবার পক্ষে সহায়তা করিতে পারে। শিপ্রার মা বিনোদিনী সংক্ষেপে তাঁহার সখীকে জানাইয়া দিলেন যে, শিপ্রার বিবাহ ঠিক হইয়া আছে ব্যারিষ্টার এবং কেম্ব্রিজ-গ্র্যাজুয়েট সমীর রায়ের সহিত, কাজেই সুশান্তর সঙ্গে তাহার বিবাহের কথা উঠিতেই পারে না।

সমীর রায়ের সহিত শিপ্রার বিবাহ যদিও বা একেবারে ঠিক ছিল না, সুশান্তর মামীমার প্রস্তাবের পর বিনোদিনী সে বিষয়ে একটু অবহিত হইলেন। সমীরকে জামাইরূপে পাইবার জন্য তিনি স্বামীর ব্যাঙ্কের খাতা তুলিয়া ধরিলেন সমীরের বাবা-মার চোখের সম্মুখে। কয়েক হাজারে রফা হইল। সমীরও কোন আপত্তি করিল না, কারণ সে বুদ্ধিমান্; দেখিল কৃতকার্য্য ব্যারিষ্টার-রূপে বসিতে হইলে প্রথম কয়েকটা বছর অন্যের দেওয়া অর্থের প্রয়োজন অনেকখানি বেশী। তাহা ছাড়া, যে দুই-একবার সে শিপ্রাকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল তাহাতে সে বুঝিয়াছিল শ্রী এবং সৌন্দর্য্যের দিক দিয়াও শিপ্রা তাহার সহধর্ম্মিণী রূপে নিতান্ত বেমানান হইবে না।

আপনারা মনে করিবেন না সমীর-শিপ্রার বিবাহের এই সমস্ত আয়োজন চলিয়াছিল সুশান্ত বা শিপ্রার অজ্ঞাতে। মামীমার কাছে সুশান্ত যথাসময়ে জানিতে পারিল শিপ্রাকে চিরকালের প্রিয়ারূপে পাইবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। ওদিকে মা'র কাছে তীব্র এক ধমক খাইয়া শিপ্রা বুঝিল যে, সুশান্তর পায়ের ধূলার আশ্রয়ে তাহার নারীত্বকে গৌরবমণ্ডিত করার সুযোগ সে পাইবে না।

সুশান্ত এবং শিপ্রা সংসারের কুটিল আবর্ত্তের সম্মুখীন হইল এই প্রথম। পরস্পরের দৈন্য, আলস্য এবং অসহায়তা বিশ্লেষণ করিয়া তাহারা কি দেখিতে পাইল জানি না, তবে তাহার পর যে সব ঘটনা ঘটিল তাহাতে আমি তাহাদের জীবনের চিত্রকর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উঠিলাম।

সুশান্ত শিপ্রার কাছে আসিয়া বলিল, শিপ্রা, বোধ হয় শুনেছ মাসীমা তোমাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চান্ না।

শিপ্রা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে শুনিয়াছে।

সুশান্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, বল ত কি করা যায়?

—কি করবে?···শিপ্রা সুশান্তর প্রশ্নের উত্তর দিল আর একটি প্রশ্নে।

সুশান্ত বুঝিতে পারিল না ইহার পর কি বলা উচিত। সে শুধু শিপ্রার হাত দুটি ধরিয়া বলিল, আশা করি সমীর রায়ের সঙ্গে বিয়েতে তুমি খুব অসুখী হবে না।···আর আমাদের এই খেলা, এটা খেলার স্মৃতিরূপেই আমাদের বুকে বেঁচে থাক, একে সত্যিকারের মর্য্যাদা কখনো দিয়ো না, নইলে জীবনের প্রারম্ভে মস্ত বড় একটা ভুল করা হবে।

শিপ্রা কাঁদিল না, হাসিল না, খুব শান্ত সহজ সুরে বলিল, চেষ্টা করব, সুশান্তদা।

আমি তাহাদের জীবনের চিত্রকর আশা করিয়াছিলাম বিবাহের রাত্রে বা তাহার আগের দিন শিপ্রা যাইবে সুশান্তর কাছে, সকলের অগোচরে, দেবদাসের পার্ব্বতীর মত। আমি আশা করিয়াছিলাম শিপ্রা সুশান্তর বুকে মাথা রাখিয়া বলিবে, এ জীবনে যদিও তোমাকে পেলাম না তবু আমি তপস্যা করতে থাকব, আস্‌ছে জীবনে আমাদের মিলন যেন অব্যাহত হয়। আমি এমনও আশা করিয়াছিলাম, সুশান্ত হয়ত দেবদাসের মত শিপ্রার অঙ্গে এমন একটা চিরস্থায়ী দাগ রাখিয়া যাইবে যাহা তাহাকে চিরকাল মনে করাইয়া দিবে সুশান্তর প্রতি তাহার শান্ত সংযত ঔদাসীন্যের কথা। যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহার কিছুই ঘটিল না।

গোধূলি লগ্নে হাসি-আনন্দের কলরোলের মধ্যে সমীর-শিপ্রার বিবাহ হইয়া গেল। সুশান্ত শিপ্রার বিবাহে যোগদান করিল না, তাহাকে স্নেহ বা আশীর্ব্বাদসূচক কোন উপহারও পাঠাইল না।

ইহার পর আমি বৎসর তিনেক শিপ্রার কোন খবর রাখিতে পারি নাই। শিপ্রা চলিয়া গেল স্বামীগৃহে, আর

আমি আসিলাম সুশান্তর সঙ্গে বোম্বাই-এ। সত্য কথা বলিতে কি, সমীর-শিপ্রা কি করিতেছে তাহা জানিবার কৌতূহলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল নিঃস্ব সুশান্তর প্রতি আমার সহানুভূতি।

আমি জীবনের ঘটনাবৈচিত্র্যের চিত্রকর। জীবনের চিত্রশালায় কাহারা কি ভাবে চলিতেছে, কখন তাহারা হাসিতেছে, কখন তাহারা কাঁদিতেছে, আমি যথাসম্ভব বিশ্বস্তভাবে আঁকিতে চেষ্টা করি। মানুষের অন্তরের নিবিড়তম বেদনা, তাহার দিশাহারা ব্যাকুলতা, এ সমস্ত আমার ছবির মধ্যে সাধারণত ফুটিয়া ওঠে না, যতক্ষণ না তাহার একটা বহিঃপ্রকাশ হয়। শিপ্রার বিবাহের পর যে তিন বৎসর আমি সুশান্তর সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম তখন কোন দিন এমন একটা মুহূর্ত্তও দেখি নাই যেদিন সুশান্ত শিপ্রার কথা ক্ষণিকের জন্যও স্মরণ করিয়াছে। সুশান্তর অজ্ঞাতে আমি তাহার ডায়েরীর পাতা উল্টাইয়া দেখিয়াছি, দেখিতে পাইয়াছি শিপ্রা সম্পর্কে তাহার শেষ উক্তি তাহার বিবাহের তারিখে—সংক্ষেপে লেখা: আজ শিপ্রার বিয়ে হয়ে গেল।···কিন্তু তাহার পর কোন দিন সে পরোক্ষেও শিপ্রার নাম বা তাহাদের যৌবনোচ্ছল খেলার উল্লেখ করে নাই। সুশান্তর লিখিবার টেবিলে, তাহার সুটকেশে, তাহার মণিব্যাগে কোথাও শিপ্রার ছোট্ট একটি ফটোও আমি দেখিতে পাই নাই।

সুশান্তর জীবনের এই তিন বৎসরের কথা বলিতে সুরু করিয়াছিলাম। যাহা দেখিয়াছি তাহাও যেন আমার কাছে কেমন প্রহেলিকাময়, কেমন রহস্যাবৃত বলিয়া মনে হয়। আমি দেখিলাম, সুশান্ত অন্য কোন মেয়েকে ভালোবাসিতে পারিল না, অন্তত এই তিনটি বৎসর সে যেন জোর করিয়া নিজেকে নারী-সংস্পর্শ হইতে এড়াইয়া চলিল। অথচ জীবনটাকে কেন এমনই করিয়া নিয়ন্ত্রিত করিল তাহার বিন্দুমাত্র আভাসও আমি তাহার কথাবার্ত্তা বাহিরের ভাবভঙ্গী হইতে বুঝিতে পারি নাই। সে কিছুদিন কাজ করিল একটা সংবাদপত্রের প্রেসে। রাত্রির পর রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমে সে কম্পোজিং প্রিন্টিং ও প্রুফ রিডিং-এর কাজ তত্ত্বাবধান করিত, ভোর পাঁচটার সময় স্থানীয় এজেন্টদের লোকদের হাতে কাগজগুলি দিয়া সে ছুটি লইত।···এইভাবে এক বৎসর কাটিয়াছিল। তাহার পর হঠাৎ একদিন প্রেসের স্বত্বাধিকারীর সহিত দুই-একটা কথা কাটাকাটি হওয়ায় সে এই চাকুরী ছাড়িয়া দিল। মাস তিনেক সে আর কোন কাজের সন্ধানে বাহির হইল না—এতদিন প্রেসে সে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সে তিনমাস কাটাইল—অনাবিল আলস্যে, নিবিড় ঔদাসীন্যে। তিনমাস পর সে সুপ্তোত্থিতের মত ভাবিতে সুরু করিল। কি ভাবিয়াছিল তাহা জানা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। কারণ সুশান্ত স্বভাবতই স্বল্পভাষী, কিন্তু দেখিলাম সে লেখায় মন দিল। গল্প বা কবিতা লেখা নয়—গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাশীল প্রবন্ধ। কলেজে তর্কসভায় বুদ্ধিমান বক্তা বলিয়া সুশান্তর খ্যাতি ছিল, প্ল্যাটফরম্ হইতে নামিয়া আসিয়া লেখনী ধারণ করিয়াও তাহার সেই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রহিল। আমাদের দেশে গল্প লেখকরাই গল্প লেখাকে জীবিকারূপে অবলম্বন করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধা করিতে পারে না, প্রবন্ধ লেখক ত কোন্ ছার। কিন্তু সুশান্তর অর্থ সঞ্চয়ের প্রতি কোন স্পৃহা ছিল না। সে সামান্য যাহা কিছু উপার্জ্জন করিত তাহাতেই তাহার স্বল্প ও সাধারণ অভাবগুলি মিটিয়া যাইত।

এইভাবে আরও এক বৎসর নয় মাস কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই সুশান্তর জীবনে আমি ঘটিতে দেখি নাই। তাহার আড়ম্বরহীন বৈচিত্র্য-বিরল জীবন পাতার পর পাতা খুলিয়া চলিল, সেখানে একটি কালির আঁচড়, এতটুকু তুলির চিহ্নও আমি দেখিতে পাইলাম না।

বিবাহের পরই শিপ্রা স্বামীগৃহে চলিয়া গিয়াছিল। সমীরের শিপ্রাকে ভালো লাগিয়াছিল, যদিও শিপ্রার চেয়েও তাহার বেশী ভালো লাগিয়াছিল তাহাকে পাইবার পাথেয়টুকু। বেশ সৌখীনভাবে অফিস্ ও ড্রয়িং রুম সাজাইয়া সমীর রায় বার-য়্যাট্-ল প্র্যাক্টিস্ সুরু করিল।

শিপ্রা সমীরকে ভালোবাসিতে চেষ্টা করিল। সুশান্তর সঙ্গে তাহার কয়েক দিনের সাহচর্য্যটাকে সে বিগত জীবনের স্মৃতি বলিয়া মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে প্রয়াস পাইল। কিন্তু যখন আকাশে বাতাসে আলোর স্রোতে ফুলের গন্ধ

ভাসিয়া আসিত, নিজের অপরিপূর্ণ জীবনের ফাঁকের মধ্য দিয়া অননুভূতপূর্ব একটা করুণ সুর বাজিয়া উঠিতে চাহিত, তখন তাহার সব এলোমেলো হইয়া যাইত। স্বামী সমীর, তাহার নূতন সাজানো সংসার, সমস্ত সে ভুলিয়া যাইত; তাহার মনে পড়িত তাহার ছিন্ন জীবনের সবচেয়ে গোপন কথাটি, যাহার বেদনার মধ্যে সে অনুভব করিত বিচিত্র একটা পুলক, যাহা শারদাকাশের মেঘের উপর ক্ষীণ রৌদ্রের রেখার মত তাহার অন্তরাকাশের শুভ্রতাকে করিয়া তুলিত আরও গৌরবোজ্জ্বল, আরও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন।

সমীর শিপ্রার মনের বিচিত্র লীলা বিশেষ বুঝিতে পারিত না, সেদিকে তাহার নজরও ছিল না। স্বামীর যাহা কিছু দাবী শিপ্রা সমস্তই মিটাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিত, তাহা ছাড়া সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য যাহা দরকার তাহাও সমীর পুরামাত্রায় পাইত। কাজেই মাসের মধ্যে একটি দিন যদি শিপ্রা অন্যমনস্কভাবে বসিয়া থাকিত, স্বামীর চায়ের টেবিলে আসিয়া বসার দৈনন্দিন কর্ত্তব্যে শৈথিল্য প্রকাশ করিত, সমীর তাহাতে ক্ষুব্ধ বা ক্ষুণ্ণ হইত না। এরকম ত্রুটি জীবনযাত্রার অপরিহার্য্য একটা অঙ্গ, একটা বৈচিত্র্যদায়ক পরিবর্ত্তন মনে করিয়া সে বরং খানিকটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত।

এইভাবে শিপ্রা-সমীরের জীবন একটানা স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছিল। সচরাচর যেমন দেখা যায়, তাহার চেয়ে বেশী একটু নিবিড়তা, পরস্পরের জন্য বেশী একটু ঔৎসুক্যই বাহিরের লোকে তাহাদের মধ্যে লক্ষ্য করিত এবং আদর্শ দম্পতি হিসাবে তাহাদের দৃষ্টান্তের উল্লেখও করা হইত। কিন্তু যাহারাই শিপ্রার অন্তরের আবরণটি খুলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহারাই বলিতে বাধ্য হইয়াছে যে, তাহা বেদনায় লাল এবং সেখানে রহিয়াছে সুতীব্র একটা কঠিনতা যাহার সংস্পর্শে কোমল এবং সুলভ সব কিছুই প্রতিহত হইয়া আসে।

শিপ্রার অন্তরের ক্ষত কোন দিন সারিত কি-না জানি না, কিন্তু আমাদের বিধাতাপুরুষ আসিয়া আবার এক বিপ্লবের সৃষ্টি করিলেন। দুই বৎসর সমীরের গৃহলক্ষ্মীভাবে থাকার পর নিঃসন্তানা শিপ্রা বিধবা হইল।

সমীরের সহিত অপ্রত্যাশিতভাবে বিবাহে শিপ্রা বিহ্বল হয় নাই, কিন্তু তাহার মৃত্যুতে সে সত্যই বিহ্বল হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে শিপ্রার বাবা-মা দুইজনেই মারা গিয়াছিলেন, কাজেই সংসারে দাঁড়াইবার মত কোন আশ্রয়ই তাহার ছিল না। সমীর অবশ্য কোন ঋণ রাখিয়া যায় নাই, কিন্তু তাহার সঞ্চয়ও বিশেষ কিছু ছিল না। শিপ্রা দেখিল তাহার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, তাহাকে বাঁচিতে হইবে এবং ভালোভাবে বাঁচিতে হইবে।

সুশান্তর কথা তাহার মনে হইয়াছিল। বিগত জীবনের সৌরভের মত ভাসিয়া আসিয়াছিল সুশান্তর কানে-কানে কথা বলা, তাহার সলজ্জ সম্ভাষণ। কিন্তু সুশান্ত কোথায়, কি ভাবে আছে তাহা যে সে কিছুই জানে না। কাজেই সে সাময়িকভাবে সুশান্তর চিন্তা মন হইতে বিসর্জ্জন দিল।

একটি বৎসর কাটিল নানা বিশৃঙ্খলায়। জীবনের ভবিষ্যৎ পথ স্থির করিয়া লইতে গিয়া সে অনেকবার ভুল করিল, স্পর্দ্ধা করিয়া সে অনেক কিছুতে হাত দিল, আবার কিছুদিন পরেই সে মলিন মুখে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল। অবশেষে একটি মেয়ে-প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সে একটি বৃত্তি পাইল—বিলাতে গিয়া শিক্ষা-সম্পর্কীয় একটা ডিপ্লোমা লইয়া আসিবার জন্য। শিক্ষাক্ষেত্রেই ভবিষ্যৎ জীবনটা কাটাইয়া দিবে সে স্থির করিয়া ফেলিল।

আমাদের গল্পের শেষাঙ্কে আসিয়া পৌঁছিলাম।

শিপ্রা বোম্বাই-এ আসিল, পরের দিন তাহার ইউরোপগামী জাহাজ ছাড়িবে। বোম্বাই শহরটা একবার দেখিয়া লইবার জন্য সে এস্‌প্ল্যানেডে-এর মোড়ে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল।

সুশান্তও কি যেন একটা কাজে সেখান দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ তাহার নজর পড়িল শিপ্রার দিকে। ঠিক সেই তিন বছর আগেকার শিপ্রার মত, তবে যেন একটু রোগা হইয়া গিয়াছে।

সুশান্ত ভাবিতে লাগিল শিপ্রাকে সম্ভাষণ করিবে কি-না। যদি সমীর কাছাকাছি কোথাও গিয়া থাকে তবে হয়ত শীঘ্রই আসিয়া পড়িবে এবং তখন শিপ্রা হয়ত রীতিমত বিব্রত বোধ করিবে।

সে খানিকক্ষণ শিপ্রার দিকে তাকাইয়া রহিল।

পর্য্যবেক্ষণের পর তাহার মনে হইল, শিপ্রা একা। সে অগ্রসর হইয়া গেল।

শিপ্রা তাকাইয়া চিনিতে পারিল। সুদীর্ঘ তিন বৎসর পর সুশান্তর সহিত তাহার দেখা, তাহার চোখের সম্মুখে দিনের আলোগুলি যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আবার হঠাৎ নিভিয়া গেল।

শিপ্রাই প্রথমে কথা বলিল, সুশান্তদা!

—হ্যাঁ, আমি। তা তুমি এখানে কোত্থেকে? তোমার স্বামী, মিঃ রায়, কোথায়?

শিপ্রা মলিনভাবে হাসিল। নিজের সীমন্তের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, উনি বছর খানেক হ'ল মারা গেছেন। আমি একা···বিলেত চলেছি।

সংবাদের আকস্মিকতা সুশান্তকে ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। তাহার পর একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, তোমার বাবা-মা?···তোমার—তোমার ছেলেমেয়ে?

আগেরই মত হাসিয়া শিপ্রা জবাব দিল, বাবা-মা ওঁর আগেই চলে গেছেন। আর, ছেলেমেয়ে? আমি ত আগেই বলেছি সুশান্তদা, আমি একা।

—তুমি কবে বিলেত যাচ্ছ? কেন? কত দিন থাক্‌বে? ···এক নিঃশ্বাসে সুশান্ত এতগুলি প্রশ্ন করিয়া বসিল।

—বিলেত যাচ্ছি কাল, ভিক্টোরিয়া জাহাজে। বৃত্তি পেয়েছি, একটা শিক্ষা-ডিপ্লোমা নিয়ে আস্‌ব। বছর দুই থাক্‌তে হবে।

সূচীভেদ্য একটা অন্ধকার যেন সুশান্তকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছিল। সে বলিল, তোমার হাতে ত সময় আছে শিপ্রা, আমার দুটো কথা বল্‌বার ছিল, আমার সঙ্গে একটু আস্‌বে?

শিপ্রা মুহূর্ত্তের জন্য কি ভাবিল। তারপর বলিল, চলুন···

উভয়ে হাঁটিয়া চলিল সমুদ্রের ধারে, বড় বড় ডকগুলি যেখানে শেষ হইয়া গিয়াছে। একটা খোলা জায়গা দেখিয়া উভয়ে বসিল।

সুশান্তই কথা সুরু করিল।

—তুমি বিলেত যাচ্ছ, বাকী জীবনটা কি তুমি শিক্ষয়িত্রী-ভাবেই কাটিয়ে দিতে চাও, শিপ্রা?

একটু যেন তিরস্কারের সুরে শিপ্রা বলিল, তা ছাড়া আর কোন পথ আমার খোলা আছে কি, সুশান্তদা? বিধবা মেয়ের স্থান আমাদের দেশে এখনও অতি অগৌরবের। এরই মধ্যে চলনসই একটা ব্যবস্থা আমাকে ত করে নিতেই হবে, নয় কি?

লজ্জিত সুরে সুশান্ত বলিল, সে কথা আমি অস্বীকার করছি না, শিপ্রা···কিন্তু ভাবছিলাম, আর কি কোন পথই তোমার খোলা নেই?

—দেখ্‌ছি না ত!

সুশান্ত যেন একটু ভরসা পাইল। আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে বলিল, বিগত জীবনের স্মৃতি আমি জোর ক'রে তোমায় মনে করিয়ে দিতে চাই নে শিপ্রা, কিন্তু আমার বিশ্বাস ক'রো, এই তিনটি বছর আমি কাটিয়েছি আলো-নেবানো উৎসব-প্রাঙ্গণে ভীরু প্রহরীর মত। নিজেকে ডুবিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছি কাজে অকাজে, বাইরে কাউকে, এমন কি, আমার নিজের মস্তিষ্ককেও জান্‌তে দিইনি আমার অন্তরের কথা। ·· তিন বছর আগে সাহস সঞ্চয় ক'রে যে ন্যায়সঙ্গত দাবী জানাতে পারিনি, আজ সেটা ভিক্ষার মত তোমায় জানাচ্ছি।

—আমাকে কি করতে ব'লো? · খুব সহজ ভাবেই শিপ্রা প্রশ্ন করিল।

—বিধবাবিবাহে আমার কোন আপত্তি নেই, শিপ্রা।··· কম্পিতকণ্ঠে সুশান্ত বলিল।

—কিন্তু আমার আছে।···সুদৃঢ় স্বরে শিপ্রা জবাব দিল।

সুশান্ত এতক্ষণ যে কল্পনা-সৌধ রচনা করিয়া তুলিতে-ছিল, শিপ্রার এই সংক্ষিপ্ত জবাবে তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। সে বেদনাপাণ্ডুর মুখে বসিয়া রহিল।

শিপ্রা কথা বলিল, খুব ধীরে ধীরে, খুব সংযত সুরে:

—এমন একটা দিন ছিল, সুশান্তদা, যেদিন তোমার কাছ থেকে এই রকম একটা দাবীরই প্রতীক্ষা করেছিলাম। সেদিন আমি ছিলাম নিতান্ত অসহায়া, সংসারে নির্ম্মমতায় অনভ্যস্তা কিশোরী। সেদিন যদি তুমি এতটুকুও জোর গলায় আমাকে বলতে যে আমাকে তোমার চাইই, তা হ'লে আমিও অনেকখানি জোর পেতাম; তোমার সঙ্গে সমান ওজনে গলা মিলিয়ে আমিও বলতে পার্‌তাম, সুশান্তকে

আমার চাইই।…তুমি তোমার দাবী জানালে না, উপেক্ষিত ব্যাহত শিপ্রা আশ্রয় খুঁজল যে তাকে আশ্রয় দিতে চাইল তারই বুকে। কিন্তু সেখানেও সে শান্তি পেল না। সুদীর্ঘ দুই বৎসরের বিবাহিত জীবন সে কাটাল অভিনয় ক'রে—মনের গভীরতম প্রদেশে তার স্বামীর রইল প্রবেশ নিষেধ, সেখানে শুধু খেলা করতে লাগল শিপ্রা আর তার কিশোরী জীবনের প্রিয়।…তুমি জান আমি সন্তানহীনা, এটাকে আমি বিধাতার বিধান বলব না, এটা যে হ'তে বাধ্য ছিল। আমি স্বামীর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করতে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিজেকে দিতে ত কখনও পারিনি! এই অসম্পূর্ণ মিলনের ফলে সন্তান কি কখনও আসতে পারে, সুশান্তদা?…যাক্ সে কথা। দু বছর পর যখন আমি সংসারে এসে দাঁড়ালাম সম্পূর্ণ একা, তখন প্রথমটা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। সংসারের আঘাতের সম্মুখীন এরকম ক'রে ত আর কখনও হইনি! কিন্তু এই একটি বছরের মধ্যে আমার নিজেকে আমি ফিরে পেয়েছি, সুশান্তদা… আমার মনে হয় না, আর কখনও আশ্রয়ের জন্ম আমাকে লালায়িত হ'তে হবে।

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিয়া শিপ্রা হাঁফাইতে আরম্ভ করিল।

সুশান্ত চুপ করিয়া শিপ্রার কথাগুলি শুনিল, তাহার পর গভীর শ্রদ্ধায় তাহার ডান হাতখানি শিপ্রার হাতের উপর রাখিল। শিপ্রা কোন বাধা দিল না।…সমুদ্রের ঢেউ উচ্ছল হইয়া উঠিল, ঝির ঝির করিয়া একটা বাতাস তাহাদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া দিয়া গেল, দূরে একটা বন্দর-প্রত্যাগত জাহাজের বাঁশীর শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল।

সুশান্ত ধীরে ধীরে বলিল, বেশ, রাত হয়ে যাচ্ছে শিপ্রা, চলো।

যেন অশ্রুতবাণী শুনিতেছে এইভাবে অন্যমনস্ক শিপ্রা জবাব দিল, চলো।

পরের দিন শিপ্রা যখন ভিক্টোরিয়া জাহাজে ওঠে তখন জেটিতে সে অনেকবার একখানা পরিচিত মুখের সন্ধান করিয়াছিল, সন্ধান মিলে নাই।

আমি, সুশান্তর জীবনকার, জানি সে কোথায় ছিল। সে গিয়াছিল তাহার সেই ভূতপূর্ব্ব সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীর কাছে তাহার নিজেরই অপরাধ হইয়াছে স্বীকার করিয়া সে আবার প্রেস-ম্যানেজারের কাজে বহাল হইল।

সুশান্ত আগের মত রাতের পর রাত আবার সেই প্রেসে কাজ করিতেছে।

বিরহিণী

শ্রীজিতেন্দ্র বক্সী

মাতাল-বাদল, নেমেছে আজিকে
গগন ভরে'
প্রিয়'র খবর আন নাই হায়
আমার তরে!
দাদুরী ডাকিছে, পাপিয়া গাহিছে
ফুকারে কেকা
কোয়েলা ডাকিছে, ঝলিছে আঁধারে
বিজুরি-লেখা!

তিমির-আঁধারে, বিরহিণী আজ
শঙ্কা মানে
গরজিছে মেঘ, মেতেছে পবন
উতলা-গানে!
অন্তর-আজি হোল ওগো মোর
বিষেতে-ঢালা
সহিতে পারিনা, প্রিয় লাগি জ্বলে
বিরহ-জ্বালা॥

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

কার্ম্মারবী-জাতি

এই জাতিতে নিষাদ, ঋষভ, পঞ্চম ও ধৈবত এই চারিটি অংশ স্বর। জাতি-প্রকরণের প্রারম্ভে যে 'অন্তর মার্গ'-এর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেই অন্তর মার্গের নিয়মে অবশিষ্ট তিনটি (স গ ও ম) স্বরের অংশ প্রভৃতি স্বরের সহিত পুনঃ পুনঃ সঙ্গতি হইয়া থাকে, সুতরাং এই জাতিতে চারিটি অংশস্বরের মধ্যে যে-কোন একটি স্বরের অংশস্বররূপে বহুল প্রয়োগ থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত স গ ও ম স্বরেরও সঞ্চারিরূপে বহুল প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই তিনটি স্বরের মধ্যেও আবার গান্ধার স্বরটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রযুক্ত হইয়া থাকে; কারণ যখন যেটি অংশস্বর হয়, তাহার সহিতও অন্যান্য পর্য্যায়াংশ (যে স্বরগুলি সেই উদাহরণে অংশরূপে পরিণত না হইয়া থাকিলেও স্থানান্তরে অংশরূপে পরিণত হইয়া থাকে এইরূপ) স্বরের সহিত সঙ্গতিনিবন্ধন গান্ধারের অধিকতর প্রয়োগ স্বাভাবিক ইহার তাল চঞ্চৎপুট, কলা ষোলটি, মূর্চ্ছনা মধ্যমগ্রামের অন্তর্গত ষড়জাদি। নাটকের পঞ্চম অঙ্কে ধ্রুবারূপে এই জাতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পঞ্চম ইহার ন্যাসস্বর এবং অংশস্বরই অপন্যাস স্বর। নিম্নে ইহার প্রস্তার প্রদর্শিত হইতেছে—

রী রী রী রী রী রী রী রী
তং ০ স্থা ০ ণু ল লি ত

মা গা সা গা সা নী নী নী
বা ০ মা ০ ঙ্গ স ০ ক্ত

০ ০ ০ ০ ০ ০
নী সা নী সা পা পা গা গা
ম তি তে ০ জঃ প্র স র

গা পা মা পা নী নী নী নী
সৌ ০ ধাং ০ শু কা ০ ন্তি

রী´ র্গা র্সা নী´ রী´ র্গা রী´ র্মা ঃ
ফ ণি প তি মু খং ০ ০

রী গা রী সা নি ধ নি পা পা ৬
উ রো বি পু ল সা০ ০ গ

র্মা র্পা র্মা র্প রি´র্গ গা গা গা গা ৭
র নি কে ০ ০ ০ তং ০ ০ ০

রী রী গা স ম মা মা পা পা ৮
সি ত প ০ ০ ম্ন গে ০ ন্দ্র

মা পা মা গ রি গ গা গা গা গা ৯
ম তি কা ০ ০ ০ স্তং ০ ০ ০

ধা নী পা মা ধা নী সা সা ১০
ষ ০ ন্মু খ বি নো ০ দ

নী নী নী নী নী নী নী নী ১১
ক র প ০ ল্ল বা ০ ঙ্গু

০ ০ ০ ০
মা মা ধা নী স লি লি ধা পা পা ১২
লি বি লা ০ স ০ ০ কী ০ ল

মা পা মা গ রি গ গা গা গা গা ১৩
ন বি নো ০ ০ ০ ঙ্গং ০ ০ ০

নী নী পা ধ নি গা গা গা গা ১৪
প্র ণ মা ০ ০ মি দে ০ ব

র্সা র্রী র্গা র্সা নী´ নী´ নী´ নী´ ১৫
য ০ জ্ঞো ০ প বী ০ ত

নী´ নী´ র্ধা র্ধা র্পা র্পা র্পা র্পা ১৬
কং ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

উপরি লিখিত প্রস্তারে অষ্টলঘু যোজনা নিম্নলিখিতরূপে করা হইয়াছে—

১ম কলায়—রী ১+রী ১+রী ১+রী ১+রী ১+রী ১+রী ১+রী ১=৮

২য় কলায়—মা ১+গা ১+সা ১+গা ১+সা ১+নী ১+নী ১+নী ১=৮

৩য় কলায়—নী ১+সা ১+নী ১+সা ১+পা ১+পা ১+গা ১+গা ১=৮

৪র্থ কলায়—গা ১+পা ১+মা ১+পা ১+নী ১+নী ১+নী ১+নী ১=৮

৫ম কলায়—রীঁ ১+র্গা ১+র্সা ১+নীঁ ১+রীঁ ১+র্গা ১+রীঁ ১+র্মা ১=৮

৬ষ্ঠ কলায়—রী ১+গা ১+রী ১+সা ১+নী ১+ধনি ১+পা ১+পা ১=৮

৭ম কলায়—র্মা ১+র্পা+১ র্মা ১+র্প রিঁ র্গ ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮

৮ম কলায়—রী ১+রী ১+গা ১+স ম ১+মা ১+মা ১+পা ১+পা ১=৮

৯ম কলায়—মা ১+পা ১+মা ১+গ রি গ ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮

১০ম কলায়—ধা ১+নী ১+পা ১+মা ১+ধা ১+নী ১+সা ১+সা ১=৮

১১শ কলায়—আটটি নী স্বরে একটি করিয়া অষ্টলঘু যোজনা করা হইয়াছে।

১২শ কলায়—মা ১+মা ১+ধা+নী ১+স নি নি ১+ধা ১+পা ১+পা ১=৮

১৩শ কলায়—মা ১+পা ১+মা ১+গ রি গ ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮

১৪শ কলায়—নী ১+নী ১+পা ১+ধ নি ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮

১৫শ কলায়—র্সা ১+রীঁ ১+র্গা ১+র্সা ১+নীঁ ১+নীঁ ১+নীঁ ১+নীঁ ১=৮

১৬শ কলায়—নীঁ ১+নীঁ ১+র্ধা ১+র্ধা ১+র্পা ১+র্পা ১+র্পা ১+র্পা ১=৮

প্রস্তারটি রচিত হইয়াছে নিম্নলিখিত পদ্যের উপরে—

—"ওংস্থানুললিত বামাঙ্গসক্রমতিতেজঃ প্রসর-
সৌবাংশুকান্তি ফণিপতিমুখং
উরো বিপুল সাগর নিকেতং সিতপন্নগেন্দ্রমতিকান্তম্।
সম্মুখ বিনোদকর পল্লবাঙ্গুলি বিলাস কীলন বিনোদং
প্রণমামি দেব যজ্ঞোপবীতকম্।"

গান্ধার-পঞ্চমী জাতি

এই জাতিতে 'পঞ্চম' অংশস্বর। ইতিপূর্ব্বে গান্ধারী ও পঞ্চমী জাতিতে যে যে স্বরের সহিত যে সকল স্বরের সঙ্গতির কথা বলা হইয়াছে, এই জাতিতেও সঙ্গতির বিধান তদনুরূপ। গান্ধারী জাতিতে বলা হইয়াছে—ন্যাস ও অংশস্বরের সহিত অপর স্বরগুলির সঙ্গতি হয়; এই জাতিতেও ন্যাসস্বর 'গান্ধার' ও অংশস্বর 'পঞ্চমের' সহিত অপর (স, রি, ম, ধ, নি) স্বরের সঙ্গতি করিতে হইবে। এইরূপ পঞ্চমী জাতিতে যেমন ঋষভ ও মধ্যম স্বরের পরস্পর সঙ্গতির বিধান রহিয়াছে, এই জাতিতেও তেমনি ঋষভ ও মধ্যমের পরস্পর সঙ্গতি হইবে। এই জাতিতে তাল-চঞ্চৎপুট, কলা ষোলটি, মূর্চ্ছনা মধ্যম গ্রামের অন্তর্গত গান্ধারাদি, গান্ধার ন্যাসস্বর, ঋষভ ও পঞ্চম অপন্যাস স্বর। নাটকের চতুর্থ অঙ্কে ধ্রুবা গানরূপে এই জাতি প্রযোজ্য।

ইহার প্রস্তার নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

পা	ম প	ম ধ	নী	ধ প	মা	ধা	নী	১
কা	০০	০০	০	০০	০	০	০	
সনিনি	ধা	পা	পা	পা	পা	পা	পা	২
০০০	০	স্তং	০	০	০	০	০	
ধা	নী	সা	সা	মা	মা	পা	পা	৩
বা	০	মৈ	০	ক	দে	০	শ	
নী	নী	নী	নী	নী	নী	নী	নী	৪
প্রে	০	ঙ্খো	০	ল	মা	০	ন	
নী	নী	ধ প	মা	নি ধ	নি ধ	পা	পা	৫
ক	ম	ল০	নি	ভং০	০০	০	০	
পা	পা	রী	রী	রী	রী	রী	রী	৬
ব	র	সু	র	ভি	কু	সু	ম	
মা	রি গ	সা	স ধ	নী	নী	নী	নী	৭
গ	০০	ন্ধা	০০	ধি	বা	০	সি	
নী	নী	র্সা	রিঁর্সঁ	রীঁ	রীঁ	রীঁ	রীঁ	৮
ত	ম	নো	০০	জ্ঞ	০	০	০	
নী	গা	সা	নি গ	সা	নী	নী	নী	৯
ন	গ	রা	০০	জ	সূ	০	মু	
নী	মা	নী	মা	পা	পা	গা	গা	১০
র	তি	রা	০	গ	র	ভ	স	
গা	পা	মা	পা	নী	নী	নী	নী	১১
কে	০	লী	০	কু	চ	০	গ্র	

মা পা মা প রি গ গা গা গা গা ১২
হ্ লী লং ০০০ তং

নী নী পা ধা নী গা গা গা ১৩
প্র ণ মা ০ মি দে ০ বং

নী নী নী নী নী নী নী নী ১৪
চ ০ ন্দ্রা ০ র্দ্ধ ম ০ ণ্ডি

মা মা ধা নী স নি নি ধা পা পা ১৫
ত বি লা ০ স কী০ ল ০ ০

মা পা মা প রি গ গা গা গা গা ১৬
ন বি নো ০০০ দং ০ ০ ০

এই প্রস্তারে অষ্টলঘু যোজনা করা হইয়াছে নিম্ন-লিখিতরূপে—

১ম কলায়—পা ১+মপ ১+মধ ১+নী ১+ধপ ১+মা ১+ধা ১+নী ১=৮

২য় কলায়—স নি নি ১+ধা ১+পা ১+পা ১+পা ১+পা ১+পা ১+পা ১+পা ১=৮

৩য় কলায়—ধা ১+নী ১+সা ১+সা ১+মা ১+মা ১+পা ১+পা ১=৮

৪র্থ কলায়—আটটি 'নী' স্বরে একটি করিয়া আটটি লঘু যোজনা করা হইয়াছে।

৫ম কলায়—নী ১+নী ১+ধপ ১+মা ১+নিধ ১+নিধ ১+পা ১+পা ১=৮

৬ষ্ঠ কলায়—পা ১+পা ১+রী ১+রী ১+রী ১+রী ১+রী ১+রী ১=৮

৭ম কলায়—মা ১+রি গ ১+সা ১+সধ ১+নী ১+নী ১+নী ১+নী ১=৮

৮ম কলায়—নী ১+নী ১+সা' ১+রি স' ১+রী' ১+রী' ১+রী' ১+রী' ১=৮

৯ম কলায়—নী ১+গা ১+সা ১+নিগ ১+সা ১+নী ১+নী ১+নী ১=৮

১০ম কলায়—নী ১+মা ১+নী ১+মা ১+পা ১+পা ১+গা ১+গা ১—৮

১১শ কলায়—গা ১+পা ১+মা ১+পা ১+নী ১+নী ১+নী ১+নী ১=৮

১২শ কলায়—মা ১+পা ১+মা ১+প রি গ ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮

১৩শ কলায়—নী ১+নী ১+পা ১+ধা ১+নী ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮

১৪শ কলায়—নী ১+নী ১+নী ১+নী ১+নী ১+নী ১+নী ১+নী ১=৮

১৫শ কলায়—মা ১+মা ১+ধা ১+নী ১+স নি নি +ধা ১+পা ১+পা ১=৮

১৬শ কলায়—মা ১+পা ১+মা ১+প রি গ ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮

উপরের প্রস্তারটি রচিত হইয়াছে নিম্নলিখিত পদ্যের উপর—

"কান্তং বামৈক দেশ প্রেঙ্খোলমান কমলনিভং,
বর সুরভি কুসুম গন্ধাধিবাসিত মনোজ্ঞনগরাজ—
সুসুরতি রাগ রভস
কেলীকুচগ্রহলীলম্।
তং প্রণমামি দেবং চন্দ্রার্দ্ধমণ্ডিত বিলাস কীলন
বিনোদম্॥"

আন্ধ্রী জাতি

এই জাতিতে নিষাদ ঋষভ গান্ধার ও পঞ্চম এই চারিটি স্বরের যে-কোন একটি অংশস্বর হইয়া থাকে। আন্ধ্রী জাতিতে ঋষভ ও গান্ধার স্বরের এবং নিষাদ ও ধৈবত স্বরের মধ্যে পরস্পর পূর্ব্বোক্তরূপ সন্নিধি ও মেলনাত্মক সঙ্গতি প্রয়োগ করিতে হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নি, রি, গ ও প এই চারিটি স্বরের মধ্যে যখন যেটি অংশস্বর হয়, সেই স্বরটি পূর্ব্বে উচ্চারণ করিয়া ক্রমে অপর স্বর উচ্চারণ পূর্ব্বক ন্যাস (গীতি সমাপ্তিকারী) স্বর পর্য্যন্ত গান করিতে হয়। ইহার মূর্চ্ছনা মধ্যম গ্রামীয় মধ্যমাদি। এই জাতি ষড়জলোপে ষাড়ব হইয়া থাকে। কলার সংখ্যা, তাল ও বিনিয়োগ গান্ধার-পঞ্চমী জাতির ন্যায়। ইহার ন্যাসস্বর গান্ধার,

অংশস্বরের যে-কোন একটি অপন্যাস স্বর হইয়া থাকে। ইহার প্রস্তার নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

গা	রী	রী	রী	রী	রী	রী	রী	১
ভ	কু	ণে	০	ন্দু	কু	সু	ম	
রী	গা	রী	গা	রী	রী	রী	রী	২
খ	চি	ত	জ	টং	০	০	০	
রী	রী	গা	গা	রী	রী	মা	মা	৩
ত্রি	দি	ব	ন	দী	স	লি	ল	
রী	গা	সা	ধনি	নী	নী	নী	নী	৪
ধৌ	০	ত	মু০	খং	০	০	০	
নী	রী	নী	রী	ধনি	ধনি	পা	পা	৫
ন	গ	সু	০	নূ০	০প্র	ণ	য়	
মা	পা	মা	বিগ	গা	গা	গা	গা	৬
বে	০	দ	নি০	ধিং	০	০	০	
রী	রী	গা	সস	মা	মা	পা	পা	৭
প	রি	ণা	০০	হি	তু	হি	ন	
মা	পা	মা	বিগ	গা	গা	গা	গা	৮
শৈ	০	ল	গৃ০	হং	০	০	০	
ধা	নী	গা	গা	গা	গা	গা	গা	৯
অ	মৃ	ত	ভ	বং	০	০	০	
পা	পা	মা	রিগ	গা	গা	গা	গা	১০
গু	ণ	র	হি০	তং	০	০	০	
নী	নী	নী	নী	রী	রী	রী	রী	১১
ত	ম	ব	নি	র	বি	শ	শী	
রী	রী	গা	নী	সা	সা	নী	নী	১২
জ্ব	ল	ন	জ	ল	প	র	ন	
পা	পা	মা	বিগ	গা	গা	গা	গা	১৩
গ	গ	ন	ত০	ঙ্গং	০	০	০	
রী´	রী´	র্গ	র্সর্ম	র্মা	র্মা	র্পা	র্পা	১৪
শ	র	ণং	০০	ব্র	জা	০	মি	
র্মা	র্মা	নী´	নী´	র্সা	রী´	র্গা	র্পা	১৫
শু	ভ	ম	তি	কৃ	ত	নী	ল	
রির্গ	র্গা	র্গা	র্গা	র্গা	র্গা	র্গা	র্গা	১৬
যং	০	০	০	০	০	০	০	

এই প্রস্তাবে অষ্টলঘু যোজনা নিম্নলিখিত রূপে করা হইয়াছে—

১ম কলায়—গা ১+রী ১+রী ১+রী ১+রী ১+রী ১+রী ১+রী ১=৮

২য় কলায়—রী ১+গা ১+রী ১+গা ১+রী ১+রী ১+রী ১+রী ১=৮

৩য় কলায়—রী ১+রী ১+গা ১+গা ১+রী ১+রী ১+মা ১+মা ১=৮

৪র্থ কলায়—রী ১+গা ১+সা ১+ধ নি ১+নী ১+নী ১+নী ১=নী ১=৮

৫ম কলায়—নী ১+রী ১+নী ১+রী ১+ধ নি ১+ধ নি ১+পা ১+পা ১=৮

৬ষ্ঠ কলায়—মা ১+পা ১+মা ১+রিগ ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮

৭ম কলায়—রী ১+রী ১+গা ১+স স ১+মা ১+মা ১+পা ১+পা ১=৮

৮ম কলায়—মা ১+পা ১+মা ১+বিগ ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮

৯ম কলায়—ধা ১+নী ১+গা ১+গা ১+গা+১+গা ১+গা ১+গা ১=৮

১০ম কলায়—পা ১+পা ১+মা ১+বি গ ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮

১১শ কলায়—নী ১+নী ১+নী ১+নী ১+রী ১+রী ১+রী ১+রী ১=৮

১২শ কলাল—রী ১+রী ১+গা ১+নী ১+সা ১+সা ১+নী ১+নী ১=৮

১৩শ কলায়—র্পা ১+র্পা ১+র্মা ১+রি র্গ ১+র্গা+১+র্গা ১+র্গা ১+র্গা ১=৮

১৪শ কলায়—রী´ ১+রী´ ১+র্গা ১+র্সর্ম ১+র্মা ১+র্মা ১+র্পা ১+র্পা ১=৮

১৫শ কলায়—র্মা ১+র্মা ১+নী´ ১+নী´ ১+র্সা ১+রী´ ১+র্গা ১+র্পা ১=৮

১৬শ কলায়—রির্গ ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮

আন্ধ্রীর এই প্রস্তারটি করা হইয়াছে নিম্নলিখিত পদ্যের উপর—

"তরুণেন্দু কুসুম খচিত জটং ত্রিদিব নদীসলিল ধৌতমুখং।
নগসূনুপ্রণয়ং বেদনিধিং পরিণাহি তুহিন শৈল গৃহম্।
অমৃত ভবং গুণ রহিতং তমবনি রবি শশি জ্বলন-জল-
পবনগগনতনুং
শরণং ব্রজামি শুভমতিকৃত-নিলয়ম্॥"

নন্দয়ন্তী জাতি

নন্দয়ন্তী জাতির অংশস্বর পঞ্চম, গ্রহস্বর গান্ধার, মতান্তরে পঞ্চমই গ্রহস্বর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই জাতি ষড়জ লোপে ষাড়ব হইয়া থাকে। ইহাতে মন্দ্র ঋষভের বহুল প্রয়োগ হয়, এই জাতি মধ্যম গ্রামের অন্তর্গত, মূর্চ্ছনা হৃষ্যকা (গান্ধারাদি) তাল পূর্ব্ববৎ চঞ্চৎপুট। কলা বত্রিশটি। নাটকের প্রথম অঙ্কে ধ্রুবা গান রূপে এই জাতি প্রযুক্ত হয়। ইহার ন্যাসস্বর গান্ধার, মধ্যম অপন্যাস স্বর। ইহার প্রস্তাব নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

গা গা গা গা পা পা ধপ মা ১
সৌ ° ° ° ° ° °° °

ধা ধা ধা ধা ধা নী সনিনিধা ২
°°°

পা পা পা পা পা পা পা প
ম্যং ° ° ° ° ° ° °

ধা নী মা পা গা গা গা গা
বে ° দা ° ন্ব বে ° দ

মা রী গা গা গা গা গা গা
ক র ক ম ল যো ° নি

মা মা পা পা ধা নিধ পা পা ৬
ত মো র জো ধি ব° ° °°

ধা নী মা পা গা গা গা গা ৭
র্জি তং ° ° ° ° ° °

গম পা পা পা মা মা গা গা ৮
হরং ° ° ° ° ° ° °

ধা নী মা পা গা গা গা গা
ভ ব হ র ক ম ল গৃ

মা মা মা মা মা মা মা মা ১০
হং ° ° ° ° ° ° °

রী গা মা পা পম পা পা নী ১১
শি বং শা ° স্তং° স ° ন্নি

রী রী রী রী পা পা মা মা ১২
বে ° শ ন ম পূ ° র্বং

ধা নী সনিনিধা পা পা পা পা ১৩
ভূ ষ °°° ণ লী ° লং °

ধা নী মা পা গা গা গা গা ১৪
উ র গে ° শ ভো ° গ

গা পা পা সা ধা মা গা মা ১৫
ভা ° সু র শু ভ পৃ থু

ধা ধা নী ধা পা পা পা পা ১৬
লং ° ° ° ° ° ° °

রী গা মা পা পম পা পা নী ১৭
অ চ ল প তি° সূ নু °

রী রী রী রী পা পা পা পা ১৮
ক র প ° ঙ্ক জা ° ম

পা গা পা পা ধা মা মা মা ১৯
ল বি লা ° স কী ° ল

নী পা গা গম গা গা গা গা ২০
ন বি নো °° দং ° ° °

রী রী গা গা মা মা মা মা ২১
স্ফ টি ক ম ণি র জ ত

নী পা নী মা নী ধা পা পা ২২
সি ত ন ব হু কু ° ল

সা' সা' ধনি ধা পা পা পা পা ২৩
ক্ষী ° রো দ ° সা ° ° গ

মা পা মা পরিগ গা গা সা' সা' ২৪
র নি কা °°° শং ° ° °

রী রী গা গা মা মা পা পা ২৫
অ জ শি রঃ ক পা ° ল

রী	রী	রী	গা	মা	রিগ	মা	মা	২৬
পৃ	থু	ভা	০	০	জ ০	নং	০	
মা	নী	পা	নী	গা	গা	গা	গা	২৭
ব	০	ন্দে	০	সু	খ	দং	০	
মা	মা	পা	পা	ধা	ধনি	নিধ	মা	২৮
হ	র	দে	০	হ	ম ০	ম ০	ল	
ধা	ধা	সা	নী	ধা	নী	পা	পা	২৯
ম	ধু	সূ	০	দ	ন	০	সু	
রী'	রী'	রী'	রী'	মা	পা	ধা	মা	৩০
তে	০	জো	০	ধি	ক	০	সু	
নী	নী	নী	নী	ধা	পা	মা	মা	৩১
গ	তি	যো	০	০	০	০	০	
মা পরিগ	গা	গা	গা	গা	গা	গা		৩২
০ ০০০	নিং	০	০	০	০	০		

নন্দয়ন্তী জাতির অষ্টলঘু যোজনা নিম্নলিখিতরূপে করা হইয়াছে—

১ম কলায় গা ১+গা ১+গা ১+গা ১+পা ১+পা ১+ধপ ১+মা ১=৮

২য় কলায়—ধা ১+ধা ১+ধা ১+ধা ১+ধা ১+নী ১+স নি নি ১+ধা ১=৮

৩য় কলায়—আটটি মন্দ্র পা স্বরে একটি করিয়া আটটি লঘুযোজনা করা হইয়াছে।

৪র্থ কলায়—ধা ১+নী ১+মা ১+পা ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮

৫ম কলায়—মা ১+রী ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮

৬ষ্ঠ কলায়—মা ১+মা ১+পা ১+পা ১+ধা ১+নিধ ১+পা ১+পা ১=৮

৭ম কলায়—ধা ১+নী ১+মা ১+পা ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮

৮ম কলায়—গম ১+পা ১+পা ১+পা ১+মা ১+মা ১+গা ১+গা ১=৮

৯ম কলায়—ধা ১+নী ১+মা ১+পা ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮

দশম কলায় আটটি মা স্বরে একটি করিয়া অষ্টলঘু যোজনা করা হইয়াছে।

১১শ কলায়—রী ১+গা ১+মা ১+পা ১+পম ১+পা ১+পা ১+নী ১=৮

১২শ কলায়—রী ১+রী ১+রী ১+রী ১+পা ১+পা ১+মা ১+মা ১=৮

১৩শ কলায়—ধা ১+নী ১+স নি নি ১+ধা ১+পা ১+পা ১+পা ১+পা ১=৮

১৪শ কলায়—ধা ১+নী ১+মা ১+পা ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮

১৫শ কলায়—গা ১+পা ১+পা ১+পা ১+ধা ১+মা ১+গা ১+মা ১=৮

১৬শ কলায়—ধা ১+ধা ১+নী ১+ধা ১+পা ১+পা ১+পা ১+পা ১=৮

১৭শ কলায় রী ১+গা ১+মা ১+পা ১+পম ১+পা ১+পা ১+নী ১=৮

১৮শ কলায়—রী ১+রী ১+রী ১+রী ১+পা ১+পা ১+পা ১+পা ১=৮

১৯শ কলায়—পা ১+পা ১+পা ১+পা ১+ধা ১+মা ১+মা ১+মা ১=৮

২০শ কলায়—নী ১+পা ১+গা ১+গম ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮

২১শ কলায়—রী ১+রী ১+গা ১+গা ১+মা ১+মা ১+মা ১+মা ১=৮

২২শ কলায়—নী ১+পা ১+নী ১+মা ১+নি ১+ধা ১+পা ১+পা ১=৮

২৩শ কলায়—সা' ১+সা' ১+ধ নি ১+ধা ১+পা ১+পা ১+পা ১+পা ১=৮

২৪শ কলায়—মা ১+পা ১+মা ১+প রি গ ১+ গা ১+গা ১+সা' ১+সা' ১=৮

২৫শ কলায়—রী ১+রী ১+গা ১+গা ১+মা ১+ মা ১+পা ১+পা ১=৮

২৬শ কলায়—রী ১+রা ১+রী ১+গা ১+মা ১+ রি গ ১+মা ১+মা ১=৮

২৭শ কলায়—মা ১+নী ১+পা ১+নী ১+গা ১+ গা ১+গা ১+গা ১=৮

২৮শ কলায়—মা ১+মা ১+পা ১+পা ১+ধা ১+ ধ নি ১+নি ধ ১+মা ১=৮

২৯শ কলায়—ধা ১+ধা ১+সা ১+নী ১+ধা ১+ নী ১+পা ১+পা ১=৮

৩০শ কলায়—রী' ১+রী' ১+রী' ১+রী' ১+মা ১+ পা ১+ধা ১+মা ১=৮

৩১শ কলায়—নী ১+নী ১+নী ১+নী ১+ধা ১+ পা ১+মা ১+মা ১=৮

৩২শ কলায়—মা ১+প রি গা ১+গা ১+গা ১+ গা ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮

এই প্রস্তারটি করা হইয়াছে নিম্নলিখিত পদ্যের উপরে—

"সৌম্যং বেদাঙ্গ বেদ-কর কমল যোনিং তমোরজো-
বিবর্জ্জিতং হরং
ভবহর কমলগৃহং শিবং শান্তং সন্নিবেশনমপূর্ব্বং
ভূষণলীল মুরগেশ ভোগভাসুর শুভ পৃথুলম্।
অচলপতি সুনুকর পঙ্কজামল বিলাস কীলনবিনোদং
স্ফটিক মণিরজতসিত নবদুকুলক্ষীরোদ সাগর নিকাশম্।
অব্জশিরঃ কপাল পৃথুভাজনং বন্দে সুখদং
হর দেহমমলমধুসূদন সুতেজোধিক সুগতি যোনিম্।"

শার্ঙ্গদেব এইরূপে শুদ্ধ জাতি সাতটি ও বিকৃত জাতি এগারটি মোট আঠারটি জাতির লক্ষণ বলিয়া তাহার প্রস্তাব প্রদর্শন পূর্ব্বক জাতি প্রকরণের শেষভাগে বলিয়াছেন —পূর্ব্বোক্ত জাতিসমূহের লক্ষণে যে যে জাতির তাল বলা হয় নাই, সেই সেই জাতিতে চঞ্চৎপুট বা পঞ্চপাণি তালের এক কল, দ্বিকল ও চতুষ্কল এই তিন প্রকারই হইতে পারে। ইতিপূর্ব্বেও বলা হইয়াছে এক কল তাল হইলে চিত্রমার্গ, মাগধী গীতি। দ্বিকল তাল হইলে বৃত্তিমার্গ সম্ভাবিতা গীতি। চতুষ্কল তালে দক্ষিণ মার্গে পৃথুলা গীতি হইবে।

ষাড়জী প্রভৃতি জাতির লক্ষণে কলার যে সংখ্যা বলা হইয়াছে তাহা দক্ষিণ মার্গ অনুসারে, সুতরাং সেই সেই জাতিতে তালও হইবে দক্ষিণ মার্গের নিয়মে চতুষ্কল, গীতিও হইবে পৃথুলা। এই জাতিসমূহ বার্ত্তিক মার্গে প্রয়োগ করিলে পূর্ব্বকথিত কলা সংখ্যা দ্বিগুণ, চিত্রমার্গে প্রয়োগ করিলে চতুর্গুণ হইবে। সুতরাং ষাড়জী জাতিতে যে দ্বাদশটি কলা বলা হইয়াছে, তাহা দক্ষিণ মার্গে। বার্ত্তিক মার্গে ষাড়জী জাতির কলা-সংখ্যা হইবে দক্ষিণ মার্গের দ্বিগুণ (১২×২=২৪) চব্বিশ। চিত্রমার্গে কলা-সংখ্যা হইবে (দক্ষিণ মার্গীয় কলা-সংখ্যার চতুর্গুণ ১২×৪=৪৮) আটচল্লিশ। ষাড়জী জাতির পূর্ব্বোক্ত কলা-সংখ্যা ১২ যেখানে বার্ত্তিক মার্গের দ্বিগুণ হইয়া ২৪ সংখ্যায় পরিণত হইবে, সেখানে ব্রহ্মার কথিত ষাড়জী জাতির পদ্যটিই বার ভাগ স্থলে চব্বিশ ভাগে বিভক্ত হইবে। এক একটি কলা যেখানে দক্ষিণ মার্গে অষ্টলঘু ছিল, বার্ত্তিক মার্গে এক একটি কলা হইবে চতুর্লঘু বা চারিটি লঘু পরিমিত। আবার চিত্র মার্গে কলা-সংখ্যা আটচল্লিশ হইলে ব্রহ্মার কথিত ঐ পদ্যটিই আটচল্লিশ ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবে। চিত্রমার্গে এক একটি কলা হইবে দ্বিলঘুপরিমিত। এইরূপ অন্যান্য জাতিগুলিকেও বার্ত্তিক ও চিত্রমার্গের উপরিলিখিত পরিবর্ত্তনের পদ্ধতিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হইবে। আর একটি কথা এই যে, সাত প্রকার শুদ্ধ জাতি বলা হইল— ইহা হইতে বিকৃত জাতি ও অন্যান্য গ্রামরাগ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং এই সকল জাতিতে অন্য রাগের একদেশ বিদ্যমান রহিয়াছে। জাতি ও রাগ সম্বন্ধে যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা রাগজনক এই জাতিসমূহে স্ব স্ব জন্য রাগের ছায়া লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মার কথিত পূর্ব্বোক্ত পদ্যসমূহের সহিত সম্মিলিত করিয়া যাঁহারা ভগবান্ মহেশ্বরের স্তুতিরূপে এই সকল জাতি সম্যকরূপে প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রযুক্ত এই জাতিসমূহ গায়ক ও শ্রোতাকে ব্রহ্মহত্যার পাতক প্রক্ষালনে পবিত্র করিয়া থাকে। ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদের মন্ত্রসমূহের অক্ষর পরিপাটি যেমন অপরিবর্ত্তনীয়, সেইরূপ সামবেদ-সমুদ্ভূত বেদ-সদৃশ এই জাতিসমূহের পূর্ব্বকথিত স্বর তাল প্রভৃতি নিয়মলঙ্ঘন প্রত্যবায়জনক।

জাতি-সংখ্যা	জাতির নাম	অংশস্বর	ন্যাসস্বর	অপন্যাসস্বর	মূর্চ্ছনা	ষাড়ব	ঔড়ু
১	ষাড়জী	স গ ম প ধ	স	গ, প	উত্তরায়তা	নি লোপে	
২	আর্ষভী	রি ধ নি	রি	রি ধ নি	শুদ্ধষড়জা	স লোপে	স, প, লোপে
৩	গান্ধারী	স গ ম প নি	গ	স প	পৌরবী	রি লোপে	নি ধ লোপে
৪	মধ্যমা	স রি ম প ধ	ম	স রি ম প ধ	কলোপনতা	গ লোপে	নি গ লোপে
৫	পঞ্চমী	রি প	প	রি, প, নি	কলোপনতা	গ লোপে	নি গ লোপে
৬	ধৈবতী	রি ধ	ধ	রি, ম, ধ	অভিরুদ্গতা	প লোপে	স প লোপে
৭	নৈষাদী	স গ নি	নি	স গ নি	"	"	"
৮	ষড়জ কৈশিকী	স গ প	গ	স প নি	"	"	"
৯	ষড়জো-দীচ্যবা	স ম ধ নি	ম	স ধ	অশ্বক্রান্তা	রি লোপে	রি প লোপে
১০	ষড়জ-মধ্যমা	স রি গ ম প ধ নি	স, ম,	স রি গ ম প ধ নি	মৎসরীকৃতা	নি লোপে	নি গ লোপে
১১	গান্ধারো দীচ্যবো	স ম	ম	স ধ	পৌরবী	রি লোপে	
১২	রক্ত গান্ধারী	স গ ম প নি	গ	গ	কলোপনতা	রি লোপে	রি ধ লোপে
১৩	কৈশিকী	স গ ম প ধ নি	গ প নি	ম গ ম প ধ নি	হারিণাশ্বা	"	"
১৪	মধ্যমো দীচ্যবা	প	ম	রি প ধ নি	শুদ্ধমধ্যা	.	
১৫	কার্ম্মারবী	রি প ধ নি	প	রি প ধ নি	শুদ্ধমধ্যা		
১৬	গান্ধার পঞ্চমী	প	গ	রি, প	হারিণাশ্বা		
১৭	আন্ধ্রী	রি গ প নি	গ	রি গ প নি	সৌবীরী	স লোপে	.
১৮	নন্দয়ন্তী	প	গ	ম প	হারিণাশ্বা	স লোপে	

কপালী

শার্ঙ্গদেব পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ প্রকার জাতি নিরূপণের পরে 'কপাল'নামক আরও একপ্রকার গীতি নিরূপণ করিয়াছেন। ষাড়জী প্রভৃতি জাতিসমূহ হইতে যেমন শ্রীরাগ প্রভৃতি রাগ-নিচয় উৎপন্ন হইয়া থাকে, তেমনই শুদ্ধ সাত প্রকার জাতি হইতে কপাল নামে আরও এক প্রকার গীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন, ঘটের একদেশ বা কপাল দর্শনমাত্রেই দ্রষ্টার হৃদয়ে ঘটের স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ ঘট-স্থানীয় রাগসমূহের ছায়াযুক্ত বলিয়া কপাল গানকালে তৎ-সদৃশ রাগনিচয়ের ছায়া উদ্বুদ্ধ হয়। এই জন্য এই শ্রেণীর গীতি কপাল নামে অভিহিত। এতদ্ভিন্ন আরও একটি কারণে এই জাতীয় গীতিকে 'কপাল' বলা হয়—কথিত আছে, ভগবান মহেশ্বর ভিক্ষা করিবার সময়ে ষাড়জী প্রভৃতি জাতি গান করিতে থাকিলে নিরতিশয় রসের অভিব্যক্তি হওয়ায় তাঁহার মস্তকস্থিত চন্দ্রকলা হইতে সুধাময় রসধারা বিগলিত হয় এবং তাহাদ্বারা মহাদেবের অঙ্গভূষণ ব্রহ্মকপাল সঞ্জীবতা লাভ করিয়া ভগবানের গানের অনুকরণে গান

করিতে থাকে। সেই কপাল গীত গানসমূহই 'কপাল' নামে অভিহিত হইয়াছে। কপাল-গীতি সাত প্রকার। নিম্নে ইহাদের লক্ষণ বলা যাইতেছে—

(১) ষাড়জী-কপাল—ইহার গ্রহ, অংশ ও অপন্যাস-স্বর ষড়জ, গান্ধার ন্যাসস্বর। গান্ধার ও মধ্যমের অতিবহুল প্রয়োগ, ঋষভ, পঞ্চম, নিষাদ ধৈবতের অল্প প্রয়োগ হইয়া থাকে। ঋষভ স্বর জাতিপ্রকরণবর্ণিত লঙ্ঘনের নিয়মে ব্যবহৃত হয়। ইহার কলা দ্বাদশটি।

(২) আর্ষভী-কপাল—এই গীতিতে ঋষভ অংশ ও অপন্যাসস্বর, মধ্যম ন্যাসস্বর, গান্ধার নিষাদ পঞ্চম ও ধৈবতস্বর অল্প, ষড়জস্বর অত্যল্প, কলা আটটি।

(৩) গান্ধারী-কপাল—মধ্যম ইহার অংশ গ্রহ ন্যাস ও অপন্যাস স্বর। এই কপালে ধৈবতের বাহুল্য, ষড়জ, ঋষভ ও গান্ধারের অল্পতা। ঋষভ ও পঞ্চমের লোপে এই কপাল ঔড়ুবে পরিণত হইয়া থাকে। ইহার কলা আটটি।

(৪) মধ্যমা-কপাল—মধ্যম ইহার অংশস্বর, নিষাদ, ঋষভ গান্ধার ও পঞ্চম ইহাতে অল্প প্রয়োগ হয়, ইহার কলা নয়টি।

(৫) পঞ্চমী-কপাল—ঋষভ ইহার অংশস্বর, ষড়জ গ্রহস্বর, নিষাদ, ধৈবত, ষড়জ গান্ধার ও মধ্যমস্বরের অল্পতা। এই কপালের কলা আটটি।

(৬) ধৈবতী-কপাল—এই কপাল আটটি কলায় রচিত হয়। ইহাতে ঋষভ ও গান্ধার অত্যল্প এবং মধ্যম ও ধৈবত বহুল প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার ন্যাস স্বর, অন্যান্য লক্ষণ ষাড়জী কপালের ন্যায়।

(৭) নৈষাদী-কপাল—ইহার গ্রহ অংশ ও ন্যাস স্বর ষড়জ, ইহাতে ঋষভ ও গান্ধারস্বর অল্প, নিষাদ ধৈবত ও মধ্যম অতিবহুলভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই কপালের কলা আটটি।

শার্ঙ্গদেব এইরূপে সাতটি কপালের লক্ষণ বলিয়া কপাল গানের ফল বলিয়াছেন—যাঁহারা ব্রহ্মার কথিত পদ ও স্বর অবলম্বনে ভগবান মহেশ্বরকে স্তুতি উপলক্ষে এই সাতটি কপাল গান করেন, তাঁহারা কল্যাণলাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মার কথিত কপাল সমূহের পদাবলী নিম্নে বলা যাইতেছে—

ষাড়জী-কপালের পদাবলী:—ঝণ্টুং ঝণ্টুম্ ॥১॥ খট্টাঙ্গ ধরম্ ॥২॥ দ্রংষ্ট্রা করালম্ ॥৩॥ তড়িৎ-সদৃশ-জিহ্বম্ ॥৪॥ হৌ হৌ হৌ হৌ হৌ হৌ হৌ হৌ ॥৫॥ বহুরূপবদনম্ ঘন-ঘোর নাদম্ ॥৬॥ হৌ হৌ হৌ হৌ হৌ হৌ হৌ হৌ ॥৭॥ উং উং হ্রাং ত্রৌং হৌং হৌং হৌং হৌং ॥৮॥ নৃমুণ্ডমণ্ডিতম্ ॥৯॥ হুং হুং কহ কহ হুং হুং ॥১০॥ কৃতবিকট মুখম্ ॥১১॥ নমামি দেবং ভৈরবম্ ॥১২॥

আর্ষভী-কপালের পদাবলী:—ঝনটুং ঝনটুম্ ॥১॥ দ্রংষ্ট্রা করালম্ ॥২॥ উং উং হ্রোং ত্রৈং হৌ হৌ হৌ হৌ ॥৩॥ হৌ হৌ হৌ ঐং হৌ হৌ হৌ হৌ ॥৪॥ বরসুরভিকুসুম ॥৫॥ চর্চিত গাত্রম্ ॥৬॥ কপাল হস্তম্ ॥৭॥ নমামি দেবম্ ॥৮॥

গান্ধারী-কপালের পদাবলী:—চলতরঙ্গ ॥১॥ ভঙ্গুরং অ ॥২॥ নেকরেণু ॥৩॥ পিঞ্জরং সু ॥৪॥ রাসুরৈঃ সুসেবিতং পু ॥৫॥ নাতু জাহ্ন ॥৬॥ বীজলং মাং ॥৭॥ বিন্দুভিঃ ॥৮॥

মধ্যমা-কপালের পদাবলী:—শূলকপাল ॥১॥ পাণি ত্রিপুর বিনাশি ॥২॥ শশাঙ্ক ধারিণম্ ॥৩॥ ত্রিনয়ন ত্রিশূলম্ ॥৪॥ সতত মুময়া সহি ॥৫॥ তং বরদং হৈ হৈ হৈ হৈ ॥৬॥ হৈ হৈ হৈ হৈ হৈ ॥৭॥ হৈ হৈ হৈ হৈ হৈ ॥৮॥ নৌমি মহাদেবম্ ॥৯॥

পঞ্চমী-কপালের পদাবলী:—জয়বিষমনয়ন ॥১॥ মদন-তনুদহন ॥২॥ বরবৃষভগমন ॥ ॥ পুরদহন ॥৪॥ নত সকল ভুবন ॥৫॥ সিতকমল বদন ॥৬॥ ভব মে ভয়হর ॥৭॥ ভব শরণম্ ॥৮॥

ধৈবতী-কপালের পদাবলী:—অগ্নি জ্বালাশি ॥১॥ খাবলি ॥২॥ মাংসশোণিত ॥৩॥ ভোজিনি সর্বাহারি ॥৪॥ ণি নির্মাংসে ॥৫॥ চার্পণে ॥৬॥ নমোস্তুতে ॥৭॥

নৈষাদী-কপালের পদাবলী:—স ব স গ জ চ র্ম পটম্ ॥১॥ ভীমভুজঙ্গমানদ্ধজটম ॥২॥ কহ কহ হুংকৃত বিকৃত মুখম্ ॥৩॥ নম তং শিবং হরমজিতম্ ॥৪॥ চন্দ্রচূড়ম-জেয়ম্ ॥ ৫ ॥ কপালমণ্ডিত মুকুটম্ ॥ ৬ ॥ কামদর্প বিধ্বংস করম্ ॥ ৭ ॥ নম তং হরং পরমশিবম্ ॥৮॥*

* এই প্রবন্ধের পরের অংশ গত মাঘ মাসের ভারতবর্ষে পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। আবার ইহার পূর্ব্বাংশের অর্দ্ধেক গত ভাদ্রমাসে প্রকাশিত হইয়াছে ও অপরার্দ্ধ পরে প্রকাশিত হইবে। পাঠকগণের সুবিধার জন্ত ইহা জানাইয়া দেওয়া হইল—লেখক।

জঙ্গম

বনফুল

২০

করালিচরণ বক্সী তন্ময় হইয়া একখানি উপন্যাস পাঠ করিতেছিলেন। বামহস্তে জ্বলন্ত সিগারেটটি নিঃশব্দে পুড়িতেছিল। সিগারেটের ভস্মীভূত খানিকটা অংশ পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, ঝাড়া হয় নাই—করালিচরণের ঝাড়িবার অবসর ছিল না। একাগ্রচিত্তে তিনি বর্জ্জাইস অক্ষরে ছাপা উপন্যাসখানি গ্রাস করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছিল, একমাত্র চক্ষুটিও কখনও নিষ্প্রভ কখনও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল।

নড়িয়া চড়িয়া বসিতেই সিগারেটের লম্বা পোড়া ছাইটা পুস্তকের উপর পড়িয়া গেল। করালিচরণ বিরক্তভাবে সিগারেটটার দিকে চাহিলেন এবং তাহাতে গোটা দুই লম্বা টান মারিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর ফুঁ দিয়া ছাইগুলি পুস্তকের পাতা হইতে পরিষ্কার করিতে গিয়া কিন্তু মুস্কিলে পড়িয়া গেলেন, ফুৎকারে মোমবাতিটা নিবিয়া গেল।

বাই নারায়ণ!

হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দেশলাই খুঁজিতে গিয়া একটা কাগজের তাড়া তাঁহার হাতে ঠেকিল। ভন্টুবাবু যে ঠিকুজি-কুষ্ঠিগুলা সকালে দিয়া গিয়াছেন সেইগুলাই সম্ভবত, তেমনই পড়িয়া আছে, খুলিয়া পর্য্যন্ত দেখা হয় নাই। দেশলাইটা গেল কোথা! বসিয়া বসিয়াই হাত বাড়াইয়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া খুঁজিতে লাগিলেন, পাওয়া গেল না। বিরক্ত করালিচরণ অতিশয় অপ্রসন্নচিত্তে শেষে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। মোড়ের ওই পানওয়ালিটার শরণাপন্ন হইতে হইতে হইবে শেষকালে! যদি অবশ্য তাহার দোকান এতরাত্রি পর্য্যন্ত খোলা থাকে! ওই কাজলপরা, মাথায় ফুলগোঁজা, দাঁতে মিশি-লাগানো প্রৌঢ় পানওয়ালিটাকে দেখিলে করালিচরণের আপাদমস্তক জ্বলিতে থাকে, অথচ এই পানওয়ালিটিই ছোটখাটো আপদে বিপদে তাহাকে সর্ব্বদা উদ্ধার করে। ধারে সিগারেট দেশলাই তো সে ক্রমাগত দিয়া চলিয়াছে। ভন্টুবাবুর হাতে টাকাকড়ি। আগের মত যখন তখন যেমন তেমন ভাবে খরচ করিবার উপায় নাই। ওই পানওয়ালিটির কৃপায় তবু মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়া খানিকটা খরচ করিয়া ফেলিবার সুবিধা আছে। ধারে জিনিস দেয় এবং ভন্টুবাবুকে বাধ্য হইয়া তাহা শোধ করিতে হয়।··করালিচরণ অন্ধকারেই পথ খুঁজিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন পানওয়ালি দোকান বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কি মুস্কিল! সামান্য একটা দেশলাইয়ের অভাবে পড়া হইবে না—সমস্ত মাটি হইয়া যাইবে! নির্লোম ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া তিনি গলির প্রান্তস্থিত পানওয়ালির বন্ধ দোকানের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। ভন্টুর বাইসিকেলের ঘণ্টা শোনা গেল এবং ক্ষণপরেই ভন্টু আসিয়া সহাস্যমুখে বাইক হইতে অবতরণ করিল।

বাইরে দাঁড়িয়ে যে?

আরে আমি তো মাটির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি, মিস মারগারেট কার্ণিশ ধরে শূন্যে ঝুলছে!

মিস মারগারেট!

দেশলাই আছে কি না আগে বলুন।

আছে, চলুন ভেতরে যাওয়া যাক, আমার বাইকে লাইট নেই দেখে এক চামচন্নু তাড়া করেছিল এখুনি, পালিয়ে এসেছি আমি, এখানে আবার না এসে পড়ে ব্যাটা, চলুন ভেতরে ঢুকে পড়া যাক।

চন্নু, মানে পুলিশ? আপনি একদিন একটা কেলেঙ্কারি না করে ছাড়বেন না দেখছি। লাইট কিনে ফেলুন না একটা—

উভয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ভন্টু বাইকটাকেও টানিয়া ভিতরে ঢুকাইয়া লইল। পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া মোমবাতিটি জ্বালিয়া দিল। বলিল, এ যে নিতান্ত স্মলিশ্ গুটুকু দেখছি—

সত্যই মোমবাতিটি অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছিল, বেশীক্ষণ টিকিবে বলিয়া মনে হয় না।

মোমবাতি জ্বলিতেই করালিচরণ পড়িতে সুরু করিয়াছিলেন, ভনুটুর কথা শুনিয়া বলিল, দেখুন তো ওদিকের তাকটায় আর একটা মোমবাতি আছে বোধ হয়।

আলমারির পাশেই যে ছোট তাকটি তিনি দেখাইলেন সেটিতে কতকগুলি ধূলিধূসর পুস্তক হেলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভনুটু সেগুলি সরাইয়া সরাইয়া দেখিতে লাগিল, করালিচরণ ঝুঁকিয়া পড়িয়া পড়িতে লাগিলেন। বইটা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে অন্য কোন ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব।

ওরে বাপ্ রে—চাম গ্যান্ ঢ অ—

ভনুটু সহসা চীৎকার করিয়া পিছাইয়া আসিল।

করালিচরণ সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, কি, হ'ল কি?

ভীষণ টিকটিকি একটা, গোদা চাম—দেখুন, দেখুন!

সত্যই বেশ বড় একটা টিকটিকি দেওয়ালের উপর উঠিয়া আসিয়াছিল। করালিচরণ বলিলেন, কেন বিরক্ত করছেন ওকে! ও অনেকদিন থেকে আছে আমার কাছে। আলোর কাছে এসে পোকামাকড় ধরে টরে খায়, থাকে ওই বইগুলোর পেছনে, ছেড়ে দিন, বিরক্ত করবেন না ওকে—

করালিচরণ পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন। ভনুটু মুখ বিকৃতি করিয়া তাহাকে পিছন হইতে ভ্যাংচাইতে লাগিল। বেশ খানিকক্ষণ ভ্যাংচাইয়া অবশেষে ভনুটু সহজকণ্ঠে বলিল, কই, এখানে মোমবাতি তো নেই।

পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়া করালিচরণ বলিলেন, মোমবাতি জোগাড় করুন তা হ'লে একটা, এটা তো গেল—

ক'পাতা বাকী আছে আপনার আর?

পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠাটি উল্টাইয়া দেখিয়া করালিচরণ বলিলেন, বেশী নাই আর, পাতা কুড়ি আছে—তাহার পর ভনুটুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, অদ্ভুত বই, বাই নারায়ণ! শেষ করতে হবে এখুনি, যান আপনি মোমবাতি নিয়ে আসুন। কথা বলবেন না—যান, সময় নষ্ট হ'চ্ছে আমার!

হ্রস্বায়মান মোমবাতিটির দিকে চকিতে চাহিয়া করালিচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আবার পড়িতে সুরু করিলেন। ভনুটু চক্ষু দুইটি ছোট করিয়া বিকৃতমুখে খানিকক্ষণ করালিচরণের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর পকেট হইতে দুইটি আঙুলের মত সরু সরু মোমবাতি বাহির করিল, একটি লাল, আর একটি সবুজ।

দেখুন তো, এতে হবে?

করালিচরণ কোন উত্তর দিলেন না, গল্পে আবার তিনি তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন।

ভনুটু পুনরায় বলিল, 'দেখুন না এতে হবে কি-না!

বিরক্ত করালিচরণ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, আঃ কি গোলমাল করছেন বারবার! ও, মোমবাতি? পেলেন কোথা থেকে? ভয়ঙ্কর সরু যে, কোথা থেকে পেলেন বলুন তো?

আমার কাছেই ছিল, বাইকে বাতি নেই, কাগজের ঠোঙার ভেতর এইগুলো জেলেই চালাতে হচ্ছে আজকাল—

করালিচরণ ভনুটুর শেষের কথাগুলি শুনিলেন কি-না সন্দেহ, কারণ আবার তিনি পড়িতে সুরু করিয়াছিলেন। ভনুটু স্মিতহাস্যে তাঁহার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। একটু পরেই অবশ্য পড়া বন্ধ করিয়া নূতন একটি মোমবাতি ধরাইবার প্রয়োজন হইল।

ভনুটু বলিল, আপনি এইটে জ্বালিয়ে পড়তে থাকুন, আমি আর একটা জ্বালিয়ে ততক্ষণ চট ক'রে কিছু বড় মোমবাতি কিনে আনি—ঘোরজালে ফেললেন দেখছি আজকে।

করালিচরণ কোন উত্তর না দিয়া পড়িতে লাগিলেন ভনুটু বাইক লইয়া বাহির হইয়া গেল।

ভনুটু যখন ফিরিল তখন করালিচরণের উপন্যাস শেষ হইয়াছে। ভনুটু দেখিল, তিনি নির্ব্বাণোন্মুখ মোমবাতিটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। ভনুটু আসিতেই তিনি মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে তাকাইলেন। সেই স্বল্পালোকেই ভনুটু লক্ষ্য করিল, তাঁহার চক্ষুটি অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, অক্ষিকোটরের মধ্যে একখণ্ড অঙ্গার যেন জ্বলিতেছে। ভনুটু কেমন যেন ভয় পাইয়া গেল।

মোমবাতি এনেছেন?

এনেছি।

একটু থামিয়া ভনুটু বলিল, আচ্ছা আপনি রোজ

মোমবাতি জ্বালান কেন বলুন তো, একটা লণ্ঠন কিনলে অনেক সস্তায় হয়—

সস্তা ? হ্যাঁ, তা বোধ হয় হয়।

করালিচরণ আর কিছু বলিলেন না, নির্ব্বাণোন্মুখ কম্পিত শিখাটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

ভন্টু মোমবাতির প্যাকেট হইতে একটি মোমবাতি তাড়াতাড়ি ধরাইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিল।

কেমন সুন্দর দেখুন তো!

নূতন শিখাটির পানে করালিচরণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর বলিলেন, আপনি আরব্য উপন্যাস পড়েছেন ভন্টুবাবু?

পড়েছি।

তাতে গোড়াতেই আছে শাহরিয়ার নামে এক সুলতান রোজ একটা মেয়েকে বিয়ে করত, আর রোজ তাকে মেরে ফেলত। মনে আছে?

মনে আছে বই কি

আমার যদি ক্ষমতা থাকত আমিও তাই করতাম। সে ক্ষমতা নেই, তাই তার বদলে রোজ নতুন নতুন মোমবাতি জ্বালাই। একটা নিঃশেষ হয়ে গেলে আর একটা জ্বালাই, সেটা নিঃশেষ হয়ে গেল আর একটা। সারাজীবন ক্রমাগত মোমবাতি জ্বালিয়ে যাব একটার পর একটা, একটার পর একটা—

লণ্ঠন জ্বালালে একটু সস্তায় হয় তাই বলছিলাম।

লণ্ঠন! পুরোনো কালিঝুলি মাখা একটা লণ্ঠন সামনে জ্বালিয়ে আজীবন কাটিয়ে দেব সস্তায় হবে বলে! বলেন কি আপনি!

করালিচরণের কথাবার্ত্তা ভন্টুর ঠিক বোধগম্য হইতেছিল না। সে মোমবাতি-প্রসঙ্গে আর কোন উচ্চবাচ্য করা নিরাপদ মনে করিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, যে কুষ্ঠি দুটো দিয়ে গেসলাম, দেখেছেন? টাকা দিয়ে দিয়েছে তারা।

কই টাকা, দিন।

করালিচরণ হস্ত প্রসারিত করিলেন।

ভন্টু পকেট হইতে কুড়িটা টাকা বাহির করিয়া বলিল, সব নেবেন না কি? পাশ বুকে জমা করতে হবে না?

আজ থাক, সমস্ত দিন মদ খেতে পাইনি। আপনি কাল যেটুকু দিয়ে গেলেন, সকালেই শেষ হয়ে গেল, বাধ্য হয়ে তাই ও বইটা নিয়ে বসতে হল!

কি বই ওটা?

ডিটেকটিভ আর পর্নোগ্রাফি কমবাইণ্ড! চমৎকার নেশা হয়, ওয়াণ্ডার ফুল!

ভন্টু আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, দশটা টাকা বরং রাখুন, দশটা টাকা আমাকে দিন। আপনার কাছে থাকলেই তো খরচ হয়ে যাবে।

না, আজ থাক

করালিচরণ টাকাগুলি তাড়াতাড়ি জামার পকেটে পুরিয়া ফেলিলেন, যেন ভন্টু ছিনাইয়া লইয়া যাইবে। তাহার পর অকস্মাৎ ভন্টুর মুখের উপর এক চক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, আমার পাঁচশ টাকার আর বাকি কত? কত জমল?

এ রকমভাবে খরচ করলে আর জমবে কি ক'রে! সেদিনও তো আপনি পঁচিশটা টাকা নিয়ে নিলেন। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে, আমাদের প্রোটোটাইপ গ্রহশান্তির জন্যে কিছু খরচ করতে চায়, কত পড়বে বলুন তো?

টাকা পঁচিশেক।

তাই বলে দেব তা হ'লে, হবে কিছু?

কিছু হবে না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া করালিচরণ বলিলেন, আপনি তা হ'লে আজ যান ভন্টুবাবু—কাল আমি কুষ্ঠি দুটো ঠিক করে রাখব।

আচ্ছা।

ভন্টু বাহিরে আসিয়া বাইকের উপর সওয়ার হইল।

ভন্টু চলিয়া গেলে করালিচরণ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর সহসা আলোটা ফুঁ দিয়া নিবাইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। খানিকক্ষণ হন-হন করিয়া হাঁটিবার পর অবশেষে তিনি যে পল্লীতে উপনীত হইলেন তাহা বেশ্যা-পল্লী। রাত্রি অনেক হইয়াছিল, স্বল্পালোকিত গলিটিতে বিশেষ কেহ ছিল না। একটা খোলার ঘরের সামনে একটিমাত্র রূপোপজীবিনী তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। করালিচরণ সোজা গিয়া তাহারই সম্মুখীন হইলেন।

লোক বসাবে?

করালিচরণের বীভৎস চেহারা দেখিয়া মেয়েটি সম্ভবত ভয় পাইয়া গিয়াছিল, বলিল, না।

বসাবে না? সে কি!

না, বসাব না—তুমি যাও!

দাঁড়িয়ে আছ কেন তা হ'লে?

আমার খুশি, তুমি সরে যাও না বাপু।

করালিচরণের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া মেয়েটি নিজেই সরিয়া দাঁড়াইল। করালিচরণ আর একটু আগাইয়া গিয়া বলিলেন, কুড়িটা টাকা দেব, নগদ—

দরকার নেই তোমার টাকায়।

মেয়েটি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিল।

করালিচরণ স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর দ্রুতবেগে আবার চলিতে সুরু করিলেন।...... দোতলার একটা ঘর হইতে গান, বাজনা, হাসির হর্‌রা সহসা তাঁহার কানে ভাসিয়া আসিল, একচক্ষু তুলিয়া করালিচরণ একবার আলোকিত জানালাটার পানে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর আবার চলিতে সুরু করিলেন।... উদ্দেশ্যবিহীনভাবে খানিকক্ষণ হাঁটিয়া করালিচরণ অবশেষে একটা হোটেলের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। সহসা অনুভব করিলেন অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে। ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

খানিকটা মাংস আর রুটি দিন তো।

কতখানি মাংস, ক' পিস রুটি?

প্রচুর দিন, ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে।

এক প্লেট মাংস আর চার পিস রুটি দিই?

দিন। মদ আছে?

আনিয়ে দিতে পারি।

হুইস্কি আনিয়ে দিন এক বোতল।

টাকা লইয়া একজন হুইস্কি আনিতে চলিয়া গেল এবং একটি বালক-ভৃত্য মাংস ও রুটি আনিয়া করালিচরণের সম্মুখে ধরিতেই করালিচরণ গপ্ গপ্ করিয়া গিলিতে লাগিলেন।...সহসা তাঁহার সেই পানওয়ালিটাকে মনে পড়িল। সেই কাজলপরা, মাথায় ফুল গোঁজা, দাঁতে মিশি লাগানো, নীলাম্বরী কাপড় পরা বুড়িটা—ছুঁড়ি সাজিয়া লোক ভুলাইতে চায়! অসহ্য! ভাবিলেও গায়ে জ্বর আসে। জ্বর আসুক, কিন্তু ওই বোধ হয় একমাত্র নারী যে করালিচরণকে একটু মমতার চক্ষে দেখে। বাকী সবাই তো তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, কেহই তো তাহাকে আমল দিতে চায় না, টাকা দিতে চাহিলেও প্রত্যাখ্যান করে—এমন কি বেশ্যারাও!

বাই নারায়ণ!

হিংস্র বুভুক্ষু শ্বাপদের ন্যায় করালিচরণ মাংসের হাড়গুলা কড়মড় করিয়া চিবাইতে লাগিলেন।

ভন্টু সেদিন অত রাত্রেও বাড়ি ফিরিয়া দেখিল দত্ত মহাশয় তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। দত্ত মহাশয়ের মুদির দোকান আছে এবং সেই দোকান ভন্টুদের সংসারে ধারে জিনিসপত্র সরবরাহ করিয়া থাকে। অনেকগুলি টাকা বাকি পড়িয়াছে। ভন্টু আজ নিশ্চয়ই কিছু দিবে বলিয়াছিল, সেই আশায় দত্ত মহাশয় বসিয়া আছেন।

দত্ত মহাশয়কে দেখিয়া ভন্টু করজোড়ে বলিল, বড় লজ্জিত হলাম দাদা, বিশ্বাস করুন, কিছুতেই জোগাড় করতে পারলাম না। আজ এক জায়গা থেকে নির্ঘাৎ পাব ভেবেছিলাম, কিন্তু সব হোন্‌ড্‌ল মোন্‌ড্‌ল হয়ে গেল!

দত্ত মহাশয় নীরবে সমস্ত শুনিলেন এবং নীরবে উঠিয়া গেলেন।

বউদিদি মুখ বাড়াইয়া হাসিমুখে বলিলেন, দত্ত কি বললে?

চুপ্‌সে গেল!

ওর টাকাটা কাল যেমন ক'রে হোক দিয়ে দাও বাপু তুমি! না হয় আমার বালাটা কোথাও বাঁধা দাও—

গভীর গাড্ডা ঝিস্টায় বিড্‌ডিকার, দুটো 'ড' নয়, পাঁচ সাতটা 'ড'—বালাটাকে দকচে আর লাভ কি! চল, খেতে দেবে চল—ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে, আগে গিলি তার পর অন্য কথা!

রান্না তো কখন হয়ে গেছে, এসো না।

উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেল।

২১

শঙ্কর বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিল মায়ের অবস্থা সত্যই অত্যন্ত ভয়াবহ। তাঁহার পাগলামি এত বাড়িয়াছে যে তাঁহাকে একটা ঘরে জানালার গরাদের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে।

বাঁধা হইয়াই বাঁধিতে হইয়াছে, কারণ তিনি এমন সব কাণ্ড করিতেছিলেন যে, বাঁধিয়া রাখা ছাড়া উপায় ছিল না। শঙ্কর দেখিল তাহার বাবার মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রহিয়াছে। শুনিল, মা না কি উন্মত্ত অবস্থায় একটা বাসন ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলেন। শঙ্কর ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। দেখিল বন্দী অবস্থাতেও মা বিড় বিড় করিয়া বকিয়া চলিয়াছেন।

মা!

কোন সাড়া নাই, উন্মাদিনী অস্ফুটভাবে ক্রমাগত কি বলিতেছে!

মা, ও মা, দেখ আমি এসেছি।

শঙ্কর হেঁট হইয়া পদধূলি লইল।

দূর হ, দূর হ, দূর হ—যত সব পাপ আপদ বালাই—দূর হয়ে যা সব—

শঙ্করের বাবা বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, শঙ্কু, চলে আয় তুই, ওখানে বেশীক্ষণ থাকতে ডাক্তারে মানা করেছে। ওতে পাগলামি বাড়ে শুধু। বেরিয়ে আয়।

শঙ্কর বাহির হইয়া আসিল। তাহার অমন মা এই হইয়া গিয়াছে!

কোন্ ডাক্তার দেখছে?

কোন ডাক্তার বাকি নেই, এ অঞ্চলের সবাই দেখেছে, এমন কি সিভিল সার্জ্জন পর্য্যন্ত।

কি বলছেন তাঁরা?

বলবেন আর কি! কেউ বলছেন ডব্লিউ সি-রায়, কেউ দিচ্ছেন ব্রোমাইড, কেউ বা আর কোন ঘুমের ওষুধ। ওই টেমপরারি কিছু ফল হয়, তার পর যে কে সেই। কবরেজিও করেছি—কিচ্ছু হয় নি।

শঙ্কর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার বাবা বলিলেন, চল বাইরে চল—আরও কথা আছে তোমার সঙ্গে।

বাহিরের ঘরে আসিয়া শঙ্করের বাবা একটি চেয়ারে উপবেশন করিলেন এবং আর একটি চেয়ার দেখাইয়া শঙ্করকে বলিলেন, বস্ তুই, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, ভেবে আর কি হবে বল বাবা, সবই অদৃষ্ট!

শঙ্কর নীরবে উপবেশন করিল।

শঙ্করের পিতা অম্বিকাচরণ রিটায়ার্ড ডেপুটি, বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। গম্ভীর রাশভারি লোক। দেখিলেই সম্ভ্রম হয়, মনে হয় এ লোকটিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা চলিবে না। কোথাও বসিলে পা দোলানো তাঁহার স্বভাব, কিন্তু তাহাও এমন গম্ভীর চালে করিয়া থাকেন যে, ছন্দ-পতন হয় না, হাকিমি গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বেশ মানাইয়া যায়।

চেয়ারে বসিয়া তিনি গম্ভীর ভাবে পা দোলাইতে লাগিলেন। শঙ্কর নীরবে বসিয়া রহিল। একটু পরে অম্বিকাবাবু একটা মোটা সিগার বাহির করিয়া সেটা ধরাইলেন। কিছুক্ষণ নীরবেই ধূমপান করিলেন, তাহার পর বলিলেন, কেমন পড়াশোনা হচ্ছে?

ভালই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। অম্বিকাচরণই পুনরায় নীরবতা ভঙ্গ করিলেন। বলিলেন, তোমাকে টেলিগ্রাম ক'রে আনালাম এই জন্যে যে, তুমি যদি পার কোলকাতায় একটা বাসা ঠিক কর গিয়ে। নিয়ে যাবার মত অবস্থা হলে কোলকাতাতেই নিয়ে যাই ওঁকে, সেখানে নানারকম স্পেশালিষ্ট আছেন, দেখা যাক একবার চেষ্টা ক'রে—

চুরুটে দু-একটা টান দিয়া পুনরায় বলিলেন, আক্ষেপ থাকে কেন!

শঙ্করের বলিবার কিছু ছিল না, সে চুপ করিয়া রহিল।

আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চুরুটের ছাইটা সন্তর্পণে ঝাড়িয়া, অম্বিকাবাবু বলিলেন, আরো একটা কথা বলবার আছে তোমাকে। নানা জায়গা থেকে তোমার বিয়ের প্রস্তাব আসচে, আমি তাড়াতাড়ি তোমার বিয়েটাও দিয়ে দিতে চাই। কারণ, আমার ব্লাড প্রেসারের যা অবস্থা, কখন কি হয় বলা যায় না। তাছাড়া, বিয়ে যখন করতেই হবে তখন দেরি করার কোন মানে হয় না। আরও একটা কথা আছে, দু-একজন ডাক্তার বলেছেন যে বউ-এর মুখ দেখে ওঁর পাগলামি খানিকটা কমবে, অন্তত সম্ভাবনা আছে।

বিস্মিত শঙ্কর বলিল, এই অবস্থায় এখন বিয়ে!

ডাক্তারদের মতে অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্যেই বিয়ের দরকার!

অম্বিকাবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সিগারে আরও একটি টান দিলেন এবং পুনরায় বলিলেন, তাছাড়া, বেশী বয়সে বিয়ে করার আমি পক্ষপাতীও নই।

শঙ্করের মনে রিণির মুখখানি ভাসিয়া উঠিল, মনে হইল তাহার সচকিত নয়ন দুইটি যেন ক্ষণিকের জন্য তাহার পানে চাহিয়া আবার আনমিত হইল।

শঙ্কর বলিল, এখন আমি বিয়ে করতে পারব না।

অম্বিকাবাবুর ভ্রূ আরও একটু কুঞ্চিত হইল। তিনি চোখ তুলিয়া পুত্রের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আমাদের কালে বাপ-মা'রা বিয়ে দেওয়ার সময় ছেলেদের মত নেওয়ার প্রয়োজন মনে করতেন না। আজকাল আমরা ছেলেদের সে সম্মানটা দিয়েছি, কিন্তু এটাও প্রত্যাশা করি যে, ছেলেরাও আমাদের সম্মান রাখবে।

শঙ্কর বলিল, এতে সম্মানের কোন প্রশ্নই উঠছে না।

উঠছে বই কি। আমি তোমাকে আদেশ না ক'রে অনুরোধ করলাম, সে অনুরোধ তুমি যদি না রাখ তা হ'লে আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে বই কি।

শঙ্কর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমি এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। এত বড় একটা দায়িত্ব নেবার আগে আমি একটু ভেবে দেখতে চাই। সময় দিন আমাকে কিছু।

আবার রিণির মুখখানা তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল।

পিতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তিনি চক্ষু বুজিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সিগারটাতে ধীরে ধীরে টান দিতেছেন।

ভেবে দেখতে চাও, দেখ। দায়িত্বের কথা নিয়ে আস্ফালন করাটা আজকাল তোমাদের একটা ফ্যাসান হয়েছে বটে, আসলে কিন্তু ওটা অন্তঃসারশূন্য ডেঁপোমি। বিয়ে করার দায়িত্ব যে কতখানি আর সে ভার বহন করবার ক্ষমতা তোমার আছে কি-না-এটা ভাল ক'রে দেখবার বয়স অথবা অভিজ্ঞতা তোমার হয় নি।

যখন হবে, তখনই বিয়ে করব।

যখন হবে তখন বিয়ে করাটা নিরর্থক—It is no good marrying at forty-five or fifty.—তার আগে অভিজ্ঞতা হয় না।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অম্বিকাবাবু পুনরায় বলিতে লাগিলেন, আসলে আজকালকার ছেলেরা অতিশয় স্বার্থপর। তাদের মতলবটা, হালকা মেঘের মত গায়ে ফুঁ দিয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়াব, যা রোজগার করব নিজের সুখের জন্যেই সেটা খরচ করব—স্ত্রীপরিবারের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাব না। তারা ভুলে যায় কিম্বা ভুলে থাকতে চায় যে, যে সমাজ তাদের মানুষ করেছে সেই সমাজের প্রতিও তাদের একটা কর্ত্তব্য আছে। সামান্য কুলিমজুরও রোজগার ক'রে তাদের স্ত্রী-পরিবার পালন করছে। দুঃখ ভোগ করছে তা স্বীকার করি, কিন্তু দুঃখ ভোগ করাটাও যে একটা ট্রেনিং, একটা প্রয়োজনীয় জিনিস, এ ষ্টিমুলাস ফর্ ষ্ট্রাগ্‌ল্ তোমরা আজকাল সেটা এড়িয়ে চল্‌তে চাও!

কুলিমজুরদের মত জীবন যাপন করাটা কি বাঞ্ছনীয়?

তা ত আমি বলছি না! আমি বলছি দুঃখের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রাম কর, ভীরুর মত পালিয়ে যাওয়াতে কোন বাহাদুরি নেই! লড়াই কর—লড়াই ক'রে জেতো। হারলেও লজ্জা নেই। কিন্তু যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা কোন কালেই গৌরবের নয়। আজকাল তোমরা তাই করছ।

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না।

অম্বিকাচরণ চোখ বুজিয়া সিগারে টান দিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, বেশ, ভেবে দেখতে চাও, ভেবে দেখো। তুমি আমার একমাত্র ছেলে। আমার শরীর ভাল নয়, তোমার মায়ের অবস্থা ত দেখছই—বাড়ীতে কোন দ্বিতীয় স্ত্রীলোকও নেই যে, আমাদের দেখাশোনা করে। শশাঙ্ক মারা যাওয়ার পরই তোমার মায়ের পাগলামি সুরু হয়েছে—তোমার বিয়ে হলে হয়ত সেরেও যেতে পারেন—কিছু বলা যায় না। সমস্ত জিনিসটা ভাল ক'রে ভেবে দেখ, টেক টাইম, দেয়ার ইজ নো হারি। আচ্ছা যাও এখন—কয়েকখানা চিঠি লিখতে হবে আমাকে।

শঙ্কর উঠিয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল।

বাড়ির ভিতরে গিয়াই সে শুনিতে পাইল, মা চীৎকার করিতেছেন, শশাঙ্ক শশাঙ্ক, শশাঙ্ক, এসেছে। দেখতে পাচ্ছিস না তোরা, চোখের মাথা খেয়েছিস না কি সব!

শশাঙ্ক শঙ্করের ছোট ভাই, কিছুদিন পূর্ব্বে মারা গিয়াছে।

শঙ্কর একা রাত্রে বিছানায় শুইয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। পিতার কথাগুলি যুক্তিহীন নয়—কিন্তু রিণি? রিণিকে যে সে ভালবাসিয়াছে। যদিও মুখে সে রিণিকে কিছু বলে নাই কিন্তু রিণি কি বোঝে না?

একটুও না? অসম্ভব। তাহার মনে যে ঝড় উঠিয়াছে তাহার একটু আভাসও কি রিণি পায় না? তাহার মনে সামান্যতম স্পন্দনও কি জাগে নাই? নিশ্চয়ই জাগিয়াছে। কিন্তু শঙ্কর তাহা জানিবে কেমন করিয়া? জিজ্ঞাসা করা তো অসম্ভব। অথচ···হঠাৎ দারুণ একটা চীৎকারে শঙ্করের চিন্তাস্রোত ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। পাগলিনী চীৎকার করিতেছে। সে চীৎকার এত করুণ, এত তীব্র, এত মর্ম্মস্পর্শী যে শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। উঠিয়া বিছানায় খানিকক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল, তাহার মনে হইল, চতুর্দ্দিকের অন্ধকার যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে, নানারূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে—অদ্ভুত মূর্ত্তি।···সহসা চীৎকারটা থামিয়া গেল : চতুর্দ্দিকে নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। সহসা দালানের ঘড়িটার শব্দ স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, দূরে চৌকিদার হাঁকিয়া গেল। শঙ্কর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আবার শুইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, সে যেন এ বাড়ির কেহ নহে, কোন আগন্তুক যেন হঠাৎ আসিয়া এক রাত্রির জন্য আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে, কাল সকালেই উঠিয়া চলিয়া যাইবে। পাশ-বালিশটা জড়াইয়া ঘুমাইবার জন্য সে ভাল করিয়া শুইল—কিন্তু ঘুম তাহার আসিল না। মুদিত নয়নের সম্মুখে রিণি আনত নয়নে সারারাত বসিয়া রহিল।

২২

দ্রুতগামী একটি এক্সপ্রেস ট্রেনের কামরায় বোসসাহেব বসিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা, কষ্ট হইবার কথা নয়, তথাপি বোসসাহেবের মুখখানি অত্যন্ত ক্লিষ্ট দেখাইতেছিল। তিনি দিল্লী হইতে ফিরিতেছিলেন, বিফল মনোরথ হইয়াই ফিরিতেছিলেন। যে সাহেবটিকে তোয়াজ করিতে তিনি গিয়াছিলেন, নানারূপ তোয়াজ সত্ত্বেও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারেন নাই। এমন একটিও আশাপ্রদ কথা সাহেবের মুখ দিয়া নির্গত হয় নাই যাহার উপর নিশ্চিন্তভাবে নির্ভর করা যায়। অথচ তাঁহার ধারণা ছিল ক্যামেরন সাহেব······

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বোসসাহেব ভাবিতে লাগিলেন।

মিষ্টার এল. কে. বোস (ললিতকুমার বোস) বাঙালী সমাজের আদর্শ পুরুষ। বরাবর ভাল করিয়া পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন, সুপারিশ এবং বিদ্যার জোরে ভাল চাকুরি জোগাড় করিয়াছেন, চাকুরি বজায় রাখিবার জন্য নানা প্রকার কলা-কৌশল শিখিয়াছেন, মোটা রকম পণ লইয়া সুন্দরী বধূ ঘরে আনিয়াছেন, ইহারই মধ্যে কলিকাতা শহরে খানিকটা জমি কিনিয়া ফেলিয়াছেন, আত্মীয় স্বজন দুই-একজনের চাকুরি করিয়া দিয়াছেন—করেন নাই কি? সুতরাং পরিচিত মহলে নিদারুণ সাহেবিয়ানা সত্ত্বেও বোস বোসসাহেবের নামে সকলের মনে শ্রদ্ধা সম্ভ্রমই জাগে। গোপনে গোপনে দুই-চারিজন বোসসাহেবের সাহেবিয়ানা লইয়া যে টিটকারি দেন না তাহা নয়, কিন্তু টিটকারিতে বোসসাহেবের কিছু আসে যায় না। সেজন্যও বটে এবং সাহেবিয়ানাটা তাঁহার চাকরির একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ এই বিশ্বাসের ফলেও বটে অধিকাংশ লোকই তাঁহার সাহেবিয়ানা লইয়া আর মাথা ঘামায় না। বোসসাহেব একজন বড় অফিসার—এই মহিমার জ্যোতিতেই সকলের চোখ ধাঁধিয়া আছে। তাঁহার চারিত্রিক নানা দোষও তাই মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। সত্যই বোসসাহেব উদ্যমশীল ব্যক্তি, নিত্য নব উপায়ে চাকুরির উন্নতি করিয়া চলিয়াছেন, শাসন-যন্ত্রের কোন্ চাকাটিতে কখন কোন্ তৈল নিষেক করিলে সুফল ফলিবে ইহা আবিষ্কার করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য এবং তাহাতে তিনি খানিকটা সফলকাম হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শৈলকে তিনি সুখী করিতে পারিয়াছেন কি-না তাহা নিতান্তই অবান্তর প্রশ্ন, তাহা লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না—তিনি নিজেও না। শৈলকে তিনি মিসেস এল, কে, বোসের মর্য্যাদা দিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট নয় কি? ইহার অধিক আর কিছু করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই, জীবনে তাঁহাকে অনেক উর্দ্ধে উঠিতে হইবে, বিবাহিত স্ত্রীকে লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিবার অবসরই বা কোথায়?

···একটা ছোট স্টেশনে এক মিনিট থামিয়া এক্সপ্রেস ট্রেন পুনরায় চলিতে সুরু করিল। অনেক দূরে তাহাকে যাইতে হইবে, অনেক স্টেশন পার হইতে হইবে, ছোট স্টেশনে বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া সময় নষ্ট করিবার অবসর নাই।

এক্সপ্রেস ছুটিতে লাগিল।

২৩

মিস বেলা মল্লিক তন্ময় হইয়া সঙ্গীত-চর্চ্চা করিতেছিলেন। গাহিতেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সেই পুরাতন গানখানা—মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী, সখি জাগো। এই পুরাতন গানটাই বেলা মল্লিকের কণ্ঠে নূতন লালিত্যে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। পাশের বাড়িতে মুগ্ধ লক্ষণবাবু খবরের কাগজটা মুখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া তাহা শুনিতেছিলেন। তাঁহার তন্ময় নিস্পন্দ ভাবটা বেলাও লক্ষ্য করিতেছিলেন। লক্ষণবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় চুকিয়া গিয়াছে। সেদিন বেলা একটি পত্রযোগে স্পষ্ট ভাবেই লক্ষণবাবুকে জানাইয়া দিয়াছেন যে কোষ্ঠির অমিল সত্ত্বেও বিবাহ দিবার মতো দৃঢ় মনোভাব তাহার দাদার অর্থাৎ প্রিয়বাবুর নাই, তাঁহার নিজেরও এ সম্বন্ধে কুসংস্কার আছে, সুতরাং বিবাহ হওয়া অসম্ভব। লক্ষণবাবু যেন অনুগ্রহ করিয়া এ প্রস্তাব আর না উত্থাপিত করেন, কারণ তাহা এ ক্ষেত্রে অকারণ ক্ষোভেরই সৃষ্টি করিবে। প্রিয়বাবুও বেলার জেদে পড়িয়া এবং নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও লক্ষণবাবুকে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—কুষ্ঠির যখন মিল হচ্ছে না তখন আর উপায় কি! কিন্তু মনে মনে তিনি বলিতেছিলেন, আহা এমন পাত্রটা ফসকাইয়া গেল। বেলাটা যে দিন দিন কি হইতেছে বুঝিবার উপায় নাই।

গানটা খানিকক্ষণ গাহিয়া বেলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অনঙ্গভঙ্গী সহকারে গা ভাঙিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাহার পর এস্রাজখানা পাড়িয়া বাজাইতে লাগিলেন। ওই গানখানাই বাজাইতে লাগিলেন। লক্ষণবাবু আর বাতায়নে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া গেলেন।

বেলা বাজাইতেছেন এমন সময় প্রিয়বাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ট্রামের পয়সা বাঁচাইবার জন্য বেচারীকে অনেকটা দূর হাঁটিয়া আসিতে হইয়াছে। তাঁহাকে চাকরি ছাড়া ইনসিওরেন্সের দালালিও করিতে হয়। একটি শিকারের সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু অভিযান সফল হয় নাই, ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। সহসা সঙ্গীত-নিরতা বেলাকে দেখিয়া তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, আমি খাটিয়া খাটিয়া গায়ের রক্ত জল করিয়া ফেলিলাম আর এ দিব্য বসিয়া সেতার বাজাইতেছে। বিবাহ করিবার নাম নাই, পাত্র আনিলে কোন না কোন ছুতায় সেটাকে তাড়াইয়া দিতেছে। মেয়েমানুষ বলিয়া মাথা কিনিয়াছে একেবারে।

প্রিয়নাথ মল্লিকের সহসা ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সম্প্রতি ভগ্নীর চালচলন ভাবগতিক এমন একটা বেপরোয়া মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে যে, তিনি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, তোর মতলবটা কি বল্ দেখি খুলে!

ভ্রূভঙ্গী সহকারে বেলা উত্তর দিলেন, কিসের মতলব?

কিসের আবার, বিয়ে থা করবি, না, না?

সোজাসুজি বলিয়া ফেলিলেন তিনি।

বেলা ছড়টা পাশে রাখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তার জন্যে তোমার অত মাথা ব্যথা কেন, তুমি নিজে বিয়ে কর না যদি ইচ্ছে হয়! কর না, বেশ আমার একটি সঙ্গী হোক!

প্রিয় মল্লিক ব্যঙ্গ তিক্ত একটা হাসি হাসিয়া বলিলেন, আমি বিয়ে করব! এই কোলকাতা শহরে একটা অবিবাহিত বোন ঘাড়ে নিয়ে একশ টাকা মাইনেয় বিয়ে করা চলে? বললেই হ'ল বিয়ে কর!

গ্রীবা বাঁকাইয়া অধর দংশন করিয়া বেলা বলিলেন, ঘাড়ে ক'রে মানে! আমিই কি তোমার বিয়ের পথে বাধা না কি? তাঁহার চক্ষু দুইটি সহসা জ্বলিয়া উঠিল।

প্রিয়নাথও একটু উত্তেজিত হইয়াছিলেন, বলিলেন, সে কথা কি এখনও বুঝতে পারনি? আর কিছু না হোক, তোমার বুদ্ধির উপর আমার কিঞ্চিৎ আস্থা ছিল!

বেলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ব'ললেন, বেশ তুমি পাত্রী দেখ, আমি তোমার ঘাড় থেকে এখুনি নেবে যাচ্ছি। একথাটা আগে বললে আগেই ব্যবস্থা করতাম, মিছিমিছি তোমার সময় নষ্ট হ'ল এতদিন! এস্রাজটা কোল হইতে নামাইয়া বেলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও কোন কথা না বলিয়া সম্মুখের আলনাটা হইতে নিজের কাপড়-জামা প্রভৃতি টানিয়া নামাইয়া পাট করিতে সুরু করিয়া দিল।

প্রিয়নাথ বলিলেন, এর মানে?

বেলা কোন উত্তর দিলেন না। একটির পর একটি কাপড় পাট করিয়া যাইতে লাগিলেন।

এর মানে কি !

তথাপি বেলা নিরুত্তর।

একটু বিব্রত কণ্ঠে প্রিয়নাথ আবার বলিল, হঠাৎ কাপড় গোছাবার মানে কি, আমি জানতে চাই।

বেলা ঘাড় ফিরাইয়া নির্ব্বিকারভাবে বলিলেন, কাপড়গুলো কি তা হ'লে রেখেই যাব! তুমিই এগুলো কিনে দিয়েছ অবশ্য, ইচ্ছে করলে কেড়ে নিতে পার।

ইচ্ছে করলে কেড়ে নিতে পারি!

বিহ্বল প্রিয়নাথ যন্ত্রচালিতবৎ কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন।

পার বই কি! বেশ, নেব না এগুলো, রইলো!

দ্রুতপদে বেলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। হাতে লইল শুধু ছোট হাত-ব্যাগটা। স্তম্ভিত প্রিয়নাথ কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাহার পর উঠিয়া জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন মেয়েটা সত্য সত্যই গেল কোথা। কিছু দেখা গেল না। তখন তিনিও রাস্তায় বাহির হইলেন। দেখিলেন দূরে দ্রুতপদে বেলা চলিয়াছে। ঘাড় ফিরাইয়া প্রিয়নাথকে দেখিয়া ডানদিকের গলিটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় প্রিয়নাথ কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় লক্ষ্মণবাবু বাহির হইয়া আসিলেন এবং সস্মিত মুখে প্রশ্ন করিলেন না, কেমন যেন বাধিয়া গেল। বলিলেন, দেখছি যদি রিকশা টিকশা একটা পাওয়া যায়!

কোথাও বেরুবেন না কি ?

মনে করছি তো।

প্রিয়বাবু ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণবাবুও এদিক ওদিক চাহিয়া অকারণে সামনের বাড়ির ভদ্রলোককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার ছেলেটি কেমন আছে আজ ?

লক্ষ্মণবাবুর কোন উৎকণ্ঠা ছিল না, এমনিই জিজ্ঞাসা করিলেন। সামনের বাড়ির ভদ্রলোক জানালার ধারে বসিয়া কামাইতে ছিলেন, আবছা গোছের একটা উত্তর দিলেন—চলছে!

উপরের বাতায়ন হইতে বেলাকে বাহির হইয়া যাইতে লক্ষ্মণবাবু দেখিয়াছিলেন, সুতরাং শীঘ্র আর সন্ধীতের সম্ভাবনা নাই। তিনি বাইকটি বাহির করিয়া দোকানের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেলেন।

খানিকক্ষণ দ্রুতপদে হাঁটিয়া বেলাকে অবশেষে গতিবেগ মন্থর করিতে হইল। শিয়ালদহের জনবহুল মোড়টাতে দাঁড়াইয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন এইবার কি করা যায়। এক রিণিদের বাড়ি ছাড়া চেনা-শোনা আর কোন স্থান তো কলিকাতা শহরে নাই। কিন্তু রিণিদের বাড়ি যাইতে তাঁহার কেমন যেন সঙ্কোচ হইতে লাগিল, সেখানে গিয়া কি বলিবে। তা ছাড়া, তাহার দাদা নিশ্চয়ই সেখানে গিয়া খোঁজ করিবেন এবং অবশেষে একটা নাটকীয় ব্যাপার করিয়া তাহাকে পুনরায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন। এরূপ অপমানের পর আর সে দাদার আশ্রয়ে কিছুতেই ফিরিয়া যাইবে না, তাহাতে অদৃষ্টে যত কষ্টই থাক। কিন্তু অবিলম্বে একটা কিছু করা দরকার। রোদও ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতেছে। শিয়ালদহের বড় ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিল সাড়ে বারোটা বাজিয়াছে, ক্ষুধারও একটু উদ্রেক হইয়াছে। সহসা বেলার মাথায় একটা বুদ্ধি জাগিল। দেখাই যাক না ভদ্রলোককে একটু পরীক্ষা করিয়া। হাত-ব্যাগটা খুলিয়া দেখিল আনা তিনেক পয়সা রহিয়াছে। উহাতেই হইবে। একটু আগাইয়া গিয়া বড় গোছের একটা দোকানে বেলা উঠিলেন এবং স্মিতমুখে নমস্কার করিয়া বলিলেন, দয়া করে আপনার ফোনটা একটু ব্যবহার করতে দেবেন কি ?

নিশ্চয়, এই যে আসুন।

দোকানদার ভদ্রলোক ভদ্রতার আতিশয্যে টুলটা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং ফোনটা আগাইয়া দিলেন। নিকটেই ডাইরেক্টরিখানা ছিল, বেলা অপূর্ব্ববাবুর আপিসের ফোন নম্বরটা বাহির করিয়া অপূর্ব্ববাবুকে ফোন করিলেন। বলিলেন, তিনি বড় বিপদে পড়িয়া শিয়ালদহের মোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন। অপূর্ব্ববাবুকে বিশেষ প্রয়োজন, তিনি যদি অবিলম্বে একবার আসিতে পারেন বড় ভাল হয়, না আসিলে বড় মুস্কিলে পড়িতে হইবে। অপূর্ব্ব বলিলেন, খুব চেষ্টা করছি আমি যেতে, ছুটি পেলে নিশ্চয়ই যাচ্ছি।

ছুটি নিন যেমন ক'রে হোক।

দেখি।

ফোনটি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া বেলা দেবী ধন্যবাদ

আপনাকে দুই আনা পয়সা বাহির করিয়া দিতে গেলেন কিন্তু দোকানী ভদ্রলোক কিছুতেই তাহা লইতে রাজি হইলেন না। বেলা দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং অপূর্ব্ববাবুর প্রতীক্ষায় ট্রাম লাইনের ধারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্লাইভ ষ্ট্রীট হইতে শিয়ালদহের মোড়ে আসিতে একটু সময় লাগে, বেলা অলসভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রাচীর-গাত্রের এবং ল্যাম্পপোস্টের উপর যে বিজ্ঞাপনগুলি ছিল তাহাই পড়িতে লাগিলেন। হরেক রকমের নানাবিধ বিজ্ঞাপন, অধিকাংশই বাড়িভাড়া-সংক্রান্ত। দেখিতে দেখিতে একটি বিজ্ঞাপন সহসা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একটি ছোট মেয়েকে গান শিখাইবার জন্ম ও পড়াইবার জন্ম একটি শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক। দুইবেলা পড়াইতে হইবে, বেতন যোগ্যতা অনুসারে। আবেদনকারিণী যেন নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। বেলা অধর দংশন করিয়া খানিকক্ষণ বিজ্ঞাপনটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর রাস্তা পার হইয়া সেই ফোনওয়ালা দোকানে গিয়া সেই ভদ্রলোকটিকে বলিলেন, আপনাকে আর একবার বিরক্ত করতে এলাম। এক টুকরো কাগজ আর একটা পেন্সিল যদি দেন—

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ কাগজ-পেন্সিল দিলেন। বেলা কাগজে ঠিকানাটি টুকিয়া লইয়া হাতব্যাগে সেটি রাখিয়া দিলেন এবং পুনরায় ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়া ট্রাম লাইনের ধারে গিয়া অপূর্ব্ববাবুর জন্ম অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরই অপূর্ব্ববাবু আসিয়া পড়িলেন। ট্রাম হইতে নামিয়া কোঁচাটি ঝাড়িয়া পাঞ্জাবীর পকেটে পুরিতে পুরিতে মিহি গলায় মৃদু হাসিয়া অথচ একটু চিন্তিতকণ্ঠে অপূর্ব্ববাবু বলিলেন, ব্যাপার কি বলুন তো?

ব্যাপার গুরুতর!

তার মানে?

তার মানে দাদা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, রাস্তায় এসে তাই দাঁড়িয়েছি, আপনি এখন একটা ব্যবস্থা করুন আমার! অপরূপ গ্রীবাভঙ্গী সহকারে অধর দংশন করিয়া বেলা অপূর্ব্ববাবুর পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ববাবু ইহার জন্ম মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। বিনা মেঘে বজ্রপাত হইলেও বোধ হয় তিনি এতটা বিস্মিত হইতেন না। আপিসে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে কাজ করিতেছিলেন হঠাৎ এ কি কাণ্ড!

দাদা তাড়িয়ে দিয়েছেন? বলেন কি!

বলছি তো, কেন তাড়িয়ে দিয়েছেন, কি বৃত্তান্ত পরে শুনবেন, এখন আমার একটা দাঁড়াবার জায়গা ঠিক করুন তো আগে! আপনি যে মেসে থাকেন সেখানে সুবিধে হতে পারে কিছু? প্রস্তাবটার অসমীচীনতায় বেলা নিজেই হাসিয়া ফেলিলেন, কিন্তু পুনরায় বলিলেন, বলুন না সেখানে আমার জায়গা হতে পারে কি-না।

অপূর্ব্ববাবু পকেট হইতে সুগন্ধি রুমালখানা বাহির করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কপালটা মুছিয়া ফেলিলেন ও আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, আমার মেসে? মানে, সেটা একটু দৃষ্টিকটু হবে না? মানে, অন্য কিছু নয়, অর্থাৎ—

অপূর্ব্ববাবু আবার ঘামিতে লাগিলেন।

বেলা পুনরায় হাসিয়া বলিলেন, আমার সম্বলের মধ্যে মাত্র তিন আনা রয়েছে এই ব্যাগে! তা না হলে আপাতত একটা হোটেলে উঠলেও চলত! কিন্তু—

অপূর্ব্ববাবু পুনরায় মুখটা মুছিয়া বলিলেন, মাসের শেষ কি-না, আমারও হাত একদম খালি, মানে—

কুটিল হাসি হাসিয়া বেলা বলিলেন, তা ছাড়া, সেদিন রিণিকে অমন দামী দুখানা বই কিনে দিতে হ'ল তো! শঙ্করবাবুকে সে টাকাটা দিয়েছিলেন আপনি?

না, এখনও দেওয়া হয় নি, দেখাই হয় না ভদ্রলোকের সঙ্গে!

এমন সময় অভাবিত একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল।

রোক্‌কে—রোক্‌কে—

চলন্ত ট্রাম হইতে শঙ্কর লাফাইয়া পড়িল।

বিস্মিত বেলা বলিলেন, এ কি শঙ্করবাবু যে! অনেক দিন বাঁচবেন আপনি, এইমাত্র আপনার নাম হচ্ছিল! হঠাৎ এখানে কোথা থেকে!

বাড়ি গেসলাম, এইমাত্র নামলাম ট্রেন থেকে! হস্টেলে ফিরছিলাম, আপনাদের দেখে নেবে পড়লাম। অপূর্ব্ব-বাবুকে একটু যেন বিব্রত মনে হচ্ছে, ব্যাপার কি?

অপূর্ব্ববাবু বারম্বার ঘাড় ও মুখ মুছিতে লাগিলেন।

বেলা অপাঙ্গে সেদিকে একবার চাহিয়া বলিলেন,

হ্যাঁ, বিব্রতই করেছি ওঁকে একটু! আপনিও শুনুন তা হ'লে ব্যাপারটা এবং যদি ইচ্ছে করেন বিব্রত হোন।

বেলা দেবী সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা পুনরায় বিবৃত করিলেন।

শঙ্কর বলিল, তার জন্যে আর ভাবনা কি, এই ট্যাক্সি—

ট্যাক্সি ডাকলেন যে?

চলুন আমার হস্টেলে! সেখানে একটা 'কমন রুম' আছে তো! সেখানেই না হয় বসবেন খানিকক্ষণ, তার পর খাওয়া দাওয়া করে যা হয় একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেললেই হবে। ওর জন্যে আর ভাবনা কি, চলুন!

সেখানে কি ব'লে আমার পরিচয় দেবেন?

বোন।

না, বোন আমি হতে চাই না কারো! একজনের বোন হয়েই যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে আমার!

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, পরিচয় যা হোক একটা দিলেই হবে, ওর জন্যে কিছু আটকাবে না, এখন উঠুন।

বেলাকে লইয়া শঙ্কর ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিল।

বেলা অপূর্ব্ববাবুকে একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া সহাস্যে বলিল, অনর্থক কষ্ট দিলাম আপনাকে, কিছু মনে করবেন না!

না, না, কিছু না—

ট্যাক্সি চলিয়া গেল।

অপ্রস্তুত মুখে সেইদিকে চাহিয়া অপূর্ব্ববাবু দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্রমশঃ

শীতের আগমনে

শ্রীহৃষীকেশ বসু

শীতান্তের মৃত্যুলোক হতে যৌবনের জয়গীতি আসে,
নব নব গতিবেগ বাঁচি নব জন্মে নব হাসি হাসে!—
বসন্তের চন্দ্রোদয় হ'তে শীতান্তের নীহারিকা ভরি
এই ভাষা, এই অনুমান প্রকৃতিতে উঠেছে গুমরি'।
প্রকৃতির নব জন্ম আছে যৌবনের উছল প্লাবন,
বার্দ্ধক্যের জীর্ণ দেহভার, ধ্রুব মৃত্যু নিশ্চিত সাধন!
এ জীবন নব রূপে রসে আপনারে আপনি বিকাশি
চলে যায় সিংহদ্বার ধরি প্রকৃতির দেওয়া হাস্য হাসি!
জন্মে জন্মে একধারা ধায় মরণেও এক গুপ্তধন,
জীবনের প্রতি পদে পদে সঞ্চয়ের নাহি নব পণ!
মানবের জন্মান্তর কথা প্রকৃতির এ তাজমহলে—
চিরতরে লেখা যদি রহে, নরজন্ম যাইবে বিফলে!
প্রকৃতির শাশ্বত শাসনে ফোটে ফুল প্রভাত বেলায়—
নিশীথের পদপ্রান্তে আসি আপনারে আপনি বিলায়!
আজিকার দিনমান ভরি শ্রমসাধ্য সঞ্চয় তাহার—
ফেলে যায় ধরণী উপর, সাথে তারে নাহি লয় আর!

মানবের জন্মান্তর সাথে জীবনের নিখিল সঞ্চয়—
ছায়াসম সাথে সাথে চলে, নব জন্মে নব পরিচয়!
তাই তার প্রতি জন্ম ভরি প্রাচীনের নবীন বিকাশ
বিন্দু হ'তে সিন্ধু সীমা তার একচ্ছত্র ঐশ্বর্য্য প্রকাশ!
মানবের জন্ম সাথে সাথে যৌবনের জীবন্ত সংস্কার,
প্রকৃতির জন্মান্তর খুঁজি কোথা পাব সঞ্চয়-বিহার?
মৃত্যু যদি জীর্ণদেহ নাশে নব জন্মে করে সংযোজনা—
তার তরে কোথা পাব আমি পাত্রপূর্ণ পূত গোরচনা!
জড়দেহ এ জড়জগতে মৃত্যুমাঝে যদি হয় লীন—
তার আগমনী জয়গানে ছিন্ন-তার মোর মনোবীণ।
বার্দ্ধক্যের অন্তরে অন্তরে যৌবনের নব উদ্দীপনা—
দেহহীন চারুচিত্ত-লোকে চেতনার জাগে উন্মাদনা।
বাহিরের আবরণ সাথে ছিঁড়ে যাক মৃত্যুর নিচোল
মোর মনে ধ্যানের আসনে এক জন্ম ভরে দিক্ কোল।
এক চিত্তে একটি যৌবন চিরকাল যেন রহে ফুটি—
কালাকাল মহাকাল ধরি সেথা থাক মোর আঁখি দুটি।

কথা, সুর ও স্বরলিপি ঃ—শ্রীমতী সাহানা দেবী

সুর—বাউলের ঘর, তাল কার্ফা

আপ্‌নাকে তুই ছাড়িয়ে যা রে
চল্ ওরে তুই সেই শিখরে যেথা হ'তে নামবি না রে।

শিয়রে তোর জাগবে তপন
থাকবে নীচে মাটির জীবন,
উঠবে ফুটে তোরি স্বপন
মুক্ত-ভূমের সেই পাথারে।

সেথায় আকাশ তোরি সাথী,
চন্দ্র তারা জ্বালবে বাতি,
পার হ'য়ে তোর আঁধার রাতি
আলোর সাথে দিন কাটা রে।

দূর অদূরের সকল ব্যথা
পার অপারের সকল কথা
শেষ ক'রে সব ব্যাকুলতা
আয় পেরিয়ে সব খোঁজা রে।

[সনা র্সর্সনর্সা -া] ||

{ সা - র্সা র্সা -া | ণধা (প)ধা পমগা (র)গা | মা ধা পমা (গ)মা | মগা (র)গা রসা (ন)সা | }
আ প্ না - কে - তু - ই ছা ড়ি য়ে - যা - রে -

{ সা -া -া রসা | ণ্া -সা ণ্ধ্া -ণ্া | সা -া -া গা | গা -া গা -া |
চ - ল্ ও- রে - তু ই সে - ই শি খ - রে -

মা ধা পা ধপা | মা গা পমা (গ)মা | (র)গা (র)গা -া মা | মগা রা সা -া | }
যে - থা - হ' - তে - না ম্ - বি না - রে -

[গমা পধা ণা ণা | পধা -া পা -া]

{ মা -া মপা -া | পা -া মগা মা | গমা পা মপা ধা | পধা ণা ধপা -া |

শি - য় - রে - তো র্ জা - গ্ বে ত - প ন্

দূ - র্ অ দূ - রে র্ স - ক ল্ •ব্য - থা -

[গমা পনা -া না | র্সা না র্রর্সা নর্সা | পনা র্সর্রা র্সা -া | ণা ণধা পা -া]

গমা পা -া না | না -া র্সা -া | র্সা - র্রর্সা ণা র্সণা | ধা ণধা পা -া | }

থা - ক্ বে নী - চে - মা - টি র্ জী - ব ন

পা - র্ অ পা - রে র্ • স - ক ল্ ক - থা -

[র্সর্সা র্রা]

পা -া র্রা র্রা | র্রা -া র্রা -া | র্সর্রা র্রা র্জ্জা র্রা - র্জ্জা -া | র্সনা -া র্সা -া |

উ - ঠ্ বে ফু - টে - তো - রি - স্ব - প ন্

শে - ষ ক' রে - স ব্ ব্যা - কু - ল - তা -

পা -া র্সা র্সা | পধা পধা পমা গমা | মগা রগা সরা গা | মগা রা সা -া |

মু - - ক্ত ভূ - , মে র্ সে - ই পা থা - রে -

আ - য় পে রি - য়ে - স - -ব্ খোঁ জা - রে -

এখান থেকে "চল্ ওরে তুই সেই শিখরে" গেয়ে আস্থায়ীতে পুনরাবর্তন।

{ সা -া গা -া | গরা মা মা -া | গপা -া মধপা মপা | মা -া গা -া |

সে - থা য় আ - কা শ্ তো - রি - সা - থী -

মা -া ধা ধা | ধপা ণা ণা ধা | র্সা -া র্সনা র্রর্সা | ণা -া ধা -া | }

চ - ন্ দ্র তা - রা - জ্বা - ল্ বে - বা - তি -

ধপা -া ণা ণা | ণা -া ণা ধা | ণা র্রা র্রর্সা নর্সা | ণা -া ধা - ণা |

পা - র্ হ' য়ে - তো র্ আঁ - ধা র্ রা - তি -

ণা র্রা র্সা ণর্সা | পধা পধা পমা গমা | মগা রগা সরা গা | মগা রা সা -া |

আ - লো র্ সা - থে - দি - ন্ কা টা - রে -

কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্‌-এ, পি-এইচ্‌-ডি

৫

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা বিচার করিতে হইলে দুইটি বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। প্রথমতঃ, কুলশাস্ত্রে যে সমুদয় ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে তাহা সত্য কি-না; দ্বিতীয়তঃ, কুলশাস্ত্রে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা বিশ্বাসযোগ্য কি-না। অবশ্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি অন্য জাতির বিবরণও কুলশাস্ত্রে আছে কিন্তু আমরা তাহার আলোচনা করি নাই। কারণ, কুলাচার্য্যেরা প্রায় সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ সুতরাং ব্রাহ্মণ জাতির সম্বন্ধেই তাঁহারা বেশী অভিজ্ঞ ছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন তাহাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত ও সমীচীন। অতএব কুলগ্রন্থোক্ত ব্রাহ্মণজাতির বিবরণ তাঁহাদের ঐতিহাসিক জ্ঞানের মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করিলেই তাঁহাদের প্রতি সুবিচার করা হইবে।

পূর্ব্ব প্রকাশিত চারিটি প্রবন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে সহজেই প্রতীতি হইবে যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজা কর্ত্তৃক পাশ্চাত্য দেশ হইতে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়ন ও প্রতিষ্ঠাই কুলগ্রন্থের মূল ঐতিহাসিক ভিত্তি। এ সম্বন্ধে চারিটি আখ্যান কুলশাস্ত্রে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম, অন্ধ্রাজা শূদ্রক কর্ত্তৃক সারস্বত ব্রাহ্মণ আনয়ন (যাঁহারা পরে সপ্তশতী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন)। দ্বিতীয়তঃ, আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন (যাঁহাদের বংশধর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র বলিয়া পরিচিত)। তৃতীয়তঃ, রাজা শশাঙ্ক কর্ত্তৃক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ আনয়ন (ইঁহারা পরে গ্রহবিপ্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন)। চতুর্থতঃ, রাজা হরিবর্ম্মা অথবা শ্যামলবর্ম্মা কর্ত্তৃক বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন।

যে পাঁচজন রাজার নাম করা হইল তাঁহাদের মধ্যে এক আদিশূর ব্যতীত সকলেই ইতিহাসে সুপরিচিত। অথচ এই আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়নই কুলশাস্ত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এবং ইহার তুলনায় অন্যান্য আখ্যানগুলি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য ইহার কারণ এরূপ হইতে পারে যে, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের এবং কুলাচার্য্যগণের অধিকাংশ ভাগই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর, সুতরাং তাঁহাদের গ্রন্থে যে আদিশূর প্রাধান্য লাভ করিবেন ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্ত্তমানে প্রচলিত কুলগ্রন্থসমূহে আদিশূরই কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়াছেন এবং আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়নই সমুদয় কুলগ্রন্থের ভিত্তিস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

আদিশূর নামক কোন রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু বঙ্গদেশে যে শূর উপাধিধারী এবং শূরবংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, রণশূর নামক রাজা দক্ষিণ রাঢ়ে রাজত্ব করিতেন, রাজা রাজেন্দ্রচোলের লিপিসমূহে তাহার উল্লেখ আছে। উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে যে সমুদয় সামন্তরাজ রামপালকে পিতৃরাজ্য উদ্ধারে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে (দক্ষিণ রাঢ়স্থিত) অপর মন্দারাধিপতি লক্ষ্মীশূরের নাম পাওয়া যায়। মহারাজ বিজয় সেনের রাজ্ঞী বিলাস দেবী বারাকপুর তাম্রশাসনে 'শূরকুলাম্ভোধি-কৌমুদী' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, বিজয়সেন শূরবংশীয় রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। সেন রাজগণ প্রথমে রাঢ়দেশে বাস করিতেন সুতরাং অসম্ভব নহে যে এই শূরবংশীয় রাজাও রাঢ়দেশের কোন অংশে রাজত্ব করিতেন। বিজয়সেনের বিবাহ একাদশ শতাব্দীর শেষে অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হইয়াছিল। সুতরাং তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ দ্বারা

একাদশ শতাব্দীতে রাঢ়দেশে শূর রাজবংশের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

'আদিশূর' এই নামটি একটু অস্বাভাবিক মনে হইলেও ইতিহাসে অনুরূপ নামের পরিচয় পাওয়া যায়। রাঢ়দেশের দক্ষিণে বর্ত্তমানে ময়ূরভঞ্জনামে পরিচিত অঞ্চলে ভঞ্জবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। এই বংশীয় রাজগণের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে, বীরভদ্রনামক এক ব্যক্তি এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং এই বীরভদ্র 'আদিভঞ্জ' নামেও তাম্রশাসনে অভিহিত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 'আদিমল্ল' নামে পরিচিত ছিলেন একথা একখানি গ্রন্থে পড়িয়াছি (১), তবে এ সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কি-না বলিতে পারি না। কিন্তু ভঞ্জবংশের তাম্রশাসনে 'আদিভঞ্জ' নাম থাকায় শূরবংশের প্রতিষ্ঠাতা আদিশূর নামে পরিচিত ছিলেন এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাজাবলী' নামক একখানি অতি ক্ষুদ্র সংস্কৃত পুঁথি আছে। ইহাতে উক্ত হইয়াছে যে, অম্বষ্ঠকুলে প্রথম শৌর্য্যবীর্যাদি সম্পন্ন রাজা বলিয়া তাঁহার আদিশূর এই নামকরণ হইয়াছিল। এই প্রবাদ উপরোক্ত অনুমানের সমর্থন করে।

বারাকপুরের তাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হয় যে, বল্লালসেন কোন এক শূর রাজার দৌহিত্র। কুলগ্রন্থে বল্লালসেন আদিশূরের দৌহিত্র অথবা দৌহিত্র-কুলসম্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাকে বল্লালসেনের সহিত শূররাজগণের প্রকৃত সম্বন্ধের ক্ষীণ অথবা বিকৃত প্রতিধ্বনি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কুলগ্রন্থে অন্য প্রায় সকল বিষয়েই ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত থাকিলেও রাজা আদিশূরই যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন এ বিষয়ে সকলেই একমত। পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নরূপ আখ্যানের মূলে কোন সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধি থাকিতে পারে, কিন্তু এই আখ্যান অমূলক হইলেও কোন প্রকৃত রাজার নামের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহা রচিত হইয়াছে এরূপ অনুমাণ করাই স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত। যদি তর্কচ্ছলে স্বীকার করা যায় যে, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ নিজেদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য কান্যকুব্জ হইতে তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের আগমনের কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইলে তাঁহারা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় সুপরিচিত অথবা অন্য কোন প্রকৃত রাজার পরিবর্ত্তে একজন কাল্পনিক রাজাকে এই আখ্যানের কেন্দ্ররূপে প্রচার করিবেন ইহা খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

এই সমুদয় বিষয় আলোচনা করিলে আদিশূর এই নাম বা উপাধিধারী কোন রাজা সত্য সত্যই বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হইবে না।

আদিশূরের রাজ্যকাল সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে প্রধানতঃ দুইটি মত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম মত অনুসারে তিনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পালরাজ্য প্রতিষ্ঠার সমকালে আবির্ভূত হন। দ্বিতীয় মত অনুসারে তিনি পালরাজ্যের অবসান কালে একাদশ শতাব্দীতে রাজ্য করেন এবং পালরাজগণকে পরাজিত করেন।

এ পর্য্যন্ত যে সমুদয় ঐতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে এই দ্বিতীয় মতটিই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। কারণ ঐ সম্বন্ধীয় তিনটি ঐতিহাসিক প্রমাণই খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে শূর-রাজবংশের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। আর সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অভাব হেতুই যদি আদিশূর ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া থাকেন (এ সম্বন্ধেও কুলগ্রন্থগুলি প্রায় এক মত) তবে দীর্ঘকাল বৌদ্ধ পালরাজগণের রাজত্বের পরেই বঙ্গদেশে এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল ইহা অনুমান করাই স্বাভাবিক। সুতরাং খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে আদিশূর নামক রাজা ছিলেন—কুলগ্রন্থের এই উক্তি আমরা আপাততঃ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বলা বাহুল্য যে, আদিশূরের দিগ্বিজয় কাহিনী ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

অতঃপর শূদ্রক, শশাঙ্ক, আদিশূর, হরিবর্ম্মা ও শ্যামলবর্ম্মা কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের পিতৃপুরুষগণ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এই কাহিনীর সত্যাসত্য বিচার করা আবশ্যক। আর্য্যজাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা পঞ্চনদ হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিলেন। কোন কোন সূত্রগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, তীর্থযাত্রা বিনা বঙ্গদেশে গমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। সুতরাং আর্য্যগণ যে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালে বঙ্গদেশে

(১) তন্ত্র(৪৫)

বসতি করিয়াছিলেন তাহা ঠিক। কিন্তু দামোদরপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনগুলি হইতে প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বেই বঙ্গদেশে সাগ্নিক ও বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণেরা আগমন করিয়াছিলেন। ভাস্করবর্ম্মার নিধানপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন পাল-রাজগণের শাসনাবলী ও অন্যান্য কতকগুলি তাম্রশাসন আলোচনা করিলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই স্বাভাবিক যে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরে কোন কালেই এদেশে বেদবিদ্ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। অন্যদিকে কোন কোন তাম্রশাসনে "মধ্যদেশাদ্বিনির্গত" ব্রাহ্মণের উল্লেখ থাকায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে, পঞ্চম শতাব্দীর পরেও মধ্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশে আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গমন ও স্থায়ীভাবে বসবাস অস্বাভাবিক বা বিশিষ্ট কোন ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। উড়িষ্যার ভঞ্জ-রাজগণের তাম্রশাসনে বারেন্দ্র দেশীয় ব্রাহ্মণগণের উড়িষ্যায় গিয়া বসবাসের উল্লেখ আছে। সুতরাং কান্যকুব্জ অথবা মধ্যদেশীয় অন্য কোন স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এক বা একাধিক ব্রাহ্মণেরা আসিয়া বঙ্গদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কিন্তু আদিশূর রাজা বঙ্গদেশে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অভাব বশত কান্যকুব্জ রাজাকে যুদ্ধে অথবা কৌশলে পরাজিত করিয়া তথা হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন এবং এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণ হইতে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর সমুদয় ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে—এই উক্তিদ্বয় এতই অস্বাভাবিক ও ঐতিহাসিক সত্যের বিরোধী যে, বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু বিশিষ্ট প্রমাণ থাকা তো দূরের কথা, এ বিষয়ে কুলগ্রন্থোক্ত বিবরণগুলি পরস্পর বিরোধী ও অলীক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। আদিশূরের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ছিলেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শূদ্রক কর্ত্তৃক সারস্বত ব্রাহ্মণ আনয়নের পূর্ব্বে এদেশে ব্রাহ্মণ ছিলেন না এবং আদিশূরের সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে মাত্র সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন ইহার কোনটিই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব। আর কালক্রমে এই সাত শত ব্রাহ্মণ বংশ প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গেল; অপর দিকে পাঁচ জন ব্রাহ্মণের সন্তান-সন্ততিতে সারা বঙ্গদেশ ছাইয়া ফেলিল, বাতুল ভিন্ন এ কথায় কেহ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। আর্য্য ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বে বঙ্গদেশকে অনার্য্য জ্ঞানে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুতরাং পরবর্ত্তীকালে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্যই যে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ এইরূপ উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সম্ভবত পরবর্ত্তীকালে মধ্যদেশ হইতে আগত ব্রাহ্মণেরা বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণদের হেয় জ্ঞান করিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। পরে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাদের সহিত সমকক্ষতা স্থাপনের জন্য কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অধিকাংশ ব্রাহ্মণই কান্যকুব্জের দলে মিশিয়া যাওয়ায় আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের উপাখ্যান সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

কুলগ্রন্থোক্ত আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের বিভিন্ন বিবরণ বিশ্লেষণের ফলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নহে। রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন এই একটি মাত্র উক্তি ব্যতীত আর কোন বিষয়েই বিভিন্ন কুলগ্রন্থের মধ্যে ঐক্য নাই। ব্রাহ্মণ আনয়নের কারণ ও সময়, পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম ও বংশাবলী তাহাদের বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠার হেতু, তাঁহাদিগকে প্রদত্ত গ্রামের নাম ও বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদের সহিত তাঁহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ ইত্যাদি প্রতি বিষয়ে কুলগ্রন্থোক্ত উক্তিগুলি বিভিন্ন ও অনেক স্থলে পরস্পরবিরোধী। কেবলমাত্র এই কারণেই কুলগ্রন্থোক্ত বিবরণ অবিশ্বাস্য বলিয়া গ্রহণের অযোগ্য। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে অন্যবিধ কারণও আছে।

তাম্রশাসনোক্ত সমসাময়িক ঘটনাবলীর বিবরণ যে পরবর্ত্তীকালে রচিত কুলগ্রন্থ হইতে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য, আশা করি সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিবেন না। সুতরাং সমসাময়িক তাম্রশাসন হইতে আমরা ব্রাহ্মণ জাতির সম্বন্ধে যে তথ্য জানিতে পারি যদি তাহা কুলগ্রন্থের বিরোধী হয় তাহা হইলে কুলগ্রন্থগুলি যে বিশ্বাসযোগ্য নহে তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়।

সমসাময়িক তাম্রশাসন হইতে আমরা দুইটি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণবংশের সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানিতে পারি। রাজা

হরিবর্ম্মের মন্ত্রী ভট্টভবদেবের প্রশস্তি হইতে আমরা তাঁহার সাত পুরুষের নাম জানিতে পারি। ইঁহারা সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ এবং রাঢ়দেশে সিদ্ধলগ্রামে বাস করিতেন। ভট্ট ভবদেবের মাতা বন্দ্যঘটিবংশীয় ছিলেন। এই বংশের আদি পুরুষ ভবদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অট্টগাস গৌড়রাজার নিকট হইতে হস্তিনীভিট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভট্ট ভবদেবের পিতামহ আদিদেব বঙ্গেশ্বরের মন্ত্রী ছিলেন। রাজা হরিবর্ম্মা সম্ভবত একাদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং এই সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশ নবম খৃষ্টাব্দের শেষ পাদ অথবা তাহার পূর্ব্ব হইতেই রাঢ় দেশের সিদ্ধল গ্রামে বাস করিতেন। আদিশূর আনীত কুলগ্রন্থ অনুসারে সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভের সন্তান বশিষ্ঠ সিদ্ধল গ্রামে বসতি করেন এবং শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের পুত্র বরাহ বন্দ্যঘটি গ্রামে বসতি করেন। সুতরাং তাম্রশাসনোক্ত ভবদেবের গোত্র, গ্রাম ও মাতৃকুলের বিবরণ পাঠ করিলে তিনি যে রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এরূপ অনুমান করাই স্বাভাবিক।

এক্ষণে আদিশূর যদি একাদশ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়া থাকেন তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তাঁহার পূর্ব্বেই এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ রাঢ়দেশে বসতি করিতেন; সুতরাং তাঁহার সময়ে কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণই যে সমুদয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের আদি পুরুষ ইহা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। আর যদি তর্কচ্ছলে ধরা যায় যে, আদিশূর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন—তাহা হইলে কুলগ্রন্থের বংশাবলীর মধ্যে আমরা ভট্ট ভবদেবের পূর্ব্বপুরুষের নামের উল্লেখ আশা করিতে পারি। কারণ, এই বংশের প্রথম যে ব্রাহ্মণের নাম তাম্রশাসনে উল্লিখিত হইয়াছে তিনি আদিশূরের রাজ্যকালের ১০০ কি ১২৫ বৎসরের মধ্যে জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার আনীত ব্রাহ্মণদের পাঁচ পুরুষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কুলগ্রন্থে সাবর্ণগোত্রজ বেদগর্ভের দ্বাদশ পুরুষের তালিকা আছে কিন্তু তাহার মধ্যে ভট্ট ভবদেবের পূর্ব্বপুরুষের কাহারও নাম নাই। অপর পক্ষে ইহাও বিবেচ্য যে, যদি কুলগ্রন্থ অনুযায়ী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ মাত্রেই কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার বিশিষ্ট মর্য্যাদা দাবী করিতেন তাহা হইলে ভট্ট ভবদেবের বংশপরিচয়ে প্রশস্তি-রচয়িতার পক্ষে বংশের আদিপুরুষ বেদগর্ভ অথবা সৌভরির নাম উল্লেখ না করা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় কি-না।

দিনাজপুরের অন্তর্গত বাদাল নামক স্থানের নিকট প্রাপ্ত একটি স্তম্ভলিপিতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বংশের আদিপুরুষ পাঞ্চালের পুত্র গর্গ ধর্ম্মপালের মন্ত্রী ছিলেন এবং তদ্বংশীয় দর্ভপাণি ও কেদার মিশ্র দেবপালের এবং গুরব মিশ্র নারায়ণ পালের মন্ত্রী ছিলেন। আদিশূর যদি অষ্টম শতাব্দীতেও আবির্ভূত হইয়া থাকেন তাহা হইলে পাঞ্চালকে তাঁহার সময়ের লোক অথবা অনতিকাল পরবর্ত্তী বলিয়া গণ্য করা যায়। অথচ এই পাঞ্চালের নাম কুলগ্রন্থোক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অথবা তাঁহাদের পুত্রগণের মধ্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, হয় কুলগ্রন্থের বংশাবলী বিশ্বাসযোগ্য নহে—নচেৎ আদিশূরের সময়ে এবং তাঁহার পূর্ব্বে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে বাস করিতেন। উক্ত তাম্রশাসন অনুসারে ইঁহারা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ইঁহাদের শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির কথাও উক্ত লিপিতে প্রশংসিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ যথার্থই বলিয়াছেন যে, "ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিতে উল্লিখিত ভট্ট ভবদেবের বংশবৃত্তান্তের সহিত আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণানয়ন বৃত্তান্তের সামঞ্জস্য অসম্ভব।"(২) ৺ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মত খণ্ডন করিবার জন্য লিখিয়াছেন যে, "পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিবার বহু পূর্ব্বাবধি বৈদিক শ্রেণীর যে সকল ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদেরও মধ্যে অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে শাণ্ডিল্য প্রভৃতি পঞ্চ গোত্রেরই অস্তিত্ব ছিল।"(৩) ৺ঠাকুর মহাশয় এই উক্তির প্রমাণস্বরূপ সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থের দুইটি অংশের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ দুই অংশে পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর চতুর্ব্বিংশতি গোত্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু কুলগ্রন্থ মতে আদিশূরের পরে রাজা শ্যামলবর্ম্মা কর্ত্তৃক ১০০১শকে পঞ্চগোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিকের পাঁচজন পূর্ব্বপুরুষ বঙ্গদেশে আনীত হন (পাশ্চাত্য বৈদিক-প্রসঙ্গে ইহা বিবৃত হইয়াছে)

---

(২) গৌড়রাজমালা (২৭)

(৩) আদিশূর (৭৪-৫)

এবং সম্বন্ধ-নির্ণয় গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে।(৪) প্রাচীন কুলগ্রন্থ-মতে আদিশূরের পূর্ব্বে মাত্র সাতশতী ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে বাস করিতেন এবং ঐ সময়ে তাঁহাদের মধ্যে মাত্র আটটি গোত্র ছিল, যথা—শুনক, শৌনক, গৌতম, কাশ্যপ, কৌণ্ডিল্য, পরাশর, বশিষ্ঠ, হারীত ও কৌৎস। সুতরাং পাশ্চাত্য বৈদিকগণের আগমনের পূর্ব্বে কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধরগণ ব্যতীত বঙ্গদেশের আর কোন ব্রাহ্মণেরই শাণ্ডিল্য অথবা সাবর্ণগোত্র থাকিতে পারে না—কুলগ্রন্থের ইহাই স্পষ্ট অভিমত। অতএব ৺ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিবাদ কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। অবশ্য এই সমুদয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণ যে এদেশে পূর্ব্বাবধিই ছিলেন ইহা ৺ঠাকুর মহাশয়ের ন্যায় আমরাও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়—কুলগ্রন্থের ঐতিহাসিকতা। আমরা কেবলমাত্র ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাই যে, বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা তাম্রশাসনোক্ত সমসাময়িক ঘটনার বিরোধী সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য নহে।

ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশের গ্রন্থকর্ত্তা বাৎস্যগোত্রীয় নারায়ণ নিজ গ্রন্থে স্বীয় পিতৃপুরুষগণের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার দ্বারা বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ প্রদত্ত গাঞির বিবরণ যে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে ইহা ৺নগেন্দ্রনাথ বসু (৫) ও কুলগ্রন্থে শ্রদ্ধাবান অন্যান্য লেখকও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, নারায়ণ পিতৃপুরুষগণের যে বংশাবলী দিয়াছেন তাহার সহিত কুলগ্রন্থোক্ত বাৎস্যগোত্রীয় ছাণ্ডড়ের বংশাবলীর সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে না।

এই সমুদয় আবিষ্কারের ফলে ৺নগেন্দ্রনাথ বসুকেও পরবর্ত্তীকালে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, কুলগ্রন্থোক্ত পাঁচজন "ছাড়া পঞ্চগোত্রের মধ্যে আরও অনেকে যে রাঢ়বাসী হইয়াছিলেন, নারায়ণের "ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশ" ও ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।"(৬) এই এক স্বীকৃতিতেই বঙ্গীয় কুলগ্রন্থের প্রধান ভিত্তি ধ্বংস হইয়াছে।

অপর পক্ষে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, কুলগ্রন্থগুলি একেবারে স্বকপোলকল্পিত রচনা নহে। কারণ ইহার কোন কোন উক্তি সমসাময়িক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয়। অরিরাজ দনুজমাধব দশরথের তাম্রশাসনে ব্রাহ্মণদের যে সমুদয় গাঞির উল্লেখ আছে তাহার অনেকগুলি কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়। খুব প্রাচীনকালেই যে ব্রাহ্মণেরা রাজদত্ত শাসন গ্রাম পাইয়া উক্ত গ্রামের নাম অনুসারে গাঞি আখ্যা পাইতেন কুলগ্রন্থোক্ত এই সাধারণ উক্তি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু কোন্ সময়ে কোন্ ব্রাহ্মণ কোন্ গাঞি উপাধি গ্রহণ করিলেন সে সম্বন্ধে কুলগ্রন্থের উক্তির মধ্যেও ঐক্য নাই, সুতরাং তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না। তাম্রশাসনের প্রমাণের দ্বারাও কুলগ্রন্থোক্ত গাঞির বিবরণ ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়। হরি মিশ্র ও বাচস্পতি মিশ্র উভয়েই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের ৫৬ গ্রামের মধ্যে 'চট্ট' গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন—ইহা হইতেই উক্ত গাঞী ব্রাহ্মণের চট্ট বা চট্টোপাধ্যায় উপাধি হইয়াছে। কিন্তু খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা ধর্ম্মাদিত্যের তাম্রশাসনে বৃহচ্চট্ট নামক ব্রাহ্মণের উল্লেখ থাকায় অনুমিত হয় যে, আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়নের বহুপূর্ব্ব হইতেই চট্ট উপাধিধারী ব্রাহ্মণ বাংলায় বর্ত্তমান ছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি প্রতিপন্ন হইতেছে—

(১) কুলগ্রন্থোক্ত রাজা আদিশূর সম্ভবত একজন প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

(২) তাঁহার সময়ে, এবং তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে, কান্যকুব্জ এবং মধ্যদেশের অন্তর্গত অন্যান্য নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণ আসিয়া বঙ্গদেশে বসবাস করিয়াছেন এরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ আছে।

(৩) আদিশূর নিজে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঁচজন ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আনয়ন করিয়াছেন—ইহার স্বপক্ষে বিশিষ্ট প্রমাণ না থাকিলেও এ বিষয়ে প্রবল জনশ্রুতি এবং সমুদয় কুলগ্রন্থে ঐক্য থাকায় ইহা সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

(৪) সং নিং (৪৫)

(৫) বসু—২ (৯-১১)

(৬) বসু—২ (৮)

(৪) কুলগ্রন্থোক্ত অন্যান্য বিবরণ,—ব্রাহ্মণদের নাম, আনয়নের সময়, প্রণালী ও কারণ, আদিশূরের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাতের বিবরণ, বঙ্গদেশে তাঁহাদের বসবাসের হেতু, তাঁহাদের সন্তানগণের বংশপরিচয়, তাঁহাদের মধ্যে রাঢ় ও বারেন্দ্র শ্রেণী-বিভাগ ইত্যাদি বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

(৫) বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র নামে পরিচিত সমুদয় ব্রাহ্মণই যে আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান এই সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক ধারণার স্বপক্ষে কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ নাই এবং বিপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

(৬) কুলগ্রন্থগুলি নিছক কাল্পনিক গ্রন্থ নহে। কিন্তু আদিশূরের বহু পরবর্ত্তীকালে লোকের মুখে মুখে যে সমুদয় প্রবাদ প্রচলিত ছিল তাহা অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে এবং যাঁহারা এ সমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট বিশ্বস্ত কোন প্রামাণিক গ্রন্থ ছিল না(৭) এবং তাঁহাদের বিচারবুদ্ধির ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব ছিল।

আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়নের পরেই বল্লালসেন কর্ত্তৃক কৌলীন্য মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা কুলগ্রন্থে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং অতঃপর এই বিষয়টির আলোচনা করা যাউক।

বল্লালসেন একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং সমসাময়িক তাম্রশাসন হইতে আমরা তাঁহার বংশ-পরিচয় সঠিকভাবে জানিতে পারি। তিনি সামন্তসেনের প্রপৌত্র, মহারাজাধিরাজ হেমন্তসেনের পৌত্র, এবং মহারাজাধিরাজ বিজয়সেন এবং শূরবংশীয়া বিলাস দেবীর পুত্র। কিন্তু বল্লালসেনের পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে কিরূপ অদ্ভুত কাল্পনিক উপাখ্যান স্থান পাইয়াছে তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১। আদিশূর মহারাজ জগতে বিখ্যাত।
তাঁর দৌহিত্র বল্লাল শ্রীধরের সুত॥

(রামজীবন-কৃত কুলপঞ্জিকা) ৮

২। কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্র নাহি ব্যবহার।
কিন্তু বৈদ্যবংশে এক পাই সমাচার॥
আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেনবংশ তাজা।
বিম্বকসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা॥

(রামজয়-কৃত বৈদ্যকুলপঞ্জিকা) ৯

রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে বল্লালসেনের যে বংশ-পরিচয় আছে তাহা সংক্ষেপত এই—

শূরবংশ ধ্বংস হইলে অরাজক গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়া সেনবংশীয় হেমন্তসেন শ্রীধর এই নাম গ্রহণ করিলেন। ৩৪ বৎসর রাজ্য করার পর তাঁহার পুত্র ধীসেন অথবা বিজয়সেন রাজা হইলেন। তিনি ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। ১০৭২ শাকে (শ্রীনাম্নী রাজ্ঞীর গর্ভে?) বিজয়সেনের বল্লাল নামে এক পুত্র জন্মে। (১০)

এখানে কুলগ্রন্থোক্ত শ্রীধর ও ধীসেন এই দুইটিকে তাম্রশাসনোক্ত হেমন্ত ও বিজয়সেনের নামান্তর বলিয়া প্রচার করায় ইহার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কারণ আছে। কিন্তু হেমন্তসেন যে শূরবংশের ধ্বংসের পরে রাজা হন নাই তাহার প্রমাণ এই যে, তৎপুত্র বিজয়সেন শূরবংশীয় রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন এবং রামপাল যে সময়ে বরেন্দ্র পুনরায় উদ্ধার করেন তখনও দক্ষিণ রাঢ়ে শূর উপাধিধারী রাজা ছিলেন। বিজয়সেন ৪০ বৎসরের অধিককাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, কারণ বারাকপুরের তাম্রশাশন তাঁহার ৬১ বৎসরে প্রদত্ত। এই তাম্রশাসনখানি আবিষ্কারের পর এই শ্লোকের যে পাঠান্তর পাওয়া যায় নাই ইহাই আশ্চর্য্য! বল্লালসেনের জন্ম ১০৭২ শাকে হওয়া অসম্ভব।

কুলশাস্ত্রমতে বিজয়সেন শ্যামলবর্ম্মার পিতা ছিলেন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। শ্যামলবর্ম্মার পিতা

(৭) যবন ও বর্গি কর্ত্তৃক কুলগ্রন্থ নষ্ট হওয়ার কথা যে কুলগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

(৮) সং নিং (২১৯)। লালমোহন মুখোপাধ্যায়—বন্দ্যবংশ (১৩)

(৯) সং নিং (৩৭৬)

(১০) বসু—২ (১৪)। বসু মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"কিন্তু হেমন্ত সেনের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া মহীপাল-পুত্র নয়পাল প্রায় ৯৬৫ শকে বিক্রমশিলায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। সেই সঙ্গে উত্তররাঢ় হেমন্ত সেনের অধিকারভুক্ত হইল। ইহাও রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীর উক্তি কি-না ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু ৯৬৫ শকে হেমন্ত সেন রাজা ছিলেন অথবা উত্তররাঢ় সেন-রাজ্যভুক্ত ছিল ইহা ঐতিহাসিক সত্যের বিরোধী।"

ও পিতামহের নাম সমসাময়িক তাম্রশাসন হইতে জানা যায়। তাঁহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন বংশীয় ছিলেন।

এই সমুদয় আলোচনা করিলে সহজেই প্রতীতি হইবে যে, যে সময়ে কুলগ্রন্থগুলি রচিত হয় সে সময় সেনবংশীয় রাজগণের ইতিহাস জনপ্রবাদে পরিণত হইয়াছে এবং এ বিষয়ে কোন প্রামাণিক গ্রন্থ কুলাচার্য্যগণের অজ্ঞাত ছিল।

বল্লাল-প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য সম্বন্ধে যে সমুদয় অদ্ভুত উপাখ্যান কুলগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বল্লালের পরে কৌলীন্য প্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণের যে বংশাবলী ধ্রুবানন্দের মহাবংশের ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে তাহাও যে কিরূপ অবিশ্বাস্য তাহাও পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে আর একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। বল্লালসেনের ও তাঁহার বংশধরগণের অনেকগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহাতে দানগ্রহীতা বহু ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ আছে কিন্তু তাহাদের কাহারও সম্বন্ধে কুলীন এই মর্য্যাদাসূচক উপাধি ব্যবহৃত হয় নাই। কুলগ্রন্থ-মতে ব্যক্তিগত গুণ দেখিয়া বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন কৌলীন্য মর্য্যাদা দিয়াছিলেন অথচ অনিরুদ্ধভট্ট, হলায়ুধ, ঈশান, পশুপতি, ধনঞ্জয়, সর্ব্বানন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অথবা লক্ষ্মণসেনের সভাস্থিত জয়দেব, শরণ, ধোয়ী, উমাপতি, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি বিখ্যাত কবিগণ কেহই কুলীন হইলেন না, কুলীন হইলেন কেবল তাঁহারাই, কুলগ্রন্থের বাহিরে যাঁহাদের নাম বা কীর্ত্তির কোন পরিচয় নাই। সারস্বত শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে অনিরুদ্ধ ভট্টের ন্যায় ব্রাহ্মণ ছিলেন অথচ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহই কুলীন হইবার যোগ্য বিবেচিত হইলেন না—বিশিষ্ট প্রমাণ অভাবে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।

বল্লালসেনের পূর্ব্বেও যে কৌলীন্যপ্রথা ছিল তাহার কিছু প্রমাণ আছে। চক্রপাণিদত্ত তাঁহার 'চিকিৎসা-সংগ্রহ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তিনি লোধ্রবলী বংশীয় কুলীন ছিলেন। চক্রপাণিদত্তের পিতা নারায়ণ গৌড়রাজের 'রসবত্যধিকারিন', অর্থাৎ—রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। চিকিৎসা-সংগ্রহের টীকাকার শিবদাস সেন বলেন যে, উক্ত গৌড়রাজ নয়পাল। শিবদাস সেনের এই উক্তি অনুসারে অন্তত বল্লালসেনের শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেই কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত ছিল। শিবদাস সেন ষোড়শ শতাব্দীর লোক, সুতরাং কুলশাস্ত্রের উক্তি অপেক্ষা তাঁহার উক্তি অধিকতর অবিশ্বাস্য এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। শিবদাস সেনের উক্তি হইতে অন্তত এটুকু প্রমাণিত হয় যে, বল্লালসেনই যে কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্ত্তক একথা ষোড়শ শতাব্দীতে সর্ব্বসাধারণ স্বীকার করিতেন না এবং তখন লোকের বিশ্বাস ছিল যে, সেন-রাজগণের পূর্ব্ববর্ত্তী পাল-রাজগণের সময়ও সমাজে কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আদিশূরের রাজ্যকাল সম্ভবত একাদশ শতাব্দী। সুতরাং যে সমুদয় কুলশাস্ত্র অনুসারে ক্ষিতিশূরের পুত্র অথবা প্রপৌত্র ধরাশূর কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্ত্তক তাহাদের মত ও শিবদাস সেনের উক্তির সহিত সামঞ্জস্য করা কঠিন।

পরবর্ত্তী কুলাচার্য্যদের ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, কৌলীন্য-মর্য্যাদা সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশই কাল্পনিক ও অতিরঞ্জিত। যে কৌলীন্য পরবর্ত্তী কালে বিশেষ মর্য্যাদার চিহ্নরূপে গৃহীত হইয়াছিল, তাহার উৎপত্তি কি, প্রথমে তাহার প্রকৃতি কি ছিল এবং বল্লালসেনের সহিত তাহার সম্বন্ধ কতটুকু আজ আর তাহা সঠিকভাবে জানিবার উপায় নাই। তবে একথা স্থির যে, বল্লালসেনের সময় কৌলীন্যপ্রথা সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নাই এবং উহা সামাজিক বা ব্যক্তিগত মর্য্যাদার একমাত্র মানদণ্ডে পরিণত হয় নাই। আজকালকার রাজদত্ত উপাধির ন্যায় কৌলিন্যও সম্ভবত প্রথমে সাধারণ মর্য্যাদা-সূচক ব্যক্তিগত উপাধি মাত্র ছিল। কালক্রমে তাহা বংশগত হইয়া উচ্চতম সামাজিক শ্রেণীর চিহ্নস্বরূপ পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহাও অসম্ভব নহে যে, তৎকালে প্রচলিত তান্ত্রিক মতের সহিত এই কৌলীন্যের ইতিহাস বিজড়িত। বৌদ্ধ তন্ত্রমতের প্রভাবে বঙ্গদেশে কৌল নামে এক নূতন শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ কৌল অথবা কুলীন নামে অভিহিত হইতেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম ছিল কুলাগম অথবা কুলশাস্ত্র। বল্লালসেন যোগিনীবট্টে একবর্ষকাল দেবীর আরাধনা করিয়া কৌলীন্য প্রতিষ্ঠা করেন, দেবীবর ঘটক কামরূপে কামাখ্যা দেবীর আরাধনা করিয়া কৌলীন্য-মর্য্যাদা দানের অধিকার লাভ করেন ইত্যাদি প্রবাদ তন্ত্রবিধির সহিত কৌলীন্যের সম্বন্ধ সমর্থন করে। কিন্তু এই সম্বন্ধ কিরূপ বা কতটুকু তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

যে সময়ে আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের এবং বল্লালসেন কর্ত্তৃক কৌলীন্য-মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠার আখ্যান পূর্ণাঙ্গভাবে গড়িয়া ওঠে ও কুলাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সালঙ্কারে লিপিবদ্ধ হয় তখন এ উভয়ই জনপ্রবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং ইহাদের প্রকৃত ইতিহাস লুপ্ত হইয়াছে। বংশপরম্পরাগত পারিবারিক আখ্যান, প্রচলিত জনশ্রুতি, অসম্পূর্ণ কুলজীগ্রন্থ, ও তৎকালে প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস নামে সাধারণে যাহা পরিচিত ছিল এই সমুদয় যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া ইহাদের সাহায্যেই কুলজ্ঞগণ আদিশূর ও বল্লালসেনের কাহিনী গড়িয়া তোলেন।

কোন্ সময়ে এই নূতন সামাজিক শাস্ত্র বিধিবদ্ধ হয় তাহা যথাযথভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীই এই নূতনরূপে কুলশাস্ত্র রচনার যুগ। যে-কোন কারণেই হউক, দীর্ঘ দুই শতাব্দীর অবসাদের পর পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গে নব-জাগরণের সূত্রপাত হয়। এই সময়েই মহাপ্রভু বৈষ্ণবধর্ম্মের নূতনরূপ প্রচার করেন, রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করেন এবং রঘুনন্দন প্রাচীন স্মৃতির নূতন ব্যাখ্যা দ্বারা মৃতপ্রায় বঙ্গ সমাজকে সঞ্জীবিত করেন। এই সময়েই বর্ত্তমান বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সূত্রপাত হয় এবং চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। সকল দিক দিয়াই একটা নব জাগরণের, প্রাচীন লুপ্তপ্রায় ধর্ম্ম, শাস্ত্র, সাহিত্য ও সামাজিক ব্যবস্থার কালোপযোগী নূতন সংস্করণের চেষ্টা দেখা যায়। খুব সম্ভব এই সময়েই কুলশাস্ত্রগুলির নূতন সংস্করণ হয়। দেবীবর ঘটক, ধ্রুবানন্দ মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র, মুলো পঞ্চানন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কুলাচার্য্যগণ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে এবং ষোড়শ শতাব্দীর আরম্ভে প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কুলাচার্য্যের গ্রন্থের বিশ্বস্ত সংস্করণ এ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীতেও যে এরূপ কোন গ্রন্থ সম্পূর্ণ বা অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। (১১) যদি কোন প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ সে সময়ে প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে বিভিন্ন কুলগ্রন্থের মধ্যে এত প্রভেদ ও পরস্পর-বিরোধী মত দেখা যাইত না।

দুই শত বৎসর বিদেশীয় রাজত্বের ফলে বঙ্গদেশের সংস্কৃতি, সভ্যতা ও জ্ঞানের অব্যাহত ধারা বিলুপ্ত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যাঁহারা বঙ্গদেশের নবজাগরণের অগ্রদূত ছিলেন তাঁহাদিগকে বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীন ইতিহাস ও সভ্যতার ভিত্তির উপরই নূতন জাতি ও সমাজ গড়িতে হইয়াছিল। কালের প্রবল স্রোতে ধর্ম্ম ও সমাজে যে সমুদয় পরিবর্ত্তন দৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইয়াই প্রাচীন আদর্শের সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইয়াছিল। কারণ বাঙ্গালার প্রাচীন সভ্যতা ও গৌরবের আদর্শ ও স্মৃতি ব্যতীত এই এই মৃতপ্রায় জাতির দেহে নবজীবন সঞ্চার করিবার আর কোন প্রকৃষ্ট উপায় ছিল না। রঘুনন্দনের অষ্টবিংশতিতত্ত্ব নবীন ও পুরাতনের সামঞ্জস্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। রঘুনন্দন কর্ত্তৃক মন্বাদি প্রাচীন সংহিতার ব্যাখ্যা অনেক স্থলে আমাদের নিকট অসঙ্গত মনে হয়। কিন্তু প্রচলিত প্রথাকে প্রাচীন শাস্ত্রের দ্বারা সমর্থন করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর বঙ্গ-সমাজের সহিত প্রাচীন হিন্দুসমাজের যোগসূত্র স্থাপন না করিলে প্রাচীন গৌরবের আদর্শে বঙ্গসমাজ উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত হইত না এবং এই প্রাচীন আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে হয়ত বাঙ্গালী জাতি নবজীবন লাভ করিতে পারিত না।

যে উদ্দেশ্যে রঘুনন্দন পুরাতন স্মৃতির বচন সংগ্রহ করিয়া অষ্টবিংশতিতত্ত্ব লিখিয়াছিলেন সেই উদ্দেশ্যেই কুলাচার্য্যগণও কুলগ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হন। তখনকার সমাজে যে শ্রেণী-বিভাগ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাকে প্রাচীনত্বের মর্য্যাদা দিয়া তাহার মধ্যে নূতন প্রাণের ও নূতন আদর্শের সৃষ্টি করাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দু রাজত্বের অবসানের প্রাক্কালে যে তিনটি হিন্দু রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল—বর্ম্ম, শূর ও সেন রাজবংশ—তাহাদের সহিত বঙ্গদেশের উচ্চ জাতির সংযোগ স্থাপন করিয়া তাঁহারা নবীনকে প্রাচীনত্বের মর্য্যাদা দান করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। রঘুনন্দন যেমন অনেক স্থলেই সমসাময়িক প্রথার সমর্থনকল্পে প্রাচীন স্মৃতির প্রকৃত

(১১) কুলতত্ত্বার্ণবে উক্ত হইয়াছে যে, যবনগণ ব্রাহ্মণদিগের গৃহ হইতে শ্রুতি, স্মৃতি, কুলগ্রন্থ ও পুরাণসকল বলপূর্ব্বক লইয়া ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিত (৫৮০ শ্লোক) এবং দেবীবর বহু চেষ্টা করিয়াও প্রাচীন কুলগ্রন্থের সন্ধান পান নাই (শ্লোক ৫৮৭)।

তাৎপর্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই—কুলশাস্ত্রকারগণও তেমনি প্রকৃত ঐতিহাসিক জ্ঞানের অভাবে প্রাচীন ইতিহাসকে কল্পনার সাহায্যে প্রয়োজনের অনুরূপ করিয়া গঠন করিয়াছিলেন। প্রকৃত ইতিহাসের মূর্ত্তি এক ও অভিন্ন, কিন্তু কাল্পনিক ইতিহাসের মূর্ত্তি অনন্ত। সেই জন্যই কুলগ্রন্থের মধ্যে এত প্রভেদ দৃষ্ট হয়। তদ্ব্যতীত ব্যক্তি বংশ বা সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত রচিত কুলগ্রন্থে স্বভাবতই অনেক অলীক আখ্যানের সংযোগ হইয়াছে। এই সমুদয়ের ফলেই বর্ত্তমান কুলশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং কুলশাস্ত্র ঐতিহাসিক গ্রন্থও নহে, নিছক কাল্পনিক উপাখ্যানও নহে। সমসাময়িক সমাজের প্রয়োজন অনুসারে প্রচলিত ঐতিহাসিক জনশ্রুতির ভিত্তির উপর কল্পনার সাহায্যে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে এই শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। তৎকালের এই ঐতিহাসিক জনশ্রুতি যে কিরূপ ভ্রান্ত ও বিকৃত ছিল রাজাবলী গ্রন্থের দৃষ্টান্তে প্রথম প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং কুলশাস্ত্রগুলিকে ঐতিহাসিক গ্রন্থরূপে গ্রহণ করিলে ইহার প্রতি অবিচার করা হইবে। এই নবজাগরণের দিনে বঙ্গদেশে প্রাচীন যুগের সম্বন্ধে কি ধারণা বদ্ধমূল ছিল এবং এই ভিত্তির উপর নূতন সামাজিক ব্যবস্থা কি প্রকারে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রকৃত চিত্র হিসাবেই ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

কুলশাস্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মত যে সর্ব্বাংশে সত্য এইরূপ কথা আমরা বলি না, কারণ এ বিষয়ে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত করার মত পর্য্যাপ্ত প্রমাণ আমাদের হাতে নাই। তবে উপস্থিত যে সমুদয় প্রমাণ আমাদের হাতে আছে তাহার পক্ষপাতশূন্য বিচার ও বিশ্লেষণ করিলে যাহা আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয়, আমরা তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। প্রাচীন সংস্কার ত্যাগ করিতে স্বভাবতই ক্লেশ বোধ হয় এবং যাঁহারা বহুকাল যাবৎ সমাজে কোন বিশিষ্ট মর্য্যাদা লাভ করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা যে সহজে এই মর্য্যাদা ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকার করিবেন ইহা আশা করাও অন্যায়। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য বিচারের সময় আসিয়াছে এবং ঐতিহাসিক সত্যের অনুরোধে যাহা বলিয়াছি আশা করি তাহাকে ব্যক্তিগত বা সমাজগত বিদ্বেষপ্রসূত বলিয়া মনে না করিয়া সুধীগণ প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রণালীতেই তাহার বিচার করিবেন। "বাদে বাদে জায়তে তত্ত্ববোধঃ।" প্রকৃত প্রণালীতে বিচার দ্বারাই সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়। আমার এই কয়েকটি প্রবন্ধ যদি কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে বিচার-বিতর্কের উদ্বোধন করিয়া প্রকৃত সত্যের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে তাহা হইলেই আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

দীনেশচন্দ্র সেন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দিনের সঙ্গে সহস্রাংশু
ওই দিনেশের মত,
বঙ্গভাষার সঙ্গে তোমার
নামটি ওতপ্রোত।

শত মরকত দ্বীপ দেখাইলে
অকূলেতে দিয়া পাড়ি।
আবিষ্কারের গৌরব তুমি
পাইবার অধিকারী।

'পূর্ব্ব-বঙ্গ-গীতিকা' তোমার
অতি বড় অবদান,
সাহিত্যে তুমি আমাদের 'কুক'
'পেরী' 'আমণ্ডসান'।

অবজ্ঞাত ও অখ্যাতে তুমি
দিয়াছ প্রাপ্য যশ,
নীরস পাষাণে উধারি' বাহির
করিয়াছ সুধারস।

স্বজনী শক্তি লভ নাই বলি
বৃথায় তোমার দুখ,
ভরা—রক্ষা ও শোভন করার
আনন্দে তব বুক।

যা কিছু পরশ করেছ—তাহাই
করিয়াছ সুন্দর,
ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেমেতে পূর্ণ
তোমার ও অন্তর।

ভাষায় এনেছ কি ঐশ্বর্য্য ?
বিস্ময়ে হই চুপ!
তুমিই দিয়াছ জীর্ণ অতীতে
কি অব্যক্ত রূপ।

প্রাচীনের তুমি নূতন কথক,
বিপুল শক্তিধর,
নব কলেবর পেলে তব কাছে
বঙ্গ বৃহত্তর।

অতি সাধারণে লুকাইয়া ছিল
কোথা লাবণ্যময়,
তীক্ষ্ণ তোমার অমৃত দৃষ্টি
পেলে তার পরিচয়।

'মেলবন্ধন' করে দিলে তুমি
তুলনা কোথায় এর ?
তুমি দেবীবর আমাদের এই
বঙ্গসাহিত্যের।

আজিকে তোমার বিয়োগব্যথায়
চক্ষেতে বহে নীর,
মনে পড়ে তব সে শব-সাধনা
অর্দ্ধ শতাব্দীর।

তোমার নিকট বাঁচা আর পূজা
এক হয়েছিল জানি,
অফুরন্ত কি কর্ম্মশক্তি
দে'ছিলেন বীণাপাণি!

ভারতীর হেন একান্ত মনে
অর্চ্চনা করে কেবা ?
তব বিশ্রাম, ধর্ম্ম, কর্ম্ম,
স্বপ্ন তাঁহারি সেবা।

অজানা অচেনা দীন শিক্ষক
কোথা পড়েছিলে তুমি,
আমোদিত ফুল খড়ির সে ফুলি
আজিকে বঙ্গভূমি।

দাগা-বুলাবার শরের কলম
তুচ্ছ উপেক্ষিত—
করিতেছে আজি সরস্বতীর
শ্রীকর অলঙ্কৃত।

ছেলে ভুলাবার তালপাতা ভেঁপু
ভেবেছে বল কে কবে—
এমন করিয়া শ্যামের হাতের
সাধের মুরলী হবে ?

মাতা পিতাপদে অচলা ভক্তি
তুমি অবিনশ্বর—
বঙ্গভাষার অন্তঃপুরে
স্থাপিলে রূপেশ্বর।

প্রতিভার টিকা নাই পায় যদি
তোমার ললাট-তল,
বাণীর দত্ত দই-হলুদের
ফোঁটা করে ঝলমল।

যে পেলে মায়ের নিজ হাতে দেওয়া
এমন আশীর্ব্বাদ,
তাহার আবার অন্য ক্ষুদ্র
গৌরবে কেন সাধ ?

সকল কার্য্যে সিদ্ধি লভেছ
সফল সকল শ্রম,
জীবনে কখনো পূজ্য পূজার
করনি ব্যতিক্রম।

বঙ্গ তনয় ধন্য হইবে
তোমার কীর্ত্তি স্মরি,
বিশ্বের মহাজাতি সদনের
বনিয়াদ গেলে গড়ি।

স্নেহ-ভালবাসা লভেছি তোমার
দীর্ঘ জীবন ধরি,
স্বরগযাত্রী, হে মহাপুরুষ!
লুটায়ে প্রণাম করি।

---

* রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট মহোদয়ের বিয়োগে।

ধর্ম্মের অপরিহার্য্যতা

অধ্যাপক শ্রীগিরীন্দ্রনারায়ণ মল্লিক

সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মানুভূতির মধ্যে নিহিত থাকে কতকগুলি মানসিক ভাবাবেগ ও ক্রিয়া। আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন ও ও বুদ্ধিজীবী জীবের পক্ষেই এইগুলি সম্ভবপর হয়। মানব-চৈতন্য ও ঈশ্বরচৈতন্যের মধ্যে যে সমস্ত সম্বন্ধ অবশ্য বিদ্যমান, ঐগুলি তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ঐগুলি যাদৃচ্ছিকরূপে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার বিলাসের মধ্যে যে নিগূঢ় যুক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে অজ্ঞাতসারে তাহার অনুগতিক্রমেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফিলসফির কার্য্য হইতেছে উপরোক্ত সম্বন্ধরাজিকে প্রপঞ্চিত করা, এবং যে প্রক্রিয়ায় পরিচ্ছিন্ন জীবচৈতন্য স্বীয় পরিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করিয়াপরোক্ষ নিত্যবস্তু-সমূহের সহিত নিগূঢ় যোগের অবস্থায় উপনীত হয়, সেই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর নির্ণয় করা। প্রকারান্তরে বলিতে গেলে, মানবমনের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহার দরুণ ইহা ঈশ্বরের সহিত নিজের সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া থাকিতে পারে না—এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করা, এবং মনের ধর্ম্মিক অনুভূতির মধ্যে নিহিত আছে যে-ঈশ্বরচেতনা তাহারই স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা ফিলসফির কার্য্য। এই কার্য্যসম্পাদনেই ফিলসফি ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করে।

প্রত্যেত মানুষ অবশ্য ধর্ম্মপ্রবণ হইবে এই কথা শ্রবণ মাত্রেই অসত্য বলিয়া প্রতীত হয়। "ধর্ম্মের অপরিহার্য্যতা" বলিতে, বলা বাহুল্য, এমন কোন কিছু বুঝায় না। মানুষ হইতে গেলে ধর্ম্ম যে তাহার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হইবে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আমাদের দেখান আবশ্যক নয় যে, ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই এমন কোনও মানুষ বিদ্যমান নাই। নীতিধর্ম্ম, ব্যবহারবিধি, বিজ্ঞান অথবা দর্শনের প্রয়োজনীয়তা বলিতে আমরা যেরূপ বুঝি, ধর্ম্মের অপরিহার্য্যতা বলিতেও ঠিক্ সেইরূপই বুঝিয়া থাকি। একথা বলা যাইতে পারে যে, যাহা যাদৃচ্ছিক নয় কিন্তু যৌক্তিকতার সারমর্ম্ম হইতে স্বতঃউৎসারিত, এই প্রকার নীতিসমূহের উপর নীতিধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। ঐ সমস্ত মৌলিক নীতির স্বীকার পূর্ব্বক উপলব্ধির মধ্যেই প্রত্যেক যুক্তিক্ষম জীব স্বীয় স্বরূপের পরিপূর্ণতা অনুভব করিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, বহু ব্যষ্টি মানব আছে যাহারা অপজাতস্বভাব; শুধু তাহাই নয়, এমন অনেক ব্যক্তি ও বর্ণ (race) আছে যাহারা মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের অত্যন্ত নিম্নস্তরে থাকায় নীতি-ধর্ম্মের অতি প্রাথমিক ধারণা পর্য্যন্ত তাহাদের নাই। আবার, কতকগুলি মূলনীতি হইতে সিদ্ধান্তক্রমে উপপাদিত হইতে পারে এমন এক কান্তশিল্পার সত্তা অবশ্য স্বীকার করা যাইতে পারে, এবং সেই সঙ্গে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, এমন বহুসংখ্যক লোক আছে যাহাদের মধ্যে সৌন্দর্য্যবোধ হয় প্রসুপ্ত অথবা বিকৃতভাবে থাকে। এই প্রকারে দেখান যাইতে পারে যে, ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং এই প্রয়োজনীয়তা, যৌক্তিকতার স্বরূপের মধ্যে, সুতরাং সমগ্র যুক্তিক্ষম জীবের মধ্যে, নিহিত থাকে। অথচ, কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ যাদৃচ্ছিকরূপে সংঘটিত হওয়ায় তাহার যথার্থ স্বরূপের বিকাশ উপযুক্তরূপে হইতে পারে না এবং সেইজন্য সে প্রকৃত আদর্শ বা লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদনের জন্য আমাদের দেখান আবশ্যক নয় যে, সকল মানুষের অথবা সকল জাতির সকল যুগের ধর্ম্মিক প্রত্যয়সমূহের মধ্যে ঐক্য আছে। অথবা বিপর্য্যাস তর্কপদ্ধতিতে (conversely) বলিতে গেলে, আমাদের দেখাইতে হইবে না যে, যে বিষয়ে সকল যুগের সকল মানুষের মধ্যে ঐক্য থাকে তাহাই ধর্ম্মের আবশ্যিক অঙ্গ। সার্ব্বজনীন সত্য বলিতে সেই সমস্ত সত্য বুঝায় না যে-বিষয়ে সকল লোকের একমত। জগতে যে সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম্মবাদ প্রচলিত আছে তাহাদের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য বর্জ্জনপূর্ব্বক সামান্য প্রত্যয় ও বিশ্বাসসমূহকে গ্রহণ করিলেই আমরা ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন অঙ্গবস্তুকে পাইতে পারি না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করা যাউক। ইতিহাস যে সমস্ত মহান্ ধর্ম্মের বিষয় উল্লেখ করে, কেবল সেইগুলি নয়, কিন্তু অনৈতিকহাসিক নিম্নতম মন্ত্রতান্ত্রিক বা পৌত্তলিক ধর্ম্মসমূহ পর্য্যন্ত, এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্ম—

এই উভয়ের মধ্যে যাহা সাধারণতত্ত্ব তাহাই ধর্ম্মের নিষ্কর্ষ নয়। এই প্রণালীতে ধর্ম্মের সারাংশ নির্ণয় করিতে গেলে ধর্ম্ম কেবলমাত্র একটা অস্পষ্ট ভাবাবেগে অথবা অতি তুচ্ছ অনির্দ্দিষ্টরূপ প্রত্যাহারবস্তুতে পর্য্যবসিত হইবে না, কিন্তু সর্ব্বমহান্ ধর্ম্মের যেটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ তাহাও আলোচনাবহির্ভূত হইবে। অসভ্যতা ও সভ্যতা এই দুই-এর যাহা সাধারণ বস্তু তাহাই যথার্থতমরূপে মানবীয় নহে, কিন্তু যাহা সভ্যতাকে অসভ্যতা হইতে পৃথক্ করে তাহাই যথার্থরূপে মানবতার বৈশিষ্ট্য। যেমন ব্যষ্টিমানবের পক্ষে, সেইরূপ জাতির পক্ষেও এমন অনেক জ্ঞানোপকরণ আছে যাহা সারত সত্য, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির একটা বিশিষ্ট স্তরে উপনীত হইলেই এই সমস্ত প্রত্যয়ের উপলব্ধি সম্ভবপর হয়, অন্যথা নয়। অতএব বুঝা যাইতেছে—ধর্ম্মের মধ্যে এমন সমস্ত জ্ঞানোপকরণ ও তথ্য বিরাজ করে যাহা নিরপবাদরূপে সত্য, অথচ, ব্যবহারিক জগৎ হইতে যতদূর জানা যায়, ঐ সমস্তের জ্ঞান মানুষের পক্ষে সভ্যতার ক্রমবিকাশের অতিপরবর্ত্তী যুগেই সম্ভবপর হয় এবং তাহাও আবার কোন জাতির স্বল্পসংখ্যক লোকের পক্ষেই ঘটিয়া থাকে। আরও এক কথা, যেখানেই আমরা উপচয় বা বিকাশের বিষয় অবতরণ করিতে বাধ্য হই, যেখানেই আমরা দেখি যে আমাদের চিন্তার বিষয়বস্তু সমজাতিক উপাদানের স্তূপীকরণের দ্বারা নয় কিন্তু বীজ অবস্থা হইতে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়া পরিশেষে পূর্ণতা লাভ করে, সেখানে ঐ বস্তুর সর্ব্বোচ্চ, সর্ব্বনিম্ন ও অন্তরাবর্ত্তী স্তরসমূহে যাহা সাধারণ ধর্ম্ম তাহারই নির্দ্ধারণের দ্বারা ঐ বস্তুর যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। উদ্ভিদ্ মাত্রই বীজ, অঙ্কুর, কাণ্ড, কোরক, ফুল, ফল প্রভৃতি নানা অবস্থার মধ্য দিয়া নিজ প্রাণবত্তার বিকাশ করে; এস্থলে কোরক, পুষ্প ও ফলের বৈশিষ্ট্যের কথা বাদ দিয়া কেবলমাত্র উপরোক্ত বীজাদি স্তরের যাহা সাধারণ বস্তু তাহারই জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভিদের সম্যক্ ধারণা করিতে পারা যায় না।

অতএব জগতে প্রচলিত ধর্ম্মমার্গসমূহের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে যদি আমরা ক্রমোৎকর্ষের লক্ষণ দেখিতে পাই, তবে ধর্ম্মের সারতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আমাদের উপরোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিলে চলিবে না। প্রচলিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। জগতে সর্ব্বত্র আদিমনিবাসিগণ প্রাকৃতিক পদার্থ ও ব্যাপারসমূহের দেবত্ব কল্পনা পূর্ব্বক ধর্ম্মোপাসনা করিতে ও এখনও কমবেশী সেই পদ্ধতি অসভ্য জাতির মধ্যে বিদ্যমান দেখা যায়। পক্ষান্তরে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মধ্যে এমন কতকগুলি প্রত্যয় ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিহিত আছে, যাহার দরুণ এই বিশেষ ধর্ম্ম মহিমা ও উৎকর্ষের দ্বারা সদা মণ্ডিত। অবশ্য উক্ত আদিম ধর্ম্মপদ্ধতি ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মধ্যে কিছু না কিছু সাদৃশ্য আছে, কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের কথা একেবারে বাদ দিয়া কেবলমাত্র উক্ত সাধারণ বস্তুর নির্দ্দেশ ও আলোচনার দ্বারা ধর্ম্মের সারতত্ত্ব ও যথার্থ স্বরূপ অবধারণ করা যায় না। ধর্ম্মবিষয়ে প্রাণীন ক্রমবিকাশের মতবাদ যদি আমরা গ্রহণ করি, তবে বলিতে হইবে যে, জগতে নিকৃষ্টতম ধর্ম্ম হউক বা উৎকৃষ্টতম হউক সর্ব্বত্র ইহার প্রয়োজনীয়তা সমানভাবে স্বীকার্য্য। নিকৃষ্টতম ধর্ম্মের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মতবাদের আলোচনায় অগ্রাহ্য হইতে পারে না, কারণ ইহাই শ্রেষ্ঠতমবাদের সুষ্ঠু প্রতীতির জন্য আবশ্যিকরূপে পূর্ব্বকল্পিত হইয়া থাকে। নিকৃষ্ট ধর্ম্মের মধ্যে যাহা সত্য ও উপযোগী, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবাদ তাহার বহু ঊর্দ্ধে স্থান পাইলেও তাহাকে গ্রহণ ও স্বাধিকারের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহাই যদি হয়, তবে সর্ব্বধর্ম্মের সাধারণ বস্তুকে ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন সত্যরূপে গ্রহণ করা ত যায়ই না, বরং বলিতে হয়—পূর্ণবিকাশের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় ধর্ম্মিক প্রত্যয় যে প্রকারের ছিল, সেইভাবে কোনও প্রত্যয়ই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবাদে আদৌ স্থান পায় না। সর্ব্বপ্রকার প্রাণীন ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে পৌর্ব্বকালিক অসম্পূর্ণ বিকাশের স্তরসমূহে যাহা কিছু থাকে তাহা পূর্ণবিকাশপ্রাপ্ত জৈবযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা নষ্টস্বরূপ ও সম্যক্ পরিবর্ত্তিত হইয়াই উক্ত জৈবযন্ত্রের মধ্যে স্থান পায়। দৃষ্টান্তচ্ছলে বলা যাইতে পারে—মানুষ মাত্রেই শৈশব, কৈশোর ও যৌবন, এই অবস্থাত্রয় ক্রমশ অতিক্রম করিয়া পূর্ণবিকাশের অবস্থায় উপনীত হয়। মানবতার এই পূর্ণবিকাশ বলিতে বুঝায়—দৈহিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ গুণের পূর্ণবিকাশ এখানে হইয়াছে। পূর্ণবিকাশের স্তরে পূর্ব্ববর্ত্তী শৈশবাদি স্তরের গুণরাজি ঠিক্ সেইভাবে কখনই থাকে না, সম্যক্

পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াই থাকে। অথচ বলিতে হইবে—পূর্ণবিকাশের স্তরে মানুষের মধ্যে এইরূপ ধারণা থাকিবে যে শৈশবাদি অবস্থায় তাহার মধ্যে সেই গুণগুলি অস্ফুটভাবে বিদ্যমান ছিল, অর্থাৎ শৈশবাদি সুলভ গুণরাজি পূর্ণবিকাশের স্তরে পূর্ব্বকল্পিত হয় বটে কিন্তু স্বারূপ্যে বিদ্যমান থাকে না। মানবজীবনের সকল স্তরে যাহা সাধারণ ধর্ম্ম তাহা আরোহ-অনুমানক্রমে (inductively) পাওয়া যায় না, কিন্তু পাওয়া যায় সেই ধারণার অবরোধের দ্বারা যাহার দরুণ পরবর্ত্তী সমস্ত রূপ ও অবস্থাকে সমগ্রভাবে এক অখণ্ড প্রাণীন বস্তুরূপে উপলব্ধি করা যায়। এই প্রকারে বুঝা যায়—জগতে যে সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে অথবা তাহাদের মধ্যে যে পৌর্ব্বাপর্য্য বা অন্যপ্রকার সম্বন্ধ থাকে, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে তাহাদের সমালোচনা হইতে উৎপন্ন যে প্রত্যয়রাজি তাহা অবশ্য ধর্ম্মবিজ্ঞানশাস্ত্রের উপকরণ সংস্থান করিবে, কিন্তু তাহাকেই ঐ বিজ্ঞানের তদাত্মক (identical) বলা যাইতে পারে না, অথবা তাহা হইতে আমরা ধর্ম্মনিহিত সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালিক সার সত্য লাভ করিতে পারি না। ঐ বস্তু লাভ করিতে হইলে, ইতিহাস যে সমস্ত ধর্ম্মমার্গ কেবল লিপিবদ্ধ করে, আমাদের চিন্তার গতিকে তাহাদের ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিতে হইবে এবং ঐ সমস্তের অন্তরালে অবস্থিত যে ধারণা সর্ব্বদা স্বীয় পূর্ণতর উপলব্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং উন্নয়নের প্রতি স্তরে কিছুমাত্র বর্জ্জন, এবং অপরিবর্ত্তিতভাবে গ্রহণ না করিয়া অতীত ধারণার পূর্ণতর উপলব্ধি করিতেছে, আমাদিগকে সেই ধারণার প্রতীতি করিতে হইবে। উক্ত ধারণার সমৃদ্ধতম বা পূর্ণতম স্বরূপ বলিতে আমরা সেই বস্তু বুঝি না যাহা পৌর্ব্বকালিক অন্যান্য অপূর্ণস্বরূপের সাধারণ বস্তু মাত্র। পক্ষান্তরে ইহা সেই সমস্ত ধারণার কোনও অংশ বা অবয়ব অপরিবর্ত্তিতরূপে নিজের মধ্যে স্থান দেয় না। অসংস্কৃত বা অপূর্ণাঙ্গ সমুদয় ধর্ম্মবাদের যাহা কিছু সত্য, সমৃদ্ধতম ধর্ম্মবাদ তাহার সুপ্ত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যান করিয়া থাকে বটে, কিন্তু স্বয়ং তাহার বিলোপসাধনপূর্ব্বক স্বীয় উজ্জ্বল মহিমায় বিরাজ করে।

ধর্ম্মের মুখ্য তাৎপর্য্য হইতেছে—"পরিচ্ছিন্ন জীবচৈতন্য যাহা কিছু পরিচ্ছিন্ন ও সাপেক্ষ সমস্তকেই অতিক্রম করিয়া এরূপ ভাবে স্বীয় উন্নয়ন সম্পাদন করিবে যে, নিরুপাধিক ভূমাতত্ত্ব ও জীবচৈতন্য এই দুই-এর মধ্যে নিগূঢ় যোগ ও পারস্পরিক আদানপ্রদান সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে।" এই প্রকার সম্বন্ধস্থাপনকেই ধর্ম্মগত সম্বন্ধ বলা যায়। সুতরাং এ পর্য্যন্ত যে ভাবে যুক্তি-বিচার করা হইল, তদনুসারে বলা যাইতে পারে—ধর্ম্মের অপরিহার্য্যতা প্রতিপাদন করিবার জন্য আমাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, উক্তপ্রকার পরিচ্ছিন্নতার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পরতত্ত্বের সহিত নিগূঢ়যোগ-স্থাপনরূপ যে কার্য্য তাহা মানুষের প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আছে, অর্থাৎ—মানুষের প্রকৃতি যে ভাবে গঠিত এবং যৌক্তিকতা ও সদসদ্‌বিবেক-রূপ তাহার যে ইতরপ্রাণীর তুলনায় বৈশিষ্ট্য তাহাতে ঐ প্রকার সম্বন্ধস্থাপন অপরিহার্য্য। স্পেন্সার প্রভৃতির অজ্ঞানবাদ ও অজ্ঞেয়তাবাদের সমালোচনাক্রমে জানা যায়, পরতত্ত্বজ্ঞানের অসম্ভাব্যতারূপ যে ধারণা প্রতিপক্ষ পোষণ করেন, তাহার মূলভিত্তি হইতেছে—"তাঁহাদের মতে সসীম ও অসীমের মধ্যে—পরিচ্ছিন্ন ও পরিচ্ছেদাতীত বস্তুর মধ্যে বিরাট ব্যবধান ও দুরপনেয় বিরোধ বিদ্যমান।" বলা বাহুল্য, এই প্রকার মতবাদ অসম্পূর্ণ আন্বীক্ষিকী শাস্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত। এই দোষ পরিহারকল্পে আমাদিগকে প্রতিপাদন করিতে হইবে যে, "সীমাবদ্ধ জীব অসীম পরতত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিলেও করিতে পারে" শুধু ইহাই নয়, কিন্তু উক্ত জীব পরতত্ত্বচেতনার ভূমিকায় উন্নীত হইতে বাধ্য। চিন্তা স্বীয় উপাধির দরুণ পরতত্ত্বচেতনা হইতে যে ব্যাবৃত্ত নয় শুধু তাহাই বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে না, কিন্তু এক অর্থে বলা যাইতে পারে যে, সুপ্ত বা উদ্‌বুদ্ধ হউক সেই প্রকার পরতত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে চিন্তা চিন্তাই নয়, জ্ঞান জ্ঞানই নয়। সুতরাং "পরিচ্ছিন্নতাই জ্ঞানের একমাত্র পরিসরক্ষেত্র এবং ভূমাজ্ঞান মোহ বা ভ্রান্তিমাত্র" এই প্রকার উক্তি করা ত বহু দূরের কথা, বরং নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানমাত্রই পরিচ্ছিন্ন বলিয়াই মোহাত্মক ও ভ্রান্ত এবং সর্ব্বপ্রকার যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা বলিতে বুঝায় যে, ইহার মধ্যে অসীমত্ব ও নিরুপাধিকত্ব অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে থাকিবেই। এই শেষোক্ত অঙ্গ ব্যতিরেকে যাবতীয় পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও অনুভবের বিশাল রচনা অনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলারহিত বস্তুতে পরিণত হইবে।

ধর্ম্মের অপরিহার্য্যতারূপ মতবাদ যে সমস্ত কারণে পোষণ করা হয়, সেই কারণগুলি এবং যুক্তি বিচারপূর্ব্বক

এই মতবাদে উপনীত হওয়ার প্রণালীর বিভিন্ন স্তরের বিশেষ পর্য্যালোচনা করিতে যখন আমরা চেষ্টা করি, তখন আমাদিগকে এরূপ অন্য এক মতবাদের সম্মুখীন হইতে হয় যাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইলে আমাদের উক্তপ্রকার চেষ্টা প্রতিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। "জগৎ জড়বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নয়, এবং জগতে কেবল জড়দ্রব্যগত কার্য্যকারণ সম্বন্ধ-পরম্পরা ও সংযোগসূত্রাবলী বিরাজ করে" যদি এই ভাবে জগতের স্বরূপব্যাখ্যান সম্ভবপর হয়; প্রাণ ও বুদ্ধিবৃত্তি সমেত জাগতিক যাবতীয় বস্তুর যে সমগ্র অখণ্ড রচনা সেই রচনাকে যদি যান্ত্রিকশক্তিমাত্রে ও তজ্জনিত বিকাররাশি-মাত্রে পর্য্যবসিত করা সম্ভবপর হয়, তবে পরতত্ত্বচেতনা এবং জীব-পরতত্ত্বের সম্বন্ধসমূহকে আশ্রয় করিয়া যে উন্নততর প্রপঞ্চব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হয় তাহা কেবল নিষ্প্রয়োজন নয় কিন্তু সম্ভবপরও হয় না। যাহা আমরা পরে দেখাইব, "ধর্ম্মের অপরিহার্য্যতা" এই বাক্যাংশের দ্বারা দ্যোতিত হয় যে, বুদ্ধিবৃত্তিবিশিষ্ট ও আত্মসংবিৎসম্পন্ন মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কিছু থাকে যাহার প্রেরণায় মানুষ জড়গত-পরিচ্ছিন্ন ভাবের বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া সর্ব্বব্যাপী বিরাট মনের ন্যূন কোনও বস্তুতেই শেষ বিশ্রান্তি পায় না। পক্ষান্তরে যে অভিনব প্রশ্নের অবতারণ হইয়াছে তাহার দ্বারা দ্যোতিত হয় যে, পরতত্ত্বচেতনাশ্রিত কোনও প্রকার জগদ্ব্যাখ্যানের প্রয়োজনই অনুভূত হয় না; তাহার কারণ হইতেছে—প্রাকৃতিক জগতের ব্যাপারসমূহ এবং সম্ভবত আধ্যাত্মিক জগতের ব্যাপারসমূহও এই শেষোক্ত মতবাদের আশ্রয় ব্যতিরেকেই সম্যক্ ব্যাখ্যাত হইতে পারে এবং তাহাও আবার অধিকতর সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত নীতি অনুসারেই সম্ভবপর হয়।

যে মিথ্যা বা ভ্রান্ত বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া প্রতিপক্ষগণের যুক্তিতর্ক প্রবর্ত্তিত হয় তাহার দ্বারা অনেক সময়ে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তার ধারণা অস্পষ্ট ও দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। একেশ্বরবাদী চিন্তাশীল লেখকগণ জড়বাদ ও প্রত্যক্ষমাত্র বিশ্বাসরূপ মতবাদের খণ্ডন করিতে নানা প্রয়াস পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে; তাহার কারণ—প্রতিপক্ষগণ যে বিষয়বস্তুকে বিচারসহ মনে করেন না, একেশ্বরবাদী দার্শনিকগণ স্বপক্ষস্থাপনের জন্য তাহাকেই অবলম্বন করিয়া থাকেন। জড়বাদীর মতের প্রকৃত ছিদ্র সেইখানে থাকে না যেখানে প্রতিপক্ষ একেশ্বরবাদী হইয়া অন্বেষণ করিয়া থাকেন, অথবা একেশ্বরবাদী যে যুক্তিবিচারকে বলবান্ মনে করিয়া স্বমত-স্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন সেইখানে প্রকৃত বলবত্তা নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—জড়বাদী নানা প্রকারে জগদ্ব্যাখ্যানের চেষ্টা করিতে গিয়া বলেন যে, "জগৎ জড়বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নয়, জড়দ্রব্যগত কার্য্যকারণসম্বন্ধরাশি ও সংযোগসূত্রাবলী মাত্র জগতে বিরাজ করে; প্রাণ ও বুদ্ধিবৃত্তি সমেত জগতের যাবতীয় পদার্থের সমগ্র রচনা আণবিক-বিকাররাশি ও যান্ত্রিকশক্তিমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, সুতরাং জগদ্ব্যাপারে ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই।" এই ভাবে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ একেবারে নির্ব্বাসিত হইলে একেশ্বরবাদী আস্তিকগণ জগদ্ব্যাখ্যানের জন্য ধর্ম্মের তাৎপর্য্য অবতারণপূর্ব্বক বলেন —"জগতের এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র রচনা ও অপূর্ব্ব অচিন্ত্য রচনাকৌশলের নির্বচনের জন্য সর্ব্বজ্ঞ রচনাশিল্পী ও জগন্নিয়ন্তৃরূপে ঈশ্বরের প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য্য।" কিন্তু এই প্রকার ব্যাখ্যান নিতান্তই অপর্য্যাপ্ত ও নিম্নস্তরের বলিয়াই মনে হয়। একেশ্বরবাদীগণের এই মতবাদের প্রতিকূলে বিচার সবিস্তারে পরে করা হইবে; এখানে এইমাত্র বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, এই মতবাদ প্রধানত দ্বৈতবাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই মতবাদে ঈশ্বরকে জগদ্বহির্ভূত স্রষ্টা বা শিল্পীরূপে বর্ণন করা হয়; এবং তাহার দরুণ ঈশ্বরত্ব কেবল এক পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে পর্য্যবসিত হয় না, পক্ষান্তরে ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে সংযোগসূত্র আকস্মিক বা যাদৃচ্ছিক হইয়া পড়ে এবং প্রকৃতপক্ষে জগতের মধ্যে কোনও ঐক্যই থাকে না। প্রথমে কেবল জড়জগতের সত্তা লইয়া আরম্ভ করিয়া পরিশেষে ঐ জগতের বহিঃস্থিত কারণ বা রচনাশিল্পী-রূপে কোন অধ্যাত্ম বস্তুর সত্তা স্বীকৃত হয়। এখানে, বলা বাহুল্য, একটির অপরটির সহিত কোনও নৈসর্গিক যোগসূত্র না থাকায় বস্তুদ্বয়ের মধ্যে বিশাল ব্যবধান অসমাধেয়-রূপে থাকিয়া যায়, সুতরাং এই প্রণালীকে আদৌ বিজ্ঞানসম্মত বলা যায় না। ঐ দুই সদ্বস্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত হওয়ায় উহাদের মধ্যে যে অপরিহার্য্য কার্য্যকারণসম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না তাহা ত বলাই বাহুল্য। এই মতবাদের অন্যতম সিদ্ধান্ত অনুসারে জগতের বহিঃস্থ কারণরূপে

চিহ্নিত যে যাদৃচ্ছিক শক্তিবিশেষ তাহার পুনঃপুনঃ মধ্যস্থীকরণ স্বীকৃত হয়, এবং তাহার ফলে জাগতিক পদার্থসমূহের মধ্যে কোনও প্রকার সুনিয়ন্ত্রিত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই মতবাদ অনুসারে জগদ্‌গত ধারণা বলিতে বুঝায়—"জগতে যে সমস্ত প্রাণবত্তার পরিচায়ক ব্যাপার অহরহ সংঘটিত হইতেছে, নিত্য নূতনভাবে যে সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীক ও বিভিন্নজাতিক জৈবযন্ত্রের আবির্ভাব হইতেছে, এবং যে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক সচেতন জীব সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে বিদ্যমান দেখা যাইতেছে—এই যাবতীয় পদার্থ ও ব্যাপারের কারণনির্দ্দেশের জন্য বহিঃস্থিত স্রষ্টার নিত্যনূতন উৎপাদনী শক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। আবার, উক্তপ্রকার পদার্থ ও ব্যাপারের মধ্যে যে অসংখ্য সম্বন্ধ সদা বিরাজ করিতেছে—বিশেষত যে সমস্ত উপায়-উপেয় সম্বন্ধ সর্ব্বদা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহাদের কারণনির্দ্দেশের জন্য আমাদের ধারণা করিতে হয় যে, উক্ত স্রষ্টার বিহিত অলৌকিক ক্রিয়াপরম্পরা অবিশ্রান্তগতিতে প্রবাহিত হইতেছে। ইহাই যদি জগদ্‌ব্যাখ্যান হয় এবং এই প্রণালীতে যদি ঈশ্বরকর্ত্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, তবে এই মতবাদকে সারত দ্বৈতবাদ বলিলে নিতান্ত অমূলক হইবে না; এবং ইহার দ্বারা জগতে যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত ও শৃঙ্খলিত ঐক্যের সত্তাও প্রতিপন্ন করা যাইবে না। কারণ, এরূপক্ষেত্রে জগতের বিকারসমূহের মধ্যে যে বিশাল অখণ্ড রচনাপদ্ধতি আছে সে কথা বলা চলিবে না। রচনাপদ্ধতি সেইখানে সম্ভবপর হয় যেখানে আমরা দেখি বিচ্ছিন্ন বস্তুর পরম্পরা কিন্তু তাহার মধ্যে থাকে এমন সমস্ত যাদৃচ্ছিক ঘটনা ও দুরবগাহ জটিলতার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ যাহার সমাধানের জন্য বাহিরের কোন আগন্তুক শক্তিকে যন্ত্রের ন্যায় প্রতিমুহূর্ত্তে উপস্থিত হইয়া ক্রিয়াশীল হইতে হয়।

একেশ্বরবাদী দার্শনিকের যে জগদ্‌ব্যাখ্যান উপরে উল্লিখিত হইল, তাহার তুলনায় জড়বাদীর ব্যাখ্যা অতি বিশদ ও অনেক বিষয়ে সুবিধাজনক। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে, এই মতবাদ অনুসারে জগতের যাবতীয় বিকার-বস্তু জড়পরমাণুর গতিপ্রজননী ক্রিয়াতে পর্য্যবসিত হয় এবং তাহার দরুণ জগতের একত্ব, সুসঙ্গতি ও অখণ্ডতার ধারণা প্রতিষ্ঠাপনের চেষ্টা লক্ষিত হয়। ঐ সমস্ত পরমাণুর প্রকৃত স্বরূপ ও তাহাদের গতি সম্পর্কিত নীতিসমূহ সম্যক্ অবধারিত হইলেই এই মতবাদ অনুসারে সমগ্র জ্ঞেয় জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। অধুনা—পদার্থবিজ্ঞানের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ইহার আলোচ্য প্রাকৃতিক ব্যাপারসমূহ একটা সর্ব্বকনিষ্ঠ অন্তঃশক্তির প্রকারভেদ মাত্র। উত্তাপ, আলোক, তড়িচ্ছক্তি ও আকর্ষণী শক্তি—ইহারা বিভিন্ন অবস্থায় উৎপাদিত গতিভেদ ভিন্ন আর কিছুই নয়, এবং সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে ইহাদের একটি অপরটিতে পরিণত হইতে পারে। আবার, যেহেতু গতি বলিতে কেবল শক্তির অভিব্যক্তি বুঝায়, সেইজন্য বলা যাইতে পারে যে, যাবতীয় পদার্থগত ব্যাপারকে বিশ্লেষণ ও প্রত্যাহাররীতির চরমপ্রয়োগের দ্বারা শক্তির বহিরভিব্যক্তিরূপে নির্দ্দেশ করা যায়। আরও এক কথা, আধুনিক বিজ্ঞান-অনুশীলনের ধারা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কিমিতিবিজ্ঞানের সর্ব্বসমস্যাকে পদার্থবিজ্ঞানের পরমাণু-বিষয়ক সমস্যাতে পর্য্যবসিত করিতেই যেন ইহার প্রবৃত্তি। অনুশীলনক্ষেত্রে আরও কিছু অগ্রসর হইলে দেখা যায় যে, উদ্ভিদ্ ও ইতরপ্রাণীর মধ্যে উৎপন্ন প্রাণময় ব্যাপারসমূহের মূল কারণ যে পদার্থবিজ্ঞান বা কিমিতিবিদ্যার নীতিসমূহের সক্রিয়তা বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারে নাই। কিন্তু বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, আলোক, উত্তাপ ও তড়িচ্ছক্তির কার্য্যকলাপ কোন এক বহুনিষ্ঠ শক্তির বিভিন্ন প্রকাশাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নয়, উহাদের এক জাতীয় ব্যাপার বা গতি অন্যপ্রকার গতিতে পরিণত হয়, কিন্তু এখানে উভয়প্রকার গতির মধ্যে পরিমাণগত সাম্য থাকে। উদ্ভিদ্ ও ইতরপ্রাণীসমূহের শক্তিনিচয় গৃহীত খাদ্য ও বাতাসের মধ্যে উৎপন্ন যে রাসায়নিক ক্রিয়া তাহার উপর নির্ভর করে। সুতরাং কোন জৈবদ্রব্যের মধ্যে এমন কোনও শক্তি থাকিতে পারে না যাহা পূর্ব্বে রাসায়নিক শক্তির মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। আমরা দেখি যে জীবতত্ত্ব-বিদ্‌গণের চরম গবেষণা অনুসারে প্রাণবত্তার মূলভূত পদার্থের নাম সূক্ষ্মজীবিতাংশ বা প্রাণপঙ্ক (protoplasm)। ইহা রাসায়নিক মৌলিক পদার্থসমূহের সংমিশ্রণে উৎপন্ন, ইহার মধ্যে ঐ সমস্ত পদার্থ পরস্পরের প্রতি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করে, এবং উর্দ্ধতন হইতে অধস্তন পর্য্যন্ত সমস্ত জৈবযন্ত্রের মধ্যে ইহার আকৃতি, সংস্থা (function) ও স্থিরাংশ অভিন্ন বস্তু।

উপরোক্ত তথ্যসমূহের দৃঢ়প্রমাণবলে আমরা জড়বাদীর মতবাদ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হই তাহা হইতেছে এই—জীবনীশক্তি রূপান্তরিত পদার্থবিজ্ঞানিক বা কৈমিতিক শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়, সুতরাং চরম অবস্থায় ইহাকে আণবিক শক্তি বলা যাইতে পারে। পরিশেষে বক্তব্য—জৈবযন্ত্রের সংঘটন এবং চিন্তা এই উভয়ের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান যদিও স্বীকৃত, তথাপি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রণিধানযোগ্য, যথা—সচেতন জীবগণের বিভিন্ন মানসিক বৃত্তি ও ক্রিয়া, এবং তৎসংসৃষ্ট অবয়ব সংঘাতরূপ দেহ এই উভয়ের মধ্যে নিবিড় অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে; অসংখ্য প্রকারের ও অপরিমেয় রাশির চিন্তা ও রূঢ় ভাবাবেগ (emotions) আমাদের স্ফুটচৈতন্য জীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ, এবং ইহাদের মধ্যে এমন একটিও নাই যাহার উদয়ে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও মস্তিষ্কস্থ জড়দ্রব্যের মধ্যে কোন না কোন বিকার বা পরিবর্ত্তন সংঘটিত না হয়, অর্থাৎ—দেহ ও মনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার্য্য। এই সমস্ত পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত সত্য হইতে ইহা কি বলা চলে না যে, বিজ্ঞান-অনুশীলনের চরম সিদ্ধান্ত অনুসারে চিন্তা-বস্তুটি জড়দ্রব্যেরই সংস্থা বা ক্রিয়াবিশেষ, অথবা, আরও বিশদভাবে বলিতে গেলে, যে আণবিক শক্তি অজৈব পদার্থ ও তদ্‌গত ব্যাপারসমূহে প্রথম অভিব্যক্ত হয়, মানুষের চিন্তাও সেই শক্তিরই সর্ব্বোচ্চ বিকাশ।

আধুনিক খ্যাতনামা জীবতত্ত্ববিদ্‌ মণীষীদিগের অন্যতম এক পণ্ডিত বলেন—"ছত্রাক কিম্বা তাহার অন্তর্গত ছিদ্রসমূহের প্রাণিন ক্রিয়াসমূহ ঐ দ্রব্যের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম জীবিতাংশের ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন; এই সিদ্ধান্ত যে মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, ঠিক্ সেই মতবাদ অনুসারে ইহাও সঙ্গতভাবে স্বীকার করা যায় যে, যাবতীয় প্রাণিন ক্রিয়া সূক্ষ্ম জীবিতাংশের অন্তর্নিহিত আণবিক শক্তিসমূহের ফলভূত। এই কথা সত্য হইলে ঠিক্ সেই অর্থে ও সেই পরিমাণে সত্য হইবে যে, মানুষের সমস্ত চিন্তা, যে সূক্ষ্ম জীবিতাংশ অঙ্গ যাবতীয় প্রাণিন ক্রিয়ার কারণ, তাহারই অন্তর্গত আণবিক বিকারসমূহের অভিব্যক্তি মাত্র।" অপর এক সমশ্রেণীক বিজ্ঞানবিৎ বলিয়াছেন—"লিউক্রেসিয়াস স্থির করিয়াছেন যে 'ঈশ্বর বা দেবতাগণের সহকারিতা বা মধ্যস্থীকরণ ব্যতিরেকেই বিশ্বায়তন নিজের সমুদয় কার্য্য আপনা আপনি করিয়া থাকে।" আবার মণীষী ব্রুনোর মতে 'দার্শনিকগণ জড়কে যে এক প্রকার বন্ধ্যা শক্তিরূপে বর্ণন করেন, জড় বস্তুত তাহা নয়, পক্ষান্তরে ইহা সমগ্র জগতের মাতৃরূপিণী যিনি স্বীয় গর্ভস্থ সন্তানের ন্যায় যাবতীয় পদার্থ প্রসব করেন।' এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকের সহিত একমত হইতে বাস্তবিকই লোভ জন্মে, অর্থাৎ—ইঁহাদের এই সমীচীন মতবাদ গ্রহণ না করিয়া থাকা যায় না। প্রকৃতির নিত্যত্বে আমার বিশ্বাস আছে বলিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র যেখানে কার্য্যকর হয় না, সেইখানেই জ্ঞানের শেষ সীমা বলিয়া আমি স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। ধীশক্তির প্রেরণায় আমি পরীক্ষণ-প্রমাণের সীমা অতিক্রম করিয়া জড়দ্রব্যের মধ্যেই যাবতীয় পার্থিব পদার্থের প্রাণবত্তার সম্ভাব্যতা ও সুপ্তশক্তি উপলব্ধি করিতে পারি। এই জড়ের নিহিত শক্তিপুঞ্জ সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশত, স্রষ্টার প্রতি আমাদের তথাকথিত ভক্তি-সম্ভ্রম থাকা সত্ত্বেও, আমরা এতকাল ঐ জড়কে নিন্দা ও ঘৃণা করিয়া আসিতেছি।" *

* অধ্যক্ষ কেয়ার্ড প্রণীত 'ধর্ম্মবিজ্ঞান' : অনুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

ভ্রান্ত

শ্রীদীপেন্দ্র সান্যাল

প্রভু, তুমি যেথায় থাক, সেথায় মোরা তাকাই না ত' ফিরে,
শুধু তোমায় খোঁজার ছলে, বেড়াই পথে, তীর্থে দাঁড়াই ঘিরে,
অন্ধকারে, মোহে, মায়ায়, পথের মাঝে খুঁজি যখন আলো,
বিরাট মনের একটি কোণে, তুমি তখন, ছোট্টপ্রদীপ জ্বালো॥

আমরা ভাবি, তোমায় ডেকে ডেকে, আজও পাই না সাড়া তবু
মনের মাঝে দাও যে সাড়া তখন, শুনি না তাও প্রভু,
চোখের জলে নুইয়ে মাথা, বাহিরে যখন, আঁকড়ে ধরি ভূমি,
মনের গোপন কোণে তখন দাঁড়াও প্রভু, লুকিয়ে হাস তুমি॥

শোকাশ্রু

শ্রীমানকুমারী বসু

একি একি অকস্মাৎ
একি নিদারুণ বাণী,
গিলিয়াছে কাল রাহু
অকালে সুধাংশুখানি।

ঝরিয়া পড়িতেছিল
উজ্জ্বল জ্যোছনাধারা,
চারি পাশে ঘিরেছিল
হীরকের কুচি তারা।

মায়ের নীলিমা বক্ষ
পাতা ছিল তার তরে
কুমুদ হাসিতেছিল
আলো করি সরোবরে

চকোর চকোরী যত
পুলকিত সুধা পানে
ভুবন ভাসিয়া গেল
সুধা মাখা গীতি তানে।

এমন মধুর নিশা
কেন হেন দস্যু এলি
মা'র কোল থেকে কেন
প্রাণধনে কেড়ে নিলি!

সেই আলোকিত পৃথ্বী
সহসা তিমির ভরা,
অশ্রুজলে গৃহ ভাসে
ঘোর হাহাকার করা!

কত যে উদ্যম আশা
কত সাধ চিত্তে তথা,
পরের কল্যাণে রত
বুঝিয়া ব্যথীর ব্যথা।

ছিল না ক' দিবারাতি,
কর্ম্মযোগী কর্ম্মে রত,
সে যে ছিল সবাকার
বিশ্বাসী সোদর মত!

সে যে ছিল পরাপরে
ভালবাসা বিলাইতে
সে যে ছিল চিরদিন
আপনা ঢালিয়া দিতে।

তুমি যে ভারতবর্ষ
কত যতনের ধন
আজি এ অভাগ্য তবু,
বিধাতার বিড়ম্বন!

আরম্ভে দ্বিজেন গেলা
শেষে গেলা জলধর,
সব শেষে সর্ব্বনাশ
হারাইয়া সুধাকর!

অভাগা সন্তান ক'টি
এ বেদনা নাহি শেষ
পতিরতা সতী কাঁদে
ধরিয়া বিধবা বেশ!

মায়ের কামনা, সুখে
পার হবে ভবসিন্ধু,
কে জানে বারিধি মাঝে
আগে ডুবে যাবে ইন্দু!

স্নেহময় 'দাদা' আজি
প্রাণের অনুজ-হারা,
সব পরিজন যেন
হারায়েছে আঁখিতারা!

এখনো জাগিছে চোখে
স্নেহভরা লিপিগুলি,
হয়নি মলিন মসী
লেখনীর মধু বুলি!

গেছ তুমি সুখে থেক
সেই স্নেহামৃত কোলে,
যে মায়েরে পেলে নরে
মরতের সবি ভোলে!

তুমি গেছ মোরা যাব
তাহে কোন ভুল নাই
তবে কি-না আগে গেলে
শোক-অশ্রু ঝরে তাই।

'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' সম্বন্ধে বক্তব্য

মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

(৬)

পূর্ব্বপ্রবন্ধে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের কথায় বলিয়াছি যে, তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন না। কিন্তু নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি যে, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের প্রধান ছাত্র ছিলেন, ইহা পণ্ডিতসমাজে চিরপ্রসিদ্ধ। বিমানবাবু তাঁহার গ্রন্থের পরিশিষ্টে (৮৯ পৃঃ) লিখিয়াছেন, "শ্রীচৈতন্য বা রঘুনাথ শিরোমণি যে সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই।"

তাহা হইলে রঘুনাথ প্রথমে কোথায় কাহার নিকটে নব্যন্যায় পড়িয়াছিলেন, ইহাও বলা আবশ্যক। কিন্তু বিমানবাবু সে বিষয়েও কোন কথা বলেন নাই। রঘুনাথ প্রথমে নবদ্বীপে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকটে পড়িয়া পরে পক্ষধর মিশ্রের নিকটে পড়িবার জন্য মিথিলায় গিয়াছিলেন, —এই চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদ বিমানবাবুরও অজ্ঞাত নহে। সুতরাং তিনি..."কোন প্রমাণ নাই"—এই কথা লিখিয়া উক্তরূপ প্রবাদে তাঁহার অবিশ্বাসই ব্যক্ত করিয়াছেন বুঝা যায়। কিন্তু সেই অবিশ্বাসের হেতু কি, ইহা তিনি ব্যক্ত করেন নাই। তিনি যে প্রবাদমাত্রকেই অসত্য বলেন, ইহাও ত বুঝিতে পারি না।

"রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায়" বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পরিচয়-বর্ণনে পরে লিখিত হইয়াছে...* "শিষ্যা যস্য শিরোমণি-প্রভৃতয়ঃ।" রঘুনাথ শিরোমণিই সর্ব্বত্র পণ্ডিতসমাজে "শিরোমণি" নামে খ্যাত। সেই শিরোমণি প্রমুখ অনেক নৈয়ায়িক—বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন, ইহাই ঐ কথার দ্বারা বুঝা যায়। আর উক্ত রঘুনাথ শিরোমণি যে কাণা ছিলেন, ইহাও চিরপ্রসিদ্ধ। তাই তিনি দেশান্তরে 'কাণভট্ট শিরোমণি' নামেও কথিত হইয়াছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে "গোষ্ঠী কথা"র রচয়িতা রাঢ়ীয় ঘটক নুলো পঞ্চাননও* রঘুনাথ শিরোমণিকে বাসুদেব সার্ব্ব-ভৌমের শিষ্য বলিয়া তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তিকথাও বলিয়া গিয়াছেন—

> "কাণাছোড়া যুদ্ধে দড় নাম রঘুনাথ।
> মিথিলার পক্ষধরে যে করেছে মাথ॥"

সুতরাং বাসুদেব সার্ব্বভৌমের শিষ্য কাণা রঘুনাথ শিরোমণি যে, মিথিলার পক্ষধর মিশ্রকেও নব্য ন্যায়ের বিচারে পরাস্ত করিয়া নবদ্বীপে নব্য ন্যায়ের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেন, ইহা নুলো পঞ্চাননের সময়েও সুপ্রসিদ্ধ বার্ত্তা সন্দেহ নাই। নুলো পঞ্চাননের ঐ সমস্ত নিন্দার্থ শ্লোকের সর্ব্বাংশে প্রামাণ্য না থাকিলেও তাঁহার সমস্ত কথাই যে, তাঁহার কল্পিত, ইহা বলা যাইবে না।

অবশ্য রঘুনাথ শিরোমণির প্রথমে নবদ্বীপে বাসুদেব

---

* "জাতৌ শ্রীল বিশারদস্য তনয়ৌ শ্রীবাসুদেবাহ্বয়—শ্রীরত্নাকর-নামকৌ গুণনিধী শ্রীসার্ব্বভৌমো মহান্। খ্যাতঃ সৎকবিপণ্ডিতেষু সহসা দেদীপ্যমানঃ ক্ষিতৌ শিষ্যা যস্য শিরোমণি-প্রভৃতয়ঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং ধীষণঃ॥"

(পূর্ব্বোক্ত) বিশারদের (১) বাসুদেব ও (২) রত্নাকর নামে দুই পুত্র জন্মে। বাসুদেব, সার্ব্বভৌম নামে এবং রত্নাকর, বিদ্যাবাচস্পতি বা বাচস্পতি নামে খ্যাত হন। "চৈতন্যভাগবতে' বৃন্দাবন দাসও লিখিয়াছেন,"বিশারদচরণে আমার নমস্কার। সার্ব্বভৌম বাচস্পতি নন্দন যাহার॥" অন্ত্য, ৩য় অঃ)

* নবদ্বীপ সমাজের সংস্থ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের এক হস্তে শক্তি না থাকায় তিনি 'নুলো পঞ্চানন' এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ দেবীবর ঘটক মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে (১৪০২ শকাব্দে) রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের ৩৬ মেল বন্ধন করেন এবং নুলো পঞ্চানন তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন,—ইহা অনেকের মত। কিন্তু নুলো পঞ্চাননের নিজের কথায় বুঝা যায় যে, তিনি দেবীবর ও রঘুনন্দনেরও পরবর্ত্তী এবং শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্ত্তী কালে দেবীবর মেলবন্ধন করেন। নুলো পঞ্চানন শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের কথা বলিয়া পরেই বলিয়াছেন,—

> "এই কালে সংকেতের বংশে এক ছেলে।
> খ্যাতনামা দেবীবর লোকে যারে বলে॥
> সেই ছোড়া মনে ক'রে কুলে করে ভাগ।
> তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ॥"

সার্ব্বভৌমের নিকটে এবং পরে মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের নিকটে অধ্যয়ন অসম্ভব বুঝিলে আমরাও উক্তরূপ প্রবাদ বা ঘটকের কথাকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে পারিব না। কিন্তু উহা অসম্ভব কি না, ইহা বুঝিতে হইলে প্রথমে রঘুনাথ শিরোমণি ও পক্ষধর মিশ্রের সময় বিচার করা আবশ্যক।

শ্রীযুক্তবাবু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় উক্ত বিষয়ে বিচার করিয়া "ব্যাপ্তিপঞ্চকে"র ভূমিকায় রঘুনাথ শিরোমণিকে শ্রীচৈতন্যদেবের অসমসাময়িক পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছেন এবং তাঁহাকে ও তাঁহার গুরু বাসুদেব সার্ব্বভৌমকেও তিনি পক্ষধর মিশ্রের ছাত্রই বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা বুঝিয়াছি যে, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীচৈতন্যদেব হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও অধিক পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। ক্রমে ইহার কারণ বলিতেছি।

মিথিলাবিজয়ী রঘুনাথ তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা বলে মিথিলার যজ্ঞপতি উপাধ্যায় ও 'নরপতি মহামিশ্র তনয়' প্রগল্ভ মিশ্র প্রভৃতি টীকাকারগণের মত খণ্ডন করিয়া পরে নব্যন্যায়ের মূলগ্রন্থ গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের "তত্ত্বচিন্তামণি"র যে অভিনব টীকা রচনা করেন, তাহার নাম 'দীধিতি'। তাই তিনি "দীধিতিকার" নামেও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সেই "দীধিতি" টীকায় তিনি সার্ব্বভৌমমতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। "দীধিতি"র প্রসিদ্ধ টীকাকার নবদ্বীপের জগদীশ প্রভৃতি "সার্ব্বভৌম মত" বলিয়া যে মতের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যে উক্ত বাসুদেব সার্ব্বভৌমেরই বিশিষ্ট মত, ইহাই গুরুপরম্পরাক্রমে প্রসিদ্ধ আছে। রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার গুরু মতের খণ্ডন করায় তিনি সেখানে গুরুর নামোল্লেখ করেন নাই,—ইহাই আমরা নৈয়ায়িক গুরু-পরম্পরানুসারে জানি। তাহা হইলে তিনি যে বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও পক্ষধর মিশ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না, ইহা নিশ্চিত।

বস্তুতঃ রঘুনাথ শিরোমণি যে সার্ব্বভৌমের মত খণ্ডন করিয়াছেন, তিনি যে অন্য দেশীয় কোন সার্ব্বভৌম, এ বিষয়ে প্রমাণ নাই। অন্যদেশে "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র টীকাকার সার্ব্বভৌম নামে প্রসিদ্ধ কোন নৈয়ায়িকের কোন সংবাদই পাওয়া যায় না। মিথিলার নব্য নৈয়ায়িকগণের মধ্যে কাহারও সার্ব্বভৌম উপাধির প্রমাণ নাই। পক্ষধর মিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রের নামও বাসুদেব বটে, কিন্তু তিনি সার্ব্বভৌম ছিলেন না, তিনি বাসুদেব মিশ্র। তৎকৃত 'তত্ত্ব-চিন্তামণি টীকা'র শেষেও দেখা যায়—"ইতি শ্রীন্যায়সিদ্ধান্ত-সারাভিজ্ঞ মিশ্রবর্য্য পক্ষধরমিশ্র-ভ্রাতুষ্পুত্র বাসুদেব মিশ্র-বিরচিতায়াং চিন্তামণি টীকায়াং।" Aufrecht সাহেব অজ্ঞতাবশতঃ উক্ত বাসুদেবকেও সার্ব্বভৌম বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, ইহা শুনিয়াছি। বস্তুতঃ পক্ষধর মিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র বাসুদেব মিশ্র—বাসুদেব সার্ব্বভৌম নহেন।*

পরন্তু "দীধিতি"কার রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলার শঙ্কর মিশ্রের মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। এই শঙ্কর মিশ্র খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই অতি-প্রখ্যাত পণ্ডিত হন। তাঁহার "ভেদরত্ন" গ্রন্থের যে পুথি জম্বুতে আছে, তাহার লিপিকাল ১৫১৯ সংবৎ (১৪৬২ খৃষ্টাব্দ). ইহাও জানিতে পারিয়াছি। নানাগ্রন্থকার শঙ্কর মিশ্র নিজ মত-সমর্থনে রঘুনাথ শিরোমণির অতি সূক্ষ্ম নবীন বিচার বা যুক্তির খণ্ডন করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে রঘুনাথ শিরোমণির গ্রন্থ রচিত হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। উক্ত শঙ্কর মিশ্রের সময় যে খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দী, ইহাও নিশ্চিত। কারণ, তিনি মিথিলার স্মার্ত্ত নবীন বাচস্পতি মিশ্রের সমসাময়িক। মিথিলার নব্যবর্দ্ধমান তৎকৃত "দণ্ডবিবেক" গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, "শঙ্কর বাচস্পতী চ মে গুরবঃ।" ইহার দ্বারা বুঝা যায়, সমকালীন শঙ্কর মিশ্র এবং বাচস্পতি মিশ্রও তাঁহার গুরু ছিলেন।

মিথিলার উক্ত স্মার্ত্ত বাচস্পতি মিশ্র মিথিলাধিপতি ভৈরবেন্দ্র দেবের ধর্ম্মপত্নীর আদেশে তৎপুত্র রাজাধিরাজ পুরুষোত্তমদেবের সময়ে "দ্বৈতনির্ণয়" নামক স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করেন,—ইহা সেই গ্রন্থের প্রারম্ভে তাঁহার শ্লোকের দ্বারাই

---

* বিমানবাবু পরিশিষ্টে (৮৯ পৃঃ) লিখিয়াছেন,—"পক্ষধর মিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রেরও নাম বাসুদেব।...পক্ষধর মিশ্র ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরাণ নকল করিয়াছিলেন।...সুতরাং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক।" কিন্তু বিমানবাবুর ঐ শেষ কথা লেখার উদ্দেশ্য কি, ইহা বুঝিতে পারি নাই। তবে কি তাঁহার মতে পক্ষধর মিশ্র শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক নহেন? ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ন্যায় পক্ষধর মিশ্রও কি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক হইতে পারেন না? তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বাসুদেব মিশ্রের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ সম্বন্ধ কি, তাহাও আমরা জানি না।

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বিমল মজুমদার

কাঙ্গরা উপত্যকা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

জানা যায়।* উক্ত ভৈরবেন্দ্রদেবের রাজ্যকাল ১৪৪০ হইতে ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দ। এ বিষয়ে ১৯১৫ খৃঃ সেপ্টেম্বর বেঙ্গল এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকায় বহুবিজ্ঞ গবেষক রায় বাহাদুর ৺মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন নিজ গ্রন্থে অনেক স্থলে উক্ত বাচস্পতি মিশ্রের "দ্বৈতনির্ণয়" গ্রন্থেরও উল্লেখ করিয়াছেন। আর তিনি যে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ "মলমাসতত্ত্বে" রঘুনাথ শিরোমণি-কৃত "মলিম্লুচবিবেক" গ্রন্থের কোন কোন কথারও প্রতিবাদ করিয়াছেন, ইহাও পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি।†

পরন্তু শ্রীহর্ষকৃত "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" গ্রন্থের অন্যতম টীকাকার রঘুনাথ, সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার উক্ত শঙ্কর মিশ্রের নাম করিয়াই তাঁহার ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়াছেন।‡ অতএব সেই টীকা যে শঙ্কর মিশ্রের টীকার পরে রচিত হইয়াছে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে, কাশী চৌখাম্বা হইতে ‘খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে’র "খণ্ডনভূষামণি" নামে যে টীকা প্রকাশিত হইতেছে, তাহা ‘দীধিতি’কার রঘুনাথ শিরোমণি-কৃত বলিয়া কথিত হইলেও উহা পাঠ করিয়া আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। এ বিষয়ে আমার দৃঢ় সংশয় জন্মিয়াছে। সেই সংশয়ের কারণ ব্যক্ত করা এখানে অনাবশ্যক।

সে যাহা হউক, আমার বক্তব্য এই যে, রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীচৈতন্যদেবের অসমসাময়িক পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদের প্রথম ভাগে নবদ্বীপে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকটে অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার উৎকল যাত্রার পরে পক্ষধর মিশ্রের নিকটে অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় গমন করিতে পারেন। বাসুদেব ও পক্ষধরের নিকটে তাঁহার অধ্যয়ন অসম্ভব নহে।

পরন্তু রঘুনাথ প্রথমে নবদ্বীপে "তত্ত্ব-চিন্তামণি" গ্রন্থ পাঠ করিলে তখন সেখানে কাহার নিকটে উহা পাঠ করিতে পারেন, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পূর্ব্বে নবদ্বীপে আর কেহ "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র অধ্যাপক ছিলেন না। রঘুনাথ "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র কিছুই না পড়িয়া প্রথমেই মিথিলায় গেলে সেখানে তিনি নব্যন্যায় বিষয়ে কোন বিচার করিতেও পারেন না। কিন্তু তিনি যে, মিথিলায় গিয়া প্রথমেই তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত অভিনব যুক্তিবলে "তত্ত্ব-চিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের সমর্থিত মতবিশেষেরও খণ্ডন করিয়া পক্ষধর মিশ্রকেও চিন্তিত ও বিস্মিত করিয়াছিলেন এবং সেজন্য পক্ষধর মিশ্র তাঁহাকে নিজের প্রধান ছাত্রের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা গুরুপরম্পরাক্রমে চিরপ্রসিদ্ধ আছে। পক্ষধর মিশ্র ও রঘুনাথের উক্তি প্রত্যুক্তিরূপ অনেক শ্লোকও পণ্ডিত সমাজে প্রসিদ্ধ আছে। ১৩১১ বঙ্গাব্দে "সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা"য় শ্রীযুক্ত পূর্ণবাবুর প্রবন্ধে তাহা দ্রষ্টব্য।

সে সমস্ত শ্লোকের কথা যাহাই হউক, রঘুনাথ শিরোমণি যে পক্ষধর মিশ্রের বিজয়ী ছাত্র, এবিষয়ে বিবাদ নাই। অনেক দিন পূর্ব্বে মুলো পঞ্চাননও বলিয়া গিয়াছেন, "মিথিলার পক্ষধরে যে করেছে মাথ।" অনেকেই বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে পক্ষধর মিশ্রেরই ছাত্র বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে অনেক বৃদ্ধ নৈয়ায়িক বলিতেন যে, বাসুদেব সার্ব্বভৌম পক্ষধর মিশ্রের বয়োজ্যেষ্ঠ সহাধ্যায়ী ছিলেন। পাঠাবস্থায় অদ্ভুত মেধা সম্পন্ন বাঙ্গালী বাসুদেবের প্রতি পক্ষধরের ভাব ভাল ছিল না এবং তিনি অনেক সময়ে নব্যন্যায়ের বিচারে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বাসুদেবকে নিরস্ত করিতেন। তাই বাসুদেব নবদ্বীপে আসিয়া পরে তাঁহার প্রধান ছাত্র প্রতিভার অবতার রঘুনাথকে মিথিলায় যাইতে আদেশ করেন। সে যাহা হউক, বাসুদেব যে পক্ষধরের সহাধ্যায়ী ছিলেন, ইহা আমারও ধারণা। কারণ, পক্ষ-

* [illegible]
রাজাধিরাজ-পুরুষোত্তমদেব-মাতা।
বাচস্পতিং নিখিল-তন্ত্র-বিদং নিযুজ্য
দ্বৈতে বিনির্ণয়-বিধিং বিধিবৎ তনোতি॥"

† রঘুনাথ শিরোমণির ঐ গ্রন্থ পূর্ব্বস্থলীতে আছে, ইহা ১৩১১ বঙ্গাব্দে "সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা"য় প্রকাশিত "রঘুনাথ শিরোমণি" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর মহাশয়ও লিখিয়াছেন। পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমি বিস্মৃতিবশতঃ পূর্ণচন্দ্রবাবুর নাম স্থলে কালীপ্রসন্নবাবুর নাম লিখিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পূর্ণচন্দ্রবাবুর ঐ প্রবন্ধ দেখিবেন। কিন্তু উহাতে ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ বা বিচার নাই। পূর্ণবাবুর শ্রুত অনেক গল্পও অনেক শ্লোকই উহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

‡ "ইতি শঙ্করমিশ্রব্যাখ্যানং যথাশ্রুত-বক্ষ্যমাণ-গ্রন্থবিরুদ্ধং হেয়ং।" "ইতি শঙ্কর মিশ্রাণাং বা আশঙ্কা, সা কথান্না ন বিরোধিনী।" রঘুনাথকৃত খণ্ডনখণ্ডখাদ্যটীকা—কাশী চৌখাম্বা সং. ২৪শ ও ২৬শ পৃঃ।

দশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে মিথিলায় বাসুদেবের অধ্যয়নকালে পক্ষধর প্রখ্যাত অধ্যাপক হন নাই, ইহাই আমি বুঝিয়াছি।

বিমানবাবুও লিখিয়াছেন, "পক্ষধর মিশ্র ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরাণ নকল করিয়াছিলেন (History of Tirhut by Shyamnarayan Singha, p. 137.) কিন্তু আমরা জানি, দ্বারভাঙ্গা জেলায় যোগিয়াড়া গ্রামে কেশব ঝার বাড়ীতে ঐ পুথি ছিল। উহার শেষে লিখিত শ্লোকের দ্বারা ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দই উহার লিপিকাল গৃহীত হইয়াছে। * উক্ত শ্লোকে পক্ষধর নামেরই উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পক্ষধর মিশ্রের প্রকৃত নাম জয়দেব। তিনি "তত্ত্ব-চিন্তামণি"র "আলোক" নামে যে টীকা করেন, তাহার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—"অধীত্য জয়দেবেন হরিমিশ্রাৎ পিতৃব্যতঃ।" ইহার দ্বারা বুঝা যায়, তিনি তাঁহার পিতৃব্য হরি মিশ্রের ছাত্র।

যাহা হউক, উক্ত জয়দেব পক্ষধর মিশ্রই বিষ্ণুপুরাণের সেই পুথির লেখক হইলে তিনি যে ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে ছাত্রাবস্থাতেই 'অমরাবতী' নগরে বাস করিয়া সেই পুথি লিখিয়াছিলেন, ইহাই বুঝা যায়। কারণ, তখন তিনি বহু ছাত্রের অধ্যাপক প্রখ্যাত পণ্ডিত হইলে বিষ্ণুপুরাণের পুথি নকল করার জন্য তাঁহার পরিশ্রম স্বীকার অনাবশ্যক।

পরন্তু মিথিলার 'সোদরপুরনিবাসী' মহানৈয়ায়িক রুচিদত্ত গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন,—"অধীত্য রুচিদত্তেন জয়দেবাজ্জগদ্‌গুরোঃ।" পূর্ব্বোক্ত পক্ষধর মিশ্রের প্রকৃত নাম জয়দেব, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং উক্ত রুচিদত্ত যে "আলোক" টীকাকার জগদ্‌গুরু পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র, ইহা নিশ্চিত। রুচিদত্তের মৈথিল অক্ষরে স্বহস্ত লিখিত উদয়নাচার্য্য-কৃত "কিরণাবলী" টীকার যে পুথি কাশীর সরস্বতী ভবনে আছে, তাহার লিপিকাল, ৩৮৬ লক্ষ্মণ সংবৎ† (১৫০৫ খৃষ্টাব্দ)। কিন্তু ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে মিথিলার রুচিদত্ত স্বহস্তে পুথি লিখিলে তাঁহার অধ্যাপক জগদ্‌গুরু জয়দেব বা পক্ষধর মিশ্র পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না। আরও কোন কোন কারণে "আলোক" টীকাকার বিশ্ববিখ্যাত নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের সময় ত্রয়োদশ শতাব্দী, তিনি "তত্ত্ব-চিন্তামণি'কার গঙ্গেশের পৌত্র যজ্ঞপতির ছাত্র, এই মত আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা বুঝিয়াছি যে, পক্ষধর মিশ্র পঞ্চদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদেই প্রখ্যাত মহানৈয়ায়িক হইয়া ক্রমে নানা দেশের বহু ছাত্রের অধ্যাপনা ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেই সময়ে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের উৎকল যাত্রার পরে রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলায় গিয়া পক্ষধর মিশ্রের নিকটে অধ্যয়নাদি করেন।

রঘুনাথ নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব বা অধ্যয়ন-কালের পূর্ব্বেই মিথিলায় যাওয়ায় তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সহাধ্যায়ী হইতে পারেন না। পরন্তু তিনি মীমাংসাদি শাস্ত্র পাঠের জন্য এবং নানা দেশের বিদ্বৎসমাজে শাস্ত্র বিচার দ্বারা নিজমত প্রতিষ্ঠার জন্য মিথিলা হইতে কাশী প্রভৃতি স্থানেও গিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদও সত্য বলিয়া বুঝা যায়। * তিনি বিদেশে থাকিয়া নানা গ্রন্থ সংগ্রহ ও কোন কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের কিছু পরেই নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না, ইহাই নানা কারণে আমার মনে হয়। তাই শ্রীগৌরাঙ্গের সহাধ্যায়ী মুরারি গুপ্ত এবং

* উক্ত পুথির শেষে শ্লোক আছে—"বাণৈ র্বেদযুতৈঃ সশম্ভুনয়নৈঃ সংখ্যাং গতে হায়নে শ্রীমদ্ গৌড়-মহীভুজো গুরুদিনে মার্গে চ পক্ষে সিতে। ষষ্ঠ্যাং তা মমরাবতী মধিবসন্ যা ভূমি দেবালয়ঃ শ্রীমৎপক্ষধরঃ সুপুস্তকমিদং শুদ্ধং ব্যলেখীদ্ দ্রুতং।" শম্ভুনয়ন ৩। বেদ ৪। বাণ ৫। ৩৪৫ লক্ষ্মণ সংবৎ। ১১১৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সংবতের আরম্ভ, এই মতানুসারে ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দ।

† উক্ত পুথির শেষে শ্লোক আছে,—"রস—বসু—হরনেত্রে চৈত্রকে শুক্লপক্ষে প্রতিপদি বুধবারে বৎসরে লাক্ষ্মণে চ। বিবুধবুধ-বিনোদং ভাবয়ন্তীং সুপুস্তী মলিখদমলপাণিঃ শ্রীরুচিঃ শ্রীসমেতাং॥" হরনেত্র ৩, বসু ৮, রস ৬। ৩৮৬ লক্ষ্মণ সংবৎ। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দ।

* মঃ মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে অনেকবার বলিয়াছিলেন যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রঘুনাথ শিরোমণি দাক্ষিণাত্য মীমাংসক পণ্ডিত রামেশ্বর ভট্টের ছাত্র ছিলেন—ইহা তিনি রামেশ্বর ভট্টের পৌত্র শঙ্কর ভট্টের রচিত "গাধিবংশানুচরিত" গ্রন্থ পাঠে বুঝিয়াছেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থ কোথায় আছে, ইহা তখন শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রশ্ন করি নাই। পরে আমি কাশীধামে শঙ্কর ভট্টের বংশধর পণ্ডিতের নিকটে অনুসন্ধান করিয়াও ঐ পুস্তক পাই নাই। কাশীর সরস্বতী ভবনেও ঐ পুস্তক নাই। উক্ত বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্যান্য কথা ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত "কাশীনাথ বিদ্যানিবাস" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

পরে কবি কর্ণপুর প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যচরিত-প্রসঙ্গে রঘুনাথ শিরোমণির সম্বন্ধে কোন কথা লেখেন নাই।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় পরে "অদ্বৈত সিদ্ধি"র ভূমিকায় (৯৭ পৃঃ) লিখিয়াছেন, "অদ্বৈত প্রকাশ" নামক একখানি বৈষ্ণব গ্রন্থের মতে রঘুনাথ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। কারণ একদিন এক নৌকার উপরে রঘুনাথ চৈতন্যদেব-কৃত ন্যায়ের টীকা দেখিয়া দুঃখিত হওয়ায় চৈতন্যদেব নিজ টীকা গঙ্গায় ফেলিয়া দেন—এইরূপ একটী বর্ণনা তাহাতে আছে।"

কিন্তু "অদ্বৈত প্রকাশ" নামক একখানি বৈষ্ণব গ্রন্থেও রঘুনাথ শিরোমণির নামগন্ধও নাই। ঐ গ্রন্থ স্বয়ং পাঠ করিলে (১৯শ অঃ) দেখা যাইবে,—

> "পূর্ব্বে গোরা যবে শাস্ত্র কৈলা অধ্যয়ন।
> তর্কশাস্ত্রের টীকা এক কৈলা বিরচন॥
> সেই টীকা লঞা তিহ গঙ্গা পারে যায়।
> হেনকালে এক দ্বিজ তাঁহারে পুছয়॥
> তব কক্ষে কোন্ গ্রন্থ কহ মহাশয়।
> ন্যায়শাস্ত্রের টীকা এই শ্রীগৌরাঙ্গ কয়॥

কিন্তু সেই দ্বিজ কে? শ্রীহট্টের সুপ্রসিদ্ধ বৃদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়ের কথানুসারে কোন বিচার না করিয়া আমাদিগের ভক্ত সুহৃৎ ৺সতীশচন্দ্র মিত্র মহোদয়ও তাঁহার সম্পাদিত "অদ্বৈত প্রকাশ" পুস্তকে (২৩১ পৃঃ) উক্ত স্থলে নিম্নে পাদটীকায় লিখিয়া গিয়াছেন,—

"এই দ্বিজ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি. তিনি এক সময়ে গৌরাঙ্গের সহপাঠী ছিলেন।"

কিন্তু ইহার প্রমাণ কি? গল্প মাত্রই কি প্রমাণ? সর্ব্বত্রই কি 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং?' আর রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গের সহাধ্যায়ী হইলে পরে "শ্রীগৌরাঙ্গ কহে ভয় নাহি দ্বিজবর" ইহা তাঁহার কেমন কথা? পরন্তু প্রশ্ন হইল,—'তব কক্ষে কোন্ গ্রন্থ কহ মহাশয়।' প্রত্যুত্তরে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন—'ন্যায়শাস্ত্রের টীকা'। কিন্তু উহা কি মূল ন্যায়সূত্রেরই টীকা অথবা নব্যন্যায়ের গ্রন্থ "তত্ত্বচিন্তামণি"র টীকা,—ইহা কেন বলেন নাই? রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায়সূত্রের কোন টীকা করেন নাই। আর ইহাও জানা আবশ্যক যে, ন্যায়শাস্ত্রের টীকা, ইহা কোন গ্রন্থের নাম বলা যায় না। লেখকের "তর্কশাস্ত্রের টীকা এক কৈলা বিরচন,"—ইহা কিরূপ বিরচন?

"নবাবী আমলের ইতিহাস" লেখক বীরভূম নিবাসী স্পষ্টবাদী বৃদ্ধ ঐতিহাসিক ৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "মধ্যযুগের বাঙ্গলা" নামক গ্রন্থে (৫৪ পৃঃ) লিখিয়া গিয়াছেন—

"গঙ্গাজলে পুথি ফেলিয়া দেওয়ার গল্পটি ঈশান দাসের (নাগর) অদ্বৈতপ্রকাশে দেখা দিয়াছে।...কিন্তু ঐ পুস্তকেও রঘুনাথ শিরোমণির নাম নাই, কোন এক পণ্ডিতের প্রসঙ্গে উহা কথিত হইয়াছে। এই স্বার্থ বিসর্জ্জনের গাল-গল্পের সমালোচনা বৃথা",—ইত্যাদি।

কিন্তু একেবারে বৃথা নহে মনে করিয়া আমি ঐ কথার সমালোচনায় আমার অন্যান্য কথা চতুর্থ প্রবন্ধের শেষে লিখিয়াছি। "নবদ্বীপমহিমা" ও "নদীয়াকাহিনী" প্রভৃতি গ্রন্থে এবং অনেক প্রবন্ধে রঘুনাথ শিরোমণির সম্বন্ধে আরও অনেক নিষ্প্রমাণ গল্প লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অনেক গল্প পড়িলে হাস্য সংবরণ করাও যায় না। যেমন রঘুনাথ মিথিলায় পাঠাবস্থায় একদিন তাঁহার গুরু পক্ষধর মিশ্রকে গুপ্তভাবে হত্যা করিবার জন্য অস্ত্র লইয়া রাত্রিকালে তাঁহার শয়নগৃহের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন, ইত্যাদি। অনেকে ঐরূপ অনেক গল্পও ইতিহাসরূপে গ্রহণ করিতেছেন, উপায় কি?

এখন এই প্রসঙ্গে রঘুনাথ শিরোমণির জন্মভূমি সম্বন্ধে পুরাতন বিবাদের কথাও কিছু বক্তব্য। এখনও সে বিষয়ে কেহ কেহ নিজের অভিমত প্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। অনেকের সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাও জানি। কিন্তু এখনও সে বিষয়ে প্রকৃত প্রমাণ না পাওয়ায় প্রবাদমূলক মতভেদ ভিন্ন নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারিব না। যে কোন কারণে মতবিশেষের প্রতি অনুরাগবশতঃ বিচার না করিয়া অত্যাচার করা উচিত নহে।

শ্রীহট্টের বহুবিজ্ঞ খ্যাতনামা পরম বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" লেখক। তিনি প্রথমে শ্রীহট্টের "বৈদিক সংবাদিনী" নামক কোন আধুনিক কুলগ্রন্থের সাহায্যে লিখিয়াছিলেন যে, শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডবাসী কাত্যায়ন গোত্র বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন—

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। তাঁহার দুই পুত্র রঘুপতি ও রঘুনাথ। জ্যেষ্ঠ রঘুপতি কোন কারণে বশীভূত হইয়া ঐ দেশের রাজা সুবিদনারায়ণের খঞ্জা কন্যা রত্নাবতীকে বিবাহ করায় সেই রাজার কুলদোষে তখন সমাজে বড় কলঙ্ক হয়। পরে সেই কলঙ্ক অসহ্য হওয়ায় বিধবা মাতা সীতাদেবী কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনাথকে লইয়া নবদ্বীপে আসেন, ইত্যাদি। এইমতে শ্রীহট্টের সেই রঘুনাথই রঘুনাথ শিরোমণি।

কিন্তু সেই রঘুনাথই যে, নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি, ইহা প্রমাণ ব্যতীত নির্ব্বিবাদে সকলে স্বীকার করিতে পারেন না। তাই তখন হইতে বিবাদের আরম্ভ হয়। উক্ত মত সমর্থন করিতে "বিজয়া" ও "সৌরভ" প্রভৃতি পত্রিকায় অনেকে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন—শ্রীহট্টের খ্যাতনামা ধর্ম্মপ্রাণ তেজস্বী পণ্ডিত ৺পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম, এ মহোদয়। "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে" শ্রীযুক্ত তত্ত্বনিধি মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধও উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরে ৺রামকমল শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত মত সমর্থন করিতে একটি নূতন কথা লিখিয়াছিলেন যে, রঘুনাথ শিরোমণি-কৃত "ক্ষণভঙ্গুরবাদে'র টীকার প্রথমে নবদ্বীপের গদাধর ভট্টাচার্য্য (রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতির প্রসিদ্ধ টীকাকার) "কাত্যায়নখনিজমণেঃ শিরোমণেঃ" ইত্যাদি শ্লোকে রঘুনাথ শিরোমণিকে "কাত্যায়ন খনিজমণি" বলিয়া গিয়াছেন। অতএব তিনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ নহেন। শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডেই কাত্যায়ন গোত্র বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণসমাজ প্রাচীন কাল হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। (পূর্ব্বে কাত্যায়ন গোত্র ব্রাহ্মণ যে, রাঢ় বঙ্গে একেবারেই ছিলেন না, ইহা কিন্তু সত্য নহে)।

কিন্তু ১৩২০ সালে ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'প্রতিভা' পত্রিকায় (১১শ সংখ্যায়) বহু বিজ্ঞ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ মহোদয় বহু ঐতিহাসিক বিচার দ্বারা ঐ সমস্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে, শ্রীহট্টের ঐ রঘুপতির কনিষ্ঠ রঘুনাথ নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি হইতে পারেন না। উপেন্দ্রবাবুর বহু গবেষণামূলক সেই বিস্তৃত প্রবন্ধের নাম **শ্রীহট্টের রঘুনাথ ও নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি।**

১৩৪০ সালে মৎপ্রণীত **ন্যায়পরিচয়** গ্রন্থের ভূমিকায় (১৫ পৃঃ) আমি উক্ত বিষয়ে উপেন্দ্রবাবুর ঐ প্রবন্ধের কথা লেখায় পরে 'শিক্ষাসেবক' পত্রে কোন প্রবন্ধে প্রতিবাদী ৺পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আমার 'শ্রীহট্টবিদ্বেষে'র কথাই লিখিয়াছিলেন। তাঁহার মত-সমর্থনে নূতন কথা কিছু লেখেন নাই। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় ব্যক্তি যে শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না, এমন কথা আমি কখনও লিখি নাই। আমি সেখানে মতভেদের কথা লিখিয়া উপসংহারে লিখিয়াছি, "রঘুনাথ যেখানেই জন্ম-গ্রহণ করুন, তিনি যে নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি, তিনি বাঙ্গলার মাথার মণি, সে বিষয়ে কোন বিবাদ হইতে পারে না।"

পরন্তু এখন ইহাও বলা আবশ্যক যে, অনেক প্রতিবাদের পরে তেজস্বী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও তাঁহার পূর্ব্বমত সমর্থন করিতে পারেন নাই। তিনিও অগত্যা শেষে উক্ত মতের প্রতিবাদই করিয়াছিলেন। শিলচর হইতে প্রকাশিত "শিক্ষাসেবক" নামক ত্রৈমাসিক পত্রে (১৩৩৭ শ্রাবণ সংখ্যায়) তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—

"নবন্যায়ের প্রবর্ত্তক রঘুনাথ শিরোমণি যে শ্রীহট্টের লোক, এবিষয়ে আমাদের কাহারও সন্দেহ থাকিবার কথা নয়। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে' (উত্তরাংশে) জীবনবৃত্তান্ত ভাগে 'রঘুনাথ শিরোমণি' শীর্ষক প্রবন্ধে দৃষ্ট হইবে যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বিশিষ্ট পণ্ডিতগণও গুরু-পরম্পরা অবগত আছেন, রঘুনাথ শ্রীহট্টেরই লোক। এখন কথা এই যে, রঘুনাথ শ্রীহট্টের কোন্ গ্রামের কোন্ বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহার সন্ধান কিছু পাওয়া যায় কি না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, রঘুনাথের বাড়ী 'পঞ্চখণ্ডে' ছিল। তিনি কাত্যায়ন গোত্র-জন্মা ছিলেন। সুবিদনারায়ণের জামাতা রঘুপতির তিনি কনীয়ান্ ভ্রাতা ছিলেন, ইত্যাদি। আমি ইহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া "বিজয়া" পত্রিকায় (১৩১৯ চৈত্র সংখ্যায়) **'শ্রীহট্টের কাণা ছেলে'** শীর্ষক প্রবন্ধে ঐরূপই লিখিয়াছিলাম। কিন্তু এই অভিমতের সারবত্তা তেমন কিছু দেখা যাইতেছে না।"

পরে ৺রামকমল শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্ধৃত "কাত্যায়ন-খনিজমণেঃ" ইত্যাদি শ্লোকের কথা লিখিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও লিখিয়া গিয়াছেন, "কিন্তু এই "কাত্যায়ন খনিজ-মণেঃ" শ্লোকটির অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, কেহই এই শ্লোকের কথা জানেন না।...গদাধর

এই শ্লোকটি লিখিয়া গিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না এইজন্য যে, আর্য্যাতে রচিত এই শ্লোকে নানারকম ছন্দোগত দোষ রহিয়াছে" ইত্যাদি। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় পরে লিখিয়াছেন—

"রঘুনাথ যদি শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালীন হন, তাহা হইলে তিনি রাজা সুবিদনারায়ণের জামাতা রঘুপতির কনিষ্ঠ সহোদর হইতেই পারেন না। তবে শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি চরিতগ্রন্থে রঘুনাথের নামগন্ধও নাই। রঘুনাথ ও শ্রীচৈতন্য বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র এবং রঘুনাথের ন্যায় শ্রীচৈতন্যও ন্যায়শাস্ত্রের টীকা লিখিয়া পরে রঘুনাথের খেদ নিবারণার্থ গঙ্গায় নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন, এসব কথাও চরিতগ্রন্থে নাই।* ঐ সকল চরিতগ্রন্থে এক সার্ব্বভৌমকে উড়িষ্যায় দেখা যায়, তাঁহার সঙ্গে যে উড়িষ্যাগমনের পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কোন পরিচয়-প্রসঙ্গ ছিল, একথাও ঘুণাক্ষরেও চরিতগ্রন্থে পাওয়া যায় না, এমন কি, এই সার্ব্বভৌম যে পূর্ব্বে নবদ্বীপে ছিলেন, একথাও চরিতগ্রন্থে নাই। সম্ভবতঃ ইনি নবদ্বীপের বাসুদেব সার্ব্বভৌমও নহেন" ইত্যাদি।

কিন্তু 'চরিতামৃতে'র মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে "সার্ব্বভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী। বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি" ইত্যাদি "নদীয়া সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম তুষ্ট হৈলা"—এই পয়ার পাঠ করিলেও ··"চরিতগ্রন্থে নাই" এমন কথা লেখা যায় না। পূর্ব্বপ্রকাশিত চতুর্থ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক, মূলকথা, মহামান্য স্বর্গত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও পরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, রঘুনাথ শিরোমণি —"শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে" লিখিত রাজা সুবিদনারায়ণের জামাতা রঘুপতির কনিষ্ঠ সহোদর রঘুনাথ নহেন। কিন্তু তিনি যে, 'শ্রীহট্টেরই লোক'—ইহা স্বদেশভক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আজীবন সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ভাল কথা,—আমাদিগের তাহাতে কোন ক্ষতিই নাই, কিন্তু প্রমাণ কি? বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কতিপয় পণ্ডিতের শ্রুত প্রবাদমাত্রকেই প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রবাদ ত অন্যরূপও শুনা যায়। সে বিষয়ে নবদ্বীপের বৃদ্ধ পণ্ডিতগণের কথাই ত পূর্ব্বে জানিতে হইবে। উক্ত বিষয়ে পরে কেবল আমিই যে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের কথা লিখিয়াছি, তাহা নহে। আমার লেখার বহু পূর্ব্বে ১২৯১ সালে নবদ্বীপনিবাসী ৺কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহোদয় তৎকালীন নবদ্বীপের বৃদ্ধ পণ্ডিত-গণের নিকটে শুনিয়া **নবদ্বীপ মহিমা** পুস্তকে উক্ত বিষয়ে কি লিখিয়া গিয়াছেন, ইহাও দ্রষ্টব্য। তখন তিনি উক্ত বিষয়ে কোন মতান্তরও শুনিতে পান নাই।

পরে ১৩১১ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" লেখক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে ১৩১৮ সালে প্রকাশিত **নদীয়া কাহিনী** পুস্তকে (১১২ পৃঃ)—রাণাঘাটের বাবু কুমুদনাথ মল্লিক মহোদয় লিখিয়া গিয়াছেন,—"রঘুনাথ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে নবদ্বীপে এক দুঃখী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।·· মতান্তরে রঘুনাথ শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন" —ইত্যাদি।

কিন্তু পরে ১৩৩০ সালে প্রকাশিত **মধ্যযুগের বাঙ্গলা** নামক পুস্তকে (৬১ পৃঃ) বীরভূমের বৃদ্ধ ঐতিহাসিক ৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন,—

"নবদ্বীপ সারস্বতসমাজের উজ্জ্বলতম রত্ন সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি বর্দ্ধমান জেলার কোঁটা মানকরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শৈশবে পিতৃহীন হইলে তাঁহার জননী ভরণপোষণের অভাবে নদীয়ায় আসিয়া এক কুটুম্বের বাটীতে আশ্রয় লন। এই এক চক্ষু কাণা বালক রঘুনাথের বুদ্ধিশক্তি বিষয়ে ভবিষ্যতে অনেক গাল-গল্প সৃষ্ট হইয়াছে।"

রঘুনাথ শিরোমণি যে, শ্রীহট্টীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ, ইহার প্রতিবাদ করিতে কালীপ্রসন্নবাবু সেখানে পাদটীকায় লিখিয়া গিয়াছেন,—

"রঘুনাথের পিতৃকুলের পরিচয় প্রসঙ্গে শ্রীহট্টবাসী শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী স্বীয় আবিষ্কৃত এক কুলজীর বলে চৈতন্যের ন্যায় রঘুনাথকেও

* বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এখানে পাদটীকায় তাঁহার পূর্ব্ব লিখিত প্রবন্ধের কথা যে প্রকৃত ইতিহাস নহে—ইহা স্বীকার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—"বিজয়ায় প্রকাশিত "শ্রীহট্টের কাণা ছেলে" প্রবন্ধে যে সব কথার উল্লেখ আছে, তাহা কিংবদন্তীমূলক কথা, প্রকৃত ইতিহাস নহে।" পরে ইহাও লিখিয়াছেন,—"ব্যাকরণের বিদ্যাসাগরী টীকা শ্রীচৈতন্যের প্রণীত, এটাও অমূলক কিংবদন্তী, কেন না, শ্রীচৈতন্যের পিতৃভূমি শ্রীহট্টের ঢাকা-দক্ষিণে আজিও ঐ বিদ্যাসাগরী টীকা লেখক বাণীনাথের বংশধরগণ রহিয়াছেন। ইহাদিগকে "সাগরের বংশ" বলিয়া লোকে অভিহিত করে।" তাহা হইলে বুঝিলাম, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবন দাসের কথায়ও প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীহট্টবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ করিয়াছেন। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩১১)। সুহৃদ্বর নগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষে ও সামাজিক ইতিহাসে এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। অনেক পূর্ব্বে 'নবদ্বীপ মহিমা' প্রণেতা কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করেন নাই। নানা কারণে অবিশ্বাসী লোক আজি কালি অপ্রচলিত কুলজীর কথায় সন্দিহান। অপিচ অচ্যুতবাবুর আবিষ্কৃত কুলজীর বংশলতার রঘুনাথ যে রঘুনাথ শিরোমণি, তাহা কে বলিবে? ৪৫ বৎসর নবদ্বীপের সহিত সংসৃষ্ট থাকায় আমরা নদীয়ার অনেক কথা জানি। রঘুনাথ শিরোমণিকে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ নিজের বলিয়াই জানেন। অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার বংশের একব্যক্তি নবদ্বীপে ছিলেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন আমাকে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে অন্যান্য কথার পরে লিখিয়াছিলেন—"নবদ্বীপ আম্পুলিয়া পাড়ায় তাহার বংশধর রামতনু ন্যায়ালঙ্কার ছিলেন, আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি। রঘুনাথ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।" অত্যল্পকাল পূর্ব্বে সম্প্রতি পরলোকগত ভট্টপল্লী নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ও আমায় বলিয়াছেন, "—গুরুপরম্পরায় সকলে জানে, কোটা মানকর শিরোমণির পিতৃভূমি।" ১৩২০ সালের "প্রতিভা" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ প্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্রীহট্টের রঘুনাথ রঘুনাথ শিরোমণি হইতে পারেন না। তিনি পরবর্ত্তীকালের লোক এবং যে হিন্দুরাজার সময়ে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন, তখন তামাকের প্রচলন হইয়াছিল, একথা আমার ন্যায় উপেন্দ্রবাবুও লক্ষ্য করিয়াছেন।"

রঘুনাথ শিরোমণির সম্বন্ধে অনেকের লিখিত অন্যান্য কথা লেখা ও তাহার সমালোচনা বাহুল্যভয়ে এই প্রবন্ধে সম্ভব নহে। কিন্তু এখানে ইহা বক্তব্য যে, রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ কালীপ্রসন্নবাবু শাণ্ডিল্য গোত্র বন্দ্যোপায় হইলেও তিনিও রঘুনাথ শিরোমণিকে নিজ গোত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন নাই। তাঁহার মতে রঘুনাথ শিরোমণি বর্দ্ধমানের কোটা মানকরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের 'শ্রোত্রিয়কুলসম্ভূত' ছিলেন।

যাহা হউক, আমাদিগের রঘুনাথ শিরোমণি যেখানেই জন্মগ্রহণ করুন, তিনি বাঙ্গালী, তিনি বাঙ্গলার মাথার মণি, এ বিষয়ে কোন বিবাদ নাই। স্বদেশভক্ত বাঙ্গালী যুবক কবি সত্যেন্দ্রনাথ সত্যই লিখিয়া গিয়াছেন—

কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি।
বাঙ্গালীর ছেলে ফিরে এল ঘরে যশের মুকুট পরি॥

হারানো দিন

শ্রীসত্যনারায়ণ সেন

পিছনে চেও না আর
দিগন্তে ওই ঝরিছে অন্ধকার,
না ফুটিতে হাসি ভোরবেলাকার আধফোটা শতদল
সন্ধ্যা-শিশিরে শিহরিছে বার বার;

কুসুম-গন্ধ লয়ে
সে-আলো কি র'বে চির-অমলিন হ'য়ে?
রাগরঞ্জিত অলকনন্দা কলসঙ্গীত গাহি
হাতছানি দেবে বন্ধুর পথ ব'য়ে?

কি দেখিস্ বারে বারে
আঁখি জলে সবি আবছায়া হ'ল কি রে!
অতীত নিঙাড়ি অঞ্জলি ভরি পাবি শুধু নোনা জল
ব্যথানীল ওই স্মরণ-সিন্ধুতীরে।

অনুকর্ষ

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

৯

দক্ষিণ বঙ্গের গঙ্গার পূর্ব্বতীরের এক স্থানে সামান্য একটি দেবালয়কে উপলক্ষ করিয়া বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে একখানি গ্রাম ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল। গ্রামবাসীরা অবশ্য তীর হইতে অন্তত অর্দ্ধক্রোশ দূরেই নিজেদের আবাস বাঁধিতেছিল, কিন্তু এক দুঃসাহসী ব্যক্তি ভাগীরথী-গর্ভের বালুকারাশি শেষ হইয়া যেখানে উচ্চ তটরেখা আরম্ভ হইয়াছে তাহার সামান্য দূরেই কতকগুলা তৃণাচ্ছাদিত গৃহ তুলিয়া কয়েক বৎসর হইতেই বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রমেই সে গৃহশ্রেণী বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া দেবালয়টিকেও নিজ আবেষ্টনের মধ্যে লইবার উদ্যোগ করিতেছিল। ইতিমধ্যে গঙ্গাতীরে একখানি পুষ্পোদ্যানও প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে; গৃহস্থের গাভী গরু-মহিষ জমিজমা এবং তদনুসঙ্গী রাখাল কৃষাণ শস্যের জন্য 'খামার' ইত্যাদি ক্রমেই বর্দ্ধিতায়াতন হইয়া সেইখানেই একটি "উপগ্রামের" সন্নিবেশ হইয়াছে। ইহা ছাড়া গৃহস্থের আর একটি কার্য্যই সাধারণ গ্রামবাসীদের চক্ষে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য হইতে উচ্চ পদ দিয়াছিল। গৃহপ্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটি বিদ্যার্থী ছাত্রও গৃহস্থদের সঙ্গে আসিয়া লম্বা একখানা ঘর দখল করিয়াছিল এবং তাহাদের পাঠের শব্দে গঙ্গাতীর সর্ব্বদা মুখরিত হইত। এই ছাত্রগুলির এবং গৃহস্বামী তথা তাঁহার পরিজনবর্গের এমন একটি স্বাতন্ত্র্য ছিল যে, গ্রামবাসী সকলেই তাহাদের অতি সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিত। তাহারা যেন সাধারণের মত নয়। তাহাদের রুক্ষ কেশ, তৈলহীন দেহ, অসংস্কৃত সঙ্কীর্ণ বসন, প্রতিদিনের নিয়মিত স্নান, কথাবার্ত্তা চালচলনে অনভিজ্ঞ গ্রামবাসী তাহাদের ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত অধ্যয়নের তত্ত্ব না বুঝিলেও তাঁহাদের সান্নিধ্য মাত্রেই তাহারা একটু দূরে দূরে থাকিয়া বিস্মিত চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত। পুষ্পোদ্যানের নিকটেই যে ঘাটে তাহারা স্নান করিতে নামিত গ্রামবাসী ও বাসিনীরা সে ঘাট সুবিধাজনক হইলেও তাহা পরিহার করিয়া 'আঘাটা'তেই নিজেরা একটি ঘাট সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল। যখন এই 'ঠাকুররা' তাহাদের দ্বিপ্রাহরিক স্নানে জলে নামিত সেই সময়টিতে মাত্র তাহাদের তরুণ যৌবন বা কিশোরস্বভাবসুলভ কিছু খেলাধূলার চাঞ্চল্য তাহাদের চোখে পড়িত মাত্র। তাহাদের বুদ্ধির অনধিগম্য হইলেও 'ঠাকুর'দের এই সময়ে যে বাক্-বাহুল্যের এবং কখনও উচ্চ কখনও হাস্যযুক্ত কণ্ঠস্বরের রোল উঠিত তাহাতে গ্রামবাসীরা যেন পরম পরিতুষ্টভাবে ঈষৎ নিকটস্থ হইয়া তাহাদের সেই জলক্রীড়া এবং বাক্‌তর্ক একমনে শুনিত ও দেখিত। বোধ হয়, মনে মনে ভাবিত, "না 'ঠাকুর'রা আর যাই হোক্, মানুষের ছেলে-ছোকরাই বটে!" নারীরা কিন্তু প্রত্যুষে বা সন্ধ্যায় জলাহরণে আসিয়া ইহাদের সংযত গম্ভীর সেই দ্বিকালিক স্নানের ব্যাপার দেখিয়া ইহাদের মুনিঋষির পর্য্যায়েই ফেলিয়া মাহাত্ম্যে অভিভূত হইয়া তেমনি দূর হইতেই অবগুণ্ঠনের অন্তরালে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত এবং গ্রামে গিয়া ভক্তিগদ্‌গদ্ চিত্তে তাহার ব্যাখান করিত। তবে তাহাদেরও নিকটস্থ হইবার সময় ছিল। যখন সেই আশ্রমের কর্ত্রী (ইহা অবশ্য প্রথমে গ্রামবাসিনীদের কল্পনাই ছিল) এবং তাঁহার সঙ্গে রুক্ষকেশ-ধূসরবসনা একটি তরুণীও স্নানার্থে ঘাটে নামিতেন তখনই তাহারা আলাপ জমাইবার জন্য অগ্রসর হইত। মেয়েটির সঙ্গে কিন্তু তাহা জমিত না। বিদ্যার্থী তরুণকয়টির স্নানের অব্যবহিত পরেই তাঁহারা ঘাটে আসিতেন এবং মেয়েটিও তাহাদের মত মৌন সংযতভাবে ঝুপ করিয়া জলে নামিয়া কয়েকটা ডুব দিয়া উঠিয়াই আশ্রমাভিমুখে চলিয়া যাইত; মাথা মুছিবার বা বস্ত্রের জল নিষ্কাসনের জন্যও একবার দাঁড়াইত না। গৃহিণীটিই কেবল শান্ত স্নিগ্ধ মুখে প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাহাদের কৌতূহলের কিছু নিবৃত্তি করিতেন। তাঁহার নিকটেই তাহারা শুনিয়াছে যে গৃহকর্ত্তা তাঁহার স্বামী, কন্যাটি তাঁহার বিধবা কন্যা এবং ছেলেগুলি তাঁহার স্বামীর শিষ্য ও ছাত্র। এই ছেলেগুলির মধ্যে তাঁহার নিজ সন্তানও আছে। শুনিয়া সরলা গ্রাম্য রমণীদের কৌতূহল

শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিত কিন্তু গৃহিণীরও স্নিগ্ধ অথচ গাম্ভীর্য্যযুক্ত পরিমিত কথাবার্ত্তায় তাহারাও বেশী কথা কহিতে পারিত না।

বৎসরাধিক কাল হইতে এই তরুণগুলির মধ্যে গৈরিক বস্ত্র পরিহিত একটি অপরূপ মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে, সেইটির বিষয়ে তাহাদের কৌতূহল ও সশ্রদ্ধ বিস্ময় অসম্বরণীয় হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু ঐ একটি "ছাত্র"—এই একটি শব্দ ছাড়া আশ্রম-স্বামিনীর নিকটে তাহারা আর কিছুই আদায় করিতে পারে নাই। আর ছাত্র ছাড়া পুত্র কোন্‌টি সেটিরও সন্ধান না পাইয়া তাহারা ক্রমে হতাশ হইতেছিল।

আর ভাবান্তর হইতেছিল সেই ছাত্রদলের মধ্যে। যেমন ভাবে নৈমিষারণ্যে কলি ঢুকিয়াছিল তেমনই ভাবে তাহাদের মধ্যেও যে দ্বেষের বেশে কে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে তাহা তাহাদের বোধ হয় তখনও অজ্ঞাত ছিল।

প্রভাত হইয়াছে। সদ্য-আগত হিমানীর হিমাভাষ তখনও নদীর উপর হইতে সম্পূর্ণ মিলায় নাই। কয়টি ছাত্র নিত্যকার প্রাতঃস্নানে আসিয়াছিল কিন্তু পূর্ব্বের মত যেন মৌন সংযত ভাব আর তাহাদের মধ্যে নাই; তাহারা যেন কিছু বলিতে চাহে, অব্যক্ত বাক্যের প্রকাশ আভাষ তাহাদের মুখের ভাবে পরিস্ফুট, অথচ কে প্রথমে সেটি ব্যক্ত করিবে তাহার জন্য এ উহার পানে যেন প্রতীক্ষার ভাবেই চাহিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে একজন বলিয়া ফেলিল, "নাঃ—এ একেবারে অসহ্য।" কেহ আবার তাহার মধ্যে একটু বেশী চতুর, এক কথাতেই সে 'ধরা-ছোঁয়া' দিতে চায় না; অতি সরলের মত সে প্রশ্ন করিয়া বসিল, "কি হে, কি আবার অসহ্য হ'ল তোমার? গঙ্গার জল?—শীত তো এখনও পড়েই নি—সবে কলির সন্ধ্যা—মাত্র কার্ত্তিক মাস।" প্রথম বক্তা দ্বিতীয়ের এই চাতুরী-ভরা বাক্যে একেবারে যেন দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, "ন্যাকামো? চালাকি?" দ্বিতীয় এই সোজা আঘাতে মুখ নামাইতেই তৃতীয় বলিয়া উঠিল, "সত্যই তো! তোমার আবার এত ভালমানুষির ভাণ কবে থেকে শেখা হল? তুমিই হ'লে পালের গোদা—তোমারই আবার এত সাধুত্বগিরি আমাদেরই কাছে?"

দ্বিতীয় আর একটুও দ্বিধা না রাখিয়া এইবারে বলিল, "আচ্ছা, আমিই না হয় সাধু সাজ্‌ছি, আর তোমরাই কি আড়ালে এই লম্ফঝম্প করে এখনি সুমুখে গিয়ে অতি ভালমানুষের মত পুঁথি খুলে পদ্মলোচন ঠাকুরের চেলা সেজে বসে যাবে না? কারু ক্ষমতা থাক্‌লে বল্‌বে মুখ তুলে এককথা—যে, ওও ছাত্র, আমরাও ছাত্র, পড়তে হয় গুরুর কাছে পড়্‌ব, ওর কাছে পাঠ নেব কেন?"

"আরে আমরা তো আমরা—আমাদের আনন্দদারই কি সাধ্য আছে এক কথা বলে? আমাদের না হয় গুরু, তার তো বাপ, সেই বা কোন্ একথা বলে বাপ্‌কে যে তোমার পদ্মলোচন তোমারি থাক্—আমাদের তুমি পাঠ দাও।"

একজনের সহসা যেন একটু ন্যায়বুদ্ধির উদয় হইলে সে বলিল,"এটি ভাই অন্যায় কথা হচ্চে তোমার, ঠাকুর আমাদের কি ছেলে আর ছাত্রে কোন তফাৎ রাখেন কখনও? বরং আমরা কখনও মুখ তুলে একটা কথা কইতে পারি, তবু আনন্দদা মোটেই পারে না।"

"মুখ তুলে কইছ না কেন তবে? নিজে এতদিন কোথায় সব প'ড়ে ট'ড়ে এসে এখানে অতি নিরীহের মত ছাত্র সেজে আসা হয়েছে এই মত্‌লবেই যে, গুরু বল্‌বেন এদের যা দু-চার বছরে শিখিয়েছি তুমি তো ছয় মাসে শিখ্‌লে? গুরু আবার রসিকতা করে বলেন কি-না, তুমিই আমার এই গরুগুলা চরাও, আর আমি বসে তোমার কোঁচড়ের মুড়িগুলো খাই। কি না, তোমার অপূর্ব্ব পড়ানো শুনি। তাঁর না হয় ভাল লাগে, আমাদের মনে কি হয় তা তো তাঁর একবার ভাবা উচিত! তাই ভাব্‌বেন? না, আরও তাঁর গরব বাড়িয়ে বলবেন, শ্রবণ মাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ—চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন-চৈতন্য, চরিতামৃতকার যা লিখে গেছেন—তোমাতে তা আমরা প্রত্যক্ষ করছি কমলাক্ষ!"

"আরে চুপ্ চুপ্, অত চেঁচিয়ে নয়—আর ঠাকুরের সম্বন্ধেও রাগের চোটে ও কি রকম করে কথা বলছিস্? রসিকতা? ছি! ছি!"

পূর্ব্ব বক্তা একটু অপ্রস্তুত হইয়া নীরব হইল। "চল শীগ্‌গির—রোদ উঠে গেল, আনন্দদা পাঠ লাগিয়ে দিয়েছেন, গলা শোনা যাচ্চে। তিনিও দেখ্‌ছি তাঁর হালের গুরুদেবের সঙ্গে ভোরেই আজকাল স্নান সার্‌ছেন। আমাদের সঙ্গটা তাঁরও ভাল লাগ্‌ছে না—না, বেশী করে যোগ অভ্যাস আরম্ভ করেছেন?"

তৃতীয় ছাত্র বলিয়া উঠিল, "এই ত্থাখ, অন্তকে সাবধান ক'রে নিজের বেলায় কি হচ্চে? চাষার ভাষাও যে আয়ত্ত করে ফেল্‌লে দেখ্‌ছি।"

পূর্ব্ব বক্তা তখনও গুমরাইতে ছিল, "কমলাক্ষ! পদ্মলোচন নামটা কি সাধে দিইছি।"

"তা বলে কানা ছেলে নয়! কমলাক্ষ বা পদ্মলোচন যা বল তাই খাটবে। ন্যায়ের নাম ক'রে অন্যায় কথাগুলো তা বলে বলো না, বুঝ্‌লে হে! সেটা নিছক ঈর্ষার পর্য্যায়েই পড়্‌বে। একে তো তার গুণের আর বিদ্যের হিংসে করছি আমরা, আবার রূপেরও কর্‌ব?"

সকলে সচকিতে তীরের দিকে চাহিয়া দেখিল —একটি ছাত্র আসিয়া তাহাদের অজ্ঞাতে একেবারে জলের নিকটেই দাঁড়াইয়াছে। সকলে একটু বেশী রকম অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, কিন্তু পূর্ব্ব বক্তা নিজেদের লজ্জা ক্ষালন করিবার জন্য সকলের সঙ্গে জল হইতে উঠিতে উঠিতে বলিল, "তোমার আর কি ভাই! বাপের আদেশে তার কাছে পাঠ নিতে লজ্জা হয় না, কিন্তু আমাদের যে মাথা কাটা যায় আনন্দদা?"

"ঠাকুরের কাছে সরলভাবে বললেই পার যে, আমাদের আপনিই পড়ান্, ওঁর কাছে আমরা পড়ব না। ত্থাখ দাদা, আমি বলি কি 'স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ'—সকলের যখন পঠনই উদ্দিষ্ট, তখন দেখ যেখান হতেই ভালরূপে আদায় হয় সেইটাই আমাদের দেখা উচিত। বাবাকে নানা বিষয়ে মন দিতে হয়—নিজের গ্রন্থালোচনা, ভজন-সাধন, তারপর এই আশ্রমের সমস্ত বিষয়, মায় চাষ-আবাদ গরু-বাছুর, লোকজন, আয়-ব্যয়—সবই যখন তাঁর, তখন তিনি যদি একটি ছাত্রের দ্বারা সাহায্য পান তো নেবেন না?"

"ছাত্র কেন বল্‌ছ তবে? একজন অধ্যাপক এনে দিয়েছেন আমাদের এইটি বললেই তো ভাল হয়। তিনিও আবার গ্রন্থ খুলে বসেন কেন আমাদের সঙ্গে ছাত্রের অভিনয় ক'রে?"

আনন্দ জিভ্‌ কাটিয়া বলিল, "ছি ছি! বড্ড অন্যায় বল্‌ছ দাদা! বিদ্যার কি সীমা আছে? উনি বাবার কাছে বিদ্যার্থী আর সাধনার্থী হ'য়েই এসেছেন, কিন্তু সত্যই উনি আমাদের অধ্যাপক হবারই উপযুক্ত। ওসব লজ্জা-টজ্জা রেখে দিয়ে আপন কাজ হাসিল ক'রে চল। আমার না হয় বাপের আদেশ, তোমাদেরও তো গুরুর ইচ্ছা, এতে এত অপমানবোধ নাই বা করলে। চল চল, বেলা হয়ে গেছে, কমলাক্ষ তাঁর ভজন সেরে গ্রন্থ নিয়ে বসেছেন। তিনি আজ এক নূতন সূত্র বোঝাবেন আমাদের।"

"ঠাকুর? তিনিও কি উঠে এয়েছেন সাধন-কুটীর ছেড়ে?'

"না না—তত বেলা হয়নি এখনও—চল।"

* * * *

প্রবীণ অধ্যাপক একমনে ব্যাকরণ সূত্রবৃত্তির আবৃত্তি ও বিশ্লেষণ করিয়া ছাত্রমণ্ডলীকে পাঠ দিতে দিতে বলিয়া উঠিলেন, "কমলাক্ষ? তাকে কেন দেখ্‌ছি না?"

এ উহার মুখপানে চাহিল—কে উত্তর দিবে? কেহই সাহস পায় না। আবার তিনি প্রশ্ন করিলেন। এবার আনন্দ ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "তিনি আমাদের খানিকটা পড়িয়েই চলে গেলেন মাঠের দিকে। বললেন, একটু ঘুরে আসি।"

"বোধ হয় শ্রান্তিবোধ করেছে। যে পরিশ্রম করছে বেচারা আমার জন্য! কত রাত পর্য্যন্ত যে লিখে গেছে আমার কাছে। যেমন মুক্তার মত লেখা—তেমনই শ্লোকার্থ গ্রহণের শক্তি! কি উপকার যে হয় আমার তার সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায়! তোমরাও এ সুযোগ ছেড় না, যে যা পার তার কাছ থেকে আদায় করে নাও। ছেলেটিকে যে বেশী দিন রাখ্‌তে পার্‌ব আমাদের কাছে, তা আমার মনে হয় না; কেন না, বিদ্যার দিক্ দিয়ে তাকে বেশী কিছু দিতে পারছি বলে আমার মনে হয় না। যা বোঝাতে যাই দেখি তাই সে জলের মত বুঝে আছে। কেবল এক বিষয়ে, মাত্র এক বিষয়ে তার আমাকে একটু প্রয়োজন আছে মনে হয়। সেদিকেও তার শক্তি অদ্ভুত।" বলিতে বলিতে অধ্যাপক সহসা ছাত্রদের মুখের দিকে চাহিয়া নিরুৎসাহিত-ভাবে থামিয়া গেলেন। একটু যেন চিন্তা করিয়া আবার গ্রন্থের পানে চাহিতেই নিজের পূর্ব্ব বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে নিঃশব্দে কখন মগ্ন হইয়া আবার ছাত্রদের পাঠ দিতে আরম্ভ করিলেন।

পাঠগৃহের প্রায় পশ্চাতেই ক্ষুদ্র একখানি পুষ্পোদ্যান। উদ্যান না বলিয়া তাহাকে গৃহস্থের প্রয়োজনীয় কতকগুলি ফুল গাছের জমি বলিলেই ঠিক হয়। তাহার কিছু দূরেই গঙ্গার দুকূল প্রসারি ধারা! গৈরিকবস্ত্রপরিহিত সেই

তরুণ উদাসীন গঙ্গাতীরে ধীরে ধীরে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে ছিলেন। নব উদ্দীপ্ত সূর্য্যকিরণ যে মুণ্ডিত মস্তকেও আরক্তিম মুখমণ্ডলে পড়িয়া তাহাকে দ্বিগুণ আরক্তিম করিয়া তুলিতেছিল, সে বিষয়ে তাঁহার খেয়ালই নাই। সহসা সেই পুষ্পবাগিচার মধ্য হইতে শব্দ আসিল, "রোদ উঠেছে। এখন আর বেড়াবার সময় নেই।" উদাসীন অত্যন্ত চমকিত হইয়া শব্দের অভিমুখে চাহিয়া দেখিলেন—কাষায়বসনা রুক্ষকুন্তলা এক নারীমূর্ত্তি ফুল তুলিতে তুলিতে তাহার আরব্ধ কার্য্য থামাইয়া সাজি হস্তে একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া আছে, তিনি চাহিতেই সে মূর্ত্তি মুহূর্ত্তে নত হইয়া পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত হইল। সে-ই যে কথা কহিয়াছে, এমন লক্ষণই যেন প্রকাশ পাইতে দিতে সে অনিচ্ছুক। তরুণ উদাসীন দ্রুতপদে সেদিক হইতে অপসৃত হইয়া আশ্রমের অন্তরাল-পথে মাঠের অন্যদিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন—যেখান হইতে এই পুষ্পোদ্যান আর চক্ষেই পড়িবে না।

১০

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে জলস্থল একাকার করিয়া তুলিতেছিল। বিদ্যার্থী ছাত্রের দল সান্ধ্যস্নান সমাপন করিয়া আশ্রমে গিয়াছে। আকাশের শেষ আরক্ত আভাটুকুও নদীবক্ষ হইতে মুছিয়া গগনের দিগন্তরেখায় ক্রমে লীন হইয়া গেল। আশ্রম হইতে আগত গোদোহনের শব্দের সঙ্গে জাহ্নবীর শান্ত সান্ধ্য কুলুকুলু ধ্বনি মিশিয়া একটা একতাল সুরের সৃষ্টি করিতেছিল।

স্নান ও সন্ধ্যা সমাপনান্তে তীরে উঠিতেই কলসধারিণী সেই মূর্ত্তি তরুণ উদাসীনের দৃষ্টিপথে পড়িল। দুইচক্ষের স্থির দৃষ্টি পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যাতারার মতই জ্বলিতেছে। দেহও নিশ্চল নিথর, যেন ক্রিয়াবিহীন। একটি দৃষ্টিমাত্রই যেন সেখানে জাগ্রত, আর সবই নিস্পন্দ!

উদাসীন জল হইতে ত্রস্তে উঠিতে গেলেন, উঠিবার এবং যাইবার সেই একটি মাত্র পথ! সে দৃষ্টিপাত হইতে সরিবার বা পলাইবার পথ নাই। অস্ফুট গর্জ্জনের মতই সক্ষোভ কণ্ঠস্বর শান্ত নদীবক্ষকেও যেন ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল, "আবার! পালাবার পথও বন্ধ।"

ধীরে ধীরে পথ পরিষ্কার হইয়া গেল কিন্তু দৃষ্টি সরিল না, সমাধিমগ্নের মত সে যেন দৃশ্যের সঙ্গে একত্ব প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল দেহ যেন সেই রোষক্ষুব্ধ স্বর শুনিয়া অভ্যাসবশে সরিয়া দাঁড়াইল মাত্র। তরুণ উদাসীন কিন্তু আর পলাইলেন না! দীপ্ত অগ্নিবর্ষীচক্ষে সেই সমাধি-মগ্নতাকে যেন একেবারে পুড়াইয়া জাগাইয়া দিবার মত ভাবে চাহিয়া উগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "যখন তখন যেখানে সেখানে আপনার এই দৃষ্টি! আপনিই দেখ্‌ছি আমাকে আশ্রম ছাড়ালেন!"

"কি দোষ?" ধীরে ধীরে সেই সম্মোহিত মূর্ত্তির নিস্পন্দ দেহে যেন স্পন্দন আসিল। নিশ্চল অধরোষ্ঠ একবার একটু কাঁপিয়া মাত্র স্থির হইল।

"কি দোষ? আপ্‌নি না আপনার পিতার কাছে ছাত্রের মত পাঠ নেন্ শুনি? আপনি না ব্রহ্মচারিণী? ধর্ম্মশাস্ত্র সামাজিক নীতিশাস্ত্র সবই নাকি জানেন কিছু কিছু? কি দোষ এতে তা জানেন না?"

"না—না!" আর্ত্তকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "মাত্র শুধু চোখের দেখা! এতেও কি অপরাধ? মাত্র শুধু দেখা—"

দ্বিগুণ রুক্ষস্বর নদীবক্ষে বাজিয়া উঠিল, "আপনার ন্যায়ে জগৎ চল্‌বে না। আপনার এই রাক্ষসী দৃষ্টির দায়েই আমাকে পালাতে হল দেখ্‌ছি।"

সম্মুখে যেন বান ডাকিয়া আসিল। চক্ষের জলের সেই অজস্র উৎসারিত সহস্র ধারার সম্মুখ হইতে তরুণ সন্ন্যাসী সবেগে একদিকে ছুটিয়া পলাইয়া গেলেন।

* * * *

গঙ্গার তীরে তীরে বিস্তীর্ণ মাঠ ভাঙিয়া আমাদের উদাসীন নিজমনে চলিয়াছেন। হাত দুইটি দীর্ঘভাবে লম্বিত, পরিধানে এবং বক্ষে মাত্র একখানি গৈরিক বস্ত্র ও উত্তরীয়, অঙ্গে আর দ্বিতীয় বস্ত্র নাই। বক্ষে উপবীতের পার্শ্বে জপের একগাছি তুলসীমালা লম্বিত, মাঝে মাঝে ওষ্ঠাধর স্পন্দিত হইতেছে, যেন কোন কিছু উচ্চারণ করিতেছেন।

সায়াহ্নের সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন। এইবার অস্ত গমনোন্মুখ হইলেন। উদাসীন সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা কণ্ঠ ছাড়িয়া পূরবীতে তান ধরিলেন। সুমধুর কণ্ঠস্বর বিশুদ্ধ তানলয়ে ও মূর্চ্ছনায় আকাশবাতাসকে পূর্ণ করিয়া সেই রাগিণীকে একটা উদাসমূর্ত্তিতে যেন প্রকটিত করিল—"দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়ে মন?"

সহসা তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল। কে যেন পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া গতিরোধ করিতেছেন। অথচ গতিতাল সমান রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। ঈষৎ সচকিত নেত্রে পার্শ্বে দৃষ্টিপাতের সঙ্গে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর কর্ণে বাজিল, "এতদিনে, আজ দুবৎসর পরে তোমায় খুঁজে পেলাম! এইদিকে তুমি, এ স্বপ্নেও মনে করিনি! তুমি কি নবদ্বীপে ছিলে কমলাক্ষ?"

উদাসীন তাহার গতিবেগ শ্লথ করিয়া যেন আশ্বস্তভাবে উত্তর দিলেন, "না, তবে কাছাকাছি বটে। তুমি কি এখনও ঐ ডাকই ডাক্‌বে ব্রহ্মচারী?"

"কোথায় বা তুমি, কোথায় বা আমি! কে তোমাকে আর এ নামে ডাকে? পূর্ব্ব-পরিচয়ের এইটুকু চিহ্নমাত্র, না পছন্দ কর আর ডাকব না।"

উদাসীন ব্যথিতভাবে তাহার হাত ধরিলেন, "দুঃখ দিলাম তোমায় বুঝি? আমার সঙ্গেরই এই গুণ ব্রহ্মচারী, দুঃখ দিই কিন্তু দুঃখ পাইও—এইটুকু দেখো।"

ব্রহ্মচারী একটু স্নেহাবেগের সহিতই ধৃতহস্তে একটু চাপ দিলেন। বলিলেন, "আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এই দু বৎসর এদিকে কেমন করে ক'বে এলে?"

"তুমি যেমন ক'রে এসেছ তেমনি ক'রেই এসেছি। দু-বৎসরই প্রায় এদিকে।"

"আমি তো তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি একরকম।"

"সত্য? কিন্তু কেন?"

"এ প্রশ্ন যে করতে পারে তাকে সেকথা বলেই বা কি হবে! মনে কর খেয়াল্।"

স্থিরনেত্রে ব্রহ্মচারীর পানে চাহিয়া উদাসীন মৃদুহাস্যের সহিত ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "আ-ছি ব্রহ্মচারী!"

"আমিও নিজেকে সে ধিক্কার সর্ব্বদা দিই। যাক্, এখন বল, সেই পূর্ব্ববঙ্গ থেকে এতদূর বিনা পাথেয়ে কি ক'রে এলে? পথে কষ্ট পেয়েছ খুব?"

উদাসীন একটু উচ্চশব্দে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আবারও সেই 'ছি-ছি'রই কথা। কষ্ট যদি পেয়েই থাকি, পেলামই বা; এই যে তুমি আমার জন্য এমনই ক'রে বেড়াচ্ছ, আমি কি তা একবারও মনে করি বা খোঁজ রেখেছি? তবে কেন তোমরা এমন ক'রে বেড়াও—এমন কর? এ কি বিড়ম্বনা তোমাদের?"

বলিতে বলিতে ক্ষোভে এবং যেন অন্তর্নিহিত কি একটা কষ্টে উদাসীন নিস্তব্ধ হইলেন। ব্রহ্মচারী সনিশ্বাসে বলিলেন, "এ কেনর উত্তর বুঝি তিনিই দিতে পারেন যিনি এই মনোভাবকে জীবের মধ্যে সঞ্জীবিত রেখেছেন।"

"কেন—উত্তর তো ঢেরই আছে, তোমারই কি তা জানা নেই, পঞ্চদশী-কারের অনাদি মায়া—অদ্বৈতবাদীর ভ্রান্তি—অন্যত্রে মোহসংস্কার ইত্যাদি?"

"তত্ত্বকথা এখন থাক্, কি ক'রে এদিকে এলে তাই বল? আর দুতিনবার যে যুষ্মদশব্দে দ্বিবচন প্রয়োগ করলে আমি ছাড়া 'আমরা', আবার কে এমন ভাগ্যবান্ হ'লেন যে তোমার পেছনে পেছনে এমনি ক'রে বিড়ম্বনা ভোগ করছে, সে কথাও বল শুনি।"

উদাসীন একটুক্ষণ চুপ করিলেন। ভাবিতে ভাবিতে সহসা উচ্চ হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি ক'রে এদেশে এলাম, সেই গল্প শুন্‌বে? সে চালাকির কথা যদি শোন, অবাক্ হয়ে যাবে একেবারে।"

"চালাকি? শুনি তা হ'লে ব্যাপারটা!"

"তোমাকেও না বলে তো নিঃশব্দে চলে এলাম। দু-চার দিনের কথা বলা অনাবশ্যক, এক মন্দিরে মহান্তের সঙ্গে মিলন হ'ল। নবদ্বীপে এসে টোলে পড়ার তখন সেই চেষ্টাই একান্ত, পাথেয় সংগ্রহ করা চাইই। দুই হাত-পা ছাড়া কিছুই নেই ত!"

"কারই বা তাছাড়া অন্য কিছু ছিল?"

"ছিল বইকি! প্রথম ঘরের বার হ'তে হরিচরণদাদা, তারপরে তুমি! তবু সঙ্গে কিছু ছিল না—বল্‌তে চাও? যাক্, হঠাৎ মনে ভাগবতপাঠ ও কথকতা করার ফন্দি জাগ্‌ল। মহান্তের নিত্যপাঠ্য শ্রীমদ্‌ভাগবত থেকে নিঃশব্দে দু-তিন অধ্যায় কাগজে তুলে নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়লাম। তুমি তো জানই, শ্রীধর স্বামী আর বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের ভাষ্যটা একটু দুরস্তই ছিল—পথ চল্‌তে চল্‌তে এক গ্রামের হাটের মধ্যে এসে প'ড়ে তখনই সেখানে গায়ের আবরণটুকু বিছিয়ে ভক্ত অম্বরীষের উপাখ্যান পাঠ আরম্ভ করলাম। দেখতে দেখতে দ্বিতীয় হাট জমে গেল সেখানে স্ত্রীপুরুষের।"

ব্রহ্মচারী কি যেন স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, কথার মধ্যপথে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "গ্রামের

হাটে তো? আমারও সেই সন্দেহ এসেছিল। তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ির দিন কয়েক পরেই আমিও যে সেইখানে উপস্থিত হই। সে গ্রামের লোক একত্র হয়ে তখন গদ্‌গদ্‌ভাবে স্মরণ করছে···বলাবলি করছে, সাক্ষাৎ মহাপ্রভু নবীন বেশে উদয় হয়ে সে গ্রামে ভক্তের চরিত্র ব্যাখ্যানের ছলে অপূর্ব্ব ভাগবত ব্যাখ্যা তাদের শুনিয়ে গেছেন। সেই একদিন ছাড়া আর কেউ তাঁকে দেখ্‌তেও পায় নি। তারা সামান্য প্রণামী যা নিবেদন করেছিল তা পর্য্যন্ত সেইখানে সেইভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি সেটুকুও গ্রহণ না ক'রে মূঢ় গ্রামবাসীদের যা দিয়ে গেছেন তা মহাপ্রভু ভিন্ন কে আর দিতে পারে! তারা চোখের জলে ভাসতে ভাসতে চিরদিন এই ভাগ্যকে স্মরণ করবে। ইনি তবে তুমিই?"

নিরীহ বেচারারা! তাদের দত্ত ঐ প্রণামীগুলোর মধ্যে আমি যে আমার এদেশে পৌঁছুবার পাথেয় সংগ্রহ করেছিলাম তাও ধরতে পারেনি? আচ্ছা! কথক মশায়ের এই ফন্দির তবে কি বুঝবে তারা বল?"

"যাক্, নবদ্বীপের টোলে কি পড়্‌লে এতদিন, তা বল! কোন শাস্ত্র-টাস্ত্র?"

"বল্‌লাম না, নবদ্বীপে নয়। টোলের গোলে হরিবোল্ দেওয়া কি আমার মত অপদার্থের সাধ্য! এখানেও এক মহাত্মার আশ্রয় লাভ ক'রে কিছু পড়া বা পড়ানো এবং সৎসঙ্গের গুণে কিছু সাধনভজনের দৃষ্টান্তও দেখ্‌তে পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু দুর্দ্দৈব যে সর্ব্বত্রই প্রবল। সঙ্গ ছাড়্‌তে চায় না যে সে।"

"তোমার নিজের 'স্বভাব' ছাড়া আর কোন দৈব যে তোমার মনোমত স্থান থেকে চ্যুত করবে এ তো মনে হয় না।"

"এবার তাই ঘট্‌ল। সেই মহৎ ব্যক্তির আশ্রয়ে আমার মত আরও দু'চারজন বিদ্যার্থী, একটু তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্থাৎ সাধন-ভজনকামী ছাত্রও দু-একটি ছিল। আশ্রমটি গৃহস্থাশ্রমের মত অনেকটা হলেও বিদ্যার্থী ছাত্রগুলির সঙ্গে বেশ ভালই ছিলাম এতদিন। কিন্তু ক্রমে—"

"অপ্রীতি ঘট্‌ল কি কারু সঙ্গে?"

"সেটুকু আমি শুধ্‌রে নিতে স্বচ্ছন্দেই পারতাম—তার জন্যে এমন কিছু না—"

"তবে?"

"কেবল দৃষ্টি। একটা দৃষ্টির দায়েই সে সৎসঙ্গ ছাড়্‌তে হ'ল এবার।"

"সে কি? স্ত্রীলোকের দৃষ্টি নিশ্চয়? আশ্রমে স্ত্রীলোক?"

"বল্‌লাম না কি, গৃহস্থাশ্রমই অনেকটা সেটি। সেই মহাত্মা তাঁর স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়েই এই আশ্রমটি খুলেছেন। টোল নয় অথচ কয়েকটি ছাত্রকেও ভরণপোষণ দিয়ে রেখেছেন—আশ্রমটিতে সংসারের উপকরণও সব আছে, অথচ ছাত্রপুত্র-কন্যাস্ত্রী সবগুলিই যেন একটি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের নিয়মে বদ্ধ। গৃহকর্ত্তা নিজে একজন সাধক! অতি শান্তির স্থান। বিশেষ ছাত্রগুলির সঙ্গ পরম লোভনীয়ই হয়েছিল আমার পক্ষে।"

"তার মধ্যেও এই উৎপাত!" তারপরে সহসা ব্রহ্মচারী যেন জ্যেষ্ঠের মত অভিভাবকের মত উদাসীনের পানে চাহিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, "অসম্ভবই বা কি। এই দুই বৎসরে তোমার মূর্ত্তি যে সাংঘাতিকই হয়ে উঠেছে! এরূপ দেখে অনেক রাক্ষস-রাক্ষসীই যে লোলুপ হ'য়ে উঠ্‌বে।"

উদাসীনের আরক্ত মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া উঠিল! বিস্ফারিতচক্ষে ব্রহ্মচারীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "তুমিও ঐ কথা বললে? তুমি তো আমার মত কাঠ-কঠিন নও, জীবের দুঃখের দরদী তুমি, তুমিও ঐ নামটা দিও না। মানুষের এই যে আদিম বন্ধন, এই যে তাদের অনেক-বস্তুকেই ভাল-লাগার স্বভাব এবং তার জন্য তাদের অধিকাংশ স্থলে যা প্রাপ্তি ঘটে, সে ব্যথার ওপর কি ঐ শব্দ প্রয়োগ উচিত! কি নিরুপায় কি অসহায় তারা ভাব দেখি।"

ব্রহ্মচারী একটু বিস্মিতভাবে উদাসীনের পানে ক্ষণেক চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যদি সে ব্যথা অনুভবই করেছ, তবে কেন আবার ব্যথা দিলে?"

"সে যে তাদের পেতেই হবে। এও যে অনিবার্য্য—নইলে আর দুঃখ কি! কিন্তু রাক্ষসী যদি তার ক্ষুধায় কাঁদে, তার ওপর তো দোষারোপও চলে না! কেবল ভাববার বিষয় এই যে, কিসের এ ক্ষুধা? আর কিসে বা এ ক্ষুধার চির-নিবৃত্তি? যে এই ক্ষুধাবৃত্তি মানুষের অন্তরে চির-সঞ্চারিত করেছে, সে এ ক্ষুধার নিবৃত্তি অন্ন—এ তৃষ্ণার জল কোথাও রেখেছে কি-না। এ ক্ষুধার দেহভেদে আবার কত নূতন নূতন মূর্ত্তি, নূতন নূতন প্রকাশ। কিন্তু তার

মূর্ত্তিও যে সাময়িক। চিরকালের জন্ম এ ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটে এমন কোন চিরসত্য চিরনিত্য বস্তু আছে কি জগতে? সেই সন্ধানই করছে জীব অনাদিকাল ধরে। যা সুমুখে এসে একটু মনোহরণ করল, অমনি ভাবে বুঝি এই সেই। অপ্রাপ্তিতে বা অতৃপ্তির ব্যথায়ও ক্রমে বুক ভেঙে পড়ে, কিন্তু ব্যথা কি মিথ্যা? এই ব্যথা পেতে পেতে চলার নামই কি পথচলা? এই পথ বেয়ে চল্‌তে চল্‌তেই কি সেই বস্তুর সন্ধান পাওয়া যাবে—যার দিকে অমনি সব ভুলে দিবারাত্র অনিমিষে চেয়ে থাক্‌তে হয়? যার দুরত্বে অমনি চক্ষের জলে বুক ভেসে যাবে—ধূলায় লুটিয়ে পড়তে হবে। বৈষ্ণব দর্শন যে বলেন, এই ব্যথাই তার প্রাপ্তি। সত্যই কি তাই? ব্যথার সময় তো নিজের এ অনুভব হয় না। কিন্তু সত্য আছে, সত্য আছে এ তত্ত্বে।" বলিতে বলিতে উদাসীনের চোখ মুখ যেন জ্বলিয়া উঠিল, যাহা বলিতেছিলেন তাহা ছাড়াইয়া তিনি যেন অন্য জগতে চলিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে তাঁহার বাহুমূল স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "ওদিকে পথ নেই ভাই—এদিকে এস।"

উদাসীন তাঁহার প্রায় রুদ্ধ নিশ্বাস সজোরে ত্যাগ করিয়া যেন এই জগতে ফিরিয়া আসিলেন। অর্দ্ধ উন্মিলিত চক্ষু সম্পূর্ণ খুলিয়া সনিশ্বাসে বলিলেন, "চল।"

"আজ সমস্ত দিন বোধ হয় খাওয়া হয়নি?"

"না।"

"কখন সে আশ্রম থেকে বেরিয়েছ?"

ভোরে!"

"কোথায় যাবে এখন?"

"যেদিকে তুমি নিয়ে যাবে!"

"এস তবে।"

কিছুদূর ব্রহ্মচারীর অনুসরণ করিয়া সহসা এক সময়ে উদাসীন দাঁড়াইয়া গেলেন। কঠিন মুখে বলিলেন, "না—কাশী যাব, সেইখানেই আমার দরকার।"

ব্রহ্মচারী নিকটস্থ হইয়া তাহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া শান্তস্বরে বলিল, "তাই হবে, কিন্তু সমস্ত দিনের উপবাসী আছ, আমিও তাই। ক্রোশ খানেকের মধ্যেই আমার একটা জানিত স্থান আছে—যেখানে অনায়াসে অতিথি হ'তে পারব। আজ চল সেইখানেই উঠি।"

"আচ্ছা, কিন্তু কাশী আমি একাই যাব, তুমি সঙ্গ ধরবে না—এই প্রতিশ্রুতি দাও আগে।"

"তাই হবে, চল।"

ক্রমশঃ

শ্বেত ভল্লুক

শ্রীকপিঞ্জল

পশুশালে বিরাজিছ তুমি শ্বেত ভল্লুক,
কোথা সে অরোরা কোথা? কোথা মেরু মুল্লুক?
কোথা হিম হি হি হাওয়া, সাড়া পাওয়া যায় না,
বল্গা হরিণ কই? ফিরে ফিরে চায় না!
ফিনিকের ছবি এ যে গড়া হিম শিনাতে,
স্লেজ হ'ল গো-শকট বাঙলার টিলাতে।
কর্ড মাছ দেখি এ যে বাঁকুড়ার পুকুরে
পৌষের বাঘা শীত বৈশাখী দুকুরে।

পাই নাই দেখা তবু চিরদিন ইস্কি'
বীরভূমে আন্‌কোরা বোহিমিয়া জিপ্‌সী।
ভাটপাড়া টোলে এলো পরে সাদা লুঙ্গি
তিব্বতী লামা না এ বার্ম্মাই ফুঙ্গি!
শ্বেত হস্তীর দেশে এলো শ্বেত ঋক্ষ,
পেন্‌গুইনের বাসা হ'ল তালবৃক্ষ।
ডোবাতে এ ডুব্‌তরী সবে দিলে টেক্কা
এস্কিমো বোলপুরে টানিতেছে একা।

কুমেরুর ইতিহাস লেখা যেন পদ্যে
কুল্‌পীর এ ভালুক কল্‌কের মধ্যে।

জাপানী স্বর্গে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

জাপানের আদিম যুগের কথা বলছি। তখন বন্য মানুষ উন্নীত হয়েছে পল্লীজীবনে। সে তখন ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করেছে লাঙল আর তাঁতের সাহায্যে। ইংরেজীতে একটা বয়েদ আছে, তার ভাবার্থ—

'আদম যখন ঠেলিত লাঙল চর্‌কা ইভের হাতে,
সভ্যভব্য নব্য মানুষ কোথা ছিল এ ধরাতে ?

মানুষ যেমন, তার দেবতা ও স্বর্গও তদনুরূপ; কারণ তার কল্পনায় শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও নারী দেবদেবীর মূর্তি ধারণ করে, নিত্যানন্দময় সুখ ধাম তারই স্বকপোলকল্পিত স্বর্গলোক।

তখনকার জাপানী স্বর্গে ছিলেন একরাজা। তাঁর ছিল পরমাসুন্দরী এক কন্যা। ঘরকন্নার কাজে মহানন্দে তার দিন কাটত। তার সবচেয়ে প্রিয়তম কাজ ছিল তাঁতবোনা। একদিন সে তাঁতশালায় বসেছে তাঁতে, সামনে খোলা দরজা, এমন সময় দেখতে পেলে একটি পরমসুন্দর তরুণ রাখাল চলেছে রাস্তা দিয়ে একটা বলদ হাঁকিয়ে। যেমনই চার চোখে হ'ল মিল, অমনই প্রাণে প্রাণে পড়ল গাঁঠ্‌ছড়া। সব দেশেই ত্রিদিবেশ্বর অন্তর্দর্শী। তিনি ওদের মনের কথা জানতে পেরে দিলেন ওদের বিবাহ। প্রণয়ের আদিকাণ্ড সর্বদেশে সর্বকালেই একইসুরে বাঁধা। নবদম্পতীর প্রেমচর্চায় ওদের দৈনন্দিন কর্ত্তব্যে পদে পদে ঘটতে লাগল ত্রুটি ও অবহেলা। মাকুটা বেকার হয়ে পড়ে থাকে। তাঁতের খটাখট শব্দ নীরব। বলদটার মেজাজ কতকটা ধর্মের ষাঁড়ের মত। রাজ-কেদারের পক্বশস্য নিত্য হয় তার পদদলিত। রোজই সে স্বর্গপল্লীর বেড়াভাঙে, ফুলের বাগান করে লণ্ডভণ্ড, পর্ণকুটীরের ছাউনি উৎপাটিত ক'রে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে হয় রোমন্থ-তৎপর। তার উপদ্রবের আর অন্ত নেই। দেবতার শরীরেও ত রাগ আছে। শ্বশুরমশাই কোপান্বিত হয়ে দিলেন জামাইকে নির্বাসনদণ্ড একেবারে আকাশ-গঙ্গার পরপারে। তবে বৎসরান্তে একবার মাত্র কন্যা-জামাতার মিলনের বিধান রইল। দেবপঞ্জিকার সপ্তমমাসের শুক্লাসপ্তমীতে একরাত্রির জন্যে ওরা একত্র হতে পারবে এই হ'ল ব্যবস্থা। সে রাত্রে স্বর্গের হংসবলাকা আকাশ গঙ্গার এপার ওপার সেতুবন্ধ রচনা ক'রে দিত তাদের পাখ্‌নায় পাখ্‌নায় গাঁথা খিলানে। এই সাঁকোর পথে ওদের হ'ত যাতায়াত। কিন্তু দৈব-দুর্বিপাকে সে রাত্রে যদি বৃষ্টি হ'ত, তবে আকাশ-গঙ্গায় নামত প্লাবনের জল, দুকূল ছাপিয়ে অনেকদূর পর্য্যন্ত বন্যার জল প্রসারিত হয়ে যেত। মরালের দল সেদিন আর পারত না সেতু রচনা করতে। এই দুর্যোগের প্রতিকূলতায় কখনও কখনও উপরি উপরি তিন চার বৎসরেও স্বামী-স্ত্রীর শুভ-সম্মিলন হতে পারত না। কিন্তু ওদের দাম্পত্যপ্রেম চিরসহিষ্ণু। নীরবে নিঁখুতরূপে ওরা কর্তব্য পালন ক'রে যেত আগামী মিলনের উৎসুক প্রতীক্ষায়।

পণ্ডিতদের মতে জাপানী পুরাণের এই কাহিনী চীন দেশ থেকে সংগৃহীত। প্রাচীন চৈন-কল্পনায় নক্ষত্রদের ছায়াপথটি আকাশ-গঙ্গা।

দেবরাজের এই কন্যাটির নাম তানাবাতা। তার কৃষাণ স্বামীর নাম হিকোবোশী। পৌরাণিক ইতিকথায় নানারকম পাঠান্তর আছে। তবে মুল ঘটনাটি এক। একটি বিবরণে দেখা যায়—এরা স্বর্গে যাবার আগে ছিল মানুষ, বাস করত চীনদেশে। প্রত্যেক শুক্লপক্ষে স্বামী-স্ত্রীতে একটি পাহাড়ের চূড়ায় বসে উদয়াস্ত চাঁদের পানে চেয়ে থাকত। চাঁদ যখন ডুবে যেত, তখন দুজনের চোখে ব'য়ে যেত অশ্রুধারা। নিরোনব্বই বৎসর বয়সে স্ত্রীর হ'ল মৃত্যু, স্বামীর বয়স তখন একশো তিন। বিপত্নীক স্বামী প্রতি রজনীতে চাঁদের দিকে চেয়ে ব'সে থাকত। জ্যোৎস্নারূপিনী প্রেয়সীর মায়ামূর্তি এসে বসত তার পাশে। এই রকমে দিনের পর দিন কাটে, এমন সময় হঠাৎ এক গ্রীষ্মরাত্রে পরমাসুন্দরী একটি নারী আকাশ থেকে নেমে এলেন সাদায় কালোয় চিত্রপক্ষ এক পাখীর পিঠে। স্ত্রী অভিসারিকা স্বামীকে নিয়ে গেলেন স্বর্গে এক দাঁড় কাকের বাহনে। স্বর্গের দেবরাজ তাঁদের দুজনের থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন ছায়াপথ বা স্বর্গঙ্গার দুই পারে। প্রতিদিন

নদীতে দেবরাজ আসতেন স্নানে। কেবল সপ্তম মাসের সপ্তমী তিথিতে যেতেন দূরান্তরে বুদ্ধদেবের কথা শুনবার জন্যে। তখন স্বর্গের পাখীরা মিলে তাড়াতাড়ি একটা সেতু রচনা করে দিত, পত্নী স্বামীর কাছে যেতেন অভিসারে সেই সেতু-সরণী ধ'রে।

আগেই বলেছি, ওদের সাম্বৎসরিক মিলন নির্ভর কর্‌ত আকাশের আনুকূল্যের উপর। বৃষ্টি নামলে সে বৎসর আর শুভযোগ হত না। সপ্তম মাসের সপ্তমী তিথির বর্ষার নাম—'নামিদানো আমি' অর্থাৎ—অশ্রুবাদল। সেদিন আকাশ গঙ্গা হ'ত অশ্রুনদী।

তানাবাতা আর হিকোবোশী এখন আকাশের তারা। কিংবদন্তী এই, যার চোখের দৃষ্টি নির্মল, সে এই শাশ্বত-দম্পতীর মিলন দেখতে পায় সাম্বৎসরিক এই শুক্লা-সপ্তমীতে। সেদিন ওই নক্ষত্রযুগল থেকে পাঁচরঙের রঙিন আলো ঝরে। গ্রামে গ্রামে সেদিন উৎসবের ধুম পড়ে যায়। পাতাশুদ্ধ দুটি বাঁশ তিন হাত অন্তরে পোঁতা হয়। পুরুষ-বাঁশটির নাম 'ওতকোদাকে', আর স্ত্রী-বাঁশটির নাম 'ওনা-দাকে'। বাঁশদুটির মাঝখানে সরলভাবে বাঁধা হয় একগাছি দড়ি, সেটা যেন হ'ল আকাশ-গঙ্গার উপর পাখীর সাঁকো। তাতে পাঁচ-রঙা কাগজে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ছোট ছোট কবিতা বা ছড়া। উৎসবরাত্রে বন্ধুরা পরস্পরকে উপহার দেয় কালিভরা পাথরের নতুন দোয়াত, কবিতা লিখবার জন্যে। ছোট ছেলেমেয়েদের হাত ধরে কলম বুলিয়ে দু-একটি কথা, যথা—'তানাবাতা' 'কাশাশাগি নো হাশি' (পাখীর সেতু) ইত্যাদি লিখিয়ে দেওয়া হয়।

এইবার গুটিকতক প্রাচীন ছড়ার অনুবাদ উপহার দিয়ে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করি।

কবিতাগুলি 'মান-ইয়োশু' বা' লক্ষ 'ঝরাপাতা' নামক পুঁথির ইংরেজী তর্জ্জমা থেকে সংগৃহীত। রচনা-কাল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে অথবা মাঝামাঝি। অধিকাংশই 'তান্‌কা' অর্থাৎ একত্রিশটি মাত্র শব্দাংশে পাঁচছত্রে লিখিত।

অধুনা তানাবাতা উৎসবে আগেকার মত সমারোহ আর নেই। বড় বড় শহরে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। তবে এখনও পল্লীতে পল্লীতে জাপানী সপ্তম-মাসের শুক্লা সপ্তমীতে এ অনুষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায়। তরুণ-তরুণীরা জ্যোৎস্নারাতে দল বেঁধে তানাবাতার উদ্দেশে গান গায়।

গানগুলি ভাব বা বিষয়বস্তুর হিসাবে মোটামুটি অভিসার, প্রতীক্ষা, বাধা ও বিরহ—এই কয়টি ভাগে লিপিবদ্ধ করলাম। মূল পুস্তকে এরূপ শ্রেণীবিভাগ নেই। অতি সংক্ষিপ্ত এই ছড়াগুলি দু-চারিটি রেখায় চিত্রাভাস মাত্র। জাপানের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা এই জাতীয় বালখিল্য কবিতাগুলিতে বেশ লক্ষ্য করা যায়। জাপানী ভাষার সঙ্গে পরিচয় নেই। তবু এই কবিতাগুলির ইংরেজী অনুবাদের আব্‌ছায়ার মধ্যেও মূল ছবিগুলির আভাস পাওয়া যায়। কবিতাগুলি কখনও নায়ক, কখনও বা নায়িকার ভূমিকায় লেখা।

অভিসার

হংস-বলাকার পক্ষ-সেতুর উপর দিয়ে চলেছে অভিসারিকা প্রিয়-সম্মিলনে। দুর্গম পথ, পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা। তাই কবি তানাবাতার উদ্দেশে বলছেন—

বিরহিনী তানাবাতা,
সেতুপথখানি পাতা
ওই আকাশের গায়
দরদি পাখীর পাখ্‌নায় পাখ্‌নায়।

অতি-সাবধানে পার হয়ে যাও সাঁকো, পাখ্‌নার ফাঁকে জলে পড়ে যেয়ো না ক'। আশা করি সে যাত্রায় কবির সাবধানী বাণী বিফলে যায়নি।

মাটির পথও কম বিপদসঙ্কুল নয়।

ওগো তানাবাতা রাণী,
উপলপর্ণা বন্ধুর পথখানি।
অতি-সাবধানে যাবে,
নতুবা আছাড় খাবে।

প্রস্তরবহুল পথে সন্ত্রস্তা যাত্রিণীর কচিৎ-ক্ষিপ্র কচিৎ-মন্থরিত পদচারণা দিব্যি চোখে ফুটে ওঠে।

আকাশ-গঙ্গাকে অশ্রুনদী বলা হয়েছে। যার দুই কূলে সম্বৎসর বিরহী-যুগলের অশ্রুধারা বয়ে যায়, তার যোগ্যতর নাম আর কি হতে পারে! আমাদের বৈষ্ণবকবির মুখেও শুনেছি, কৃষ্ণবিরহে গোকুলে যখন পশুপক্ষী তৃণগুল্ম সবই

বিশীর্ণ, তখন একা যমুনাই কেবল ভরাগাঙ, বিরহিণীদের অশ্রুজলে।

শীর্ণা গোকুলমণ্ডলী পশুকুলং শষ্পায়ন স্পন্দতে
মূকাঃ কোকিলশঙ্ক্রয়ঃ শিথিকুলং ন ব্যাকুলং নৃত্যতি।
সর্বে তদ্বিরহানলেন সততং হা কৃষ্ণদৈন্যং গতা!
কিন্ত্বেকা যমুনা কুরঙ্গনয়না নেত্রাম্বুভির্বর্দ্ধতে॥

অভিসারিণী তানাবাতা অমুতীর্থ নদীর কূলে দাঁড়িয়ে—

অশ্রুদরিয়ার কূলে আমি,
কখন আসিবে মোর স্বামী?

*

অশ্রুনদীর হিল্লোল'পরে ভাসে
বঁধুর তরণী, ঢেউ-এ ঢেউ-এ কাছে আসে।
গোধূলির আলো নিভেনি সাঁঝের পটে,
তরীখানি তার অচিরে ভিড়িবে তটে।

*

আসে হিকোবশী তরণী বাহিয়া তার প্রেয়সীর লাগি,
ক্ষেপণীর ঘায় শীকরকণায় নীহারিকা ওঠে জাগি।

বিজ্ঞানের মুখেও আজ শুনি সৃষ্টি-নীহারিকা বৈদ্যুত-মিথুনের ঘূর্ণীনৃত্যে বুদ্বুদিত হ'য়ে উঠছে মহাশূন্যে।

অনেক দিনের না-পাওয়া বঁধু সে মোর,
পার হ'তে হবে অশ্রুদরিয়া ক্ষীণবাহু পায় জোর।
সন্ধ্যা না হ'তে এ পাড়ি করিব শেষ,
জানি পরপারে দাঁড়ায়ে আছে প্রাণেশ।

এই কবিতাটিতে তানাবাতা দাঁড় টেনে গাঙ পার হয়ে চলেছে স্বামীর সন্ধানে।

হঠাৎ কুয়াশা ঘনিয়ে উঠল। পরপার আর দেখা যায় না। সেই অন্ধকারে আশ্বাসবাণী ছলকিত হয়ে ওঠে দাঁড়ের মুখে।

নৈশ আঁধারে সহসা কুহেলি হেরি,
বৈঠা ফুকারে—পহুঁছিতে নাই দেরী।

আর দেরী নেই। নৌকা কূলে ভিড়বে অচিরে, অভিসার-যাত্রা হবে মিলনান্তিকা। কানে আসে ক্ষেপণীর মুখে জলকল্লোল, গায়ে লাগে তার উৎক্ষিপ্ত শীকরকণা।

অশ্রুনদীর 'পরে
ক্ষেপণীর মর্মরে
জাগে মঞ্জুলধ্বনি
বাজে সমীরণে মিলনের আগমনী।

পুনশ্চ—

মেঘল গোধূলি, সাঁঝের বাদলঝরে।
বুঝি আসে নায়,
শীকর ছড়ায়
বঁধুর বৈঠা এই সিকতার 'পরে।

নদীকূলের ছোট ছোট এই দৃশ্যপটগুলি শুধু জাপানী স্বপ্ন-স্বর্গের প্রতিকৃতি নয়, আমাদের এই বঙ্গপল্লীর নদীতীরেও এদের প্রতিচ্ছায়া ফুটে ওঠে।

প্রতীক্ষা

প্রাচীন জাপানে এই প্রথা ছিল, প্রণয়ীযুগল বিচ্ছেদের পূর্বাহ্নে পরস্পরের কোমরে একটি ফিতার গ্রন্থি বেঁধে দিত, পুনর্মিলনের আগে পর্যন্ত সে গ্রন্থিসূত্রটি থাকত অটুট। প্রতীক্ষমানা তানাবাতার মুখে কবি এই ছড়াটি আমাদের শোনালেন:

বহু-প্রতীক্ষার ধন মম
আসিছে আজিকে প্রিয়তম।
অটুট নীবিড় গ্রন্থিডোর
আবার উন্মুক্ত হবে মোর।

প্রতীক্ষার গুটিকতক শ্লোক এইখানে উদ্ধৃত করি।

বসন তোমার বুনেছি আপন হাতে
মোর এই ছোট তাঁতে।
অঙ্গাবরণ যতনে সেলাই করি
রয়েছি ধৈর্য্য ধরি।
ওগো প্রিয়তম কখন আসিবে তুমি,
উপহার লবে চুমি?

স্ত্রীর হাতে বোনা কাপড়ে তৈরী জামার স্মৃতি হিকো-বোশীকেও উন্মনা করে।

যে বসনখানি বুনেছিল তানাবাতা,
আঙিনার তাঁতে ছিল যার বুকপাতা,
সে জ্যোতির্বাসে আমারি গায়ের মাপে
আংরাখা রচি জাগর যামিনী যাপে।

আসাম অঞ্চলে আমাদের নববধূর হাতে-বোনা কাপড়ে বরের বিবাহসজ্জা হয়।

কুয়াশাচ্ছন্ন অশ্রুনদীর কূলে প্রতীক্ষমানা প্রোষিত-ভর্তৃকার ছবি নানা কবির শ্লোকে চিত্রিত হয়েছে। যথা—

বঁধুর আশে কুহেলি ঢাকা দরিয়া কূলে রই,
শীকরকণা সিক্তবাসে অশ্রুঘন হই।

*

শরতের চাঁদ আবার ফিরিয়া আসে
অশ্রুনদীর কুহেলিবিথার পরে,
আমি চেয়ে রই বঁধুর দরশ আশে
উৎসুক প্রেম শতশিখা যেন ধরে।

*

সাঁঝের হঠাৎ ঝড়ে
সাদা মেঘগুলি গগনে লুটায়ে পড়ে।
শুভ্রাঞ্চলখানি
বুঝি তানাবাতা রাণী
উড়ায়ে বঁধুরে দিতেছেন হাতছানি!

*

কুহেলি ঘনায় মন্দাকিনীর জলে,
তরণী বাহিয়া যাচনার ধন কাছে আসে পলে পলে।

*

সে আজ রয়েছে বহু দূরে।
স্তরে স্তরে পুঞ্জিত জলদ
রচিয়াছে কাজল প্রচ্ছদ
আবরিতে আমার বঁধু রে।
চেয়ে রয় অপলক চোখ
ভেদিবারে কুহেলি-নির্ম্মোক।

ভোর হয়ে গেছে। ব্যর্থপ্রতীক্ষার শ্রান্তিতে তানাবাতা নিদ্রাভিভূতা। তার উদ্দেশে কবির মিনতি—

ওগো সারসের দল,
তোমরা তুলো না কোলাহল।
অঞ্চলে রাখি মাথা
ঘুমায়ে পড়েছে তানাবাতা,
পূরবের দিক্‌চক্রবালে
আবীরগুলালি উষা ঢালে।

হিকোবশীর উক্তি—

চাঁদের উপর দিয়া মেঘ ভেসে যায়,
জানি তানাবাতা মোর পাড়ি দেয় অশ্রু-দরিয়ায়।

*

আগেই বলেছি 'নামিদানো আমি' অর্থাৎ—অশ্রুবাদল সজোরে নাম্‌লে সে বৎসর আর বধূবরের মিলন হয় না। এই বাধার উদ্দেশে তানাবাতা দোঁহাবলীর অনেকগুলি দোঁহা রচিত। দু-চারটে নমুনা দেওয়া যাক।

বাধা

এ পারের চিল ওপারে উড়িয়া যায়,
শুধু তরী তার পারে না ত লঙ্ঘিতে
নিষেধের বাঁধ। শারদী সপ্তমীতে
বন্দী সে তরী বারেক মুক্তি পায়।

*

ওপারের মেঘ এপারে ভাসিয়া আসে,
নাই কোনো বাঁধ বাতাসে বা নীলাকাশে।
আমার প্রিয়ের কোনো সংবাদ হায়
আনে না ত তারা শূন্য এ সিকতায়

*

আসিল ঝড় উঠিল ঢেউ দুলে
টানিয়া গুণ তরণী তব ভিড়াও মোর কূলে।

*

বেপরোয়া প্রেমিকের গর্বোক্তি—

আসুক ঝঞ্ঝা, উচ্ছল ঢেউগুলি
জাগুক্ সরোষে উদ্যত ফণা তুলি,
আমি নির্ভয়ে ভরা গাঙ হব পার,
নৈশ আঁধার রুধিবে না অভিসার।

নিয়তির প্রতিকূলতা—

নক্ষত্রের অধিপতি আমি,
অন্তরীক্ষে মুক্তগতি, মন্দাকিনী কূলে এসে থামি।
ক্রূর বিধি প্রতিকূল অতি,
অচল তরণী মোর নিয়তি হরিল তার গতি।

প্রণয়িনীর নৈরাশ্য—

প্লাবনের ঢল নামিল যে দরিয়ায়,
তিমির যামিনী ধীরে আসে পায় পায়।

পার হতে হায় পারিল না হিকোবোশী,
শূন্য এ তটে একাকী রহিনু বসি।

বিরহ

বিরহের কবিতাগুলি দিয়ে জাপানী স্বর্গের তানাবাতা-হিকোবোশী প্রসঙ্গ শেষ করি।

যুগযুগান্ত ধরি
হাত রাখি হাতে আঁখি রাখি আঁখি 'পরি
মোরা বসে থাকি যদি,
এ অমর প্রেম নিত্য নবীন রবে জানি নিরবধি।
জানি না কেন যে তবু
ঘুচিল না হায় বিধির বারণ কভু।

*

স্বর্গে মর্ত্তে ভেদ নাহি ছিল যবে
তদবধি মোরা বধূবর এই ভবে।
তবু বিরহের ব্যবধান মাঝখানে,
সপ্তমীতিথি ভাদ্রে মিলন আনে।

*

বিদায়ের খনে দৃষ্টি হারাল' আঁখি,
চকিতে উধাও হ'ল পলাতকা পাখী
সম্বৎসর পথপানে চেয়ে থাকা,
বৎসরান্তে হিয়া'পরে হিয়া রাখা

*

সারা বরষের নিরাকুল বাসনার
অতৃপ্তিভরা সমাপ্তি নিশি শেষে।
আগামী প্রভাতে নব সাজ বিধবার,
বৎসরান্তে সাজিব বধূর বেশে।

*

নিশি হলে ভোর ফুলশয্যাটি মোর
ধ্বংসস্তূপে লভিবে তাহার গোর।
শূন্য শয়নে একটি বরষ ধরি'
রহিব পড়িয়া শুধু অপেক্ষা করি'।

বর্ত্তমান যুগের সুসভ্য কৃত্রিম মানুষের অন্তস্তলে যে আদিম মানুষটি অমর হয়ে আছে, এই সব পৌরাণিক ছড়া-ছবিতে ও আখ্যায়িকায় তার নিদর্শন পাই।

কয়েক বৎসর আগে মনের আনন্দে এই জাপানী কবিতাগুলি যখন তর্জমা করেছিলাম, তখন কে জানত চীন-জাপানের খাণ্ডবদাহে প্রাচ্যদিগন্ত অন্ধকারময় হয়ে উঠবে? একদা বোধিদ্রুমের ছায়া সুদূর চীন-জাপানের উপর তার স্নিগ্ধ অনাতপখানি প্রসারিত করে রেখেছিল। আজ সেখানে শিলীভূত বুদ্ধমূর্ত্তির মাথায় বহ্নিচ্ছত্র। বাংলার কবি জয়দেব গোস্বামী একদিন গেয়েছিলেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।

আজ এই নৃশংসতার দৃশ্য দেখে কোন্ করুণার অবতারের উদ্দেশে তার বিদেহী আত্মা স্তোত্র রচনা করবেন?

দেবতাও খুঁজে ফেরে

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার বি-এল

জীবন আরতি শেষে—বাসনার ধূপ বুকে নিয়া
তোমারে করেছি পূজা—কেঁদে শুধু ফিরিয়াছে হিয়া।
প্রদীপ নিভিয়া গেছে—চন্দন বেদনা বুকে তার,
শুকায়ে বাতাসে শুধু—ছড়ায়েছে গন্ধ বেদনার।
ডালা ভরা ফুলগুলি—হাসি তার নিভে নিভে আসে,
তোমার এ মুখ চেয়ে কেঁদে কেঁদে মরেছে হতাসে!
অন্ধ অন্ধকার মাঝে—দেউলের পূজারীর দল,
ফেলিয়া গিয়াছে শুধু পাষাণের প্রতিমা কেবল।

তখন—তখন সেই অন্ধকার বনপথে একা,
আমি যে পেয়েছি মোর - হৃদয়ের দেবতার দেখা।
ধ্যান ভাঙি কাছে আসি—অন্ধকার রূপে উজলিয়া,
আমারে নিয়েছে টানি'—স্নিগ্ধ তা'র বক্ষেতে তুলিয়া!
তখন বুঝেছি আমি পূজা মোর হয়নি বিফল,
অন্তরের ব্যথা মোর দেবতারে করেছে চঞ্চল।
অশ্রুজলে দেছে ধরা—অন্তরের দেবতা আমার!
দেবতাও খুঁজে ফেরে কোথা কাঁদে পূজারী তাহার।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবজন্তু

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

প্রায় সাড়ে ষোল কোটি বছর আগে পৃথিবীতে প্রথম জীবের সৃষ্টি। ক্রমবিবর্ত্তন ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের পর বর্ত্তমানে বনজঙ্গলে আমরা যে সব হিংস্র জীবজন্তুর আধিপত্য দেখতে পাচ্ছি, প্রাগৈতিহাসিক যুগের জন্তুদের তুলনায় তারা অতি ক্ষুদ্র। তবে প্রকৃতি তার প্রথম সৃষ্টিতে যেটার দিকে বেশী ঝোঁক দিয়েছিলো সেটা গুণগত নয় পরিমাণগত। তাই আদিম জন্তুরা অতি বীভৎসকায় হ'লেও বুদ্ধির দিক থেকে ছিলো অতি দুর্ব্বল। এই সব জীবজন্তু পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হ'য়ে বুদ্ধি আর স্থূলত্বের সমতা রেখে বর্ত্তমান জীবজন্তুতে রূপ নিয়েচে।

প্রস্তরীভূত জান্তব দেহের কঙ্কাল উদ্ধারের এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবজন্তুদের সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গবেষণার ফলে বৈজ্ঞানিকরা স্মরণাতীত যুগের বহু অত্যাশ্চর্য্য বিষয় আবিষ্কার ক'রেচেন। সৃষ্টির আদি-কাণ্ড থেকে এরাই পৃথিবীর বুকে তাদের রাজত্ব চালিয়ে আসছিলো—পরে কোন এক শুভ বা অশুভ মুহূর্ত্তে প্রকৃতির এক অদ্ভুত খেয়ালে এ সব অতিকায় জান্তবদেহ আশ্রয় নিলে মাটির তলায়। তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেছে, আজকের মানুষ যাদের আদিম জনক পনর কি বিশ হাজার বছর আগে প্রথম পৃথিবীর আলো দেখলো, তারা এই আদিকাণ্ডের গবেষণায় মস্তিষ্কের খোরাক পেয়েচে।

বৈজ্ঞানিকরা প্রাগৈতিহাসিক জীবকে তিনভাগে ভাগ ক'রেচেন। এর প্রথমভাগে আসে মৎস্যশ্রেণীর জীব, দ্বিতীয়ভাগে আসে সরীসৃপ শ্রেণীর এবং সর্ব্বশেষে আসে স্তন্যপায়ীরা। স্তন্যপায়ীরা তাদের সৃষ্টির প্রারম্ভে এক সাধারণ শ্রেণী হিসাবে জন্মালেও পরিশেষে নিজেদের ভেতর শ্রেণীগত পার্থক্যের ফলে ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতর হ'য়ে ওঠে। আর সরীসৃপ শ্রেণী থেকে পক্ষী একটা প্রশাখা হিসাবে বের হয়।

যদিও এ সব জীবজন্তুর অধিকাংশই পৃথিবী থেকে একেবারে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে, তবু তাদের কিয়দংশের জীবনীর খবর তাদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল থেকে পাওয়া যায়।

নিউজিল্যাণ্ডের মামোথ (Mammoth) ও মোয়া শ্রেণীর জীবের বিলুপ্তির জন্য মানুষকেই দায়ী করা হয়। কিন্তু ডাইনোসরস্ (Dinosaurs) ও পক্ষবিশিষ্ট সরীসৃপ প্টেরোডেকটাইলের (Pterodactyl) বিলুপ্তির জন্য প্রকৃতিকেই সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা যায়। অতিকায় জলচর

ডাঃ ষ্টক্ প্রাগৈতিহাসিক যুগের ব্যাঘ্রের মস্তক-খুলি পরীক্ষা ক'রছেন ; টেবিলের উপর প্রাগৈতিহাসিক যুগের সিংহের মস্তকখুলি বর্ত্তমান খুলি অপেক্ষা আকারে পঁচিশ গুণ বৃহৎ

সরীসৃপ প্লেসিওসরসের (Plesiosaurus) এরূপ অবস্থাও একই কারণে। এ জন্তুটির দেহের গঠন ছিলো এক অদ্ভুত

প্রকৃতির। সরীসৃপ, কুমীর ও তিমির সংমিশ্রণে এদের দেহ গঠিত। এরা মাংসাশী এবং দৈর্ঘ্যে ২০ ফিটেরও বেশী।

সরীসৃপদের ভেতর অনেক বিভিন্ন রকমের জন্তু পাওয়া

প্রাগৈতিহাসিক যুগের উষ্ট্রের কঙ্কাল

যায়। ডাইনোসরস (Dinosaurs) তাদের মধ্যে অন্যতম। এদের চারটি প্রত্যঙ্গের মধ্যে সামনের দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং পশ্চাতের দুটির সাহায্যে সহজে চলাফেরা করতে পারে। আয়তন ও আকৃতিতে এরা বিভিন্ন উপশ্রেণীতে বিভক্ত। আশী ফিট দৈর্ঘ্যের Atlantosaurus এবং ৬০ ফিট লম্বা ও ২০ টন ওজনের Brontosaurus এদের মধ্যে অন্যতম। Ceratosaurus আয়তনে ক্ষুদ্রতম হ'লেও এদের বুদ্ধি সবচেয়ে তীক্ষ্ণ। ডাইনোসরস পরিবারের মধ্যে ষ্টেগোসরাস (Stegosaurus) ও ট্রিসেরাটপসের (Triceratops) দেহের গঠন সবচেয়ে অভিনব। প্রথমটির শরীরের উপরে পিঠের ঠিক মাঝখান দিয়ে খুব চওড়া হাড়ের 'প্লেট' দুই সারিতে সাজান থাকে। আর এর লেজটিও একটু অদ্ভুত রকমের এবং শরীরের তুলনায় মুখটি অতি ক্ষুদ্র। এরা নিরামিষাশী। দ্বিতীয়টির মাংসের এক অদ্ভুত গ্রীবাবেষ্টনী থাকে এবং সেটির প্রান্তদেশে বড় বড় পেরেকের ন্যায় বস্তু সজ্জিত থাকে। মাথায় তিনটি শিং আছে। এরা মাংসাশী। 'পেটেরোডেকটাইল' নামক খেচর সরীসৃপের সন্ধান এ যুগেই পাওয়া যায়। এখানে মনে করা স্বাভাবিক যে পক্ষীর উৎপত্তি এদের সাহায্যে। আসলে কিন্তু পক্ষীর উৎপত্তি 'ইগুয়ানোডন' থেকে।

বর্ত্তমানে পৃথিবীতে এমন কোন জীবিত পাখী নেই যাদের দাঁত আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাখীদের যে সরীসৃপের মত দৃঢ় দাঁত থাকতো Archaeopteryx তার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েচে।

কঙ্কালের সাহায্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় স্তন্যপায়ী জন্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। আমেরিকার Natural History Museum এ এই শ্রেণীর অনেক জন্তুর কঙ্কাল সজ্জিত আছে। বিকটাকার গণ্ডার, অতিকায় ব্যাঘ্র, মাংসাশী পক্ষী, পক্ষবিশিষ্ট সরীসৃপ ও বীভৎসকায় সামুদ্রিক জন্তু প্রভৃতির কঙ্কাল বৈজ্ঞানিকদের প্রাগৈতিহাসিক যুগের বন্য জীবনের অবস্থা জানতে সাহায্য ক'রেচে। এরূপ কঙ্কাল সংগ্রহ করা বহু ব্যয়, কষ্ট ও শ্রম সাপেক্ষ। অনেক

প্রাগৈতিহাসিক যুগের বীভৎসকায় মৎস্যের চোয়াল। এ জাতীয় মৎস্যের উচ্চতা আশি ফিট ; চোয়ালে প্রায় দু' শত দাঁত বিদ্যমান

সময় পার্ব্বত্য প্রদেশে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ও মাসের পর মাস একাধিক স্থান খনন ক'রেও কোন ফল

মানুষের জন্মলাভ করবার বহু পূর্ব্বে এই বৃহৎ জন্তু পৃথিবীতে রাজত্ব ক'রত। এর নাম ডিপ্লোডোকাস। লম্বায় আশি ফিটেরও বেশী

পাওয়া যায় না। তবু উৎসাহী মানুষ এরই জন্য জীবন উৎসর্গ ক'রেচে।

সম্প্রতি সবচেয়ে বৃহৎ মাংসাশী টাইরেনোসরাসের (Tyrannosaurus) একটি সমগ্র কঙ্কাল উদ্ধার করা হ'য়েচে। এদের বৈশিষ্ট্য হ'চ্চে যে, যে কোন জানোয়ার সামনে পড়লে তাকে আক্রমণ ক'রবে। এরা লম্বায় ৩০ থেকে ৪০ ফিট এবং উচ্চতায় প্রায় ২০ ফিট। থাবার দ্বারা এরা অতি সহজে একটি ষাঁড়কে আয়ত্তে আনতে পারে। দুই থেকে তিন ইঞ্চি লম্বা তলোয়ারের ন্যায় ধারালো দাঁত দিয়ে এরা শিকারকে আক্রমণ করে। পাহাড়ের সঙ্গে কঙ্কালটি গেঁথে থাকার জন্য অতি সাবধানে এটিকে বিচ্ছিন্ন ক'রতে দুটি ঋতু অতিবাহিত হ'য়েছিলো। তার পর কঙ্কালটি উদ্ধার করার পর পর্ব্বতগাত্রে যে গর্ত্তটি হ'ল সেটির দৈর্ঘ্য ৩০ ফিট, প্রস্থ ২০ ফিট এবং গভীরতা ২৫ ফিট।

আজ পর্য্যন্ত যে সব আংশিক কঙ্কাল পর্ব্বত গাত্র থেকে উদ্ধার করা হ'য়েচে তাদের ভেতর সবচেয়ে ভারী হ'চ্চে প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি গণ্ডারের (Tricerotops) মস্তক। এটির ওজন তিন টনেরও কিছু বেশী। অবশ্য পরে এর দেহের অবশিষ্ট অংশগুলিও উদ্ধার করা হয়। বর্ত্তমান সময়ের গণ্ডারের কাছে ২৫ ফিট দৈর্ঘ্যের এই জন্তুটি এক অতিকায় দৈত্যের ন্যায়। আমেরিকার Natural History Museumএ প্রাগৈতিহাসিক যুগের হাঙ্গরের যে চোয়াল দুটি আছে সেগুলি আরও ভয়ঙ্কর। চোয়াল দুটিতে সর্ব্বসমেত দু'শটি দাঁত আছে। অর্থাৎ জীবিত থাকলে হাঙ্গরটি নিঃসন্দেহে আশী ফিট লম্বা হ'তো। মঙ্গোলিয়াতে পাঁচ থেকে আট কোটি বছর আগেকার কতকগুলি ডিম পাওয়া যায়। Dinosaurs জননীকে ও ডিমগুলির পাশেই পাওয়া গিয়েছিলো। এতদিন প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবজন্তুদের দৈর্ঘ্যের পরিমাপ ৮০ থেকে ৯০ ফিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ ব'লে ধারণা ছিলো। পরে পূর্ব্বআফ্রিকার সমুদ্রতটের ৯০০ ফিট উপরে এক মালভূমিতে দেড়শত ফিট দৈর্ঘ্যের একটি কঙ্কাল সে ধারণা বদলিয়ে দিয়েচে।

আজ পর্য্যন্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের ৭৩ বিভিন্ন জন্তুর সম্পূর্ণ ও আংশিক কঙ্কাল উদ্ধার করা হ'য়েচে, যার

ডাইনোসরস্—এরা পশ্চাতের পা দিয়ে চলাফেরা করে ; মাটি থেকে এ'র উচ্চতা কুড়ি ফিটেরও বেশী

অধিকাংশই বিজ্ঞানের কাছে সম্পূর্ণ নূতন। কিন্তু যা আবিষ্কার হয়েছে তা, যা আবিষ্কার হয়নি তার তুলনায় সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। তাই বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার আর অন্ত নেই। হয়ত তাঁদের এ আশা সফল হবে। কিন্তু যদি আবার প্রকৃতির আর এক অদ্ভুত খেয়ালে আজকের সমগ্র সৃষ্টি, তার সঙ্গে সঙ্গে এই বিজ্ঞান, এই দর্শন, এই কৃষ্টি, এই সভ্যতা সমস্তই মাটির তলায় আশ্রয় নেয়—আর এক কালের জীবরা যদি প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবজ চেয়েও শক্তিশালী আর আজকের মানুষের চেয়েও বুদ্ধি হ'য়ে জন্মগ্রহণ করে—তাহ'লে হয়ত তারা এই শতাব্দ একটি শ্রেষ্ঠ জীব ও তার কার্য্যকলাপের দিকে চেয়ে এক করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রবে।

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'

শ্রীকালিদাস রায়

তরী হ'তে অবতরি' চলিলেন বিশ্বেশ্বরী
ভবানন্দ-ভবনের পানে,
নৌকা বাঁধি বটতলে ঈশ্বরী-পাটনী চলে
পিছে পিছে সজল নয়ানে।

সূর্য্য বসিয়াছে পাটে লোক নাহি চলে বাটে
দূর গ্রামে বেজে উঠে শাঁখ,
দিনের আলোর বায়ে উড়ায়ে পাখার ঘায়ে
উড়ে যায় বলাকার ঝাঁক।

"ফিরে যা রে কেন মিছে আসিস রে পিছেপিছে ?"
জননী ফিরিয়া কন ডেকে—
"তোর তরী হতে নামি পারের কড়ি ত আমি
এসেছি সেঁউতি' পরে রেখে।"

ঈশ্বরী পাটনী কয় "দাও মাগো পরিচয়,
তুমি ত সামান্য মেয়ে নও,
হেরি কার শ্রীচরণ ধন্য হলো এ জীবন
জানিতে বাসনা, কও কও।"

দেবী কহিলেন হাসি' "গাঙ্গিনী তীরেই আসি
দিয়াছি ত নিজ পরিচয়,
বিশেষণে সবিশেষ বুঝায়ে বলেছি বেশ,
তাতে তোর দূর হলো ভয়।"

পাটনী কহিল, "তাতে বুঝেছি স্বামীর সাথে
কলহ করিয়া অভিমানে,
তুমি কুলীনের মেয়ে সতীনের দাগা পেয়ে
চলেছ মা আশ্রয় সন্ধানে।

বলনি ত আর কিছু, চলিয়াছি পিছু পিছু
কে মা তুমি জানিবারে চাই।
সাধনভজনহীন আমি এ পাটনী দীন,
নিজ ভাগ্যে প্রত্যয় না পাই।"

হাসিয়া জননী ক'ন "ডাকে মোরে ত্রিভুবন
জননী বলিয়া শোন তবে,
তুষ্ট আমি তো'র পর যাহা ইচ্ছা মাগ বর,
যা চাহিবি তাই তোর হবে।"

পাটনী চিনিয়া মায় অলক্ত রঞ্জিত পায়,
পড়িয়া কহিল যোড়হাতে,
যদি কৃপা হলো হেন আমার সন্তান যেন
চিরদিন থাকে দুধে ভাতে।

বক্রশীর্ণ অলি-পথ চলিয়াছে সর্পবৎ
দুই পাশে শ্যাম ধান্য ভার,
দাঁড়াইয়া তার মাঝে দেবী অন্নপূর্ণা রাজে
নেয়ে পড়ি পদতলে তাঁর।

জননী কহিল "নেয়ে এমন সুযোগ পেয়ে
এই শুধু করিলি প্রার্থনা,
এ-ত অতি তুচ্ছ কথা এরি তরে কাতরতা ?
আর কিছু নাহি কি কামনা ?

মুক্তি চাস্ মোক্ষ চাস্ চাস্ চির স্বর্গবাস,
শত পুত্র চাস্ যদি পাবি,
পরমায়ু বর্ষ শত রাজ্য ধনরত্ন যত,
কিবা চাস্ বল পুন ভাবি।"

জোড়হাতে নেয়ে কয় "মরিতে করিনা ভয়,
মোক্ষ মুক্তি ? কাজ নাই তাতে।
রাজ্যধন নেব কেন ? আমার সন্তান যেন
চিরদিন থাকে দুধে ভাতে।"

শঙ্করী তথাস্তু বলি অদৃশ্য হলেন ছলি
নেয়ে চায় অবাক নয়ানে,
স্বপ্নভঙ্গে চলে ধেয়ে হৃষ্টচিত্তে বর পেয়ে
আপনার কুটীরের পানে।

আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম

অধ্যাপক শ্রীমেঘনাদ সাহা ডি-এস-সি, এফ-আর-এস

"সবই ব্যাদে আছে।"

অনেক পাঠক আমি আমার প্রথম প্রবন্ধে "সবই ব্যাদে আছে" এইরূপ লিখায় একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন যে আমি 'বেদের' প্রতি অযথা অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু এই ধারণা ঠিক্ নয়। এই বাক্যটীর প্রয়োগ সম্বন্ধে একটু ব্যক্তিগত ইতিহাস আছে। প্রায় ১৮ বৎসর পূর্বেকার কথা, আমি তখন প্রথম বিলাত হইতে ফিরিয়াছি। বৈজ্ঞানিক জগতে তখন আমার সামান্য কিছু সুনাম হইছে। ঢাকা শহরনিবাসী (অর্থাত্ আমার স্বদেশবাসী) কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল আমি কি বৈজ্ঞানিক কাজ করিয়াছি জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি প্রথম জীবনের উৎসাহভরে তাঁহাকে আমার তদানীন্তন গবেষণা সম্বন্ধে (অর্থাত্ সূর্য ও নক্ষত্রাদির প্রাকৃতিক অবস্থা, যাহা Theory of Ionisation of Elements দিয়া সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়) সবিশেষ বর্ণনা দেই। তিনি দুই-এক মিনিট পর পরই বলিয়া উঠিতে লাগিলেন, "এ আর নূতন কি হইল, এ সমস্তই ব্যাদে আছে।" আমি দুই-একবার মৃদু আপত্তি করিবার পর বলিলাম, 'মহাশয়, এসব তত্ত্ব বেদের কোন্ অংশে আছে, অনুগ্রহপূর্বক দেখাইয়া দিবেন কি?' তিনি বলিলেন, "আমি ত কখনও 'ব্যাদ' পড়ি নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমরা নূতন বিজ্ঞানে যাহা করিয়াছ বলিয়া দাবী কর সমস্তই 'ব্যাদে' আছে।" অথচ এই ভদ্রলোক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য যে, বিগত কুড়ি বৎসরে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ এবং হিন্দু জ্যোতিষ ও অপরাপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আমি কোথাও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই যে, এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে বর্তমান বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে। সকল প্রাচীন সভ্যদেশের পণ্ডিতগণই বিশ্বজগতে পৃথিবীর স্থান, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহাদির গতি, রসায়ন বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান বিজ্ঞান গত তিনশত বৎসরের মধ্যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সমবেত গবেষণা, বিচারশক্তি ও অধ্যবসায় প্রসূত। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি, এদেশে অনেকে মনে করেন, ভাস্করাচার্য একাদশ শতাব্দীতে অতি অস্পষ্টভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন সুতরাং তিনি নিউটনের সমতুল্য। অর্থাত্ নিউটন আর নূতন কি করিয়াছে? কিন্তু এই সমস্ত "অল্পবিদ্যা-ভয়ঙ্করী" শ্রেণীর তার্কিকগণ ভুলিয়া যান যে, ভাস্করাচার্য্য কোথাও পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহসূর্যের চতুর্দিকে বৃত্তাভাস (elliptical) পথে ভ্রমণ করিতেছে একথা বলেন নাই। তিনি কোথায়ও প্রমাণ করেন নাই যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও গতিবিদ্যার নিয়ম প্রয়োগ করিলে পৃথিবীর ও অপরাপর গ্রহের ভ্রমণ কক্ষ নিরূপণ করা যায়। সুতরাং ভাস্করাচার্য বা কোন হিন্দু, গ্রীক বা আরবী পণ্ডিত কেপলার-গ্যালিলিও বা নিউটনের বহুপূর্বেই মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, এরূপ উক্তি করা পাগলের প্রলাপ বই কিছুই নয়। দুঃখের বিষয়, দেশে এইরূপ অপবিজ্ঞানপ্রচারকের অভাব নাই, তাঁহারা সত্যের নামে নির্জলা মিথ্যার প্রচার করিতেছেন মাত্র।

এই শ্রেণীর লোক যে এখনও বিরল নয় তাহার প্রমাণ সমালোচক অনিলবরণ রায়। তিনিও সবই ব্যাদে আছে এই পর্যায়ভুক্ত, তবে সম্ভবত তিনি 'বেদ' মূলে না হউক, অনুবাদে পড়িয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে সবই বেদে আছে এইরূপ অপজ্ঞান আরও জোর গলায় প্রচার করা সম্ভবপর হইয়াছে। আমি "সবই ব্যাদে আছে" এই উক্তিতে বেদের প্রতি কোনও রূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করি নাই। অনিলবরণ রায় মহাশয়ের মত মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আমার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছি মাত্র।

বেদে কি আছে?

এই ঘটনার সময়, অর্থাত্—আঠার বৎসর পূর্বে আমার বেদ পড়া ছিল না। বলা বাহুল্য, বেদ বলিতে এস্থানে আমি

ঋগ্বেদই বুঝিয়াছি। পরে ইংরেজী ও বাঙ্গলা অনুবাদে "ঋগ্বেদ-সংহিতা" পড়িয়াছি, কারণ মূল বৈদিক সংস্কৃতে পড়ার সাধ্য নাই। সমালোচক অনিলবরণ রায়ও বোধ হয় মূল 'বৈদিক সংস্কৃতে' বেদ পড়েন নাই, আর মূলে পড়িলেও তাহা বিশেষ কোন কাজে আসিবে না, কারণ ঋগ্বেদ পাণিনির সময়েই (খৃঃ-পূঃ ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে) দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সায়নাচার্য খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে উহার অর্থ বুঝিতে প্রয়াস পান (সায়নভাষ্য)। কিন্তু প্রধানত য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণই সম্পূর্ণ বেদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন এবং বিবিধ উপায়ে উহার দুর্বোধ্য অংশসমূহের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সত্ত্বেও অধিকাংশ স্থলে অর্থ সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাহার কারণ অনেক—একটী প্রধান কারণ * এই যে, বেদের বিভিন্ন অংশ অতি প্রাচীনকালে রচিত হয় এবং যে সময়ে যে দেশে অথবা যে সমস্ত অবস্থার মধ্যে যে শ্রেণীর লোক দিয়া রচিত হইয়াছিল, পরবর্তী যুগে লোকে তাহা সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানের back ground না থাকিলে প্রকৃত অর্থবোধ হওয়া দুঃসাধ্য এবং পরবর্তীদিগকে কষ্টকল্পনার সাহায্য লইতে হয়। প্রথম জানা দরকার, 'বেদ কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল?' বেদে অনেক জ্যোতিষিক ঘটনার উল্লেখ আছে। এই সমস্ত ঘটনার সময়নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নয়। অধ্যাপক জেকোবী, শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, বাল গঙ্গাধর তিলক, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ইত্যাদি দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণ এই সমস্ত জ্যোতিষিক উল্লেখের বিজ্ঞানসঙ্গত পর্যালোচনা করিয়া 'বেদের উপরোক্ত অংশের' সময়নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি বর্তমান লেখকের সমালোচকগণ, যাঁহারা এককালে গণিত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনর্থক বাগাড়ম্বর বিস্তার না করিয়া এই সমস্ত প্রবন্ধ পড়িলে নিজেদের মানসিক জড়তা (mental inertia) দূর করিতে পারিবেন। এই সমস্ত প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বেদোক্ত জ্যোতিষিক ঘটনাগুলির কোনটীকেই খ্রীষ্টীয় অব্দের চারি সহস্র বৎসর পূর্বে ফেলা যায় না। অনেকে মনে করেন যে, বাস্তবিক পক্ষে খৃঃ-পূঃ ২৫০০ অব্দ হইতে ৮০০ অব্দের মধ্যে বেদের বিভিন্ন অংশ সংকলিত বা রচিত হইয়াছিল, যেখানে ইহা হইতে প্রাচীনতর ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা 'শ্রুতি মাত্র'। যেমন বর্তমানে এদেশে প্রচলিত পঞ্জিকাতে অশ্বিনী নক্ষত্রকে নক্ষত্রপুঞ্জের আদি ধরা হয়। ইহা বর্তমানে শ্রুতি মাত্র, কারণ বাস্তবিক পক্ষে অশ্বিনী নক্ষত্র আদি নক্ষত্র ছিল খৃঃ ৫০৫ অব্দে, ১৯৩৯ অব্দে নয়। বর্তমান পঞ্জিকাকারগণ 'মানসিক জড়তা' বশত ১৪৩৪ বৎসর পূর্বের জ্যোতিষিক ঘটনাকে বর্তমানকালীয় বলিয়া প্রচার করিতেছেন। বেদের প্রাচীনতম অংশও অনেক সুবিজ্ঞ লেখকের মতে বাস্তবিক সংকলন কালের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বের ঘটনার শ্রুতি মাত্র বহন করিতেছে। যাহা হউক, বেদের প্রাচীনতম অংশকেও খৃঃ অব্দের ২৫০০ বৎসর পূর্বে ফেলিতে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণেরও বিশেষ আপত্তি নাই।

সুতরাং পৌরাণিক সত্যযুগের কথা 'যাহা ১৭,২৮,০০০ বৎসর স্থায়ী এবং বর্তমান সময়ের ২১,৬৫,০৪০ বৎসর পূর্বে শেষ হইয়াছিল' বলিয়া প্রচার করা হয়, তাহা সম্পূর্ণ অলীক ও ভ্রান্ত।

খৃঃ-পূঃ ২৫০০ অব্দে পৃথিবীতে নানা স্থানে অনেক বড় বড় সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছিল। মিশরীয় সভ্যতাকে খৃঃ-পূঃ ৪২০০ অব্দ পর্যান্ত টানিয়া আনা যায়। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২৭০০ অব্দে মিশরে পিরামিড্ ইত্যাদি নির্মিত হইয়াছিল। খৃঃ-পূঃ ২৬০০ অব্দে ইরাক্ দেশে সুমেরীয় জাতি সভ্যতার উচ্চ শীর্ষে আরূঢ় ছিল। সম্ভবত খৃঃ-পূঃ ১৯০০ অব্দে প্রাচীন সভ্য জগতের কেন্দ্রস্বরূপ বেবিলোন নগরী ইরাকের রাজধানীত্ব লাভ করে। নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগে স্থির হইয়াছে যে, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে যে প্রাগ্বৈদিক্ ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে খৃঃ-পূঃ ২৫০০ অব্দের দুই-এক শতাব্দীর এদিকে বা ওদিকে টানিয়া আনা যায়।

এখন জিজ্ঞাস্য যে, 'বৈদিক সভ্যতা' এই সময়ে কোন্ দেশে প্রচলিত ছিল এবং প্রাচীন মিশরীয়, সুমেরীয় ও প্রাগ্বৈদিক ভারতীয় সভ্যতার সহিত উহার কোন আদান প্রদান ছিল কিনা?—বৈদিক সভ্যতার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৪৫০ পূঃ-খৃঃ অব্দের মিটানীয় রাজাদের

---

* একথা বলিয়া দিতে হইবে না যে লেখক বেদকে মনুষ্যপ্রণীত মনে করেন। যাঁহারা বেদকে 'অপৌরুষেয়' মনে করেন, তাঁহাদের জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত নয়।

উৎকীর্ণ লিপিতে। এই রাজগণ আধুনিক মোসাল্ (Mosul) নগরীর উত্তর পশ্চিম অংশে বাস করিতেন এবং তাঁহারা যেরূপ সম্ভ্রমের সহিত মিসরীয় ও বাবিলোনীয় সভ্যতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে ধারণা হয় যে নিজেদের সভ্যতাকে উক্ত দুই সভ্যতার সমপর্যায়ভুক্ত মনে করিতেন না। আর একটী প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যদিও প্রাচীন মিটানীয়গণ, ইরানিয়ান্ অর্থাত্ পারস্য দেশবাসী আর্যগণ ও ভারতীয় বৈদিক আর্যগণ—সকলে প্রায় এক ভাষাভাষী ছিলেন, কিন্তু এতাবত কাল পর্যন্ত তাঁহাদের নিজস্ব কোন লিপি ছিল বলিয়া কোনও অবিসম্বাদিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বরঞ্চ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পরবর্তী কালের তুর্কীদের বা মধ্যএশিয়াবাসীদের মত তাঁহারা যখন যে-দেশে গিয়াছেন সেই দেশের লিপিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেমন পারস্যের এথিমিনীয় বংশীয় রাজগণ, বিশেষত ডেরিয়াস (দরায়াবুস্) ও তাঁহার পরবর্তী সম্রাটগণ ৫০০ পূঃ-খৃঃ অব্দে তাঁহাদের অনুশাসন পর্বত-গাত্রে উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন, এই অনুশাসনের ভাষা প্রায় বৈদিক ভাষা, কিন্তু লিপি প্রাচীন বেবিলোন প্রচলিত কীলক-লিপি এবং সাম্রাজ্যের অংশবিশেষে বিশেষত সীরিয়া দেশ প্রচলিত Aramaic লিপি। ১৪৫০ পূঃ-খৃঃ অব্দে মিটানীয়গণ তাহাদের অনুশাসনে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, নাসত্যাদি বৈদিক দেবতার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখানেও বেবিলোন প্রচলিত কীলক (Cuneform) লিপি ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতীয় আর্যগণ ৫০০ খৃঃ-পূঃ অব্দের পূর্বে কি লিপিতে লিখিতেন এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ২৫০ খৃঃ-পূঃ অব্দের অশোক রাজার অনুশাসন সমস্তই ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা, হয়ত এই লিপির উৎপত্তি ইহার অনেক পূর্বেই হইয়াছিল। কি করিয়া এই লিপির উৎপত্তি হইল এখনও তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় নাই।

এই সমস্ত ঘটনা হইতে বোধ হয় ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না যে, প্রাচীন আর্যগণের কোন নিজস্ব বিশিষ্ট লিপি ছিল না; তাঁহারা বিজেতা হিসাবে যে দেশে গিয়াছেন, সেই দেশের লিপিই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিজস্ব কোন লিপি (script) থাকিলে তাঁহারা কখনও বিদেশীয় লিপিতে নিজেদের ভাষা উৎকীর্ণ করিতেন না। ইংরেজ ভারতবর্ষে বা চীনে আসিয়া কি নিজেদের লিপি পরিবর্জন করিয়াছে? মধ্যযুগের আরবগণ অনেক সুসভ্য দেশ নিজেদের অধিকারে আনে, কিন্তু সর্বত্রই অধিবাসীদিগকে আরবীলিপি গ্রহণে বাধ্য করিয়াছেন। কিন্তু মধ্য এশিয়ার তুর্কী বা হুন বর্বরেরা বিজেতা হইয়াও চীনে চীন-লিপি, পারস্যে ফার্সীলিপি এবং রুশিয়াতে Cyrillic লিপি গ্রহণ করিয়াছিল, কারণ তাহাদের নিজেদের কোন লিপি ছিল না।

সুতরাং আশা করি, সমালোচকগণ স্বীকার করিবেন যে, ঋগ্বেদ সংহিতা খৃঃ-পূঃ ২৫০০ অব্দ হইতে রচিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ইহা যেরূপ সমাজের বা সভ্যতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, সেই সমাজ ও সভ্যতা হইতে উন্নততর সমাজ ও সভ্যতা পৃথিবীর অন্যান্য অংশে (ইজিপ্ট, ইরাক) এবং সম্ভবত এই ভারতবর্ষেও বর্তমান ছিল। ঋগ্বেদের নদনদাদির উল্লেখের পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে বর্তমান পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমাংশ ও বর্তমান আফগানিস্তানের পূর্বাংশ প্রাচীনতম আর্যগণের বাসভূমি ছিল এবং তাঁহারা প্রায়ই সভ্যতর সিন্ধুনদবাসীদিগকে উৎপীড়ন করিতেন।

ঋগ্বেদ সংহিতায় সমসাময়িক সুমেরীয় বা মিশরীয় সভ্যতার কোন উল্লেখ আছে কি? এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ এখনও আবিষ্কার হয় নাই বটে, কিন্তু পরলোকগত লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধে দেখান যে, অথর্ববেদের কতকগুলি দুর্বোধ্য শব্দ ও শ্লোক, যাহাদের কোনওরূপ সুস্পষ্ট অর্থ করা কখনও সম্ভবপর হয় নাই, সম্পূর্ণ স্পষ্ট হইয়া যায়—যদি ধরা যায় যে ঐ সমস্ত শব্দ বেবিলোন দেশে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী হইতে গৃহীত হইয়াছে। যদি ধরিয়া যাওয়া যায় যে অথর্ব বেদ ১৫০০—১৬০০ খৃঃ-পূঃ অব্দে রচিত হইয়াছিল, তাহা হইলে তিলকের প্রবন্ধ হইতে প্রমাণ হয় যে এই সময়ে ভারত ও বেবিলোনের ভিতর যোগাযোগ ছিল। হয়ত ঋগ্বেদের অনেক দুরূহ অংশেরও এইভাবে মীমাংসা হইতে পারে।

ঋগ্বেদ নানা পরিবারস্থ বা গোত্রভুক্ত ঋষিগণ কর্তৃক সূর্য বা সবিতা, চন্দ্র বা সোম ইত্যাদি প্রাকৃতিক দেবতা এবং ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ইত্যাদি দেবতার উদ্দেশে রচিত স্তোত্রাবলীর সমষ্টি মাত্র। অনেকের মতে মিত্র, বরুণ, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতাও সূর্যেরই প্রতীক মাত্র। কিন্তু গ্রহনক্ষত্রাদি ও

প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতারূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাদের স্তবস্তুতি করা বৈদিক আর্যদের মৌলিক আবিষ্কার বা একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল না। বৈদিক সভ্যতার সমসাময়িক মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতাতে এবং প্রায়শ সর্বত্রই প্রাচীন সভ্যতার স্তরবিশেষে সর্বজাতির মধ্যে এই মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরীয়গণ সূর্য বা 'রা' দেবতাকে প্রধান দেবতা ও সৃষ্টিকর্তা বলিয়া মনে করিতেন। Sirius তারকা বা লুব্ধক নক্ষত্র, যাহা আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠস্থানীয়, তাহাকে তাঁহারা তাহাদের Isis দেবীর প্রতীক মনে করিতেন। প্রাচীন সুমেরীয়গণের অধিকাংশ দেবতাই ছিল গ্রহনক্ষত্রাদিমূলক। যেমন—

An or Anu আকাশ বা দ্যৌ; Shamash বা Babbar—সূর্য, ন্যায় ও আইনের দেবতা; Sin বা Nannar—চন্দ্র; Istar—সৌন্দর্যের ও প্রেমের দেবী, Venus বা শুক্র গ্রহকে ইহার প্রতীক মনে করা হইত; Marduk দেবতাদের রাজা, ইনি ছিলেন বৃহস্পতি বা Jupiter গ্রহ; Nabu দেবতাদের লেখক, ইনি আমাদের Saturn বা শনিগ্রহ; Nergal যুদ্ধের দেবতা, আমাদের Mars বা মঙ্গলগ্রহ। এই সমস্ত দেবতা এবং অন্যান্য সমুদ্র, নদী বা পর্বতাত্মক দেবতাদি সম্বন্ধে প্রাচীন সুমেরীয় কবি বা ঋষিগণ যে সমস্ত স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ বর্তমান সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং British Museum-এর সুমেরীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ ডক্টর গ্যাড্ কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইজিপ্টীয় দেবতাদের উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্রাবলীও Egyptian Book of the Dead নামক গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান্ প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক ব্রেস্টড্ তাঁহার Dawn of Conscience in the World এই গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় বাইবেল্ এ যে সমস্ত আধ্যাত্মিকতার বাণীকে যীশু খৃষ্টের মুখনিসৃত বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহার অধিকাংশই ভাবত নয়, এমন কি, অক্ষরতও প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় ও মিশরীয় শাস্ত্রাদি হইতে ধার করা। অর্থাত্ বাস্তবিকপক্ষে ৪০০০ পূঃ-খৃঃ অব্দ হইতে ৬০০ খৃঃ-পূঃ অব্দ পর্যন্ত দুইটী সুপ্রাচীন সভ্যজাতি তাঁহাদের বহু সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে যে সমস্ত আধ্যাত্মিকতার তত্ত্ব (Altruistic Philosophy) আবিষ্কার করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাহাই খৃষ্টীয় ধর্মের 'আধ্যাত্মিকতা'র ভিত্তি গঠন করিয়াছে। কিন্তু খৃষ্ট ধর্মে এবং আরও অপরাপর ধর্মে গ্রহনক্ষত্র ও নদী-পর্বতাত্মক 'দেবতাসমূহ' নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। পরবর্তী দুই সহস্র বৎসরের ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে, আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি গঠনের জন্য বহুদেবতার উপাসনার কোন প্রয়োজন নাই।

বেদ ও বেদ-পরবর্তী শাস্ত্রাদি পর্যালোচনা করিলেও একবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। মহেঞ্জোদারোর সময় (খৃঃ-পূঃ ২৫০০ অব্দ) এবং অশোকের সময়ের (খৃঃ-পূঃ ৩০০ অব্দ) মধ্যবর্তী যুগের ইতিহাস লিখিবার উপাদান এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার সমস্ত মূলসূত্র আবিষ্কৃত ও গঠিত হয়। বৈদিক সভ্যতা ও প্রাগ্বৈদিক ভারতীয় সভ্যতার দুইটী বা তিনটী বিভিন্ন ধারার সঙ্গমের ফলেই ভারতীয় ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতা গঠিত হয়, পরবর্তী যুগের (অর্থাত খৃঃ-পূঃ ৩০০ অব্দের পরবর্তীকালের) লিখিত মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ ইত্যাদিতে এই ২২০০ বৎসরের ঘটনাবলীর অস্পষ্ট শ্রুতিমাত্র পাওয়া যায়। বৈদিক আর্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন নিশ্চয়ই ঘটা করিয়া যাগযজ্ঞাদি করিতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে (আনুমানিক বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতেই) বৈদিক যাগযজ্ঞের কার্যকারিতা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ওঠে। উপনিষদে এই সন্দিগ্ধ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; উপনিষদের 'আধ্যাত্মিকতা' ব্রহ্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, উহাতে বৈদিক দেবতাদি পরিত্যক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈনগণ 'বেদকে' সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের ধর্মমত গঠন করেন। কিন্তু যে সমস্ত শাস্ত্র বা দর্শন খাঁটি সনাতনী বলিয়া প্রচলিত, মূলত তাহাদের অনেকাংশই বেদ-বিরোধী। যেমন ধরা যাউক্ সাংখ্যদর্শন; ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "বেদের অবজ্ঞা সাংখ্যে কোথাও নাই, বরং বৈদিকতার আড়ম্বর অনেক। কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনকার বেদের দোহাই দিয়া শেষে বেদের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন।"

বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ হিন্দুশাস্ত্রের সমস্ত মত বঙ্কিমচন্দ্র বিবিধপ্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক পড়িয়া দেখিতে পারেন। এই সমস্ত 'মত'

অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বেদ অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত এই মত অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে অর্থাত পুরাণাদি রচনার সময় প্রচলিত হইয়াছে। প্রাচীনকালের শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত ও অস্পষ্ট মত প্রচলিত আছে, কিন্তু কোন মতই বেদকে "অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত" প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে নাই।

একটা কথা উঠিতে পারে, বেদের এতটা প্রতিপত্তির কারণ কি? যাঁহারা বেদমতবিরোধী তাঁহারাও বেদের দোহাই দেন কেন? একথার উত্তর আর একটী ধর্ম হইতে দেওয়া যাইতে পারে। তাহা হইতেছে ইসলামধর্ম—যাহা কোরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। হজরত মোহম্মদ 'ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ' শুনিয়া যাহা বলিয়া যাইতেন তাঁহার শিষ্যগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিতেন, এই সংগ্রহই হইল কোরাণ! কিন্তু হজরত মোহম্মদের মৃত্যুর কুড়ি বৎসরের মধ্যেই নানা কারণে বিশাল ইস্‌লাম জগতের বিভিন্ন অংশে কোরাণের নানারূপ পাঠ ও অনুলিপি প্রচলিত হয়। তখন খলিফা বা ইস্‌লাম জগতের অধিনায়ক ছিলেন ওস্‌মান। খলিফা ওস্‌মান দেখিলেন যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের কোরাণের প্রচলন হইতে থাকিলে শীঘ্রই ইসলাম ধর্মে অনৈক্য দেখা দিবে, ইস্‌লাম-জগৎ শতধা বিভক্ত হইবে। ইহার প্রতীকার-কল্পে তিনি এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি তৎকালে হজরত মোহম্মদের যে সমস্ত শিষ্য ও কর্মসঙ্গী জীবিত ছিলেন তাঁহাদিগের একটী বৃহতী সভা আহ্বান করিলেন এবং বিভিন্ন দেশে প্রচলিত কোরাণের রচনাবলী বাস্তবিকই হজরতের মুখনিসৃত কি-না তদ্বিষয়ে তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বহু দিন এইরূপ পরীক্ষার পর যে সমস্ত রচনা প্রকৃতপক্ষে হজরতের মুখনিসৃত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, সেই সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকৃত 'কোরাণের' পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করিলেন এবং নিয়ম বাঁধিয়া দিলেন যে, যদি ভবিষ্যতে কোরাণের কোনও অনুলিপিতে কিছুমাত্র ভুল থাকে, তাহা অশুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। এই কড়া নিয়মের জন্য বিগত চতুর্দশ শতাব্দী ধরিয়া বিশাল ইস্‌লাম-জগতের কোথাও কোরাণের পাঠ পরিবর্তন সম্ভবপর হয় নাই। ইস্‌লাম-জগতে সর্বত্রই কোরাণ এক!

কিন্তু এইরূপ কড়াকড়ি সত্বেও ইস্‌লামধর্মে নানারূপ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। অধ্যাপক তারাচাঁদের মতে বর্তমানে ইসলামে ৭২টী বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। সকল সম্প্রদায়ই বাহ্যত কোরাণকে অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় (অর্থাত্ হজরত মোহম্মদের মুখনিসৃত ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ) বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস আচার ব্যবহারে অনেক সময় আকাশ-পাতাল তফাৎ, গোঁড়া মুসলমানদের মতে কোরাণসঙ্গত' নয়। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর যুক্তিবাদী মোতাজীল সম্প্রদায় হইতে (যাঁহারা বাস্তবিকপক্ষে সক্রেটিস, প্লেটো, আরিস্টট্‌ল্ প্রভৃতি প্রাচীন যুক্তিবাদী গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদে বিশ্বাসবান ছিলেন্) আগা খানী সম্প্রদায় পর্য্যন্ত (যাঁহারা অবতার, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি ভারতবর্ষীয় মতে বিশ্বাসবান্) সমস্ত পর্য্যায়ের ধর্মবিশ্বাসীই আছেন। তাহার কারণ, ইস্‌লামধর্ম অতি অল্পকাল মধ্যেই সীরিয়া, পারস্য, ইরাক্, মধ্য এশিয়া ইত্যাদি নানাদেশে প্রচারিত হয় এবং এই সমস্ত দেশের অধিবাসীগণ ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেও বাস্তবিক স্বদেশপ্রচলিত ধর্মবিশ্বাস একেবারে ছাড়িতে পারে নাই। অনেকস্থলে প্রাচীন গ্রীক ও ভারতীয় ধর্মদর্শনতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও ইস্‌লামীয় ধর্মমতে শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারেন নাই। কিন্তু রাজশক্তি ইস্‌লামধর্মাবলম্বী, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কথা বলিবার মত সাহসও তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং বাহ্যত কোরাণের দোহাই দিয়া, তাঁহারা বাস্তবিক পক্ষে গোঁড়া মুসলমানদের মতে কোরাণবিরুদ্ধ ধর্মমত পোষণ করেন।

'বেদের অভ্রান্ততার' সম্বন্ধেও এই বক্তব্য চলে। বৈদিক আর্যগণ যখন ২৫০০ খৃঃ-পূঃ অব্দের কিছু পূর্বে বা পরে উত্তর-ভারতের সর্বত্র নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন, তখন তাহাদের নেতা পুরোহিত (ঋষি) ও রাজগণ খুব আড়ম্বর করিয়া যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। এই যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে তাঁহারা তাঁহাদের উপাস্য দেবদেবীর উদ্দেশ্যে স্তোত্র গান করিতেন এবং পশু বলি প্রদান করিতেন। পাণিনির পূর্বেই এই সমস্ত স্তোত্রাদি সংকলিত, গণিত ও মণ্ডলাদিতে বিভক্ত হয়। কিন্তু উপনিষদের যুগ হইতেই চিন্তাশীল ঋষিগণ বৈদিক যাগযজ্ঞের আধ্যাত্মিকতা

সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত হইতে থাকেন। এদিকে প্রাগ্বৈদিক ভারতীয় সভ্যতায় যে সমস্ত লোকের ধর্মবিশ্বাস ছিল (সম্ভবত পাশুপতধর্ম বা নারায়ণীয় ধর্ম) তাহারাও ক্রমে অন্য-প্রকারে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে চেষ্টা করিতে থাকে। দেশের রাজশক্তি ও পুরোহিতশক্তি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে প্রগাঢ় বিশ্বাসবান্, সুতরাং তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নিজেদের মতবাদ প্রচার করার সাহস প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসীদের ছিল না, সুতরাং তাঁহারা বেদের অস্পষ্ট সূক্তাদির দোহাই দিয়া নিজেদের ধর্মমতাদির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। এইজন্য প্রাগ্বৈদিক 'শিব পশুপতি' বেদের অমঙ্গলের দেবতা রুদ্রের সহিত এক হইয়া গেলেন এবং 'বেদের' সৌরদেবতা বিষ্ণুর সহিত নারায়ণীয় ধর্মের নারায়ণের একত্ব সম্পাদনের প্রয়াস হইল। পাশুপত ও নারায়ণীয় মতাবলম্বীগণ এইরূপে বেদের দোহাই দিয়া অবৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বা ধর্মবিশ্বাসকে 'জাতে' উঠাইয়া লইলেন, যদিও অনেকস্থলে গোঁড়া বেদবিশ্বাসীগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; কিন্তু জৈন বা বৌদ্ধেরা ঐ পথে মোটেই গেলেন না, তাঁহারা সরাসরিভাবে বেদের অভ্রান্ততা অস্বীকার করিলেন এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডকে নিরর্থক বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

বর্তমান লেখক বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে হিন্দুর বেদ ও অপরাপর ধর্মের মূলতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে অবজ্ঞা বা অবহেলার কোন কথা উঠিতে পারে না। তাঁহার বিশ্বাস যে, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহ যে সমস্ত জাগতিক তথ্য (world-phenomena), ঐতিহাসিক জ্ঞান ও মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের উপর বর্তমান যুগের উপযোগী "আধ্যাত্মিকতা" প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কিরূপে 'বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির' ভিত্তিতে নবযুগের উপযোগী 'আধ্যাত্মিকতা'র প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, প্রবন্ধান্তরে তাহার সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

স্বপ্নো নু মায়া নু

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

কি মোহে কি দিয়ে মোরে বেঁধেছ এমন—
সমান হ'ল যে চোখে নিদ-জাগরণ!
দিবস রজনী যেন ও-মুখে চাহি'
আবেশে চলেছি শুধু জীবন বাহি'!

স্বপন দেখেছি কাল রাতের শেষে—
সহসা কোথায় যেন্ কোন্ বিদেশে,
একেলা ফিরিতেছিনু উদাস মনে,
রাজার প্রাচীর-ঘেরা চাঁপার বনে!

প্রভাতী বাতাস আসি' দুলায়ে শাখা
মাতায়ে তুলিল দিক্ সুরভি-মাখা;
পাপিয়া উঠিল জাগি' গলাটি খুলি',
গগন চাহিল পূবে নয়ন তুলি'!

দু'পাশে চাঁপার চারা হাতের কাছে
সাজায়ে ফুলের তোড়া দাঁড়ায়ে আছে!
সোনার বরণ কচি কলিকাগুলি
আদরে ডাকিছে যেন আঙুল তুলি'!

চকিতে মেলিয়া বাহু আবেশে আকুল,
ত্বরিতে লইনু তুলি' একটি মুকুল;
সমুখে পড়িতে আঁখি, সহসা চেয়ে—
দেখিনু অদূরে আসে রাজার মেয়ে!

কাঁপিয়া উঠিল দেহ ভয়ে ভরি' মন,
চলিতে চাহিনু, তবু চলেনা চরণ!
চাঁপারই লতাটি ধীরে এগিয়ে এসে
আমারই সমুখে দেখি—দাঁড়া'ল শেষে

কেমন সে রূপ—চোখ দেখিনি চেয়ে,
কাঁপিল হৃদয়—সে যে রাজার মেয়ে!
ফুলটি স'পিনু তবু চরণ চুমি'—
মুখ তুলে' দেখি—একি! হেথাও তুমি!

অহিংসা এণ্ড্ কম্প্যানি

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

গজানন আগে মাংস বড়ই ভালবাসিত। দুই বেলায় অন্তত নাকি একসের মাংস নহিলে তাহার কোন দিনই চলিত না। তবে মাংস সম্বন্ধে তাহার উদারতার সীমা ছিল না। মাংস হইলেই যথেষ্ট—কিসের মাংস সে সম্বন্ধে গজানন কোন দিন মাথা ঘামাইত না। লোকে তাহার মাংসলোলুপতার দোষ দিলে সে মোটেই দমিত না; উপরন্তু জোর গলায় বলিত যে মাংসবর্জ্জনের ফলেই এ দেশ স্বাধীনতা হারাইয়াছে ও ক্রমশ নির্জ্জীব হইয়া পড়িতেছে। গজানন ক্রমশ বিখ্যাত বক্তা ও দেশপ্রেমিক হইয়া উঠিল এবং উচ্চকণ্ঠে সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, মাংসই ভারতবাসীর একমাত্র কাম্য ও ভোজ্য হওয়া চাই। এই এক মাংসভক্ষণ হইতেই তাহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সবগুলাই একসঙ্গে মিলিবে। যে দিন হইতে ভারতবাসীর মাংস খাওয়ার অভ্যাস শিথিল হইয়াছে, সেই দিন হইতে তাহারা অধীনতার শৃঙ্খল পরিতে সুরু করিয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মের উপর সে জাতক্রোধ। তাহার মতে বৈষ্ণবদের কাটিয়া ফেলিলেও দোষ নাই; তাহাতে আর কিছুনা হউক্ মাংসভোজনের পথের কণ্টক দূর হইবে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুত্থান না হইলে ইংরেজ ভারতবর্ষ জয় করিতে পারিত না এবং মুসলমানেরাও বেশী দিন ভারতবাসীদের দাবাইয়া রাখিতে পারিত না।

এ হেন গজাননের হঠাৎ ব্লাড্ প্রেসার বাড়িয়া গেল এবং হু হু করিয়া ক্রমাগত বাড়িতেই লাগিল। গজানন তখন রীতিমত দেশপ্রেমিক। বিনা ফিয়ে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ডাক্তারেরা আসিয়া গজাননকে পরীক্ষা করিতে লাগিল এবং প্রতিদিন নিয়মিতভাবে তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বুলেটিন বাহির হইতে লাগিল। অবশেষে ডাক্তাররা একমত হইয়া ব্যবস্থা দিলেন যে, গজাননকে মাংস-মৎস্য এবং এমন কি নিরীহ ডিম্ব পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে।

মৎস্যকে জলবাস পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলে তাহার যে দুঃখ বা অসুবিধা হয় গজাননের দুঃখ বা অসুবিধা তাহার চেয়ে কোন অংশে কম হয় নাই। গজানন—যে গজানন মাংসগতপ্রাণ—মাংস-সর্ব্বস্ব, এক খণ্ড মাংস কম হইলে যে ক্রোধে দিশাহারা হইত, দৈবাৎ একদিন আহারের সময় মাংস না পাইলে যে দুটি চক্ষে অন্ধকার দেখিত, সেই গজানন আর মাংস খাইতে পাইবে না! কিন্তু গজানন দেশপ্রেমিক। দেশের জন্য তাহাকে বাঁচিতেই হইবে। কাজেই গজাননকে মাংস ছাড়িতে হইল।

ক্রমে গজানন দেখিল, স্বদেশী করিয়া আর কোন লাভ নাই। শুধু লাভ নাই নহে, অলাভ যথেষ্ট। সুতরাং স্বদেশী করা অসহ্য। কারণ, সে মাংস খাইবে না, কিন্তু তাহার সহকর্ম্মীরা দিনরাত্রি মাংসের শ্রাদ্ধ করিবে। রুধিরলিপ্ত জবাকুসুমসংকাশ বলদৃপ্ত মাংসের সেই মনোহর মূর্ত্তি সে নিত্য দেখিবে। রাঁধা মাংসের মুনিমনলোভা গন্ধ তাহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া তাহার উপবাসী চিত্তকে নিত্য পাগল করিবে—আর সে গরু ও ছাগলের খাদ্য চিবাইয়া ও গিলিয়া বাঁচিয়া থাকিবে! ধিক্ তাহার জীবনে এবং ততোধিক ধিক্ তাহার দেশসেবায়!

জীবন—বিশেষত দেশসেবকের জীবন—তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে যাহা আদৌ খাইবে না, অপরে তাহা চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় করিয়া খাইবে! অতএব গজানন দেশসেবা ছাড়িয়া দিল এবং ধর্ম্ম ও সমাজ লইয়া পড়িল। অচিরে সে একজন বিখ্যাত সমাজসংস্কারক হইয়া পড়িল।

(২)

মহাবীর দগ্ধমুখ হইলে সান্ত্বনার জন্য সীতা দেবী তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে মহাবীর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে তাঁহার স্বজাতির সকলেই যেন দগ্ধমুখ হন—যাহাতে কেহই তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে না পারে। মাংসবর্জ্জনে বাধ্য হইয়া গজাননের প্রাণান্ত চেষ্টা হইল যাহাতে ভারত হইতে—অন্তত বাংলাদেশ হইতে মাংসভোজন উঠিয়া যায়। যে মধুর খাদ্য হইতে সে বঞ্চিত হইয়াছে, আর কেহ যেন সে খাদ্য খাইতে না পায়। জগাই-মাধাই রাতারাতি পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠিল।

গজানন কলিকাতা হইতে সামান্য দূরে ঢাকুরিয়ায় এক

আশ্রম স্থাপিত করিল। শিষ্য এবং শিষ্যা জুটিতে বিলম্ব হইল না। একটু সুবিধা করিয়া লইয়াই গজানন আগাইয়া আসিয়া 'রক্ষাকালীস্থানে' একটি শাখা আশ্রম খুলিয়া দিল। আশ্রমের প্রতিষ্ঠা ইহাতে আরও বাড়িয়া গেল। চারিদিক হইতে শিষ্য ও শিষ্যার দল ক্রমশঃ ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

নূতন কোন সত্য বা তথ্যের সন্ধান পাইবার পূর্ব্বে গজানন খুব বেশী ঘুমাইত। শয়নগৃহ তো দূরের কথা, শয্যা পর্য্যন্ত সে ত্যাগ করিত না। যে যৎসামান্য আহারের প্রয়োজন তাহা শিষ্যদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে শয্যার উপরেই সম্পন্ন করিতে হইত। বাথরুম ঠিক শয়নকক্ষের সহিত সংলগ্ন ছিল; কিন্তু সেখানে তাহাকে কেহ যাইতে দেখে নাই। সুতরাং আমরা ঠিক বলিতে পারিব না, সেই অবশ্য-প্রয়োজনীয় স্থানে যাইবার তাহার কোন প্রয়োজন হইত কি-না। রক্ষাকালীস্থানে আসিবার পর হইতেই গজাননের নিদ্রালুতা ভয়ঙ্করভাবে বাড়িয়া গেল। শিষ্যগণ তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইল, বেদাদির মত নূতন একটা কিছু গুরুদেবের মনোমাঝে উঁকি মারিতেছে। এসবের পূর্ব্বে যেমন বেদনা, অপূর্ব্ব জ্ঞানোন্মেষের পূর্ব্বে তেমনি গুরুদেবের নিদ্রা। তাহারা হর্ষ, বিষাদ ও উদ্বেগে দিন কাটাইতে লাগিল।

চতুর্থ দিনে গজাননের ঘুমঘোর কাটিল। প্রেমানন্দ ও বৃন্দার তৎক্ষণাৎ ডাক পড়িল। দুজনে স্বামি-স্ত্রী—গুরুগত-প্রাণ। প্রেমানন্দ সকলই গুরুপদে সমর্পণ করিয়াছে, কেবল দেহটা—তাও কালো এবং রুক্ষ বলিয়া নিজের জন্য পৃথক রাখিয়াছে।

কক্ষে উভয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিল গুরুদেবের চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ, মুখে ভ্রুকুটি। প্রণাম করিয়া দুজনে করযোড়ে বসিতে গজানন কহিল, বৃন্দা, পারবে?

প্রেমানন্দ আগেই কহিল, নিশ্চয়ই পারব গুরুদেব। কি আদেশ করুন।

বৃন্দাও ঐ কথা কহিল, কিন্তু চোখে। বৃন্দা মুখের চেয়ে চোখেই বেশী কথা কহিয়া থাকে।

গজানন বলিল, রক্তস্রোত দেখেছ বৃন্দা? কাতরদৃষ্টি লক্ষ্য করেছ প্রেম?

প্রেমকে আহ্বান করিতে সে প্রায় গলিয়া গেল। পুরাপুরি না বুঝিলেও কাল বিলম্ব না করিয়া উত্তর দিল, খুব লক্ষ্য করেছি, প্রভু। কি বল বৃন্দা?

বৃন্দা মুখে কিছু বলিল না। সুধু ক্ষণেকের জন্য শিহরিয়া উঠিয়া দুই হাতে দুটি চক্ষু ঢাকিল এবং হস্ত প্রসারিত করিয়া গুরুদেবের পাদপদ্ম স্পর্শ করিল। ভাবটা—আমার দেখাশোনা সব তোমারই চরণে দিয়াছি।

ব্যাপারটা আর একটু স্থূলভাবে বলা প্রয়োজন ভাবিয়া গজানন বলিল, মায়ের মন্দির ঐ রক্তস্রোতে কলুষিত। ঐ রক্ত বন্ধ করা চাই। পারবে? 'না' বললে চলবে না। পারতে হবেই। দুজনে যাও, সবাইকে আমার বাণী বল। কাল থেকে কাজ আরম্ভ করা চাই। প্রেম, তুমি আগে যাও। আশ্রমের সকলকে এই কথা বলগে।

প্রেম উঠিয়া গেল।

বৃন্দা বসিয়া রহিল। গুরু তাহাকে আরও গুহ্য কথা বুঝাইয়া দিল।

বৃন্দা চতুরা। চট করিয়া সব কথা বুঝিয়া ফেলিল।

এক সম্প্রদায় লোক আছে যাহাদের বিশ্বাস যে নারীর বুদ্ধি যখন তীক্ষ্ণ হইয়া ওঠে তখন সেই বুদ্ধি পুরুষের ক্ষুরধার বুদ্ধিকেও ম্লান করিয়া দেয়। কেহ কেহ এমন সন্দেহও করিয়া থাকে যে, যেহেতু ভগবান নারীকে অবলা করিয়াছেন সেই হেতু তিনি হয়ত ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ তাহাদের মগজে একটু বেশী বুদ্ধি দিয়া ফেলিয়া থাকিবেন। গজানন্দের অভিজ্ঞতা হইয়াছিল প্রচুর। বোধ করি সেই জন্যই তাহার বৃন্দার বুদ্ধির উপর অধিকতর আস্থা ছিল।

বৃন্দা তাহার কার্য্য সাফল্যের দ্বারা সহজেই প্রমাণ করিয়াছিল যে এই আস্থা বা শ্রদ্ধা অপাত্রে অর্পিত হয় নাই।

(৩)

পরদিন সারা কলিকাতা শহরে ও পার্শ্ববর্ত্তী শহরতলীতে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। তাহার চেয়েও বেশী আন্দোলন পড়িয়া গেল সংবাদপত্রের কল্যাণে—দূর দূরান্তরে। সকলেই জানিল, স্বামী গজানন্দ ছাগকুলের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। মন্দিরের পূজারীরা কাতর হইয়া উঠিল; অধিকারীরা সন্ত্রস্ত হইল। গজানন্দের শিষ্য-সম্প্রদায় ভীষণ চিন্তায় পড়িল, কি করিয়া এই রক্তস্রোত বন্ধ করা যাইবে। অপর পক্ষ ব্যাকুল হইল—এ রক্তস্রোত বন্ধ হইলে তাহাদের উপায় কি হইবে এই ভাবিয়া।

কাগজে কাগজে স্বামীজীর ছবি বাহির হইল। তাঁহার

নিদারুণ স্বার্থত্যাগ লইয়া কবিতা প্রকাশিত হইল। ভক্তগণ ভক্তবৎসলের জীবনহানির আশঙ্কায় কাতর হইল; কসাই সম্প্রদায় চঞ্চল হইয়া পড়িল—কি জানি যদি হিন্দুরা সবাই একযোগে মাংসই ছাড়িয়া দেয়। মাংসাহারীগণ মনে মনে খুশী হইল, ক্রেতার সংখ্যা কমিয়া গেলে মূল্য নিশ্চয়ই কমিবে। যাহারা নিরামিষ মাংসাশী অর্থাৎ—অনাগত শাবক ডিম্ব ভক্ষণ করিয়া থাকে তাহারা পর্য্যন্ত মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল, পাছে গজানন্দজী আর এক পা আগাইয়া গিয়া বলিয়া বসেন ডিম্বের ভিতরেও প্রাণ থাকে; অতএব ডিম্বভক্ষণে ভ্রূণহত্যার পাপ আসিতে পারে।

এইরূপ সারা শহরটায় একটা দারুণ আশঙ্কার ছায়া ঘনাইয়া আসিল। খাইয়া কাহারও সোয়াস্তি নাই—যেন কখন কি অঘটন ঘটিয়া বসে। যেখানে দুইজন একত্র হইয়াছে সেখানেই ঐ এক কথা—কি হইবে?

আজকাল জনমতের যুগ। কাজেই জনমতটা আগে জানিয়া রাখা প্রয়োজন। মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত লোকেরাই তো জনমত গঠিত করে এবং তাহাদের সবাইকেই প্রায় পাওয়া যায় মাছ-তরকারির বাজারে। এক ক্রেতা দুই পয়সার অতি ক্ষুদ্র চিংড়ি মাছ কিনিয়া এবং তাহার উপর অনেক অনুরোধে মৎস বিক্রেত্রীর নিগ্রহ সহ্য করিয়া মাত্র চারিটি ফাউ সংগ্রহান্তে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আর মশাই, কাল হয়ত শুনব গজাননজী বলেছেন, ঘুসো চিংড়ি খেলে শিশুহত্যার পাপ হবে এবং পুঁই সহযোগে চিংড়ি খেলে তিনি অনশন ব্রত গ্রহণ করে সৃষ্টি ধ্বংস করবেন।

অপর একজন ছোট চিংড়িও সংগ্রহ করিতে না পারিয়া বলিল, বলেন কেন মশাই, পরশু হয়ত শুনবেন আইন-সভায় মৎস্যমাংসরক্ষণ বিল পাশ হয়ে গেছে এবং মৎস্য ও পশুহত্যা নরহত্যার মতই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের ভবিষ্যতের অবশ্য ভরসা ছাত্রসম্প্রদায়ের মত জানিবার জন্য কলেজ ষ্ট্রীটের বা তাহার কাছাকাছি যে কোন রেস্তরাঁয় সন্ধ্যাকালে গিয়া বসিলে শুনিবেন মাংসের চপে এক কামড় দিয়া একটি ছাত্র বলিতেছে—চপ নইলে জীবন বৃথা। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার প্রবন্ধ ছুঁড়ে মারলেও 'পাদমেকং ন গচ্ছামি।'

অপর একটি ছাত্রটি চপ সমাপ্ত করিয়া চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া বলিল, কিন্তু এখন কি করবে? গজানন্দ যে এবার ধ্যানে বসেছেন। মন্দির ছেড়ে তিনি যখন কসাই-খানার দিকে এগুবেন তখন কি হবে? মাংসের চপ ছাড়া মাংসের মুড়ি (মাথা নহে) পর্য্যন্ত যে ক্রমশ অমিল হয়ে উঠ্‌বে।

পূর্ব্বোক্ত চপরত ছাত্রটি প্রথমধৃত চপটি সাবধানে শেষ করিল ও অপরটি হস্তে ধারণ করিয়া কহিল, আরে রেখে দাও তোমার গজানন্দ। বুদ্ধদেব অত বড় রাজার ছেলে—রাজ্য স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করে চপের বিরুদ্ধে লাগ্‌লেন, পারলেন কি? "চপং জীবনো মরণঃ।"

পিছন হইতে একজন মৃদুস্বরে বলিল, ইতি মনু স্মৃতিঃ। বি, এ-তে সংস্কৃতে অনার্স ছিল নাকি বন্ধু?

চায়ের পেয়ালায় আর একবার চুমুক দিয়া প্রথম যুবক ছাত্রটি কহিল, দেখ না ভাই, পৃথিবীতে দুর্নীতির অন্ত নাই। আর কোনটাই গজানন্দের নজরে পড়্‌ল না—পড়্‌ল কেবল এই ছাগ হত্যার উপর। আরে, মানুষ যে মানুষের টুঁটি ধরে কামড়াচ্ছে—তার বেলায় কি কচ্ছেন?

(৪)

এবার গজানন্দের আশ্রম বা অহিংসা এণ্ড কম্প্যানির আফিসের সন্ধান লওয়া যাউক্। একটি পুরাতন কিন্তু বড় ত্রিতল বাড়ীতে গজানন্দের আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। দিবারাত্রি লোকের অন্ত নাই। দ্বিতলের একটি কক্ষে তিনি অনশনে বসিয়াছেন। দুই-তিনটি কক্ষ পার হইয়া এই কক্ষে পৌঁছিতে হয়। নীচে উপরে রীতিমত সত্যাগ্রহের আফিস বসিয়াছে। নীচের তলে দুইজন স্বেচ্ছাসেবক দুয়ারের দুই পাশে দুর্গাপুরের মোড়া পাতিয়া বসিয়া আছে। কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তাহার নাম, ধাম ও উদ্দেশ্য লিখিয়া লইয়া একজন স্বেচ্ছাসেবক চট্ করিয়া উপরে চলিয়া যায়। দ্বিতলে উঠিতেই প্রথম কক্ষে উপবিষ্ট প্রেমানন্দকে সেই কাগজ দিতে হয়। প্রেমানন্দ উঠিয়া দ্বিতীয় কক্ষে উপবিষ্টা বৃন্দাকে তাহা দিবে। বৃন্দা অবস্থা বুঝিয়া হয় নিজে হইতে আদেশ দিবে, না হয় তাহার কক্ষে যেখানে গজানন্দ শয্যাপরে শয়ান সেখানে গিয়া আদেশ লইয়া আসিবে।

এই অপরূপ সত্যাগ্রহের প্রথম দিনে ব্যাপারটা সবাই পুরাপুরি চট্ করিয়া বুঝিতে পারে নাই। ছাগ বলিদান

দেওয়াইতে আমি, খাঁড়া সজোরে নামাইতেছে কামার, কাটিতেছে ধারাল ইস্পাতের খাঁড়া (ভোঁতা নহে যে ছাগ শিশুর কষ্ট হইবে) ইহাতে কাহারও চট্ করিয়া মাথা ব্যথা হইবার কারণ ঘটে নাই। তাহার উপর মাংস খাইতে খাইতে জিভ ও দাঁত যেমন অভ্যস্ত হইয়া যায়, ছাগমাংস দেখিতে দেখিতে চক্ষুও তেমনি অভ্যাস করিয়া বসে। তদুপরি মাংস খাইয়া খাইয়া মাংসাশীদের কাছে ছাগ মেষ ইত্যাদি ক্রমশ লাউ-কুমড়ার মতই সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই লঘু ব্যাপারটাকে ঘনাইয়া এবং পাকাইয়া তুলিল লেখকেরা ও কাগজওয়ালারা। তৃতীয় দিন হইতেই তাই অহিংসা এণ্ড কম্প্যানির আফিসে এতখানি ভিড় জমিয়া গেল। ছাগলের জন্য যাহাদিগকে পয়সা থাকিলে আমরা নিত্য না হউক্, মাসে অন্তত এক-আধবার কিনিয়া হউক্ বধ করিয়া হউক্ খাইয়া থাকি—যে মহাপুরুষ আপনার 'জীবন্ত' প্রাণ দিতে উদ্যত তিনি দেখিবার বস্তু সন্দেহ নাই। সিদ্ধার্থ যে বংশ উজ্জ্বল করিয়া জন্মিয়াছিলেন সে বংশ এখনও বর্ত্তমান কি-না সন্দেহ; মহাপ্রভুর সত্যকার বংশ না থাকাই সম্ভব; কারণ তিনি বংশরক্ষার পূর্ব্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর কলিযুগের এই প্রায় অন্তিম অবস্থায় যে মহাপুরুষ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন তিনি এখন স্বয়ং সশরীরে বর্ত্তমান। এ মহাত্মা দর্শনের প্রলোভন প্রায় মাংসাহারের প্রলোভনের সঙ্গে সমান। এই জন্যই অহিংসা অফিসের বাহিরে ভিতরে এই অপূর্ব জনতা।

চতুর্থ দিনের প্রভাত। শীতকাল; তাই ছয়টা বাজিলেও পথে লোক চলাচল বেশী হয় নাই। তথাপি অত ভোরে জনার্দ্দন অধিকারী স্বয়ং অহিংসা আফিসে আসিয়া উপস্থিত। তিনি মন্দিরের লভ্যাংশের বাহান্ন ভাগের এক ভাগের অধিকারী, প্রকৃত অধিকারীদের ভাগিনেয়। মাতুলবংশ নিঃসন্তান অবস্থায় স্বর্গে যাওয়ায় এই অংশটুকু তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে পাইয়াছেন।

অধিকারী মহাশয় 'ঠাকুর' দর্শনের অভিলাষ করিলে স্বেচ্ছাসেবক কাগজ ও পেনসিল আগাইয়া দিল। অধিকারী লিখিলেন—জনার্দ্দন অধিকারী, মায়ের অন্যতম সেবাইত। দর্শনের উদ্দেশ্য—প্রভুর বহুমূল্য জীবনরক্ষার চেষ্টা।

একজন স্বেচ্ছাসেবক দুয়ার আগুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অপরে কাগজের টুকরা লইয়া দ্বিতলে গিয়া প্রেমানন্দের হাতে দিল। প্রেমানন্দ নাম দেখিয়াই চটিয়া গেল। তাহার মাথায় তখনই প্রবেশ করিল, এ শত্রুপক্ষের লোক; ছলে বলে আন্দোলন বন্ধ করাই ইহার উদ্দেশ্য। গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া প্রেমানন্দ বলিল—বল, দেখা হবে না।

স্বেচ্ছাসেবক বলিল, আপনি তবু একবার অন্তত দিদিকে দেখিয়ে আসুন তো!

বৃন্দা শিষ্যবর্গের দিদি—অবশ্য প্রেমানন্দ ছাড়া।

কাজেই 'দিদি'কে দেখাইবার জন্য তাহাকে উঠিতে হইল। দ্বিতীয় ঘরে তখন কেহ ছিল না। প্রেমানন্দ বুঝিল, বৃন্দা তৃতীয় কক্ষে—গুরু-সকাশে। দুয়ার ভিতর হইতে ভেজানো। প্রেমানন্দ অতি ধীরে দুয়ারের উপর দুইবার মধ্যমা অঙ্গুলির আঘাত করিল। উত্তর আসিল—দাঁড়াও—দুই মিনিট।

প্রেমানন্দ তৎক্ষণাৎ দুই হাত সরিয়া আসিয়া স্থাণুর মত দণ্ডায়মান রহিল।

দুই মিনিটের স্থলে প্রায় পাঁচ মিনিট হইল। বৃন্দা দুয়ার খুলিয়া ফিরিল। আসিয়াই স্বামীকে দেখিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি খবর?

প্রেমানন্দ বৃন্দার হাতে কাগজখানি দিল। পড়িয়া বলিল, নিয়ে এস। প্রেম বলিল, লোকটা কিন্তু মন্দিরের সেবাইৎ। দেখা করলেই গোলমাল বাধাবে।

বৃন্দা তাচ্ছিল্যভরে বলিল, তোমার যেমন বুদ্ধি। যাও, নিয়ে এস। সঙ্গে করে আনবে। আর কারও সঙ্গে কথা কইতে দেবে না।

বুদ্ধির ভুলটা কোথায় তাহা ভাবিতে ভাবিতে প্রেমানন্দ নামিয়া গেল ও কিছুক্ষণ পরে লোকটিকে সঙ্গে আনিয়া বৃন্দার জিম্মা করিয়া দিল।

বৃন্দা ততক্ষণে মুখমণ্ডলে এমন করুণ ভাব আনিয়া ফেলিয়াছিল যাহা দেখিয়া অধিকারী ভাবিল, হয়ত বা অনশনে এতক্ষণ স্বামীজীর নাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে। ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞাসা করিল, প্রভুর অবস্থা কি খুবই—'খারাপ' একথাটা আর অধিকারী মুখে আনিতে পারিল না।

বৃন্দা মুখ ফিরাইয়া একবার অতি সংক্ষেপে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল—যাহার আভাসও অধিকারী জানিল না। পরে মুখখানা ম্লানতর করিয়া বলিল, এর জন্য আপনারাই তো দায়ী।

অধিকারী প্রায় গলিয়া গিয়া কহিল, কিন্তু আমাদের কি অপরাধ বলুন। মায়ের সেবাইৎ আমরা। মায়ের সেবা তো আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। বলিদান শাস্ত্রের বিধান। শাস্ত্রবাক্য—এতকালকার বিধি—আমরা কি ক'রে লঙ্ঘন করি?

এক মহাত্মার অমূল্য প্রাণ আপনারা নষ্ট করতে বসেছেন—এই তো আপনাদের শাস্ত্রবাক্যপালন! একজন মহাত্মার প্রাণ নষ্ট করা মানে—একশ নারী হত্যা করা, তা জানেন?

অধিকারী অতি মাত্রায় সংকুচিত হইয়া বলেন, তা হ'লে প্রভুর বাঁচবার কি আর কোন উপায় নেই?

বৃন্দা হতাশার সুরে বলিল, আর কি আছে বলুন! আপনারা যদি বলেন এবং লিখে দেন যে আজ থেকে মন্দিরে ছাগবলি বাদ, তবেই উনি অনশন ভঙ্গ করবেন; নইলে উনি প্রাণত্যাগ করতে কৃতসংকল্প।

অধিকারী একটু ঢোক গিলিয়া বলিল, অন্য কোন উপায়ে কি ওঁকে অনশন ব্রত ত্যাগ করানো যায় না?

বৃন্দা একটু ভাবিবার ভান করিয়া বলিল, আর কি উপায় হতে পারে তা-তো জানি না।

অধিকারী একবার একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, বলিদান পাপ—এই ভেবেই না উনি এ কাজ করতে বসেছেন? পাপ নিবারণ এক হিসেবে পুণ্য উপার্জ্জন। ধরুন, উনি যদি টাকা দিয়ে একটা কোন বড় রকমের পুণ্য কর্ম্ম ক'রে ফেলেন—পুণ্য কর্ম্ম তো কতই আছে—তা হ'লে কি চলে না?

বৃন্দা একটু ভাবিয়া বলিল, সে রকম পুণ্য কর্ম্ম কিই-বা আছে যাতে এই প্রতিদিনকার পাপ দূর হতে পারে, আর তত টাকাই বা ইনি কোথায় পাবেন?

অধিকারী কহিল, আচ্ছা টাকা যদি কোন ভক্ত এঁকে স্বেচ্ছায় দেয়। বলিয়া একশত টাকার পাঁচখানি নোট বৃন্দার আরক্ত করতলের উদ্দেশে ভূমিতলে রক্ষা করিয়া কাতর দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিল। বৃন্দার মুখ সুন্দর। চাহনি সুন্দরতর। সে মুখের পানে খানিকটা চাহিয়া থাকিতেও মন্দ লাগে না। কাজেই অধিকারী চট্ করিয়া দৃষ্টি নামাইল না। বরং একটু বেশী কাতর হইয়াই বলিল, দেখুন কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে বাস করি। কাল থেকে আমার পালা আরম্ভ। এই কদিন মাত্র সারা বছরের ভরসা। এই সময়েই আপনারা এসে এক নূতন ঢেউ তুল্‌লেন। মন্দির বন্ধ গেলে কি অবস্থা হবে আমাদের একবার ভেবে দেখুন।

বৃন্দা আর একবার ভাবিল। অধিকারীর বেশ একটু বয়স হইলেও মনে হইল বৃন্দার ভাবনাটুকুও বেশ সুন্দর, অনেকটা যেন নবীন মেঘের মত। মেঘ অপসারিত করিয়া বৃন্দা বলিল, দেখুন, এ সমস্তই প্রভুর ইচ্ছা। তাঁর অনুমতি না হ'লে আমি কিছুই বল্‌তে পারিনে। দেখি যদি কিছু হয়।

নোট কয়খানা হতাদরে ভূমিতলেই পড়িয়া রহিল। অধিকারী কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বৃন্দা সম্মুখের ক্ষুদ্রকক্ষে—যেখানে গুরুদেব কত লোকের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিতেছেন সেখানে—প্রবেশ করিয়া দুয়ার রুদ্ধ করিল। রুদ্ধ দুয়ারের বাহিরে বর্দ্ধিত কৌতূহলের সহিত অধিকারী উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিল।

ভিতরে প্রবেশ করিতে গজানন্দের শায়িত মূর্ত্তি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কক্ষে শব্দহীন বাণী ফুটিয়া উঠিল—কি হ'ল?

বৃন্দাও সেই মত নিশব্দে লেখা কাগজখানি দেখাইয়া বাঁ হাতের পাঁচটি অঙ্গুলি উঠাইল।

আঁখিতে পুনরায় প্রশ্ন জাগিল, কি করা যায়?

বৃন্দা গুরুর চরণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। ভাবটা তুচ্ছ নোট কয়খানাকে শ্রীচরণে আশ্রয় দিন। কি করিবেন? ভক্তের উপহার।

গুরু শব্দহীন সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বৃন্দা বাহিরে আসিল, কিন্তু মুখখানির ভাব বাহিরে আসিতে আসিতে অদ্ভুতভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

অধিকারী জিজ্ঞাসুভাবে চাহিতে বৃন্দা নিরাশার সুরে বলিল, নিলেন না; আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

অধিকারী হাতযোড় করিয়া প্রায় বৃন্দার পায়ের উপর গড়াইয়া পড়িল। বৃন্দা মুখ ফিরাইয়া মৃদু হাসিয়া একটু পিছাইয়া আসিল। পরে মৃদুস্বরে বলিল, আমার কি দোষ, বলুন? আপনার কথা বল্‌তে গিয়ে আমি ঠাকুরের কাছে বকুনি খেয়ে এলাম। আপনি ও নিয়ে যান।

অধিকারী অতি মাত্রায় কাতর হইয়া বলিল, আপনি আমার উপর দয়া করুন। ও ক'খানা আপনার কাছেই

রাখুন। সুবিধামত ওঁর কাজে লাগাবেন। আর আমি যেন পথে না বসি এইটুকু দেখ্‌বেন।

বলিয়া অধিকারী হাতযোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অত্যন্ত অনিচ্ছার ভাব দেখাইয়া বৃন্দা নোট ক'খানা তুলিয়া রাখিল।

অধিকারী একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া পাছে বৃন্দা আবার মত বদ্‌লাইয়া ফেলে—বুঝি বা সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল এবং দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল।

বৃন্দা তৎক্ষণাৎ হাস্যমুখে গুরুর কক্ষে আসিয়া তাঁহার শয্যাপ্রান্তে নোট কয়খানা ফেলিয়া দিল। গুরু প্রসন্নমুখে কাগজ কয়খানা তুলিয়া লইয়া সাবধানে গণিয়া বালিশের নীচে রাখিলেন।

আর আধঘণ্টা পরে আবার বৃন্দা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দুয়ার ভেজাইয়া দিয়া শয্যাপ্রান্তে দাঁড়াইল। অতি মৃদুস্বরে গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, কি?

বৃন্দা বলিল, মোড়ের মাথার রেস্তর্‌াঁর মালিক ধনপতি দাস এসেছে।

গুরু প্রশ্ন করিলেন, কি বলে?

বৃন্দা বলিল, তাহার নাকি খ'দ্দের কম হচ্ছে। পাছে আরও কম হয় সেজন্য আপনার উপবাসে উদ্বিগ্ন হয়ে এসেছে।

গুরু। তার পর?

বৃন্দা। বলে, ভরসা পেলে কিছু প্রণামী দেয়। এনেছে একশো।

গুরু। বলে দাও, অর্থ বিষ। ধনপতি একমাসে এর দশগুণ লাভ করে।

উক্ত কথোপকথন অতি মৃদুস্বরে হইয়াছিল। শেষের দিকে একটু উচ্চকণ্ঠে বৃন্দা বলিল, আপনি বেশী কথা কইবেন না, উত্তেজিত হবেন না; আমি এখনই ওদের সরিয়ে দিচ্ছি।

বৃন্দা গুরুর কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল এবং তাহার কক্ষ পার হইয়া প্রেমানন্দের কক্ষে আসিয়া তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট ধনপতির কাছে আগাইয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিল, কেন আপনারা গুরুদেবের এই দুর্ব্বল শরীরের উপর অত্যাচার করেন? আর এরকম অত্যাচার করতে আসবেন না।

বলিয়া আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিল।

ধনপতি সাহু জাতিতে বেণিয়া। গয়া জেলার লোক। বিশ বৎসর কলিকাতায় থাকিলেও এখনও সে কোঁচার খুঁটে টাকাপয়সা বাঁধিয়া রাখে। বৃন্দা চলিয়া গেলে সে খানিকটা কপালে হাত দিয়া ভাবিল। পরে প্রেমানন্দের অনুমতি লইয়া আবার বৃন্দার কক্ষে প্রবেশ করিল ও অত্যন্ত বিনয়ের সহিত প্রণামী দ্বিগুণ করিয়া দিল।

অত্যন্ত অনিচ্ছার ভাব দেখাইয়া বৃন্দা প্রণামী গ্রহণ করিল এবং গুরু যদি গ্রহণ করেন সেই চেষ্টা দেখিতে গুরুর কক্ষে প্রবেশ করিল।

প্রণামী যথাস্থানে সঞ্চিত হইলে ফিরিয়া আসিয়া বৃন্দা কহিল, যান, অতিকষ্টে রাখতে অনুমতি পেয়েছি। কিন্তু আপনারা সাবান আনেন না কেন? যেখানে সেখানে টাকা নোট রাখছেন—এসব ধুতে হবে না? এসব স্পর্শ গুরুদেবকে কাঁটার মত বেঁধে।

ধনপতি তৎক্ষণাৎ দশবাক্স সাবান আনিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বিদায় লইল।

এইরূপে আরও কয়েকজন আসিল ও গেল। তাহাদের সকলের কথা বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়।

ঠাকুরের প্রাণরক্ষার জন্য কেবল কমলালেবুর রস ঠাকুরকে দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু অনশন ব্রতের জন্য ঠাকুরের ক্ষুধার প্রাচুর্য্য ঘটিয়াছিল যাহাতে বাজারে কমলালেবুর দাম দশগুণ বাড়িয়া গেল। গৃহস্থঘরের রোগীদের জন্য কমলালেবুর একটি কোয়া পর্য্যন্ত দুর্ল্লভ হইয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি ঠাকুরের দেহ যেন ক্রমশ ক্ষীণ হইতে লাগিল।

ঠাকুরের দেহ মূল্যবান্। ততোধিক মূল্যবান্ ঠাকুরের প্রাণ। এই দুইটি অমূল্য পদার্থ রক্ষার জন্য ভক্তগণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন ঠাকুরের জীবনরক্ষা-সমিতি গঠিত হইল যাহার সভ্য ও সভ্যা হইল প্রেমানন্দ, বৃন্দা ও চরিত্র সিংহ। প্রথমোক্ত দুইজনকে আমরা ভাল করিয়াই জানি। তৃতীয় চরিত্রসিংহ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ। ধনবান্ ও বুদ্ধিহীন। বহু অর্থ ঠাকুরের সেবায় লাগাইয়াছে। জীবনরক্ষা-সমিতির গুপ্ত অধিবেশনে চরিত্রসিংহ বলিল, ঠাকুরের বাল্য ও যৌবনের দেহ ও মন অতিরিক্ত মাংসাহারে পুষ্ট। হঠাৎ মাংস ছাড়িয়া দেওয়ায় শরীর আরও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। ঠাকুরকে কোন একটা বলকারক কিছু

দেওয়া প্রয়োজন। অতএব কমলালেবুর রসের সহিত কুক্কুটশাবক স্থপ দেওয়া হউক।

বৃন্দা বলিল, হিন্দুর মন্দিরে কুক্কুট বলিদান দেওয়া হয় না। অতএব ঠাকুরের নীতির সহিতও ইহার বিরোধ ঘটিবে না!

চরিত্রসিংহ একেবারে সাধু ভাষায় কথা কহে। বলিল, বিরোধ ঘটিলেও ঠাকুরের প্রাণরক্ষার জন্য তাহারও প্রয়োজন।

প্রেম বলিল, নিশ্চয়ই।

বৃন্দা বলিল, তবে ঠাকুর যেন জানিতে না পারেন।

চরিত্র ঘাড় নাড়িয়া আশ্বাস দিল—সে ভার তাহার।

ঠাকুর রক্ষা পাইলেন। বহুকাল পরে মাংসের আস্বাদ পাইয়া ঠাকুর যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। অনশন ব্রতের শেষের কয়টা দিন বেশ কাটিতে লাগিল।

কিন্তু দেবতার নামে এতটা ফাঁকি সহিল না। একদিন ঠাকুর হঠাৎ মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হইলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ব্লাড্‌প্রেসার অসম্ভবভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। উপবাসে ব্লাড্‌প্রেসার কমিবার কথা। হঠাৎ বাড়িল কেন কেহ ভাবিয়া পাইল না। সমস্ত দোষ তখন পড়িল গিয়া নিরপরাধ কমলালেবুর উপর।

ঠাকুরের জীবন এবম্বিধভাবে বিপন্ন দেখিয়া ওঁকার মঠের সহকারী আচার্য্য শ্রীমদ্ বিপুলানন্দ ব্রহ্মচারী, বাংলার অন্যতম মন্ত্রী মহাশয়, কবি নাগুচির এক প্রতিনিধি এবং আমাদের প্রিয়তম কবির এক নিদারুণ ভক্ত সকলে একযোগে আসিয়া ঠাকুরের হাতে পায়ে (কেহ হাতে ও কেহ পায়ে) ধরিল। তাহাতে অনন্যোপায় হইয়া ভক্ত-বৎসল ঠাকুর অনশন ব্রত আপাতত স্থগিদ্ রাখিলেন।

বলিদানের পক্ষাবলম্বী লোকেরা অবহিত রহিবেন, বলিদান আবার বাড়িতে দেখিলেই ঠাকুর জীবন ত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন।

সকলেই ইহাতে হাফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

চৈতালি স্বপ্ন

শ্রীপ্রশান্তকুমার চৌধুরী

উতলা চৈতালি রাতি ;
স্বপ্নাতুর বনানীর শিরে—
নেমে আসে জোছনার মায়া।
আলো আর ছায়া—
কাঁপে দূরে পত্রঘন অশথ-তলায়।
চিত্ত মোর ভেসে যেতে চায়—
কোন্ সে অজানা দেশে।
না জানি কিসের লাগি, কাহার উদ্দেশে।

জানি জানি এ শুধুই ভাবাবেশ,
এ শুধুই মায়া।
জাগরণ-ক্লান্ত চক্ষে ক্ষণিকের স্বপনের ছায়া।
এর পরে আছে নগ্ন অনাবৃত স্বার্থকোলাহল
অন্নময় জীবনের চিন্তাক্লিষ্ট ভারাক্রান্ত মাস দণ্ড পল।

তবু চেয়ে থাকি—
তোমা পানে মুগ্ধ নেত্রে অনিমেষ আঁখি—
হে মোর চৈতালি রাতি, হে মোর ক্ষণিকা!
হোক্ মায়া, হোক স্বপ্ন, হোক মিথ্যা
তবু সত্য তুমি মোর স্বপ্ন বিলাসিকা।

বাংলার চিত্রকলা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

সভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যজাতির সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির ন্যায় ললিতকলারও উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। শুধু তাহা নয়, কলা-শিল্পের আদরও সে দেশে এত অধিক যে তাহাদের এক একটার মূল্যের পরিমাণ শুনিলে আমাদের দেশের লোকেরা যুগপৎ বিস্ময়ে ও অবিশ্বাসে অভিভূত হইবেন সন্দেহ নাই।
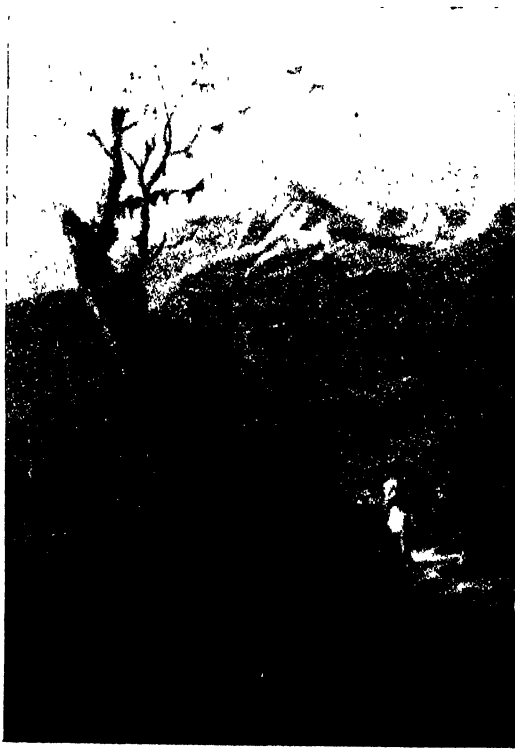
সূর্য্যাস্ত —শিল্পী এম সেন

অসাধারণ শিল্পপ্রীতি ব্যতীত চিত্র বা ভাস্কর্য্যের মূল্য যে দশ.বিশ লক্ষ টাকা হইতে পারে ইহা কল্পনারও বাহিরে।

আমাদের অনেকেরই ধারণা, চিত্রকলা শুধু বিলাসেরই উপকরণ, আর সেই বিলাসিতার পৃষ্ঠপোষক ধনীর দল। এই ধারণা অল্পবিস্তর সমগ্র জাতির মধ্যে এমন মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে যে বর্ত্তমানে কলাশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও এই ভ্রান্ত সংস্কারের সম্যক অপনোদন সম্ভবপর হইতেছে না।

উপস্থিত প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়; শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে চারুকলার সাহায্য ব্যতীত কোন জাতিরই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি আশা করা যাইতে পারে না। পাশ্চাত্য জাতির ব্যবসা-বাণিজ্যে চারুশিল্পের বিভিন্ন ব্যবহার দেখিলে আমরা কখনও বলিব না যে উহা শুধু বিলাসেরই সামগ্রী। রূপ সৃষ্টি না করিলে ব্যবসা বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার হয় না। কোন একটী দ্রব্য কিনিতে ক্রেতা প্রথমে তাহার গুণ দেখে না, দেখে রূপ; রূপে মুগ্ধ হইলে তাহার পর আসে গুণের পালা। শুধু কার্য্যকারিতা দেখিলে লোকে হাজার রকম কাপড়ের পাড় খুঁজিত না বা শুধু উপকারিতা দেখিলে লক্ষ প্রকারের বিলাস উপকরণেরও সৃষ্টি হইত না।

এই প্রবন্ধটীর শিরোনামা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন, কলা-শিল্পকে কষ্টিপাথরে কষিয়া দর নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি কলা-লক্ষ্মীর একজন সামান্য উপাসক, শিল্পকলার কোন আয়োজন দেখিলে তাহা উপভোগ করিতে প্রয়াসী হই মাত্র। এই বৎসর কলিকাতা গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের বার্ষিক শিল্প-প্রদর্শনীতে বাংলার চারু-শিল্পের যে আশাতীত উৎকর্ষ দেখিয়াছি, তাহার সামান্য মাত্র আভাস দেওয়াই আমার বর্ত্তমান উদ্দেশ্য। কবি, শিল্পী বা সাহিত্যিকের দান যতদিন দেশবাসী অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে না পারে, ততদিন তাহার যথার্থ সার্থকতা হয় না। চিত্রের প্রদর্শনীতে উৎকর্ষ অপকর্ষ থাকিবেই, কারণ অধিকারীর মধ্যেও তারতম্য আছে। চিত্র সংগ্রহ এবার এত অধিক যে কয়েকখানার মাত্র পরিচয় দান ব্যতীত অপরগুলির উল্লেখও আদৌ সম্ভবপর নয়।

প্রদর্শনীতে প্রবীণ শিল্পী ভবানীচরণ লাহার কয়েকখানা চিত্রেই অঙ্কন প্রণালীর একটু নূতনত্ব দেখা যায়। সাধারণ অঙ্কন প্রণালীতে ইহারা অঙ্কিত নয়; বর্ণগুলিকে এমন

কৌশলে ও স্থুলভাবে চিত্রস্থ করা হইয়াছে যাহা নিকটে সম্পূর্ণ অর্থহীন, কিন্তু উপযুক্ত ব্যবধানে অতিশয় সুন্দর।

শিল্পী যামিনী রায়ের 'পট'চিত্রগুলি প্রদর্শনীতে বহু সমালোচনার বিষয় ছিল। দর্শকগণ বলেন, প্রগতির যুগে চিত্রকরের পশ্চাৎ গতির পরিচয় কেন? প্রাচীন চিত্রের বিষয়বস্তুর প্রকাশ-ভঙ্গীতে শিল্পীর নিজের মৌলিকতা থাকা প্রয়োজন, নতুবা ইহারা শুধু প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য দিবে মাত্র। তাঁহার অঙ্কিত 'শৈলবালা', 'শুভমুহূর্ত্ত' প্রভৃতি চিত্র বহু পূর্ব্বেই শিল্পীকে যশ দান করিয়াছে।

অতুল বসু অঙ্কিত কয়েকখানা চিত্রের মধ্যে 'মেঘাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা' সুন্দর হইয়াছে। 'বারান্দায়' চিত্রখানাতে তরুণীর মুখের পানে তাকাইলে মনে হয়, একটী করুণান্ত নাটক পাঠ করিতে করিতে তন্দ্রায় পড়িয়াছেন; অন্তরের সমবেদনা নিদ্রার ভিতর হইতেও আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ' আমাদিগকে আনন্দ দান করে নাই।

হেমেন্দ্রনাথের 'কমল না কণ্টক' উচ্চ শ্রেণীর জল রং-চিত্র। অনেকে চিত্রখানার শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য্যেরই প্রশংসা করেন, কিন্তু ইহার যথার্থ ভাব—নারীর রূপের অনলে কত প্রেমিক নিত্য আহুতি দিতেছে, কত রাজা রাজ্য হারাইয়াছে; আবার সেই নারীরই সহযোগিতায় কত মোহান্ধ চক্ষু ফিরাইয়া পাইয়াছে, কত ভোগী যোগী সাজিয়াছে! শিল্পীর মনে তাই বোধ হয় প্রশ্ন জাগিয়াছে—সত্যই নারীজাতি 'কমল' না 'কণ্টক'? আমরা বলি, দুনিয়ায় নারীত্ব যতদিন থাকিবে, এ প্রশ্ন শুধু প্রশ্নই থাকিবে, সমাধান আর হইবে না। তাঁহার "সাকী" শিল্পসৃষ্টির অপূর্ব্ব নিদর্শন। কানে আঙুরের দুল, পাত্রে রস, মুখে মদিরা, দেহে তরঙ্গ; মনে হয় ভাবের আধিক্যে শিল্পী স্বয়ং গলিয়া গিয়া বর্ণ তুলিকার সাহচর্য্য করিতেছেন। ইঁহার অঙ্কিত 'দুষ্টগ্রহ' দেখিলে শিল্পীকে শুধু 'স্ত্রী-জাতির শিল্পী' বলা চলে না। আমাদের মনে হয়, সর্ব্ববিষয়ে এই চিত্রটী শিল্পীর শ্রেষ্ঠ দান।

এম্, সেন অঙ্কিত চিত্রগুলি প্রদর্শনীর যথেষ্ট সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে বলা যায়। নৈসর্গিক চিত্র সাধারণতঃই লোকের মনে আনন্দ সৃষ্টি করে, তাহার পর যদি তাহাতে শৈল-শিখরে সূর্য্যের উদয়-অস্তের খেলা থাকে, তবে দর্শককে বহুকাল ভাবের ঘোরে মগ্ন রাখিবে সন্দেহ নাই। ইঁহার অঙ্কিত কাঞ্চনজঙ্ঘার চিত্রগুলি দর্শকদের মনে রেখাপাত করিয়াছে।
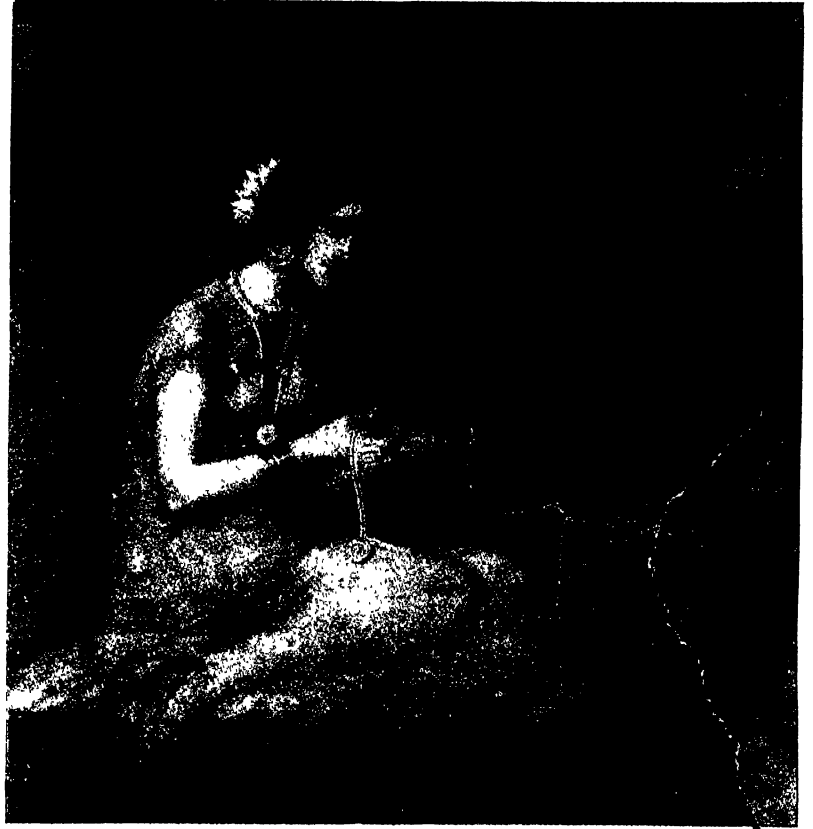
গহনার বাক্স —শিল্পী পূর্ণ চক্রবর্ত্তী

ভাস্কর প্রমথনাথ মল্লিকের নূতন পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। তাঁহার 'পারিশ্রমিক' ও 'জীবনমৃতা' প্রদর্শনীর

সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। পল্লীর প্রাণ চাষীর দল সরল ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াই সুখী। 'পারিশ্রমিক' মূর্ত্তিটীর মুখে ও ভঙ্গীতে তাহা হুবহু ফুটিয়াছে। 'জীবনমৃতা' মূর্ত্তির পরিচয় না দেওয়াই ভাল, কারণ এদেশের লোকের চার ভাগের মধ্যে তিন ভাগেরই ঐ অবস্থা।

শিল্পী সতীশ সিংহের কয়েকখানা চিত্রের মধ্যে 'মাদ্রাজী সাড়ী' ও 'সাগরপারে' উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাজী সাড়ী ও সাগরপার কোনটাই বাংলাদেশের নয়, যদিও শিল্পী আমাদেরই। চিত্রের বৈদেশিক বিষয়বস্তুতে শত সাফল্য

জীবন্মৃতা —ভাস্কর প্রমথ মল্লিক

লাভ করিলেও ইহাতে যেন তেমন গৌরব বোধ হয় না। সতীশবাবুর শিল্পজ্ঞান যথেষ্ট, আমরা তাঁহাকে খাঁটী দেশী যাহা তাহাই আঁকিতে অনুরোধ করি।

রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বিদেশ ভ্রমণের ফলস্বরূপ যে কয়েকটী চিত্র দেখিলাম, তাহাতে দক্ষতা আছে। তুলিকার দ্রুত ও যথেচ্ছা ব্যবহার করিলেও তিনি বিষয় বস্তুর প্রকৃত রূপ ফুটাইতে পারিয়াছেন। এই শিল্পীর তৈলচিত্রে কৃতকার্য্যতা অতি আধুনিক এবং অল্প সময়েই তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

বিমল মজুমদারের প্রাকৃতিক দৃশ্য সকলেরই আনন্দদায়ক। ইনি বর্ণের খেলায় ও বৃক্ষলতাদির চরিত্র অঙ্কনে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। জল, প্রস্তর ও ভগ্ন মৃত্তিকার স্তূপ অঙ্কনে ইঁহার একটু নেশা আছে।

বসন্ত গাঙ্গুলীর অঙ্কিত কয়েকখানা চিত্রই বেশ উল্লেখযোগ্য, তুলিকার প্রয়োগে ইঁহার অধিকার যথেষ্ট।

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের 'চৈতন্ত' উচ্চশ্রেণীর চিত্র সন্দেহ নাই। মুকুল দের 'এচিং' গুলির মধ্যেও যথেষ্ট শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার 'নৃত্যরতা'য় নৃত্যের চিহ্ন দেখি না; তাহা ব্যতীত দেহ গ্রীবা প্রভৃতির ভঙ্গীতেও মাধুর্য্যের অভাব।

সারদা উকীলের কৃষ্ণবিষয়ক চিত্রগুলি পেন্সিলে অঙ্কিত হইলেও বেশ সতেজ এবং ভাবযুক্ত। 'ভারতীয়' পদ্ধতিতে অঙ্কিত বলিয়া অনিন্দ্য দেহ গঠনের কিছু অভাব আছে সত্য, তথাপি মাধুর্য্যরস প্রতিচিত্রে বিদ্যমান।

যশস্বী শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর অঙ্কিত চিত্রগুলি আমাদের বেশ ভালই লাগিয়াছে। তাঁহার 'গহনার বাক্স'টী বেশ মূল্যবান ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রহ্লাদ কর্ম্মকারের 'জলসা' কলাকৌশলে সবিশেষ উচ্চাঙ্গের সন্দেহ নাই। ফণীগুপ্তের ক্যালিকলমের চিত্র বহুপুস্তকের অঙ্গের শ্রী বৃদ্ধি করিয়াছে। তাঁহার চিত্রগুলিতে বেশ একটা নিজস্ব ছাপ দেওয়া থাকে।

কে, সি, রায়ের উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য্যের নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটী মূর্ত্তি ও প্রতিমূর্ত্তি দর্শককে যথেষ্ট আনন্দ দান করিয়াছে। তাঁহার 'শিক্ষার অভিমান' অসম্পূর্ণ মূর্ত্তিটী অনেক সম্পূর্ণ শিল্প অপেক্ষা ভালই লাগিল।

তরুণ শিল্পী শৈলজ মুখার্জ্জির বেশ তুলিকার শক্তি জন্মিয়াছে। তাঁহার 'সুন্দরবনের জেলের দল' কয়েকটী আঁচড়েই চমৎকার চিত্রের আকার ধারণ করিয়াছে।

অতি তরুণ ভাস্কর সুনীলকুমার পালের 'বন্যা' প্রদর্শনীর মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা যে যথার্থই প্রশংসার যোগ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রদর্শনীটী তরুণ শিল্পীদের দানে পরিপূর্ণ। ভবিষ্যতের

শিল্প-জগতে ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত আশাতীত সাফল্যের অধিকারী হইবেন। উদীয়মান শিল্পীদের মধ্যে সমর ঘোষ, বীরেন দে, নির্ম্মল মজুমদার, অমিতাভ রায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছাত্রীদের বিভাগেও উৎকর্ষের লক্ষণ বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

অনেক সময় ইহা দেখা গিয়াছে যে, প্রথম যৌবনে কোন কোন শিল্পী আশাতীত প্রতিভায় পরিচয় দিয়া প্রশংসার আতিশয্যে জীবন-মধ্যাহ্নেই যেন সব হারাইয়া বসিয়া আছেন। আমাদের বিশ্বাস নবীনের দল এই পথ কদাচ অবলম্বন করিবেন না।

শীত

মনসুর রহমান

শীতের সজল কুয়াসা তিমিরে এলো পাতাঝরা দিন
শূন্য বীথির হিয়ার আথর হ'ল আশ্রয়হীন!

রিক্ত শাখায় দোদুল দোলায় কত নামহীন পাখী
ঝরা পাতাদের মরা বেদনায় জল ছল ছল আঁখি।

কোন নিরজনে লুকায়ে গাহিবে আজি পাতাহীন শাখা
বাতাসে উড়িয়া ভাবিয়া আকুল দোলায় কাজল পাখা।

এতদিন পাখী গেয়েছিল গান পরাণের ধারা ডালি
সবুজের রূপ অরূপ করেছে বনে দাবানল জ্বালি।

পাতাহীন তরু শীর্ণ কায়ায় স্মৃতির স্বপনে জাগি
অধীর হইয়া দিবস যাপিছে নবীন জীবন লাগি।

শুষ্ক-কুসুম শ্রীহীন অঙ্গে ধুলার পরাগ পরে
শ্যামল বনের ললিতা মাধবী নীরবে পড়েছে ঝরে।

হৃদি মনোরমা নীল কাঞ্চনা কালো অঞ্জন মাখি
হিমরেণু বায়ে পড়িছে ঝরিয়া ধীর অপলক আঁখি!

বন্দনাহীন ব্যথার বাসরে তন্বী-তরু ও লতা
ধূলিরঞ্জিত ধূসর অঙ্গে কহে পরাণের কথা!

আকুলতা আর ব্যাকুলতা মাঝে সম্পদহীন কায়া
কে আর মাখাবে মলিন তনুতে রূপের শ্যামল মায়া?

কে আর পরাবে কুসুম ভূষণ মাখায়ে সুরভি রেণু,
কে আর বাজাবে ছায়াহীন বনে ভুবন ভুলানো বেণু।

কে আর খেলিবে কুসুমের খেলা উষসীর জাগরণে,
কে আর ছুটিবে ব্যাকুল হইয়া পাতা ছায়াহীন বনে?

আর কি আসিবে পথিক বন্ধু দিন হ'লে অবসান
আলো ছায়াহীন এ স্নেহ-নিবাসে তৃপ্তি করিতে দান!

সেই ত সেদিন পান্থনিবাসে আলোকের রূপছটা
আগমনী বেলা মধুর করিতে এসেছিল করি ঘটা।

আজিকে যে তরু হ'ল মুকুলিত জানি না কেন যে তার
হৃদি পঞ্জরে জ্বলিয়া উঠিছে অসহ ব্যথার ভার!

মধুপ বালারা অরূপ কাননে জানি না কিসের তরে
মনের অলখে অশ্রু মুছিয়া উতলা হইয়া মরে।

এসেছিল শীত আজ চলে যায় লয়ে শ্যামলিমা রাশি
রেখে যায় শুধু স্মৃতির অরূপ বেদনার শত হাসি!

আবার কাননে নব কচি পাতা শ্যামলিমা রূপ লয়ে
কুসুম ভূষণে সাজিয়া আসিবে গন্ধে বিভোর হয়ে।

অমৃত পানে হবে বিকশিত এ বীথিকা পথ ধারে
কেহ বা ডুবিবে বিরহব্যথায় সুধার সাগর পারে।

আসিবে না শুধু ঝরা পাতাদল পুষ্পিত ফুল কলি
স্মৃতিটি রাখিয়া ঝরে গেছে যারা নবীন হৃদয় দলি।

বাংলায় হর্ষবর্দ্ধনের আধিপত্য

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ-ডি

খ্রীঃ ৬০৬ অব্দে মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন স্থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার অগ্রজ মহারাজাধিরাজ রাজ্যবর্দ্ধন কান্যকুব্জ এবং স্থানেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে গৌড়াধিপ শশাঙ্ক কর্তৃক নিহত হন। ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে হর্ষ কঠোর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। যদি কতিপয় দিবস মধ্যে তিনি পৃথিবী নি-গৌড় করিতে না পারেন, অর্থাৎ—শশাঙ্ককে বধ করিতে না পারেন তবে অগ্নিতে প্রাণবিসর্জ্জন করিবেন। ইহার পর তিনি বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া শশাঙ্কের বিরুদ্ধে পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি পথিমধ্যে শুনিতে পাইলেন যে তাঁহার ভগ্নী রাজ্যশ্রী কান্যকুব্জের কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া বিন্ধ্যবনে পলায়ন করিয়াছেন। সেনাপতি ভণ্ডীর হস্তে সৈন্য চালনার ভার দিয়া হর্ষ বিন্ধ্যবনে গমন করেন এবং রাজ্যশ্রীর উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক কিয়ৎ দিবস মধ্যে গঙ্গাতীরে ভণ্ডীর সহিত পুনরায় মিলিত হন।

বানভট্ট প্রণীত হর্ষচরিত হইতে হর্ষের গৌড়াভিযান সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছুই জানা যায় না। ৬১৯ খ্রীঃ উৎকীর্ণ গঞ্জাম তাম্রলিপি[১] দ্বারা প্রমাণ হয় যে, শশাঙ্ক অন্ততঃ ৬১৯ খ্রীঃ পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন। সুতরাং কতিপয় দিবসের মধ্যে দূরের কথা, চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে হর্ষ শশাঙ্কের ক্ষমতা কিছুমাত্র হ্রাস করিতে সমর্থ হন নাই। বলা বাহুল্য, প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ প্রাণত্যাগও তিনি করেন নাই।

চীনা পরিব্রাজক হিউএন্‌সঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্ত[২] হইতে জানিতে পারা যায়,—"হর্ষ পূর্ব্ব দেশাভিমুখে অগ্রসর হওয়া-কালীন কজঙ্গলে (বর্ত্তমান রাজমহলে) এক সভার অনুষ্ঠান করেন। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আরও জানা যায় যে, শশাঙ্কের পরবর্ত্তী মগধের রাজার নাম পূর্ণ বর্ম্মন। পূর্ণ বর্ম্মনের রাজ্যাবসানের পর হর্ষ মগধে আধিপত্য বিস্তার করেন।[৩] এই প্রমাণানুযায়ী হর্ষ ৬১৯ খ্রীঃ কিছুকাল পরে মগধ-বিজয় করিয়াছিলেন। সুতরাং মনে হয় যে, ৬৩০ খ্রীঃ নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে হর্ষ কজঙ্গলের সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কজঙ্গলের পূর্ব্বদিকস্থ দেশসমূহের বিরুদ্ধে হর্ষের সৈন্যাভিযান সম্বন্ধে চীনা গ্রন্থ হইতে কিছুই জানা যায় না।

বৌদ্ধগ্রন্থ মঞ্জুশ্রী মূলকল্পে[৪] উল্লিখিত আছে যে, "ব্রাহ্মণ-বংশে সোমাখ্য নৃপতির জন্ম হয়। "র"কারাখ্য নৃপতি জাতিতে বৈশ্য ছিলেন। "র"কারাখ্য নৃপতি নীচজাতীয় এক নৃপতি কর্ত্তৃক নিহত হন। "র"কারাখ্য নৃপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা "হ"কারাখ্য নৃপতি পূর্ব্বদেশের অন্তর্গত পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে সোমাখ্য নৃপতির সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করেন। সোমাখ্য নৃপতি পরাজিত হন। তাঁহাকে তাঁহার নিজ দেশে থাকিতে আদেশ করা হয় ও পশ্চিম দেশাভিমুখে আসিতে নিষেধ করা হয়। অতঃপর 'হ'কারাখ্য নৃপতি

১. Epigraphia Indica, vol. xi.

২. Watters: "On Yuan-chwang, vol. ii, p. 182,

৩. Ibid, p. 115.

৪ ভবিষ্যতে চ তদা কালে মধ্যদেশে নৃপোবরঃ।
রকারাদ্যোত যুক্তাত্মা বৈশ্য বৃত্তিম চঞ্চলঃ॥৭১৯
শাসনেঽস্মি তথাশক্ত সোমাখ্য সসমো নৃপ।
সোঽপি যাতি তবাস্তেন নগ্নজাতি নৃপেন তু॥৭২০
তস্যাপ্যনুজো হকারাখ্য একবীর ভবিষ্যতি।
মহাসৈন্য সমাযুক্তঃ শূরঃ একান্ত বিক্রমঃ॥৭২১
নির্ধারয়ে হকারাখ্যো নৃপতিং সোম বিশ্রুতমঃ।
বৈশ্যবৃত্তি স্ততো রাজা মহাসৈন্যো মহাবলঃ॥৭২২
পূর্ব্বদেশং তদাজগ্মু পুণ্ড্রাখ্যং পুরমুত্তমম্।
ক্ষাত্রধর্ম্মং সমাশৃত্য মানরোষমশীলনঃ॥৭২৩
পরাজয়ামাস সোমাখ্যং দুষ্ট কর্ম্মানু চারিণম্।
ততো নিষিদ্ধঃ সোমাখ্যো স্বদেশেনাবতিষ্ঠতঃ॥৭২৫
নিবর্ত্তয়ামাস হকারাখ্য ম্লেচ্ছরাজ্যেমপূজিতঃ।
তুষ্টকর্ম্মা হকারাখ্যো নৃপঃ শ্রেয়সাচার্থধর্ম্মিনঃ॥৭২৬
স্বদেশে নৈব প্রয়াতঃ যথেষ্ট গতিনাপি বা।
তৈরেব কারিতং কর্ম্ম রাজ্য হর্ষসমন্বিতৈঃ॥৭২৭

—Imperial History of India in a Sanskrit Text, by K. P. Jayaswal.

ম্লেচ্ছরাজ্যে অনাদৃত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি সোমাখ্য নৃপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছেন ইহাতেই নিজেকে বিশেষ গৌরবযুক্ত মনে করেন। সোমাখ্য নৃপতি সতর বৎসর একমাস সাতদিন রাজত্ব করিয়া নরকে গমন করেন। তাহার পর গৌড়রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। একজন রাজা সাতদিন রাজত্ব করেন। আর একজন একমাস সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন! ইহার পর সোমাখ্য নৃপতির পুত্র মানব আট মাস পাঁচদিন রাজত্ব করেন। মানবের রাজত্বাবসানের পর নাগবংশীয় জয়নাগ রাজা হ'ন।"

কয়েকজন ঐতিহাসিকের মতে সোমাখ্য বলিতে শশাঙ্ককে, 'র'কারাখ্য বলিতে রাজ্যবর্দ্ধনকে ও 'হ'কারাখ্য বলিতে হর্ষবর্দ্ধনকে বুঝিতে হইবে।

মঞ্জুশ্রী গ্রন্থে লিখিত উপরোক্ত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন: হর্ষ দুইবার গৌড়-বঙ্গ আক্রমণ করেন। তাঁহার প্রথম বারের আক্রমণ নিষ্ফল হয়। দ্বিতীয় বারের অভিযানে শশাঙ্ক অথবা তাঁহার অজ্ঞাত বংশ-ধরকে পরাস্ত করিয়া তিনি সমগ্র গৌড়, বঙ্গ, রাঢ়া ও সমতট আপনার আয়ত্তাধীনে আনয়ন করেন। তৎপর তিনি গৌড়, বঙ্গ ও সমতট স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত রাখিয়া কর্ণসুবর্ণ কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্ম্মের হস্তে অর্পণ করেন।

মঞ্জুশ্রী-বর্ণিত ঐতিহাসিক তথ্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টিগোচর হইবার বহু পূর্ব্বে ডক্টর ভিনসেণ্ট এ স্মিথ, রায় বাহাদুর শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতি ইতিহাস-রচয়িতাগণ বর্ত্তমান সমগ্র বঙ্গদেশ হর্ষের শাসনাধীনে ছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে,'হর্ষচরিত এবং হিউএন-সঙ্গের বিবরণ হইতে হর্ষের বর্ত্তমান বঙ্গে আধিপত্য বিস্তারের কোনই আভাস পাওয়া যায় না। মঞ্জুশ্রীর বিবরণ সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, যদিও হর্ষ কর্ত্তৃক শশাঙ্ক যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন, হর্ষ বঙ্গে আপন আধিপত্য বিস্তারে অকৃতকার্য্য হইয়া স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক এবং তাহার বংশধরের রাজত্বাবসানের পর জয়নাগ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। জয় নাগ কর্ত্তৃক কর্ণসুবর্ণ হইতে প্রকাশিত একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে।৫

বলা বাহুল্য, জয় নাগের রাজ্যকাল ৬১৯ খ্রীঃএর পরবর্ত্তী সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল।

অতএব দেখা যাইতেছে যে হর্ষচরিতে, হিউএনসঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্তে ও মঞ্জুশ্রী মূলকল্পে হর্ষের বঙ্গে আধিপত্য বিস্তারের কোনই উল্লেখ নাই।

জয় নাগের মৃত্যুর পর অর্থাৎ—খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে সমগ্র বঙ্গদেশ কাহার শাসনাধীন ছিল এই সমস্যার সমাধান করিতে পারিলেই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

হিউএনসঙ্গ খ্রীঃ ৬৩৯ অব্দে বঙ্গদেশে পদার্পণ করেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সব প্রদেশগুলির রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি নীরব। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, এই সময় সমগ্র বঙ্গদেশ হর্ষের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল বলিয়া হিউএনসঙ্গ ইহার রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে উল্লেখ করেন নাই। এই যুক্তির সারমর্ম্ম বুঝা কঠিন। হিউএনসঙ্গ অন্ধ্র দেশের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে কিছু উল্লেখ করেন নাই। সমসাময়িক তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে, হিউএনসঙ্গের অন্ধ্রদেশ পরিভ্রমণ কালে বেঙ্গির চালুক্যবংশীয় নৃপতিগণ ঐ দেশের অধিপতি ছিলেন। সুতরাং হিউএনসঙ্গের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বাঙ্গলার শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকায় হর্ষের বঙ্গে আধিপত্য বিস্তারের প্রমাণ হয় না।

হিউএনসঙ্গের জীবনীতে প্রকাশিত একটি ঘটনা হইতে তাঁহার ভারত-ভ্রমণকালীন গৌড়দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কিছু আভাস পাওয়া যায়।৬

৬৪২ খ্রীঃ হর্ষবর্দ্ধন উড়িষ্যা হইতে কজঙ্গলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর শুনিতে পান যে হিউএনসঙ্গ কামরূপে ভাস্কর-বর্ম্মার অতিথি হইয়া বাস করিতেছেন। হর্ষ দূতমুখে ভাস্কর বর্ম্মার নিকট চীনা পরিব্রাজককে কজঙ্গলে পাঠাইবার জন্য সংবাদ প্রেরণ করিলেন। ভাস্কর বর্ম্মা তাঁহার মস্তকের

৫। Epigraphia Indica, vol. xii.
৬। Life of Hiuen Tsiang, by Beal, p. 172.

বিনিময়েও চীনা পরিব্রাজককে ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিলেন। ভাস্কর বর্ম্মার এই উদ্ধত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া হর্ষ ভাস্করবর্ম্মাকে তাঁহার মস্তক পাঠাইবার জন্য সংবাদ প্রেরণ করিলেন। ভাস্করবর্ম্মা ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিশ হাজার হস্তী সৈন্য ও ত্রিশ হাজার রণতরী সহ কজঙ্গলাভিমুখে রওনা হইলেন এবং গঙ্গা বাহিয়া কিছুকালের মধ্যে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, ভাস্কর বর্ম্মা এই বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া কামরূপ হইতে গৌড়দেশ অতিক্রম করিয়া কজঙ্গলে পহুঁছিয়াছিলেন। হিউএনসঙ্গ স্বয়ং এই বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন, সুতরাং তাঁহার এই বিবরণ সত্য বলিয়া গ্রহণযোগ্য। ইহার ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে এই সময় গৌড়দেশ ভাস্কর বর্ম্মার রাজ্যভুক্ত ছিল। এই সময় গৌড়দেশ যদি হর্ষ কিংবা অন্য কোন নরপতির শাসনাধীন থাকিত তবে ভাস্করবর্ম্মা বিনা বাধায় এই বিপুল সৈন্য লইয়া কিছুতেই গৌড়দেশ অতিক্রম করিয়া কজঙ্গলে যাইতে পারিতেন না। নিধানপুরে আবিষ্কৃত তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে, ভাস্কর বর্ম্মা গৌড় ও রাঢ়ায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ভাস্কর বর্ম্মার গৌড় ও রাঢ়া বিজয়ের তারিখ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু নিধানপুর তাম্রলিপির সহিত হিউএনসঙ্গের জীবনীতে প্রকাশিত উপরিল্লিখিত ঘটনাবলীর সমালোচনা করিলে প্রমাণ হয় যে খ্রীঃ ৬৪২ অব্দে গৌড় ও রাঢ়া ভাস্করবর্ম্মার শাসনাধীন ছিল। এই সব প্রমাণাদি হইতে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, জয় নাগের মৃত্যুর পর অন্তত খ্রীঃ ৬৪২ অব্দ পর্য্যন্ত ভাস্কর বর্ম্মা গৌড় ও রাঢ়ার অধিপতি ছিলেন।

চীনা পরিব্রাজক ইৎসিঙ্গের বিবরণীতে আছে যে খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে রাজভট সমতটের অধিপতি ছিলেন।[৭] পণ্ডিতগণ ইৎসিঙ্গ-বর্ণিত রাজভট এবং খড়্গবংশীয় রাজভট অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। খড়্গাবংশীয় নৃপতিগণ বঙ্গ ও সমতটের অধীশ্বর ছিলেন। রাজভটের পিতা নৃপতি দেবখড়্গ ছিলেন। দেবখড়্গ নৃপতি জাতখড়্গের পুত্র ছিলেন এবং জাতখড়্গের পিতা নৃপতি খড়্গোদ্দম ছিলেন। পণ্ডিতগণ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কোন রাজবংশের রাজত্বের স্থিতিকাল জানিবার সঠিক প্রমাণ না থাকিলে ঐ বংশের প্রত্যেক রাজার রাজত্বকাল গড়ে পঁচিশ বৎসর ধরিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা খুব কম। এই সূত্রানুযায়ী খড়্গাবংশের প্রতিষ্ঠাতা খড়্গোদ্দমের রাজত্বকালের আরম্ভ খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে নির্দ্ধারিত হইবে।

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, হর্ষের রাজত্বকালে খড়্গাবংশীয় নৃপতিগণ বঙ্গ ও সমতটের স্বাধীন নৃপতি ছিলেন।

উপরোক্ত প্রমাণাদি হইতে এই সিদ্ধান্ত হইবে যে, হর্ষ কোন সময়েই বাংলার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হ'ন নাই। হর্ষের রাজত্বকালে গৌড় ও রাঢ়া শশাঙ্ক, জয় নাগ ও ভাস্কর বর্ম্মার শাসনাধীন ছিল এবং খড়্গাবংশীয় নরপতিগণ সমতটের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৭। Beals' Life of Hiuen Tsiang, Introduction, p. xxx

তিস্তায় প্রভাত

কে, এম, শমশের আলী

প্রভাত হইল নিশি তন্দ্রাচ্ছন্ন ত্রিস্রোতার তীরে,
সদ্য-স্নাতা কুমারীর আলো-রাঙা নিটোল যৌবন
প্রাচীর অঙ্গন-তলে লাজ লাস্যে জাগে ধীরে ধীরে,
নিদ্রা-মৌন ধরা কার হেম-স্পর্শে হ'ল সচেতন।
অনন্ত প্রেমিক পাখী চক্রবাক প্রিয়া সনে তার
কল স্রোতা ত্রিস্রোতার বালুময় সিক্ত বেলাভূমে
প্রাণপণে কি যেন খুঁজিয়া ফিরে। মুকুতার হার
শ্যামল তৃণের দলে ঝলসিছে হেম আলো চুমে।
কুহেলী কুয়াসা ঢাকা সুবিস্তীর্ণ জলরাশি হ'তে
অকস্মাৎ আদিম আলোক-রশ্মি উদিল বিহসি
ছড়াইল দেবগণ চতুর্দ্দিকে কাঞ্চনের গুঁড়া।
জলধি, কানন, কুঞ্জ, উচ্চ শির ভূধরের চূড়া—
রঙে রাঙি' মাতোয়ারা, উল্লসিত হাসিল উর্বসী,
প্রভাতী অরুণ-বিভা দেখা দিল সপ্তাশ্বের রথে।

ধূসর লগ্ন

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

সামনের বাড়ীতে শানাই বাজিতেছে।

ঘন কুয়াশাভরা শীতের সকালে শানাইয়ের করুণ মূর্চ্ছনা যেন ব্যথিতের মর্ম্মান্তিক গোপন মর্ম্মবেদনা। প্রভাতীর সুরে শানাই কিন্তু মাঙ্গলিকীরই সূচনা জানাইতেছে।

লেপটাকে আরও গাঢ়ভাবে টানিয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম। ঘরের অভ্যন্তরস্থ ঘড়িটির টিক্ টিক্ শব্দ শানাইয়ের মূর্চ্ছনায় ডুবিয়া গেছে।

মহানগরীর বিপুল কর্ম্ম-কোলাহল এখনও পরিপূর্ণরূপে জাগিয়া ওঠে নাই; স্তব্ধতার মাঝে শানাই যেন একটা ভাবের রূপ আনিয়া দিতেছে।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই যন্ত্রের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই নগরী জাগিয়া উঠিল। মোটরের হর্ন, রিক্সার টুং টাং, আর পথচারির পদক্ষেপের আঘাতে নিদ্রিতা নগরীর আত্মচেতনা ফিরিয়া আসিল।

আবার সেই যন্ত্রের ঘর্ঘর শব্দ, বিপুল কর্ম্মময় জগতের কর্ম্ম-কোলাহল; শানাইয়ের প্রভাতীর সেই করুণ মূর্চ্ছনার সুরটিও বুঝি বা হারাইয়া গেছে!

গৃহিণী আসিয়া তুলিয়া দিলেন, বেলা অনেক হয়ে গেছে, মুখহাত ধুয়ে নাও, ঠাকুর চা নিয়ে আস্‌ছে।

উঠিতে হইবে—হ্যাঁ, এইবার উঠিতে হইবে। রাত্রির মাদকতা আর নাই। বিশ্রামের অবকাশ-বেলা ফুরাইয়া আসিয়াছে।

আবার জাগরণ, কাজ আর কাজ! সংসারের শতকোটি ফাই-ফরমায়েস অফিসের তাগাদা, জীবনের প্রয়োজন, নিদ্রা হইতে জাগরণ! রাত্রির পরমায়ু অত্যন্ত ক্ষীণ, বেসুরা শানাই শুনিয়া মনে হইল, রাত্রির পরমায়ু অত্যন্ত ক্ষীণ!

বারান্দায় চায়ের কাপের সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক সংবাদ-পত্রও আসিল।

রাজনীতি, সমাজনীতি, কংগ্রেস্, ফরওয়ার্ড ব্লক, হিন্দু-মহাসভা, মুস্লিমলীগ, নারীহরণ, মাম্‌লা-মোকর্দ্দমা, খেলার খবর, পল্লীসংবাদ—বিপুল বিশ্বের বিপুলতম বৈচিত্র্যময় সংবাদে ভারাক্রান্ত। কিন্তু হেডিংএর পরই চোখ বুলাইবার অবকাশ মেলে না।

গৃহিণীর নিকট হইতে বাজারের ফর্দ্দ আসিল।

নূতন গুড় উঠিয়াছে। কপি, কড়াইশুঁটি, গল্‌দা চিংড়ি—এই সময়ই তো আহারের বিলাস!—চাকরের দ্বারা কি আর বাজার করা সম্ভব? শুধু পয়সাগুলোই নষ্ট!

এবারের চালটা ভালো দেয় নাই। পূর্ব্বের তুলনায় অনেক মোটা অথচ দাম একই লইয়াছে। কয়লাওয়ালা ফাঁকী দিয়াছে, শুধু কয়লাই পোড়ে অথচ আঁচ হয় না।

ছেলেমেয়েরাও আসিল—অসংখ্য অভিযোগ আর অভাব!

গৃহ শিক্ষক বেতন চাহিয়াছে—ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকের নূতন ভালো 'নোট' বাহির হইয়াছে। শীত পড়িয়াছে, ভালো গরম পোষাক নাই ইত্যাদি—ইত্যাদি!

ঘড়ির কাঁটাটিও চলিয়াছে মুহূর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়া!

সকলের অভাব অভিযোগই পড়িয়া রহিল—দৃষ্টি দিবার অবকাশ নাই।

ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজিয়া গেছে।

উঠিয়া স্নানঘরে প্রবেশ করিতে হইল, জীবনের প্রয়োজনের তাগিদ্ কাহারও অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে না।

সাম্‌নের বাড়ী বিবাহোৎসবে মাতিয়াছে। পাতায় পাতায় ফুলে রঙে সুশোভিত।

উৎসব মুখরিত গৃহমাঝে মাঙ্গলিকী বাজিয়া বাজিয়া চলিয়াছে। কলহাস্যের কলকাকুলি আনন্দ-প্রীতির বন্যা আর উচ্ছ্বাসের সুরু—সামনের বাড়ীকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু সেদিকে আর লক্ষ্য করিবার অবকাশ নাই।

অফিস বাহির হইবার সময় গৃহিণী জানাইলেন, ওগো আজ আবার সামনের বাড়ী বিয়ে, নেমন্তন্ন আছে, আসবার সময় একখানা শাড়ী কিনে এনো।

সমস্ত দিন অফিসের কর্ম্মচক্রে ক্লিষ্ট চিত্ত সামনের বাড়ীর

মাঙ্গলিকী উৎসবের প্রভাতী সুরের মূর্চ্ছনা মন হইতে কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। বস্তুতন্ত্রের কাছে ভাববিলাসের স্থান নাই।

অফিস হইতে গৃহে ফিরিবার পথে মার্কেটে নামা গেল। নগরীর বুকে সন্ধ্যালোকের ছায়া চারিদিকের আলোকমালা জন-কোলাহল আর মোটরগাড়ী বাস ট্রাম—নগরীর রূপোজ্জ্বল সন্ধ্যা।

কপিওয়ালার সহিত দরদস্তুর করিয়া কপি কেনা হইল, বড় চিঙ্ড়ি মাছও।

ছেলেমেয়েদের কয়েকটি গরম পোষাক, সামনের বাড়ীর মেয়েটির জন্ম একখানি রঙিন শাড়ী, অনেকগুলি অর্থই ব্যয় হইয়া গেল। এখনও ছেলেমেয়েদের স্কুলের মাহিনা গৃহশিক্ষক আর চাকর-পাচকের বেতন—শুধু খরচ আর খরচ।

কিন্তু তবুও যেন মনে কেমন করিয়া না জানি খানিকটা রঙের পরশ লাগিয়া গেল।

শো-কেশের ওই সুদৃশ্য শাড়ীগুলি! বর্ণশোভায় যেন ঝলমল করিতেছে। গৃহিণীর জন্ম একখানি শাড়ী কিনিতে পারিলে হয়।

ফিকে নীল একখানি সিল্কের শাড়ী, ছোট সাদা কার্ডে তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত করা রহিয়াছে। দশটাকা বারো আনা। ঘুরিয়া ফিরিয়া বহু রকমে দেখিয়া শুনিয়া ওইখানিই কেমন না-জানি ভারী পছন্দ হইয়া গেল।

গৃহিণীর বয়স, সংসারের প্রয়োজন, মনের কোণ হইতে সব কিছুই যেন মুছিয়া গেছে।

অতীত দিনের কোন্ এক দুর্লভ লগ্নের আলোকিত রাত্রির মাঙ্গলিকী বাঁশী চিত্তের গোপন মর্ম্মকোণে আজ সহসা আবার বাজিয়া উঠিল।

দশটাকা বারো আনা—যাক্ গে, অত হিসাব করিয়া চলিতে হইলে জীবন অচল হইয়া যায়।

দশটাকা বারো আনা দিয়া শাড়ীখানি লইয়া আবার ট্রামে উঠিয়া বসা গেল।

উচ্ছ্বাসের সুরে হৃদয় আজ পরিপ্লাবিত।

'শীতের সন্ধ্যার কন্ কনে ঠাণ্ডা হাওয়া, ট্রামের গতি আর পথের দৃশ্য, নগরীর উজ্জ্বলতম আলোকমালা—জীবনের মালিন্যকে আজ যেন ডুবাইয়া দিয়াছে।

চারিদিকে শুধু আলো আর আলো, রূপ আর রং। মাথার উপর সঙ্কীর্ণ আকাশ, আজ তাহাও লক্ষ তারকায় ভরা—নীল পটভূমিকায় হীরকের দীপ্তি—সীমান্তের পরিপূর্ণ চাঁদ ওই বড় বাড়ীটার আলিশার কোণে যেন ডুবিয়া গেছে।

ট্রাম আসিয়া গৃহ-পথে থামিয়া গেল।

গৃহে প্রবেশ করিতে আবার সেই শানায়ের সুর—পূরবীর মূর্চ্ছনায় সুরের আবেগ বুঝি ভাঙিয়া পড়িতেছে।

তীব্র আলোকমালায় বিবাহ বাড়ী সুশোভিত। ঘন ঘন উলুধ্বনিতে আর কলকাকুলিতে সামনের বাড়ী যেন হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে।

গৃহে প্রবেশ করিতে গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন—ওবাড়ীর জন্যে কাপড় এনেছ?

হাতের বোঝা নামাইয়া দিলাম। কপি, কড়াই শুঁটি, গলদা চিঙ্ড়ি—ছেলেমেয়েদের গরম পোষাক—সামনের বাড়ীর লৌকিকতা—কিছুই বাদ পড়ে নাই। গৃহিণী উৎফুল্ল।

কিন্তু এ নীল ফিকে সিল্কের শাড়ী আবার কার জন্যে এনেছ?

হাসিয়া কহিলাম—তোমার জন্যে।

গৃহিণী তো অবাক্! তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? এই শাড়ী পরবার কি আর বয়েস আছে? অপব্যয়—রমারও এ শাড়ী অনেক বড় হবে। যাও, এক্ষুনি ফেরত দিয়ে এস। বুড়ো বয়সে তোমার যেন ভীমরতি ধরেছে। কত দাম নিলে?

দশটাকা বারো আনা।

দশটাকা বারো আনা! অবাক বিস্ময়ের সহিত গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন।

নিজের নির্বুদ্ধিতায় আমি হতবাক্ হইয়া গেলাম।

সামনের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যেন চমকাইয়া উঠিলাম—সামনের কেশভাগ বিরল হইয়া আসিয়াছে—টাক পড়িয়া যেন বার্দ্ধক্যের সূচনা জানাইতেছে।

গৃহিণীর মুখেরও আর সে কমনীয়তা নাই। ললাটে মসীরেখা, চক্ষু যেন দীপ্তিহীন।

সত্যিই পাগল হইয়া গেছি। দশটাকা বারো আনার সিল্কের শাড়ীখানি লইয়া উঠিয়া পড়িলাম—ফেরত দিতে হইবে। অপব্যয় এবং নিতান্তই অসামাজিক।

গৃহিণী নির্দ্দেশ দিলেন, উহার বদলে ভাল দেখিয়া জ্যেষ্ঠ কন্যা রমার জন্য একখানি ন-হাতী রঙিন শাড়ী আনিতে।

সামনের বাড়ীর শানাই আবার নূতন সুরের বন্দনা-গীতি সুরু করিয়াছে—ঘন ঘন উলুধ্বনিও শোনা যাইতেছে।

বারান্দা হইতে দেখা গেল, ও-বাড়ীর বর আসিয়াছে।

চক্রাবর্ত্তন বনাম ক্রমবিকাশ

(Repetition or Evolution ?)

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম-এস-সি ও অধ্যাপক শ্রীশচীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম-এস-সি, বি-টি

মানুষের চিন্তাধারা আলোচনা করিলে—চক্রাবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশ—ইহার কোন্‌টি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহা বলা দুষ্কর। মোটামুটিভাবে ইহা হয়ত বলা যায় যে, প্রাচ্য চিন্তাধারায় প্রথমটির প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট। কর্ম্মফলবাদ, শাস্ত্রের বচন—'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ'—ইত্যাদিতে বোধ হয় প্রথম মতেরই পোষকতা করা হইয়াছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে বলিয়াছেন—'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং'—ইহাও চক্রাবর্ত্তন মতবাদেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। পাশ্চাত্য চিন্তাধারায়—বিশেষ করিয়া বিজ্ঞানে—ক্রমবিকাশ বা ক্রমবিবর্ত্তনেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। আমরা এই প্রবন্ধে সঠিকভাবে কোন চূড়ান্ত রায় না দিয়াও ইহা দেখাইতে সমর্থ হইব যে, মানবজাতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ, তথা তাহার উচ্চাঙ্গের সাধনার বিষয়বস্তু—যথা বিজ্ঞান এবং দর্শন, যে চিন্তাধারা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা সকল সময়েই একটানা ক্রমবিকাশের পরিচায়ক নহে, পরন্তু তাহাও চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে, অর্থাৎ—তাহারও উত্থান-পতন আছে। বিজ্ঞান-দর্শনের আলোচনার পূর্ব্বে মানুষের সাধারণ আচারব্যবহার, পোষাক এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা ধরা যাউক। ডি'রোজিওর সময়ে বাংলা দেশে যখন প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল তখন মাইকেল মধুসূদন প্রমুখ তাঁহার ছাত্রগণ প্রকাশ্যে মদ্যপান এবং নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দেওয়া গৌরবজনক মনে করিতেন। তারপর কিছুদিন ধরিয়া চলিল ইংরেজী শিক্ষিতমহলে পান-ভোজনের এই স্বৈরাচার। এখন কিন্তু ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে অন্যরূপ। মদ্যপান তো দূরের কথা, অসামাজিক কোনরূপ আহারবিহারও শিক্ষিত সমাজে আর তেমন প্রশ্রয় পায় না। এমন কি, কোন কোন ডাক্তার—বিশেষজ্ঞের মত হিসাবে—এমনও প্রচার করিয়া থাকেন যে শুধু নিরামিষাহারই নহে, আতপ তণ্ডুল এবং কাঁচা কদলীর মাহাত্ম্যও অপরিসীম। 'Back to the village'—এই রবও অধুনা জোর গলায় প্রচারিত হইতেছে। বিলাত-ফেরতরা পূর্ব্বে দেশে ফিরিয়া বিলিতি সাহেবদেরও হার মানাইতেন। কথা বলিতেন ইংরেজীতে, চিন্তা করিতেন ইংরেজীতে, বোধ করি বা স্বপ্নও দেখিতেন ইংরেজীতে। আহারবিহারের তো কথাই নাই। হালের বিলাত-ফেরতরা ধুতি তো পরেনই, হুঁকাও বাদ দেন না। বিলাতের মেমসাহেবরা পূর্ব্বে যে গাউন পরিতেন তাহা গোঁড়ালিরও নিম্ন পর্য্যন্ত পৌঁছিত—বস্ত্রবাহী অনুচরীরা উহা ধরিয়া থাকিত। ক্রমে স্কার্ট (পরশুরাম স্বয়ংবরা গল্পে কেদার চাটুয্যের মুখে যাহাকে বাঁদিপোতার গামছা বলিয়াছেন) হাঁটুর উপরে উঠিল। এখন আবার নামিতেছে। বাঙ্গালীবাবুদের আদি ও অকৃত্রিম পোষাক শার্টের কথাই ধরা যাউক। প্রথমে হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুল ছিল, মাঝখানে কিছুদিন চলিল একেবারে কোমর পর্য্যন্ত—এখন আবার সাবেক ঝুলই ফ্যাসান দাঁড়াইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে জংলী শাড়ী বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু এখন বোধ হয় পুনরায় জঙ্গলে গিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছে।

ঠাকুরমা-ঠানদিদিদের কানবালা ও বাজু মাঝে কিছুদিন একেবারে বরবাদ হইয়া পুনরায় ঝুমকা এবং আর্ম্মলেট-রূপে দেখা দিয়া স্বামী বেচারাদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। অপর পক্ষে, রৌপ্যালঙ্কারের পুনঃ প্রচলন হইয়া তাহাদের কতকটা স্বস্তিও দিয়াছে (বিধাতা করুন, এই রৌপ্যপ্রীতি যেন দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয়!) সিঁদুরের ফোঁটাও আবার বড় হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও কলিনস্ প্রভৃতি টুথ্‌পেষ্ট এবং বুরুশ না হইলে আমরা দাঁত পরিষ্কার করিতে পারিতাম না। বর্ত্তমানে আবার নিমের দাঁতন এবং দেশী মাজনের বহুল প্রচলন সুরু হইয়াছে। প্রস্তর যুগ, লৌহযুগ ছাড়াইয়া আমরা যেন য়্যালিউমিনিয়ম যুগে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। ফলে মাটীর হাঁড়ির হইল নির্ব্বাসন এবং গৃহলক্ষ্মীদের রন্ধনশালার সজ্জা হইল য়্যালুমিনিয়মের

বাসন। হালে কিন্তু আবার ধুয়া উঠিয়াছে—মাটীর বাসনে খাওয়া স্বাস্থ্যকর ইত্যাদি। প্রগতিশীল মানব আমরা—ঠাকুরমা ঠানদিদিদের কোন দিনই ভাল চোখে দেখিতাম না। শিশুদের ন্যাংটা করিয়া রোদে ফেলিয়া তাঁহারা যে তৈল মাখাইতেন আমরা উহাকে বলিতাম—অসভ্য নোংরামি। তাই তৈলের পরিবর্ত্তে কিনিতাম সাবান পাউডার—আরও কত কি! এখন কিন্তু ডাক্তাররাও বলেন—খালি গায়ে বাতাস লাগাও, তেল মাখিয়া রোদে ফেলিয়া রাখ—ক্যালসিয়ম শোষণের পক্ষে উহা সহায়ক। সুইজরলণ্ডের বিশ্ববিখ্যাত হাসপাতালেও সান্ বেদিং-এর রেওয়াজ আছে। বলিতে হয়—'ঠাকুরমা ঠানদিদি কি জয়!' আয়ুর্ব্বেদের কথা ধরা যাউক। পাশ্চাত্য চিকিৎসার মোহমুগ্ধ ভারতীয়ের অনাদরে ও অবহেলায় ইহার চর্চ্চা দেশ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছিল। এখন কিন্তু মকরধ্বজের চাহিদা এত বাড়িয়াছে যে জার্মানীর বিখ্যাত মার্ক কোম্পানীও ইহা প্রস্তুত করিতেছেন। শক্তি ঔষধালয়ের এলাকা বিদেশেও বিস্তৃত হইতেছে। এন্জার্স ইমালসনের অপেক্ষা চ্যবনপ্রাশের কাটতি অধুনা কম নহে। ডাক্তারগণ এখন হরলিক্স্ প্রভৃতি কৃত্রিম দুগ্ধজাত খাদ্য অপেক্ষা মাতৃদুগ্ধ এবং টাটকা গোদুগ্ধেরই বেশী পক্ষপাতী। মেয়েদের নামকরণে দেখা যায়—ইলা, বেলা, রেবা, রেখার যুগ কাটিয়া পুনরায় সাবিত্রী, গায়ত্রী, মৈত্রেয়ী, খনা, ভারতী ও অরুন্ধতীর যুগ আসিয়াছে। সভা-সমিতিতে মাঙ্গলিক ও প্রশস্তির এবং শোভাযাত্রায় শঙ্খধ্বনি ও লাজবৃষ্টির পুনরায় প্রচলন হইতেছে।

সাধারণ বিষয়ের উদাহরণ আর বাড়াইয়া লাভ নাই—এইবার অপেক্ষাকৃত গুরু বিষয়ের অবতারণা করা যাউক। বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, যদিও অনেক ক্ষেত্রেই ক্রমবিকাশের নিরবচ্ছিন্ন ধারা সুস্পষ্ট রূপে বিদ্যমান, তথাপি সকল ক্ষেত্রে নহে। এখানেও ব্যতিক্রমের উদাহরণ এবং পুরাতনের পুনরভ্যুত্থান যে কোন ক্ষেত্রেই হয় নাই এমন নহে। অবশ্য পুরাতন হুবহু পুরাতনের রূপেই ফিরিয়া আসে নাই, আসিয়াছে সম্পূর্ণ নূতনের রূপ ধরিয়া, কিন্তু যে সত্যের কণা পুরাতনের গর্ভে নিহিত ছিল তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অকাট্য প্রমাণস্বরূপ আনিয়াছে সঙ্গে করিয়া নূতন তথ্য, নূতন দৃষ্টিভঙ্গি এবং নূতন আলোক। ইহারই কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেখাইব।

রসায়নের পূর্ব্ব-পুরুষেরা ছিলেন আরব দেশের এলকেমিষ্টগণ (alchemists)। তাঁহাদের একমাত্র ধ্যান-ধারণার বিষয় ছিল, জীবনকে ঐশ্বর্য্যে এবং স্বাস্থ্যে পরিপূর্ণ করিয়া তোলা। সুতরাং তাঁহারা পরশপাথরের (Touch Stone) সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন—যাহার স্পর্শমাত্রেই সমস্ত নিকৃষ্ট ধাতু মহামূল্য স্বর্ণে রূপান্তরিত হইবে। আর ছিলেন অমৃতের (elixir of life) সন্ধানে—যাহা সেবন করিয়া মানুষ দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করিতে পারিবে। কিন্তু রসায়নের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা শীঘ্রই তাঁহাদের অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিবার এই প্রয়াসকে বাতুলতা বই কিছু ভাবিতে পারিলাম না। আজ বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে অবস্থান করিয়া কিন্তু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে আর বাতুলতা বলিতে ভরসা পাইতেছেন না। কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল সেই সম্বন্ধেই অতি সংক্ষেপে দু-এক কথা বলিব।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ডলটন্ (Dalton) তাঁহার প্রসিদ্ধ পরমাণু তত্ত্ব ঘোষণা করিলেন। ইহাও সম্পূর্ণ নূতন কিছু নহে—প্রাচ্য দার্শনিকের মতবাদের চক্রাবর্ত্তনে পুনরাবির্ভাব। ইহারই কিছু পরে প্রাউট (Prout) দেখিলেন যে, হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন এক ধরিলে, অন্যান্য মৌলিক পদার্থের পরমাণুর আনুপাতিক ওজন প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই ভগ্নাংশবিহীন এক একটি পূর্ণসংখ্যা (whole number) পাওয়া যায়। ইহা হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণুই বিভিন্নসংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু লইয়া গঠিত। ইহা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে লৌহকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করিতে পারা অন্তত যুক্তির দিক হইতে একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের দরবারে প্রাউটের সিদ্ধান্ত এলকেমিষ্টগণের পাগলামি অপেক্ষা অধিক কদর পাইল না। শীঘ্রই দেখা গেল, এমন অনেক মৌলিক পদার্থ আছে যাহাদের পরমাণুর আনুপাতিক ওজন নিশ্চিতভাবে ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যা। সুতরাং প্রত্যেক পদার্থেরই মূল উপাদান হাইড্রোজেন—ইহা স্বীকৃত হইল না। ইহারই বহু বৎসর পরে য়্যাষ্টন (Aston) তাঁহার Isotope-এর গবেষণা প্রকাশ

করিলেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নহে, কিন্তু এই গবেষণার ফলে যখন ভগ্নাংশযুক্ত আনুপাতিক ওজনের ব্যাখ্যা পাওয়া গেল, তখন একথা নিঃসংশয়ে বোঝা গেল যে প্রাউটের সিদ্ধান্ত যে মূলতই প্রমাদপূর্ণ—জোর করিয়া একথা বলিবার আর কোন পথ রহিল না। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিংশ শতাব্দীতে পরমাণুর গঠনতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত গবেষণা চলিতে লাগিল তাহা বিজ্ঞানের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। তাহারও বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নহে। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক পদার্থের পরমাণুই যে এক একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সৌরজগতের ন্যায় তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। সৌরজগতে সূর্য্য যেমন কেন্দ্রে অবস্থান করিয়া উহার চতুর্দ্দিকের ঘূর্ণ্যমান গ্রহগুলির গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তেমন পরমাণুর বেলায়ও কেন্দ্রে কতগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট ধনাত্মক বিদ্যুৎ-সমন্বিত প্রোটন তাহার চতুর্দ্দিকস্থ ঘূর্ণ্যমান ঋণাত্মক তড়িৎবাহী বিদ্যুতিন (electron)-গুলির গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। পরমাণুর ওজন সমস্তই এই প্রোটনের দরুণ এবং বিদ্যুতিনগুলির সেই তুলনায় প্রায় কোন ওজনই নাই বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। সুতরাং সৌরজগতে যে শক্তি এই গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আর পরমাণুর বেলায় এই শক্তি তাড়িৎ শক্তি। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে বিভিন্ন সংখ্যক প্রোটন এবং বিদ্যুতিন বিদ্যমান। হাইড্রোজেনের পরমাণুতে মাত্র একটি প্রোটন এবং ইহাকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে এইরূপ একটি মাত্র বিদ্যুতিন আছে। পরমাণুর মধ্যে হাইড্রোজেন পরমাণুই সর্ব্বাপেক্ষা কম জটিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু লইয়া গঠিত—প্রাউটের এই সিদ্ধান্ত পুনরায় গৃহীত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ রুশীয় বৈজ্ঞানিক মেন্‌ডেলিফ পিরিওডিক ক্লাসিফিকেশন-এর মূলসূত্র আবিষ্কার করিয়া বিরুদ্ধবাদী বৈজ্ঞানিকদের হাতে যত সব লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর পরে এখন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। এখন আমরা পরমাণুর গঠনতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে মেনডেলিফের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন না করিয়া পারি না। এমনই করিয়া কালের চক্রাবর্ত্তনে একদা-নিন্দিত পুরাতন আবার পূজার আসন লাভ করিয়াছে। শুধু প্রাউট এবং মেন্‌ডেলিফই যে পূজিত হইয়াছেন তাহা নহে। আরব দেশের ঊষর মরুভূমিতে বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এলকেমিষ্টগণ যে স্বপ্নে বিভোর হইয়াছিলেন, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধুনা-লোকান্তরিত বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক রদারফোর্ডের অক্লান্ত সাধনার ফলে তাহাও বুঝি সফল হইতে চলিয়াছে। তিনি অতি দ্রুতগামী বিদ্যুৎযুক্ত হিলিয়ম পরমাণু দ্বারা (L-particle) নাইট্রোজেন পরমাণুকে আঘাত করিয়া তাহা হইতে হাইড্রোজেন তৈরী করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নাইট্রোজেন হইতে হাইড্রোজেন তৈরী করা সম্ভব হইলে যে-কোন মৌলিক পদার্থ হইতে অপর কোন মৌলিক পদার্থ প্রস্তুত করা এবং লৌহ হইতে স্বর্ণও প্রস্তুত করা কেন যে যাইবে না তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। এলকেমিষ্ট-গণের অমৃতের সন্ধান কবে কোন্ পথে আসিবে জানি না, কিন্তু তাঁহাদের পরশ পাথরের সন্ধান অধুনা একপ্রকার পাওয়া গিয়াছে বলা যায়। ইহা অতি বেগবান আলফাকণা ব্যতীত আর কিছুই নহে—যাহা রেডিয়ম এবং সমধর্ম্মী অন্যান্য ধাতুসমূহ স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া প্রতিনিয়ত বিচ্ছুরিত করিতেছে। অবশ্য কৃত্রিমভাবে ইহার বেগ আরও অনেক বর্দ্ধিত করিয়া মৌলিক পদার্থের অপর মৌলিক পদার্থে রূপান্তরে (artificial transmutation of elements) অনেক বেশী সাফল্য অর্জ্জন করা যাইতেছে। কেন্দ্রে অবস্থিত প্রোটনসমষ্টির (nucleus) সহিত আলফাকণার একটি সফল সংঘর্ষ ঘটানো যে কি দুরূহ ব্যাপার তাহা সহজেই বোঝা যাইবে। শত সহস্র আলফাকণা হয়ত কেন্দ্র এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ঘূর্ণ্যমান বিদ্যুতিনগুলির মধ্যে যে খালি জায়গা আছে তাহারই মধ্য দিয়া বেমালুম এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হইয়া বাহির হইয়া যাইবে। আবার কয়েক সহস্র হয়ত কেন্দ্রের অতি সন্নিকটে গিয়াও কেন্দ্রস্থ সমধর্ম্মী বিদ্যুৎ কর্ত্তৃক বিকর্ষিত হইয়া কেন্দ্রের কাছ ঘেঁষিয়া বাহির হইয়া যাইবে—যেমন করিয়া মহাকাশে ঘুরিতে ঘুরিতে ধূমকেতু সূর্য্যের কাছ ঘেঁষিয়া চলিয়া যায়। এই সমস্ত নিষ্ফল সম্ভাবনা কাটাইয়াও যদি কোন আলফাকণা নেহাৎই কেন্দ্রের উপর গিয়া পড়ে ত তাহার উহাকে ভাঙিয়া ফেলিবার মত শক্তি তখন অবশিষ্ট থাকিবে কি-না তাহাই বা কে জানে! থাকিলেও এই প্রকার ভাঙিয়া ফেলিবার উপযুক্ত

সংঘর্ষ শত সহস্রবার হওয়া চাই—নতুবা কোন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নূতন মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হইবে না।

মৌলিক পদার্থনিচয়ের উপাদান সম্বন্ধে প্রাউটের সিদ্ধান্তের যে সব ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছিল, তাহার ব্যাখ্যা যে কেবল য়্যাষ্টনের isotope-তত্ত্বেই সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় তাহা নহে। পরমাণুর আনুপাতিক ওজন ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যা হইবার আরও একটি কারণ আছে। তাহা আপেক্ষিকতাবাদের ভিতর পাওয়া যাইবে। এই মতানুসারে জড় ও চেতনের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্যই নাই। এমন কি, একে অপরে রূপান্তরিতও হইতে পারে। যে-কোনও পদার্থের এক গ্রাম পরিমাণ যদি সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হইয়া শক্তিতে (energy) রূপান্তরিত হয় তাহা হইলে তাহার পরিমাণ হইবে ১৭৬০ টন গ্যাসোলিন পোড়াইলে যতখানি তাপের সৃষ্টি হয় তাহার সমান। ইহা পরম বিস্ময়ের কথা। অবশ্য কেহ যেন মনে না করেন যে, উত্তাপ সৃষ্টির এই প্রণালী আমাদের করায়ত্ত। তাহা যদি হইত তাহা হইলে ভাবনার কিছুই ছিল না। পৃথিবীর কয়লা-সম্পদ ফুরাইয়া গেলে কি করিয়া জাহাজে অথবা ট্রেনে চড়িব অথবা কেমন করিয়া কল-কারখানা চলিবে—ইহা ভাবিয়া সুনিদ্রার ব্যাঘাত করার কোনই আবশ্যক হইত না। যেখান সেখান হইতে একমুষ্টি ধূলি লইয়া যাদুকরের ন্যায় এক ফুঁ দিয়া তাহাকে সত্য সত্যই অদৃশ্য করিয়া নিমেষের মধ্যে তাহা হইতে এই বিরাট পরিমাণ তাপের সৃষ্টি করিয়া সকলকে তাক লাগাইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা সম্ভব না হইলেও এই প্রকার কোন্ কিছু যে সীমাহীন আকাশতলে প্রতিনিয়তই হইতেছে তাহার প্রমাণ অন্তত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিলিকানের মতে পাওয়া গিয়াছে। হাইড্রোজেন পরমাণুর ভিতর একটি প্রোটন এবং হিলিয়ম পরমাণুর ভিতর চারিটি প্রোটন আছে ইহা যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন এক ধরিলে হিলিয়ম পরমাণুর ওজন চার হওয়া উচিত—কিন্তু দেখা যায় উহা প্রকৃতপক্ষে চার অপেক্ষা সামান্য কম হয়। আপাতদৃষ্টিতে ইহা "জড়ের ক্ষয় বৃদ্ধি নাই" (conservation of matter) —এই মতের বিরুদ্ধতা করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। যতটুকু ওজন কম্‌তি পড়ে প্রকৃতপক্ষেই ততটুকু জড়পদার্থ বিনষ্ট হয় এবং তাহার পরিবর্তে অনেকখানি শক্তির সৃষ্টি হয়। পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই বোঝা যাইবে যে, এই শক্তির পরিমাণ এত অধিক যে তাহার সহিত আমাদের পরিচিত সাধারণ কোন শক্তির তুলনাই হয় না। জড়ের এই সামান্য একটুখানি ক্ষয় যে দেখা যায় তাহার কারণ ধনাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত প্রোটন-গুলির ঘন সমাবেশ এবং তন্মধ্যস্থ ঋণাত্মক তড়িৎবাহী বিদ্যুতিনগুলির এই ধনাত্মক বিদ্যুৎসমষ্টির একান্ত সান্নিধ্য। ইহাকেই "বিপরীতধর্ম্মী তড়িৎক্ষেত্রের একান্ত সান্নিধ্য-সমাবেশ-হেতু ক্ষয়।" বা সংক্ষেপে ইংরেজীতে packing effect বলা হইয়াছে। প্রাউটের সূত্রের যে সব ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়, ইহাও তাহার অপর একটি কারণ। অনন্ত আকাশ হইতে cosmic radiation বলিয়া যে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন রশ্মি প্রতিনিয়তই পৃথিবীর উপর আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতেছে বলিয়া ধরা পড়িয়াছে, তাহারও ব্যাখ্যা মিলিকান এইভাবেই দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, অত্যুষ্ণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে ক্রমাগত তাহা বিকীরণের ফলে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিয়তই হাল্কা পরমাণুর যোগাযোগে ভারী পরমাণু সংশ্লেষিত হইতেছে এবং উহার জড়ভাগের কিয়দংশ packing effect-এর দরুণ ধ্বংস হইয়া তৎপরিবর্তে খুবই প্রচণ্ড শক্তির সৃষ্টি করিতেছে। তাহাই cosmic radiation-রূপে ধরাপৃষ্ঠে আপতিত হইতেছে। পদার্থ বিজ্ঞান পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে নিউটন যে ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী-কালে হাইগেন্স তরঙ্গমতবাদ (Wave theory) এবং ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল তাড়িতচৌম্বকতরঙ্গমতবাদ (Electro magnetic theory) দ্বারা তাহা সম্পূর্ণভাবে উড়াইয়া দেওয়ায় উহা বিজ্ঞান-সমাজ কর্ত্তৃক একেবারে পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু বহু বৎসর পরে আজ আবার দেখিতেছি যে, প্রসিদ্ধ মনীষী, দার্শনিক, গণিতজ্ঞ, পদার্থবিজ্ঞানবিৎ এবং সঙ্গীতজ্ঞ, হিটলারী শাসনে জার্মানী হইতে বিতাড়িত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন তাঁহার নূতন আপেক্ষিকতাবাদ (Relativity) দ্বারা আলোকতত্ত্বের রহস্য ভেদ করিয়া যে সব নূতন তথ্য পাইয়াছেন তাহার—নিউটন-কথিত আলোকতত্ত্বের ব্যাখ্যার সহিত অনেক সাদৃশ্য আছে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখা ভাল যে, নিউটনের পর আজ পর্য্যন্ত এত বড় মনীষী আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার আপেক্ষিকতাবাদ

প্রচলিত-বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রণালীতে এক বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে। নিউটনের সহিত আইনষ্টাইনের মতবাদ সম্বন্ধে সাদৃশ্য কোথায় তাহা সংক্ষেপে বলিব। নিউটন মনে করিয়াছিলেন যে, উজ্জ্বল আলোকসম্পন্ন পদার্থ হইতে জড়কণাসমূহ বিচ্ছুরিত হইয়া যখন চক্ষুমধ্যস্থ রেটিনায় আঘাত করে তখনই আমাদের আলোকের অনুভূতি হয়। এই কণাগুলি সরল রেখার পথ ধরিয়া ধাবিত হয়। সেই পথকেই আলোকরশ্মি (ray of light) বলা হয়। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে আলোকের একটা চাপ (pressure) থাকিবে এবং উহার উপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবও থাকিবে। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও নিউটনের সময়ে চাপের কিংবা মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবের অস্তিত্ব ধরা পড়ে নাই। আইনষ্টাইনের যুক্তি বুঝিবার পূর্ব্বে জড় এবং চেতনের (matter and energy) সম্পর্ক অনুধাবন করা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিকের কাছে এতদিন পর্য্যন্ত জড় এবং চেতন দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জগৎ বলিয়া বিবেচিত হইত। শুধু এই সম্পর্ক স্বীকার করা হইয়াছিল যে জড়কে আশ্রয় করিয়াই চেতনের প্রকাশ। এই দুই জগৎ সম্পর্কে এতদিন গবেষণা সমান্তরালভাবে চলিয়া আসিতেছিল। সেই দুই সমান্তরাল রেখা যে অবশেষে একই বিন্দুতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, অর্থাৎ—জড় ও চেতন যে মূলত একই, তাহাও ক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে। এই দুইয়ের মিলনবিন্দু বিদ্যুতিন। অর্থাৎ—বিদ্যুতিন যেমন জড়ের কণা, তেমনই বিদ্যুতের অর্থাৎ চেতনেরও কণা বটে। অতএব দেখা যাইতেছে বৈচিত্র্যের ভিতর একত্বের সন্ধান, ইহা শুধু দর্শনেরই এলাকা নহে—বিজ্ঞানও ঐ একই পথের পথিক। কবি বলিয়াছেন—

'তপস্যা বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া,
বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।'

বহু বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞানেও একথা স্বীকৃত হইয়াছে যে, পরিদৃশ্যমান জড় ও চেতন জগতের যাবতীয় বৈচিত্র্যই ৯২টি মৌলিক পদার্থ এবং আলোক, তাপ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি কয়েকটি শক্তির সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান আরও একধাপ উপরে উঠিয়াছে। এখন আমরা মাত্র দুইটি সত্তার সাহায্যে সমস্ত বৈচিত্র্যই ব্যাখ্যা করিতে পারি। উহা হইতেছে ইলেকট্রন এবং প্রোটন। বিশাল বারিধি, উত্তুঙ্গ শৈলশিখর, তিমির-গর্ভ খনি, শ্যামল বনানী, মহাব্যোমের ঘূর্ণ্যমান জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী, জনপদের বিশাল সৌধশ্রেণী, মনোহর বেশভূষা, সুন্দরী নারী, শক্তিমান পুরুষ, মনমাতান সুগন্ধ দ্রব্য, ব্যাধি-নিরাময়ক ঔষধ, মেরুপ্রদেশের অরোরা, ব্যেরি য়্যালিসের অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটা, সাক্ষাৎ যমরূপী বোমাবর্ষী বিমান এবং ভীম ভাসমান মাইন—এ সমস্তই এই দুই অনাদি, অমর, অব্যয় সত্তা ইলেকট্রন এবং প্রোটনের লীলাখেলা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অদ্বৈতবাদীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আজিও বৈজ্ঞানিক ঘোষণা করিতে পারেন নাই বটে যে—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান দ্বৈতবাদের কোঠায় উপনীত হইয়া অন্তত এটুকু বলিতে সমর্থ—সর্ব্বে খল্বিমে ইলেকট্রন-প্রোটনে। যাহা হৌক, আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধেও যে পুরাতনের পুনরভ্যুদয়ের প্রমাণ পাই তাহাই বলিতেছিলাম। আলোকের উদ্ভব যে বিদ্যুতিনের কম্পন থেকে তাহা আইনষ্টাইনের পূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছিল। আইনষ্টাইন যে যুক্তি দেখাইলেন তাহা এই—জড় এবং আলোক উভয়ই যখন বিদ্যুতিন হইতে জন্মলাভ করিয়াছে তখন মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব কেবল জড়ের উপরই থাকিবে—আর আলোর উপর থাকিবে না—ইহা হইতে পারে না। প্রচণ্ড বেগে ধাবমান একটি জড়বস্তুও যেমন কোন বৃহৎ বস্তুর নিকট দিয়া যাইবার সময়ে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব হেতু খানিকটা বাঁকিয়া যাইবে, তেমনই একটি আলোকরশ্মিও অনুরূপ অবস্থায় কেন খানিকটা বাঁকিয়া যাইবে না? অবশ্য আলোর গতিবেগ অসাধারণ (সেকেণ্ডে ১৮,৬,০০০ মাইল) হওয়ায় উহার গতিপথ বাঁকাইতে হইলে প্রকাণ্ড বড় একটি পদার্থের প্রয়োজন। সূর্য্যকে এইরূপ একটি বড় জড়বস্তু নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে। সুতরাং কোন নক্ষত্র হইতে পৃথিবীর দিকে প্রচণ্ড বেগে ধাবমান কোন আলোক-রশ্মি সূর্য্যের নিকট দিয়া যাইবার সময়ে নিশ্চয়ই খানিকটা বাঁকিয়া যাইবে—ফলে নক্ষত্রের অবস্থানও খানিকটা সরিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইবে। ফটোগ্রাফ তুলিলে তাহা ধরা পড়িবে। আইনষ্টাইনের গণিতে অসাধারণ ক্ষমতা। সুতরাং গণিতের সাহায্যে তিনি নক্ষত্রের এই অপসরণের পরিমাণ গণনা করিয়া বাহির করিলেন। অবশ্য ইহা বলা আবশ্যক যে, এখানে নিউটনের পুরাতন মাধ্যাকর্ষণের আইন

খাটিবে না। এই আইন আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ দ্বারা যেভাবে পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করে সেই ভাবেই প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু মুস্কিল এই যে, সূর্য্যের ঔজ্জ্বল্যের তুলনায় নক্ষত্রের আলো এত ম্লান যে সূর্য্যের উপস্থিতিতে উহা দেখাও যাইবে না এবং উহার ফটোও তোলা যাইবে না। একমাত্র উপায় হইতেছে পূর্ণ গ্রাস সূর্য্যগ্রহণের সময়ে সূর্য্যের কাছাকাছি কোন নক্ষত্রের ফটো তোলা এবং পরে আকাশে সূর্য্যের অবস্থান যখন সরিয়া যায় তখন পুনরায় ঐ একই নক্ষত্রের ফটো তোলা এবং তারপর একই নক্ষত্রের এই দুই অবস্থানের মধ্যে কতটুকু তফাৎ পাওয়া যায় তাহা মাপিয়া বাহির করা। একমাত্র এই ভাবেই আইনষ্টাইনের গণনার সত্যতা যাচাই করা সম্ভব। আমরা জানি, অজকালকার উগ্র জাতীয়তার প্রবল রেষারেষির মধ্যে একমাত্র বিজ্ঞানই ভৌগোলিক সীমারেখা স্বীকার করে না। তাই জার্মান মনীষী আইনষ্টাইনের ভবিষ্যৎবাণী যাচাই করিয়া দেখিলেন শত্রুপক্ষীয় ইংরেজ। ১৯১৪—১৮ সালের পৃথিবীব্যাপী মহাসমর তখনও শেষ হয় নাই। সেই অবস্থায়ই পূর্ণগ্রাস সূর্য্য গ্রহণের সময়েই মাত্র ইহা যাচাই করিয়া দেখিবার একমাত্র সুবর্ণ সুযোগ মেলে বলিয়া ইংরেজ দক্ষিণ আমেরিকার সোব্রাল এবং পশ্চিম আফ্রিকার প্রিনসাইপ নামক স্থানে দুই দল বৈজ্ঞানিক পাঠাইলেন। বিজ্ঞান সমাজে ইহার ফলাফল সুবিদিত; পরীক্ষার ফল আইনষ্টাইনের জয় জয়কার ঘোষণা করিল। নিউটনের আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মতবাদে যে সত্যের কণা নিহিত ছিল তাহা পুনরায় নূতন করিয়া নূতনভাবে স্বীকৃত হইল।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ বিজ্ঞানকে যে পথে চালিত করিয়াছে তাহাও পুরাতনের অভ্যুত্থানের দিকেই বলিয়া মনে হয়। অবশ্য এই মতবাদ অত্যন্ত জটিল এবং উচ্চাঙ্গ গণিতের পরাকাষ্ঠা ইহাতে দেখান হইয়াছে। তাহা এখানে আলোচনা করা অসম্ভব। কিন্তু ইহার সিদ্ধান্তগুলির সহিত ভারতীয় ঋষির কণ্ঠে যে মায়াবাদ ঘোষিত হইয়াছিল তাহার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীরও অপূর্ব্ব সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এমন কি, এই অতি আধুনিক মতবাদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এরূপ কোন পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে ভুল হয় দর্শনই পড়িতেছি কিংবা বিজ্ঞানই পড়িতেছি। আইনষ্টাইন বলিয়াছেন—এ যাবৎ বৈজ্ঞানিকগণ যে সমস্ত তথ্য আহরণ করিয়াছেন এবং যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ভুল না হইলেও পূর্ণ সত্য (absolute truth) নহে। উহা মাত্র আপেক্ষিক অর্থাৎ পর্য্যবেক্ষকের অবস্থান ও কালের উপর উহা নির্ভর করিতেছে। তাই অপর কোন নক্ষত্র হইতে কোন পর্য্যবেক্ষক এই একই বস্তু সম্বন্ধে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন, কারণ উভয়েরই একটা গতিবেগ আছে যাহা বিভিন্ন এবং যাহার সম্বন্ধে উভয়ই অজ্ঞ। এতদিন বিজ্ঞান বলিয়াছে প্রত্যেক বস্তুরই একটি অন্য-নিরপেক্ষ নিজস্ব নির্দ্দিষ্ট অস্তিত্ব ও ধর্ম্ম (objective existence) আছে—যাহা পর্য্যবেক্ষকের পর্য্যবেক্ষণ স্থান বা কালের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু অধুনা বিজ্ঞান ও দর্শনের ন্যায় বলিতেছে যে, বস্তুর দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ কোন সত্তা আছে কি-না সন্দেহ—থাকিলেও তাহা কিরূপ তাহা জানিবার উপায় নাই। যাহা জানি তাহা শুধু দ্রষ্টা উহাতে যে সত্ত্বা ও ধর্ম্ম আরোপ করিয়াছে তাহাই (অর্থাৎ subjective existence); সুতরাং দেখা যাইতেছে—things are not as they seem. ইহাকেই বোধ হয় বেদান্তকার বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। অবশ্য বিজ্ঞানের বেলায় তফাৎ এই যে, বিজ্ঞান ব্রহ্ম সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কিছু বলে নাই কিম্বা বলিবার প্রয়োজনও বোধ করে নাই। তবে, জগৎ মিথ্যা, অন্তরে যেরূপ প্রতীয়মান হইতেছে সেরূপ যে নহে—ইহা প্রকারান্তরে বলিতেছে।

এইরূপেই মানুষের অজ্ঞাতসারে তাহার জীবনে অনাদরে, অবহেলায় পরিত্যক্ত পুরাতন পুনরায় আদৃত হইয়াছে, পুনরায় তাহার অভ্যুদয় হইয়াছে। এই ভাবেই পুরাতন পশ্চাৎ হইতে হাতছানি দিয়া প্রগতিশীল মানবকে ডাকিয়া বলিতেছে—আমাকে তুমি একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পার নাই, আমারই গর্ভে শাশ্বত এবং চিরন্তন যে সত্য-কণিকা নিহিত ছিল, বড় জোর, তাহাকে নূতন রূপ দিয়াছ এবং আরও নূতন তথ্য উদ্ঘাটন করিয়াছ।

জন্ম—৭ই মে ১৮৯৫ সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় মৃত্যু—১৫ জানুয়ারী ১৯৪০

সুধাংশুশেখর

গত ২৪শে পৌষ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে এগারোটার সময় সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করেন। বাঙ্গলার প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রে এবং কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে আরম্ভ করিয়া বহু নাগরিক, সাহিত্যিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ এবং তাঁহার বিধবা জননী, স্ত্রী, পুত্র কন্যা, জামাতা ও জ্যেষ্ঠ সহোদরের শোকে গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এই অবসরে আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। তাঁহাদের অকৃত্রিম সহানুভূতি আমাদিগকে শক্তি ও সান্ত্বনা দান করিয়াছে।

অতি অল্পবয়সেই সুধাংশুশেখরের ব্যবসায় জীবন আরম্ভ হয়। ব্যবসায়ী মাত্রেই জানেন, ব্যবসায় অতি নিষ্করুণ প্রভু। এই জীবন যিনি গ্রহণ করেন তাঁহার জীবনে অবকাশ খুব কমই মেলে। সুখে-দুঃখে, বাহিরের চলমান বৃহত্তর মানবজীবনের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিবার সুযোগ কমই পাওয়া যায়। কিন্তু এই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডী সুধাংশুশেখরকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। এই অবসরহীন কঠোর জীবনের মধ্য হইতেও বাহিরের আনন্দলোক তাঁহাকে ক্রমাগত হাতছানি দিয়া ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে। ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস হইতে বিলিয়ার্ড পর্য্যন্ত সমস্ত খেলায় তাঁহার অপরিসীম উৎসাহ ছিল। তিনি মোহনবাগান ক্লাবের সদস্য ছিলেন। আর বাণীর পুণ্যপীঠ তো তাঁহাদের গৃহেই প্রতিষ্ঠিত। এমনি করিয়া শুষ্ক ব্যবসায় জীবনের ভিতরেও তিনি নিজের মধ্যে একটি বিশিষ্ট রসলোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

জীবনে তাঁহার বন্ধুর সংখ্যা বেশী ছিল না। বাহিরে তিনি অত্যন্ত স্বল্প ও মৃদুভাষী ছিলেন। সম্ভবত ব্যবসায়ের প্রয়োজনেই এই নিতান্তই বাহিরের আবরণ গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার অভ্যন্তরের প্রীতিতে কোমল, হাস্য-পরিহাসে উজ্জ্বল ও বিনয়ে নম্র অন্তঃকরণের একান্ত পরিচয় লাভের সুযোগ নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুগণেরই মিলিয়াছিল। সেখানে আভিজাত্যের গর্ব্ব অথবা ধনের রূঢ়তার চিহ্নমাত্রও ছিল না। ধনীর দুলাল হইয়াও যাঁহাদের সহিত তিনি মিশিতেন তাঁহাদের সহিত সমানে-সমানে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবেই মিশিতেন।

যে কৃত্রিমতা বর্ত্তমান যুগ-সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ মনে-প্রাণে সুধাংশুশেখর তাহাকে ঘৃণা করিতেন। কি বন্ধু-সমাজে, কি বাহিরের ব্যবসায়ী-জীবনে কোনদিন তিনি কৃত্রিমতার প্রশ্রয় দেন নাই। সর্ব্বত্রই নিজেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করিতেন না। নিজের সহিত তাঁহার পরিচয়ও ছিল প্রত্যক্ষ। নিজের জীবনের উদ্দেশ্য, নিজের ক্ষমতা ও অক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে সচেতন ছিলেন। যাঁহারা নিজেদের মতামত, ক্ষমতা-অক্ষমতা, অবসর-অনবসর, এমন কি আদর্শ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইযা শুধু কোনরকমে পুরোভাগে একটুখানি স্থান করিয়া লইবার জন্য ঠেলাঠেলি করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে সুধাংশুশেখর অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিতেন। স্বভাবতই তিনি মিতভাষী ছিলেন। যেখানে তাঁহার অধিকার এবং প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত সেখানেও তিনি নিজেকে সকলের পিছনে রাখিতেই ভালবাসিতেন। যশোলাভের প্রত্যাশা মাত্র না রাখিয়া তিনি নিঃশব্দে এবং অবিচলভাবে নিজের কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেন।

কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। নিজেকে পিছনে রাখিবার সুনির্দ্দিষ্ট এবং অক্লান্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে নিশ্চয়ই। যে সময় তিনি নিজেকে সকলের পিছনে গোপন রাখিবার চেষ্টায় ব্যস্ত তখন যে তিনি প্রীতিস্নিগ্ধ জগতের একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন তাহা নিজেও জানিতে পারেন নাই। সেকথা প্রতিপন্ন হইল তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে, সর্ব্বত্র যখন শোকের গাঢ় ছায়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল তখন। তখন বোঝা গেল তাঁহার স্থান কোথায় হইয়া গিয়াছে। আমরা জানি তাঁহার কর্ম্ম তিনি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। কাল আসিয়া অকালেই তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। একদিকে সেই অসমাপ্ত মহৎ কর্ম্মভারের গুরুত্ব ও দায়িত্ব সম্বন্ধে এবং অন্যদিকে আমাদের দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা সম্বন্ধেও আমরা সচেতন। সেই সঙ্গে এ বিশ্বাসও আমাদের আছে যে, শুভানুধ্যায়ী ও সুহৃজ্জনের সহানুভূতি ও প্রীতির কল্যাণে সেই অসমাপ্ত কর্ম্মও সমাপ্ত হইবে।

পুতুল

শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোট ছোট পশমী বল টেবিলে টেবিলে ঘুরপাক্ খাচ্ছে। স্যাম্পেন্ বোতলের গলায় রঙীন্ কাগজের ফিতে জড়ানো; ঘরের চারিদিকে হাসি-হুল্লোড় চলছে। অফুরন্ত মনোযোগ দিয়ে খানসামারা খালি গ্লাস পূর্ণ ক'রে দিচ্ছে এবং অনেক কায়দা ক'রে ভর্তি মদের বোতল বরফের মধ্যে চুবিয়ে রাখছে।

চৌ-পমি-ক্যাবারে-হলে আমাদের সময় বেশ কাটছিল। ভাল ভাবেই নয়? তার মানে, আমরা আমাদের জীবনের সব চিন্তা দূর করার জন্যে প্রচুর গোলমাল করছিলাম; সেই দুঃখ—যা মানুষের দরজায় বিস্ফারিত চোখে অবিরাম চেয়ে থাকে, তাকে ভুলবার জন্যে সকলেই মেতে উঠেছিলাম?

তাই হবে, হয়ত!

পোষাকের ঘরে ফ্রান্সিন্ তার বন্ধু রেইমণ্ড্-এর সঙ্গে আলাপ করছিল।

"তোমার ঠিকঠাক্ হয়ে গেছে, ডিয়ার?"

"হ্যাঁ, এক আরজেন্টাইন্-বাসিনীর সঙ্গে।...আর তোমার?"

"আমারও! হামবুর্গের জনৈক ব্যবসাদার। তেমন ফুর্তিবাজ নয় সে, কিন্তু ভারী ভদ্র আর ভাব-প্রবণ।"

"গুড্ লাক্। ফ্রান্সিন্!"

চৌ-পমির মাইনে-করা ক্যাবারে নাচিয়ে ফ্রান্সিন্—দেহ-বিলাসিনীও সে। বাল্জাকের গল্পের খ্যাতনাম্নী নায়িকার মত তারও বয়স ত্রিশ বছর, মাথার চুল পিছনে ওলটানো—আর কাঁধ প্রায় পুরুষের মত পরিষ্কার ক'রে ছাঁটা। তার মনের জোর আছে। এই পথ থেকেও সে তার সহজাত রসজ্ঞান আজও হারায় নি। তেমনই তার দয়া বা কারুণ্যেরও অভাব নেই—যে সব সাহসী মেয়ে পেটের দায়ে এ পথে আসে তাদের এটা একটা বৈশিষ্ট্য। তার শীকারের কাছে গিয়ে ফ্রান্সিন্ বসে। লোকটির কালো চুল, মোটা ও ঘন, আর পেশী-বহুল হাত দুটো দেখ্‌লে মনে হয় বড়লোক হওয়ার আগে তাকে অনেক খাটতে হয়েছে।

ফ্রান্সিন্ যেন ভদ্রতার খাতিরেই বলে: "সব ঠিক তো, গমেজ?"

"হ্যাঁ ডিয়ার।...এত গোলমালে তোমার বিরক্তি লাগছে না? এখান থেকে কোথাও গেলে হত না? তোমার ওখানে বরং আমরা ভালই থাকতাম। কি বল?"

"তুমি রাজী থাক্‌লে—সে বেশ হয়!...দাও, বিল চুকিয়ে।...চল, যাই।"

তারা উঠে পড়ে, নাচিয়ের ভিড় ঠেলে বাইরে আসে। মৃদু বাজনার তালে সকলে ট্যাঙ্গো নাচতে নাচতে যেন আট্‌কে গেছে। এক মিনিট তারা ক্যাবারের দরজায় দাঁড়ায়। ট্যাক্সি ডেকে তারা উঠতে যাবে এমন সময় একটি মেয়ে পাশ থেকে এগিয়ে এসে ভাঙা গলায় বলে:

"মাদাম্, আপনার এই ডল্‌টা..."

ফ্রান্সিন্ মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে। মাথায় তার টুপি নেই, ফ্যাকাসে মুখ, কালো পোষাকের নীচে হাত দুখানি ঢাকা—দেখলেই তাকে দরিদ্র এবং দুঃখী ব'লে মনে হয়। ফ্রান্সিন্ বলে:

"কি?...আমার ডল্?"

"মাদাম...ওখানে আপনাকে তাঁরা যেটি দিয়েছেন—সুন্দর পুতুল একটি।...আপনার নিশ্চয় অনেক আছে।...ওটা দয়া ক'রে আমার ছোট্ট মেয়েকে যদি দিতেন..."

"তোমার মেয়ে আছে?"

"হ্যাঁ।...ব্রন্‌কাইটিস্ থেকে সেরে মাত্র উঠ্‌ছে সে।...এখনও বিছানা থেকে উঠ্‌তে পারে না।...তাকে একটু খুশী করার মত আমার কিছুই দেবার নেই।"

"তার বয়েস কত?"

"পাঁচ বছর।...মাদাম, আপনার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি।"

কালো পোষাক-পরা মেয়েটির অনুরোধ এত করুণ যে, ফ্রান্সিন্ ব্যথিত হ'য়ে ডল্‌টি তাকে দিতে যায়।

"এই নাও!"

"ধন্যবাদ, মাদাম! ডিডি আপনাকে নিজে ধন্যবাদ

দিতে যদি পারত।...আপনার মত সুন্দরী মহিলাকে দেখ্‌লে সে কি খুশীই না হ'ত!...সে খুব চালাক!"

"থাক কোথায়?"

"রুবিয়ে'। ছ'তলার একটা ঘরে থাকি। আমি বিধবা, কোনও রকমে কাটা-পোষাক সেলাই ক'রে কষ্টে নিজেদের দিন চালাই।"

"আচ্ছা, দাঁড়াও একটু...ডল্‌টা দাও আমাকে... আমি নিজে গিয়ে সেই ছোট্ট মেয়েটিকে এটি দেব।... দাঁড়াও এখানে।"

ফ্রান্‌সিন্ ট্যাক্সির পাশে দণ্ডায়মান তার বন্ধুকে ডেকে বলে:

"গোমেজ, একবার রুবিয়ে'তে মাদামের বাসায় যাব। ড্রাইভারকে বল...এসো মাদাম, ওঠ গাড়ীতে।"

তার বিস্মিত সঙ্গী একবার গড়িমসি করে। ফ্রান্‌সিন্ জোর ক'রেই তাকে বলে:

"যা বলছি তাই কর, ঘাব্‌ড়িয়ো না।"

একটা কদর্য বাড়ীর সামনে ট্যাক্সি থেকে তারা নামে। সিঁড়ি বেয়ে তারা উপরে পোষাক-ওয়ালীর ঘরে যায়। দৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বেঁচে আছে এই দরিদ্র বিধবা, তারই সামান্য বাসস্থান এটি। কি ক'রে যে সে তার নিজের এবং এই রোগগ্রস্ত ছোট্ট মেয়েটীর বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে, তা ঘরখানি দেখ্‌লেই বুঝতে পারা যায়।

লোহার খাটের উপর উপুড় হ'য়ে ছোট্ট মেয়েটি ঘুমোচ্ছিল। তাকে সে ডেকে তোলে।

"ডিডি, ওঠ। দেখ, তোমার নতুন-মা তোমার জন্যে কি এনেছেন!...দেখ ডিডি।..."

চোখ মুছে মেয়েটি তাকায়। ফ্যাকাসে মুখের চারিপাশে কালো চুল, তার শীর্ণদেহ দেখলেই বুঝা যায় যে তার কঠিন রোগ হয়েছিল।

"কি বললে, মা?"

"দেখ ডিডি...এই ভদ্রমহিলা তোমার জন্যে কি এনেছেন।...এনেছেন কেন জান? তুমি বড্ড ভাল মেয়ে, আর ওষুধ খেতে কখনও গোলমাল করোনি ব'লে—"

লোহার খাটের পাশ থেকে ফ্রান্‌সিন্ উপুড় হ'য়ে মেয়েটির মুখের পানে চেয়ে চেয়ে হাসে। ছোট্ট মেয়েটি নির্বাক বিস্ময়ে তার মুখ দেখে।

"তোমার নতুন-মা কি বলছেন, শুনছ ডিডি? এই সুন্দর ডল্‌টি আমি এনেছি তোমার জন্যে, কারণ ছোট্ট ভাল মেয়েদের আমি খুব ভালবাসি।...ভাল লাগছে তো?"

ডিডি তার ছোট হাত বাড়িয়ে সেই ডল্‌টি নিতে যায়। রুশীয় রাজকুমারীর পর্সিলেনের ডল্, আকাশের মত নীল রংয়ের পোষাক পরানো, আবার সোনালী চুল একটা নকল রঙীন পাথরের টায়ারা দিয়ে বাঁধা। মেয়েটির চোখ বিস্ময়ে বড় হ'তে থাকে; সে একবার তার মায়ের দিকে, একবার সেই সুন্দরী মেয়েটির দিকে চায়।

"এটা কি আমার জন্যেই এনেছেন্, নতুন-মা?"

"হ্যাঁ। তোমার জন্যেই, ডিডি, এই সুন্দরী মহিলাকে তোমার ধন্যবাদ দাও।"

ডল্‌টিকে নিজের পাশে বিছানায় শুইয়ে ডিডি ফ্রান্‌সিনের গলা জড়িয়ে ধরে। ফ্রান্‌সিন্‌ও সেই রুগ্না মেয়েটিকে তার বুকে তুলে নেয়।

হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ায় এবং তার বন্ধুকে পাশে ডাকে। এতক্ষণ তার বন্ধু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নীরবে সব দেখ্‌ছিল। ঘরের এক কোণে তাকে ডেকে ফ্রান্‌সিন্ ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে:

"ডিয়ারী, এক মিনিট—আজ রাতে আমাকে তুমি কত দিবে ঠিক করেছ?"

"ও কথা এখন কেন? ও কথা পরেই হবে!"

"না, না। বল এখনই আমাকে।"

"পঁচিশ লুই।"

"বেশ কথা। তা হ'লে সেটা এখনই আমাকে দিতে পার?"

"কেন?"

"দাও, দাও! কেন, শুনতে হবে না!"

ফ্রান্‌সিন্ পাঁচশো ফ্রাঙ্ক গোমেজের কাছে পায়। তারপর নোটগুলি হাতে নিয়ে রুগ্না মেয়েটির মাকে বলে:

"এটা নিন্, মাদাম্।...আপনার মেয়ের জন্যে পেলেন— একটি ডল্, আর এটি তার মা'র জন্যে দিচ্ছি।"

"ওঃ!...না, না!...ওটা আমি নিতে পারি না, মাদাম।..."

"নিন্, নিন্! ও কথা থাক্। এটা নিন্ তাড়াতাড়ি।··· এ টাকা আমি ডিডির রোগমুক্তির জন্যে দিলাম।"

"মাদাম! কি ব'লে আপনাকে ধন্যবাদ দিব।···আমি বলতে পারছি নে।"

"আমাকে ধন্যবাদ দিতে হবে না।···সময়ে সময়ে যদি এক-আধটা ভাল কাজও না করা যায়, তা হ'লে বাঁচে কি ক'রে মানুষ!···গুড্ নাইট, ডিডি!···তোমার নতুন ডল নিয়ে খেলা কর।·· চল গোমেজ, আমরা যাই।"

* * * * *

পাঁচ মিনিট পরেই ফ্রান্সিন্ গোমেজের সঙ্গে ট্যাক্সিতে চাপে। গোমেজ বলে:

"তোমার প্রাণ আছে, ডিয়ার! তুমি অমন করলে কেন, বলবে?"

কিছুক্ষণ ফ্রান্সিন্ চলন্ত ট্যাক্সির কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। অবশেষে তার সঙ্গীর পানে ফিরে বসে, তার চোখ দুটিতে অশ্রু উপ্‌ছে পড়ছে, তার কণ্ঠস্বর ব'দলে গিয়েছে। ধীরে ধীরে সে বলে:

"কেন? কারণ, আমারও ওই মেয়েটির মত একটি মেয়ে আছে।···তাকে আমাদের গাঁয়ে রেখে এসেছি।··· গাঁয়ের লোকই দয়া ক'রে তার দেখা-শোনা করে, তাকে মানুষ করে।···"

গোমেজ ফ্রান্সিনের মুখখানি দুহাত দিয়ে তুলে দেখতে চায় যে তার চোখের জল সত্যি, না ফাঁকি। সে তার অন্তরের বেদনার পরিমাপ করতে চায়। গোমেজ বুঝতে পারে। হঠাৎ তার কপালে একটা চুম্বন এঁকে সে ফ্রান্সিন্‌কে বলে:

"শোন ডিয়ার,···আজ তোমাকে এখনই তোমার বাসার দরজায় নামিয়ে দিয়ে যাব। কালকে আবার আস্‌ব এবং তোমায় মোটরে ক'রে তোমার গাঁয়ে নিয়ে যাব—তোমার মেয়েকে তুমি দেখবে, আবার ফিরে পাবে।···আর তাকে ডল্ না দিয়ে, আমি তাকে তার মাকে উপহার দিয়ে আস্‌ব। তার মানে, এমন ব্যবস্থা করব আমি—যাতে তার মা তার নিজের বাড়ীতে থেকে তার মেয়েকে ঠিকভাবে মানুষ করতে পারে।"

লীলাময়ী

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার

খেলিবে আমারে ল'য়ে আর কত খেলা
ওগো লীলাময়ী, মোর জীবনের বেলা
অবসান-প্রায়, এবে হৃদয়-গগনে
নামিয়া আসিছে সন্ধ্যা—অশান্ত চরণে।

ধরণীর অন্তরালে—একা সঙ্গীহীন
আপনারে সাথী করি ছিনু এতদিন
প্রশান্ত অন্তরে, তুমি আনিলে হেথায়
জয়মাল্যে তুলি' দিলে জীবন-দোলায়।

তোমার কুসুম হার, জয়ের গৌরব,
লীলায়িত অঙ্গ মোর ফিরে লহ সব,
তৃষ্ণা যা দিয়েছ প্রাণে থাক্ শুধু তাই,
প্রেম-নদী পারে যেন তৃষ্ণাজল পাই।

তোমারে পেয়েছি তাই জেনেছি জীবনে
অন্তর রেখেছ বাঁধি' অনন্ত-মিলনে।

নিখিল-ব্রহ্ম বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন—

গত বড়দিনের অবকাশে রেঙ্গুনে নিখিল-ব্রহ্ম বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকারেই এই সম্মেলন সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। সম্মেলনের মূল সভাপতি ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের ভাষায় বলিতে গেলে, "কি জনসমাগমে, কি প্রবন্ধসম্ভারে, কি উদ্যোগ-আয়োজনে ও শৃঙ্খলায়, যে কোন বিষয়েই এই সম্মেলন বাংলায় বা বাংলার বাহিরের সম্পাদক ডাঃ বিনয়শরণ কাহালী মহাশয় ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণের অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রমে সম্মেলনের সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে।

গত ২৫শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণে সিটি হলে মূল সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্‌সেলর উ টিন্‌ টুট্‌ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে ব্রহ্ম জাতির নামে ডক্টর বাগ্‌চীকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান।

উদ্বোধনান্তে পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীরমাপ্রসাদ

নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন

জাতীয় সম্মেলনের তুলনায় গৌরব অনুভব করিবে। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য মুখ্যত সাহিত্যালোচনা হইলেও ইহা ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালী জনসাধারণের সামাজিক মিলন কেন্দ্রও বটে এবং এই সম্মেলন এই উভয় উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ সফল করিয়াছে।" সভাপতি হিসাবে ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় সম্মেলনের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। সম্মেলনের চৌধুরী তাঁহার স্বাগত অভিভাষণ পাঠ করেন। তারপর মূল সভাপতি ডক্টর বাগচী তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য-পূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি দেখান যে একই সংস্কৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেশে নব নব রূপ গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গ্রীক, ইরাণীয় ও বৈদিক সংস্কৃতির মধ্যে বহু পরিমাণে ঐক্য

থাকিলেও প্রভেদও বিস্তর আছে—যদিও এই সমস্ত সংস্কৃতি মূলত এক। সাহিত্যও এই প্রভাব হইতে মুক্ত নয়। ভারতীয় সাহিত্য মূলত এক হইলেও প্রদেশবিশেষে বিশেষ আবেষ্টনীর মধ্যে তাহার নূতন মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

২৬শে ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে বেঙ্গল একাডেমী হলে সাহিত্য-শাখার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্তা সুরুচি রায় সাহিত্যভারতী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে সংস্কৃত যুগ হইতে সাহিত্যের ধারা লক্ষ্য করিয়া বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি ও পরিণতির আলোচনা করেন।

২৭শে ডিসেম্বর বুধবার পূর্ব্বাহ্ণে বেঙ্গল একাডেমী হলে অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিজ্ঞান শাখার অধিবেশন হয়। সভাপতি মহাশয় আলোক চিত্র সহযোগে ধান্ত ও ধান্তের পুষ্টি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই সভায় অনেকগুলি প্রবন্ধ পঠিত হয়।

২৮শে ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত পরেশপ্রসাদ মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে ইতিহাস ও অর্থনীতি শাখার অধিবেশন হয়। অভিভাষণে সভাপতি মহাশয় বহু প্রাচীন সভ্যতার উত্থান-পতনের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া সভ্যতায় ভারতের দান সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এখানেও অনেকগুলি সুলিখিত প্রবন্ধ পঠিত হয়।

ঐদিন অপরাহ্ণে একই স্থানে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে দর্শন শাখার অধিবেশন হয়। অভিভাষণে সভাপতি মহাশয় প্রাচীন হিন্দু দর্শনের বিশেষত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি দর্শনের সহিত উহার সম্বন্ধ নির্ণয় করেন। এখানেও কয়েকটি প্রবন্ধ পঠিত হয়!

পরদিন ডক্টর বাগচীর সভাপতিত্বে মূল সম্মেলনের শেষ অধিবেশন হয়। সভায় কয়েকটী প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটী প্রস্তাবে সাহিত্য পরিষদের ব্রহ্মদেশীয় শাখাকে অনুরোধ করা হয় যে, তাহারা যেন বাংলা ও ব্রহ্ম ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী ভাষান্তরিত করিয়া সংস্কৃতি সংযোগ দৃঢ়ীকরণে যত্নবান হন। অন্য একটি প্রস্তাবে আগামী বৎসর রেঙ্গুনে নিখিল-ভারত প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করা যায় কি-না বিবেচনার জন্ত স্থানীয় পরিষদকে অনুরোধ করা হয়। অন্য একটি প্রস্তাবে বাংলা ভাষাকে পাঠ্যরূপে গ্রহণের জন্ত রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হয়। সভাপতির বক্তৃতার পর সম্মেলন শেষ হয়।

রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে আ বিচ্ছিন্ন। কিন্তু প্রাচীন কাল হইতেই ব্রহ্মদেশ ভারতে অংশবিশেষ বলিয়াই গণ্য হইয়া আসিতেছে। ব্রহ্মদেশ ভারতের অতি-নিকট বলিয়াই যে শুধু তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা তাহা নহে, সংস্কৃতির ইতিহাসের দিক দিয়াও ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে প্রাণ-প্রেরণা লাভ করিয়াছে। ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রহ্মদেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, বৌদ্ধ-শাস্ত্র ও সাহিত্যের প্রভাব ব্রহ্মদেশের জীবনাদর্শকে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ও ব্রহ্মের ভাষার মধ্যেও একটি মৌলিক যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। বৌদ্ধ কৃষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া পালিভাষা ব্রহ্ম ভাষাকে বিশেষ করিয়া প্রভাবান্বিত করিয়াছে। ইহা ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যেও ভারতের সহিত ব্রহ্মদেশের চিরদিনই যোগ বিদ্যমান। রেঙ্গুনে যে নিখিল-ব্রহ্ম বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে তাহাতে ভারতের সেই অন্তরনিহিত যোগসূত্রটিকেই আরও দৃঢ় করিয়া দিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাঙ্গালার সঙ্গেই ব্রহ্মের সংযোগ গভীরতর। বহু বাঙ্গালীই ব্যবসা-বাণিজ্য-চাকুরী উপলক্ষে ব্রহ্মদেশে গিয়াছেন এবং কালে সেখানে স্থায়ী আবাস স্থাপন করিয়া বসবাস করিতেছেন। আজ ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙ্গালীগণ দেশের সংস্কৃতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত যে প্রচেষ্টা করিতেছেন তাহার ফলে ব্রহ্মদেশের রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব তাঁহাদের সৃষ্ট সাহিত্যের ভিতর দিয়া দেশের মর্ম্মস্থানে সঞ্চারিত হইবে। তাই আমরা প্রবাসী বাঙ্গালীদের এই প্রচেষ্টাকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখিতেছি এবং তাঁহাদের প্রচেষ্টার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হউক, ইহাই কামনা করি। কৃত্রিম বিভেদের গণ্ডী এই দুই প্রাচীন বন্ধুকে যেন বিচ্ছিন্ন করিতে অক্ষম হয়, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

দেশলাই শিল্প—

ভারতে সাধারণত বৎসরে এক কোটি সত্তর লক্ষ গ্রোস দেশলাই ব্যবহৃত হয়। গত ১৯২২ সালে আমদানি দেশলাইয়ের উপর প্রতি গ্রোস দেড় টাকা শুল্ক ধার্য্য করিবার পর ভারতে বিদেশী দেশলাই আমদানি প্রায় বন্ধ

হইয়াছে। ১৯২১ সালে যেখানে দুই কোটি চারি লক্ষ টাকার দেশলাই আমদানি হইয়াছে, সেখানে ১৯৩০ সালে চারি লক্ষ টাকার এবং ১৯৩৬ সালে মাত্র আটচল্লিশ হাজার টাকার দেশলাই আমদানি হইয়াছে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এই হিসাব দেখিলে দেশলাই সম্পর্কে ভারত স্বাবলম্বী হইয়াছে বলিয়াই মনে হইতে পারে কিন্তু আসলে তাহা সত্য নহে। এই আমদানি শুল্ক ধার্য্য হইবার পর সুইডিস ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী বিরাট মূলধন লইয়া ভারতে এক বিরাট দেশলাইয়ের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সুইডেনের দেশলাই পৃথিবীর সর্ব্বত্র সুপ্রচলিত, এই ব্যবসায়ে তাহাদের অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট বেশী। সুতরাং তাহারা যে ভারতের শিশু দেশলাই প্রতিষ্ঠানগুলিকে অতি সহজেই প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা টেরিফ বোর্ডের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি। অবিলম্বে প্রতিকার না হইলে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস হইয়া যাইবে।

পেট্রলের অনুকল্প পদার্থ—

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, পনর বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুত কে-এম্-চক্রবর্ত্তী ও ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক লেবোরেটরীতে অনুসন্ধান করিয়া যে তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এতদিন পর বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহা আদৃত হইয়াছে। তাঁহাদের আবিষ্কৃত পদার্থ পেট্রলের পরিবর্ত্তে মোটরে ব্যবহৃত হইতে পারে। তাঁহাদের আবিষ্কৃত পন্থায় প্রস্তুত জ্বালানি তেলের উৎপাদন খরচ খুব কম। কেন না, এখানে কয়লার মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। ভারতে এই শিল্পটি গড়িয়া উঠিলে বিদেশীর হাত হইতে একভাবে নিস্তার পাওয়া যাইবে।

হিন্দির উৎপাত—

শীঘ্রই ঢাকা জেলার মালিকান্দা গ্রামে গান্ধী সেবাসংঘের বার্ষিক উৎসব হইবে এবং মহাত্মা গান্ধী ঐ সময় তথায় উপস্থিত থাকিবেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ, সম্মেলনের বক্তৃতা আলোচনা সবই নাকি হিন্দি ভাষায় অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। এইজন্য সেখানে অনেকে নাকি ইতিমধ্যে হিন্দি ভাষা শিক্ষা সুরু করিয়া দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, কলিকাতা হইতে একজন হিন্দি শিক্ষকও নাকি সেখানে প্রেরিত হইয়াছে। একথা সত্য হইলে আফশোষের কথা। কেন না নিজেদের মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গালা দেশে সভাসমিতিতে বাঙ্গালীরা হিন্দি ভাষার আশ্রয় লইবে ইহা এ যুগে বরদাস্ত করা কঠিন।

হিন্দু সৎকার সমিতি—

সম্প্রতি কলিকাতার হিন্দু সৎকার সমিতির নূতন গৃহে স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সমিতির অষ্টম বার্ষিক সভা হইয়া গিয়াছে। ১৯৩৯ সালের কার্য্য-বিবরণী হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে ২৮১০-টি মৃতের সৎকার সমিতির পক্ষ হইতে করা হইয়াছে। পরীক্ষিত হিসাব হইতে জানা যায়, আয় ২৪,০২৩৮৪ পাই মধ্যে ২২,৮৪৬৶৬ পাই ব্যয় হইয়াছে। সভায় এই প্রস্তাবটিও সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইয়াছে—কতকগুলি হাসপাতালে হিন্দুর বেওয়ারিশ মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। উহা হিন্দুশাস্ত্রবিরোধী বলিয়া হিন্দু সৎকার সমিতি ঐ সকল হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে।

ভারতে ক্ষয় রোগের প্রকোপ—

ভারতে ক্ষয়রোগের প্রকোপ দিন দিনই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। পাশ্চাত্যের তুলনায় এ দেশে ক্ষয়রোগী ও ক্ষয় রোগের ফলে মৃত্যুর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। দুঃখের বিষয়, ক্ষয়রোগের চিকিৎসার যে ব্যবস্থা আছে তাহা আদৌ প্রয়োজনানুরূপ নহে। ফ্রান্সের লোকসংখ্যা ৪ কোটি ২০ লক্ষ, সেখানে ক্ষয়রোগের চিকিৎসার জন্য ৭১,৬৩২ জনের শয্যা আছে। ওয়েল্সের লোকসংখ্যা ৩ কোটি ৭০ লক্ষ, সেখানে ২৮,৯০০ জনের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় ৩৬ কোটি, অথচ এখানে ক্ষয়-রোগের চিকিৎসার জন্য মাত্র ২,২৫৫টি শয্যা আছে! ভারতে ক্ষয়রোগ একটি জনস্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যায় আসিয়া উপনীত, বহু লোক এই রোগে আক্রান্ত হইতেছে। ফলে বহু লোক দীর্ঘকালের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে এবং বহু লোকের মৃত্যু ঘটিতেছে। সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি স্বামী বিরজানন্দ ক্ষয়রোগীদিগের জন্য রাঁচিতে একটি স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের সংকল্প করিয়া জনসাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিয়া এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন।

এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে রাঁচি শহরের অদূরে আড়াইশত একর জমি ক্রয় করা হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, স্বামীজীর, তথা রামকৃষ্ণ মিশনের এই সংকল্প কার্য্যকরী করিবার পক্ষে অর্থের কোন অভাব হইবে না; বদান্য দেশবাসীরা অবিলম্বে অর্থসাহায্য করিয়া সংকল্পটি কার্য্যে পরিণত করিবেন।

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশন—

সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রায় বিশটি ব্যাঙ্ক লইয়া বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই বিশটি ব্যাঙ্কের মধ্যে সাতটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত। অপর ব্যাঙ্কগুলির নিম্নতম মূলধন পঞ্চাশ হাজার টাকা। বাংলা দেশের ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা করা, অসঙ্গত প্রতিযোগিতা রহিত করা, সুদের হার নির্দ্ধারণ করা এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের উন্নতি করা—এই সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারের সভাপতি ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লোকাল বোর্ডের সদস্য ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার সভাপতিত্বে নব-গঠিত সমিতির প্রথম সভা হয়। ডক্টর লাহা বক্তৃতাপ্রসঙ্গে উচ্চহারে আমানত গ্রহণ ও উচ্চ সুদের আশায় কম নিরাপদে টাকা খাটানোর নিন্দা করিয়া বলেন যে, বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশনকে এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

স্বাধীনতা দিবস ও নূতন প্রতিজ্ঞা—

গত ২৬এ জানুয়ারী ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে ভারতের সর্ব্বত্র যথাযোগ্যভাবে এবং যোগ্য গাম্ভীর্য্যের সহিত স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই স্বরাজ পতাকা উড্ডীন করা হইয়াছিল। গত দশ বৎসর ধরিয়া এই দিনে স্বাধীনতাকামী ভারতীয়েরা যে প্রতিজ্ঞা-মন্ত্র পাঠ করিয়া আসিতেছিল, এবারে তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ফলে কোন কোন সমাজতন্ত্রী নেতা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

পাঠ্যপুস্তক ও টেক্সট্‌বুক কমিটি—

গত ইংরেজী বৎসরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনের জন্য টেক্সট্‌বুক কমিটির নিকট ১৮৪৭ খানি পাঠ্যপুস্তক পেশ করা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে ৯৩৭ খানি গ্রন্থ মনোনীত হইয়াছে। বাকী ৯১০ খানি অমনোনীত পুস্তকের মুদ্রণ ব্যয় ইত্যাদিতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা নষ্ট হইয়া গেল। পুস্তকপ্রকাশক ও অতিলোভী শিক্ষিতদের উদ্যম এদিকে এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, প্রতি বৎসর নূতন নূতন পাঠ্যপুস্তক কিনিতে দরিদ্র অভি-ভাবকদের প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছে। টেক্সট্ বুক কমিটির লেফাপাদুরস্ত ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হওয়াও আবশ্যক।

পণ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ—

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে দিল্লীতে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদের যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহার একটি সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারত সরকার দুইজন পরামর্শদাতা কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন স্থির করিয়াছেন। ইঁহাদের একজন কলিকাতায়, আর একজন বোম্বাইয়ে থাকিয়া পাট ও তুলার ফাটকা বাজারের মূল্য ওঠা-নামা ও তাহার কারণাদি লক্ষ্য করিবেন এবং দৈনিক ও সাপ্তাহিক রিপোর্ট দিয়া ভারত সরকারকে পাট ও তুলার বাজার সম্বন্ধে সজাগ রাখিবেন। পাট ও তুলার ফাটকা বাজার নিয়ন্ত্রিত করিবার কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে কি-না সে সম্বন্ধে কিছু স্থির হয় নাই। কথা হইয়াছে, নবনিযুক্ত কর্ম্মচারীদের পর্য্যবেক্ষণের ফলাফল বিবেচনা করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার পরে বাঙ্গালা ও বোম্বাই সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া যথাকর্ত্তব্য করিবেন। তুলার বাজার সম্পর্কে বোম্বাই সরকার কি করিতেছেন জানি না, কিন্তু পাটের ব্যাপারে বাঙ্গালা সরকার যে ভাবনার বহর দেখাইতেছেন তাহা দেখিয়া পাটচাষীর হিতার্থীরা হতবুদ্ধি হইয়াছেন।

সরকারী রেলের আয়—

গত ২১এ ডিসেম্বর হইতে ৩১এ ডিসেম্বর মাত্র এই কয়দিনে সরকারী রেলওয়েগুলির তিন কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসর এই কয় দিনে যে আয় হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা এ বৎসর এগার লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩১এ

ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কয় মাসে আনুমানিক সত্তর কোটি নিরানব্বই লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। তাহার পূর্ব্ব বৎসরে এই কয় মাসে সরকারী রেলওয়েগুলির যে আয় হইয়াছিল আলোচ্য বর্ষে তাহা অপেক্ষা এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে, সরকারী রেলওয়েগুলির আয় ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আয়ের অনুপাতে তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ সুবিধা কিছুমাত্র বাড়ে নাই বা বাড়াইবার চেষ্টামাত্রও হয় নাই; অথচ এই দুই শ্রেণীর ভাড়া হইতেই রেল কোম্পানীর বেশী আয় হয়। তা ছাড়া,আয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে দরিদ্র কর্ম্মচারীদের বেতনও বৃদ্ধি হয় নাই। এই অশোভন ও অসঙ্গত ব্যবহার আর কতকাল চলিবে?

কংগ্রেস ও প্রাদেশিকতা—

মধ্যপ্রদেশে দলগত প্রাধান্য লইয়া কংগ্রেসের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়াছে তাহারই ফলে ডাঃ খারের মত একজন সর্ব্বজনমান্য নেতার বিরুদ্ধে কংগ্রেস হইতে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তাহাতে কংগ্রেসভক্ত সকল মহারাষ্ট্র-বাসীর প্রাণে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল; তাহার অপরিহার্য্য প্রতিক্রিয়া মধ্যপ্রদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে। কংগ্রেসের সে মহিমা আর তাই সেখানে এখন তেমনভাবে নাই। সম্প্রতি নাগপুর মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু-সভার পক্ষ হইতে উক্ত নির্ব্বাচনে পাঁচ-জনকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হইয়াছিল, তাহার মধ্যে চারিজন জয়ী হইয়াছেন। কংগ্রেসের এই পরাজয়ের পশ্চাতে ডাঃ খারের প্রতি ব্যবহারের জন্য মহারাষ্ট্রের মনে যে গভীর ক্ষত দেখা দিয়াছে, তাহাই যে অনেকাংশে দায়ী একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের ইহাতেও চৈতন্য হয় না—ইহাই দুঃখের বিষয়।

মহাত্মার দাবী—

স্বাধীনতার নূতন সংকল্পবাক্যে চরকা খদ্দর অবশ্য অবলম্বনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহাতে বামপন্থী কর্ম্মীগণ তীব্রভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি 'হরিজন' পত্রে মহাত্মাজী এই সব প্রতিবাদের উপর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে বৃটিশ-সরকারের সহিত সংগ্রামে যোগ দিতে মোটেই রাজী নহেন। মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া যদি বন্ধুত্ব রাখা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তিনি কোনমতেই বিরোধকে বরণ করিবেন না। তবে বিরোধ অপরিহার্য্য হইলে সংগ্রামকে কোনমতেই উপেক্ষাও করিবেন না। তাঁহার মতে আজও সংগ্রামের প্রশ্ন ওঠার দিন আসে নাই। বড়লাটের বোম্বাই বক্তৃতা তিনি বিশ্বাস করেন, কেন না তাহা আন্তরিক। তিনি বিশ্বাস করেন, দুই দেশের মধ্যে সম্মানজনক আপোষের সম্ভাবনা এখনও বর্ত্তমান। মানুষের আদর্শ লাভের শেষ আশা নির্ম্মূল না হইলে সে কখনও বিরোধে ঝাঁপাইয়া পড়ে না। মহাত্মাজী মুক্তিকামী ভারতের নেতা, তিনি যে পন্থা নির্দ্দেশ করিবেন সকলকেই সেই পথ স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। যিনি তাহাতে সম্মত না হইবেন তাঁহাকে হয় কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে, নতুবা কংগ্রেসে নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া মহাত্মাজীর প্রভাব হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত করিয়া নিজেকে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

সিন্ধুর দাঙ্গা—

সিন্ধু প্রদেশের সুক্কুরে অসহায় হিন্দু নরনারীর প্রতি যে বীভৎস অত্যাচারের তাণ্ডব লীলা চলিয়াছিল সম্প্রতি তাহার সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে ১৪২জন হিন্দু নিহত হইয়াছে, দশজন জীবন্ত দগ্ধীভূত হইয়াছে, ৫৮জন আহত অবস্থায় হাসপাতালে গিয়াছে ও তাহার মধ্যে পরে ৯জন মারা গিয়াছে; মুসলমানদের মধ্যে ১৪জন নিহত, ১২জন আহত। আহতেরা সকলেই সারিয়া উঠিয়াছে। যে ৬জন হিন্দু নারীকে পাওয়া যাইতেছিল না, তাহাদেরও পাওয়া গিয়াছে। যে ১৬৪খানি গৃহ ভস্মসাৎ হইয়াছে, তাহার বেশীর ভাগই হিন্দুদের এবং তাহাতে আনুমানিক প্রায় ১,৪৮,০০০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে; ৪৬৭খানি গৃহ লুণ্ঠিত, তাহার ফলে ৬,৫৩,০০০ টাকা লোকসান গিয়াছে। ঘরের মধ্যে যে সব দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়াছে তাহার ক্ষতির পরিমাণ ইহাতে ধরা হয় নাই। এই রকম ধনজনহানিকর ব্যাপারের পর সরকার দেশবাসীর কাছে কি কৈফিয়ৎ দিবেন, তাহা আমরা ভাবিয়াও পাই না।

সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে প্রশ্রয় দিলে এ ধরণের অরাজকতা অপরিহার্য্য। এ সম্পর্কে সিন্ধু সরকার প্রতিকারের কি পন্থা অবলম্বন করেন তাহা দেখিবার জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি।

ব্যবস্থা-পরিষদ ও প্রিভিলেজ কমিটি—

কিছুদিন আগে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের স্পীকারের বিরুদ্ধে মন্তব্য করার জন্য বাংলার দৈনিক "আজাদ"এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত হয়। এই অভিযোগের বিচার করিবার জন্য যে প্রিভিলেজ কমিটি আছে সেই কমিটি সম্প্রতি উক্ত অভিযোগের বিচার করিয়াছেন। কমিটির সদস্যেরা সকলেই একবাক্যে 'আজাদ' সম্পাদককে ক্ষমা চাহিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু মন্ত্রী বিজয়প্রসাদের মতে কমিটির নির্দ্দেশ নাকি সঙ্গত হয় নাই। কমিটির সদস্যরা নাকি বিষয়ের গুরুত্ব না বুঝিয়াই রায় দিয়াছেন। মন্ত্রী মহাশয়ের এ মন্তব্যে কমিটির সদস্যেরা কিন্তু মোটেই আপত্তি করিলেন না। 'আজাদ' পত্রের সম্পাদক মৌলানা আক্রাম খাঁ সাহেব ক্ষমা চাহিতে গররাজী হইলেন। যে প্রিভিলেজের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কমিটি রক্তচক্ষু হইয়াছিলেন, ব্যবস্থাপক সভাগৃহে দাঁড়াইয়াও পুনরায় আক্রাম খাঁ সাহেব সেই প্রিভিলেজের অমর্য্যাদা করিলেন, কমিটির সভ্যরা তথাপি বিজয়প্রসাদের পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন না। একাজ যাঁহারা সজ্ঞানে করিতে পারেন তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রিভিলেজ কমিটির কোন সার্থকতাই নাই।

ব্যাঙ্কিং ও মহাজনী আইন—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মহাজনী বিলের আলোচনার সময় তর্ক উঠিয়াছিল, ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়কে প্রাদেশিক আইনের অন্তর্ভুক্ত করিবার অধিকার প্রাদেশিক আইন সভার আছে কি-না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলভুক্ত এবং বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক ছাড়া অপরাপর ব্যাঙ্ক যে টাকা ঋণ দিবে তাহা বঙ্গীয় মহাজনী আইনের আমলে আনিবার ব্যবস্থা এই বিলে করা হইয়াছে এবং বিলের এই ধারাটিই এই বিতর্কের বিষয়। বহু তর্ক-বিতর্ক শুনিয়া সভাপতি রায় দিয়াছেন—সমস্যাটি সন্দেহজনক, এ সম্বন্ধে কোন সুনির্দ্দিষ্ট মীমাংসায় পৌঁছানো শক্ত, কাজেই বিলের আলোচনা চলিতে থাকুক। হয় ত বিলটি এ অবস্থায়ই পাশ হইয়া যাইবে; কিন্তু পরে ইহা লইয়া যে জটিলতার সৃষ্টি হইবে, তাহার মীমাংসা করিতে অনেক বেগই পাইতে হইবে। ভারত-শাসন আইনের সপ্তম তপ্‌শীলে গলদ নাই এমন নয়। মহাজনী কারবার প্রাদেশিক তালিকার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু প্রমিসরি নোট স্থান পাইয়াছে ফেডারেল তালিকায়—ইহা একটা বড় রকমের গলদ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্যাঙ্কিং এবং মহাজনী সম্বন্ধে তপশীলে যাহা আছে সমস্যাটি বুঝিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

আসাম-মন্ত্রিসভার নূতন মন্ত্রী—

আসামের মন্ত্রিসভা হইতে কংগ্রেস সরিয়া পড়ায় ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী স্যর সাদুল্লা পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। নবগঠিত সেই মন্ত্রিসভায় আসামের শ্রীরূপনাথ ব্রহ্ম আবার ফিরিয়া গিয়াছেন। এই যোগদান সম্পর্কে তিনি যে কৈফিয়ৎ প্রচার করিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। পার্ব্বত্য জাতিদের সুখ সুবিধা নাকি আসামে একটা মন্ত্রিসভা না থাকিলে বজায় থাকে না, তিনি যদি দয়া করিয়া স্যর সাদুল্লাকে রক্ষা না করেন তাহা হইলে আসামে আর মন্ত্রিসভাই কায়েম হইবে না—ইহাই হইল তাঁহার কৈফিয়তের সংক্ষিপ্তসার। ভাগ্যে স্যর সাদুল্লা মিঃ ব্রহ্মকে চিনিয়া ছিলেন, নতুবা এ যাত্রায় তাঁহার মন্ত্রিত্ব বজায় রাখা সুকঠিন হইয়া পড়িত। আসাম মন্ত্রী-মণ্ডলের এই নব-নিযুক্ত মন্ত্রী মহাশয়ের বিনয় প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশবাসী এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইবেন কি?

হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য দান—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সদস্য নদীয়া জেলার প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত রণজিৎ কুমার পালচৌধুরী মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই অর্থের আয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশের যোগ্য অধ্যাপকদের আহ্বান করিবেন এবং তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশানুযায়ী 'হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি' সম্পর্কে অধ্যয়ন ও গবেষণা করিবেন। হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের

মালমশলা ভারতের সর্ব্বত্র বিচ্ছিন্ন আছে, এই উপায়ে সেগুলি একত্র সন্নিবেশিত হইলে জাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যে অজ্ঞতা স্বাভাবিক ত বটেই, তাহা ছাড়া রাজনৈতিক কারণেও পণ্ডিতদের মধ্যে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্ত ধারণা আছে। এই ব্যবস্থায় তাহার কথঞ্চিৎ লাঘব হইবে বলিয়াই মনে হয়। এই মহৎ কার্য্যে শ্রীযুক্ত পালচৌধুরীর এই দান দেশবাসী সকৃতজ্ঞচিত্তেই গ্রহণ করিবে।

পানীয় জলের সুব্যবস্থা—

কলিকাতা শহরে পানীয় জল যাহাতে দুষিত হইতে না পারে সেই রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য কয়েক বৎসর হইতেই আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। কলিকাতা কর্পোরেশন এই জন্য অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিকদের লইয়া একটি কমিটি বসাইয়াছিলেন। সেই কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী সংশোধনের সুব্যবস্থা করিবার জন্য কয়েকটি উপায় গৃহীত হইয়াছে। তদনুসারে পল্তায় একটি উচ্চ শ্রেণীর পর্য্যবেক্ষণাগার ও পরীক্ষাগার নির্ম্মিত হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা কর্তৃক এই গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। আশা করি, অতঃপর কলিকাতায় বিশুদ্ধতর পানীয় জল সরবরাহ করা হইবে এবং তাহার ফলে জন-স্বাস্থ্যও প্রভূত উন্নত হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মিণ্টো অধ্যাপক—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে মিণ্টো অধ্যাপকের পদ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সৃষ্ট হয় এবং সেই হইতে এই পদের ব্যয় ভারত সরকারের তহবিল হইতে প্রদত্ত হইতেছিল। এ বৎসর হঠাৎ কোন অজ্ঞাত কারণে ভারত সরকার আগামী বৎসরের জন্য সেই অর্থ (বার হাজার টাকা) সরবরাহ করিতে অসম্মত হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় অগত্যা বাংলা সরকারকে এই ব্যয় মঞ্জুর করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন; কিন্তু বাংলা সরকারও কেন্দ্রীয় সরকারেরই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া জানাইয়া দিয়াছেন—দেওয়া অসম্ভব। বাংলা সরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হয়ত মনে করিতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ব্যাপক ও অধিকতর শিক্ষাপ্রদান অনাবশ্যক, কিন্তু বাংলার জনগণ তাহা আদৌ মনে করেন না। বিশ্ববিদ্যালয় এই পদের বার্ষিক বেতনের টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফি ফণ্ড' হইতে দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেশবাসীর প্রশংসা অর্জ্জন করিলেন।

বাংলার মৎস্য ও কড্‌লিভার—

নিখিল-ভারত শরীর পালন ও জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের এক রিপোর্টে আমাদের দেশীয় খাদ্যদ্রব্যের কোন্‌টার মধ্যে কতটা খাদ্যপ্রাণ আছে সে সম্পর্কে এক গবেষণামূলক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। বোয়াল, আইর, ঢাইন ও শোল মৎস্য সম্বন্ধে যে তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পর আমাদের মধ্যে বিদেশী কড্‌ লিভার তৈল ব্যবহারের কোন সার্থকতাই দেখিতে পাই না। আমরা অবশ্য রুই, কাত্‌লা, কই, মাগুর ইত্যাদি মৎস্য সুখাদ্য ও পরম উপকারী বলিয়া অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া থাকি। কিন্তু উক্ত রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় যে, বোয়াল, ঢাল, আইর ও শোল মৎস্যে যে খাদ্যপ্রাণ আছে তাহা নরওয়ের কড্‌লিভারের অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশী। অথচ দুঃখের বিষয়, আমরা উক্ত মৎস্যগুলি খাই না।

কাশ্মীরে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার—

কাশ্মীর দরবার সম্প্রতি পল্লীসংগঠন ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রচারের জন্য একটি নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা মত কার্য্য চালাইয়া আগামী দশ বৎসরের মধ্যে রাজ্যের সমগ্র লোকসংখ্যার অক্ষর-পরিচয় শিক্ষা সম্পূর্ণ করা হইবে। আশা করি অন্যান্য দেশীয় রাজ্যসমূহও কাশ্মীরের এই আদর্শ অনুকরণ করিবে।

বাঙ্গালী রাসায়নিকের কৃতিত্ব—

শ্রীযুক্ত জ্ঞানশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় খ্যাতনামা রাসায়নিক; তিনি সম্প্রতি 'স্পাইরোচিন' নামক একপ্রকার বায়ী অবক্ষার (volatile alkaloid) আবিষ্কার করিয়াছেন। এই স্পাইরোচিন হইতে প্রস্তুত স্পাইরোচিন হাইড্রোক্লোরাইড নামক পদার্থ ইন্‌জেক্‌শন করিয়া নানা প্রকার দুষ্ট ক্ষতে

আশ্চর্য্য সুফল দেখা যাইতেছে। কলিকাতা কারমাইকেল মেডিকেল কলেজেও বহু খ্যাতনামা চিকিৎসক এই ঔষধটির সাহায্যে ইরিসিপ্লাস, কার্বাংকল্, গ্যাংগ্রীন এবং নানা প্রকার দূষিত ও পুরাতন ক্ষত, উপদংশ, বাঘী, অর্শ, ভগন্দর ইত্যাদি জটিল ব্যাধির উপশম ঘটাইতেছেন। ঔষধটির আবিষ্কারক শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত চম্পকদী গ্রামের অধিবাসী; আমরা তাঁহার সর্ব্ববিধ উন্নতি কামনা করিতেছি।

কর্পোরেশন প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলন—

সম্প্রতি কলিকাতায় কর্পোরেশন-পরিচালিত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদিগের সম্মিলন হইয়া গেল। দেশের বরেণ্য শিক্ষাব্রতীগণ এই উপলক্ষে শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। সম্মিলনের সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে অনেক নূতন তথ্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। সকল সভ্য দেশেই স্বীকৃত—বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে যে দারুণ অবহেলা দেখা যায় তাহার প্রতি এই সম্মিলন দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। এই কলিকাতা শহরেই অক্ষর-পরিচয় হয় নাই এরূপ প্রায় চারি লক্ষ পুরুষ আছে (স্ত্রীলোকের সংখ্যা যে কত তাহা অবশ্য তিনি বলেন নাই)। শহরের মিউনিসিপ্যালিটির অন্যতম প্রধান কার্য্য—প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা; ইতিপূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল না। কংগ্রেসী আমলেই ইহার প্রচলন হইয়াছে। তবু কলিকাতায় এখনও অন্তত পঞ্চাশ হাজার ছেলেমেয়ের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। কলিকাতা কর্পোরেশনের আয় প্রায় আসাম সরকারের সমান। অথচ এই বিপুল আয়ের শতকরা মাত্র চার ভাগ শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়। ভাল স্কুল ও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও উপযুক্ত গ্রন্থাগারের অভাব, ছাত্রগণের দৈহিক পুষ্টির অভাব এবং তাহার প্রতিকারের জন্য স্বল্পমূল্যে ও একান্ত অভাবগ্রস্তের জন্য বিনামূল্যে আহার ও দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা, অশিক্ষিত কিংবা অসন্তুষ্ট শিক্ষকের উপর শিক্ষার ভার ন্যস্ত থাকার কুফল প্রভৃতি বহু বিষয়ে তিনি সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কর্পোরেশন যেখানে প্রকৃত প্রশংসার অধিকারী সেখানে তাহার প্রাপ্যকেও স্বীকার করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই; কর্পোরেশন যদি নিরক্ষর নাগরিকদিগের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে একদিকে যেমন করদাতাদিগের প্রতি তাঁহারা কর্ত্তব্য পালন করিবেন, অপর পক্ষে তাঁহারা অগ্রগামীরূপে সমগ্র দেশের পথপ্রদর্শক হইবেন। সুরেন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জন যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্পোরেশনকে নবরূপ দান করিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে নাগরিকদিগের প্রত্যেককেই শিক্ষা দেওয়া অন্যতম ছিল। কর্পোরেশনের সেই কল্যাণ আদর্শকে সফল করিবার জন্য অবহিত হওয়া যে উচিত তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু অপব্যয় নিবারণ ভিন্ন এই সকল কার্য্য সফল করিবার অন্য কোন উপায় আছে বলিয়াও মনে হয় না।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুবার্ষিকী—

গত ৭ই মাঘ রবিবার হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীর নেতৃত্বে সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দেবানন্দপুর শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি এবং এখানেই তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। বিদ্যাসাগরের বীরসিংহ, বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁঠালপাড়া, মধুসূদনের সাগরদাঁড়ী বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছে—শরৎচন্দ্রের জন্মভূমিরূপে দেবানন্দপুরও বাঙ্গালার এই তীর্থগুলির অন্যতম। শরৎচন্দ্রের খ্যাতির উপযোগী কোন স্থায়ী স্মৃতি যাহাতে এই স্থানে রক্ষিত হয়, তাহার চেষ্টা দেশবাসীর করা কর্ত্তব্য। এই কিছুদিন আগে মেদিনীপুর শহরে বিদ্যাসাগর ভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দেবানন্দপুরেও যাহাতে সেইরূপ একটি ভবন নির্ম্মিত হয় এবং তাহাতে শরৎচন্দ্রের লিখিত পুস্তকাবলী, পাণ্ডুলিপি, তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, তাঁহার চিত্র ও প্রতিমূর্ত্তি ইত্যাদি তথায় রক্ষিত হয়, প্রতি বৎসর সাহিত্যাচার্য্যের জন্ম ও মৃত্যু দিনে সেখানে উৎসব, প্রবন্ধ পাঠ ইত্যাদির ব্যবস্থা হয় সে বিষয়ে সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। বিশেষ সুখের বিষয়, হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস্

মহাশয় এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন। যদিও শরৎচন্দ্র সমগ্র বাঙ্গালার গৌরবের, তবু তাঁহার জন্মভূমিরূপে হুগলীর নিকট আমাদের একটু বিশেষ দাবী রহিয়াছে—এই দাবী তাঁহার দেশবাসীর সম্মিলিত চেষ্টায় পূর্ণ হইলে দেশের একটি প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ—

ডক্টর অনন্তহরি পাণ্ডা শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি ভারতীয় হইয়াও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ হইবার সুযোগ লাভ করিলেন। ডক্টর পাণ্ডা কাথিয়াবাড়ের অধিবাসী, বোম্বাই বিশ্ববিস্তালয়ের ছাত্র। তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং উপাধি পরীক্ষায় জেম্‌স্ বেকারলে স্বর্ণপদক ও পুরস্কার পান। পরে তিনি আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনষ্টিটিউটের 'অনারারি ফেলো' নির্ব্বাচিত হন ও 'ডক্টর অফ্ সায়েন্স' উপাধি পান। তিনি বিলাতে থাকার সময় রি-ইন্‌ফোর্‌স্‌ড কংক্রিট এবং লোহার কারু-কার্য্যের বহু উন্নতি সাধন করেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ডক্টর পাণ্ডা বত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের জেম্‌স্ এফ লিঙ্কন আর্ক ওয়েল্ডিং ফাউণ্ডেশন ইণ্টার ন্যাশনাল বৃত্তি লাভ করেন। যোগ্য ব্যক্তির যোগ্যতা স্বীকার করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ সুবিবেচনার পরিচয় দিলেন।

আরব নেতার উক্তি—

প্যালেস্টাইনের গ্র্যাণ্ড মুফ্‌তির ভাগিনেয় জামাল হুসেনীর জ্ঞাতি ভ্রাতা আরবনেতা মুসা হুসেনী বর্ত্তমানে লণ্ডনে আছেন। তিনি 'হায়ার' কমিটির একজন সদস্য। 'হিন্দুস্থান টাইম্‌স্' পত্রিকার লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিঃ জিন্নার মতবাদ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জানিতে চাহেন। উত্তরে তিনি বলেন—মিঃ জিন্না অকারণ বাড়াবাড়ি করিয়াছেন; তাহা দেখিয়া আরবে বড় বড় নেতারা দুঃখিত হইয়াছেন। এই মতবাদের ভিতর আন্তরিকতা থাকিলে বলিব যে তাহা মূর্খামি। এ জন্য মিঃ জিন্নার কাণ্ডজ্ঞানহীনতা এবং রাজনৈতিক বুদ্ধিভ্রংশতাই দায়ী। তিনি ভারতের ঐক্য এবং স্বাধীনতার পথে ব্যাঘাত জন্মাইয়া ইসলামের অপকার করিয়াছেন। ভারতীয় মুসলমানেরা যদি ভেদের সুযোগ লইয়া বৃটেনের প্রগতি-বিরোধীদের হাতে ধরা দেয় তবে ইসলামের শক্তি খর্ব্ব হইবে। কারণ ভারতবর্ষ এবং আরব যাহাতে স্বাধীনতা না পায় তজ্জন্য এই প্রগতিবিরোধিরা বদ্ধপরিকর। সংখ্যা লঘিষ্ঠদের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইবে, ইহা আমরা জানি। কংগ্রেস বা গণপরিষৎ যদি তাহা না করে এবং স্বাধীন ভারতে মুসলমানেরা নির্য্যাতিত হয় তবে পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান তাহাদের পক্ষাবলম্বন করিবে। মুসলমান ছাড়া অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ন্যায়পরায়ণ লোকেরাও তাহাদের পক্ষে যোগ দিবে। ভারতীয় মুসলমানের প্রথম রাজনৈতিক কর্ত্তব্য হইতেছে নিজেকে দেশহিতকামী ভারতীয় মনে করা। 'আমি স্বাধীন দেশের লোক'—এ কথা বলা কি ভারতীয় মুসলমানের পক্ষে শ্লাঘার কথা নহে? মিঃ জিন্না কি বলেন?

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপাদান—

ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বহু উপকরণই দেশান্তরিত হইয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাহা সুরক্ষিত আছে। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনস্থ কংগ্রেস পাঠাগারে ভারতীয় বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর হোরেস পোলম্যান সম্প্রতি উক্ত পাঠাগারে যে পুস্তক-তালিকা তৈয়ারি করিয়াছেন তাহাতে প্রায় নয় হাজারখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তালিকা-ভুক্ত এই সকল পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া তিনি এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই সব পাণ্ডুলিপির মধ্যে এমন সব বিষয় সন্নিবেশিত আছে যাহা আবিষ্কার করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ সবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার এই মন্তব্যের মধ্যে একটা ব্যাপক অর্থ আছে। তাহা হইতেছে এই যে, ভারতীয় মুনিঋষিরা জড়জগত ও অধ্যাত্ম জগৎ সম্পর্কেও যে অবদান রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আজিকার বিজ্ঞান গৌরবে গৌরবান্বিত সুসভ্য জগতেরও পরম কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম। অথচ এ তথ্য আমাদের কাছে অপরিজ্ঞাত। হয় ত একদিন আমাদেরই পূর্ব্ব-পুরুষদের জ্ঞানের অবদান পাশ্চাত্যের হাত হইতে আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

আপোষ মীমাংসার চেষ্টা—

গান্ধী-বড়লাটের আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা এবারেও ব্যর্থ হইয়াছে। কংগ্রেসের দাবী ও বড়লাটের প্রস্তাবের মধ্যে মূল প্রভেদ এই যে, ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা বৃটিশ-সরকারই স্থির করিবেন—ইহাই হইল বড়লাটের প্রস্তাব। অপর পক্ষে কংগ্রেসের মনোভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কংগ্রেস মনে করেন, ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিবে ভারতবাসীরাই, অপর কেহ নহে। আর তাহাই হইল প্রকৃত স্বাধীনতার পরিচয়। যত দিন না মূল পার্থক্য বিদূরিত হয় এবং বৃটিশ সরকার প্রকৃত পন্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন অর্থাৎ—ভারতীয়ের দ্বারাই যে ভারতের শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হইবে—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেন ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে কোন প্রকার শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক আপোষ-মীমাংসার সম্ভাবনা নাই। মহাত্মাজী বলেন, ভারতীয়ের দ্বারা ভারতের শাসনতন্ত্র রচিত হইলেই দেশরক্ষা, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়, দেশীয় রাজন্যবর্গ ও ইউরোপীয়দের স্বার্থরক্ষা—সকল সমস্যারই সমাধান আপনা হইতেই হইয়া যাইবে।

সাম্প্রদায়িক বিরোধের মিলন—

বাঙ্গালা দেশের সাম্প্রদায়িক বিরোধ মিটমাটের জন্য কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ হিন্দু নেতা শ্রীযুত বি-সি চট্টোপাধ্যায় ও প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ-কে-ফজলল হক সম্মিলিতভাবে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া এক গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করায় আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। ১০ই ফেব্রুয়ারী ঐ বৈঠক আহ্বানের কথাও শুনা গিয়াছিল, কিন্তু ঐ সময়ে বহু নেতা কলিকাতায় থাকিবেন না বলিয়া নাকি বৈঠকের তারিখ পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গোলটেবিল বৈঠক কিরূপ হইবে এবং তাহাতে কি কি বিষয় আলোচিত হইবে, তাহা এখনও জানা যায় নাই—তথাপি এইরূপ বৈঠকে যে সমস্যার সমাধান হইতে পারে এই কথা ভাবিয়া হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতারাই স্বস্তি বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বৈঠকের কথা শুনিয়াই নিশ্চিন্ত হইবার কারণ নাই। কেন না, প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলল হক সাহেবের মত পরিবর্ত্তনে বিশেষ সময় লাগে না। তিনি যে শেষ পর্য্যন্ত গোলটেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্মত হইবেন, সে বিষয়ে লোক এখনও নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছে না।

অতিরিক্ত কর নির্দ্ধারণ—

অতিরিক্ত লাভের উপর অত্যধিক পরিমাণে কর নির্দ্ধারণের জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে একটি নূতন আইন প্রণয়নের চেষ্টা চলিতেছে। এই আইনে যে কোন লোকের নির্দ্ধারিত আয়ের অধিক অতিরিক্ত লাভ হইলে তাহার শতকরা ৫০ টাকা ট্যাক্স হিসাবে গভর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে। অতিরিক্ত লাভ করাও যেমন অন্যায়, এইরূপ অত্যধিক ট্যাক্স আদায় করাও সেইরূপ অন্যায় ও অসঙ্গত। এই আইনের প্রস্তাবেই ব্যবসায়ী মহলে ইহার বিরুদ্ধে বিশেষ অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। কাজেই গভর্ণমেণ্ট যাহাতে সকল দিক বিবেচনা করিয়া ইহা আইনে পরিণত করেন, সে জন্য আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইতেছি।

তীর্থস্থানে যাত্রী নিবাস—

বাঙ্গালার বাহিরে বিভিন্ন তীর্থস্থানে বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীদিগকে নানাপ্রকার অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করিতে হয় বলিয়া ভারত সেবাশ্রম সংঘের কর্ম্মীরা বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীদিগের জন্য অনেক স্থানে যাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐ সকল যাত্রীনিবাসে বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীরা শুধু নিরাপদ বাসস্থান পান না, তাঁহাদের তীর্থকৃত্যাদিও সহজে সম্পাদনের ব্যবস্থাও করা হইয়া থাকে। গয়া, কাশী, এলাহাবাদ ও পুরীতে ঐরূপ যাত্রীনিবাস স্থাপিত হইয়াছে এবং অন্যান্য স্থানেও তাহার চেষ্টা চলিতেছে। আমরা ভারত সেবাশ্রম সংঘের কর্ম্মীদের এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করি এবং আশা করি ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ এই কার্য্যে তাঁহাদিগকে সাহায্য দানে কার্পণ্য করিবেন না।

কাহার জীবনের মূল্য বেশী ?

সম্প্রতি বিলাতের নর্থউডের (মিড্‌লসেক্স) এক সাহিত্য সভায় এক অভিনব বিতর্ক অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। বিতর্কের বিষয় ছিল—যদি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মিঃ বার্ণার্ড শ, বিখ্যাত অভিনেত্রী গ্রেসী ফিল্ড ও

'বসন্তে শ্রাবণ এলো' শিল্পী—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্বারভাঙ্গা)

শিকার

শিল্পী—নীরোদ রায় (গৌহাটী)

ভারতের জননায়ক মহাত্মা গান্ধীকে কোন এক নির্জন দ্বীপে বন্দী করিয়া রাখার পর ইঁহাদের মধ্যে এক জনকে বাঁচাইবার অধিকার পাওয়া যায় তবে কাহাকে বাঁচানো উচিত হইবে? বিতর্কের ফল ভোটের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং দেখা যায় মহাত্মা গান্ধী প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী দ্বিতীয়, অভিনেত্রী গ্রেসী ফিল্ড তৃতীয় ও বার্ণার্ড শ মাত্র এক ভোট পাইয়া চতুর্থ হইয়াছেন। বিষয়টা হয় ত খুব গুরুতর নয়, তবু বৃটেনের এক শ্রেণীর লোকের মনোভাব ইহাতে স্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়াছে।

লালগোপাল পাল—

নদীয়া জেলার রাণাঘাটনিবাসী স্বনামধন্য কৃতী লালগোপাল পাল মহাশয় সম্প্রতি পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বাল্যে কোনরূপ বিদ্যাশিক্ষার
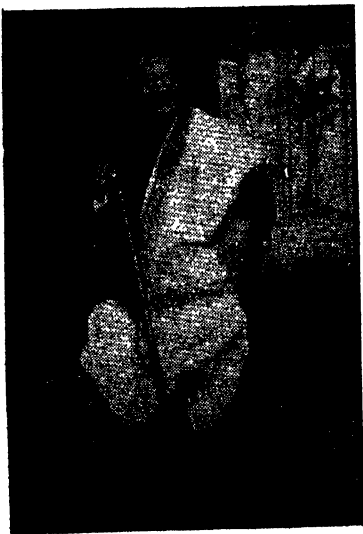
লালগোপাল পাল

সুযোগলাভ না করায় মাত্র তিন টাকা বেতনে তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। নিজ অসাধারণ বুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতার ফলে ব্যবসা দ্বারা তিনি জীবনে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। নিজে দরিদ্র ছিলেন বলিয়া তিনি অর্থের সদ্ব্যবহার জানিতেন এবং সারাজীবনে যে কত টাকা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার হিসাব নাই। তিনি রাণাঘাটে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার জন্য প্রচুর অর্থ দিয়া গিয়াছেন এবং দেবসেবার জন্য তাঁহার অর্জিত সম্পত্তির অধিকাংশ দান করিয়া গিয়াছেন। অবশিষ্ট সম্পত্তি তিনি নিজ পুত্রপৌত্রাদি ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন।

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—

২৪ পরগণা জেলার খ্যাতনামা দেশকর্ম্মী বরাহনগরনিবাসী খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৮শে পৌষ শনিবার সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। খগেন্দ্রবাবু দক্ষিণেশ্বরনিবাসী প্রসিদ্ধ কথক স্বর্গত তারাপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র ছিলেন। তিনি যৌবনেই দেশের কাজে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ও অবিবাহিত ছিলেন। জীবনের প্রায় ২৫ বৎসর কাল

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

তাঁহাকে কারাগারে বা অন্তরীণ অবস্থায় কাটাইতে হইয়াছিল। বারাকপুর মহকুমাবাসী যুবকগণের তিনি আদর্শ স্থানীয় ছিলেন এবং নিজ অকপট ব্যবহারের জন্য সর্ব্ব সম্প্রদায়ের প্রিয় ছিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

আগ্রীমতা দিবস ও ব্রটিশ সংবাদপত্র—

মহাত্মাজীর মতে সাম্রাজ্যবাদের দুই অঙ্গ আছে—রাজন্যবর্গ ও ভারতীয় সিভিল সার্ভিস। কিন্তু আমাদের মতে,

সাম্রাজ্যবাদের আরও দুইটি অঙ্গ আছে, তাহার একটি জনাব জিন্না ও তাঁহার সাম্প্রদায়িকতাবাদী অনুচরবৃন্দ, অপরটি বিলাতী সংবাদপত্র। আমাদের একথা যে সত্য তাহা 'অমৃতবাজার পত্রিকার' লণ্ডনস্থিত সংবাদদাতার প্রদত্ত একটি সংবাদে সুপ্রকাশিত। গত ২৬এ জানুয়ারী ভারত-ব্যাপী যে স্বাধীনতা দিবস পালিত হইয়াছে এক 'নিউজ ক্রনিক্‌ল্‌' ছাড়া আর কোন সংবাদপত্রে সে সংবাদ প্রকাশের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ইহা হইতে কি এই সত্যটাই প্রকট হয় নাই যে, লড়াইয়ের জন্য ভারত ধনজন দিয়া বৃটিশকে সাহায্য করিবে, অথচ বৃটেন ভারতকে যথারীতি উপেক্ষা করিয়াই চলিবে ?

প্রবন্ধ পঞ্জী—

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস অতি প্রাচীন না হইলেও ইহার কোন ধারাবাহিক বিবরণ এখনও লিখিত হয় নাই। এমন কি কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও যে সকল সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের বিবরণ জানিবার আমাদের কোন উপায় নাই। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য শ্রীযুত তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সকল সাময়িক পত্রের প্রবন্ধপঞ্জী প্রণয়নে যত্নবান হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। তিনি প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রগুলির প্রবন্ধপঞ্জী প্রস্তুত করিতেছেন ও সেগুলি কোন কোন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। এইভাবে সকল পুরাতন পত্রের প্রবন্ধপঞ্জী প্রস্তুত হইলে অনুসন্ধিৎসু গবেষকগণকে পরে আর কোন প্রবন্ধের জন্য হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইবে না। আমরা তিনকড়ি বাবুর এই উদ্যমের প্রশংসা করি।

কবি-প্রিয়া

শ্রীবিশ্বনাথ রায়চৌধুরী

ফিরিতে পথের ধারে
সহসা হেরিনু কারে
আঁখিতে আঁখিটি মিলানু যেমনি
চেনা অচেনায় মিলন অমনি,
নয়ন নামালো ধীরে
বন্ধন মায়া-তীরে।
কত কথা কয় মমতায় ভরা
কান পেতে শুধু শোনে এই ধরা
আর কেহ নাহি শুনিতে পায় সে কথা
জাগে মোর মনে গোপনে বিহ্বলতা।

* *

গোপনে কখন চপল মলয় এসে
তাহারে দোদুল দোল দেয় ভালবেসে
আমি বসে রই পাশে
সবুজ কোমল ঘাসে
দুলে দুলে এসে পরশ সে মোরে করে
উতলা কাঁপন লাগে মোর হিয়া পরে।

* *

সেদিন হইতে সে আমারে ভালোবাসে
পথ চেয়ে রয় সারা খন মোর আশে
যখন গোপনে কল্পনা করি একা
কেন সে ভাসিয়া নয়নে দেয় গো দেখা ?

* *

তৃপ্তির ঘোরে তাহারে রাখিয়া বুকে
সুপ্তি আসে গো স্বপনে জড়ায়ে সুখে
ঝুলন খেলায় রাত কেটে যায়
কেমনে গোপনে নাহি বুঝি তায়
অগুরু গন্ধে বসনে সুবাস ভরে ;
উন্মনা মন কেঁদে মরে তারি তরে।

* *

শোন, শোন, তবে গোপনে গোপনে বলি
প্রিয়বান্ধবী ! মোর সে, 'যূথিকাকলি'।

বেদ ও ভারতীয় দর্শন

ডক্টর আশুতোষ শাস্ত্রী এম্-এ, পি-এইচ্-ডি, পি-আর-এস, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

ভারতীয় আস্তিক দর্শনের সহিত বেদের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা ও বেদান্ত—এই ছয়খানি আস্তিক দর্শন বেদ-প্রামাণ্যের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠিয়াছে। বেদকে অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে বলিয়াই উক্ত ষড় দর্শনকে আস্তিক বলা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে নাস্তিকতা বেদনিন্দক এই মতানুসারে বেদকে যাঁহারা অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলা হয়। চার্ব্বাক বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি দার্শনিকগণ বেদ মানেন না, এইজন্য তাঁহাদের দর্শন নাস্তিক দর্শন। নাস্তিক দার্শনিকগণ বলেন যে, বেদের নির্দ্দেশ মত বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না; সুতরাং তাহা হইতে বেদের নির্দ্দেশ যে মিথ্যা ইহাই নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। দ্বিতীয়তঃ বেদের উক্তির মধ্যে পরস্পর-বিরোধও বহু দেখিতে পাওয়া যায়; পূর্ব্বে যে কথা বলা হইয়াছে, পরে আবার তাহারই সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলা হইয়াছে; এক কথার বার বার পুনরুক্তিও বহু আছে। এইরূপ বেদকে অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই গ্রহণ করিতে পারেন না। বেদে বলা হইয়াছে যে, পুত্রেষ্টি যাগ করিলে পুত্রলাভ হয়, কারীরী যাগ করিলে সুবৃষ্টি হইয়া থাকে। অনেকে বেদের এই প্রকার নির্দ্দেশের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া পুত্রেষ্টি ও কারীরী যাগের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কিন্তু পরে দেখা গিয়াছে যে পুত্রও হয় নাই, বৃষ্টিও হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে বেদের উক্তিকে কি করিয়া সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়? যে সকল যাগযজ্ঞের ফল আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি সেই প্রত্যক্ষফল যাগযজ্ঞ যদি মিথ্যা হয় তবে অপ্রত্যক্ষফল অগ্নি-হোত্রাদি যাগযজ্ঞ যে মিথ্যা নহে তাহা কেমন করিয়া বুঝা যায়? দ্বিতীয় কথা, অগ্নিহোত্র হোম কোন্ সময়ে করিতে হইবে? ইহার উত্তরে বেদে অগ্নি-হোত্র যাগের তিনটী সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে—(১) সূর্য্য উদিত হইলে হোম করিবে (২) সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হোম করিবে ও (৩) সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আকাশে যখন নক্ষত্র দেখা যাইবে না তখন হোম করিবে। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত কালত্রয়ে অগ্নিহোত্র হোমের বিধান করিয়াই পরমুহূর্ত্তে উক্ত তিন কালের হোমেরই নিন্দা করিয়া বেদে বলা হইয়াছে যে, "যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয় হইলে হোম করে শ্যাব নামক কুকুর তাহার আহুতি ভোজন করে; যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হোম করে শবল নামক কুকুর ইহার আহুতি ভোজন করে; যে ব্যক্তি সূর্য্য ও নক্ষত্রশূন্য কালে হোম করে শ্যাব ও শবল এই কুকুরদ্বয়ই তাহার আহুতি ভোজন করে" (১)। এইরূপ বেদের কথার মধ্যেই যেখানে বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়, সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না, সেই বেদের উক্তিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় কিরূপে? আর এক কথা, বেদে যখন ঐ প্রকার দুইটী বিরুদ্ধ উক্তি পাওয়া গেল তখন ঐ দুইটী পরস্পর-বিরোধী উক্তি তো আর সত্য হইতে পারে না; উহাদের একটী মিথ্যা হইবেই, যেটী মিথ্যা হইবে বেদের সেই অংশ যে মিথ্যা ইহা তো বেদের উক্তি হইতেই প্রমাণ হইয়া গেল। তারপর ঐ পরস্পর-বিরোধী উক্তিদ্বয়ের কোন্টী মিথ্যা, আর কোন্টী সত্য, তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলিবার কোন উপায় নাই। এই অবস্থায় উহাদের কোন একটীকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। বেদে এক কথার পুনরুক্তিও বহু পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে যজ্ঞীয় অগ্নি প্রজ্বালিত করিবার সময় এগারটী ঋক্ মন্ত্রের প্রয়োগ করিবার কথা দেখিতে

---

(১) শ্যাবোঽস্যাহুতিমভ্যবহরতি য উদিতে জুহোতি, শবলোঽস্যাহুতি মভ্যবহরতি যোঽনুদিতে জুহোতি। শ্যাবশবলৌ বাস্যাহুতি মভ্যবহরতঃ যঃ সময়াধ্যুষিতে জুহোতি। ন্যাঃ বাৎস্যাঃ ভাঃ ২।১।৫

আচার্য্য জয়ন্ত ভট্ট ন্যায়মঞ্জরীতে শ্যাবশবলের পরিবর্ত্তে শ্যামশবলৌ এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।

পাওয়া যায়। ঐ সকল ঋক্ মন্ত্রের সাহায্যে অগ্নি সমিদ্ধ বা প্রদীপ্ত হয় বলিয়া অগ্নি প্রজ্বালন মন্ত্রকে সামধেনী ঋক্ বলা হইয়া থাকে (২)। শতপথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ঐ এগারটী সামধেনী ঋক্ মন্ত্রের প্রথম ও শেষ মন্ত্রটীর তিন তিনবার পাঠ করিবার বিধান আছে। এখানে আপত্তি এই যে, একটী মন্ত্র একবার পাঠ করিলেই তো মন্ত্র পাঠের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, একই মন্ত্রকে তিন তিনবার পাঠ করিবার বিধান করার কি সার্থকতা আছে? ইহাতে পুনরুক্তি দোষ হয় নাই কি?

নাস্তিকগণের (১) বেদ মিথ্যা, (২) বেদের উক্তি পরস্পর-বিরোধী এবং (৩) বেদ পুনরুক্তি দোষদুষ্ট—এই ত্রিবিধ আপত্তির উত্তরে মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন যে, ঐ সকল আপত্তির একটীও বিচারসহ নহে। প্রথম হইতেই ধরা যাউক—পুত্রেষ্টি যাগ করা গেল, পুত্র হইল না সুতরাং বেদের উক্তি মিথ্যা এইরূপ সিদ্ধান্তের কোনই মূল্য নাই; কারণ পুত্রেষ্টি যাগ ও পুত্রজন্ম ইহার মধ্যে অনেক বিষয় বিচার করিবার আছে। প্রথমতঃ, যাগটী পূর্ণাঙ্গ এবং সুবিশুদ্ধ হইয়াছে কি-না দেখা দরকার। যজমান ও যজ্ঞকর্ত্তা পুরোহিত সচ্চরিত্র, বিদ্বান্, বেদবিশ্বাসী ও যজ্ঞ-কুশল কি-না ইহাও বিচার করা আবশ্যক। যজ্ঞকুশল আচার্য্য কর্ত্তৃক পূর্ণাবয়ব যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে তাহা নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ হইবে। এই তো গেল যজ্ঞের দিকের কথা, তারপর যজ্ঞই তো পুত্রজন্মের একমাত্র কারণ নহে, যজ্ঞানুষ্ঠানের পরই যেমন আকাশ হইতে বৃষ্টি পতিত হয় সেইরূপ পুত্র পতিত হইতে পারে না। পুত্রের জন্ম পিতা-মাতার সহবাস সাপেক্ষ। যথাকালে স্ত্রীসহবাস পুত্রজন্মের প্রত্যক্ষ কারণ। যজ্ঞ আমাদিগকে পুত্রলাভের শুভাদৃষ্টের অধিকারী করিয়া থাকে মাত্র। পিতা বা মাতার পুত্রজন্মের প্রতিবন্ধক কোন ব্যাধি থাকিলে কেবলমাত্র যজ্ঞই পুত্র দিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে পুত্রেষ্টি যজ্ঞানুষ্ঠানের পর পুত্রলাভ না হইলেই বেদ মিথ্যা এইরূপ সাব্যস্ত করা চলে না। কারণ যজ্ঞানুষ্ঠানের কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির দরুণ কিংবা পিতামাতার পুত্রজন্মের প্রতিবন্ধক ব্যাধিবশতও পুত্র না হইতে পারে। বেদ বস্তুতঃ মিথ্যা নহে। অনেক ক্ষেত্রেই পরিপূর্ণাঙ্গ কারীরী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞ সমাপ্তির পরই সুবৃষ্টি লাভ হইয়াছে। বেদ যদি মিথ্যা হইত তবে কোন স্থলেই বৈদিক যজ্ঞ করিয়া ফল পাওয়া যাইত না। যজ্ঞই যেখানে ফল দান করে, অন্য কোন কারণান্তরকে অপেক্ষা করে না, সেইরূপ স্থলে বিশুদ্ধ পূর্ণাঙ্গ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যে ফল পাওয়া যায় তাহা জয়ন্ত ভট্ট তদীয় ন্যায়মঞ্জরীতে নিজ প্রপিতামহের নাম করিয়াই দেখাইয়া দিয়াছেন যে, "আমার প্রপিতামহই গ্রাম কামনায় "সাংগ্রহণী" নামক যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞ সমাপ্তির পরই "গৌরমূলক" নামে গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। (৩) বেদ পরমেশ্বরের উক্তি, তাহা কি কখনও মিথ্যা হইতে পারে; মহর্ষি গৌতমের উক্তির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া ন্যায়বার্ত্তিক রচয়িতা উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে পুত্রেষ্টি যাগ অনুষ্ঠান করিয়াও পুত্র হয় না, ইহা সত্য কথা। এখানে বিচার করা আবশ্যক যে পুত্র না হওয়ার কারণটী কি? বেদের উক্তি যদি মিথ্যা হয় তবেও পুত্র না হইতে পারে, বেদ সত্য হইলেও বৈদিক অনুষ্ঠান যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি-পূর্ণ হয় তবে পুত্র নাও হইতে পারে। এরূপ স্থলে আমাদের নাস্তিক প্রতিপক্ষ বলিবেন যে, বেদ মিথ্যা বলিয়াই পুত্রেষ্টি যাগ করিয়াও পুত্রলাভ হয় নাই। আমরা বলিব যে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের ত্রুটি-বিচ্যুতির দরুণই পুত্র হয় নাই। উভয় পক্ষেই যথেষ্ট বলিবার যুক্তি আছে এবং উভয়েই স্বীয় যুক্তি প্রমাণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। এই অবস্থায় যে পর্য্যন্ত এক পক্ষের যুক্তি অসার বলিয়া প্রমাণিত না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন পক্ষের যুক্তিকেই অভ্রান্ত যুক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আর কোন পক্ষেরই যুক্তি খণ্ডিত না হইলে প্রকৃত হেতু কি, সে বিষয়ে সংশয়ও উপস্থিত হয়। হেতুতে সংশয়

(২) সমিদ্ধে সামধেনীভির্হোতা তস্মাৎ সামধেন্যো নাম।

শতপথ ব্রাহ্মণ, ১।৩।৫

বার্ত্তিককার কাত্যায়ন ঐরূপ অর্থ স্বীকার করেন না। কাত্যায়নের মতে যে ঋক্ মন্ত্র দ্বারা সমিধ আধান বা গ্রহণ করা হয় তাহার নাম সামধেনী। সমিধা বাধানেবেণ্যেন্—কাত্যায়নকৃত বার্ত্তিকসূত্র।

(৩) অস্মৎপ্রপিতামহ এব গ্রামকামঃ সাংগ্রহণীং কৃতবান, সইষ্টি সমাপ্তি সমন্তরমেব গৌরমূলকং গ্রাম মবাপ। ন্যায়মঞ্জরী, ২৭৪ পৃষ্ঠা।

উপস্থিত হইলে ঐ সন্দিগ্ধ হেতু দ্বারা কোন সত্যই নির্ণীত হইতে পারে না। পুত্রেষ্টি যাগ করিলাম, পুত্র হইল না, ইহা তো দেখিলাম।—কেন পুত্র হইল না? নাস্তিক বলিলেন, বেদ মিথ্যা সেই জন্যই পুত্র হয় নাই। আস্তিক বলিলেন, বেদ সত্য, তোমার অনুষ্ঠানটী পূর্ণাবয়ব ও বিশুদ্ধ হয় নাই, এই জন্যই পুত্র হয় নাই। এই নাস্তিক ও আস্তিকের সিদ্ধান্ত বিচার করিয়া উদ্দ্যোতকর বলিলেন যে, আমি বেদ সত্য কি মিথ্যা, প্রমাণ কি অপ্রমাণ তাহা সাধন করিতে চাহি না। আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, উপরে প্রদর্শিত নাস্তিক ও আস্তিকের উভয় প্রকার বিরোধী-সিদ্ধান্তের ফল বিচার করিলে ইহাই আসিয়া দাঁড়ায় যে, নাস্তিকগণ 'বেদ প্রমাণ নহে' ইহা প্রমাণ করিবার জন্য যে 'মিথ্যাত্ব' হেতুটীর অবতারণা করিয়াছেন সেই হেতুটী বেদের অপ্রামাণ্য সাধনে নির্দ্দোষ হেতু ইহা বলা যায় না। কেন না, যজ্ঞ বিকলাঙ্গ হইলেও যখন যজ্ঞোক্ত পুত্রফল না পাওয়া যাইতে পারে। অতএব তখন যজ্ঞের অপূর্ণতা বা বিফলতাতেও ফল না হওয়ার হেতু বলিয়া ধরা যায়। এই অবস্থায় বেদের মিথ্যাত্বকেই তো আর একমাত্র হেতু বলা যায় না, ফলে প্রকৃত হেতু কি সে বিষয়ে সন্দেহ অনিবার্য্য এবং নাস্তিকের প্রদর্শিত হেতুই একমাত্র হেতু নহে বলিয়া নাস্তিকসম্মত বেদের অপ্রামাণ্য স্থাপনে ঐরূপ হেতু হেতুই হইতে পারে না—ঐ হেতু অসিদ্ধ হেতু। (৪)

আমরা নাস্তিকগণের বেদ মিথ্যা—এই প্রথম আপত্তির পরিহার দেখিলাম। এখন আমরা নাস্তিকগণ বেদবাক্যে যে বিরোধের আশঙ্কা করিয়াছেন তাহার যৌক্তিকতা আলোচনা করিব। সূর্য্যের উদয়ে, অনুদয়ে এবং সূর্য্যনক্ষত্র-শূন্যকালে অগ্নিহোত্র হোমের বিধান আছে। উক্ত কাল-ত্রয়ের যে-কোন কালেই যজমান অগ্নিহোত্র হোম করিতে পারেন। তবে বিশেষ এই যে, অগ্নি-আধান বা অগ্নি গ্রহণের কালে যিনি যে সময়ে হোম করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিবেন তাহাকে সেই সময়েই হোম করিতে হইবে। সূর্য্যোদয়ে হোম করিবেন বলিয়া অগ্নি-আধান করিলে তাহাকে সূর্য্যোদয়েই হোম করিতে হইবে, সূর্য্যের অনুদয়ে বা সূর্য্যনক্ষত্রশূন্য কালে হোম করা চলিবে না। হোমের সংকল্পিত সময় পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্যকালে কেহ হোম করেন তবেই তাঁহার যজ্ঞীয় আহুতি শ্যাব ও শবল নামক কুকুরে ভক্ষণ করিবে। শ্যাব ও শবল নামক কুকুরদ্বয়ের কথা উল্লেখ করিয়া কালান্তরে কৃত হোমেরই নিন্দা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ বৈদবিধিতে কোন বিরোধ সূচনা করা হয় নাই। তিনই হোমের কাল। যজমান যে সময় ইচ্ছা করিবেন সেই সময়েই হোম করিতে পারিবেন। সূর্য্যের উদয় হইলেও হোম করিতে পারেন, আবার উদয় না হইলেও হোম করিতে পারেন। ইহা তাহার খুশী। সূর্য্যের উদয়ে এবং অনুদয়ে দুই সময়ে হোম করিবার বিধান আছে। ইহার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ইচ্ছামত যে-কোন সময়ই লওয়া যায়। বেদরহস্যজ্ঞ ভগবান মনুও শ্রুতিবাক্যে ঐরূপ বিরোধ দেখিয়া দুই প্রকার বিধানই শ্রুতির অভিপ্রেত বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন এবং সূর্য্যের উদয়ে এবং অনুদয়ের হোমকেই দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপ বিধান বেদে বিধিবিকল্প বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বিধি-বিকল্পস্থলে বিরোধের আশঙ্কা করা বেদে অজ্ঞতারই পরিচায়ক। হোমবিধিতে কোনরূপ বিরোধ নাই।

বেদে যে সামধেনী মন্ত্রের পুনরুক্তি দোষের কথা বলা হইয়াছে সেখানে বক্তব্য এই যে, নিষ্প্রয়োজনে যদি এক কথা বার বার বলা হয় তবেই তাহা দোষাবহ। পুনরুক্তির সঙ্গত কারণ থাকিলে তাহা দোষাবহ নহে। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে এগারটী সামধেনী ঋক্ বা অগ্নি-প্রজ্বালন মন্ত্রের উল্লেখ আছে। ঐ শতপথ ব্রাহ্মণেই দর্শ ও পৌর্ণ-মাস যাগে পনরটী সামধেনী মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থা আছে। এখন কথা এই যে, সামধেনী ঋক্ হইল মোট এগারটী। এই অবস্থায় দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগে পনরটী সামধেনী ঋক্ পাঠের যে বিধান করা হইল ইহার অর্থ কি? ইহার উত্তরে শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে যে, এগারটী সামধেনী ঋকের প্রথম ঋকৃটী তিনবার ও শেষ ঋকৃটী তিনবার পাঠ করিবে, ফলে একাদশ সামধেনীই পঞ্চদশ সামধেনী হইবে। (৫) বেদের বিধানও সার্থক হইবে। বেদে এইরূপ মন্ত্রপাঠের বিধান আছে। ইহা পুনরুক্তি নহে, অনুবাদ। হোতা

(৪) উদ্দ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিক, ২।১।৫৭-৫৯ দ্রষ্টব্য।

(৫) স বৈ ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ। ত্রিরুত্তমাম। শতপথ, ১।৩।৫। তৈত্তিরীয় সংহিতা, ২।৫ দ্রষ্টব্য

যজ্ঞে বিশেষ ফললাভের জন্য এইরূপ অনুবাদ করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রানুবাদ মীমাংসক-শিরোমণি মহর্ষি জৈমিনি ও প্রাচীন মীমাংসা ভাষ্যকার শবরস্বামী সমর্থন করিয়াছেন। এই অনুবাদ বা পুনরুক্তি নিরর্থক পুনরাবৃত্তি নহে বলিয়া দোষাবহ নহে। নিষ্প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তিই দোষাবহ। (৬)

আস্তিক দার্শনিকগণ এইরূপে নাস্তিকগণের সমস্ত আপত্তি পরিহার করিয়া বেদ যে অভ্রান্ত প্রমাণ ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষায় বিভিন্ন দার্শনিক মত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বৈশেষিকগণ পরমেশ্বরের বাণী বলিয়াই বেদকে অভ্রান্ত প্রমাণ মানিয়া লইয়াছেন। নৈয়ায়িকগণের মতে শব্দময় বেদ 'আপ্ত' মহাপুরুষের বাক্য এবং আপ্তবাক্য বলিয়াই বেদ প্রমাণ। আপ্ত কাহাকে বলে? যিনি লৌকিক অলৌকিক সমস্ত বস্তু অভ্রান্ত প্রমাণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিয়া সর্ব্বদর্শী হইয়াছেন, ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং যাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের সুফল সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার ইচ্ছা ও শক্তি আছে, ঈশ্বরাবতার সেই মহাপুরুষই 'আপ্ত'। তিনি ঋষি হউন, আর্য্য হউন বা ম্লেচ্ছ হউন, যাহাই হউন না কেন, তাঁহার জাতিতে কিছু আসে যায় না। তিনি সত্যদ্রষ্টা তত্ত্বজ্ঞানী তিনিই আপ্ত, তাঁহার বাক্যই প্রমাণ।

আপ্তবাক্য দুই প্রকার—দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ। যে বাক্যের অর্থ বা প্রতিপাদ্য বস্তু আমরা এই জগতেই স্থূল চক্ষুতে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা দৃষ্টার্থ আপ্তবাক্য। আর যে প্রতিপাদ্য বস্তু ইহলোকে প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা অদৃষ্টার্থ আপ্তবাক্য। স্বর্গ, নরক, পরলোক, দেবতা প্রভৃতি আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না—যদিও উহা যোগচক্ষু বা প্রজ্ঞাচক্ষুর সাহায্যে আপ্ত মহর্ষিগণ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবু তাহা আমাদের দৃষ্টিতে অদৃষ্টার্থ। যে বস্তু আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে পরীক্ষিতব্য তাহা যেমন সত্য, সেইরূপ মহর্ষিগণের যোগদৃষ্টিতে পরীক্ষিতব্য আমাদের অদৃষ্টবস্তুও সত্য। আমাদের দৃষ্টবস্তু যেমন প্রমাণ, আমাদের অদৃষ্ট বস্তুও সেইরূপই প্রমাণ। এই জন্যই মহর্ষি গৌতম তৎকৃত ন্যায়-দর্শনে বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষায় বলিয়াছেন যে আয়ুর্ব্বেদের ফল সকলেরই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। এইজন্যই আয়ুর্ব্বেদের উক্তি যে প্রমাণ তাহাতে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। বিষনিবৃত্তির জন্য যে সকল মন্ত্রের প্রয়োগ করা হয় তাহারও ফল সর্ব্বজন-প্রত্যক্ষ। এই জন্য ঐ সকল মন্ত্রের প্রামাণ্য সম্বন্ধে কাহারও কোন বিবাদ নাই। আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদেরই উপাঙ্গ। বিষনিবৃত্তির মন্ত্রগুলিও বেদেরই অংশবিশেষ। বেদের ঐ সকল অংশ দৃষ্টফল বলিয়া যদি ঐ অংশে বেদকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের দৃষ্টান্তে এ কথাও অবশ্য বলা যায় যে, বেদের ঐ সকল অংশ যেমন সত্য, সেইরূপ অদৃষ্টার্থ স্বর্গাদিসাধক বেদভাগও সত্য। দৃষ্টার্থ মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ যেমন তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের উক্তি, অদৃষ্টার্থ বেদভাগও সেইরূপ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষেরই উক্তি। সত্যদ্রষ্টা মহর্ষির উক্তি বলিয়াই বেদ প্রমাণ। দৃষ্টফল বেদও যিনি রচনা করিয়াছেন, অদৃষ্টার্থ বেদও তিনিই রচনা করিয়াছেন। সত্যদর্শী মহাপুরুষের রচিত বেদের কোন অংশ সত্য, কোন অংশ মিথ্যা এরূপ কল্পনা করা যুক্তিবহির্ভূত। বরং মহাপুরুষের বাণী বলিয়া সমগ্র বেদকে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত। (৭) মহর্ষি গৌতম এই জন্যই বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষায় আপ্ত মহাপুরুষের উক্তিকেই (আপ্ত প্রামাণ্যাৎ) হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আপ্তবাক্য সত্য। বেদ আপ্তবাক্য সুতরাং বেদও সত্য। বেদরচয়িতা এই 'আপ্ত' পরমেশ্বর ব্যতীত অপর কেহ নহেন। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার বেদ রচনা করিবার শক্তি নাই। মহর্ষি গৌতমের এই মত বাচস্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য্য, গঙ্গেশ উপাধ্যায়, জয়ন্তভট্ট প্রভৃতি সমস্ত ন্যায়াচার্য্যগণই সমর্থন করিয়াছেন। এখানে প্রশ্ন হয় এই যে, নিরাকার পরমেশ্বর কেমন করিয়া বেদ রচনা করিলেন? তারপর মহর্ষি গৌতম যদি 'আপ্ত'শব্দে পরমেশ্বরকেই বুঝিয়া থাকেন তবে পরমেশ্বরের বাণী বলিয়াই তো বেদকে প্রমাণ বলিতে

(৬) অভ্যাসে ন তু সংখ্যাপূরণং সামধেনীধ্যাস প্রকৃতিত্বাৎ। মীঃ সূঃ, ১০।৫।২৭

উক্ত সূত্রের শবর ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(৭) ন্যায় বার্ত্তিক, ২।১।৬৮ দ্রষ্টব্য।

পারেন, তাহা না বলিয়া আপ্তবাক্যের প্রামাণ্যনিবন্ধন বেদের প্রামাণ্য সাধন করিতে গেলেন কেন? একই পরমেশ্বরকে বেদের কর্ত্তা না বলিয়া বহু আপ্তকে বেদের দ্রষ্টা ও বক্তা বলিবার অভিপ্রায় কি? ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন যে সমস্ত আপ্ত মহাপুরুষই পরমেশ্বরের বিভিন্ন অবতার। জগতের কল্যাণের জন্য লোকশিক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য ভগবান্ বিভিন্ন আপ্তশরীর পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীর বুকে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সমস্ত তত্ত্বশাস্ত্রই পরমেশ্বরের উক্তি। সমস্ত শাস্ত্রকারই পরমেশ্বরের মূর্ত্ত বিগ্রহ। এই দৃষ্টিতে বিচার করিতে গেলে বুদ্ধ আর্হৎ প্রভৃতি শাস্ত্রকারও পরমেশ্বরেরই অবতার। তাঁহাদের বাণীও পরমেশ্বরেরই বাণী। মহানৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট তদীয় ন্যায়মঞ্জরীতে এইরূপ পরম উদার আস্তিক মতের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আপ্ত কপিল বুদ্ধ আর্হৎ প্রভৃতির প্রণীত সমস্ত শাস্ত্রই আগমতুল্য। ঐ সকল শাস্ত্রের প্রামাণ্য যুক্তিসিদ্ধ। ঈশ্বরই সমস্ত আগমের রচয়িতা। তিনি প্রাণিগণের বিভিন্ন প্রকার কর্ম্ম ও কর্ম্মফল প্রত্যক্ষ করিয়া প্রাণিগণের প্রতি করুণাবশতঃ উহাদের কর্ম্ম, চিন্তার ও যোগ্যতার অনুরূপ বিবিধ প্রকার মুক্তিপথের সন্ধান দিবার জন্য স্বীয় ঐশী বিভূতিবলে নানা শরীর পরিগ্রহ করিয়া বুদ্ধ আর্হৎ কপিল প্রভৃতি নামে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। (৮) সুধী পাঠক বিচার করিয়া দেখিবেন, জয়ন্তভট্টের উক্তি কি উদার। জয়ন্তভট্টের এই উদার দৃষ্টিতে বিচার করিলে বুদ্ধ ও আর্হৎকে নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নাস্তিক ও আস্তিকের যে বিবাদ চলিয়া আসিতেছে তাহারও সম্পূর্ণ অবসান হয়।

ন্যায় ও বৈশেষিকের মত বিচার করিয়া দেখা গেল যে, তাঁহাদের মতে বেদ ঐশী প্রজ্ঞারই বিকাশ। পরমেশ্বরের বাণী বলিয়াই বেদ প্রমাণ। আচার্য্য শঙ্করের মতেও পরমেশ্বরই বেদের রচয়িতা। সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর ব্যতীত নিখিল জ্ঞানভাণ্ডার বেদ রচনা করা অপরের সাধ্যায়ত্ত নহে। সর্ব্বজ্ঞানাকর বেদ রচনা দ্বারাই ভগবানের সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা পরিস্ফুট হইয়া থাকে। ভগবানই ব্রহ্মযোনি। বেদ উপনিষৎ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহার নিঃশ্বাস। আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস যেমন সহজভাবে অনায়াসে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ সৃষ্টির উষায় পরমেশ্বরের হৃদয়কন্দর হইতে সহজ ও সাবলীল গতিতে বেদপ্রবাহ উদ্ভূত হইয়াছে। এই সুবিশাল সহস্রশাখ বেদ মহীরুহের সৃষ্টি করিতে তাঁহাকে কোন প্রয়াস পাইতে হয় নাই। বেদ রচনায় শ্রীভগবানের যে কোন প্রয়াস নাই তাহা শ্রুতিই "অস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ ঋগ্বেদঃ" ইত্যাদি বলিয়া স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিয়াছেন।(৯) পুরুষোত্তমই বেদের রচয়িতা, ইহাই যদি শ্রুতির সিদ্ধান্ত হয় তবে বেদকে "অপৌরুষেয়" (পুরুষকৃত নহে) বলা হয় কেন? ইহার উত্তরে বেদান্তী বলেন যে সাধারণ পুরুষের রচিত গ্রন্থে যেমন রচয়িতার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে ভাব ও ভাষার যাহা খুশী অদল বদল করিতে পারেন, লেখকের দোষ গুণ ও ব্যক্তিত্বের ছাপ গ্রন্থে তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠে, গ্রন্থ পাঠ করিলেই গ্রন্থকারের সঙ্গেও পাঠকের পরিচয় হয়। এইজন্যই ঐরূপ গ্রন্থকে পৌরুষেয় বা পুরুষকৃত বলা হইয়া থাকে। বেদ কিন্তু সাধারণ গ্রন্থজাতীয় নহে। বেদ রচনায় ভগবান ভগবান্ হইলেও তাঁহার কোন স্বাধীনতা নাই, বেদমন্ত্রের একটী অক্ষরকে এদিক ওদিক করিবার অধিকারও তাঁহার নাই। কল্পকল্পান্তরে ভগবান একই রূপ বেদ রচনা করিয়া হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিকে উপদেশ করিয়া থাকেন। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ভগবানের বেদ রচনায় সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা অস্বীকার করার অর্থ এই যে, বেদ রচনায় ভগবানের স্বাধীনতা স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে, তিনি ইচ্ছা করিলে প্রতি কল্পের নূতন সৃষ্টিতে যখন

(৮) তস্মাৎ সর্ব্বেষামাগমানামাপ্তেঃ কপিলসুগতার্হৎ প্রভৃতিভিঃ প্রণীতানাং প্রামাণ্যমিতি যুক্তম।......সর্ব্বাগমানামীশ্বর এব ভগবান্ প্রণেতেতি সহি স্ববিভূতি মহিম্না নানা শরীর পরিগ্রহাৎ স এব সংজ্ঞাভেদানু গচ্ছতি অর্হন্নিতি, সুগত ইতি কপিল ইতি স এবোচ্যতে ভগবান্। জয়ন্তভট্ট কৃত ন্যায়মঞ্জরী, ২৬৯ পৃষ্ঠা

(৯) শাঙ্করভাষ্য, ১।১।৩ দ্রষ্টব্য।

দেবর্ষয়ো মহাপরিশ্রমেণাপি যন্নাশক্তা তদয়মীষৎপ্রযত্নেন লীলটো করোতীতি নিরতিশয়মস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিমত্ত্বং চোক্তং ভবতি। ভামতী ১।১।৩।

বেদের উপদেশ দেন তখন বেদকে যে ভাবে খুশী অদল-বদল করিয়াও উপদেশ দিতে পারেন। ফলে প্রত্যেক কল্পে বেদের স্বরূপ ও উপদেশ বিভিন্ন হইয়া পড়িতে পারে এবং বৈদিক সম্প্রদায়ের যে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ জগতের নানা সৃষ্টি ও ধ্বংসলীলার মধ্যেও অবাধ গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরেরও বেদ রচনায় স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা যায় না।(১০) বৈদিক সম্প্রদায়ের অনুচ্ছেদই আমাদের কাম্য। সেই সম্প্রদায় রক্ষার জন্যই বেদ রচনায় ভগবানেরও স্বাধীনতা অস্বীকার করা হয় নাই। নতুবা যিনি সর্ব্বজ্ঞানাকর বেদ রচনা করিতে পারেন তিনি বেদের একটী বর্ণও অদল-বদল করিতে পারেন না ইহার অর্থ কি? বেদ চিন্ময় ভগবানের শব্দময় বিগ্রহ। এই শব্দশরীর সর্ব্বদা অপরিবর্ত্তনশীল—সৃষ্টি-প্রলয়ের নানা আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের মধ্যেও বেদের এই শব্দময় অপরিবর্ত্তনীয় রূপের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না। বেদে ভগবানের নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়তা বুঝাইবার জন্যই বেদ রচনায় পরমেশ্বরকে 'অস্বতন্ত্র' বা স্বাধীন নহেন বলা হইয়াছে। পুরুষোত্তম পরমেশ্বর বেদের রচয়িতা হইয়াও স্বীয় রচনার পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধনে স্বেচ্ছাধীন নহেন বলিয়াই পরমপুরুষ রচিত বেদকে "অপৌরুষেয়" বলা হইয়া থাকে। পুরুষের স্বাধীন কর্ত্তৃত্বের অভাবই 'অপৌরুষেয়' শব্দদ্বারা সূচিত হয়। এই অর্থেই মীমাংসকগণও বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া থাকেন।(১১) মীমাংসকদিগের মতে অক্ষর নিত্য সুতরাং অক্ষরময় বেদও নিত্য, বেদের কোন কর্ত্তা নাই। বেদ চির-সত্য সনাতন। বৈদিক ঋষিগণ বেদের দ্রষ্টা, বক্তা ও অধ্যেতা মাত্র। কঠ কলাপ প্রভৃতি ঋষিগণের নাম অনুসারে বেদে যে সকল বিভিন্ন শাখা দেখিতে পাওয়া যায়, কঠ কলাপ প্রভৃতি ঋষিগণ সকল শাখার কর্ত্তা বা রচয়িতা নহেন। উহারা বেদের ঐ সকল অংশ বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়া স্বীয় শিষ্যগণকে অধ্যাপনা করাইয়াছিলেন। ফলে উঁহাদের নাম অনুসারে এক একটী ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয় এবং বেদের ঐ অংশ তাঁহাদের নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। ঐ সকল মন্ত্রদ্রষ্টা ও মন্ত্র ব্যাখ্যাতা ঋষিগণও বেদকে গুরুশিষ্য-পরম্পরায় যেরূপ পাইয়াছেন ও পড়িয়াছেন, সেই রূপেই শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন। একটী মন্ত্রের একটী অক্ষরেরও অদল বদল করার সাধ্য তাঁহাদের নাই, এই স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়াই বেদকে মীমাংসকগণ বলিয়াছেন, 'অপৌরুষেয়।' ন্যায়, বৈশেষিক ও অদ্বৈত বেদান্তীর মতে বেদ অকর্ত্তৃক নহে। পরমেশ্বরই বেদের কর্ত্তা। শব্দ অনিত্য সুতরাং শব্দময় বেদ নিত্য হইতে পারে না, উহা অনিত্য। পরমেশ্বর রচিত বেদ ঐশী প্রজ্ঞার বিকাশ; ঐশী প্রজ্ঞা নিত্য, সেই হিসাবেই বেদকে নিত্য বলা হইয়া থাকে। নতুবা বাগিন্দ্রিয়জ শব্দময় বেদ নিত্য হইবে কিরূপে? মীমাংসকগণ সৃষ্টি ও প্রলয় মানেন না, কাজেই তাঁহাদের মতে বৈদিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ হইবার কোন কথা উঠে না। গুরুশিষ্য পরম্পরায় বেদ অধ্যয়নকে তাঁহারা অনাদি এবং অনবচ্ছিন্ন বলিয়া থাকেন। বেদপ্রবাহ অনাদি ও নিরবচ্ছিন্ন বলিয়াই নিত্য। বেদের এইরূপ প্রবাহ-নিত্যতা ন্যায় বৈশেষিক ও বৈদান্তিক প্রভৃতি দার্শনিকগণ স্বীকার করেন না। কেন না, তাঁহারা সকলেই সৃষ্টি ও প্রলয় স্বীকার করিয়া থাকেন। সৃষ্টি এবং প্রলয় স্বীকার করিলে অবশ্যই বলিতে হয় যে, মহা প্রলয়ে বেদ বিলুপ্ত হইয়া যায়, পরে সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ পুনরায় পূর্ব্বকালোক্ত বেদের উপদেশ দেন। এই অবস্থায় বেদের অনাদিপ্রবাহনিত্যতা ব্যাখ্যা করা যায় না। মীমাংসকগণ বেদের প্রবাহনিত্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন বলিয়াই সৃষ্টি ও মহাপ্রলয় তাঁহারা মানেন না। তাঁহাদের মতে মহাপ্রলয় নাই বলিয়া বেদ-প্রবাহের উচ্ছেদের কোন সম্ভাবনাও নাই। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বেদকে 'অপৌরুষেয়' বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে বাক্যমাত্রই পৌরুষেয় বা পুরুষ-বিরচিত। বেদবাক্যও বাক্য, সুতরাং তাহাও পৌরুষেয় বা পুরুষ রচিতই হইবে, "অপৌরুষেয়" হইবে কিরূপে? এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাক্যমাত্রই কোন না কোন পুরুষ রচিত হইলেও প্রত্যেক কল্পেই যখন একই প্রকার বেদ

"(১০) বৈয়াসিকন্তু মতমনুবর্ত্তমানা শ্রুতিস্মৃতীতিহাসাদিসিদ্ধ সৃষ্টি প্রলয়ানুসারেণানাত্তবিদ্যোপধোনলব্ধ সর্ব্বশক্তি জ্ঞানস্যাপি পরমাত্মনো নিতান্ত বেদানাং যোনেরপি নতেষু স্বাতন্ত্র্যম্ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সর্গানুসারেণ তাদৃশ তাদৃশানুপূর্ব্বী বিরচনাৎ। ভামতী, ১।১।৩ :

(১১) পুরুষাস্বাতন্ত্র্যমাত্রং চাপৌরুষেয়ত্বং রোচয়ন্তে জৈমিনীয়া অপি। ভামতী, ১।১।৩

'আলো ছায়া' শিল্পী—শ্রীকামাখ্যা ভট্টাচার্য্য (গৌহাটী)

'খাঁচার পাখী' শিল্পী—কিরণ নাহার

একটি দৃশ্য

শিল্পী—শ্রীসুশীলকুমার মুখার্জ্জি (মাদ্রাজ)
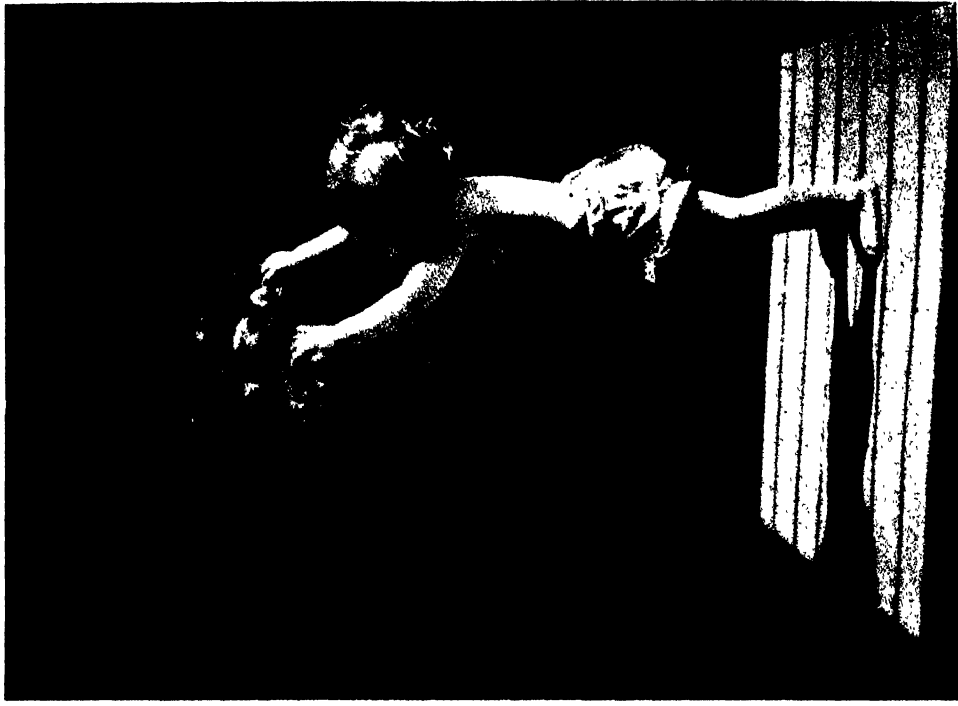
রচিত হইয়া আসিতেছে, একটী বর্ণও অদল-বদল হয় নাই তখন একথা বলিলে অশোভন হয় না যে, কাব্য নাটকাদি রচনায় লেখকের যেমন অবাধ গতি আছে, বেদ রচনায় পরমেশ্বরের সেইরূপ অবাধ গতি নাই। বেদপ্রবাহকে অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য পরমেশ্বরের স্বাধীন রচনাগতিকেও প্রতিহত করিতে হইয়াছে। রচনার গতিবেগ যেখানে প্রতিহত এবং যে রচনায় রচয়িতার কোন স্বাতন্ত্র্য নাই সেইরূপ রচনা পুরুষ কর্ত্তৃক রচিত হইলেও 'অপৌরুষেয়'। এভাবে বেদের অপৌরুষেয়তা বেদান্তী ও মীমাংসকের যেমন স্বীকার্য্য, ন্যায় বৈশেষিকেরও স্বীকার্য্য। সুতরাং বাক্য-মাত্রই 'পৌরুষেয়' বা পুরুষকৃত এই ন্যায় বৈশেষিক সিদ্ধান্তের সঙ্গেও বেদান্ত মীমাংসার 'অপৌরুষেয়তা' সিদ্ধান্তের কোন বাস্তবিক বিরোধ নাই। সাংখ্যদর্শনেও বেদকে ঐরূপ অর্থেই 'অপৌরুষেয়' বলা হইয়াছে। যেখানে লেখকের মনীষাবলে স্বাধীন রচনার অবাধ গতি আছে তাহাই 'পৌরুষেয়'; পুরুষ কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইলেই তাহা পৌরুষেয় হয় না, স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে রচিত হইলেই তাহা পৌরুষেয় বা পুরুষকৃত বলা যাইতে পারে। স্বয়ম্ভু হিরণ্যগর্ভ বেদের কর্ত্তা নহেন, বক্তা বা দ্রষ্টা মাত্র। কল্পের প্রারম্ভে আদি পুরুষ স্বয়ম্ভু বেদ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পেও যেই বেদ যে ভাবে উচ্চারিত হইয়াছিল পরকল্পেও সেই বেদবাণীই উচ্চারিত হইয়া থাকে। ইহাতে আদি পুরুষ স্বয়ম্ভু বা হিরণ্যগর্ভের কোন বুদ্ধির খেলা নাই; শ্বাস প্রশ্বাস যেমন আমাদের কোন প্রয়াস ব্যতীতই স্বচ্ছন্দে বাহির হইয়া যায় সেইরূপ স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল গতিতে বেদপ্রবাহ বিনায়াসে স্বয়ম্ভুর মুখবিবর হইতে উচ্চারিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে। স্বয়ম্ভু উচ্চারক মাত্র, রচয়িতা নহেন; সুতরাং স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক উচ্চারিত বেদকে অপৌরুষেয় বলিতে কোন বাধা নাই (১২)। বেদ সাংখ্যদর্শনের মতেও অনিত্য, নিত্য নহে। সাংখ্যেরা বলেন যে, বেদের মধ্যেই বেদের উৎপত্তি বর্ণিত আছে সুতরাং বেদ নিত্য হইবে কিরূপে? এই অনিত্য বেদের কর্ত্তা কে? কপিল-কৃত সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নাই সুতরাং ঈশ্বর বেদের কর্ত্তা হইতে পারেন না। মুক্ত পুরুষ ও বদ্ধ জীবের মধ্যে বদ্ধ জীব অল্প জ্ঞান ও অল্প শক্তি, তাঁহার অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার বেদ রচনা করিবার শক্তি কোথায়? জীবন্মুক্ত পুরুষের জ্ঞান ও শক্তি যদি অসীম ও অপ্রতিহত, তথাপি সে বীতরাগী, কোনরূপ প্রবৃত্তিই তাঁহার নাই, সে সহস্রশাখ, বেদ নির্ম্মাণ করিতে অগ্রসর হইবে কেন? সাংখ্যোক্ত পুরুষ তো অসঙ্গ নির্লেপ নির্ব্বিকার, তাঁহার তো বেদ রচনা করিবার কথা উঠিতেই পারে না। এই অবস্থায় বেদ কে রচনা করিবে? বেদের যখন কর্ত্তা নাই তখন বেদ অপৌরুষেয় এইরূপ সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত। (১৩) এখন প্রশ্ন এই যে, যাহার কর্ত্তা পাওয়া গেল না, সেই অপৌরুষেয় বেদ কি নিত্য হইল না? সাংখ্যকার বেদকে অনিত্য বলেন কি হিসাবে? ইহার উত্তরে সাংখ্যকার বলেন যে, আদি পুরুষ স্বয়ম্ভু হিরণ্যগর্ভই বেদের কর্ত্তা বা প্রকাশয়িতা। তাঁহার এই কর্ত্তৃত্ব কাব্য নাটকাদি কর্ত্তৃত্বের ন্যায় স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব নহে, তিনি উচ্চারয়িতা মাত্র, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি; সুতরাং বেদ পৌরুষেয় হইয়াও অপৌরুষেয়। বেদপ্রবাহ অবাধ ও অবিচ্ছিন্ন। কল্পে কল্পান্তরে বেদের প্রবাহের উচ্ছেদ হয় না বলিয়াই বেদকে এইমতে নিত্য বলা হইয়া থাকে। (১৪) বেদ হইতে জ্ঞানময় পুরুষের স্বরূপ জানা যায়, ঐ চিন্ময় পুরুষ নিত্য, এই জন্যই শব্দময় বেদ অনিত্য হইলেও বেদপ্রতিপাদ্য জ্ঞান নিত্য, এই হিসাবে বেদকেও নিত্য বলিতে কোন বাধা নাই। বেদ সাংখ্যমতে স্বতঃপ্রমাণ। সাংখ্যকার বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য সাধন করিবার জন্য প্রত্যক্ষফল মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদকেই দৃষ্টান্ত-রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ দৃষ্টফল এবং স্বতঃপ্রমাণ। উহা বেদের অংশ। ঐ অংশ স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া সমগ্র বেদ ঐ ঐ রূপ স্বতঃপ্রমাণ। সাংখ্যদর্শন এখানে নৈয়ায়িকদিগের যুক্তি ও দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পার্থক্য এবং যে ন্যায়মতে জ্ঞান পরতঃপ্রমাণ সাংখ্য-

---

(১২) ন পুরুষোচ্চারিতা মাত্রেণ পৌরুষেয়ত্বং কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বকত্বেন।
বেদাস্তুনিঃশ্বাসবদেবাদৃষ্টবশাদবুদ্ধিপূর্ব্বকা স্বয়ম্ভুবঃ সকাশাৎ স্বয়ং ভবন্তি। অতো ন পৌরুষেয়াঃ।
সাংখ্য প্রবচন ভাষ্য, ৫।৫০।

(১৩) ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ। সাংখ্যসূত্র, ৫।৪৬

(১৪) বেদ নিত্যতা বাক্যানি চ সজাতীয়ানুপূর্ব্বী প্রবাহানুচ্ছেদ রূপানি। সাংখ্য প্রবচন ভাষ্য, ৫।৪৫ সূত্রে।

মতে উহা পরতঃপ্রমাণ নহে, স্বতঃপ্রমাণ। পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে। ঈশ্বরই বেদযোনি। ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে হইলেও বেদেরই শরণাপন্ন হইতে হয়, সুতরাং বেদ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ অনাদি। ঈশ্বর কালপরিচ্ছিন্ন নহেন, তিনি কালাতীত এবং ব্রহ্মাদি দেবগণেরও গুরু তিনিই ব্রহ্মাদি দেবগণের হৃদয়মন্দিরে বেদ-জ্ঞানদীপ প্রজ্বালিত করিয়াছেন। পাতঞ্জলের মতে অন্তর্যামী ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য এবং বেদ সেই নিত্যজ্ঞানেরই বিকাশ, সুতরাং বেদও নিত্য এবং অপৌরুষেয়। বেদপ্রতিপাদ্য জ্ঞান নিত্য ইহাতে কোন বিবাদ নাই। এই বর্ণময় বেদ অনিত্য, এই সিদ্ধান্ত পাতঞ্জলও স্বীকার করেন। পাতঞ্জলের এই সকল সিদ্ধান্ত অনেক অংশে ন্যায় সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ। (১৫)

বেদ প্রমাণ কি না, এই প্রশ্নের বিচার করিতে গিয়া আমরা প্রসিদ্ধ ষড়্‌দর্শনের মতেরই আলোচনা করিলাম বৈদিক জ্ঞান যে নিত্যসত্য, এ বিষয়ে কোন আস্তিক দর্শনেরই বিবাদ নাই। দর্শনের আলোকসম্পাতে বৈদিক জ্ঞানের বন্ধুর পথ সুগম হইয়া থাকে। বেদ ও দর্শন শাস্ত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বদ্ধ। বেদ প্রাণ, দর্শন শরীর। প্রাণ ব্যতীত শরীর যেমন অসার, সেইরূপ বৈদিক ভিত্তি ব্যতীত দর্শনশাস্ত্র নিরর্থক কোলাহল মাত্র। পক্ষান্তরে শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি ব্যতীত প্রাণ যেমন নিষ্ক্রিয়, সেইরূপ দার্শনিক তর্কের স্নেহধারা ব্যতীত বেদজ্ঞান-প্রদীপও নিষ্প্রভ। দর্শনের চক্ষুতে নিত্য, চিন্ময় বেদপুরুষকে দেখিতে পারিলেই মানব-জীবন মধুময় হয়—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

(১৫) মহর্ষি পাতঞ্জল তদীয় দর্শনে স্ফোটবাদ স্বীকার করিয়াছেন। উচ্চার্য্যমান আধত্য বর্ণাত্মক শব্দের অন্তরালে স্ফোট নামে অর্থের প্রকাশক এক প্রকার নিত্য শব্দ আছে। ঐ আত্মক শব্দ নিত্য এবং বেদও নিত্য সিদ্ধান্ত পাতঞ্জল স্বীকার করেন। ষড়্‌দর্শনের অন্য কোন দর্শনেই স্ফোটবাদ অঙ্গীকৃত হয় নাই, প্রত্যাখ্যাতই হইয়াছে। স্ফোটবাদ স্বীকার করায় বেদ নিত্য কি না এই প্রশ্নে পাতঞ্জল যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন সেই সিদ্ধান্তের স্বরূপ ও তাহার খণ্ডন শৌলা আমরা স্থানান্তরে আলোচনা করিব।

নক্ষত্র ও পৃথিবী

শ্রীযতীন্দ্র সেন

আমি হ'ব সখি, দূর গগনের তারা,
তুমি হ'য়ো এই শ্যামলা মাটীর মেয়ে;
যুগ-যুগান্ত পুলকে আপনা-হারা—
তোমা' পানে আমি নীরবে রহিব চেয়ে।
চূর্ণ চিকুরে, আয়ত আঁখির'পরে,—
পাংশু কপোল-যুগে তব অনুপম,—
আমার নয়ন-আলোক পড়িবে ঝরে'—
বিকশিত বুকে কমল-কলিকা-সম।

রক্ত অধরে সোহাগ-চুমন-ছলে,
নীবির সীমায়, ক্ষীণ কটি-বেলাভূমে—
রচিব স্বপন আমার নয়ন-জলে;
নভোপানে সখি, চেয়ো জাগি' আধঘুমে।

অনাদিকালের বুকেতে রহিবে চেয়ে—
আকাশের তারা, শ্যামলা মাটীর মেয়ে॥

তমসো মা জ্যোতির্গময়

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্‌-এ

সৃষ্টির আদিম প্রাতে বিশ্ববিধাতারে
কে কহিল ডাকি—ওগো এই অন্ধকারে
দেখাও আমায় দেব, তব জ্যোতিষ্মান
দীপশিখা? আজো সেই কাতর আহ্বান,—
সে আকুতি জানাইছে মানব-হৃদয়
অসহায় শিশুসম; অনন্ত সংশয়
জাগিতেছে সদা! ওরে মূঢ় মানবক,
অহর্নিশ তোরে কোন্ অদৃশ্য চালক
অন্ধকার হ'তে নিয়ে যায় অন্ধকারে?
চ'লেছিস্ আমরণ কার অভিসারে

দুরত্যয় পথ বহি'? কে কহিবে ওরে
অমৃতের কি আশ্বাস প্রলোভিছে তোরে?
ভেদ করি' যবনিকা সান্দ্র তমসার
জাগিবে কি আলোকের বীণার ঝঙ্কার?

রঞ্জি ক্রিকেট ঃ

বাঙ্গলা—২৬০ ও ১৬৩

ইউ পি—২৯৫ ও ১২৪ (৮ উইঃ)

ইউ পি প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী থাকায় বিজয়ী হ'য়েচে। দারুণ উত্তেজনার মধ্যে খেলা শেষ হ'য়েছে। রঞ্জি ট্রফির খেলায় বাঙ্গলা এই প্রথম ইডেন গার্ডেনে পরাজিত হ'ল। বাঙ্গলার পক্ষে খেলার ফলাফল যে ভাল হবে না তা টীম মনোনয়ন দেখেই বোঝা গিয়েছিলো। এস গাঙ্গুলী, কে রায়, জব্বর এবং সর্ব্বোপরি এক্লেসটন যে কি ক'রে প্রতিনিধি মূলক খেলায় স্থান পেতে পারে তা হয়ত কর্ত্তৃপক্ষরাই ভাল বোঝেন তবে তাঁরা যে-খেলা দেখিয়েচেন তাতে কর্ত্তৃপক্ষ পুনরায় এ ভুল ক'রবেন না ব'লেই আশা করি। ভবিষ্যতে কোন জাতি বা কোন বিশেষ ক্লাবকে প্রাধান্য দিতে না গিয়ে তাঁরা প্রকৃত ভাল খেলোয়াড়দের যেন মনোনয়ন করেন কেননা এতে একটা সমস্ত প্রদেশের সম্মান নির্ভর করে। এস দত্ত বিহারের বিরুদ্ধে খুব ভাল বল ক'রেছিলো। প্রথম ইনিংসে সে ছটা উইকেট পায় ৩২ রানে। তাকে টীমে স্থান না দিয়ে কর্ত্তৃপক্ষ একই ক্লাবের অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর খেলোয়াড় এক্লেসটনকে যে কেন স্থান দিলেন তা বোধগম্য নয়। একজন একটা ম্যাচে খুব ভাল খেললেও পরের ম্যাচ খেলতে পেল না। এস গাঙ্গুলী একাধিক বার প্রতিনিধি মূলক খেলায় স্থান পেয়েচে এবং প্রতিবারের মতই এবারও দর্শকদের বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই পায় নি। জব্বরের ব্যাটিং সমালোচনারও অযোগ্য তবে তার ফিল্ডিং প্রশংসনীয়। কে রায়ের উইকেট কিপিং নিম্নস্তরের, ব্যাটিং ততোধিক। কে বসুর অধিনায়কত্বে কোনরূপ ত্রুটি হয় নি; এক প্রথম ইনিংসের 'ব্যাটিং অডার' ছাড়া। বোলার চেঞ্জ প্রশংসনীয়।।

ইউ পি ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ বাঙ্গলা প্রদেশকে পরাজিত করেছে

কার্ত্তিক বসু ক্যাপটেন—বাঙ্গলা
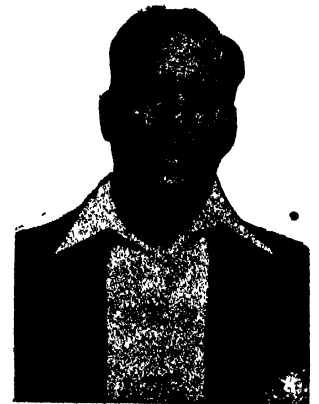
পালিয়া ক্যাপটেন—ইউ পি

বাঙ্গলা টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে। ব্যাট ক'রতে নামে বেরেণ্ড ও মিলার। আরম্ভ খুব ভাল হ'য়েচে। প্রথম উইকেট পড়লো ১০০ রানে; মিলার ৪০ ক'রে আউট

নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জী বেরেণ্ড

হ'ল। এস গাঙ্গুলি এসে শূন্য ক'রে গেল। কার্ত্তিকও তাই। চার রানের মধ্যে তিনটে উইকেট প'ড়ে গেল। সব কটাই পেলো পালিয়া। নির্ম্মল এসে খেলায় যোগদান ক'রে খেলার গতি ঘুরিয়ে দিলে। বেরেণ্ড উপযুক্ত সহযোগী পেয়ে দ্রুত রান তুলতে লাগলো। ৬৯ রানে বেরেণ্ড একটা 'চ্যান্স' দিলে। চায়ের সময় ৩ উইকেটে ২১০ হ'য়েছে। বেরেণ্ড আর নির্ম্মল যথাক্রমে নট আউট ৯১ ও ৫৩। চায়ের পর বেরেণ্ড ২৪৫ মিনিট খেলে শতরান পূর্ণ ক'রলে। ১০৭ ক'রে বেরেণ্ড সালাউদ্দিনের বলে পালিয়ার কাছে ধরা দিলে। বেরেণ্ডের টীমে স্থান পাবার সময় অনেকেরই সন্দেহ হ'য়েছিলো এবার তার খেলা ভাল হবে কিনা। কিন্তু অতিশয় ধীরভাবে ২৭৮ মিনিট খেলে বেরেণ্ড প্রমাণ ক'রলে যে 'বড় খেলায়' তার স্থান কেন উচ্চে। তার চার ছিলো ১২টা। এর পরই ভাঙ্গন সুরু হ'ল; জব্বরও কে ভট্টাচার্য্য শূন্য ক'রলে। হ্যামণ্ডও গেলো অল্প রানে। ওদিকে নির্ম্মল সালাউদ্দিনের বলে আউট হ'ল। নির্ম্মলের খেলা সবচেয়ে দর্শনীয় হ'য়েচে। উইকেটের চারিদিকে সমানভাবে পিটিয়ে ৬৪ রানে আউট হ'ল; চার ছিলো ৮টা। নির্ম্মলের সহযোগিতা না পেলে বেরেণ্ডের সেঞ্চুরী করা সম্ভব হ'ত না। বাঙ্গলার প্রথম ইনিংস ২৬০ রানে শেষ হয়। সালাউদ্দিন ৬টা উইকেট পায় ৬২ রানে। ইউ পি প্রথম ইনিংসে ২৯৫ রান তোলে। তৃতীয় উইকেটে পালিয়া ও আকতাবের সহযোগিতায় রান খুব বেশী উঠে। উভয়ে রান তুলবার সহজ গতি দর্শকদের মুগ্ধ ক'রেচে। পালি ৭১ আর আকতাব ৭২ রান ক'রে আউট হয়। আকত একবার একটা অতি সহজ রান আউট থেকে বেঁচে যায় তবে সে বা পালিয়া মারের ভুল ক'রে 'চান্স' দেয়নি। ক ৫৬ রানে পাঁচটা উইকেট পায়।

দ্বিতীয় ইনিংসে বাঙ্গলা গোড়া থেকেই পিটিয়ে খেল থাকে এবং ১৬৩ রানে ইনিংস শেষ হয়। মিলার সর্ব্বো রান ক'রে ৫৫। তারপর নির্ম্মল ২৬। আকত ৫৫ রানে ৫টা আর পালিয়া ১৬ রানে ৪টে উইকে পেয়েচে।

ইউ পির দ্বিতীয় ইনিংসে প্রথম উইকেট চারে, দ্বিতী সতেরতে, তৃতীয় ও চতুর্থ উনচল্লিসে, পঞ্চম আটচল্লিশে এব ষষ্ঠ উইকেট আশীতে প'ড়ে যায়। ৮৭ রানের মাথায় কমল বেরেণ্ডের বলে সালাউদ্দিনের ক্যাচ ফেলে দিলে। এই ক্যাচটা না ফস্‌কালে খেলার গতি একেবারে ঘুরে যেত।

ইণ্ডিয়ান স্কুল স্পোর্টসে ইয়াকুব ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসিপ পেয়েছে ফটো—সি ব্রাদার্স এণ্ড কোং

সালাউদ্দিন শেষ পর্য্যন্ত ৬৮ রান ক'রে নির্ম্মলের বলে বোল্ড হ'ল। ইউ পি'র ৮ উইকেটে ১২৪ রান হবার পর সময়াভাবে খেলা শেষ হ'ল।

মহারাষ্ট্র—৬৫০ (৯ উইকেট)

বরোদা—৩০৩ ও ২৮৩

(৫ উইঃ)

প্রফেসর দেওধর

এম এম নাইডু

প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী থাকায় মহারাষ্ট্র বিজয়ী হ'য়েচে।

তিন দিনের খেলায় সর্ব্বসমেত ১২৩৬ রান ওঠা বোলারদের পক্ষে যথেষ্ট সম্মান হানিকর; উইকেট প'ড়েচে মাত্র ২৪টা।

বরোদা প্রথমে ব্যাট ক'রে ৩০৩ রান তোলে। অধিকারীর ৬৮ ও আর বি নিম্বলকারের ৬৩ রান উল্লেখ-যোগ্য। বরোদার রান সংখ্যা নিতান্ত কম নয় তারপর সি এস নাইডুর মত বোলার তাদের দলে। প্রবীণতম হিন্দু অধিনায়কের পরিচালিত মহারাষ্ট্র কিন্তু অদ্ভুত খেলা দেখিয়ে ৯ উইকেটে ৬৫০ রান তুললে। সি এস ২৬১ রানে মাত্র চারটে উইকেট পেয়েচে; এত খারাপ 'এভারেজ' তার বোধ হয় কখনো হয়নি। ৩৮৭ মিনিট খেলে হাজারি ৩১৬ রান ক'রে নট আউট রইলো। এবং রঞ্জি প্রতি-যোগিতায় ব্যক্তিগত রেকর্ড স্থাপন ক'রলে। তার খেলায় চার ছিলো ৩৭টা। গত বছর ফাইনালে ইডেন গার্ডেনে ওয়াজির ২২২ নট আউট ক'রে রেকর্ড স্থাপন ক'রেছিলো। নাগর-ওয়ালা ২ রানের জন্য সেঞ্চুরী ক'রতে পারলে না। ভাণ্ডারকার রান আউট হ'ল ৭৭ রান ক'রে। বরোদার দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ২৮৩ উঠার পর সময়াভাবে খেলা শেষ হ'ল। ১৬৪ মিনিট খেলে এম এম নাইডু ১২০ রান ক'রলে এবং আর বি নিম্বলকরর আউট হ'ল ৭৮ রান ক'রে। এর আগের *খেলায় মহারাষ্ট্র* ৫৪০ রান তুলে রঞ্জি প্রতিযোগিতায় যে ইনিংস রেকর্ড ক'রেছিলো তা ভঙ্গ ক'রে আবার নূতন রেকর্ড স্থাপন ক'রলে। হাজারি ও নাগরওয়ালার সহযোগিতায় নবম উইকেটে ২৪৫ রানও রঞ্জি প্রতিযোগিতায় আর এক নূতন রেকর্ড।

ব—২০৫ ও ১১৬ (৫ উইঃ)

সীমান্ত প্রদেশ—২২৮ ও ৯২

দক্ষিণ পাঞ্জাব ৫ উইকেটে বিজয়ী হ'য়েচে।

সীমান্ত প্রদেশ প্রথমে ব্যাট ক'রে ২২৮ রান তোলে আব্দুল লতিফের ৭০ ও করিমবক্সের ৫৮ রান উল্লেখযোগ্য। অমরনাথ ৫০ রানে ৩ আর মহারাজা ৭৭ রানে ৪ উইকেট পান।

দক্ষিণ পাঞ্জাবের প্রথম ইনিংস মাত্র ২০৫ রানে শেষ হয়। সর্ব্বোচ্চ রান করে মহম্মদ সৈয়দ ৫১। লতিফ ৭৬ রানে ৬টা উইকেট পায়, প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী থাকার সুযোগ পেয়েও সীমান্ত প্রদেশ পরাজিত হ'তে বাধ্য হ'ল। দ্বিতীয় ইনিংসে অমরনাথ ও মুরায়াতের অদ্ভুত বোলিংয়ের বিরুদ্ধে তারা রান তুললো মাত্র ৯২। অমরনাথ ১৯ ওভার বলে ৭টা মেডেন এবং ২২ রানে পাঁচ উইকেট পেয়েচে। মুরায়াত ২৭ রানে ৪। দক্ষিণ পাঞ্জাব ৫ উইকেটে তাদের প্রয়োজনীয় রান তুলে দেয়।

পরবর্ত্তী ম্যাচে তারা মহারাষ্ট্রের সঙ্গে খেলবে।

হাজারী অমরনাথ

সেফিল্ড শীল্ড ফাইনাল ঃ

নিউ সাউথ ওয়েলস ঃ—৩০৯ ও ৪৯২ (৫ উইকেট ডিক্লিয়ার্ড) বার্ণেস ১৩৫ নট আউট, ম্যাক্‌কেব ১১৪

ভিক্টোরিয়া ঃ—২৯৮ (হ্যাসেট ১২২, ওরেলী ৭৮ রানে ৫ উইকেট) ও ৩২৬ (হ্যাসেট ১২২)

নিউ সাউথ ওয়েলস ১৭৭ রানে ভিক্টোরিয়াকে পরাজিত করে সেফিল্ড শীল্ড বিজয়ী হ'য়েছে। এবার নিয়ে নিউ সাউথ ওয়েলস ২২ বার সেফিল্ড শীল্ড বিজয়ী হ'ল। নিউ সাউথ ওয়েলস প্রথম ইনিংসে ৩০৯ রানে করে এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ৪৯২ রান তুলে। ভিক্টোরিয়া প্রথম ইনিংসে ২৯৮ রান করে। ওরিলি ৭৮ রানে ৫ উইকেট বিজিত দলের হ্যাসেট উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। বিজয়ী দলের বার্ণেসের নট আউট ১৩৫ রান এবং ম্যাক্‌কেবের ১১৪ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে রান উঠে ৩২৬।

হ্যাসেট

সি পি কোয়াড্রাঙ্গুলার ঃ

ম্যাক্‌কেব

হিন্দু—১৪৩ ও ৩৭৩

মুসলীম—১১৮ ও ২৮৮

হিন্দু ১১০ রানে বিজয়ী হ'য়েচে।

হিন্দুদের অধিনায়কত্ব করেন মেজর সি কে নাইডু। হিন্দুরা প্রথমে ব্যাট ক'রে মাত্র ১৪৩ রান তোলে; লতিফ ৪২ রানে পাঁচ উইকেট পায় আর মাস্তক ৩৪ রানে তিন। মুসলীমদের প্রথম ইনিংস শেষ হয় আরও কম রানে ১১৮তে। সি এস ৫৫ রানে ৬ উইকেট পেয়েছে; দ্বিতীয় ইনিংসে হিন্দুরা ৩৭৩ রান তুলেচে। সি এস তিন রানের জন্য সেঞ্চুরী নষ্ট ক'রলে আর সারবাটে ৮১ রান ক'রে নট আউট রইল। মুসলীমদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হ'ল ২৮৮ রানে। ইউসুফ ১০২ রান ক'রে আউট হ'ল, এই কোয়াড্রাঙ্গুলারে একমাত্র সেই সেঞ্চুরী ক'রেচে। মেজর নাইডু ৮১ রানে ৬টা উইকেট পেয়েচেন।

টেনিস ঃ

সিডনীর ওয়েষ্টার্ণ সাবার্ব হার্ড কোর্ট টেনিস টুর্ণামেণ্টে সিনক্লেয়ার ও রের শেষ সেটের খেলা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ব্যাপী টেনিস খেলা হিসেবে রেকর্ড করেচে। সিনক্লেয়ার ৩৪-৩২ গেমে রে'কে পরাজিত ক'রে বিজয়ী হয়। উভয় খেলোয়াড়ই অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। খেলা আরম্ভ হ'য়েছিলো সকাল সাড়ে নটায় আর শেষ হ'তে রাত্রি হ'য়ে গিছলো।

১৯৩৮ সালে উইম্বলডনে হাভেল ও সেরউড ২১-১৯ গেমে গাওার ও ডাওয়ারকে একটি সেটে পরাজিত করেন।

মোহনবাগান এথেলেটিক স্পোর্টসে দূরে বল নিক্ষেপে প্রথম বলাই চ্যাটার্জি (মধ্যস্থলে), দ্বিতীয় কে ব্যানার্জি (বাম দিকে), তৃতীয় সন্মথ দত্ত (ডানদিকে)

পূর্ব্বে একবার উইম্বলডন সেমি ফাইনালে প্রথম দু'সেটে সমান সমান হবার পর তৃতীয় সেটে যখন উভয় খেলোয়াড়েরই ২৪টি ক'রে গেম হ'ল তখন তারা টস ক'রে কে ফাইনালে উঠবে তার মীমাংসা ক'রেছিলো।

পুনসেক ও গাউস ঃ

যুগোশ্লোভিয়ার এক নম্বর খেলোয়াড় পুনসেক এবং ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় গাউস মহম্মদের মধ্যে চারবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হ'য়ে গেছে, গাউস জিতেছেন মাত্র একবার, বাকী তিনবার জয়ী হ'য়েছেন পুনসেক। হায়দ্রাবাদে যখন তাঁদের সাক্ষাৎ হ'ল, গাউস প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ৬-৪, ৩-৬, ৩-৬, ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে পুনসেকের কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রলেন। উভয়ের খেলাই দর্শনীয় হ'য়েছিলো। পুনসেক খেলেছেন নির্ভুল। পরের আর এক প্রদর্শনী খেলায় গাউস ৬-২, ৬-১, ৩-৬ ও ৬ ৩ গেমে পুনসেককে পরাজিত ক'রেন। গাউস সবদিক থেকেই পুনসেকের চেয়ে উন্নততর খেলা দেখিয়েছেন। গাউস কিন্তু এ গৌরব বেশী দিন রাখতে পারলেন না। পুনসেক

পুনসেক

পর পর দুটো ম্যাচে গাউসকে হারিয়ে প্রতিশোধ নিলেন। গান্টুরের প্রদর্শনী খেলায় গাউস পুনসেকের কাছে মোটে দাঁড়াতেই পারেন নি। পুনসেকের খেলা যেমন নির্ভুল তেমনি দর্শনীয়। গাউস দুটিই লাভসেট খেয়েছেন। বোধহয় পূর্ব্বে তিনি কখনও এমন ভাবে পরাজিত হন নি। উইম্বলডন বিজয়ী রীগস্ তাঁকে পরাজিত ক'রেছিলেন ৬-২, ৬-২ ও ৬-২ গেমে। যুগোশ্লোভিয়া বীরের এই প্রতিশোধ গাউসের বহুদিন মনে থাকবে। গাউসের এই পরাজয় দেখে অনেক দিন আগের একটি ঘটনা মনে পড়ে। ক'লকাতায় খেলা হ'চ্ছে পাশাপাশি দু কোর্টে। এক কোর্টে বিখ্যাত টেনিস বীর কোসের সঙ্গে তখনকার সময়ের ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ববের আর এক কোর্টে খেলেছেন মদনমোহন ও ব্রাগন্‌। মহনমোহন ব্রাগন্‌কে বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলেছেন। এদিকে কোসে বন্ধুর দুর্দ্দশা দেখে নিজের খেলায় মনযোগ না দিয়ে ভুলের পর ভুল ক'রতে লাগলেন। বব তখন জিতছেন ৫-০ গেমে। এদিকে মদনমোহন ব্রাগন্‌র কাছ থেকে 'লাভ' সেট নিলেন। কোসে এইবার নিজের খেলায় মনযোগ দিয়েছেন। বব বহু চেষ্টা ক'রেও এর পর আর একটি গেমও জিততে পারলেন না। কোসে ৭-৫ ও ৬-০ গেমে ববকে পরাজিত ক'রলেন। কোসের মত টেনিস বীরের পক্ষেই সম্ভব।

গাউস মহম্মদ

মাদ্রাজ টেনিস ফাইনালে পুনসেক গাউসকে ৬-১, ৬-২, ও ৬-২ গেমে হারিয়েছেন।

সাবুর এক প্রদর্শনী খেলায় পুনসেককে ১-৬, ৬-২ ও ৬-৩ গেমে হারিয়ে সকলকে আশ্চর্য্য ক'রে দিয়েছেন।

অষ্ট্রেলিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ ঃ

কুইষ্ট ৬ ৩, ৬-১ ও ৬-২ গেমে ক্রফোর্ডকে পরাজিত ক'রে অষ্ট্রেলিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ ক'রেছেন। ক্রফোর্ড অষ্ট্রেলিয়ার এক নম্বর এবং বিশ্বের পর্য্যায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারকারী ব্রোমউইচকে হারিয়ে বিশেষ বিস্ময়ের সৃষ্টি ক'রেছিলেন। অবশ্য কুইষ্টের কাছে ক্রফোর্ডের পরাজয়ে বিস্ময়ের কিছু নেই।

বিহার লন্ টেনিস ফাইনাল্স ঃ

বিহার লন টেনিস ফাইনালে খসুসেন ও নসুসেন বিশেষ

কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। খসু সেনের কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশী। সিঙ্গলস ফাইনালে প্রবীণ খেলোয়াড় যুধিষ্ঠির সিং ৬-১, ৪-৬, ৬-২, ৬-৪ গেমে তাকে পরাজিত ক'রেছেন। ডবলসে খসু ও নসু ৭-৫, ৩-৬, ৮-৬ ও ৭-৫ গেমে বিখ্যাত খেলোয়াড় যুধিষ্ঠির সিং ও প্রেমপান্ধীকে পরাজিত

খসু সেন যুধিষ্ঠির সিং

ক'রেছেন। মিক্সড ডবলসে খসু ও শ্রীমতী টুইড ১-৬, ৬-২, ৬-২ গেমে প্রেমপান্ধী ও কুমারী আর্মারকে হারিয়ে বিজয়ী হ'য়েছেন।

ইন্টার কলেজ মহিলা স্পোর্টস ঃ

মহিলাদের ইন্টার কলেজিয়েট স্পোর্টস এসোসিয়েসনের তত্ত্বাবধানে কলেজ ছাত্রীদের পঞ্চম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হ'য়েছে। প্রতিযোগিতায় এ বৎসর বহু ছাত্রী যোগদান করে এবং বিভিন্ন বিষয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষিত হয়। ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউসনের কুমারী শোভা বোস ৩০ পয়েন্ট পেয়ে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসিপ পেয়েছেন। পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও স্কটিসচার্চ্চ কলেজের ছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে বিজয়ীনী হ'য়ে ৮৯ পয়েন্ট পেয়ে টীম চ্যাম্পিয়ানসিপ পেয়েছেন। বাঙ্গলা দেশে স্কুল এবং কলেজ ছাত্রীদের মধ্যে এরূপ প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলার অভাব আমরা বহুদিন থেকে অনুভব করে আসছিলাম। এ বিষয়ে স্কুল এবং কলেজ কর্ত্তৃপক্ষদের সমবেত চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন। ছাত্রীদিগকে উপযুক্ত শিক্ষক কিম্বা শিক্ষয়ত্রীর তত্ত্বাবধানে খেলাধূলা অভ্যাসের ব্যবস্থা করা সত্বর আবশ্যক। মাত্র দু'একটী মহিলা কলেজ ব্যতীত সকলেই এ বিষয়ে উদাসীন। আমরা জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে তাঁদের বার বার একথা স্মরণ করিয়ে দিই।

ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী কুমারী শোভা বসু মহিলাদের স্পোর্টসে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসিপ পেয়েছেন

ফটো—সি, ব্রাদার্স এণ্ড কোং

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক "সংগ্রাম ও শান্তি"—১৷৹
শ্রীনন্দদুলাল সান্যাল প্রণীত উপন্যাস "অসমাপ্ত"—২৷৷৹
শ্রীমতিলাল দাশ প্রণীত গল্পসংগ্রহ "পত্নীব্রত"—১৷৹
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "অগ্নিহোত্রী"—২৲
শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্তের শিশুপাঠ্য গল্প "মণি-কল্যাণ"—৷৷৹
শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত উপন্যাস "গঙ্গাপুত্র"—১৷৹
শ্রীশিশিরচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত "গ্রেট হাঙ্গার"—২৲
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ব্রহ্মসূত্র"—২৲
শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মুমূর্ষু পৃথিবী"—২৲
ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা প্রণীত "দেশ বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো—৩৷৹

সম্পাদক—
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons,
at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta

চৈত্র—১৩৪৬

দ্বিতীয় খণ্ড | সপ্তবিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

উপনিষদের অর্থ

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস

জার্মান দার্শনিক শোপেনহর বলেছিলেন যে—"পৃথিবীতে উপনিষদের মত এমন মানসিক উৎকর্ষসাধক এবং উপকারী গ্রন্থ নাই ; উপনিষদ ছিল তাঁর জীবনের শান্তি এবং তাঁর ভরসা ছিল—মরণেও তা তাঁকে শান্তি দেবে।"(১) উপনিষদ সম্পর্কে তাঁর এই অভিমত বোধ হয় অনেক মনীষীরই অন্তরের অভিমতকে ব্যক্ত করে। বাস্তবিক বল্‌তে কি, উপনিষদ একহিসাবে যেমন প্রাচীনতায় আমাদের মুগ্ধ করে, তেমনই তার ভাবের গভীরতা এবং সত্যতা আমাদের বিস্ময় জাগায়। দার্শনিক জ্ঞানের সন্ধানে মানুষের প্রথম চেষ্টার ফল হ'ল এই উপনিষদ ; কিন্তু সেই প্রথম চেষ্টাই তাকে সত্য সাধনার পথে কতখানি যে এগিয়ে দিয়েছিল সেইটা উপলব্ধি কর্‌লেই বিস্ময় বোধ হয় অপরিসীম।

উপনিষদের অর্থ সাধারণত যা হয়ে থাকে সে সম্বন্ধে প্রারম্ভেই আমাদের আলোচনা ক'রে নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমরা জানি, উপনিষদ বেদের অঙ্গ এবং প্রাচীন উপনিষদগুলি অন্তত বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বে রচিত। বেদকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—(১) সূত্র (২) ব্রাহ্মণ এবং (৩) আরণ্যক ও উপনিষদ। সূত্রে আমরা পাই মন্ত্রসমষ্টি, ব্রাহ্মণে পাই যজ্ঞের বিধি এবং কোন্ সূত্র কোন্ যজ্ঞে প্রয়োগ করা হবে ইত্যাদি সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থা। সুতরাং বেদের এই দুই অংশে আমরা পাই ধর্ম্মকর্ম্মের দিকটা। আরণ্যক এবং উপনিষদ কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের জিনিষ। সেখানে কর্ম্মের বালাই নাই,

(১) Welt, also Wille und vorctellung serous. by Haldane and Kemp, vol. I. p. xiii.

যাগ-যজ্ঞের বিধি-নিয়ম ইত্যাদি নিয়ে বিব্রত হবার প্রয়োজন নাই, সেখানে আছে জ্ঞানপিপাসু হৃদয়ে জ্ঞানের দ্বারা সৃষ্টির অন্তর্নিহিত তথ্যকে উপলব্ধি করার প্রয়াস। এক পক্ষে দেখ্‌তে গেলে ব্রাহ্মণ হতে উপনিষদের জন্মের মধ্যে আমরা উপনিষদের একটি গভীর এবং যুগান্তকর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তনের ইতিহাস পাই। ব্রাহ্মণ যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধি-ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ। আরণ্যক কিন্তু আনে অন্য সুর। বার্দ্ধক্য লাভের পর যাঁরা বানপ্রস্থ অবলম্বন কর্‌তেন, তাঁদের জন্যই এই আরণ্যকের ব্যবস্থা। এখানে যাগ-যজ্ঞাদির ততটা বালাই নাই। ধ্যান বা কোন বিশেষ মন্ত্রের অভ্যাসই এখন যাগযজ্ঞাদির স্থান নিয়েছে। এর উদাহরণ আমরা কোন কোন উপনিষদের মধ্যেই পাই, কারণ অনেক ক্ষেত্রে উপনিষদ ও আরণ্যক পরস্পর ওতঃপ্রোত-ভাবে মিশে গিয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ আমরা ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক নামে দুটি প্রাচীন উপনিষদের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর্‌তে পারি। ছান্দোগ্য উপনিষদের গোড়ায় উদ্গীথের ব্যাখ্যা হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে বাস্তবে অশ্বমেধ যজ্ঞের পরিবর্ত্তে উষাকে অশ্বমেধ যজ্ঞরূপে ধ্যান কর্‌বার ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। এইরূপে ব্রাহ্মণ হতে আরণ্যকে এসে আমরা একটি নূতন সুরের আস্বাদ পাই। এখানে নিছক জ্ঞানের উপাসনা প্রবর্ত্তিত না হয়ে থাক্‌লেও সুর যে বদলাতে সুরু করেছে তার আভাস আমরা যথেষ্ট পাই। যাগযজ্ঞের বিস্তারিত কর্ম্ম-তালিকার প্রতি এখানে তত আকর্ষণ নাই। মানসিক কর্ম্ম এবং ধ্যানই তার স্থান নিয়েছে। উপনিষদে আমরা দেখি এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি তার পূর্ণ রূপটি গ্রহণ করেছে। এখানে যাগযজ্ঞাদির কোন বালাই নাই, বরং তাদের প্রতি অবজ্ঞা আছে। বেদের প্রথম অংশকে এখানে অবজ্ঞার সুরে 'অপরা বিদ্যা' বলে নির্দ্দেশ করা হয়(২)। এখানে সঙ্কেতে যজ্ঞেরও প্রয়োজন নাই, ধ্যানের প্রয়োজন নাই, এখানে আছে স্বাধীন মানসিক শক্তির বিকাশ এবং যে মহান শক্তি সমগ্র সৃষ্টির পেছনে আত্মগোপন করে আছেন তাঁকে আবরণমুক্ত ক'রে জান্‌বার চেষ্টায় সেই মানসিক শক্তির প্রয়োগ। তখন ঋষির প্রার্থনায় এ সুর শোনা যায় না—আমায় পুত্র দাও, গরু দাও বা আমার শত্রুকে বিনাশ কর।

সেখানে যে প্রার্থনা বিশ্বশক্তির উদ্দেশ্যে জ্ঞাপিত হয় তা বলে—"অসৎ হতে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার হতে আলোতে এবং মৃত্যু হতে অমৃতে নিয়ে যাও,"(৩) তা বলে "হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ ঢাকা, হে পুষন্ সে তত্ত্বকে আবরণমুক্ত কর, যাতে আমরা সত্যকে জানতে পারি।"(৪) এখানে কর্ম্মকে নীচে ফেলে জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে। এখানে এই প্রার্থনা ক'রেই ঋষি ক্ষান্ত হন নি। তিনি তাঁর সমস্ত মানসিক শক্তি সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সেই পরমতত্ত্বকে জানবার চেষ্টায় নিয়োগ করেছেন। তাঁর সেই সাধনার ফলেই আমরা পেয়েছি উপনিষদের দর্শন। এমন মহান প্রেরণা এবং সাধনা একত্র সমাবিষ্ট হয়েছিল বলেই এমন ভাবনিগূঢ় দার্শনিক চিন্তা উপনিষদের বাণীতে জমাট বেঁধেছে। ফলে শুধু ভারতীয় কেন, বিশ্বের সকল দার্শনিকতত্ত্বের অঙ্কুরই অনুসন্ধান কর্‌লে আমরা সেই অমৃত বাণীতে খুঁজে পাব। সেই সাধনার বলেই ত উপনিষদের ঋষি এমন গর্ব্বোন্নত বাণী জগদ্বাসীকে শুনিয়ে দেবার স্পর্দ্ধা পেয়েছিলেন:— "সকল অমৃতের পুত্র যারা দিব্য ধামে বাস করেন তাঁরা শুনুন, আমি মহান আদিত্যবর্ণ পুরুষ যিনি অন্ধকারের পরপারে থাকেন তাকে চিনেছি।"(৫)

উপনিষদের সাধারণত অর্থ করা হয় এই যে, গুরুর সহিত একান্তে নৈকট্য হেতু যে শিক্ষা লাভ হয় তাই হ'ল উপনিষদ। অর্থ এই যে, এ বিদ্যা নির্জ্জনে কেবলমাত্র গুরুর সাহায্য নিয়ে লাভ করতে হবে। এইরূপ অর্থ ম্যাক্সমুলারই প্রথম করেন।(৬) ডয়সেন উপনিষদকে রহস্যগত জ্ঞান

(২) মুণ্ডক—১।১।৫

(৩) তদেতানি জপেৎ—অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময় ॥১।৩।২৮

(৪) হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।

(৫) শৃণ্বন্তি বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আয়ে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥
—শ্বেতাশ্বতর

(৬) "Upanishad meant originally session, particularly a session consisting of pupils assembled at a respectable distance round their teacher."—Translation of Upanishads by Max Muller; Sacred Books of the East, vol. 1, p. lxxxi.

বলে ব্যাখ্যা করেছেন।(৭) তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্যের গোড়ায় শঙ্কর উপনিষদের অর্থের ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে—"ব্রহ্মজ্ঞানকে উপনিষদ বলা হয়, কারণ যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতির বন্ধন শিথিল হয়ে যায়, কিম্বা তাদের একেবারে বিনাশ ক'রে দেয়, কিম্বা ছাত্রকে ব্রহ্মের সন্নিধানে উপস্থিত করে কিম্বা তার মধ্যে পরব্রহ্ম সন্নিবিষ্ট আছেন বলে।" মোটামুটি তা হ'লে শঙ্করের মতে উপনিষদের কোন বিশেষ ধাতুগত অর্থ খোঁজবার প্রয়োজন নাই, তা দার্শনিক জ্ঞানের সমার্থ-বোধক। অষ্টোত্তরশত উপনিষদের সঙ্কলনে পণ্ডিত বাসুদেব শর্ম্মা যে ব্যাখ্যা করেছেন তা এইরূপ: উপ অর্থে গুরু-উপদেশ হতে লব্ধ, নি অর্থে নিশ্চিতরূপে জ্ঞান, সদ্ অর্থে জন্মমৃত্যুর বন্ধনকে খণ্ডন করে। আমরা এবার এই মতগুলির সমালোচনা করব।

ডয়সেন-এর ব্যাখ্যার ভিত্তি এই যে, উপনিষদের তত্ত্বকে উপনিষদের মধ্যেই অনেকস্থলে গোপনীয় বিষয় বলে নির্দ্দেশ করা হয়েছে এবং বিশেষ উপযুক্ত পাত্র ভিন্ন তার তত্ত্বকে অন্য মানুষে সংক্রামিত করার নিষেধ আছে। অধিকারী-ভেদের প্রশ্ন এখানে এসে পড়ে, কিন্তু বিষয়ের গোপনীয়তার প্রয়োজন হেতু নয়, তার গুরুতা এবং জটিলতাই তার হেতু। দ্বিতীয়ত উপনিষদের জ্ঞান যে কেবল নির্জ্জনে একা একা গুরুর নিকট শিক্ষা করার ব্যবস্থামাত্রই আছে তার প্রমাণও আমরা উপনিষদের মধ্যে পাই না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখ্‌তে পাই যে, প্রকাশ্য রাজসভায় উপনিষদের তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছে। রাজা জনকের ত এইরূপ দার্শনিক আলোচনার ব্যবস্থা করবার জন্য বিশেষ খ্যাতির কথা শুনতে পাই। বৃহদারণ্যকে উল্লেখ আছে যে, জনকের এই খ্যাতির কথা কানে পৌঁছলে পর রাজা অজাতশত্রুর বিশেষ ঈর্ষাবোধ জেগেছিল এবং তিনি নিজেই এইরূপ দার্শনিক আলোচনার ব্যবস্থা ক'রে জনকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু করেছিলেন।(৮) শুধু তাই নয়, আমরা পাই ব্রহ্মজ্ঞান বা পরাবিদ্যার প্রচারের জন্য ঋষিদের কি আকুলতা। তাঁরা ত ব্রহ্মবিদ্যাকে নির্ব্বাচিত কয়েকজন সৌভাগ্যবানের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আট্‌কে রাখতে চান না। তাঁরা চান বিশ্ববাসী সকলেই সেই জ্ঞানের পবিত্র স্পর্শ লাভ ক'রে মোহমুক্ত হবে। তাঁরা বলেন, যারা অবিদ্যার উপাসনা করে তারা ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করে।(৯) বৃহদারণ্যক আরও বলেন যে, যে মানুষ অবিদ্যার উপাসনা করে সে মানুষ মৃত্যুর পর আনন্দ নামে দুঃখময় লোকে প্রবেশ করে।(১০) ব্রহ্মজ্ঞান দান করতে তাঁরা যেমন প্রকাশ্য রাজসভায় কুণ্ঠিত নন, তেমনই জাতি-বংশনির্ব্বিশেষে উপনিষদের ঋষি সকলকেই সেই জ্ঞানের অধিকারী বলে গণনা করে নিয়েছেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে জবালার কাহিনীতে আমরা পাই যে, তিনি তাঁর পুত্র সত্যকামকে তার পিতার গোত্র কি বল্‌তে অক্ষম হয়েছিলেন—কিন্তু তবু সেই সত্যকামকে গৌতম ঋষি প্রত্যাখ্যান করেন নি। যাজ্ঞবল্ক্য তার পত্নী মৈত্রেয়ীকে অজ্ঞ নারী বলে শিষ্যত্বে বরণ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। তবে উপনিষদের জ্ঞানের বিস্তারে যেটুকু বাধা ছিল তা বিষয়ের জটিলতা হেতু। এই পরম সত্যের পথকে ঋষিরা ক্ষুরের ধারা মত শাণিত এবং দুর্গম বলে কল্পনা করেন, কাজেই সেই পথে গমন অনেকের পক্ষে সাধ্যাতীত হয়ে পড়ে। সেটা কোন বিশেষ বিধি-নিষেধের প্রভাবে নয়, বিষয়ের গুরুতা হেতুই তা ঘটে থাকে। উপনিষদের জ্ঞানকে রহস্য বলে যে ব্যাখ্যা করা হয় তাও সেই একই কারণে। রহস্যে একান্তে তার আলাপের বিধি আছে বলে তা রহস্য নয়; তার তথ্যগুলি নিগূঢ় এবং সুগভীর চিন্তা-সাপেক্ষ, সেই কারণেই তা রহস্য। এই কারণে ডয়সেনের ব্যাখ্যা উপনিষদের চিন্তাধারাসম্মত বলে গণ্য হতে পারে না।

ম্যাক্সমূলারের যে ব্যাখ্যা তাও উপরে লিখিত একই কারণে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। নির্জ্জনে বসে একান্তে গুরুর নিকট শিক্ষালাভ উপনিষদের জ্ঞানের বিস্তারের একমাত্র উপায় বলে পরিগণিত হত না। অনেক স্থলে

(৭) Deussen Philosophy of the Upanishads. p. 14-15

(৮) বৃহদারণ্যক, ২।১।১।

(৯) অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে (কেন—৯)

(১০) আনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি অবিদ্বাংসো অবুধো জনাঃ ॥৪॥৪॥১১
বৃহদারণ্যক।

অবশ্য গুরু শিষ্যকে শিক্ষা দিতেন, যেমন নারদ ও সনৎ-কুমারের গল্প এবং আরুণি ও শ্বেতকেতুর গল্পে আমরা পাই; কিন্তু অনেক স্থলে আলোচনাকারীদের মধ্যে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাক্‌ত না। অজাতশত্রু ও জনকের সভায় যা ঘট্‌ত—তা দুই বা বহু দার্শনিকের মধ্যে পরস্পর বিদ্যার প্রতিযোগিতা। সেখানে প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে পরস্পরকে পরস্পর হারাতে চেষ্টা করতেন এবং পরিশেষে যিনি পাণ্ডিত্যে সকলকে পরাজিত কর্‌তেন তাঁকেই রাজা পুরস্কার দিতেন। কাজেই একান্তে শিক্ষাও উপনিষদের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নয় যে, তার সঙ্গে তার নামকরণের কোন বিশেষ যোগসূত্র থাকতে পারে।

শঙ্করের যা অর্থ তা রূপক অর্থে মোটামুটি ঠিক হয়েছে বলা চলে। উপনিষদের আলোচ্য বিষয় ব্রহ্ম এ কথা ঠিক। উপনিষদের মধ্যেই এইরূপ অর্থের সমর্থক উক্তিও আমরা খুঁজে পাই। মুণ্ডকে আমরা এই উক্তিটি পাই—"ব্রহ্মবিদরা বলে থাকেন যে, দুই রকম বিদ্যা আমাদের শিখ্‌বার আছে, পরা ও অপরা। অপরা বিদ্যা হল ঋগবেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ। আর পরা বিদ্যা হ'ল তাই যার দ্বারা সেই অক্ষরকে (ব্রহ্মকে) জানা যায়।"(১১) ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে আমরা এই কথা পাই—"বিদ্যা ও অবিদ্যা বিভিন্ন জিনিষ; শ্রদ্ধার সহিত বিদ্যার দ্বারা উপনিষদের দ্বারা যা করা যায় তাই আমাদের ক্ষমতা প্রদান করে এবং তাই সেই অক্ষরের (ব্রহ্মের) ব্যাখ্যানস্বরূপ হয়।"(১২) এই উক্তিগুলির মধ্যে আমরা লক্ষ্য কর্‌তে পারি যে, বিদ্যার সহিত উপনিষদকে জড়িত করা হয়েছে এবং উভয়কেই একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সেই অর্থ হল এই যে, তা ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের প্রদান করে। কাজেই উপনিষদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে শঙ্কর যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তা যথার্থ হয়েছে সন্দেহ নাই।

পণ্ডিত বাসুদেব শর্ম্মার ব্যাখ্যা যেন ম্যাক্সমুলার ও শঙ্করের ব্যাখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা বলে মনে হয়। তিনি একদিকে গুরুর অস্তিত্বকে শিক্ষার ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন, অথচ সদ অর্থে সংসারবন্ধন কর্ত্তন করায় উপনিষদের সার্থকতা, এ বিষয়ও উল্লেখ করেছেন। এরূপ ব্যাখ্যাতে বাহাদুরী থাক্‌লেও এটুকু বলা প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে, এ ব্যাখ্যা যেন একটু জোর ক'রেই করা হয়েছে। সংসারবন্ধন ছেদন কর্‌বার প্রয়োজনীয়তাবোধ তখনই জাগে, যখন পরজন্মবাদের উপর মানুষের দৃঢ় প্রতীতি জন্মায়। কিন্তু প্রাচীন উপনিষদে এমনও দেখা যায়, যখন পরজন্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট বদ্ধমূল ধারণা ঋষিদের মনে ভাল করে জাগে নি, তখনকার দিনে বরং উপনিষদের সার্থকতা এই হিসাবেই বেশী পরিলক্ষিত হ'ত যে অজ্ঞানের অন্ধকারকে তা বিনষ্ট করে। সুতরাং উপনিষদ্ কথাটি যারা প্রবর্ত্তন করেন তাঁদের মনে এরূপ কোন অর্থ জেগেছিল বলে মনে হয় না।

আসলে ভুল হয়েছে এই যে, উপনিষদ কথাটির সহজ সরল স্বাভাবিক অর্থ, আপাতদৃষ্টিতে যে অর্থ দাঁড়ায় সে অর্থের প্রতি কেহই নজর দেন নি। সকলেই এই কথাটির মধ্যে একটি গূঢ় অর্থ খোঁজবার চেষ্টা করেছেন। ফলে জটিল অর্থ তাঁদের মনে ঠেকেছে কিন্তু সহজ অর্থটি কারও চোখে পড়েনি। উপনিষদের আর এক নাম বেদান্ত আমরা জানি। এই বেদান্ত অর্থে পরবর্ত্তীকালে আমরা কয়েকটি বিশেষ দার্শনিক মত বলে জেনেছি; আসলে কিন্তু সেই মতগুলিই মহর্ষি বেদব্যাস রচিত উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্রের উপর ভিত্তি করে গঠিত। এই ব্রহ্মসূত্রের উৎপত্তি ও উপনিষদগুলির মধ্যে যে দার্শনিক মত নানা বিশ্লিষ্ট আকারে ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের একত্র সমাবিষ্ট ক'রে তাদের মধ্য হতে একটি সুসংবদ্ধ দার্শনিক মত সৃষ্টির চেষ্টা থেকেই হয়েছে। এইরূপে উপনিষদের মতগুলিকে দার্শনিক মতের আকার দেবার চেষ্টা হতে এই বিভিন্ন মতগুলির উৎপত্তি হয়েছে বলেই তাদেরও নাম বেদান্ত দর্শন হয়েছে। আসলে কিন্তু উপনিষদকেই বেদান্ত বলা হয়ে থাকে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই আমরা উপনিষদ অর্থে এই বেদান্ত কথাটির

---

(১১) দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ ব্রহ্মবিদোবদন্তি পরাচৈবাপরাচ॥ তত্রাপরা ঋগবেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি॥ অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ মুণ্ডক॥১॥১॥৪-৫

(১২) নানাতু বিদ্যা চা বিদ্যা চ যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীতি খল্বেতস্যৈবাক্ষর স্যোপব্যাখ্যানং ভবতি। ছান্দোগ্য॥১॥১॥১০॥

উল্লেখ পাই। তার শেষে আছে—"বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরা কল্পে প্রচোদিতম্॥" এই কথাটি। উপনিষদকে বেদান্ত বলে নামকরণ করবার কারণ এই যে, তা বেদের অন্তে স্থাপিত। বেদের শেষে তার স্থিতি বলেই তাকে বেদান্ত বলা হয়। আমার ত মনে হয় উপনিষদের ধাতুগত অর্থও হ'ল ঠিক তাই। বেদের শেষে তা আছে বলেই তার নাম উপনিষদ, অন্য কোন কারণে নয়। গুরুর নৈকট্য লাভের উপায় বলে বা ব্রহ্মের সন্নিধি স্থাপন করে বলে তার এ নাম হয় নি। উপনিষদ শব্দটি বেদান্তের সমার্থ-বোধক শব্দমাত্র।

এখনই মাত্র আমরা ব্রহ্মসূত্রের কথা উল্লেখ করেছি। এ সম্বন্ধে আমাদের আর একটু বিস্তারিত আলোচনা এখানে প্রয়োজন হয়ে পড়্‌বে। ঋষি বেদব্যাস যখন ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল উপনিষদে যে চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত আকারে নানা স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের সংগ্রহ করে একটি সমগ্ররূপ দান করেন এবং তার সাহায্যে একটি বিশেষ দার্শনিক মত গঠন করেন। উপনিষদ নানাকালে নানা ঋষির রচিত। তাতে যে চিন্তাধারা আছে সেগুলি সব সময় শ্রেণীবিভাগ ক'রে সাজান হয়নি। তাদের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা বা নিয়মের ব্যবস্থা নাই। যখন যে তত্ত্ব যে ঋষি সংগ্রহ করেছেন তখনই সেটি রচিত হয়েছে এবং সেইরূপে বিশৃঙ্খলার মাঝখানে তারা পুস্তকে নিজেদের স্থান খুঁজে নিয়েছে। এই রকম ঘটবার একটি বিশেষ কারণও তখন বর্ত্তমান ছিল। উপনিষদের তথ্যগুলি ঋষিরা যে সংগ্রহ করতেন তা চিন্তাশক্তিকে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে পরিচালিত ক'রে, বিশ্লেষণ ক'রে, দেখে সংগৃহীত হত না। ঋষির মনে প্রেরণার মুহূর্ত্তে যখন যে অবস্থায় যে কোন ভাবধারা জাগ্‌ত, তাকেই তাঁরা সুন্দর সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করতেন। তাঁদের সত্যান্বেষণের পদ্ধতি বৈজ্ঞানিকের পদ্ধতির মত ছিল না; তা ছিল কবির মত, সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করে তাই তাঁরা লিখতেন। সেই কারণেই তার ভাবের ধারা সুসংবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণেই এই অসংলগ্ন ভাবধারাগুলি সজ্জিত ক'রে একটি পূর্ণাবয়ব দার্শনিক মতের আকার দেবার অত্যন্ত প্রয়োজনও হয়েছিল। মহর্ষি বেদব্যাসও সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন।

কিন্তু সূত্রাকারে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে ব্রহ্মসূত্র এমন আকার গ্রহণ করল যে, তা দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়াল। এইরূপ হওয়ার কারণ ছিল এই—সেকালে লিখিত আকারে পুস্তকাদি অনেক সময় রক্ষণ করা সম্ভব হ'ত না। সেই কারণেই সূত্রের ব্যবস্থা। সূত্রের উদ্দেশ্য এই যে, বিস্তারিত ভাবকে সংক্ষিপ্ততম আকার দিতে হবে; যত সংক্ষিপ্ত হয় ততই তার সার্থকতা বেশী, কারণ তাতে মুখস্থ করার পরিশ্রম অনেক লঘু হয়। কালে এই সংক্ষেপকরণের নেশা তখনকার পণ্ডিতদের এমন ক'রে পেয়ে বসেছিল যে, কোন বিষয়কে রূপান্তরিত করতে গিয়ে তাঁরা আর তার আসল রূপের পরিচয় দেওয়ার কোন লক্ষণই বজায় রাখ্‌তেন না। একটি সূত্র থেকে একটি মাত্র অক্ষরকে ত্যাগ করতে সক্ষম হলে তাঁরা নাকি পুত্রসন্তানপ্রাপ্তির সমান আনন্দের অধিকারী হতেন। এ থেকে বোঝা যাবে তাঁদের ঝোঁক ছিল কোন্ পথে। সংক্ষেপকরণটা গৌণ জিনিষ, তার সার্থকতা স্মৃতিশক্তিকে সাহায্য করবার জন্য; কিন্তু তার আসল কাজ পুস্তককে প্রকাশ দেওয়া, তা যত সংক্ষিপ্ত আকারেই হোক না কেন। কিন্তু কার্য্যগতিকে হয়ে পড়্‌ল উল্টো, মুখ্য উদ্দেশ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে তাঁরা গৌণ উদ্দেশ্যকেই সম্মান দেখালেন বেশী। ফলে এমন হ'ল যে পুস্তকের সেই সংক্ষিপ্ত আকার হ'ল সকলের দুর্বোধ্য, টীকা বা ভাষ্য ভিন্ন তার অর্থ করা মানুষের সাধ্যাতীত হ'ল। সূত্র রচনার এই সাধারণ দোষ ব্রহ্মসূত্রেও যথেষ্ট বর্ত্তিয়াছিল। এখানেও ভাষ্য ভিন্ন তার অর্থ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। অনেক স্থলে একই সূত্র একাধিকবার বিভিন্ন স্থানে প্রয়োগ করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে বুঝা যায়, এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন অর্থে তার প্রয়োগ হয়েছে; কিন্তু কোথায় কি অর্থ তার, তা জেনে নেওয়ার কোন উপায় নাই। ফলে ভাষ্যকারের কাজ হয়ে পড়ে অত্যন্ত জটিল। মোটামুটি তাঁকে সম্পূর্ণ নিজের বিদ্যা-বুদ্ধির উপর নির্ভর করতে হয়। কাজেই যে-যার নিজের ভাষ্যে নিজের মনোভাবই প্রতিবিম্বিত হতে দেখতে পান। এরূপ ক্ষেত্রে এরকম হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ নির্ভর করবার বা পথ দেখাবার যখন কিছু নাই এবং সূত্র এমনি দুরূহ যে তাতে দু-তিন রকম মানে অনেক স্থলে অসম্ভব হয়, সেখানে মানুষ নিজের বুদ্ধি বা ধারণা-

সম্মত অর্থকেই তার স্বাভাবিক অর্থ বলে গ্রহণ করে থাকেন।

ব্রহ্মসূত্রের বেলায় এই ধরণের বিভ্রাট ঘটেছিল অতি মাত্রায় বেশী। এখানে তার অর্থ যে ভাষ্য ভিন্ন বার করা অসম্ভব, কেবল তাই নয়; তার অর্থ বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন রূপে করেছেন। সেই ব্যাখ্যাগুলি এমনই পরস্পর থেকে বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র যে, তাদের প্রত্যেককে এক একটি বিভিন্ন দার্শনিক মত বলে বেশ শ্রেণীবিভাগ করা চলে। এরা প্রত্যেকেই বেদান্ত-দর্শন বলে খ্যাত, কারণ তারা মূলে সকলেই ব্রহ্মসূত্রের বা বেদান্তের ব্যাখ্যা-স্বরূপ মাত্র। আসলে কিন্তু তারা তা নয়। তারা প্রত্যেকেই যে মনীষী দ্বারা রচিত, তাঁর নিজের দার্শনিক মতের প্রতিচ্ছবি মাত্র। এতগুলি যে বিভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা সম্ভব হয়েছে, ব্রহ্মসূত্রের অর্থের দুর্বোধ্যতা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলেই অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে যে সব ব্যাখ্যা ব্রহ্মসূত্র সম্বন্ধে প্রধানত সম্ভব হয়েছে, তাদের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তার প্রয়োজনীয়তা দুই কারণে। প্রথমত, তা আমাদের দেখিয়ে দিতে সমর্থ হবে এই পরস্পরবিরোধী মতগুলির বিরোধের পরিমাণ কতখানি। দ্বিতীয়ত, আমরা ধারণা ক'রে নিতে পারব, কত ধরণের মত একই সূত্রকে ভিত্তি ক'রে সম্ভব হয়েছে। আমরা সংক্ষেপে ব্রহ্মসূত্রের উপর ভিত্তি করে যে প্রধান মতগুলি বিভিন্ন দার্শনিক তাঁদের ভাষ্যে গড়ে তুলেছেন তার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেব।

ব্রহ্মসূত্রের উপর যে মনীষীদের ভাষ্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা হ'ল এই পাঁচজনের।(১) শঙ্কর, (২) রামানুজ, (৩) মাধব, (৪) বল্লভাচার্য্যও (৫) নিম্বার্ক। এঁদের দার্শনিক মতের বিবরণ দেওয়ার পূর্ব্বে কয়েকটি গোড়ার কথা আমাদের বলে নেওয়া প্রয়োজন। সকল উপনিষদের সকল মতগুলিই একটি বিষয়ে একমত যে, এই বিশ্বসৃষ্টির কারণ হলেন ব্রহ্ম। এখন প্রধানত এই মতটি সকল ভাষ্যকারই গ্রহণ করেছেন। মোটামুটি তাঁদের মতভেদ, এই সৃষ্টির সঙ্গে ব্রহ্মের যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে, তাই নিয়েই। এই কার্য্যকরণ সম্পর্ক সাধারণত দুই ধরণের হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, ঘটের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এক পক্ষে ঘটের উৎপত্তি হয়েছে মৃত্তিকা থেকে, এই হিসাবে মৃত্তিকাই তার কারণ। অন্য পক্ষে, কুম্ভকারও ঘটের কারণ। এইরূপে স্বর্ণালঙ্কারের বিষয়েও ঠিক একই কথা খাটে। এক হিসাবে, স্বর্ণ তার কারণ। উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম ধরণের যেটি কারণ সেটি হ'ল বস্তুটির উপাদান; মৃত্তিকা ও স্বর্ণ বিশেষরূপ পরিগ্রহ ক'রেই ত ঘট বা অলঙ্কার হয়। এই কারণে এই প্রথম শ্রেণীর কারণকে উপাদান কারণ বলে নির্দ্দেশ করা হয়। সেইরূপ দ্বিতীয় ধরণের সেটি কারণ, যেটি বস্তুর উপাদান নয়; সেটি কেবল উপাদানকে বিশেষ রূপ দিতে সাহায্য করে মাত্র। এই দ্বিতীয় কারণটিকে সেইজন্য নিমিত্ত-কারণ বলা হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন ওঠে এই যে, এই এই সৃষ্ট জগতের ব্রহ্ম কিরূপ কারণ।

আমরা প্রথমেই শঙ্করের দর্শনের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করব।

শঙ্কর মোটামুটি বলেন এইরূপ: আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ব্রহ্মা সৃষ্টির কেবল নিমিত্তকারণ মাত্র। কারণ উপনিষদে অনেক উক্তি আছে যা মোটামুটি এইরূপ বলে যে, ব্রহ্মা আগে সৃষ্টি করবার ইচ্ছা করলেন, তার পর সৃষ্টি করলেন। (১৩) এই ধরণের কারণসম্বন্ধ কার্য্য হতে বিশ্লিষ্ট কোন শক্তির উপরই আমরা আরোপ করে থাকি, যেমন অলঙ্কার বিষয়ে স্বর্ণকার এবং ঘট বিষয়ে কুম্ভকার। ব্রহ্মার উপর কিন্তু এইরূপ কারণ আরোপ করলে এক বিষয়ে মুস্কিল হয়। তাহ'লে কিন্তু ব্রহ্মাই বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টির কারণ হতে পারেন না, আর একটি দ্বিতীয় উপাদান-কারণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেই কারণে ব্রহ্মাকে আমাদের উভয়রূপ কারণ বলেই দেখতে হয়। তিনি এই দৃশ্যমান বিশ্বের উপাদান-কারণও বটে, নিমিত্ত-কারণও বটে। কিন্তু ব্রহ্ম এমনই কারণ যে, তিনি সৃষ্টিকে সম্ভব করতে অন্য কোন দ্বিতীয় শক্তির উপর নির্ভর করেন না। একাধারে তিনি উপাদানও বটে, আবার সেই উপাদানকে সৃষ্টির রূপে পরিণত করবার কার্য্যও, নিমিত্ত কারণ হিসাবে তিনিই সম্পাদন করে থাকেন। কাজেই এক্ষেত্রে কুম্ভকারের কারণত্বও ঠিক

(১৩) শঙ্করভাষ্য ১।৪।২৩

তাঁর উপর আরোপ করা যায় না, আবার মৃত্তিকার কারণত্ব মাত্রও তাঁর ওপর আরোপ করা যায় না।(১৪)

ব্রহ্মকে এইরূপ উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ বলে যুগপৎ নির্দ্দেশ করায় এরকম ধারণা জাগা স্বাভাবিক যে, ব্রহ্ম বোধ হয় কারণ হিসাবে এক এবং কার্য্যরূপে যখন রূপান্তরিত হন, তখন হন তিনি বহু। ব্রহ্মের তা হলে কারণ হিসাবে একত্ব থাকে, কিন্তু তিনি যখন কার্য্যে রূপান্তরিত হন তখন তিনি বহু হন। এক্ষেত্রে এইরূপ ধারণা জাগাই স্বাভাবিক। এরূপ স্থলে, সাধারণত ব্রহ্মকে একটি বৃক্ষের মূলস্বরূপ কল্পনা করা হয় এবং সৃষ্টিকে তাঁর শাখাপ্রশাখা রূপ কল্পনা করা হয়; ফলে এক হিসাবে তিনি সমগ্রকে নিয়ে এক হন, আবার অন্য হিসাবে তিনি বহু শাখারও সমষ্টি বটেন। এইরূপ কেউ বা ব্রহ্ম এবং সৃষ্টিকে অনন্ত সমুদ্র এবং তার কোলে অসংখ্য বীচিমালার সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। সেখানেও সমগ্ররূপে দেখ্‌তে গেলে ব্রহ্ম এক, আবার ব্যষ্টিরূপে দেখতে গেলে তিনি বহু হয়ে যান। শঙ্কর কিন্তু এই ধরণের মতকে মোটেই আমল দিতে চান না। তাঁর পরিকল্পনায় ব্রহ্ম কার্য্য হিসাবেও এক, কারণ হিসাবেও; তাঁর একত্ব তিনি কখনও পরিবর্জ্জন করেন না, কোন অবস্থাতেই করেন না। যে ব্রহ্ম কারণ-হিসাবে এক থাকেন আবার কার্য্যহিসাবে বহুতে রূপান্তরিত হন, তিনি ত চিরতরে এক হতে পারেন না। তাঁর মতে ব্রহ্ম সর্ব্ব অবস্থাতেই এক।

সুতরাং শঙ্করের মতে ব্রহ্ম একমাত্র এবং অদ্বিতীয়, কোন অবস্থাতেই তিনি বহু হন না। আপাতদৃষ্টিতে এখানে একটি অসম্ভব অবস্থা এসে পড়ে। ব্রহ্ম যদি সর্ব্বাবস্থাতেই এক থাকেন, ব্রহ্ম যদি বিশ্বসৃষ্টির কারণ হন, তাহলে এই যে বিশ্বের নাট্যে আমরা বহুর লীলা দেখি তার সঙ্গে শঙ্কর ব্রহ্মের একত্ব খাপখাওয়াতেন কি করে?

শঙ্কর তাতে বিচলিত হন না; তিনি বলেন, দৃশ্যমান জগৎ নিশ্চয় ব্রহ্ম, তা থেকে তা অভিন্ন নয়। তবে বিশ্বে যে আমরা বহু দেখি, নানা দেখি, ওইটাই ভুল। বিশ্বে কোথাও নানা নাই, বহু নাই, আছেন একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। তবে আমরা যে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির সাহায্যে নানা দেখি, বহু দেখি, তা কি মিথ্যা? শঙ্কর বলেন—হাঁ, তাই। এই যে নানার খেলা, এই যে বহুর খেলা এটি কল্পনা মাত্র, এটি চোখের ভুল, আসলে তা নাই। এই যে ব্রহ্মের কার্য্য আকারে বহু ও নানার বেশে বিকার, সে বিকারও নাই, এই নাম ও রূপের ভেদ সম্পূর্ণ অলীক। দৃশ্যমান জগৎ ও ব্রহ্ম একই পদার্থ; জগৎকে আমরা যখন বহুরূপে দেখি তখন ভুল দেখি, আসলে তা সেই একই ব্রহ্ম। এখানে যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে তাতে বিকারের স্থান নাই, যা কার্য্য তাই কারণ, মূলত তারা একই; কারণকে কার্য্যরূপে আমরা যে দেখি তা হ'ল চোখের ভুল।' (১৫)

এখন এটা বোঝা সহজ হবে যে, শঙ্কর যে অর্থে ব্রহ্ম ও জগৎকে কার্য্যকারণ সম্বন্ধে জড়িত করেন, সে সাধারণ অর্থ থেকে বিভিন্ন। সাধারণত কার্য্যকে আমরা কারণের পরিণাম বলে নির্দ্দেশ করে থাকি, অর্থাৎ—কার্য্যকে কারণের রূপান্তর বলে গ্রহণ করে থাকি। শঙ্কর কিন্তু বিশ্বসৃষ্টিকে ব্রহ্মের পরিণাম বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন।

তিনি বলেন, জগৎ ব্রহ্মের রূপান্তর নয়, সৃষ্টি এবং ব্রহ্ম একই জিনিষ; সৃষ্টির মধ্যে আমরা যে এককে না পেয়ে বহুকে অনুভূত করি, সেটি আমাদের অনুভূতির দোষ। এখানে পরিণাম ঘটে নি, ঘটেছে বিবর্ত্ত বা বিকৃতি। এটা আমাদের অনুভবশক্তির বিকারহেতুই এরকম ঘটে থাকে, যেমন জলের মধ্যে প্রবিষ্ট সোজা লাঠিকেও আমরা বাঁকা আকারে দেখে থাকি। যখন দুধ রূপান্তরিত হয়ে দই হয় তখন আমরা পাই পরিণামকে, আর যখন রজ্জু চোখের দেখার ভুলে সর্প বলে মনে হয়, তখন আমরা পাই বিবর্ত্তকে। এই যে চোখে দেখার ভুল ঘটে থাকে, তার

(১৪) নিমিত্তত্বং তু অধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবাদধিগন্তব্যম্। যথা হি লোকে মৃৎসুবর্ণাদিকম্ উপাদানকারণং কুলাল সুবর্ণাদীনধিষ্ঠাত্‍ন পেক্ষৎ প্রবর্ত্ততে নৈবং ব্রহ্মণ উপাদান কারণস্য। শারীরক ভাষ্য, ১।৪।২৩

(১৫) অভ্যুপগম্য চৈমং ব্যবহারিকং ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণং বিভাগং স্যাল্লোকবদিতি পরিহারোঽভিহিতঃ, ন ত্বয়ং বিভাগঃ পরমার্থতোঽস্তি, যস্মাত্তয়ো কার্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বমবগম্যতে। কার্য্যমাকাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ, কারণং পরং ব্রহ্ম, তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতোঽনন্যত্বং ব্যতিরেকেণাভাবঃ কার্য্যস্যাবগম্যতে।... যতো বাচারম্ভণং বিকারো নাম ধেয়ং বাচৈব কেবলমস্তীত্যারভ্যতে বিকারো ঘটঃ শরাব উদঞ্চনং চেতি। নতু বস্তু বৃত্তেন বিকারো নাম কশ্চিদস্তীতি।

—শারীরক ভাষ্য,২।১।১৪)

কারণ হল মায়া, রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম করতে হলে যেমন দরকার—অন্ধকারের। 'মায়া' শক্তিটির এমন ক্ষমতা আছে যে, তা আসল জিনিষটিকে আবৃত ক'রে রাখে এবং নকল জিনিষের সৃষ্টি করে। ফলে আমরা আসল জিনিষকে দেখ্‌তে পাই না, দেখি তার মেকি রূপকে। কাজেই এই যে বহুর জগৎ, নানার জগৎ, তা একেবারে যে ভিত্তিহীন, তাও বলা চলে না। তা ব্রহ্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তা ব্রহ্মই; কিন্তু তাকে আমরা দেখার ভুলে এক দেখি না, বহু দেখি, নানার আকারে দেখি। এই মাত্র তার দোষ।

ব্রহ্মের সত্যরূপ, আসল অবিকৃত রূপ যা শঙ্কর এঁকেছেন তাতে তাঁর দুটি মাত্র বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি সৎ অর্থাৎ আছেন এবং তিনি চিন্ময়, তিনি জ্ঞাতা-স্বরূপ। সেখানে জ্ঞাতা আছেন বটে কিন্তু জ্ঞেয় নাই। কারণ, সেখানে দ্বিতীয় কেউ নাই, একমাত্র অদ্বিতীয় চিন্ময় ব্রহ্ম একাই বিরাজমান। তাঁর জ্ঞানশক্তির কখন বিলোপ নাই। এই জ্ঞাতৃত্ব তাঁর গুণ নয়, এ তাঁর স্বভাব, যেমন লবণের স্বভাবই হল তার লবণের আস্বাদ।'(১৬) ব্রহ্মকে তাই তিনি 'নির্ব্বিশেষ 'চিন্মাত্র' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। সূর্য্য যেমন মহাশূন্যে তার কিরণরাজি বিকারণ করে—তা সেখানে সে কিরণকে গ্রহণ করবার কোন বস্তু থাক বা নাই থাক, ব্রহ্মেরও সেইরূপ জ্ঞাতৃত্ব শক্তি চির বিরাজমান, তা জ্ঞানের বিষয় কিছু থাক বা নাই থাক।(১৭) সেই আসল রূপে তিনি যে কিছু দেখেন না বা ভোগ করেন না, তার কারণ এই যে, দ্বিতীয় তাঁর কিছু নাই যে তিনি তা দেখ্‌বেন বা ভোগ করবেন।(১৮)

এইখানে এটা উল্লেখ করে রাখা দরকার যে, ব্যবহারিক জগতের প্রয়োজনের জন্য তিনি সগুণ ব্রহ্মের কল্পনাও করেছেন। সেখানে ব্রহ্ম একক নন, সেখানে তিনি সগুণ ঈশ্বরের রূপ নিয়ে দুয়ের নানার জগতের অধীশ্বর হন। কিন্তু তাঁর দর্শনের এ দিকটার সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার কোন সম্পর্ক নাই। ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তার অবস্থা কিরূপ, সেই আমাদের এখানে বিশেষ আলোচনার বিষয়। সুতরাং আমরা তাঁর দর্শনের যে বিবরণ সংক্ষিপ্ত আকারে উপরে দিয়েছি, আমাদের বর্ত্তমান প্রয়োজনের পক্ষে তাই যথেষ্ট হবে।

(ক্রমশঃ)

(১৬) শারীরক ভাষ্য, ৩।২।১৬

(১৭) শারীরক ভাষ্য, ২।৩।১৮

(১৮) নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। বৃহদারণ্যক, ৪।৩।২৩ এই সঙ্গে তুলনীয়।

ফাগুন কি দিন যায়—

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

রঙে-রঙে রাঙা হয়েছে পথের ধূলি—
শিমূল-পলাশ অনুরাগে হ'ল লাল,
আকাশে সূর্য্য বুলায় রঙের তুলি,
নদীতে তরণী মেলেছে রঙীন্ পাল।
গৃহ-অলিন্দ রাঙালো আবীরে ফাগে—
অধীর আনন্দে নব পরিণীতা বালা,

হৃদয়পদ্ম শতদল মেলি জাগে—
দেহের গগনে প্রেমের প্রদীপ জ্বালা
দীঘি-কালো জল রাঙা হ'ল কুঙ্কুমে,
সে-রঙে অশোক যৌবনে টলটল্!
উতলা বাতাস অগুরু-ধূপের ধূমে;
শ্যামার কণ্ঠে মুখরিত বনতল।

ভেসে আসে, শুনি, দূরে কোন পাখী গায়—
কাঁদে বনদেবী, "ফাগুন কি দিন যায়"!

বনফুল

২৪

প্রফেসার গুপ্ত কালিদাসের কাব্যে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। সংস্কৃত কাব্য-চর্চ্চা করা তাঁহার জীবনের প্রধানতম বিলাস। যদিও তাঁহার পরিধানে রিমলেস চশমা, হস্তে বিলাতী-সিগারেট, অঙ্গে মুসলমানী ঢিলা পাঞ্জাবী ও পায়জামা, কিন্তু মনে মনে তিনি উজ্জয়িনীবাসিনী মালবিকা নিপুণিকা চতুরিকার প্রণয়ী। তাঁহার কুশন-দেওয়া রিভালভিং চেয়ারে বসিয়া বসিয়াই তিনি নগাধিরাজ হিমালয়ের গভীর গাম্ভীর্য্যের মধ্যে অথবা অলকাপুরীর মায়াময় স্বপ্নলোকে তন্ময়চিত্তে বিচরণ করিয়া থাকেন। ছন্দে গাঁথিয়া তেমন কোন উল্লেখ-যোগ্য কবিতা যদিও তিনি অদ্যাপি লেখেন নাই, কিন্তু কোন উল্লেখযোগ্য কবিতাও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই, ইহা সত্য কথা। তাঁহার নিজের জীবনটাতেই নানা কবিতার উপকরণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা কোন দিন ছন্দোবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইল না। ছাত্রস্থানীয় শঙ্করের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বের কারণও এই কবিত্ব প্রীতি। শঙ্করের কবিতা যদিও ছাপা হয় নাই কিন্তু তাহা অপরূপ। তাহার মধ্যে তিনি উদীয়মান কবি-প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন; তাহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া সুখ হয়, তাহার মনের সংস্পর্শে আসিলে নিজের মনের সুর বিচিত্র লীলায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া ওঠে। বয়স এবং সম্পর্কের অনৈক্য সত্ত্বেও তাই শঙ্করের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিয়াছে।

প্রফেসার গুপ্ত তন্ময়চিত্তে শকুন্তলায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, এমন সময় পিওন আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া গেল। পত্রখানি বিলাত হইতে আসিয়াছে, পরিচিত হস্তাক্ষর। প্রফেসার গুপ্তের অধরে মৃদু একটি হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। ইভার চিঠি। সেই ইভা যাহাকে ঘিরিয়া একদিন কত স্বপ্নই না মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল! সে স্বপ্নগুলি আজ কোথায়? লণ্ডনবাসিনী বিপণি-পরিচারিকা ইভার মনেও কি এখনও তাহারা সজীব হইয়া আছে? হয়তো নাই। না থাকুক, কিন্তু এক দিন এই ইভাই তাঁহার প্রবাসজীবন অনন্ত মাধুর্য্যে ভরিয়া দিয়াছিল তাহা সত্য কথা। এক দিন ইহা জীবন্ত সত্য ছিল বলিয়াই আজও পত্রধারায় নির্জ্জীব অভিনয় চালাইতে হইতেছে। ইভাও তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া নাই, তিনিও ইভার ধ্যানে মগ্ন নহেন, চিঠি লেখাটা এখনও তবু চলিতেছে, অতীত জীবনের সেই পরম রমণীয় ভঙ্গুর স্বপ্নটি যদিও আজ ভাঙিয়া গিয়াছে কিন্তু তবু তো তাহা এক দিন ছিল। ইভার ছবিটা মনে ভাসিয়া উঠিল। তাহার নীল চক্ষু দুইটিতে, সোনালি অলকে, রক্তিম অধরে, নীরব বক্ষে এখনও কি সেই মাদকতা আছে? চক্ষু মুদিত করিয়া প্রফেসার গুপ্ত কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া নিমীলিত নয়নে তিনি ইভাকেই দেখিতে লাগিলেন—যে ইভা তাঁহাকে বিবাহিত জানিয়াও প্রত্যাখ্যান করে নাই, যে ইভা সর্ব্বস্ব দিয়াও তাঁহাকে একটু খুশি করিতে পারিলে বর্ত্তিয়া যাইত, সে ইভা কি এখনও বাঁচিয়া আছে? ···প্রফেসার গুপ্ত কেমন যেন তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, মনে হইল তিনি যেন কণ্বমুনির আশ্রমে গিয়াছেন, অদূরে আশ্রমবাসিনী বল্কলবসনা শকুন্তলা দুষ্মন্তের পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু এ কি, শকুন্তলার মুখখানা ঠিক যেন ইভার মতো! এ যে একেবারে অবিকল ইভা!

খুট্ করিয়া একটা শব্দ হইল—স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল।

প্রফেসার গুপ্ত তাড়াতাড়ি টেবিল হইতে মাথা তুলিলেন। সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, অধর দংশন করিয়া একটি তন্বী যুবতী অপরূপ গ্রীবাভঙ্গী করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে—পাশে শঙ্কর দাঁড়াইয়া!

শঙ্কর বলিল, এই অসময়ে ঘুমুচ্ছিলেন না কি?

না, ঘুমুই নি ঠিক, একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল। এসো বসো—ইনি কে, আসুন বসুন।

প্রফেসার গুপ্ত সম্ভ্রমভরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বেলাকে অভ্যর্থনা করিলেন। শঙ্কর পরিচয় করাইয়া দিল।

যথাবিধি নমস্কারান্তে সকলে যথন আসন পরিগ্রহ

করিলেন তখন শঙ্কর বলিল, আপনি মানতুর জন্যে একজন গানের মাস্টার খুঁজছিলেন—ইচ্ছে করলে এঁকে রাখতে পারেন। গান বাজনায় খুব ভাল ইনি!

বেশ তো।

শঙ্কর সংক্ষেপে বেলার পরিচয় দিয়া এবং তাঁহার গৃহত্যাগের কারণ জানাইয়া বলিল, অতিশয় স্বাধীনপ্রকৃতির মহিলা ইনি! কারো গলগ্রহ হয়ে থাকতে চান না, নিজে রোজগার করে নিজের পায়ে দাঁড়াবেন এই এঁর প্রতিজ্ঞা।

প্রফেসার গুপ্ত সোৎসাহে বলিলেন, এ তো খুব ভাল কথা! দেশের যা অবস্থা তাতে মেয়েদের আত্মপ্রত্যয় জাগা খুবই উচিত। খালি গানই শেখান আপনি? পড়াতে পারবেন?

বেলা এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এইবার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, না। খালি গানই শেখাই। পড়াশোনা আমার বেশী দূর নয়, ম্যাট্রিক দিয়েছিলাম, পাশ করতে পারি নি। প্রাইভেটে বাড়িতে পড়ে পরীক্ষা দিয়েছিলাম—হ'ল না!

প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, ম্যাট্রিকটা পাশ করা কি আর এমন শক্ত ব্যাপার, একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যায়।

পড়াশোনায় কোন দিনই বেশী মন নেই আমার। গান বাজনাই বেশী ভাল লাগে, সেইটেই ভাল করে শিখেছি!

সহসা বেলা লক্ষ্য করিলেন, প্রফেসার গুপ্ত অপলক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছেন।

বেলা দৃষ্টি নত করিলেন এবং ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছি, এখন আপনারা একটু সাহায্য না করলে মুস্কিলে পড়ব।

সাহায্য নিশ্চয়ই করব! মাইনে কত চান আপনি?

মাইনে যা হয় দেবেন, আপনার মেয়েকে বেশ ভাল করে গানবাজনা শিখিয়ে দেব আমি! আমার খাওয়া-পরা-থাকার খরচটা চলে গেলেই হ'ল!

বেলা দেবী আবার চক্ষু দুইটি আনত করিলেন।

প্রফেসার গুপ্ত কিছু না বলিয়া বেলার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

শঙ্কর বলিল, কি ভাবছেন?

একটু হাসিয়া গুপ্ত মহাশয় বলিলেন, ভাবব আবার কি!

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রফেসার গুপ্ত পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, আপনি এখন কোথায় আছেন?

শঙ্করই উত্তর দিল, মহৎ আশ্রমে।

হোটেলে থাকা কি বেশী দিন সুবিধে হবে?

বেলা বলিলেন, সে তো অসম্ভব। ঠিক করেছি কোথাও একটা রুম নিয়ে ইক্‌মিকে রেঁধে খাব। কিন্তু তার আগে রোজগারের একটা ঠিকঠাক করতে হবে, সেই অনুপাতেই সব বন্দোবস্ত করতে হবে তো! আরও দু-একটা টিউশনি জোগাড় করতে হবে। করে দেবেন তো শঙ্করবাবু?

দেখব চেষ্টা ক'রে নিশ্চয়ই—বলিয়া শঙ্কর শকুন্তলাটা টানিয়া লইয়া পাতা উলটাইতে লাগিল। সকলেই মিনিট খানেক নীরব হইয়া রহিলেন।

তাহার পর বেলা বলিলেন, আপনার মেয়ে কোথা, ডাকুন না, আলাপ করি একটু।

তারা এখন এখানে কেউ নেই, মামার বাড়ী গেছে। এই কোলকাতাতেই অবশ্য মামার বাড়ি, কালই বোধ হয় আসবে তারা।

আপনার মেয়ের বয়স কত?

বছর বারো হবে।

আগে গান শিখেছিল কারো কাছে?

তেমন কিছু নয়, এমনিই শুনে শুনে যা দু-একটা শিখেছে। তবে গলাটা মিষ্টি, সুর-বোধও আছে বলে মনে হয়, তা ছাড়া বিয়ের বাজারেও গানটা দরকারে লাগবে।

প্রফেসার গুপ্ত একটু হাসিয়া পুনরায় বলিলেন, গোড়াতেই কিন্তু মাইনের ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাওয়া ভাল। আমি টাকা কুড়ির বেশী এখন দিতে পারব না। তবে একটা কাজ আমি করতে পারি; আপাতত আপনার থাকবার ব্যবস্থা একটা আমি ক'রে দিতে পারি। আমার এক বন্ধুর একটা ছোট বাড়ী আমার চার্জে আছে, ভাড়াটে এখনও পর্য্যন্ত জোটে নি। ভাড়াটে যতদিন না জুটছে ততদিন সেটাতে আপনি পুট-আপ করতে পারেন।

বেলা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়িটার ভাড়া কত?

ভাড়া পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। বাড়িটা ভাল।

কোন্ পাড়ায় বাড়িটা?

বাগবাজারে।

বেশ তো, যতদিন ভাড়াটে না জোটে আমিই না হয়

থাকি ; অত না পারি কিছু ভাড়া দেব। আরও গোটা দুই টিউশনি যদি জোগাড় করতে পারি, আমিই না হয় থেকে যাব। কি বলেন শঙ্করবাবু ?

হ্যাঁ।

শঙ্কর অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল। সে শকুন্তলায় নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

তা হ'লে কালই চলে আসুন সে বাড়িটাতে, মিছিমিছি হোটেলে আর পয়সা দিয়ে লাভ কি? দাঁড়ান, চাবিটা এনে দি তা হ'লে আপনাকে !

প্রফেসার গুপ্ত উঠিয়া ভিতরের দিকে গেলেন। কিছুদূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, চা আনতে বলি, কি বলেন ?

শঙ্কর বলিল, বলুন।

প্রফেসার গুপ্ত চলিয়া গেলে শঙ্কর শকুন্তলাটা মুড়িয়া রাখিয়া দিল এবং বেলার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল।

হাসলেন যে ?

এমনি।

আর একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, প্রায় তো নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন দেখছি! আমার বিদায় নেওয়ার সময় আসন্ন হয়ে এল ভেবে দুঃখ হচ্ছে। হাসিটা ছদ্মবেশ মাত্র!

দেখুন, কবিত্বশক্তি ভগবান যতটুকু দিয়েছেন সবটুকু আমার ওপর নিঃশেষ ক'রে ফেলবেন না। রিণি বেচারীও তো আশা ক'রে বসে আছে!

রিণি! রিণির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি ?

সম্বন্ধ নেই বলেই সম্বন্ধ গভীর। সব জানি আমি, বৃথা লুকোচ্ছেন কেন ?

অধর দংশন করিয়া বেলা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

শঙ্কর কিছু বলিল না, কেবল ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিস্ময়ের ভাবটা ফুটাইতে চেষ্টা করিল।

প্রফেসার গুপ্ত চাবি লইয়া প্রবেশ করিলেন ও বলিলেন, এই নিন! আসুন, এইবার একটু গল্প করা যাক!

বেলা বলিলেন, আপনি পড়াশোনা করছিলেন, আপনাকে হয় তো বিরক্ত করছি!

না, না, কিছু না! এসে তো দেখলেন, ঘুমুচ্ছিলাম। আসুন, একটু আড্ডা দেওয়া যাক।

আপনার সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার মতো বিদ্যে আমার নেই—শঙ্করবাবু হয় তো পারবেন!

বেলা দেবী হাসিলেন।

প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, আড্ডা দেওয়ার মধ্যে পাণ্ডিত্যের স্থান কোথায় তা তো বুঝি না! তা ছাড়া—আচ্ছা থাক, এত অল্প পরিচয়ে সে কথাটা বলা ঠিক হবে না।

কি কথা ?

থাক সে পরে বলব কোন দিন, অবশ্য সে দিন যদি আসে।

প্রফেসার গুপ্ত বেলার মুখের পানে চাহিয়া একটু রহস্যময় হাসি হাসিলেন। তাহার পর অন্য কথা পাড়িলেন।

আপনি ম্যাট্রিকটা পাশ ক'রে ফেলুন!

কি আর লাভ হবে তা'তে ?

চাকরি। আপনার পড়বার আমি সুবিধে করে দিতে পারি। ম্যাট্রিকুলেশনটা অন্তত পাশ করা থাকলে অনেক রকম স্কোপ পাওয়া যায়, কি বল শঙ্কর ?

শঙ্কর পুনরায় শকুন্তলাটা উল্টাইতেছিল।

মুখ না তুলিয়াই বলিল, নিশ্চয়।

প্রফেসার গুপ্ত সোৎসাহে বলিতে লাগিলেন, পাশ ক'রে ফেলুন ম্যাট্রিকটা, ম্যাট্রিক পাশ করা কি আর এমন শক্ত ব্যাপার! প্রাইভেটেই দিন আবার!

বেলা কিছু না বলিয়া প্রফেসার গুপ্তের মুখের পানে চাহিয়া শুধু একটু হাসিলেন। ভৃত্য চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল এবং বেলা নিজেই উঠিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

প্রফেসার গুপ্ত চা-পরিবেশনকারিণী বেলার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, আপনাদের এই মূর্ত্তিই কিন্তু সব চেয়ে ভাল লাগে আমার।

ঘাড় ফিরাইয়া বেলা প্রশ্ন করিলেন, কোন্ মূর্ত্তি ?

অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি!

শঙ্কর বলিল, আমার চায়ে একটু বেশী চিনি দেবেন, একটু বেশী মিষ্টি খাই আমি।

বেলা বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, আজ সকালে বলছিলেন—আপনি খুব ঝালেরও ভক্ত! মাংসে ঝাল না হ'লে ভাল লাগে না।

শঙ্কর কিছু না বলিয়া স্মিতমুখে চাহিয়া রহিল।

তিন চামচে দিয়েছি, আর দেব ?

না, ওতেই হবে।

সকলে মিলিয়া গল্প করিতে করিতে চা পান করিতে লাগিলেন।

২৫

ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিয়া গেল। কই, আজও তো মৃন্ময় আসিল না। কোথায় গেল সে? তিন দিন তাহার কোন খবর নাই। জানালার ধারে জনবিরল গলিটার পানে চাহিয়া হাসি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আজ মৃন্ময় নিশ্চয় আসিবে, সে বড় আশা করিয়াছিল। রাত বারোটা বাজিয়া গেল! গুণিতে ভুল হয় নাই তো! সে উঠিয়া গিয়া ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিল, না, ঠিক বারোটাই বাজিয়াছে। আজও কি তাহা হইলে আসিবে না? শুষ্কমুখে হাসি পুনরায় জানালার ধারে আসিয়া বসিল। বড় ভয় করে তাহার! তিন-চার দিন হইতে ডান চোখের পাতাটা এমন নাচিতেছে! তিন দিন পূর্ব্বে এখনই আসিতেছি বলিয়া মৃন্ময় সেই যে বাহির হইয়া গিয়াছে—এখনও পর্য্যন্ত ফেরে নাই। এই তিন দিন হাসি খায় নাই, ঘুমায় নাই, কেবল ঘর আর বাহির করিয়াছে। ঘরের এই জানালাটার ধারে সে সন্ধ্যা হইতে আসিয়া বসিয়া আছে; দেখিতে দেখিতে বারোটা বাজিয়া গেল! ঠাকুরপো'ও তো এখনও পর্য্যন্ত ফিরিল না। ভনুটুবাবুর বাড়ি কতদূর? অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া সহসা হাসির দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, টপ টপ করিয়া কয়েকটা বড় বড় ফোঁটা কপোল বাহিয়া আঁচলের উপর ঝরিয়া পড়িল। তাহার কপালে ভগবান এত দুঃখ লিখিয়াছেন কেন? কি দোষ করিয়াছে সে! অতি শৈশবেই বাপ মা ভাই তাহাকে ফেলিয়া একে একে মরিয়া গেল। সে মরিল না কেন? মরে নাই বোধ হয় মেয়েমানুষ বলিয়া। অফুরন্ত পরমায়ু লইয়া অসীম দুঃখ সহ্য করিতে হইবে যে! মুকুয্যে মশায়ের উপর সহসা হাসির রাগ হইল, কেন তিনি তাহাকে লইয়া গিয়া দূরসম্পর্কের বড়লোক পিসা মহাশয়ের আশ্রয়ে রাখিলেন, কেন তাহাকে অনাহারে মরিয়া যাইতে দিলেন না। সে মরিয়া গেলে কাহার কি ক্ষতি হইত? কাহারও না। এমন তো কত লোক রোজ মরিয়া যাইতেছে! সকলকে কি মুকুয্যে মশাই বাঁচাইতে যাইতেছেন? তাহাকে বাঁচাইতে গেলেন কেন! ছেলেবেলায় সব শেষ হইয়া গেলেই তো ভাল হইত। এখন যে মৃন্ময়কে ছাড়িয়া মরিতেও ইচ্ছা করে না। মরা দূরের কথা, তাহাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতেও কষ্ট হয়। অথচ কপালগুণে এমন একটা চাকরি জুটিয়াছে যে দিনরাত বাহিরে না থাকিলে উপায় নাই। এবারও কি চাকরির কাজেই বাহিরে গিয়াছেন? প্রতিবারই তো যাইবার আগে বলিয়া যান; তা ছাড়া, এখনই ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন যে! হঠাৎ কোন জরুরি দরকারে যদি বাহিরে যাইতেই হয় বাড়ীতে আসিয়া সেটা বলিয়া যাইবারও কি অবসর ছিল না? না, আপিসের কাজ বলিয়া বিশ্বাস হয় না! নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটিয়াছে।

হাসি অন্ধকারে একা একা বসিয়া অকূলপাথার ভাবিতে লাগিল। আগে অনেকবার মনে হইয়াছে, এখন আবার তাহার মনে হইল মৃন্ময় তাহাকে ভালবাসে তো! তাহাকে পাইয়া সুখী হইয়াছে তো! তাহার মাঝে মাঝে কেমন যেন সন্দেহ হয়, মনে হয় কেমন যেন কোথায় কিসের একটা অভাব রহিয়া গিয়াছে, সেটা যে কি তাহা হাসি ধরিতে পারে না। ধরিতে পারে না, কিন্তু অনুভব করে। আর কাহাকেও কি মৃন্ময় ভালবাসে? কাহাকে? কেমন দেখিতে সে মেয়েটি? সহসা হাসির মনে হইল, ছি ছি, সে এ কি করিতেছে। স্বামীর সম্বন্ধে এ সব কথা চিন্তা করাও পাপ। তিনি ভাল হোন, মন্দ হোন, সে সমালোচনা করিবার অধিকার আমার নাই। তাঁহাকে পাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে ইহাই কি আমার মত অভাগিনীর পক্ষে যথেষ্ট নয়? আমিই কি আমার স্বামীর যোগ্য? অমন সুন্দর সুপুরুষ বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্যক্তির সহধর্ম্মিণী হইবার মত কি যোগ্যতা আছে আমার!

অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আবার তাহার চক্ষু দুইটি অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। চোখের পাতা উপছাইয়া গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, সে মুছিবার চেষ্টা করিল না। পাথরের মূর্ত্তির মত স্থিরভাবে বসিয়া রহিল।

সঙ্কীর্ণ গলিটা রাত্রে একেবারে নির্জ্জন। কোথাও কাহারও সাড়া নাই, সকলেই ঘুমাইতেছে।...সহসা পদশব্দ শোনা গেল। ওই যে চিন্ময় আর ভনুটুবাবুর গলার স্বর

শোনা যাইতেছে। আরও কে যেন একজন সঙ্গে রহিয়াছেন, গলার স্বরটা হাসির ঠিক চেনা নয়।

ভনুটু, চিন্ময় এবং শঙ্কর বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। হাসি যে এত রাত্রে বৈঠকখানায় আসিয়া রাস্তার ধারের জানালায় বসিয়া থাকিতে পারে চিন্ময় তাহা কল্পনা করিতে পারে নাই। সুতরাং কোনরূপ সাবধানতার প্রয়োজন সে অনুভব করিল না। অসঙ্কোচেই ভনুটুকে সম্বোধন করিয়া বলিল—ভনুটুদা, বৌদিকে কি বলবেন এখনই ঠিক ক'রে নিন; দাদা যে ক্যাম্বেল হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন এ কথা তো বৌদিকে বলা চলবে না!

হাসি রুদ্ধশ্বাসে শুনিতে লাগিল।

ভনুটু বলিল, সে আমি সামলে নেব।

কি বলবেন?

শঙ্কর, বল্ না কি করা যায়, তুই তো মিথ্যে কথার গুরুমশাই একটি!

শঙ্কর মৃদু হাসিয়া বলিল, সত্যি কথাটা বললে ক্ষতি কি!

ভনুটু মুখটি সূচালো করিয়া কয়েক সেকেণ্ড শঙ্করের দিকে চাহিয়া রহিল এবং মুখটি সূচালো করিয়া রাখিয়াই উচ্চারণ করিল, সত্যি কথা!

তাহার পর সহজভাবে বলিল, বাপের টাকায় মজাসে হস্টেলে আছিস—সত্যি মিথ্যের হদিস্ তুই কি বুঝবি!

চিন্ময় বলিল, না শঙ্করবাবু—সত্যি কথা বললে বৌদি ভয়ানক কান্নাকাটি করবেন, এমনিই না খেয়ে আছেন ক'দিন থেকে!

ভনুটু বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, সে সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি আমি। ওর কথা শুনছিস কেন তুই? কড়া নাড়্, বারোটা বাজে, ফিরতে হবে তো আবার।

তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, সত্যি ফত্যি ভুলে যা—দাব্‌কে ঢোক গিলে যা! রাস্তায় চলতে গেলে যেমন গায়ে ধুলো লাগবেই, সংসার করতে গেলে তেমনি ক্রমাগত মিথ্যে বলতে হবে। মিথ্যের হরির লুট দিতে দিতে যেতে পারলে আরও ভাল হয়।

হাসি আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, কপাট খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ওঁর কি হয়েছে বল না ঠাকুরপো, হাঁসপাতালে অজ্ঞান হয়ে আছেন উনি! আমার কাছে লুকিয়ো না কিছু লক্ষ্মীটি, শিগ্‌গির বল কি হয়েছে!

হাসির কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল। অপরিচিত শঙ্কর এবং স্বল্প-পরিচিত ভনুটুকে দেখিয়া সহজ অবস্থায় সে হয় তো ঘোমটা দিত, এখন কিছুই করিল না।

বলা বাহুল্য সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

চিন্ময় বলিল, চল ভেতরে চল, সব বলছি।

না, আগে বল তুমি।

সে অনেক কথা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি বলা যায়। ভেতরে চল বলছি সব।

সকলে ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

চিন্ময় শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, শঙ্করবাবু, আপনি একটু বাইরের ঘরটায় বসুন, আমরা আসছি এখনি। আসুন ভনুটুদা!

ভনুটু, চিন্ময় ও হাসি ভিতরে চলিয়া গেল। শঙ্কর বাহিরের ঘরের চেয়ারটায় বসিয়া রহিল। সে বেলাকে মহৎ আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়া হস্টেলে ফিরিতেছিল, এমন সময়ে পথে ভনুটুর সহিত দেখা। ভনুটুর সহিত চিন্ময়ও ছিল। ভনুটুর মুখেই শঙ্কর শুনিল যে, গত তিন দিন যাবৎ মোমবাতির কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এখন জানা গিয়াছে যে, সে ক্যাম্বেল হাসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায় রহিয়াছে। একটা দ্রুতগামী ট্যাক্সি তাহাকে নাকি চাপা দিয়াছে। ভনুটুর আগ্রহাতিশয্যে সে হস্টেল হইতে ছুটি লইয়া সেই হইতে ইহাদের সঙ্গে ঘুরিতেছে। রিণির কাছে যাইবার কথা ছিল, সেখানেও যাওয়া হয় নাই। তাহা ছাড়া আর একটা কর্ত্তব্যও এখন পর্য্যন্ত অসমাপ্ত রহিয়াছে। বাপ একটা বাড়ী ভাড়া করিতে বলিয়াছিলেন তাহার এখনও কিছুই করা হয় নাই। বেলা এবং ভনুটুর পাল্লায় পড়িয়া সমস্ত সন্ধ্যাটাই তাহার মাটি হইয়া গিয়াছে। অথচ ইহাদের সঙ্গ এত লোভনীয় যে, জোর করিয়া চলিয়া যাইতেও ইচ্ছা হয় না। যাই হোক, কাল সকালে উঠিয়াই প্রথমে রিণির ওখানে যাইতে হইবে এবং যেমন করিয়া হোক একটা বাড়ীর সন্ধান করিতে হইবে। সহসা তাহার মৃন্ময়ের মুখখানা মনে পড়িল, ভনুটু ও চিন্ময়ের সঙ্গে সে-ও হাসপাতালে গিয়াছিল। অচেতন মৃন্ময় চক্ষু বুজিয়া

শুইয়াছিল, প্রশান্ত মুখখানায় কেমন যেন একটা আত্ম-সমাহিত ভাব। সেদিন রাত্রের সেই চিঠিখানার কথাও মনে পড়িল। চিঠিটা এখনও তাহার কাছে আছে। সেদিন রাত্রে ঘরে এই মেয়েটিই তো ছিল। স্বর্ণলতা তাহা হইলে কে! ভীম জাল!

ভনটু আসিয়া প্রবেশ করিল।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি হ'ল?

ভীমজাল টু দি পাওয়ার এন্।

মানে?

মানে, খুজবুজ হাসপাতালে যেতে চাইছে!

খুজবুজ কে?

মোমবাতির বউ! বলছে আমি শুধু একটিবার নিজের চোখে দেখতে চাই তাকে! ভয়ানক উইপিং আপিস খুলেছে!

শঙ্কর বলিল, এত রাত্রে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব?

সেখানে ঢুকতে দেবে কি?

আমাদের পাড়ার ধীরেন ডাক্তার চেষ্টা করলে করতে পারে ব্যবস্থা। ইচ্ছে করলে সে সব করতে পারে, কারণ রিয়েলি সে চাম লজ্! চল যাই।

কোথায়?

ধীরেন ডাক্তারের কাছে।

আমাকে আবার টান্‌চিস কেন ভাই?

উত্তরে ভনটু শুধু মুখবিকৃতি করিল।

প্রভাত হইবার আর বেশী বিলম্ব নাই।

শঙ্কর একা দ্রুতপদে পথ অতিবাহন করিতেছিল। সে ক্যাম্বেল হাসপাতাল হইতে ফিরিতেছিল। হাসিকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে লইয়া যাইতে হইয়াছিল এবং অসময়ে রোগীর কাছে যাইবার অনুমতি সংগ্রহের জন্য কম বেগ পাইতে হয় নাই। অনেক বলা-কহার পরে তবে অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। হাসি গিয়া মৃন্ময়ের শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছে এবং এখনও সেখানে বসিয়া আছে, কিছুতেই তাহাকে সেখান হইতে নড়ানো যাইতেছে না। এখন হাসি যাহাতে সেখানে থাকিতে পায় নিরুপায় ভনটু অগত্যা নানাভাবে সেই তদ্বির করিতেছে।

ভনটুর সঙ্গে চিন্ময়ও আছে। শঙ্কর কিন্তু আর সেখানে থাকিতে পারিল না। বেদনাতুর হাসির অশ্রু-ছলছল মুখখানি শঙ্করকে কেমন যেন উন্মনা করিয়া দিল। শঙ্কর কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপিচুপি রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

বহুক্ষণ হাঁটিবার পর সে যখন রিণিদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন ভোরের মৃদু আলো ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে। রাস্তা হইতে বাড়ীটা দেখা যায়, শঙ্কর বাড়ীটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে গেটের নিকট গিয়া দেখিল গেট ভিতর হইতে তালা বন্ধ। শঙ্কর বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এভাবে এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাটা যে অশোভন সে চেতনাও তখন তাহার ছিল না। সে অপলকদৃষ্টিতে বাড়ীটার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা দ্বিতলের একটি বাতায়ন খুলিয়া গেল এবং শঙ্কর সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে রিণি দাঁড়াইয়া আছে।

কেহ কোন কথা বলিল না। নির্নিমেষ শঙ্কর ও নিস্পন্দ রিণির মধ্যে তালাবদ্ধ লোহার গেটটা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

২৬

রাস্তাটি খুব বড় নহে, গলি বলিলেই চলে, বাড়ীটি কিন্তু প্রকাণ্ড। রাত্রি গভীর হইয়াছে। একটি প্রকাণ্ড দামী মোটরকার নিঃশব্দে আসিয়া বাড়ীটার সম্মুখে থামিল। মোটরের দালাল অচিনবাবু গাড়ি হইতে নামিলেন। গাড়িতে আর কেহ ছিল না। গাড়ি হইতে নামিয়া অচিন-বাবু একবার ভাল করিয়া চতুর্দ্দিক দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন কেহ কোথাও নাই। তখন তিনি ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড বাড়ীটার বন্ধ দরজার উপরে চারিটি টোকা দিলেন। টোকা দিবার মধ্যেও একটু কায়দা ছিল। প্রথম দুইটি টোকা ঘন ঘন এবং শেষ দুইটি বেশ দেরি করিয়া করিয়া। দরজা নিঃশব্দে খুলিয়া গেল, কিন্তু নিষ্কাশিত-অসি বিরাটকায় এক পাঠান আসিয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। অচিনবাবু তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে মণিব্যাগ বাহির করিয়া একটি টাকা, একটি আধুলি, একটি সিকি এবং একটি দুয়ানি তাহার হস্তে দিলেন। পাঠান পকেট হইতে একটি টর্চ

বাহির করিয়া মুদ্রাগুলি উল্টাইয়া প্রত্যেকটির সাল দেখিতে লাগিল। তাহার পর মুদ্রাগুলি ফেরত দিয়া স-সম্ভ্রমে সেলাম করিয়া একটি ইলেক্‌ট্রিক্ বেল টিপিল। সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির আলোটা জ্বলিয়া উঠিল এবং অচিনবাবু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে উপরে উঠিয়া গেলেন। উপরে যে ঘরে গিয়া তিনি হাজির হইলেন সেই ঘরের একটি কোণে বিস্তৃত ফরাসের উপর সর্ব্বাঙ্গে দামী শাল জড়াইয়া একটি বৃদ্ধ বসিয়াছিলেন। অচিনবাবুকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, আপনার কাজ হয়ে গেছে, তিনখানা কারের অর্ডার দিয়েছেন মালিক। একখানা নিজের জন্যে, একটা জামাইবাবুর, আর একখানা যাবে স্টেটের ম্যানেজারের ওখানে। তার পর সে ছোকরার খবর কি ?

এখনও মরে নি, হাসপাতালে রয়েছে শুনলাম, এ যাত্রা বেঁচে গেল বোধ হয় !

ড্রাইভারটা কিন্তু ধরা পড়েছে শুনলাম ?

হ্যাঁ, তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

বৃদ্ধ বলিলেন, এ ঠিক সেই ছোকরাই তো, মৃন্ময়বাবু না কি নাম বলছিলেন ? ভুলে কোন লোককে আবার চাপা দিলে না তো !

অচিনবাবু বলিলেন, না, না আমি নিজে তার ফোটো তুলে নিয়েছি, নিজে সেই ড্রাইভারকে ফোটো দিয়েছি, তা ছাড়া মৃন্ময়বাবুকে দেখিয়েও দিয়েছি একদিন। ভুল হয় নি।

একটু থামিয়া অচিনবাবু বলিলেন, ড্রাইভারটাকে কিন্তু বাঁচাতে হবে। আপনারই কথা মত তাকে আমি আশ্বাস দিয়েছিলাম যে, টাকা দিয়ে যা করা সম্ভব—তা আমরা করব তাকে বাঁচাবার জন্যে।

নিশ্চয় ! এ সব ব্যাপারে ঢালা হুকুম আছে কর্ত্তার। উকিল-টুকিল ব্যবস্থা করে দিন। ফাইন হয় দেব আমরা। জেল হয় তার পরিবারের ভরণপোষণের খরচা ছাড়াও কমপেনসেশন দেব। ওর জন্যে কোন ভাবনা নেই। কত টাকা চাই বলুন না।

শ পাঁচেক এখনই দরকার।

ভদ্রলোক উঠিয়া পড়িলেন ও দেয়ালে পোতা একটা লোহার সিন্দুক খুলিয়া পাঁচ শত টাকার নোট বাহির করিয়া আনিয়া অচিনবাবুর হস্তে দিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, নতুন মাল কবে দিচ্ছেন ? কর্ত্তা যে ক্ষেপে উঠেছেন একেবারে !

অচিনবাবু বলিলেন, শিক্ষয়িত্রীর জন্যে বিজ্ঞাপন তো দিয়েছি একটা, সুবিধে মত পেলে হাজির করে দেব।

হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি যা হয় করুন একটা।

সর্ব্বদাই চেষ্টায় আছি। আচ্ছা, এবার চলি আমি, ব্যবস্থা করতে হবে অনেক !

আসুন তা হ'লে !

অচিনবাবু উঠিয়া পড়িলেন ও যথাবিহিত নমস্কারান্তে নামিয়া আসিলেন। বাহির হইবার সময় কোনরূপ বেগ পাইতে হইল না। মোটরে চড়িয়া স্টিয়ারিং ধরিয়া মিনিটখানেক কি যেন ভাবিলেন। ভাসা-ভাসা চক্ষু দুইটিতে অতি মৃদু চাপা একটি হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর মোটরে স্টার্ট দিয়া নিঃশব্দগতিতে গলি হইতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

অচিনবাবু চলিয়া গেলে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি উঠিয়া গিয়া দেওয়ালে লাগানো একটি বোতাম টিপিলেন। প্রকাণ্ড বাড়ীটার দ্বিতলের সুদূর একটা অংশে ইলেকট্রিক বেল ঝনৎকার দিয়া উঠিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলিষ্ঠ গ্যাঁট্টাগোঁট্টা গোছের একটা লোক আসিয়া দ্বারপথে উঁকি মারিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, নিয়ে আয় এবার।

লোকটি চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে আরও দুইজন লোকের সাহায্যে একটি অজ্ঞান যুবতীর দেহ বহন করিয়া আনিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে ফরাসের উপর শোয়াইয়া দিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

কতক্ষণ বাদে এর জ্ঞান হবে, ডাক্তার বলেছে কিছু ?

গ্যাঁট্টাগোঁট্টা লোকটি উত্তর দিল, ঘণ্টা দুই বাদে।

কিছু খাওয়ানো হয়েছে ?

গ্লুকোজ না কি একটা ইন্‌জেকশন্ দিয়েছেন, বলেছেন, আজ রাত্রে আর খাওয়াবার দরকার নেই কিছু।

আচ্ছা, যা তোরা—এখন কর্ত্তার পছন্দ হ'লে হয় ! জ্বালা এক চাকরি হয়েছে আমার ! তোরা সব বাড়ী চলে যা, ওই পাঠানটাকেও বাড়ী যেতে বল্। কর্ত্তা আজ আসবেন।

আচ্ছা হুজুর।

ভৃত্য তিনজন বাহির হইয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধ উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহাদের পদশব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল, একটু পরে আর শোনা গেল না। বৃদ্ধ তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শালখানা অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িল, কুব্জ দেহটাকে যথাসম্ভব উন্নত করিয়া কিছুক্ষণ মেয়েটির দিকে তিনি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, বলিরেখাঙ্কিত মুখমণ্ডলে পাশবিক ক্ষুধা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল, লুব্ধ চাহনি অচেতন মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গ যেন লেহন করিয়া ফিরিতে লাগিল, নিশ্বাসের গতি-বেগ বাড়িয়া গেল। মেয়েটির দিকে কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া সহসা তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ নাই সকলে চলিয়া গিয়াছে। বাহিরের কপাটটা বন্ধ করিয়া চকিত দৃষ্টি মেলিয়া তিনি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। না, কেহ কোথাও নাই। ত্বরিতপদে আবার তিনি উপরে উঠিয়া আসিলেন। মেয়েটি এখনও অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে। একবার সে দিকে চাহিয়া আলমারি হইতে কয়েকটা বড়ি বাহির করিয়া কি একটা আরক সহযোগে সেগুলি গলাধঃ-করণ করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর শাল মুড়ি দিয়া বসিলেন এবং অপলকদৃষ্টিতে মেয়েটির পানে চাহিয়া রহিলেন।

পূর্ব্বপুরুষ বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন; টাকা দিয়া যাহা সম্ভব সব হইতেছে এবং দেখা যাইতেছে সবই বোধ হয় সম্ভব। এমন কি, সুনামটি পর্য্যন্ত বজায় আছে। চাকর বাকর পর্য্যন্ত জানে যে কোন অজ্ঞাত লম্পটের জন্য এই সব আয়োজন, এই বৃদ্ধ তাহাদেরই মত বেতনভুক একজন ভৃত্য মাত্র। বৃদ্ধ যে নিজেই কর্ত্তা, একথা বৃদ্ধ ছাড়া আর কেহ জানে না।

নির্নিমেষ নয়নে বৃদ্ধ সংজ্ঞাহীন নারীর দেহটার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে শিকারলুব্ধ বৃদ্ধ অজগরের লোলুপতা মূর্ত্ত উঠিতে লাগিল।

২৭

রাত্রি গভীর হইয়াছে।

ছেলেমেয়েরা সকলে ঘুমাইতেছে, নিশাচর ভন্টুও এই কিছুক্ষণ আগে আসিয়া খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়াছে এবং দালানে শুইয়া নাক ডাকাইতেছে। বাকু এখনও ওঠেন নাই, যদিও উঠিবার আর বেশি দেরিও নাই। ভন্টুর বৌদি ধীরে ধীরে বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন, আস্তে আস্তে নিজের তোরঙ্গটির নিকট গেলেন এবং অতি সন্তর্পণে তোরঙ্গের চাবি খুলিলেন। তাহার পর তোরঙ্গের ভিতর হইতে কতকগুলি রঙীন চিঠির কাগজ বাহির করিলেন। মার্জ্জিতরুচি কোন লোকের চোখে কাগজগুলি হয় তো তেমন সুদৃশ্য বলিয়া মনে হইবে না, বৌদিদির নিকট উহাই কিন্তু যথেষ্ট সুন্দর। স্বামী যাইবার সময় কিনিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। কাগজ বাহির করিয়া বৌদিদি ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, শনটুটা দোয়াত কলম যে কোথায় ফেলে তাহার ঠিক নাই। ঠাকুরপোর কাছে এত মার খায়, তবু ছেলেটার স্বভাব বদলাইল না। ঘরের কোণের কমানো বাতিটি আস্তে উস্‌কাইয়া দিয়া সেটি হাতে করিয়া লইয়া বৌদিদি সন্তর্পণে ঘরের তাকগুলি খুঁজিতে লাগিলেন। ভাগ্যক্রমে দোয়াত কলম তাকেই ছিল, মিলিয়া গেল। বৌদিদি প্রসন্নমুখে ঘরের মেঝেতে ছেঁড়া মাদুরটি বিছাইয়া তাহার উপর বসিলেন এবং আলোটি কাছে সরাইয়া আনিয়া অতিশয় নিবিষ্টচিত্তে প্রবাসী স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিলেন। কলমের নিবটা ভাল নয়, কাগজ অতি সাধারণ, দোয়াতের কালি জলবৎ। বৌদিদির চিঠির ভাষাও উচ্চাঙ্গের নহে। বানান ভুল অজস্র হইতেছে। তথাপি কিন্তু এই নিস্তব্ধ মধ্যরাত্রে চুরি করিয়া স্বামীকে চিঠি লেখার মধ্যে যে মাধুর্য্য, যে মহিমা, স্পন্দিত বিরহের যে আকুতি বৌদিদির গোলগাল কালো মুখমণ্ডলকে খণ্ডিত করিয়াছে তাহা তুচ্ছ করিবার নহে। স্বল্পালোকিত ঘরে ছিন্ন মাদুরের উপর উপুড় হইয়া বৌদিদি দীর্ঘ একখানি পত্র লিখিয়া ফেলিলেন। পত্র লেখা শেষ করিয়া পত্রখানি আর একবার পড়িলেন, পুনশ্চ দিয়া আবার খানিকটা কি লিখিলেন, অবশেষে খামের মধ্যে পত্রটি পুরিয়া শিরোনামা লিখিয়া সেটি বিছানার নীচে রাখিয়া দিলেন।

তাহার পর প্রাচীর বিলম্বিত জগদ্ধাত্রীর ছবিটির নিকট গিয়া গলায় আঁচল দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন। অনেকক্ষণ পরে যখন মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার চোখে অশ্রুবিন্দু টলমল করিতেছে।

পাশের বাড়ির ঘড়িতে টং করিয়া একটা বাজিল।

ক্রমশঃ

শিকারের প্রথম পাঠ : রামনগর

শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত

রামনগরের ক্যাম্প লাইফ আমাদের চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। রামনগর পালামৌ জিলার এক অরণ্যময় অঞ্চল। এখানে রেল লাইন নেই, বাস নেই, অন্য কোন প্রকার যানবাহনে যাতায়াতের রাস্তাও দুর্গম। এর কারণ, শিকার ছাড়া এখানকার স্থানীয় বিশেষ কোন আকর্ষণ নাই। এই অরণ্য-উপকণ্ঠের অধিবাসিগণ যে জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত, তাহা এখন ওয়ার্ডস্ স্টেটের অধীন। কোন এক সময় এখানে একটি কাছারি-বাড়ী নির্ম্মিত হ'য়েছিল। আজ এ কাছারি জীর্ণ, এর কক্ষগুলি অন্ধকার। চারিদিকে প্রাচীরের চুণ বালিও খ'সে প'ড়েছে। জানোয়ার অধ্যুসিত অরণ্যের প্রান্তভাগে এই জীর্ণ বাড়ী আজ আমাদের চোখে অপরূপ। এর কক্ষগুলি রহস্যের আগার। এই বাড়ীতেই আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে। দশক্রোশ দূর ডালটনগঞ্জ থেকে অসংখ্য কুলীর মাথায় এসেছে আমাদের জন্য খাটিয়া, টেবিল, চেয়ার, আলনা, আরও কত কি। জঙ্গল কেটে পাথর ভেঙ্গে একটি রাস্তাও তৈরী হ'য়েছে। এই রাস্তায় আমাদের মোটর আসবে। দুখানা মোটরে আমরা কয়েকজন বন্ধু ও বান্ধবী, আর বাকী দুখানা মোটরে বাক্স, পেটারা, বিছানাপত্র, চাকর-বাকর ও খাদ্যদ্রব্য রওয়ানা হ'ল।

এই দুর্গম পাহাড়-পথে অপরিসর রাস্তায় সেবারের মোটরযাত্রা আমরা কখনও ভুলব না। তখনও শিকারের তেমন কোন অভিজ্ঞতা নাই, তবু আমাদের আগ্রহ অসাধারণ। গাড়ী চলেছে পাঁচ মাইল স্পীডে। কোথাও শম্বর কোথাও চিত্র-হরিণ দাঁড়িয়ে আছে, তাই দেখতে পেয়ে আমাদের উত্তেজনার সীমা নাই। বন্ধু ডাক্তার চৌধুরী আদেশ করলেন, ব্যাঘ্র-শিকার আমাদের লক্ষ্য, রাস্তায় হরিণের উপর গুলি চালিয়ে জানোয়ারদের চকিত করা হবে। প্রচুর উত্তেজনা সত্ত্বেও আমরা এই সংযত বন্ধুর নির্দ্দেশ মেনে নিলাম।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি। অরণ্যে তখনও ঝরাপাতার খেলা চলেছে। কোথাও বা বিচিত্র বর্ণের কচি পাতার সমারোহ। চারিদিকে অজস্র নাম-না-জানা বনফুল আর তার মৃদু মিষ্ট গন্ধ। আবহাওয়া মনোরম। শীতের প্রকোপ নেই। রৌদ্রও প্রখর নয়। অথবা বৃক্ষবহুল এই অরণ্য-প্রদেশে সূর্য্যের তাপ তেমন অনুভূত হয় না।

ক্যাম্পে যখন আমাদের গাড়ী পৌঁচেছে তখন বেলা দশটা। আহার্য্যের প্রচুর আয়োজন দেখে আমাদের শিকারের উৎসাহ বেড়ে গেছে। চাল, দাল, ঘি, তরকারী, মাংস, দুধ—সব জিনিষই প্রচুর। দক্ষ পাচক ভৃত্যেরও অভাব ছিল না। বান্ধবীদের স্নেহ যত্ন আরও মধুর।

সদর কাছারির বাহিরের আঙ্গিনায় দুইটি হাতী আমাদের জঙ্গলে নিয়ে যেতে প্রস্তুত হ'য়ে আছে। আর জঙ্গল পিটিয়ে (beat ক'রে) জানোয়ার মাচার সম্মুখে এনে দেওয়ার জন্য মজুত হ'য়েছে প্রায় দেড়শতাধিক অর্দ্ধনগ্ন মানুষ। এই মানুষদের অধিকাংশই অনাহারে শীর্ণ। পেট পিলের ভরা। রং প্রায় সকলেরই ঘোরতর কালো। মিঃ সেন—যিনি আমাদের জন্য এই শিকার-আয়োজন করেছিলেন তাঁর কাছে এই অপগণ্ড মানুষগুলির জীবনের যে মূল্য স্থির করা হয়েছে তা শুনে অবাক হলাম। বীট করতে বেরিয়ে যে বাঘের আক্রমণে জখম হবে সে দশ টাকা, আর যে প্রাণ হারাবে তার পরিবারকে দিতে হবে পঞ্চাশ টাকা। বীট করার সমস্ত দিনের মজুরীও যৎসামান্য। কিন্তু বীটারদের উৎসাহের সীমা নাই। শম্বর, শূয়োর বা নীল গাই মারা গেলে এরা একদিন পেট পুরে খেতে পাবে। জঙ্গলে বাস ক'রেও অন্যথা এদের মাংস ভোজন হয় না।

আমরা নূতন শিকারী। মাচায় শিকারের অভিজ্ঞতা তখনও আমাদের নেই বললেই চলে। বাঘ ছুটে বেরিয়ে এলে আমরা ভয়ে অজ্ঞান হ'য়ে যেতে পারি, সেন সাহেবের এই জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। কিন্তু আমাদের অদম্য উৎসাহের সম্মান তাকে দিতেই হবে। নইলে ছাড়ে কে?

বাঘ-শিকার সম্বন্ধে আমাদের অনেক উপদেশ দিলেন। দূরে বাঘ দেখতে পেলে হঠাৎ গুলি চালিও না। তাকে কাছে আসতে দিও। দূরের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। অথবা

বাঘ জখম হ'লেও মরবে না। আহত বাঘ বীটারদের পক্ষে বিপজ্জনক। মাচার শিকারীরাও নিরাপদ নহে। বাঘ কাছে এলে যদি সে আমাদের দেখতে পায়—নড়াচড়া করব না। পাথরের মূর্ত্তির মত ব'সে থাকা। পলকও না পড়ে। এতটুকু নড়াচড়া বা বন্দুক তুলতে যাওয়ায় সমূহ বিপদ। এমন নিশ্চল হয়ে থাকতে হবে, যাতে বাঘ মনে করে মাচায় প্রথমে দেখে যা অদ্ভুত মনে হয়েছে ওটা চোখের ভ্রান্তি, আসলে কিছু নয়। বাঘ নাক-বরাবর সোজা চ'লে এলে আমাদের দেখতে না পেলেও গুলি করতে হবে না; গুলি খেয়েই বাঘ সম্মুখের দিকে লাফ দেয়। সেই উল্লম্ফনে আমাদের জীবনান্ত হ'তে পারে।

বাঘ অন্য দিকে মুখ ক'রে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে এই অবস্থায় গুলি চ'লবে, কিন্তু মনে রাখতে হবে—দু-একটি গুলি বাঘের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যাকে আপাতদৃষ্টিতে মৃত ব'লে মনে হয়েছে, এমনি নিশ্চল আহত বাঘ মুহূর্ত্তে লাফিয়ে উঠে কত জঙ্গলে কত লোকের প্রাণহানি করেছে তার ইয়ত্তা নাই।

মাচায় ব'সে সিগারেট চলবে না; নস্যি নয়, মশার কামড় পোকার উপদ্রব উপেক্ষা করতে হবে। পোষাকে কোন গন্ধদ্রব্য থাকবে না, মাথায়ও নয়। খাকী ছাড়া সাদা লাল হ'লদে কোন রং চ'লবে না। রুমালও খাকী হওয়া চাই, গুলির থ'লেটাও; হাঁচি কাসি দমন করতে হবে। এক কথায়, কোন শব্দই চলবে না। আমাদের শিকার শিক্ষার প্রথম পাঠ এই। মনে মনে ভাবলাম—এ ভালই হ'ল। এত সংযম শিখলে সন্ন্যাসের শিক্ষাটাও পোক্ত হবে। 'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ' যদি করতেই হয়, তার গোড়াপত্তন এইখানেই ক'রে নেওয়া যাবে। সে বয়সে বনে এলে সন্ন্যাসও হবে, শিকারও হবে। শিকারে গেরুয়া চলবে না এই যা তফাৎ। এই প্রসঙ্গে আর একটা বড় সমস্যার সমাধানও বুঝি পাওয়া গেল। বনে মুনি ঋষিদের বাঘে খেয়েছে এমন কথা ত শুনিনি। মাংসে বাঘের তখন অরুচি ছিল কি? আজ ব্যাপারটা স্পষ্ট হচ্ছে। বাঘ দেখলে মুনিরা ধ্যানস্থ হতেন। ধ্যানস্থ হ'লে বাঘের ভ্রান্তি জন্মে, চোখে যেটা দেখতে পাচ্ছে সেটা আসলে কিছু নয় ভেবে 'বিষয়ান্তর' সন্ধান করত।

অনেক কিছুই শিখে নিয়ে শিকারীর পোষাক পরা গেল। ব্রিচেস খাকী মোজা আর মিলিটারী শার্ট। হাতে বন্দুক, গলায় পৈতার আকারে চামড়ার বেল্টে টোটা।

মহিলারাও সঙ্গে যাবেন। সাবিত্রী সেকালে যমের হস্ত থেকে সত্যবানকে ফিরিয়ে এনেছিল। আমাদের কলিকালের সতীরা বাঘের কবল থেকে আমাদের ফিরিয়ে আনতে পারবে না! আমার সাবিত্রী আমার অবিচ্ছিন্ন সঙ্গী। তাঁকে যেতেই হবে। অন্য মহিলারাও প্রস্তুত হ'লেন। হাতীর আড়ম্বরটা তাঁদের আকৃষ্ট করেছে কম নয়। আমাদের সেন সাহেব মহিলাদের অভিপ্রায় জেনে আতঙ্কিত হ'লেন। শিকারের সম্ভাবিত বিপদ বুঝিয়ে দিতে তাঁর প্রাণান্ত হ'ল। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে কয়েকটা উপদেশ দিলেন।

পরিশেষে বললেন—তাঁর উপদেশ স্মরণ রাখলে মহিলারা মাচায় বসতে পারেন, কিন্তু বাঘ জখম হ'লে বিপদ হ'তে পারে। গুলিবিদ্ধ বাঘের লম্ফ ও গর্জ্জন এতই ভয়াবহ যে মহিলারা অজ্ঞান হ'য়ে যেতে পারেন। তখন কে কাকে দেখে! আর একটা কথা বললেন—ভালুক বেরোলে মাচায় ওঠার মইখানা যেন সরিয়ে নেওয়া হয়। টেনে মাচায় তুলে রেখে দেওয়া যায়, কিম্বা পায়ে ঠেলে মাটিতে গড়িয়ে দিলেও চলে।

আমাদের প্রথম নম্বর মাচা হ'ল হস্তীপৃষ্ঠ। হাতীকে বৈঠ্ বলে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। তার পর হাতীর পাহাড় প্রমাণ পেটের সঙ্গে একটি মই লাগিয়ে দিল। প্রথমে সাবিত্রীরা বহু আয়াসে হাতীর পিঠের গদীতে আসন নিয়ে গদিবাঁধা মোটা দড়ি ধ'রে ন্যুব্জ হ'য়ে বসলেন। তার পরে উঠলাম আমরা শিকারীত্রয়। হাতীর পিঠে হেলে দুলে জঙ্গলের রাস্তা অতিক্রম ক'রে যাচ্ছি—আমাদের আনন্দের সীমা নেই। চারিদিকে ঘন অরণ্য। কোন বনে গাছে পাতা নেই। পত্রহীন গাছগুলি পদাতিকের মত শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোন অরণ্য পত্রশ্যামল। পাখীর কূজনে মুখরিত। কত বিচিত্র তাদের বুলি—বিচিত্র কলরব। কোথাও লতার গায়ে দুলছে স্তবকে স্তবকে ফুল। কোন ফুল শ্বেত শুভ্র, কোন ফুল বা নীল। কোথাও পলাশ বন। পাতাগুলি ঝ'রে গেছে, কিংশুকের পর্য্যাপ্ত লালফুলে করছে হোলির উৎসব। সহসা মনে হ'ল—কাল হোলি। পলাশ বনে তারই রং লেগেছে।

হাতী চ'লেছে হেলে দুলে। পথে কাঁটা গাছ দেখ্‌লে মাহুত বল্‌ছে—মাল ঠোক্কর। আর হাতী শুঁড় দিয়ে তাই উপড়ে ফেলে দিচ্ছে। হাতীর পা সুকোমল গদীর মত। কাঁটা পায়ে ফুট্‌লে তার কষ্টের অবধি থাকে না। তাই কাঁটা দেখলে মাহুত হাতীকে সাবধান ক'রে দিচ্ছে। গাছের শাখাপ্রশাখা আমাদের চোখে মুখে আঘাত করবে, মাহুত হাতীকে বলছে—ধর! হাতী শুঁড়ে ক'রে টেনে তাই ভেঙে দিচ্ছে। কখনও আমাদের শিকারের উত্তেজনা বেড়ে উঠছে—অগ্রবর্ত্তী হাতীর উপর থেকে দলপতির হাতের ইসারায়। 'চুপ্‌ চুপ্‌, একটা জানোয়ার দেখা যাচ্ছে।' বন্দুকে গুলি পুরে নিতেই শুন্‌তে পাই—'পালিয়ে গেছে!' প্রায়ই হরিণ দেখা যেত। কিন্তু ইসারা পেলেই ভাবতাম বুঝি বাঘ। হয়ত এম্‌নি রাস্তাতেই বাঘ দেখা যাবে। এ জঙ্গলে বাঘ না দেখাই ত আশ্চর্য্য। মহিলারা প্রথমে হাতীর পিঠে চড়তে যতটা অপটু মনে হ'য়েছিল—এখন আর তা মনে হচ্ছে না। জঙ্গলের শোভা তাঁদের আকৃষ্ট করেছে। জানোয়ার দেখ্‌তে তাঁরা উৎসুক। সমস্ত শিকার-যাত্রাটা তাঁদের কৌতুক ও কৌতুহলের বিষয় হ'য়ে উঠেছে। তাঁদের সাহচর্য্যে আমরাও সরস। তফাৎ এই, আমাদের শিকারের গাম্ভীর্য্যটা তাঁরা নিতান্তই কৃত্রিম আর অনাবশ্যক ব'লে মনে করছেন। মিসেস চৌধুরী পুত্র সুব্রতকে নিয়ে ব'সে আছেন রাজ্ঞীর মত, মাঝে মাঝে অপাঙ্গে চেয়ে দেখ্‌ছেন ডাক্তার চৌধুরীকে। মিস্‌ ব্যানার্জীর শিকারে সাধ নাই। ফাগুনের অরণ্য তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। হাসিতে ফুটে উঠেছে তাঁর দন্তরুচি।

মাচায় বসেছি। সঙ্গে সাবিত্রী আর একটি গ্রাম্য যুবক। সে জানোয়ার দেখিয়ে দেবে; আবশ্যক হ'লে হুঁসিয়ার ক'রে দেবে। তার হাতে একখানা টাঙ্গী। এই অস্ত্র এ অঞ্চলের ছেলে-বুড়ো সকলের দিন-রাত্রের সহচর। একটা জানোয়ারের ত্রস্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল। যে জানোয়ার বেরিয়ে এল তার চেহারা অদ্ভুত! না-ঘোড়া, না-গাধা, শম্বরও নয়। গুলি করলাম—রক্তের দাগ রেখে সে তীর বেগে পালিয়ে গেল। পরে শুনে বিরক্ত হয়েছি—এটা একটা নীল গাই। এর পর কয়েকটা বীটে দূরে দূরে হরিণ দেখা গেছে, আর গোটাকয়েক ময়ূর। একটাও মারা পড়েনি। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কয়েকটা হরিণ চরতে দেখে নীচে ব'সে গেলাম—ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে। এখানে মাচা ছিল না—তার প্রয়োজনও নাই। এবারে একটা হরিণ মারা পড়্‌ল সেন সাহেবের রাইফেলে। বাকী হরিণগুলো পালিয়ে গেল। তাদের দৌড়ের গতি দেখে বিস্মিত হলাম। বুঝ্‌লাম, নিতান্ত অসতর্ক না হ'লে বাঘের পক্ষে হরিণ শিকার সহজসাধ্য নহে।

আজকের শিকারে মাচা আর বীটের প্রথা বুঝে নিয়েছি। মাচাগুলি পর পর এমন ভাবে তৈরী হয় যে এক প্রান্তের মাচা থেকে অন্য প্রান্তের মাচা একটা অর্দ্ধবৃত্তের দুই প্রান্তবিন্দু। দুই মাচার মধ্যে ব্যবধান অনেক। গাছপালা পাহাড় আড়াল ক'রে আছে বলে এই ব্যবধান আরও বেশী মনে হয়। মাচায় ব'সে সোজা ডাইনে বা বাঁয়ে গুলি করা চল্‌বে না, পরবর্ত্তী মাচার শিকারীদের পক্ষে তাহা বিপজ্জনক। বীটের সর্দ্দার মাচায় শিকারীকে তুলে দেবে। আবার বীট শেষ হলে বীটাররা এসে নামিয়ে নেবে। বীটার না এলে মাচা থেকে নামা নিষেধ। জানোয়ার আহত হ'লে—বিশেষত বাঘ, ভালুক, শূকর প্রভৃতি হিংস্র জানোয়ার—এই সতর্কতা অপরিহার্য্য। মাচায় শিকারীদের তুলে দিয়ে সর্দ্দার-বীটার দূরে জঙ্গলের বীটারদের খবর দিলেই বীট আরম্ভ হবে। মাচা থেকে শুন্‌তে পাই—কত রকম বুলি, চীৎকার, হো, হো, হৈ, হৈ। কখনও বা ঢোলের আওয়াজ। টাঙ্গীর বাঁট দিয়ে গাছ পেটানোর শব্দ। পেছনে এই কোলাহল শুনে জানোয়ার ছুটে আসে কোলাহলহীন মাচার দিকে। তখন শিকারী সুযোগ বুঝে গুলি চালায়।

শিকার শেষে অপরাহ্নের শেষ রশ্মিটুকু মিলিয়ে যেতেই আহ্বান হয় ফিরে যাওয়ার। আবার হাতী, ধীর মন্থর দোদুল গতি। ঝোপের কাছে কৌতূহলী খরগোষ দীর্ঘ কাণ খাড়া ক'রে চেয়ে আছে। পলায়মান শেয়াল ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে নিচ্ছে অনাহুত লোকসমারোহ। চকিত হরিণ দাঁড়িয়ে অরণ্যের প্রান্তে। শহরের সে নিত্যকার অভ্যস্ত দৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ এক নূতন দেশ, নূতন অভিজ্ঞতা। ক্যাম্পে চা'র টেবিলে শিকার-প্রসঙ্গ, দিনের পর্য্যটনের পুনরাবৃত্তি, কত সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতির আলোচনা। আর এ সমস্ত আলোচনা সরস হ'ত ডাক্তার চৌধুরীর হাস্যরসে। ইনি আমাদের বন্ধু মহলের 'উড

হাউস'। এঁর এক্সটেম্পোর রসরচনা, চোখা ভাষার নিপুণ পরিহাস উজ্জ্বল ক'রে তুলত আমাদের এ সান্ধ্যসভা। তার পর আসে বিবিধ খাদ্য, মিস্ ব্যানার্জীর সাবলীল পরিবেশন, মিসেস চৌধুরীর নিখুঁত যত্ন। ভোজ্যগুলিও কি উপাদেয়! আহার-অন্তে সারি সারি শুভ্র শয্যায় প্রগাঢ় নিদ্রা।

দ্বিতীয় দিনে ভোরের অন্ধকারে এলেন আর এক শিকারী-বন্ধু। বাংলাদেশের একটা কলেজের অধ্যাপক। শিকারে এঁর অভিজ্ঞতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। দুই-চারিটা হরিণ ইনি ইতিপূর্ব্বে শিকার করেছেন, আমরা তাও করিনি। এই অধ্যাপক-বন্ধুর আগমনে আমাদের শিকারে নূতন প্রেরণা এসেছে। আমার সঙ্গে এঁর আগে পরিচয় ছিল না, কিন্তু সেদিন স্বল্প আলাপেই চিনে নিলাম, ইনি নূতন নন—পুরাতন। এঁর ভিতরে কৃত্রিমতার লেশটুকুও নেই।

আজকের শিকারে দুটো শূকর জখম হ'য়েছে। আর মারা পড়েছে একটা হরিণ, একটা কোটরা (barking deer) আর একটা নীল গাই। বাঘের কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

রাত্রে বহির্ব্বাটীতে কলরব শুনে বেরিয়ে দেখি, অসংখ্য নরনারী জমা হ'য়েছে—নীল গাইর মাংসের আশায়। ভাগ নিয়ে কলহও আরম্ভ হয়েছে। এই দুই টুকরো মাংস তাদের কাছে অমূল্য। আজ তাদের রুটিরও প্রয়োজন নাই।

পরদিন ভোরেই যাত্রার তাগিদ এসেছে। বাইরে তাকিয়ে দেখি সদর কাছারীর অঙ্গনে লোকারণ্য। সকলের হাতেই ছোট-বড় টাঙ্গী। আবার জঙ্গল থেকে ডাক এসেছে, জঙ্গলের এ মানুষগুলো ব'য়ে এনেছে সেই খবর। আর দেরী নয়। যাত্রার আয়োজন হাতী দুটোকেও সাড়া দিয়েছে। মাঝে মাঝে গর্জ্জন ক'রে তাদের চাঞ্চল্য প্রকাশ করছে। বাইরের আমন্ত্রণে চা'র টেবিলের গল্পগুজব তুচ্ছ হ'ল। পোষাক প'রে জলের কেরিয়ার ফলের থ'লে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আজ সেন সাহেব যাত্রার পূর্ব্বাহ্নে জানিয়ে দিলেন—আজ সত্যিকার বাঘের জঙ্গলে যেতে হবে।

তাঁর উপদেশের সারাংশ পুনরাবৃত্তি করলেন। একটি মহিলা পরেছিলেন লাল সাড়ী। 'ওটা চলবে না।' তৎক্ষণাৎ তিনি সেটা বদলে ফেললেন। লাল কাপড় দেখলে বাঘ ক্ষেপে যায়।

ফাল্গুনের প্রভাত। নবারুণরশ্মি বনের তরুলতাকে রাঙিয়ে দিয়েছে। নব কিশলয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে তারই স্বর্ণরাগ। পাখীর গানে আজ আনন্দের সুর। আজ হোলি। তাই বনলক্ষ্মী আজ উৎসবময়ী। সর্ব্বাভরণভূষিতা, প্রাণহিল্লোলে স্পন্দিতা। বিশ্ব-সৃষ্টির এই মধুর উদ্বোধনক্ষণে আমাদের প্রাণেও পুলকের বাণ ডেকেছে। শিকারের উন্মাদনা ভুলে গিয়ে চেয়ে দেখছি প্রকৃতির এই অপরূপ সাজ—অপূর্ব্ব চেতনা।

কত ক্রোশ পার হয়েছি হিসাব নেই। এক সময় মনে হ'ল হাতী একটা নদীর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। নদীর দুই উচ্চ তীরে গহন বন, অদূরে পাহাড়। বর্ষায় এই নদী তরঙ্গাভিঘাতে পাড় ভাঙ্গে, বড় বড় গাছপালা উপড়ে নিয়ে দূরদিগন্তে ছুটে যায়। আজ এ নদীতে শুধুই শুষ্ক বালুকারাশি, জলের রেখাটুকুও নাই।

সেন সাহেব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আমাদের বাঁয়ের জঙ্গলে। এখানে বাঘের জন্য মোষ বাঁধা হয়েছে। বাঘ মোষ মারলে এখানে মাচা তৈরী ক'রে বাঘের প্রতীক্ষায় বসতে হবে। একটি লোক লক্ষ্য ক'রে দেখে খবর দিল, মোষ মারেনি কিন্তু বাঘের পায়ের দাগ আশে পাশে দেখা যাচ্ছে। হয়ত কি একটু সন্দেহ হয়েছিল, তাই বাঘ মহিষকে দূর থেকে তাকিয়ে দেখে বিরক্ত হ'য়ে ফিরে গেছে। এইবারে আমরা বাস্তব-জগতে ফিরে এসেছি।

কিছুক্ষণ পরে মনে হ'ল হাতী দুটো চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। ভয় পেলে যেমন হয়। মাঝে মাঝে অদ্ভুত গর্জ্জন করছে। সেন সাহেব হেতু অনুসন্ধান করতে হাতীকে বসিয়ে মইয়ের সাহায্যে নেমে গেলেন। পায়ের নীচে নদীতে শুষ্ক বালুরাশি। বালু পরীক্ষা ক'রে তিনিও একটু চঞ্চল হ'লেন। ইসারায় আমাদের হাতী থেকে নীচে আসতে বললেন। মুখে কথা নেই—একটা আঙুলে নিজের ঠোঁট স্পর্শ ক'রে আমাদেরও কথাবার্ত্তা বন্ধ ক'রে দিলেন। আমরা তাঁর নির্দ্দেশ মত এগিয়ে দেখতে পেলাম সেই বালুতে সদ্য বাঘের পায়ের ছাপ। বালুর নদীতে যে রাস্তা ধ'রে আমরা এসেছি সেই দিক্ থেকে নদীর নিম্ন দিকে বরাবর ছাপ চ'লে গেছে।

সেন সাহেব জানালেন, এই পায়ের দাগ এই ভোরের দিকেই পড়েছে। বনে চরা গোরু মোষের বা রাখালের পায়ের দাগ একে এখনও মুছে দেয় নি।

দুই হাতীতে প্রায় দশ জন লোক। আজ মহিলা তিন জন; মিসেস চৌধুরী আজ আসেন নি। সেন সাহেব বললেন, বাঘ কাছেই আছে। জলের কাছে কোন জঙ্গলে শীতল ছায়ায় ঘুমিয়ে আছে। আজকের প্রথম শিকার এই জঙ্গলে। মুহূর্ত্তে সকলের হাস্য পরিহাস বন্ধ হয়ে গেল। সকলের মুখেই একটা আতঙ্কের ছায়া পড়েছে। অধ্যাপক-বন্ধু এগিয়ে এসে আমাকে বললেন, 'বড়বাবু, আমি অনেক জঙ্গলে শিকার করেছি, কিন্তু আজকের মত এমন ভয় কখনও হয়নি।' আমিও কোন দিন বাঘের শিকারে আসিনি। অরণ্য পর্য্যটনের এই সবেমাত্র হাতে খড়ি। আমার ভয় হয়নি একথা হলফ্ ক'রে বল্‌তে পারি না। মুখে হাসি টেনে এনে শ্রীকান্তের শ্মশানের কথাগুলি অভিনয়ের সুরে বললাম—আর সেদিন যদি আজই এসে থাকে, তবে হে আমার অভ্যগ্র পদধ্বনি—

সেন সাহেবের আবির্ভাবে অভিনয়ে যবনিকা পড়ল। শুন্‌লাম তাঁর গৃহিণীকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌ছেন, তোমাকে বোঝাবার দরকার আছে কি? শিকার-যাত্রা তোমার ত নূতন নয়। ভয় করলে চলবে কেন? মাচায় নিঃশব্দে ব'সে থাকবে, না হয় চোখ বন্ধ করে দিও। বেশ বুঝতে পারলাম, সমস্ত আলোচনার ভিতরে একটা বাস্তবতার সুর এসেছে। মাচায় উঠে গেলাম। আমার সঙ্গে গৃহিণী আছেন, তাই একটি মাহুতকে আমার মাচায় দেওয়া হয়েছে। শঙ্কটে তার অভিজ্ঞতা অনেক কাজে আস্‌বে। মইখানাকে সরিয়ে নেওয়া হ'ল—সতর্কতার কোন ত্রুটি না হয়। কল্পনায় বাঘের বিরাট মুণ্ড গ'ড়ে নিয়ে নিজের সাহস পরীক্ষা ক'রে নিচ্ছি। কোন্ দিক্ দিয়ে এলে কি ভাবে গুলি চালাতে হবে তাও ঠিক ক'রে নিলাম। মাচার সামনে এক হস্ত পরিমিত উঁচু পাতার ঘেরা থেকে দু-একটা পাতা ছিঁড়ে ফেল্‌লাম। আবার দুই-একটা পাতা নতুন ক'রে গুঁজে দিলাম। সঙ্গিনীকে দুই-একটি উপদেশ দিয়েছি কিন্তু মনে হ'ল, এখানে উপদেশ অনর্থক। তাঁর কর্ত্তব্য বোধ হয় তাঁর কাছে স্পষ্ট।

বীট আরম্ভ হ'ল। ঢোল বাজ্‌ছে। হৈ-চৈর অন্ত নাই। সন্ধানী দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে চোখ জ্বালা করতে লাগল। বার বার চশমার কাচ সাফ্ ক'রে নিচ্ছি। মাচায় ব'সে জঙ্গলের প্রত্যেক রন্ধ্র নিরীক্ষণ ক'রে না দেখ্‌লে বাঘের মাথা বেরোলেও তাকে বাঘ বলে চেনা যাবে না। এদের গণ্ডি এত নিঃশব্দ যে জঙ্গলের ফাঁকে এর মাথাকে পাহাড় ব'লে ভুল করব। হঠাৎ অন্য মাচা থেকে কয়েকটি বন্দুক ও রাইফেলের আওয়াজ শোনা গেল। আমার তখন উত্তেজনার সীমা নাই। এবারে হয় ত বাঘ এদিকে ছুটে আস্‌বে। কিন্তু ছুটে যেটা এল সে একটা ময়ূর। ময়ূর দেখেও নিরাশ হইনি, কারণ বাঘ আর ময়ূরের সখ্যের কথা অনেক শুনেছি। এই দুই প্রাণীর পরস্পরের প্রতি আশ্চর্য্য আকর্ষণ। ময়ূরের পরেই বেরোয় বাঘ—বীটারকে ঠিক পিছনে রেখে। কিন্তু বাঘ বেরোল না। বীটাররা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়েছে। সেন সাহেব ময়ূরের উপরেই রাইফেল চালিয়েছিলেন, আর ডাক্তার চৌধুরী বন্দুকের দুই গুলিতে একটা বিরাট দেহ শম্বরকে নদীর বালু-শয্যায় শুইয়ে দিয়েছিলেন। এত ফাঁকা জায়গায় শোয়া তার অভ্যাস নেই, তাই উঠে অন্যত্র চ'লে গেছে।

এর পরে আর দুই-একটা বিট খুব কাছাকাছি জঙ্গলেই হ'ল। বাঘ কাছেই আছে সেই আশায়। কোন বড় জানোয়ার দেখা গেল না। একটা বেজে গেছে। আমাদের এবারে যেতে হবে দূরে বস্তীতে। সেখানে আমাদের দ্বিপ্রহরের ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে। ক্যাম্পের তিন ক্রোশ দূর থেকে কুলীর মাথায় আস্‌ছে—লুচী, তরকারী আর হরিণের মাংসের কাটলেট্। গাছের ছায়ায় আমাদের গল্পগুজব চল্‌ছে। মেয়েরা বসেছেন একপাশে। সেন সাহেবের রূপসী গৃহিণী, স্মিতনেত্রা মিস্ ব্যানার্জ্জী আর আমার ক্ষুদ্রদেহা পত্নী। ডাক্তার চৌধুরী আজ হাস্যরস পরিত্যাগ ক'রে রাইফেল নিয়ে পড়েছেন। তীক্ষ্ণ যুক্তির সাহায্যে রাইফেলের সোজা কথাটাকে দিলেন বেঁকিয়ে। আশৈশব যিনি রাইফেল চালিয়েছেন তিনি মিথ্যাটাকেই সত্য ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেন।

আহার শেষ ক'রে যখন প্রস্তুত হয়েছি তখন তিনটে বেজে গেছে। হাতী এল, এগিয়ে চল্‌লাম। এবারে নিশ্চয় বাঘের জঙ্গল। গত কয়েক বারে ভুল হয়েছে জলের কাছে বীট হয়নি। বাঘ যে জলের কাছেই আশ্রয় নিয়েছে সেটা

আগে খেয়াল হয়নি। খবর এসেছে এক ক্রোশ দূরে জল আছে। আর সে জঙ্গলে গাছের পাতা এখনও ঝরে যায়নি। গাছগুলি ঘনপল্লবিত। বাঘ এই জঙ্গলেই যে আশ্রয় নিয়েছে তাতে সন্দেহ মাত্র নাই। 'কোশ ভর' পাহাড়ের বন্ধুর রাস্তা। সেখানে পৌছুতে সময় লাগবে অনেক।

জঙ্গলের খুব কাছে এসে যখন পৌচেছি, তখন দূরে একটা কোলাহল শোনা গেল। আমাদের দলেও বেশ একটা চাঞ্চল্য লক্ষিত হ'ল। সকলেই চকিত। আমি প্রথমে কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি, কিন্তু এটা বুঝেছিলাম কিছু একটা অনর্থ ঘটেছে। নাম, নাম, হাতী থেকে নেমে পড়, বীট আরম্ভ হয়েছে। হাতী থেকে নেমে পড়েছি, কিন্তু কোন্ দিকে মাচা কিছুই জানি না। জঙ্গলের রাস্তা ধ'রে ছুটব, ডান না বাঁয়ে, পূর্ব্বে না পশ্চিমে কোন্ দিকে! হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলাম। শিকারীরা কে কোথায় উধাও হ'য়ে গেছে জানি না, সকলেই উর্দ্ধ শ্বাসে ছুটেছে। দূরে বীটারদের গাছ-পেটার শব্দ। সম্মুখে আশেপাশে ধাবমান শিকারীদের ছুটে যাওয়ার শব্দ, কিন্তু রাস্তানির্ণয়ের কোন উপায় নাই। আমার আগে অন্য হাতীতে গৃহিণী ছিলেন, তাঁকেও দেখা গেল না। যেদিকে চোখ যায়, মরিয়া হ'য়ে ছুটেছি। অবিলম্বে মাচায় উঠ্‌তে হবে। এতক্ষণ জানোয়ার ছুটে বেরিয়ে আস্‌ছে তাতে সন্দেহ নাই। এই জঙ্গলেই বাঘ আশ্রয় নিয়েছে, সে কথা পূর্ব্বেই শুনেছি। সেই সত্য আমাকে তাড়িয়ে নিচ্ছে ক্ষিপ্তের মত। জঙ্গলের ভিতরে টিলার মত ছোট ছোট পাহাড়। আরোহণ কষ্ট-সাধ্য। পা পিছলে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। আগে মাচায় উঠ্‌তে হবে। ছুটে যেতে একটা মাচা চোখে পড়ল। সেটায় অধ্যাপক বন্ধু বসেছেন, সঙ্গে মিস্ ব্যানার্জ্জী। নীচে স্খলিত অঞ্চলে আমার গৃহিণী। মাচার উপর থেকে বন্ধু ডাক্‌ছেন চেঁচিয়ে সেই মাচায় উঠে যেতে —কিন্তু গৃহিণীর সেদিকে খেয়াল নাই। তিনি দিশেহারা হ'য়ে খুঁজ্‌ছেন আমাকে। আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে দৌড়ে এলেন। তাঁকে পিছনে রেখে আমি ছুট্‌ছি মাচার উদ্দেশে। এক সময়ে পিছনে চেয়ে দেখি আমার সঙ্গিনী অন্তত পঞ্চাশ গজ দূরে পাহাড়ের নীচে, আমি উপরে। তিনি উঠবার চেষ্টা করছেন। সহসা পেরে উঠছেন না। হঠাৎ শোনা গেল, রাইফেলের নির্ঘোষ। ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ। যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই। জানোয়ার বেরিয়ে আস্‌ছে।

রাইফেলের ব্যারেল কোন্ দিকে, জানোয়ারের গতি কোন্ মুখে তাও জানি না। জঙ্গলের আড়ালে কোন মাচাই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। নীচে নেমে যাচ্ছি সঙ্গিনীর সাহায্যে, তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমার বন্দুক কোথায়?' তাই ত, বন্দুক সঙ্গে নেই ত! এতক্ষণ সেটা খেয়ালই হয়নি। অদূরে দেখ্‌তে পেলাম পূর্ব্বাহ্নের দু-তিনটা বীটের সঙ্গী ও সেই মাহুতটা ছুটে আস্‌ছে, আর দূরে পালিয়ে যাচ্ছে একটা বীটার। এ লোকটা স্টপের কাজ করে। শেষ প্রান্তের মাচার পাশ কাটিয়ে জানোয়ার বীটের বাইরে চ'লে না যায়, এরা চীৎকার ক'রে তাই জানোয়ারদের গতিরোধ করে। তার হাতে দেখা যাচ্ছে আমার বন্দুক আর গুলির থ'লে। বন্দুক নেওয়া হ'ল, কিন্তু মাচা কই! মাহুত চতুর্দ্দিকে দৌড়ে বিশেষ নিরীক্ষণ ক'রেও মাচা বা একটুখানি আড়ালও আবিষ্কার করতে পারলে না। ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজে মনে হ'চ্ছে, একটা ছোট-খাট যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়ে গেছে। পাহাড়ের গায়ে জানোয়ারের পায়ের শব্দও শোনা যাচ্ছে।

দূর থেকে একটা গভীর খাদ উপর থেকে নীচে এসে আমাদের পায়ের কাছ থেকে বেঁকিয়ে দূরান্তরে চ'লে গেছে। উপায়ান্তর না দেখে এইখানেই ব'সে পড়লাম। এই খাদই সচরাচর বাঘের চলাচলের রাস্তা। আমার সঙ্গিনী এক খণ্ড পাথরের উপরে বসেছেন, হাতে গুলির থ'লে। আমি আছি দাঁড়িয়ে হাতে বন্দুক। দারুণ উত্তেজনায় চঞ্চল। মাহুত আমার পেছনে। বৃক্ষ অসংখ্য, কিন্তু আরোহণ করার মত একটা গাছও নাই। নিজেদের অসহায় অবস্থা বুঝে নিয়ে আমি প্রস্তুত হ'চ্ছি একটা লড়াইয়ের জন্য। হাতে পায়ে লড়াই! জানোয়ার কাছে এলে হয় ত বন্দুক কোন কাজেই আসবে না। হয় ত বাঘ উপস্থিত হওয়ার আগে গাছের আড়ালের জন্য তাকে দেখ্‌তেই পাব না, আর দুই-একটা গুলিতে তাকে নিঃশেষে মারাও অসম্ভব। তার পরের অবস্থাটা কল্পনার অগোচর। তবু আমি ভাব্‌ছি—যদি তাই হয়, বাঘের টুঁটি চেপে ধ'রে প্রাণপণে টিপে দিলে তাকে কাবু করা যাবে কি? চোখে

আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলে কি হয়? বন্দুক দিয়ে জোরে বাঘের মাথায় আঘাত করলে? হয় ত কিছু হ'তেও বা পারে, কিন্তু তার ফুরসুৎ পাব? সাহসে কুলোবে কি?

মাহুত বললে, 'বড় জানোয়ার বেরোলে গুলি ক'রবেন না।'

'বড় জানোয়ার কি বল্‌ছ?'

'এই বাঘ, ভালুক, শূকর। গুলি করলে বিপদ হবে।'

মাহুতটা বলে কি? গুলি না করলেই তারা আমায় ছেড়ে দেবে নাকি? কোন মাচার শিকারীর গুলি-খাওয়া বাঘ যদি এদিকে আসে? আমি মাহুতের আদেশ মেনে নিতে প্রস্তুত নই। শিকারে এসে বড় জানোয়ার দেখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব! সঙ্গিনীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম সে নির্ব্বিকার। আমার জন্য বিভিন্ন রকমের বুলেট সাজিয়ে একটা পাথরের উপরে রেখে দিচ্ছেন। ব্যস্ততায় গুলি বেছে নিতে ভুল না হয়। আমি জিজ্ঞাস কর্‌লাম, তোমার ভয় হচ্ছে না ত? আমার কিন্তু একটুও ভয় করছে না।

অনাবশ্যক টোটাগুলো থ'লের ভিতরে রেখে দিয়ে তিনি জবাব দিলেন, 'তোমার কখনও ভয় হয় নাকি?'

আমি এর প্রত্যুত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করি নাই। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, শিকারে ব'সে মশার কামড় আর পোকার উপদ্রব স'য়ে যেতে হয়; শব্দ ক'রে তাড়ালে উৎকর্ণ জানোয়ার পালিয়ে যাবে। কিম্বা হঠাৎ চকিত হ'লে আক্রমণও করতে পারে।

কয়েকটা গুলি বেছে আমার পকেটে রেখে দেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে একবার বললেন, 'বড্ড পোকায় বিরক্ত করছে।'

আমি হাসব কি কাঁদব জানি না, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে যে বাঘের আক্রমণ আশঙ্কা করছে, পোকার উপদ্রব গ্রাহ্য করার তার অবকাশ কোথায়! তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লাম—সে মুখে ভয়ের লেশমাত্রও নাই।

পাঠক আমাদের অবস্থা কল্পনা করুন। আমি নূতন শিকারী। নদীতে হাঁস আর বনের পাখী, শিকারের অভিজ্ঞতা তখনও আমার এতটুকু। সেন সাহেব বাঘের বিভীষিকা যা বর্ণনা করেছেন, এই পালামৌর জঙ্গলে কিছুদিন পূর্ব্বে যে রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেছে, তার প্রতি অক্ষর আমার মনে আছে। তাই আজ বাঘের আসন্ন সম্ভাবনায় আমি মরিয়া হ'য়ে উঠেছি। অন্তরের নিভৃত কোণে এসেছে একটা উদাস আত্মসমর্পণ! জীবন-মৃত্যু দুইই এক হয়ে গেছে। সম্মুখে দেখ্‌ছি—একটা বিরাট ভয়াল দেহ, সর্ব্বাঙ্গ চিত্রিত। বদন ব্যাদান ক'রে ছুটে আস্‌ছে দুর্জ্জয় রোষে—চোখ দুটো জ্বল্‌ছে হিংসার আগুনে। আমার ঘাড়ে তার বিশাল দংষ্ট্রার স্পর্শেরও প্রয়োজন নাই। তার বিরাট থাবার একটি আঘাতে পলকে জীবন-মরণের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে পারে। কত দক্ষ শিকারী এম্‌নি ভাবেই ত প্রাণ হারিয়েছে। আমার যদি আজ সত্যিই সেদিন এসে থাকে তবে আবার বল্‌ছি, 'হে আমার অভ্যগ্র পদধ্বানি, হে আমার সর্ব্বদুঃখভয়ব্যথাহারী অনন্ত সুন্দর, তুমি তোমার অনাদি আঁধারে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া এই দুটি চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও। আমি তোমার এই অন্ধ-তমসাবৃত নির্জ্জন মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে তোমাকে নির্ভয়ে বরণ করিয়া মহানন্দে তোমার অনুসরণ করি।'

যখন হুঁস হ'ল, তখন বন্দুকের আওয়াজ থেমে গেছে। সায়াহ্নের ছায়া নেমে এসেছে অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে। সম্মুখের খাদে সে ছায়া আরও গভীর। অদূরের বীটারদের দেখা গেল "হা কোয়া" শেষ হ'য়ে গেছে। কোথায় বাঘ, কোথায় ভালুক। বাঘের আবির্ভাব, আক্রমণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ—সব মুহূর্ত্তে মিলিয়ে গেছে। যবনিকা উত্তোলিত—দেখা যাচ্ছে, আশার আলো, জীবনের অমৃত।

অনেকটা পথ চ'লে যখন একটা মাচার কাছে উপস্থিত হয়েছি, দেখ্‌লাম সে মাচা থেকে সেন সাহেব আর তাঁর স্ত্রী তখনও অবতরণ করেন নি। আমাদের নীচে দেখে বিস্মিত হ'লেন। শিকারের এ নিয়ম নয়। বীটার এসে নামিয়ে না নিলে মাচা থেকে নামা উচিত হয় নি। সেন সাহেব ভর্ৎসনার সুরে আমাদের প্রশ্ন করতেই জবাব দিলাম, 'মাচা আমাদের ছিল না, নীচেই ছিলাম।' কণ্ঠে ছিল বোধ হয় একটু অভিমানের সুর। তিনি আমার জবাবে ভীত হ'য়ে দাবী করলেন, 'মাচা পাননি, সে কি, তবে আমাদের মাচায় ছুটে আসেন নি কেন?

আমি উত্তর দিলাম, 'এমন ক'রে অপরের শিকার নষ্ট করা শিকারীর পক্ষে গর্হিত। তা হ'লে এই গোটা আয়োজনটা পণ্ড হ'ত।'

এমন সময়ে শিকারীর দল এসে জুটেছে। চৌধুরী সাহেবও এসেছেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। মনে হ'ল, একটা বিষম কিছু ঘটেছে। একবার ভাব্‌ছিলাম, হয় ত আমাদের দুঃস্থ অবস্থা কল্পনা ক'রে তিনি গম্ভীর হয়েছেন। আমাদের আলোচনায় বাধা দিয়ে তিনি আমাকে বললেন, 'আপনি শিকারীর উপযুক্ত কাজই করেছেন, তর্কের আবশ্যক নাই।' একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন, 'আমি যা বল্‌ছি, তার তুলনায় আপনাদের কাহিনী তুচ্ছ।' সমস্ত ঘটনা শুনে শিউরে উঠ্‌লাম। চৌধুরী সাহেবের মাচায় ছিল তাঁর কিশোর বয়স্ক পুত্র, জনক জননীর একমাত্র সন্তান। আর সেন সাহেবের এক নিকট আত্মীয়। বয়সে তিনিও তরুণ। যখন জানোয়ার ছুটে বেরোচ্ছে—শম্বর, শূকর, হরিণ—তখন এই দুইটি তরুণ তাই লক্ষ্য ক'রে চৌধুরী সাহেবের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করছিল। হঠাৎ তাঁর পুত্র 'বাপ্‌রে' ব'লে মাথা সরিয়ে নিলে। অন্য ছেলেটি 'উঃ' ব'লে চেঁচিয়ে বুকে হাত দিয়ে ব'সে পড়ল··· দারুণ আতঙ্কে সাহেব দেখ্‌লেন, রাইফেলের গুলি বৃষ্টি হ'চ্ছে তাদেরই মাচার আশে পাশে! মুহূর্ত্তে তিনি বন্দুক ফেলে দিয়ে ছেলেদের শুইয়ে দিয়ে নিজে শুলেন তাদের উপরে। নিজের দেহের আড়াল ক'রে গুলি বৃষ্টি থেকে তাদের বাঁচাতে। এই ভয়াবহ ব্যাপারের দীর্ঘ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। অস্ফুট কণ্ঠে শুধু প্রশ্ন করলাম, 'বুকে হাত দিয়ে যে ব'সে পড়ল তার কি হ'ল?' চৌধুরী সাহেব বললেন, ভাগ্যিস তার জখম যৎসামান্য। ছেলেটিকে আহ্বান ক'রে দেখিয়ে দিলেন, গায়ের কোট, কামিজ এবং গেঞ্জি ছিঁড়ে গেছে। বুকের চামড়া খানিকটা কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়েছে। আমার রুদ্ধ শ্বাস এবারে মুক্তি পেল, কিন্তু তখনও বাক্‌শক্তি ছিল না। আজকের অ্যাডভেঞ্চার আর থ্রি্‌ল্‌ একটু রসাল ক'রে বর্ণনার ইচ্ছা ছিল—সে ইচ্ছা লোপ পেয়েছে। নিমেষে আমাদের সমস্ত আয়োজন কি ট্রাজেডীতে সমাপ্ত হ'ত ভেবে আমি স্তম্ভিত।

প্রশ্ন ক'রে সব ব্যাপারটা বুঝে নিলাম।

প্রথম নম্বর: এই জঙ্গলের বীটারদের সর্দ্দার নূতন। ভুলে একটা মাচা কম তৈরী হয়েছিল, সে খবর আমাদের দেয় নি। দ্বিতীয় নম্বর: আমাদের মাচায় বসিয়ে দেওয়া দূরের কথা, আমাদের জঙ্গলে আসার আগেই বীট আরম্ভ হয়েছিল। তৃতীয় নম্বর: যে দিক থেকে বীট করা উচিত ছিল, সে দিক থেকে অর্থাৎ আমাদের সম্মুখ দিক থেকে বীট না ক'রে ডান দিকের এক প্রান্ত থেকে বীট করা হয়েছে। এ ভাবে বীট হ'লে এক মাচার গুলি অন্য মাচার শিকারীকে বিদ্ধ করবে। এই ভুলের পরিণাম শোচনীয় হ'তে পারত; কিন্তু বাঘের আবাসস্থান ঘিরে বীট হয়নি ব'লে বাঘের অন্য দিকে পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা খোলা ছিল। হয় ত এই ভুলের জন্যই বাঘের সাক্ষাৎ হয় নি; কিন্তু বাঘ বেরোলে যাঁরা মাচার অভাবে নীচে স্থান নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

আজকের এই দারুণ ঘটনা আমাদের সকল আলোচনার সুর বদলে দিয়েছে। হাতীতে আর চড়া হ'ল না, অন্ধকার অরণ্য পথে নিঃশব্দে কয়েকটি প্রাণী ক্যাম্পের উদ্দেশে এগিয়ে চললাম। মনে মনে সংকল্প করলাম, এমন ঘটনা মিসেস চৌধুরীকে বলা হবে না।

এই ঘটনার পর বহু বৎসর অতীত হ'য়ে গেছে। সেদিনকার বীট নিয়ে অনেক বিতর্কও শুনেছি। সকলেই একবাক্যে বলেছে—এমন কাণ্ডও ঘটে! এই বীটের ভুলে কি-ই না হ'তে পারত! কেউ বলেনি—ভাগ্যিস্ বীটে ভুল হয়েছিল! যদি কেউ এমন কথা বলত আমি হয় ত জবাব দিতাম—তা হ'লে শিকারীর তালিকায় আমার নামটা উঁচুতে লেখা হ'ত।

(এই কাহিনীতে কেবলমাত্র নামগুলিই কাল্পনিক)

মৃতনক্ষত্র

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

আজ ঠিক মনে নেই কত রাত্রি হয়েছিল।

বাইরে ঝুর ঝুর ক'রে তুষার পড়ছে। খুব অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় চারিদিক কেমন জানি স্বপ্নাতুর হয়ে উঠেছে!

মাঝে মাঝে পাইন বনে নিশীথের হাওয়া মর্ম্মরিত হয়ে ওঠে। হোটেলের সবাই প্রায় এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে!

একটা ভারী কাশ্মীরী কম্বলে আপাদমস্তক ঢেকে ইজিচেয়ারে কাত হয়ে শুয়ে টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় একখানি বই পড়ছি!···

শরীরটা নাকি ইদানিং বড়ই খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, তাই মা ঠেলেঠুলে পূজার মরশুমে শিলং পাঠিয়ে দিয়েছেন! স্নেহান্ধ জননী!

ডাক্তার!

একটা মৃদু চাপা কণ্ঠস্বর কানে এসে বাজল!

চম্‌কে মুখ তুললাম, কে?

ডাক্তার! আপনার কাছে কোন ঘুমের ঔষধ আছে?···

টেবিল ল্যাম্পের মৃদু নরম আলোয় প্রশ্নকারীর দিকে তাকালাম। লম্বায় প্রায় ছয় ফিট্ কি সাড়ে ছয় ফিট্!···

রোগা ছিপ্‌ছিপে চেহারা!

চোখে একজোড়া কালো গগল্‌স্!···একমাথা লম্বা লম্বা রেশমের মত পাতলা চুল বিপর্য্যস্ত; কপালের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কপালের কোণ ঘেঁষে রগের শিরা দুটো সজাগ। সেখানকার চুলগুলি সাদা হয়ে উঠেছে। দাড়ি গোঁফ নিখুঁতভাবে কামান!···

গালের হাড় দুটো 'ব'-এর মত সামনের দিকে ঠেলে উঠেছে! গায়ে একটা জাপানী সিল্কের স্লিপিং কোট!···

পরনে জাপানী সিল্কের ঢোলা পায়জামা!

কোথায় যেন একে দেখেছি?···কোথায়!

আমায় বোধ হয় চিনতে পারছেন না? আমিও এই হোটেলেই উঠেছি, সেদিন রাস্তায় বিকালে বেড়াতে গিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

ও, ঠিক্! ঠিক্! তাই আপনাকে দেখে কেবলই মনে হচ্ছিল কোথায় যেন···তারপর কি ব্যাপার বলুন ত?

কোটের পকেট থেকে একটা ছোট দামী সোনার রিষ্টওয়াচ্ বের ক'রে চোখের সামনে মেলে ধরলেন, It is about one thirty!

হাতের আঙুলগুলি শীর্ণ বাঁকান সরু সরু ও শিরাবহুল!

খোলা দরজাটা দিয়ে কন্‌কনে হাওয়া এসে ঘরে ঢুকছে! তুষারাচ্ছন্ন প্রকৃতি মৌন আঁধারে যেন ঢুলছে!··

চেয়ার থেকে উঠে টেবিলের উপর রক্ষিত চামড়ার ব্যাগটা হতে একটা 'ক্যাফিয়াসপ্রিনের' ফাইল বের করলাম!

What's that! Caffiasprin? সহসা ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন!···

আমি একান্ত বিস্মিত হয়েই ভদ্রলোকের দিকে ফিরে তাকালাম—হাঁ, কিন্তু কেন বলুন ত?

but that has been proved hopeless long ago!···অতি করুণ একটুখানি হাসি ভদ্রলোকের ঠোঁটের কোল ঘেঁষে জেগে উঠ্‌ল! Narcotic group of drugs একে একে সব experiment-ই হয়ে গেছে! Now the morphia remains alone.

এবারে সত্য সত্যই একটু আশ্চর্য্য হলাম।

ভদ্রলোক অশান্তভাবে হাতের সরু সরু বাঁকান আঙুলগুলি দিয়ে মাথার চুলগুলি ধরে টানতে লাগলেন; একদিনও নয়, দুদিনও নয়, প্রায় দু'-দুটো বছর এমনি ক'রে না ঘুমিয়ে আমি রাত কাটাই। প্রথম প্রথম অবিশ্যি heavy doze-এ ঘুমের ঔষধ খেলে ঘুম আসত; কিন্তু ক্রমান্বয়ে রাতের পর রাত ঔষধ ব্যবহার করতে করতে এখন আর কোন ঔষধেই কাজ হয় না। কেবল মরফিয়া ইন্‌জেকশন নিলে খানিকক্ষণের জন্য একট ড্রাউজিনেস্ আসে। একটা অবসাদ, একটা ক্ষণিক তন্দ্রাচ্ছন্নতা! কিন্তু ডাক্তার বলতে পার, এমনি ক'রে কতকাল আর না ঘুমিয়ে রাত কাটাব? অসহ্য ঘুমের ভারে সমস্ত শরীর এলিয়ে আসে, তবু আমি ঘুমোতে পারি না! I can't Doctor! I can't!···ভদ্রলোক অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পাইচারি

এমন সময়ে শিকারীর দল এসে জুটেছে। চৌধুরী সাহেবও এসেছেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। মনে হ'ল, একটা বিষম কিছু ঘটেছে। একবার ভাব্‌ছিলাম, হয় ত আমাদের দুঃস্থ অবস্থা কল্পনা ক'রে তিনি গম্ভীর হয়েছেন। আমাদের আলোচনায় বাধা দিয়ে তিনি আমাকে বললেন, 'আপনি শিকারীর উপযুক্ত কাজই করেছেন, তর্কের আবশ্যক নাই।' একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন, 'আমি যা বল্‌ছি, তার তুলনায় আপনাদের কাহিনী তুচ্ছ।' সমস্ত ঘটনা শুনে শিউরে উঠ্‌লাম। চৌধুরী সাহেবের মাচায় ছিল তাঁর কিশোর বয়স্ক পুত্র, জনক জননীর একমাত্র সন্তান। আর সেন সাহেবের এক নিকট আত্মীয়। বয়সে তিনিও তরুণ। যখন জানোয়ার ছুটে বেরোচ্ছে—শম্বর, শূকর, হরিণ—তখন এই দুইটি তরুণ তাই লক্ষ্য ক'রে চৌধুরী সাহেবের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করছিল। হঠাৎ তাঁর পুত্র 'বাপ্‌রে' ব'লে মাথা সরিয়ে নিলে। অন্য ছেলেটি 'উঃ' ব'লে চেঁচিয়ে বুকে হাত দিয়ে ব'সে পড়ল··· দারুণ আতঙ্কে সাহেব দেখ্‌লেন, রাইফেলের গুলি বৃষ্টি হ'চ্ছে তাদেরই মাচার আশে পাশে! মুহূর্ত্তে তিনি বন্দুক ফেলে দিয়ে ছেলেদের শুইয়ে দিয়ে নিজে শুলেন তাদের উপরে। নিজের দেহের আড়াল ক'রে গুলি বৃষ্টি থেকে তাদের বাঁচাতে। এই ভয়াবহ ব্যাপারের দীর্ঘ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। অস্ফুট কণ্ঠে শুধু প্রশ্ন করলাম, 'বুকে হাত দিয়ে যে ব'সে পড়ল তার কি হ'ল?' চৌধুরী সাহেব বললেন, ভাগ্যিস তার জখম যৎসামান্য। ছেলেটিকে আহ্বান ক'রে দেখিয়ে দিলেন, গায়ের কোট, কামিজ এবং গেঞ্জি ছিঁড়ে গেছে। বুকের চামড়া খানিকটা কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়েছে। আমার রুদ্ধ শ্বাস এবারে মুক্তি পেল, কিন্তু তখনও বাক্‌শক্তি ছিল না। আজকের র‍্যাডভেন্‌চার আর থ্রি্‌ল্‌ একটু রসাল ক'রে বর্ণনার ইচ্ছা ছিল—সে ইচ্ছা লোপ পেয়েছে। নিমেষে আমাদের সমস্ত আয়োজন কি ট্রাজেডীতে সমাপ্ত হ'ত ভেবে আমি স্তম্ভিত।

প্রশ্ন ক'রে সব ব্যাপারটা বুঝে নিলাম।

প্রথম নম্বর: এই জঙ্গলের বীটারদের সর্দ্দার নূতন। ভুলে একটা মাচা কম তৈরী হয়েছিল, সে খবর আমাদের দেয় নি। দ্বিতীয় নম্বর: আমাদের মাচায় বসিয়ে দেওয়া দূরের কথা, আমাদের জঙ্গলে আসার আগেই বীট আরম্ভ হয়েছিল। তৃতীয় নম্বর: যে দিক থেকে বীট করা উচিত ছিল, সে দিক থেকে অর্থাৎ আমাদের সম্মুখ দিক থেকে বীট না ক'রে ডান দিকের এক প্রান্ত থেকে বীট করা হয়েছে। এ ভাবে বীট হ'লে এক মাচার গুলি অন্য মাচার শিকারীকে বিদ্ধ করবে। এই ভুলের পরিণাম শোচনীয় হ'তে পারত; কিন্তু বাঘের আবাসস্থান ঘিরে বীট হয়নি ব'লে বাঘের অন্য দিকে পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা খোলা ছিল। হয় ত এই ভুলের জন্যই বাঘের সাক্ষাৎ হয় নি; কিন্তু বাঘ বেরোলে যাঁরা মাচার অভাবে নীচে স্থান নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

আজকের এই দারুণ ঘটনা আমাদের সকল আলোচনার সুর বদলে দিয়েছে। হাতীতে আর চড়া হ'ল না, অন্ধকার অরণ্য পথে নিঃশব্দে কয়েকটি প্রাণী ক্যাম্পের উদ্দেশে এগিয়ে চললাম। মনে মনে সংকল্প করলাম, এমন ঘটনা মিসেস চৌধুরীকে বলা হবে না।

এই ঘটনার পর বহু বৎসর অতীত হ'য়ে গেছে। সেদিনকার বীট নিয়ে অনেক বিতর্কও শুনেছি। সকলেই একবাক্যে বলেছে—এমন কাণ্ডও ঘটে! এই বীটের ভুলে কি-ই না হ'তে পারত! কেউ বলেনি—ভাগ্যিস্ বীটে ভুল হয়েছিল! যদি কেউ এমন কথা বলত আমি হয় ত জবাব দিতাম—তা হ'লে শিকারীর তালিকায় আমার নামটা উঁচুতে লেখা হ'ত।

(এই কাহিনীতে কেবলমাত্র নামগুলিই কাল্পনিক)

মৃতনক্ষত্র

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

আজ ঠিক মনে নেই কত রাত্রি হয়েছিল।

বাইরে ঝুর ঝুর ক'রে তুষার পড়ছে। খুব অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় চারিদিক কেমন জানি স্বপ্নাতুর হয়ে উঠেছে!

মাঝে মাঝে পাইন বনে নিশীথের হাওয়া মর্ম্মরিত হয়ে ওঠে। হোটেলের সবাই প্রায় এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে!

একটা ভারী কাশ্মীরী কম্বলে আপাদমস্তক ঢেকে ইজিচেয়ারে কাত হয়ে শুয়ে টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় একখানি বই পড়ছি!…

শরীরটা নাকি ইদানিং বড়ই খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, তাই মা ঠেলেঠুলে পূজার মরশুমে শিলং পাঠিয়ে দিয়েছেন! স্নেহান্ধ জননী!

ডাক্তার!

একটা মৃদু চাপা কণ্ঠস্বর কানে এসে বাজল!

চমকে মুখ তুললাম, কে?

ডাক্তার! আপনার কাছে কোন ঘুমের ঔষধ আছে?…

টেবিল ল্যাম্পের মৃদু নরম আলোয় প্রশ্নকারীর দিকে তাকালাম। লম্বায় প্রায় ছয় ফিট্ কি সাড়ে ছয় ফিট্!…

রোগা ছিপ্‌ছিপে চেহারা!

চোখে একজোড়া কালো গগল্‌স্!…একমাথা লম্বা লম্বা রেশমের মত পাতলা চুল বিপর্য্যস্ত; কপালের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কপালের কোণ ঘেঁষে রগের শিরা দুটো সজাগ। সেখানকার চুলগুলি সাদা হয়ে উঠেছে। দাড়ি গোঁফ নিখুঁতভাবে কামান!…

গালের হাড় দুটো 'য়'-এর মত সামনের দিকে ঠেলে উঠেছে! গায়ে একটা জাপানী সিল্কের স্লিপিং কোট!…

পরনে জাপানী সিল্কের ঢোলা পায়জামা!

কোথায় যেন একে দেখেছি?…কোথায়!

আমায় বোধ হয় চিনতে পারছেন না? আমিও এই হোটেলেই উঠেছি, সেদিন রাস্তায় বিকালে বেড়াতে গিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

ও, ঠিক্! ঠিক্! তাই আপনাকে দেখে কেবলই মনে হচ্ছিল কোথায় যেন…তারপর কি ব্যাপার বলুন ত?

কোটের পকেট থেকে একটা ছোট দামী সোনার রিষ্টওয়াচ্ বের ক'রে চোখের সামনে মেলে ধরলেন, It is about one thirty!

হাতের আঙুলগুলি শীর্ণ বাঁকান সরু সরু ও শিরাবহুল!

খোলা দরজাটা দিয়ে কন্‌কনে হাওয়া এসে ঘরে ঢুকছে! তুষারাচ্ছন্ন প্রকৃতি মৌন আঁধারে যেন ঢুলছে!…

চেয়ার থেকে উঠে টেবিলের উপর রক্ষিত চামড়ার ব্যাগটা হতে একটা 'ক্যাফিয়াসপ্রিনের' ফাইল বের করলাম!

What's that! Caffiasprin? সহসা ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন!…

আমি একান্ত বিস্মিত হয়েই ভদ্রলোকের দিকে ফিরে তাকালাম—হাঁ, কিন্তু কেন বলুন ত?

but that has been proved hopeless long ago!…অতি করুণ একটুখানি হাসি ভদ্রলোকের ঠোঁটের কোল ঘেঁষে জেগে উঠ্‌ল! Narcotic group of drugs একে একে সব experiment-ই হয়ে গেছে! Now the morphia remains alone.

এবারে সত্য সত্যই একটু আশ্চর্য্য হলাম।

ভদ্রলোক অশান্তভাবে হাতের সরু সরু বাঁকান আঙুলগুলি দিয়ে মাথার চুলগুলি ধরে টানতে লাগলেন; একদিনও নয়, দুদিনও নয়, প্রায় দু'-দুটো বছর এমনি ক'রে না ঘুমিয়ে আমি রাত কাটাই। প্রথম প্রথম অবিশ্যি heavy doze-এ ঘুমের ঔষধ খেলে ঘুম আসত; কিন্তু ক্রমান্বয়ে রাতের পর রাত ঔষধ ব্যবহার করতে করতে এখন আর কোন ঔষধেই কাজ হয় না। কেবল মরফিয়া ইন্‌জেকশন নিলে খানিকক্ষণের জন্য একটু ড্রাউজিনেস্ আসে। একটা অবসাদ, একটা ক্ষণিক তন্দ্রাচ্ছন্নতা! কিন্তু ডাক্তার বলতে পার, এমনি ক'রে কতকাল আর না ঘুমিয়ে রাত কাটাব? অসহ্য ঘুমের ভারে সমস্ত শরীর এলিয়ে আসে, তবু আমি ঘুমোতে পারি না! I can't Doctor! I can't!…ভদ্রলোক অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পাইচারি

সুরু করলেন। তারপর সহসা এক সময় সামনের চেয়ারটার উপর বসে দুহাতে মুখ ঢাকলেন। ল্যাম্পের অস্পষ্ট ম্রিয়মান আলোর রেখাগুলি ওর দেহের উপর যেন কেমন এক বিভীষিকায় ছড়িয়ে পড়েছে।…

দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের উত্থান-পতনে সারা শরীরটা ফুলে ফুলে উঠছে।…

আপন মনেই আবার এক সময় বিড় বিড় ক'রে বলতে লাগলেন। তবু আমায় বাঁচতে হবে। এমনি ক'রেই রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে হবে! But it is too much

একটি নয়, দুটি নয়, পর পর তিন তিনটি সন্তানই কেউ একদিনের, বড় জোর, দু'দিনের হয়েই মারা গেল।…

হতভাগ্য অবোধ শিশু! উঃ সর্ব্বাঙ্গে কেমন শাদা শাদা দাগ।…

চোখের পাতা দুটো বোজা।…ক্ষীণ শ্বাস-প্রশ্বাসটুকু শুধু বোঝা যায়।…অসহনীয় যন্ত্রণার তীব্র প্রতিবাদে বোধ করি ক্ষুদ্র দেহখানি কুঁকড়ে কুঁকড়ে ওঠে! তারপর এক সময় সব শেষ হয়ে যায়!

অশোকের মা নীরবে চোখের জল মুছলেন।

আর অলোকা?

অশোক পিতার একটি মাত্র সন্তান!

বাপ পাটের দালালি ক'রে টাকা ব্যাঙ্কে রেখে গেছেন। বাপ মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অশোক কলেজের পড়া ইতি করে আনন্দের ও সৌন্দর্য্যের সন্ধানে আপনাকে বিলিয়ে দিল।

প্রথম প্রথম সমস্ত দিনটাই বাইরে কাটিয়ে রাত্রির দিকে বাড়ী ফিরে আসত, ক্রমে বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যা হতে লাগল; তারপর একদিন সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রির মধ্যেও সে একটি বারের জন্য বাড়ী ফিরল না। মা নীরবে শুধু চোখের জলই মুছতে লাগলেন।

এই সময় হঠাৎ সে গ্রামে বেড়াতে গিয়ে ফিরবার পথে অলোকাকে বিবাহ ক'রে নিয়ে ফিরে এল।

হাসি অশ্রুর মাঝখান দিয়ে মা পুত্রবধূকে বরণ ক'রে তুললেন!

অসামান্য রূপ নিয়েই অলোকা দীনদুঃখীর ঘরে জন্মেছিল!

বিবাহের পর হতে কিন্তু অশোক আশ্চর্য্য রকম বদলে গেল। বন্ধু-বান্ধব এসে ডেকে ডেকে ফিরে যায়।…

কত অনুযোগ, কত অভিমান, কিন্তু অশোক শুনেও যেন কিছুই শোনে না।…

মা আজকাল নীরবে হাসেন!

অলোকা বলে, লোকে বলে তোমাকে স্ত্রৈণ।…

অশোক হাসতে হাসতে জবাব দেয়, তাদের অলোকা নেই।…

কিন্তু আমার যে লজ্জা করে!

আমার ভাল লাগে। দু'হাতে অশোক অলোকাকে বুকের মাঝে টেনে নেয়!

* * * *

অলোকা নাকি সন্তানসম্ভাবিতা।…

গভীর রাত্রি; কেউ জেগে নেই; শুধু দূর আকাশের কোলে জাগে তারার দল!

অশোক অলোকাকে বুকের মাঝে টেনে নেয়, মৃদু কণ্ঠে শুধায়, হ্যাঁ বউ, তবে সত্যি!…

অলোকা অশোকের বুকে মুখ লুকায়।…

দিন যায়, মাস যায়! প্রতি সপ্তাহে ডাক্তার এসে অলোকাকে দেখে যান!

অনাগত শিশুর জন্য অসংখ্য খেলনা, জামা, পেনি, বিছানা, ঘর ভর্ত্তি হয়ে ওঠে।…

আজকাল স্বামী-স্ত্রীতে প্রায়ই তর্ক হয়—ছেলে হবে না মেয়ে হবে, তাই নিয়ে।

অশোক বলে, ছেলে।

না গো না মেয়ে। অলোকা বলে।

ছেলে হবে। নাম রাখব তার স্বপনকুমার!

মেয়েই হবে। নাম দেব তার রাত্রি।…

এমনি ক'রেই একদিন সেই দিনটি আসে।…

শেষ রাত্রির দিকে অলোকার একটি পুত্রসন্তান হয়, কিন্তু হতভাগ্য শিশুর সর্ব্বাঙ্গে বড় বড় জল ঠোসা।… যন্ত্রণায় থেকে থেকে শিশু চীৎকার ক'রে ওঠে! ডাক্তার শিশুর দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় মুখ ফিরান।…

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শিশুটি মারা গেল!

অলোকা তখনও অজ্ঞান।…পাশের ঘরে অশোকের

দুকান ভরে তখন শিশুর যন্ত্রণাকাতর ধ্বনি বাজতে থাকে !…

অশোকের মা, অশোক সকলে মিলে অলোকাকে সান্ত্বনা দেন !

দুঃখ কি, আবার ছেলে হবে !…

সত্যিই ত' দুঃখ কি !…

আবার অলোকা অন্তঃসত্ত্বা হয় !…

এবারে অশোক শহরের যেখানে যত বড় বড় ডাক্তার আছে কাউকেই বাদ দেয় না।

এবারে একটি মেয়ে হয় এবং মাত্র ঘণ্টা দুই বেঁচে শেষ নিঃশ্বাস নেয়; মারা যাবার ঘণ্টা দুই আগ পর্য্যন্ত সে কি করুণ চীৎকার !

তৃতীয় সন্তানও আঁতুড়েই মারা যায় ! ‥

অশোকের জননী মুখ বাঁকান !…

কোথাকার এক অলুক্ষুণে হাড়-হাভাতের ঘরের মেয়েকে নিয়ে এসেছে।…

বউয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হলে অশোকের জননী তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নেন।…

মা কিন্তু একদিন অশোককে ডেকে স্পষ্টই বলে দেন, তোমার জন্ম আমি মেয়ে দেখছি অশোক !…

অশোক মা'র কথার কোনই জবাব দেয় না, চুপ ক'রেই থাকে। অলোকার প্রতি সেও আজ বুঝি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছে !

সেদিন দুপুরে কি একটা কাজে নিজের ঘরে ঢুকে অশোক থমকে দাঁড়ায় !…

রাস্তার ধারের জানালার উপর চুপটি ক'রে বসে অলোকা ! গায়ের আঁচল স্খলিত হয়ে মাটীতে লুটাচ্ছে !…

অজস্র কেশপাশ তৈলাভাবে রুক্ষ। সারা পিঠময় ছড়িয়ে পড়েছে। একটা হাত কোলের উপর ন্যস্ত। বহু দিন সে এ ঘরে আসে না।

এই কি সেই অলোকা ! সেই অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী ! একদিন যার দিকে তাকালে চোখ ফিরান যেত না, আজ তার এ কি করুণ দৈন্য ?

সন্তান-ধারণের ব্যর্থ পরিসমাপ্তি বুঝি ওকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়ে গেছে ! কি করুণ রিক্ততা !

অশোক চুপি চুপি পালিয়ে এল !

সত্য সত্যই একদিন মধুর সুরে সানাই বেজে উঠ্‌ল !

অশোকের এবারের স্ত্রী ধনীর একমাত্র কন্যা, শিক্ষিতা, কলেজে-পড়া বনশ্রী।

…ফুলশয্যার রাত্রি তখনও শেষ হয় নি !

ঘরের ঈষৎ নীল আলো তখনও সমগ্র ঘরখানি জুড়ে স্বপ্ন রচনা ক'রে রেখেছে। ফুলের মৃদু সুবাস ঘরের বাতাসে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় !

বনশ্রী ঘুমিয়ে পড়েছে ! সমস্ত রাত্রির জাগরণে ক্লান্তি !…

গত রাত্রির চন্দনের ফোঁটাগুলি কপাল ও কপোলে শুকিয়ে উঠেছে !…

অশোক বনশ্রীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে !…মনে পড়ে হয়ত—এমনি আর একটি রাত্রিশেষের কথা ? ধীরে ধীরে ওর ওষ্ঠ দুটি বনশ্রীর ঘুমায়িত চোখের দিকে নত হয়ে আসে।

সহসা এমন সময় বন্ধ দুয়ারে প্রবল ধাক্কার শব্দে অশোক যেন ছিট্‌কে দূরে সরে যায় !…

দাদাবাবু ! দাদাবাবু গো !…

অশোক তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখে, বাইরে দাঁড়িয়ে হরির-মা !

কি ব্যাপার হরির-মা ?

ওগো দাদাবাবু ! হরির-মা হাঁপাতে থাকে।

কি ? কি হয়েছে ? উৎকণ্ঠায় অশোক ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

বৌমা ! ওগো বৌমা ! কান্নায় হরির মার গলার স্বর বুজে আসে।

অলোকা তার নিজ শয়ন ঘরের কড়িকাঠের সঙ্গে সাড়ীর আঁচল দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়ে গেছে !

হয় ত ভালই করেছে !

যথা সময় বনশ্রীও সন্তানসম্ভাবিতা হ'ল !

দিন যত এগিয়ে আসে, কি একটা অজানিত আশঙ্কা যেন অশোককে ছেয়ে ফেলে।

বনশ্রীর মনে যে ভয় হয় না, তাও নয় !

সে এবাড়ীর দাসী-চাকরের কাছ হতে সকল কিছুই শুনেছে।

কেমন ক'রে অলোকার তিন তিনটি নবজাত শিশু আঁতুড় ঘরে মারা গেছে কিছুই তার জানতে বাকী নেই।

মাঝে মাঝে পেটের মধ্যে জ্রণ যখন নড়াচড়া করে, বনশ্রী কেঁপে কেঁপে ওঠে।

তারপর সেই দিনটি আসে।

…গভীর রাত্রে নবজাত শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি অশোকের কানে তীরের মত গিয়ে বাজে।

অশোক দৌড়ে পাশের ঘরের দরজায় গিয়ে উঁকি মারে।

উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয়, অশোক দেখে, কুৎসিত এতটুকু একটি শিশু!…সর্ব্বাঙ্গে ঘা!…যন্ত্রণায় শিশুটি প্রাণপণে চীৎকার করছে।

অশোক ধীরে ধীরে দরজার পাশ থেকে সরে আসে।

ডাক্তার সেন সবে হালে বিলাত হতে ফিরেছেন!

কঠিন কণ্ঠে অশোকের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, It is useless! Child will expire very soon. কিন্তু এর জন্য দায়ী কে জানেন? আপনি! হাঁ, আপনি!

অশোক বারেকের তরে শিউরে ওঠে।

I and you should pay the penalty of your own crime.

ডাক্তারের ভারী জুতোর শব্দ বারান্দায় মিলিয়ে যায়।

ওঘর হতে শিশুর ক্রন্দন তখনও এক ঘেয়ে শোনা যায়।

গভীর যন্ত্রণায় সে তখনও কাত্‌রাচ্ছে!…কানের মধ্যে যেন গরম শিসে ঢেলে দেয়! অশোক তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়।

এ বাড়ীর ব্যর্থ সন্তানধারণের নির্ম্মম পুনরাবৃত্তি!

বিবাহের আগে অতীত জীবনের দিনগুলি ছায়াবাজীর মতই যেন চোখের পাতায় একে একে ভেসে ওঠে!

তার নীতি, তার শিক্ষা…তার সভ্যতা—সব কিছুই আজ যেন একটা বিরাট কঠিন ধিক্কারের মর্ম্মন্তুদ গ্লানিতে বিষিয়ে উঠেছে!

পর পর দুইটি নিষ্পাপ নারীর সন্তান ধারণের করুণ ব্যর্থতা; এর জন্য দায়ী কে?

তারই নিজের খাওয়া বিষের ক্রিয়া নয় কি?

অশ্লীলতার গভীর পঙ্কিলতায় কালো হয়ে আছে জীবনের যে অতীত পাতাগুলি, এ ত তারই ভ্রূকুটি মাত্র!

দেহ ভরে সেই কুৎসিত ব্যাধির নির্ম্মম চিহ্নগুলি আজিও হয় ত নিশ্চিহ্ন হয়ে একেবারে মিলিয়ে যায়নি!

দুর্ব্বিনীত জীবনের সেই অভিশাপ আজিও তার দেহের প্রতি রক্ত বিন্দুতে হয়ত ঘুরে বেড়ায়।

অলোকা!

চোখের জলে দৃষ্টি বুঝি ঝাপ্‌সা হয়ে আসে!

তারই কলঙ্ক ইতিহাসের কালিমাটুকু নীরবে বুকে তুলে নিয়ে নিঃশব্দে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেল!

হতভাগ্য নিষ্পাপ শিশুগুলি তারই কলঙ্কের বিষে বিষাক্ত হয়ে একে একে তাদের জন্মমুহূর্ত্তে চিরবিদায় নিয়ে গেছে পিতার বিরুদ্ধে নির্ম্মম অভিযোগের বিষাক্ত কাঁদুনি নিয়ে!…

কে? কে দায়ী?

ওঘর হতে নবজাত শিশুর একঘেয়ে কান্না দেওয়াল ভেদ ক'রে ছুটে আসে!

সমস্ত রাত্রি বিশ্বচরাচর সেই বিষাক্ত কান্নার বিষে বিষিয়ে ওঠে!

শিশুর দেহের বিষাক্ত জ্বালা অশোকের দেহের প্রতি রক্ত বিন্দুতে ছড়িয়ে পড়ে!

পাগলের মতই অশোক দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়!

না! না! এ কান্না ও আর শুনতে পারে না!

…দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে অশোক রাস্তায় এসে নামে! নীরব নিঝুম রাত্রি বুঝি বোবা হয়ে গেছে!

বোবা রাত্রির কঠিন মৌনতা ভেদ ক'রে শিশুর কান্নার সুর কানে এসে বাজে! অশোক জোরে জোরে হাঁটতে আরম্ভ করে!…

কাঁদুক। কত কাঁদতে পারে ও কাঁদুক!…

অশোক পালিয়ে যাবে, দূরে বহুদূরে, যেখানে ঐ একঘেয়ে বিষাক্ত কান্নার আওয়াজ পৌঁছুবে না।…

অশোক পাগলের মতই ছুটতে থাকে।

পাগলের মতই অশোক এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়।

দীর্ঘ দশদিন বাদে অশোক রাতের আঁধারে বাড়ীর সদর দেউড়িতে এসে দাঁড়ায়।

দরদালান পার হয়ে দক্ষিণ দিকে অশোকের শয়ন কক্ষ।

করুণ কান্নার শব্দ কানে ভেসে আসে।

অশোক থম্‌কে দাঁড়াল।

বুক ভাঙ্গা বেদনার্ত্ত হাহাকার।

ঘরের দরজাটা ভেজান, ঈষৎ ঠেলতেই খুলে যায়।

ত্রয়োদশীর ক্ষীণ চাঁদের আলো মুক্ত বাতায়ন-পথে ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে।

মেঝের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে বনশ্রী ফুলে ফুলে কাঁদছে, অজস্র কেশপাশ বিপর্য্যস্ত, পিঠেরই পাশ দিয়ে লুটিয়ে পড়েছে। বনশ্রীর কান্নার সুরে যেন সেই বিষাক্ত ঘেয়ো কান্নার দুঃস্বপ্ন, সেই ঘেয়ো শিশুদের যন্ত্রণা-কাতর মর্ম্মান্তিক বুকভাঙ্গা অভিযোগ, অশোক আর দাঁড়াতে পারে না।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে পালিয়ে আসে।

গভীর রাতে ঘুমের মাঝে অশোক চম্‌কে ওঠে।

মনে হয় ছোট ছোট শিশুর দল, সর্ব্বাঙ্গে তাদের বিষাক্ত ঘা, যেন তার চারিপাশে গভীর যন্ত্রণায় চীৎকার করে কাঁদে।

অশোক ধরফড়্‌ করে শয্যার 'পরে উঠে বসে।

দিনের পর দিন গভীর যন্ত্রণায় অশোক বুঝি পাগল হয়েই যাবে।

চোখ বুজ্‌লেই সেই ক্লেদাক্ত দুঃস্বপ্ন।

ছোট ছোট শিশুর দল, সর্ব্বাঙ্গে তাদের বিষাক্ত ঘা।

কণ্ঠে তাদের অভিযোগের মর্ম্মন্তুদ হাহাকার।

কিন্তু না ঘুমিয়ে মানুষ পারে নাকি? ঘুম যে তার চাই-ই। গভীর ঘুম!

তার সমগ্র দেহ ব্যেপে, তার সমস্ত দুঃস্বপ্নকে বিলুপ্ত করে দিয়ে নেমে আসুক ঘুম!...

কাঁদুক সেই ঘেয়ো শিশুর দল! তাদের অভিযোগ আজ আর ও শুনবে না।

কিছুতেই শুন্‌বে না।

না! না! না!

পায়ের উপর হ'তে এক সময় কম্বলটা স্খলিত হ'য়ে মাটীতে পড়ে গেছে।

সামনের দরজাটা হা হা করছে—খোলা।

বাইরে তুষারাচ্ছন্ন অস্পষ্ট বোবা রাত্রি!

কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যে কাদের অস্পষ্ট চাপা কান্নার শব্দ আসছে না?

অল্পে অল্পে ক্রমে অন্ধকারে চাপ বেঁধে উঠ্‌ছে!

কারা কাঁদে?

কেন কাঁদে?

অতিথি

শ্রীগায়ত্রী দেবী

কে তুমি অতিথি, মম হৃদয় দুয়ারে
মোহন মুরতি ধরি দিলে দরশন,
সমস্ত জগত প্রভু চাহে কি তোমারে
তুমিই কি মানবের সাধনার ধন?
মনে হয় যেন কত জন্মান্তর হতে
তোমা সনে আমি বুঝি চির-পরিচিত—
হৃদয়ের প্রতি স্তরে পরতে পরতে
বিশাল মুরতি তব রয়েছে অঙ্কিত!

কি দিয়া পূজিব তোমা না পাই খুঁজিয়া
দীন আমি অভাজন জগতের মাঝে
হৃদয় না হয় তৃপ্ত সর্ব্বস্ব সঁপিয়া
হেন রত্ন নাহি কোথা যা তোমারে সাজে!
তবু আনিয়াছি আজ হে অন্তরতম
লবে নাকি ও চরণে এ অর্ঘ্য আমার,
হৃদয়-চয়িত ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি মম
সর্ব্বস্ব সহিত এই ক্ষুদ্র উপহার।

মেঘদূতে পরাধীনতার পরিণাম

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এল, প্রত্নতত্ত্ববিশারদ

মেঘদূত কাব্যখানি মহাকবি কালিদাসের এক অতি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই খণ্ড কাব্যখানি আখণ্ড বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররসে আপ্লুত। কিন্তু তাই বলিয়া এই কাব্যখানিতে রস কখনই একেবারে নিম্নগামী হয় নাই। সাহিত্য-দর্পণে স্বয়ং বিষ্ণুকে শৃঙ্গাররসের অধিপতি বলা হইয়াছে, সুতরাং এই রসের বর্ণনা করা ঠিক সাপুড়িয়ার সাপ খেলার মত। সাপুড়িয়া একটু অসতর্ক হইলেই যেমন সর্প তাহাকে দংশন করিয়া বসে, তেমনই কবি একটু অসাধান হইলেই রস নিম্নগামী এবং অশ্লীল হইয়া পড়ে। কবি মাঘ এবং শ্রীহর্ষ শিশুপালবধ এবং নৈষধচরিত কাব্যে এই শৃঙ্গাররসের অবতারণা করিতে গিয়া অনবধানতাবশত উহার মর্য্যাদা এবং গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই; ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের এই দুইখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মহাকবি কালিদাস এই রসযোজনায় সিদ্ধহস্ত। এই রসের অবতারণা করিতে গিয়া তিনি কখনও আত্মবিস্মৃত হন নাই। তিনি যখনই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, রস নিম্নগামী হইয়া পড়িতেছে, তখনই তিনি পুনরায় উদ্দীপনার দ্বারা রস স্বস্থানে আনয়ন করিয়াছেন; সুতরাং তাহার হস্তে কখনই উহার অমর্য্যাদা বা গাম্ভীর্য্যের হানি হয় নাই। যাহা হউক রস, অলঙ্কার এবং ছন্দের কথা বাদ দিয়া এই কাব্যখানি কোন্ আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং ইহার মর্ম্মকথাই বা কি, এইক্ষণ তাহাই বিচার করিতে হইবে।

বহু বিখ্যাত সুধীব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছি যে এই অমূল্য কাব্যখানিতে শুধু যে বিরহী যক্ষ তাহার বিয়োগবিধুরা প্রিয়ার প্রতি গভীর প্রেম এবং বিরহব্যথা নিবেদন করিয়াছে তাহাই নহে, বস্তুত ইহাতে বিশ্বের সমগ্র নারীজাতির প্রতি বিশ্বের সমগ্র পুরুষ জাতির গভীর প্রেম প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং অন্তরের বিরহবেদনা বাজিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে হিসাবে এই কাব্যখানির মূল্য কতটুকু এবং আদর্শের গৌরবই বা কতখানি তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। কাব্যের প্রারম্ভেই কবি যক্ষকে কামী বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন;

> "তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ সকামী—
> নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।"

সেই কামুক যক্ষপত্নী বিরহিত হইয়া সেই পর্ব্বতে কয়েক মাস অতিবাহিত করিলে তাহার কনকবলয় পতিত হওয়ায় মণিবন্ধপ্রদেশ ভূষণশূন্য ছিল।

যক্ষ স্ত্রীসম্ভোগহেতু নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করায় রাজাধিরাজ কুবের কর্ত্তৃক রামগিরি পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। এইক্ষণ সে তাহার প্রিয় পত্নীর বিরহে কাতর এবং রুগ্ন, কামে তাহার অন্তর জর্জ্জরিত। প্রিয়ার সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে তাহার ব্যাকুল বাসনা; সুতরাং কোন কবির পক্ষে এইরূপ কামপিপাসাপূর্ণ ভালবাসাকে আদর্শ প্রেম বলিয়া জগতের সমক্ষে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ না হইলেও আদর্শ হিসাবে ইহার মূল্য অতীব নিকৃষ্ট। আর তাহা হইলে সর্ব্বকালে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের দ্বারা ইহা কখনই সমাদৃত হইত না, ইহা সম্প্রদায়বিশেষের নিজস্ব সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু এই সরস কাব্যখানি দেশকালপাত্রনির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে তুল্যভাবে উপভোগ্য এবং আদরণীয়। তাহা হইলে এই কাব্যখানি এমন কোন আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহাতে এমন কোন গূঢ় মর্ম্মকথা আছে, যাহাতে কালের শত শত আবর্ত্তনের মধ্যেও ইহা সঞ্জীবিত থাকিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে। সেই আদর্শ এবং মর্ম্মকথা কি, তাহা বুঝিতে হইলে মহাকবি কালিদাসের জীবনী সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন হইবে।

মহাকবি কালিদাস সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্বে এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত মৌলিক গবেষণার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে; এমন কি, আমাদের বাঙ্গলা দেশেও তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত মতামত প্রকাশ করা সমীচীন বা আদৌ সম্ভবপর নহে। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে তিনি সম্ভবত কাশ্মীর বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন, "Kalidasa, although a resident of Ujjainy, was in all likelihood, a native of Kashmir or of a contiguous province."(—Dr. Bhan Daji.) জীবনের প্রথমাবস্থায় তিনি অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। দারিদ্র্যের নির্ম্মম পীড়নে তিনি তাহার প্রাণাধিক পত্নী এবং স্বীয় আবাসভূমি কাশ্মীর পরিত্যাগ করিয়া সুদূর মধ্যভারতে রাজবৃত্তি গ্রহণ করিয়া উজ্জয়িনী নগরীতে বসবাস করিতেন। প্রাচীন ইতিহাসে উজ্জয়িনী নগরী বিশাল, অবন্তী এবং অবন্তিকা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রচলিত মতানুসারে তিনি সম্বতাব্দের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভা শোভন করিয়াছিলেন; আবার কাহারও কাহারও মতে তাঁহার সময়ে রাজা হর্ষ বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর সিংহাসন আলোকিত করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক না কেন, তিনি যে প্রচুর সমৃদ্ধশালিনী উজ্জয়িনীর বৃত্তিভোগী রাজকবি ছিলেন ইহা সুনিশ্চিত।

রাজবৃত্তি গ্রহণ করায় কালিদাসের আর্থিক অসচ্ছলতা দূরীভূত হইলেও তিনি উহাতে আদৌ মানসিক শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং যথেষ্ট রাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি যে অভাবের তাড়নায় স্বাধীনতা বিসর্জ্জন

দিয়া পরাধীনতার নিগড় পরিধান করিয়াছেন, এই চিন্তাই সব সময়ে তাঁহার নিকট বিষম যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া মনে হইত ; হয়ত বা তিনি এই দাসত্বের শৃঙ্খলকে তাঁহার কবিত্বশক্তির সম্যক্ স্ফুরণের পথে সময়ে সময়ে অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেন। পরাধীনতার বেদনা এবং কি ভাবে ইহা মনকে অধঃপতনের দিকে ক্রমশ টানিয়া লইয়া যায় তাহা তিনি নিজেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। সর্ব্বোপরি যৌবনে প্রাণপ্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সুন্দর উজ্জয়িনী নগরীতে অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে অতীব ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিল। এক দিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল, অন্য দিকে প্রাণাধিকা কান্তার বিরহ—এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া তাঁহার নিকট তাঁহার নিজের জীবন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই দোটানার মর্ম্মবেদনা মেঘদূতের কয়েকটি শ্লোকে অতি সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এইখানেই মেঘদূত কাব্যের সৌন্দর্য্য এবং গৌরব। বস্তুত এই কাব্যখানিতে মহাকবির আত্মজীবনীর ছায়া পরিষ্কাররূপে প্রতিফলিত হইয়াছে, "Kalidasa, under the guise of a Yaksha, seated on the mountain Ramgiri in Central India, addresses one of the heavy clouds gathering in the south and proceeding in a northernly course towards the Himalaya mountains, the fictitious position of the residence of the yaksha. He desires the cloud to waft his sorrows to a beloved and regretted wife."—Dr. Bhan Daji.

মেঘদূত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, কবি যক্ষকে তাঁহার কাব্যের নায়ক নির্ব্বাচন করিলেন কেন এবং ইহার সার্থকতাই বা কি। যক্ষ ছিল ধনাধিপ কুবেরের প্রধান কিঙ্কর। সুতরাং সে হিসাবে পরাধীনবৃত্তি গ্রহণ করিলেও মান এবং প্রতিপত্তি তাহার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এইরূপ প্রধান কিঙ্করেরও যে কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহা কবি কাব্যের প্রথম শ্লোকেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

> কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
> শাপেনাস্তং গমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
> যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
> স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু ॥

—কোন এক যক্ষ নিজের কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করায়—প্রভু কর্ত্তৃক কান্তাবিরহহেতু দুঃসহ বর্ষব্যাপী নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় মহিমাহীন দীনদশাগ্রস্ত হইয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে স্নিগ্ধ ছায়াতরুপরিশোভিত আশ্রমে বাস করিয়াছিল। ঐস্থানের নদী জলাশয়াদি পূর্ব্বে জানকীর অবগাহন দ্বারা পবিত্র হইয়াছিল।

যক্ষের অপরাধ হইতেছে যে সে নিজপত্নী সম্ভোগহেতু তাহার কর্ত্তব্য-কর্ম্মে একটু অবহেলা করিয়াছিল। যৌবনে নিজের প্রিয়ার সহিত বিলাসে কর্ত্তব্যকর্ম্মে একটু আধটু ত্রুটি অনেকেরই হইয়া থাকে। এরূপ অপরাধ দণ্ডার্হ হইলেও কোন একটা লঘুদণ্ড বোধ হয় ইহার পক্ষে যথেষ্ট হইত। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তাহাকে অতীব কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইল ; তাহাকে এক বৎসরের জন্য সুদূর রামগিরি পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত করা হইল। শুধু তাহাই নহে, তাহার অতি কষ্টের এবং বহু তপস্যার ফল অষ্টসিদ্ধি তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল। ফলে সে হতশ্রী হইয়া অতি দীন দশা প্রাপ্ত হইল। এইরূপে লঘু পাপে গুরুদণ্ডের বিধান করা হইল ; কিন্তু পরাধীনবৃত্তির এমনই মহিমা যে, ভৃত্যের পক্ষে প্রভুর অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই। তাহাকে প্রভুর সমস্ত অন্যায় এবং অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে হইবে। যক্ষকেও তাহাই করিতে হইয়াছিল।

স্বাধীনতা হারাইয়া কবি কালিদাসের যে কিরূপ মানসিক গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল তাহা মেঘদূতের অষ্টম শ্লোকে অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে—

> ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্গৃহীতালকান্তাঃ
> প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ।
> কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং
> ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ ॥

হে মেঘ, তুমি বায়ুমার্গ অবলম্বন করিলে প্রোষিতভর্ত্তৃক রমণীগণ স্বামী আসিবেন এই বিশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া কুন্তলরাজি উত্তোলনপূর্ব্বক তোমাকে অবলোকন করিবে। আমার ন্যায় যে ব্যক্তি পরাধীন তদ্ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি তোমাকে সমুদিত দেখিয়া বিয়োগবিধুরা পত্নীকে উপেক্ষা করিতে পারে ?

কবির অন্তরে দারুণ কামপিপাসা, অথচ পরাধীনতার লৌহপাশে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরহকাতরা পত্নীর সহিত মিলিত হইবার উপায় নাই—এইস্থানে কবির অন্তরে শেল বিদ্ধ হইয়াছে এবং তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

কবি পরাধীনতার চরম দুর্দ্দশা মেঘদূতের বিংশতি শ্লোকের শেষ চরণে অতি সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

> রিক্তঃ সর্ব্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায়।

সারহীন সর্ব্বব্যক্তি লঘু হয়, পূর্ণতা গৌরবের নিদান।

যে পর্য্যন্ত লোকের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে সে পর্য্যন্ত লোকের সারবত্তা বজায় থাকে ; সুতরাং তাহার গুরুত্বও পূর্ণ এবং অম্লান থাকে কিন্তু স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলিলে মানুষ একেবারে অন্তঃসারশূন্য হয়, তাহার আর কোনরূপ গুরুত্বই থাকে না ; সে একেবারে পদার্থহীন হইয়া পড়ে। যক্ষেরও অবিকল সেই অবস্থা হইয়াছিল। পরাধীনতার জন্য সে আজ তাহার অন্তরের সারবস্তু বহুকষ্টে অর্জ্জিত অষ্টসিদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছে। আজ সে একেবারেই দীন, হীন, নিঃস্ব এবং পদার্থবিহীন।

অনুচরের যে প্রভুর অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই এবং অনন্যোপায় হইয়া তাহাকে যে প্রভুর সমস্ত দণ্ড নীরবে সহ্য

করিতে হইবে তাহা কবি উত্তরমেঘের শেষভাগে অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

নম্বাত্মানং বহু বিগণয়ন্নাত্মনৈবাবলম্বে
তৎকল্যাণি ত্বমপি নিতরাং মা গমঃ কাতরত্বম্।
কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ ॥ ৪৮ ॥

—হে কল্যাণি, অনেক চিন্তা করিয়া আমি স্বয়ং ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকি। তুমিও অত্যন্ত কাতর হইও না। এই জগতে কাহারই বা ঐকান্তিক সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হয়। চক্রধরের ন্যায় দশা নিম্নে ও উপরে গমন করে।

প্রভুর অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক, এইখানে কবি পরাধীনতার নিকট একেবারে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে কবি তাঁহার পুরুষকারও বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

রাজবৃত্তি গ্রহণ করায় কবির যে কতদূর মানসিক অধোগতি হইয়াছিল তাহা মেঘদূতের ষষ্ঠ শ্লোকে বিশদভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাৎ দূরবন্ধুর্গতোঽহং
যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা ॥

—হে মেঘ, তুমি পুষ্করাবর্ত্তকদিগের ভুবনবিখ্যাত বংশে সমুৎপন্ন হইয়াছ; তুমি ইচ্ছানুসারে নানা রূপ ধারণ করিতে পার এবং ইন্দ্রের একজন প্রধান কর্ম্মচারী তাহা আমি জানি। এই জন্য দৈব দুর্ব্বিপাক-বশত প্রিয় ব্যক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমি তোমার নিকট প্রার্থীরূপে উপস্থিত হইয়াছি। গুণী ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করিয়া বিফল হওয়াও বরং ভাল; কিন্তু অধম ব্যক্তির নিকট প্রার্থনার সাফল্য বাঞ্ছনীয় নহে।

এইরূপ কবিতা রাজার নিকট রাজকবির মনস্কাম পূর্ণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে বটে, কিন্তু ইহার প্রতি চরণের সহিত কবির অন্তর ধাপে ধাপে নামিয়া আসিয়াছে। পরিশেষে পরাধীনতার পরিণামে অন্তরের চরম দুর্দ্দশা উত্তরমেঘের শেষাংশে একটি শ্লোকে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

কচ্চিৎ সৌম্য ব্যবসিতমিদং বন্ধুকৃত্যং ত্বয়া মে
প্রত্যাদেশান্ন খলু ভবতো ধীরতাং কল্পয়ামি ॥
নিঃশব্দোঽপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ
প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব ॥ ॥ ৫৩ ॥

—হে সৌম্য, তুমি কি বন্ধুর এই কার্য্য করিবে? তোমার এই ধীর নিরুত্তর ভাব প্রত্যাদেশ জন্য নহে ইহা মনে করি। অথবা করিব ইত্যাদি অঙ্গীকারবাক্যে ধীরতা হয় না ইহাই মনে হয়। প্রার্থিত হইয়া তুমি নিঃশব্দে চাতকদিগকে জলদান করিয়া থাক। অভিলষিত অর্থ সম্পাদন করাই যাচকদিগের সাধুগণের প্রতি-প্রত্যুত্তর।

এইরূপ স্তুতিবাক্যে মানুষ তো দূরের কথা, বোধ হয় অতি কঠিন পাষাণও দ্রবীভূত হয়। নবরত্নপরিবেষ্টিত রাজা বিক্রমাদিত্যের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল সহজেই অনুমান করা যায়।

পরিশেষে কবি স্বাধীনতা হারাইয়া মানসিক ক্লেশের চরম অবস্থায় উপনীত হইয়া নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়াছেন এবং বিধাতা পুরুষের উপর দোষারোপ করিয়াছেন।

ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া-
মাত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত্তুং।
অস্ত্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌকৃতান্তঃ ॥—উত্তরমেঘ, ৪৪॥

—হে প্রিয়ে, তুমি প্রণয়াভিমানিনী হইয়াছ, এইরূপ চিত্র শিলাতলে ধাতুরাগ দ্বারা অঙ্কিত করিয়া আমি তোমার চরণে পতিত হইয়াছি, এইরূপ চিত্র করিতে যেই ইচ্ছা করি, তৎক্ষণাৎ মুহুপ্রবৃদ্ধ অশ্রুরাশিতে আমার চক্ষু আবৃত হইয়া যায়। নিষ্ঠুর বিধাতা চিত্রেও আমাদিগের সঙ্গম সহ্য করিতে পারেন না।

কবির নিজের দুঃখকষ্টের মর্ম্মস্পর্শী করুণ কাহিনী এই শ্লোকের প্রতি অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মেঘদূত কাব্যখানি মহাকবি কালিদাসের আত্মজীবনী এবং স্বীয় অভিজ্ঞতার অনুরূপ প্রতিচ্ছবি। পরাধীনতার জন্য কবির নিজের দুঃখকষ্ট এবং মানসিক অধোগতির করুণ কাহিনী ইহার অক্ষরে অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বস্তুত মর্ম্মবেদনার এইরূপ প্রাণস্পর্শী করুণ কাহিনী ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কাহারও লেখনী হইতে নির্গত হওয়া সম্ভব নহে। এইজন্যই মেঘদূত কাব্যখানি এত সুন্দর, এত মধুর এবং এত মর্ম্মস্পর্শী।

গান

ছায়ানট—তেতালা

পূজারী দাঁড়ায়ে আজি তব দুয়ারে।
খোল দ্বার ফিরায়োনা বারে বারে ॥
হৃদয় নিঙাড়ি তার
আনে ব্যথা উপচার
আঁখির মিনতি ঝরে নয়ন ধারে ॥

হে পাষাণ, খোল দ্বার করোনা হেলা
বাহিরে আঁধার ঘিরে—গেল যে বেলা।
রজনী প্রভাতে যবে
এ-পূজারী নাহি রবে
ফিরায়ে আনিবে প্রিয় কেমনে তারে ॥

কথা ঃ—শ্রীজগৎ ঘটক   সুর ও স্বরলিপি ঃ—কুমারী বিজন ঘোষ দস্তিদার

৩ ০ ১ +
II গমণা ধা পা পক্ষধপা | রা গা মধা পধা | মা রা সন্‌া সা | মা রা -া -া I
পূ০০ জা রী দাঁ০০০ ড়া য়ে আ০ জি০ ত ব দু০ য়া রে ০ ০ ০

I সরা সগরা ণ্‌ধ্‌া -প্‌া | প্‌া প্‌রা রা রা | গগা -রগা মধা পধা | মপমা -গমগা -রগরা -সা II
খো০ ল০০ দ্বা০ র্‌ ফি রা০ য়ো না বা০ ০০ রে০ বা০ রে০০ ০০০ ০০

৩ ০ ১ +
II র্সা সা মগরগা মা | পা ক্ষা পা -া | র্সনা র্সা পনর্সর্রা র্সনর্সা | ণধপা পধণা ধা -পা I
হৃ দ য়০০০ নি ঙা ড়ি তা র্‌ আ০ নে ব্য০০০ থা০০ উ০০ প০০ চা র্‌

I পা র্সণা ণা ণধপা | পধা ধণধপা মা মা | রা পমা রসা মরা | সা -া -া -া I
আঁ খি০ র মি০০ ন০ তি০০০ ঝ রে ন য়০ ন০ ধা০ রে ০ ০ ০

I সরা সগরা ণ্ধ্া -প্া | প্া প্রা রা রা | গগা -রগা মধা পধা | মপমা -গমগা -রগরা -সা II

খো০ ল০ ০ ষা০ র্ ফি রা০ য়ো না বা০ ০০ রে০ বা০ রে০০ ০০০ ০০০ ০

৩ ০ ১ +

II মরা সরা মা -া | মরা মপা ক্ষা পা | মা মণা ধপা পণধা | পক্ষপা -া -া -া I

হে০ পা০ ষা ণ্ খো০ ল০ দ্বা র্ ক' রো না০ হে০০ লা০০ ০ ০ ০

I ক্ষপা ক্ষপধনা সর্রা সর্গর্রা | সনা রর্সা ধণা ধপা | ক্ষা পা ধণা পধা | পমা -া -া -া I

বা০ হি০০০ রে০ আঁ০০ ধা০ র০ ঘি০ রে০ গে ল যে০ বে০ লা ০ ০ ০

৩ ০ ১ +

I ন্া সা মগরগা মা | পা পা ক্ষা পা | না র্সা পনসর্রা সর্রা | ণধপা পধর্সণা ধা পা I

র জ নী০০০ প্র ভা তে য বে এ পূ জা০০০ রী০ না০০ হি০০০ র বে

I নর্সা র্গর্রর্গা সর্না র্সা | পধা পধা মা মা | সা মরা গমপা মধপা | মরা -া -সন্া -সা I

ফি০ রা০০ য়ে০ আ নি০ বে০ প্রি য় কে ম০ নে০০ তা০০ রে০ ০ ০০ ০

I সরা সগরা ণ্ধ্া -প্া | প্া প্রা রা রা | গগা -রগা মধা পধা | মপমা -গমগা -রগরা -সা II II

খো০ ল০০ ষা০ 'র্ ফি রা০ য়ো না বা০ ০০ রে০ বা০ রে০০ ০০০ ০০০ ০

মোহ-মুক্তি

নাটক

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

একবিংশ দৃশ্য

স্থান—তিনকড়িবাবুর বৈঠকখানা

সময়—রাত প্রায় নয়টা

উপস্থিত—তিনকড়ি, তারানাথ, শ্রীপতি—সকলেই চিন্তাকুল

তিনকড়ি। (শ্রীপতির প্রতি) তার পর ?

শ্রীপতি। ননীর ভাসুর শচীন্দ্রবাবুকে নন্দ বিশেষ শ্রদ্ধা করে। তিনিও নন্দকে ভালবাসেন। তাই আবশ্যক ভেবেই তিনি সকল কথা নন্দকে অসঙ্কোচে বলেন ও যেমন ক'রে হোক্ কাকাবাবুকে এই সব কদর্য্য বিষয় ও অভদ্র ব্যাপার থেকে নিরস্ত করতে বলেন এবং এ কাজের শেষ পরিণামও জানিয়ে দেন। পনর দিন পূর্ব্বে নন্দ তাই করতেই এসেছিলেন। তোমরা জান নন্দকে তিনি কত ভালবাসেন। এ সব তার জন্যেই তিনি করছেন।

তারানাথ। Nonsense—ওটা তোমার কাকার প্রকৃতি—দুরভিসন্ধির ধুরন্ধর। তার জয়ের আনন্দটাই তিনি উপভোগ করেন। নন্দকে ভালবাসা! ওসব লোকের কোমল বৃত্তি! পাগল আর কি।

শ্রীপতি। তুমি জান না তারানাথ—ভীষণ দুর্বৃত্তদেরও কোন না কোনও soft corner থাকে—মানুষ তো!

তারানাথ। যদি সত্যিও হয়—তা হ'লেও সেটা শেখবার বস্তু নয়। ওরকম বাপ প্রার্থনার জিনিষও নয়—

তিনকড়ি। যাক্ ও কথা—ছেলে তো বাপ বাছাই ক'রে আসে না, সে কি করবে ?

শ্রীপতি। নন্দ তাঁকে ঐ সব জঘন্য ব্যাপার থেকে নিরস্ত করবার জন্যেই এসেছিল। শেষ তাঁর হাতে পায়ে ধ'রে—বিপদের গভীরতা ও পরিণাম জানিয়ে বলে—তা হ'লে আমাকে আপনি ত্যাগই করলেন! তাতেও কোন ফল হয়নি। কাকার ধারণা—ওসব কলেজে পড়া উদার নীতি, তিন মাসে সব বুঝতে পারবে, মত বদলে যাবে। নন্দ শেষে হতাশ হয়ে বাপকে একখানি খোলা চিঠি লিখে রেখে চ'লে গিয়েছে।

তিনকড়ি। এতটা তো জানা ছিল না—নন্দ কি তা হ'লে সত্যি সত্যিই বাড়ী ছাড়ল ?

শ্রীপতি। হ্যাঁ, যাবার সময় গোপনে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে অনেক কথা ব'লে গেল। বললে—'এ সব যদি আমার ভালর জন্যেই ক'রে থাকেন, আমি যত সত্বর সে সব সংস্রব ত্যাগ ক'রে চ'লে যেতে পারি, তাতে উভয়েরই মঙ্গল। আমি ওসব কিছুই চাই না—আমি চললুম দাদা। এ ছাড়া তাঁকে নিরস্ত করবার বা বিপদ থেকে উদ্ধার করবার অন্য উপায় নেই। আপনি আমার সন্ধান করবেন না। আমি কোথায় যাব, কোথায় থাকব, কি করব—কিছুই জানি না, ভাবিও নি। যা ভাল হয় করবেন, মাকে দেখবেন।' বলতে বলতেই অন্ধকারের মধ্যে চলে গেল।

তিনকড়ি। (সাগ্রহে) আর দেখা হয়নি, তারপর ?

শ্রীপতি। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) আর কি শুনবে! কাল কলকেতায় গিয়েছিলুম। পেছন থেকে কে ডাকলে। ফিরে দেখি ডিমনোষ্ট্রেটর ভবনাথবাবু। জিজ্ঞাসা করলেন, 'নন্দর খবর জান ?' বললুম 'না, বাড়ীতে তো নেই।' বললেন, 'আজ পাঁচ দিন হ'ল তাকে দার্জ্জিলিং স্যানাটরিয়ামে দু-তিনটি বন্ধুর সঙ্গে দেখলুম। সকলেরই মাতাল অবস্থা! নন্দ মদ খেতো নাকি ?' বললুম, 'সে কি, না, কখনো তো দেখিনি!' বললেন, 'একদম বেহেড্ দেখলুম যে! আমি কোথায় তার জন্যে—যাক্—' চলে গেলেন।

তিনকড়ি। বলো কি ?

শ্রীপতি। এখন আমার কি করা উচিত! আমার কথা কাকা শুনবেনই না—বিশ্বাস করা তো দূরের কথা। শত্রু বলেই জানেন।

তারানাথ। তিনি ঠিক্ ভাববেন—তুমি সব জান, মজা করতে এসেছ।

তিনকড়ি। আশ্চর্য্য নয়।

শ্রীপতি। (তিনকড়ির প্রতি) তুমি যদি সঙ্গে থাক তো চেষ্টা পাই।

তিনকড়ি। না ভাই, পারব না। কি বলতে যাবে শুনি? নন্দ তাঁকে কিছু বলতে বাকি রেখেছে কি? মুখে যা পারেনি, পত্রে তা ব'লে থাকবে। এখন কেবল শোনাতে যাওয়া—'নন্দ মদ ধরেছে—'

তারানাথ। অমন ছেলেটাকে জাহান্নামে দিলেন!

শ্রীপতি। চন্দ্রবাবুকে ধরলে কি হয়?

তিনকড়ি। তিনিই ধরে আছেন তোমার খুড়োকে। যা করবে একদিন পরে ক'র—তাড়াতাড়ি কেন! মাথা স্থির হোক্।

তারানাথ। সেই ভাল শ্রীপতি। রাত হয়েছে, এখন ওঠা যাক্।

শ্রীপতি। (উদাসভাবে) নন্দর কি সর্ব্বনাশটাই করলেন!

তারানাথ। চলো—

সকলে উঠলেন

দ্বাবিংশ দৃশ্য

স্থান—৺ব্রজ লাহিড়ীর বাগান-বাড়ীর সম্মুখ
সময়—বৈকাল, প্রায় সন্ধ্যা
উপস্থিত—ভক্তগণ

কেহ দড়িতে আমপাতার টানা বাঁধচে, কেহ কলাগাছ ও পূর্ণকুম্ভ বসাচ্ছে, কেহ দেবদারুর বেড় তৈরি করছে। বাড়ীর কপাল-ফলকে লাল সালুর ওপর তুলো বসিয়ে বড় বড় হরপে লেখা—

—"শ্রী-নাম ও দান মন্দির"—

ব্যস্তভাবে নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। এখনো সব নিড়্‌বিড়্ করচো যে! ও চালে চলবে না। সারারাত খাটতে হবে—

বিপিন। তবে এই বেলা ছ'টা লণ্ঠনের ব্যবস্থা ক'রে রাখুন।

নিবারণ। হচ্ছে। প্রভু সেই যে আসনে বসেছেন, এখনো ওঠবার নাম নেই। তিনি না উঠলে কাকে বলি।

বিপিন। তবেই হয়েছে! তিনি সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত পাচার ক'রে উঠবেন, দেখে নিও। ওঁর কি আর এসব মনে আছে?

রাখাল। এই দেখে আসছি, কি কঠোর সাধনা ভাই! ব'সে আছেন যেন দেরকো! নাকের ওপর একটা শিখা মাঝে মাঝে দপ্ দপ্ করে উঠছে। চন্দোর-বাবু শুনে আড়ষ্ট! কি কাজ ছিল—এগুতে পারলেন না।

মন্টু। প্রভুর প্রভাবে দেখে নিও—এই অভিরামপুর একদিন হরিনাভী দাঁড়িয়ে যাবে। এই বাগানের মধ্যেই ছ' গজ করে জায়গা—পঞ্চাশ টাকা নিয়ে বিলি করছেন। আমি ঐখানটা (অঙ্গুলীনির্দ্দেশ) নিয়ে ফেললুম—চায়ের দোকান খুলব—

রাখাল। খাসা হবে। টাকা দিয়েচিস্?

মন্টু। দিইনি আবার? এই চোটের মুখে খাতিরে কাজ হয় না বাবা। কোথা থেকে সব খবর পেয়ে লোকে পিল্ পিল্ ক'রে দূর দূর থেকে এসে টাকা নিয়ে সাধাসাধি লাগিয়েছে! ঘরের কাছে—আমরা জানতে পারিনি! বেগুনি, ফুলুরি, নামাবলী বার দিনেই বসে যাচ্ছে। সকালে টাকার ডাঁই দেখেছি! একা মধু মোদকই দশ গজ নিলে। সন্দেশ, রসগোল্লা আর বাতাশা রাখবে।

নরহরি। (আগন্তুক) দয়া ক'রে আমাকে একটু দেওয়ান বাবুরা। টাকা নিয়ে বেড়াচ্ছি, কা'কে ধরতে হবে—জানি না বাবু। আমি এই কদ্‌মা, ওলা আর বীরখণ্ডি রাখব। আমার প্রতি দয়া করুন বাবুরা।

রাখাল। বেশ তো—ভাবচ কেন? দেখছ না —প্রকাণ্ড বাগান, অমন্ দু'শো ছ' গজ আছে। আজ তো প্রভু উঠবেন বলে' মনে হয় না। কাল বেলা আটটার মধ্যে ধরলেই হবে। তার পর মহামারি উৎসব।

নরহরি। আমি শিঙুর থেকে এসেছি বাবু, এই রোয়াকেই আজ পড়ে থাকব।

নিবারণ। বেশ কথা, এখন এঁদের সঙ্গে কাজে লেগে যাও। পুণ্য করাও হবে—প্রভু শুনে খুশীও হবেন। এই সামনেটা চেঁচে পরিষ্কার ক'রে রাখো। এলেই তাঁর নজর পড়বে, আমরাও তা হ'লে বলবার সুযোগ পাব।

নরহরি তৎক্ষণাৎ গায়ের কাপড় ফেলে কোমর বেঁধে

নরহরি। দ্যান্, কোদাল দ্যান্ বাবু।

নিবারণ। বিপিন, কোদাল এনে দাও।

একটা প্রকাণ্ড দেবদারুর ডাল ঘেঁশড়াতে ঘেঁশড়াতে সুকুমারের প্রবেশ

সুকুমার। এই নিন।

নিবারণ। (নরহরির প্রতি) আচ্ছা, এইটে ততক্ষণ ছড়ে ফেল।

নরহরি পাতা ছাড়াতে লেগে গেল। দিবাকর করবী, জবা, গোলকচাঁপার ঝাড় প্রভৃতি এক টুকরি এনে

দিবাকর। এই নাও।

নিবারণ। থ্যাঙ্ক্ ইউ! এই তো চাই।

দিবাকর। আমি প্রভুর কাছে চললুম। ফুল তুল্‌তে তুল্‌তে হরির কৃপায় মনে হ'ল, আমি ফুলের দোকানই করব। যাত্রীরা তো ফুল সঙ্গে নিয়ে আসবে না। বাপ্! সেই ত্রিবেণী থেকে লোক ঝুঁকেছে হে! এসব খবরই বা দিলে কে! বাবা, হিঁদুর দেশ, তায় রাধারাণীর আবির্ভাব! বিলম্ব করলে রম্ভা, তাই ছুটে এলুম। সকালে বুঝতে পারি নি, ভাবলুম কিসের এত টাকা প্রভুর সামনে পড়ছে! চন্দোরবাবু গুণে থাক লাগাচ্ছেন! চললুম্, গপ্প ব'নে যাবে, মায়ের কৃপায় গপ্প ব'নে যাবে—

উল্লাসে লম্ফ

নিবারণ। প্রভু এখন ধ্যানস্থ, এই দেখে এলুম।

দিবাকর। তবে? তবে একটা বিড়ি ছাড়, ঘুরে ঘুরে জান্ গেছে। আমার কিন্তু ছ গজ চাই-ই, আর ছ্যাখো, একটা পরামর্শ দাও দাদা। দই, চিঁড়ে, মুড়কি প্লস্ গুড়ং, আর ওই সঙ্গে কতকগুলা মাল্‌সা রাখলে হয় না? একদম বিশুদ্ধ বৈষ্ণবী রেস্তোরঁ!

নিবারণ। তোর মাথা খুব খ্যালে দেখছি—মার্ভেলাস্ আইডিয়া! খুব হয়, খুব হয়, জমির ভাবনা কি, বহুৎ আছে, এন্তার্—লাহিড়ী-ল্যাণ্ড্! (নরহরিকে দেখিয়ে) এই এঁরও চাই। নে না সব, কত নিবি—

নরহরি। (সবিনয়ে হাত জোড় ক'রে দিবাকরকে) আপনার পায়ের তলায়ই—দয়া করবেন হুজুর।

নিতি গয়লানীর প্রবেশ

নিবারণ। এই যে নেত্য, এসো এসো! বড় সময়েই এসেছিস্—না চাইতে জল্—তা সেটা তোদের পুরুষানুক্রমে—

নিতি। আহা-হা, আমার জলের কারবার কি-না! পয়সা দিতে না পারলেই—ওই সব কথা। আমি মরচি, এখন আমি রাতারাতি আড়াই মণ দুধ কোথায় পাই বল দিকি? এক পয়সা বায়নার নাম নেই! তিনবার এলুম। প্রভু থামের মত ভিত্ গেড়ে বসে আছেন!

কার্য্যান্তরে ডাক্ পড়ায় নিবারণ ছুট্‌ল

বিপিন। আহা রাগ কর কেন নেত্য, ধর্ম্মকর্ম্মে অত টাকা-টাকা করতে আছে কি? যে রকম টাকা আসছে—পাই-পয়সা, বুঝলে—দেখতে হবে না।

নিতি। হ্যাঁ, তা আর আমাকে দেখতে হবে কেন! আমার মুখ্ দেখে গরু দুধ্ দেবে।

নিবারণ। (ফিরে এসে) দ্যায় না? অনেক গরু দেয়। মিছে কথা ব'ল না।

নিতি। ও—তাই গায়ে লেগেছে, জানতুম না।

রাখাল। সন্ধ্যে হ'ল যে, লণ্ঠন কই নিবারণবাবু?

বিপিন। এই যে নেত্য রয়েছে।

নিতি। তোমাদের তামাসা রাখ! আমার মাথায় বিশ্ মণ পাথর। মুখের কথায় কেউ আড়াই মণ দুধ দিক্ না দেখি! সন্ধ্যে হয়ে গেল, আর কি দাঁড়াতে পারি গা?

নিবারণ। দাঁড়িয়ে থাকতে কে বলচে? যাও না, গিয়ে ততক্ষণ জলটা তুলে রাখলেও তো কাজ এগিয়ে থাকবে। আড়াই মণ হতে' আর কতক্ষণ!

নিতি। (চোখ মুখ ঘুরিয়ে—মাথা নেড়ে)—এ হরিনাম মিশিয়ে সাধু হওয়া নয়।

হারু ভট্‌চাযের প্রবেশ। সাজানো মণ্ডপ দেখে—

হারু। বাঃ, কি চমৎকার দেখাচ্ছে। হরির ইচ্ছা কি-না! একে বলে চাক্ষুষ ধর্ম্মবল্। সিদ্ধপীঠ—সিদ্ধপীঠ; এই বাহান্নর ওপর তিপ্পান্ন চাপ্‌ল। আহা রাধারাণী যেন হাস্য করছেন। এতদিনে বেটীর দান সার্থক হ'ল।

নিতি। (নিবারণের দিকে) হাস্য করছেন না আর

কিছু—এই দেখে এলুম, মুখ্ তোলো হাঁড়ি! (হারু ভট্‌চায্যিকে) এখন আমাকে কিছু বায়না হিসেবে দিইয়ে দিন্। আমি গরীব মানুষ, শুধু হাতে আড়াই মণ দুধ্—কোত্থেকে জোগাড় করব ঠাকুর?

হারু। ধর্ম্ম কর্ম্মে অভাব হবে না নেত্য, অভাব হবে না; হরি সাহায্য করবেন। শাস্ত্র বলেছেন—ঋষি শ্রাদ্ধে অজা যুদ্ধে—অভাব হয় না। তুমি তায় শাপভ্রষ্টা—

বলতে বলতে সরে পড়লেন

নিবারণ। শুনলি?

নিতি। (একটু স্তব্ধ থেকে) পোড়ার মুকো বামুন পাগল নাকি গা? ভদ্দোর লোকের মুকে এই সব কথা! ওঁর বিদ্যে বুদ্ধি সকলেই জানে, নইলে আজ···'ভ্রষ্টা' বলা—

বিপিন। (গম্ভীরভাবে) না—সত্যি, ওকি কথা? আমার ভাল লাগেনি, শুনে চম্‌কে গিছি—ছিঃ!

নিতি। যাও—যাও, থাম আর ফোড়ন দিতে হবে না। ঐ গরুকে দিয়ে কাজ কম্ম করাতে তোমাদের—ছি ছি। শ্রাদ্ধটা ঠিক্ হয় বটে, সেটা মানি।

বলতে বলতে নিতি দ্রুত চলে গেল

রাখাল। ঘা দিয়ে গেল কেমন! যাক্, এখন কাজ যে বন্ধ যাচ্ছে, অন্ধকারও হয়ে গেল। হাতে এই রাতটুকু। সকাল না হতে চার দিক থেকে সংকীর্ত্তন, ভক্ত দর্শক—সব ভেঙে পড়বে।

নিবারণ। কারুর ভরসায় থাকলে হবে না ভাই। চল, যে যার বাড়ীর লণ্ঠন্ আনা যাক্। আর ভেবে কাজ নেই। নরহরি, তুমি এখানে রইলে। আমরা এলুম বলে।

নরহরি। (সজোরে মাথা নেড়ে) যে আজ্ঞে হুজুর।

সকলের প্রস্থান

তখন আশার আনন্দে, উবু হয়ে বসে মাথা নেড়ে নরহরির আপনমনে গীত, মৃদু অথচ শোনা যায়

তোমার ভরসায় এসেছি হরি—
তোমার নাম স্মরি।
দু'গজ জমি পেলেই
বানাবো বাগিচা শুধু ফুলের

(এমন) থাল্ ভরে সাজাব ওলা,
পড়লে নজর যায় না ভোলা,
কদ্‌মা কাঁপা—দু'দিক চাপা
(সব) রইবে দেখে—হাঁ করি।
ভবির পইচে, নেড়ীর বিয়ে,
ছাইব চালা উলু দিয়ে
ধনা তেলির ভাঙ্‌ব গরব
এসে, পড়্‌বে কেঁদে পায় ধরি।

ত্রয়োবিংশ দৃশ্য

স্থান—রমণ মিত্রের বাটীর বহির্দ্দেশ

সময়—ভোর, অরুণোদয়, একটু ঘোর ঘোর আছে

উপস্থিত—কনষ্টেবলরা আড়াল আবডালে থেকে উঁকি মারছে, হুইসিলের আওয়াজ হতেই রেগুলেসন্ লাঠি হাতে সব বাড়ী ঘিরে ফেললে। দ্বিতীয় দল্ মার্চ ক'রে এসে হরিসভার সাজানো বাড়ী ঘিরে ফেললে, রমণ মিত্রের বাড়ী হতে ক্রন্দনধ্বনি, হুটোপাটি, ছুটোছুটি শোনা যেতে লাগল—ইন্‌স্পেক্‌টর মতি সামন্ত ডাইরেক্ট্ করতে লাগলেন

উত্তেজিতভাবে বিমলের প্রবেশ

বিমল। (মতি সামন্তকে) এ কি কাণ্ড, এটা হরিসভা, ধর্ম্মমন্দির। এর মধ্যে জুতা পায়ে দিয়ে এ কি অত্যাচার? এদের ঢুকতে বারণ করুন্।

ইন্‌স্পেক্টর। তুমি কে? এ বাড়ীর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে?

বিমল। নেই? এটা সাধারণ সম্পত্তি।

ইন্‌স্পেক্টর। তেওয়ারি সিং, পাক্‌ড়ো।

বিমল। (ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন, একখানা চটি পড়ে রইল)

নিবারণ। আমি প্রভুকে ডেকে দিচ্ছি, তারপর যা হয় করবেন।

ইন্‌স্পেক্টর। আপনাকে কষ্ট ক'রে ডাকতে হবে না, সে কষ্টটা আমরাই করছি। এ বাড়ী এখন খালি ক'রে সরে পড়া হোক্।

নিবারণ। মালিক এখন পূজায়, তিনি না বললে—

ইন্‌স্পেক্টর। এই কিস্‌মৎ সিং!

বলার বলে কিসমৎ সিং দ্রুত আসতেই

নিবারণ। চলে এসো হে সব।

বলেই দ্রুত অগ্রসর। চার-পাঁচ জনের তথা করণ
নরহরি সারারাত খেটে একপাশে শুয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছিল

কনেষ্টবল্। (লাঠির গুঁতা দিয়ে) এই কোন্ হ্যায়, উঠো।

নরহরি ধড়মড় করে উঠে পুলিস্ দেখে

নরহরি। (হাত জোড় ক'রে) হুজুর, আমি (চার দিক চেয়ে কাকেও দেখতে না পেয়ে হকচকিয়ে) আমি কিচ্ছু জানি না হুজুর। কাল্ বিকেলে এসেছি হুজুর, একটু জমি নিতে, কদ্‌মা—

ইন্‌স্পেক্টর। যাও—ভাগো—ভাগো, কদ্‌মা থাও যাকে।

নরহরি কাপড় সামলাতে সামলাতে ছুট্। সংবাদ পেয়ে গ্রামের মেয়ে পুরুষের ভিড়, কদমও উপস্থিত। সকলের মুখেই ভয়, বিস্ময়, কেবল কদমের মুখে টেপা হাসি

অনন্তমনে গাইতে গাইতে সংকীর্ত্তনের দলের প্রবেশ

সংকীর্ত্তন

হরি তুমি পারের কাণ্ডারী
অশেষ পাপে পাপী মোরা
বোঝা যে ভারি।
হরি তুমি পারের কাণ্ডারী।

পুলিস্ দেখেই খোল্ থেমে গেল—কণ্ঠরোধ

প্রধান। এ কি, পুলিস্! হরিসভায়! রাধে রাধে!

ইন্‌স্পেক্টর। পাপীদের পার করবার জন্তে। একে—একে—এসো। এই লক্কড়্ সিং, ইধার্—

সকলে। ওরে বাপ্‌রে!

যে যেদিকে পারলে পলায়ন। একজন খোল শুদ্ধ পড়ে
তাড়াতাড়ি উঠে আধখানা খোল্ গলায় ছুট্

ইন্‌স্পেক্টর। (সব্-ইন্‌স্পেক্টরকে) এত দেরি হচ্ছে কেন পীতাম্বর?

সব-ইন্‌স্পেক্টর। বেটা, পাইখানার পথে গলে পালাচ্ছিল! মকাই সিং ধরে ফেলেছে।

ইন্‌স্পেক্টর। কাগজপত্তোর?

সব-ইন্‌স্পেক্টর। খোঁজা হচ্ছে—এখনো পাওয়া যায়নি। চেক্ বইখানা পাওয়া গেছে। কিন্তু শেষের সই করা দু'খানায়, হাজার তিনেক বার ক'রে নিয়েছে দেখছি।

ইন্‌স্পেক্টর। ভালই হয়েছে। আর সব কাগজ, হ্যাণ্ডনোট্—সে সব গেল কোথায়?

সব-ইন্‌স্পেক্টর। কই পাচ্ছি না তো, বলে হরি জানেন।

ইন্‌স্পেক্টর। জানেন বই-কি! দুর্জ্জয় এখনো ফেরেনি?

সব-ইন্‌স্পেক্টর। কই দেখ্‌চি না।

কন্‌ষ্টেবল বিকট সিং একটা ছোট ট্রাঙ্ক নিয়ে এল

ইন্‌স্পেক্টর। কি আছে দেখি?

খোল খত্তাল বাজাতে বাজাতে নেড়া-নেড়ীর প্রবেশ

গীত

যেন, যা করি সব তুমি করাও
তোমারি সব ভার্।
যেন, পরের বলে রয় না কিছু,
—সবি সে আমার
হরি সবি সে আমার।

পুলিশ দেখে সহসা নৃত্য গীত থেমে গেল

নেড়ী-পাঁচী। (সভয়ে) এসব কি গা! পোড়ার মুকোরা কোথায় আন্‌লি, এসব কি গো!

ইন্‌স্পেক্টর। (সহাস্তে) সবই সে তোমার! পাঁড়ে দেখো, কোই না ভাগে।

সকলে। দোহাই রাধাবল্লভ, দোহাই রাধারাণী!

ছুটোছুটি করে পলায়ন। একজনের গুপীযন্তর দেবদারু ডালে
আটকে পড়ে গেল।

পাঁচ-ছয়জন পুলিশ হারুকে নিয়ে হাজির
হাওলদার দুর্জ্জয় রায়ের হাতে একটা হাত-বাক্স

হারু। (কাঁদতে কাঁদতে) আমি গরীব ব্রাহ্মণ হুজুর, আমি কি জানি পরের বাক্সয় কি আছে? এই পরশু ঐ বন্ধ বাক্স প্রভু রেখে গেলেন। বললেন, রাধারাণীর বিষয়ের দলিলপত্তোর আছে। উৎসবের পর নিয়ে যাব। বাড়ীতে ঐ ক'দিন গোলমাল থাকবে। খুব সাবধানে

রেখো, নিজের যথাসর্ব্বস্ব গেলেও দুঃখ নেই, বুঝলে ?' কি ভয়ঙ্কর দুর্দ্দৈব মশাই, (ক্রন্দন) হাতে দড়ি !

ইন্‌স্পেক্টর। যা বলবার থানায় বল।

হারু। প্রভু কই হুজুর ? এখুনি মুকোবালা করে' দি—

ইন্‌স্পেক্টর। তিনি সেজে গুজে আসচেন—এলেন বলে। চুপ্, আর কথা নয়।

হারু। (উৎসাহে) ঐ প্রভু আসছেন। য়্যাঃ, কি অত্যাচার, প্রভুকেও পুলিসে, মহাপুরুষ, সর্ব্বনাশ্ হয়ে যাবে, উচ্ছন্ন যাবে !

ইন্‌স্পেক্টর। (ধমকে) খবরদার, চুপ ! দেখবে মজা ?

রমণ মিত্রের সামনে, পশ্চাতে ও দুধারে কন্‌ষ্টেবলেরা ঘিরে নিয়ে এলো

ইন্‌স্পেক্টর। (সব-ইন্‌স্পেক্টরকে) বাক্সটা খোলা হয়েছে ?

দুর্জ্জয় রায়। চাবি বার করল না, তাই ভাঙ্‌তে হ'য়েছে।

হারু। চাবি আমি কোথায় পাব হুজুর ! প্রভুর বাক্স, ঐ তো রয়েছেন, উনিই বলুন না।

ইন্‌স্পেক্টর। (ধমক্ দিয়ে) ফের ? (সব-ইনস্পেক্টরকে) কি আছে দেখলে ?

সব্-ইন্‌স্পেক্টর। এই দেখুন না, যা লিষ্টে আছে, দেখছি সবই আছে।

রমণ। (সবিস্ময়ে, যেন আকাশ থেকে পড়লেন) য়্যা—এ সব কোথা থেকে বেরুল ! এর জন্যেই তো মেয়ে বারবার লিখছে, আমি পাগল হ'য়ে রয়েছি, খুঁজে খুঁজে হাল্লাক্ হচ্চি ; য়্যা, বাক্স কোথায় পেলেন ?

ইন্‌স্পেক্টর। এই আপনার মন্ত্রীর বাড়ী।

হারুকে দেখিয়ে

রমণ। (হাঁ করে চোখ দুটো বাইরে বের্ ক'রে) ঠিকই বলেছেন, য়্যা—এও সম্ভব ! হারু, তোমার এই কাজ ? আমি মেয়েটার কাছে…উঃ এ কি লীলা হরি !

হারু। (অবাক হতভম্ব হয়ে শুনছিল, চ'টে তোত্‌লা হয়ে) প-পরশু রাতে, আ-আমার বাড়ী রেখে গেল তবে কে !

রমণ। (হাসি টেনে) কে ? আমি ? তা ছাড়া আর কে ?

হারু। ওরে ব্যাটা মহাপুরুষ ! চোরাই মাল্—তাই অত রাতে ? উচ্ছন্ন যাবে উচ্ছন্ন যাবে, মুখ-দে রক্ত উঠবে—

রমণ। (হাসিমাখা মুখে) আগে ভাবনি ! এখন ভাবছ ঐ বলে রক্ষা পাবে ? আমি ছাড়ব ? যাক্—জিনিষগুলা যে পাওয়া গেছে—হরি মুখরক্ষা করেছেন—উঃ।

হারু। (ইন্‌স্পেক্টরের প্রতি) পাপিষ্ট যা বলেছে তাই করেছি মশাই ! ব্রজর পরিবার—সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী, ওর পরামর্শে তাকে বাক্যের ফন্দিতে ফেলে এই বাগান-বাড়ী, হরিসভার নাম ক'রে, ওই হারামজাদা ভণ্ডর নামে আজ উচ্চুগ্‌গু করাচ্ছিলুম, এখন বলে বাক্সর কথা জানে না ! আমি চোর ! নির্ব্বংশ হবে—নির্ব্বংশ হবে—

ইন্‌স্পেক্টর। থাক্ ঠাকুর, থাক্। যা বলবার থানায় গিয়ে ব'ল।

রমণ। (মৃদু হাস্যে) চোরেদের কিছু আটকায় না, হরি হে—লোক বাঁচবার জন্যে কি না বলে ? তবু—আগে ভাবে না, সবই তোমার লীলা !

হারু। (হাত লম্বা কোরে) কাল সর্প, কাল সর্প ! আচ্ছা হুজুর, তাহ'লে চাবি তো আমার কাছেই পেতেন, সেটার সন্ধান করুন্।

সব্-ইন্‌স্পেক্টর। (ইন্‌স্পেক্টরের প্রতি) চাবি এই বাড়ীতেই পেয়েছি।

হারু। জয় মা দুর্গা।

রমণ। চোরের চাবি খোঁজবার সখ থাকে না !

ইন্‌স্পেক্টর। এই যে সব জানা আছে ! এখন সাধনোচিত ধামে চলুন।

হারু। দীর্ঘজীবী হও বাবা—বেশ বলেছ। ও, বেটার আবার সমাধি হয় !

ইন্‌স্পেক্টর। (কনষ্টবলদের) থানামে লে চলো। হিঁয়া দো আদ্‌মি রহো। এ মোকান্‌মে কোই না ঘুসে। আওর দো-জোয়ান্ বাগিচা সে সব্ হাঁকা দেও। (সব্-ইন্‌স্পেক্টরকে) পীতাম্বর, তুমি এখন এইখানেই থাকো।

হারু চারিদিকে ক্যাল ক্যাল ক'রে চাইছিল, রমণ মিত্র গম্ভীর

কন্‌ষ্টেবল। (হারুকে) চলো—চলো, ইধার উধার কেয়া দেখতা ?

হারু। (ক্রন্দনস্বরে—ইন্‌স্পেক্টরকে) আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন, খাঁদির মাকে দেখবার যে—

ইন্‌স্পেক্টর। ভাবচেন কেন, আপনাদের মত মহাপুরুষ অনেক আছেন, এখন থানায় চলুন।

হারু। (যেতে যেতে কদমকে দেখতে পেয়ে) কদম্, দেখিস সব্।

কদম। ভাববেন না, পুরুষ মানুষ, কান্না কিসের! সৎসঙ্গে কাশীবাস তো হয়ই।

হারু। পদ্মপিসি, দেখো দিদি। পুঁটির মা, সব রইল। স্বর্ণ, কালাচাঁদকে দেখতে ব'ল। সে-ই দেখবে, আর কেউই দেখবে না। এ পাপিষ্ঠকে ক্ষমা করতে ব'ল—সে করবে—

কনষ্টবলরা আসামী নিয়ে চলে গেল

ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ বেরিয়ে, পশ্চাৎ হতে

চন্দ্রবাবু। (কদমকে) এই সেই লেখাপড়ার কাগজখানা, রাখ মা, বউমাকে দিও। ও পাপ আর আমার কাছে কাজ নেই।

কদম। ঐ তিনকড়িবাবুকে (দেখিয়ে) ডাকুন—ওঁদের সামনে দিন।

চন্দ্র। (উচ্চে) তিনকড়ি, সুধাংশু—এদিকে শোন। (তারা এলে) এই ব্রজর বাগানবাড়ীর দান-পত্তোরখানা। আমার কাছেই রেখেছিলুম—পাপিষ্ঠ কিছু বলতে পারে নি। আমি কদমের হাতে দিচ্ছি। বউমা ও-নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারেন। ছিঁড়ে ফেলে দেওয়াই তাঁর উচিত। (কদমকে দিলেন) ঐ দানব আমার আরামবাগের মহাল নিজের নামে ডেকে নিয়েছে। কথা আছে, কিন্তু সে কি আর ট্রান্‌স্ফার ক'রে দেবে ?

তিনকড়ি। সে আশা আর রাখবেন না জ্যেঠামশাই—

চন্দ্রবাবু। (হতাশভাবে) তবেই আমার ভরাডুবি!

মাথায় হাত দে বসে পড়লেন

তিনকড়ি। চলুন, বাড়ী পৌঁছে দি।

চন্দ্রবাবু। আর বাড়ী! (দীর্ঘনিশ্বাস)

তিনকড়ির সঙ্গে প্রস্থান। অপর দিক দিয়ে পাগলের মত মধু মোদকের প্রবেশ

মধু। কই, কোথায় সে সাধু দু বেটা! আমি যে গেলুম! (মাথা চাপড়ানো) উঃ, চিনতে পারিনি—তা না তো চোরকে বলে মহাপুরুষ! হ্যাঁগা বাবুরা, আমার উপায় হবে না? তারা গেল কোথায়, য়্যাঃ!

পাগলের মত তাদের উদ্দেশ্যে ছুট্

নরহরি রাখালের পায়ের ধুলো নেয়, আর মাথায় দেয়

রাখাল। কি কর হে ?

নরহরি। আজ্ঞে দয়া করুন্, বাধা দেবেন না। আপনিই সাক্ষাৎ দেবতা! সন্ধ্যেবেলা বললেন, 'সকালে মহামারি উৎসব।' আর ভোর না হতেই তা অকাট্য ফলে গেল মশাই। এই দেখুন না, মহামারির চাঁদমারি! যেন ধর্ম্মের ষাঁড়ে গুঁতিয়েছে—আমার কদমা বার ক'রে দিয়েছে। ফুলেছে দেখুন!

রাখালের হাত টেনে দেখাল

রাখাল। তোমার টাকা তো ট্যাঁকে মজুদ্ হে! আমি যে পরিবারের অনন্তও এ জন্মের মত দক্ষিণান্ত ক'রে বসেছি।

চামুণ্ডার মত আলুথালু হয়ে নিতির দ্রুত প্রবেশ। হাতে "কণ্ঠী" ছেঁড়া

নিতি। (ব্যস্ত ভাবে) নিস্‌পেক্টোর গেলো কোথা! আমার ঐ ঘরের শত্তুর পোড়ারমুখো মেম্বর মিনসেকে নিয়ে গেল না? যোমেও নেবে না, এরাও নেবে না, তবে নেবে কে গো? (রোষে) তোর কণ্ঠীর মুয়ে আগুন! (ছুঁড়ে দূরে নিক্ষেপ)। (সব ইন্‌স্পেক্টরকে দেখতে পেয়ে) হুজুর, আমার পোড়ারমুখোকেও ওই সঙ্গে—তোমার পায়ে পড়ি। ও, আড়াই মণ দুধ পুলিসকে দিলুম। ওরা যে উবগার করেছে, দেশের হাড়্ জুড়ুল! (চীৎকার ক'রে কান্না) ওগো আমার কি হ'ল—গো!

চতুর্ব্বিংশ দৃশ্য

স্থান—লালবাজার পুলিশ-গারদ্

সময়—রাত নয়টা

উপস্থিত—নন্দ, মাতাল অবস্থায় নীত হয়ে—গারদের মধ্যে বেড়াচ্ছে—বাইরে দুজন কনষ্টবল টহল দিচ্ছে

নন্দ। (টলতে টলতে বিচরণ করতে করতে) ব্যাটারা কিসসু বোঝে না—কিসসু বোঝে না। বললে—মাতাল

হুয়া। জরদ্গব ব্যাটারা ওই "হুয়া" আর "ক্যা", এই হুয়াক্যাই জানে। কোনো বাবা—আমি কি টল্‌ছি? এই তো ঠিক্ আছি বাবা, একদম্ bolt erect! মিসি মিসি ট্রবল্ (টলিতে টলিতে পদচারণ। হঠাৎ দাঁড়িয়ে) কি বাবা, দেশটা উস্‌সন্নো গেলো নাকি? কই, আর কোনো বেটাই তো আসসে না! সব বেটা চন্নামেত্তো ধরলে নাকি? "পুষিফুট্" মেরে গ্যালো, ছিঃ! আই য়্যাম্ দি ওন্‌লি মনার্ক অফ্ মাই থ্রোন্ (এই বলে বসতে গিয়ে চিৎপাৎ) ছিঃ, রাতকাণা বেটারা চিনতে পারে নি! জেণ্টল্‌ম্যান্‌কে ছোটো লোকের গারদে এনেছে—

ওয়ার্ডার। এই চুপ রও!

দু'হাতে আস্তিন টান্‌তে টান্‌তে উঠে দাঁড়াল
দুজন কন্‌ষ্টবল একজনকে নিয়ে এসে

কন্‌ষ্টবল। (ওয়ার্ডারকে) লেও, তোমরা মাল্!

নন্দ। (গলা বাড়িয়ে একদৃষ্টে) বেটা তাড়ি গিলে মরেছে! ছ্যাঃ! হুইস্কি য়্যাণ্ড তাড়ি ইন্ সেম্ ব্র্যাকেট্! ওঃ ডেমোক্রাসি, ফুঃ! গন্ধগোকুলো বেটা—সারারাত ভোগাবে যে, জমাদার সায়েব, ইস্‌কো আড়গড়ামে লে যাও বাবা, হিঁয়া নেহি!

বল্‌তে বল্‌তে নন্দ দু'পা এগিয়ে এল

গারদে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে সহসা নন্দর কণ্ঠস্বর শুনে রমণ মিত্র সচকিত-ভাবে চম্‌কে চাইতেই উভয়ে উভয়কে চিনলে। নিজের অজ্ঞাতেই রমণ মিত্রের মুখ থেকে বেরুল

রমণ। নন্দ!

নন্দ। (তারও মুখ থেকে ঐ ভাবে) বাবা!

নন্দর সঙ্গে হাজতে সাক্ষাতের আকস্মিক অভাবনীয়তা, হতাশ ও লজ্জা প্রভৃতির যুগপৎ সংঘাতে রমণ মিত্র বিমূঢ় হয়ে গেলেন। যেন বাস্তব জগতের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আর দাঁড়াতে না পেরে তিনি গারদের রেলিং ধ'রে ফেললেন।

নন্দ স্থির শূন্য দৃষ্টিতে রমণের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে এল।

শেষ

সুরসুন্দরী

শ্রীনারায়ণপ্রসাদ আচার্য্য

দিবসে নিশীথে সুমধুর গীতে তোমার এ কোন্ খেলা?
ফুটে টুটে যত কুসুম সাজায় তোমার মোহন মেলা।
ফুল কুঁড়িদের অন্তর মাঝে
তোমার বীণার মন্তর বাজে
অকারণ কোন্ মহা উল্লাসে বিচিত্রতার ডালা
ভরিয়া তুলেছে পুলক আকুল তোমার সুরের খেলা।

সুরের সাধনে দূরের দয়িত ফুলের মতন হ'য়ে
গৌরবময় করে এ বিশ্বে সৌরভ পরিচয়ে।
হিয়ায় হিয়ায় তপ্ত তৃষায়
বিরহ ঘনায় মিলন নেশায়,
অশ্রু-হাসির জমাট সুষমা অগাধ অসীম হ'য়ে
বিশ্বরাজের আরতি জানায় মাধুরীর গীতি গেয়ে।

কে জানে এ কোন খেয়াল তোমার, মুরলীর মুরছন—
যুক্তি ভাসান এ কোন্ মুক্তি এ কী গীতি আলাপন!—
মুক্তি উদার এ কী বন্ধন,
সার্থকতার এ কী ক্রন্দন,
রূপ ইঙ্গিত-ভরা সঙ্গীতময় কি সে মহা জাগরণ!—
রস হতে রসে ফিরে জাগাইয়া আলোকের শিহরণ।

অণুতে অণুতে অনুরাগ ঢালে তোমার সুরের মেলা—
সব খেলা যেন লীলা হ'য়ে উঠে খেলিয়া তোমার খেলা।
প্রভাত আলোকে সন্ধ্যা আঁধারে
প্রাণ যেন ফিরে খুঁজিয়া কাহারে,
আধ-চেনা এক অপরিচয়ের নেশায় ফুরায় খেলা।
ফেনাইয়া ছুটি সাগরের জল কে জানে কোথায় মেলা?

বাঙ্গালায় পালরাজত্ব ও কম্বোজ-বংশ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন •

ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাল-উপাধিধারী রাজবংশের অভাব নাই। আবার বিভিন্নবংশে পাল-উপাধিধারী একই নামের কয়েকজন রাজা বিদ্যমান ছিলেন। তাম্রশাসন শিলালিপির পাঠও অনেকস্থলেই সহজবোধ্য বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং ভারত তথা বাঙ্গলার ইতিহাসে স্বাভাবিকভাবেই বহু জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা এইরূপ একটী জটিল সমস্যার প্রতি ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

গুর্জ্জর প্রতিহার বংশে পাল-উপাধিধারী রাজগণ	বাঙ্গালার পাল উপাধিধারী রাজগণ
মহেন্দ্রপাল	ধর্ম্মপাল
দেবপাল +	দেবপাল +
বিজয় পাল	রাজ্য পাল*
রাজ্য পাল *	

বাঙ্গালার পালবংশীয় প্রথম বিগ্রহপালের পুত্রের নাম নারায়ণপাল। এই নারায়ণপালের পুত্রের নাম রাজ্যপাল। আবার পালবংশীয় অন্যতম প্রসিদ্ধ নরপতি রামপালের পুত্রের নামও রাজ্যপাল। নয়পালের 'ইর্দ্দ তাম্রশাসন" হইতে জানা যায়, কম্বোজ-বংশ-তিলক রাজ্যপাল নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি "প্রিয়ঙ্গু" হইতে এই তাম্রশাসন দান করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই রাজ্যপালের স্ত্রীর নাম ভাগ্যদেবী। ওদিকে পালবংশীয় নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপালের স্ত্রীর নামও ভাগ্যদেবী। কম্বোজবংশীয় রাজ্যপালের পুত্রের নাম নারায়ণপাল। ওদিকে পাল-বংশীয় রাজ্যপালের পিতার নামও নারায়ণপাল। কম্বোজ-বংশীয় রাজ্যপালের অপর পুত্রের নাম নয়পাল। ওদিকে পালবংশীয় রাজ্যপাল হইতে অধস্তন চতুর্থ পুরুষের নাম নয়পাল। নিম্নে বংশতালিকা দিলাম—

পাল-বংশীয় প্রথম বিগ্রহপাল বা শূরপালের পত্নীর নাম লজ্জা দেবী, তিনি হৈহয় রাজকুমারী। সম্ভবত নারায়ণপাল তাঁহারই গর্ভজাত। নারায়ণপালের শ্বশুর কোন বংশীয় এবং তাঁহার স্ত্রীর নাম কি ছিল জানা যায় না। রাজ্যপালের পত্নী ভাগ্যদেবীর পিতার নাম তুঙ্গ, ইনি রাষ্ট্রকূট রাজবংশীয়। কম্বোজ-বংশ-তিলক রাজ্যপালের পুত্র নয়পাল আপনার ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে বর্দ্ধমান-ভুক্তির অন্তঃপাতি দণ্ডভুক্তি মণ্ডলের কণ্টি সংলগ্ন বৃহৎ ছুট্টিভল্ল, শর্ম্মাস ও বাদখণ্ড নামক তিনখানি গ্রাম অশ্বত্থ শর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণকে দান করেন। প্রিয়ঙ্গু রাজধানী অথবা জয়স্কন্ধাবার? কিন্তু এই গ্রাম তিনখানি দানের সময় দণ্ডভুক্তি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল না, দণ্ডভুক্তি তখন বর্দ্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত একটী মণ্ডলমাত্র। তাম্রশাসনে যেভাবে প্রিয়ঙ্গু নামক স্থানে মহারাজাধিরাজ রাজ্যপালের প্রাধান্য-লাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় এই রাজ্যপালই কম্বোজ-বংশের প্রথম রাজা, যিনি রাঢ় কিম্বা বরেন্দ্রিতে প্রথম আগমন ও রাজ্যস্থাপন করেন। কম্বোজান্বয়জ আর একজন রাজা গৌড়পতি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম কি কুঞ্জর ঘটাবর্ষ? আমাদের মনে হয় চন্দেল্লবংশীয় যশোবর্ম্ম দেব (খ্রীঃ ৯৫০এর পূর্ব্বে বাপরে) যখন গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেন, সেই সময়েই এই কম্বোজ-

বংশীয় রাজ্যপাল বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কেহ রাষ্ট্রবিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগেই বঙ্গে কম্বোজ-বংশের অভ্যুদয় অনুমান করিতে হয়। অতঃপর ধঙ্গদেব যখন রাঢ়দেশ জয় করিয়া মহোবায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সুযোগে কম্বোজ-বংশীয়গণ বর্দ্ধমান-ভুক্তি ও দণ্ডভুক্তি অধিকার করেন। ঐতিহাসিকগণের মতে ধঙ্গদেব ১০০২ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্গ ও রাঢ়দেশ জয় করিয়াছিলেন। ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রাজা রাজেন্দ্র চোলের হস্তে দণ্ডভুক্তিপতি ধর্ম্মপাল নিহত হন। এই ধর্ম্মপালকে আমরা নয়পালের পুত্র বলিয়া মনে করি! এই অনুমানের কারণ নয়পাল যে মণ্ডল হইতে ভূমি দান করিয়াছিলেন, সে স্থান যে তাঁহার অধিকৃত ছিল ইহা একরূপ অবিসম্বাদিত। অন্যের ভূমি হইলে মূল্য দিয়া কিনিয়া লইলে তবে দানের অধিকার জন্মে। ইর্দ্দ তাম্রশাসনে তাহার ইঙ্গিত মাত্র নাই। সুতরাং একথা নিশ্চিত যে, নয়পাল নিজ অধিকৃত ভূমিই দান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালকে আমরা যখন সেই দণ্ডভুক্তিতে রাজ্য করিতে দেখি, তখন এ অনুমান অপরিহার্য্য যে তিনি নিশ্চয়ই নয়পালেরই উত্তরাধিকারী। নয়পালের পূর্ব্বে যে ধর্ম্মপাল থাকিতে পারেন না, তাহার প্রমাণ ইর্দ্দ তাম্রশাসনে ধর্ম্মপালের প্রসঙ্গ নাই এবং তিনি রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন। ঘনরাম তাহার ধর্ম্মমঙ্গলে লিখিয়াছেন—

ধর্ম্মপাল রাজা মলো অরাজক দেশ।
পাত্র মিত্র প্রজা লোক পায় বড় ক্লেশ॥

ঘনরামের ধর্ম্মপাল যে দণ্ডভুক্তিপতি ধর্ম্মপাল সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। পাল-বংশীয় মহীপাল (প্রথম) তখন উত্তর রাঢ়ের অধিপতি এবং ইঁহারই হস্তে পরাজিত হইয়া রাজেন্দ্র চোল স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আর্য্য ক্ষেমীশ্বর বিরচিত চণ্ডকৌষিক নাটকে যে মহীপাল চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে এবং তাঁহার হস্তে পরাজিত কর্ণাটকগণ নবনন্দের সঙ্গে উপমিত হইয়াছেন, সে মহীপাল ঐ প্রথম মহীপাল এবং কর্ণাটকগণ ঐ রাজেন্দ্র চোল ও তাঁহার সৈন্য সামন্ত। সুতরাং রাজেন্দ্র চোলের প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহীপাল যে দণ্ডভুক্তি অধিকার করিয়াছিলেন, অথবা তাঁহারই আদেশে ধর্ম্মমঙ্গলের লাউসেন দণ্ডভুক্তি অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, এইরূপ অনুমানই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

পাল-রাজত্বের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে কতকগুলি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত হয়। ধর্ম্মপালের পুত্র ত্রিভুবনপাল খালিমপুর তাম্রশাসনের দূতকরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। যুবরাজ ত্রিভুবনপাল রাজা হইলেন না কেন? ধর্ম্মপালের পর তাঁহার অপর পুত্র দেবপাল রাজা হইয়াছিলেন। ইঁহারা উভয় ভ্রাতাই রাষ্ট্রকূট রাজবংশের দৌহিত্র। অনুমান করিতে হয়, ত্রিভুবনপাল মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, কিম্বা কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি রাজ্যাধিকার পান নাই।

দেবপালের ৩৩শ রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত মুদ্গগিরি (মুঙ্গের) হইতে সম্পাদিত তাম্রশাসনে পুত্র রাজ্যপাল দূতকরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। অথচ তিনি রাজ্যাধিকার পাইলেন না। রাজা হইলেন জয়পালের পুত্র প্রথম বিগ্রহপাল বা শূরপাল। প্রথম বিগ্রহপালের এইরূপ নামান্তর দৃষ্টে কেহ কেহ বলিতে চাহেন, রাজ্যপাল, শূরপাল ও বিগ্রহপাল একই ব্যক্তি। নারায়ণপাল, এই বিগ্রহপাল বা শূরপাল বা রাজ্যপালের পুত্র। ধর্ম্মপাল ও দেবপালের তাম্রশাসনে বাক্‌পাল ও জয়পালের নাম নাই। আবার প্রথম বিগ্রহপাল বা তদ্বংশীয়গণের তাম্রশাসনে বাক্‌পালও জয়পালের গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে। বাক্‌পাল ধর্ম্মপালের কনিষ্ঠ? নারায়ণপালের তাম্রশাসনে দেবপালকে জয়পালের পূর্ব্বজ বলা হইলেও কেহ কেহ জয়পালকে দেবপালের কনিষ্ঠ এবং ধর্ম্মপালের পুত্র না বলিয়া তাঁহাকে বাকপালের পুত্র ও ধর্ম্মপালের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিতে চাহেন। বিগ্রহপাল যে জয়পালের পুত্র সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। দেবপালের মন্ত্রী কেদারমিশ্রই প্রথম বিগ্রহ বা প্রথম শূরপালের মন্ত্রী ছিলেন। এই মন্ত্রীগণের প্রভাব ছিল অতুলনীয়। দেবপাল মন্ত্রী দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায় তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন। অগ্রে দর্ভপাণিকে চন্দ্রবিম্বানুকারী আসন দান করিয়া নানা-নরেন্দ্র-মুকুটাঙ্কিত-পাদপাংশু সুররাজ-কল্প নরপতি দেবপাল স্বয়ং সচকিতভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। দর্ভপাণির পৌত্র কেদারমিশ্র দর্ভপাণির পর দেবপালের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন, প্রথম বিগ্রহপাল ইঁহাকেই মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। বিগ্রহপাল যজ্ঞশেষ শান্তিবারি গ্রহণের জন্য নতমস্তকে এই কেদার

মিশ্রের যজ্ঞশালায় উপস্থিত থাকিতেন। তবে কি রাজ্যপাল এই মন্ত্রীর বিরাগভাজন হইয়াই রাজ্য হারাইয়া ছিলেন এবং ধর্ম্মপালের বংশের হস্ত হইতে জয়পালের বংশে রাজ্য হস্তান্তরিত হইয়াছিল?

আমাদের এইরূপ প্রশ্নের উদ্দেশ্য আছে। অভিনন্দ নামক এক কবির রামচরিত নামে একখানি গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে বরোদা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই কবির পৃষ্ঠপোষক কখনও যুবরাজ নামে, কখনও হারবর্ষ নামে অভিহিত হইয়াছেন। আবার তিনি নরেশ্বর, পৃথ্বীপাল, জগতীপতি নামেও বিশেষিত হইয়াছেন। এই হারবর্ষ নিজেও কবি ছিলেন। কখনও তিনি শকারি বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে, কখনও বা "গাথা-সপ্তশতী"-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ নরপতি হালের সঙ্গে তুলিত হইয়াছেন।

"শকভূপরিপোরনন্তরং কবয়ঃ কুত্র পবিত্র সঙকথা।
যুবরাজ ইবায়মীক্ষিতো নৃপতিঃ কাব্য কলাকুতূহলী॥"

* *

"নমঃ শ্রীহারবর্ষায় যেন হালাদনন্তরং।
স্বকোশঃ কবি কোশানামাবির্ভাবায় সংভৃত॥"

* *

"শ্রীহারবর্ষ যুবরাজ মহীতলেন্দু"

অভিনন্দ ইহাকে "পালাম্বুজ" "পালকুলচন্দ্রমা" "পালান্বয়" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভিল্লমাল ও কান্যকুব্জের গুর্জ্জরপ্রতীহারবংশে পাল-উপাধিধারি বহু রাজা ছিলেন। কিন্তু কবি অভিনন্দ "শ্রীধর্ম্মপাল-কুল-কৈরব-কাননেন্দু" বলিয়া হারবর্ষের পরিচয় দিয়াছেন। প্রতীহার-বংশে আজ পর্য্যন্ত কোন ধর্ম্মপাল রাজার নাম পাওয়া যায় না। যে ভাবে শ্রীধর্ম্মপাল-কুল-কুমুদবনের চন্দ্রস্বরূপ বলিয়া কবি ইহার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে কোন রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা কুলপতি ধর্ম্মপালকেই বুঝায়। বাঙ্গালার ধর্ম্মপাল ভিন্ন ভারতের ইতিহাসে এরূপ কোন দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের অস্তিত্ব অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। এই হারবর্ষ যদি বাঙ্গালার পালবংশীয় হন, তাহা হইলে "ত্রিভুবনপাল বা রাজ্যপালের নামান্তর বা উপাধি হারবর্ষ" এইরূপই কল্পনা করিতে হয়। কারণ রাজ্যপালের পর প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মপালের বংশ লোপ হইয়াছিল। ত্রিভুবনপাল রাষ্ট্রকূট রাজবংশের দৌহিত্র ছিলেন। দেবপালের পত্নীর নাম ও শ্বশুরবংশের পরিচয় জানা যায় নাই। কিন্তু বর্ষ উপাধিটা রাষ্ট্রকূট রাজবংশেই দেখিতে পাওয়া যায়। হারবর্ষ যখন পালবংশীয় এবং ধর্ম্মপালের কুলচন্দ্র, তখন তিনি রাষ্ট্রকূটবংশীয় অথবা প্রতীহারবংশীয় হইতে পারেন না। অথচ বর্ষ উপাধি বাঙ্গালার পালবংশে ছিল না। এরূপ ক্ষেত্রে সন্দেহ হয়, ত্রিভুবনপাল কিম্বা রাজ্যপাল মাতামহ-বংশের রাজ্যখণ্ডের সঙ্গে কি তাঁহাদের উপাধিটাও গ্রহণ করিয়াছিলেন? কিন্তু এ সন্দেহ অমূলক, কারণ হারবর্ষের পিতার নাম বিক্রমশীল। বিক্রমশীল যে পাল-সম্রাট ধর্ম্মপালের অথবা দেবপালের দ্বিতীয় নাম ছিল, অদ্যাবধি তাহার কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। এই রামচরিতের কবির পিতার নাম শতানন্দ। আর একজন কবি অভিনন্দ ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম জয়ন্ত ভট্ট। ভারতীয় কবিগণের মধ্যে অভিনন্দ নামা কোন কবি কি ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, বাণ, অমর, মাঘ, ভবভূতির সঙ্গে তুল্য-সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন? এ অভিনন্দ, কোন্ অভিনন্দ? তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হারবর্ষ কোন্ রাজ্যের যুবরাজ, অথবা কোন্ রাজ্যের অধীশ্বর?

কোঙ্কনের কবি সোড্ঢল তাঁহার "উদয়সুন্দরী কথা"য় এই অভিনন্দ ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষক যুবরাজের নাম করিয়াছেন।

স্পষ্টং তদত্র যুবরাজ নরেশ্বরেণ।
যন্দ্রঙ্করং কিমপি যেন গিরঃ শ্রিয়শ্চ॥
প্রত্যায়নং স্ফুট মকারি নিজে কবীন্দ্র।
মেকাসনে সমুপবেশয়তাভিনন্দম্॥"

সোড্ঢল খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি লাটদেশের অধিপতি চালুক্যরাজ বৎস-রাজের সভায় কিছুদিন উপস্থিত ছিলেন। এই বৎসরাজের পুত্রের নাম ত্রিলোচনপাল। "পাল" দেখিয়াই কোন কিছু স্থির করা দেখিতেছি অত্যন্ত বিপজ্জনক।

যুবরাজ হারবর্ষ এবং তাঁহার কবি তাহা হইলে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহাদের দেশ-নির্ণয়ের উপায় কি? সুদূর কোঙ্কনে অভিনন্দের কবিখ্যাতি

প্রসার লাভ করিতে কত দিন সময় লাগিতে পারে? এই অভিনন্দ কি বাঙ্গালী ছিলেন? জয়ন্ত ভট্টের পুত্র গৌড়াভিনন্দ নামে পরিচিত। ইঁহার পিতামহ কল্যাণ-স্বামী ও প্রপিতামহ শক্তিস্বামী। সেকালের বাঙ্গালায় স্বামী উপাধিধারী বহু ব্রাহ্মণের নাম তাম্রশাসনে পাওয়া গিয়াছে। এই অভিনন্দের পুস্তকের নাম "কাদম্বরী-কথাসার"। ইঁহার পিতা জয়ন্তভট্ট "ন্যায়মঞ্জরী" নামক গ্রন্থের প্রণেতা। এই অভিনন্দ পূর্ব্বোক্ত রামচরিতকার শতানন্দপুত্র অভিনন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী। "কাদম্বরীকথাসার"-প্রণেতা অভিনন্দ কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। শক্তি-স্বামীর পিতামহ নাকি গৌড়দেশ হইতে কাশ্মীরে গিয়া বাস করিয়াছিলেন।

রামচরিতের অভিনন্দ যদি বাঙ্গালায় থাকিয়া—বিশেষ বাঙ্গালায় পালরাজবংশের সভায় থাকিয়া কাব্য রচনা করিতেন, তাহা হইলে কোন না কোন তাম্রশাসনে তাঁহার নাম পাওয়া যাইত, একথা বলা চলে না। কারণ গৌড়-কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতগ্রন্থ বাঙ্গলায় পাওয়া যায় নাই এবং অত বড় কবির নামও কোন তাম্রশাসনে উল্লিখিত হয় নাই। বরং এইরূপই সন্দেহ হয় যে, হয় তো অভিনন্দের রামচরিতগ্রন্থই সন্ধ্যাকর নন্দীকে রামচরিত রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

কম্বোজাম্বয়জ গৌড়পতি সম্বন্ধে আমার আর একটী প্রশ্ন আছে। কম্বোজ কোন্ দেশের নাম? পৌরাণিক মতে কম্বোজ বোধ হয় পারস্যের অন্তর্গত বা নিকটবর্ত্তী দেশ। ঐতিহাসিকগণ কেহ বলেন, হিমালয়ের প্রান্তস্থিত কোন দেশের নাম কম্বোজ। স্বর্গগত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব অনুমান করিতেন, কম্বোজ বোম্বাইয়ের অন্তর্গত কম্বায় বা খম্বায়ৎ নগরকে বুঝাইতেছে। এই কম্বায় নগরে চতুর্থ গোবিন্দের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতে জানিতে পারি, রাষ্ট্রকূটবংশীয় দ্বিতীয় কৃষ্ণ বা অকালবর্ষ নামক কোন নৃপতি হৈহয়বংশীয় প্রথম কোক্কল্ল-দেবের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

> সহস্রার্জ্জুন বংশস্য ভূষণং কোক্কলাত্মজা।
> তস্যাভবন্মহাদেবী জগত্তুঙ্গস্ততোজনি॥

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনবংশীয় বলিতে হৈহয়বংশীয় বুঝাইতেছে। এই হৈহয় বংশেরই কন্যা লজ্জাদেবী প্রথম বিগ্রহপাল বা শূরপালের পত্নী ছিলেন। প্রথম বিগ্রহপাল দ্বিতীয় কৃষ্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী। দ্বিতীয় কৃষ্ণ যখন গৌড় আক্রমণ করেন, তখন বোধ হয় লজ্জা দেবীর পুত্র নারায়ণপাল কিম্বা পৌত্র রাজ্যপাল বাঙ্গালার পালবংশের অধীশ্বর।

> তস্যোত্তর্জ্জিত গুর্জ্জরো হৃতহটল্লাটোদ্ভট শ্রীমদো
> গৌড়ানাং বিনয় ব্রতার্পণগুরুনসামুদ্র নিদ্রাহরঃ।
> দ্বারস্থাঙ্গ কলিঙ্গ গাঙ্গ মগধৈরভ্যর্চ্চিতাজ্ঞশ্চিরং
> সুনুস্সুনৃতা বাগভূবঃ পরিবৃঢ় শ্রীকৃষ্ণরাজোভবৎ॥

(রাখালদাসের বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, দেউলীতে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় কৃষ্ণের তাম্রশাসন)

আমাদের অনুমান হয়, এই দ্বিতীয় কৃষ্ণের সঙ্গে হয় তো কোন কম্বায় নগরাধিবাসী সামন্তরাজ গৌড়ে অভিযান করিয়াছিলেন এবং তিনি দ্বিতীয় কৃষ্ণের প্রতিনিধি স্বরূপ গৌড়-সিংহাসন অধিকার করেন। এই সামন্তই কি কুঞ্জরঘটা-বর্ষ? ইনিই কম্বোজাম্বয়জ গৌড়পতি নামে অভিহিত? ইনি রাষ্ট্রকূট রাজবংশের সামন্ত বলিয়াই কি বর্ষ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন? তাহা হইলে ইর্দ্দ তাম্রশাসনে নয়পাল ইঁহার নামোল্লেখ করিলেন না কেন? কিন্তু কুঞ্জরঘটাবর্ষ যদি নাম না হইয়া শকাব্দার সঙ্কেত হয়, তাহা হইলেই বা ইহার মীমাংসার উপায় কি? বাস্তবিক কম্বোজ-বংশতিলক রাজ্যপাল, নারায়ণপাল, নয়পাল কেহই বর্ষ উপাধি গ্রহণ করেন নাই, হঠাৎ মাঝখান হইতে একজন কি জন্য বর্ষ উপাধি গ্রহণ করিবেন? কুঞ্জরঘটাবর্ষ যদি কম্বোজবংশীয় নরপতির নাম হয় এবং তিনি রাজ্যপালের পূর্ব্ববর্ত্তী হন, তাহা হইলে ইর্দ্দ তাম্রশাসনে তাঁহার নাম সগৌরবে উল্লিখিত থাকিত। উত্তর পুরুষ হইলে রাজ্যপাল, নারায়ণপাল ও নয়পালের পর এবং ধর্ম্মপালের পূর্ব্বে তাঁহার স্থান করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে সামঞ্জস্য থাকে কিরূপে? দিনাজপুর জেলায় বাণগড়ের স্তম্ভে যে কম্বোজাম্বয়জ গৌড়পতির উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনিই কম্বোজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ধরিয়া লইলে তাঁহাকে রাজ্যপাল বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। কুঞ্জরঘটাবর্ষ শকাব্দার

সংকেত হইলে ৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পারে কি-না তাহাও বিচার করিতে হয়। নরপালের ইর্দ্দা তাম্রশাসনখানির প্রামাণিকতাও বিশেষরূপে বিচার্য্য বিষয়।

কুঞ্জরঘটাবর্ষ যদি রাজার নাম হয়, তাঁহার সঙ্গে যুবরাজ হারবর্ষের কোন সম্বন্ধ আছে কি? ধর্ম্মপাল কুলচন্দ্রমা বলিতে দণ্ডভুক্তিপতি ধর্ম্মপালকে বুঝায় কি? কুঞ্জর-ঘটাবর্ষের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিলে হারবর্ষ তাঁহার সভাকবি কর্ত্তৃক কম্বোজবংশ-চন্দ্রমা না হইয়া পালকুলচন্দ্রমারূপে উল্লিখিত হইলেন কেন? আবার দণ্ডভুক্তিপতি ধর্ম্মপালের সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া লইলে এই ধর্ম্মপালকে আর কম্বোজ বংশীয় বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। নিতান্ত অসম্বদ্ধভাবেই আমার সন্দেহগুলির উল্লেখ করিলাম। বাঙ্গালায় বর্ত্তমানে সক্রিয় ঐতিহাসিক বলিতে মাত্র দুইজনকে বুঝায়। একজন ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, অন্যজন ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক। দুইজনই কৃতবিদ্য, দুইজনেই যুক্তি ভিন্ন বাজে তর্ক করেন না। দুই জনেই কঠোর নিষ্ঠাসম্পন্ন, অথচ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কবিত্ববোধের সম্মেলনে সরস সমালোচনায় নিপুণ। আমি আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের প্রতি এই দুইজন সুপণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ভরসা করি তাঁহারা এই জটিলতার গ্রন্থি উন্মোচনপূর্ব্বক বাঙ্গালার ইতিহাসের অন্তত একটী পৃষ্ঠায় আলোকসম্পাত করিবেন।

এলো মধু-নিশা

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাশ এম-এ

এলো মধু-নিশা—আলোয় আলোয় ভুবন ভাসিয়া যায়;
তুমি পাশে মোর—আমি পাশে তব, চাঁদ হাসে নীলিমায়।
নাহি কলহাস—নাহি কলরব,
ঘুমে নত তব আঁখি-পল্লব,
ডাকি পিয়া পিয়া নীরব পাপিয়া তরুশাখে বেদনায়;
পৃথিবী ঘুমায়—তুমিও ঘুমাও রূপালিয়া জ্যোছনায়।

তোমায় দেখেছি নিতি নবরূপে নব নব বেশে কত;
তোমারে ঘিরিয়া সারা নিখিলের সুষমা লুটায় যত।
তোমায় দেখেছি ভরা-যৌবনে
উন্মনা মম মনোমৌ-বনে,
তোমায় দেখেছি গৃহ-দেবতার দেউলে ভক্তি নত;
তুমি অপরূপ, তোমার তুলনা—তুমি যে তোমার মত।

তোমার প্রেমের উন্মেষ-গাথা তুমি জানো কবি জানে;—
সেদিন ছিল গো সমারোহ কি যে দিকে দিকে গানে গানে।
সেদিন বরষা দিগন্ত ছাপি—
মেঘমায়া ঘোরে উতল কলাপী,
রজনীগন্ধা সুরভি-লীলায় তন্দ্রা-আবেশ আনে;
মত্ত বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে আসে বর্ষণ-ধ্বনি কানে।

বছরের পর বছর কেমনে কেটে গেল অগোচরে;
কত ঢেউ এসে ভেঙে ভেঙে গেল জীবনের বালুচরে।
আজ নিরালায় ঝঙ্কার তুলি
সুখে-দুখে মাখা বাজে দিনগুলি,
অযুত যুগের স্মরণ ছড়ানো আমাদের এই ঘরে;
লুকানো কথার হাওয়া বয়ে যায় আজি রাতে অন্তরে।

মালতী অশোক বকুল মাধবী বাসর-শয়ন পাতি
দূর-গগনের নীহারিকা সনে হরষে থাকুক মাতি।
বনে বনে যাক জ্যোছনা ঝরিয়া—
তুমি থাক মোর পরাণ ভরিয়া,
হাসিবে তোমার দৃষ্টি-প্রদীপে দুখের কাজল রাতি;
এহেন রজনী নিশীথ বিরল না যেন পোহায় সাথী!

ঝুন্টু কুলির বাঁশি

শ্রীরথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

নিস্তব্ধ রাত্রি। জীবনের কত ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তের ইতিহাস মনের মধ্যে ভীড় করিতেছিল। এমন সময় ঝুন্টু কুলির বাঁশিটা বাজিয়া উঠিল। অলস মুহূর্তের সমস্ত চিন্তা এক নিমেষের মধ্যে বাঁশির সুরে হারাইয়া গেল। আমি বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—জ্যোৎস্নালোকে রেল লাইনটা ঝকঝক্ করিয়া উঠিতেছে, কিছু দূরে কুলিদের কয়েকখানা খড়ের ঘরের অস্পষ্ট আভাস দেখা যাইতেছে—সেখান হইতেই চিরপরিচিত বাঁশিটার সুর ভাসিয়া আসিতেছে। রাত্রি নিস্তব্ধ হইলেই ঝুন্টু কুলির বাঁশিটা বাজিয়া ওঠে। জীবনের সুখ দুঃখের মুহূর্তগুলি সুরের প্লাবনে কোথায় যেন ভাসিয়া যায়। নিস্তব্ধ হইয়া ঘরের কোনে বসিয়া থাকি। কোনদিন পাগল মনটাকে টানিয়া রাখা দুঃসাধ্য হইয়া ওঠে—ঝুন্টু কুলির ঘরে ছুটিয়া যাই। ঝুন্টু বলে, "বাঁশি কি বাজাতে পারি বাবু, কে জানে আপনার কেন ভাল লাগে।"

ইহার যে কি উত্তর হইতে পারে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিনে, বলি, "তা আমিও জানিনে, ঝুন্টু।"

ঝুন্টু বাঁশের বাঁশিটা লইয়া বাজাইতে সুরু করিয়া দেয়। আমি নিস্তব্ধ হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকি। বাঁশি যখন শেষ হইয়া যায় তখনো নেশা যেন কাটিতে চাহে না। ঝুন্টু বলে, "বাবু, রাত তো অনেক হলো, আবার কাল।"

রেল লাইনের পাশ ঘেঁসিয়া ঘরে ফিরিবার সময় ঝুন্টুর বাঁশিটা কেবলি কানে বাজিতে থাকে।

বাঁশিটা যেন আজ কিছুতেই থামিতে চাহে না। ক্রমে রাত গভীর হইয়া আসিল, জ্যোৎস্নালোক ম্লান হইয়া গেল—সহসা আমার চমক ভাঙিল, ঝুন্টুর বাঁশি তো আর বাজে না।

ঝুন্টুর বাঁশি এমন সুরে তো কোনদিন বাজে নাই—কি একটা নেশায় আমার চোখ দুইটা আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

পরের দিন রাত্রে ঝুন্টুর বাঁশি আর বাজিল না। রাত্রি নিস্তব্ধ হইল—অস্পষ্ট অন্ধকারের তলে কুলিদের খড়ের ঘরগুলি হারাইয়া গেল, আমার প্রতীক্ষারত মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল—তথাপি বাঁশি বাজিল না। সুদীর্ঘ চার বৎসরের মধ্যে এমন কোনদিন হইয়াছে বলিয়া তো মনে পড়ে না।

সারা রাত ঘুম কিছুতেই আসিতে চাহে না—এই একটি রাত্রির বিপুল নিস্তব্ধতায়—মনের মধ্যে কোন জায়গাটা যেন শূন্য ফাঁকা হইয়া গেল। আকাশের চাঁদ তখন অস্ত গিয়াছে—সমস্ত জগৎটা অন্ধকারের নীড়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—আমার মনটা তখনো জাগিয়া জাগিয়া চঞ্চল পাখীর মতো উড়িয়া ফিরিতে লাগিল।

ভোরে কুলি পল্লীতে খবর লইতে গেলাম। ঝুন্টুর বাড়ি গিয়া দেখি ঘর বন্ধ। খোঁজ করিয়া জানিলাম—গতকাল নাকি ঝুন্টুর একটা চিঠি আসিয়াছিল—সন্ধ্যার গাড়ীতেই বাড়ি চলিয়া গিয়াছে। মনটা শংকিত হইয়া উঠিল, মনের মধ্যে কত কথাই না একে একে জাগিয়া উঠিতে লাগিল—তবুও ঝুন্টুর চলিয়া যাওয়ার মধ্যে একটা বিরাট রহস্য থাকিয়া গেল। তাহার পর কত রাত্রি কাটাইয়া দিলাম। মনের শূন্যতাটা ক্রমশই যেন অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইলেই দৃষ্টিটা ছুটিয়া যায় কুলি-পল্লীর একটা খড়ের ঘরের দিকে, সমস্ত অন্তকরণটা কিসের প্রতীক্ষায় যেন স্তব্ধ হইয়া থাকে। রাত্রি গভীর হইলে প্রতিদিনই কি রকম একটা কল্পনার নেশা আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া যায়; এখন যদি বাঁশিটা বাজিয়া ওঠে, এমন তো হইতেও পারে—ঝুন্টু যদি ফিরিয়া আসিয়াই থাকে।

কিন্তু বাঁশি আর বাজিয়া ওঠে না, প্রতিটি রাত্রির গভীর নীরবতা হৃদয়ের শূন্যতার উপর একটা বিরাট বেদনা লইয়া ঝুলিতে থাকে।

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দাশগুপ্ত — গৃহশিল্প — ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
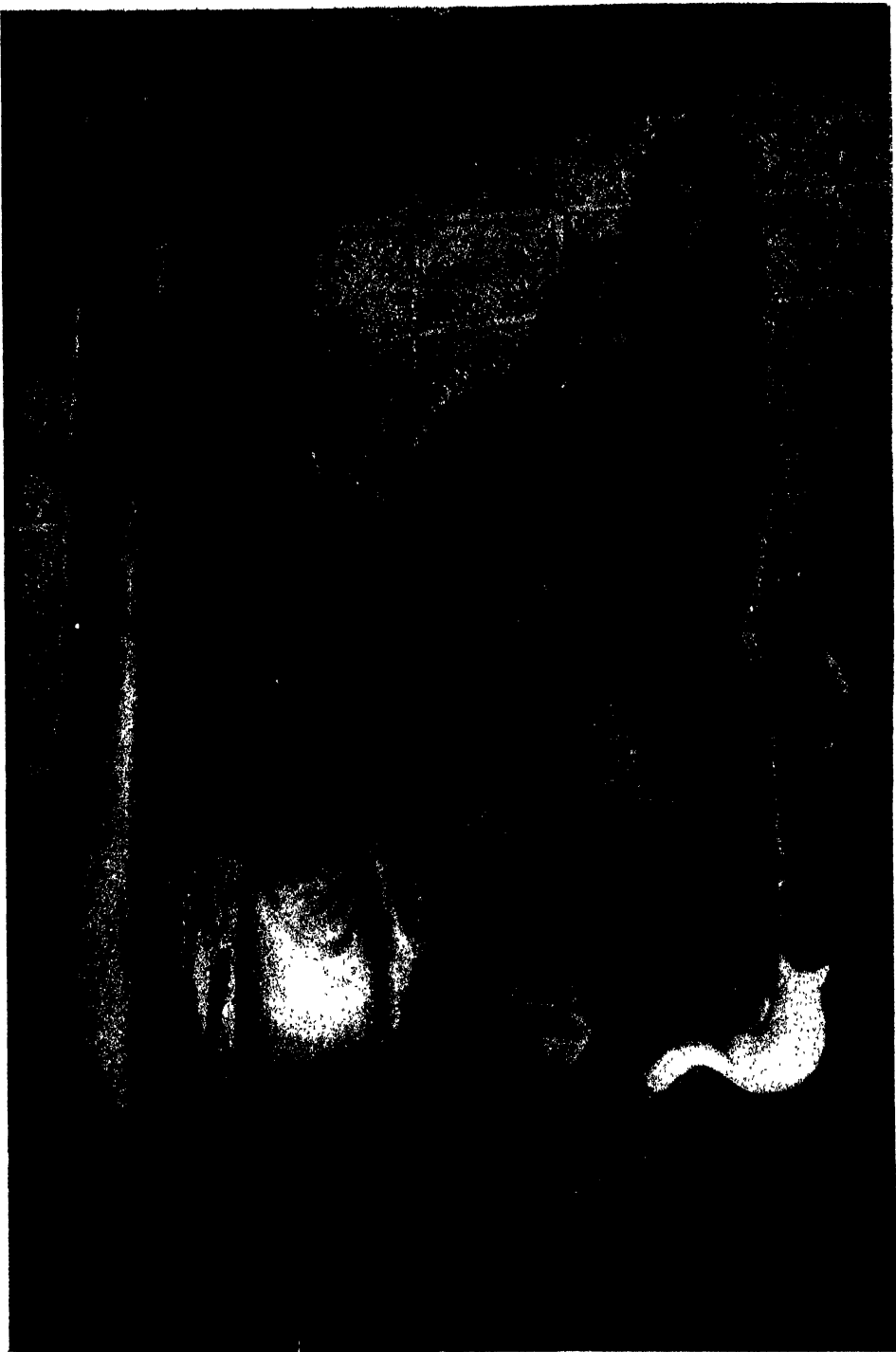
কতদিন কাটিয়া গিয়াছে ঠিক মনে পড়ে না। জ্যোৎস্না-লোকে কুলি-পল্লীর দিকে চাহিয়া বহুদিন আগেকার একটা রাত্রির কথা মনে পড়িল। সেদিনই ঝুনুটুর বাঁশিটা শেষ বাজিয়াছিল—তেমনসুরে আর কোনদিন বাজে নাই। সেদিন কি একটা নেশায় আমার চোখ দুইটা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। সে-ই তো শেষ বাঁশি শোনা।

কি জানি কেন মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। জ্যোৎস্না-লোকে কুলিপল্লীর দিকে ছুটিয়া চলিলাম।

একটু বিস্ময় জাগিল। চাহিয়া দেখিলাম ঝুনুটুর ঘরের দরজাটা খোলা, একটি মিটমিটে প্রদীপের আলো বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। ছুটিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম—ঝুনুটু এক কোণে নীরব হইয়া বসিয়া আছে, একটা বিরাট ঝড়ে যেন তাহার দেহটা ভাঙিয়া চুরিয়া গিয়াছে। একবার মিট্‌মিট্‌ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া ঝুনুটু নীরব হইয়াই রহিল। জানিনা কেন সহসা আমার চোখ দুইটা জলে ভারি হইয়া উঠিল।

কহিলাম, "ঝুনুটু, তোমার বাঁশি তো আর বাজে না?"

ঝুনুটুর চোখে জল নামিয়া আসিল, কহিল, "আমার বাঁশি তো নেই বাবু, তাকে হারিয়েই তো বাড়ি থেকে এলুম।"

আমার মনের মধ্যে কত কল্পনা অস্পষ্ট হইয়া ভাসিতে লাগিল—নীরবে ঝুনুটুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ঝুনুটু কহিতে লাগিল, "আপনাকে তো সেকথা কোনদিন বলিনি বাবু, তাই অবাক হয়ে যাচ্ছেন। চার বছর আগে যখন বাড়ি থেকে বাংলাদেশে আস্‌ছিলাম আমার পাঁচ বছরের ছেলে বাঁশি একটা বাঁশের বাঁশি হাতে দিয়ে বলেছিল, 'বাবা, এটা নিয়ে যাও।' এটা ওর কি খেয়াল জানিনে—ও বাঁশিটা ছিল ওর সবচেয়ে আদরের বস্তু। বাঁশি ভাল বাস্‌তো বলেই ওর নাম রেখেছিলাম বাঁশি। বাংলাদেশে এসে প্রথম বাঁশি বাজাতে শিখি। রাতে যখন বাঁশিটা বাজাতুম—মনে হতো আমার বাঁশি যেন কাছে কোথাও বসে শুনছে। সমস্ত দিনের পরিশ্রান্ত শরীরটা কি একটা আনন্দে ধুয়ে মুছে শান্ত হয়ে যেতো।"—ঝুনুটু কুলি থামিল, চাহিয়া দেখিলাম তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছে। চোখ মুছিয়া কহিল, "এই তো সেদিন বাড়ি থেকে পত্র পেলুম ছেলের অসুখ। বাড়ি গিয়ে দেখ্‌লুম—বাঁশি তো নেই—আমার যাওয়ার আগেই হারিয়ে গেছে।"

চোখের জলে ঝুনুটু কুলির বুক ভাসিয়া গেল। আমার বুকের মধ্যে তখন ঝড় উঠিয়াছে—কথা কহিবারও শক্তি যেন নাই।

সহসা ঘরের একটা কোনের দিকে লক্ষ্য পড়িল।

দেখিলাম, ঝুনুটুর সেই বাঁশের বাঁশিটা অতি যত্ন করিয়া ছোট একটা থাটুলির উপর তুলিয়া রাখিয়াছে। ঝুনুটুর মুখের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলাম—ঝুনুটু তখন অশ্রুপূর্ণ চোখে এক দৃষ্টে বাঁশিটার দিকে চাহিয়া আছে।

বাঁশী

কাদের নওয়াজ

(রুমী হইতে)

বাঁশী বাজে রাতে, মোরা শুনি শুধু
পাই হৃদে উল্লাস।
অর্থ তাহার জানিবারে কেহ
করিনে ক' উল্লাস।
জানো কি বন্ধু, বাঁশীর আত্মা
কাঁদিতেছে অবিরাম

বেণু বনে তার প্রিয় আছে—চায়
সেথা যেতে দিবা সম।
মোদের আত্মা, বাঁশীর মতই
ডুকরে কাঁদিছে নিতি,
সুদূর প্রিয়ের সাথে মিশিবারে
খুঁজিছে শুক্লা তিথি।

অনুকর্ষ

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

১১

বেশ একটু রাত্রি হইয়া গেলে তাঁহারা একটি গ্রামের প্রান্তভাগে কয়েকখানি কুটীরের সন্নিবেশে এক নিরালা আশ্রয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কুটীর কয়টির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গনগুলি পরিষ্কৃত মাটি দিয়া লেপা! মধ্যস্থলে একটি করিয়া তুলসী গাছ, তাহার চারিদিক ক্ষুদ্র বেদীর মত বাঁধানো, নিম্নে একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। ধূপের গন্ধে বায়ু সুরভিত। কোন কোন কুটীর হইতে মৃদু মৃদু খঞ্জনির শব্দের সঙ্গে গানের সুরে উচ্চারিত হইতেছিল—

"হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।"

উদাসীন বলিয়া উঠিলেন "একি ব্রহ্মচারী, আমাকে যে বৈরাগীদের আড্ডায় এনে ফেল্লে দেখ্‌ছি।"

ব্রহ্মচারী নম্রস্বরে বলিলেন "যা বল! আমার বৈষ্ণব দীক্ষার গুরু বাবাজীমশায় এইখানেই বাস করেন, তাঁকে একবার দর্শন ক'রে যাব।"

"তিনি? এইখানে থাকেন? ওঃ তাঁকে দেখ্‌বার আমারও যে সাধ ছিল। শ্যামা-সাধক ঠাকুরমশায়ও এই কথা বলেছিলেন—কিন্তু এই অসময়ে এখানে নিয়ে এলে ভাই? মনের এই দুর্দ্দশার সময়ে?"

"তোমারও আবার সময়-অসময় আছে এ তো এতদিন জান্‌তাম না।"

উদাসীন পূর্ণচক্ষে ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিতেই অন্ধকারেও সেই দীপ্ত চক্ষের উজ্জ্বল দৃষ্টি তারকা জ্যোতির মত তাঁহার চক্ষে পড়িল। উদাসীন গাঢ়স্বরে বলিলেন "তোমার মত হৃদয়বান্ লোকের মুখে এমন কথা শুনব এ আশা করিনি ব্রহ্মচারী! হিংস্রজন্তুকেও আঘাত ক'রে তার যন্ত্রণা দেখ্‌লে ব্যথিত না হয় এমন নির্দ্দয় কেউ কি আছে জগতে? যদি থাকে সে পশুর চেয়েও অধম।"

"হিংস্রজন্তুকে আঘাত ক'রেও ব্যথা বোধ?"

"হ্যাঁ। হিংস্র নাম আমরাই তাকে দিচ্চি। সে তো নিজের ক্ষুধারই নিবৃত্তি চায় মাত্র; তার নাম যদি হিংসা হয় জগতের সবাই হিংসুক।"

ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে মস্তক নত করিলেন। মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিলেন "তুমিই যথার্থ বৈষ্ণব। আমাদের ভান মাত্র।"

"এর ওপর আর অপরাধী ক'র না। চল সাধু দর্শনে যদি গ্লানি কাটে মনের।"

সম্মুখে একটি কৌপীন বহির্বাস পরিহিত বৈরাগীকে দেখিয়া ব্রহ্মচারী মস্তক নত করিতেই বৈরাগীও মস্তক নত করিয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন—"আপনি? আঃ ঠিক্ সময়েই এসেছেন। আমরা আপনাকে মনে মনে এত ডাক্‌ছিলাম। বাবাজী মশায়ের দেহের কিছু ব্যতিক্রম অবস্থা মনে হ'চ্চে।" ব্রহ্মচারী স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া গেলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বৈরাগী ব্যস্তভাবে পুনর্ব্বার বলিলেন "অতখানি ভয় পাবেন না। তবে বৃদ্ধশরীর, তাই ভয় হচ্চে— বিশেষ এখানে আমাদের উনিই একমাত্র আশ্রয় জানেন ত!"

"কতদিন হ'তে এ রকম আশঙ্কা কর্‌ছেন আপনারা?"

"এই দুই তিন দিন মাত্র। চলুন কুটীরে চলুন, আপনাকে দেখে সুখী হবেন। সঙ্গে ইনি—" বলিতে বলিতে সেই অস্পষ্টালোকেও উদাসীনের পানে চাহিয়া বক্তা বিস্মিত ভাবে নীরব হইলেন। ব্রহ্মচারী অগ্রসর হইয়া বলিলেন— "আমার ভ্রাতৃতুল্য—সুহৃদ্—সাধু পুরুষ।"

"আমাদের দ্বিগুণ সৌভাগ্য যে এমন ব্যক্তির দর্শন লাভ হল। বয়সে অতি কিশোর বলেই মনে হচ্চে। আজ আমাদের কুটীরে আতিথ্য স্বীকার ক'রে আমাদের কৃতার্থ করতে হবে বাবাজীকে।" উদাসীন মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন— "সে হবে, আগে বাবাজীমশায়কে দর্শন করি। কে আছে তাঁর কাছে?"

"আমাদের কাছে আর কে থাকবে বাবা! শ্রীরাধা-গোবিন্দের নাম মাত্র ভরসা।"

কীর্ত্তনকারীর কণ্ঠ অদূর কুটীর হইতে কীর্ত্তন-শেষ পদগুলি মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া গাহিতেছিল—

"মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন।

শ্রীগুরু চরণ বন্দি ভক্ত সঙ্গে বাস
জনমে জনমে করি এই অভিলাষ।"

একখানি কুটীরের দ্বারে তিনজনে উপস্থিত হইলে পূর্ব্বোক্ত বৈরাগীটি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—"কি অবস্থায় আছেন—গিয়ে প'ড়ে তাঁর ভজনানন্দে ব্যাঘাত না ঘটাই।"

ব্রহ্মচারী ঈষৎ আশ্বস্ত হইয়া চুপি চুপি বলিলেন "ভজন কর্‌তে পাচ্চেন তাহলে ?"

"বলেন কি ব্রহ্মচারী বাবা! আজীবন যিনি এই করছেন তাঁকে এটুকু শক্তিও যদি না দেবেন নাম ব্রহ্ম, তাহলে আমরা কোন্ ভরসায় থাকি ?"

ব্রহ্মচারী একটু অপ্রস্তুত হইয়া নীরব হইলেন। উদাসীন মৃদু মৃদু উচ্চারণ করিলেন—"সদা তদ্ভাবভাবিত!" বৈরাগী কুটীরের দরজা হইতে ডাকিলেন "বাবাজীমশায়!" বার দুই তিন ডাকের পর কুটীর মধ্য হইতে গম্ভীরস্বরে উত্তর আসিল "কেন বাবা ?"

"ব্রহ্মচারী বাবা এসেছেন, প্রভুর দর্শনপ্রার্থী।"

"তাঁকে আস্‌তে বল—তুমিও এস।"

উভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন—উদাসীন বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্ষণপরেই বৈরাগী বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে ভিতরে আহ্বান করিলে উদাসীন কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—একটি তৃণ কম্বল নির্ম্মিত শয্যার উপরে একটি ক্ষীণ দেহ অথচ স্নিগ্ধদর্শন বৃদ্ধ বৈষ্ণব বসিয়া আছেন—হস্তে তাঁহার জপমালা, আর পায়ের কাছে ব্রহ্মচারী যেন বিহ্বল ভাবে চরণ দুখানি জড়াইয়া পড়িয়া আছেন। এক হস্তে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ যেন আলিঙ্গনের ভাবে স্পর্শ করিয়া বৃদ্ধ বৈরাগী উদাসীনের পানে প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোকের মত স্নিগ্ধনেত্রে চাহিয়া বলিলেন "এস বাবা, বাইরে কেন ছিলে? একে তুমি এই আশ্রমের অভ্যাগত অতিথি, তাতে এই সাধুর বেশ!" বলিতে বলিতে বৈরাগীর নেত্রে যেন দ্বিগুণ বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল "হরিদাস—প্রদীপটা উজ্জ্বল করে তুলে ধর তো একবার। চক্ষের দৃষ্টি ক্ষীণ, বাবাজীর শ্রীমূর্ত্তিটি ভাল করে দেখি।"

হরিদাস নামে অভিহিত বৈরাগীটি প্রদীপ উজ্জ্বল করিতে করিতে ব্রহ্মচারী গুরুর চরণ হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন "এঁর কথা একবার শ্রীচরণে আমি নিবেদন পেয়েছি। আমার ভ্রাতৃতুল্য স্নেহাস্পদ।"

"সেই তিনি? আঃ একি গৌরচন্দ্র! গৌরচন্দ্র! নবদ্বীপচন্দ্র আমার?" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের শরীর কাঁপিয়া উঠিয়া পতনোন্মুখ হইতেই ব্রহ্মচারী ব্যস্তভাবে তাঁহাকে ধারণ করিলেন। অস্ফুটস্বরে আরও দুই চারি বার কি যেন বলিবার চেষ্টা করিতেই বৃদ্ধের কণ্ঠ মধ্য হইতে এমন একটা শ্লেষ্মার ঘড়্ ঘড়্ ধ্বনি উঠিল যে সভয়ে উদাসীন ও পূর্ব্বোক্ত বৈরাগী উভয়েই একসঙ্গে তাঁহার নিকটস্থ হইলেন এবং তিনজনে মিলিয়া ত্রস্তে তাঁহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন। বৈরাগী একটু উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে!" ব্রহ্মচারী গুরুর হস্ত নিজ হস্তে লইয়া নাড়ি পরীক্ষা করিতে করিতে ইঙ্গিতে তাহাদের আশ্বস্ত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "দুর্ব্বল দেহে ভাবাবেশ! তবু ভয় নেই মনে হচ্চে।"

কিছুক্ষণ পরে সংসজ্ঞ হইয়া বৃদ্ধ বৈষ্ণব কর্ণপথে আগত শব্দের সঙ্গে অস্ফুট ভাবে কণ্ঠ মিলাইতে চেষ্টা করিলেন "হরে কৃষ্ণ হরে রাম—গৌরচন্দ্র প্রভু আমার, কই—কই ?" বিপদগ্রস্ত এবং অপ্রস্তুত উদাসীন ত্বরিতগতিতে কুটীরের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার মনে হইতেছিল সেই মুহূর্ত্তেই সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেই ভাল হয়, কিন্তু পাছে অভুক্ত অতিথি চলিয়া যাওয়ায় সাধুরা দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হন, ব্রহ্মচারী পাছে কষ্ট পান্, এই ভয়ে অগ্রসরোন্মুখ পদযুগলকে নিস্পন্দ করিতে তাহাদের উপর জোর দিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মচারী তাঁহাকে কি বিপদেই ফেলিলেন—তাঁহার সঙ্গে আসিয়া কি অন্যায়ই হইয়াছে—দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই কথা ভাবিতেছেন—এমন সময়ে বৈরাগীটি আসিয়া তাঁহাকে আবার আহ্বান করিলেন—"বাবাজী প্রকৃতিস্থ হয়েছেন—আপনাকে না দেখে কাতর হচ্চেন, চলুন আপনি।"

উদাসীন জোড়হাত করিতেই আবার সানুবন্ধভাবে বলিলেন "আপনার মনোভাব বুঝ্‌ছি কিন্তু অনুপায়; আমাদের অবস্থা অনুভব ক'রে একটু দয়া করুন, সহ্য করুন ওঁর ভাবাবেশকে! আমি আপনাদের যৎসামান্য আতিথ্য সম্পাদনের চেষ্টা দেখি—শ্রান্ত আছেন আপনারা—তবু দয়া করুন আমাদের।"

দ্বিগুণ বিপদগ্রস্ত ভাবে উদাসীন নত-মস্তকে কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—এবারে সেই বৃদ্ধ বৈষ্ণব বাবাজী ব্রহ্মচারীর বুকে ঠেস্ দিয়া বসিয়া হস্তস্থ জপমালাটিকে জপের ভাবে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে করিতে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিতেছেন। উদাসীনকে একবার চকিতে দেখিয়া লইয়া চোখ্ বুজিয়া মৃদু মৃদু বলিতে লাগিলেন "এস বাবা, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর! এইখানে আসন নিয়ে বস। তোমার কথা আমাকে আমার নিতাইদাস বলেছিলেন একসময়! আমার ভাগ্য যে এমন সময়েও তোমাকে একবার দেখ্‌তে পেলাম। দেখ্‌বার সাধ হয়েছিল সেদিন ওঁর মুখে শুনে। গৌরচন্দ্র তা পূর্ণ করলেন। আতিথ্য স্বীকার কর বাবা আজ আমাদের এই কুটীরে। নিতাইদাস যাও বাবা, এঁর যথাসাধ্য শ্রান্তি দূর করার চেষ্টা আর ভোজনের—" উদাসীন তাঁহার নিকটস্থ আসনে বসিয়া পড়িয়া যোড়হস্তে অথচ দৃঢ়স্বরে বলিলেন "আপনি যদি স্থির হয়ে থাকেন তবেই আতিথ্য সম্ভব হবে। উনি গেলেন সেইজন্য, ব্রহ্মচারীদাদাকে ঐরকমেই যদি ব'সে থাকৃতে দেন তবেই আমার উপরে দয়া করা হবে, অন্যথায়—"

"আচ্ছা তাই হোক্।" বলিয়া বৃদ্ধ মৃদু জপ করিতে লাগিলেন।

উদাসীন ব্রহ্মচারীর পানে চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিলেন "নিতাই দাদা, যদি কোন কবিরাজ এদিকে থাকেন তাঁকে ডাক্‌বার চেষ্টা করলে ভাল হয়। শ্লেষ্মারই প্রকোপ দেখা যাচ্চে। গলার মধ্যে এখনো শব্দ হচ্চে একটু।"

ব্রহ্মচারী নিঃশব্দেই তাঁহার বক্ষে ও পৃষ্ঠে বোধহয় পুরাতন ঘৃতই মালিশ্ করিয়া দিতেছিলেন। তিনি কোন উত্তর দিলেন না—বৃদ্ধ সাধুই একটু হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা বাবা, তোমার আদেশই মান্‌লাম। কি নাম বলেছিলে নিতাই দাস? কমলাক্ষ? আহা আমার দয়াল অদ্বৈত-প্রভুর নাম যে! জয় রাধা গোবিন্দ! বাবা তুমি চঞ্চল হয়ো না, বৃদ্ধাবস্থায় এই রকমই দুর্ব্বল হ'তে হয়। এতটুকু মনোবেগও দেহ ধারণ করতে পারে না, বিশেষ এর কাজও বোধহয় এইবার শেষ হয়ে এসেছে। আমি সুস্থির হয়েছি, নিদ্রাকর্ষণ হচ্চে! নিতাইচাঁদ! তুমি আমার গৌরচন্দ্রকে নিয়ে আতিথ্য সেবা করাওগে—তোমার গুরুর প্রতিনিধি হ'যে—যাও!"

*　　*　　*　　*

নির্জ্জন পুষ্করিণী-তীরে হস্তপদমুখ প্রক্ষালনান্তে উভয়ে উপরে উঠিয়া একটু স্থান দেখিয়া বসিলেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন "ভাই, আমাকে একটি ভিক্ষা দেবে?"

"আবার ও কি বলবে না জানি, ভয় লাগছে।"

"সেকি—তোমারও ভয়? 'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়ো স্মৃতিঃ!' তা কি ভুলে গেছ?"

"প্রায়, বল কি বল্‌ছিলে?"

"তুমি দুচারটি দিন আরও আমাকে ভিক্ষা দাও। প্রভুপাদের কাছে তুমি থাক। আমি একটি বিশেষ প্রয়োজনে দুতিন দিনের জন্য স্থানান্তরে যেতে চাই।"

"কি বিশেষ প্রয়োজন আমাকে বলতে বাধা আছে কি?"

"বাধা আর কি! তোমার সম্মুখেই তো তাঁকে এনে উপস্থিত করব।"

"কাকে এনে উপস্থিত করবে? কে তিনি?"

"আমার প্রভুপাদের গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম-পত্নী! আজীবন ব্রহ্মচারিণী—শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী আমার মাতৃসমা পূজনীয়া দেবী তিনি। বৃদ্ধ বয়সেও কি কঠোর ভজনশীলা! প্রভুপাদ তরুণ বয়সেই সংসার ত্যাগ করেন, তিনিও সেই হ'তেই স্বামীর আদর্শে গৃহস্থাশ্রমে থেকেই সর্ব্বত্যাগিনী।"

"তুমি তাঁর কথাও এত জান্‌লে কি করে?"

"কিছুকাল পূর্ব্বে প্রভুর মুখেই তাঁর কথা শুনে গিয়ে দর্শন করে আসি। মনের বেগে প্রভুর সংবাদও তাঁকে কিছু কিছু দেওয়ায় তাঁর স্নেহও লাভ করি। গ্রামের লোকের মুখে তাঁর নিষ্ঠা ও ভজনের কথা শুনতে পাই। প্রভু তো এতদিন এদিকে ছিলেন না—কয়েক বৎসর মাত্র এই একটা নির্দ্দিষ্ট আশ্রমে ভজন করছিলেন। তিনিও এখন একাকিনী, তবুও বাহ্যে কেউ কারু উদ্দেশ রাখেন না। কেবল মা আমাকে এই প্রতিশ্রুতি করিয়ে রেখেছেন যে ওঁর সেবার বিশেষ প্রয়োজন হ'লে বা এই রকম ক্ষেত্রে তাঁকে আমি সংবাদ দেব।"

উদাসীন কিছুক্ষণ নিস্পন্দভাবে বসিয়া থাকিয়া ধীরে উচ্চারণ করিলেন—"আচ্ছা যাও। আমিও ওঁকে এ অবস্থায় রেখে চলে যেতে পারব না হয়ত। যদি উনি আর

নাই থাকেন—দেখ্‌তে সাধ আছে; সাধ হয় ওঁদেরও এ অবস্থায়। সেই "অব্যক্তনিধনান্যেব,"—"জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে যেথায় জলে" চিরকালের সেই কথাই, না নূতন একটু কিছু—তাও বুঝতে পারা যাবে অন্ততঃ! কিন্তু—"

"আবার কিন্তু কেন উঠ্‌ছে মুখে?"

"ঠাকুরাণীটিকে যে আমি বড় ভয় করি! ঠাকুরের সঙ্গে এক হাত লড়তে পারি দাঁড়িয়ে বরং—কিন্তু তিনি উদয় হলে চরণেই যে কেবল জোর আসে।"

"আঃ কি বল' কমলাক্ষ। সাধ্বী ব্রহ্মচারিণী বৃদ্ধা—একেবারে মাতৃমূর্ত্তি—তাঁকেও তোমার ভয়?"

"বল কি! মহামায়ারও আমার যে মাতৃমূর্ত্তিই! উনি যে সব বেশেই সমান শক্তিশালিনী। জীবনে ঐ ডাক্ কখনো ডাকিনি এবং ও স্নেহই কেমন তা জানি না—তাই ঐ অচিন্ত্য তত্ত্বকেই আমার বেশী ভয় ভাই।"

"সেই জন্যই অত শৈশবেই এমন হতে পেরেছ। মহামায়া তোমায় প্রথম থেকেই কোল ছাড়া করেছিলেন—তাই এত স্বাধীন! যাক্ আমি তবে চল্লাম। তুমি প্রভুপাদকে বৈদ্য দেখিয়ে বেশী হাঙ্গাম ক'র না, উনি যা চাইবেন তাই মাত্র দিও।"

উদাসীন হাসিয়া বলিলেন "তুমি তো যাও, সে দেখা যাবে।"

গভীর রাত্রি। কুটীরের মধ্যে অতন্দ্রভাবে বৃদ্ধ সাধুকে প্রায় কোলে করিয়াই আমাদের উদাসীন বসিয়া আছেন। রাত্রেই শ্লেষ্মার আধিক্য ঘটে। শ্লেষ্মার কোপে এক একবার বৃদ্ধ যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছেন, আর উদাসীন ধীরে ধীরে অঙ্গুলি করিয়া নিকটে খলে-মাড়া ঔষধ লইয়া তাঁহার জিহ্বায় দিতেছেন। বৃদ্ধ চক্ষু চাহিয়া দেখিতেছেন, অথচ আশ্চর্য্য এই যে তাহাতে আপত্তা মাত্র করিতেছেন না। পুরাতন ঘৃত গরম করিয়া বক্ষে পৃষ্ঠে মর্দ্দন করিয়া দিতেছেন পায়ের তলায় দিতেছেন, কিছুতেই তাঁহার আপত্তা নাই! কেবল এক একবার চক্ষু চাহিয়া তাঁহাকে দেখিয়ালইতেছেন; আবার পরম নিশ্চিন্তমনে যেন নিদ্রার ঘোরে ঢুলিয়া পড়িতেছেন। মুখে অস্ফুটে 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ' শব্দ, কখনো 'গৌর' এই কথাটি মাত্র ধ্বনিত হইতেছে। যেন তিনি এক পরম আবেশে আবিষ্ট হইয়া আছেন—যাহাতে বাহিক কোন কার্য্যই তাঁহাকে অন্যদিকে আনিতে পারিতেছে না। কিসের এ আবেশ? ব্যাধিরই প্রকোপে মস্তিষ্কের জড়তা, অথবা এ এক নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের মধ্যে অসংশয়ে আত্ম-সমর্পণ! কে ইহার উত্তর দিবে!

১২

ব্রহ্মচারীর সঙ্গে যিনি আসিলেন তাঁহাকে দেখিয়া উদাসীন একটু বিস্মিতই হইয়া গেলেন। ইনিই কি এই মহাত্মার ধর্ম্মপত্নী? একেবারে বিধবার বেশ যে! তাঁহার মনে সেই গঙ্গাতীরের গার্হস্থ্য অথচ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের স্বামিনীর মূর্ত্তিটিই আদর্শ হইয়াছিল। লালপাড়ের কাপড় এলা মাটি দিয়ে ছোপান, রুক্ষ কেশের মধ্যেও আরক্ত সিন্দুর চিহ্ন! হস্তে দুইটি লাল শাঁখা—কখনো লাল সূতা বাঁধা—সর্ব্বাঙ্গেই যেন একটা আরক্ত ছাপে তাঁহাকে শিবসংযুক্তা শিবানীর মতই দেখাইত। আর ইনি তার একেবারে বিপরীত! যেন কতকালের তপঃকৃশা বিধবা তাপসী, মুখে এবং সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা উদাসীনতার ছাপ, যেন জগতের সহিত কোন-খানে কোন সংযোগ নাই, সর্ব্বদা আত্মসমাহিত নিম্ন দৃষ্টি। মস্তকের কর্ত্তিত ক্ষুদ্র কেশ শুভ্র হইয়া উঠিয়াছে, তবু যেন কাহারো সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে চাহেন না বা বাক্যালাপও করেন না। উদাসীনের ইচ্ছা হইল একবার ব্রহ্মচারীকে বলেন যে এই কি তোমার মাতৃমূর্ত্তি? ইনি যে মৌনব্রতা গুহাবাসিনী তপস্বিনী! কিন্তু তাঁহার যে 'মহামায়া'র ভয় হইয়াছিল তাহা নিরসন হওয়াতে একটু সুখী ও নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি নিঃশব্দে আসিয়াই বৃদ্ধ বৈষ্ণবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন; এজন্য উদাসীনের মুক্তিরও পথ হইয়াছিল, ইচ্ছা করিলেই তিনি যাইতে পারিতেন; কিন্তু সেই বৃদ্ধ বৈষ্ণবই তাঁহার ক্রমে যেন এক পরম বন্ধনের কারণ হইয়া উঠিলেন। সুস্থ অথবা নির্দ্দিষ্ট পথের যাত্রী তাঁহাকে একদিকে ভিড়িতে দেখিলেই যেন উদাসীন নিশ্চিন্ত হইতেন, কিন্তু তাহা শীঘ্র যে দুটার একটাও ঘটিবে এমন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল না।

বৃদ্ধ বৈষ্ণবেরও কোন ভাবান্তর মাত্র নাই, ইনি যেন চিরকালই এই আশ্রমে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন, বালকের মত তাঁহাকে খাওয়াইতেছেন মুছাইতেছেন শোওয়াইতেছেন, হস্তে জপের মালা তুলিয়া দিতেছেন, পুঁথি পড়িয়া শুনাইতেছেন। উভয়ের মধ্যে কখনো যে

কোন সম্পর্ক ছিল এমন একটা কথা মাত্রও একবার উঠে না।

সেদিন ঠাকুরাণী বৈষ্ণব সাধুকে তাঁহার ইচ্ছায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিয়া শুনাইতেছিলেন। যদৃচ্ছা পাঠ অগ্রসর হইয়া আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে আসিয়া পড়িয়াছিল। তিনি পড়িতেছিলেন—

শ্রীবলরাম গোঁসাই মূল সঙ্কর্ষণ
পঞ্চরূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন।
আপনে করেন কৃষ্ণ লীলার সহায়
সৃষ্টি লীলা কার্য্য করে ধরি চারি কায়।
দৃষ্টাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন
শেষরূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন।
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ সেবানন্দ
সেই বলরাম সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ।"

কুটীরের বাহিরে ব্রহ্মচারী এবং তরুণ উদাসীন নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, উভয়ের কর্ণেই পাঠের শব্দগুলি যাইতেছিল। হাসিয়া উদাসীন ব্রহ্মচারীর পানে চাহিয়া বলিলেন "পুরুষরূপী প্রকৃতি আর কি! যাঁকে শাক্ত উপাসকরা বল্‌ছে শক্তি।"

"সেই প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে তাঁর খেলা।" তবে ঠাকুরের পুরুষের বেশ ধর্‌বার দরকার কি ছিল! এত সেবা স্ত্রীবেশেই তাঁকে বেশ মানাত। আবার একটা পুরুষ নাম বা বেশ ধরা কেন?

ব্রহ্মচারী একটু হাসিলেন মাত্র; কিন্তু কুটীর মধ্য হইতে নারী কণ্ঠে সহসা উত্তর আসিল "শক্তি বস্তুকে কি ব্যাকরণ দিয়েই বিচার করতে হবে বাবা? সে কি শব্দ মাত্র? ভগবদ্ শক্তি কি স্ত্রী পুরুষ দুইই হতে পারেন না? দুই তত্ত্বই তাঁর উপর আরোপ কি চলে না?" সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ বৈষ্ণবের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল "নিতাইচাঁদ—আমার নিতাইচাঁদ।"

উদাসীন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি ব্রহ্মচারীর সঙ্গে পরিহাসে একটা কুতর্ক তুলিয়া রঙ্গ করিয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু স্বল্পভাষিণী অজ্ঞাতবিদ্যা রমণীর উত্তর শুনিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিলেন, বুঝিলেন ইহাঁকে আপাতদৃষ্টে যেমন মনে হইতেছে ইনি তাহা নন্। উদাসীন একটু অপ্রস্তুত হইয়া স্নানার্থে উঠিয়া পড়িলেন। ব্রহ্মচারীকে বলিলেন "যাবে না?"

"আমার কিছু দেরী আছে, তুমি এগোও।"

পুখুরটি গ্রামের কোল্ ঘেঁসিয়া; তাহাতে গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই স্নান করে। উদাসীন আজ তাঁহার মধ্যাহ্ন-স্নান সময়ের পূর্ব্বেই ঘাটে আসিয়া পড়িয়া দেখিলেন—ঘাটে স্ত্রীলোকেরই আধিক্য বেশী! ঘাটের দিকে তো অগ্রসর হইবারই উপায় নাই; যদিও আথ্‌ড়ার দুই একজন বৈষ্ণবও সে ঘাটে স্নান করিতেছিল তথাপি উদাসীন সেদিকে না গিয়া আঘাটার জঙ্গল ভাঙিয়াই জলে নামিয়া পড়িলেন, ফিরিয়া যাইতে আর ইচ্ছা হইল না।

যেখানে নামিয়াছিলেন জলের মধ্যে সেখানে বড়ই জলের জঙ্গল জড় হইয়া স্নানের বাধা সৃষ্টি করিতেছিল। জলজ লতার দল ফুল ফুটাইয়া পত্র বিস্তার করিয়া একেবারে সেখানটা পুষ্পবন করিয়া তুলিয়াছে। উদাসীন স্থলের দিক হইতে ডুব সাঁতারে অন্য দিকে চলিয়া যাইবার জন্য নিঃশব্দে ডুব দিলেন। কিছুদুর গিয়া ভাসিয়া মাথা তুলিতেই মনে হইল গলায় কি যেন মোটা জিনিষ জড়াইয়া গিয়াছে! বুঝি জল-লতার শৃঙ্খলই হইবে? এইরূপ ভাবিতে না ভাবিতে ঘাট হইতে তীব্র চিৎকার ধ্বনি কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিল। "সন্ন্যাসী ঠাকুর—ও সন্ন্যাসী ঠাকুর—গলায় তোমার ও যে মস্ত সাপ, কি সর্ব্বনাশ, ও মা কি হবে—মুখ বের করছে ছ্যাখ!" স্ত্রীলোকেরা আর্ত্তনাদে সমস্ত পুখুর ছাইয়া ফেলিল; বৈষ্ণব কয়জনও "জয় নিতাই জয় নিতাই" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল; সাঁতরাইয়া অগ্রসর হইবার সাহস কাহারই হইল না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সন্ন্যাসী ঠাকুরও তাহাদের চিৎকারের সঙ্গে একবার "জয় নিতাই" শব্দ করিয়াই সজোরে আবার জলের মধ্যে ডুব দিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেল—সেই কয় মুহূর্ত্তই যেন সকলের এক যুগ! আবার সন্ন্যাসী জল হইতে মাথা তুলিলেন। সকলে একসঙ্গে সানন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল "ছেড়ে গেছে, স'রে গেছে, জয় নিতাই, জয় নিতাই! পালিয়ে এস সন্ন্যাসী ঠাকুর এইবার; আমরা এই ঘাট ছেড়ে উঠে যাচ্ছি, তুমি এই ঘাটে এসে ওঠ ঠাকুর!" বলিতে বলিতে কয়েকটি রমণী কাঁদিয়াই ফেলিল। বৈষ্ণব কয়জন তাঁহাকে জঙ্গলের দিকে নামার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য মৃদুভাবে দোষারোপ করিতে লাগিলেন। উদাসীন সেদিকে মনোযোগ না দিয়া রমণীগণের পূর্ব্ব-অধিকৃত, এখন সম্পূর্ণ ত্যক্ত, ঘাটের

নিকটে আসিয়া জলেই দাঁড়াইলেন। তীর হইতে মৃদুস্বরে কেহ বলিল "গলায় কোন রকম কষ্ট বোধ হচ্চে না ত?—মোচড় দিতে পারেনি বোধ হয়।" সন্ন্যাসী সচকিতে ফিরিয়া দেখিলেন—ব্রহ্মচারীর বর্ণিত সেই মাতৃমূর্ত্তি প্রকট হইয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া আছেন—কক্ষে কলসী! জলাহরণেই আসিয়াছিলেন বোধ হয়।

তিনি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কলসধারিণী আবার বলিলেন "গলায় একটা লাল দাগ কিন্তু পড়েছে, কিছু চাপ দিয়েছিল বোধ হয়।"

তাঁহার পশ্চাতে আরও দুই তিনটি রমণী তাঁহার আগমনে সাহস পাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের চক্ষু ও মন হইতে তখনো সে বিভীষিকা রহস্য যেন অপসৃত হয় নাই, তাহারা "উঃ—বাবা গো—কি হতো গো!" বলিয়া যেন শিহরিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। একজন বর্ষিয়সী আরও সাহস ধরিয়া বলিয়া উঠিল "আপনি এসে দাঁড়ালেই আমরা এখান থেকে উঠে যাব—আপনি 'চান্' সেরে গেলে তবে নাম্‌ব, আর আপনি অমন জঙ্গল আঘাটায় যেওনি বাপু! যাবে নি ত বাবা?"

উদাসীন এইবার মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন "না।" সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই কথাটুকুর উত্তর পাইয়াই সে যেন বর্ত্তাইয়া গিয়া পরম বিজয়িনী ভাবে সঙ্গিনীদের মুখপানে চাহিয়া যেন বুঝাইল "দ্যাখ—ঠাকুরকে কথা কইয়েছি।"

কলস কক্ষে ব্রহ্মচারিণী মাতা জলের কাছে নামিতেই উদাসীন অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন "আমায় কলসী দেন, আমি বেণী জল থেকে পরিষ্কার জল তুলে দিই।" তাঁহার হস্তে কলসী ছাড়িয়া দিয়া মাতা ধীরে ধীরে বলিলেন "বাবা, যাকে তুমি ভয় করবে সেই তোমায় ভয় দেখাবে! অভয়ের সাধনা করছ—কাকে তোমার ভয়? ভয় আপনি ভয়ে পালিয়ে যাবে। সাপ-বাঘ যার পথ ছেড়ে দেয় মানুষকে তার ভয়—আর যে মানুষ তার মা—তার ভগ্নী—তার কন্যা?"

কলস ভরিয়া নির্ম্মল জল তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিয়া উদাসীন আরক্ত মুখে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মস্তকে দিলেন। বর্ষিয়সী স্নিগ্ধ প্রসন্ন নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া অস্ফুটে কি যেন আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিলেন। তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন—সন্ন্যাসী নিজকৃত্য সমাপনান্তে জল হইতে উঠিতে উঠিতে ভাবিতেছিলেন—এই মূর্ত্তি উহাঁর এ কয়দিন কোথায় ছিল! সত্যই কি আমার নিজের মনের ভাবান্তরেই উহাঁকে অন্য মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলাম?

আশ্রমে পৌছিয়া দেখেন সেখানে মহা গণ্ডগোল বাধিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী সংবাদ পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছিলেন এমন সময়ে উদাসীনকে সম্মুখে পাইয়া একেবারে সাপটাইয়া জড়াইয়াই ধরিলেন, "কি সর্ব্বনাশ—কি সর্ব্বনাশ! গলায় কিছু হয় নাই ত!" বার বার কণ্ঠের চারিদিকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। উদাসীন হাসিয়া বলিলেন "কিছুই হয় নি! নিত্যানন্দ একটু রসিকতা করলেন আর কি, আমার সঙ্গে।"

"ঠিক্ ঠিক্—তাই বটে! জয় নিতাই—জয় নিতাই! কি আশ্চর্য্য! আমার মনেও কিন্তু তোমার পরিহাসটা বেজেছিল, ভয় করেছিল একটু।"

"বটে? তা যদি কর্‌ত তুমি আমার সঙ্গে থাক্‌তে! দ্যাখো মা-ঠাক্‌রুণেরও নিশ্চয় লেগেছিল মনে, নৈলে তিনি ঐ সময়ে জল আন্‌তে যাবেন কেন? অবোধ সন্তানের জন্য মা'র চিন্তা হয়েছিল।"

উভয়ে চাহিয়া দেখিলেন সেই বিকারশূন্য তপস্বিনী তাঁহাদের কথা শুনিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। তাঁহার সেই হাসিতে জাগতিক স্নেহেরই সম্পূর্ণ আভাস।

* * * *

সেই দিনই মধ্যরাত্রে তাঁহাদের নিশ্চিন্ত নিদ্রার মধ্যে কাহার আহ্বানে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। সচকিতে চাহিয়া দেখিলেন—তপস্বিনী মাতা তাঁহাদের উভয়কে ডাকিতেছেন। উভয়েই ধড়ফড়্ করিয়া উঠিয়া বসিলেন, "তোমরা ওঠো, সময় আগত।"

"সময় আগত?" ব্রহ্মচারী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আর যেন দণ্ডাঘাতে আহত হইয়া উদাসীন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি যে মনে করিতেছিলেন প্রভাতেই বিদায় নিয়া কাশীর পথে রওনা হইবেন। বাবাজী যে সম্পূর্ণই সুস্থ হইয়া গিয়াছেন!

তখনি তাঁহারও ডাক্ পড়িল। কুটীর মধ্যে গিয়া দেখিলেন তিনি হাসিমুখে শয্যায় প্রায় বসিয়াই আছেন—হস্তে জপের মালা। ব্রহ্মচারীর অঙ্গে শরীরের ভর রহিয়াছে,

আর সম্মুখে তপস্বিনী স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সাধু যেন আদরের সহিত আহ্বান করিলেন "এ সময়ে দূরে কেন বাবা গোরাচাঁদ—আমার নিতাইচাঁদের পাশে এস! জন্ম জন্মান্তরের সম্বন্ধ না থাকলে কি এসময়ে এমন মিলন হয়? সঙ্কোচ কিসের—কাছে এস।"

উদাসীন হাঁটু পাতিয়া নিকটে বসিয়া নাড়ী দেখিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেই সেই হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বৃদ্ধ বৈষ্ণব যেন তাঁহাকে নিকটেই আকর্ষণ করিলেন। কর্ত্তব্যমূঢ়ভাবে তিনি ব্রহ্মচারীর পার্শ্বেই বসিয়া পড়িলেন। সাধুর কোন ব্যতিক্রম বুঝিতে পারিতেছিলেন না, নাড়ীটা একবার দেখিতে পাইলে হইত, কিন্তু তাঁহাকে বিরক্ত করিতেও সাহস হইতেছে না। পত্নীর দিকে চাহিয়া সহসা বৃদ্ধ বলিলেন "জগতের যে মায়িক সম্বন্ধ তাতে তোমায় আমি অনেক দুঃখ দিয়েছি, জানি—"

"কিন্তু অমায়িক সম্বন্ধে তেমনি আমায় পরম সুখ দিয়েছেন! এতদিন পরে আবার অতীত দিনের কথা, আর তার স্মৃতি কেন আনছেন প্রভু?"

"নৈলে সাধ্বীর কাছে যে অপরাধ থেকে যায়! তার মার্জ্জনা ভিক্ষার এই ত সময়। জাগতিক ঋণ রেখে যেতে নেই, সেও এক বন্ধন। দেনা পাওনা শোধ হয়ে যাক্।"

সাধ্বী যোড় হস্তে উত্তর দিলেন "প্রভু শুনেছি আপনাদের কোন ঋণই থাকে না। আপনারা সংসারের সকল ঋণেই মুক্ত। স্ত্রীর কাছে ঋণ তো তুচ্ছ কথা।"

উদাসীন আশ্রমের অন্য সকলকে ডাকিবার প্রয়োজন ভাবিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেই মহাত্মা ইঙ্গিতে নিবারণ করিলেন। তাহার পরে সকলের সঙ্গে নাম উচ্চারণ করিতে করিতে কখন এক সময় হস্ত হইতে মালা শিথিল হইয়া পড়িয়া গেল। সকলে সচকিতে চাহিতে লাগিলেন—কিন্তু তপস্বিনী ইঙ্গিতে তাঁহাদের চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া একভাবে নাম উচ্চারণ করিয়া চলিলেন। তাঁহারা তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণে স্থিরভাবেই বসিয়া রহিলেন।

কতক্ষণ পরে সহসা যেন জাগিয়া উঠিয়া বৃদ্ধ বৈষ্ণব চোখ মেলিয়া পরিষ্কার স্বরে ডাকিলেন "কমলাক্ষ!" উদাসীন সচমকে তাঁহার মুখের সম্মুখে গিয়া উত্তর দিলেন 'প্রভু!'

"তোমার ঋণ তো শোধ হ'লনা—হঠাৎ এ সময়ে অহেতুকী এত আনন্দ কেন দিলে? একি জন্মজন্মান্তরেরই সম্বন্ধ নয়! নিতাই দাসের মুখে তোমার কথা শুনে সাময়িক তখন একবার তোমায় কাছে পেতে ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু তা যে এতখানি সম্বন্ধ তা তখন জানিনি। [illegible] বাবা, কি আমার কাছে তোমার প্রাপ্য আছে তাতো বুঝছিনা, তুমি নিজে নাও এসে।"

উদাসীন ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহার চরণ ধূলি নিতেই তিনি উভয়পদ একেবারে প্রসারণ করিয়া দিলেন। পরম আবিষ্টের মত বলিয়া উঠিলেন "নাও সব নাও, যা আছে আমার এতকাল ধ'রে সঞ্চিত, সব। তোমাকে দিয়ে যাবার জন্যই বুঝি এতকাল সঞ্চয় করে রেখেছিলাম, নিতাই দাসও নিতে পারেনি, তোমার জন্যই ছিল বুঝি।" উদাসীনের নয়ন হইতে অহেতুকী অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, দর্শক দুইজনের চক্ষুও শুষ্ক ছিলনা। তাঁহারাও ভয়ে ভয়ে যখন পদধূলি লইতে নিজ নিজ হস্ত প্রসারণ করিলেন তখন আবার সাধু তাঁহার মুহু উচ্চারিত নামসমুদ্রের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন।

উষার ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, তরুণ সূর্য্যরশ্মি আশ্রমের শিরে জাগিয়া উঠিল। আশ্রম সুদ্ধ সকলে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন, প্রত্যেকেই চরণধূলা নিতেছিল, কেহ বা নাম উচ্চারণ করিতেছিল। ইঁহাদের তিনজনের মুখের বিরাম ছিল না।

"কমলাক্ষ, ধর।" সকলে পূর্ণ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল সেই শুষ্ক দেহ দুলিয়া উঠিয়াছে, চক্ষু ঈষদোন্মুক্ত অথচ তারকা দৃষ্টিশূন্য। একখানি হস্ত মুষ্টিবদ্ধভাবে প্রসারিত হইতেই উদাসীন উভয় হস্তে সেই মুষ্টিধারণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কিসের একটা বেগ তাঁহার সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত যেন তাঁহাকে বাহ্যজ্ঞান শূন্য করিয়া দিল। যখন তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিল দেখিলেন—সকলে পূর্ণবেগে নাম উচ্চারণ করিতেছে, আর তার মধ্যে সেই জ্যোতির্ম্ময় দেহ স্থির উন্নত। ব্রহ্মচারীর বক্ষে আর অবলম্বন নাই, নিজ বেগে তাহা মেরুদণ্ডের উপরই দাঁড়াইয়াছে।

এইবার তপস্বিনী মাতা সহসা তাঁহার চরণের উপর লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, বুঝিলেন এইবার মহাত্মা সত্যই মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে তিনি একি দান করিলেন শেষ মুহূর্ত্তে? এ লইয়া তিনি কি করিবেন! স্থির হইয়া আর যেন তিনি বসিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না। কুটীরের বাহিরে মুক্ত আকাশের তলে আসিয়া দাঁড়াইয়া তবে যেন স্বচ্ছন্দে শ্বাস গ্রহণ করিতে পারিলেন। যেন ক্রমে তাঁহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল।

সাধুর দেহের শেষ কৃত্য সম্পাদনের পর—আশ্রমের সকলে এক সময়ে লক্ষ্য করিলেন—উদাসীন তরুণ সন্ন্যাসী সকলের অলক্ষিতে কখন্ সে আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন।

সুদীর্ঘ পথ বাহিয়া আবার তিনি চলিয়াছেন। কানে বাজিতেছিল তপস্বিনীর একটি কথা "বাবা মহাত্মার নিকট যা পেয়েছ তার যত্ন কর। যত্ন বিনে আমরা জীবনের অনেক রত্নই হারাই। তাই দিলেও পাওয়া হয় না, তা রাখ্‌তে জানা আর তার ব্যবহার জানা চাই।"

তাঁহার উদ্দেশে মস্তক নত করিয়া উদাসীন নিজ গন্তব্য পথে আবার যাত্রা করিলেন।

ইহারই কয় বৎসর পরে এই কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে।

ক্রমশঃ

আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম্ম

আলোচনা

ডক্টর মেঘনাদ সাহার নব-নীতি

শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত বি, এ

বৈশাখের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের "আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিবার পর জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহার প্রতিবাদ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই বিষয়ে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এবং অধ্যাত্ম সাধকের মধ্যে এই পতিত ভারতজাতির উন্নতি ও সভ্যতা'র আদর্শ সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে দুইটি বিভিন্নমুখী চিন্তাধারার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমঝদার মাত্রেরই কাছে এই প্রবন্ধগুলির একটা আবেদন আছে। আমরা এখন উক্ত প্রবন্ধগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

অনিলবরণবাবু লিখিয়াছিলেন, "হিন্দুর ধর্ম্ম ও দর্শনের মূল হইতেছে বেদ।" তাঁহার এই অতি সরল ও অবিসম্বাদিত কথাটি মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে মেঘনাদবাবু প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা একান্তই অজ্ঞতাপ্রসূত। হিন্দুর এমন কোন উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ, শাস্ত্র নাই—যাহাতে বেদকে মূল বলিয়া স্পষ্ট স্বীকার করা হয় নাই। উপনিষদের ঋষিরা তাঁহাদের বক্তব্যের সমর্থনে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ-স্বরূপে বলিতেন, "তদেষঃ ঋচাপ্যুক্তঃ।" উপনিষদ স্পষ্ট বলিয়াছে— "সর্ব্বে বেদাঃ যৎ পদমামনন্তি" (কঠ)। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, "সকল বেদে আমিই বেগু।" তাহা ছাড়া হিন্দুর পূজা, সন্ধ্যা, উপাসনা, বিবাহ আদি সামাজিক ব্যাপারে সর্ব্বত্র আজ পর্য্যন্ত বেদের মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে, দ্বিজগণ আজ পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিয়া ত্রি-সন্ধ্যা করিতেছে। ডক্টর মেঘনাদ সাহা এ-সবকে উড়াইয়া দিলেন—এক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় কে মাটির তলায় কি ভাঙ্গা হাঁড়ীর সন্ধান পাইয়াছে তাহার জোরে! এ-সব গবেষণায় লোকে কিরূপ স্বকপোলকল্পিত উদ্ভট ব্যাখ্যা করিয়া থাকে তাহা সুবিদিত। ইহার উপর নির্ভর করিয়া ডক্টর সাহা বেদকে উড়াইয়া দিলেন, "ব্যাদ" বলিয়া ব্যঙ্গ করিলেন, ইহাতে মৌলিকতার পরিচয় আছে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়িল। কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম, কলিকাতায় কোনও এক বৈষ্ণবাচার্য্য নাকি সেদিন হরিভক্তি প্রচার-মানসে ভাগবত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রোতৃমণ্ডলীকে শুনাইতেছিলেন যে, "ম্যা, ম্যা" (অর্থাৎ "মা", "মা") ডাকে অন্তরে ভক্তি জাগে না— "হরি", "হরি" বলিলেই অন্তরে ভক্তির উদয় হয়। বেদের উপর ডক্টর সাহার কটাক্ষ আর উক্ত বৈষ্ণবাচার্য্যের মাতৃনামে বিরাগ একই প্রকারের সিদ্ধান্ত বলিয়া আমাদের ধারণা।

অনিলবরণবাবু বলিয়াছিলেন, হিন্দুরা দার্শনিক কল্পনা-বিলাসে মগ্ন হইয়া কর্ম্মশক্তি হারাইয়াছে, মেঘনাদবাবুর এই কথায় কোন মৌলিকতা নাই। মেঘনাদবাবু বলিয়াছেন—না, ইহা মৌলিক। কাহার নিকট হইতে তিনি ইহা লইয়াছেন অনিলবরণবাবুর পক্ষে বলিয়া না দেওয়া অভদ্রতা। কিন্তু যে কথা শত শত লোকে বলিতেছে, তাহাদের কাহার নিকট হইতে এই কথা তিনি পাইয়াছেন অনিলবরণবাবু কেমন করিয়া তাহা বলিবেন? তবে বলিতে পারি, যাঁহারা উইলিয়াম আর্চার-এর 'ইণ্ডিয়া এণ্ড দি ফিউচার' নামক ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধীয় পাশ্চাত্য সমালোচনা-সংগ্রহের বইখানি পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের কাছে মেঘনাদবাবুর কথাগুলি উক্ত পুস্তকের প্রতিধ্বনি বলিয়াই মনে হইবে। অনেকেই অবগত আছেন যে, উইলিয়াম আর্চার-এর সমালোচনার সার্থক জবাব দিয়াছিলেন স্যর জন্ উড্‌রফ তাঁহার 'ইজ্ ইণ্ডিয়া সিবিলাইসড্' নামক গ্রন্থে—যে উত্তর সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—যেন একটা গুবরে পোকাকে জাঁতায় পিষিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ নিজে ঐসব সমালোচনার সম্পূর্ণ জবাব দিয়াছেন তাঁহার মহান্ গ্রন্থ 'এ ডিফেন্স অফ্ ইণ্ডিয়ান কাল্‌চার'-এ। মেঘনাদবাবু যদি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব-সূচক উপরি উক্ত গ্রন্থ দুইখানি পাঠ করেনতাহা হইলে তিনি হিন্দুর ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার অনেক মতামত পরিবর্ত্তিত করিতে বাধ্য হইবেন বলিয়াই আমরা মনে করি।

অনিলবরণবাবু বলিয়াছেন হিন্দুর অবতারতত্ত্বে ইভলিউসন থিওরীর ইঙ্গিত রহিয়াছে। মেঘনাদবাবু ইহা লইয়া ঠাট্টা করিয়াছেন। অনিলবরণবাবু এমন কথা নিশ্চয়ই বলেন নাই যে, অবতারদের মধ্যে যে রকম বিবর্ত্তন দেখা যায় প্রাণী হইতে মানুষ ঠিক পরপর সেইভাবেই হইয়াছে—ঐটা কেবল একটা মূল প্রিন্সিপল্-এর সিম্বলিক ইলাসট্রেশন মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানও এখন পর্য্যন্ত ঠিক করিতে পারে নাই, কোন্ জীবের পর কোন্ জীব হইয়াছে—এখনও অনেক মিসিং লিংক্‌স্ রহিয়া গিয়াছে। তবে মূল তত্ত্বটি সম্বন্ধে— মানুষ ক্রমবিবর্ত্তনের দ্বারা নিম্নতর প্রাণী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ভগবানের দ্বারা একেবারে সৃষ্ট হয় নাই—প্রায় সকলেই একমত এবং হিন্দুর উপনিষদ, সাংখ্যদর্শন, গীতা এইটিই স্পষ্টভাবে বলিয়াছে। মেঘনাদবাবু একস্থলে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কোন্ পাশ্চাত্য পুস্তকে লিখিত আছে যে এককালে এই পৃথিবীতে অর্দ্ধ-মানব অর্দ্ধ-সিংহ জানোয়ারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল? ইহা সম্ভবত প্রাচীনদের এই সত্যের অনুভব যে, উপরের অর্দ্ধেকে মানুষ মানুষ হইলেও নীচের অর্দ্ধেকে সে নানা ভঙ্গীতে পশু মাত্র। সে যাহা হউক, জড় হইতে কেমন করিয়া প্রাণ হইল, প্রাণ হইতে কেমন করিয়া মন হইল, ইহার কোন ব্যাখ্যা বিজ্ঞান আজ পর্য্যন্ত

দিতে পারে নাই; কিন্তু হিন্দুর অধ্যাত্মদর্শনে ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে এবং আমরা যতদূর জানি শ্রীঅরবিন্দ ইহার গভীর ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাঁহার 'আর্য্য' পত্রিকায় প্রকাশিত 'লাইফ ডিভাইন' নামক অপূর্ব্ব প্রবন্ধাবলীতে।

হিন্দুরা যে বলে—আশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মানুষ হয়, এখানে জন্মান্তর লক্ষিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। বিবর্ত্তনের শক্তিরূপে আধুনিক বিজ্ঞান কেবল হেরিডিটি বা উত্তরাধিকার মানে, হিন্দু ইহাও মানে এবং পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মও মানে। পূর্ব্বজন্মের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নহে; কিন্তু উহা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ, ঐ দৃষ্টিকে উড়াইয়া দিবার কোন সামর্থ্য বা অধিকার বিজ্ঞানের নাই। অনিলবরণ-বাবুর যেটি মূলকথা—ভগবান সহসা একদিন মানব সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন, ইহা খৃষ্টান ধর্ম্মের কথা, হিন্দুধর্ম্মের নহে—ডক্টর সাহা তাহা খণ্ডন করিতে পারেন নাই।

অনিলবরণবাবুর প্রবন্ধে এমন কোন কথা তিনি বলেন নাই যে আধুনিক বিজ্ঞানের সকল আবিষ্কারই হিন্দুর বেদ উপনিষদ দর্শনে আছে। তিনি শুধু বলিয়াছেন যে, হিন্দু যেমন দর্শনের চর্চ্চা করিয়াছে তেমনি বিজ্ঞানেরও চর্চ্চা করিয়াছে এবং হিন্দুর কন্‌ট্রিবিউশন টু সায়েণ্টিফিক নলেজ্ আদৌ নগণ্য নহে। আর আধুনিকতম বিজ্ঞানের ডিটেল্‌স্ নহে, পরন্তু মূলগত সত্যগুলি সবই হিন্দুর দর্শনে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহাই বিশদভাবে দেখাইয়া দিবার জন্য অনিলবরণবাবু ডক্টর সাহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি অভদ্র বিদ্রূপ করিয়াই অনিলবরণবাবুর উক্ত আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন।

ডক্টর সাহা বলিয়াছেন, অনিলবরণবাবু তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া লোককে বিভ্রান্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন; কিন্তু অনিলবরণবাবু কোন্ বিষয়ে তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছেন তাহা তিনি দেখাইয়া দেন নাই। পরন্তু, অনিলবরণবাবু যে-সব মত মেঘনাদবাবুর উপর আরোপ করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটি তিনি তীব্রভাবে সমর্থন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। তাহা হইলে অনিলবরণবাবু লোককে বিভ্রান্ত করিয়াছেন এ-কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? তিনি যে মহেঞ্জোদরোর আবিষ্কারের অজ্ঞতা লইয়া পণ্ডিচারী-প্রবাসী ধ্যানমগ্ন অনিলবরণের উপর ব্যক্তিগতভাবে বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন, সেখানকার প্রাপ্ত স্ক্রিপ্‌ট্‌গুলির পাঠোদ্ধার করাও এখন পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। এই তুচ্ছ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও সভ্যতার উপর বেদের শত সহস্র বৎসরের প্রভাবকে উড়াইয়া দিবার মত অযৌক্তিকতা ও অবৈজ্ঞানিকতা কিছু হইতে পারে বলিয়া আমরা কল্পনা করিতে পারি না। ডক্টর মেঘনাদ সাহার মত বৈজ্ঞানিক যে এরূপ অসারতম যুক্তি প্রয়োগ করিতে ইতস্তত করেন না, ইহা না দেখিলে আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।

বেদকে আক্রমণ-প্রসঙ্গে ডক্টর সাহা বলিতে চাহিয়াছেন যে, পুরুষ-কষ্ট-কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। বৈদিক আর্য্যদের পূর্ব্বে ভারতে দ্রাবিড় সাধনা ছিল, তাহারও পূর্ব্বে ছিল দ্রাবিড়-পূর্ব্ব বহু-বিচিত্র নানা জাতীয় সাধনা। ভারতে বেদপূর্ব্ব, বৈদিক আর্য্য, অবৈদিক আর্য্য, নানা শ্রেণীর ও নানা মতের অনার্য্য প্রভৃতি চিরদিন পাশাপাশি বাস করিয়া আসিয়াছে, প্রত্যেক সাধনা আপনাকে অন্য সাধনার সংস্পর্শ হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই ভাবে আপন আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার চেষ্টার বিকৃত রূপই হইল—অন্যকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিবার মনোবৃত্তি এবং তাহা হইতেই অস্পৃশ্যতা প্রভৃতির উৎপত্তি। ভ্রান্ত মনস্বীরা উপেক্ষা করিলেও বুঝিয়া লইতে হইবে জাতিভেদের জন্মের প্রাকৃতিক ইতিহাস আছে, উহার পরিবর্ত্তন হইবে, সমাজ বিকাশের প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণে—ভাবের উচ্ছ্বাসের হুকুমে নয়। ডক্টর সাহার মতে জাতিভেদপ্রথা হস্ত ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু মস্তিষ্ক ও হস্তের সংযোগ যে ভারতের আদর্শ ছিল তাহার প্রমাণ এই যে, বেদের ঋষি অন্নের সৃষ্টির জন্য নিজের হাতে হল ধরিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, বৈশ্যত্বের নামে নয়, ব্রাহ্মণত্বের নামে ডাক দিলেই ভারতের প্রাণের সাড়া পাওয়া যাইবে।

ডক্টর সাহা বেদের বিরুদ্ধে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রমাণ উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বেদের যে নিন্দা আছে তাহা প্রকৃতপক্ষে বেদের বিকৃত ব্যাখ্যা ও অপব্যবহারেরই নিন্দা। এরূপ বেদের নিন্দা হিন্দুর পরমপূজ্য গীতার মধ্যেও আছে। বস্তুতঃ জৈনধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, ভারতের সকল ধর্ম্মেরই মূল রহিয়াছে বেদ ও উপনিষদে। পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য দেখাইয়াছেন, বেদান্তের ব্রহ্মেরই বৌদ্ধ নাম বিজ্ঞান (I. H. Q., 1934, pp 1-11)। শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষ পি-বসু ফেলোশিপ লেকচার-এ দেখাইয়াছেন, "সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তদর্শনের মধ্যেই বৌদ্ধ-দর্শনের সমস্ত মূলতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। বেদান্তের ব্রহ্মবাদ, সাংখ্যের প্রকৃতি এবং যোগদর্শনের প্রায় সমস্ত মূলতত্ত্বগুলিকেই ভিত্তি করিয়া বৌদ্ধদর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে। সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষের শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া প্রতীত্যসমুৎপাদ-রূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে।"

মানুষের সভ্যতা বিকাশের জন্য যে ভগবানকে মানা প্রয়োজন নাই, ইহার প্রমাণ স্বরূপে ডক্টর সাহা বৌদ্ধধর্ম্ম এবং আধুনিক রুশিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম ভগবান কথাটি ব্যবহার না করিলেও এক উর্দ্ধের চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে, সেই চৈতন্যের মধ্যে প্রবেশ করার নামই নির্ব্বাণ—অহং ও বাসনার নির্ব্বাণ করিয়া সেই পরম নির্ব্বাণ লাভ করা যায়। ডক্টর সাহা এরূপ কোন চৈতন্য স্বীকার করেন না। তিনি যে নৈতিকতার কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে মনবুদ্ধির দ্বারা নির্দ্ধারিত কয়েকটি নীতি বা আদর্শ পালন। শুধু ইহার উপর নির্ভর করিয়া কোন ধর্ম্মই জগতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং আজ পর্য্যন্ত কোন সভ্যতাই দাঁড়াইতে পারে নাই। নৈতিকতা যখন ধর্ম্মের সহায় হয় এবং ধর্ম্মের দ্বারা সমর্থিত হয় তখনই তাহার দ্বারা সমাজের উপকার

চৈতন্য স্বীকার করা—তাহাকে যে নামেই অভিহিত করা হউক—এবং সেই চৈতন্যের স্থূল দৃষ্টান্ত বা প্রতীক বা প্রতিভূ স্বরূপে কোন দেবতা, অবতার বা নবীর পূজা বা উপাসনা করা। বৌদ্ধধর্ম্মে বুদ্ধই ভগবানের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা যেমন বলে, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি, তেমনই তাহারা বলে, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। এই শরণাগতিই সকল ধর্ম্মের মূলকথা। ডক্টর মেঘনাদ সাহার প্রস্তাবিত নৈতিকতার মধ্যে তাহা নাই—অতএব শুধু তাহার দ্বারা মানবের কোন উচ্চ উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না। ভগবদ্‌বিশ্বাস ও সাধনা ব্যতীত মেঘনাদবাবুর প্রস্তাবিত মৈত্রী, প্রীতি ও নৈতিকতার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা মানুষের জীবনে হইতে পারে না।

আর বুদ্ধও বস্তুত ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। তিনি স্পষ্টবাক্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে এক অজাত, অভূত, অকৃত অর্থাৎ শাশ্বত নিত্য সত্তা বিদ্যমান আছে। ইহাকে যদি ভগবান বলা না যায়, তাহা হইলে হিন্দুর বরেণ্য শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বিকার নির্গুণ ব্রহ্মকেও ভগবান বলা চলে না। অতএব ডক্টর মেঘনাদ সাহা যে প্রস্তাব করিয়াছেন—ভগবানকে বাদ দিয়া আধুনিক নৈতিকতার দ্বারাই তিনি এই পতিত হিন্দুজাতির উদ্ধার সাধন করিবেন, তাহা আদৌ সম্ভব নহে।

রুশিয়া এখনও দৃষ্টান্তের যোগ্য হয় নাই। তাহারা দেশের, সমাজের প্রকৃত উন্নতি কতখানি করিয়াছে সে তর্ক নাই বা তুলিলাম; কিন্তু সেখানে রাষ্ট্রের শত চেষ্টা সত্ত্বেও ধর্ম্মভাব দূর হয় নাই—আর কম্যুনিষ্টরা মুখে নাস্তিক হইলেও কার্য্যত যে ভাবে লেনিনের পূজা করিতেছে, তাহা ধর্ম্মেরই একটা প্রকারভেদ। অতএব জীবন হইতে ভগবানকে, ধর্ম্মকে বাদ দিবার চেষ্টা বা প্রস্তাব বৃথা; ইহাতে কখনও কোন সমাজের কল্যাণ হইতে পারে না।

বিগত তিন শত বৎসরে বিজ্ঞান বিস্ময়কর সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও যান্ত্রিক-সভ্যতার সর্ব্বাঙ্গে ব্যর্থতা জ্বলন্ত অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। ইহার কারণ, এ সভ্যতা ভগবানকে বাদ দিতে চাহিয়াছে—"বিজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে ধর্ম্মের বি-সহচর" (ডক্টর ভগবানদাস)। আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত বিজ্ঞানের অগ্রগতির কোন সামঞ্জস্য নাই। এই জন্যই বিজ্ঞানের অপব্যবহার থামিবার কোন আশা নাই। বিজ্ঞান ধনুক ও ধানুকীর নিকট আত্ম-বিক্রয় করিয়া জগতের অকল্যাণেরই বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং রাষ্ট্র ও সমাজ সর্ব্বত্র ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে। এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা গত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা "পরিচয়" পত্রিকায় করা হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণকে আমরা ঐ দুই সংখ্যা "পরিচয়" হইতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত "বিজ্ঞানের ব্যর্থতা-মোক্ষণ" নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ডক্টর মেঘনাদ সাহা আষাঢ়ের ভারতবর্ষে লিখিয়াছেন, "সমালোচক কোথাও চৈতন্যে বিশ্বাসবান্ বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের নামধাম বা তৎপ্রণীত পুস্তকাদির উল্লেখ করেন নাই।" আমাদের মনে হয়, ঐ সকল বৈজ্ঞানিকের মত সুবিদিত বলিয়াই অনিলবরণবাবু তাঁহাদের বা তাঁহাদের পুস্তকের নাম উল্লেখ করেন নাই। আমরা এখানে দুই-একটি উল্লেখ করিতেছি। অধ্যাপক এ, এস, এডিংটন্ তাঁহার 'দি নেচার অফ দি ফিজিকাল ওয়ার্ল্ড' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"Life would be stunted and narrow if we could feel no significance in the world around us beyoud that which can be weighed or measured with the tools of the physicist, or described by the metrical symbols of Mathematics.…The idea of a Universal Mind or Logos would be, I think, a fairly plausible inference from the present state of scientific theory. স্যর জেম্‌স্ জীন্স তাঁহার 'দি নিউ ব্যাক্ গ্রাউণ্ড অফ্ সায়েন্স' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"At the farthest point science has so far reached, much, and possibly all, that was not mental has disappeared.…Few will be found to doubt that some re-orientation of scientific thought is called for. It is my own view that the final direction of change will probably be away from the Materialism and strict determinism which characterised 19th century physics." 'দি গ্রেট ডিজাইন' নামক গ্রন্থে জার্মানীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক Driesch লিখিয়াছেন—"The Breakdown of Materialism recognises that the mechanical laws of physics and chemistry *are inadequate to explain biological phenomena*" ঐ গ্রন্থেই অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের মত উদ্ধৃত হইয়াছে—"reason and order is everywhere in the Universe in which law is dominant,…Law which is inconceivable without intelligence, inevitable antecedent. বাহুল্য ভয়ে আর একটি মাত্র মত আমরা তুলিয়া দিলাম: To-day there is a wide measure of aggreement, which on the physical side of science approaches almost to unanimity, that the streams of knowledge is heading towards a non-mechanical reality; the universe begins to look more like a great thought than like a great machine. Mind no longer appears as an accidental intruder into the realm of matter; we are beginning to suspect that we ought rather to hail it as the creator and governor of the realm of matter."

—"The Mysterious Universe" by Sir James Jeans.

ডক্টর সাহা তাঁহার মূল বক্তৃতা এবং প্রত্যুত্তরে যে-সব কথা বলিয়াছেন তাহা হইতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, তিনি বিশ্বজগতের পশ্চাতে কোন চৈতন্য বা ভগবান আছে ইহা স্বীকার করেন না। অথচ তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "আমি কোথায় অস্বীকার করিয়াছি?" তিনি যদি তাঁহার বক্তৃতার কোথাও ভগবানের অস্তিত্ব বা ভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তির প্রয়োজনীয়তা এতটুকুও স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে কখনই অনিলবরণবাবু তাঁহার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না।

আষাঢ়ের প্রবন্ধেও ডাঃ সাহা বিশ্বজগতের পশ্চাতে চৈতন্যের পরিকল্পনাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন, "এইরূপ বিশ্বাস যদি সভ্যতার উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করে তাহা হইলে Aztec জাতির মত সভ্যজাতি

পৃথিবীতে জন্মে নাই, কারণ তাহারা সূর্য্যকে দেবতা বলিয়া মানিত এবং পর্ব্বে পর্ব্বে সূর্য্যের ক্ষুধানিবৃত্তির জন্ম সহস্র সহস্র নরবলি দিত।" এখানে ডক্টর সাহা Animism এবং Spiritualityর মধ্যে গোলমাল করিয়াছেন। আদিম বর্ব্বর জাতিরা যে ভাবে প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা বলিয়া উপাসনা করিয়াছে, দেবতা সম্বন্ধে হিন্দুর অধ্যাত্ম দৃষ্টি তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন—সে দৃষ্টির পরিচয় লইতে হইলে বর্ব্বর জাতিদের প্রথা না দেখিয়া উপনিষদ ও গীতার শিক্ষা আলোচনা করিতে হয়। ডক্টর সাহা বলিয়াছেন, আজিকার শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সূর্য্যকে দেবতা জ্ঞান করে না, বিজ্ঞানের প্রসাদে সূর্য্যের উত্তাপকে কাজে লাগায়। হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা বলে, ঐ যে উত্তাপকে তুমি কাজে লাগাইতেছ, ঐ উত্তাপ আসিতেছে ভগবান হইতে। যে বুদ্ধি লইয়া তুমি উহাকে কাজে লাগাইতেছ তাহাও আসিতেছে ভগবান হইতে এবং যে কাজে লাগাইতেছ তাহাও ভগবানেরই কাজ, ভগবানেরই ইচ্ছায় সম্পাদিত, আর তুমি সেই ভগবানের অংশ—ভগবান তোমার আর অসংখ্য জীবের ভিতর দিয়া নিজেকে অসংখ্যভাবে প্রকট করিতেছেন এবং নিজের মধ্যে প্রকট এই আশ্চর্য্যময় বিশ্বজগৎকে অনন্তভাবে উপভোগ করিতেছেন। হিন্দুর এই পরিকল্পনা কি আধুনিক বিজ্ঞানের বিরোধী কিম্বা বর্ব্বরতা, অসভ্যতার পরিচায়ক?

ডক্টর মেঘনাদ সাহা লিখিয়াছেন, "বিশ্বজগতের পশ্চাতে চৈতন্যই থাকুন বা অচৈতন্যই থাকুন, তাহাতে মানব-সমাজের কি আসে যায়—যদি সে চৈতন্য কোন ঘটনা-নিয়ন্ত্রণ না করেন, অথবা কোনও প্রকারে সে চৈতন্যকে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যের অনুকূলে চালিত করিতে না পারি?" ভগবান যদি থাকেন তবে তাঁহাকে মানুষের সেবায়, মানুষের অহংকার ও বাসনা পূরণের কার্য্যে নিজেকে নিয়োজিত করিতে হইবে—ভগবান সম্বন্ধে ডক্টর সাহার এই পরিকল্পনার সহিত হিন্দুর পরিকল্পনার কোন মিল নাই। হিন্দুর মতে মানুষের জন্য ভগবান নহেন, ভগবানের জন্যই মানুষ। যে মানুষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাহার দেহ, প্রাণ, মনবুদ্ধির—তাহার যথাসর্ব্বস্বের মূল ও উৎস ভগবানে আত্মসমর্পণ করে কেবল সেই মানুষই ভগবানের চৈতন্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, কেবল সে-ই জানিতে পারে যে, এই বিশ্ব-জগতের পশ্চাতে যে অনন্ত চৈতন্য রহিয়াছে তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি, কি ভাবে তাহা এই বিশ্ব-জগৎকে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে এবং ইহার ভিতর দিয়া কি মহান্ বিশ্ব-উদ্দেশ্যে অব্যর্থভাবে সিদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। এইরূপ লোককেই বলা যাইতে পারে God-drunk, কিন্তু ডক্টর সাহার ন্যায় বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদীর নিকট আজিও তাঁহারা উপহাসের পাত্র।

আষাঢ়ের প্রবন্ধে ডক্টর সাহা জ্যোতিষ সম্বন্ধে অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, বর্ত্তমানক্ষেত্রে এই পাণ্ডিত্যপ্রকাশের প্রাসঙ্গিকতা কি তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। অনিলবরণবাবু বলিয়াছেন, প্রাচীন হিন্দুরা Astronomy বিজ্ঞানে অনেক উন্নতি করিয়াছিল এবং শুধু সাধারণভাবে এই কথা না বলিয়া আধুনিক বিজ্ঞানের কি কি বিষয় হিন্দু-জ্যোতিষে প্রকট হইয়াছিল অনিলবরণবাবু নাম ধরিয়া সে-সবের উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন। ডক্টর মেঘনাদ সাহা অনিলবরণবাবুকে পুনঃ পুনঃ অজ্ঞ বলিয়াছেন; কিন্তু ডক্টর সাহা তাঁহার অগাধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লইয়া অতি-বিস্তৃত গবেষণা ও আলোচনা করিয়াও অনিলবরণবাবুর কোন একটি কথাকেও বিজ্ঞানের দিক দিয়া ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। হিন্দুর জ্যোতিষে ঐ সকল বিষয়ই প্রকট হইয়াছিল, ডক্টর সাহা তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই; তিনি শুধু বলিয়াছেন যে, ঐ-সব হিন্দুদের নিজস্ব নহে, গ্রীকদের নিকট হইতে ধার করা। বস্তুত হিন্দুরা গ্রীকদের নিকট হইতে লইয়াছিল না গ্রীকরা হিন্দুদের নিকট হইতে লইয়াছিল তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। ডক্টর সাহাকেও বলিতে হইয়াছে, "সম্ভবত গ্রীকদের নিকট হইতে ধার করা।" ধার করাটা অন্য দিক দিয়াই হইয়াছিল, এটাও সম্ভব। ঐ সময়ের গ্রীক দর্শন যে হিন্দু দর্শনের নিকট ঋণী তাহা একপ্রকার সর্ব্বসম্মতিক্রমেই স্বীকৃত। অধ্যাপক উইন্টারনিজ্ তাঁহার বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে গ্রন্থে বলিয়াছেন, "গার্ব্বে অনুমান করেন Herodotus, Empedocles, Anaxagoras, Democritus এবং Epicuras-এর দার্শনিক মতবাদ ভারতীয় সাংখ্যদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। পীথাগোরাস্ যে সাংখ্যদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আর Gnostic ও Neo-Platonic দর্শন যে ভারতীয় দর্শনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে, হিন্দুরা গ্রীকদের নিকট হইতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের কোন কোন তথ্য গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতেও অনিলবরণবাবুর বক্তব্যের কোন হানি হয় না। কারণ ডক্টর সাহার প্রবন্ধ হইতেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, হিন্দুরা বিজ্ঞানের চর্চ্চায় খুবই অগ্রসর হইয়াছিল। অতএব তিনি যে তাঁহার মূল বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, ভারতীয়েরা "অলস দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় সময় নষ্ট করিতেন" তাহা ঠিক নহে। ইউরোপে গ্যালিলিও যে সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবী চলমান বলিয়াছেন, একথা অনিলবরণবাবুও বলেন নাই—কিন্তু ঐ সময়ে ইউরোপ যে ঐ তথ্য ভুলিয়া গিয়াছিল, গ্যালিলিওকে সে সময়ে যে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহাই তাহার প্রমাণ নহে কি? হিন্দুদের সাহায্যেই ইউরোপে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—অনিলবরণবাবুর এই কথা ডক্টর সাহার নিজের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার দ্বারাই সমর্থিত হইয়াছে।

ডক্টর সাহা লিখিয়াছেন—"লেখক হিন্দু-জ্যোতিষ সম্বন্ধে আমাকে অনেক জ্ঞান দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।" ইহা ঠিক নহে। ডক্টর সাহা শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের সম্মুখে যে বক্তৃতা দেন সেখানে বিজ্ঞান ও অন্যান্য ক্ষেত্রে হিন্দুদের কৃতিত্বের কোন কথা উল্লেখ করেন নাই—হিন্দুরা যে চির-অকর্ম্মণ্য এইটিই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। অনিলবরণবাবু কেবল তাঁহার এই ত্রুটিটিই দেখাইয়া দিয়াছেন। নতুবা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডক্টর সাহার অসামান্য প্রতিষ্ঠা ও জ্ঞান অনিলবরণ-

বাবু তাঁহার প্রবন্ধে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিয়াছেন। ডক্টর সাহার পক্ষে নিজমুখে পুনঃ পুনঃ সে কথাটা পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া শোভন হইয়াছে কি ?

বিজ্ঞানে এবং সাধারণভাবে জীবনে ভারতবাসী যে অনেক পিছাইয়া পড়িয়াছে তাহা অনিলবরণবাবু স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহার কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমাজে প্রচলিত ভ্রান্তি ও কুসংস্কার সম্বন্ধে তিনিও ডক্টর সাহার ন্যায়ই সজাগ এবং এই সকল ত্রুটি সংশোধন করিতে ডক্টর সাহা যদি চেষ্টা করেন তবে তাঁহার সহিত অনিলবরণবাবুর কোন বিরোধই নাই। তবে এ জন্য তিনি যে হিন্দুসভ্যতার মূল ও সনাতন আদর্শকে (এবং সাধারণভাবে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতাকে) হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতেই অনিলবরণবাবুর আপত্তি।

ডক্টর মেঘনাদ সাহা মহাভারত ও পুরাণ হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে হিন্দুর পৌরাণিক বর্ণনার সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের কোন মিল নাই। কিন্তু পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র হইতেই জানিতে পারা যায় যে ঐ সকল বর্ণনা বস্তুতপক্ষে বাহ্যজগতের বর্ণনা নহে, পরন্তু অন্তর্জগতের রূপক। পুরাণে চতুর্দ্দশ ভুবনের কথা আছে—কিন্তু তাহার সাতটি হইতেছে উপরের দিকে পৃথিবী পর্য্যন্ত, আর সাতটি পৃথিবী হইতে নীচের দিকে, পৃথিবীর অন্তরালে। ডক্টর সাহা ইহাকে পৌরাণিকগণের কাল্পনিক বর্ণনা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। মাতৃকাভেদতন্ত্রে শঙ্কর বলিতেছেন, "মত্তেজসা পারদেন কিং রত্নং নহি লভ্যতে।"—অর্থাৎ পারদই হইতেছে আমার তেজ, আর এমন কোন রত্ন নাই যাহা তাহা হইতে লাভ করা যায় না। শিব-সাধনার কথা বলিতে যাইয়া মাতৃকাভেদতন্ত্রে পারদস্ফোটনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সাধনার দিক দিয়া পারদস্ফোটনের মর্ম্মার্থ হইতেছে যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে বিন্দুর স্তম্ভন ও স্থিরীকরণ অর্থাৎ উর্দ্ধরেতা হওয়া। বাহুল্যভয়ে আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। ত্রিবেণীর কথাই বলিতেছি। লোকে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গম স্থলকে পবিত্র তীর্থ বলিয়া জ্ঞান করে ; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহা হইতেছে অন্তর্জীবনের একটি যৌগিক তত্ত্ব। একটি বাউলের গানে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

> সে ত্রিবেণী, কোন্ সাধনে যাবি ?
> ত্রিবেণীর ঐ বাঁধা ঘাটে
> দুয়ার আঁটা তিনটি কাঠে
> ভাবের জগই পেটা আছে রূপ রসের কপাটে
> আবার স্থানে স্থানে তার উল্টা চাবি।

বিজ্ঞানের পরিভাষা জানা না থাকিলে বিজ্ঞান যেমন সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হয়, তেমনই ভারতের যোগসাধনা, অধ্যাত্মসাধনার সহিত যাহাদের পরিচয় নাই, তাহারা বেদ ও পুরাণের এই সব রূপক-বর্ণনা হইতে হিন্দুসভ্যতা, আদর্শ ও জ্ঞান সম্বন্ধে নানারূপ উদ্ভট ধারণা করিয়া থাকে।

* *

ইয়ুরোপের প্রধান কৃতিত্ব বিজ্ঞান ; কিন্তু প্রতীচ্যের এই বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া আমাদের বৈশিষ্ট্যকে—প্রাচ্যের আত্মবাদ ও পরাবিদ্যাকে ভুলিবার প্রয়োজন নাই। যান্ত্রিক সভ্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে, আমাদের দেশকে য়ুরোপ ও আমেরিকার ন্যায় সমৃদ্ধিশালী করিতে আমাদের কোন আপত্তিই থাকিতে পারে না। আমরা শুধু বলিতে চাই, হিন্দুসভ্যতা তাহার সমন্বয়মুখী প্রতিভার দ্বারা বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের, জড় ও ভগবানের আপাতবিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিয়া যে পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার সন্ধান জগতকে দিয়াছে তাহার সম্যক্ পরিচয় আমাদের পাইতে হইবে। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধির সমন্বয় হিন্দুসভ্যতা ও সাধনার বৈশিষ্ট্য। যুগধর্ম্মের অব্যর্থ নির্দ্দেশে প্রাচ্যের সত্যপ্রতিষ্ঠার উপরই গড়িয়া তুলিতে হইবে পাশ্চাত্যের লীলাভবন। সে সাধনারই মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন সার্থক হইয়া উঠিবে।

সমালোচনার উত্তর

অধ্যাপক শ্রীমেঘনাদ সাহা ডি. এস্‌ সি, এফ. আর. এস

এই সংখ্যার ভারতবর্ষে প্রকাশিত "ডাক্তার মেঘনাদ সাহার নবনীতি" শীর্ষক শ্রীমোহিনীমোহন দত্তের সমালোচনা সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। উক্ত সমালোচকের সমালোচনার উত্তর দেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে মনে হয় না। কারণ যে ব্যক্তি বাস্তবিকই নিদ্রিত তাহাকে জাগান সহজ ব্যাপার, কিন্তু যে লোক ঘুমাইবার ভান করিয়া বাস্তবিক পক্ষে জাগ্রত আছে তাহাকে ঠেলিয়া তোলবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সমালোচক সেই শ্রেণীর লোক। তিনি জাগিয়া থাকিয়া ঘুমাইবার ভান করিয়াছেন। তিনি আমার প্রবন্ধের যে সমস্ত তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন তাহার উত্তর আমার প্রবন্ধেই দেওয়া আছে, একটু ধৈর্য্যসহকারে পাঠ করিলেই উহা পাইবেন।

কোন "মন্ত্র" উচ্চারণ করিয়া দেবতাকে ডাকিলে সিদ্ধিলাভ হয়—আমার এ বিশ্বাস কদাপি ছিল না, এখনও নাই ; আমার মতে উহা একটি মধ্যযুগীয় কুসংস্কার মাত্র। এখন জিজ্ঞাস্য, যদি "বেদমন্ত্র" উচ্চারণ করিলে বহু দেবদেবী বা যাগযজ্ঞ করিলে দেবতা ও ভগবান্ প্রসন্ন হন, তবে গত দুই শত বৎসরধরিয়া হিন্দুজাতি বেদ-পুরাণ-হিন্দুর দেবতা প্রভৃতিতে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী, সর্ব্ববিধ ভক্ষ্য-অভক্ষ্য আহারকারী মুষ্টিমেয় বৈদেশিকের দ্বারা নিগৃহীত, পদদলিত ও অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়া আসিতেছে কেন ? ইহার সদুত্তর সমালোচক দিতে পারেন কি ?

দুঃখের বিষয়, Willam Archer প্রণীত 'India and the Future' এবং শ্রীঅরবিন্দ প্রণীত 'Defence of Indian Culture', এই দুইখানি গ্রন্থের কোনখানাই আমি এ পর্য্যন্ত পড়ি নাই, তবে ঐ দুইখানি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ কিছু কিছু অন্য প্রসঙ্গে পড়িয়াছি। শ্রীঅরবিন্দ

তাঁহার উক্ত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা যে "সমসাময়িক" অন্যান্য সভ্যতা হইতে ন্যূন ছিল না—তাহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু এই তর্ক এখানে উঠে কেন? ভারতের প্রাচীন সভ্যতা তাৎকালীন পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় যতই শ্রেষ্ঠ হউক না কেন, তাহা যে মধ্যযুগ ও বর্ত্তমান যুগের উপযোগী নয়, তাহা যাঁহাদের বিগত ৮০০ বৎসরের ভারতেতিহাসে সামান্য জ্ঞান আছে তাঁহাদিগকে বিশদ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। সমালোচকের ঐ ধরণের যুক্তি দেখিয়া এক শ্রেণীর কুযুক্তির কথা মনে পড়িয়া গেল।

আমাদের দেশের জনসাধারণ অত্যন্ত দরিদ্র এবং বর্ত্তমান ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই দারিদ্র্য দূর করিতে পারেন নাই বলিয়া এদেশে ও বিদেশে তাহাদিগকে অনেক অনুযোগ শুনিতে হয়। তজ্জন্য কয়েকজন উর্ব্বর-মস্তিষ্ক "সিভিলিয়ন্" ভাবিয়া চিন্তিয়া একটি অদ্ভুত যুক্তি বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে হিন্দু ও মোগল-রাজত্বকালে ভারতবাসীর গড়পড়তা আয় বর্ত্তমান ভারতবাসীর আয় অপেক্ষা বেশী ছিল না; সুতরাং এই সমস্ত সিভিলিয়ানের মতে বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনকারিগণ যে বলেন 'বৃটন ভারতকে শোষণ করিতেছে' তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। একটু তলাইয়া দেখিলে বোঝা শক্ত নয় ইহা অতি কুযুক্তি। কারণ, বর্ত্তমানে প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য—দেশকে পৃথিবীর অপরাপর সভ্য দেশের তুল্য সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলা; তাহা না হইলে আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশের শিল্প-বাণিজ্য লোপ পাইবে, জন-বিপ্লব আসিবে এবং দেশ বিদেশীর পদানত হইবে। যদি বিলাতের কোন গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের দেশের অধিবাসিগণের আয় মধ্যযুগের আয়ের সমতুল্য রাখিতে প্রয়াস পাইতেন তাহা হইলে তাঁহারা একদিনও টিকিতে পারিতেন না। সুতরাং মধ্যযুগের অবস্থার সহিত বর্ত্তমান যুগের অবস্থার পরস্পর তুলনা করা কুতর্ক বই কিছুই নয়, কিন্তু ভারতবর্ষে গায়ের জোরে সবই চলে, তজ্জন্য এই সিভিলিয়ানী যুক্তিও চলিয়া যাইতেছে।

সমালোচক অনিলবরণ রায়ের ও মোহিনীমোহন দত্তের সমালোচনাও এই সিভিলিয়ানী কুযুক্তির পর্য্যায়ভুক্ত। যেহেতু প্রাচীন ভারতীয় (অর্থাৎ, ২২০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্ত্তী) সভ্যতা সমসাময়িক অন্য দেশীয় সভ্যতার সমতুল্য বা শ্রেষ্ঠ ছিল, সুতরাং বর্ত্তমান ভারতীয় সভ্যতা সমসাময়িক পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতার সমতুল্য বা শ্রেষ্ঠ। ইহা অতি কুযুক্তি। শ্রীঅরবিন্দ কি বলিয়াছেন যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা বর্ত্তমান সময়ের ? যদি বলিয়া থাকেন তবে কোথায়—তাহা জানাইলে সুখী হইব।

লেখক 'অধ্যাত্ম দৃষ্টি' কথাটি পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত অধ্যাত্মবাদী আমাদের দেশে আছে কিনা সন্দেহ; এই কথাটি, এদেশে অধিকাংশ স্থলে, কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও ভণ্ডামির ছদ্মবেশ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। সেদিন খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম যে এদেশীয় পঞ্জিকাকারগণ একসভায় মিলিত হইয়া প্রস্তাব 'পাশ' করিয়াছেন যে হিন্দুর জ্যোতিষিক গণনা "অধ্যাত্ম-জ্ঞানের" উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তাঁহারা পাশ্চাত্য জ্যোতিষ গ্রহণ করিতে পারেন না এবং তজ্জন্য পুরাতন ঋষিপ্রোক্ত নিয়মানুসারেই পঞ্জিকা রচনা করিতে থাকিবেন। দুঃখের বা সুখের বিষয় এই যে, জ্যোতিষ-শাস্ত্রে গোঁজামিল দিবার সুবিধা নাই, কারণ উহাতে "সূর্য্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ" ইত্যাদির কালগণনা করিয়া এক বৎসর পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু ঋষিগণ লিখিত প্রণালীতে 'গ্রহণ' গণনা করিলে সময়ের অনেকটা বৈষম্য হয়। তজ্জন্য এতদ্দেশীয় পঞ্জিকাকারগণ বেমালুম তুলিয়া দিয়া পাশ্চাত্য "নাবিক পঞ্জিকা" (Nautical Almanac) হইতে 'গ্রহণ কাল' "ঋষি প্রোক্ত" বলিয়া চালাইয়া দেন। পঞ্জিকাকারগণ বলেন—৩১শে চৈত্র মহাবিষুব সংক্রান্তি হয়, কিন্তু বাস্তবিক এই ঘটনা ঘটে ৭ই চৈত্র। সমস্ত হিন্দু পঞ্জিকা এইরূপ অসংখ্য ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ এবং ইহা গাণিতিক ও প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত ব্যাপার বলিয়া এই সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি প্রদর্শন করা সুকঠিন নয়। তাহা সত্ত্বেও এই সব "কুসংস্কার-ব্যবসায়িগণ", অধ্যাত্মবিদ্যার দোহাই দিয়া অন্ধবিশ্বাসী হিন্দু জনসমাজে ব্যবসায়টি বেশ চালাইতেছেন।

পক্ষান্তরে "জন্মান্তরবাদ", "অবতারবাদ" ইত্যাদি গণিতের বা প্রত্যক্ষ দর্শনের ব্যাপার নয়, "বাদ" মাত্র; মানুষের বিশ্বাসের উপরই মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত। প্রায়ই দেখা যায় যে পৌত্র অধিকাংশ স্থলে পিতামহের প্রকৃতি পায়, সুতরাং এরূপ ধারণা হওয়া অসম্ভব নয় যে লোকে বিশ্বাস করিবে যে পিতামহ পুনরায় পৌত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এক বংশে একই প্রকৃতিসম্পন্ন লোকের বারংবার জন্ম হয়, সম্ভবতঃ পর্য্যবেক্ষণজনিত জ্ঞান হইতেই জন্মান্তরবাদের উৎপত্তি হইয়াছিল। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রেও বহু স্থলে ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহার জন্য এরূপ কষ্ট কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই যে, একই লোকের আত্মা নানা যোনিতে ঘুরিতেছে। Mendelism তত্ত্ব দিয়া এইরূপ পর্য্যবেক্ষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হয়।

অবতারবাদের মাহাত্ম্য বা কার্য্যকারিতা আমি কখনও বুঝিতে পারি নাই। অবতারবাদে অনেক রকম অসামঞ্জস্য আছে। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

অবতারবাদ মতে * কুঠারধারী রাম (পরশুরাম) ও দাশরথি রাম যথাক্রমে বিষ্ণুর ষষ্ঠ ও সপ্তম অবতার। ভীষণ সংহারমূর্ত্তি, অতি ক্রোধপরায়ণ, ভ্রূণঘাতী জামদগ্ন্য রাম, তিনি হইলেন হিন্দুর অবতার

* বৈদিকযুগে অবতারের কোন বালাই ছিল না, শ্রুতি-স্মৃতিতে উহার নাম নাই, মনে হয় পৌরাণিক যুগে এই বাদের প্রথম সৃষ্টি। দশাবতারের কথা হিন্দুসমাজে প্রচলিত। জয়দেব গোস্বামী এবং শঙ্করাচার্য্য এ সম্বন্ধে যে স্তোত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। পৌরাণিক যুগে ইহার উৎপত্তি হইলেও বিষ্ণুরই মাত্র অবতার আছে, ব্রহ্মা ও শিবের কোন অবতার নাই।—লেখক

(নৃশংসতার অবতার ?) ! কিন্তু, রামায়ণে বর্ণিত আছে যে এই দুই অবতার পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একই দেবতার দুই অবতার কি করিয়া যুগপৎ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন তাহা সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির অগম্য। বলরাম অষ্টম অবতার। ইঁহার শক্তিমত্তার পরিচয় এই যে, তিনি হলের মুখে যমুনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং অষ্ট-প্রহর মদ খাইয়া এবং বাল্যে একটা মামুলী অসুর মারিয়া অবতার শ্রেণীতে আসন পাইয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার অপর কোন কৃতিত্ব শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করে নাই।

"জন্মান্তরবাদ" অনুসারে পাপীলোকে নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু (কলিকালে !) পৃথিবীর শত-করা ৯৯ জন লোকই পাপী ; সুতরাং, এই জন্মান্তরবাদ সত্য হইলে পৃথিবী এতদিন নিকৃষ্ট প্রাণী পর্য্যায়ভুক্ত কীট-পক্ষী-পশু-পতঙ্গে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত ও মানুষের সংখ্যা হ্রাস পাইত। কিন্তু ইতিহাস আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীর লোক-সংখ্যা গত ১০০ বৎসরে চারিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অনেক জাতীয় পশু-পক্ষী প্রায় বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। অতএব, প্রমাণিত হয় যে সমালোচকের অধ্যাত্মদৃষ্টি তাঁহার মানসিক জড়তার পরিচায়ক মাত্র।

লেখক 'মহেঞ্জোদারো'র আবিষ্কারের কথা তুলিয়া নিজের অজ্ঞতার আর একটি প্রমাণ দিয়াছেন। মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারের মূলতথ্য বুঝিবার যদি তাঁহার সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে এইরূপ ভাবে লেখনী-কণ্ডূয়নের বৃথা প্রয়াস করিতে হইত না। মহেঞ্জোদারোর লিপি পড়া যায় নাই সত্য, কিন্তু ধ্বংসাবশেষ হইতে তত্রত্য নাগরিক জীবনের উন্নত অবস্থা সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা করিয়া লওয়া কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। "শিবঠাকুরের নাম" না পড়িতে পারিলেও তিনি মূর্ত্ত হইয়া "যোগাসনে" আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। মহেঞ্জোদারোর মূর্ত্তি কয়টিতে যোগশাস্ত্র বর্ণিত নাসাগ্র বদ্ধদৃষ্টি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ তাহা দেখাইয়াছেন। বৃক্ষ-দেবতার পূজাপ্রথা তখন প্রচলিত ছিল ইহা কয়েকটি 'মুদ্রা' ("শীল") হইতে প্রমাণিত হয়। ইরাক্‌দেশে "কিস্" নামক প্রাচীন নগরের খননে কতিপয় স্তরে মহেঞ্জোদারোর "শীল" পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা হইতে পণ্ডিতগণ স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন যে মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা খৃষ্টের ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বের। তখন মধ্য ও পূর্ব্ব পঞ্জাব পর্য্যন্ত এই সভ্যতা বিস্তৃত ছিল এবং "বৈদিক ইন্দ্র-অগ্নি-সূর্য্য-উপাসক" মানব উত্তর-পশ্চিম পঞ্জাব ও আফ্‌গানিস্থানে সভ্যতার নিম্ন-পর্য্যায়ে থাকিয়া জীবন-যাপন করিত। কারণ, ১৪৫০ পূঃ খৃষ্টাব্দে ইরাক্ দেশের উত্তরে মিটানী-প্রদেশস্থ "বৈদিক-দেবতা-পূজক" রাজগণ ব্যাবিলোনিয়া ও মিশরীয় সভ্যতাকে যেরূপ সসম্ভ্রমে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে মনে হয় না যে তাঁহারা নিজস্ব "বৈদিক সভ্যতা"কে ব্যাবিলোনিয় ও মিশরীয় সভ্যতার সমতুল্য বিবেচনা করিতেন।*

* এ সম্বন্ধে সমালোচক "Science and Culture"—পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিতে পারেন—

"Indus Valey five thousand years ago," "Buried Empires" by Prof: H. B. Roy Chowdhary. (Vol 5. No 1, 2 & 4, 1939)

"পুরুষ সূক্তের তাৎপর্য্য ও প্রকৃত অর্থ।"

এ বিষয়ে আমার মত ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, এজন্য তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। উক্ত মতের কোন পরিবর্ত্তনের কারণ দেখি না। তবে আমার মতের সামর্থনের জন্য প্রসিদ্ধ মনীষী ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মন্তব্য † উদ্ধৃত করিতেছি।—

"ঋগ্‌বেদ রচনাকালের অনেক পর এই অংশ রচিত হইয়া ঋগ্বেদের ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদের অন্য কোথাও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতির উল্লেখ নাই এবং এই শব্দগুলি কোনও স্থানে শ্রেণী বিশেষ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। ব্যাকরণবিদ্ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে এই ঋকের ভাষাও বৈদিক ভাষা নহে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত। জাতিবিভাগ প্রথা ঋগ্বেদের সময় প্রচলিত ছিল না ; ঋগ্বেদে এই কুপ্রথার একটি প্রমাণ সৃষ্টি করিবার জন্য এই অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।"—

অর্থাৎ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের মত বিখ্যাত মনীষীর মতে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্তের দ্বাদশ শ্লোক—যাহাকে বর্ণাশ্রমীগণ জাতি-বিভাগের মূল স্তম্ভস্বরূপ মনে করেন—তাহা কোন প্রাচীন ঋষি-প্রোক্ত নয়। পরবর্ত্তীকালের কোনও অর্ব্বাচীন বর্ণাশ্রমীর রচিত একটি "জাল দলীল" মাত্র। সুতরাং, এই জাল দলীল ভিত্তি করিয়া জাতিভেদ সমর্থক এবং তথাকথিত বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি শীর্ষক যত কিছু আখ্যান পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, সন্দেহ নাই।

"চৈতন্যে বিশ্বাসবান্ বৈজ্ঞানিক"—

সমালোচক মোহিনীমোহন দত্ত চৈতন্যে বিশ্বাসবান বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে Sir Arthur Eddington ও Sir James Jeansএর নাম এবং মতামত উল্লেখ করিয়াছেন। সুখের বিষয়, উভয় বৈজ্ঞানিকই বর্ত্তমান লেখকের সহিত নিবিড় ভাবে পরিচিত এবং লেখকের ও উক্ত বৈজ্ঞানিকদ্বয়ের কর্ম্মক্ষেত্র কতকটা এক হওয়ায় লেখক তাঁহাদের রচনার সহিত যতটা পরিচিত ভারতের অতি অল্প-লোকই ততটা পরিচয়ের দাবী করিতে পারেন।

অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে Sir Arthur Eddington কোয়েকার (Quaker) সম্প্রদায়-ভুক্ত এবং খৃষ্টের বাণীতে প্রকৃত বিশ্বাসী। বিগত যুদ্ধে তিনি 'conscientious objector' ছিলেন বলিয়া প্রায় জেলে যাইতে বসিয়াছিলেন, কোনও উচ্চপদস্থ বন্ধুর চেষ্টায় নিষ্কৃতি পান। তাঁহার 'Idea of Universal Mind or Logos' তাঁহার কোয়েকার-হৃদয়ের "বিশ্বাসের" কথা, বৈজ্ঞানিকের "যুক্তি" উহাতে অল্পই আছে।

লেখক Sir James Jeansএর মন্তব্যে কি বুঝাইতে চান তাহা বোধগম্য হইল না। জিনা প্রাকৃতবিজ্ঞানের সুবিখ্যাত জর্ম্মান্ অধ্যাপক

† রমেশচন্দ্র দত্ত অনুদিত 'ঋগ্‌বেদ সংহিতা' পৃঃ ১৫৭২।

Heisenbergএর Theory of Indeterminismএর কথা তুলিয়াছেন, ইহাতে ভগবান্ বা চৈতন্যের কোন কথা নাই। Derisp এর বাক্যতেও ঐ তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। লেখকের প্রাকৃত-বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় না থাকায় তিনি এই উদ্ধৃত অংশ কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই।*

Eddington ও Jeans প্রমুখাৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ "বিশ্বজগতের পশ্চাতে চৈতন্যে বিশ্বাসবান্" হইলেও সেই চৈতন্যকে আমাদের দেশের অপদার্শনিকদের দৃষ্টিতে দেখেন না। এতদ্দেশের দার্শনিক ও ধর্ম্মবাদিগণ ঐ চৈতন্য বা শক্তিকে প্রসন্ন করিবার জন্য, অথবা কোন কাল্পনিক 'বিভূতি' বা 'সিদ্ধি' লাভের প্রত্যাশায় যোগাসনে ধ্যানে বসিয়া যান, অন্ততঃ লোকের কাছে এইরূপ ভাণ করেন যে তাঁহারা উক্ত "চৈতন্যের" সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন অথবা কোন লোকাতীত শক্তির অধিকারী হইয়াছেন এবং পরে একটা ধর্মের বা দার্শনিকতার ব্যবসায় ফাঁদিয়া সাধারণ লোককে প্রতারিত করিতে আরম্ভ করেন। দৃষ্টান্ত দেওয়ার প্রয়োজন নাই, কারণ দৈনিক খবরের কাগজ খুলিলে প্রত্যহই অনেক ধর্মের ব্যবসায়ীর নাম দৃষ্টিগোচর হইবে। কিন্তু Jeans বা Eddington প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এইরূপ "ভণ্ডামি"র ধার দিয়াও যান না। তাঁহারা প্রাকৃতবিজ্ঞানের নিয়মাবলী (laws of physics) এবং গণিতশাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াইবার চেষ্টা করেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বিতণ্ডা করিতে হয়, অপরাপর পণ্ডিতবর্গের আপত্তি ও তর্কের সমুচিত উত্তর দিতে হয় এবং সর্ব্বোপরি প্রত্যক্ষের সহিত লব্ধ ফলকে মিলাইয়া দেখিতে হয়। যখন প্রত্যক্ষের সহিত না মিলে তখন উপপত্তি-গুলিকে বর্জ্জন করিতে হয়; সুতরাং বিশ্বজগতের পশ্চাতে "চৈতন্য" আছে এইরূপ 'বিশ্বাস' বা 'অবিশ্বাস' তাঁহাদের কার্য্যক্রমের অণুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটায় না। আমাদের দেশের অধ্যাত্মবাদ-ব্যবসায়িগণ কি উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে 'মহাত্মা' শ্রেণীভুক্ত করিতেন তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ধরা কিছু শক্ত নয়।

সমালোচক দুই-একজন পরলোকে বিশ্বাসবান্ বৈজ্ঞানিকের নাম করিয়াছেন, যেমন Sir William Crookes ও Sir Oliver Lodge. ক্রুক্স্ এককালে Psychical Societyর সদস্য ও সভাপতি ছিলেন। তিনি psychical experience সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণা করিতেন এবং বলা বাহুল্য, এই সব গবেষণামূলক বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ লিখিয়া রাখিতেন। তিনি একজন কৃতী বৈজ্ঞানিক এবং বিশ্ববিখ্যাত Royal Societyর সভাপতি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে, অধ্যাত্মবাদিগণ দাবী করিবেন যে তাঁহারা খুব একটি "বড় কাৎলা"কে বঁড়শীতে গাঁথিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু Crookesকে যে সমস্ত অধ্যাত্মবাদী নিজেদের দলভুক্ত বলিয়া প্রচার করেন্ তাঁহারা খুব সততার পরিচয় দেন্ না, কারণ তাঁহারা Crookesএর অধ্যাত্মবিদ্যা চর্চার ইতিহাস পরবর্ত্তীকালে জানাইতে ভুলিয়া যান। Crookes একদিন অধ্যাত্মবিদ্যা বিষয়ক তাঁহার যাবতীয় গবেষণা ও অভিজ্ঞতার কাগজপত্র অগ্নিসাৎ করেন এবং যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিন এই সম্বন্ধে কোন কথাই মুখে আনিতেন না। লোকে কল্পনা-জল্পনা করে—

"He was the victim of some confidence trick."

বিলাতের ওয়াকীব মহলে জনশ্রুতি এই যে, Sir Oliver Lodge "ভুতুড়ে" (spiritualist) হওয়ার পর তিনি খাঁটি বৈজ্ঞানিক মহলে

---

* অধ্যাপক Heisenbergএর Theory of Indetermimism প্রকাশের পর Planck, Jeans, Eddington, প্রভৃতি কিছুদিন ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন যে প্রাকৃত-বিজ্ঞানের গণ্ডীটি প্রসারিত করিয়া মনরাজ্যের ভিতর আনা যায় কিনা; অর্থাৎ যে সমুদয় ঘটনা (events) ঘটিবে তজ্জন্য আমাদের ইচ্ছা-শক্তির নিরপেক্ষ-দায়িত্ব কতটুকু; অথবা, ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা কিছুই নাই, ইচ্ছা মগজের ক্রিয়া এবং মগজ 'প্রকৃতি'র অন্তর্ভূত হওয়ায় কার্য্যকারণ-তত্ত্বটি (causal concept) বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 'ইচ্ছা'র ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে কি না। এই অনুসন্ধানটি অনেকটা ন্যায়ের বিচারের ন্যায় চলিয়াছিল, কিন্তু বাস্তব ফল প্রসব করে নাই। Planck "determination"এর সপক্ষে যুক্তি দিলেন (Thesis), এবং Jeans ও Eddington "freedom of the will"এর সপক্ষে যুক্তি দিলেন (Anti-Thesis), কিন্তু তাহা হইতে সারবান্ কোন সিদ্ধান্তে (Synthesis) উপনীত হওয়া গেল না। উহা নিছক্ কথার কথা, সাহিত্যামোদিগণের রস রচনায় উপভোগ্য হইতে পারে, অথবা popular বক্তৃতা দিবার কালে শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। এ বিষয়টির বুনিয়াদ কিরূপ তাহা নিম্নলিখিত দ্বন্দ্বালাপ হইতে প্রতীত হইবে।

"Murphy.—'It is now the fashion in physical science to attribute something like free-will even to the routine practices of inorganic nature.

"Einstein.—'That non-sense is not merely non-sense, it is objectionable non-sense.

"Murphy.—'But then you know that certain English physicists of very high standing indeed and at the time very popular have promulgated what you you and Planck call, and many others with you, unwarranted conclusion.

"Einstein.—'You must distinguish between the physicist and the literateur when both professions are combined into one···what I mean is that there are scientific writers in England who are illogical and romantic in their popular books, but in their scientific work they are acute logical reasoners'—Where Science is going,"—Planck.

অতএব, দেখা যাইবে যে ইহাতে 'চৈতন্য', 'আধ্যাত্মিকতা' বা 'ধ্যানরসিকতা'র কোন প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই; কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের (principle) প্রসারের সম্ভাব্যতা কতটুকু তদ্বিষয়ে ইহা বিজ্ঞানানুগ একটি পন্থার অনুসন্ধান মাত্র।—লেখক

অনেকটা প্রতিপাত্ত হারাইয়াছেন। তিনি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে কিছু গবেষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে কিছু দান করেন্ নাই, "ভুতুড়ে বিজ্ঞানে" কি দান করিয়াছেন, তাহা আমার জানা নাই।

শেষ কথা

ভারতবর্ষে আমার প্রবন্ধ দুইটি প্রকাশিত হইবার পর মৌমাছির চাকে ঢিল মারিলে যেরূপ হয় সেইরূপ অনেক প্রকার "সমালোচনা, কদালোচনা, গালাগালি নানাস্থানে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সবের উত্তর দেওয়া আমি সমীচীন মনে করি না—এবং আমার প্রবৃত্তিও নাই, অবকাশও নাই। নিছক যুক্তিহীন গালাগালির কোন সদুত্তর আছে কি না জানি না, গালাগালি করিতে পারিলে বোধ হয় ঠিক জবাব হয়। কিন্তু তাহাতে অভীষ্ট-সিদ্ধি হয় না, তজ্জন্য ঐ সমবেত গালাগালির পাল্টা জবাব দিতে আমি অসমর্থ। মাত্র একজন লেখক আমার বেদ-সম্বন্ধে মন্তব্যের জন্য আমাকে ও (আমার প্রবন্ধ প্রকাশ করার জন্য) ভারতবর্ষ-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে "নরকে" পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক হয়ত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়া নরকের "টিকিট্" নষ্ট করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু আমার নরকের টিকিট্ গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। উপসংহারে, এই সম্বন্ধে একটি গল্প আপনাদের শুনাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। গল্পটি এই—

"দুই বন্ধু—প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থী। প্রাচীনপন্থী, বেদ, উপনিষদ, পুরাণের কথা জনিত, পঞ্জিকায় যত রকম উপবাসের বিধি-ব্যবস্থা আছে তৎসমুদয় পালন করিত, প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিত এবং হাঁচি টিক্‌টিকি পাঁজি মানিয়া চলিত, কোনওরূপ অভক্ষ্য ভক্ষণ করিত না, স্বপাক ভিন্ন আহার করিত না। নবীনপন্থী ছিল বস্তুতান্ত্রিক, কোন-কিছু শাস্ত্র-বিধি মানিত না, অভক্ষ্য ভক্ষণ করিত। যথাসময়ে মৃত্যুর পরে প্রাচীন-পন্থী গেল 'হিন্দু'র স্বর্গে, নবীনপন্থী গেল 'বৈজ্ঞানিকের' নরকে। কিছুদিন যায়। নবীনপন্থীর অনুরোধে প্রাচীনপন্থী একদিন রিটার্ণ-টিকিট কাটিয়া নরকদর্শনে বাহির হইল। কিন্তু সেই যে গেল আর স্বর্গে ফিরিয়া আসিল না। ব্যাপার কি? না-ফেরা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইয়া প্রাচীনপন্থীর স্বর্গবাসী জনৈক বন্ধু তাহাকে চিঠি লিখিয়াছিল; প্রত্যুত্তরে বন্ধুকে প্রাচীনপন্থী যে চিঠি দিয়াছিল তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। প্রাচীনপন্থী লিখিয়াছে—

'...বৈজ্ঞানিকের নরকের সীমানায় উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ ভীষণ উত্তাপ ও তৃষ্ণা অনুভব করিলাম, ভাবিলাম যাত্রা করিয়া কি ঝকমারিই করিয়াছি, এখন উপায়? কিন্তু সীমানার ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র স্বর্গের গাড়ী বদলাইয়া নূতন গাড়ীতে উঠিতে হইল; ঐখানে একটা বড় জংসন দেখিতে পাইলাম। জংসনের বর্ণনা করিবার আমার শক্তি নাই, নূতন গাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলাম আশ্চর্য্য!...আর উত্তাপ নাই, খাসা ঠাণ্ডা এবং মৃদুমন্দ হাওয়া বহিতেছে। ব্যাপার কি? শুনিলাম, এখানকার সমস্ত গাড়ীই air-conditioned। গন্তব্য ষ্টেসনে গাড়ি থামিলে নামিয়া বন্ধুর আবাসে উপস্থিত হইলাম। তথাকার বিধি-ব্যবস্থা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। স্বর্গে যেমন আমাদের পরিশ্রম করিতে হইত না, কেবল ইন্দ্রের সভায় হাজির থাকিয়া অপ্সরার মামুলী নাচ দেখিতে হইত এবং নারদ-ঋষির ভাঙ্গাগলায় পৃথিবীর 'গেজেট্' শুনিতে হইত, পানীয়ের মধ্যে এক-ঘেয়ে ভাঙ্গ ও ধেনো মদ—অর্থাৎ পৃথিবীতে আমি যে-সব যত্নের সহিত বর্জ্জন করিয়াছিলাম স্বর্গে তাহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ আমাকে ঐ সমস্ত জিনিস ভোগ করিতে দেওয়া হইত—তেমনি বৈজ্ঞানিকের নরকে উহার সবই উল্টা, অথচ কি চমৎকার ব্যবস্থা! যদিও নরক দেশটি অত্যন্ত গরম, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা সেখানে যন্ত্রবলে উত্তাপকে কার্য্যে পরিণত করিয়া সমস্ত ঘরবাড়ী air-conditioned করিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং উত্তাপ মোটেই অনুভূত হয় না। তৃষ্ণা পাইলে Ice-cream সরবৎ, খাবার টেবিলে সর্ব্বদেশজাত টাট্‌কা ফলমূলের প্রাচুর্য্য এবং নূতন প্রণালীতে উদ্ভাবিত অপরাপর আহার্য্যের বাহার, পারিপাট্য ও সুগন্ধ স্বতঃই ক্ষুধার উদ্রেক করে। স্বর্গে বেড়ান ঝক্‌মারি, ঘোড়াগুলা বুড়া হইয়া গিয়াছে প্রায়ই গাড়ী উল্টায়, কিন্তু নরকে air-conditioned হাওয়া-গাড়ী, দিব্যি 'খেয়ে-দেয়ে-ঘুরে-ফিরে' আরামে আছি। রেডিওর সুইচ্ টিপিলে বহির্জগতের সব খবর শুনিতে পাই, বিখ্যাত গায়ক-গায়িকার কলা-কুশলী সঙ্গীত, অভিনেতা-অভিনেত্রীর বক্তৃতা, আর্ট, নৃত্য-কলা প্রভৃতি দেখিয়া শুনিয়া মন আপনা হইতেই মুগ্ধ ও বিভোর হইতে থাকে। বহির্জগতের কোন ব্যাপার অনুসন্ধান করিতে যখন ইচ্ছা হয় museumএ যাই এবং planetariumএ প্রদত্ত বক্তৃতা শুনি। স্বর্গের এক ঘেয়ে জীবন যাত্রায় কি সুখ আছে জানিনা, কিন্তু আমার কাছে বৈজ্ঞানিকের নরকের জীবনযাত্রা বড়ই আরামপ্রদ ও লোভ-জনক মনে হইয়াছে। সুতরাং আমি আমার 'স্বর্গবাস' Cancel করিয়া ভবিষ্যতে 'নরকবাসে'র বন্দোবস্ত কায়েমী করিয়া লইয়াছি।"—

বর্ত্তমান লেখককে যাঁহারা, প্রাচীন পন্থীর মত নরকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাঁহাদের প্রস্তাব আমি সানন্দে গ্রহণ করিলাম।—

সমাপ্ত

চোখের পরদা

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

এক

পাল্লা দিয়া দৌড়িয়া যখন ভাইবোনে দেবকীবাবুর বাহির-বাড়ীর বারান্দায় পৌঁছিল, তখন তাহাদের ফটোচিত্র তুলিয়া রাখিবার যোগ্য! শ্বাস রুদ্ধপ্রায়, কপোলে স্বেদাশ্রু, মুখমণ্ডল রক্তকমলদলতুল্য।

টেনিস ব্যাটখানা মাথার উপর ঘুরাইয়া অজয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, হু-রো দি-দি!

অশোকা তখন একখানা বেতের চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া অজগরের মত ঘন ঘন শ্বাসত্যাগ করিতেছিল। তাহার হাতের ব্যাটখানা শিথিলমুষ্টি হইতে মেঝের উপর খসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার জবাব দিবার সামর্থ্যই ছিল না।

বোধ হয় তাহাদের সাড়া পাইয়া একরাশি হাসির ফুলঝুরি ছড়াইয়া বৈদ্যনাথবাবুর ছেলেমেয়েরা বাহিরে ছুটিয়া আসিল।

অমলা বলিল, বল্লুন ত অশুদি এল বলে—কোন্ সকালে উঠেছে—

অমলার ছোট ভাই শ্যামল হো হো হাসিয়া বলিল, বারে! এর নাম বুঝি সকাল সকাল ওঠা? বলে—রোদে চারদিক ফুট ফুট করছে!—বেলা যে সাড়ে আটটা পেরুল—

—ওমা, সাড়ে আটটা? চল ভাই অশুদি, খেলিগে আমরা—

অজয় নড়িল না—তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইল, সে এই প্রস্তাবে আদৌ সন্তুষ্ট হয় নাই। বিরক্তির স্বরে বলিল, বারে! শিশিরদা না এলে বুঝি খেলা হয়?

অমলার ভাইবোনেরা কিন্তু হাসিয়া উঠিল। অমলা বলিল, তবেই হয়েছে! দাদা উঠবে এখুনি? বলে, থিয়েটারের রিহার্সাল হচ্ছে ওদের রোজ রাত্তিরে।

চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে শিশির তৎপূর্ব্বেই বাহিরে আসিয়াছিল—সে তাহাদের শেষ কথাগুলা শুনিয়াছিল। সকলের দিকে চাহিয়া পরে বাহিরে সূর্য্যকরোজ্জ্বল মাঠমাঠের দিকে লক্ষ্য করিয়া সবিস্ময়ে বলিল, তাই ত, এত বেলা হয়ে গেছে।

অমলা শ্লেষের সুরে বলিল, না, তা হবে কেন? রিহার্সাল দাও না রাত দুটা অবধি—তোমার জন্যে বেলা বসে থাকবে!

অশোকা এতক্ষণ শিশিরের অপূর্ব্ব সাজসজ্জার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি ছিল—তাহার পরিধানে একখানা রঙীন লুঙ্গি আর একটা গেঞ্জি—তাহার বলিষ্ঠ দেহের মাংসপেশীগুলি সেই গেঞ্জির আবরণ ভেদ করিয়া যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। অশোকা মৃদু হাসিয়া বলিল, আপনি হলেন বাঁকীপুরের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার—শ্রেষ্ঠ বক্সার—শ্রেষ্ঠ পালোয়ান—আপনার জন্যে এখনই বেলা আটটা হতে পারে!

খুব একটা হাসির রোল উঠিল। অপ্রতিভ হইয়া শিশির বলিল, না, না—কি জানেন, দেখুন, এই গিয়ে—

অমলা বাধা দিয়া বলিল, থাক্, আর তোমার এই গিয়ে করতে হবে না। খেলতে চাও, এসো এখনি আমাদের সঙ্গে। এসো ভাই অশুদি!

অমলা অশোকাকে একরূপ টানিয়া লইয়া মুক্ত প্রাঙ্গণে নামিয়া পড়িল—বালক বালিকারা হাস্যকোলাহলে স্থানটাকে সজীব করিয়া তাহাদের অনুসরণ করিল। কেবল অজয় নড়িল না, পূর্ব্ববৎ গোঁভরে দাঁড়াইয়া রহিল।

হাত মুখ ধুইতে ধুইতে শিশির বলিল, তুই গেলি না অজয়?

খানসামা তোয়ালেখানা লইয়া চলিয়া গেল এবং পরমুহূর্ত্তেই তাহার মনিবের খেলার সাজসজ্জা লইয়া হাজির হইল। অজয় মুখ ভার করিয়া বসিয়াছিল। শিশিরের প্রশ্নে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, খালি খালি কুঁড়ের মত ঘুমুবে, আর সবাই ঠাট্টা করবে—হুঁ!

শিশির হাসিয়া বলিল, তাই নাকি? আচ্ছা এবার থেকে তোর মত চটপটে হব।

অজয় বলিল, হুঁ, তাই বুঝি? আমার মত কেন,

গিরীনদার মত দু-দুটা পাশ দাও না—আর, আর কানহাইয়ালাল ?

শিশির সস্নেহে বালককে দুই হাতে শূন্যে উঠাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, তুই পাশ দে, তোর গিরীনদারা পাশ দিক, তা হ'লেই আমার পাশ দেওয়া হবে, বুঝলি! জানিস ত আমার মাথা মোটা ? সবাই বলে ষাঁড়ের গোবর পোরা ?

অজয় রাগিয়া বলিল, বা রে—তা কেন হবে? তা হ'লে খেলায় তোমায় কেউ পারে না কেন ? দুবার দুবার গঙ্গা পেরুতে পারে কেউ তোমার মতন ?

শিশির বলিল, আচ্ছা রে, এবার থেকে কলেজেও পাশ দেব, হ'ল ত ?

খেলার মাঠের দিকে যাইতে যাইতে শিশির বলিল, হাঁ রে, তোদের কলকাতা যাওয়া ঠিক ?

অজয় বলিল, হাঁ, আমরা সবাই যাব—বাবা যাবে আমি যাব, দিদি যাবে—

শিশির বলিল, দিদি যাবে ? তবে যে শুনলুম তোর দিদির একজামিন আসছে বলে এখানে মা'র কাছে থাকবে ?

অজয় বলিল, তোমার মার কাছে? না শিশিরদা, আমরা সবাই যাব—তবে দিন দুই-চার পশরোহায় থেকে যাব ভূপতিদার ওখানে।

শিশির ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, ভূপতিদা ? ও হো হো—ঐ যিনি নওয়াডার কাছে চাষ বাস করছেন—ঐ পশরোহায় ?

বালক বলিল, হাঁ, হাঁ, ঐ ভূপতিদার ওখানে। তুমি কিছু শোননি ? দিদির যে বিয়ে হবে—তাই কলকাতায় যাচ্ছেন বাবা আমাদের নিয়ে—শোন না বলছি সব।

বালক তখন অনর্গল বক্তৃতা করিয়া যাইতে লাগিল—শিশিরদাকে পাইলে সে জগৎ সংসার ভুলিয়া যাইত-শিশির ছিল তাহার বাল্যের স্বপ্ন, আদর্শ দেবতা ! কথার পর কথা—ভূপতিদা তাদের কে—পশরোহায় সে কি করে, বাবা তাহাকে কত ভালবাসেন, কত পরামর্শ করেন—দিদি ভূপতিদা বলিতে একেবারে অজ্ঞান—কত কি ! বালকের সরল হাসি আর মধুর আলাপ অন্য সময়ে শিশিরকে আনন্দ-রসে সিক্ত করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু এ সময়ে সে কি জানি কেন কেমন আনমনা হইয়া রহিল।

হঠাৎ ফটকে মোটরের হর্ন শুনিয়া উভয়ে থমকিয়া দাঁড়াইল। কে আসিল ? শিশির অজয়কে খেলার মাঠে পাঠাইয়া দিয়া ফটকের দিকে চলিল। রক্তকঙ্করমণ্ডিত পথে দুই-চারিপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই আগন্তুকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল—আগন্তুক বিদেশী পর্য্যটকের সাজে সজ্জিত, মুখে তাহার বর্মা সিগার।

শিশির বলিল, ওঃ আপনি ? রায় বাহাদুরের দেখা পান নি ?

আগন্তুক ভূপতি—শিশির পূর্ব্বে তাহাকে কয়েকবার রায় বাহাদুর বৈদ্যনাথবাবুর বাড়ী দেখিয়াছিল।

ভূপতি বলিল, না, শুনলুম তিনি তোরে বেড়াতে বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেন নি। অশোকারা এখানে এসেছে না ?

শিশির অপ্রসন্ন মুখে বলিল, হাঁ, আসুন আমার সঙ্গে।

যাইতে যাইতে ভূপতি বলিল, আপনি কেমন আছেন ?—দেবকীবাবু ?

শিশির বলিল—সবাই ভাল। আপনি কি বৈদ্যনাথ-বাবুদের নিয়ে যেতে এসেছেন ?

বিস্মিত হইয়া ভূপতি বলিল, হাঁ, কেন বলুন ত ?

শিশির বলিল, না, এমন কিছু নয়—শুনেছিলুম আপনার ওখানে ওঁরা যাবেন।

ভূপতি বলিল, হাঁ, তা বটে। জানেন ত বৈদ্যনাথ-বাবু আমার বাবার খুব বন্ধু ছিলেন—এক গাঁয়েই ছিল বাড়ী, তারপর কলকাতায় এক জায়গায় থেকে দুজনে লেখাপড়া করেছেন—অনেক দিন থেকেই আমার ওখানে যাবার কথা হচ্ছে—তা এবার কলকাতায় যাবার সময়—

শিশির একটু অধীরভাবে বলিল, তা ছুটির ত এখনও এক হপ্তা দেরী—

ভূপতি তার কথার একটু ঝাঁঝ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, না, এখনই—আজই নিয়ে যেতে আসি নি। এখানে ওঁদের বাসায় থেকে মনে করছি এবার নালান্দা আর রাজগীরটা দেখে যাব—এদ্দিন বেহারে রইছি, কখনও দেখিনি—আপনি যাবেন ? উঃ খুব ভাল হয়—বেশ একটা এক্সকারসান্—

শিশির একটু রূঢ়ভাবে বলিল, আপনারা যাচ্ছেন—যান না—আমার সময় নেই।

ভূপতি এই অকারণ উষ্মার মূল খুঁজিয়া পাইল না; বলিল, সে ত ভাল কথা। কাজের মানুষ হওয়াই তো ভাল। তা বোধ হয়, আপনাদের জমিদারীর কাজকর্ম্ম এখন আপনিই দেখছেন, দেবকীবাবুর বয়েস হয়েছে—সব পেরে ওঠেন না—শুনেছি বেহারেই আপনাদের মস্ত জমিদারী আছে, আর বাঁকীপুরেও বড় বড় ব্যবসা!

কথাটার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আভাস ছিল কি-না শিশির বুঝিতে পারিল না। সে সরলভাবেই জবাব দিল, না, ওসব উপযুক্ত কর্ম্মচারীদেরই ওপর ভার দেওয়া আছে।

ভূপতি বলিল, তবুও তারা ত পর, আপনার মত টেনে করবে কি কিছু তারা? ওঃ অমন জমি—সোনা ফলে একটু চেষ্টা করলে।

এই সময়ে উভয়ে টেনিস মাঠের নিকটে উপস্থিত হইলে অশোকা ও অজয় উল্লাসভরে চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিল। তাহারা যেরূপ আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত ভূপতির হাত ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া সাদর অভ্যর্থনার নায়েগ্রা প্রপাতে তাহাকে ডুবাইয়া দিল, তাহাতে শিশির-কুমারের অস্তিত্বই যে তথায় আদৌ অনুভূত হইতেছিল না, তাহা বুঝিয়া শিশিরকুমার ম্লানমুখে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

দুই

পুত্রের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া দেবকীবাবু যতটা বিস্মিত হইয়াছিলেন, বোধ হয় তত কেহই হন নাই। অকর্ম্মণ্য, অলস, দেহচর্চ্চায় মশগুল পুত্র শিশিরকুমার শহরের ভোগ-বিলাস ছাড়িয়া পশরোহার বনেবাদাড়ে যাইবে পোল্ট্রি ফার্মিং ডেয়ারী ফার্মিং শিখিতে, চাষবাসে হাতে খড়ি দিতে—এ অসম্ভব কথা পুত্রের নিজের মুখে শুনিয়াও তিনি প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। আর শিশিরের ভাই-ভগিনীরা? তাহারা ত হাসিয়াই খুন!

হাসিবার যে একটা মস্ত কারণও ছিল না তাহা নহে। শিশির ছিল মস্ত বড় ধনী জমিদারের সন্তান, বাল্যকাল হইতেই সুখে ও আরামে লালিত পালিত। দেবকীবাবুরা ছিলেন বংশানুক্রমিক জমিদার, তাহার উপর ব্যবসায়ী মহাজন হইয়াছিলেন তিনি স্বয়ং। একবার পত্নীর কঠিন বাতব্যাধির সময় ডাক্তারের পরামর্শে তিনি তাঁহাকে লইয়া রাজগীরে আসেন। সেখানে পত্নী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হন। তদবধি তাঁহার বেহারের উপর মায়া বসিয়া যায়, আর সেই হেতু তিনি বাঁকীপুরে স্থিতভিত হন। বেহারের কোথাও কোথাও তিনি জমিদারী কিনিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঁকীপুরে দুই-তিনটা কারবার খুলিয়াছিলেন। দশ-পনেরো বৎসরের মধ্যেই তিনি বাঁকীপুরের একজন বিশিষ্ট 'রইস'-রূপে পরিগণিত হন। জনসাধারণের ত কথাই নাই, লাট-দরবারেও তাঁহার প্রসার-প্রতিপত্তি কম ছিল না। এ হেন সম্ভ্রান্ত জমিদারের ছেলে—সোনার ঝিনুক মুখে লইয়া যে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে—যাহার মুখের কথা খসিতে না খসিতে সমস্ত আবদার-বাহানা প্রতিপালিত হইত—এমন ছেলে পল্লীর কষ্টময় জীবন যাপন করিতে স্বেচ্ছায় সম্মত হইয়াছে, একথা কি সহজে বিশ্বাস্য হইতে পারে? তাই কথাটার আলোচনা হইতেই তাহার ভ্রাতা-ভগিনী ও আত্মীয়-বন্ধুরা হাসিয়া আকুল হইয়াছিল। অথচ যে এত হাসির কারণ, সে ভাবিয়াই পায় না, তাহার কাজ শিখিতে যাওয়ার কথায় কেন এত হাসি! নিজের উপর ছিল তার একটা মস্ত প্রত্যয় যে, সে ইচ্ছা করিলে অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারে—করে না দরকার হয় না বলিয়া! কিন্তু সে ছাড়া অপরে এ কথা বিশ্বাস করিত না। তাহারা তাহার মুখের উপরেই তাহাদের সেই অবিশ্বাস ও তাচ্ছিল্যের ভাবের কথা শুনাইয়া দিত, আর সেইজন্য সে অন্তরে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইত।

তিন মাস হিল্লী দিল্লী টহল দিয়া অশোকারা যখন বাঁকীপুরে ফিরিয়া আসিল, তখন শিশিরকুমারের মধ্যে এমন কিছু পরিবর্ত্তন দেখিল যাহা হইতে পারে বলিয়া তাহারা ধারণাই করিতে পারে নাই। জীবনটাকে সে যত হাল্কা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল, এখন যেন তাহার কথায় কাজে তাহার কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না। সে প্রায় সব সময়েই থাকে গম্ভীর, সব সময়েই যেন কি চিন্তা করিতেছে, তার সেই স্বাভাবিক সরল হাসিও আর দেখা যায় না। আর একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন এই যে, সে থিয়েটার কুস্তীর আখড়া ছাড়িয়া দিয়া এটা-ওটা-সেটা নানা কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকিবার চেষ্টা করিত। কাজ জানিতও সে কিছু কিছু অনেক রকমের, কিন্তু কোনটাতেই কখনও মনস্থির করিতে পারিত না।

মোটর মেকানিক্‌স্‌ হিসাবে সে মন্দ ছিল না। ইদানী কিন্তু সে কাঠ-কাঠরার কাজেই ঝোঁক দিয়াছিল বেশী। নিজের ছোটখাট কারখানায় একদিন একটা আলমারির কাজে সে তন্ময় হইয়া আছে, এমন সময়ে অলক্ষে অশোকা আসিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইল, মুখে মৃদুমন্দ হাস্য। শিশির কিন্তু তাহার অস্তিত্ব বিন্দুমাত্রও জানিতে পারে নাই; অথচ তখন কেহ যদি তাহার মনের গোপন কোণে উঁকি দিতে পারিত, সেখানে অশোকাই যে সমস্ত স্থানটা জুড়িয়া বসিয়া রহিয়াছে তাহা দেখিতে পারিত।

অশোকা মৃদু অনুযোগের সুরে বলিল, বেশ লোক ত আপনি!

সে অশোকার অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে চমকিয়া উঠিল। বাটালীটা তাহার হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহাকে অপ্রতিভ ও নিরুত্তর দেখিয়া অশোকা অবস্থাটুকু বেশ উপভোগ করিল; বলিল, খেয়ে-দেয়ে আজ না আমাদের 'অরুণা' দেখতে যাবার কথা—এগারোটা থেকে অলডে পার্ফর্ম্যান্স—এখনও বাটালী চালাচ্ছেন? উঠুন, উঠুন—

বাটালীটা কুড়াইবার ছুতায় দৃষ্টি অবনত রাখিয়াই শিশির সঙ্কোচজড়িত অস্পষ্টস্বরে বলিল, না, দেরী নেই, আপনাদের সঙ্গেই তৈরী হয়ে নিচ্ছি এখুনি।

দুই বৎসরের মেশামিশিতেও শিশির অশোকাকে 'আপনি' ছাড়া অন্য সম্বোধনে অভ্যস্ত হইতে পারে নাই।

শ্লেষোক্তি করিয়া অশোকা বলিল, তাই নাকি? গঙ্গা পেরুনো ত নাইবার সময় কামাই যাবে না! আসুন, আসুন, আর দেরী করবেন না।

কথাটা বলিয়াই অশোকা বিদ্যুৎঝলকের মত চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু তখনও শিশিরকে যন্ত্রপাতি গুছাইতে দেখিয়া অস্থিরভাবে বলিল, বারে, তবুও বসে রইলেন? বলছি—আপনাকে না নিয়ে যাব না।

হঠাৎ বালিকাসুলভ চাপল্যের সহিত অশোকা শিশিরের একটা হাত ধরিয়া টান দিল। শিশির বিস্মিত স্তম্ভিত—তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া একটা তড়িৎপ্রবাহ বহিয়া গেল।

যাইতে যাইতে অশোকা বলিল, কি কাজ হচ্ছিল শুনি! ও মা, ও আবার কাজ! ও ত সখের কাজ—ইচ্ছে হ'ল করলুম, না হ'ল সটান নিদ্রা দিলুম!

শিশির সঙ্কুচিত হইল। ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—তা ঠিকই বলেছেন—অপদার্থই বটে আমি।

হো হো করিয়া হাসিয়া অশোকা বলিল, ওঃ অভিমান হ'ল বুঝি! তা আপনার লোকেরাও কিছু বলবে না? বলুন ত, সত্যিই ওটা খেয়ালের কাজ কি-না? হাঁ, কাজের লোক দেখে এলুম বটে ভূপতিদাকে। কি অদ্ভুত মানুষ, একলাই একশো! পশরোহার জলাজঙ্গলে সত্যিই সোনা ফলিয়েছেন তিনি।

শিশির গম্ভীরস্বরে কেবল বলিল, হুঁ।

যাইতে যাইতে অশোকা শতমুখে তাহার ভূপতিদার গুণব্যাখ্যা করিয়া যাইতে লাগিল। কথার পিঠে কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পাইল না। ভূপতিদার কেমন সুন্দর ফলের বাগান, কেমন ফুলের নার্সারী, ফসলের চাষ, মাছের চাষ, ডেয়ারী ফার্ম, পোল্‌ট্রি ফার্ম, কত রকমের কত কি! একলাই সব করিতেছেন। এখন কারবার এত বড় হইয়াছে যে, একজন বিশ্বাসী শিক্ষিত বাঙালী যুবকের সাহায্য বড়ই প্রয়োজন। কিন্তু বাঙালীর ছেলে কে যাইবে বনেবাদাড়ে এত কষ্ট সহ্য করিতে!

শিশির পুনরপি অন্যমনস্কভাবে বলিল, হুঁ।

অশোকা বলিল, অবাক! হুঁ কি? ঐ নিয়ে সেদিন জেঠামশায়ের সঙ্গে বাবার কথা হচ্ছিল। জেঠামশাই বলছিলেন, বাঙালীর ছেলেরা বড্ডো আয়েসী হয়ে পড়েছে, এক পা হাঁটতে পারে না, একটু নেমন্তন্ন খেলেই অসুখ করে, —ওরা জানে কেবল ফ্যানের তলায় বসে কলম পিসতে, আর কোন ক্ষমতা নেই।

শিশির বলিল, কে, বাবা বলছিলেন?

অশোকা বলিল, হাঁ। তা মিথ্যে কি বলেছেন? ভূপতিদার মত অমন কটা হয়? বাঙালীরা যদি কষ্ট সহ্য করতে পারত—

শিশির বাধা দিয়া বলিল, আপনি পছন্দ করেন বাঙালীদের ঐ রকম দেখতে?

অতিমাত্র আগ্রহ ও উৎসাহভরে অশোকা বলিল, করিনি? খুব করি। কেবল ঘরে বসে আড্ডা মারা, না হয় কেবল খেলা আর খেলা! ওমা, ওরা এসে পড়ল যে—চলুন, চলুন—পেছুনে কে আসছে? ওমা, ভূপতিদা, না? কখন এল?

একটা উল্লাসধ্বনি করিয়া অশোকা বনকুরঙ্গীর মত ছুটিয়া গেল, শিশিরকুমারের দিকে ফিরিয়াও দেখিল না। শিশিরকুমারের মুখখানা আঁধার হইয়া গেল। এই যে তরুণী ক্ষণিক আলোকসম্পাত করিয়া নিমিষে অন্তর্হিত হইল, তাহার শ্লেষমিশ্রিত সহানুভূতির আভাস কি নারীর সহজাত করুণার অভিব্যক্তি, না আর কিছু,—এই কথাটাই সে তখন মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতেছিল।

তিন

—ওঃ এগুনো কি তোর মাস্‌ল্? বাপ্! যেন জাহাজের দড়া!

ভূপতি শিশিরের গুলিন মাস্‌ল্ টিপিয়া দেখিতেছিল, পশরোহার ক্ষেত-খামারের সঙ্গে একটা কুস্তি ও জিমনাষ্টিকের আখড়াও ছিল।

শিশির হাসিয়া বলিল—কেন, তোমারই বা কম কি ভূপীদা?

ভূপতি বলিল, তা বলে তোর সঙ্গে তুলনা? উঃ অসুর!

বস্তুত ভূপতি কথাটা মিথ্যা বলে নাই। সত্যই শিশির অতিমাত্র বলিষ্ঠ, বাঁকীপুরে শারীরিক ব্যায়ামে সে প্রায় সমস্ত প্রথম প্রাইজই দখল করিয়াছিল।

পশরোহা আসিবার পর মাস দেড়েকের মধ্যেই ভূপতি শিশিরকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। বয়সে সে শিশিরের চেয়ে পাঁচ-ছয় বছরের বড়, কিন্তু পাঞ্জা কসিতে গিয়া বয়োকনিষ্ঠ শিশিরের দৈহিক শক্তির যে পরিচয় পাইয়াছিল তাহাতেই সে তাহাকে অসুর বলিয়া ডাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। আহার্য্যের সদ্ব্যবহার করিয়াও শিশির তাহার 'আসুরী' শক্তির পরিচয় দিয়াছিল।

অবশ্য এ ডাক আদরের, স্নেহের, ঘনিষ্ঠতার। শিশিরের অদ্ভুত অশ্বচালনা, শিকারে শিশিরের অব্যর্থ সন্ধান, শিশির যে গুরুভার বহনক্ষম, শিশির যে ইচ্ছা করিলে অথবা ঝোঁক দিলে অতিমাত্র সহিষ্ণু হইতে পারে, এ সকল ভূপতি কয়দিনেই বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল এবং সেজন্য তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ক্ষেতখামারে—ডেয়ারী বা পোলট্রি ফার্মে প্রথম প্রথম তাহার অনাস্থা দেখিলেও পরে শিশিরের অদ্ভুত কার্য্যকুশলতা দেখিয়া ভূপতি পুলকিত হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর অবসরকালে কোন কোন দিন শিশিরের অভিনয় শুনিয়া ভূপতি মুগ্ধ হইত। এই শিশির অলস, অকর্ম্মণ্য? সত্যই ভূপতি তাহাকে কনিষ্ঠ সহোদরেরই মত ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং শিশিরও ভূপতিদার উদার আপ্যায়নে সম্ভাষণে ও আন্তরিক স্নেহযত্নে তাহার প্রতি অতিমাত্র আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এ সংসারে পুরুষদের এই অকপট ভালবাসার মধ্যে নারী যদি দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত অন্তরায় হইয়া না দাঁড়াইত!

শিশিরের পশরোহা যাত্রার মূলে ছিল অশোকা, এ কথা সত্য। সে-ই তার ভূপতিদাকে বুঝাইয়াছিল যে, শিশিরবাবুর মত বলিষ্ঠ অসমসাহসী মানুষ যদি তাঁহার সাহায্য করে, তবে তাঁহারও সুবিধা, শিশিরবাবুরও কাজের লোক হইবার সুবিধা। কথাগুলি সে এমনই নির্লিপ্তভাবে বলিয়াছিল, যাহাতে ভূপতির ধারণা হইয়াছিল যে দেবকীবাবুর দেহের ভালমন্দের কথা ভাবিয়াই অশোকা সময় থাকিতে সাবধান হইতে পরামর্শ দিতেছে। অশোকা যে দেবকীবাবুকে যথার্থই পিতার ন্যায় ভালবাসিত এবং দেবকীবাবুও যে অশোকাকে আপনার কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন, কয়বার বাঁকীপুরে থাকিয়া ভূপতি তাহা ভালরূপেই বুঝিয়াছিল।

কিন্তু অশোকার এই ওকালতিটা ঠিক এইভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই একজন—সে শিশির। পশরোহা যাত্রার পূর্ব্বে বৈদ্যনাথবাবুর বাড়ীর ভোজে অশোকার সহিত তাহার ভূপীদার এ সম্বন্ধে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, ঘটনাক্রমে অদৃশ্য থাকিয়া শিশির অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার কতক শুনিয়াছিল। তাহার মনের নির্ম্মল আকাশে উহার পরেই কালো মেঘের সঞ্চার হইল। হায় নারী!

ভূপতি উহাদের কে? তাহার সহিত অশোকার এই ঘনিষ্ঠতা কেন? তাহার সম্পর্কে এ স্নেহের দাবী করিবার ভূপতির কাছে অশোকার কি অধিকার আছে? সে নিজে অলস অকর্ম্মণ্য একথা সত্য, কিন্তু সে জন্য পরের মাথা ব্যথা কেন, তাহাকে বাঁকীপুর হইতে তাড়াইবার মন্ত্রণা কেন? তাহার সান্নিধ্য কি অশোকার পক্ষে এতই বিরক্তিকর?

দুর্জ্জয় রোষে ক্ষোভে অপমানে অভিমানে ভাবপ্রবণ শিশিরের অন্তর ভরিয়া উঠিল। কোন কথা তলাইয়া

দেখিবার ধৈর্য্য তাহার কখনও ছিল না। কাজেই তাহার পশরোহা যাত্রার প্রস্তাব হইবামাত্র ঝোঁকের মাথায় সে তাহাতে সম্মত হইয়া তৎপরদিনই ভূপতির সহিত পশরোহায় চলিয়া আসিল।

যাহার হৃদয় আছে তাহার মিষ্ট ব্যবহারে বনের পশু পক্ষীও বশ হয়, শিশিরের মত ভাবপ্রবণ মানুষের ত কথাই নাই। প্রথম প্রথম সে পশরোহা আসিয়া গম্ভীর ও মন-মরা হইয়া থাকিত। কিন্তু তাহার পর সে যখন এই কৃত্রিম খোলস ছাড়িয়া স্বাভাবিক রূপ ধারণ করিল, তখন সেই বনবাদাড়ের নিঃসঙ্গ জীবনে তাহার সঙ্গ ভূপতির বড়ই মিঠা লাগিল, উভয়ের মধ্যে 'আপনি' 'মহাশয়' অথবা 'শিশিরবাবু'-রূপ সম্ভাষণ ক্রমে 'ভূপীদা' ও 'ওরে শিশির'-আলাপে পরিণত হইয়াছিল।

শিশিরের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও ভূপতি মাঝে মাঝে দেখিত, শশিরকুমার বড় অস্থির ও অন্যমনা হইত; তাহার সদাপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল বর্ষার বারিভরা মেঘের মত গম্ভীর হইত। সে সময়ে সে কাহাকেও কাছে আসিতে দিত না, আসিলে বিরক্ত হইত। ভূপতি ভাবিত, বাঁকীপুরের সুখময় জীবনের আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন এই নির্ব্বাসিত জীবনে সে বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। তখন সে শিশিরকে বাঁকীপুরে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিত। কিন্তু শিশিরের সঙ্কল্প পাথরের মত কঠিন ছিল—সে কিছুতেই বাঁকীপুরে ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইত না। কয়দিন কাছাকাছি দুই-একটা বড় শহর হইতে একটা খবর আসিয়া পৌঁছিবার পর ভূপতি বড়ই উৎকণ্ঠিত ও চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছিল। খবরটা আতঙ্কজনক বটে। কারণ, ঠিক মহামারীর আকারে না হইলেও দুই-দশটি করিয়া প্লেগ বেহারের কোন কোন শহরে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং তাহাতে মানুষও মরিতেছিল। তবে একটা ভরসার কথা এই যে তখনও গ্রামে রোগ দেখা দেয় নাই; অন্তত পশরোহা ও তার আশপাশের গ্রামগুলির স্বাস্থ্য ছিল ভাল। কিন্তু পশরোহা হইতে নওয়াডা শহরের ব্যবধান অধিক না হইলেও তথায় প্লেগ দেখা দিয়াছিল। ভূপতির নিজের জন্য কোন আশঙ্কা ছিল না—সে মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল। কিন্তু শিশিরকুমার? পরের ছেলে—বিশেষত অবস্থাপন্ন ঘরের আদরের ছেলে—তাহার কথা স্বতন্ত্র। কিরূপে তাহাকে বাঁকীপুরে আত্মীয়স্বজনের কাছে ফিরাইয়া পাঠান যায়। কথাটা কয়দিন ধরিয়া ভূপতি পাড়িতে পারিতেছিল না—পাছে শিশির ভিন্ন অর্থে কথাটা গ্রহণ করে!

আজ তাই সে শিশিরের দৈহিক শক্তির কথাচ্ছলে বলিল, দেখ্ মজা এই, এই দেহ এ একটা টুস্কিরও ভর সয় না, এই আছে এই নেই।

শিশির হাসিয়া বলিল, ওঃ ধম্ম কথা এনে ফেললে যে ভূপীদা! বল, ভগবানের একটা ফুৎকার--

—তা নয় ত কি? এই ত হাত-পা রয়েছে বেশ—একটা শির টেনে ধরুক দিকি কোথাও—ব্যস! আমি স্বচক্ষে দেখেছি নওয়াডার সুচেৎ সিংকে পেটের ব্যথায় কাটা ছাগলের মত ছটফট করতে—অত বড় পালোয়ান ত। হাঁ, ভাল কথা, শুনেছিস, নওয়াডার ওদিকে প্লেগ ব্রেক আউট করেছে? নাম শুনলেই ভয় করে, একবার ধরলে আর রক্ষে নাই।

—হাঁ, ভানুয়ারা বলাবলি করছিল বটে। শুনেছি নাকি একটু চোখ লাল হয়ে জ্বর হলেই ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়?

ভানুয়ারা সপরিবারে ভূপতির ফার্মে কাজ করে।

—হাঁ, গালগলা ফুলোরও তর সয় না। তা বলছিলুম কি, বাঁকীপুরের চিঠিপত্তোর পেয়েছিস এর মধ্যে? যা না দিনকতক বাড়ী ঘুরে আয় না।

শিশির গম্ভীর ও অপ্রসন্ন মুখে কেবল বলিল, না।

—না কেন? যা না।

শিশির বলিল, তাড়িয়ে দিচ্ছ? আর বুঝি পুষতে পারছ না ভূপীদা? তুমিও চল না কেন—তোমায় দেখে অনেকেই আহ্লাদ করবে।

কথাটার মধ্যে শ্লেষ না উষ্মা? ভূপতি বুঝিতে না পারিয়া সহজভাবেই বলিল, হ্যাঃ, আমার নাকি যাবার এই সময়! দেখছিস নি বর্ষার জল থৈ থৈ করছিল, এইবার সরতে আরম্ভ করেছে, এখন—

—তবে আমায় যেতে বলছ কেন? আমারও ত কাজ আছে।

—আমি আর তুই?

—কেন? তা নয় কেন?

কথাটা বলিয়া ক্ষণপরে শিশির হাসিয়া বলিল, প্লেগের ভয় বুঝি আমার একা, তোমার নেই?

ধরা পড়িয়া ভূপতি অপ্রতিভ হইল, বলিল, তোর জন্যে ভাববার ঢের লোক রয়েছে।

—আর তোমার?

ভূপতির মুখমণ্ডল অসম্ভব গম্ভীর হইল, সে কিছুক্ষণ নীরব রহিল। তাহার মুখে চোখে এমন একটা দারুণ ব্যথার অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিল যাহা শিশির ছাড়া অন্য কেহ হইলে নিশ্চিতই ধরিয়া ফেলিতে পারিত।

হঠাৎ বিকৃতকণ্ঠে সে বলিল, যা ধরবি তা ত ছাড়বি নি—ধামারিয়া যাবি? চল্, দুজনে যাই—নাম শুনেছিস ত? অত বড় জলা এ তল্লাটে কোথাও নেই, আর অত হাজার হাজার পাখীও কোথাও নেই—যাবি শিকার করতে?

অন্য সময় হইলে শিকারের নাম শুনিয়া শিশির লাফাইয়া উঠিত, কিন্তু এখন কোনও আগ্রহ না দেখাইয়া বলিল, তা গেলেও হয়।

—বারে, এ যেন উপরোধে ঢেঁকি গেলা! যাবি কি না বল্—একঘেঁয়ে কাজ আর কাজ মোটেই ভাল লাগছে না। হাঁ, বাড়ীতে চিঠি লিখেছিস?

—চিঠি আর রোজ রোজ কি লিখব, লিখতে যেন গায়ে জ্বর আসে।

—আর দেখিস দিকি অশোকার চিঠিখানা—চার পৃষ্ঠা, তাতে কেবল তুই কি করিস, কি খাস, কি কাজ শিখলি—এইতেই সাতকাণ্ড রামায়ণ। উঃ পাগলী কি লেখাই লিখতে পারে! একটু বেজারও হয় না!

শিশির কাঠ হইয়া বসিয়া শুনিতেছিল। ক্ষণপরে বলিল, আচ্ছা ভূপীদা, তুমি বাড়ীতে চিঠি লেখো না কেন? কই, কখনও দেখিনি ত লিখতে?

ভূপতি গম্ভীর ও অন্যমনস্কভাবে বলিল, দরকার হয় না তাই লিখিনি—হাঁ, তা হ'লে কালই শিকারের ঠিক করি—কি বল্?

শিশির বলিল, আচ্ছা, করো!

ভূপতি বলিল, তা হ'লে আজ একবার নওয়াডা হয়ে আসি—বন্দুকের পাশফাসগুলো—আর কিছু জিনিষ-পত্তোরও চাই।

হঠাৎ শিশির বলিল, আচ্ছা ভূপীদা, বাপ-মা তোমার নেই এ ত শুনেছি অনেক দিন, আর কে আছেন তোমার?

বিরক্তিভরে ভূপতি বলিল, সে সব কথায় তোর দরকার কি বল্ ত?

ভূপতি অপ্রসন্ন মুখে অন্যত্র চলিয়া গেল। অবাক হইয়া বিস্মিতনেত্রে শিশির তাহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

চার

শিকারে যাত্রার পূর্ব্বদিনে ভূপতি নওয়াডার কাজ সারিতে গিয়া শিশিরের পিতাকে একখানি পত্র লিখিয়া আসিল। শিশিরের সহিত বিচ্ছেদের কল্পনা অতিমাত্র কষ্টদায়ক হইলেও সে অন্ধ স্নেহ, ভালবাসার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইল না। সে শিশিরের পিতাকে জানাইল যে, শিশিরের মত অশেষ গুণবান ছেলে আজিকালিকার বাঙালীর ছেলেদের মধ্যে হাজারে একটি মিলে কি-না সন্দেহ। সে এই অল্প সময়ের মধ্যেই চাষবাস ও অন্যান্য কাজে এমন পোক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, এখন কেহ টাকাকড়ির হিসাবপত্র রাখিলে সে অনায়াসে তাঁহার জমিদারীতে সোনা ফলাইতে পারে—হিসাবপত্রে তাহার মাথা পরিষ্কার নহে। নওয়াডা অঞ্চলে সম্প্রতি প্লেগ দেখা গিয়াছে। গ্রামেও দুই-একটা মৃত্যু ঘটিতেছে। সুতরাং এ সময়ে শিশিরকে বাঁকীপুরে লইয়া যাওয়াই ভাল।

ভোরে সেখানে উঠিবার সময় শিশির দেখিল, ভূপতি দুই কপোলে দুই আঙুল টিপিয়া বসিয়া আছে, তাহার হাতে এমোনিয়ার শিশি, আর তার মুখ-চোখে একটা অব্যক্ত যাতনার অভিবক্তি। সে উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে ভূপীদা, অসুখ করেছে?

বিরক্তিভরে ভূপতি বলিল, কিছু না, মাথাটা একটু টিপ টিপ করছে। তুই যা দিকি জিনিষপত্তোরগুলো ভাড়ুয়ারা গাড়ীতে গুছিয়ে তুল্‌ল কি-না দেখে আয় দিকি—হাঁ, ভাল কথা, আচ্ছা, তুই কেমন গাড়োল বল্ দিকি—এত ক'রে বারণ ক'রে দিই, অনর্থক মরবার পথে ছুটিস কেন বল্ দিকি?

ততক্ষণ শিশির ঘরের সীমা ছাড়াইয়া অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। সে জানিত, কল্যকার একটা কাজের জন্য ভূপীদার কাছে ভৎ‍র্সনা খাইতে হইবে; কারণ কাল যখন ভূপীদা নওয়াডা গিয়াছিল, তখন সে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া,

এমন এক কাণ্ড করিয়া বসিয়াছিল, যাহাতে আর যে হউক, তাহার ভূপীদা যে মোটেই সন্তুষ্ট হইবে না, একথা সে বিলক্ষণ জানিত। ফার্মের একটা ঘোড়া খেপিয়া গিয়া হাওয়ার মত ছুটিয়া চাষীর ছেলেদের খুন-জখম করিবার জোগাড় করিয়াছিল, সে সেই সময়ে তাহার মুখের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঘটনাটা সে যতটা তুচ্ছ করিয়া দেখিয়াছিল, ফার্মের লোক-লস্করা তেমন দেখে নাই এবং তাহাদের মুখে উহার অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যা শুনিয়াই ভূপতি তাহার এই হঠকারিতার জন্য বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। সে এখন তাড়াতাড়ি পলাইয়া না গেলে শুনিতে পাইত যে, ভূপতি বলিতেছে, 'তোর মুখ চেয়ে কত লোক রয়েছে তা ত জানিস নি।' গোযানে ঘণ্টা চার-পাঁচ অতিক্রম করিবার পর তাহারা যখন ধামারিয়া পৌঁছিল, তখন রৌদ্রের আলোকে সারাজগৎ হাসিতেছে। তখনই সূর্য্যকর প্রখর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। দূর হইতে সুবিস্তীর্ণ জলাভূমিকে যেন একটা হ্রদ বলিয়াই মনে হইতেছিল। হ্রদের হেথা সেথা দুই-দশটা ঝোপ ও কাঁটাবন, আর কোথাও কচিৎ বড় বড় গাছ আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতীয় জলচর বিহঙ্গ হেথা সেথা উড়িয়া বেড়াইতেছে, জলে ডুবিতেছে উঠিতেছে, সাঁতার কাটিতেছে, ডানা ঝাড়িতেছে।

ধামারিয়া গ্রামখানা কয়েকখানা খাপরার চালের কুটীরের সমষ্টিমাত্র, হ্রদ হইতে প্রায় পোয়াটাক পথ হইবে। গ্রামের মধ্যে একটা বড় কূপ, তাহার পাশে মহাবীরজীর আখড়ায় রক্তপতাকা উড্ডীন হইতেছে। কাছেই পাশাপাশি শিবমন্দির ও মুসলমানদের মসজিদ। দুই-চারিখানা কলুর ঘানি, দুই-চারিটা মুচীর দোকান, ধোপার বাড়ী, বেশীর ভাগই গোয়ালার গরু-মহিষের গোয়াল-বাড়ী, চাষীর লাঙল নিড়েনের ক্ষেতখামার। একখানি মুদীর দোকান, উহাকে মনিহারী দোকান, বেনেতি মশলার দোকান, যাহা ইচ্ছা তাহাই বলা যায়। মুদীর একখানা খালি ঘরেই শিকারীবাবুদের আস্তানা পড়িল। গ্রামের বালক-বালিকা—এমন কি বউঝিরাও দলে দলে আসিয়া অবাক বিস্ময়ে বাবুদের ও বাবুদের অদৃষ্টপূর্ব্ব সাজসরঞ্জাম দেখিতে লাগিল। চাকর বামুন ষ্টোভে বাবুদের রান্না-বান্নার উদ্যোগ করিতে লাগিল, বাবুরা দুই-একজন অনুচর লইয়া জলার অভিমুখে পদব্রজে অগ্রসর হইলেন, সেখানে আর গাড়ী চলে না।

জলা যতই নিকটবর্ত্তী হয়, উৎকট আনন্দে ততই শিশিরের অন্তর ভরিয়া ওঠে। কিন্তু ভূপতির বেদনাক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল, সে যেন যন্ত্রচালিতেরই মত পথ অতিক্রম করিতেছিল। জলার তটপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাহারা দেখিল, তদঞ্চলের অধিবাসীরা ডোঙায় চড়িয়া পানিফল তুলিতেছে, কেহ কেহ মাছ ধরিতেছে। শিকারী বাবুদের দেখিয়া তাহারা কাজ ছাড়িয়া সবিস্ময়ে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহাদেরই ডোঙা ভাড়া করিয়া বাবুরা শিকারে মাতিলেন। শিশিরকুমারের মনে বাল্যের চাপল্য ও উল্লাস উৎসাহ দেখা দিল বটে, কিন্তু ভূপতি কেমন যেন নিঃঝুম নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

সারাদিন শিকারের পর অপরাহ্লে যখন তাহারা শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন দেহে তটভূমিতে অবতীর্ণ হইল, তখন আর ভূপতির চলিবার সামর্থ্য নাই। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, দেহ জ্বরতপ্ত। শিশির তাহার অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইল, তাহার সমস্ত দিনের আমোদ আনন্দ এক অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া রহিল।

'বাবু পিলেগ্'—অনুচরদের সাহায্যে ভূপতিকে ধরাধরি করিয়া বাজারে আনিবার সময় হঠাৎ কাহার মুখে কথাটা শুনিয়া শিশিরের হৃদ্‌পিণ্ড দুরুদুরু করিয়া উঠিল। সে ধমক দিয়া লোকটাকে নিরস্ত করিল বটে, কিন্তু তাহার আতঙ্ক শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। মুদীর দোকানে পানাহার স্থগিত রহিল, কোনমতে গোযানে শয্যা আস্তৃত করিয়া রোগীকে শয়ন করাইয়া দেওয়া হইল, রোগী অজ্ঞান অচৈতন্য, জ্বরে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতেছে। শিশির দুইহাতে পয়সা ছড়াইয়া লোক-লস্করের মুখ বন্ধ করিল—এই কাজটাই ছিল সকলের চেয়ে কঠিন—কেন না, জানাজানি হইলে বিদেশ বিভূঁইয়ে মুস্কিল বড় অল্প নহে।

কিন্তু এত সাবধান হইয়াও ফল হইল না। সারারাত জাগিয়া রোগীর সেবাপরিচর্য্যা করিয়া ভোরের গাড়ীতে নওয়াডা হইতে ডাক্তার লইয়া যখন শিশির পশরোহায় ফিরিল, তখন ভাণ্ডুয়া ও তাহার স্ত্রীপুত্র ছাড়া আর সমস্ত ভৃত্য ও কারিগর পলায়ন করিয়াছে! এ যে কি সাংঘাতিক বিপদ প্রবাসে নির্ব্বাসিত জীবনে, তাহা ভুক্তভোগী না হইলে বুঝিবে না!

কিন্তু শিশির তাহাতে দমিল না। কোন বিষয়ে একাগ্রচিত্ত ও দৃঢ়সঙ্কল্প হইলে মানুষের সাধ্যায়ত্ত কোন কাজে জগতের কোন শক্তি তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিত না। সে একাই একশত হইয়া রোগীর সেবা পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। ডাক্তারবাবু রীতিমত পুরস্কার পাইয়া রোগের কথা গোপন রাখিতে প্রতিশ্রুতি দিয়া নওয়াডা চলিয়া গেলেন; কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বে ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা বুঝাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলেন যেন অবিলম্বে সেবার জন্য আত্মীয়স্বজনদের অথবা অভাবে ভাড়াটিয়া নার্সের বন্দোবস্ত করা হয়, নতুবা শিশিরবাবু বিপন্ন হইবেন; তবে রোগের আক্রমণ মৃদু, আশঙ্কার কোনও কারণ নাই।

কিন্তু এই আশ্বাসবাণী পাইবার পরেও আটচল্লিশ ঘণ্টাকাল রোগীকে লইয়া যমে মানুষে টানাটানি চলিল। এই সময়টা শিশিরের উপর দিয়া সেই আত্মীয়স্বজনহীন নির্ব্বাসিত জীবনে কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা তাহার অন্তর্যামী ব্যতীত কেহ বলিতে পারে না। সে স্বভাবতই এরূপ অসাধারণ ধৈর্য্য, সাহস ও সহিষ্ণুতা-সাপেক্ষ কার্য্যে অনভ্যস্ত ছিল; কিন্তু কর্ত্তব্যের কঠোর গুরুভার যখন বিধাতা তাহার মাথার উপর চাপাইয়া দিলেন, তখন সেও মানুষের মত সেই অগ্নিপরীক্ষা সানন্দে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছিল।

একটা বিষয়ে তাহার মন সংশয়দোলায় আন্দোলিত হইতেছিল—রোগীর অবস্থা জানাইয়া বাঁকীপুরে তার করা উচিত কি-না। একদিন সে এই কথাটাই মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতেছিল। ডাক্তারবাবুর নির্দ্দেশ—তার অবিলম্বেই করিতে হইবে; পরন্তু প্রবাসে বৈদ্যনাথবাবুরাই রোগীর আত্মীয়, বন্ধু—সবই, সুতরাং তাঁহাদের কাছে এ রোগের কথা গোপন করিয়া রাখার দায়িত্ব সামান্য নহে। ঈশ্বর না করুন, যদি রোগীর ভাল-মন্দ হয়, তাহা হইলে? সে পাপের বোঝা কাহার উপর চাপিবে? চিরদিনের জন্য কথা শুনিবার ভাগী হইয়া থাকিবে কে? বিশেষত ভূপতি ও অশোকার মধ্যে মনের ভাব কিরূপ, তাহা ত তাহার অবিদিত নাই!

একদিকে এতগুলি কারণ, অন্য দিকেও বাধা ত সামান্য নহে। যদি তার পাইয়া অশোকাও এখানে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ! এই জন-মানবহীন মরুপ্রান্তরে যদি তাহার মত কোমলা বালিকার উপর রোগ সংক্রামিত হইয়া পড়ে! সে দায়িত্ব—সে পাপ যে আরও গুরু! শিশির কোন্ পথে যাইবে, স্থির করিতে না পারিয়া অস্থিরভাবে রোগীর কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হঠাৎ ক্ষীণকণ্ঠে কাহাকে তাহার নাম লইয়া সম্বোধন করিতে শুনিয়া শিশির চমকিয়া পিছনে চাহিয়া দেখিল। আশ্চর্য্য! রোগী তাহাকে কাছে আসিয়া বসিতে বলিতেছে! অস্পষ্ট ক্ষীণস্বরে রোগী পার্শ্বে উপবিষ্ট শিশিরকে যাহা বলিল, তাহাতে শিশির বুঝিল যে, সে তাহাকে অবিলম্বে স্থানত্যাগ করিয়া বাঁকীপুর চলিয়া যাইতে বলিতেছে, আর তাহার সেবা-পরিচর্য্যার জন্য হয় নওয়াডায় না হয় বাঁকীপুরের হাসপাতালে বন্দোবস্ত করিয়া দিতে আদেশ করিতেছে—বেহারে সরকারী বে-সরকারী মহলে তাহার বন্ধুর অভাব নাই, অর্থব্যয়েও সে কাতর বা কুণ্ঠিত নহে। কিন্তু দুই-চারিটা কথা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতেই রোগী ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং ক্ষণপরেই সে নিদ্রাভিভূত হইল; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে শিশিরকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লইল যে, সে অবিলম্বে বাঁকীপুরে তার করিয়া দিবে, নতুবা সে তাহার সেবা লইবে না—এমন কি ঔষধ পথ্যও সেবন করিবে না!

সত্যই কিন্তু সেদিন বাঁকীপুরে তার করিয়া শিশির শান্তি তৃপ্তি অনুভব করিল, তাহার মাথার উপর হইতে যেন একটা গুরু পাষাণ চাপ নামিয়া গেল। অপরাহ্ণে সে রোগীকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখিয়া একটু বিশ্রাম গ্রহণ করিল। পূর্ব্বে দুই-তিন দিন সে একেবারেই চোখের পাতা বুজিতে পারে নাই।

সন্ধ্যার পর সে বৈদ্যনাথবাবুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশয়ান থাকিয়া সে সাত দিনের বাসী একখানা সংবাদ পত্রে চোখ বুলাইতেছে, এমন সময় শুনিল, রোগী ক্ষীণকণ্ঠে বলিতেছে, শোন।

কাগজ ফেলিয়া ব্যস্তভাবে শিশির শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল; সস্নেহে ভূপতির অঙ্গে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে বলিল, কি ভূপীদা?

ভূপতি ধীরে ধীরে বলিল, জান্‌তুম ইডিয়ট গুলোই একগুঁয়ে হয়। তোকে ত তা মনে করি নি।

বিস্মিত হইয়া শিশির বলিল, তার মানে?

—মানে এই যে, বারণ করলেও তুই এখান থেকে নড়লিনি এক পা। ভাবলি, খুব একটা বাহাদুরী নিলি আমার সেবা ক'রে! কিন্তু এর জন্যে আমায় এই অবস্থায় মনে কত বড় ব্যথা দিয়েছিলি—কত ভাবনায় চিন্তায় ফেলে মরণ ডেকে এনেছিলি—তা ত বুঝলি নি!

—মরণ ডেকে এনেছিলুম? বাঃ!

—হাঁ, হাঁ, মরণই তাকে বলে। জানিস, তোর প্রাণটা আমার কাছে কত বড়?—আর তার জন্যে—আমি কত বড় দায়িত্ব নিজে ঘাড় পেতে নিয়েছিলুম?

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া শিশির কিছুক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, কি বলছ ভূপীদা, কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

—আমার মাথা খারাপ হয় নি, খারাপ হয়েছে তোর। গাড়োল! অন্ধ! চোখের সামনে তোর মস্ত পর্দ্দা! ওটা সরিয়ে না দিলে ত কিছু বুঝতে পারবি নি তুই!

—পর্দ্দা?

—হাঁ, হাঁ, পর্দ্দা—বাংলা ক'রে যাকে বলে আড়াল, বুঝলি?

তখনও শিশির তাহার মুখের দিকে হাঁ ক'রে চাহিয়া রহিল।

হঠাৎ গম্ভীর হইয়া ভূপতি বলিল, মানুষের মরা-বাঁচার কথা কেউ ঠিক ক'রে বলতে পারে না। ভেবেছিলুম, তুই নিজে থেকে না বুঝলে তোকে বোঝাব না। কিন্তু মরি-বাঁচি কিছুই যখন ঠিক নেই এ যাত্রা, তাই কথাটা বুঝিয়ে দিচ্ছি তোর চোখের পর্দ্দা সরিয়ে, বুঝলি?

উত্তরোত্তর বিস্মিত হইয়া শিশির বলিল, বুঝিয়ে দেবে? পর্দ্দা সরিয়ে?

—হাঁ রে গাধা! চাবী নিয়ে টেব্‌লের ডানদিকের টানাটা খুলগে যা ওঘরে—ওর ভিতরে একখানা চিঠি পাবি—ঐটে পড়লেই সব বুঝতে পারবি। যা, যা, আমার বড্ডো মাথা ঘুরছে, আমি একটু ঘুমুই, যা।

ভূপতি পাশ ফিরিয়া শুইয়া চক্ষু নিমীলিত করিল, আর একটি কথাও কহিল না। কিছুক্ষণ শিশিরকুমার ভূতাবিষ্টের মত নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার পর মানুষের স্বাভাবিক কৌতূহল বৃত্তি মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিলে সে ধীরে ধীরে পার্শ্বের কক্ষে চলিয়া গেল। তখনও ভূপতি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নীরবে শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

কয়টি ছত্রের একখানি চিঠি—বহুদিন পূর্ব্বে লিখিত। সে চিঠির উপরে ভূপতির নাম-ঠিকানার কালী শুকাইয়া পুরাতন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মুক্তাবিন্দুর মত সজ্জিত সেই অক্ষরগুলি যেন শিশিরের নয়নের সমক্ষে সজীব হইয়া নৃত্য করিতেছে, আর সেই সঙ্গে বুঝি তাহার অন্তরের রক্তবিন্দুও রুদ্রতালে নৃত্য করিতেছে—সে হস্তলিপি বড় পরিচিত—সে হস্তলিপি অশোকার!

কম্পিত হস্তে ভিতরের পত্রখানি বাহির করিয়া কম্পিত হৃদয়ে শিশির পাঠ করিল:

শ্রীশ্রীহরি বৈদ্যনাথধাম, বাঁকীপুর
শরণং —কার্ত্তিক, ১৩—সাল

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত বাবু ভূপতিনাথ মিত্র দাদামহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু—

শ্রীচরণেষু,

ভূপীদা, চিঠির জবাব দিতে কি হয়? এত ভুলো মন? যে কথাটা পাড়লুম তার কি হ'ল? বাবা তোমার কত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তা তো তুমি জান। তিনি একবার আধবার নয়, কতবার অনুরোধ করেছেন। আচ্ছা, তাঁর কথা নয় ছেড়ে দিলুম, কিন্তু আমি? আমার আবদার? তোমার এই ছোট বোনটির অনুরোধ? তাও শুনবে না? তোমার দুটি পায়ে পড়ি ভূপীদা, আবার ঘর-সংসার কর, অমন ক'রে সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে বনে জঙ্গলে থেকো না। একজন দোষ করেছে বলে সমস্ত পৃথিবীর মেয়েমানুষই দোষী হয়ে থাকবে?

জানি, তোমার সমস্ত বিশ্বাস আর ভালবাসার অপমান ক'রে খুব দাগা দিয়ে সে কুলের বাইরে চলে গেছে। ভাবো না, সে মরে গেছে! তার মত পোড়ারমুখী চুলোমুখী রাক্ষুসীর কি কোনকালে ভাল হবে?—সে ত সত্যিই মরে গেছে।

যাক্, খুব খানিকটা জ্যেঠামি করলুম বোধ হয়! কিন্তু সত্যিই তোমার বনবাস দেখে এক এক সময় বড়ই অসহ্য হয়ে ওঠে, তাই চুপ ক'রে থাকতে পারি নে।

আচ্ছা, ঐ বনবাদাড় ভাল লাগে? আর একজন যিনি গেছেন, তাঁর কেমন লাগছে? সুখী মানুষ, কষ্ট হচ্ছে বোধ হয় খুব?

তোমাদের ডেয়ারী ফার্মের ঘি-মাখন খাওয়ালে না ত—বেশ লোক যা-হোক—কেবল একলা একলাই ভাল জিনিষ খাবে! তা, নিজের তৈরী কি-না। তা আপনার নতুন লোকটি ওদিকে কিছু শিখ্‌লেন টিখ্‌লেন? না, কেবল হৈ হৈ?

আচ্ছা, ওদিকে নাকি খুব পাহাড়-জঙ্গল? বাঘ-ভালুক লুকিয়ে থাকতে পারে না কি? বুনো শূয়োর?—সাপ? তোমার সঙ্গীটির ত শিকারের ঝোঁক খুব—জঙ্গলে খুব যাচ্ছেন ত তিনি? বড় দোষ—কাঠ গোঁয়ারের মত সাহস—ওদিকে একটু নজর রেখো, আমিই বলে কয়ে পাঠিয়েছি কি-না তাই বলছি।

যাক্, চিঠি বড় হয়ে যাচ্ছে। দুটি পায়ে পড়ি, চিঠির জবাব দিও শিগ্‌গীর, কেমন থাক লিখো। আমরা ভাল আছি। আমার প্রণাম নিও। ইতি

প্রণতা ভগিনী
শ্রীঅশোকা রায়

চিঠিখানা হাতে ধরিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত শিশির উহার দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে কখন যে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল এবং 'ভূপীদার' ঔষধ পথ্য দিবার সময় অতিবাহিত হইল, সে দিকে তাহার হুঁস রহিল না!

ব্যর্থ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

হয়নি ত, হ'তে যা পারিত
হ'ল না তা; ঝরিল মুকুলে
ফুটিতে পারিত যাহা ফুলে।
রয়ে গেল অনবধারিত,
হয়েছিনু শুধু প্রতারিত?
অথবা সে নিমেষের ভুলে
তুমি যবে এলে দ্বার খুলে
তোমারে ধরিতে পারিনি ত।

বুঝিনি কি ছিল তব মনে,
এলে যদি মোরে দিতে ধরা
কেন পুন চপল চরণে
হ'লে তুমি পলায়নপরা?
ছল তব? অথবা দ্বিধায়
চিরন্তরে হারানু তোমায়?

মৃত্যু

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

দীর্ঘ এ জীবন শুধু মৌন বেদনায়
কেবল কাটিয়া যায় নিশি-দিনমান,
তারি জ্বালা তিল তিল বিষায় পরাণ,
দুঃসহ ব্যথার তাপে নভ-কিনারায়
কম্পিত আঁখির অশ্রু বাষ্প হ'য়ে যায়,
তাই কি আকাশখানি ঘন মেঘে ভরা?
ভূমিকম্পে শিহরায় পদনিম্নে ধরা?
মোদের বিফল স্বপ্নে বাদল ঘনায়।

কেন এই অকারণ খালি হাহাকার?
সুখ কি মুহূর্ত্ত শুধু বিদ্যুতের মত
ক্ষণিক প্রদীপ্ত হ'য়ে মিলাবে আবার?
কে চাহে এ সুখভ্রান্তি, দুঃখ অবিরত?
তার চেয়ে ভাল মৃত্যু তুষার-কঠিন,
কিবা মূল্য বেঁচে থাকা স্বপ্নসাধহীন?

নববিধানের স্কুল ও শিক্ষায় স্বাধীনতা

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম্‌-এ, বি-টি (ক্যাল্), ডিপ্‌-এড্ (এডিন্ ও ডাব্)

শিক্ষায় স্বাধীনতা বলিতে একেবারে পুরা রকমের স্বরাজ বুঝায় না। রাষ্ট্রের ব্যাপারে সমষ্টির মঙ্গলের সীমানার মধ্যে অস্ত ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের স্বাতন্ত্র্য মানিয়া লইয়া ব্যক্তির যেমন স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়, বিস্তালয়েও তেমনই শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা সীমানার বাহিরে যাইতে পারে না। যেহেতু বিস্তালয়গঠিত চরিত্র বয়োপ্রাপ্তগণকে লইয়া কোন প্রতিষ্ঠান হয়, সেজন্য উহাতে সম্পূর্ণ স্বরাজ হইতে পারে না; সেখানে একজন প্রধান পরিচালক ও শিক্ষকমণ্ডলীর অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেই হইবে। আমার পরিদৃষ্ট পাশ্চাত্যে ও এদেশে বিভিন্ন প্রকারের কয়েকটি স্কুলের চিত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়া শিক্ষায় স্বাধীনতার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

আমেরিকায় জর্জ্জীয় রিপাব্‌লিক নামক সাধারণতন্ত্র স্কুলটি এখন আর নাই। এখানে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ জর্জ্জ ছেলেদের স্বরাজ দিয়াছিলেন। তাহাদের পুলিশ, কোর্ট, বিচারবিভাগ, আইনসভা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সকলই ছিল। একবার তাহারা ধূমপানের স্বপক্ষে আইন পাশ্‌ করে। পরে তাহার দোষ দেখিতে পাইয়া এই আইন সভাতেই তাহা তারা উঠাইয়া দেয়। জর্জ্জ পিছনে থাকিয়া বেশ মজা উপভোগ করিতেন; সকল সময়েই তিনি হস্তক্ষেপ করার দরকার বোধ করিতেন না। এক্ষেত্রে তিনি বুঝিয়াছিলেন—ছেলেরা নিজে হ'তেই আত্মসংশোধনে বাধ্য হবে।

বোলপুরের শান্তিনিকেতনেও কতকটা এই ভাব দেখা যায়। সেখানে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ পিছনে আছেন বটে, কিন্তু তিনি ছেলেমেয়েদের মধ্য দিয়াই স্কুলের কর্ম্মশৃঙ্খলা অনেকটা বজায় রাখেন। তারা অভাব বোধ না করা পর্য্যন্ত কোন নূতন বিষয় তাদের সাধারণত তিনি দিতে চান না। গানের ক্লাস চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন; কিন্তু তখনই যন্ত্রাদির ব্যবস্থা তিনি নিজে হ'তে করিলেন না। পরে কার্য্যক্ষেত্রে যখন তাহারা অভাব বোধ করিয়া তাঁহাকে জানাইল তখন তিনি তাহা তাহাদের জন্য ব্যবস্থা করিলেন। তিনি ছেলেমেয়েদের উপর যতটা বিস্তালয়ের কার্য্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, আমরা ততটা পারি না; কারণ তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনেকটা। কোন ইংরেজী কবিতার অনুবাদকল্পে তাঁহারই অভিপ্সিত বাংলা প্রতিশব্দ পর্য্যন্ত ছন্দোবন্ধে তিনি তাদেরই মুখ দিয়া বাহির করিয়া লইতে পারেন, বা আমরা পারি বলিয়া মনে হয় না। তাঁর ব্যক্তিত্ব পশ্চাতে থাকিয়া যতটা করিতে পারে আমরা তাহা পারি না। বিস্তালয়ে স্বরাজ বা স্বাধীনতা বলিতে অনেক বাঁধাবাঁধি ও সীমা নির্দ্দেশ যে বুঝায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডে রুশো আন্তর্জাতিক স্কুলে দিনের প্রথমার্দ্ধের কাজ লোকালয়ে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগৃহেই সম্পন্ন হয়; দিনের শেষার্দ্ধের কাজ—যার বেশীর ভাগই হাতের কাজের মধ্যে—আল্পস্ পর্ব্বতের সুরম্য পার্শ্বদেশে প্রকৃতির সুষমার মধ্যে ওনেক্স নামক পল্লীতে অবস্থিত বিস্তালয়ের অংশবিশেষে অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলের বাসে করিয়া ছেলে-মেয়েদের সঙ্গেই আমি এখানে আসিয়াছিলাম। এখানে আল্পসের স্বাস্থ্যকর মুক্ত হাওয়া, উপরে তার আকাশের নীলিমা, অদূরে লেক্‌জেনেভার সবুজাভনীলকান্ত জলরাশি ও থাকে থাকে এখানে সেখানে সুরভিনিঃস্বন্দী নীলিমাজড়িত পাইনবলয় বিস্তালয়ের জীবনকে আপনা হ'তেই যেন মুক্তি দিয়েছে, যদিও সেখানে নবপ্রণালীর মহিমায় শিক্ষা পূর্ব্ব হ'তেই খানিকটা মুক্ত। সেখানে ছোট ছেলেমেয়েরা শৈল-গাত্রে গাছের তলায় বা কুঞ্জবনে একটি কুকুরকে ঘেরিয়া কেমন ক্লাশ করিতেছে; কুকুরটি উপলক্ষ করিয়া ছোট প্রজেক্টের মত পাঠই যেন স্বভাবতই তাদের হইয়া পড়িল—আমি তা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম।

এখন বলি, লণ্ডনের বাহিরে বুসী পার্কস্থিত রাজার ক্যানেডিয়ান্ স্কুলের কথা। কাউন্টি কাউন্সিলের বা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের সহায়তায় বা সমর্থ গৃহস্থের হইলে নিজের খরচে দুর্ব্বল ও অসুস্থ ছেলেরা ডাক্তারের পরামর্শমত এখানে আসিয়া কিছুকাল থাকিয়া প্রকৃতির স্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে প্রকৃতির সুরে সুর মিলাইয়া শিক্ষালাভ করে। এখানে ডাক্তার নিয়মিতভাবে ছেলেকে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করেন। জলকেলি, অভিনয়, পক্ষীপালন, গাছপালা লাগান, অল্প অল্প চাষ, সময়ে মুক্ত বায়ুতে ক্লাশ প্রভৃতির মধ্য দিয়া ছেলের শিক্ষা বেশ একটু মুক্তি পাইয়াছে অনুভব করা যায়। এই স্কুল-বাড়ীটি বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে ক্যানাডার সৈন্যদের ব্যারাক ছিল, যুদ্ধের পর তাহারা সম্রাটকে উহা উপহার দিয়া যায়। সম্রাট দুইটি রাজহংসসহ বাড়ীটি বুশীপার্ক স্কুলের জন্য দিয়া দেন।

নর্দ্দাম্‌টন্ সায়ারে আউণ্ডেল বিস্তালয় মহাযুদ্ধের পর সুধিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সেখানে স্কুলের কাজের সঙ্গে সমাজের কাজের সহযোগিতা প্রথমে তার অধ্যক্ষ স্যাণ্ডারসনই সাধন করেন। মহাযুদ্ধের সময় শেল্ বা গোলা তৈরী তাঁর ছাত্রেরাই অনেক করে এবং তাঁর স্কুলেই অফিসার ট্রেনিং ক্লাশ খোলা হয়। এই সকল কাজে এবং যুদ্ধের সময় সৈন্য সংগ্রহের সভায় বক্তৃতা করিতে করিতে অসমতন্ম স্যাণ্ডারসন্ ইহলোক ত্যাগ করেন। এখনও আউণ্ডেল তাঁর স্মৃতিসৌরভে আমোদিত এবং তাঁর আত্মিক বলে অনুপ্রাণিত। সেখানকার কর্ম্মশালায় ছেলেরা এখনও কৃষকদের বস্তু কোদাল, লাঙ্গলের ফাল ইত্যাদি তৈয়ার করে; কৃষি বিষয়ে পরীক্ষা কাজের দ্বারাও কৃষকদের কাজের সাহায্য করে। তারা হয়তো শহরের ইতিহাস সঙ্কলন করিতে বাহিরের লোকের সংস্পর্শে আসে এবং এই প্রসঙ্গে সাধারণের পক্ষে অনেক দরকারী

তথ্যেরও আলোচনা করে। ছুতার বা কামারশালার কাজে হয়তো তাদের কোন কোন দল দুইমাস স্কুলের শ্রেণীর কাজে যোগ না দিয়া কেবলমাত্র হাতের কাজগুলি স্বাধীনভাবে একটানা খাটিয়া শেষ করিয়া ফেলে। হাতের কাজের জন্য এই দুইমাস একভাবে কাজ করিতে না পাইলে হয়তো তাদের কাজ শেষ হওয়ার পক্ষে অসুবিধা হইত।

আবার রাগ্‌বি স্কুলের ছেলেরা যে শুধুই বেশী খেলা করিয়া স্বাধীনতা সম্ভোগ করে তা নয়। সেখানে লাইব্রেরী ও মিউজিয়মে অনেক যুগের শিল্প, স্থপতি বিদ্যার নমুনা এবং অনেক মহাপুরুষের হস্তলিপি ও স্মৃতি চিহ্নাদি রক্ষিত আছে। ছেলেরা সেখানে দল বিভাগ করিয়া এক এক দল এক এক যুগের কাজ বা ইতিহাস বিষয়ের অনুসন্ধানের ফল রিপোর্টের আকারে বাহির করিয়া থাকে। আউণ্ডেলের ছেলেরা বিজ্ঞান বিষয়েও এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া থাকে। শিক্ষায় স্বাধীনতা বা মুক্তি আমরা এইভাবেও অনেকটা বুঝিতে চেষ্টা করি। যে প্রণালী লইয়া এত কিছু, সেই প্রণালীই যে-কোন বিষয় বিশেষ পঠনে যে একমাত্র পথ তা নয়। আমরা দেখিতে পাই, ইতিহাস শিক্ষার বিষয়ে ব্রুসেলস্‌ স্কুলে ডিউইর প্রজেক্ট্‌ প্রণালী অনুযায়ী স্থানীয় ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও প্রকাশ আউণ্ডেল স্কুলের প্রচলিত প্রণালীর সঙ্গে অনেকটা মিলিয়া যায়। ইহার মধ্যে প্রণালীর হেরফের কার্য্যক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ আছেই—তা প্রণালী-বাহুল্যে যাঁহারা পরিচিত নন তাঁহারা সহজে বুঝিতে চাহিবেন না। এবিষয়ে ভূয়োদর্শনই টে্রনিং প্রাপ্ত শিক্ষকের মনোবৃত্তির মুক্তির একমাত্র উপায়। বাঁধা ধরা প্রণালীর বশেই যাইতে হইবে এমন কথা নাই; কথা হইতেছে প্রণালীকে খেলাইয়া শিক্ষার বিষয় শিখাইতে হইবে। শিক্ষককে বহির্দৃষ্টি হারাইয়া অন্তর্দৃষ্টি হইতে হইবে অর্থাৎ কাজের উপাসক হইতে হইবে।

জার্মানীর বন্দর হামবুর্গের নবপ্রতিষ্ঠিত পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়গুলিতে জাতি গঠনের কাজে লাগে এমন (যেমন জার্মানী ও ইংলণ্ডের মৎস্য ব্যবসায়ের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা) তুলনামূলক পাঠদানের মধ্যে ফেলা হইয়াছে। ইহা অন্য ভাবেও শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা হিসাবে সেখানে অনেক সময়েই ব্যবহারিক দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়। প্রবন্ধান্তরে জার্মনীতে 'কার্শেনষ্টাইনারের' 'কুলতুরকুণ্ডে' প্রণালীর মতে এক সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের দিক হইতে পঠনীয় বিষয়বিশেষের আলোচনা উল্লেখ করিয়াছি।

মিসেস্‌ পাকহার্ষ্টের শিক্ষায় অভিনয়-প্রণালীর বিষয় একটু বলি। এই প্রণালীতে বিষয়বিশেষ বা পাঠ্যাংশকে অভিনয়ের মধ্য দিয়া শিখানর ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহাতে ছাত্র বা ছাত্রী অভিনেতা বা অভিনেত্রীভাবে পাঠের বিষয়বিশেষকে সজীবিত করিয়া তুলে। এই ব্যবস্থা অবশ্য প্রতিদিনের কাজে চলিতে পারে না। ইহা পরিমিতভাবে মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হইতে পারে। অব্যাপারীর হাতে পড়িয়া এই প্রণালী শিক্ষাকে হুজুগে পরিণত করিতেই বা কতক্ষণ। তাছাড়া, সকল শিক্ষকের অভিনয়-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তেমন নাই। এই সকল ব্যবস্থা অভিনয় বলিতে যাহা বুঝায় তা নয়। ইহা কতকটা আবৃত্তি শ্রেণীর, বাড়াবাড়ির প্রশ্রয় দেয় না এবং সেজন্য অযথা সময় নষ্টেরও ভয় নাই।

লণ্ডন্‌ কাউণ্টি কাউন্সিলের পরিদর্শক ডাঃ হেওয়ার্ড্‌ আমায় মহাপুরুষের কীর্ত্তি স্মরণোৎসবের মধ্য দিয়া তাঁর আবৃত্তিমূলক Recital প্রণালীর বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞান দিয়াছিলেন। এই প্রণালীর বিষয় এদেশে বিশেষ চর্চ্চা হয় নাই। তবে এই প্রণালী জানার আগে আমার পরামর্শ ক্রমে একবার রাজসাহী কলেজের ছাত্রেরা কৃত্তিবাস স্মরণোৎসব করিয়াছিল। তাতে প্রবন্ধ, কবিতা, গান, বক্তৃতা ও ছোট অভিনয়ও হইয়াছিল। এই সকল প্রণালীর আলোচনাক্রমে দেখা যায়, শিক্ষার নিগড় কথঞ্চিৎ অপসারণই এদের উদ্দেশ্য।

জেনেভার অধ্যাপক ডালক্রোজ যে ইউরিথামিক শিক্ষাপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তা শরীর ও মনের ছন্দোবন্ধে একপ্রকার শারীরিক শিক্ষা বলা চলে। সেখানে ছেলে বা মেয়ে যেন সুরের সঙ্গে তালে তালে অঙ্গসঞ্চালনীছন্দে জীবন্ত মালা গাঁথিয়া তুলে। এখানে শিক্ষায় মুক্তি তো আছেই, তবে তার চেয়ে বেশী মনে হয় শিক্ষায় খেলার ছন্দ।

এখানে ব্রতীবালক অনুষ্ঠানের কথাও একটু বলি। এদের প্রধান কাজ হইতেছে রাজভক্তি ও দেশের সেবায় চরিত্র-গঠন করিয়া পরিশেষে উপযুক্ত নাগরিক হওয়া। এদের ব্যবহৃত পোষাকে ও কোন কোন আচার ব্যবহারে একটি কল্পনার জগতের ছাপ দেখা যায়। তাতে বালক বা কিশোর মনের সামনে রঙ-বেরঙের কল্পনা রাজ্যের দুয়ার খুলিয়া যায়।—মন সেবা-ধর্ম্মের মধ্য দিয়া ব্যবহারিক জগৎ ও কল্পনা রাজ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য লাভে সচেষ্ট রহিয়া পুরিপুষ্ট হইতে থাকে। এখানে একটি সাবধান বাণী আমরা প্রবন্ধান্তরে উল্লেখ করিয়াছি। তা হইতেছে অসভ্য জীবন হইতে আচার অনুকরণে শিক্ষাকে কথঞ্চিৎ তথাকথিত মুক্তিদানের চেষ্টার বিষয়ে।

বাংলার ব্রতচারী সঙ্ঘের কথাও এখানে আলোচ্য। এই সঙ্ঘ শ্রমের মর্য্যাদা, কর্ত্তব্য, ঐক্য, সত্য প্রভৃতির উপর ঝোঁক দিয়া চরিত্রগঠনের জন্য একটি সঙ্ঘ-জীবন সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী। ব্রতনৃত্য কেবল ইহার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান, যাতে শরীর ও মন কর্ম্মের আনন্দময় একটা সুরে সুন্দর স্ফূর্ত্ত বিকশিত হয়। বিগত জাতীয় জীবনসন্ধ্যার মেঠো সুরের একটু আধটু যে এর মধ্যে ধ্বনিত না হয় তা নয়। বাঙালীর গৃহলক্ষ্মী যেন আবার ব্রতনৃত্যে নবশ্রী ধারণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। এখানে চাই কেবল গৃহের অন্তরস্থাপনা, গৃহলক্ষ্মীকে গৃহেই প্রতিষ্ঠা করা, তাঁহাকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া কর্ত্তৃস্থানীয়দের মনোরঞ্জনের চেষ্টা কেবল দুর্ব্বলতার বীজ বপন করিয়া প্রণালীর লক্ষ্য ব্যর্থ করে মাত্র।

আজ কেবল কতকটা জার্মানীর ভাবে আমাদের দেশে বহুস্কুল মিলিয়া একত্র ড্রিল বা ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে সংখ্যাবৃদ্ধির শক্তির সুবিধালাভ ঘটে। জাতীয়ভাবে শিক্ষার ইহা একটি কম জিনিষ নয়। এতে শিক্ষার্থীর মন আরও একটু বিরাট সমগ্রতার ভাবে প্রভাবান্বিত বা অনুপ্রাণিত না হইয়া পারে না। এর উপরে জাতীয় সঙ্গীত বা রজঃগুণাত্মক বাজনা স্বতই তার কিশোর প্রাণকে

সমষ্টিগত কর্ম্মের উত্তেজনার স্তরে মনকে তুলিয়া দিয়া নবভাবে পূর্ণ করে। এই বিষয়ে আমি ১৯২৮ খৃঃ অব্দে আমার শিক্ষাসংস্কার নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলাম।

তারপর বলি, জার্মানীতে মুক্তদেহে কিশোর-কিশোরীর সূর্য্যসেবা। নবগঠিত অতি স্বাভাবিক বিকাশের স্কুল সম্বন্ধে আমরা বেশী কিছু বলিতে চাই না। মাত্র এই বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, মোটামুটি ভাবে নিম্নতর প্রবৃত্তি সংগোপনই মাত্র যখন সাধারণ মানুষের শিক্ষায় ভরসা, যখন ইহার নিরোধমাত্র যোগী-ঋষিগণেরই সাধ্য, তখন বেশী স্বাধীনতার মধ্য দিয়া প্রবৃত্তিবশ কি করিয়া সম্ভব হয়?

এখন শিক্ষাপ্রণালীর কয়েকটি আলাপালা ছাড়িয়া তার ডাল বা কাজের কিছুর অনুসন্ধান করা যাক্। আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডিউইর প্রোজেক্ট্ প্রণালীই আজকাল শিক্ষা জগতে কম-বেশী চলিতেছে। ইহাতে অনুকূল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনের কার্য্যাবলী কতকটা প্রতিফলিত বা কেন্দ্রীভূত করা হয়। ইহারই মধ্যে সাড়া দিয়া বাড়িতে বাড়িতে ভবিষ্যৎ জীবন ক্রমে বিকশিত হয়। স্কুল এখানে ব্যবস্থিত পারিপার্শ্বিক—যার জীবনধারা বাহ্যসংসারের ধারার সহিত যোগরক্ষা করিয়া নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে। আমার বন্ধু মিষ্টার রাইরী কৃষ্ণনগরের অদূরে চাপরায় তাঁর টে্নিং স্কুলে তার পারিপার্শ্বিকের উপযুক্ত করিয়াই কৃষিপ্রজেক্ট্-সমূহ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই প্রজেক্টের কতকগুলি ফসলের সুবিধানুসারে এক এক ঋতু ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয়। প্রজেক্ট্ নীতিতে দরকারমত ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের সমাবেশ হয়। শিক্ষার্থীরা ছোট ছোট দল করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে একই বা ততোধিক বিষয়ের চেষ্টা করে। কর্ম্ম, পর্য্যবেক্ষণ, পুঁথিগত চর্চ্চা, আলোচনা ও রিপোর্ট্ আকারে সংগৃহীত জ্ঞান লিপিবদ্ধ করা, এই সকলই হইল তার অঙ্গ। আমরা কলিকাতা নর্ম্যাল্ স্কুলে স্যাভানা তৃণভূমির জীবমণ্ডলের আলোচনা প্রজেক্ট্ মতে করিয়া বিশেষ সাফল্য ও কাজে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। এ বিষয়ে প্রবন্ধাকারে হস্তলিখিত চিত্র ও বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই যে কাজে গ্রূপ্ বা দল বিভাগ, ইহা কতকটা শিক্ষায় পরিচালনা (supervised study) নীতি হইতে লওয়া। ইহাতে দুজন তিনজন বা ততোধিক করিয়া অভিধান, অন্যান্য পুস্তক বা ঐতিহাসিক দলিলাদির সাহায্য লইয়া একটি নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যাংশ তৈয়ারী করিতে থাকে। আর শিক্ষক ঘুরিয়া ফিরিয়া তাদের স্বাবলম্বী কাজ পরিদর্শন করিতে থাকেন। জার্মানী ও তার নিকটবর্ত্তী কয়েকটি দেশে আজকাল কার্শেনষ্টাইনারের একই বিষয়ে বিদ্যাসমন্বয়মূলক 'কুলতুরকুণ্ডে' নীতি প্রবলভাবে চলিতেছে। রুশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ডিউইর প্রজেক্ট্ প্রণালীরই চলন বেশী। ইংলণ্ডে কোন একটি বিশেষ প্রণালীর প্রাধান্য দেখা যায় না। সেখানে প্রত্যেক স্কুলের একটি নিজস্ব বিশেষত্ব অল্প-বেশী লক্ষ্য করিয়াছিলাম; কিন্তু ফ্রান্সের সেই সেকালের গ্রীসের জিমনাসিয়াম্ শিক্ষার কড়াকড়ি ভাব এখনও বেশ একটু প্রবল। সেখানে খেলাধূলার তাদৃশ স্ফূর্ত্তি বা শিক্ষায় তেমন আনন্দ দেখিলাম না। জার্মানীর অন্তর্বর্ত্তী শৈলময় প্রদেশে উইজ্রার নদীর তীরে, কার্লশাফেন্ পল্লীতে গ্যামা প্রণালীতে ইংরেজী শিক্ষার ক্লাশ দেখিলাম, ইহা কোন বিষয় অবলম্বনে আলোচনাক্রমে ভাষাশিক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর মধ্যে একটা প্রণালী থাকা চাই। আলগা গল্প করা, ফাঁকী দেওয়া বা উপরওয়ালাকে খুশী করাই এখানকার শিক্ষকের দৃষ্টির বিষয় নয়।* জাতিগঠন, মানবগঠন, কর্ত্তব্য বা ভগবানের কাজ করা এর যে-কোন একভাবে অনুপ্রাণিত এদের কর্ম্ম; সুতরাং এসব শিক্ষাগুরু—যাঁরা উপরওয়ালার ভয়ে তটস্থ নন, কিন্তু কর্ত্তব্য সম্পাদনের ত্রুটির ভয়ে সদাচিন্তাগ্রস্ত—বাস্তবিকই লোকের শ্রদ্ধা ভালবাসার পাত্র ও আমাদের নমস্য। উপরওয়ালা পরিদর্শক পর্য্যন্ত আসিয়া এঁদের সঙ্গে মিশিয়া সাময়িকভাবে কর্ম্মানন্দ বা জ্ঞানানন্দ উপভোগ করেন। আর আমাদের দেশে কোথায় সেই কর্ম্মানুরাগ বা কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কোথায় বা সেই জ্ঞানের দিকে সশ্রদ্ধ অভিগমন!

স্থান পরিদর্শনের সঙ্গে ম্যাপ্ আঁকা বা পূরণ করা বা তৎসম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া আলোচনার পর তাহা লিপিবদ্ধ করার প্রণালী লিপ্লেহাউসের আলেকজাণ্ডার ফার্কার্সন্ সাহেবের ক্যাম্পে থাকিয়া আমি শিখিয়াছিলাম। এই প্রণালীতে কাজ সম্পন্ন করিতে পারিলে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। ইহা অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধদের জন্য। কিন্তু স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে ইহাকে উপযোগী করিয়া পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া চলে। তাতে পরিদর্শন ও বিবরণ বেশী প্রাধান্য লাভ করিবে। আমার ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ফিন্ সাহেব কতকটা এই মতে পরিদর্শনের মধ্য দিয়া প্রাথমিক ভূগোল শিক্ষার ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই প্রণালীতে আমি স্থানীয় ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছি ও পশুশালার জানোয়ারের বিষয় আলোচনা করিয়াছি।

হিউরিজম্ বা আবিষ্ক্রিয়ামূলক প্রণালীর বিষয়ে এখানে সামান্য উল্লেখমাত্র করিলেই চলিবে। এই প্রণালীতে শিক্ষার্থী বয়সে কিশোর। তাকে কোন একটি সত্যকে অনুসন্ধানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে বলা হয়। এতে তার আত্মবিশ্বাস বাড়ে। এই প্রণালীমতে সময় সময় কিছু কিছু কাজ করিতে দিলে একেবারে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার লাগিবে তা বলা যায় না। উপকরণ ও নামের বিভীষিকাই আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অন্যতম অন্তরায়; প্রকৃত শিক্ষার অভাব তো আছেই। আজকাল ডল্টন্ নামে যে প্রণালীর কথা নবপ্রণালীবিৎরা বলিয়া থাকেন, তাও কার্য্যক্ষেত্রে ফলপ্রদ বলিয়া মনে হয় না। কারণ, কোন সময়ের মধ্যে পাঠপ্রস্তুতের চুক্তি অপেক্ষা দৈনিক অভ্যাস অনুযায়ী কার্য্য করাইয়া লওয়াই অন্ততঃ এদেশে সমীচীন। যখন ছেলেমেয়েরা অগঠিত ও তাদের বেশীর ভাগই আপাতসুখ চায়, তখন তাদের উপর বোঝা ফেলিয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হয় না। এই সব প্রণালীর বিষয়ে তারাই বেশী মুখর—যাদের আসল বিষয়ে জ্ঞান তত গভীরতা লাভের সুযোগ পায় নাই।

* জেনেভাতেও বার বৎসর বয়স হইতে কতকটা এই প্রণালীতে ইংরেজী শিখান হয়।

শিশুশিক্ষার মণ্টেসেরী, কিণ্ডারগার্টেন ও ডিক্রোলী প্রভৃতি প্রণালী বেশ প্রচলিত আছে। প্রথমোক্ত দুইটি প্রণালী অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিশুর পক্ষে ততটা সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয় না। তবে এই প্রণালীর কতক কতক তাদের শিক্ষাকেও রঞ্জিত করিতে পারে। মণ্টেসেরী সাধারণতঃ প্রায় চারি বৎসরের শিশুর জন্য; কিণ্ডারগার্টেন্ সাধারণত পাঁচ হইতে সাত বৎসরের শিশুর জন্য; আর ডিক্রোলী আট হইতে দশ বৎসরের শিশুর জন্য প্রশস্ত। মণ্টেসেরী মতে শিশু তার খেলাঘরে বেশী স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতে পায়। সে যেন তার দ্বিতীয় বাড়ীতে খেলাধূলার ছলে সাজসরঞ্জামের সাহায্যে লেখাপড়া ও গণনাতে প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করে। শিক্ষয়িত্রী তার মা বা বড় বোনের মত রক্ষণাবেক্ষণ করেন ও যে সময়ের যে খেলা বা খেলার ছলে কাজ তাতে তাকে নিযুক্ত করেন ও দেখেন। এখানে পিয়ানোর সুরের সঙ্গে তালে তালে পদক্ষেপে নিয়মিত পদচালনা শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বস্তুতন্ত্র-ভাবে অক্ষরসংখ্যাদির পরিচয় পর্য্যন্ত শিশুজীবনের আনন্দ বজায় রাখিয়া সাধিত হয়। প্রাতে দুগ্ধ পান, মধ্যাহ্নে পরিপাটি শয্যায় শয়ন পর্য্যন্ত এখানে কেমন সুন্দর সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হয়। কিণ্ডারগার্টেন বা শিশু-উদ্যানে স্বাধীনতার অল্প সঙ্কোচ লক্ষিত হয়। শিক্ষার ও প্রণালীর অনুরোধে সেখানে খেলার সামগ্রী কিঞ্চিৎ স্বাভাবিকতা ত্যাগ করে; সেখানে জ্যামিতির প্রভাব স্বভাবের আকার-প্রকারকে কথঞ্চিৎ খর্ব্ব করিয়াছে, কিন্তু ডিক্রোলী প্রণালীতে শিক্ষাসামগ্রী অধিকতর জীবিত ও বাস্তব। এস্থলে গাছপালা ও ছবি প্রভৃতি উপকরণ অধিকতর মনোরম। এই প্রণালী মতে ছবি প্রভৃতির সাহায্যে অক্ষর কাব্যাদি শিখান হয়। ইহাকে ছবি-বাক্য-মিলন প্রণালী বলা চলে।

নববিধানের যাবতীয় প্রণালীর মধ্যে একটি বিষয় সব চেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায়; তা হইতেছে শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন। শিশুর ভাল-মন্দ সহজাত বৃত্তিগুলি ধরিয়াই তার ব্যক্তিত্বকে বুঝিতে হইবে ও সেই মত তার কতটা প্রবৃত্তি অনুসরণ করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তার ব্যক্তিত্বকে লম্বা রজ্জু দিয়া নয়, পক্ষান্তরে দলিত মথিত করিয়াও নয়, সামাজিক আদর্শমত গঠিত বিকশিত করিতে হইবে। কতকটা তার প্রকৃতিকে বশ করিয়া তার সাহায্য লইয়া অগ্রসর হইতে হয়। সে যদি ভ্রমণশীল হয় তবে পরিদর্শনের মধ্য দিয়া বা বেশী খেলা ভালবাসিলে খেলার মধ্য দিয়া, অল্প বুদ্ধি বা কর্ম্মপ্রিয় হইলে হাতের কাজের মধ্য দিয়া তার শিক্ষাবিষয়ে মন বসাইতে হইবে। রুশো বলিয়াছেন—'প্রকৃতি অনুসরণ কর।' এর মানে এই নয় যে, শিশুকে কাঁধে তুলিতে হইবে—মানে এই যে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিশুর মনোবৃত্তি বিকাশের নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ও স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিকের সৃজন করিয়া যথাসম্ভব শিক্ষাপথে অগ্রসর হওয়া। পূর্ব্বেকার বিধানে শিশুর শক্তি সামর্থ্য প্রভৃতি কিছুরই প্রতি দৃষ্টি ছিল না। তখন ছিল সমাজের দরকার মত ও শিক্ষক মহাশয়ের সুবিধা ও খেয়ালমত বিষয় শিখাইতে হইবে। রুশোর পর হইতে সুর ফিরিল। লোকে তখন শিশুমনের দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করিল। কিসে শিক্ষা জিনিষটা বাঘের ভয়ের মত না হইয়া হৃদয়গ্রাহী হয় এই চেষ্টা হইল সকল শিক্ষাভাবুকের ও ব্যবস্থাদাতার। রুশোর শুরুভাই হার্ব্বার্ট ফ্রোবেল প্রভৃতি পেষ্টালট্‌সী মন্ত্রে দীক্ষিতগণ ও তাঁর সুরের অনুসারী বা ইঙ্গিতগ্রহণকারী লক্-স্পেন্সার প্রভৃতি সসীম স্বাধীনতার মাঝে শিক্ষায় ব্যক্তিত্বের বিকাশের প্রস্তাব লইয়া শিক্ষাজগতে আবির্ভূত হইলেন। তার পর নববিধানে নূতন নূতন প্রণালী ও ব্যবস্থার কথা দিকে দিকে প্রচারিত হইল। শিশুশিক্ষায় নবযুগের উদয় হইল। এক্ষেত্রে শিশুর প্রকৃতি অনুসরণ এই ভাবে ঘটিল :ও তদুপরি ক্রমে তার অনুকূল বেষ্টনীর মধ্যে বিকাশের জন্য প্রণালী অনুসারে কমবেশী স্বাধীনতাও খানিকটা স্বীকৃত হইল। এই স্বাধীনতার স্বরূপ কি তা বিভিন্ন প্রণালীর আলোচনাক্রমে অনেকটা বুঝা গিয়াছে।

এই আলোচনার উপসংহারক্রমে একটা মজার কথা মনে পড়িল। আমাদের বাড়ীর পাশে সতীশ হাড়ি রাত বারটার সময় বাসায় ফিরিয়া শয্যায় বক্তৃতা দিতেছে শুনা গেল,—'আরে বিটি শুনেছিস্, বোলপুরে গাছের ডালে স্কুল হয়। সেখানে মাষ্টার তলায় বসে আর ছেলেরা ডালে বই হাতে ক'রে চড়ে।' শিক্ষায় স্বাধীনতার কথা ভাবিতে গিয়া আমরা কমবেশী এইরূপ কোন ধারণা করিয়া না বসি। কারণ শিক্ষিত হইলেও ক্ষেত্রবিশেষে মন আমাদের দুর্ব্বল, আত্মপ্রবঞ্চনাশীল বা সত্যগ্রহণে অক্ষম থাকে। আমাদের দেশে অনেক শিক্ষকই নববিধানের চিন্তায় বিভোর হইয়া বা দুর্ব্বলতা ঢাকিতে কিম্বা উৎকোচস্বরূপ অতিরিক্ত স্বাধীনতা দিয়া আত্মহারা হইয়া পড়েন; ফলে স্কুলগুলিতে স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার হাওয়া বেশ একটু ঢুকিয়াছে; শিক্ষায় গম্ভীরতার অন্তর্ধান হইতে বসিয়াছে। প্রণালীর নামে এখন চোখে ধুলি, শিশুর অন্তরে নিবেশের দৃষ্টি এখন বাহ্যভাবে উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র, ভূদেবচন্দ্র, অজিতনাথ, কামাখ্যানাথ প্রভৃতি সরল জীবন সাদাসিদে শিক্ষার জীবন্ত মূর্ত্তির স্থলে এখন বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন একশ্রেণীর নবশিক্ষক সম্প্রদায় আজ শিক্ষার মুক্তিদাতারূপে আবির্ভূত।

পরিশেষে বক্তব্য যে, স্বাধীনতা বলিতে পাশ্চাত্য স্কুলসমূহ যা বুঝেন তাও এখানে নিয়ন্ত্রিত করিয়া গ্রহণীয়। কারণ, এখানে শিক্ষক বা ছাত্র এবং ছাত্রের স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক, গৃহ ও বান্ধবমণ্ডলী কখনও প্রকৃত মুক্তির মর্ম্ম জানে না; কারণ ব্যক্তি ও জাতি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। এক্ষেত্রে অপরিণত অবস্থায় অসীম মুক্তিদানের অপব্যবহার হইতে সাবধান হইতে হইবে। যাদের লইয়া কাজ তাদের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি চারিত্রিক বিকাশ, জলবায়ুর প্রভাব হেতু শারীরিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ও বাহিরের হাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া শিক্ষায় বিশেষ বিশেষ প্রণালী প্রয়োগে স্বাধীনতার মাত্রার ব্যবহার করিতে হইবে। নব নব প্রণালীর অটুট প্রয়োগ কখনই এদেশের অবস্থায় যুক্তিযুক্ত নয়। এই সকল প্রণালী হইতে মাত্র প্রয়োজনমত ইঙ্গিত, বীজমন্ত্র বা সুরগ্রহণ করাই সমীচীন ব' ক্ষেত্রবিশেষে আংশিক গ্রহণও চলে। কারণ, শিক্ষা জাতির অন্তস্তল হইতে স্বাভাবিক বেষ্টনীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে গড়িয়া উঠিবার জিনিষ; ইহা একরাত্রির মধ্যে মন্ত্রের বলে বিকশিত ও ফলবান হইবার নয়।

প্রতীচ্যে ও প্রাচ্যে নব্য রূপচর্চ্চা

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

এবারের নিউ ইয়র্ক প্রদর্শনীতে চিত্রশিল্পী স্যাল্‌ভাদর দালি যে সব রচনা উপস্থিত করেছেন তাতে সকলের একটা বিস্ময় জন্মেছে। এক সময় ইউরোপ বাস্তবতার বড়াই করত—গ্রীক ও রোম্যান শিল্পের দোহাই দিয়ে। অথচ আজ বাস্তবতার সুমেরু হ'তে অবাস্তবতার কুমেরুতে ইউরোপ ও আমেরিকা তাঁবু খাটিয়েছে। জগতে প্রশ্ন উঠেছে—ততঃ কিম্? সামনে মডেল রেখে যারা চুলচেরা বাস্তবতাকে চিত্রার্পিত করত আজ তাদের সে প্রেরণা কোথায়? শিল্পী কন্‌ষ্টেবল্ উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বলেন—Imitate nature, in that way lies your salvation প্রকৃতিকে নকল কর—তাতেই তোমাদের মুক্তি। আজ বিখ্যাত শিল্পী Ceranne বল্‌ছেন—প্রকৃতির ভিতর সব এলোমেলো এবং তাতে বিস্তর ভুল রয়েছে—শিল্পীদের চিত্রে তা সংশোধন করতে হবে। এ হ'ল বিপরীত অনুভূতি! এই অনুভূতির যুগ এসেছে।

ইউরোপের প্রাচীন সমুত্থান যুগ (Renaissance) এই বাস্তবতাকে এবং ইন্দ্রিয়জ জড়ত্বকে মুখ্য প্রতিপাদ্য ব্যাপার মনে করেছিল। ফলে র‍্যাফায়েলের খ্রীষ্ট গ্রহণ করেছে নাটকের অভিনেতার রূপ এবং মাইকেল এঞ্জেলোর খ্রীষ্ট হয়েছে একজন স্যাণ্ডোর মত পালোয়ান। এসব রচনায় প্রতিটি মাংসপেশী সুচারুভাবে বিম্বিত হয়েছে। অথচ মানুষ শুধু মাংসের সমষ্টি মাত্র নয়—মনেরও পেশী আছে এবং এমন কি, তুরীয় পেশীও মানুষ নিজের অধ্যাত্মজীবনে উপলব্ধি করে। 'চক্ষুর চক্ষু' দ্বারা এসব দেখা যায়, কিন্তু ইউরোপ এরকম চোখের খবর রাখে না। যা চোখে দেখা যায় না, তাকে নিয়ে ভাব্‌তে সে দেশ প্রস্তুত নয়।

অথচ এরকমের জড়ময় কো.ষ ইউরোপের বহুদিন থাকা সম্ভব হয় নি। সম্প্রতি আমেরিকার স্যান্‌ফ্রানসিস্কো প্রদর্শনীতে শিল্পী দালি যে অর্ঘ্য দান করেছেন তা সমগ্র পশ্চিম ভূখণ্ডে একটা তোলপাড় উপস্থিত করেছে। দালির দান অপ্রাকৃত ও অবাস্তব।—শুধু তাই নয়, যে সব মত্ততার সীমান্ত স্পর্শ ক'রে এনেছে এক অট্টহাস্য, তাতে যান্ত্রিক সভ্যতাও অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। জগতে চিত্রকর দালিই যে সবচেয়ে বিস্ময়জনক ব্যক্তি একথা বার বার স্বীকৃত হয়েছে। বস্তুত, দালি প্রমাণ করেছে, হুবহু সত্যের যুক্তি ও তথ্য অতি যৎসামান্য ব্যাপার—তার বাইরেই জগতের বৈচিত্র্য ও রহস্য!

তরল মহিলাদ্বয়—শিল্পী—দালি (নিউ ইয়র্ক প্রদর্শনীর সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর সৃষ্টি)

একথা স্বীকার করতেই হবে, ইউরোপের ও আমেরিকার বিরূপ রূপের প্রতি এই আসক্তির সঞ্চার হয়েছে—প্রাচ্য সাধনার সংস্পর্শ হ'তে। ইউরোপের রূপের অচলায়তন ভেঙেছিল দুটি জাপানী চিত্রকর হিরোসিগে ও হোকুসাই। এঁরা বৌদ্ধ সভ্যতা ও শীলতার পরিণত প্রসূন। বুদ্ধদেব ঐহিক আয়োজনকে ত্যাগ ক'রে অগ্রসর হয়েছিলেন। রাজার ছেলে

ভোগের জড় আয়োজনকে বর্জ্জন ক'রে অতি-প্রাকৃত সত্য খুঁজেছিলেন—অন্তরের ভিতর। কাজেই চোখ্‌কে বহিরঙ্গ বস্তু থেকে অন্তরঙ্গ বস্তুর দিকে আকর্ষণ করা হয়। ফলে ভারতীয় চিন্তায় যে সত্যকে 'হিরণ্ময় পাত্রে'র দ্বারা আবৃত বলে' কল্পনা করা হয় তারই সাক্ষাৎকার হয়েছিল। বৌদ্ধ সভ্যতা এই অজর ও অমর বস্তুকে আলঙ্কারিক ক'রে তোলে জীবনের সকল সম্পর্কে। তাই স্থূল জড়রূপের ভিতরও এই সূক্ষ্ম পুলক একটা মাধুর্য্য বিস্তার করেছে। এজন্য চিত্র ও ভাস্কর্য্যে বিষয় বা বস্তু হয়েছে উপলক্ষ মাত্র—লক্ষ্য নয়। বিষয়কে অবলম্বন ক'রে সত্যিকার রসব্যাপারকে মঞ্জরিত করা হয়েছে। ফলে চিত্রকলার সুষমা দাঁড়িয়েছিল অবাস্তব

ছাতার ছাদ (৫৮ খানি ছাতা আছে) নিউইয়র্ক প্রদর্শনী—শিল্পী—দালি

বর্ণকুহেলি ও রেখাপুলকের অঙ্গাঙ্গী অপ্রাকৃত রূপাবর্ত্তে। এজন্য জাপানী চিত্রগুলি যখন ইউরোপে রপ্তানি হয় তখন প্রতীচ্য রসিক মুগ্ধ হয়ে দেখ্‌ল এক নূতন বিধান! বাস্তবকে অনুকরণ একটুও নেই—অথচ সব দৃষ্টি রসে ভরপুর!

ইউরোপ বাস্তবকে অনুকরণ না ক'রে এই অবাস্তবের মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সমগ্র চিত্রপদ্ধতি বিপর্য্যস্ত হ'ল। খুঁটিনাটি রেখাবিতান অদৃশ্য হয়ে গেল। আভাসপন্থীরা (Impressionist) কয়েকটা বর্ণের প্রলেপ ও স্তরে সমগ্র চিত্রকে পর্য্যবসিত করল। পরবর্ত্তী ঘনপন্থীরা (Cubist) দ্রব্যের ঘনত্বের ভিতর দিয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে ভাবলে রূপচর্চ্চার ভিতর এই রসবস্তুকেই উপস্থাপিত করতে হবে—যদিও বাস্তবকে অনুকরণের চোখে এর সন্ধান পাওয়া যায় না। পিকাসোর (Picasso) বেহালাবাদিকা কয়েকটি উচ্চ-নীচ ঘনস্তরের সমষ্টিমাত্র, চর্ম্মচোখে এসব তুনিয়া দেখা যায় না। এমনি ক'রে অবাস্তবের সোনার হরিণের পেছনে ছুটে ইউরোপ এক অরাজক রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে—যেখানে ছন্দ আছে অথচ শৃঙ্খলা নেই, রস আছে অথচ কোথাও তার কোন সীমান্ত নেই। সবই যেন এলোমেলো ও উদ্ভট। ইউরোপীয় দর্শন যেমন প্রত্যক্ষের

শিল্পী দালি ও খাঁচা মানুষ—নিউ ইয়র্ক প্রদর্শনী

উপর নির্ভর এবং Categoryর দোহাই দিয়ে ইস্পাতের (steel frame) কাঠামোর সাহায্যে তৈরী পথে চলে এসেছে এবং পরে 'Anti-intellectual'-তত্ত্বের দোহাই দিয়ে বুদ্ধির অবলম্বনকে প্রত্যাখ্যান করেছে—ইউরোপের রম্যকলাও তেমনি বস্তুতন্ত্র রচনা প্রত্যাখ্যান ক'রে সূক্ষ্ম রসতন্ত্রের আধারকেই বরণ করেছে।

এরিক গিল্ প্রমুখ ইউরোপীয় শিল্পীরা প্যারিস ও লণ্ডনে রক্ষিত ভারতীয় মূর্ত্তি-সংগ্রহকে বিশেষ যত্নের সহিত অধ্যয়ন করে। এজন্য তাদের রচনায় 'নির্গুণ রূপের গূঢ় প্রেরণা

সমগ্র সৃষ্টিকে ভরপুর ক'রে তোলে। রোদ্যাঁর সৃষ্টি এক সময় স্পষ্টভাবেই গ্রীক ও রোমক আদর্শ প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রতিবাদ শুধু একটা বাইরের কথা মাত্র যে নয়, তা পরবর্ত্তী শিল্পচেষ্টা প্রমাণিত করেছে। কারণ পরবর্ত্তী আর্নষ্ট প্রমুখ শিল্পীরা একটা অতিপ্রাকৃত শিল্পচক্রই সৃষ্টি ক'রে বসেছে। এ শ্রেণীর অতিপ্রাকৃত চিত্রকলার প্রবর্ত্তক হচ্ছেন শিল্পী জর্জিও-ডি-চিরিকো। এঁর পিতা ও মাতা হচ্ছেন ইতালীয় এবং জন্ম হয়েছিল গ্রীসে। দালি, আর্নষ্ট-আর্প প্রভৃতি শিল্পীরা এই চক্রকে আবর্ত্তিত ক'রে আস্ছেন আজ পর্য্যন্ত।

এঁরা বলেন, মনের গহন বনে চিন্তাপ্রবাহ লীলা করছে সত্যিকার রূপে। এসব চিন্তা স্বতঃস্ফূর্ত্ত শৃঙ্খলহীন ও অকুণ্ঠিত। আমরা এ সবকে শাসনে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ভদ্র-বেশে উপস্থিত করি বাইরের সমাজে। বাইরের সমাজের শাসন, ভদ্রতা, আচার ও কঠিন বিধির আইন মানুষের চিন্তাকে বন্দীর মত দাঁড় করায় জনতার সাম্‌নে। অথচ মানুষের ভিতরে মনের পর্দ্দার ভিতর অর্গলহীনভাবে এসব ছুটাছুটি করে। কাজেই সত্যিকার স্বাধীন চিন্তা খুঁজতে হবে মানুষের হৃদয়ারণ্যে, বাইরের কৃত্রিম রচনায় নয়—এ হ'ল এসব শিল্পীদের মত।

দেরাজের সহর (City of Drawers) শিল্পী দালি

এমনি ক'রে এই চক্র আজ পর্য্যন্ত পশ্চিমের শিল্পকে উদ্‌ভ্রান্ত ও উল্লোল ক'রে তুলেছে। স্যাল্‌ভাদর দালি নিউ ইয়র্কের বিশ্ব মেলায় আবার এই প্রসঙ্গে এক শ্রেণীর জীবন্ত চিত্র উপস্থাপিত করেছে। নানা রকম দৃশ্যপট, আসবাব ও আবেষ্টনকে জড় ক'রে ক্যানভাসের পরিবর্ত্তে সত্যিকার বস্তুর সাহায্যে এসব রচনা করা হয়েছে —যাতে করে' সকলে এ সকল 'round' ও 'real' ছবির ভিতর ঢুকতে পারে। এটা এই চলচ্চিত্র যুগের একটা নূতন অভিযান সন্দেহ নেই।

দালির এই অভিনব উপঢৌকন এসব শিল্পীর ধারাকে জমাট করেছে সন্দেহ নেই। চিরিকোর ওরাক্‌ল-এ মানুষ নেই, আছে ঐশী ইঙ্গিত; এই ইঙ্গিতের জন্য দুটি চোখের প্রয়োজন হয় না—মাত্র একটি হ'লেই চলে—তাই শিল্পী একটি একচোখো মূর্ত্তি রচনা করেছেন। মেষ্ট্রোভিক্‌ম্ মাতৃমূর্ত্তি খুঁজতে গিয়ে আদর্শ পেয়েছেন নিগ্রো রচনায়, তাতে মানবীয় লালিত্য নেই—আছে নিরেট মায়ের রস-শ্রী। অবান্তর রূপের কুহক সৃষ্টি ক'রে নারীর দেহ সুষমার সাহায্যে চিত্তকে প্রলুব্ধ ক'রে তাকে মায়ের দোহাই দিয়ে পার ক'রে দেওয়ার খলতা এতে নেই। এতে

পাখী শিল্পী—আর্ণষ্ট

উৎসব শিল্পী—হি উই

প্রতীক-হিসেবে এ মূর্ত্তির তুলনা নেই, অথচ এই মূর্ত্তিই এ যুগের যথার্থ দ্বারপালস্থানীয় 'বিরুঢ়ক' ও 'বিরূপাক্ষে'র যুগ চলে গেছে! হেন্‌রি মুরের 'মা' একেবারে abstract সৃষ্টি। নিগ্রো না হ'লেও এ 'মা' বিশুদ্ধ রূপে মণ্ডিত—মন হরণের কোন কুহেলি এ মূর্ত্তিতে নেই—এমন কি, ঠিক মানুষের বা নারীর আকারেও এই মূর্ত্তি কল্পিত নয়। একটা অসীম দূরগামী দীপশিখার মত সমগ্র প্রাণী-প্রবাহের মাতৃত্ব যেন নিষ্কম্প হয়ে আছে মনে হয়। অপর দিকে শিল্পী এপ্‌ষ্টাইনের 'আদম' বিলেতে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করে। অসংখ্য জনতা এসে এ মূর্ত্তিকে দেখে—কেউ হাসে, কেউ বা ভ্রূকুঞ্চিত করে। রসিকেরা বলে, এরকম একটা মূর্ত্তি মাথার ভিতর থেকে বার করা সহজ কর্ম্ম নয়। মূর্ত্তিটির যেন জাতি নেই। সভ্যও নয়, অসভ্যও নয়, নিগ্রোও নয়—একটা যেন Common humanity'র প্রতিমা স্বরূপ। এজন্যই তাকে বলা হয়েছে 'আদম' বা প্রথম মানব।

বর্ণ, তরল রূপ, জাতিনিরপেক্ষ মাতৃত্বের শীর্ষেই জয়মাল্য অর্পিত হয়েছে। অপর দিকে এপষ্টাইনের যন্ত্রশক্তি নিয়েছে একটা দানবের আকার। বিপুলতা, দৃঢ়ত্ব ও নির্ম্মমতার

দেবধ্বনি (oracle) শিল্পী—চিরিকো

হিউইর উৎসব চিত্রে আছে এক অদ্ভুত সমবায়। কাক, মানুষ, হ্যাট, কুকুর, পিপে, খাঁচা—সব মিলে এক তুমুল পাকচক্র। এরকমের বিরূপ রূপ রচনা করাই আধুনিক নব্য-চিত্রকলার বাহাদুরী, এতে বস্তুতন্ত্র কিছুই নেই। আর্নষ্টের কুটীরের ও উপবিষ্ট মানুষগুলির অপর দিক হতে দেখলে মনে হয় যেন একটি প্রকাণ্ড মুখোস মাটির উপর পড়ে আছে। ব্যাপারটি একটি পরিহাসের ব্যাপার হয়ে পড়েছে—এরকম অবান্তর তামাসা ক'রে শিল্পী বাস্তববাদকে বিদ্রূপ করেছেন।

স্তজানের 'স্নানার্থিনী'তে সমস্ত রেখাগুলিকে অবাস্তবরূপে সংযত করা হয়েছে। এই প্রসিদ্ধ শিল্পী বলেন যে, প্রকৃতির ভিতর রেখায় সৌন্দর্য্যগত সামঞ্জস্য মোটেই নেই—

শিল্পীকে চিত্রের ভিতর সে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে হয়। কাজেই এ ছবিতে সে চেষ্টা করা হয়েছে!

এক্ষেত্রে শিল্পী দালি সকলকে হতশ্রী ক'রে দিয়েছে। দালির City of Drawers-এ মানুষ আছে ও drawers‌ও আছে—অথচ তার নাম দেওয়া হয়েছে 'শহর'! এসব রচনাকে sur-real বা অতি-বাস্তব বলা হয়েছে। নিউ ইয়র্ক বিশ্বপ্রদর্শনীতে (World's Fair) দালি যে সমস্ত অতি-বাস্তব দৃশ্য-সংগ্রহ উপস্থিত করেছেন তাতে সমগ্র আমেরিকায় একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

মাতৃ-মূর্ত্তি (এ যুগের শ্রেষ্ঠতম ভাস্কর মেট্রোভিক্‌স্)

দালির প্রথম প্রদর্শনী হয় প্যারিসে—১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে। সে প্রদর্শনী একটি বোমার মত সকলের তাক্ লাগিয়ে দেয়। আন্দ্রে ব্রিতঁ ফ্রান্সে এই রকমের চিত্র চালাবার বিশেষ চেষ্টা করেন। কোন সমালোচক বলেন :—"Like the I. R. A. bomb campaign sur-realism has kept on banging away here and banging away there—in Paris, in Zurich, in Copenhagen, in Tokyo, in London, in New York to shock us back into 'reality!'

আদম (Adam) শিল্পী—এপ্‌ষ্টাইন

দালি বলেন, আমাদের মগ্নচৈতন্যের ভিতর মৃত্যু, দেশ, কাল প্রভৃতি ধারণা বায়বীয় তরল অবস্থায় ঘোরাঘুরি

কাওয়াবাটা শিল্পী—রুইসী

করে। 'The subconscious is expressed in the vocabulary of the great vital constants, sexual instinct, feeling of death, physical notion of the enigma of space.' এ হ'ল দালির কথা। শিল্পী আরও বলেন, 'The only difference between myself and a mad man is that I am not mad !' বস্তুত, এই মনোবৃত্তির সাহায্যে যে সমস্ত চিত্র-মূর্ত্তি বা দৃশ্য রচিত হয় তাতে বাস্তবতার দোহাই থাকা সম্ভব নয়, অথচ এই অবাস্তবতা প্রাচ্য অবাস্তবতা নয়; গীতিমূলক প্রতিবাদ থেকেই এই

প্রলোভন শিল্পী—বেকম্যান

শ্রেণীর রচনা আবির্ভূত হয়েছে। মেট্রোভিক্সের মাতৃ-মূর্ত্তির লীলায়িত দেহভঙ্গ আদিম খ্রীষ্টানদের catacombs-এর রচনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অজন্তা, মধ্য এসিয়া বা সহস্র বুদ্ধ গুহার রচনায় এরকম অবসন্ন কারুতা লক্ষ্য করা যায় না। এপষ্টাইনের আদম-এর প্রগল্‌ভ সারল্য ইউরোপীয় শিল্পের ইতিহাসে একটা অধ্যায় রচনা করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রাচ্য পল্লীশিল্পের মৃদ্‌রচনায় যে স্নিগ্ধ আবেশ, সরল আবেষ্টন ও পুলকিত প্রাচুর্য্য দেখতে পাওয়া যায় তা ইউরোপ ও আমেরিকার প্রতিবাদমূলক সৃষ্টিতে পাওয়া যায় না। এসব সৃষ্টি চায় মনের ঝিল্লিকে আঘাত করতে এবং আঘাত করে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে। সত্যিকার কোন গভীর ডাক এতে নেই। যান্ত্রিক যুগের আসবাব ত ভীষণ। এক একটা এঞ্জিন-ঘরের ভিতরে যে সমস্ত অতিকায় দৈত্যের মত বিপুল যন্ত্রবাহু ও চক্র আছে সে সব আর্টে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। এ সমস্তের ভিতর সৌন্দর্য্যের কোন শাসন নেই—আছে প্রয়োজনের ও ব্যবহারের খাতির। দালি প্রমুখ শিল্পী প্রাচীন বাস্তবতাকে ভেঙে যা রচনা করেছেন, তা নতুন বাস্তবতার সঙ্গে তাল রক্ষা করেছে। সে বাস্তবতা হচ্ছে ভাঙবার—গড়বার নয়। এ যুগ ভাঙবার যুগ—এ যুগের পদ্ধতি হচ্ছে মিশ্র, কাজেই অতি-বাস্তববাদীরা এই ভঙ্গুর মনের ছন্দ রচনা ক'রেই চলেছে। 'ছাতার ছাদ' দৃশ্যটি এবারের

নারী শিল্পী—পিকাসো

নিউইয়র্ক প্রদর্শনীতে দেখান হয়েছে। আটান্নটি ছাতার সাহায্যে এ ছাদ তৈরী হয়েছে। ছাতাগুলোর মাঝখান-টায় একটা টেলিফোন ঝুলছে! এরকম অঘটন-ঘটনপটু সৃষ্টি কল্পনা করাও কঠিন। জিওফ্রে গ্রিগশন বলেন: Dali is a fascinator. He is the twentieth century Frith, but he paints delusions and dreams instead of Derby Day. 'ব্যাণ্ডেজ করা গাভী' দৃশ্যটির অপূর্ব্বত্ব সকলকে অবাক ক'রে দেয়। এ হ'ল অদ্ভুত রসের উপাদান, কিন্তু কাজের বেলা হাস্যরসেরই সৃষ্টি হয়। একটা গাভীর মমিকে অসংখ্য

ভাবে পটি দিয়ে বাঁধা হয়েছে। দূরে অদ্ভূত গাছের সারি; বরফের স্তম্ভের শ্রেণী, খিলানের ঢেউ ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে —সব কিছু মিলে হয়েছে এক অষ্টবজ্র মিলন! এ সবের কোন মানে নেই—মানে না-থাকাটাই বাহাদুরী, কারণ আর্ট বা রম্যকলা স্বপ্রকাশ—self-expressive, তার কোন দ্বিতীয় ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না।

নিউ ইয়র্কের প্রদর্শনীর সব চেয়ে বিস্ময়জনক আকর্ষণ হয়েছে শিল্পী দালির 'তরল মহিলা'। নয় বছরে দালি বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে—এই রচনাটি তাঁর মহত্ত্ব বজায় রেখেছে। এর ভিতর মহিলারা ত আছেনই—তা ছাড়া, কি যে নেই বলা শক্ত! কঙ্কাল, নরমুণ্ড, শৃঙ্খল, জলের পাত্র, সুন্দরী নারী প্রভৃতি আজব পদার্থ এই রচনায় আছে। এই শিল্পীর এরূপ বিরূপবজ্র সৃষ্টি করার এক অসাধারণ শক্তি দেখে বিস্মিত হ'তে হয়। সমগ্র বিশ্ব অবাক্ হয়ে এসব অসম্ভব উপাদানের সমন্বয় দেখে অবাক্ হয়ে যায়। দালির Bird Cageman বা খাঁচা-মানুষ একটা গভীর বিদ্রূপের মত মনে হয়—অথচ দালি বিদ্রূপ করার লোক নন। একটা খাঁচাকে মানুষ করা হয়েছে—খাঁচাটি কোট পরেছে—তার ভিতর হাতও দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া দু'খানি পাও এর আছে—পাশে ইলেক্‌ট্রিক আলো জলছে। খাঁচা-মানুষের ভিতর দু'টি পাখী দেখা যাচ্ছে। শিল্পী নিজে সে পাখী দুটিকে দেখছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে আরব্য উপন্যাসেও এরকম উদ্ভট কল্পনা হয় নি। অথচ ইউরোপ ও আমেরিকা এ রকমের কল্পনা উপভোগে মশগুল হয়ে আছে। এ জগত বাস্তব নয়। গ্রীক্ ও রোম্যান বাস্তবতা আজ কঙ্কনের লোভে দুর্গম কাদায় ডুবে গেছে! তাই বলতে হয়, ইউরোপ চলেছে আবার একটি নব্য মধ্যযুগের আলেয়ার পিছনে! সেটাও বাস্তব কি-না সন্দেহ! অবাস্তবতার অসীম মরুতে পথভ্রান্ত হয়ে আমেরিকা ও ইউরোপ আজ হঠাৎ উপস্থিত হয়েছে! এখানকার স্নিগ্ধ রূপবিশ্বও অবাস্তব! ইউরোপের আধুনিক আগ্নেয় যুগ যে সব কিছুকেই ভঙ্গুর, ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক ক'রে তুলছে—এ রকমের রূপচর্চ্চাই তার প্রমাণ!

চোর ও কুকুর শিল্পী—টৌকিওসী হোণ্ডা

গোল্‌ফ খেলা শিল্পী—সাচিও নাগাসাওয়া

অপর দিকে এসিয়া চলেছে নব্য বাস্তবতার দিকে। নব্য জাপান ইদানীং সৃষ্টি করছে আন্তর্জাতিক রূপবিতান। এসব চলেছে অন্য পথে। এখানে রূপের আলেয়া দূরে গিয়ে নূতন বস্তুতন্ত্র সৃষ্টিও প্রকাশ হয়েছে। শিল্পী কুইসি কাওয়াবাটার মৎস্যচক্র, চিত্রের দিক থেকে বাস্তব রচনার নিদর্শন। শিল্পী নাগাসাওয়া ও শিল্পী হুদা ভাস্কর্য্যেও বাস্তবতার সূত্রপাত করেছেন।

কৃত্তিবাস-প্রশস্তি

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

জয় কবি কৃত্তিবাস, রাম-নামামৃত-রসধারে
অভিষেক করিয়াছ বর্ণময়ী বাগ্‌-দেবতারে ;
আনন্দের গন্ধরাজ নিবেদিয়া পদপ্রান্তে তাঁর
পেলে অমরত্ব বর এইখানে, এই ফুলিয়ার
গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠিত তোমার সাধন-স্বপ্ন-বেদী,
সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষ ধ্বজা তার ওড়ে অভ্র ভেদি।
তোরণ গড়েছ তুমি রামধনু চিত্রার্পিত করি
সারস্বত-কুঞ্জদ্বারে উলটিয়া আলোর গাগরী।
কীর্ত্তি তব শ্লোকমালা, রামায়ণী মঞ্জু-আলিপনা
ক্ষীয়মাণা নহে কভু, অফুরন্ত রস-উদ্দীপনা।
যে মালঞ্চে প্রবেশিয়া পূজাপুষ্প করিতে চয়ন
মধুর উদয় সেথা মধু ব্রতে করে আমন্ত্রণ,
ডাকে নীল-কণ্ঠ পাখী, জাতিস্মর ভোলেনি তোমায়,
একেলা লাগে না ভাল, কবি-সঙ্গ যাচে পুনরায়।
তোমার গানের লীলা নানা রাগিণীর মূর্ত্তি ধ'রে
ঝঙ্কারিত বাঙালীর প্রাণে-প্রাণে, অন্তরে-অন্তরে।
অনবদ্য দান তব, উপার্জ্জিলে বিপুল সম্মান,
শাশ্বত যশের জ্যোতিঃ যুগ-যুগান্তরে দীপ্যমান।
ত্রেতার বল্মীকে-সিদ্ধ বাল্মীকির আশীর্ব্বাদ লভি
তব যজ্ঞ অগ্নিজাত দিব্য এক পুরুষ গৌরবী—
প্রাপ্য ভাগ পেলে তুমি অমৃতের চরু-পাত্রে তাঁর,
শাস্তবুদ্ধি হে ব্রাহ্মণ, তোমারে করি গো নমস্কার।
অপ্রতিম রামরূপ দেখেছ তৃতীয়-নেত্র ভরে'
পরন্তপ রামগীত শুনিয়াছ সুপ্তি-প্রজাগরে।
মহাঘোষ শঙ্খ তব, রন্ধ্রে তার গর্জ্জিছে সাগর,
বেঁধেছ ছন্দের ডোরে সেতুবন্ধে ভৈরব সমর।
মহাবীরে অনুসরি রাবণের গুপ্ত-মৃত্যু-বাণ
সন্ধান করেছ কবি, ত্রাসে যার পৃথ্বী কম্পমান।
রাম অবতীর্ণ হ'লে খসে যার শিরস্ত্রাণ হতে
মুক্তা-ফল, অশ্রুরূপে গলে রক্ষো-নারী-নেত্র-পথে।
দণ্ড দিয়ে স্পর্দ্ধিতেরে ডিণ্ডিম বাজিল স্বর্ণ-তটে,
দেবতারা উৎকণ্ঠিত বিরাট সে আকাশের পটে।
বৈরী-রক্ত-অলক্তকে শোভিল সে কন্যা-কুমারিকা—
নিভে গেল সিন্ধুকূলে লঙ্কেশের অভিমান-শিখা।
রটে ডঙ্কা রামেশ্বরে, সাড়া দেয় সমস্ত ভারত,
উদ্ধারিয়া হৃতা সীতা অযোধ্যায় ফিরে রামরথ।

তারপরে কি দুর্দ্দৈব, প্রজাপুঞ্জে করিতে রঞ্জন
অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধা সেই রাম-রমা-নির্ব্বাসন ;
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু যার লাগি সে রাজ-লক্ষ্মীর
বিলাপ-লহরী-সুরে কাঁপে আত্মা তমসা নদীর।

নাহি সেই রঘুবংশ, নামশেষ রাম-রাজধানী,
হিরণ্য-পরিধি যার, নিশ্চিহ্ন সে সিংহাসনখানি।
অক্ষৌহিণী সেনা যার উড়াইতে চাহিত পর্ব্বত,
অভিযানে বাধা দিতে অক্ষম ইন্দ্রের ঐরাবৎ।
সে অস্ত-সূর্য্যের স্তব মুখরে সরযূ-কলস্বরে,
শুনেছিলে হে দরদী বেজেছিল সে দুঃখ অন্তরে,
সয়েছিলে মহাকবি, অরুন্তুদ গভীর বেদনা,
আবেশের উন্মাদনা—কাব্য তব তাহারি ব্যঞ্জনা
যুক্ত অনন্তের সাথে ; শুনায়েছ পরিপূর্ণ গান
মহীয়ান্‌ করে যাহা চিরন্তন মানুষের প্রাণ।
উঠিয়াছে উর্দ্ধগ্রামে তব কবি-মানস-সপ্তক,
যশঃ-ক্ষয়-কৃৎকাল দেয় ভালে অজেয় তিলক।
ফুলিয়ার পুণ্য-তীর্থে তোমারে দেখিত দিবাকর,
চিনিত প্রভাতী তারা ; পেলে মন্ত্র কল্যাণ-সুন্দর।
কোথা সে জীবন-পর্ব্ব, বেদবিৎ কুল-পুরোহিত ?
টুটেছে বটের মূল পুরাতন মন্দিরের ভিত ;
পূজাহারা দেবতারা, হোমগন্ধ না বহে পবন,
ছদ্মবেশী আত্মঘাত মায়ামৃগে মুগ্ধ করে মন।—
জাহ্নবী সরিয়া গেছে, বদ্ধ-বারি ধূসর সৈকতে
বঞ্চিত হইয়া আছে নবীন জীবন-ধারা হ'তে ;
মূর্চ্ছিত শৈবাল-গুল্মে ভাসাইয়া কবে গো আবার
পৌর্ণমাসী-চন্দ্রোদয়ে শূন্য ঘাটে জাগিবে জোয়ার !
যেথা থেকে এসেছিলে, ফিরে গেছ সে নন্দন-বনে,
মিলিয়াছ কলকণ্ঠ বাণী-বর-পুত্রদের সনে।
সম্রাটের উপহার বিলাইয়া অকিঞ্চন-জ্ঞানে
বনফুল হার গলে, বসে যারা সারদার ধ্যানে।
আঁধারের ছায়া নাহি যে অক্ষয়-প্রদীপের তলে
তারি শিখা হতে তুমি দীপ জ্বালি' নিলে কুতূহলে।
লহ কবি পূজা-অর্ঘ্য, বসেছ যে উৎসবসভায়
নেপথ্য-রহস্য-লোকে শ্রদ্ধাঞ্জলি পঁহুছে সেথায়।

ফুলিয়ার উৎসবে পঠিত

কাগজের কথা

অধ্যাপক শ্রীবরদা দত্ত রায় এম-এ

পাশের ঘরে ছোট বোন্‌টি গ্রামোফনে গান দিয়াছিল। বিরহের গান। আজকালকার আধুনিকারা যেন ঐ সব গানই পছন্দ করেন বেশী। কিংবা দুঃখের গানই বোধ হয় মনের আনাচে কানাচে মধু-বৃষ্টি করে। ক্রৌঞ্চ-মিথুনের অসময়ে পক্ষী-লীলা সমাপ্তি দেখিয়া কবি বাল্মীকির মনে শোক উথলিয়া উঠিল, তিনি সঙ্গে সঙ্গে শ্লোক সৃষ্টি করিয়া বসিলেন। কবি শেলী দুঃখকেই 'মধুরতম' বলিয়া অমর হইয়া গেলেন। গান বলিতেছিল,

"আঙ্গুল কাটিয়ে কলম বানায়ে
নয়নের জলে করলুম কালী,
কাগজ আনিয়ে লেখনী লিখিয়ে
পাঠালাম শ্যাম-বন্ধুর বাড়ী।"

শ্রীরাধিকার চিঠি শ্যাম-বন্ধুর নিকট পৌছিল কি-না এবং তাহার ফল কি হইল তাহা না হয় নাই বা বলিলাম। কিন্তু মনে হইল লিখিবার উপাদানের কথা। শকুন্তলা নাটকেও বিরহিণী শকুন্তলাকে পদ্ম-পত্রে প্রেম-পত্র রচনা করিতে দেখিতে পাই। সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে—কালী কলম আর কাগজ যাহা যুগে যুগে মানুষের মনোভাবের বাহন হইয়া পৃথিবীকে দিদিমার মত গল্পের জাহাজ করিয়া রাখিয়াছে। তাহা না হইলে আজ কে মহেঞ্জদারোর সভ্যতা, মিশরের ইতিহাস, মেক্সিকোর 'মায়া'-সভ্যতার ইতিহ্যস ইত্যাদি জানিবার জন্য মাথা ঘামাইত! সভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তাহার মনোভাবকে, চিন্তাধারাকে চিরন্তনী করিয়া রাখিবার জন্য কত বিচিত্র চিত্রেরই না অবতারণা করিয়াছে! অক্ষর সাপ্‌-বেঙ্‌-হাতী-ঘোড়া যাহাই হউক না কেন, কিন্তু তাহাকে 'অক্ষয় ও অব্যয়' করাই বোধ হয় মানুষের অন্তরের অন্যতম সাধনা।

ফলে প্রাচীন মিশরের ছবির অক্ষর কাষ্ঠ-ফলকে মোম-গলান হরফে দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে কালী-কলমের বালাই নাই। লেখা হইলেই হইল। প্রাচীন বেবিলন ও আসিরিয়াতে প্রস্তর-ফলকে লেখা চলিত। আসিরিয়াতে পরবর্ত্তী সময়ে মাটির ফলকেও লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীসে পরিষ্কার চামড়ার দ্বারা কাগজের কাজ চলিত। যে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এভাবে লেখা-পড়া চলিত, সে যুগে ভারতে ভূর্জ্জপত্র, তালপত্র, পদ্ম-পত্র ইত্যাদির প্রচলন ছিল। সহজ-লভ্য যজ্ঞ-বেদিকার কালী, বনজাত নল্‌-খাগড়ায় কলম এবং তাল-পাতা, ভূর্জ্জ পাতা তখনকার দিনের আত্ম-সমাহিত আরণ্যক ঋষিদের ভাব-স্রোত বহন করিত। হয়ত ঐ সব আপনভোলা সন্ন্যাসী লিখিবার উপাদানের কথা ইহার বেশী চিন্তাও করিতেন না, করিলে হয়ত ভারতই সর্ব্বপ্রথম কাগজ সৃষ্টি করিত। কিন্তু সর্ব্বপ্রথম কাগজ সৃষ্টি হইল মিশরে। যেখানে 'পেপিরাস' নামক এক প্রকার জলজ ঘাস জন্মে, সেই পেপিরাস হইতে কাগজ সৃষ্টি হইল। ইংরেজীতে কাগজের নাম 'পেপার'। পেপিরাস ঘাসের স্থান ভূমধ্যসাগর পার হইয়া নানা দেশ ডিঙাইয়া তাহার পৈতৃক উপাধি ত্যাগ করিতে পারিল না, ফলে নানা দেশে নানাভাবে কাগজ প্রস্তুত হইলেও কাগজের নাম 'পেপার'ই রহিয়া গেল।

ছেঁড়া কাপড়, ঘাস-পাতা ইত্যাদি পচাইয়া আধুনিক কাগজ প্রথম প্রস্তুত হইল প্রাচীন চীনে। খৃষ্টীয় ৯০০ অব্দে চীন দেশ হইতে কাগজ প্রস্তুত-প্রণালী আরব, স্পেন, ইতালী, ফ্রান্স, হলাণ্ড ইত্যাদি দেশে প্রসারতা লাভ করিল। ইতালীতে সর্ব্বপ্রথম হস্তনির্ম্মিত কাগজ প্রস্তুত হইল। তারপর ১৭৫০-১৮০০ খৃঃ অব্দে হলাণ্ডার বিটার (Hollander Beater) নামক যন্ত্র দ্বারা ইউরোপের নানা স্থানে কাগজ প্রস্তুত হইতে লাগিল। খৃঃ ১৮০৩ অব্দে কোর্ডিলিয়ার ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম যন্ত্র দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করিলেন। তারপর কাগজ প্রস্তুত-প্রণালীতে মেসার্স জন ডিকিনসন কোং প্রভৃতি কাগজের কল নানা প্রকার উন্নতি করিলেন। কিন্তু কাষ্ঠ-পণ্ড হইতে সর্ব্বপ্রথমে ১৮৭৪ ইং সালে জার্মানীতে কাগজ প্রস্তুত আরম্ভ হয়। তারপর অন্যান্য দেশে অন্যান্য দ্রব্যাদি দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করিয়া অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে কাগজ সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। আজ বিশ্বের ঘরে ঘরে কাগজ লক্ষ্মীর ঝাঁপির মত বিরাজমান। আজকাল কাগজের কলেরও এত উন্নতি হইয়াছে যে, ঘণ্টায় বিশ মাইল লম্বা কাগজ প্রস্তুত করা আজকাল বিচিত্র নহে।

প্রাচীন ভারতের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বৌদ্ধ যুগে প্রস্তর-ফলক, তাম্রলিপি, পিত্তলফলকের বাহুল্য দেখা যায়। মুসলমান যুগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও হস্তনির্ম্মিত কাগজ প্রস্তুত সুরু হইয়াছিল। সেই কাগজ তুলা, পচা ঘাসপাতা এবং এক জাতীয় বৃক্ষের ছাল হইতে প্রস্তুত হইত। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কোষ্ঠী ঠিকুজী প্রভৃতি এই সমস্ত কাগজে লেখা তুলা-নির্ম্মিত কাগজ বাজারে 'তুলট' কাগজ নামে প্রচলিত এবং গাছের ছালের কাগজকে বলে 'গুচি-পাত'। গুচি-পাত বোধ হয় গুচি-পত্রেরই অপভ্রংশ। গুচিপাত সাধারণত দেবকার্য্য, মন্ত্র-তন্ত্র লিখন, কোষ্ঠী-ঠিকুজী লিখনকার্য্যেই ব্যবহৃত হইত। যে গাছের ছাল হইতে 'গুচিপাত' তৈয়ারী হইত সেই গাছের নাম 'অগুরু'। এই অগুরু গাছ উত্তর-আসাম, ভুটান,

ভেনেসেরিয় প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। যে অগুরু গাছ হইতে সুগন্ধি প্রস্তুত হয়, সেই অগুরু এবং এই 'শুচী-পাতের' জনক অগুরু একজাতীয় কি-না কে জানে। মুসলমান যুগে যাহারা কাগজ প্রস্তুত করিতেন, তাহাদের নাম ছিল 'কাগজী'। আজও বাংলার নানা স্থানে কাগজী সম্প্রদায়ের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু তাহারা আজ নিজ বাসভূমে পরবাসীর মত ভিন্ন কর্ম্মাবলম্বী, কারণ আজকাল আর এ ব্যবসাতে পয়সা নাই।

চীন-জাপানেও হস্তনির্ম্মিত কাগজের প্রচলন আছে। তাঁহারা এক প্রকার তুঁতে গাছের ছাল হইতে কাগজ প্রস্তুত করেন। এই জাতীয় তুঁতে গাছ দেখিতে ছোট এবং শ্যামল, চীন-জাপান প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বাংলা দেশেও এই জাতীয় গাছের চাষ করা যায়। সম্প্রতি পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গের কাগজী সম্প্রদায় হস্ত-নির্ম্মিত কাগজ-শিল্পের উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করিয়াছেন। নিখিল-ভারত পল্লী-শিল্প সমিতি (All-India Village Industries Association) খড়, বাজে কাগজ (waste paper), পাটের নিকৃষ্ট অংশ হইতে কাগজ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশে এই জাতীয় কাগজ প্রস্তুত সুরু হইয়াছে। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী বন-গবেষণা বিভাগ এবং বাংলা সরকারের শিল্প পরীক্ষাগারে সম্প্রতি খড়, কচুরীপানা এবং পাট গাছের গুড়ি হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে কি-না সেই সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। বহু মূল্য দলিলাদি সম্পাদনের নিমিত্ত ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে এই জাতীয় কাগজের যথেষ্ট চাহিদা আছে। আশা করা যায় যে, ভারতবর্ষ ইহা করিলে অতি সহজেই হস্ত-নির্ম্মিত কাগজ-শিল্প বিশ্বের বাজারে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারিবে।

কারণ, হস্ত-নির্ম্মিত কাগজ-শিল্প ভারতের নিজস্ব এবং এক কালে ভারত এই জাতীয় কাগজ-শিল্পে খুব উন্নীত হইয়াছিল, তারপর যে ভাবে ভারতের অন্যান্য শিল্প লোপ পাইয়াছে, সে ভাবে ভারতের কাগজ-শিল্পও লোপ পাইয়াছে। আধুনিক ধরণের প্রথম কাগজ-কলের প্রচলন হয় ১৮৭০ সালে বালীতে ও তারপর ১৮৮২ ইং সালে টিটাগড়ে; ১৮৭৯ ইং সালে লক্ষ্ণৌয়ে, ১৮৮৫ ইং সালে পুনাতে, ১৮৮৯ ইং সালে রাণীগঞ্জে। ইংরেজী ১৯৩৫-৩৬ সালে ভারতে কাগজের কল ছিল মোট দশটী; ১৯৩৬-৩৭ ইং সালে এগারটি; ১৯৩৭-৩৮ সালে হইয়াছে আঠারটি। তন্মধ্যে,

বাংলা—	৬
বোম্বাই—	๑
মাদ্রাজ—(মহীশূর ত্রিবাঙ্কুর সহ)	৪
যুক্তপ্রদেশ—	২
বিহার—	১
পঞ্জাব	১
	১৮

আবার কাগজের মত প্রস্তুত কলও সম্প্রতি তিনটি স্থাপিত হইয়াছে। ভারতীয় শুল্ক-সমিতি (Tariff Board) অনুমান করিয়া দেখিয়াছেন যে, ভারতের মোট চাহিদা গড়পড়তা বাৎসরিক প্রায় লক্ষ টন, তন্মধ্যে ভারতীয় কল কোন রকমে পঞ্চাশ হাজার টন প্রস্তুত করিতে পারে। নিম্নে কাগজ প্রস্তুতের নির্ঘণ্ট দেখিলে ভারতীয় শুল্ক-সমিতির অনুমান সমীচীন বলিয়া ধারণা হয়।

ভারতীয় কাগজ টন হিসাবে প্রস্তুত

১৯২৪-২৫—	২৭,০২০ টন
১৯২৬-২৭—	৩১,৬৭২ টন
১৯২৮-২৯—	৩৮,২২২ টন
১৯৩০-৩১—	৩৯,৫৮৭ টন
১৯৩৫-৩৬—	৮,৯২,০০০ হন্দর
১৯৩৬-৩৭—	৯,৭১,০০০ হন্দর
১৯৩৭-৩৮—	১০,৭৬,০০০ হন্দর
১৯৩৮-৩৯—	১১,৮৪,০০০ হন্দর

বাহির হইতে আমদানী

১৯২৪-২৫—	৮৪,৯৪৩ টন
১৯২৫-২৬—	১,০০,৪১৯ টন
১৯২৮-২৯—	১,১৫,৬২৯ টন
১৯৩০-৩১—	১১,৪৬,৯০ টন
১৯৩৫-৩৬—	২৮,৩৬,০০০ হন্দর
১৯৩৬-৩৭—	২৭,১৮,০০০ হন্দর

তন্মধ্যে শতকরা হিসাবে ভাগ লইয়াছেন,

ইংলণ্ড—	৩০·৬
নরওয়ে—	১০·৮
সুইডেন—	১১·৫
জার্ম্মানী—	২৫·২
জাপান—	৪·১

বাকী অষ্ট্রিয়া জাপান ইত্যাদি রপ্তানি করিয়াছে, এবং টাকার হিসাবে—
১৯৩৫-৩৬ সালে বিদেশী কাগজ আমদানী হইয়াছে—

	২,৭৪ লক্ষ টাকার
১৯৩৬-৩৭	২,৭০ " "
১৯৩৭-৩৮	৪,১৫ " "

ভারতীয় কাগজকে বিদেশী কাগজের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইংরেজী ১৯৩১ সাল হইতে প্রতি টনে ১০০৲ টাকা করিয়া শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছে। ১০০৲ টাকা আমদানি-শুল্ক ধার্য্য করা সত্ত্বেও ভারত আপন চাহিদার পরিমাণ কাগজ প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারে নাই। ভারতে যে পরিমাণ কাগজ ব্যবহৃত হয় তাহার কিঞ্চিদধিক এক-চতুর্থাংশ কাগজ মাত্র ভারতে প্রস্তুত হয়। অবশ্য

অদূর ভবিষ্যতে যে ভারত কাগজ-শিল্পে উন্নতি করিয়া নিজের চাহিদা নিজে মিটাইতে পারিবে না তাহা নহে, তবে সে ভবিষ্যৎ যে কবে বর্ত্তমান হইবে কে জানে? বর্ত্তমান যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গেই কাগজ যেরূপ অগ্নি-মূল্য হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সর্ব্বসাধারণ পর্য্যন্ত বিদেশী কাগজের চাহিদা বুঝিতে পারিবেন। খবরের কাগজ দিন দিন শীর্ণকায় হইয়া পড়িতেছে, খাতা, খাম ইত্যাদির দাম বাড়িয়া গিয়াছে; এমন কি ঠোঙা পর্য্যন্ত চড়া দামে বিক্রয় হইতেছে। এত সব সুবিধা সত্ত্বেও যে কেন ভারতীয় কলগুলি দেশের চাহিদা মিটাইতে পারে না, তাহার কারণ সেই পুরাণ কথা।

ভারতীয় কাগজ বিদেশী কাগজের মত মসৃণও হয় না, তেমন বক-পক্ষ উজ্জ্বল সাদাও হয় না। তা ছাড়া তৈয়ারী খরচা পড়ে বেশী। ভারতে কাগজ প্রস্তুতের প্রধানতম উপাদান সাবে ঘাস। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সাবে ঘাস চালান দিতে এত বেশী খরচ পড়ে যে, তাহা দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করিয়া প্রতিযোগিতায় টেকা যায় না। দ্বিতীয়ত, সাবে ঘাসের অঞ্চলে কাগজ-কল স্থাপিত করিলে নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে কয়লা পাওয়া যায় না। বাঁশ-মণ্ড কাগজ প্রস্তুতের অন্যতম উপাদান, কিন্তু বাঁশ-মণ্ড এখনও সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য হয় নাই, কাজেই ইহাও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। ফলে কাষ্ঠ-মণ্ড আমদানি করিতে হয়। যদিও বর্ত্তমান সময়ে দেশেও কাষ্ঠ-মণ্ড প্রস্তুত হইতেছে, তথাপি এখনও গড়পড়তা ২০,০০০ টনের মত কাষ্ঠ-মণ্ড বিদেশ হইতে আমদানি হইয়া থাকে। গত পাঁচ বৎসরে কাষ্ঠ-মণ্ডের আমদানির হিসাব,

১৯৩২-৩৩—	১৫,৬০০ হন্দর
১৯৩৩-৩৪—	২০,৩০০ "
১৯৩৪-৩৫—	১৯,৫০০ "
১৯৩৫-৩৬—	৩৬,৯০০ "
১৯৩৬-৩৭—	২২,১০০ "

এদিকে বিদেশী কাষ্ঠ-মণ্ডের উপর প্রতি টন ৫৬ টাকা ৪ আনা রক্ষা-শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছে। ফলে দেশীয় কাষ্ঠ-মণ্ড শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। দেশীয় কাষ্ঠ-মণ্ড বৎসরে সম্প্রতি ১৭,৫৭১ টন হইতে ৩৫,৭৪১ টন প্রস্তুত হইতেছে। অবশ্য আশার কথা সন্দেহ নাই।

এদিকে কাগজ প্রস্তুতের উপাদান লইয়াও নানা প্রকার গবেষণা চলিতেছে। স্যার হরিশঙ্কর পাল বঙ্গীয় ন্যাশনাল চেম্বার অফ্ কমার্শে বক্তৃতা প্রসঙ্গে এক ইতালীয়ান ব্যবসায়ীর খবর দিয়াছেন, যিনি ধানের খড়ের মণ্ড দিয়া ভাল কাগজ প্রস্তুত করিতে পারেন এবং তাহাতে তিনি সফলকাম হইয়াছেন। মিঃ এস্-আর-কে-মেনন নামক জনৈক মাদ্রাজী বৈজ্ঞানিক নারিকেলের ছোব্ড়া হইতে কাগজ প্রস্তুত করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। বোম্বাই সরকার বাঁশের মণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত করিতেছেন। দেরাদুনের বন-গবেষণা বিভাগ ঘাস হইতে সস্তাদরের প্যাকিং পেপার প্রস্তুত করিতেছেন। উক্ত প্যাকিং কাগজ প্রতি বৎসরই প্রায় ৮,২৫০ টনের মত বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। কিন্তু রক্ষা-শুল্ক ধার্য্য করিয়া উক্ত কাগজ-শিল্পকে রক্ষা না করিলে ভারতীয় কাগজ প্রতিযোগিতায় বিদেশী কাগজের সঙ্গে টিকিতে পারিবে না। টেরিফ বোর্ড ও ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্শের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার অবশ্যই এই প্যাকিং কাগজ শিল্পকে (যাহার পোষাকী নাম ক্রাফ্ট্-পেপার) রক্ষা করিবেন।

বর্ত্তমান সময়ে হঠাৎ যুদ্ধ বাধিবার ফলে বিলাতী কাগজ যেরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে—তেমনই কাষ্ঠ-মণ্ডও দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে এবং যুদ্ধ আরও কিছু কাল চলিতে থাকিলে ভারতকে কাগজের অভাবে নানা ভাবে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। যাহারা দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার কামনা করেন এবং দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য অর্থ-সাহায্য করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন, তাঁহারা এই সুযোগে কাগজ-শিল্পের উন্নতির জন্য মনোনিবেশ করিতে পারেন। এক দিকে দেশীয় নিতান্ত আবশ্যকীয় শিল্পের উন্নতি হইবে, অন্য দিকে বহু বেকার যুবকের অন্ন-সংস্থানের পন্থাও নির্দ্ধারিত হইবে। আর, একটি শিল্পের উন্নতি হইলেই সঙ্গে সঙ্গে আরও ছোট খাট আনুষঙ্গিক শিল্পের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। বস্ত্র-শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন রঞ্জন শিল্প আবার পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে, কলের কাগজেরও তেমনই উন্নতি হইলে এবং চাহিদা বাড়িলে যে হস্তনির্ম্মিত কাগজ-শিল্পেরও উন্নতি হইবে না—তাহা কে বলিতে পারে? হয়ত তখন হাতের তৈয়ারী কাগজের চাহিদা আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মত বাড়িয়া যাইবে। ভিন্নপন্থাবলম্বী কাগজী-সম্প্রদায় হয়ত নিজ নিজ পেশাতে আসিয়া দুটি অন্নের সংস্থান করিতে পারিবে। কিন্তু সে দিনের আর কতদূর?

যাদুঘরে চিত্র প্রদর্শনী

শ্রীকাশীকান্ত ঠাকুর

প্রতিবারের মত এবারেও বড়দিনে যাদুঘরের চিত্র-প্রদর্শনী দেখেছি, এই দেখার মধ্যে যে আনন্দরস উপলব্ধি করেছি তারই কিছু প্রকাশের জন্য আমার এই—প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে একটি শিল্পীপ্রাণ।

লক্ষ্মীর জন্ম শিল্পী—বি-সি-গুই

এই শিল্পের একমাত্র সম্পদ হচ্ছে রূপচ্ছবি বা ভাবচ্ছবি। শিল্প ব্যাপারের ভিতর কোন জাতি প্রতীতি নেই, কোন সত্য, কি কল্পনা তার উল্লেখ নেই, কোন প্রকার প্রণালীর নির্দ্দেশ নেই, কোনো লক্ষণের দ্বারা লক্ষ্য নির্দ্দেশের চেষ্টা নেই—এতে আছে শুধু অনুভব এবং তার ফলে—অনুভূতি বা উপলব্ধি, এর অতিরিক্ত কিছু নেই।

এই অনুভূতি যার ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তার নাম ভাষা। ভাষা বলতে এখানে শুধু ধ্বনি বোঝায়

নদীতীরে শিল্পী—কে-আর-ঠাকুর

হর পার্ব্বতী শিল্পী—এম গুপ্ত

না, বর্ণ (colour) ও রেখাকেও ভাষা বলা হয়। যখনই কোন অনুভূতি ধ্বনি বা ছবির ভিতর দিয়ে মনের মধ্যে

পাল্‌স্　　শিল্পী—ভি-এস-গুর্জ্জরি

হর পার্ব্বতীর নৃত্য　　শিল্পী—এস-মহাপাত্র

প্রকাশ লাভ করে—তখনই সুন্দরের সৃষ্টি হয়। তাই যখনই কারুর কোন অনুভূতি ব্যাপক, স্ফুট ও বিশদ-ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে তখনই তার শিল্পের স্থান নির্দ্দেশ হয়েছে উচ্চস্তরে এবং যেখানে অনুভূতির সম্পূর্ণ বিকাশ সেইখানেই শিল্পীর শিল্পের সম্পূর্ণতা।

এইবার খানকয়েক ছবির পরিচয় ও আমার কেন ভাল লেগেছে তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব।

প্রথমেই মিঃ এস্ মহাপাত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি পৌরাণিক "হরপার্ব্বতী নৃত্য" বিষয়ক মূর্ত্তির জন্য স্বর্ণপদক পেয়েছেন। প্রথমেই বলেছি অনুভূতি বিকাশের তারতম্যের মধ্যেই শিল্পীর স্থান-নির্দ্দেশ রয়েছে। ওই একটুখানি ছোট্ট মূর্ত্তির ভিতর যে অনুভূতির নির্দ্দেশ করতে শিল্পী চেয়েছেন, আমার মনে হয় তাতে সফলকাম হয়েছেন। তাই এই "প্রদর্শনকে" এই প্রদর্শনীতে অনুপম বলা যেতে পারে।

ডাল হ্রদে সূর্য্যাস্ত　　শিল্পী—ডি-এন-ওয়ালি

তারপরেই তেলরংয়ের ছবির মধ্যে মিঃ ভি এস্ নাম বিশেষ শ্রেণীতে পড়ে। ইনি "পালস্" শীর্ষক ছবিখানিতে স্বর্ণপদক পেয়েছেন, এই ছবিখানির বর্ণ-সম্পাত প্রথমেই দর্শককে আকৃষ্ট করে।

এর পরেই এই বিভাগে মিঃ ভি এ মালি "প্রসাধন" ছবিখানির বর্ণ-সম্পাত রচনা প্রভৃতি প্রশংসনীয়।

প্রসাধন শিল্পী—ভি-এ-মালি

পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে যত চিত্র এসেছে তার মধ্যে শ্রীভবানী গুঁইএর "লক্ষ্মীর জন্ম" ছবিখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাগরমন্থন থেকে উঠে এলেন লক্ষ্মী; এর সম্পূর্ণতা রয়েছে এই ছবিখানিতে।

ওয়াটার কলার বিভাগে শ্রীকমলারঞ্জন ঠাকুরের "নদীর ধারে চিত্রখানি দর্শককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এর আঁকা ছবির মৌলিকত্ব বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর রামায়ণের চিত্রাবলীর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্বারভাঙ্গা মহারাজ বাহাদুরের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত মিঃ পি আর রায়ের ছবি "রোসেন আরা" চিত্রখানি কাজের বৈশিষ্ট্যের জন্যে সাধারণের প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়েছে।

এর পরে কয়েকখানি উল্লেখযোগ ছবির নামের তালিকা নীচে দিচ্ছি।

১। মিঃ ভি, এন্ ওয়ালির "ডাল হ্রদের অস্তমিত সূর্য্য"

২। মিঃ এস্, জি, ঠাকুর সিংয়ের "মৌসুমি বায়ুর পরের সূর্য্যাস্ত"

৩। রাজকুমারী নির্ম্মলা রাজের (গায়কোয়ার) —"মথুরার ঘাট"

৪। মিসেস্ এ, কে, বতর "jessoscrerze"

প্রতিযোগিতার জন্য না দিয়ে শুধু প্রদর্শনের জন্য যাঁরা ছবি দিয়েছেন তার মধ্যে শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বলতে হয়। এঁর আঁকা কাদম্বরী গদ্য-কাব্য বিষয় অবলম্বনে যে ছবিখানি, তাকে অপূর্ব্ব বলা যেতে পারে।

সর্ব্বশেষ মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের সৌজন্যে যে সব ছবি আমাদের দেখবার সুযোগ হয়েছে তা আমাদের পক্ষে সহজলভ্য ছিল না। ওই ছবি দিয়ে প্রদর্শনীকে সমৃদ্ধিশালী করার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

রাখালানন্দ-প্রয়াণে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সাধু-সন্ন্যাসী সন্ধানে আমি
ঘুরিয়াছি বহু ঠাঁই,
অবশেষে আসি দুয়ারের কাছে
তব সন্ধান পাই।

উপল এবং কঙ্কর মাঝে
ভাবিতে পারিনি মোরা
এত বড় নীলমণি ছিলে তুমি
কৌস্তভ যার জোড়া।

ছদ্মবেশেতে পল্লীতে ছিলে,
প্রতিভার হিমালয়।
ভক্ত যে তুমি, এত বড় ছিলে
পাই নাই পরিচয়।

তোমাতে বিনয় মূর্ত্তি লভিল
তব হাস্যের মাঝে
রাখাল-রাজের ভুবন ভোলানো
হাসির রেখাটি রাজে।

ছিল যে তোমার দেহলাবণ্যে
স্নিগ্ধ পুণ্য জ্যোতি,
অতি পাষণ্ডে গর্ব্ব ভুলিয়া
চরণে করিত নতি।

আমাদের মাঝে তুমিই থাকিতে
কোথায় থাকিত মন।
তোমারে ঘেরিয়া করিত বিরাজ
নদীয়া বৃন্দাবন।

দেখি নাই কভু মুনি-ঋষি মোরা,
হেরিয়া তোমার মুখ
অদর্শনের দর্শন সুখে
ভরিয়া উঠিত বুক।

তব কণ্ঠের রসকীর্ত্তন
দীন পল্লীতে নিতি
আনিত অতীত অনুভব-দূর
রস-বাদরের স্মৃতি।

সৃষ্টি করিত ভাবের রাজ্য
সে আবেশ মনোহর—
অপার্থিবকে লয়ে যুগে যুগে
আমরা যে করি ঘর।

তোমারে দেখাই ছিল উৎসব,
যেখানে যাইতে তুমি
অপূর্ব্ব সেই হরিনাম গানে
তীর্থ হইত ভূমি।

যে অমৃতরস সুলভে বিকাত
তোমাদের প্রেমহাটে,
চিনিতে পারি না—ভাবিতেই শুধু
মোদের জীবন কাটে।

পুরুষ তো গোরা—আর সব নারী,
কি গূঢ় সত্যবাণী!
দুরূহ ভজন কেমনে বুঝিব?
আমরা প্রাজ্ঞ! জ্ঞানী!

তুমি লভিয়াছ বাঞ্ছিতে তব—
গোপন সাধন ফল,
মানস চক্ষে হেরি সে মাধুরী
মোরা মুছি আঁখিজল।

কন্যাপক্ষ

শ্রীমতী বাণী রায়

আমার ছোটমামা একটু অসাধারণ লোক। বাইরের পরিচয় তার বাঙালী 'আই-সি-এস'দের মধ্যে তরুণতম, সুন্দরতম যুবক মাত্র, কিন্তু অন্তরের পরিচয় বিশেষ কেউ আজও ভাল ক'রে জানে না। নিতান্ত আমি তার খুব কাছে গিয়ে পড়েছিলুম, আমার সঙ্গে কতকটা বন্ধুভাব ছিল, তাই বুঝ্‌তাম যে এই বাইরে কাটখোট্টা সাহেবী-ধরণের লোকটির মন একান্ত ভাবপ্রবণ এবং শিশুর মত অভিমানী।

ছোটমামার সঙ্গে আমার শিশুকাল থেকে বড় বেশী আলাপ ছিল। মামার বাড়ী যাবার আকর্ষণ আমার ছিল কেবল ছোটমামার সঙ্গে খেলা করবার জন্য। বয়সে আমার থেকে পাঁচ-ছয় বছরের বড় হ'লেও ছোটমামা এক মুহূর্ত্তের জন্যও যেন বুঝ্‌তে দেয়নি যে তার ও আমার মধ্যে বয়েসের কোনও ব্যবধান আছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ছোটমামা ছুটিতে ছিল, আমার বয়স তখন দশবছর। সেই সময় আমার ছোটবোন খুকু হওয়ায় আমি মাতৃক্রোড় বঞ্চিত হয়ে মামার বাড়ীতে দিদিমার কাছে কিছু দিন ছিলাম। দিন আমার হয়তো তত ভাল কাট্‌ত না, যদি না ছোটমামা আমাকে সাগ্রহে তার কাছে টেনে নিয়ে আমার ব্যথা ভুলিয়ে দিত।

সন্ধ্যাবেলা বাইরের লনে বসে আছি, হঠাৎ আকাশের একটি মাত্র তারার দিকে চেয়ে মনে হ'ল মা এতক্ষণ একটা বিচ্ছিরি কাঁদুনে খুকুকে নিয়ে কত বা আদর করছেন! সঙ্গে সঙ্গে অভিমানে চোখে জল এসে পড়্‌ত, আপনি অধর কেঁপে উঠ্‌ত। আর তখনই যেন অন্তর্যামীর মত ছোটমামা এসে আমার পাশে দাঁড়াত। চুলের ওপর হাত রেখে সস্নেহকণ্ঠে বল্‌ত 'রুবি, চল্, খরগোশটাকে কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ার থেকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।'

সকালবেলা দিদিমার কাছে দুধ খেতে খেতে থামকা মনে হ'ত—মা আমাকে ভুলে গেছেন একেবারে। হাত থেকে দুধের রূপোর গেলাস হয়তো বা গড়িয়ে পড়ে টোল খেয়ে যেত, চোখের জল গোপন করবার জন্য অন্য দিকে মুখ ফেরাতে হ'ত। তখনই কোথা থেকে ছোটমামা দৌড়ে আস্‌ত, 'রুবি, চল্, আমরা বাগান তৈরি করি-গে।'

আশ্চর্য্য! কোন দিন কিন্তু ছোটমামা আমার চোখের জলের কারণ জিজ্ঞাসা করত না, একবার উল্লেখ পর্য্যন্ত করত না। তখন ভাবতাম, 'ছোটমামা কিছু দেখ্‌তে পায়নি, কিন্তু এখন বুঝি তার চোখে সব পড়েছিল। সেইজন্য সে তার সমবয়স্ক বন্ধুদের সাহচর্য্যের মোহ ত্যাগ ক'রে আমার মত একটা নিতান্ত অপদার্থ কাঁদুনে মেয়ের মনোরঞ্জনের জন্য এত ব্যস্ত ছিল।

একমাস পরে বাড়ী ফিরে এলাম। আমার মায়ের স্নেহ ত্যাগ হয়ে গেলেও তখন আমার দুঃখের কিছু রইল না। এই একমাসে যে আমি আমার ছোটমামার স্নেহ ভালবাসা সমস্ত একান্ত আমারই ব'লে জেনেছিলাম।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় সমস্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে ছোটমামা কলেজে ভর্ত্তি হ'ল। বাবাও আমাকে স্কুলে দিলেন।

তখন আবার আমার ও ছোটমামার বন্ধুত্ব নূতন জগৎ নিয়ে গড়ে উঠ্‌ল, কলেজের প্রতিটি গল্প ছোটমামা আমাকে বল্‌ত—যা আমি বুঝ্‌তে না পারি—তাও। ছোটমামার কোন কথাই আমার অজানা ছিল না। আবার আমার জগতের প্রতিটি তুচ্ছ ঘটনাও ছোটমামার কানে আমার তোলা চাই। সহপাঠিনীর বেশবিন্যাস, শিক্ষয়িত্রীর শাসন---সমস্ত মনে মনে জমা ক'রে রেখে দিতাম, কখন ছোটমামা আস্‌বে, কখন তাকে বল্‌ব। মাঝে মাঝে নিজের মনে জমানো কথার হিসাব মিলিয়ে বল্‌তাম, ভুল না হয়ে যায়।

এইরকম করে দিনে দিনে আমরা এই অসম বয়সের দুই বন্ধু দুই অসম জগৎ নিয়ে পরস্পরের কাছে ক্রমেই আরও সরে আস্‌ছিলাম। আমার বড় দুই ভাইবোন ও ছোট বোন খুকুর চেয়ে আমি আবার দেখ্‌তে অনেক খারাপ ছিলাম। মা'র উজ্জ্বল গৌরবর্ণ বা বাবার অনিন্দ্য মুখচোখ কিছুই আমি পাইনি। পাশাপাশি দাঁড়ালে

আমাদের ভাইবোন বলে চেনা দুষ্কর। তার ওপর আমি চিরকাল বড় লাজুক, অভিমানী-প্রকৃতির ছিলাম। রূপের অভাবে গুণের বিকাশ দেখাবার উপায়ও আমার যেন ছিল না। লোকের কাছে বের হ'বার সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ত, এরা আমাকে আমার ভাইবোনদের সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখে দেখে হয়তো উপহাস করছে। তাই যেন কুণ্ঠিত চরণ আপনি থেমে যেত, ভীরু চোখ আপনি নীচু হ'ত। এ-হেন একটা নির্জ্জীব, জড়প্রকৃতির কুশ্রী মেয়েকে ছোটমামার মত রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ পুরুষ কেন যে আদরে স্নেহে মাথার মণি ক'রে তুলল সেইটাই আশ্চর্য্য লাগ্‌ত সবার। আমার অন্যান্য ভাইবোন তার কাছে আমলও পেত না, দূর থেকে কেবল ঈর্ষার দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকৃত। সবাই বল্‌ত, 'সোমেশ আদর দিয়ে দিয়ে রুবিটাকে মাথায় তুলেছে।'

আমার ছোটমামার নাম সোমেশ।

ছোটমামা আবার দেখ্‌তে তার ভাইবোন সকলের চেয়ে সুন্দর। সতেরো-আঠারো বছর বয়েসেই তার চেহারা রাস্তার লোক ফিরে চেয়ে দেখে যেত। শুভ্র মর্ম্মরের মত উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ। বাঙালীর মধ্যে অতটা ফর্সা বিরল, আমার চোখে তো আর একটিও পড়েনি। নিকষ কালো চুল তরঙ্গায়িত হয়ে প্রশস্ত ললাট থেকে উর্দ্ধে উঠে গেছে। যুগ্ম ভুরু। আকর্ণ কিন্তু অনতিপ্রশস্ত চোখে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, যেন শিকারী ঈগলের মত প্রতিটি বস্তুর ওপর নির্ভুল লক্ষ্য। উন্নত রোমান্ নাক, প্রসন্ন অধরোষ্ঠ রক্তকোকনদের পরাগের মত। পাথর কেটে তৈরী করার মত সুগঠিত চিবুক। প্রশস্ত বক্ষ, উন্নত সবল দেহ! বিদ্যার খ্যাতিতে, রূপের খ্যাতিতে ছোটমামার স্তাবক ও বন্ধুর অভাব ছিল না। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারলে সাধারণ ছেলেরা নিজেদের ধন্য মনে করত। কিন্তু সে তাদের গণ্ডি কাটিয়ে ছুটে চলে আস্‌ত বালিগঞ্জে আমাদের বাড়ী, যেখানে আমি তার পথের দিকে চেয়ে থাকৃতাম।

ছোটমামার ভাবপ্রবণ চিত্তের এও একটা লক্ষণ। যাকে সে ভালবাস্‌ত বাইরের কোন টানই তাকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারত না। লোকের উপহাস বা ভুলিয়ে নেবার প্রচেষ্টা যেন তার বন্ধনকে আরও দৃঢ় করত। সে জান্‌ত আমাকে কেউ চায় না; আমি আমার হাস্যমুখর সুন্দর ভাইবোনদের মধ্যে নিতান্ত খাপ্‌ছাড়া। তার কোমল মনে আমার অবস্থাটা বিশেষ ক'রে নাড়া দিত। তাই সে বাইরের আঘাত থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্য নিজের অসীম স্নেহ দিয়ে আরও নিবিড় ক'রে ঘিরে রাখ্‌ত।

এ এক সর্ব্বনাশা মন! এরা ভালবাসে খুব কম, কিন্তু যাকে ভালবাসে তাকে কিছুতেই ভুলে যেতে পারে না। অনেক সময় নিজের ইচ্ছা সত্ত্বেও পারে না।

ছোটমামা যখন বি-এ পড়ে তখন তার দু-একটি বান্ধবী হ'ল। সে খবর অবশ্য প্রত্যহ ছোটমামা আমাকে এসে নিয়মিত ব'লে যেত। কোন মিস্ খান্ তার ছবি চেয়েছে, কোন্ রেবা বোস তাকে অহেতুক চিঠি লেখে—এ সবই আমার জানা ছিল। ছোটমামার রূপের তীব্র আকর্ষণে অনেক পতঙ্গই আকৃষ্ট হয়েছিল, যদিও বেচারী তাদের পক্ষ প্রসারণের বাইরে যাবার যথেষ্ট প্রচেষ্টা করত। আমি মাঝে মাঝে বলতাম, 'ছোটমামা, কেন তুমি ওদের পষ্টাপষ্টি বলে দাও না যে তুমি এসব পছন্দ কর না?'

কিন্তু এখানেও ছোটমামার আশ্চর্য্য দুর্ব্বলতা দেখ্‌তাম। মেয়েদের যেন সে মধ্যযুগের নাইট্‌দের চক্ষে দেখ্‌ত! তার শুভ্র কুমার মনে কোন মেয়ে রেখাপাত করতে পারেনি জানি, তবু সে তাদের মনে আঘাত দিতে পারত না। নারীর স্থান তার কাছে অনেক উর্দ্ধে ছিল। আমার দাদার বিয়েতে মা তাকে মেয়ে দেখ্‌তে যাবার অনুরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠ্‌ল, 'দিদি, ওই কাজটা আমি পারব না। একটি মেয়েকে দেখে অপছন্দ হয়েছে বলার কথা আমার মনেও আসে না। এ কি বাজারের জিনিষ যে অন্তঃকরণ বলে কিছুর বালাই নেই? বরপক্ষের পছন্দ হ'লে ভাল, না হ'লে অনর্থক সে মেয়েটির মনে কতটা কষ্ট দেওয়া হয় কেউ ভেবে দেখে না। চিরকাল কন্যাপক্ষের এই অপমান!'

মনে আছে, সেদিন একথা নিয়ে আমাদের বাড়ীতে কত আন্দোলন হয়েছিল। মা ঠোঁট উল্টে বলেছিলেন, 'কি পাকা পাকা কথা বলে যে সোমেশ! চিরকাল ধরে তো মেয়ে দেখে তারপরেই বিয়ে হচ্ছে। আজ সে নিয়ম

একপলকে উল্টে যাবে নাকি?' দিদি টিট্‌কারি দিয়ে বলে উঠ্‌ল 'আচ্ছা, নিজের বেলা দেখা যাবে।'

কিন্তু ছোটমামার কথা আর কেউ না বুঝ্‌লেও আমি বুঝ্‌তে পার্‌লাম।

•

আমি যখন আই-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি তখন ছোটমামা ইংলণ্ড থেকে সিভিল্‌ সার্ভিস পরীক্ষা পাশ ক'রে ফিরে এল। দেখ্‌তে সে আরও অনেক সুন্দর হয়েছে। তার দিকে যেন বেশীক্ষণ চেয়ে থাকাও যায় না। কালো পোষাক-পরা, সুদীর্ঘ দেহ, সুপুরুষ যুবকটির কাছে এগিয়ে যেতে আমার সঙ্কোচবোধ হচ্ছিল। কিন্তু সেই সস্নেহকণ্ঠে 'রুবি' ব'লে ডেকে ছোটমামা যখন আমাকে আদরে বুকে জড়িয়ে ধরল, তখন জাহাজঘাটায় দাঁড়িয়ে ক্ষণকালের জন্য আমার সন্দেহ হ'ল—আমার বাবা-মা কি আমাকে বেশী ভালবাসেন, না ছোটমামা বেশী ভালবাসে!

—ছোটমামা বিষ্ণুপুরে চাকরি পেল। প্রতি সপ্তাহেই প্রায় সে কল্‌কাতায় আস্‌ত। সে সময়টা বড় আনন্দে কাট্‌ত, সারা বাড়া হাসি-গল্পে মাতিয়ে আমাদের নিয়ে বেড়িয়ে হৈ চৈ ক'রে যেত। আমার ওপর তার ভালবাসা আরও যেন বেশী হয়েছিল। নিজেদের বাড়ী বা আমাদের বাড়ী যেখানেই সে থাক্‌ত, একদণ্ডও তার আমাকে ছেড়ে চল্‌ত না।

বিদেশে থেকে ছোটমামার কোন পরিবর্ত্তন হয় নি বা মতামত কিছুই বদ্‌লায় নি। মেয়েদের ওপর ছোটমামার সেই শ্রদ্ধামিশ্রিত উচ্চ ধারণা তুহিনপ্রদেশের তুহিনহৃদয়া লিসি-সিসির সংস্পর্শে এসেও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। মেয়ে দেখে বিয়ের কথায় সে আবার আগের মত 'কন্যাপক্ষের অপমান' ইত্যাদি বড় বড় কথা বলে। বিয়েতে ছোটমামাকে আমরা কিছুতেই রাজী করতে পারি না। আবার ব্যবসাদারী ভাবে মেয়ে দেখে বিয়ে ঠিক করার পরিবর্ত্তে প্রেমমূলক বিবাহের কথা বললেও বলে, 'এত ব্যস্ত কেন? আমি কি তোমাদের অরক্ষণীয়া মেয়ে নাকি?' ছোটমামার বিবাহে অনিচ্ছা যেন আমাদের একটা অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল।

এদিকে দিদির বিয়ে হয়ে গেল। দিদির বিয়ের পর সেই বছরের শেষ থেকেই ছোটমামার একটা পরিবর্ত্তন দেখ্‌তে পেলাম। তার হাসিখুসী ভাবটা চলে গিয়ে একটা অকালগাম্ভীর্য্য সে স্থানে দেখা দিল। আমার সঙ্গে গল্পেও যেন তার সে আগেকার প্রাণ ছিল না। কথা বল্‌তে বল্‌তে চুপ ক'রে অন্যমনস্ক হ'ত। আমি তাকে বেশী ক'রে অন্তরঙ্গভাবে দেখ্‌তাম বলে তার এই ভাবটা প্রথম অবশ্য আমার কাছেই ধরা পড়্‌ল। কিন্তু ক্রমে সে এতটা বিষণ্ণ ও মলিন হয়ে গেল যে, সেটা সকলের চোখেই পড়্‌লো। এ নিয়ে সকলে তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ কর্‌ত, কিন্তু ছোটমামা সে সবের কোনও উত্তর দিত না।

আমাকে সকলে প্রশ্ন কর্‌ত 'কি রে, তুই তো তোর মামার খাস্‌-মুন্সী, কি হয়েছে ওর জানিস্‌?' আমি মাথা নেড়ে 'না' বলে চলে যেতাম। মনে হ'ত কি একটা কারণে ছোটমামার সারা পৃথিবীর ওপর বিজাতীয় অভিমান হয়েছে এবং সেই অভিমান তার মুখ চেপে বন্ধ করে রেখেছে—এমন কি আমার কাছেও খুল্‌তে দিচ্ছে না। কিন্তু আমিও তো সেই অভিমানী মামার ভাগ্নী! আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম, জীবনে প্রথম যখন সে আমার কাছে কথা লুকোচ্ছে, আমিও সে নিজে না বললে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌ব না। সুদূর বিদেশ থেকেও প্রতি ডাকে যার সহাস্য সুন্দর চিঠিগুলি 'এল্‌সি', 'ডোরা' 'লরা'দের তুচ্ছ কথাও বিন্দুমাত্র গোপন ক'রে আন্‌ত না, সে আজ যখন স্বদেশে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে তার মনের ভেতর দেখ্‌তে দিচ্ছে না তখন আমি কেন তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব? তাই যখন দেখ্‌তাম আড়াল থেকে—যে ছোটমামা অর্দ্ধভুক্ত থালা ঠেলে রেখে খাবার 'টেবল্‌' থেকে উঠে যাচ্ছে, বিনিদ্র রাত্রি বারান্দায় একলা ঘুরে ঘুরে কাটাচ্ছে, তখন আমার চোখে জল আস্‌লেও মুখে কথা ছিল না। আমার অভিমানও যে ছোটমামার সমান!

কার্ত্তিকের শেষে বিষ্ণুপুর থেকে ছোটমামা চিঠি দিল সে এখানে আস্‌ছে মেয়ে দেখ্‌তে। কয়েকটি মেয়ের বাবা তাকে বিব্রত ক'রে তুলেছে। সে নিজে দেখে বিয়ে ঠিক কর্‌তে চায়।

সূর্য্য পশ্চিমে উঠ্‌লেও কেউ বোধ হয় এতটা আশ্চর্য্য হ'ত না। রূপে গুণে ছোটমামার তুলনা বিরল, চাকরিও ভাল পেয়েছে। তার ওপর আমার মামার বাড়ীর বংশ ও

ধনমর্য্যাদা-বিখ্যাত। সুতরাং কন্যাদায়গ্রস্ত মেয়ের বাবারা ছোটমামাকে বিব্রত ক'রে তুল্‌বে এতে আশ্চর্য্য হবার নেই; কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, সেই ছোটমামা—যে মেয়েদের এত ওপরে ভাব্‌ত, বাজারের পণ্যের মত ক'রে মেয়ে দেখার বিরোধী ছিল, সে এত সহজে বিয়েতে রাজী হয়ে নিজে মেয়ে দেখ্‌তে আস্‌ছে। সকলে হাসি-তামাসা করতে লাগল, ছোটমামার নাকি ও সমস্ত ভণ্ডামী ছিল। আমার আশ্চর্য্য ও দুঃখিত লাগ্‌লেও মনে আনন্দ হ'ল; তা হ'লে এবার ছোটমামা বিয়ে করবে, তাহ'লে তার জীবনে আকর্ষণ আস্‌বে। শেষের কয়েকটি দিনের মত তাঁর ছন্নছাড়া রূপ আমার চোখ মেলে দেখ্‌তে হবে না!

ছোটমামা কল্‌কাতায় এল। পাণ্ডু হয়েছে তার মূর্ত্তি, চোখে মুখে নববর-সুলভ কোন ভাবই খুঁজে পাওয়া যায় না। দশটি দেখে একটিকেও পছন্দ না ক'রে সে ফিরে চলে গেল। সকলে দ্বিতীয়বার আশ্চর্য্য হ'ল।

তারপর থেকে আরম্ভ হ'ল ছোটমামার মেয়ে দেখার অভিযান। বারে বারে সে আস্‌ত, বারে বারে মেয়ে অপছন্দ ক'রে ফিরে যেত। লোকের বিদ্রূপে আমার কানপাতা দায় হ'ল। কলেজের মেয়েরা পর্য্যন্ত আমাকে ঠাট্টা করত, 'কি রে রুবি, তোর মামার আর ক'টি মেয়ে দেখ্‌লে হাজার পূর্ণ হয় রে?' বাইরের ছেলেরা 'সোমেশ রায়ের দিগ্‌বিজয় মাত্র!' ব'লে এক ছড়াই তো লিখে বস্‌ল!

এই সব লোকের নিন্দায় আমার চোখে জল আস্‌ত। মনে মনে বল্‌তাম, 'ছোটমামা, তোমাকে এরা সব ভুল বুঝেছে। কেন তুমি এমন করছ বলে দাও এদের। কোন্ মেয়ের ছবি তোমার সারা মন জুড়ে রয়েছে যে সহস্র মেয়ের মাঝ থেকে তুমি তাকে খুঁজে বের করতে চাও? কার ওপর অভিমানে তুমি সমস্ত নারী-জাতির ওপর এমন শোধ তুলছ?'

আমার মনের কথা কিন্তু মনেতেই থাকৃত। অভিমান আমারও কণ্ঠরোধ ক'রে ধরেছিল।

ইদানীং ছোটমামা বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছিল, যা আমার চক্ষেও বড় বিসদৃশ লাগ্‌ত। বাবার এক দূর-সম্পর্কীয়া ভাগ্নীকে ছোটমামা আমাদের বাড়ী দেখ্‌বে বলে কথা দিয়েছিল। মেয়েটি বড় সুন্দরী, ভীরু হরিণীর মত টানা টানা যুগল চোখে ভুবন ভোলানো কোমল দৃষ্টি। প্রথম যৌবনের উন্মেষে তনুদেহটি লাবণ্যে টলমল্ করছে। একটু লাজুক সে, নম্র পুষ্পভারনতা লতার মত। আমার বড় আনন্দ হ'ল, এবারে ছোটমামার নিশ্চয় পছন্দ হবে। মেয়ে দেখার সভায় আমি ছোটমামার কানে কানে বললাম, 'এবার কেমন পছন্দ না হয় দেখি?'

ছোটমামার অধরে বিদ্রূপের শাণিত হাসি খেলে গেল। তারপর সেই লজ্জিতার নির্য্যাতন সুরু হ'ল। ছোটমামা যে এত চোখালো ধারালো প্রশ্ন মনে জমা ক'রে রেখেছে কে জান্‌ত? কথার বাণে নিরপরাধা মেয়েটিকে বিদ্ধ ক'রে না-পছন্দের রায় দিয়ে তবে সে ক্ষান্ত হ'ল।

সেদিন আর থাকৃতে পার্‌লাম না। ফুলের মত কোমল মেয়েটির অপমানে আমার মুখ থেকে যেন জোর ক'রে কথা বার হ'ল, 'ছোটমামা, তুমি কি মানুষ? কোথায় গেল তোমার নারী-জাতির ওপর শিভাল্‌রি-এর কথা, কতকাল ধরে তো বলে এসেছ 'কন্যাপক্ষের চিরদিন অপমান'। কই, আজ তো তোমার কন্যাপক্ষের ওপর কোন দয়াদাক্ষিণ্য মনে এল না? আজ যে দুর্ব্বল কন্যাপক্ষের বরপক্ষের অপমানে এত লজ্জা—তা তো তুমি একবার ভাব্‌লেও না?'

মনে আছে, সেদিন আমার এত কথার, এত রাগের উত্তরে ছোটমামা একটি কথাই বলেছিল। অধরে ক্লান্ত করুণ একটু হাস্য, চোখে মলিন শ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে ছোটমামা বলেছিল, 'রুবি, তুই এখনও ছেলেমানুষ, এসব বুঝ্‌তে পার্‌বি না। কন্যাপক্ষই চিরকাল প্রবল।'

গরমের ছুটিতে আমি ও মা দাদার সঙ্গে বিষ্ণুপুরে ছোটমামার কাছে গেলাম। মা দাদার সঙ্গে এখানে ওখানে বেড়িয়ে ফির্‌তেন। আমি ছোটমামার কাছে বাড়ীতেই থাকৃতাম।

সেদিনটা আজও আমার পরিষ্কার মনে আছে। মা দাদা বাড়ী নেই। বাইরে বস্‌বার ঘরে গ্রীষ্মের রমণীয় বৈকালে আমি আর ছোটমামা বসে গল্প করছি। ছোট-মামার মুখে পাইপ্, আমার হাতে একখানা ইংরেজী কবিতার বই।

বাইরে মোটর দাঁড়াবার শব্দ পাওয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভারী রেশমের পর্দা সরিয়ে যে মেয়েটি ঘরে ঢুক্‌ল, তাকে দেখে সে দেখ্‌তে ভাল কি মন্দ, সে সব

কিছু মনে হবার আগেই মনে হয় এর সঙ্গে মেশ্‌বার পর, একে দেখ্‌বার পর কোন পুরুষের একে ছাড়া দিন কাটে কেমন ক'রে ?

ছোটমামার দিকে তাকিয়ে দেখি, এক মুহূর্ত্তে তার মুখের চেহারা বদলে গেছে। আনন্দ, আশ্চর্য্য ভাব, অভিমান, প্রেম সমস্ত মিলে তার সুন্দর মুখকে আরও অপরূপ ক'রে তুলেছে। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ছোটমামা বলে উঠ্‌ল, 'ললিতা, তুমি এ সময়ে ?'

ললিতা উত্তর দিল, 'মা এসেছেন সঙ্গে।'

ললিতার মা স্থূল দেহভার বহন ক'রে ঘরে ঢুক্‌লেন, হাতে তাঁর একতাড়া নিমন্ত্রণের লাল চিঠি। তারই একখানা ছোটমামার দিকে অগ্রসর ক'রে দিয়ে ভদ্রমহিলা অনর্গল বকে চললেন, 'বড় তাড়াতাড়ি দিন ঠিক হয়ে গেল সোমেশ। তোমাকে আর কি বল্‌ব ? সেই তোমার প্রথম চাকরির দিন থেকে এখানে আমাদের সঙ্গে আলাপ। তুমি তো ঘরের ছেলে, যেও ললিতার বিয়েতে। আমরা আর কি করব বল ? আমাদের মন তো তোমার ওপরেই ছিল, কিন্তু যে জেদী মেয়ে! ব'লে বস্‌ল দ্বিজেনকে ছাড়া কাউকেই বিয়ে কর্‌বে না। কি আর করি বল ? এতদিন চেষ্টাও তো কম কর্‌লাম না! ছেলেবেলা থেকে দ্বিজেনের সঙ্গে আলাপ। এত বড় মেয়ের মতামতটাই এক্ষেত্রে আমাদের সব চেয়ে বেশী। তা, তোমার কি আর পাত্রীর অভাব? ললিতার বিয়ের পর দেখে আমিই পছন্দ ক'রে দেব। বড় তাড়াতাড়ি, আর দাঁড়াবার সময় নেই। যা হোক্, সোমেশ, তোমার কিন্তু যাওয়া চাই।'

তাঁরা বেরিয়ে চলে গেলেন—আর কোন দিকে দৃষ্টিক্ষেপ না ক'রে—ঝড়ের গতিতে।

কি একটা বল্‌তে যেয়ে সহসা ছোটমামার ওপর চোখ পড়ে আমি থেমে গেলাম। ছোটমামার হাত থেকে জলন্ত পাইপটা পড়ে গিয়ে দামী কার্পেটখানা পুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আর ছোটমামার মুখ!—মানুষ কি কখনও জীবিত অবস্থায় এত শাদা দেখাতে পারে!

আমার প্রতিজ্ঞা ছিল, ছোটমামা নিজের থেকে কিছু না বললে আমি কখনও তাকে জিজ্ঞাসা করব না। আমার তাকে প্রশ্ন কর্‌তে হল না কিছু, তারও কিছু আমাকে বল্‌তে হ'ল না। আমাদের দৃষ্টি সম্মিলিত হ'ল মাত্র। আমার জীবনের পরম সুহৃৎ, আমার প্রিয়তম আত্মীয়ের মুখের দিকে একবার চেয়ে আমি বুঝ্‌তে পারলাম তার সব কথা।

আমার ব্যথিত স্তম্ভিত দৃষ্টির সাম্‌নে দিয়ে ধীরে ধীরে ছোটমামা গিয়ে তার শোবার ঘরে ঢুক্‌ল। দ্বার আমারই চোখের সাম্‌নে বন্ধ হয়ে গেল।

সেই রুদ্ধদ্বারের দিকে চেয়ে চেয়ে আজ আমি ছোট-মামার সেদিনের কথা এতদিন পরে বুঝ্‌তে পার্‌লাম—

'রুবি, চিরকাল কন্যাপক্ষই প্রবল।'

অমৃত-সন্ধানে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(১)

চন্দন কাঠের চিতা সাজায়ে বণিক পিতা
শোকমগ্ন গাঙ্গুড়ের তীরে।
বেহুলার কোল থেকে শব কেড়ে লইবে কে ?
একে একে সবে আসে ফিরে।
সনকা ফুকারি কাঁদে, চাঁদ ডাকে বজ্রনাদে
"জয় শূলী-শম্ভু" বার বার।
শুধু বেহুলার চোখে অশ্রু নাই এই শোকে
বহ্নি-জ্বলে নয়নে তাহার।
মন্ত্রতন্ত্র ঔষধাদি উপদেশ সাধাসাধি
এই সবে বেড়ে যায় বেলা।
সাথে লয়ে মৃতপতি ভাসাল বেহুলা সতী
গাঙ্গুড়ের খরস্রোতে ভেলা।
ভাসিয়া নয়ন জলে 'ফিরে আয়' মাতা বলে
পিতা ডাকে 'মাগো ফিরে আয়।'

শাশুড়ীও কয় ডেকে "নেমে এস ভেলা থেকে
তোমা পেয়ে ভুলিব বাছায়।"
ছয় বধূ সনকার ডেকে বলে বারবার
"নেমে আয় ফিরে আয় বোন।"
দুই কূলে সারি সারি দাঁড়াইয়া নরনারী
বলে—"মাগো মার কথা শোন।"
ভাই বোন বেহুলার কত সাধে বার বার
সাথে সাথে ছুটে তীরে তীরে।
বলে "বোন ফিরে আয় মায়ের আঁচলছায়,
পাগলিনী মড়া বাঁচে কি রে।"
চম্পকনগর হ'তে গাঙ্গুড়ের খরস্রোতে
কলার মান্দাস যায় ভেসে।
না বাঁচাইয়া লখীন্দরে আর ফিরিবেনা ঘরে
বেহুলা বলিয়া যায় হেসে।
প্রকৃতি ভ্রূকুটি হানি বলে, "ওগো সতীরাণী
ফিরে যাও অবোধ বালিকা।
মৃত কভু বাঁচে না যে এ কথাটি জানে না কে?
আশা তব শুধু মরীচিকা।"
স্বর্গ হ'তে দেবতারা বলে "ওরে জ্ঞানহারা,
মরেছে যে দেবতার শাপে,
কে তারে বাঁচাবে আজ? শিবেরো অসাধ্য কাজ,
ফিরে গিয়ে বল তোর বাপে।"
বলিছে বনের পাখী "মৃত কভু বাঁচে না কি?
ফিরে যাও আপনার গ্রামে।"
দুধারে মড়ার লোভে কুমীরেরা ভাসে ডোবে,
শকুনি ভেলার পরে নামে।
দুধারের লোকে কয় "এ কি মেয়ে নেই ভয়,
কোথায় চলেছ একাকিনী?
সাথে পচা খসা মড়া, যৌবন লাবণ্যভরা
রূপ ধরি' তুমি কি ডাকিনী?"
দেহে নাই মাংসলেশ অস্থিমাত্র আছে শেষ,
আগুলিয়া তাই চলে সতী।
কাহারো কথায় কান দেয় না সে দিবে প্রাণ
অস্থিতেই জিয়াইবে পতি।

(২)

ভুলিয়াছি হাহাকার ছয় বধূ বিধবার
ভুলিয়াছি সনকার ব্যথা।
ভুলিয়াছি মনসার জোর করি স্ব-পূজার
প্রচারের তরে নিষ্ঠুরতা।
সপ্ত মধুকর তরী তারো কথা নাহি স্মরি,
চন্দ্রধরে বীর ব'লে মানি,
তাহারো পুরুষকার তাও ভুলি বারবার
ভুলি নাই এই চিত্রখানি।
এই গাঙ্গুড়ের ধারা কোথায় হয়েছে হারা?
বাঙ্গালীর চিত্ত-পারাবারে
অশ্রুর বন্যায় ভেসে মিলিয়া গিয়াছে শেষে,
এ কথা বুঝাতে হবে কারে?
স্মৃতির তরঙ্গদলে সে ভেলা ভাসিয়া চলে
যুগে যুগে অনন্তের পানে।
বসি সতী তার 'পরি অস্থিমুষ্টি বক্ষে ধরি'
চলিয়াছে অমৃতসন্ধানে।
অশনি কাঁপায় সৃষ্টি রোধে দৃষ্টি ঝঞ্ঝাবৃষ্টি,
পলে পলে দৈব দেয় হানা,
জলে ডুবে চলে ভেলা সর্ব্ববাধা করি হেলা,
নাহি মানি দেবতার মানা।
দিন যায়, মাস যায়, কালের উত্তাল ঘায়
কত শতবর্ষ পড়ে ধ্বসি,'
কোথা গাঙ্গুড়ের তীর? সেথা রুধি অশ্রুনীর
প্রতীক্ষায় কেহ নাই বসি।
কোথায় উজানী গ্রাম? বিস্মৃত তাহার নাম।
চিহ্নহারা চম্পকনগর,
হিঁতালের যষ্টি ধরি শুধু শূলীশম্ভু স্মরি
ঘুরে একা চাঁদ সদাগর।
অনন্ত-যৌবনা নারী অনন্তে দিতেছে পাড়ি,
উড়ে ঝড়ে রুক্ষ ঘন কেশ।
অশ্রুভরা পারাবারে কে তারে ফিরাতে পারে?
কেবা জানে কোথা যাত্রাশেষ!
এই পারাবারে পশি কত কীর্ত্তি গেল ধ্বসি'
ডুবে গেছে কত মধুকর,
বেহুলার ভেলাখানি কোন বাধা নাহি মানি
আজো ভাসে ঢেউএর উপর।
সতীত্বের তেজস্বিতা হয় না কো অনুমৃতা,
চলে হেন কোলে করি শব,
অমৃতের অন্বেষণে যুঝিতে নিয়তি সনে
অসম্ভবে করিতে সম্ভব।

প্রাণের ঝরণা

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যদি সূর্য্য নিভে যায়! অনন্ত জ্যোতির্লেখনের মাঝে থাক্‌বে সৌর-পুরাণ মহাকালের পৃষ্ঠায়? আমাদের নীহারিকা হবে কি হীনপ্রভ অজ্ঞাত-জগৎবাসী আলোক-সঞ্চারী সন্তানদের দৃষ্টিতে? অ-তল অন্ধকার লুকাবে সৌর-জগৎকে, হিম-সূর্য্যাঙ্গ অসীম শূন্যে হবে পরিব্যাপ্ত হিম বস্তু-ফেনায়। চন্দ্র ছুটবেন ব্রহ্মার কাছে অনুযোগ করতে; ওষধি বনস্পতির একচ্ছত্র সম্রাটত্ব হারিয়ে। সন্ধ্যার ভালে কি অলংকৃত হবে প্রিয় সন্ধ্যাতারা? দেব-গুরু বৃহস্পতি দেবলোককে আশ্রয় নিয়ে ধ্যানে অন্বেষণ করিবেন ব্রহ্মলোকের আকস্মিকতার ইঙ্গিত। যদি সূর্য্য নিভে যায়! হিম-শৈত্য নাম্‌বে পৃথিবীর বুকে অ-তল অন্ধকারের নিস্তরঙ্গ স্রোতে—পিশাচের বক্ষে যক্ষ করবে বাস! পৃথিবী আবর্ত্তন করে যাবে, মেষ বৃষ কর্কট মিথুন···করবে সমাবর্ত্তন মহাকালের অট্টহাস্যের তালে, মহাকালের পাক-যন্ত্রে চিত্রা ভরণী বিশাখা···সুন্দরী সপ্ত-বিংশতি সোম-পত্নীরা হবে মথিত বিখণ্ডিত। হিম-অন্ধকারের প্রেত-লোকে সৌর-জগতের কঙ্কাল—বস্তুফেনার স্তূপ, কল্প-বিবর্ত্তনের কঙ্কাল রাশিতে মিশে যাবে।

'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' পরম পুরুষ আছেন কোন্ ব্রহ্মলোকে—'অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ'। অগ্নি—প্রজাপতি, সূর্য্য সেই অগ্নির সমিধ্। 'তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ, সোমাৎ পর্জ্জন্য-ওষধয়োঃ পৃথিব্যাম্।' স্বর্গলোক সমিদ্ধ হচ্ছে সূর্য্য দ্বারা, চন্দ্র হতে মেঘসম্ভাত, মেঘ হতে পৃথিবীতে ওষধি-রাজির উদ্ভব। ক্রমানুসারে উৎপত্তি জীবের ওষধি-বনস্পতি সম্ভাত বীর্য্যের পরিক্রমণে—জীবোত্তর আমরা মানুষ। সূর্য্য সবিতা-জনক পৃথিবীর। সুন্দর জগতে মানুষের জন্ম দিলেন সূর্য্য। *মানুষের জ্ঞান শ্রদ্ধা প্রেম সৌরালোকসম্ভাত।*

> 'পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য
> ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো।
> যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
> যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।'

হে জগৎ-পোষক! হে একাকী গমনশীল! হে সর্ব্ব-সংযমী! হে সূর্য্য! হে ব্রহ্ম-সন্তান! তোমার রশ্মি-জাল অপসারিত কর, তীক্ষ্ণ তেজ সংহরণ কর, তোমার অশেষ কল্যাণময় রূপ দেখি। ঐ যে আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ, আমি তাঁহার সঙ্গে একক হয়েছি।

পরমপুরুষ আমাতেও অধিষ্ঠ—তাঁর চক্ষুযুগল চন্দ্র সূর্য্য। সূর্য্য-চন্দ্রের কল্যাণময় রূপে তাঁর পরিচয়। সৌরালোকের প্রাণেই তাঁকে জানা যাবে—সৌরালোক-অপসারণে নয়। ঋষির শ্রদ্ধা-নিবেদন জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের অন্তরে ব্রহ্মময় পুরুষের কাছে। যদি সূর্য্য নিভে যায়! হিম-শৈত্যের পেশক-দণ্ডে মানুষ হবে পাথর···মহাপ্রাণকে অ-সীম পেশন আণবিক পরিবর্ত্তনে বাঁধবে; কঠিন হীরকে·· মহাকালের কপোলে জ্বলবে সেই মণি!···যুগ-বিবর্ত্তনে, সৌর-জগতের অসীম ব্যাপ্তিতে দানব-শক্তি 'জমাট বেঁধে' রাখ্‌বে বস্তুর স্তূপ!

মহাসমুদ্রের বুকে উড়ে বেড়ায় ক্ষুদ্র পাখী—তৃষ্ণাতুর কণ্ঠ ভিজিয়ে নেয় ক্ষুদ্র ঠোঁট দুখানি মহাসমুদ্রে ডুবিয়ে। অনন্ত-সমুদ্র হতে অনন্তাংশে পরিমিত তার নেওয়া—সমুদ্র জান্‌তে পারে কি? কিন্তু পাখী ঋণী তার কাছে পিপাসু মহাপ্রাণের পরিতৃপ্তিতে, জল পান করে। সৌর-জগতের অনাদি অনন্ত পরিস্থিতি সৌরালোকাপ্লুত, ক্ষুদ্র পৃথিবী নেয় অনন্তাংশ সেই আলোক-রাশির। চাঁদ সুন্দর ত' সেই আলোকেরই প্রতিফলন নিয়ে! মানুষের প্রেমের উৎস ত' সেই চাঁদেরই জ্যোৎস্নায়!

মহাশূন্যে অণু-পরমাণু করছে রুদ্রের লীলা সৃষ্টির তাণ্ডবে। কোটী সূর্য্যের জ্যোতিঃ—কোটী আবর্ত্তমান নীহারিকা—খণ্ড-বিখণ্ড নক্ষত্র-পুঞ্জ—নারকীয় অন্ধকার, আলোকময় স্বর্গপুরী—অপরিমিত উত্তাপ আর শৈত্য—ঘূর্ণনের ভীম বেগ—সৃষ্টির প্রচণ্ড উন্মত্ততা ভাঙা-গড়ার খেলায়···

> ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
> স্তরে স্তরে
> সূর্য্যচন্দ্র তারা যত
> বুদ্বুদের মত।

অণু-পরমাণু সৃষ্টির উত্তেজনায় ঠিক্‌রে উঠে কল্পনাতীত পথ পলক-মাত্র সময়ে ছুটে আসছে, বিঁধছে গ্রহের দলকে। জ্বলন্ত সূর্য্য কবে একাঙ্গ বিচ্ছিন্ন করেছিল—কত কল্প কত যুগ চলে গেছে তারপর—উত্তেজনা কমে' শৈত্য এসে গড়েছে আমাদের পৃথিবী। বেগবান্ সূর্য্যের অংশ হয়ে আসছে জড়'। প্রতি প্রভাতে সূর্য্যের আলো আনে জড়ের গতি।

পাখী—'ভোর না হতে ভোরের খবর কেমন ক'রে রাখে?' কি আবেশ মাখা তার সুরে, কি বাণী তার কণ্ঠে! কোন্ স্বপ্নলোকের দেশ থেকে সে আবাহন ক'রে আনে আলোককে? পূর্ব্ব-আকাশে ফোটে অরুণিমা—পাখী মুগ্ধ হয়ে দেখে, কণ্ঠে সুর হয় মধুরতর—চক্ষে সৌন্দর্য্য-তন্ময়তা, পুচ্ছে ছন্দিত আনন্দ! বাষ্পপুঞ্জে আবীর···আবীর ছড়ানো নীলিমায়, পাখীর সুর হয় মধুরতম—স্নিগ্ধ বাতাসে সে সুর গলে' যায়, আকাশের কোলে সুর হয় মূর্চ্ছিত। পাখী গেয়ে যায়··

ঘুমন্ত মানুষকে যত স্বপ্নাতুর কোমল স্পর্শে জান্‌তে পারে জাগ্‌বার

সময় হয়েছে। স্বপ্ন-কাতরতার ভিতর হতে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে বিস্ময়-ভরা পুলক-ভরা আধ-তন্দ্রাচ্ছন্ন বহি-চেতনা। স্পর্শের বাণী তখনও ধ্বনিত হচ্ছে শিরায়—'জাগো জাগো'! প্রাণ চাইল, আনন্দে ভেসে উঠ্‌ল, পরীরা বললে—'ঘুম ভাঙ্‌ল! ওঠো ওঠো'—যেন মৃদু ভৎর্সনার সুর!

পৃথিবীর ওপাশ থেকে সূর্য্য এসে দাঁড়িয়েছেন দুই গোলার্দ্ধের সন্ধিক্ষণে—মাটীর সমতল হতে তখনও অনেক নীচে—আকাশ হতে যেন আলোর পরীরা নাম্‌ছে—স্বচ্ছ নীলাভ শুভ্র তাদের ওড়না, অঙ্গের রং অতি-বেগুণী। আলোর পরী ধরার নিদ্রামাখা শরীর স্পর্শ করে—স্বর্গের আনন্দ পরমাণুর অন্তরে পুলক আনে।

মালঞ্চে সকলেই জাগ্‌ল। কোন্ ফুল-কলিকা আগে উঠেছে? আমি—আমি—যেন চারিপাশ থেকে সুর ওঠে। প্রতিক্ষণে কলরব বাড়ে, আকাশপথে সূর্য্য ছড়িয়ে দেন মুঠি মুঠি সোনা—প্রাণের কণিকা কে আগে নিতে পারে! কে কত বেশী সংগ্রহ করতে পারে! প্রাণগুলো ছিট্‌কে ওঠে দেহ ছেড়ে প্রাণের কণিকা লুফে নিতে। নাম্‌ছে পড়্‌ছে ঝর্ণার ধারায় মহাশূন্য থেকে প্রাণের পুলক্। মালঞ্চ হল পুলকিত।

সে কোন্ শিল্পী—'অবিজ্ঞাতম্ বিজানতাং বিজ্ঞাতং আবিজানতাম্', পাখীর কণ্ঠে জাগাল চারণ-কবি, ফুলকে করিল স্নেহ ঘুম ভাঙিয়ে স্নিগ্ধ স্পর্শে। কে সে অনন্দময়, বিশ্বের প্রাণে যার হৃদয়ের সুর তুল্‌ছে প্রতিধ্বনি। আনন্দের ঝর্ণা কে তুমি করলে মুক্ত আকাশ-পথে?

'তোমার আলো গাছের পাতায়
নাচিয়ে তোলে প্রাণ।
তোমার আলো পাখীর বাসায়
জাগিয়ে তোলে গান॥'

সূর্য্য ওঠেন অগ্নিরথে। অতি-বেগুণী সব আগে পরীর অনুভূতি নিয়ে ছুটে এসেছিল—এখন বর্ণচ্ছটায় সমষ্টিগত হয়। আলোর কণিকা ঠিক্‌রে ওঠে, দল বাঁধে, মহাবিশ্বের আনন্দ নিয়ে ঝর্ণার ধারায় তরঙ্গিত হয়ে নামে। আলোর বর্ণচ্ছটায় সাত্‌টা বর্ণ—প্রতিটি বর্ণ বিশেষ বিশেষ কণিকার প্রবৃত্তি-গত সন্নিবেশ। সেই কণিকাদের দলগত কার্য্যপ্রণালী সৃষ্টি করে প্রতিটি আলোর কণা—শুভ্র ও দীপ্ত। ঝর্ণার তরঙ্গে আলো নামে, অচেতন জগৎকে করে সচেতন সূক্ষ্ম স্পর্শে—আলোর কণিকারা দল ভেঙে স্বতন্ত্র হয়ে দেহের অণুতে মাটীর অণুতে করে আঘাত—অতি-লোহিত কণিকা বিশ্বের তাণ্ডব-সুর, মহাশূন্যে মহাবিশ্ব-গঠন ও ধ্বংসের ক্রিয়া আনে প্রাণের কণায় প্রতি মুহূর্ত্তের পরিবর্ত্তনে আলো যত হতে থাকে দীপ্তিময়, দেহের অণুতে অণুতে তত লাগে প্রেরণার প্রতিধ্বনি।

বহ্নি-পিণ্ড আকাশের শিরে। বাতাসে হয় তাপ-বিনিময়, বিশ্বের প্রাণে জাগে কর্ম্মের প্রেরণা। এরা আপনাকে শুচি করে আলো-স্নানে, আহুতি দেয় জল—অগ্নির দীপ্যমান্ জিহ্বা গ্রহণ করে আহুতি। দোলায়মান সূর্য্যরশ্মি আহুতিকে করে' দেয় আপনার—প্রভাতে গায়ত্রী-ছন্দে যে আহুতি হয় নিবেদিত—দেব সবিতার বরেণ্যকে, তাহা আদিত্য-রশ্মিরূপে উপনীত হয় সুরপুরে। সপ্ত-জিহ্বা অগ্নির—'কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী—॥' সপ্ত জিহ্বা সৃষ্টির মাঝে আনে স্রষ্টার বাণী, স্রষ্টার মাঝে সৃষ্টিকে করে মিলিত।

পাষাণের স্তূপে আলো আঘাত করে বিফলে। পাষাণ জাগ্‌বে না। প্রাণের সুর জমে গিয়ে বস্তুত্বের বিরাট অহমিকায় দাঁড়িয়ে আছে—নড়ে না, আলোকে করে বিদ্রূপ। কলুষতার বস্তুত্বে মানুষ নামে তমো-গুণেরও নীচের তলায়। পাপের চরমতা দেহ ও মনকে করে বস্তুত্বের স্তূপ। আলো জাগাতে পারে না তাকে। শাস্ত্রে বলে—অতি-পাতক জন্মান্তরে হবে পাহাড়। অতি-পাতকতা শুধু বস্তুত্বের চরম নয়, অবিনশ্বর অতি-পাতকী চেতনা দেহান্তরে স্থূল পর্ব্বতের শরীরে আপনাকে গড়বে! পৃথিবীর চরম বস্তুত্ব পর্ব্বতে—পরমাণুর গতি নেই, সমষ্টিগত কার্য্যক্ষমতা ত' নেই-ই। কলুষ-ভার-গ্রস্ত মন পাহাড় বাড়িয়ে তুল্‌বে—

'অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্ম্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে।'

যুগযুগান্তর পরে কখন পৃথিবীর ভিতরকার প্রাণ উপরের বস্তু ভারে গুমরে উঠ্‌বে। আলোর প্রেরণায় আবার সেই পাষাণ টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে প্রাণের কণায় আশ্রয় গ্রহণ কর্ব্বে।

'নাচে আলো নাচে ওগো আমার হৃদয়মাঝে।'

আমি জড়পরমাণুর সমষ্টি ও প্রবৃত্তি। চারিদিকে 'বস্তুরূপে উঠিতেছে স্তূপে স্তূপে' জড়দেহ—অন্তরে এক টুক্‌রা *প্রাণের কণিকা, পৃথিবীর* বক্ষ সৃষ্টির যে জ্বলন্ত উত্তেজনা রেখেছে লুকিয়ে, তারই একটি অণু। আলোর তরঙ্গে নাচে আনন্দ। দেহের জড়ত্বে—আণবিক স্থূলত্বে আলো আনে সমষ্টিগত প্রভাব। অঙ্গ নেচে ওঠে প্রাণের বার্ত্তায়। সত্ত্ব রজঃ তমঃ—দেহের জড়ত্বের পরিমাপ।

'তার অন্ত নাহি গো, যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ
তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ।'

অণু পরমাণুর সমষ্টিগত প্রবৃত্তিতে, আলোর বিশেষ কণিকাগুলিকে ধরে, ময়ূর-পুচ্ছের অকৃত্রিম কারুশিল্প, মণিমাণিক্যের বর্ণময় দীপ্তি, আমাদের দেহের পীতত্ব, প্রতি গাছে প্রতি ফুলটিতে বর্ণের বিচিত্রতা। রক্তজবা আলোর লোহিত-কণিকা নিয়ে—আলোর রাসায়নিক ক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ উপাদানকে নিয়ে, সৌর-জগতের সৃষ্টি ও ধ্বংসের যে কারণ তারই হয় অভিব্যক্তি। তাই, তামসী জবার স্থান কালিকা-চরণে। সূর্য্যের আলোর—শক্তিগত তরঙ্গে, সমষ্টিগত শুভ্রতায় পাই ভূমার পরিচয়। আলোর বর্ণচ্ছটা পরমাণুর উপরে হয় প্রতিবিম্বিত—কণ্ঠের শিরায় তাই ওঠে ধ্বনি।

'আলোর রং যে বাজল পাখীর রবে।'

তখন সূর্য্য চলে যান পৃথিবীর ওপাশে। তখন—

'মেঘে মেঘে সোনা
(ও ভাই) যায় না মাণিক গোণা,
পাতায় পাতায় হাসি
(ও ভাই) পুলক রাশি রাশি
সুর-নদীর কূল ডুবেছে সুধা-নিঝর-ঝরা।'

পশ্চিমের আকাশ আপনি বিস্মিত কোন্ মননময় শিল্পীর সৌন্দর্য্য-সাধনার উৎকর্ষ আপন বক্ষে নিয়ে। সূর্য্যের আলো সেই তলা থেকে কত পথ বেঁকে আসছে 'আলোকের বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া ওঠে বর্ণস্রোতে'। পৃথিবীর এ পাশে তখন চুপটি-করা উদাসভাব—পশ্চিমাকাশে আলোর পথ বেয়ে কত দূরে চলে যায় মন চেতনার স্রষ্টা সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে।… কখন্ কোমল আলোর ঝর্ণা নামে পৃথিবীর উপর—সূর্য্যের যে আলো চাঁদে হয়েছে প্রতিফলিত। আলো স্পর্শ করে দেহের পরমাণুকে—মহাশূন্যে শত সূর্য্যের তাণ্ডবের মাঝে বিশ্বের নিস্তব্ধ পরিস্থিতি যে ভূমা করেছে সৃষ্টি প্রতিফলন যে সমষ্টিগত স্নিগ্ধতা পেয়েছে, তারই আনন্দ বহন করে। কি-যেন পায় মানুষকে জ্যোৎস্নার মাঝে!—যেন কোথায় প্রতিফলিত করতে চাই আপনাকে, কোন্ স্নেহের—কোন্ প্রীতির—কোন্ প্রেমের অজানা মূর্ত্তিখানিকে প্রাণের প্রতিফলনে পুলকিত করতে চাই…উদাস-শিল্পী পৃথিবী-মুগ্ধা প্রেমময়ী চন্দ্রিমা, শিল্পীর তন্ময়তায় বিস্ময়-প্রসূতা,—শিল্পীর উদাস-ভাব; তার জীবন-সাথীতে যে দেহ-হীন স্বপ্নলোকে সে করে বাস, তারই বিভোরতা।…আজ কৃত্রিম জ্যোৎস্নার উপায় হয়েছে! গবেষণাগারের ভিতর হতে অণুপরমাণুকে টুক্‌রা করে বেগবান্ বিদ্যুৎকণাকে বায়ুতরঙ্গে ছেড়ে দিলে তাড়িতিক বিকীরণ কোমল রশ্মি-জাল সৃষ্টি করবে। কিন্তু আজিকার আনন্দ?

জ্যোৎস্নার কান্না নিয়ে চাঁপা ফোটে—জ্যোৎস্নার মাঝে; অন্ধকারে বিচ্ছুরিত রশ্মি তার কাছে পৌঁছায়। শুভ্র পাপড়ীতে ভূমার স্বত্ব। অনন্ত ভূমার সত্তা—শিব। রূপকথার বন্দিনী রাজকন্যা তাই রাক্ষস-পুরীতে রাজকুমারকে লুকাতে পারত শিব-মন্দিরের চাঁপার রাশিতে। তমো-গুণাধার রাক্ষস তবু গন্ধ পেত রক্তমাংসের। যদি রাজকুমার হতেন চাঁপার পাপড়ীর মত সত্ত্বমনা, রাজকন্যাকে বলতে হত না—'আমি ভিন্ন এখানে আবার মানুষ পেলে কোথায়? ইচ্ছা হয়, আমায় খাও।' কিন্তু রাক্ষস ত' ভুল করে নি! মানুষের দেহের গন্ধ সে ঠিক ধ'রেছিল। মানুষ যদি সত্ত্ব-গুণময়ই হত! মানুষের দেহে প্রতিটি অণুপরমাণুতে যদি সম্পূর্ণ সমষ্টিগত প্রবৃত্তি থাক্‌ত!—আলোর ঝর্ণা, কি বিচ্ছুরিত, কি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্বের সুর বাজাত পরমাণুর অন্তরে ধনাত্মক-কেন্দ্রীনের চারিপাশে ঋণ-বিদ্যুৎকণার আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে!…

দিনের আলোর স্বপ্ন-বিলাসী গায়—'কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে কোন্ ছায়াময়ী অমরায়?' আলোকের সন্তান, আলোকের ঝর্ণা-ধারাতেই তার সঞ্জীবনী শক্তি, কেমন করে যে সে ক্লান্ত হয় সেই আলো-স্নানে? সুবর্ণময় পুরুষ আদিত্য-মণ্ডলে অবস্থান করেন—উদ্ঘাটিত করেন পৃথিবীর দৈনন্দিন ইতিহাস, উদ্দীপিত করেন পৃথিবীর জীবন—'য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশঃ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ।' আলোকের সন্তান কণ্ঠে গায় সুর সেই পরম পুরুষের প্রেরণায়।

অন্ধকারে মনে জাগে বিক্ষোভ। কৃত্রিমতার আশ্রয় নিই। অনুভব করতে পারি না, দিনরাত্রি আলোর রশ্মি-জাল ঝরছে পৃথিবীতে—বায়ুতরঙ্গে পরমাণুর বিকীরণ ও অনন্ত ছায়াপথ হতে অনন্ত-সঞ্চারী সূক্ষ্ম রশ্মি-রাশি। অনন্ত জ্যোতিষ্ক রশ্মি-করে করেন আশীর্ব্বাদ—শিশুকে জানান্ কৈশোরের আনন্দ মনের অবচেতন কোণে, কিশোরকে যৌবনের উচ্ছ্বাস। মাতৃ-গর্ভ হতে জরা পর্য্যন্ত সেই রশ্মি-জাল যৌন প্রেরণায় হাসায় কাঁদায় যত আলোর সন্তানকে।

'আলো তোমায় নমি, আমার
মিলাক্ অপরাধ।
ললাটেতে রাখো আমার
পিতার আশীর্ব্বাদ।'

অতীতের সত্যময় দিনে, ঋষিরা জান্‌তে পেরেছিলেন, আলোর সোনার স্পর্শ মনকে জাগিয়ে তোলে তমসের সুপ্তি থেকে—আলোর ধারা প্রাণের ঝর্ণা, তাহাতে স্নান করে জড়ত্ব ঘুচে যাবে, প্রাণের সূক্ষ্ম বার্ত্তায় মনের স্থূলত্ব হবে অপসারিত, স্বর্গের তৃপ্তি আসবে। তাঁরা মুক্তকণ্ঠে বলেছিলেন—

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো চ
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিম্ বিধেম।

হে বহ্নি! আমাদের সুপথে, ঐশ্বর্য্যময় পদ্ধতিতে পরিচালিত কর। আমাদের সর্ব্ব কর্ম্ম তোমার বিদিত। আমাদের কুটিল পাপপুঞ্জ বিনাশ কর। তোমাকে ভূয়িষ্ঠ প্রণতি নিবেদন করি।

'যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে,
অরুণ আলোর সোনার কাটি ছুঁইয়ে দাও।
আলোকের এই ঝর্ণা-ধারায় ধুইয়ে দাও।"

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

বাংলা ১২৯২ সনের ১লা বৈশাখ (ইং ১৮৮৬ সালের ১২ই এপ্রিল) মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বহরমপুরে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন এবং ঢাকায় নবাব-দরবারে উচ্চ রাজকার্য্য করিতেন। যখন মুর্শিদ-কুলি খাঁ ঢাকা হইতে দেওয়ানী দপ্তর মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করিলেন, তখন তাঁহাদের এক শাখা ভাগীরথীর তীরে মুর্শিদাবাদের অপর পারে দাহাপাড়ায় এবং অপর শাখা যশোহরের অন্তর্গত চৌঘরিয়ায় বসতি স্থাপন করেন।

এই বংশীয় মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া বহরমপুরে ওকালতী ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে স্বনামখ্যাত স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেনও বহরমপুরে ওকালতী করিতেন। ইঁহারা দুইজনেই মতিলালের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। স্যর গুরুদাস মুক্তকণ্ঠে মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধীশক্তি ও আইন বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট নিজের সফলতার জন্য ঋণস্বীকার করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

মতিলালের দুই বিবাহ ছিল। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে একটি মাত্র পুত্র হয়। দ্বিতীয়া স্ত্রীর আটটি সন্তানের মধ্যে মাত্র একটিই বাঁচিয়াছিলেন; ইনিই স্বনামধন্য রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাল্যে রাখালদাস ভোগ ও বিলাসের মধ্যেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ধনী পিতার দ্বিতীয় পক্ষের আটটি সন্তানের মধ্যে একমাত্র জীবিত পুত্রের যে কিরূপ অত্যধিক আদর হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। পরিণত বয়সে রাখালদাস নিজেই তাঁহার বাল্যকালের অনেক অসঙ্গত আবদারের কথা গল্প করিতেন। কোন বিষয়ে অভীষ্ট সিদ্ধ না হইলে ক্রোধ পরবশে তিনি কারেন্সী নোট টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেন এবং ইহার জন্য তাঁহাকে কেহ কিছু বলিতে পারিত না। এইরূপ পরিবেষ্টনের মধ্যে বর্দ্ধিত হওয়ায় তাঁহার বাল্যজীবনে সংযম শিক্ষার সুযোগ হয় নাই। উত্তরকালে এই সুশিক্ষার অভাব তাঁহার জীবনে অনেক দুঃখের কারণ হইয়াছিল।

রাখালদাস বাল্যকালেই ধীশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুল হইতে তিনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পনের টাকা বৃত্তিলাভ করেন। তিন বৎসর পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ্-এ পরীক্ষায় প্রথমভাগে উত্তীর্ণ হন। এই বৎসরই তাঁহার পিতা-মাতা উভয়ের মৃত্যু হয় এবং বৈষয়িক গোলমাল ও মামলা মোকদ্দমায় ব্যতিব্যস্ত হওয়ায় কয়েক বৎসরের জন্য তাঁহার পড়াশুনা স্থগিত রাখিতে হয়। অবশেষে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইতিহাসে অনার্সসহ তিনি বি-এ পরীক্ষায় এবং ১৯১০ সনে উক্ত বিষয়ে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিবার পরেই রাখালদাসের বিবাহ হয়। তাঁহার স্ত্রী ৺কাঞ্চনমালা দেবী উত্তরপাড়ার জমিদার নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ছিলেন। তিনি বিদুষী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি বাংলায় কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করেন। বিবাহের তিন বৎসর পরে রাখালদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র অসীমচন্দ্র এবং ১৯০৯ সনে তাঁহার বর্ত্তমানে একমাত্র জীবিত-পুত্র অদ্রীশচন্দ্রের জন্ম হয়।

রাখালদাস যখন কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন হইতেই তাঁহার মনে ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য অদম্য আগ্রহ ও উৎসাহ জন্মে। এই সময়ে তিনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্পর্শে আসায় এই বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানলাভের অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই যে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব-বিষয়ে তাঁহার শিক্ষাগুরু ইহা রাখালদাস চিরদিনই মুক্তকণ্ঠে ও কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিয়াছেন। বি-এ পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই রাখালদাস ভারতীয় পুরাতত্ত্ব-বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জ্জন করেন। এই জন্য প্রায়ই তিনি কলিকাতা মিউজিয়মে যাতায়াত করিতেন। এই সময়ে ডক্টর থিওডোর ব্লক ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের অন্যতম

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও মিউজিয়মের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। পুরাতত্ত্ব-বিষয়ে রাখালদাসের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেখিয়া ডক্টর ব্লক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মে। প্রাচীন ভারতীয় অনুশাসন পাঠে ব্লক বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। এবিষয়ে রাখালদাস পরবর্ত্তীকালে যে অনন্যসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা যে অনেকাংশে ডক্টর ব্লকের সাহচর্য্য ও শিক্ষার ফল তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিতেন।

এইরূপে বি-এ পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই রাখালদাস ভারতীয় পুরাতত্ত্ব, বিশেষত প্রাচীন মুদ্রা ও লিপি-বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। বি-এ পাশ করার পর বৎসর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষগণ উহার পুরাতত্ত্ব বিভাগের ক্যাটালগ প্রস্তুত করিবার জন্য রাখালদাসকে আমন্ত্রণ করেন। তিনি দুই তিন মাসের মধ্যেই এই কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। ১৯১০ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের কলিকাতা মিউজিয়মের সহকারী (Assistant) পদে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে তাঁহার দক্ষতা ও প্রভূত জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯১১ সনের ১লা নভেম্বর তাঁহাকে স্থায়ীভাবে পুরাতত্ত্ব বিভাগের উচ্চতর শ্রেণীর কর্ম্মচারীপদে নিযুক্ত করেন। যাঁহারা এই পদে নিযুক্ত হন তাঁহাদিগকে কয়েক বৎসর এই প্রকার কার্য্যে শিক্ষানবিশী করিতে হয়। কিন্তু রাখালদাসের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহার জ্ঞানের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে একেবারেই সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ দেন। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ স্যর জন্ মার্শাল রাখালদাসের গুণে মুগ্ধ হইয়া ১৯১৭ সনে তাঁহাকে পশ্চিম বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত করেন।

পরবর্ত্তী ছয় বৎসর রাখালদাস বম্বের অন্তর্গত পুনা শহরে থাকিয়া এই কার্য্য অতি যোগ্যতার সহিত নির্ব্বাহ করেন। এই সময়ে বম্বে প্রেসিডেন্সী ব্যতীত রাজপুতানা ও মধ্য-ভারত পশ্চিম-বিভাগের অন্তর্গত ছিল। রাখালদাস এই বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রের সর্ব্বত্র পরিদর্শন করিয়া যে সমুদয় আবিষ্কার, খনন ও রক্ষণ-কার্য্য করিয়াছেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ সরকারী বাৎসরিক রিপোর্টে লিপিবদ্ধ আছে। একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না যে, তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও বিভাগীয় অধ্যক্ষ এরূপ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম স্বীকারের পরিচয় দেন নাই। বম্বে প্রেসিডেন্সীতে যাহাতে প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি যথাযথভাবে রক্ষিত হইতে পারে তজ্জন্য তিনি একটি সন্তোষজনক ব্যবস্থা করিয়া তাহা গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন করাইয়া লন। বাদামী, ত্রিপুরী ও ভূমারার মন্দির সম্বন্ধে তাঁহার সুলিখিত গ্রন্থাবলী এই সময়কার অভিজ্ঞতার ফল। পুণায় শানাওয়ারের পেশোয়াগণের প্রাসাদগুলির ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া তিনি অনেক লুপ্ত কীর্ত্তির উদ্ধার করেন। কিন্তু তাঁহার এই সময়কার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কার। ১৯২২ সনের শীতকালে তিনি এই স্থান পরিদর্শন করেন এবং কিছু কিছু খনন করেন। কিন্তু ইহার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট টাকা না থাকায় এই খননকার্য্য বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু এই স্বল্প পরিমাণ খননের ফলেই রাখালদাস মহেঞ্জোদারোর প্রাচীন মুদ্রা ও শিল্পের সে সমুদয় নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহার ফলেই পরবর্ত্তীকালে মহেঞ্জোদারোর অতি প্রাচীনত্বের বিশিষ্ট পরিচয় পাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ ইহার ধ্বংসের যথাযথ খননকার্য্যের ব্যবস্থা করেন। মহেঞ্জোদারোর প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কারের ফলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। ইহার জন্য প্রথম পথপ্রদর্শকের কৃতিত্ব যে রাখালদাসেরই প্রাপ্য, ভারত-বর্ষের ঐতিহাসিক মাত্রেই চিরদিন কৃতজ্ঞহৃদয়ে ইহা স্বীকার করিবেন।

পুনায় থাকিতেই রাখালদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয়। এই নিদারুণ শোকে তিনি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়েন। মহেঞ্জোদারোতে অবস্থানকালে তাঁহাকে বহু কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ইহার ফলে মহেঞ্জোদারো হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরেই তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং তাঁহাকে এক বৎসরের ছুটি লইতে হয়।

১৯২৪ সনের জুন মাসে রাখালদাস পূর্ব্ববিভাগের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় বদলি হন। মাত্র দুই বৎসর তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার মধ্যে পাহাড়পুরের ধ্বংস খনন তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

১৯২৬ সনে রাখালদাসকে সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর

লইতে হয়। জব্বলপুর জেলায় ভেরাঘাট নামক স্থানে চৌষট্টিযোগিনী মন্দিরের একটি মূর্ত্তি স্থানান্তর করার জন্য মধ্যপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির করেন। ইহার ফলে তাঁহাকে প্রথমে অস্থায়ীভাবে কর্ম্মচ্যুত (suspend) করা হয়। বিভাগীয় তদন্তের ফলে তিনি মূর্ত্তি স্থানান্তর করা ব্যাপারে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হন; কিন্তু অন্যান্য কয়েকটি অর্থঘটিত ব্যাপারে তাঁহার উপর সন্দেহ হওয়ায় ভরণপোষণের জন্য কিছু পেন্সন দিয়া তাঁহাকে চাকরী হইতে অপসৃত করা হয়।

জীবনের শেষভাগে শারীরিক অসুস্থতা ও অর্থাভাবে রাখালদাস বহু কষ্ট সহ্য করেন। তিনি পিতা ও মাতামহীর বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার চরিত্রের অসংযম ও অমিতব্যয়িতার ফলে সে সকলই নষ্ট হয়। ১৯২৮ সনে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে "মণীন্দ্র নন্দী অধ্যাপকের' পদে নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার কষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছিল। কিন্তু চিরদিন বিলাসিতা ও অপরিমিত ব্যয়ে অভ্যস্ত রাখালদাস শেষ জীবনের অর্থকৃচ্ছ্রতায় একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কলিকাতার বাড়ীখানি পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান অদ্রীশের জন্য তিনি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। দুই-তিন বৎসর রোগশোক ও দুঃখ যাতনা সহ্য করিয়া ১৩৩৭ সনের ৯ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার (মে, ১৯৩০) ভগ্ন হৃদয়ে রাখালদাস কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ৪৬ বৎসর। রাখালদাসের পাণ্ডিত্য-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অনাবশ্যক। কালের দরবারে একদিন তাহার সঠিক মূল্য নির্ণয় হইবে। তবে মোটামুটিভাবে একথা বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন লিপি ও মুদ্রা পাঠে তাঁহার অনন্যসাধারণ দক্ষতা ছিল। প্রাচীন মূর্ত্তি ও অন্যান্য শিল্পনিদর্শন-বিষয়েও তিনি বহু আলোচনা ও গবেষণা করিয়াছিলেন। এই সমুদয় বিষয়ে তিনি যে বহুসংখ্যক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন এবং বহু সংখ্যক প্রাচীন লিপি ও মুদ্রার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন তাহা চিরদিনই তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিদর্শন-স্বরূপ বিদ্বৎ-সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিবে। প্রাচীন ভারতবর্ষের সাধারণ ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার সঠিক মূল্য কি—তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি অনেক স্থলে গৃহীত না হইলেও তিনি যে এ বিষয়ে অশেষ অধ্যবসায় সহকারে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার বিলাসিতা ও অসংযম তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাকেও কিয়ৎ পরিমাণে ম্লান ও খর্ব্ব করিয়াছে। তিনি নিজে স্বহস্তে লেখনী পরিচালন না করিয়া মুখে মুখে বলিয়া যাইতেন ও অন্য একজন তাহা শুনিয়া লিখিয়া লইত—ইহাতে তাঁহার লেখায় অনেক স্থলে ভুল ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। তাঁহার বাক্যের ন্যায় তাঁহার রচনার অসংযম অনেক সময় পণ্ডিতজনোচিত সুবিচার ও সতর্ক সিদ্ধান্তের পরিপন্থী হইয়াছে। এই সমুদয় কারণে তাঁহার যে পরিমাণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ছিল, অনেক সময় তাঁহার গ্রন্থে বা প্রবন্ধে তাহা সম্যক পরিস্ফুট হয় নাই।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও রাখালদাসই সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা করেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের 'গৌড়রাজমালা' ও রাখালদাসের 'Palas of Bengal' ও 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রায় একই সময়ে রচিত হয়; তবে গৌড়রাজমালা দুই-এক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরে প্রকাশিত হইলেও রাখালদাসের গ্রন্থ দুইখানি অনেক দিক দিয়াই এই বিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শকের সম্মান দাবী করিতে পারে। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালার ইতিহাস রচনায় কুলশাস্ত্রের প্রভাব অত্যন্ত অধিক ছিল। এই দুইজন মনস্বী কুলশাস্ত্রের স্বরূপনির্ণয় ও বাঙ্গালার ইতিহাসকে তাহার নাগপাশ-বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য ৺নগেন্দ্রনাথ বসু-প্রমুখ তৎকাল-প্রসিদ্ধ লেখকগণের বিরুদ্ধে যে সার্থক আন্দোলন করিয়াছিলেন তাহার জন্য বঙ্গবাসী-মাত্রেই তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাসকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাখালদাস আরও দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 'বঙ্গদেশে ব্যবহৃত লিপির উৎপত্তি ও ক্রমিক পরিণতি'-বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জুবিলী রিসার্চ্চ পুরস্কার' প্রাপ্ত হন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে 'The Origin of the Bengali Script'-নামে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালার প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার ও তাঁহার কালনির্ণয়ের

জন্য এই গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান। বাঙ্গালার প্রাচীন ভাস্কর্য্যের আলোচনার ফলস্বরূপ তাঁহার 'Eastern Indian School of Mediæval Sculpture" গ্রন্থ ১৯৩৩ সনে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বহু প্রবন্ধ পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক নানা প্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমুদয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধের প্রকাশ করিয়া তিনি বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও ভবিষ্যৎ আলোচনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।

প্রাচীন মুদ্রা ভারতবর্ষের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের একটি প্রধান উপকরণ। এ সম্বন্ধে রাখালদাসই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। প্রাচীন মুদ্রা নামক তাঁহার গ্রন্থ বাংলা ১৩২২ সালে প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর গ্রন্থ আর নাই। যে সমুদয় ঐতিহাসিক রচনাবলী দ্বারা রাখালদাস বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন 'প্রাচীন মুদ্রা' তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু কেবল বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসেই রাখালদাস অভিজ্ঞ ছিলেন না। মধ্যযুগের অর্থাৎ মুসলমানী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসেও তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগে তিনি এই যুগের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে এই যুগের বাঙ্গালার ইতিহাস দুই-একখানি ছিল বটে, কিন্তু নবাবিষ্কৃত প্রাচীন লিপি ও মুদ্রার সাহায্যে রাখালদাস যে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন তাহা একপ্রকার নূতন ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আজকালকার দিনে কোন একটি ইতিহাসে বিশেষ জ্ঞানলাভ করাই দুরূহ, সে অবস্থায় রাখালদাস হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় যুগের বাঙ্গালার ইতিহাসেই বিশেষজ্ঞ ছিলেন, ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে।

বাংলার বাহিরে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ইতিহাস আলোচনায়ও রাখালদাস বিশেষ পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। প্রায় ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে রচিত কনিষ্ক সম্বন্ধে তাঁহার সুবিস্তৃত প্রবন্ধ বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। পরিণত বয়সে লিখিত ত্রিপুরীর হৈহয় জাতির ইতিহাস ও উড়িষ্যার ইতিহাস এবং ভুমারার শৈব মন্দির ও বাদামীর ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে গ্রন্থগুলি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। এতদ্ব্যতীত হিন্দু ও মুসলমান যুগের লিপি, মুদ্রা ও শিল্পকলা এবং সাধারণ ইতিহাস বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃষ্ট জ্ঞানের পরিচয়স্থল।

রাজকর্ম্মব্যপদেশে ও অনেক সময় নিজে ইচ্ছা করিয়া রাখালদাস পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু পরিভ্রমণ করিয়াছেন। ইহার ফলে তিনি অনেক নূতন লিপি, মুদ্রা ও শিল্পকলার আবিষ্কার করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার যেন একটা স্বাভাবিক সূক্ষ্মানুভূতি ছিল। ঢাকা নগরীতে দুই একদিনের জন্য অবস্থানের মধ্যেই তিনি নর্থব্রুক হলের নিকটস্থিত লক্ষ্মণ-সেনের লিপি সম্বলিত চণ্ডীমূর্ত্তির আবিষ্কার করেন। এই মূর্ত্তি বহুদিন যাবৎ নগরীর এক প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিত ছিল, অথচ তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এই প্রাচীন লিপি-সম্বলিত মূর্ত্তিটির প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। গয়ার ন্যায় প্রসিদ্ধস্থানেও তিনি এইরূপ অনেক লিপির সন্ধান করিয়াছিলেন।

ইতিহাস ব্যতীত রাখালদাসের অন্যান্য অনেক বাঙ্গলা রচনা আছে। তিনি বঙ্গভাষায় কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে 'শশাঙ্ক', 'ধর্ম্মপাল' ও স্কন্দ-গুপ্তকে কেন্দ্র করিয়া যে তিনখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন তাহা তৎকালে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। 'পাষাণের কথা'-নামে একগ্রন্থে তিনি সহজ ভাষায় অনেক পুরাকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহার বিষয়বস্তু ও সরস রচনাপ্রণালী অনেককেই মুগ্ধ করিয়াছিল।

এই সমুদয় হইতে সহজেই প্রতীতি হইবে যে রাখাল-দাসের প্রতিভা বহুমুখী ছিল। কিন্তু সাহিত্যিক প্রতিভাই তাঁহার চরিত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নহে। দেশের নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া তিনি যে অসাধারণ কর্ম্মদক্ষতা দেখাইয়াছিলেন তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। বম্বের প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্ মিউজিয়াম এবং কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁহার সহযোগিতায় বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছিল। বম্বের উল্লিখিত মিউজিয়ামের পুরাতত্ত্ব-বিভাগ তাঁহার হাতে তৈয়ারী। এশিয়াটিক সোসাইটির গৃহে রক্ষিত প্রাচীন লিপিগুলি সুবিন্যস্ত ও ইহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া তিনি

জন্ম—১লা বৈশাখ, ১২৯২ সাল

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অশেষ উপকার করিয়াছেন। বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং যাহাতে ইহার আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা দূর হইয়া ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্বজ্জনের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয় তাহার জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার পরম শ্রদ্ধার পাত্র রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-প্রমুখ প্রাচীন পণ্ডিতগণের বিরুদ্ধাচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। নানা কারণে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান কালে অসমীচীন বলিয়া মনে করি। কিন্তু সত্যের অনুরোধে একথা বলিতেই হইবে যে, রাখালদাসের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে সাহিত্য পরিষদের অনেক সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

রাখালদাসের চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াই তাঁহার জীবন-কাহিনীর উপসংহার করিব। সেটি তাঁহার বন্ধুবৎসলতা। আমার ন্যায় এখনও অনেকে জীবিত আছেন যাঁহারা এ বিষয়ে ব্যক্তিগত প্রমাণ দিতে পারিবেন। ইতিহাসচর্চ্চা ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া আমরা কয়েকজন রাখালদাসের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও ক্রমে বন্ধুত্ব লাভের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। বহু বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও রাখালদাস কোনদিন এই বন্ধুত্বের মর্য্যাদা লাঘব করেন নাই। বহু সন্ধ্যায় সিমলা ষ্ট্রীটস্থিত তাঁহার গৃহে সমবেত হইয়া আমরা বহু আলোচনা ও আলাপ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়াছি এবং অবশেষে চব্যচোষ্য ভোজে পরিতৃপ্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছি। বন্ধুদিগকে ভোজন করাইতে তাঁহার ও তাঁহার পরলোকগতা গৃহিণীর বিশেষ আগ্রহ ও আনন্দ ছিল। আজ সে সমুদয় অতীত কাহিনী স্মরণ করিয়া চক্ষু অশ্রু-সজল হয়। যে সমুদয় বন্ধুর দল তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, বোধিসত্ত্ব সেন ও তরুণ বয়স্ক ননীগোপাল মজুমদার এখন পরলোকে। জীবিতদলের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন রায়, সুরেন্দ্রনাথ কুমার, কালিদাস নাগ প্রভৃতি আমার ন্যায় প্রায়ই এই সান্ধ্যবৈঠকে যোগ দিতেন। তাঁহার অসামান্য বন্ধুপ্রীতি ও সৌহার্দ্দ্যের নিদর্শনের অনেক কাহিনীই ইঁহারা বলিতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সে সমুদয়ের সবিস্তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

রাখালদাসের বিস্তৃত জীবনী রচনার সুযোগ যদি কখনও উপস্থিত হয় তবে ব্যক্তিগত অনেক ঘটনা লিখিবার ইচ্ছা রহিল। এই সমুদয় আলোচনা করিলে সুখেদুঃখে দোষে-গুণে রাখালদাসের বিচিত্র জীবন কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল তাহার একটি স্পষ্ট ধারণা করা যাইবে। কিন্তু তাহার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং পরলোক-গত বন্ধুর আত্মার সদ্গতি কামনা করিয়া আজ এখানেই এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি।

হিন্দু-মুসলমান

এস, ওয়াজেদ আলী, বি-এ, (ক্যাণ্টাব) বার-য়্যাট-ল

এস যত হিন্দু, এস যত মুসলমান
গাও সবে মিলে বিরাট এক মহাগান,
ঐক্যের উদাত্ত তানে উঠুক সে গান গগন ভেদিয়া,
মধুর গুঞ্জনে তার বিভেদ যত যাউক ঘুচিয়া,

সে গানের ছন্দের হিল্লোলে, প্রেমের বারিধি উঠুক নাচিয়া,
সে গানের মধুর কল্লোলে সঙ্কীর্ণতা যত যাউক ভাসিয়া
সে গানের স্বর্গীয় ঝঙ্কারে দ্বেষহিংসা যত পড়ুক ঝরিয়া
সে গানের রুদ্র হুঙ্কারে, অমিত শক্তি উঠুক জাগিয়া

গাও সেই মহাগান,
গাও সবে মিলে ভারত সন্তান যত হয়ে যাক এক প্রাণ।

দীর্ঘ জ্যায়ের সেতু

শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় বি-এস-সি, বি-ঈ, সী-ঈ

কোন্ এক অনাদি অতীত যুগে মানব যেদিন খরস্রোতাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া সহজ গমনাগমনের জন্য উহার উপর এক বৃক্ষখণ্ড অথবা এক শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিল—সেই দিন পূর্ত্তবিদ্যার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন—সেই দিন সেতুর জন্মদিন। আজকালের প্রগতির সঙ্গে পূর্ত্তবিদ্যা এত উন্নত এবং এত লোকহিতকর হইয়াছে যে জগতের সংস্কৃতি ইহার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। এমন কি, আধুনিক সভ্যতার বিকাশ বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহারই জাজ্জ্বল্য প্রমাণ পূর্ত্তবিদ্যা। বিখ্যাত পূর্ত্ততত্ত্ববিদ ট্রেডগোল্ড (Tredgold) সাহেব বলেন, মানুষের প্রয়োজনে এবং হিতে লাগাইবার জন্য প্রকৃতির শক্তিপুঞ্জকে দমন করিয়া ফলপ্রসূ কার্য্যে লাগাইবার নাম পূর্ত্তবিদ্যা (Civil Engineering)। মানব-সভ্যতার প্রগতির এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় এবং সুগঠিত সেতুর প্রয়োজন হইল। তাই মিশর, ভারতবর্ষ এবং এশিরিয়া প্রভৃতি দেশে সেতুর সূচনা দৃষ্টিগোচর হয়; কেবল হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ রামায়ণে সেতুর উল্লেখ ও বর্ণনা পাই; কিন্তু খৃষ্ট-ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলে সেতুর উল্লেখ নাই।
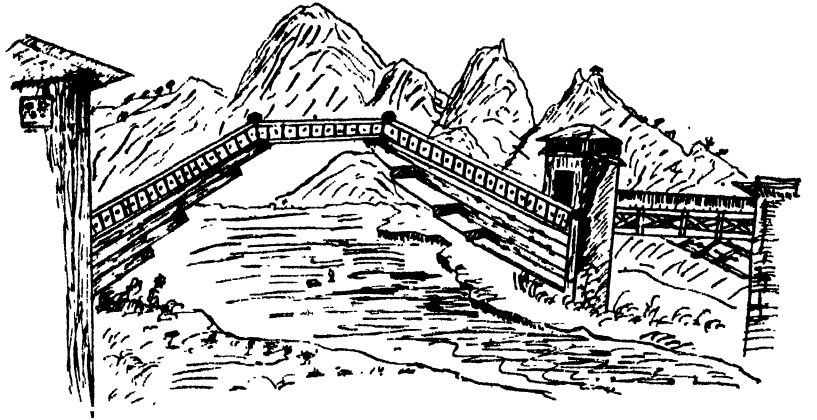
প্রাচীন কালে প্রধান প্রধান নগরগুলি নদী অথবা পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিত এবং ঐ সকল পরিখার উপর নগর হইতে বাহিরে যাইবার জন্য সেতু নির্ম্মিত হইত। তখনকার দিনে লোকে অধিকাংশ স্থলেই সহজে বিনষ্ট করা যায় এমন সেতু অধিকতর পছন্দ করিত; কেন না, হঠাৎ শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইলে সংযোজক সেতুগুলি সহজে ধ্বংস করার প্রয়োজন। তাই আমরা দেখি লারস্ পোরসেনার (Lars Porsena) সৈন্যগণ রোমের দিকে অগ্রসর

১নং চিত্র

প্রাচীন প্রসারণী সেতু

হইতেছে এই বার্ত্তা শুনিয়া নগর-পিতাদের এই সিদ্ধান্ত করিতে—

"Out spoke the Consul roundly :
The bridge must straight go down ;
For since Janiculum is lost,
Naught else can save the town."

আবার দেখি, নিম্নে সেতু চূর্ণ করিবার জন্য বহু লোক কর্ম্মরত এবং উপরে হোরেসিয়াস তাহার দক্ষিণে লারসিয়াস ও বামে হারমিনিয়াস্ লক্ষ বিপক্ষ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

তখন হোরেসিয়াস্ বলিতেছে :

"Hew down the bridge, Sir, Consul,
With all the speed you may ;
I, with two or more to help me,
Will hold the foe in play."

সেতু কাহাকে বলে ?

সুবৃহৎ স্রোতস্বিনী, ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী কিম্বা কোন পথকে লঙ্ঘন করিয়া উহার উপর দিয়া লৌহবর্ত্ম অথবা রাজপথ চালনার জন্য গঠনকে সেতু বা পুল কহে।

ল্যান্সডাউন সেতু

সাধারণত দেখা যায় যে, প্রশস্ত নদীতে ১নং চিত্রের অনুরূপ কতকগুলি গঠন সেতু-স্তম্ভের (pier) উপর সরল ভাবে সন্নিবেশিত আছে। দুই সেতুস্তম্ভের মধ্যের ব্যবধান স্থানকে সাধারণত জ্যা কহে (span)। বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে জ্যা তিন প্রকারের :

১। মুক্ত জ্যা (clear span)
২। কার্য্যকরী জ্যা (effective span)
৩। মোট দৈর্ঘ্য (overall length)

মুক্ত জ্যা

একটি সেতুস্তম্ভ হইতে অপর একটি সেতু-স্তম্ভের (pier) কিম্বা সেতুস্তম্ভ হইতে তীরস্তম্ভের (abutment) কিম্বা তীরস্তম্ভ হইতে তীরস্তম্ভের (যেখানে একটি জ্যায়ের সেতু) দূরত্বকে মুক্ত জ্যা কহে। (১নং চিত্র)

কার্য্যকরী জ্যা

ভারগ্রাহী বেলুনের কেন্দ্র হইতে (rocker pin) তৎপরবর্ত্তী ভারগ্রাহী বেলুনের কেন্দ্র পর্য্যন্ত দূরত্বকে

ফোর্থের সেতু

কার্য্যকরী জ্যা কহে। অনেক প্রকারের সেতুর ভার কেন্দ্রীভূত করিয়া ভারগ্রাহী বেলুনে ন্যস্ত করা হয়। বেলুন হইতে বিশেষ লৌহ নির্ম্মিত চেয়ারে এবং চেয়ার হইতে সেতুস্তম্ভ অথবা তীরস্তম্ভে ন্যস্ত করা হয়। সহজভাবে বসান সেতুর ভার যে দুই স্থান হইতে কেন্দ্রীভূত হইয়া সেতুস্তম্ভে ন্যস্ত হয় সেই দুই কেন্দ্রস্থানের ব্যবধানকে কার্য্যকরী জ্যা কহে। (১নং চিত্র)
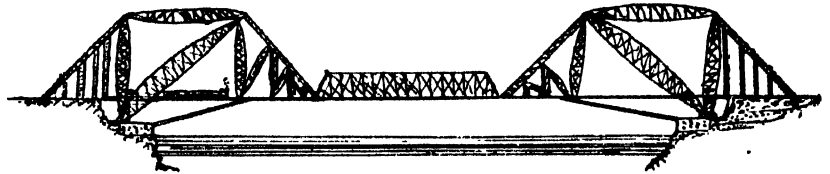
মোট দৈর্ঘ্য

সেতু নির্ম্মাণে দুই ভারকেন্দ্রের বাহিরেও কিছু গঠন-কার্য্য প্রসারিত করিতে হয়। এই সেতুর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যকে মোট দৈর্ঘ্য কহে (১নং চিত্র)

দীর্ঘ জ্যা-বিশিষ্ট সেতু নির্ম্মাণে সেতুর ভার একটি

প্রধান বিচার্য্য বিষয়। বিশেষ আকৃতির এবং বিশেষ লৌহদ্বারা নির্ম্মিত সেতুর একটি বিশেষ নির্দ্দেশ আছে, যাহার অধিক জ্যা নির্ম্মাণ করিতে যাওয়া বাতুলতা।

উপরে সেতু নির্ম্মাণের জন্ত ভারা বাঁধা অসম্ভব অথবা বহু আয়াস এবং ব্যয়সাপেক্ষ, সেরূপ স্থলে প্রসারণী শ্রেণীর সেতু নির্ম্মাণই যুক্তিযুক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন মিসিসিপি ও
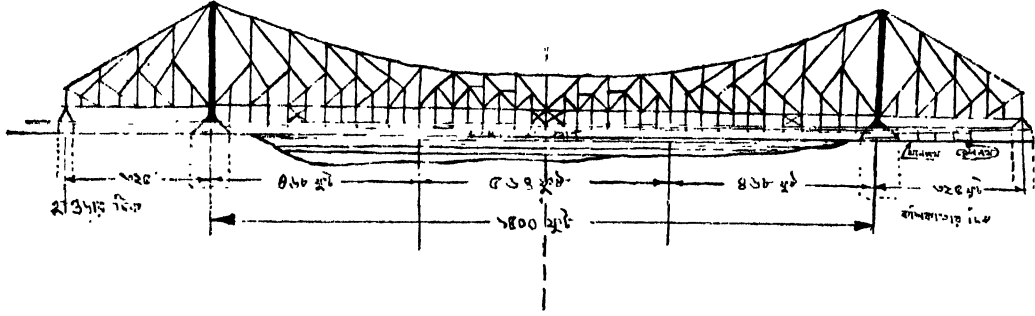
নূতন হাওড়ার পুল

সহজভাবে বসান সেতু

(Simply Supported Truss)

তাই আমরা দেখি কারবন ইস্পাতে প্রস্তুত কাঠামোর সহজভাবে বসান সেতু, অর্থনৈতিক দিক দিয়া বিচার করিলে ছয়শত ফুট পর্য্যন্তও ব্যবধানের করা যাইতে পারে। আবার যদি নিকেল ইস্পাতে কাঠামো তৈয়ারি হয়, তাহা হইলে সাড়ে সাতশত ফুট পর্য্যন্ত জ্যায়েরও করা যাইতে পারে। মেট্রোপোলিসে ওহিও নদীর উপর ঈদৃশ সেতুর পরিকল্পনা ৭২০ ফুট জ্যায়ের।

ওহিও নদীর উপরে সেতু। যেখানে সেতুর ভার তীর্য্যক্‌ভাবে নিম্নদিকে ন্যস্ত করান সম্ভব, সেখানে খিলানাকৃতি সেতুর নির্ম্মাণই সমীচীন। যেমন নায়েগ্রা প্রপাতের নিকট খিলানাকৃতির সেতু। ৬০০।৭০০ ফুট জ্যায়ের সাধারণ 'সহজ-ভাবে-বসান' কাঠামোর সেতুর যদ্রূপ নির্ম্মাণ-ব্যয়, প্রসারণী সেতুরও তদ্রূপ জ্যায়ের সেতুর ও সমনির্ম্মাণব্যয়। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক দিয়া বিচার করিলে সহজভাবে বসান কাঠামোর সেতু ব্যবহার করা উচিত। কেন না, সমজ্যায়ের প্রসারণী সেতুর অধোবিক্ষেপ (Deflection) সহজভাবে বসান সেতুর কাঠামো অপেক্ষা তুলনায় অধিক। ৬০০ ফুটের অধিক জ্যা-বিশিষ্ট সেতুতে প্রসারণী শ্রেণীর সেতুর প্রস্তুতকরণই শ্রেয়। যদি নিকেল-ইস্পাতে ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে জ্যা দৈর্ঘ্য (span length) ২০০০ ফিট পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে। কারবন ইস্পাতে নির্ম্মিত ফোর্থের সেতু ১৭০০ জ্যা-বিশিষ্ট, নিকেল-ইস্পাতের কুইবেক সেতু ১৮০০ ফিট জ্যায়ের। কুইবেক সেতুতে গঠনকার্য্যে ব্যবহৃত ইস্পাতের অচল ভার (dead lood) প্রতি

সিডনী হারবার সেতু

প্রসারণী সেতু বা একদিক সংযুক্ত অপরদিক মুক্ত সেতু (Cantilever Bridge)

ছয়শত ফুটের অধিক জ্যায়ের সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইলে প্রসারণী সেতুরই আশ্রয় লইতে হয়। যেখানে নদীর

ফুটে প্রায় ২১০ মণ এবং সেতুর স্তম্ভের দিকে প্রতি ফুটে ৯৩৮ মণেরও অধিক। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে,
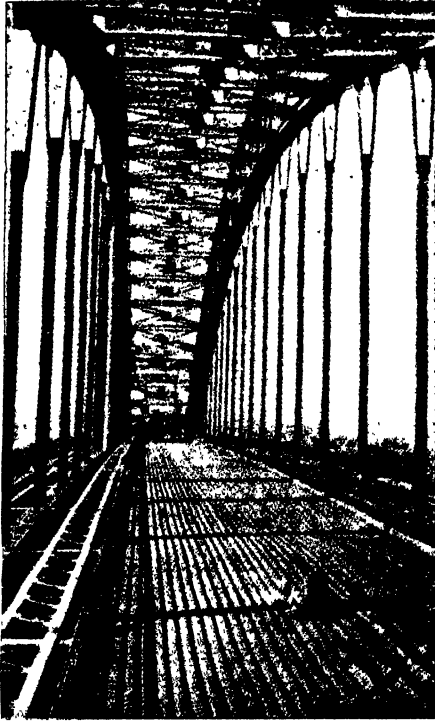
সিডনী হারবার সেতু

প্রসারণী সেতুতে সেতুস্তম্ভের উপর বেশী ভার ন্যস্ত হয়। পরন্তু সহজভাবে-বসান সেতুতে প্রায় সমানভাবেই ভার আসে।

প্রসারণী সেতু অতি প্রাচীন সেতু। বংশ অথবা কাষ্ঠ নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসারণী সেতু তিব্বতে ও দক্ষিণ চীনে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে তাহাদের জ্যা খুবই ছোট। সিন্ধুর রোহ্‌রা নদীর উপর ল্যান্সডাউন (Landsdowne) সেতু ভারতবর্ষের মধ্যে দীর্ঘতম প্রসারণী সেতু। কিছুদিনের জন্য ইহা জগতের মধ্যে দীর্ঘতম সেতু ছিল, কিন্তু কুইবেক সেতু ইহার সম্মান হরণ করিয়া লইয়াছে।

ল্যান্সডাউন ব্রিজ

ইহার প্রসারণী অংশ ৩১০ ফুট করিয়া এবং মধ্যস্থল ঝুলমান অংশটি ২০০ ফুট, মোট দৈর্ঘ্য ৮২০ ফুট। ইহার মোট অচল ভার ৩৩০০ টন। ইহার পরিকল্পনা করেন স্যার আলেকজাণ্ডার রেন্‌ডেল। পরিকল্পনা-মত ইহার লৌহকার্য্য নির্ম্মাণ করিয়া দেয় মেসার্স ওয়েষ্টউড এণ্ড বারলিক অফ পপ্‌লার। তৎকালীন বড়লাটের অনুপস্থিতিতে বোম্বাইয়ে লাট Lord Reay ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৫ মার্চ্চ উদ্বোধন করেন। গঠনস্থলে পূর্ত্তবিৎ মিঃ এফ্‌-ই-রবার্টন-এর উপর কার্য্যভার ছিল। ১৮০০ সালের মার্চ্চ মাসে ১৭১০ ফিট জ্যা-বিশিষ্ট ফোর্থের সেতুর উদ্বোধন কার্য্য হয় এবং দীর্ঘতম প্রসারণী সেতুর সম্মান ফোর্থের সেতুর উপর অর্পিত হয়।

নূতন হাওড়ার সেতু

ইহা ১৫০০ জ্যা বিশিষ্ট প্রসারণী মিশ্রিত ঝুলন সেতু। ইহার ভিত্তির গঠনকার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে, উপরের কার্য্য চলিতেছে।

খিলানাকৃতি সেতু

যেখানে উল্লঙ্ঘন করিবার দূরত্ব ১৫০০ ফুটেরও অধিক এবং যেখানে ভারগ্রহণের ভূমি এরূপ উত্তম যে সমস্ত গঠনের তির্য্যকভাবে চাপ অনায়াসে বহন করিতে পারে, সেখানে খিলানাকৃতি সেতু ব্যবহার হয়। যেখানে নদী পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী খাদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, যদি সেইরূপ স্থলে সেতু নির্ম্মাণের প্রয়োজন হয় তখন সাধারণত

টাইন নদীর সেতু (মিরজা সৈয়দ আমেদের সৌজন্যে)

খিলানাকৃতি সেতু ব্যবহার হইয়া থাকে। ৩০০০ ফিট দীর্ঘ খিলান সেতুরও পরিকল্পনা করা হইয়াছে। খিলান সেতুর জন্য একমাত্র দ্রষ্টব্য এই যে, দুই পার্শ্বের ভূমি সেতুর ভার-গ্রহণে সমর্থ কি-না। তাই খিলান সেতু ক্ষুদ্রতম জ্যা হইতে ৩০০০ ফিট জ্যা পর্য্যন্ত হইতে পারে। খিলান সেতুর আকৃতি বাস্তবিকই নয়নমুগ্ধকর। তাই নগরীতে খিলান এবং অনুরূপ আকৃতির সেতুই অধিক দৃষ্ট হয়। কেন না,

নিউ জার্সির ফিলডেনফুল সেতু

সাধারণ লোক যাহাতে সেতু সৌন্দর্য্য এবং চারুকলা সম্মত হয় তাহারই অধিক পক্ষপাতী। সেখানে শুধু অর্থ নৈতিক দিক বিচার্য্য নয়। যেখানে চলনশীল গুরুভার দ্রুতবেগে চলে সেখানে সেতুর সরলোন্নত অংশগুলি আরও দৃঢ় করার প্রয়োজন, তাহাতে বহু অর্থ ব্যয় হয়। সিডনী সেতু নির্ম্মাণের পূর্ব্বে নিউ ইয়র্কের ৯৭৭½ জ্যায়ের "হেল গেট"

ইষ্টনদীর উপর হেলগেট সেতু

আরিজোনার কলরেডো নদীর সেতু

সেতু পৃথিবীতে দীর্ঘতম সেতু ছিল। আজ সিডনী হারবার সেতু ইহার স্থান লইয়াছে।

সিডনী হারবার সেতু

জগতের দীর্ঘতম খিলান সেতু—সিডনী হারবার সেতু। ইহা দুইটি খিল দেওয়া ১৬৫০ ফিট জ্যায়ের। জলের উপরিভাগ হইতে ইহার যুক্ত উচ্চতা ১৬০ ফিট। খিলানের সর্ব্বোচ্চ অংশ নিম্ন অংশ হইতে ৩৫০ ফিট ঊর্দ্ধে। গঠনকার্য্য ডরম্যান লং কোম্পানী করে। ইহা নির্ম্মাণ করিতে লাগিয়াছিল সাত বৎসর এবং ব্যয় হইয়াছিল আটচল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ সওয়া পাঁচ কোটী টাকা। এই সেতুতে প্রচুর পরিমাণে সিলিকন-ইস্পাত ব্যবহৃত হইয়াছিল। সমস্ত লৌহগঠনকার্য্য ৫২,০০০ টন ইস্পাতের মধ্যে ২৬,০০০ টন সিলিকন-ইস্পাত ব্যবহৃত হইয়াছিল। তৎসহ প্রচুর পরিমাণে সিমেণ্ট ও প্রস্তর খণ্ডেরও ব্যবহার হইয়াছিল। দুই তীর হইতে গঠনকার্য্য সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং প্রসারিত গঠনের নিম্নগতিকে রোধ করিবার জন্য তীর হইতে অন্যূনপক্ষে ১২৮টি তারের দড়ি দিয়া গঠনের ভারকে প্রতিরোধ করা হইয়াছিল—যতদিন পর্য্যন্ত না কার্য্য শেষ হয়। স্থানীয়ভাবে অন্যূনপক্ষে ৬০ লক্ষ রিভেট মারা হইয়াছিল। রিভেটের গর্ত্ত ⅛ ইঞ্চি বেশী করিয়া করা হইয়াছিল। দুই দিক হইতে গঠন অগ্রসর হইতে একেবারে চুলে চুলে একটি অপরের সঙ্গে মিলিয়া গেল।

ব্রিজ্ অফ সাইস্ (দীর্ঘনিশ্বাসের সেতুও) একটী খিলানাকৃতি সেতু। এর সম্বন্ধে একটি কবিতা আছে—

One more unfortunate,
Weary of breath,

Realy unfortunate,
Gone to her death !
Take her up tenderly,
Lift her with care,
Fashioned so slenderly,
Young and so fair !

"আরেক দুর্ভাগিনী
গেছে সংসার থেকে
জীবন যাতনা মানি
মৃত্যু নিয়েছে ডেকে।
ধর গো আগে ধর
মুখখানি সুন্দর
সাবধানে তোল বাছা
বয়েস নেহাৎ কাঁচা।

হাওসাব নদীর উপর ঝুলন সেতু

খিলানের ব্যবহার প্রায় ৩০০০ বৎসর খৃষ্ট-পূর্ব্ব হইতে। নিমরুদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে খিলান প্রথম আবিষ্কার হয়। রোমের ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীটি প্রস্তর নির্ম্মিত খিলান দিয়া আবৃত। সে আজ সপ্তম শতাব্দী খৃষ্ট-পূর্ব্বের কথা। প্রস্তরের খিলান হইতে স্তরে স্তরে ইস্পাতের খিলান হইতে থাকে এবং জ্যা'ও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নিম্নে একটি ৪০০ ফুটের অধিক জ্যায়ের খিলানাকৃতি সেতুর তালিকা দেওয়া হইল :

খিলান সেতুর তালিকা

সেতুর নাম	নির্ম্মাণ কাল	জ্যা-দৈর্ঘ্য ফুটে
নায়েগ্রা ক্লিফটন	১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ	৮৪০ ফিট
ভায়ায়ুর	১৮৯৮ "	৭২১ "
বন্	১৮৯৮ "	৬৬৮ "
ডুসেন ডর্ফ	১৮৯৮ "	৫৯৫ "
অপোরোটো লিয়ুজ	১৮৮৫ "	৫৬০ "
মাংসটেন	১৮৯৭ "	৫৫৭ "
নায়েগ্রা	১৮৯৭ "	৫৫০ "
গারাবিট্	১৮৮৫ "	৫৪১ "
বেলোস্ ফল্স্	১৯০৫ "	৫৪০ "
লেভেল্ সার্ড	১৮৯৩ "	৫৩৩ "
অপোরোটো পায়া মেরিয়া	১৮৭৭ "	৫২৫ "
সেণ্ট লুই	১৮৭৪ "	৫২০ "
গ্রুনেন থাল্	১৮৯২ "	৫১৩ "
ওয়াশিংটন	১৮৮৯ "	৫১০ "
জাম্বেসী	১৯০৬ "	৫০০ "
পণ্ডের্নো	১৮৮৯ "	৪৯২ "
অষ্টারলিজ্	১৯০৫ "	৪৫৯ "
মুনিয়াপোলিস্	১৮৮৯ "	৪৫৬ "
কষ্টারিকা	১৯০২ "	৪৪৮ "
মাগ্ডেবুর্গ	১৯০০ "	৪৪৩ "
পিটার্স্বার্গ	১৯০৭ "	৪৪০ "
রোচেষ্টার	১৮৯০ "	৪১৬ "
রিকমো-ইণ্ড	১৮৮৬ "	৪০০ "

দীর্ঘতম সেতুর জন্য ঝুলন সেতুরই আশ্রয় লইতে হয়। ৪৩৩৫ ফিটে তার হইতে ঝুলমান সেতুর পরিকল্পনা এবং ব্যয় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এমন কি, নিকেল ইস্পাতে ৭০০০ ফিট জ্যায়েরও ঝুলন সেতু সম্ভব। ঝুলন সেতুর পরিকল্পনা শ্রীকৃষ্ণ হয়ত করিয়া থাকিবেন। কিন্তু গভীর বনে বানরেরা পরস্পর ধরাধরি করিয়া ঝুলন সেতু তৈয়ারী করিয়া নদী পার হয়। জীবজগতে মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঝুলন সেতুকার হইতেছে—উর্ণনাভ। কেন না, অতি ক্ষীণ ঊর্ণে যে ভার বহন করে নরতম ইস্পাতেও সেই অনুপাতে ভার বহন

করিতে পারে না। হৃষিকেশের লছমন ঝোলায় প্রাচীনকালে দড়ির ঝুলন সেতু ছিল। বর্ত্তমানে একটি লৌহরজ্জুর ঝুলন

প্রথম শ্রেণীর ঝুলন সেতু

সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাচান চীনে ঝুলন সেতুর নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ৬৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট মিংএর রাজত্বকালে য়ুনেম প্রদেশে ৩৩০ ফুট জ্যায়ের একটি ঝুলন সেতু নির্ম্মিত হয়। সেতুটির পাটাতন ছিল কাঠের। ঈদৃশ সেতু চীন-চিয়ানে ১৪০ ফিট দৈর্ঘ্যের এবং আঙ্গ নদীর উপর কয়েক শত ফিট দৈর্ঘ্যের ঝুলন সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। আয়ারল্যাণ্ডের 'কারিক-এ-রীড' নামক স্থানে নদীর উভতীরবর্ত্তী দুই বৃক্ষকাণ্ড হইতে ১৯০ ফিট জ্যায়ের একটি ঝুলন সেতু দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানে কলিকাতায় লেকের উপর একটি ক্ষুদ্রতম ঝুলন সেতু আছে।

ঝুলন সেতু দুই প্রকারের, ১। নদীর উভয় তীরে দুই সুদীর্ঘ তীরস্তম্ভ এবং ঐ স্তম্ভদ্বয়ের শিরোদেশ হইতে দুইটি শৃঙ্খল বা লৌহরজ্জু বিলম্বিত।

২। নদীর মধ্যদেশে একটি সুদীর্ঘ সেতুস্তম্ভ এবং রজ্জু বা শৃঙ্খল দুইটি ঐ স্তম্ভের উপর দিয়া দুই তীরে সংবদ্ধ।

বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার মিঃ টেলফোর্ড যখন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে
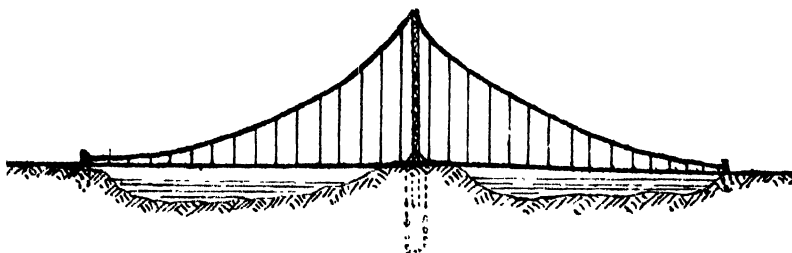
দ্বিতীয় শ্রেণীর ঝুলন সেতু

রান্‌কর্ন গ্যাপ্‌-এর জন্য একটি সেতুর পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তখন তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ১০০০ জ্যা পর্য্যন্ত ঝুলন সেতু করা যাইতে পারে। টেলফোর্ডের রান্‌কর্ন সেতু পরিকল্পনার চারি বৎসর পরে জেমস্ এণ্ডারসন নামক এডিনবরার এঞ্জিনিয়ার বলেন যে, ফার্থ অফ ফোর্থকে অতিক্রম করিতে তিনটি ১৫০০/-২০০০ ফিট জ্যায়ের ঝুলন সেতু করিলে চলিবে এবং তাহার যথোপযুক্ত গণনাও করেন। ঈদৃশ ক্রমোন্নতির পরিণতিতে আমরা সান্‌ফ্রান্সিকোর গোলডেন গেট সেতু ৪২০০ ফিট জ্যায়ের পাইয়াছি। হয়ত একদিন আমরা অথবা অনাগত যাহারা তাহারা দেখিবে—ডোভার হইতে ক্যালে পর্য্যন্ত একটি ঝুলন সেতু হইয়া ইংরেজ ও ফরাসীর মিত্রতাকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়াছে।

গোল্ডেন গেট সেতু

ইহার জল হইতে সেতুর তলদেশের ব্যবধান ২০০ ফিট। ইহার দুই তীরের স্তম্ভ দুইটি দৈর্ঘ্যে ৮০০ ফিট এবং দুই স্তম্ভের মধ্যে ব্যবধান ৪২০০ ফিট। এক একটি স্তম্ভে—সমস্ত ফোর্থের সেতুতে যত লৌহ ব্যয় হইয়াছে তাহারও অধিক লৌহ লাগিয়াছে। দুইটি সমান্তরাল রজ্জু দুই দীর্ঘ স্তম্ভ হইতে ঝোলান; এক একটি রজ্জুর ব্যাস ৬·২ ইঞ্চি এবং প্রত্যেকটিতে ২৭,৫৭২টি করিয়া তার লাগিয়াছে। ৬·২ ইঞ্চি ব্যাসের রজ্জু তৈয়ারী করিতে ৩৭টি সমান সংখ্যক ক্ষুদ্র ব্যাসের রজ্জু তৈয়ার করিয়া তাহা পাকাইয়া ৬·২ ইঞ্চি ব্যাসের করা হইয়াছে। তারগুলি ৪০,০০০ ফিট দৈর্ঘ্যে এক একটি রীলে করিয়া সরবরাহ করা হইয়াছিল। এত তার ব্যয় হইয়াছিল যে, তাহা দ্বারা পৃথিবীকে তিন-চারবার বেষ্টন করা যায়। স্তম্ভের লৌহকার্য্য সকল বর্ত্তমান কায়দামত সিমেণ্ট দিয়া আবৃত করা হয় নাই; পরন্তু খোলা রাখা হইয়াছে যাহাতে লোকে রাজমিস্ত্রী অপেক্ষা ইঞ্জিনিয়ারগণেরই কৃতিত্ব দেখিতে পায়।

প্রাচীনকালে, প্রাচীনকালে কেন, যখন হুগলীর জুবিলি সেতু হয় তখন শুনিতাম যে ছেলেধরা চারিদিকে ঘুরিতেছে। ছেলে পেলেই লইয়া গিয়া সেতুর তলায় পুঁতিয়া ফেলিবে। তাহা হইলে সেতু ঠিক হইবে। এমনও খবর শুনা যাইত, অমুক দিন একটি ছেলেকে ফেলা হইয়াছে। তুর্কদেশে এমনই একটি ঘটনা শুনা যায় যে, একটি সেতু নির্ম্মাণ কিছুতেই কার্য্যকরী হইতেছিল না, সেই সময়ে একদিন একটি কুমারী কন্যা ঐ রাস্তা দিয়া যাইতেছিল; তাহাকে জীবন্ত সমাধি দিয়া সেতুটি গড়িয়া উঠিল। প্রাচীন-কালে সেতুনির্ম্মাণ ধর্ম্মযাজকদের হস্তে ছিল, তাহার পরে উহার দায়িত্বভার ইঞ্জিনিয়াররা নিজেদের হাতে গ্রহণ করেন।

কিন্তু এখন হাওড়ার নূতন সেতু নির্ম্মাণে ছেলেধরার ভয় নাই। সকলেই ভাসা পুরাতন পুলের উপর দাঁড়াইয়া নূতন সেতুর গঠন কার্য্য দেখে', কেহ আবার সেইদিকে দৃষ্টিপাতও করে না।

দোল-বেদ

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ওই নন্দদুলাল এল দোল দে রে দোল,
হ'ল ফাল্গুন বনপথ ঘন উতরোল।

ওরে কুঙ্কুমে কুঙ্কুমে আজি হবে দোলরণ, প্রেমেরি ধনুকে হবে বান-বরষণ,
হেথা হৃদয়ে হৃদয় দিয়া হৃদয় বাঁধিতে আজি মানবে মানবে হবে প্রেমপরশন।
এই রঙ্গীন হোলি খেলা কুঙ্কুম হানাহানি মানবের সাথে এ তো দোল খেলা নয়,
ওরে রং মেখে ভগবান জেগেছেন ঘরে ঘরে জেগেছেন নদনদী-মধুবেলাময়।
আজি ওঠে জীবনের রসে রূপ-হিল্লোল,
এল ছন্দের নটবর ওঠ্ ধরানন্দিনী নন্দদুলাল এল দোল দে রে দোল?

আজ হিংসাকলহ-বিষে বিশ্বে মাতিয়া যারা ধরণীকে করিয়াছে দুঃখে জরজর,
ওরে তাদের লাগিয়া কভু নহে এই দোল তারা অন্ধকারের মাঝে পেতে র'ল ঘর।
যারা করেছে প্রেমের পূজা রূপেরে বেসেছে ভাল মূর্ত্তিরে বলিয়াছে রূপভগবান,
ওরে তারাই করিবে আজি এ নিখিলে হোলি খেলা তারাই গাহিবে হেথা বাঁশরীর গান।
অয়ি ধরণী মা ওঠ্ অবগুণ্ঠন খোল,
আয় রূপপূজারীর দল নেমেছে রসের ঢল নন্দদুলাল এল দোল দে রে দোল।

ওরে নিখিলে উঠেছে জেগে ধ্বংসসমর আজি শ্যাম-সখাদের তাতে কিবা আসে যায়,
সখী, মোদের কি আছে ডর আমরা খেলিব হোলি মোদের যে কাছে সদা বাঁধা শ্যামরায়।
হেথা শাসনের ভ্রুকুটিতে দুঃখে ও অনশনে ভাঙ্গিবে না এই খেলা এই হোলি গান,
ওরে যে হোলি রচিল কানু, শ্যাম যা রচিল নিজে হবে না কভু তারি অবসান।
আজ রং মেখে ভগবান দিতে এল কোল,
ওরে দোলে সুর দোলে তাল দোলে দিক দোলে কাল নন্দদুলাল এল দোল দে রে দোল।

ওরে ঘরেতে দুলুক দোল বনে টাঙ্গা হিন্দোল ঘর সে বাহির হোক বাহির সে ঘর,
এই প্রেমখেলা দোলরণে রবে না রবে না আজ বিশ্বেতে কোনো জাতি আপন ও পর।
প্রেমে সব মানবের মনু গলে' আজি হ'ল রঙ জীবন হয়েছে আজ বাঁশরীর গান,
সখী, যে দেশেতে দোল নাই নাই রঙ নাই প্রেম সে দেশেতে বুঝি হায় নাই ভগবান।
ওরে দোল জীবনের রস দোল প্রেম-কোল,
আজ বাঁধন ভাঙ্গার দিন আনন্দে বাজা বীণ নন্দদুলাল এল দোল দে রে দোল।

ফ্রাঞ্জো ঈমিল সিলান্‌পা

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

এবার নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন ফিন্‌ল্যাণ্ডের বিখ্যাত কবি ফ্রাঞ্জো সিলান্‌পা। বিশ্বসাহিত্যে সাফল্যের এই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার সিলান্‌পা-কে জয়গৌরবে ভূষিত করেছে তাতে সন্দেহ নেই; তাই ব'লে একথা বলা চলে না যে, সিলান্‌পা নোবেল প্রাইজ না পেলে তাঁর প্রতিভা বিশ্বসাহিত্যে নিজস্ব আসন অধিকার ক'রবার সুযোগ পেত না। বর্ত্তমান য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে সিলান্‌পার যে একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষ স্থান আছে, সে কথা তিনি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার অনেক আগেই প্রতিপন্ন হয়েছিল, যখন গত মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'পায়াস্ মিজারী' প্রকাশিত হয়। যুদ্ধবিগ্রহের তিক্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বিপ্লব মিশে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ফিন্‌ল্যাণ্ডের সমাজ ও গণজীবনে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, তারই বাস্তবরূপ পল্লবিত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করল সিলান্‌পা'র 'পায়াস্ মিজারী'তে। ফিন্‌ল্যাণ্ড স্বাধীন হ'ল ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে, সেই সঙ্গে সঙ্গে কবির প্রাণেও জেগে উঠ্‌ল মুক্তির আকুতি। সেই অবস্থান্তরের মাঝখানে পড়ে সমগ্র দেশবাসীর মনে যে চঞ্চল উদ্বিগ্নতা জেগে উঠেছিল, সিলান্‌পা তারই অন্তর্নিহিত গূঢ় সত্যের জলন্ত ছবি এঁকে নিজেকে অকপটে প্রকাশ করলেন তাঁর ওই সামাজিক উপন্যাসে। সিলান্‌পা-র কথা আলোচনা করতে গিয়ে আজ যেন আপনা থেকেই একটা কথা মনে আসে। হয়ত একথা মনে আস্‌ত না, যদি তিনি নোবেল প্রাইজ পেতেন আরও একবছর কি দু-বছর আগে। ফিন্‌ল্যাণ্ডের জাতীয় জাগরণ ও মুক্তির সঙ্গে, এমন কি তার রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির সঙ্গেও সিলান্‌পার কবিপ্রতিভার যেন একটা অচ্ছেদ্য যোগসূত্র আছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে ফিন্‌ল্যাণ্ড জয়যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হ'ল সিলান্‌পার কাব্যপ্রতিভার অভ্যুদয়। গত মহাযুদ্ধের শেষে ফিন্‌ল্যাণ্ড যেদিন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে স্বাধীনতার পরিবেশে নূতন জীবনের প্রাঙ্গণতলে এসে দাঁড়াল, সেদিন কবি তুলে দিলেন তাদের হাতে তাঁর প্রতিভার উজ্জল রত্নদীপ। সমগ্র ফিন্‌ল্যাণ্ডে সাড়া পড়ে গেল। দেশ অবিসম্বাদিতভাবে স্বীকার ক'রে নিল সিলান্‌পা-কে তাদের শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে। তার পর দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে গেল কুড়িটি বৎসর। একে একে বিকশিত হ'ল ফিন্‌ল্যাণ্ডের সর্ব্ববিধ সমৃদ্ধি; ধীরে ধীরে গৌরবের শিখর-চূড়ায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ল সিলান্‌পার প্রতিভা। বিশ্বসাহিত্যের মাপ-কাঠিতে যেই শেষ হ'য়ে গেল সিলান্‌পার প্রতিভার চূড়ান্ত নির্ণয়ন, অমনি আবার ঘনিয়ে উঠ্‌ল ফিন্‌ল্যাণ্ডের আকাশে রাষ্ট্রীয় অপায়ের কালো মেঘ। কবির জয়োৎসবের শঙ্খধ্বনি শেষ না হ'তেই সারা ফিন্‌ল্যাণ্ডে ধ্বনিত হ'ল যুদ্ধের দামামা নির্ঘোষ। কে জানে, কবির চরম সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই ফিন্‌ল্যাণ্ডের শান্তি চরম শিখরে পৌঁছিল কি-না!

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর পশ্চিম ফিন্‌ল্যাণ্ডের অন্তর্গত হামিন্‌কাইরোতে সিলান্‌পা'র জন্ম হয়। হামি ও স্যাটাকান্টা প্রদেশের প্রান্তবর্ত্তী একটি পল্লীগ্রামে এক দরিদ্র কৃষক-পরিবারে যেদিন সিলান্‌পা জন্মগ্রহণ করেন, সেদিন হয়ত কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করে নি যে, ওই শিশু-সিলান্‌পা একদিন সারা বিশ্বে আপনার গৌরবে সুপরিচিত হবে। সিলান্‌পার পূর্ব্বপুরুষেরাও কৃষক ছিলেন। কৃষক হ'লেও তাঁদের অল্পস্বল্প ক্ষেতখামার ছিল; তাই থেকে কোনরকমে নির্ব্বাহ হ'ত সংসারযাত্রা। কিন্তু সিলান্‌পা-র পিতা ছিলেন নিতান্ত গরীব। অন্যের খামারে সামান্য শ্রমিকের কাজ ক'রে তাঁর দিন চল্‌ত। নিজের কোন ভূসম্পত্তি ছিল না; ছোট একখানি কুঁড়ে ঘর ভাড়া নিয়ে কায়ক্লেশে স্ত্রী-পুত্রদের প্রতিপালন করতেন। গরীব হ'লেও সিলান্‌পার শৈশব খুব আনন্দেই অতিবাহিত হয়েছিল। সেই অতীত দিনের মধুর স্মৃতি ও গ্রাম্যজীবনের জনবিরল পল্লীপথের কথা তাঁর লেখার অনেক জায়গায় সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। শৈশব থেকেই সিলান্‌পা বেশ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে 'ম্যাঞ্চেষ্টার অফ্ ফিন্‌ল্যাণ্ড' বিদ্যালয় থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে 'ইম্পিরিয়াল আলেকজাণ্ডার য়ুনিভার্সিটিতে' পাঁচ বৎসরকাল অধ্যয়ন করেন। কিন্তু উক্ত য়ুনিভার্সিটির কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হ'য়েই সিলান্‌পা হঠাৎ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ক্রিষ্টমাস

ইত্তের সময় নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর পল্লীকুটীরে ফিরে আসেন। আত্মীয়স্বজনেরা সিলান্‌পাকে এই ভাবে ফিরে আস্‌তে দেখে সকলেই বিস্মিত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার অল্পদিন পূর্ব্বেই মানসিক কোন সংঘাতের ফলে তিনি জীবনের ধারা পরিবর্ত্তন করার সংকল্প করেছিলেন এবং স্থির করেছিলেন যে, সাহিত্যকেই তিনি জীবিকার জন্যে অবলম্বন করবেন। তাই তিনি ফিরে এসেছিলেন আবার সেই পরিস্থিতিতে যেখানে সুখ দুঃখকে গভীরভাবে অনুভব ক'রবার সুযোগ ও কাজ ক'রবার পর্য্যাপ্ত অবসর পাওয়া যায়। হামিনকাইরোতে ফিরে আসবার আগে থেকেই সিলান্‌পা ছোট গল্প লিখ্‌তে সুরু করেন এবং মাসিক সাহিত্য-পত্রিকাদির সঙ্গে তাঁর পরিচয় স্থাপিত হয়।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পল্লীবালিকা সিগ্রি মারিয়া স্যালোমাকিকে বিয়ে করেন। স্যালোমাকি সুন্দরী, অথচ তার জীবনধারায় নাগরিক সভ্যতার তীব্র আঁচ লেগে পল্লীজীবনের সজীব সরলতা শুষ্ক হ'য়ে ওঠে নি। এই বৎসরের শেষ ভাগে সিলান্‌পার প্রথম উপন্যাস 'লাইফ এণ্ড সান' (জীবন ও সূর্য্য) প্রকাশিত হয়। প্রথম উপন্যাস হ'লে কি হয়, 'লাইফ এণ্ড সান' অসাধারণ উপন্যাস হ'য়েই ফিনিশ সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে। তার কিছুদিন পরেই (১৯১৭) লেখকের গল্পসমষ্টি 'চিল্‌ড্রেন অফ ম্যানকাইণ্ড ইন্ দি মার্চ অব লাইফ' প্রকাশিত হয়। এই গল্পগুলিই তাঁর প্রথম জীবনের লেখা। ফিনিশ সাহিত্যে যদিও আগে থেকেই কাব্য ও সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রেরণার অনেক নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল, তবু সিলান্‌পার এই উপন্যাসখানি মৌলিকতার দিক থেকে এমন একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল যে, পূর্ব্বতন কোন উপন্যাসের সঙ্গেই তার তুলনা করা চলে না। আখ্যানবস্তুর মধ্যে হয়ত নূতন কোন কাহিনী সিলান্‌পা শোনাতে পারেন নি। কিন্তু মানুষের নৈমিত্তিক ও নিত্য জীবনের খুঁটিনাটিকে তিনি যেন দেখ্‌লেন সম্পূর্ণ নিজস্ব দৃষ্টিতে। 'লাইফ এণ্ড সান'-এর ঘটনা অতি সামান্য। একটি তরুণ ও দুটি তরুণীর জীবনে এলো এক সুমধুর গ্রীষ্ম। কবির কল্পনায় বাস্তব হ'য়ে উঠ্‌ল সেই গ্রীষ্মের প্রকৃতিগত আনন্দময় বিকাশ, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে জলে উঠ্‌ল ওই তরুণ হৃদয়গুলির গোপন দেউলে উৎসবের বাতি। নিতান্ত অজ্ঞাতসারেই তারা যেন প্রথম অনুভব করল এই পৃথিবীকে শুধু আনন্দের পরিবেশে। সিলান্‌পার কল্পনা অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তিতে বিকশিত হয়েছে ওই ছোট্ট আখ্যানটুকু অবলম্বন ক'রে। মানুষের জীবনকে যেন তিনি দেখেছেন তার শীর্ষচূড়ায় দাঁড়িয়ে; সেই সঙ্গে তার গভীরতার অতল তল পর্য্যন্ত পৌঁছে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সিলান্‌পার আর একখানি গল্পসঞ্চয়ন 'মাইডিয়ার ফাদারল্যাণ্ড' প্রকাশিত হয়।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হ'ল তাঁর পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'হিল্‌টা এণ্ড রাগনর'—একটি গ্রাম্য মেয়ে আকৃষ্ট হ'ল শহরের কোন যুবকের মোহে। তারই পরিণাম ফলে মেয়েটিকে করতে হ'ল আত্মহত্যা।—এবারে সিলান্‌পার লেখার ধারা যেন আবার নিল স্বতন্ত্র প্রবাহ। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা গ্রাম্য আখ্যানগুলির একখানি সুপাঠ্য সঞ্চয়ন—'ফ্রম দি লেভেল অফ দি আর্থ' —বাস্তবতার জীবন্ত ছবি। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে 'তোলিন-মাকি", ১৯২৮-এ 'কন্‌ফেশান' ও ১৯৩০-এ 'থ্যাঙ্কস্ ফর্ দি মোমেণ্টস্ লর্ড" প্রভৃতি পর পর প্রকাশিত হয়। আশ্চর্য্য কথা এই যে, কোন লেখাতেই সিলান্‌পার প্রতিভা ম্লান হয় নি, এমন কি একটি পুরাণ সুরেরও পুনরুক্তি ঘটে নি। তার পর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হ'ল তাঁর সুবৃহৎ উপন্যাস 'সিল্‌জা'। এখানি শুধু সুবৃহৎ তাই নয়, 'সিল্‌জা'-ই তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। সমস্ত য়ুরোপের সাহিত্যে 'সিল্‌জা' সাড়া জাগিয়ে তুল্‌ল। মাত্র দুটি প্রাণীর জীবন-কথা। বাপ ও মেয়ে। একটি প্রাচীন কৃষকপরিবারের ক্ষীয়মান জীবনধারা যেন সহসা এসে পুষ্পিত হ'য়ে উঠ্‌ল সিলজার জীবনে। সিলজার চরিত্রে কবি এঁকেছেন ফিনিশ জাতির আদর্শ মেয়েকে। বর্ত্তমান যুগের জীর্ণ ও জর্জ্জরিত সমাজের একটি সত্যিকারের মেয়েকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, যার বুকের ভিতর জেগে আছে চিরন্তনী নারী—স্নেহ মায়া ও ভালবাসার অফুরন্ত প্রাণের সাড়া নিয়ে। পশ্চিম ফিন্‌ল্যাণ্ডের একটি পল্লী-সমাজ, যেখানে আধুনিক সভ্যতা সবেমাত্র বিস্তার ক'রেছে তার প্রভাব, সেই পল্লীর ছায়ায় গড়ে' উঠেছে সিলজার জীবন। তার স্বপ্নজড়িত কৈশোর-শেষে দেখা দিল যৌবনের উজ্জ্বল প্রভাত, প্রেমের মৌসুমি ফুলের ফসল। সিলান্‌পার

সৃষ্টি-চাতুর্য্যে সিলজা জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। শুধু জীবন্ত নয়, জাগ্রত ও অফুরন্ত হ'য়ে উঠেছে। কোন পাঠক চেষ্টা ক'রেই সারা জীবনে সিলজাকে ভুলতে পারে না। মৃত্যুর কালো পর্দ্দার ওপর সিলজার ছবি যেন জ্বল্ জ্বল্ করে। সিলান্‌পার প্রতিষ্ঠা জয়যুক্ত হ'ল সমগ্র য়ুরোপে। এর পর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হ'ল 'এ ম্যান্স রড'—নায়ক একটি তরুণ কৃষক। যৌবনের গভীর ভালবাসাকে তুচ্ছ ক'রে সে বিয়ে করল একটি রুগ্না ধনীর মেয়েকে—কিন্তু শান্তি পেল না। মেয়েটি যখন মারা গেল, তখন পাভো আহ্‌রোলা সাময়িক অবসাদে আচ্ছন্ন হ'ল বটে, কিন্তু জীবনের প্রকৃত শান্তি সে খুঁজে পেল তখনই, যখন প্রথম জীবনের বাঞ্ছিতা স্বাস্থ্যবতী নারীর হাতে তুলে দিল তার জীবনের ভার। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'পিপ্‌ল্ ইন্ এ সামার্ নাইট' প্রকাশিত হয়।

সিলান্‌পার সাহিত্যে মেতারলিঙ্ক, হাম্‌সুন ও ষ্ট্রিণ্ডবার্গ প্রভৃতির প্রভাব যে নেই সে কথা বলা চলে না। তবুও মানুষের চরিত্র এবং প্রকৃতির রহস্যময় রূপকে গভীরভাবে দেখবার এমন একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী এবং তাকে নিখুঁত-ভাবে লিপিবদ্ধ করবার এমন প্রশংসনীয় শিল্প-কুশলতা তাঁর আছে, যাতে ক'রে আধুনিক য়ুরোপে তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী উপন্যাসকার ব'ললেও অত্যুক্তি হয় না। মেতারলিঙ্কের সাহিত্যে 'মিস্‌টিসিজ্‌ম্' (অতিন্দ্রিয়বাদ) বাস্তবতাকে অতি-ক্রম ক'রে সাহিত্যের সহজ স্ফূর্ত্তিকে যথেষ্ট পরিমাণে আচ্ছন্ন করেছে। হামসুন ও ষ্ট্রিণ্ডবার্গের কল্পনা অতিমাত্রিকভাবে বস্তুতান্ত্রিকতা অবলম্বন করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে মনের খোরাক জোগাতে পিছিয়ে প'ড়েছে। কিন্তু সিলান্‌পার সাহিত্যে ওই দুটি ধারা পাশাপাশি চলেছে বেশ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন ক'রে। উপন্যাসকার হ'লেও তাঁর ভাষায় কাব্যের প্রাচুর্য্য থাকায় বর্ণনাভঙ্গী পাঠককে মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী যেমন গদ্যসাহিত্যেও প্রচুর কাব্যরসের আনন্দ সঞ্চার করে এবং পাঠক-মনে নীরস গদ্যের ছায়াপাত করতে দেয় না, সিলান্‌পার সাহিত্যও কতকটা তেমনই। অবশ্য গভীরতার দিক থেকে সিলান্‌পা রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করতে পারেন নি। শুধু অতিক্রম করতে পারেন নি তাই নয়; পাশাপাশি দু'জনের লেখা পড়লে মনে হয় যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের সুর আরও উচ্চগ্রামে বাঁধা। বানার্ড শ'র গতিপথ সম্পূর্ণ বিভিন্নমুখী, কাজেই তাঁর লেখার সঙ্গে সিলানপার সাহিত্যের তুলনা অপ্রাসঙ্গিক।

সিলান্‌পা সম্প্রতি সপরিবারে বাস করছেন হেলসিংকিতে। তিনি পি, ই, এন ক্লাবের ফিনিশ শাখার চেয়ারম্যান। তিনি গণতন্ত্র মতের পক্ষপাতী এবং ফিন্-ল্যাণ্ডের স্ক্যান্‌ডিনেভিয়া-প্রীতি পছন্দ করেন। আমরা কবির দীর্ঘ আয়ু ও স্বাস্থ্য কামনা করি।

বিংশ শতাব্দীতে যাঁরা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন :—

১৯০১ আর, এফ্, এ সালি-প্রুধমা, ফ্রান্স
১৯০২ থিওডোর মোম্‌সেন, জার্মানী
১৯০৩ বি. বিয়র্নসন, নরওয়ে
১৯০৪ { ফ্রেদারিক মিস্ত্রাল্, ফ্রান্স
যোশে ইচিগ্যারে, স্পেন }
১৯০৫ হেনরিক সিঙ্কিয়েভিচ্, পোলাণ্ড
১৯০৬ অধ্যাপক জি. কার্দ্দুকি, ইতালী
১৯০৭ রুডিয়ার্ড কিপলিং, ইংলণ্ড
১৯০৮ অধ্যাপক রুডলফ্ অয় কেন্ জার্মানী
১৯০৯ সেল্‌মা লাগারলফ্, সুইডেন
১৯১০ পল্ জে. লুডউইগ হেসি, জার্মানী
১৯১১ ম্যরিস্ মেতারলিঙ্ক, বেলজিয়ম
১৯১২ জের্‌হার্ট হাউপ্টম্যান্, জার্মানী
১৯১৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯১৪ কেউ পুরস্কার পান নি
১৯১৫ রম্যাঁ রোলাঁ, ফ্রান্স
১৯১৬ ভি. হিডেনস্টাম্, সুইডেন
১৯১৭ কার্ল জেলারুপ ও মঃ পন্তোপিদান, ডেনমার্ক
১৯১৮ কেউ পুরস্কার পান নি
১৯১৯ কার্ল স্পিতেলার, সুইটজর্‌ল্যাণ্ড
১৯২০ ক্নুট হাম্‌সুন, নরওয়ে
১৯২১ আনাতল ফ্রাস, ফ্রান্স
১৯২২ জেসিন্তো বেনাভান্তে, স্পেন
১৯২৩ উইলিয়ম্ বাট্‌লার ইয়েট্‌স্, আয়র্ল্যাণ্ড
১৯২৪ লাডিস্লাব রেমণ্ট, পোলাণ্ড
১৯২৫ জর্জ বার্নার্ড শ, ইংল্যাণ্ড
১৯২৬ গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা, ইতালী
১৯২৭ আঁরি বার্গস, ফ্রান্স
১৯২৮ সিগ্রিড উণ্ডসেট্, নরওয়ে
১৯২৯ টমাস্ ম্যান্, জার্মানী
১৯৩০ সিন্‌ক্লেয়ার লুইস, আমেরিকা
১৯৩১ ডাঃ এরিক য়্যাগ্‌জেল্ কার্লফেল্ডৎ, সুইডেন
১৯৩২ জন্ গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি, ইংল্যাণ্ড
১৯৩৩ আইভান বুনিন, রুশিয়া
১৯৩৪ লুইগি পিরান্‌দেল্লো, ইতালী
১৯৩৫ কেউ পুরস্কার পান নি
১৯৩৬ ইউজিন ও'নিল, আমেরিকা
১৯৩৭ আর. এম্. দুগার্দ, ফ্রান্স
১৯৩৮ পার্ল এস্. বাক, আমেরিকা
১৯৩৯ ফ্রান্সো ঈমিল সিলান্‌পা, ফিনল্যাণ্ড

বৈদেশিকী

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র রায়

মহাযুদ্ধের ভবিষ্যৎ

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের প্রথম অঙ্কের উপর সম্ভবত অতি শীঘ্রই যবনিকাপাত হইবে। হিটলারের পোলাণ্ড বিজয়, জার্মানী ও সোভিয়েটের পোলাণ্ড বিভাগ, বিভিন্ন সাগরে চুম্বক মাইন কর্ত্তৃক রণতরী ও বাণিজ্যপোত ধ্বংস এবং ষ্টালিনের ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ, বোধ হয়, এই প্রধানতম ঘটনা কয়টিতেই প্রথম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

তার পর ?

দ্বিতীয় অঙ্ক সুরু হইবারও আর অধিক বিলম্ব নাই। খুবই সম্ভব বসন্ত আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই পাশ্চাত্যে প্রলয়ের আহ্বান ঘোরতর রবে বাজিয়া উঠিবে। সমস্ত ইউরোপ যেন রুদ্ধনিশ্বাসে সেই পরম অশুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতেছে। পাশ্চাত্য রাজনীতিজ্ঞ মহলে বর্ত্তমানে উহাই একমাত্র আলোচ্য বিষয়; ভবিষ্যৎ রণনীতিও তদনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত স্থলযুদ্ধ ম্যাগিনো ও সিগফ্রিড লাইন এই দুইয়ের অন্তর্বর্ত্তী নো-ম্যান্স্-ল্যাণ্ড্-এ সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, রুশ ও ফিন্, মাত্র ইহারাই যুধ্যমান জাতি ছিল। নব অধ্যায়ের সূচনা হইবার সঙ্গে সঙ্গে বহুদূরবর্ত্তী ভূখণ্ডসমূহ রণক্ষেত্রে পরিণত হইবে এবং বর্ত্তমানে নিরপেক্ষ জাতিসমূহ অচিরেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিতে বাধ্য হইবেন। মহাযুদ্ধের এই নাটকীয় পরিণতির মূলে রহিয়াছে রুশ কর্ত্তৃক ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ। কে কোন্ পক্ষে যোগদান করিবে ইহাই হইবে প্রথম সমস্যা। পক্ষাবলম্বনের পালা শেষ হওয়া মাত্র ইউরোপের দুইটি বিভিন্ন অংশে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে—বাল্টিক এবং বল্কান প্রদেশে।

ওয়াকিবহাল্ মহল মনে করেন, প্রথমোক্ত ভূভাগের উপরই প্রথমে মঙ্গলগ্রহের রোষদৃষ্টি পতিত হইবে। কিন্তু কেন ?

রুশ ও ফিনল্যাণ্ড

মাসের পর মাস ধরিয়া ক্ষুদ্র ফিনল্যাণ্ড অপূর্ব্ব বিক্রমে সোভিয়েটের অগণিত বাহিনীর গতিরোধ করিয়া আসিতেছে। ইতিহাসে এই অতুলনীয় বীরত্ব চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে হল্‌দিঘাট ও থার্ম্মাপলির সহিত ভাই-পুরীর যুদ্ধও সমশ্রেণীতে স্থান পাইবে। কিন্তু ইহার পরিণাম কি ?

যুদ্ধবিদ্ মাত্রেই জানিতেন, বাহির হইতে সামরিক সাহায্য না পাইলে ফিনল্যাণ্ডের পতন অবশ্যম্ভাবী। ইংলণ্ড, ইটালী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে রণসম্ভার কিয়ৎ পরিমাণে আসিয়াছে। কিন্তু সরকারীভাবে কোন জাতিই তাহাকে সাহায্য করে নাই। এই গৌণ সহায়তা যে তাহাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিবে তাহা সুদূরপরাহত।

অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে রণক্লান্ত ফিন সৈন্য কোভিষ্টো দুর্গ রক্ষা করিতে পারিল না। কোভিষ্টো দ্বীপের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভেদ্য ম্যানারহাই ব্যূহও ভেদ হইয়াছে। সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় রুশবাহিনী ভাইপুরীর উপর আসিয়া পড়িতেছে। সোভিয়েটের দুর্দ্দমনীয় আক্রমণের সম্মুখে তাহারা আর কতদিন দাঁড়াইয়া থাকিবে ?

ফিনল্যাণ্ডের প্রতিবেশী

নরওয়ে, ডেনমার্ক এবং সুইডেন—ফিনল্যাণ্ডের এই তিন প্রতিবেশীর সম্মুখে এক মহা সমস্যা উপস্থিত।

এই তিনজনই উপলব্ধি করিতেছে যে, অগৌণে কিংবা ভবিষ্যতে, সোভিয়েটের আক্রমণ হইতে কেহই নিস্তার পাইবে না এবং আত্মরক্ষার একমাত্র পন্থা অবিলম্বে ফিনল্যাণ্ডকে যথাযোগ্য সরকারীভাবে সামরিক সাহায্য প্রদান করা।

কিন্তু তাহারও আর এক বিপদ আছে। ত্রিশক্তির সম্মিলিত সাহায্যের সংবাদ বিপক্ষ দলে পৌঁছান মাত্র হিটলার তাহার বন্ধু ষ্টালিনের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে—বন্ধুত্বের আহ্বানে নয়, স্বার্থের খাতিরে। রুশ যদি উত্তর ভাগ আক্রমণ করে জার্মানী দক্ষিণ ভাগ অধিকার করিয়া বসিবে। কারণ সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক এই তিনটি রাজ্যই যুদ্ধোপযোগী প্রচুর কাঁচা মালে পরিপূর্ণ। যে শক্তি এই তিনটি রাজ্য আপনার আয়ত্তের মধ্যে আনিতে

পারিবে তাহাকে পরাজয় করা বিপক্ষ শক্তির পক্ষে অত্যন্ত আয়াসসাধ্য হইবে।

এই সমুদয় তথ্য এই ত্রিশক্তির অজ্ঞাত নহে। কিন্তু তাঁহারা মনে মনে এই অন্ধ আশা পোষণ করিতেছেন—হয় ত বেসরকারী সাহায্য দ্বারা ষ্টালিনের অগ্রগতি রুদ্ধ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধিরও ত্রুটি করিতেছেন না।

উপায় কি?

যদি ফিনল্যাণ্ডের পতন হয় তবে এই ত্রিশক্তির সম্মুখে ফ্রান্স ও বৃটেনের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন পন্থা নাই। কারণ নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক এই তিনের মিলিত বাহিনী দশ লক্ষ লোকের অধিক হইবে না। মাত্র সাড়ে তিনশতটি এরোপ্লেন এবং অতি সামান্য সংখ্যক রণতরী। নরওয়ে এবং ডেনমার্কের প্রকৃতপক্ষে কোন নৌশক্তি নাই। দুইটি ক্রুজার, তিনটি ছোট যুদ্ধ জাহাজ, পাঁচটি বন্দর-রক্ষাকারী জাহাজ, একটি এরোপ্লেনবাহী, আটটি ডেষ্ট্রয়ার ও ষোলটি সাবমেরিন—এই হইল সুইডেনের নৌ-বাহিনী। এই পরিমিত সৈন্য ও রণোপকরণ লইয়া হিটলার ও ষ্টালিনের সম্মিলিত শক্তিকে বাধা প্রদান করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। কাজেই গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সকে আহ্বান করা ব্যতীত ত্রিশক্তির পক্ষে অন্য কোন পথ খোলা নাই।

মিত্রশক্তি কি করিবে?

ফরাসী ও ইংরেজ যে এই আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিবে মনে হয় না। ষ্টালিন তাহার গতি ক্রমাগত পশ্চিম দিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। হিটলারের সহযোগে হউক, কিংবা তাহার মতের বিপক্ষেই হউক, অন্তত যে পর্য্যন্ত তাহার গতি ব্যাহত না হয় সে পর্য্যন্ত রুশ পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। যদি নির্ব্বিঘ্নে শত্রুপক্ষের নৌ-বাহিনী নরওয়ের উপকূল পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে তাহা হইলে অবস্থা মিত্রশক্তির পক্ষে মোটেই অনুকূল হইবে না। নরওয়ে হইতে স্কট্ল্যাণ্ড চারিশত মাইলের মধ্যে।

সুইডেন যদি রুশিয়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় তাহা হইলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যে একেবারে নির্ব্বাক্ থাকিবে তাহা মনে হয় না। বর্ত্তমানে যে সমুদয় রাজনীতিক যুক্ত-রাষ্ট্রের কর্ণধার, তাঁহাদের উপর স্কাণ্ডিনেভীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকানদের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে।

যদি সত্যই এই অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহা হইলে মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা অত্যন্ত ভীষণভাবেই হইবে। বর্ত্তমানে নিরপেক্ষ শক্তিসমূহের মধ্যে কে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন তাহা বলা দুরূহ; হয় ত তাহার সময় এখনও আসে নাই। কিন্তু একথা সত্য যে, যুদ্ধ তখন ম্যাগিনো ও সিগফ্রিড লাইনেই আবদ্ধ থাকিবে না। সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে।

মহাসমরের অন্য দিক

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের অন্য একটা দিক আছে সেকথা ভুলিলে চলিবে না। এরূপ হওয়াও বিচিত্র নয় যে, পশ্চিম ও পূর্ব্ব উভয় রণাঙ্গনেই মহাকালের তাণ্ডব একই মুহূর্ত্তে সুরু হইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাতের স্বনামখ্যাত "ডেলী মেল" পত্রিকা লিখিয়াছিলেন, মধ্য ইউরোপের প্রবল শীতের বিরামের সঙ্গেই জার্মানী অথবা রুশিয়া কিম্বা উভয় শক্তিই একযোগে বল্কান আক্রমণ করিবে। আগামী ১৪ই মার্চ্চের মধ্যে রুমানিয়া বিশ লক্ষ সৈন্য সমবেত করিতে সমর্থ হইবে। উক্ত রাজ্য হইতে পেট্রলের আমদানি আংশিকভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই আক্রমণ-ভীতি তুরস্কেও সংক্রামিত হইয়াছে। তথায় 'জাতির রক্ষার জন্য' দেশরক্ষা আইন প্রযুক্ত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারগণের সহায়তায় দুর্গসমূহের সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। বার্লিনে নাকি ইহা মহা অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছে। মতলবে বাধা পড়িলে কে অসন্তুষ্ট না হয়?

কূট রাজনীতিক মহলে প্রকাশ, হিটলার ও ষ্টালিন ইউরোপকে কালনেমির লঙ্কা ভাগ করিবার অভিপ্রায়ে গত আগষ্ট মাসে এক সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়াছে এবং পশ্চিম রণাঙ্গনের বর্ত্তমান যুদ্ধনীতি এই সন্ধি অনুসারে পরিচালিত হইতেছে। ফিনল্যাণ্ড ও নরওয়ের প্রান্তসীমা হইতে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত একটি সরল রেখা টানিলে তাহার পূর্ব্বদিকে থাকে ফিনল্যাণ্ড, এস্টোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোলাণ্ডের অর্দ্ধেক, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, তুরস্ক এবং পশ্চিম দিকে পড়ে নরওয়ে, সুইডেন, বাল্টিক সমুদ্র, পোলাণ্ডের অপরার্দ্ধ

ফিনল্যাণ্ড, সুইট্জারল্যাণ্ড, ইটালী ও যুগোশ্লাভিয়া এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে পূর্ব্বাংশ সোভিয়েটের ও পশ্চিমাংশ জার্মানীর ভাগে পড়িবে। নাৎসী বৈদেশিক মন্ত্রী ফন রিবেনট্রপের উদ্যোগে নাকি এই সন্ধি গৃহীত হইয়াছে। তাই উহার নাম আর প্লেন।

সাম্রাজ্যলিপ্সার প্রতিরোধ

ষ্টালিন ও হিটলারের এই দুর্দ্দম সাম্রাজ্যলিপ্সার প্রতিরোধের সময় আসিয়াছে। ইংরেজ ও ফরাসীকে ইহার বিপক্ষে দাঁড়াইতে হইবে। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে এমন একটি দলের উদ্ভব হইয়াছে যাঁহারা অবিলম্বে সোভিয়েটকে আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। এই দলের মুখপাত্র মিঃ লেস্লী হোর বেলিসা, ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব যুদ্ধমন্ত্রী।

এই মতপোষণের ফলে কিংবা সমর বিভাগের সংস্কার সাধনের চেষ্টায় তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে, তাহা এই প্রবন্ধের বিচার্য্য বিষয় নহে। অবশ্য বিলাতের কোন কোন সংবাদপত্র বলিয়াছেন যে, প্রধান সেনাপতি লর্ড গর্টের সহিত মনোমালিন্যের ফলে তাহার পদচ্যুতি হইয়াছে এবং হোর বেলিশা ইহুদী-বংশোদ্ভব ইহাও অন্যতম কারণ; কিন্তু সরকারী মহল তাহা সমর্থন করে নাই।

কিন্তু পূর্ব্বে যাহাই করুন না কেন, মিঃ চেম্বারলেন ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণকে শীঘ্রই এক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। অচিরেই তাঁহাদিগকে স্থির করিতে হইবে, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করিবে কি-না। বর্ত্তমান নিরপেক্ষ নীতি আর চলিবে না। মহাযুদ্ধের ভবিষ্যৎ এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিতেছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত শক্তিবৃন্দ ব্যতীত পাশ্চাত্য জগতে আর একটী শক্তি আছে যাহাকে ইউরোপের সমস্যা সমাধানে কোনরূপ বাদ দেওয়া চলে না। রুশ যদি বল্কান আক্রমণ করে, বেনিটো মুসোলিনী তাহা কখনই মানিয়া লইবেন না। মুসোলিনী ইতিমধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছেন, যদি ষ্টালিন অবিলম্বে ফিনল্যাণ্ড দমন করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে তাহার লাল ফৌজ দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে অর্থাৎ বল্কানে পরিচালিত হইবে। তাই কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই ইটালীর চেষ্টা হইয়াছে বল্কান রাষ্ট্রগুলিকে তাহার কর্তৃত্বাধীনে একতাবদ্ধ করা। এই উদ্দেশ্যে কাউন্ট সিয়ানো হাঙ্গেরীর প্রধান মন্ত্রীর সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এরূপ শোনা যায়, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরী ও ইটালী মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। রুমানিয়ার রাজা ক্যারল ইতিমধ্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নিকট হইতে রুশিয়ার বিরুদ্ধে সাহায্যের অঙ্গীকার পাইয়াছেন। 'রুমানিয়া রুশিয়ার বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে দণ্ডায়মান হইবে'—রাজা ক্যারল ইতিমধ্যে ইহা ঘোষণা করিয়াছেন।

মুসোলিনীর মুখপত্র "Gornale d Italia" ইতিমধ্যে লিখিয়াছেন—'সোভিয়েট তাহার আপন সীমার মধ্যে বিচরণ করুক, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু যদি কম্যুনিজম ইউরোপে কিংবা ইটালীতে অনধিকার প্রবেশ করিতে চায় ইটালী তবে তাহার সমুচিত প্রত্যুত্তর দিবে।'

মার্কিনের শান্তি প্রয়াস

শান্তিদূত সামনার ওয়েলেস ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রবিদ্‌-দিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অবশেষে বার্লিন আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

কিন্তু পাশ্চাত্য রাজনীতিক মহলে প্রশ্ন উঠিয়াছে, উহা কি রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের আন্তরিক কামনা, না তৃতীয়বার আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হইবার জন্য রাজনৈতিক চাল?

ভবিষ্যতই এই প্রশ্নের উত্তর দিবে।

শান্তিপ্রয়াসী মাত্রেই মিঃ সামনার ওয়েলসের দৌত্যের সাফল্য কামনা করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রচেষ্টা কতটুকু সফলতা-মণ্ডিত হইবে, তাহা বাস্তবিকই সংশয়স্থল। হিটলার এবং তাহার অনুচরগণের উক্তিদ্বারা যদি তাহাদের প্রকৃত মনোভাব সূচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে আসন্ন ভবিষ্যতে পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের আশা সুদূর পরাহত। নাৎসীদলের বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা দিবসে মিউনিক হইতে হিটলার যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহা পাশ্চাত্য গণতন্ত্র-সমূহকে দ্বন্দ্বে আহ্বান ব্যতীত আর কিছুই নহে। 'আন্তর্জ্জাতিক ধনিকসঙ্ঘ কর্ত্তৃক জার্মানীর যে সমুদয় সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছে আমরা সে সমুদয়ের প্রত্যর্পণ দাবী করি।'

তাহার পর গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ডাঃ গোয়েল্‌বস্‌ তাহার মানষ্টার বক্তৃতায় সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। "পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ চিরদিনই দুর্ব্বলতার জার্মান জাতিকে তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করিয়া

আসিয়াছে। জার্মানী ভাল করিয়াই জানে, এই যুদ্ধ তাহাদের জীবন-মরণ সংগ্রাম।'

এই মনোভাবের পশ্চাতে আর যাহাই থাকুক না কেন, শান্তির কামনা নাই মোটেই। জার্মানীর 'অপহৃত সম্পত্তি'র প্রত্যর্পণের অর্থ—ভার্সাই সন্ধি মকুব ও তাহার সঙ্গে বিজিত উপনিবেশসমূহ জার্মানীকে ফিরাইয়া দেওয়া। এই সর্ত্তে মিত্রশক্তি সম্মত হইবেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। মিত্রশক্তি জানেন যে পৃথিবীতে শান্তি আনয়ন করিতে হইলে জার্মানীর সাম্রাজ্য ও রণলিপ্সা খর্ব্ব করিতে হইবে। বিশেষত হিটলারের অঙ্গীকারে বিশ্বাস কি? একমাত্র অন্ধ আশাবাদীই বর্ত্তমান অবস্থায় শান্তির প্রত্যাশা করিতে পারেন।

নিরপেক্ষের নিগ্রহ

গত মহাযুদ্ধের ন্যায় এবারও নিরপেক্ষ শক্তিসমূহকে, বিশেষ করিয়া ক্ষুদ্র শক্তিসমূহকে, সংগ্রামে লিপ্ত না হইয়াও বহু প্রকারে ক্ষতি ও নিগ্রহ সহ্য করিতে হইতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী এবং ক্ষতির পরিমাণও প্রচুরতর। যুধ্যমান জাতিসমূহের ইচ্ছানুসারে তাহাদিগকে স্ব স্ব বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে হইতেছে; বাণিজ্যতরী সবমেরিন ও মাইন দ্বারা প্রতিনিয়ত ধ্বংস হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে বৃটেন এবং ফ্রান্সের যতগুলি জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের ক্ষতি তদপেক্ষা কোন অংশে কম হয় নাই। অথচ এই অন্যায়ের কোন প্রতিবিধান নাই। প্রতিবাদের উত্তরে যুধ্যমান জাতিসমূহের নিকট হইতে তাঁহারা পাইয়াছেন গর্ব্বোদ্ধত উত্তর। এইরূপ তথাকথিত ত্রুটিস্বীকার লইয়াই তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে। একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বলিয়াছিলেন, যুদ্ধ করার চেয়ে নিরপেক্ষ থাকিবার বিড়ম্বনা বেশী। ডেনমার্কের ব্যাপার—সোভিয়েট এরোপ্লেন কর্ত্তৃক সুইডেনের অন্তর্গত পাজালা গ্রামের উপর বোমা বর্ষণ এবং হেলিগোলাণ্ডের উপর দিয়া জার্মান বিমানবাহিনী পরিচালনা—এই সমুদয়ই উপরোক্ত উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানী এবং বৃটেনের মধ্যবর্ত্তী উত্তর সাগরে তাঁহাদের জাহাজের গমনাগমন নিষেধ করিয়া আদেশ প্রচার করিয়াছেন। ডেনমার্কও অনুরূপ পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার ফলে উভয় জাতির বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু ইহা ভিন্ন নিরপেক্ষদিগের আর আত্মরক্ষার উপায় কি?

কিন্তু ইহাতেও যে তাঁহারা নিস্তার পাইবেন তাহা মনে হয়না। উঁহাদের হইয়াছে মারীচের অবস্থা। এক পক্ষের উপরোধ রক্ষা করিলে অন্য পক্ষ ক্রুদ্ধ হইবেন। কাজেই শীঘ্রই এমন এক সময় আসিতেছে, যখন নিরপেক্ষ বলিয়া কোন শক্তি যুদ্ধ হইতে দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবেন না। মহাসংগ্রামের প্রচণ্ড আবর্ত্ত তাঁহাদিগকে অচিরেই কুক্ষীগত করিবে।

মহাযুদ্ধ ও পূর্ব্ব এসিয়া

বহুদিন হইতে নাৎসী জার্মানী পূর্ব্ব-এসিয়ার রাষ্ট্রসমূহে বিশেষত প্যালেষ্টাইনে বৃটেনের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইয়া আসিতেছে। 'ডেলী টেলিগ্রাফ' পত্রিকার বিশেষ সংবাদ-দাতা আর্থার মার্টন কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন যে, জার্মানীর প্রচার-কেন্দ্র বর্ত্তমানে তেহরানে অবস্থিত। তথা হইতে তাহারা ব্রিটিশ বিদ্বেষ মধ্য-এসিয়ার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দেয় এবং উহা আফগানিস্থান ও কোয়েটের ভিতর দিয়া ইরাকে আসিয়া পৌছে। জার্মানীর অর্থ ঐ সমস্ত প্রদেশে প্রচুর উৎকোচ প্রদানে ব্যয়িত হইতেছে। মিঃ মার্টন অভিমত প্রকাশ করেন যে, বৃটেনের পক্ষে অবিলম্বে নাৎসী প্রভাব প্রতিরোধ করা কর্ত্তব্য।

বিশেষ করিয়া ইরাকের আভ্যন্তরীণ অবস্থা মিত্রশক্তির পক্ষে কিঞ্চিৎ উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। তথায় জার্মান প্রচারকার্য্য বহুদিন হইতে চলিয়াছে, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রাষ্ট্রের ভিতরে যুদ্ধপ্রয়াসী দল ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি করিতেছে। তাহাদের কাম্য—ইরাক হইতে বৈদেশিক শক্তিসমূহের প্রভাব প্রতিপত্তি ও স্বার্থ সমূলে নিস্মূল করা। ইহাদের বিরুদ্ধে নুরি সৈয়দ পাশার মত বিখ্যাত যোদ্ধা ও রাজনীতিকও দাঁড়াইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী গত ১৯৩৮ সন হইতে রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন, তিনিও এই দলের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করেন নাই।

তুরস্কের সহিত ইংরেজের মৈত্রীবন্ধন ইরাকের পক্ষে খানিকটা আশ্বস্তির বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতিবেশী ইরাণের মনোভাব সম্পূর্ণরূপে না জানিতে পারিলে ইরাক কখনই রুশ আক্রমণ হইতে নিশ্চিত হইতে পারিবে না।

এই অবস্থায়, মিঃ আর্থার মার্টেনের মতে, ইংরেজের পক্ষে আরবজাতির দৃঢ়তর সৌহার্দ্দ্য বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া শ্রেয়। প্যালেষ্টাইন ও ইরাক উভয়ের মৈত্রী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে পরম কল্যাণকর হইবে।

কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচন—

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আগামী রামগড় কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন হইযা গিযাছে। কংগ্রেসের বর্ত্তমান পরিচালকগণ যে গত এক বৎসর ধরিযা তাঁহাদের বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী কর্ম্মীদিগকে দূবে সরাইযা বাখিবাব চেষ্টা করিতেছেন, তাহা সংবাদপত্রেব পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। তাঁহাবা নিজেদের দলভুক্ত মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে সভাপতির পদপ্রার্থী স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের মধ্যে যে তাঁহাদের বিবোধী দল ক্রমে শক্তিমান হইতেছেন, তাহা দেখাইবাব জন্য শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় এই নির্ব্বাচনে সভাপতিপদপ্রার্থী হইয়াছিলোন। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা এই নির্ব্বাচন হইযা থাকে। এবার আত্মকলহের জন্য বাঙ্গালা ও দিল্লী প্রদেশ হইতে কোন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন নাই। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় পরাজিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে। তিনি যে কমসংখ্যক ভোট পাইয়াছেন, তাহা হইতেই দেশের বর্ত্তমান আবহাওয়া বুঝা গিয়াছে। মৌলানা আজাদ বয়সে বৃদ্ধ—ইতিপূর্ব্বে তিনি সভাপতির কার্য্যও করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার নির্ব্বাচনে উল্লাসের কোন কারণ নাই। আমরা আশা করি, নির্ব্বাচনে এই দ্বন্দ্ব হইতেই কংগ্রেসের বর্ত্তমান পরিচালকগণ দেশের অবস্থা বুঝিয়া ভবিষ্যত কর্ত্তব্যে অবহিত হইবেন।

ফ্রান্সে ভারতীয় সৈন্যদল (ঘোড়ার দল লইয়া যাইতেছে)

বর্দ্ধমানে বেহুলা উৎসব—

বর্দ্ধমানবাসী কয়েকজন উৎসাহী সাহিত্যিকের চেষ্টায় এবার বর্দ্ধমান শহরের অনতিদূরস্থ কসবা চম্পাইনগর গ্রামে গত ৫ই ফাল্গুন স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে সতীরাণী বেহুলার স্মৃতি-উৎসব হইয়া গিয়াছে। হিন্দুর আদর্শ দেশ হইতে ক্রমে চলিযা যাইতেছে; তাহার পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য এইরূপ উৎসবের প্রয়োজন আছে; কাজেই বেহুলা-উৎসবের উদ্যোক্তাগণ এ জন্য দেশবাসী হিন্দু মাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র।

ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস উৎসব—

নদীয়া জেলায় ফুলিয়া গ্রামে রামায়ণ-কার কবি কৃত্তিবাসের স্মৃতি-উৎসব দিন দিন অধিকতর জাঁকজমকের

সহিত সম্পন্ন হইতেছে। গত বৎসর তাহার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক লোকসমাগম হইয়াছিল—এবার গত ২৮শে
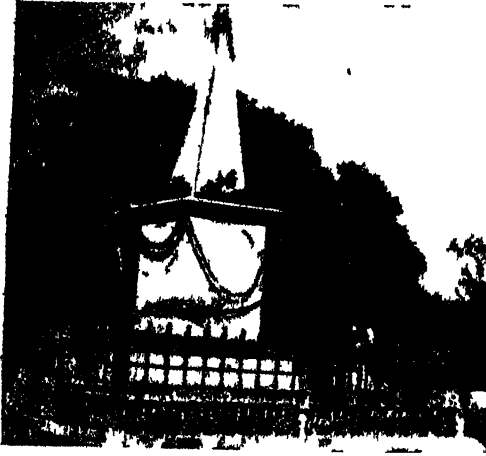
ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস স্মৃতি মন্দির

মাঘ আরও অধিক লোকসমাগম হইয়াছিল। এবার পল্লীবাসী ভক্তকবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল প্রমুখ বহু কৃতী সাহিত্যিক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। কবি শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা এবং রায় সাহেব সুকবি শ্রীযুত ভূদেব শোভাকরের গান সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এই উপলক্ষে, এবার একটি রামায়ণ-প্রদর্শনী হওয়ায় উৎসবের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। বহু তরুণ কবি এবার তথায় গিয়া কবিতা পাঠ দ্বারা কৃত্তিবাসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন এবংকলিকাতা হইতে রবিবাসরের সদস্যগণ যাইয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমা-হাকিম, জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রভৃতির আগমনে স্থানটি এবার পরিষ্কৃত ও পথগুলি সংস্কৃত হইয়াছিল। রেল কোম্পানীও যাত্রীদিগকে নানা ভাবে সাহায্য দান করিয়া উৎসব-কর্ত্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করিয়াছেন। শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক তরুণ কর্ম্মী শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিকের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলেই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ—

গত ৬ই ফাল্গুন সোমবার দেশবরেণ্য স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় কলিকাতা শ্যামবাজার দেশবন্ধু পার্কের নিকটস্থ ১৩বি হালদার বাগান লেনে সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের গৃহারম্ভ উৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। পরিষদের এতদিন পর্য্যন্ত নিজস্ব গৃহ ছিল না। কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে সম্প্রতি ঐ জমি পাওয়া গিয়াছে এবং ভিত্তি স্থাপনও হইল। এইবার শীঘ্রই পরিষদ নিজগৃহে প্রবেশ করিবে। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ কলিকাতা শহরে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচার কল্পে যাহা করিতেছেন, তাহার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের বিশ্বাস, পরিষদের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য অর্থেরও অভাব হইবে না।

ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস উৎসবে সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ

মানসিক ব্যাধি চিকিৎসা—

কলিকাতায় মানসিক ব্যাধি চিকিৎসার কোন

হাসপাতাল নাই। বেলগেছিয়ার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে সপ্তাহে মাত্র দুই দিন মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করা হয়। সেজন্য সম্প্রতি কলিকাতার নিকটে কসবা ১২৪ বেদিয়াডাঙ্গা রোডে মানসিক ব্যাধি চিকিৎসার একটি হাসপাতাল খোলা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু উহার উদ্বোধন করিয়াছেন। তথায় প্রত্যহ বেলা আটটা হইতে দশটা পর্য্যন্ত রোগী দেখা হইবে। ঐ কার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় তাঁহার বিশ হাজার টাকা মূল্যের একটি গৃহ দান করিয়াছেন। বাড়ীটি একতালা, সাড়ে তিন কাঠা জমির উপর; উহার সংলগ্ন বাগান তেইশ কাঠা চারি ছটাক। রাজশেখরবাবুর এই দান তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। গিরীন্দ্রশেখরবাবু নিজে মানসিক ব্যাধির খ্যাতনামা চিকিৎসক। তাঁহার পরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠান উন্নতি লাভ করিয়া বাঙ্গালা দেশের জনগণের উপকার করিবে বলিয়া আমাদের আশা আছে।

সঙ্গীত শাস্ত্রে উপাধি লাভ—

গোয়ালিয়র রাজ্যে যে সঙ্গীত শিক্ষার কলেজ আছে,

শ্রীবসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়

সেখান হইতে সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত শাস্ত্রে সর্ব্বোচ্চ উপাধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী এই উপাধিলাভ করেন নাই। তাঁর গায়ক বলিয়াও বসন্তবাবুর সুনাম আছে। তাঁহার বাড়ী ঢাকা বিক্রমপুর। আমরা তাঁহার জীবনে সাফল্য কামনা করি।

বাঁকুড়ায় চণ্ডীদাস স্মৃতি-মন্দির—

মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণের পরই বাঁকুড়াবাসী সাহিত্যিকগণ বাঁকুড়ায় 'চণ্ডীদাস স্মৃতিমন্দির'

দিল্লীতে নিখিল ভারত পশু-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পশু
(গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী প্রদর্শনী হইয়াছিল)

প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। চণ্ডীদাসের গান বাঙ্গালীর বিশেষ আদরের, অথচ চণ্ডীদাসের কোন স্মৃতি-মন্দির এদেশে এখনও স্থাপিত

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পাল—(কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ মূর্ত্তিকর—ইনি রামগড়ে কংগ্রেস প্রদর্শনীতে মূর্ত্তি নির্ম্মাণের ভার পাইয়াছেন)

হয় নাই। সুবিখ্যাত মনীষী আচার্য্য শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়কে পুরোভাগে লইয়া বাঁকুড়াবাসীরা এই

কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই এজন্ত বহু টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। স্থানীয় জেলা জজ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার হালদার ও তাঁহার পত্নী সুলেখিকা শ্রীমতী ইলা দেবী এই কার্য্যে বিশেষ উৎসাহের সহিত সাহায্য করিতেছেন। রাজসাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির মত বাঁকুড়ায় রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠা করাই স্মৃতি-মন্দিরের উদ্দেশ্য। রাঢ়ে ধনীর অভাব নাই। চণ্ডীদাস শুধু বাঁকুড়ার নহে—সমগ্র বঙ্গের প্রাণের মানুষ। কাজেই তাঁহার স্মৃতি-রক্ষায় বঙ্গবাসী মাত্রেরই আগ্রহ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাত্মা-দর্শনে যাইতেছেন

এ বিষয়ে অর্থাদি বাঁকুড়া-সাহিত্য-পরিষদের কোষাধ্যক্ষ স্থানীয় সরকারী-উকিল শ্রীযুক্ত কুমুদকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইতে হইবে।

রামকৃষ্ণ মিশন-বিদ্যামন্দির—

দেশের যুবকগণের মধ্যে সৎশিক্ষার সহিত নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞান বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড়মঠে একটি বিদ্যামন্দির স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ইচ্ছার কথা তাঁহার স্বহস্তলিখিত 'ডাইরী' হইতে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"এখন উদ্দেশ্য এই যে, এই মঠটিকে ধীরে ধীরে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে। তাহার মধ্যে দার্শনিকচর্চ্চা ও ধর্ম্মচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে একটি পূর্ণ 'টেকনিকাল ইনিষ্টিটিউট' করিতে হইবে। এইটি প্রথম কর্ত্তব্য। পরে অন্যান্য অবয়ব ক্রমে ক্রমে সংযুক্ত হইবে।"

শ্যামসুন্দর গোস্বামী ও প্রসিদ্ধ মার্কিণ ব্যায়ামবীর মিঃ ম্যাক্‌ফাডেন

স্বামীজীর সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মীরা বেলুড় মঠে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি আই-এ কলেজ স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। সেজন্ত ত্রিশ বিঘা জমি সংগ্রহ করা হইয়াছে ও গত ৩১শে জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের অষ্টসপ্ততিতম জন্মদিনে মিশনের সভাপতি স্বামী বিরজানন্দ বিদ্যা-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই কার্য্যের প্রাথমিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্ত অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রয়োজন। স্বামীজীর জন্মোৎ-

মার্কিন-মিত্র্যা এ জন্য দশ হাজার টাকা দিতেছেন। অবশিষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইলে এই বৎসরই কলেজের কার্য্য আরম্ভ হইবে। এই কার্য্যের জন্য সাহায্যাদি হাওড়া বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দের নিকট পাঠাইতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস, এ দেশে ধনী দাতার অভাব নাই। কাজেই অর্থের অভাবে স্বামীজীর পরিকল্পিত এই বিদ্যা-মন্দিরের কার্য্য কখনই অসমাপ্ত থাকিবে না।

ফ্রান্সে ভারতীয় সৈন্যদল (সৈন্যদল খাদ্য ওজন করিতেছে)

পরলোকে হরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ—

কলিকাতার খ্যাতনামা কাগজ-ব্যবসায়ী মেসার্স এচ-কে-ঘোষ এণ্ড কোম্পানীর হরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। হরেন্দ্রবাবু রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার অগ্রজ

হরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ

হরেন্দ্রকৃষ্ণঘোষ মহাশয়ও ব্যবসায়ী মহলে এক সময়ে সর্ব্বজন-পরিচিত ছিলেন। হরেন্দ্রবাবু জন্ ডিকিন্সন কোম্পানীর কাজ করিয়া ব্যবসা শিক্ষা করেন এবং পরে নিজে প্রকাণ্ড কাগজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেন। কোন্নগরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীদুর্গা কটন মিলেরও তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। হরেন্দ্রবাবু বহু সদ্গুণের অধিকারী ছিলেন এবং সেজন্য সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙ্গালায় মহাত্মা গান্ধী—

ঢাকা জেলার মালিকান্দা গ্রামে এবার গান্ধী-সেবা-সংঘের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধী বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় আসিয়া কয়েক ঘণ্টা পরেই কবিগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য বোলপুরে চলিয়া যান। শনি ও রবিবার বোলপুরে থাকিয়া তিনি সোমবারে কলিকাতায় ফিরেন ও সেই দিনই মালিকান্দা যাত্রা করেন। মালিকান্দায় কয়দিন থাকিবার পর ২৬শে ফেব্রুয়ারী সোমবার সকালে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং ২৭শে মঙ্গলবার রাত্রিতে পাটনায় চলিয়া গিয়াছেন। এবার বহুদিন পরে মহাত্মা গান্ধী কলিকাতায় আসিলেও জনসাধারণের মধ্যে গান্ধীজীকে দেখিবার জন্য বা তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য তেমন সাড়া

দেখা যায় নাই। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি অবিচার করার পর হইতে বাঙ্গালী মহাত্মা গান্ধীকে বা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য

শান্তিনিকেতনে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার পত্নী

রামগড়ে খাদি প্রদর্শনী—(নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছে)

নেতাদিগকে পূর্ব্বের মত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে বিরত হইয়াছে। বাঙ্গালার জননেতা সুভাষচন্দ্রের প্রতি ওয়ার্কিং কমিটির অবিচারের ফলে বাঙ্গালার রাজনীতিক অবস্থা কিরূপ হইয়াছে তাহা মহাত্মা গান্ধী এবার নিজ চক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত বিচক্ষণ ও বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন নেতার পক্ষে এই অভিজ্ঞতা লইয়া ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি স্থির করা এখন আর বোধ হয় কষ্টসাধ্য হইবে না।
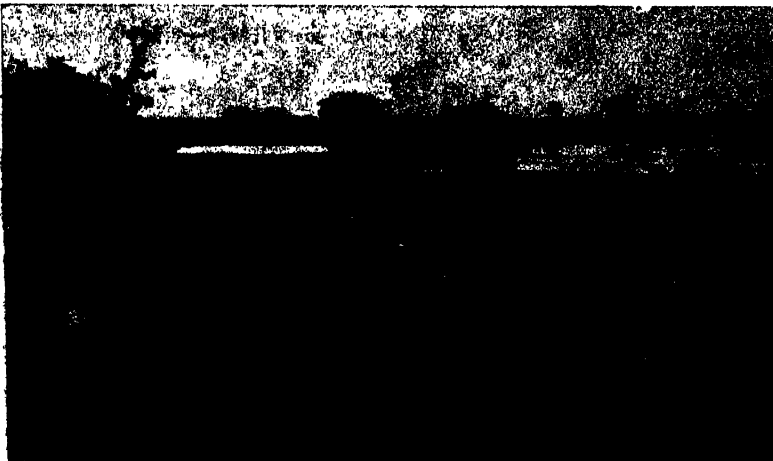
নানাস্থানে

মহাত্মা গান্ধীর বাঙ্গালা দেশে আগমন উপলক্ষে হাওড়া ষ্টেশন, শিয়ালদহ ষ্টেশন, বোলপুর ও মালিকান্দায় যে সকল গুণ্ডামী অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার জন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতির লজ্জিত হওয়া উচিত। মহাত্মা গান্ধী সর্ব্বজনমান্য নেতা এবং অহিংসা প্রচারক। কিন্তু তাঁহার অনুচরবর্গের পক্ষ হইতে যদি এই সকল হিংসা প্রকাশক গুণ্ডামী করা হইয়া থাকে, তবে তাহা গান্ধীজীর পক্ষেও অবশ্যই আনন্দদায়ক হয় নাই। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অবিচারে অসন্তুষ্ট হইয়া একদল বাঙ্গালী কংগ্রেস কর্ম্মী মহাত্মা গান্ধীর সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে গিয়াছিল বটে, কিন্তু সেইজন্য অপর পক্ষ যদি ভাড়াটিয়া গুণ্ডা দ্বারা তাহাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে, তবে সেজন্য বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদিগকে দোষ দেওয়া যায় না।

গান্ধীজীর প্রতি ভক্তির আতিশয্যে যাহারা বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ করিবার জন্য গুণ্ডা ভাড়া করিয়াছিল, তাহাদিগকে মহাত্মাজী কি ভাবে সমর্থন করিবেন জানি না। বাঙ্গালার রাজনীতিক আকাশ আজ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। এ অবস্থায় বাঙ্গালার কর্ম্মীদিগের গৃহবিবাদ বাঙ্গালাকে যে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে তাহা জানিয়া এবং বুঝিয়াও যাহারা এই বিবাদ বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতেছে, তাহাদিগকে বলিবার কিছুই নাই।

মালিকান্দার দৃশ্য (ষ্টীমার হইতে)

মালিকান্দায় মহাত্মা গান্ধী (চরকায় সূতা কাটিতেছেন)

ভেজাল খাদ্য—

বাঙ্গালার শহর ও মফস্বলে ভেজাল খাদ্যের কারবার দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। মিউনিসিপালিটি ও জেলা বোর্ড হইতে ভেজাল দ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করিবার নামমাত্র চেষ্টা দেখা যায়। ১৯৩৭ সালে বাঙ্গালার জেলাবোর্ডগুলির চেষ্টায় বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্যে কি পরিমাণ ভেজাল সাব্যস্ত হইয়াছিল তাহার তালিকা দেখিলে দেখা যায়, সরিষার তৈল শতকরা ২১ ভাগ, ঘৃত ৪১'৭, দুগ্ধ ৬৮'৪, আটা ৮'৭, চা ৫'৭, ছানা ২৩'৭, দধি শতকরা ১৫'৪ ভাগ। পল্লী অঞ্চলের তুলনায় শহর অঞ্চলে খাদ্যে ভেজালের পরিমাণ আরও বেশী। ঐ বৎসর মিউনিসিপালিটিগুলিও অনুরূপ চেষ্টায় যে পরিমাণ ভেজাল সাব্যস্ত করিয়াছে তাহার বিবরণে দেখা যায়—সরিষার তৈল শতকরা ২১'৩ ভাগ, ঘৃত ৩১'৯, দুগ্ধ ৭১'৭, চা ১৯'৫, দধি ৫৯ ও মাখন শতকরা ২৭'২ ভাগ। অথচ ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে, ভেজাল খাদ্য গ্রহণে যে কেবল স্বাস্থ্যই নষ্ট হয় এমন নয়, পরন্তু জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে। ভেজাল সরিষার তৈলে শোথ রোগের এবং ভেজাল আটায় কলেরার বীজাণু থাকে। কাজেই খাদ্য আইনের কঠোরতম প্রয়োগ না করিলে অতি-লোভী মুদী ও দোকানদারদের খাদ্যদ্রব্য ভেজাল করার প্রবৃত্তি দূর করা সম্ভব হইবে না।

বেকার সমস্যার সমাধান চেষ্টা—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে আলোচনার জন্য ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যাল যে প্রস্তাবটি পেশ করিয়াছেন,

মালিকান্দায় গান্ধীজির কুটীর—(খালের ধারে অবস্থিত)

তাহার গুরুত্ব সম্পর্কে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। প্রস্তাবে বাঙ্গালীর চাকরির ব্যাপারে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য বাঙ্গালা সরকারকে এখন

মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামে বিদ্যাসাগর বাণী ভবনের নূতন বাড়ী
(সম্প্রতি বাঙ্গালার গভর্ণর তথায় গিয়াছিলেন)

হইতে সকল প্রকার সরকারী চাকরিতে, সরকারী ঠিকাদারীতে এবং আবগারী দোকান, মোটরগাড়ী, বনজ দ্রব্য সংগ্রহ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চালানর অনুমতি ও লাইসেন্স ইত্যাদিতে বাঙ্গালীদের দাবী সকলকার আগে বলিয়া গণ্য করিতে বলা হইয়াছে। প্রস্তাবে বাঙ্গালী যুবকদের জন্য যে সব কাজ সংগ্রহের কথা বলা হইয়াছে, অনেক দিন হইতে প্রচারিত হইতেছে যে বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে ঐ সব কাজের যোগ্যতা নাই। এই মিথ্যা কলঙ্কের সুযোগ লইয়া বাঙ্গালা সরকার অধিকতর সংখ্যায় অবাঙ্গালী এখানে আনাইতেছেন। অথচ আজও বাঙ্গালার ভয়াবহ বেকার সমস্যার কোন প্রতীকার চেষ্টা সরকার হইতে হয় নাই। প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে একদিকে বাঙ্গালী তাহার অযোগ্যতার কলঙ্ক ক্ষালন করিতে পারিবে। অপর পক্ষে তেমনই বাঙ্গালার ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যারও আংশিক সমাধান হইবে। আমাদের বিশ্বাস বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাঙ্গালী সদস্যগণ (রাজনীতি ক্ষেত্রে যে দলেরই হোন না) একযোগে প্রস্তাবটি গ্রহণ করিবেন।

দিনাজপুরে কলেজের প্রস্তাব—

দিনাজপুরের জননায়ক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে এক জনসভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়

হইয়াছে যে, আগামী জুলাই মাসে দিনাজপুরে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর আর্টস্ কলেজ খোলা হইবে। আমরা এই প্রচেষ্টার সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করিতেছি।

লোক-গণনা—

আগামী লোক-গণনা উপলক্ষে যাঁহারা এ কাজের ভার পাইয়াছেন, সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে তাঁহাদের এক বৈঠক বসিয়াছিল। গণনা যাহাতে নির্ভুল হয় তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে স্থির হইয়াছে। ভারতবর্ষের জনসাধারণ, বিশেষত পল্লী অঞ্চলের অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত নরনারী এই লোক-গণনা-প্রথার সার্থকতা ঠিকমত জানে না; কাজেই তাহারা স্বভাবতই ইহাতে আবশ্যক মনোযোগ দেয় না। তাহাদের এই অমনোযোগের ফলে সংখ্যা-গণনাও নির্ভুল হইতে পারে না। আগামীবারে যাহাতে এই অসুবিধার সৃষ্টি না হয় এবং যাহাতে কর্ম্মী ও জনসাধারণের মধ্যে এই বিষয়ে একটি যোগ থাকে, তাহার প্রতি আমরা উভয়পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

দিল্লীতে কুমারী মীরাবেন—(মহিলা সভায় যাইতেছেন)

হস্তান্তরিত জমি প্রত্যর্পণ—

বাঙ্গালা সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে জানান হইয়াছে যে, বঙ্গীয় চাষীখাতক আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর এমন কি, ১৯৩৫ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে উহা বিলের আকারে প্রকাশিত হইবার পর—তাড়াহুড়া করিয়া বহু ডিক্রিজারি করা হইয়াছে এবং ফলে বহু চাষীপ্রজাকে তাহাদের জোতজমির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে বলিয়া সরকারের নিকট বহু অভিযোগ আসিয়াছে। আসল মালিকদিগকে ঐ সব জোত-জমা ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা কতটা সম্ভব হইতে পারে তাহা সরকার বিবেচনা করিতেছেন। তবে ইহা নিশ্চিত যে, এই উদ্দেশ্যে কোনও আইন-কানুন তৈয়ারি করিতে হইলে তৃতীয় পক্ষ ক্রেতার অধিকার সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে। কিন্তু এরূপ কোন আইন তৈয়ারির পূর্ব্বে আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য ভবিষ্যতে বেনামী করিয়া যদি কোন সম্পত্তি লেন-দেন করা হয়, তবে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। গত ১৯৩৯ সালের ২০শে ডিসেম্বর এই সম্পর্কে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন, তদনুসারে সাধারণের অবগতির জন্য ইহা জানান যাইতেছে যে, প্রাপ্য টাকা বাকী ডিক্রি, রাজস্ব ডিক্রি কিংবা বকেয়া খাজনা

বাবদ সার্টিফিকেটের ডিক্রিজারীতে যে সব সম্পত্তি বিক্রীত হইয়াছে, ১৯৩৯ সালের ২০ ডিসেম্বরের পর যদি কেহ

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ইণ্টার কলেজ বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী কলিকাতাবাসী শ্রীমান পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাধন গুপ্ত

ডিক্রিদারের নিকট হইতে সেই সম্পত্তি ক্রয় করেন, তবে তাঁহাকে নিজ দায়িত্বেই তাহা করিতে হইবে।

ভারতে ব্যাঙ্কের সংখ্যা—

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে জানা যায়, গত ১৯৩৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বৃটিশ ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকার বাহিরে আনুমানিক মোট এক হাজার চারি শত একুশটি ব্যাঙ্ক কাজ করিতেছে। তাহার মধ্যে বাঙ্গালায় ৯৮৮, মাদ্রাজে ২৫২, আসামে ৫২, যুক্তপ্রদেশে ৪০, পাঞ্জাবে ৩৬ এবং বোম্বাইয়ে ২৬টি তালিকাভুক্ত হইয়াছে। তালিকার বাহিরে এই ১,৪২১টি ব্যাঙ্কের মধ্যে ২৩৬টি ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও মজুদ তহবিলের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকার উপর; অন্য পক্ষে ১,১৮৫টি ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও মজুদ তহবিলের পরিমাণ উহা হইতে অনেকটা কম। উল্লিখিত ২৩৬টি ব্যাঙ্কের মধ্যে ১৩৫টি ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও মজুদ তহবিল এক লক্ষ হইতে দুই লক্ষ টাকা। মাত্র ৩৬টি ব্যাঙ্কের এই খাতে দুই লক্ষ হইতে পাঁচ লক্ষ টাকা আছে। চারি লক্ষ হইতে পাঁচ লক্ষ টাকা আদায়ী মূলধন ও মজুদ তহবিলওয়ালা ব্যাঙ্কের সংখ্যা মাত্র সাতটি। ১,১৮৫টি ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কের মধ্যে ৩৭৭টি ব্যাঙ্কের তহবিলের পরিমাণ ৫ হাজার টাকার নীচে; ২৩৬টি ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও মজুদ তহবিলের পরিমাণ ৫ হাজার হইতে ১০ হাজার টাকা এবং ২৩৭টি ব্যাঙ্কের উক্ত তহবিলের পরিমাণ ১০ হাজার হইতে বিশ হাজার টাকা। ছোট ছোট ব্যাঙ্কের গড়ে এই তহবিলের পরিমাণ ১২ হাজার টাকা এবং বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির উক্ত তহবিলের পরিমাণ গড়ে একলক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা মাত্র।

হিন্দু স্বদেশরক্ষী সৈন্যদল—

ভারতবর্ষে একটি হিন্দু স্বদেশরক্ষী সৈন্যদল গঠন করিবার জন্য হিন্দু মহাসভার বিগত কলিকাতা অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহা কাজে পরিণত করিবার জন্য ডাঃ মুঞ্জেকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। ভারতে দেশরক্ষী সৈন্যদল গঠনের উপযোগিতা অস্বীকার করিবার যো নাই। সরকার হইতেই দেশবাসীকে ব্যাপকভাবে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা উচিত, কিন্তু সরকার সেদিকে জোর দেন নাই। কাজেই এখন সরকারের উপর নির্ভর না করিয়া জন-

শ্রীমান অরুণ মুখোপাধ্যায়

(বাঙ্গালী যুবক—বিমান বিভাগে চাকরী পাইয়া যুদ্ধে গিয়াছেন)

সাধারণকেই এ বিষয়ে তৎপর হইতে হইবে। মুসলমানদের মধ্যে খাকসার বাহিনী দিন দিনই বৃহদাকার ধারণ

করিতেছে। হিন্দুদের মধ্যেও একটি দেশরক্ষী বাহিনী গড়িয়া ওঠা প্রয়োজন। ডাঃ মুঞ্জে এই কাজের যোগ্যতম ব্যক্তি। তাঁহার নেতৃত্বে অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় দেশরক্ষী বাহিনী গড়িয়া উঠিবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

ভাস্কর ও শিল্পী বাসবেন্দ্র ঠাকুর—

সম্প্রতি লণ্ডনের রয়াল এম্পায়ার সোসাইটিতে শ্রীমান বাসবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাস্কর্য্য শিল্পের নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছে। শিল্প-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিতে গিয়া ইণ্ডিয়া সোসাইটির চেয়ারম্যান স্যর ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড শিল্পী বাসবেন্দ্রনাথের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে ঠাকুর-পরিবারেরও যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। বাঙ্গালার শিল্পীগোষ্ঠীর দানে বর্ত্তমান ভারত বাহিরের জগতে একটা বিশেষ শ্রদ্ধার স্থান লাভ করিয়াছে। শিল্পী বাসবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র পরলোকগত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র এবং তাঁহারবয়স বর্ত্তমানে মাত্র চব্বিশ বৎসর। ইতিমধ্যেই তিনি বিলাতের রয়াল আর্ট কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করিতেছি।

রামগড় কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট স্থান (দামোদর নদ পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত)

হাওড়া ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁহার পত্নী এলেন রায়

বাঙ্গালার শিক্ষক—

সম্প্রতি পাবনা জেলায় সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের যে সম্মিলন বসিয়াছিল তাহার সভাপতিরূপে ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় একটি সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন। অভিভাষণটি নানা দিক হইতেই প্রণিধানযোগ্য। বাঙ্গালা দেশে শিক্ষকেরা যথাযোগ্য বেতন পান না, তাহার উপর একদিকে সরকারী পরিদর্শক, অন্যদিকে বিদ্যালয়-পরিচালকগণ তাঁহাদের উপর নানা রকম উপদ্রব করিয়া থাকেন। কাজেই ঘরে-বাহিরে উপদ্রুত হইয়া যে তাঁহারা

শিক্ষাদানে কতকটা আন্তরিকভাবে মনোযোগী হইতে পারেন তাহা বলাই বাহুল্য। স্বাধীন মনোভাব তাঁহাদের মোটেই থাকে না। জনসাধারণও তাই তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হয়। শিক্ষকদের মধ্যে আবার ব্যর্থকাম উকিল, ডাক্তার, ব্যবসাদার, এমন কি প্রাক্তন পুলিশ কর্ম্মচারীও আছেন। শিক্ষকতা এদেশে এখন নিরুপায়ের অবলম্বন-রূপে গণ্য। তাই দিন দিনই তাহাদের দুর্গতি

বোম্বায়ে মহামান্ত আগা খাঁ—(বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর

ভাগলপুরে নিহত কুম্ভীর—(অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীযুত ভোলানাথ বিশ্বাস সম্প্রতি পাতালিয়া নদীতে ইহাকে গুলীতে নিহত করেন—ইহা ২১ ফিট লম্বা)

বাড়িয়া চলিতেছে। এ অবস্থায় প্রতীকার সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষা ও সাম্প্রদায়িকতা—

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বাঙ্গালায় যে বিভেদ বর্ত্তমান তাহাকে স্থায়ী করিবার পক্ষে সরকারের কর্ম্মনীতি অনেকাংশে যে দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গে পর পর দুইটি শিক্ষাসপ্তাহের আয়োজন হইয়াছিল এবং ইহার ফলে বিভেদ আরও বৃদ্ধি পাইবে। নিখিল-বঙ্গ সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সুকবি গোলাম মোস্তাফা সাহেব সরকারের এই নীতির নিন্দা করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য শিক্ষকদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাইয়াছেন। শিক্ষকগণ আন্তরিক চেষ্টা করিলে যে সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণে কিঞ্চিৎ সমর্থ হইবেন সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা কি তাঁহারা পারিবেন?

হিন্দু ও মুসলমান একই জাতি—

মিঃ জিন্না কিছুদিন আগে 'টাইম এণ্ড টাইড' পত্রে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি ভারতে দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত সি, বিজয়রাঘবাচারিয়া বলিয়াছেন যে, মিঃ জিন্নার ধারণা যেমন উদ্ভট, তেমনই ভারতীয় জাতীয়স্বার্থক্ষতিকর। একই

দেশে একই সময়ে দুইটি বিভিন্ন জাতির স্থিতি জিন্না সাহেব বিশ্বাস করেন দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। ইতিহাসে এরকম ধারণা অবিদিত। ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের উপযুক্ত নয়—মিঃ জিন্নার এ উক্তি যে ভুল তাহাতে সন্দেহ নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মিঃ জিন্না শ্রীযুক্ত আচারিয়ার সহিত নেহেরু কমিটির সদস্য ছিলেন এবং তখন তাঁহারা সকলেই একমত হইয়া ইউনিটারী সরকারই ভারতবর্ষের একমাত্র উপযোগী, অন্য কোন সরকার নহে—এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। আজ সেই জিন্না সাহেবই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদের হিমালয় খাড়া করিয়া তুলিতেছেন। অথচ আসলে হিন্দু-মুসলমান স্বতন্ত্র জাতি নহে এবং মূলত একই জাতির দুইটি শাখা। বিশেষত আজিকার ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশই ছিলেন পূর্ব্বে হিন্দু।

আমেরিকায় প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর শ্যামসুন্দর গোস্বামী ও তাঁহার শিষ্য প্রামাণিক।

লণ্ডনে ভারতীয় বালিকাগণ কর্তৃক ভারতীয় সৈন্যদের সেবার ব্যবস্থা
(সাঁর ফিরোজ খাঁ নুন ও প্রধান-মন্ত্রী নেভিলি চেম্বারলেনের পত্নী তাহা দেখিতেছেন)

জনসাধারণ ও সাহিত্য—

সম্প্রতি 'আনন্দ বাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার হুগলী জেলার উত্তরপাড়ায় অনুষ্ঠিত প্রগতি সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি-রূপে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে ভাবিবার ও করিবার অনেক বিষয়ই আছে। সাহিত্য-সম্পর্কে দেশবাসীর উপেক্ষা ও অনাদরের উল্লেখ করিয়া তিনি যে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা জনগণের মনে স্থায়ী প্রভাব স্থাপন করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে। বাঙ্গালায় লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম, দেশের আর্থিক সঙ্গতি আরও সামান্য;

অথচ থিয়েটারে সিনেমায়, খেলার মাঠে, রকমারি সৌখীন জিনিষের দোকানে ভিড়ের অভাব হয় না। এই সকল ব্যবসা দেশে ভালই চলে এবং যাঁহারা এ সব ব্যবসা হইতে জীবিকার্জ্জন করেন তাঁহাদের আয়ও বেশ ভালই হয়। কিন্তু সাহিত্যসেবা করিয়া সাহিত্যিকের অন্ন হয় না, জীবিকার জন্য তাহাকে নানা উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। ফলে সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অক্ষুণ্ণ শ্রদ্ধা থাকে না, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত সাহিত্যের সেবাও করিতে পারেন না। সাহিত্যিকের অন্নসংস্থান সম্পর্কে দেশ কোন কথাই ভাবে না, অথচ তাঁহার কাছে সুসাহিত্য দাবী করে। এই অপব্যবস্থার ফলেই দেশের সাহিত্য যথাযোগ্য উন্নতি করিতে পারিতেছে না, দেশের শিক্ষিত সাধারণ যদি পুস্তক ক্রয় করাকে অন্যতম কর্ত্তব্য হিসাবে জ্ঞান করিতে শিখেন, তবে সহজেই সাহিত্যিকের দুর্দ্দশা দূর হয়, সাহিত্যের উন্নতিও সহজ হইয়া আসে।

বোম্বায়ে অলিম্পিক খেলার উদ্বোধনে সুন্দরী বালিকাবৃন্দ

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হিন্দুদের আত্মরক্ষা—

সম্প্রতি মদনমোহন মালব্য বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'অনেক জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পুলিশ হিন্দুদের রক্ষা করিতে পারে নাই, অনেক সময় এ ধরণের অভিযোগ শুনি। সব সময়েই যে পুলিশ বা ফৌজ আসিয়া হিন্দুদের রক্ষা করিবে ইহা কাহারও অভিপ্রেত নয়। নিজেদের রক্ষা নিজেরাই করিতে হইবে, ইহাই আমি চাই।' সুখের বিষয়, হিন্দুদের মধ্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা জাগিয়াছে। সুক্কুর অত্যাচারের পর সিন্ধুপ্রদেশে আত্মরক্ষী দল গঠিত হইতেছে। আত্মরক্ষা হিংসাও নয়, সাম্প্রদায়িকতাও নয়। সকলেরই আত্মরক্ষার অধিকার আছে। যাহাদের আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই, মানুষের মত তাহাদের বাঁচিয়া থাকিবারও অধিকার নাই। মার খাইয়া তৃতীয় পক্ষের কাছে কাঁদুনি গাওয়া পৌরুষের পরিচয় নয়। আশা করি, বাঙ্গালার হিন্দুরা আত্মরক্ষায় উদাসীন থাকিবেন না।

পণপ্রথা—

বাঙ্গালার সমাজ-জীবনে পণপ্রথা যে ক্ষতি করিয়া আসিতেছে, তাহা হিন্দু-মাত্রেরই জানা আছে এবং আজিকার দিনে পণপ্রথার সে কড়াকড়িতে অনেকটা শিথিলতাও দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি মুসলমান সমাজও সে বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন দেখিয়া আশান্বিত হইলাম। প্রকাশ, বাঙ্গালার কোয়া-লিশনীদলের সদস্য মৌঃ ইদ্রিস আহ্‌মেদ পণপ্রথা নিবারণ কল্পে একটি আইনের খসড়া বিল আনিয়াছেন। উক্ত আইন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের উপরই প্রযুক্ত হইবে। ইহা দ্বারা বিবাহের সময় পণ দান অথবা গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হইবে। আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালার কেহই এ বিলের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। দেশের জনসাধারণের স্বাধীন ইচ্ছার উপর সামাজিক উন্নতির ভার ন্যস্ত করিলে যে সকল সময় চলে না তাহা ত আমরা এতদিন দেখিলাম। সুতরাং এ বিলের সমর্থনে জনমত আনুকূল্য করিবে এ প্রত্যাশা দুরাশা হইবে না।

পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ—

১৯৪০ সালের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঙ্গালা সরকার এক অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন। ১৯৪০ সালের চাষ

সম্পর্কীয় এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত এত বিলম্বে প্রকাশিত হওয়ায় অনিষ্টের সম্ভাবনা যথেষ্ট। ডিসেম্বরে 'সময় নাই' এই অজুহাতে বিলটি মাঝপথে ফাইল চাপা দিয়া ফেব্রুয়ারী মাসে 'বর্ত্তমানে আইন সভার অধিবেশন চলিতেছে না' এই অজুহাতে অর্ডিনান্স জারী করার যৌক্তিকতা কোথায় বোঝা যাইতেছে না। কার্য্যকারণ দেখিয়া আমাদের মনে হইতেছে যে, মন্ত্রিমণ্ডল আইন-সভাকে পাশ কাটাইতে চাহিয়াছেন। বিষয়টির গুরুত্ব এত বেশী এবং ইহার সহিত বাঙ্গালার অগণিত জনগণের আর্থিক ভবিষ্যৎ এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, এ বিষয়ে কোনও শেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের আগে মন্ত্রি-মণ্ডলের পক্ষে আইন সভার অনুমোদন গ্রহণ করা উচিত ছিল।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি—

গত ২৮শে ও ২৯শে ফেব্রুয়ারী এবং ১লা মার্চ্চ তিন দিন পাটনায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় দুইটি প্রস্তাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি প্রস্তাবে বাঙ্গালার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং তাহার কার্য্যকরী সমিতিকে বেআইনি ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহার ফলে বাঙ্গালার রাজনীতিক্ষেত্রে যে অবস্থার উদ্ভব হইল তাহা অভূতপূর্ব্ব। বাঙ্গালার অধিকাংশ কংগ্রেসকর্ম্মী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত পছন্দ করেন না—তাঁহারাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পরিচালক ছিলেন। এখন তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া যে দল সংখ্যায় অল্প—তাহাদের উপর প্রাদেশিক কংগ্রেস চালাইবার ভার দেওয়া হইল। এই অবিবেচনার ও স্বেচ্ছাচারিতার ফলে বাঙ্গালায় কংগ্রেস আন্দোলনকে কতটা পঙ্গু করা হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এখন আর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নহে—ইহা স্বেচ্ছাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কাজেই তাঁহাদের সম্বন্ধে আর কিছু না বলাই ভাল। দ্বিতীয় প্রস্তাবে গভর্ণমেণ্টকে জানান হইয়াছে যে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী—তাহা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থায় কংগ্রেস বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত আপোষ করিবেন না। কিন্তু এই প্রস্তাবেও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই।

কালীপ্রসন্ন সিংহ শতবার্ষিক—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে গত ২রা মার্চ্চ শনিবার সন্ধ্যায় পরিষদ মন্দিরে পরিষদের সভাপতি শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্মের শতবার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় মাত্র ৩০ বৎসর জীবিত ছিলেন—তিনি ধনী জমীদার হইয়াও ঐ অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব দান করিয়াছে। তিনি সংস্কৃত মূল মহাভারতের অনুবাদ করাইয়া তাহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার 'হুতোম পেঁচার নক্সা' বাঙ্গালা ভাষার একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। কালীপ্রসন্ন তাঁহার দানের জন্যও সুবিখ্যাত ছিলেন। আমরা তাঁহার এই জন্ম শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

গত দিল্লী অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় রাইসিনা বেঙ্গলী হাই স্কুলের ব্রতী বালকদলের কাঠি নৃত্য

ধান্যকুড়িয়ায় মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র—

চব্বিশপরগণা জেলার ধান্যকুড়িয়া গ্রাম তাহার জমিদার-দিগের বদান্যতার জন্য বিখ্যাত। সম্প্রতি ঐ গ্রামের পরলোকগত ধনী নফরচন্দ্র গাইনের স্মৃতিরক্ষা কল্পে তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ কর্তৃক লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি মাতৃমঙ্গল ও শিশুসহায় কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। গত ২৯শে জানুয়ারী বাঙ্গালার গভর্ণরের পত্নী লেডী মেরী হার্বার্ট তথায় গিয়া কেন্দ্রের নূতন গৃহের উদ্বোধন উৎসব সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। গাইনবাবুদের অর্থসাহায্যে ঐ গ্রামে ইতি-পূর্ব্বে বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায় গ্রামবাসীরা নানাভাবে উপকৃত হইয়াছে। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারাও প্রসূতিদিগের ও নবজাত শিশুদিগের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। সুখের বিষয় এই যে, গাইনবাবুরা গ্রামেই বাস করেন; কাজেই তাঁহাদের দ্বারা গ্রাম যে সমৃদ্ধ ও উপকৃত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?
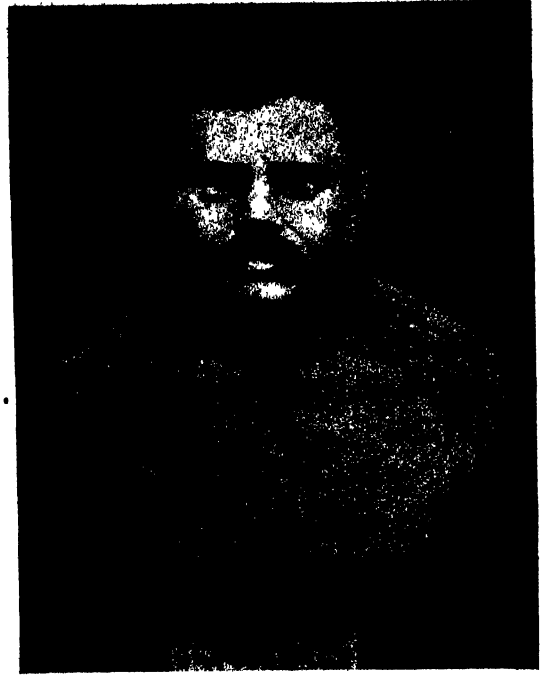
পরলোকগত নফরচন্দ্র গাইন

ধান্যকুড়িয়া মাতৃমঙ্গল ও শিশুপালনকেন্দ্র

ঐক্য প্রচেষ্টা—

আগামী রামগড় কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বে এলাহাবাদ অথবা দিল্লীতে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদলের একটি সম্মিলন আহ্বানের জন্ম মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ইয়াকুব হাসান চেষ্টা করিতেছেন জানিয়া আমরা আশান্বিত হইলাম। ইতিপূর্ব্বেও এই রকম চেষ্টার সম্ভাবনার কথা শুনিয়াছি, কিন্তু অনিবার্য্য কারণে তাহা সম্ভব হয় নাই। শ্রীযুক্ত ইয়াকুব হাসান সত্যই বলিয়াছেন যে, মোসলেম লীগের বাহিরে হাজার হাজার জাতীয়তাবাদী মুসলমান রহিয়াছেন যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতাকে আদৌ প্রশ্রয় দেন না। এই সকল মুসলমান যদি নিজেদের মতামত জোরের সহিত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে জিন্নাসাহেবের অযৌক্তিক ও অসঙ্গত দাবীর অসারতা প্রমাণিত হইবে এবং মোসলেম লীগ যে ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধি নহে তাহাও পৃথিবীর লোক জানিতে পারিবে। আর সঙ্গে সঙ্গে এই সকল জাতীয়তাবাদী মুসলমান যদি কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করেন তাহা হইলে বৃটিশ সরকারও ঐ দাবী উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। আমরা শ্রীযুক্ত ইয়াকুব হাসানের এই সাধু প্রচেষ্টার সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

ভারতীয় নারীদের প্রশংসনীয় উদ্যম—

নিখিল-ভারত নারী-সম্মিলনের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ, সম্মিলন গত বৎসরে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে অনেকগুলি কার্য্য করিয়াছেন। মামুলি বক্তৃতা, প্রবন্ধপাঠ ও প্রস্তাবগ্রহণের মধ্যেই তাঁহাদের শক্তিকে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া তাঁহারা যে গঠনমূলক কার্য্যে নামিয়াছেন ইহা সত্যই আশার কথা। একটি সভ্য দেশের মধ্যে এত অশিক্ষিত নারী পৃথিবীর আর কোন সভ্য দেশে নাই। শিক্ষিতা মহিলারাই তাঁহাদের দেশের অশিক্ষিতা নারীদের অজ্ঞানতা দূর করিতে পারেন। বাড়ী বাড়ী গিয়া পুরমহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার একমাত্র তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভব, পুরুষ কর্ম্মীদের পক্ষে তাহা মোটেই সম্ভব নহে এবং অশিক্ষিতা পুরমহিলাদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারই দ্রুত শিক্ষাবিস্তারের অন্যতম প্রধান উপায়। নিখিল-ভারত নারী-সম্মিলন এই দিকে অধিকতর শক্তি নিয়োগ করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে।

ধান্যকুড়িয়ায় স্মৃতি উৎসব—

গত ৮ই ফাল্গুন ২৪ পরগণা জেলার ধান্যকুড়িয়া গ্রামে স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণের উদ্যোগে উক্ত গ্রামের স্বর্গত বদান্য জমিদার রায় বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ সাউএর পঞ্চবিংশতি স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীযুত

রায় বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ সাউ

তুষারকান্তি ঘোষ ঐ উৎসবে পৌরোহিত্য করিতে গিয়াছিলেন। স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ধান্যকুড়িয়া ও তৎসন্নিহিত গ্রামগুলির অধিবাসীদিগকে সকল সময়ে তাঁহার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

শ্রীযুত শ্যামসুন্দর গোস্বামী—

নদীয়া শান্তিপুরের খ্যাতনামা ব্যায়ামবীর শ্রীযুত শ্যামসুন্দর গোস্বামী তাঁহার শিষ্য শ্রীযুত ডি, প্রামাণিককে সঙ্গে লইয়া সম্প্রতি আমেরিকা ও জাপানের নানাস্থান দেখিয়া ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার ব্যায়াম কৌশল দেখিয়া লোক মুগ্ধ হইয়াছে। কলিকাতায় তাঁহার ব্যায়াম প্রদর্শন ইতিপূর্ব্বে অনেকেই দেখিয়াছেন—কাজেই তাঁহাদের নিকট শ্যামসুন্দরবাবুর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কিছুই নাই।

সারা জগতের লোকের নিকট প্রশংসা অর্জ্জন করায় আমরা শ্রীযুত গোস্বামী ও তাঁহার শিষ্যকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

সংবাদপত্র দলন—

বাঙ্গালা সরকার কলিকাতার 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' নামক ইংরাজি দৈনিকপত্র ও চট্টগ্রামের 'দেশপ্রিয়' নামক বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন—তাঁহারা কোন সম্পাদকীয় মন্তব্য সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে না দেখাইয়া নিজ নিজ পত্রে প্রকাশ করিতে পারিবেন না। এই আদেশের পর হইতে 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্র প্রকাশিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয় না। সে স্থানটি সাদা থাকে। সরকারের এইরূপ কঠোর আদেশের অর্থ বুঝা দুরূহ। এইভাবে সংবাদ-পত্র দলন করা হইলে দেশে অসন্তোষই বৃদ্ধি পায়।

যুদ্ধের সংবাদে ব্যয়বরাদ্দ—

পাঞ্জাব সরকার সংবাদপত্রের মারফত প্রদত্ত যুদ্ধের সংবাদে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া আগামী বৎসরের জন্য এ বাবদে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন। যুদ্ধের সঠিক খবর যাহাতে পাঞ্জাবের ঘরে ঘরে জোগান দেওয়া হয়, এই টাকা সেই উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হইবে। অথচ আমাদের বিশ্বাস, পাঞ্জাববাসীরা যুদ্ধের সঠিক খবরের অভাবে মৃতকল্প হইয়া বসিয়া নাই; যাহার অভাবে সত্যিই তাহারা মৃতকল্প, সেই সব জনহিতকর ব্যাপারে অর্থব্যয় করিলে তাহা সত্যিকারের কাজে আসিবে। কিন্তু সেই বেলায় সরকারের অর্থাভাব দেখা দেয়।

ভারতীয় মুসলমান ও ভারতবাসী—

মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান স্যার মির্জা ইসমাইল সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে পৌরোহিত্য করিতে আসিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার 'মুস্‌লিম ছাত্র সমিতি'র এক সভায় মুসলমান ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা নানা দিক হইতেই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—'আমি আশা করি, তোমরা মুসলমান বলিয়া গৌরব বোধ কর এবং সেই মহান ধর্ম্মের গৌরবোজ্জ্বল পারম্পর্য্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে; কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও কখনও ভুলিবে না যে ভারতের প্রতিও তোমাদের রাজনৈতিক আনুগত্য আছে। সত্যিকারের মুসলমান ও সত্যিকারের ভারতবাসী—এই দুইই তোমরা হইতে পার, আর হওয়াও উচিত। বাঙ্গালায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের সুযোগ সহজ। এখানে উভয় সম্প্রদায়েরই মাতৃভাষা এক। এই ভাষা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত প্রতিভাশালী কবির দ্বারা সমৃদ্ধ, এই মাতৃভাষার উপর ভিত্তি করিয়াই বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন নিবিড় হইতে পারে।' স্যর মির্জা ইসমাইল সাহেবের উপদেশে দূরদৃষ্টি আছে এবং তিনি যে একজন দেশের কল্যাণকামী, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু মুসলমান সমাজ আজ যে মুষ্টিমেয় লোকের খেয়াল খুশীর কাছে হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছে, সেই লীগ-পন্থীরা যে এই উপদেশের কোন মূল্যই দিবেন না তাহাও সত্য। কেন না, ইতি-মধ্যেই তাঁহারা ভারতের মুসলমানদের এক স্বতন্ত্র জাতিরূপে দাঁড় করাইতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের কাছে স্যর মির্জা ইসমাইলের সুপরামর্শ গ্রহণযোগ্য বলিয়াই গ্রাহ্য হইবে না।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রদর্শনী—

মেসার্স সি, কে, সেন এণ্ড কোম্পানী কলিকাতা চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে তাঁহাদের নবনির্ম্মিত ভবন 'জবাকুসুম হাউসে' গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে যে আয়ুর্ব্বেদীয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা এ দেশে আয়ুর্ব্বেদের প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে সন্দেহ নাই। গত ২৭শে মাঘ সন্ধ্যায় স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় ঐ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। উক্ত কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয় এ দেশে দেশীয় চিকিৎসাপদ্ধতি প্রবর্ত্তনের যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পৌত্র-প্রপৌত্রগণ সে বিষয়ে এখনও যথেষ্ট যত্নবান দেখিয়া দেশবাসী মাত্রই আনন্দানুভব করিবেন।

আর্থিক দুনিয়া

শ্রীসুধাংশুভূষণ রায়

বাঙ্গলা সরকারের বাজেট

অর্থসচিব মিঃ এইচ্‌. এস সুরাবর্দী গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গলা সরকারের ১৯৪০-৪১ সালের যে বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন তাহা পূর্ব্ব বৎসরের মত সকল দিক দিয়া একটা নিরাশার ভাবই জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। এবারকার বাজেটে আগামী বৎসরের হিসাবে রাজস্বের খাতে মোট ১৩ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। অপরদিকে মোট ১৪ কোটি ৫৪ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। কাজেই ১৯৪০-৪১ সালে রাজস্বের হিসাবে আয় অপেক্ষা ব্যয় বৃদ্ধির জন্য মোট ৫৬ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা ঘাটতি হইবে। ঐ বৎসরে ঋণ আমানতের স্বতন্ত্র খাতেও ২৫ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কাজেই শেষপর্য্যন্ত উভয় দফা মিলাইয়া মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৮২ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। বাঙ্গলা সরকারের মজুত তহবিল ভাঙ্গাইয়া এই ঘাটতি পূরণ করা হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

গত বৎসর যখন বাঙ্গলা সরকারের ১৯৩৯-৪০ সালের অর্থাৎ চলতি বৎসরের বাজেট পেশ করা হয় তখন রাজস্বের হিসাবে ১৩ কোটি ৭৭ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা আয় ও ১৪ কোটি ৬৪ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে সংশোধিত বরাদ্দে আয়ের পরিমাণ ১৪ কোটি ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ও ব্যয়ের পরিমাণ ১৪ কোটি ১৬ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে। ফলে চলতি বৎসরে রাজস্বের হিসাবে ১৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে। ঐ প্রকারের ঘাটতি পূরণ করিয়া এবার বৎসরের শেষে বাঙ্গলা সরকারের হাতে মোট ৯৪ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকার নগদ তহবিল থাকিবার কথা। কিন্তু চলতি বৎসরে বাঙ্গলা সরকার ট্রেজারী বিল বাবদ যে ৬০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ফলে শেষপর্য্যন্ত নগদ তহবিলের পরিমাণ ১ কোটি ৫৪ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা দাঁড়াইবে বলিয়া অর্থসচিব অনুমান করিতেছেন। আগামী বৎসরে রাজস্ব খাতের ৫৬ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা ও ঋণ আমানত ইত্যাদি দফার ২৫ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ঘাটতি পূরণ করিয়া ঐ নগদ তহবিলের মাত্র ৭২ লক্ষ ২২ হাজার টাকা অবশিষ্ট থাকিবে। বর্ত্তমান নিয়ম অনুসারে বাঙ্গলা সরকারকে সদাসর্ব্বদাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ও ট্রেজারী বিল ইত্যাদিতে ৫ লক্ষ টাকার মত নিয়োজিত রাখিতে হয়। কাজেই সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে প্রয়োজন মত খরচপত্র চালাইবার পক্ষে আগামী ১৯৪০-৪১ সালের শেষে বাঙ্গলা সরকারের হাতে নগদ মাত্র বাইশ-তেইশ কোটি টাকার মত অবশিষ্ট থাকিবে। এই অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। আর সেকারণে অর্থসচিব তাঁহার বক্তৃতায় বাঙ্গলা সরকারের তহবিল সমুচিত পরিমাণে বাড়াইবার জন্য অদূর ভবিষ্যতে নূতন ট্যাক্স বসাইবার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা ৪১ লক্ষ টাকা পরিমাণ নগদ তহবিল লইয়া কার্য্য সুরু করিয়া ছিলেন। ভারত সরকারের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ মুকুব হইয়া যাওয়ায় ঐ সময় হইতে ঋণ পরিশোধের দফায় এগার লক্ষ টাকা খরচ বাঁচিয়া যায়। তখন হইতে ভারত সরকারের নিকট সাক্ষাৎভাবে আয় করের অংশ বাবদ বৎসরে বিশ-ত্রিশ লক্ষ টাকা ও পাট রপ্তানি শুল্ক বাবদ বৎসরে পঞ্চাশ ষাট লক্ষ টাকা পরিমাণে অতিরিক্ত রাজস্ব প্রাপ্তিরও সুবিধা হয়। কিন্তু এই প্রকার বর্দ্ধিত আয়ের সুযোগে নগদ ও মজুত তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া আর্থিক সংস্থিতি সুদৃঢ় করার চেষ্টাই বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে সঙ্গত ছিল। কিন্তু দেখা যাইতেছে, তাঁহারা তাহা করা দূরে থাকুক, বরং আয়ের তুলনায় ব্যয় ক্রমান্বয়ে বাড়াইয়া দিয়া একটা দেউলিয়া দশায়ই উপনীত হইতেছেন।

নূতন প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে সকলেই আশা করিতেছিলেন যে, এখন হইতে সরকারী কার্য্যনীতির ধারা ক্রমেই জাতি-গঠনমূলক-কার্য্যবিষয়ে নিয়োজিত হইবে। আর তাহার ফলে বাঙ্গলার পুঞ্জীভূত দুঃখগ্লানি মোচনেরও সুব্যবস্থা হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা এপর্য্যন্ত যে কয়টি বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে ঐ প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁহাদের কোন সুপরিকল্পিত ও সুসঙ্কল্পিত কার্য্যধারার আভাষ পাওয়া যায় নাই। শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ, বেতন ও ভাতার ব্যয় বহর মিটান এবং বিশেষভাবে পুলিশ বিভাগের মোটা অঙ্ক জোগাইতে গিয়াই তাঁহারা সরকারী রাজস্বের বিপুল অংশ ক্ষয় করিতেছেন। তৎপর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই মাত্র ছিটেফোঁটা হিসাবে বিভিন্ন জনহিতকর বিভাগে বণ্টন করা হইতেছে। ফলে, বর্ত্তমান স্বায়ত্তশাসনের আমলেও উপযুক্ত অর্থের অভাবে কৃষির প্রয়োজনে দেশে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি, ঋণ প্রদানের সুযোগ সুবিধা বা চাষাবাদের উন্নত প্রণালী প্রবর্ত্তনের বন্দোবস্ত তেমন কিছুই অগ্রসর হইতেছে না। অনুরূপভাবে সুপরিকল্পিত চেষ্টা ও প্রয়োজনানুরূপ অর্থ নিয়োগের অভাবে শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিক দিয়াও বর্ত্তমান পশ্চাৎপদ অবস্থা কাটিয়া ওঠার সুবিধা হইতেছে না। জাতিগঠনমূলক কার্য্যের একটা বাহ্যিক আড়ম্বর দেখাইবার জন্য তাঁহারা

প্রতিবৎসরই কিছু কিছু দান-খয়রাতি করিতেছেন। উহাতে অনেক অনুপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও সাম্প্রদায়িক শিক্ষায়তনের কলেবর পুষ্ট হইতেছে। কিন্তু আসল কাজ কোন দিক দিয়াই অগ্রবর্তী হইতেছে না। গত কয়েক বৎসরে বাঙ্গলায় আত্মনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থার এই স্বরূপ দেখিয়া দেশের লোক ক্ষুব্ধ ও বিশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ আইন

উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করিয়া চাহিদার অনুপাতে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ না করিলে যে পাটের মূল্যের স্থায়ী উন্নতি হইবে না তাহা দেশের হিতকামী মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার দীর্ঘকাল এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে অহেতুক উপেক্ষা ও অবহেলার ভাব দেখাইয়া এক্ষণে একটি আইনের খসড়া বিল উপস্থিত করিয়াছেন। বিলম্বে হইলেও আমরা উহাকে একটা শুভ প্রচেষ্টা বলিয়াই মনে করি। তবে যেরূপ সুসঙ্গত পরিকল্পনা লইয়াও যেরূপ আঁটঘাট বাঁধিয়া বাধ্যকরী পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের মত জটিল ব্যাপারে হাত দেওয়া উচিত, বাঙ্গলা সরকারের কার্য্যে তাহার বিশেষ অভাব লক্ষিত হইতেছে, ইহা দুঃখের বিষয়।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিলে বলা হইয়াছে যে, ১৯৩৯ সালে যে জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল সেই জমির রেকর্ড প্রস্তুত করিয়া তাহারই ভিত্তিতে ভবিষ্যতে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। কিন্তু নানা কারণে এইরূপ বিধান সমুচিত নহে বলিয়াই আমাদের ধারণা। প্রথমত, বাঙ্গলার কতকগুলি জেলাতে পাটচাষের উপযুক্ত জমি থাকা সত্ত্বেও বর্ত্তমানে সেখানে পাটের চাষ বিশেষ কিছুই হয় না। কিন্তু ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণের ফলে পাটের দাম বাড়িতে দেখিলে ঐ সকল জেলা বর্ত্তমানের তুলনায় বেশী পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিতে চাহিবে। আর সেই অবস্থায় উহাদের ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করিতে যাওয়া অসঙ্গত হইবে। দ্বিতীয়ত, ১৯৩৯ সালে যদি কোন কৃষক পারিবারিক বিপদ, অর্থাভাব বা রোগশোক প্রভৃতি কারণে কম জমিতে পাট চাষ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে তবে ভবিষ্যতেও তাহাকে ঐ অনুপাতেই কম পাট চাষ করিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়ার মূলেও কোন সঙ্গতি নাই। ভবিষ্যতের জন্য পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণের কোন নির্দ্দেশ দিতে হইলে আমাদের মতে গত পাঁচ বৎসরের পাটের জমির গড় পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার ভিত্তিতেই উহা করা সঙ্গত। তাহা না হইলে অনেক কৃষকের প্রতিই অবিচার করা হইবে।

তাহা ছাড়া কৃষকদের ভিতর পাটচাষের জমি বিভাগ করিয়া দিবার জন্য এবং পাটচাষের নির্দ্ধারিত পরিমাণ সম্পর্কে লাইসেন্স প্রদানের নিমিত্ত পল্লীকেন্দ্রে যে ইউনিয়ন জুট কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার সম্পর্কেও নানা ত্রুটিবিচ্যুতির ভাব খুবই সুস্পষ্ট। পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ বিলের ঐ ধারা সম্পর্কে ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচিত কমিটি এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ইউনিয়ন জুট কমিটিতে মোট সাত জন সভ্য থাকিবে এবং নির্ব্বাচনী প্রথায় ঐ সব সদস্য নিয়োগ করিতে হইবে।

বর্ত্তমান পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ বিলের একটা প্রধান গলদ এই যে, পাটের মূল্যের উন্নতিবিধায়ক অন্য অনেক প্রয়োজনীয় বিধি-ব্যবস্থার নির্দ্দেশ ইহাতে নাই। সম্প্রতি সরকার-নিযুক্ত পাট তদন্ত কমিটি পাটচাষীদের হিতার্থে এ প্রদেশে পাটের নিম্নতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়ার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা দেখিয়া ব্যথিত হইলাম, বর্ত্তমান বিলে সে বিষয়ে কোন কার্য্যক্রমই নির্দ্ধারিত হয় নাই। এ প্রদেশের কৃষকেরা দরিদ্র বলিয়া ভবিষ্যতে উচিত মূল্য পাওয়ার আশায় পাট ধরিয়া রাখিতে পারে না। চলতি খরচ মিটাইবার জন্য অনেক সময় নিতান্ত কম দামেই তাহাদিগকে পাট বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়। আর সেই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ধনী পাট-কলওয়ালারা ও মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীরা তাহাদিগকে পাটের ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকে। কাজেই পাটের চাষ উপযুক্তরূপ নিয়ন্ত্রণ করা হইলেই তাহাতে কৃষকদের প্রকৃত কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইয়া উঠিবে না। চট-কলওয়ালারা ও ব্যবসায়ীরা যাহাতে পাট চাষীদিগকে সমুচিত মূল্য হইতে বঞ্চিত করিতে না পারে সেজন্য উৎপাদন ও চাহিদার অবস্থা বিবেচনা করিয়া পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া প্রয়োজন। আমরা আশা করি, গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বিলটিতে সেই মর্ম্মে একটি নূতন বিধান সংযুক্ত করিবেন।

ভারত সরকারের বাজেট

গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইস্‌ম্যান্ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে আগামী ১৯৪০-৪১ সালের বাজেট বরাদ্দ পেশ করেন। এই বাজেট প্রকাশিত হওয়ার অনেক পূর্ব্ব হইতেই নূতন ট্যাক্সের নানারূপ অশুভ জল্পনা সুরু হইয়াছিল। এক্ষণে ঐ বাজেট দৃষ্টে ঐ সব জল্পনা সম্পূর্ণ না হইলেও কতকাংশে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অতিরিক্ত লাভের উপর কর নির্দ্ধারণের সুসমাচার পূর্ব্বাহ্নেই দেশবাসীর কর্ণগোচর হইয়াছিল। এক্ষণে অর্থসচিব মহোদয় চিনির উপর উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি ও পেট্রোল ট্যাক্স বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করিয়াছেন। গত বৎসর যখন ভারত সরকারের ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত করা হয় তখন ঐ সালের মোট আয় ও ব্যয়ের অঙ্ক কষিয়া ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব স্যার জেমস্ গ্রীগ্ শেষ পর্য্যন্ত ৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। এক্ষণে চলতি বৎসরের যে সংশোধিত বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহাতে ঐ বৎসরে আয়ের পরিমাণ ৫ কোটি ৮ লক্ষ টাকা পরিমাণে বেশী হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহাতে চলতি বৎসরের শেষে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ঐ অনুপাতে অনেক বেশী হইবারই কথা ছিল। কিন্তু নূতন অর্থসচিব জানাইয়াছেন যে চলতি বৎসরের হিসাবে আয় যেমন বাড়িবে তেমনই সামরিক ব্যয়ের পরিমাণও ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা পরিমাণে বাড়িবে। কাজেই, শেষ পর্য্যন্ত বাজেটে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে মাত্র ৯১ লক্ষ টাকা। ১৯৪০-৪১ সালে অর্থাৎ আগামী বৎসর সম্বন্ধে অর্থসচিবের বরাদ্দ এই যে, ঐ বৎসর ভারত সরকারের মোট ৮৫ কোটি ৪০ লক্ষ

টাকা আয় হইবে। অপরদিকে ঐ বৎসরে ব্যয় হইবে মোট ৯২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। কাজেই আগামী বৎসরে ৭ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য নূতন তিন দফা ট্যাক্স বলবৎ করা হইবে। প্রথমত, শিল্প-ব্যবসায়ের অতিরিক্ত লাভের উপর শতকরা ৫০ টাকা হারে কর আদায় করা হইবে। দ্বিতীয়ত, চিনির উপর বর্ত্তমানে প্রতি হন্দরে ২ টাকা হারে যে উৎপাদন শুল্ক আছে উহা বাড়াইয়া ৩ টাকা করা হইবে। তৃতীয়ত, পেট্রোল ট্যাক্সের পরিমাণ বাড়াইয়া প্রতি গ্যালনে দশ আনা স্থলে বার আনা করা হইবে। অর্থসচিবের অনুমান এই, প্রথম দফায় ৩ কোটি টাকা, দ্বিতীয় দফায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ও তৃতীয় দফায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা আয় হইবে। চলতি বৎসরের উদ্বৃত্ত ৯১ লক্ষ টাকা ও নূতন ট্যাক্স বাবদ যে আয় হইবে তাহা দ্বারা ৭ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার ঘাটতি পূরণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ১৯৪০-৪১ সালের শেষে ভারত সরকারের হাতে মোট ৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে সম্প্রতি ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আর তাহার ফলে শুল্ক, আয়কর ও অন্য কয়েকটি দফায় ভারত সরকারের আয় ইতিমধ্যেই বিশেষভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। রেলের যাত্রী ও মালের ভাড়া চড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া রেল বিভাগের নিকট হইতেও গভর্ণমেণ্ট আগামী বৎসর ৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা আদায়ের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কিন্তু ঐরূপ ভাবে আয় বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহারা সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ এতই বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন যে, সরকারী বাজেটে কিছুতেই আর আয়ব্যয়ের কোন সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে না। ১৯৩৯-৪০ সালের প্রাথমিক বাজেট বরাদ্দে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ৪৫ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। পরে সংশোধিত বরাদ্দে তাহা বাড়াইয়া ৪৯ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে অর্থাৎ আগামী বৎসর উহার অঙ্ক ৫৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকায় পৌঁছিবে বলিয়া অর্থসচিব অনুমান করিতেছেন।

আগামী বৎসরের ঘাটতি পূরণের জন্য যে তিন দফা ট্যাক্স বসান হইয়াছে তাহার মধ্যে অতিরিক্ত মুনাফা কর সম্বন্ধে পূর্ব্বেই দেশে বিরূপ সমালোচনার ঝড় বহিয়াছিল। চিনি শুল্ক বৃদ্ধি সম্পর্কেও ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। এই শুল্কের ফলে দেশে চিনি শিল্পের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইবে। উৎপাদন শুল্কের সঙ্গে আমদানি শুল্কও সমভাবে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে ভারতে বিদেশী চিনির প্রতিযোগিতা নূতন করিয়া বাড়িতে পারিবে না বটে কিন্তু চিনির মূল্য চড়িয়া ওঠার ফলে উহার কাটতি হ্রাস পাইয়া দেশের চিনির কলগুলি যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা নিশ্চিত। বেশী দরে চিনি কিনিতে বাধ্য হইয়া দেশের দরিদ্র জনসাধারণকেও পরোক্ষে করের বোঝা বহন করিতে হইবে। পেট্রোল ট্যাক্সের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় দেশের মোটর ও বাস সার্ভিসগুলির উপর দুর্ব্বহ চাপ পড়িবে। মোটরে ও বাসে যাতায়াত করিতে ও মাল চলাচল করিতে সাধারণকেও তাহার জের টানিতে হইবে।

রেলের যাত্রী ও মালভাড়া বৃদ্ধি

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে স্বাভাবিক আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় বর্ত্তমানে ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের একটা সুদিন দেখা গিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ১৯৪০-৪১ সালের রেলওয়ে বাজেটে যাত্রী ও মালভাড়া বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হইয়াছে ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। গত বৎসর রেলবিভাগের ১৯৩৯-৪০ সালের অর্থাৎ চলতি বৎসরের বাজেট উপস্থিত করিয়া রেলওয়ে সচিব মহোদয় এবার ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। এক্ষণে রেলওয়ে রাজস্বের উন্নতির সঙ্গে এবার শেষ পর্য্যন্ত ৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া সংশোধিত বরাদ্দ উপস্থিত করা হইয়াছে। আগামী বৎসরে যাত্রী ও মালভাড়া কোনরূপ বৃদ্ধি না করিলেও শেষ পর্য্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই রেল বিভাগের হাতে ৩ কোটি টাকার মত উদ্বৃত্ত হইত, ইহাই রেলওয়ে সচিবের অভিমত। তথাপি কয়েকটি কারণ দেখাইয়া পরোক্ষ ট্যাক্সভার দ্বারা রেলের আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইয়াছে। সকলেই জানেন, গত ১৯২৪-২৫ সাল হইতে রেলের আয় হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রতি বৎসর ভারত সরকারের সাধারণ রাজস্বে দেওয়ার নিয়ম প্রবর্ত্তিত আছে। রেল বিভাগের আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকায় গত ১৯৩০-৩১ সাল হইতে ঐরূপ দেয় টাকা ক্রমেই বাকী পড়িয়া যাইতেছিল। কাজেই রেলওয়ে সচিব যাত্রী ও মালভাড়া বর্দ্ধিত করিয়া বেশী পরিমাণ আয়ের সংস্থান করিয়াছেন। গত ১লা মার্চ্চ হইতে রেলযাত্রীদের ভাড়া টাকায় এক আনা পরিমাণে ও মালের ভাড়া টাকায় দুই আনা হারে বাড়ান হইয়াছে। তবে যাত্রী-ভাড়া যেস্থলে এক টাকার কম সেস্থলে ভাড়ার হার পূর্ব্ববৎই থাকিবে। আর মালের ভাড়া বাড়াইতে গিয়াও খাদ্যশস্য, পশুর খাদ্য, সার ও সমর সরঞ্জামের ভাড়াও পূর্ব্বহারেই বজায় রাখা হইয়াছে। উপরোক্ত-ভাবে বর্দ্ধিত হার বলবৎ হওয়ার ফলে আগামী বৎসরে রেলবিভাগের মোট ১০৩ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। উহা হইতে অনুমিত ব্যয় ৬৫ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা ও গৃহীত ঋণের সুদ ২৮ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা মিটাইয়া আগামী বৎসরের শেষে রেল বিভাগের হাতে মোট ৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা থাকিবে। উহা হইতে ৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ভারত-সরকারকে দেওয়া হইবে এবং বাকী ২ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা রেলের মজুত তহবিলে ন্যস্ত করা হইবে বলিয়া রেলওয়ে সচিব স্থির করিয়াছেন।

সকল বিষয় বিবেচনা করিলে ইহা খুবই বলা যায় যে, রেলওয়ে সচিব এবার যাত্রী ও মালভাড়া এত চড়াহারে বর্দ্ধিত না করিলেও পারিতেন। যাত্রীভাড়া বৃদ্ধির জন্য দেশের জনসাধারণকে রেল চলাচলকালে বেশী ব্যয় বহন করিতে হইবে। মালভাড়া বৃদ্ধির জন্য দেশীয় শিল্পের বিপদ দেখা দিবে। এইরূপ আত্মঘাতী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া রেলের মজুত তহবিল বৃদ্ধির কি সার্থকতা থাকিতে পারে?
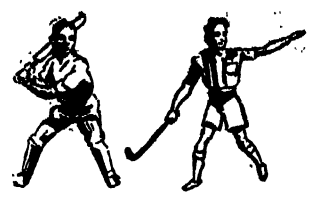
শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

রঞ্জিট্রফি ফাইনাল্ঃ

মহারাষ্ট্র—৫৮১ ও ১২ (কোন উইকেট না হারিয়ে)

ইউ পি—২৩৭ ও ৩৫৫

মহারাষ্ট্র ১০ উইকেটে বিজয়ী হ'য়েছে।

মহারাষ্ট্র এই প্রথম বহু আকাঙ্ক্ষিত রঞ্জি ট্রফি বিজয়ী হ'ল। তাদের এবং ভারতের প্রধানতম অধিনায়ক প্রফেসার দেওধর খেলার শেষে ব'লেছেন, 'The Ranji Trophy has come to Poona and the ambition of my life has been fulfilled.' গত বছর বিজয়ী হ'য়েছিল বাংলা, দক্ষিণ-পাঞ্জাবকে পরাজিত ক'রে। মহারাষ্ট্র এবারের রঞ্জি প্রতিযোগিতায় যে ভাবে ব্যাটিংয়ে নিপুণতা দেখিয়েছে তা উচ্চ প্রশংসনীয়।

ইউ পি টসে জিতে প্রথমে ব্যাট ক'রতে নামল। আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার কিন্তু দর্শক-সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। ১ রানে ইউ পির প্রথম উইকেট পড়ল। তেরো রানের মাথায় পালিয়া নিজে আউট হ'ল। তেরো অশুভ সংখ্যা। তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল ২৩৭ রানে।

রঞ্জিট্রফি

পালিয়া
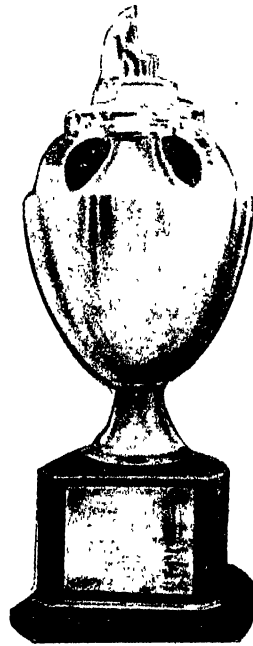
সর্বোচ্চ রান ক'রেছে গুরুদাচর ৬৩, তারপর মূর্ত্তি ৪৮। এ ছাড়া আর কারো রান উল্লেখযোগ্য হয় নি। অস্থিরতার জন্য খেলোয়াড় রান-আউট হ'য়েছে। দিনের শেষে মহারাষ্ট্র কোন উইকেট না হারিয়ে ১৩১ রান তুললে। ভাণ্ডারকার ও সোহানী যথাক্রমে ৫৪ ও ৬৭ রান ক'রে নট আউট রইলেন। দ্বিতীয় দিনে মহারাষ্ট্রের ৬ উইকেটে ৪৭৭ রান উঠল। ভাণ্ডারকার ১৩২ রান ক'রে পালিয়ার বলে বোল্ড হ'লেন। তিনি ২৭২ মিনিট খেলে উইকেটের চতুর্দ্দিকে সমানভাবে পিটিয়ে দলের সর্ব্বোচ্চ রান ক'রেছেন। তাঁর খেলায় চার ছিল ১২টা। সোহানী ৯৬ রান ক'রে মূর্ত্তির বলে আলেক-জাণ্ডারের হাতে ধরা দিলেন। সোহানী অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশত মাত্র চার রানের জন্য সেঞ্চুরী ক'রতে পারলেন না; তার খেলায় চার ছিল ৮টা। প্রফেসার দেওধর ৬০ ক'রে আউট হ'য়েছেন। এ ছাড়া নাগরওয়ালার ৫৪ এবং হাজারীর ৫৩ রানও উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় দিনের খেলায় মহারাষ্ট্রের প্রথম ইনিংস ৫৮১ রানে শেষ হ'ল। হ্যারিস ৬২ রান করার পর দুর্ভাগ্যবশত রান আউট হ'য়েছে। বোলিং কারো উল্লেখযোগ্য হয় নি। ৩৪৪ রান পিছিয়ে থেকে ইউ পি তাদের দ্বিতীয় ইনিংস সুরু ক'রলে। আরম্ভ প্রথম ইনিংসের মতই হ'ল। ১ রানে প্রথম উইকেট পড়ল। পালিয়া এসে খেলার গতি একেবারে ঘুরিয়ে দিলেন এবং দিনের শেষে ১৫৬ রান ক'রে নট আউট রইলেন। তাঁর খেলা দর্শনীয়; যদিও ইতিমধ্যে দুবার আউট হবার সুযোগ দিয়েছেন। আলেকজাণ্ডার ৪১ রান ক'রে দেওধরের হাতে ধরা দিয়েছে। চার উইকেটে ইউ পির

দেওধর হাজারী

রান সংখ্যা উঠলো ২৪০। ইনিংস পরাজয় থেকে রক্ষা পেতে এখনও ১০৪ রান বাকী।

চতুর্থ দিনের খেলায় ইউ পির দ্বিতীয় ইনিংস ৩৫৫ রানে শেষ হ'ল। অতিরিক্ত ২৫ রান বাদ দিয়ে ইউ পির খেলোয়াড়রা ৩৩১ রান তুলেছে, তার মধ্যে পালিয়া একাই ক'রচেন ২১৬। তাঁর খেলা প্রকৃত ক্যাপ্টেনের মত হ'য়েচে। নিজের টীমকে ইনিংস পরাজয় থেকে রক্ষা করবার জন্য পালিয়ার চেষ্টা উচ্চ প্রশংসনীয়। ৩৩১ মিনিট খেলে এবং দর্শনীয় 'লেগ গ্লান্স' 'কাট' এবং বিভিন্ন মার দেখিয়ে তিনি উক্ত রান তুলেছিলেন। তাঁর খেলায় চার ছিল ২৫টা। পালিয়ার জন্যই ইউ পি ইনিংস পরাজয় থেকে রক্ষা পেয়েচে। প্রয়োজনীয় রান সংখ্যা তুলতে মহারাষ্ট্র একটিও উইকেট হারায় নি। খেলার শেষে প্রফেসর দেওধর পালিয়ার খেলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রেছেন।

মহারাষ্ট্র—৪৮২ ও ২০৩ (৬ উইকেট)

দক্ষিণ পাঞ্জাব—৪২৯ ও ৩০৯ (৯ উইঃ ডিক্লিয়ার্ড)

মহারাষ্ট্র প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী থাকায় বিজয়ী হ'য়েছে।

দক্ষিণ পাঞ্জাবের পক্ষে নিসার, অমরনাথ ও মহারাজা নিজে খেলেন নি, কাজেই তাদের টীম বিশেষ দুর্ব্বল ছিল। তথাপি প্রথম ইনিংসে তারা ৪২৯ রান তোলে। নাজির আলি করেন ১৫১ আর সৈয়দ আমেদ ৭৬। এর উত্তরে মহারাষ্ট্র ৪৮২ রান করে। হাজারী আবার নিজ দলের সর্ব্বোচ্চ রান করেন ১৫৫। এছাড়া, রজনেকার ৮৭ ও সোহানী ৬০ রান করেন। দক্ষিণ পাঞ্জাব দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেটে ৩০৯ রান উঠলে 'ডিক্লিয়ার্ড' করে। ক্যাপ্টেন ওয়াজির আলি ১৫২ রান করেন। হাজারী পাঁচ টা উইকেট পান ৭৯ রানে। মহারাষ্ট্রর ৬ উইকেটে ২০৩ রান উঠলে সময়াভাবে খেলা শেষ হয়।

হকি ঃ

হকি লীগ খেলা সুরু হ'য়েছে। গতবারের লীগ বিজয়ী কাষ্টমস্ প্রথম প্রথম এত অধিক গোলে জিতছিল যে, এবারও তাদের লীগ বিজয় একেবারে সুনিশ্চিত ব'লেই সকলে ধারণা ক'রেছিলেন। হঠাৎ বি জি প্রেস তাদের হারিয়ে দিয়ে সকলকে আশ্চর্য্য ক'রলে। ততোধিক

ওয়াই এম-সির (ভবানীপুর) টেবিল টেনিস খেলায় মিস্ আর নাগ মহিলাদের সিঙ্গলস বিজয়িনী হ'য়েছেন। মিক্সড ডবলসেও তিনি বিজয়িনী হ'য়ে নিজ সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন

জাতীয় যুব সঙ্ঘের স্পোর্টসে বিজয়িনী বেথুন কলেজ স্কুল　　ছবি—পান্না সেন

আশ্চর্য্য ক'রলে তাদের কাছে ই বি আরের জয়লাভ। টীম হিসাবে ই বি আর মোটেই ভাল নয় কিন্তু কাষ্টমস্ তাদের সঙ্গে ভাল খেলতে পারে নি। পোর্ট-কমিশনারে পাঞ্জাবের বিখ্যাত খেলোয়াড় চিরঞ্জীৎ রায় ও কাপুর যোগদান করায় তারা খুব শক্তিশালী হ'য়েছে। পোর্ট-কমিশনার, বি জি প্রেস ও মিলিটারী মেডিক্যালস এবার লীগ নেবার জন্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রবে। ভারতীয় দলগুলির মধ্যে কারো অবস্থা ভাল নয়।

অলিম্পিক ঃ

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। পুরুষদের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হ'য়েছে

নিখিল ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ৮০ মিটার হার্ডল রেস বিজয়িনী বাঙ্গলার লোলা সিভিল

পাতিয়ালা। মহিলাদের প্রতিযোগিতায় সাইক্লিং ও সুটিংয়ে জয়ী হ'য়েছে বোম্বাই আর বাঙ্গলা কুস্তি, ওয়েট লিফটিং এবং সাধারণ বিষয়ে চ্যাম্পিয়ানসিপ পেয়ে বর্দ্ধমান শীল্ড ও ডোরাব টাটা ট্রফি লাভ ক'রেচে। কুস্তিতে বাঙ্গলা ৩৪ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম হ'য়েছে; পাঞ্জাব মাত্র ১৬ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রেছে। ওয়েট লিফটিংয়ে বাঙ্গলা

জহুর আমেদ

বাঙ্গলার এস সিংহ (বামদিকে) হেভিয়েট ও এ কে সিংহকে (বাঙ্গলা) পরাজিত করেন। অলিম্পিকে কুস্তিতে বাঙ্গলা ৩৪ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম হয়েছে

প্রথম স্থান অধিকার ক'রেছে ২৪ পয়েন্ট পেয়ে; পাঞ্জাব ১২, বোম্বাই ৫ এবং বিহার ৩ পয়েন্ট পেয়েছে। এ

নিখিল ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বাস্কেট বল বিজয়ী বাঙ্গলা দল ও বিজিত মাদ্রাজ দল;
বাঙ্গলা ৩৯-২২ পয়েন্টে মাদ্রাজ প্রদেশকে পরাজিত করেছে

ছাড়া, বাস্কেট বল ফাইনালে বাঙ্গলা ৩৯—২২ পয়েন্টে মান্দ্রাজকে পরাজিত ক'রেছে। এবারের অলিম্পিকে যে সব বিষয়ে নূতন রেকর্ড স্থাপিত হ'য়েছে তার ভেতর মান্দ্রাজের বুসির হপ-ষ্টেপ-জাম্পে ৪৯ ফিট ৪½ ইঃ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঞ্জাবের জহুর 'পুটিং-দি-সটে ৪৫ ফিট ২ ইঃ এবং সিডোন ৯৩ ফিট ৭⅛ ইঃ জেভেলীন নিক্ষেপ ক'রে নূতন রেকর্ড স্থাপন ক'রেছেন। জানকী দাস ১০,০০০ মিটার সাইক্লিং-এ—১৮ মিঃ ২৭·৩ সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে আর পাতিয়ালার সোমনাথ ১৩০ ফিট ৮½ ইঞ্চি, 'হ্যামার' নিক্ষেপ ক'রে নূতন রেকর্ড স্থাপন ক'রচেন। এই ভারতীয় অলিম্পিক রেকর্ডগুলির সঙ্গে পৃথিবীর অলিম্পিক রেকর্ডের তুলনা ক'রলে দেখা যাবে যে, ক্রীড়াজগতে ভারতবর্ষ কতখানি পিছিয়ে র'য়েছে। হপ-ষ্টেপ-জাম্পে পৃথিবীর অলিম্পিক রেকর্ড হ'চ্ছে ৫২ ফিট ৫⅛ ইঞ্চি; জাপানের তাজিমা ক'রেচেন। পুটিং-দি-সটে ৫৩ ফিট ১¾ ইঞ্চি; জার্ম্মানীর ওয়েলক ক'রেচেন। জেভেলীন নিক্ষেপের রেকর্ড হ'চ্ছে জার্ম্মাণীর ষ্টোকের ২৩৫ ফিট ৮½ ইঞ্চি। হ্যামার নিক্ষেপের রেকর্ড ও জার্ম্মাণীর থেকে হ'য়েছে। হেন ক'রেচেন; দূরত্ব ১৮৫ ফিট ৪·৯ ইঞ্চি। একমাত্র হপ-ষ্টেপ-জাম্প ছাড়া বাকী সব বিষয়েই ভারতের স্থান বহু পশ্চাতে।

আনন্দ মুখার্জ্জি

পোলভল্টে বাঙলার আনন্দ মুখার্জ্জি ১১ ফিট ৯½ ইঞ্চি

লাফিয়ে প্রথম স্থান অধিকার ক'রেচেন। অনেকের মতে এইটি অলিম্পিকের রেকর্ড আবার অনেকের মতে নয়।

'ডিসকাস থ্রো' বিজয়িনী যুক্তপ্রদেশের মিস জে নিকলস
দূরত্ব—৮০ ফিট—২½ ইঞ্চি

আমরা জানি, পাঞ্জাবের আব্দুল সফি খানের ১২ ফিট ৭/৮ ইঞ্চি এক রেকর্ড আছে কিন্তু সে রেকর্ড অলিম্পিকে হ'য়েছিল কি-না তা আমাদের জানা নেই। যখন এই ব্যাপার নিয়ে অনেকের মতভেদ র'য়েছে এবং তা একাধিক কাগজে প্রকাশিত হ'য়েছে তখন অলিম্পিক এসোশিয়েশনের সেক্রেটারীর ব্যাপারটি পরিষ্কারভাবে খবরের কাগজে প্রকাশ করা উচিত ছিল।

কুচবিহার ক্রিকেট কাপ ফাইনাল ঃ

ই বি আর—১৪৪ ও ৯৫

রেঞ্জার্স ক্লাব—৮৩ ও ১৩৮

ই বি রেলদল ১৮ রানে বিজয়ী হয়েছে।

পূর্ব্ববর্তী বিজয়িগণ :—১৯৩৬—মহমেডান স্পোর্টিং; ১৯৩৭-৩৯ এরিয়ান্স ক্লাব।

টেবিল টেনিস ফাইনাল ঃ

টেবিল টেনিসের ফাইনালে ইউনিভারসিটি ল'কলেজ, কারমাইকেল মেডিকালকে পরাজিত করেছে। পাঁচটি খেলার মধ্যে ল'কলেজ দু'টি সিঙ্গলসে এবং একটি ডবলসে জয়ী হয়। বাকী দু'টি সিঙ্গলস খেলায় কারমাইকেল কলেজ বিজয়ী হয়।

ল'কলেজের পক্ষে কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল সরকার, অসিত মুখার্জ্জি এবং কারমাইকেলের পক্ষে অনিল সোম, বিনয় ঘোষ ও দেবনারায়ণ রায়চৌধুরী খেলেন।

পূর্ব্বভারত লন টেনিস ফাইনাল ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলসে—ই ভি বব ২-৬, ৬-১, ও ৬-২ গেমে এস এ নাজিমকে পরাজিত করেন।
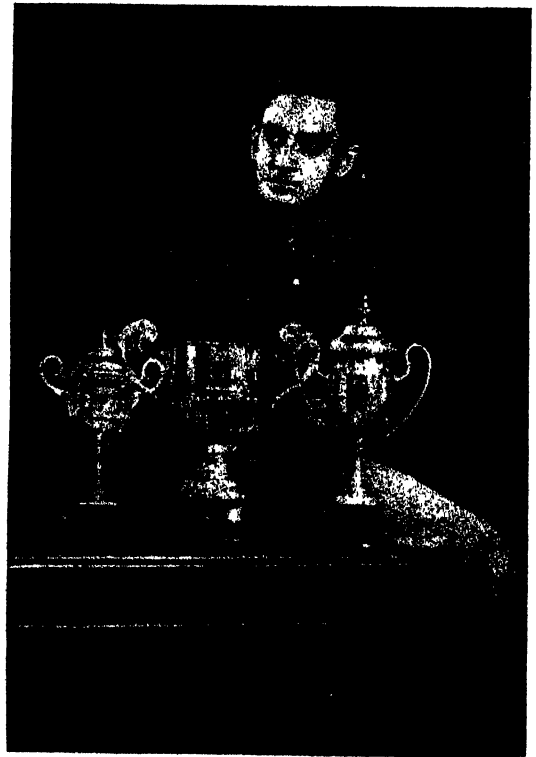
১৯৩৬-৪০ সালের ইণ্টার কলেজিয়েট চ্যাম্পিয়ন ও ১৯৩৫ সালের কলিকাতা ইউনিভারসিটি জে আর চ্যাম্পিয়ান, ১৯৩৭ সালে ও গত বর্ষ বার্ষিক বেঙ্গল টেনিসে পুরুষদের সিঙ্গলস বিজয়ী—কমল বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বৎসর ইউনিভারসিটি ল' কলেজের পক্ষ থেকে অমল সরকারের সহযোগিতায় ডবলসে কারমাইকেল কলেজকে পরাজিত করেছেন

পুরুষদের ডবলসে—জে ই টিট্ট ও মিটন ৯-৭, ৬-৩ গেমে বিকিভোল্ড ও মিলাইয়ের কাছে বিজয়ী হয়।

মহিলাদের ডবলসে—মিস্ লীলারাও ও মিস এমারি ৬-২, ৪-৬ ও ৬-২ গেমে কে হাজী ও পি ডালিমাকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে—মিস লীলারাও ও ই ভি বব ৬-৪, ৭-৫ গেমে মিস কে হাজি ও এফ বিকিভোল্ডএর নিকট বিজয়ী হ'ন।

ইণ্টার কলেজ স্পোর্টস ঃ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টার কলেজ স্পোর্টস এ বৎসর সুশৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পন্ন হ'য়েছে। বাঙ্গলার বিভিন্ন কলেজ থেকে মোট ১০৭ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। প্রেসিডেন্সি কলেজের আনন্দ মুখার্জ্জি নিখিল ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করায় কলেজ স্পোর্টসে অনুপস্থিত ছিল। ৭২ পয়েণ্ট পেয়ে সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ, কলেজ-চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছে; এবং উক্ত কলেজেরই ছাত্র ডি ই কেয়োন ৩২ পয়েণ্ট পেয়ে ব্যক্তিগত-চ্যাম্পিয়ান-সিপ পেয়েছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ্যারিয়ার্স ক্লাব ১০ মাইল ভ্রমণ প্রতিযোগিতায় প্রথম—শশধর ভট্টাচার্য্য (রিপণ কলেজ) দ্বিতীয়—গতি দে (সিটি কলেজ) ও তৃতীয়—কালীদাস ভট্টাচার্য্য (আশুতোষ কলেজ)

ইণ্টার কলেজ ভারোত্তলন ও পেশীসঙ্কুচন প্রতিযোগিতা ঃ

ভারোত্তলন প্রতিযোগিতায় পাঁচটি বিষয়ে বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররা যোগদান করে। কলেজ চ্যাম্পিয়ান-সিপে প্রথম স্থান অধিকার করেছে যাদবপুর কলেজ এবং দ্বিতীয় স্থান বিদ্যাসাগর কলেজ। পেশী সঙ্কুচন প্রতি-যোগিতায় তিনটি বিষয়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। রিপন কলেজ প্রথম এবং ইউনিভারসিটি ল'কলেজ ও ইসলামিয়া কলেজ একত্রযোগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

ইণ্টার কলেজ ভারোত্তলন প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন কলেজের ছাত্র

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি ফাইনাল ঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি ফাইনালে এ বৎসর বোম্বাই দল ২-০ গোলে দিল্লী দলকে পরাজিত করেছে। দিল্লীর ও ফেরেরাকে অতিক্রম করতে পারে নি। বিজয়ী দলের লতিফই দু'টি গোল দিয়ে নিজ দলের সম্মান রক্ষা করেছে। বোম্বাই গত বৎসরের আন্তঃপ্রাদেশিক হকি চ্যাম্পিয়ান বাঙ্গলা

আন্ত-প্রাদেশিক হকি খেলায় বাঙ্গলা দল

আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা গোল দেবার সুযোগ বেশী বার পেলেও বোম্বাই দলের রক্ষণভাগের লিন, ফিলিপস্ দলকে এ বৎসর ৩-০ গোলে পরাজিত করেছিল। বাঙ্গলা প্রদেশ প্রথম খেলায় মাদ্রাজ দলকে ৭-০ গোলে পরাজিত করে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত কবিতা "মধু-সন্ধান"—১৷৹
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "ঘি ও আগুন"—২৲
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "শোণিত-লোলুপ ভবন"—১৷৷৹
বিমল সেন প্রণীত "মরুযাত্রী"—৸৹
শ্রীহরিদাস মজুমদার প্রণীত "কলিকাতার নাগরিক"—৷৹
ডাঃ শিবপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "বিমান আক্রমণ ও তাহার প্রতিরোধ"—৸৹
শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "অবশ্যম্ভাবী"—২৷৷৹
শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত নাটক "মহামায়ার চর"—১৷৹
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী "কালীপ্রসন্ন সিংহ"—৷৹
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "শনি-রবি সোম"—১৲
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রণীত (উপন্যাস) (সবার সাথে)—২৲
শ্রীপ্রবোধ সরকার প্রণীত (উপন্যাস) নারী প্রগতি—১৷৷৹
বিধায়ক ভট্টাচার্য্য প্রণীত (নাটক) বিশবছর আগে—১৷৹

সম্পাদক—
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjee & Sons,
at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

আনমনা

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

বৈশাখ—১৩৪৭

তীয় খণ্ড | সপ্তবিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

নারদের ভক্তিসূত্র

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

ভক্তি সম্বন্ধে যতগুলো প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায়, নারদের ভক্তিসূত্র তার মাঝে একখানা অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ভক্তির দার্শনিকতা অপেক্ষা সাধনভাগের কথাই নারদ বিশদভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর ভক্তিসূত্রে। এজন্য ভক্তিপথের পথিকদের কাছে এ গ্রন্থের আদর খুব বেশী। সাধনার মূর্তবিগ্রহ দক্ষিণেশ্বরের মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিসাধনার কথায় প্রায়ই বলতেন, কলিতে নারদীয় ভক্তি।

তখনকার শিক্ষা ছিল গুরুমুখী। গুরু-পরম্পরাক্রমে মুখে মুখেই শিক্ষা চলে আসত। শিক্ষার সুবিধার জন্য অনেক শাস্ত্রই তখন অতি সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে রচিত হত। খুব অল্প অক্ষরে পরিষ্কাররূপে তত্ত্বের সারকথাগুলো বর্ণনা করাই সূত্রগ্রন্থের বিশেষত্ব। নারদের ভক্তিসূত্রে দশটি অধ্যায়ে চুরাশিটি সূত্র আছে।

ভক্তির সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে নারদ বলছেন, ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রেমের নামই ভক্তি। ভক্তি অমৃত-স্বরূপ।[১]

এর বেশী প্রত্যক্ষ বর্ণনা তিনি করলেন না বা করতে পারলেন না। পরে তিনি বলেছেন, বোবা যেমন স্বাদ অনুভব করে কিন্তু বলতে পারে না, প্রেমের স্বরূপও তেমনই মুখে বলা যায় না। প্রেমের স্বরূপ অনির্বচনীয়।[২]

বর্ণনা হয় দুরকম—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। ভক্তির প্রত্যক্ষ বর্ণনা আর সম্ভব নয় দেখে নারদ তার পরের পথ অবলম্বন করে বললেন, যে বস্তুটি লাভ করলে মানুষ সিদ্ধ হয়,

১ সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা। অমৃতস্বরূপা চ। ২-৩।

২ অনির্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্‌। মূকাস্বাদনবৎ। ৫১-৫২।

৭৮

অমৃত হয়, তৃপ্ত হয়, তার নামই ভক্তি। যে বস্তুটি পেলে মানুষ আর কিছু চায় না, কোন কিছুর জন্য শোক করে না, কাউকে দ্বেষ করে না, সংসারের কোন জিনিস পেয়ে আনন্দিতও হয় না বা কোন কিছু পাবার জন্য উৎসাহীও হয় না, তার নামই ভক্তি। যে বস্তুটিকে জানতে পারলে মানুষ মত্ত হয়, স্তব্ধ হয়, আত্মারাম হয়, তার নামই ভক্তি।[৩]

আবার নারদ বলছেন, ভক্তির মাঝে কোন কামনা থাকে না, কারণ ভক্তি নিরোধস্বরূপ।[৪]

সমাজের ও শাস্ত্রের বিধানে চলে আমাদের জীবনযাত্রা। মানুষ যখন ভক্তি লাভ করে তখন তার মন সামাজিক ও শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের উপরে চলে যায়। লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যাপারকে সে পরিত্যাগ করে। নারদ বলেন, এই শাস্ত্রীয় ও লৌকিক অনুষ্ঠান ত্যাগের নামই নিরোধ। ভক্তি লাভ করলে মানুষ অন্যান্য সকল আশ্রয় পরিত্যাগ করে এবং একমাত্র ঈশ্বরেই তার সমস্ত মন-প্রাণ অর্পণ করে। অন্য বিষয়ে সে উদাসীন থাকে। তবে শাস্ত্রীয় ও লৌকিক অনুষ্ঠানের যতটুকু ভক্তিপথের সাহায্যকারী হয় ততটুকুমাত্রই সে গ্রহণ করে, অন্য বিষয়ে থাকে উদাসীন।[৫]

ভক্তির লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে নারদ ক-একজন আচার্যের মতের উল্লেখ করেছেন—

—পরাশর বলেন, পূজাদিতে অনুরাগই ভক্তির লক্ষণ।

—গর্গ বলেন, ভগবৎ কথাতে অনুরাগই ভক্তির লক্ষণ।

—শাণ্ডিল্য বলেন, বিরোধহীন আত্মরতিই ভক্তির লক্ষণ।

কিন্তু নারদ বলেন, ঈশ্বরে সমস্ত জাগতিক বিষয় সমর্পণ করা—আর তাঁর বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতা অনুভব করাই ভক্তির লক্ষণ। এ রকমই হয়ে থাকে। ব্রজগোপীদের এরকমই হয়েছিল।[৬]

পরে আরও ক-একটি সূত্রে নারদ ভক্তির লক্ষণ বর্ণনা করেছেন; যদিও প্রেমের স্বরূপ মুখে বলা যায় না, তবুও কোন কোন ব্যক্তির মাঝে তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। ভক্তি সত্ত্ব রজ তম তিন গুণের অতীত, ভক্তির মাঝে কোন কামনা থাকে না, ভক্তি বিরামহীন সূক্ষ্ম অনুভব রূপ, আর প্রতি মুহূর্তেই তার গতি বেড়ে চলে। ভক্তিকে পেলে সাধক শুধু ভক্তিই দেখে, ভক্তিই শোনে, ভক্তির কথাই কয়—আর ভক্তির বিষয়ই চিন্তা করে।[৭]

যে ভক্তির কথা এত সময় নারদ বলে এসেছেন, সেটি হ'ল ভক্তির একেবারে চরম অবস্থা। মানুষ প্রথমেই চরম অবস্থায় উপস্থিত হতে পারে না। আরম্ভের সময় হয় তো তাকে অতি সাধারণ অবস্থা থেকেই আরম্ভ করতে হয়। যেখান থেকেই আমরা যাত্রা আরম্ভ করি না কেন, চরম অবস্থাতেই আমাদের যাত্রা শেষ হয়। সেই অবস্থাটিই যে আমাদের লক্ষ্য। লক্ষ্যটি যদি মানসপটে পরিষ্কারভাবে অঙ্কিত না থাকে তা হ'লে আসে সিদ্ধির পথে অনেক অন্তরায়। লক্ষ্যটিকে অতি পরিষ্কারভাবে চিত্রিত করবার জন্যই নারদ ভক্তির চরম অবস্থাটিকেই বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। চরম অবস্থাটির বর্ণনা করতে গিয়ে নিম্নতর সোপানের কথা তিনি ভোলেন নি। তাই অনির্বচনীয় গুণাতীত মুখ্য-ভক্তি থেকে খানিকটা নেমে এসে তিনি বললেন, গুণভেদে বা আর্তাদি ভেদে গৌণ ভক্তিতে তিনটি ভাগ করা যায়। সত্ত্ব রজ তম বা আর্ত জিজ্ঞাসু অর্থার্থী। এর মধ্যে তামসিক ভক্তির চেয়ে রাজসিক, আবার রাজসিক অপেক্ষা সাত্ত্বিক ভক্তি শ্রেষ্ঠ। অর্থার্থীর ভক্তির চেয়ে জিজ্ঞাসুর, আবার জিজ্ঞাসুর থেকে আর্তের ভক্তি শ্রেষ্ঠ।[৮]

অর্থার্থী ভক্ত সংসারের সুখসুবিধের জন্য ভগবানকে ডাকে, জানবার আকাংক্ষা নিয়ে ডাকে জিজ্ঞাসু, আর

৩ যল্লব্ধা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি। যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি। যজ্ জ্ঞানাৎ মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবতি আত্মারামো ভবতি। ৪-৬।

৪ সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ ৭।

৫ নিরোধস্তু লোক-বেদব্যাপারসন্ন্যাসঃ। তস্মিন্ অনন্যতা তদ্-বিরোধিষু উদাসীনতা। অন্যাশ্রয়ানাং ত্যাগেহনন্যতা। লোকে বেদেষু তদনুকূলাচরণং তদ্ বিরোধিষু উদাসীনতা। ৮-১১।

৬ তল্লক্ষণানি বাচ্যন্তে নানামতভেদাৎ। পূজাদিষ্বনুরাগ ইতি পারাশর্যঃ। কথাদিষ্বিতি গর্গঃ। আত্মরত্যবিরোধেনেতি শাণ্ডিল্যঃ নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি। অস্ত্যেবমেবম্। যথা ব্রজগোপিকানাম্। ১৫-২১।

৭ প্রকাশ্যতে ক্বাপি পাত্রে। গুণরহিতং প্রতিক্ষণবর্ধমানমবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভবরূপম্। তৎ প্রাপ্য তদেবাবলোকয়তি তদেব শৃণোতি তদেব ভাষয়তি তদেব চিন্তয়তি। ৫৩-৫৫।

৮ গৌণী ত্রিধা গুণভেদাৎ আর্তাদিভেদাৎ বা। উত্তরস্মাদুত্তরস্মাৎ পূর্বপূর্বা শ্রেয়ায় ভবতি। ৫৬-৫৭।

দুঃখ বেদনায় জর্জরিত হয়ে সমস্ত অন্তর দিয়ে ডাকে আর্ত ভক্ত। ভক্তির সত্ত্ব রজ তম সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেব অতি সুন্দর বলতেন, ভক্তিরও সত্ত্ব রজ তম তিন গুণ আছে। যে ভক্তের সত্ত্বগুণ আছে সে ধ্যান করে অতি গোপনে। সে হয় তো মশারির ভিতর ধ্যান করে। সবাই জান্‌ছে, ইনি শুয়ে আছেন, বুঝি রাত্রে ঘুম হয় নি তাই উঠতে দেরি হচ্ছে। এদিকে শরীরের উপর আদর কেবল পেট চলা পর্যন্ত। শাকান্ন পেলেই হল। খাবার ঘটা নেই, পোষাকের আড়ম্বর নেই, বাড়ির আসবাবের জাঁকজমক নেই। আর সত্ত্বগুণী ভক্ত কখনও তোষামোদ করে ধন লয় না।

—ভক্তির রজ থাকলে সে ভক্তের হয় তো তিলক আছে, রুদ্রাক্ষের মালা আছে। সেই মালার মধ্যে মধ্যে আবার একটি সোনার দানা। যখন পূজা করে, গরদের কাপড় পরে পূজা করে।

—ভক্তির তম যার হয় তার বিশ্বাস জ্বলন্ত। ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি করে ধন কেড়ে লওয়া। মারো কাটো বাঁধো—এরূপ ডাকাত-পড়া ভাব।[৯]

গৌণভক্তি সম্বন্ধে নারদ আর বিশেষ কিছু বলেন নি।

জীবনে সব চেয়ে কঠোর সত্যরূপ দেখা দেয় মৃত্যু। এর হাত থেকে বাঁচবার কারু উপায় নেই। অথচ মানুষ তার মানবজীবনের প্রথম প্রভাত থেকেই আকাংক্ষা করছে মৃত্যুর পারে যেতে, অমৃতত্ব লাভ করতে। মানুষ অমৃত-স্বরূপ, তাই মৃত্যুর বুকে দাঁড়িয়েও সে যুগে যুগে চেষ্টা করে এসেছে মৃত্যুকে জয় করতে। রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শে মানুষ চায় সারা বিশ্বকে আপনার মাঝে টেনে নিতে। কিন্তু যতই সে ভোগ করুক না কেন, কিছুতেই সে তৃপ্ত হতে পারে না। অন্তর তার আরো চায়, আরো বেশী চায়, আরোও বড় চায়। সে যে ভূমা-স্বরূপ, সেজন্যে তাই তার কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। শত দুঃখেও মানুষ সুখের আশা ত্যাগ করতে পারে না। মানুষ আনন্দ-স্বরূপ, তাই সে আনন্দই কামনা করে সর্বাবস্থায়।

যে বস্তুটি পেতে আমরা ইচ্ছে করি তার নাম ইষ্ট। অমৃত-স্বরূপ আনন্দময় ভূমাই আমাদের ইষ্ট, আমাদের যথার্থ সত্তা। এই বস্তুটি পাবার জন্যই প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক প্রাণী জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে তার জীবনপথে এগিয়ে চলেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, মায়া বা অজ্ঞানের জন্যই আমরা ইষ্টলাভ করতে পারছি নে, আমাদের স্বরূপকে জানতে পারছি নে। ইষ্টকে নিশ্চিতরূপে পাবার আত্মস্বরূপকে জানবার চারটি পথ তাঁরা আবিষ্কার করেছেন, জ্ঞান ভক্তি যোগ ও কর্ম।

এই চারটি পথের মধ্যে ছোট-বড় নেই। দেশ-কাল ও অধিকার-ভেদে প্রত্যেক পথের উপযোগিতাই সমান। গীতার শ্রীকৃষ্ণ এবং দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ও বাণীতে এই চারটি পথের প্রতি যে সমদর্শনের বিকাশ দেখা যায়, সত্যই তা দুর্লভ। প্রচারকদের তো কথাই নেই, জগতের বড় বড় মহাপুরুষদের অনেকেই এ বিষয় অল্প-বিস্তর পক্ষপাতদোষে দুষ্ট।

নারদ বলেন, কর্ম জ্ঞান ও যোগ থেকে ভক্তি শ্রেষ্ঠ। সকল সাধনার ফল ভক্তি, সেজন্য ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। অন্যপথে সাধন করলে অভিমান আসে। ঈশ্বর অভিমান ঘৃণা করেন—আর দীনতা ভালবাসেন। সাধকের মনে ভক্তি দীনতা আনে, তাই ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। কেউ কেউ বলেন, জ্ঞানসাধনের দ্বারা ভক্তি লাভ হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, জ্ঞান ও ভক্তি একে অন্যকে আশ্রয় করে চলে। কিন্তু সনৎকুমার নারদ প্রভৃতি ব্রহ্মকুমারদের অভিমত এই যে, কর্মজ্ঞান বা যোগপথের সাহায্য ছাড়া ভক্তি স্বয়ংই ফল প্রসব করতে পারে। রাজার বাড়ি দেখলেই যেমন রাজাকে দেখা হয় না, খাদ্যসামগ্রী দেখলেই যেমন ক্ষুধার শান্তি হয় না, ভক্তি ছাড়া অন্যপথের সাধনও ঠিক সেরকম। সুতরাং যারা মুক্তি লাভ করতে ইচ্ছা করে, একমাত্র ভক্তিকেই তাদের গ্রহণ করা উচিত।[১০]

সূত্রগ্রন্থগুলোর আলোচনায় একটা মস্ত অসুবিধে আছে। সূত্রকারদের অধিকাংশই তাঁদের বক্তব্য বিষয়টি অতি সংক্ষেপে

---

৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম ভাগ, স ১৩, পৃ ৬৬-৬৭।

১০ সা তু কর্ম-জ্ঞান-যোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা। ফলরূপত্বাৎ। ঈশ্বরস্যাপ্যভিমান দ্বেষিত্বাদ্দৈন্যপ্রিয়ত্বাচ্চ। তস্যা জ্ঞানমেব সাধনমিত্যেকে। অন্যোন্যাশ্রয়ত্বমিত্যন্যে। স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রহ্মকুমারাঃ। রাজগৃহ ভোজনাদিষু তথৈব দৃষ্টত্বাৎ। ন তেন রাজপরিতোষঃ ক্ষুধাশান্তির্বা। তস্মাৎ সৈব গ্রাহ্যা মুমুক্ষুভিঃ। ২৫-৩৩।

অল্প কটি অক্ষরে প্রকাশ করতে যত মনোযোগ দিয়েছেন, সুস্পষ্টতার দিকে তত মনোযোগ দিতে পারেন নি। স্বল্পাক্ষর সূত্র থেকে এজন্য সূত্রকারদের অভিমত বোঝা অনেক স্থলেই কঠিন হয়ে পড়ে। নারদের সময়ে ভক্তি সম্বন্ধে যেসব মতবাদ প্রচলিত ছিল, তার দুটির উল্লেখ নারদ এখানে করেছেন—

(এক) জ্ঞানসাধনার ফল ভক্তি।

(দুই) জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর আশ্রয় করে চলে।

প্রতিবাদ করে নারদ বলছেন, ভক্তিফল পাবার জন্য অন্য কোন সাধন বা আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই।

এখানে একটা প্রশ্ন আসে, অন্য পথের আশ্রয় একেবারে না নিয়ে ভক্তিপথে সাধন করা সম্ভব কি-না। একেবারে বিচার না করে কি ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়া যায়? ইষ্টচিন্তা কি মনঃসংযম ছাড়া সম্ভব? ভক্তিসাধনায় ভগবৎগুণ শ্রবণ-কীর্তন প্রভৃতির যে বিধান রয়েছে, সেগুলো কি কর্ম নয়? সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়, ভক্তিপথে জ্ঞান কর্ম ও যোগের কিছু কিছু অনুষ্ঠান অনিবার্য। অন্য পথের অনিবার্য অনুষ্ঠানগুলোকে হয় তো নারদ ভক্তিপথের অনুষ্ঠান বলেই গণ্য করেছেন। তাই তিনি অন্য কোন পথের সাহায্যের প্রয়োজন অস্বীকার করেছেন।

কর্ম যোগ জ্ঞান ভক্তি, কোন পথই সহজ নয়। এর মধ্যে আবার জ্ঞান ও যোগের পথ কঠিন। মানুষের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, যে প্রবৃত্তির প্রেরণায় মানুষ প্রতিমুহূর্ত চলছে, জ্ঞান ও যোগের পথে সেই স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধে আরম্ভ থেকেই সাধককে চলতে হয়। এভাবের চলা কারু পক্ষে আনন্দের হতে পারে, অপেক্ষাকৃত সহজ হতে পারে, কিন্তু একথা অতি সত্য যে অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই এ দুটি পথ উপযোগী নয়। জ্ঞান ও যোগের পথে যত লোক চলতে পারে, তার চেয়ে ঢের বেশী চলতে পারে কর্মের পথে, আবার তার চাইতেও বেশী পারে ভক্তির পথে। ভক্তির পথ ভালবাসার পথ। অধিকাংশ কাজে ভালবাসাই মানুষকে পরিচালিত করে, প্রেরণা দেয়, শক্তি জোগায়।

নারদ বলেন, অন্যান্য পথ অপেক্ষা ভক্তিপথে ইষ্টলাভ সহজ। 'এর আর অন্য প্রমাণের দরকার হয় না। ভক্তি নিজেই এর প্রমাণ। ভক্তিসাধনায় সাধক শান্তি পায়, পরমানন্দ পায়, এজন্যও ভক্তিপথ সহজ। তিনটি সত্যের মধ্যে, জ্ঞান যোগ ও ভক্তির মধ্যে ভক্তিপথ শ্রেষ্ঠ, ভক্তিপথই শ্রেষ্ঠ।[১১]

অধিকাংশ মানুষই ভালবাসাপ্রবণ। তাই ভক্তিপথে চলা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ। ভক্তিসাধনায় গোড়া থেকেই নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় না, আবার সাধনার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দও পাওয়া যায়। এজন্যও ভক্তিপথ অন্যান্য পথ অপেক্ষা সহজগম্য। কিন্তু যদি আমরা মনে করি, পৃথিবীর সকল সাধকের পক্ষেই ভক্তিপথে চলা সহজ, তা হলে আমরা নিশ্চয়ই মস্ত ভুল করব। এমন অনেকে আছেন, যাঁরা বিচারপ্রবণ ধ্যানপ্রবণ বা কর্মপ্রবণ, যাঁরা জ্ঞানযোগ বা কর্মের অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের পক্ষে ভক্তিপথ অপেক্ষা জ্ঞানযোগ বা কর্মপথ সহজ। জ্ঞানের অধিকার নিয়ে যে জন্মেছে, ভক্তিপথে তাকে জোর করে চালিয়ে দিলে উপকার না হয়ে তার অপকারই হয়। নারদ কি সকলকেই ভক্তিপথে পরিচালিত করতে চাইছেন? ভক্তি সম্বন্ধে তিনিও কি পক্ষপাতদোষে দোষী?

একটা কথা এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। যারা ভক্তিপথে অগ্রসর হতে ইচ্ছে করে, ভক্তিসাধনার যারা অধিকারী, শুধু তাদের কাছেই নারদ ভক্তির উপদেশ করেছেন।[১২] অন্যান্য পথ অপেক্ষা ভক্তিপথই তাদের কাছে উপযোগী ও সহজ, তাই তাদের কাছে ভক্তিপথই সব চাইতে বড়। এভাবে বিচার করলে নারদের এই কথাগুলো বোঝবার পক্ষে আর অসুবিধে হয় না। নারদ গোঁড়ামি করেন নি, বরং যথেষ্ট উদারতার সঙ্গে তাঁর মতবাদ আলোচনা করেছেন।

ভক্তদের সম্বন্ধে নারদ বলেন, ঐকান্তিক ভক্তেরাই শ্রেষ্ঠ। পরস্পর তাঁরা ভগবৎ কথা আলাপ করেন, আনন্দে তাঁদের কণ্ঠরোধ হয়ে আসে, দুচোখ বেয়ে জল পড়তে থাকে, শরীর পুলকিত হয়, তাঁদের বংশকে তাঁরা পবিত্র করেন,

১১ অন্যস্মাৎ সৌলভং ভক্তৌ। প্রমাণান্তরস্যানপেক্ষত্বাৎ স্বয়ং প্রমাণত্বাৎ। শান্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ। ৫৮-৬০। ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী ভক্তিরেব গরীয়সী। ৮১।

১২ অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ। ১।

পৃথিবীকে তাঁরা পবিত্র করেন। তাঁদের দ্বারা তীর্থগুলো সত্যিকার তীর্থে পরিণত হয়, কর্ম হয় সুকর্ম, আর শাস্ত্র হয় সৎশাস্ত্র। সর্বদাই তাঁরা ভগবানে তন্ময় হয়ে থাকেন। তাঁদের জন্যে পিতৃগণ আনন্দ করেন, দেবতারা নৃত্য করেন, আর পৃথিবী যেন তার অধীশ্বর পায়। তাঁদের মাঝে জাতি বিদ্যা রূপ কুল ধন ও কর্মগত কোন ভেদ থাকে না। কারণ তাঁরা যে ভগবানেরই।[১৩]

মুখ্য ভক্তদের কথা ছাড়া গৌণ ভক্তদের সম্বন্ধে নারদ তাঁর ভক্তিসূত্রে কোন আলোচনা করেন নি। ভক্তদের সম্বন্ধে অল্প কথায় তিনি অতি চমৎকার বলেছেন। ভক্ত ও ভগবান যে অভেদ, একথাও নারদ তাঁর ভক্তিসূত্রের এক জায়গায় বলেছেন।

ভক্তির সাধন সম্বন্ধে নারদ বলেছেন, ভক্তিলাভের সব চাইতে বড় উপায় হল মহতের কৃপা অথবা ভগবানের সামান্য মাত্র করুণা। মহতের সঙ্গ দুর্লভ অগম্য ও অমোঘ। একমাত্র মহতের কৃপা দ্বারাই ভক্তিলাভ হতে পারে। কারণ, ভক্ত আর ভগবানে কোন ভেদ নেই।[১৪]

—সব সময় অবিরামভাবে ভগবানের ভজনা করবে। সুখ দুঃখ লাভ মনের ইচ্ছা প্রভৃতির জন্য প্রতীক্ষা করে এক মুহূর্তকালও বৃথা অতিবাহিত করা উচিত নয়। সর্বদা সর্বপ্রকারে নিশ্চিন্তভাবে ভগবানকেই ভজনা করবে। অন্য লোকের কাছেও যদি ভগবানের গুণ শ্রবণ বা কীর্তন করা যায়, তাতেও ভক্তির সাধনা হয়। ভগবানের নাম গুণ কীর্তন করলে শীঘ্রই তিনি আবির্ভূত হন এবং ভক্তকে তাঁর আবির্ভাব অনুভব করিয়ে দেন। ভগবানের তিন (বিভিন্ন) রূপের মধ্যে কোন ভেদজ্ঞান না এনে নিত্যদাস বা নিত্যকান্তাভাবে তাঁকে ঐকান্তিক ভক্তি করা উচিত। ভক্তির সাধনা কর, ভক্তিরই সাধনা কর।[১৫]

—ভক্তি শাস্ত্র মনন করবে, আর যে সব কাজের দ্বারা ভক্তিভাব বাড়ে সেগুলোও করবে। তর্কবিতর্ক করা উচিত নয়। তাতে অনেক অবান্তর বিষয় এসে পড়ে, আর তর্ককে সংযত রাখা সম্ভব হয় না। অহিংসা সত্য শুচিতা দয়া আস্তিক্য প্রভৃতি পরিপালন করবে।[১৬]

—অভিমান দম্ভ প্রভৃতি পরিত্যাগ করবে। ধনসম্পদের কথা, শত্রু নাস্তিক আর স্ত্রীলোকের চরিত্র শ্রবণ করবে না। কেউ অনিষ্ট করবে, এ ভাবনা অথবা কারু অনিষ্ট চিন্তা করবে না। কারণ, ভক্ত যে তার নিজেকে আর লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানকে ভগবানেই নিবেদন করেছে। বিষয় ও সঙ্গ ত্যাগ করে ভক্তির সাধনা করতে হবে। দুঃসঙ্গ সব প্রকারেই পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ, তাই থেকে কাম ক্রোধ মোহ স্মৃতিভ্রংশ বুদ্ধিনাশ, এমন কি, সর্বনাশও উপস্থিত হয়। ছোট একটি ঢেউ-এর রূপে দেখা দিলেও কুসঙ্গের প্রভাবে এগুলো শেষকালে সমুদ্রের আকার ধারণ করে।[১৭]

—ভক্তের সমস্ত কর্মই ভগবানে নিবেদিত, তাই কাম ক্রোধ অভিমান প্রভৃতি যদি করতেই হয় তাহলে ভগবানের উপরই করবে।[১৮]

সাধনার সময় ভগবানের সাথে একটা সম্পর্ক পাতিয়ে

১৩ ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ। কণ্ঠাবরোধ-রোমাঞ্চাশ্রুভিঃ পরস্পরং লপমানাঃ পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিবীঞ্চ। তীর্থী কুর্বন্তি তীর্থানি সুকর্মীকুর্বন্তি কর্মাণি সচ্ছাস্ত্রী কুর্বন্তি শাস্ত্রাণি। তন্ময়াঃ। মোদন্তে পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ সনাথা চেয়ং ভুর্ভবতি। নাস্তি তেষু জাতি-বিদ্যা-রূপ-কুল-ধন-ক্রিয়াদি ভেদঃ। যতস্তদীয়াঃ। ৬৭-৭১।

১৪ মুখ্যতস্তু মহৎ কৃপয়ৈব ভগবৎ কৃপালেশাদ্বা। মহৎ সংগস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ। লভ্যতে তৎকৃপয়ৈব। তস্মিন তজ্জনে ভেদাভাবাৎ। ৩৮-৪১।

১৫ অব্যাবৃত ভজনাৎ। ৩৬। সুখদুঃখেচ্ছালাভাদি ত্যক্তে কালে প্রতীক্ষ্যমাণে ক্ষণার্ধমপি ব্যর্থং ন নেয়ং। ৭৭। সর্বদা সর্বভাবেন নিশ্চিন্তিতৈর্ভগবান্ এব ভজনীয়ঃ। ৭৯। লোকেঽপি ভগবদ্গুণশ্রবণ-কীর্তনাৎ। ৩৭। স সংকীর্ত্যমানঃ শীঘ্রমেবাবির্ভবত্যনু ভাবয়তি ভক্তান্। ৮০। ত্রিরূপভংগ পূর্বকং নিত্যদাস নিত্যকান্তা ভজনাত্মকং বা প্রেম এব কার্যং প্রেম এব কার্যমিতি। ৬৬। তদেব সাধ্যতাম্ তদেব সাধ্যতাম্। ৪২।

১৬ ভক্তিশাস্ত্রাণি মননীয়ানি তদ্বধক কর্মাণ্যপি করণীয়ানি। ৭৬। বাদোনাবলম্ব্যঃ। ৭৪। বাহুল্যাবকাশত্বাদনিয়তত্বাৎ। ৭৫। অহিংসা সত্য শৌচ দয়াস্তিক্যাদি চারিত্র্যাণি পরিপালয়ানি। ৭৮।

১৭ অভিমান দম্ভাদিকং ত্যাজ্যম্। ৬৪। স্ত্রী-ধন-নাস্তিক-বৈরি-চরিত্রং ন শ্রবণীয়ম্। ৬৩। লোকহানৌ চিন্তা ন কার্যা নিবেদিতাত্ম-লোকবেদশীলত্বাৎ। ৬১। তত্তু বিষয়ত্যাগাৎ সংগত্যাগাচ্চ। ৩৪। দুঃসংগঃ সর্বথৈব ত্যাজ্যঃ। ৪৩। কাম-ক্রোধ-মোহ-স্মৃতিভ্রংশ-বুদ্ধিনাশ-সর্বনাশকারণাৎ। ৪৪। তরংগায়িতা অপীমে সংগাৎ সমুদ্রায়ন্তি। ৪৫।

১৮ তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ম্। ৬৫

নিলে ভক্তি গাঢ় হয়—আর সাধনাও অনেকটা সহজ ও মধুর হয়ে আসে। অধিকারীভেদে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটি ভাবের মধ্যে যে-কোন একটি অবলম্বন করে সাধনা করতে আচার্যেরা উপদেশ দেন। কোন একটা ভাব আশ্রয় করে ভগবানে ভক্তি করার নাম দিয়েছেন নারদ আসক্তি। নারদ বলেন, ভগবানে আসক্তি এক, তবুও তাকে এগার রকমে ভাগ করা যায়—গুণ মাহাত্ম্যাসক্তি রূপাসক্তি পূজাসক্তি স্মরণাসক্তি দাস্যাসক্তি সখ্যাসক্তি কান্তাসক্তি বাৎসল্যাসক্তি আত্মনিবেদনাসক্তি তন্ময়াসক্তি ও পরমবিরহাসক্তি।[১৯]

ভক্তিলাভের উপায় বা সাধনা সম্বন্ধে নারদ যা বলেছেন, সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়—(এক) মহতের বা ভগবানের কৃপা। (দুই) ভগবানের বিভিন্ন রূপের মধ্যে কোন ভেদবুদ্ধি না এনে নিশ্চিন্তমনে ঐকান্তিকভাবে তাঁর ভজনা করা। (তিন) তর্ক-বিতর্কে না গিয়ে ভক্তিশাস্ত্র অনুধ্যান ও ভক্তিবর্ধক কর্ম করা, অহিংসা শুচিতা প্রভৃতি পালন করা। (চার) কুসঙ্গ অভিমান দম্ভ কাম ক্রোধ প্রভৃতি সাধনার বিঘ্ন, এগুলো ত্যাগ করা। (পাঁচ) কাম ক্রোধাদি করতে হলে ভগবানের উপরই করা। (ছয়) একটি ভাব আশ্রয় করে ভগবানকে ভালবাসা।

ভগবানে অনুরাগের কথা বলতে গিয়ে নারদ ব্রজ-গোপীদের উদাহরণ দিয়েছেন। তারপর বলছেন, ব্রজগোপীদের অনুরাগের মধ্যে ভগবানের মাহাত্ম্যবোধ ছিল না, এ অপবাদ মিথ্যা। যদি মাহাত্ম্যজ্ঞান না থাকে সে প্রেম উপপতি প্রেমের মতই হয়ে দাঁড়ায়। প্রেমাস্পদের সুখেই প্রেমিক সুখী, এ ভাবটা উপপতি-প্রেমের মাঝে নেই।[২০]

সাধনপথের মস্ত বড় বিঘ্ন মায়া বা অজ্ঞান। নারদ তাঁর ভক্তিসূত্রে মায়ার কথাও উল্লেখ করেছেন।—কে মায়ার পারে যেতে পারে? যে সঙ্গ ত্যাগ করে মহতের সেবা করে আর মমতাশূন্য হয়। যে নির্জন স্থানে বাস করে, লোকের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না, তিন গুণের উপরে যেতে পেরেছে, কোন বস্তু উপার্জনের বা রক্ষণা-বেক্ষণের ইচ্ছে করে না। যে কর্মফল ত্যাগ করে, কর্মসব ভগবানে সমর্পণ করে, আর সুখদুঃখ মান-অপমান ভালমন্দ প্রভৃতির পারে চলে গেছে। যে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের উপরে চলে গেছে, আর ভগবানে নিরবচ্ছিন্ন অনুরাগ লাভ করেছে—সে, একমাত্র সে-ই—মায়াকে অতিক্রম করতে পারে, শুধু তাই নয় অন্যকেও সে মায়ার পারে নিয়ে যেতে পারে।[২১]

আগেই বলেছি আমাদের জীবনযাত্রা চলে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় বিধানে। লৌকিক ও শাস্ত্রীয় কর্ম ত্যাগ করতে নারদ উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু সমাজের ও শাস্ত্রের বিধান অমান্য করলে সমাজে যে বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে। এ সম্বন্ধে নারদ কি বলেন?

নারদ শাস্ত্রের বিরোধী ছিলেন না, লৌকিক কর্মের বিরোধীও তাঁকে বলা যায় না। তিনি বলেছেন, ভক্তিশাস্ত্র মনন করবে আর যেসব কাজে ভক্তিভাব বাড়ে সেসবও করবে। যেসব লৌকিক ও বৈদিক কর্মে ভক্তি বাড়ে তার অনুষ্ঠান করবে আর ভক্তির বিরোধী অনুষ্ঠানে থাকবে উদাসীন। (সূত্র ৭৬ ও ১১)

ভক্তির বিরোধী সব কিছুই সাধককে ত্যাগ করতে হয়, তা শাস্ত্রই হোক বা যাই হোক। কিন্তু শাস্ত্রীয় বা লৌকিক কর্ম প্রথমেই পরিত্যাগ করতে নারদ বলেন নি। তিনি বলেছেন, যতদিন পর্যন্ত ভক্তি দৃঢ় না হয়, ততদিন শাস্ত্রের বিধান মেনে চলা উচিত। নইলে পতনের আশংকা আছে। যতদিন পর্যন্ত নিজের যথাসর্বস্ব ভগবানে নিবেদন করতে পারা না যায়, ততদিন লৌকিক কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়। তবে কর্মফল ত্যাগ করতে হবে।

---

১৯ গুণমাহাত্ম্যাসক্তি রূপাসক্তি পূজাসক্তি স্মরণাসক্তি দাস্যাসক্তি সখ্যাসক্তি কান্তাসক্তি বাৎসল্যাসক্তি আত্মনিবেদনাসক্তি তন্ময়াসক্তি পরমবিরহাসক্তিরূপা একধাপ্যেকাদশধা ভবতি। ৮২

২০ ন তত্রাপি মাহাত্ম্যজ্ঞান-বিস্মৃত্যপবাদঃ। তদ্বিহীনং জারাণামিব। নাস্ত্যেব তস্মিংস্তৎসুখসুখিত্বম্। ২২-২৪।

২১ কস্তরতি কস্তরতি মায়াম্ যঃ সংগং ত্যজতি যো মহানুভাবং সেবতে যো নির্মমো ভবতি। যো বিবিক্তস্থানং সেবতে যো লোকবন্ধ-মুন্মূলয়তি নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবতি যোগক্ষেমং ত্যজতি। যঃ কর্মফলং ত্যজতি কর্মাণি সন্ন্যস্যতি ততো নির্দ্বন্দ্বো ভবতি। বেদানপি সন্ন্যস্যতি কেবলম-বিচ্ছিন্নানুরাগং লভতে। স তরতি স তরতি স লোকাংস্তারয়তি। ৪৬-৫০।

ভগবানে দৃঢ় হলে আর লৌকিক কর্ম থাকে না, কিন্তু যতদিন শরীর আছে ভোজনাদি শারীরিক কর্ম ততদিনই থাকবে।[২২]

নারদের ভক্তিসূত্রে আমরা জানতে পাই সে সময়ে ভক্তিতত্ত্বের বিরুদ্ধ মতও প্রচলিত ছিল, আর বিরুদ্ধবাদীরা ভক্তিতত্ত্বের আচার্যদের যথেষ্ট সমালোচনাও করতেন। অনেক আচার্যের নাম নারদ করেছেন, ব্রহ্মকুমার ব্যাস শুক শাণ্ডিল্য গর্গ বিষ্ণু কৌণ্ডিল্য শেষ উদ্ধব আরুণি বলি হনুমান বিভীষণ প্রভৃতি। সকলের মতবাদ নিয়ে নারদ তাঁর ভক্তিসূত্র রচনা করেছেন।

যিনি এই নারদ-কথিত শিবের উপদেশ বিশ্বাস করবেন, শ্রদ্ধা করবেন, তিনি ভক্তিলাভ করবেন, তিনি ইষ্টলাভ করবেন, নিশ্চিতই তিনি ইষ্টলাভ করবেন।[২৩]—এই বলে নারদ তাঁর অমূল্য ভক্তিগ্রন্থ শেষ করেছেন।

২২ ভবতু নিশ্চয়দার্ঢ্যাদূর্ধ্বং শাস্ত্ররক্ষণম্। অন্যথা পাতিত্যাশংকয়া। ১২-১৩। ন তদসিদ্ধৌ লোকব্যবহারো হেয়ঃ কিন্তু ফলত্যাগস্তৎ সাধনঞ্চ কার্যমেব। ৬২। লোকোঽপি তাবদেব কিন্তু ভোজনাদি-ব্যাপারস্ত্বাশরীরধারণাবধি। ১৪

২৩ য ইদং নারদপ্রোক্তং শিবানুশাসনং বিশ্বসিতি শ্রদ্ধত্তে স ভক্তিমান্ ভবতি স প্রেষ্ঠং লভতে স প্রেষ্ঠং লভত ইতি। ৮৪

ক্ষমা ক'র অপরাধ—

বন্দে আলী মিয়া

এমনি আরেক দিন—বাতাসে আবেশ ছিল—ঘন নীল ছিল বনতল
কেন জানি একা ঘরে ক্ষণে ক্ষণে তব তরে আঁখি মম হয়েছে সজল।
সে-দিন তোমারে রাণী কাছেতে আনিনি আমি করি নাই আদর যতন
ভেবেছিনু পাব যবে একেলা আপন করি—সোহাগেতে ভরে দেব মন।
তুমি মোরে বাস ভাল স্বপন যে ছিল মনে—নির্ভর ছিল 'পরে তব
বিজন শয়নে রহি মমতা পরশ তব করেছিনু প্রাণে অনুভব।
তাই কাছে যাইনি কো—দূর হতে ভাবিয়াছি তুমি মোর প্রিয় আপনার
বুকেতে নিবিড় করি একদা লভিব তোমা—কোন বাধা রহিবে না আর।

এমনি আরেক দিন বাতাস মদিরা মাখা নভতলে স্বপনের সাধ
নারিনু রহিতে ঘরে আসিনু তোমার দেশে ভাঙি মোর সঙ্কোচ-বাঁধ।
দীর্ঘ দিনের পরে তোমার পেলাম দেখা—লভিলাম সঙ্গ তোমার
যে-কথা হয়নি বলা—বলিতে নারিনু তারে—এল চোখে অশ্রুপাথার।
তোমার নিরালা মনে যে-সাধ লুকায়ে ছিল—ছিল যেই কামনা গোপন
নয়নে নয়ন রাখি অনুভব করি তাহে জানালাম প্রাণের বেদন।
এত কাছে রহি তবু এতদূরে ছিনু মোরা যার নাহি কূল পারাবার
সে-ব্যথা আজিও জাগে বাদল নিশীথ সম মাঝে রাণী তোমার আমার।

সে-দিন এমনি ছিল সোনালি স্বপন মাখা এমনিই প্রদোষ মধুর
ফিরিল না সেই দিন—ফিরিবে না কভু হায়—তুমি আজ বিপুল সুদূর।
তোমায় আমায় দেখা সেই শেষ প্রিয়তমা আছ আজ দূর অলকায়
পরপার হতে তুমি এ জীবনে কোন দিন ফিরিবে না আর কভু হায়।
যাবার বেলায় রাণী শেষ দেখা হ'ল না কো এই ব্যথা জাগে বুকে আজ
না জানি কত না কথা কত সাধ কত ব্যথা ছিল তব অন্তর মাঝ!
যেথায় রহ গো তুমি ক্ষমা ক'র অভাগায়—ক্ষমা ক'র যত অপরাধ
তুষের অনল দহে নিশিদিন বুকে মম—এ জীবনে পূরিল না সাধ।

একা

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

ইস্কুলে নতুন মাষ্টার মশায় এসেছেন—নাম দেবেনবাবু।

ভদ্রলোক ডবল এম-এ; পূর্ব্বে কোথাও হেড মাষ্টার ছিলেন, এখানে য়্যাসিষ্টাণ্ট মাষ্টার হ'য়ে এসেছেন বলে আমরা সকলেই বিস্মিত হ'য়েছি। শিক্ষক-হিসাবে কয়েক দিনেই বেশ নাম কিনে ফেল্‌লেন, কিন্তু তাঁর স্বভাব চরিত্র দেখলে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

ভদ্রলোক কখনও অকারণ কথা বলেন না। একাকী ঘুরে বেড়ান, অবসর সময় সাহিত্য পাঠ করেন। কোন সংক্রান্ত কোন ব্যাপারেই তাঁর মতামত পাওয়া যায় না, জিজ্ঞাসা করলে হেসে বলেন—আমি? আমার আবার একটা মত! শুনেছি ভদ্রলোক বিবাহিত, কিন্তু আজ দু'মাসের মধ্যে খামে কোন পত্র আসে নি। পোষ্টকার্ডে মায়ের পত্র কদাচিৎ আসে। মাহিনার অর্দ্ধেক নিয়মিত মায়ের নিকটে যায়। ভদ্রলোক নিরামিষাশী, বয়স মাত্র তিরিশ।

ওঁর দিকে চেয়ে চেয়ে কেবলই মনে হয়, ওঁর জীবনের ইতিহাস হয়ত বিচিত্র, তা না হ'লে জীবন এমন অস্বাভাবিক কেন? আলাপ করবার অবসর খুঁজি, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে প্রেতের সতর্কতা নিয়ে নিজেকে পাহারা দেন—অবসর কদাচিৎ মেলে।

সেদিন স্কুলের সেক্রেট্যারী মহোদয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল।

সকলেই আমরা খেতে বসেছি। হোষ্টেলের টিচারেরা বেশ আনন্দের সঙ্গেই জিহ্বাকে তৃপ্তিদান করছেন। মাছের কালিয়া পরিবেশককে দেবেনবাবু ব'ললেন—আমি মাছ খাই না, দেবেন না।

সেক্রেটারী বললেন—সে কি দেবেনবাবু! এত অল্প বয়সে মাছ ছেড়েছেন কেন? একটু খেয়ে দেখুন না।

দেবেনবাবু এমন রুক্ষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাইলেন যে, তিনি পুনরায় অনুরোধ করতে সাহসী হলেন না। ভোজের বারান্দা নানা পরিহাসে যখন প্রায় নির্দ্দোষ আনন্দের সীমা অতিক্রম করতে চ'লেছে তখন চেয়ে দেখি দেবেনবাবু রুমালে চোখ মুছে সেটাকে পরিষ্কার করতে চেষ্টা করছেন।

অকস্মাৎ তিনি বললেন, আপনারা মাপ্ করবেন, আমি উঠ্‌লাম।

কাহারও উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই তিনি উঠে সদর দরজার অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সকলে নির্ব্বাক-বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন, কিন্তু কথা বলার মত অবসর কেউ পেলেন না।

ব্যাপারটা অভদ্রোচিত ও অতি আকস্মিক এবং তাঁর মত লোক এমনি ব্যবহার ক'রতে পারেন এ যেন বিশ্বাস হয় না। ওই ধীর সৌম্য শান্ত ব্যক্তির মধ্যে কোন্ চঞ্চলতা আছে, তা জানবার কৌতূহল আমার মধ্যে অদম্য হ'য়ে উঠ্‌ল। বিচিত্র জগতে কত বিচিত্র মানবমনই না আছে! তার মধ্যে দুঃখ আনন্দও কত বিচিত্র!

বোর্ডিং-এ মাষ্টারদের ঘরে সন্ধ্যার পর চা-এর আসরে কত উজীর-নাজির বধ, কত হিটলার-মুসোলিনীর দণ্ডাদেশ, কত মহাদেশ বণ্টন নিত্যই চলে কিন্তু দেবেনবাবু একা একটি কোণে বিছানার সবখানি দখল ক'রে নির্ব্বিকার চিত্তে বই পড়েন। সেদিন সদ্য-পরিণীত যতীশবাবু তার নবোঢ়া বধূর নবমেঘদূত-রূপ বিরাট পত্রখানা সগর্ব্বে পাঠ করছিলেন। শুনেছি তার স্ত্রী একটা পাশ দিয়েছেন, তার বিরহ, জোছনা-রাতের যন্ত্রণা প্রভৃতির আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনা সকলকে মুগ্ধ করেছিল সন্দেহ নেই। যতীশবাবু নিরক্ষর স্ত্রীর স্বামীগণের প্রতি ব্যঙ্গদৃষ্টি দিয়ে প্রগলভের মত হাসছিলেন।

হঠাৎ চেয়ে দেখি দেবেনবাবু কান পেতে সেই পত্রখানাই শুন্‌ছেন—এটা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিকি, তাই জিজ্ঞাসা করলুম, পত্রখানা শুনছেন দেবেনবাবু?

—হ্যাঁ, শুন্‌ছি।

যতীশবাবু আরও উৎসাহিত হ'য়ে পত্র পড়তে লাগলেন। দেবেনবাবু শুনলেন।

পত্র পাঠান্তে আমি প্রশ্ন ক'রলুম, দেবেনবাবু, নারী এমনি ক'রেই পুরুষের মনকে পরিপূর্ণ করে দেয়, না? এই পরিতৃপ্তির উপর নির্ভর ক'রেই কত সাহিত্য কাব্য গড়ে উঠেছে!

দেবেনবাবু কোন মতামত প্রকাশ করবেন আশায় সকলেই চুপ করলেন। দেবেনবাবু একটু হেসে বললেন, না, সাহিত্য গড়ে উঠেছে অতৃপ্তি থেকে। বড় বড় শিল্পীদের জীবনী পাঠ করলে দেখ্‌তে পাবেন, তারা নারীকে নিয়ে তৃপ্তি পায়নি, তাই তারা চরিত্রহীন, না হয় সংসারত্যাগী। তার কারণ, পুরুষে চায় তার কল্পনাকে এই বাস্তব নারীর মধ্যে, আর নারী চায় এই বাস্তবকে। তাই অতৃপ্তিই গড়ে ওঠে।

যতীশবাবুর দাম্পত্যজীবন আকণ্ঠ কাব্যরসাশ্রিত, তিনি প্রতিবাদ করলেন—না, কথনই না, এই যে জীবনে নতুন উৎসাহ এসেছে, কেন?

দেবেনবাবু প্রশ্ন করলেন, আপনি কি বলতে পারেন, দাম্পত্য জীবনে আপনি সম্পূর্ণ সুখী, কোথায়ও অতৃপ্তি নেই, না-পাওয়ার বেদনা নেই?

—না।

—তবে আমি বলতে চাই, হয় আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসেন না, না হয় আপনি সুখদুঃখ জিনিষটাই সম্পূর্ণ বুঝতে পারেন না।

যতীশবাবু উত্তেজিত হ'য়ে আবার প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু দেবেনবাবু শত ব্যঙ্গোক্তির উত্তরেও কোন উত্তর দিলেন না। সান্ধ্যসভা সেদিনের মত শেষ হ'ল।

বিস্তীর্ণ আড়িয়ালখা নদীর তীরে, শহরের উত্তরে প্রকাণ্ড চর। স্বাস্থ্যান্বেষী বৃদ্ধ-তরুণ-তরুণী সকলেই সেখানে বেড়াতে যান। সঙ্গীহীন দেবেনবাবুও যান, একাই পদচারণা ক'রে ফিরে আসেন। কথা বললে হয়ত ভদ্রতা-সুলভ দু-একটা উত্তর দেন, কাজেই তার সঙ্গীও জোটা চলে না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ত্রয়োদশীর চাঁদ আকাশে উঠেছে। হঠাৎ সামনে দেখি আকাশের পানে চেয়ে দেবেনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। পাশে দাঁড়িয়ে বললুম, দেবেনবাবু, কি ভাবছেন!

দেবেনবাবু চমকে বললেন—কে? ও শীতলবাবু! ভাবছিলুম কি?

—হ্যাঁ—আপনার সঙ্গে বেড়াতে অনুমতি করেন ত, চলুন একটু ঘুরি—

—আসুন, এই ধানের আ'লে বসি। পাগলের সংজ্ঞা কি জানেন! যে যা ভাবে তাই যদি বলে দেয় তবে তাকেই লোকে পাগল বলে। তাই সব কথা বলা ত' সম্ভব নয়, তবে শুন্‌তে চাইলে বলতে পারি—

—বলুন।

—একটি তরুণীকে দেখেছেন একটু আগে, একটা চাকরের সঙ্গে একা ঘুরছে? আমিও একাই ঘুরি। চরের এই নরনারীর মধ্যে এমনি একাই আমরা ঘুরে বেড়াই—সকলেই। জগতের এই কোটি লোক-এর মধ্যে সকলেই একা—জীবনের মনের সাথী কেউ নেই। ওই চাঁদ উঠেছে—আমি যেমন করে ওই চাঁদকে দেখছি, আমার ইচ্ছা অমনি ক'রে আর একজনও দেখুক, আমার মত ভাবুক, কিন্তু তা কি এই জগতে হয়!

কথাটার সঙ্গে সেদিনকার নারী-সংক্রান্ত মন্তব্যের একটা সূত্র আছে নিশ্চয়ই, তাই বললুম—সেদিন প্রভাত-বাবুকে যে কথাটা বলেছিলেন, তা কি সত্যি বলে আপনার বিশ্বাস?

—হ্যাঁ। আজ আমার মনটা ঠিক প্রকৃতিস্থ নেই, আজ এ অবস্থায় অনেক কিছুই বলে ফেল্‌তে পারি, যদি সেটা ঠিক তেমনি ভাবেই নিতে পারেন তবে বলতে পারি।

—না, আপনাকে ভুল বুঝব না বলেই আমার বিশ্বাস।

—দেখুন, আমার দাদা, মা, ভাই, বৌ—সবই আছে, কিন্তু তার মধ্যেও আমি নিরবচ্ছিন্নভাবে একা। আমার স্ত্রীর প্রশংসা গ্রামবাসী করে, মা করেন, দাদারা করেন। এমন কি, আমার চেয়েও তাকে হয়ত বেশী ভালবাসেন। সেও যে আমাকে ভালবাসে সে বিষয়েও আমার সংশয় নেই, তবু ত তৃপ্তি পাই না। একটা দুরধিগম্য প্রাচীর কোথায় যেন রয়ে যায়!

—আপনি ত তাঁর কাছে পত্রও দেন না।

—না, দিই না; তার কারণ, তার পত্র পেয়ে আমি

আরও বেশী দুঃখ পাই। আমার দুঃখটা কোথায় তা আমি বুঝোতে পারি নে, সেও বোঝে না। কেউই বোঝে না—

—আমিও ত ঠিক আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

—জানি, একটা উদাহরণ দিলে হয়ত বুঝবেন। জানেন, এ জগতে যে যাকে সব চেয়ে ভালবাসে তার কাছে সবচেয়ে বেশী আশা করে—রাস্তার লোকের কাছে আমি কোন ভদ্রতা প্রত্যাশা করি না, কিন্তু আপনার কাছে করি—কারণ অবস্থাভেদে নৈকট্য জন্মায়। বহুদিন পরে হয়ত বাড়ী যাই, মনে মনে ভাবি সে হয়ত কত অভিযোগ করবে, পথের সম্বন্ধে আমার জীবন সম্বন্ধে শত প্রশ্ন করবে, কিন্তু সে নির্ব্বাকভাবে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ে। সীতার সহিষ্ণুতা আত্মসমর্পণ নিয়ে হয়ত সে গড়ে উঠেছে, কিন্তু আমার মনে হয়, এই অনাগ্রহ এই শিথিলতা তার উপেক্ষার পরিচয় মাত্র। মন বেদনায় বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে, মন আর যুক্তিতর্ক মানে না—জানি না, শিক্ষিতা হ'লেও ঠিক এমনি নীরব সে হ'ত কি-না! তবে যতদূর মনে হয়, নারী—সে নারীই, শিক্ষায় তার প্রকৃতি বদলায় না।

—আপনার দিক দিয়েও ত যথেষ্টই উপেক্ষা আছে।

—এ উপেক্ষা আমার ছিল না, গড়ে উঠেছে। অতৃপ্তির মাঝে মনটা এমন হওয়া ত স্বাভাবিক। যারা হয়ত আমার মত ক'রে পেতে চায় না, তারা এদের নিয়ে সুখী হ'তে পারে জানি, কিন্তু আমার সুখী হওয়ার কোন উপায়ই নেই।

আলোচনার ফাঁকে জীবনের অনেক কথাই জানলুম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমার মনে হ'ল—যে বুকে এত ভালবাসা, সে বুকে শান্তি তৃপ্তি মেলা একান্তই অসম্ভব। এই ভালবাসার দুর্দ্দম স্রোতের সামনে সাহসে ভর ক'রে দাঁড়াবার সাহস ক'জনের আছে?

এমনি ক'রে নির্ব্বান্ধব দেবেনবাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠ্‌ল।

ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি সমস্ত মন শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠ্‌ল—জীবনকে এমন গভীরভাবে এমন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আমরা ত কখনও দেখি নি, তাই বোধ হয় এই অতৃপ্তির হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। মাঝে মাঝে দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়, দেবেনবাবুর স্ত্রীকে—যাঁকে সকলেই ভাল গৃহস্থবধূ বলে; তার মধ্যে কোন্ দীনতা আছে যার জন্যে এই উদারপ্রাণ দেবেনবাবু এমন ক'রে উদাসজীবনের মাঝে আত্মহত্যা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

সেদিন কথায় কথায় তাঁর হেড-মাষ্টারী ছেড়ে আসবার প্রসঙ্গে বললেন—হেড মাষ্টারী ক'রতে পারিনি বলে আমি ছেড়ে আসিনি। স্কুলকে যেমন ক'রে গড়ে তুলব ভাবি, তেমন ক'রে সেটা গড়ে ওঠে না। ছেলেরা মনের মত হয় না, মাষ্টার মশায়রা হন্ না, মনে বড় দুঃখ পাই—নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। কোথায় যেন আমার ত্রুটি থেকে যায়। সেই দায়িত্ব আর অতৃপ্তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই চলে এসেছি। এখানে দায়িত্ব অল্প, কাজেই পরিতৃপ্তি আছে।

বৈশাখের মাঝামাঝি দেবেনবাবু অত্যন্ত অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। কলেরার আক্রমণ বলে ডাক্তার যখন সনাক্ত করলেন তখন হাসপাতালেই তাঁকে স্থানান্তরিত করতে হ'ল। তৃতীয় দিনে অবস্থা খুব ভাল বলে মনে হ'ল না।

আমি বললুম, দেবেনবাবু, আপনার মা, দাদা, স্ত্রী, এদের কাছে পত্র লিখি, খবর দেওয়া দরকার। ঠিকানা—

তিনি একটু চিন্তা ক'রেই হোক, আর দুর্ব্বলতাবশত দেরী ক'রেই হোক, ধীরে ধীরে জবাব দিলেন—না, দরকার নেই, লাভও কিছু নেই। তাঁরা মানসিক অশান্তি আর কষ্ট পাবেন মাত্র। আমার সান্ত্বনা উপকার কিছুই হবে না।

—তবুও—

—না, এর মধ্যে 'তবুও' নেই। আমার যখন লাভ নেই তখন আমার জন্যে আর কয়েকজন কষ্ট পাবে, এ আমার ইচ্ছে নয়। আর যদি এখানেই আমার জীবনের শেষ হয়, আমার স্যুটকেসের মধ্যে সমস্ত ঠিকানাটা পাবেন, প্রয়োজন হ'লে পত্র দিতে পারবেন—এ রোগ-যন্ত্রণার উপশম ত হবার নয়।

চুপ ক'রেই রইলাম। এমন জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে এমনি ক'রে নির্ব্বিকারচিত্তে সমস্ত প্রিয়জনের স্নেহ সেবা প্রীতিকে উপেক্ষা করা—এ যেন একান্তই অসম্ভব বলে মনে হয়। কিন্তু যা চোখের সামনে দেখ্‌ছি, যে-কথা স্বকর্ণে শুনলাম তাকেই বা অস্বীকার করি কেমন ক'রে! মানুষের মনে কি এমনি অনুভূতি থাকাও সম্ভব!

কয়েকদিন ক্রমাগত ভাল এবং মন্দের সীমানায় গতায়াত ক'রে যেদিন দেবেনবাবুর অবস্থা আর আশঙ্কাজনক রইল না, সেদিন তাঁর দাদা এসে পৌঁছলেন। তাঁর পত্রোত্তরে আমিই পত্র দিয়েছিলাম, কাজেই সংবাদ পেতে তার বাধা হয়নি।

গ্রীষ্মের ছুটি হওয়ার সময় সময় দেবেনবাবুর ধীরে ধীরে উঠে বেড়াবার মত সামর্থ্য হ'ল। তাঁর দাদা বন্ধে বাড়ী নিয়ে যাওয়ার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করতে আরম্ভ করলেন—কিন্তু দেবেনবাবু কেবল একটি সুস্পষ্ট 'না' ছাড়া দ্বিতীয় কিছুই বললেন না।

চরে বেড়াতে গিয়ে সেদিন তাঁর দাদার সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল—

তাঁর দাদা খগেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলুম, দেবেনবাবুর স্বভাব কি চিরদিনই এমনি ?

খগেনবাবু বললেন—না, বিয়ের কিছু কাল পর থেকেই ওর স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। আগে ও ছিল সব চেয়ে আমুদে, সব চেয়ে মিশুক, থিয়েটারের কমিক প্লেয়ার, ফুটবলের ভাল খেলোয়াড়। আর আজ ও একেবারে নির্ব্বিকার—

একটুক্ষণ থেমে বললেন, বৌমা আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে। তার কোথাও আমরা এতটুকু ত্রুটি পাইনি। ধীর স্থির, সর্ব্বকার্য্যে সুনিপুণা, অথচ কেন যে এমন হয়! সে সতী-লক্ষ্মীর চোখের জল ফেলে কি ওরই মঙ্গল হবে? ও তার উপরে কেবল অত্যাচারই করে, সে মুখ বুজে সহ্য করে। এর প্রতিবাদ করবার সাহসও তার নেই।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পার্থক্য বা ব্যবধানটা কোথায় রয়েছে তা ত আমিও জানি না, কাজেই নির্ব্বাক হয়ে কেবল শুনলাম। খগেনবাবু বললেন, আপনারা যদি অন্তত ওর স্ত্রীকে এখানে বাসায় আনবার মত করাতে পারেন তবে আমরা এই অশান্তির হাত থেকে মুক্তি পাই। তার ভাগ্যে যা থাকে তাই হবে।

—দেবেনবাবুর মতামত সৃষ্টি বা পরিবর্ত্তিত করবার সাহস আমার নেই, তবে বলে দেখ্‌তে পারি।

সেদিন হোটেলে ফিরে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত আলোচনা ক'রে ঠিক হ'ল, দেবেনবাবু বাড়ীতেই যাবেন এবং ফিরবার সময় সস্ত্রীক ফিরে আসবেন। আমি ও তিনি দুজনে মিলে একটি বাসা নিয়ে বসবাস আরম্ভ করব।

যে মহিলাটিকে দেখবার কৌতূহল মনের মধ্যে অদম্য হ'য়ে উঠেছিল, তিনি এলেন।

নাম তাঁর বীণা, সুন্দরী না হ'লেও চেহারায় একটা লাবণ্য আছে। মুখখানা দেখলেই মনে হয়, যেমন শান্ত তেমনি সরল, পবিত্রতার একটা সুস্পষ্ট দাগ সমগ্র মুখে অস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। দেখলে শ্রদ্ধা হয়। বয়স বেশী নয়, কুড়ির কমই বলে মনে হয়—যৌবনের চাঞ্চল্য নেই, কিন্তু তার মাধুর্য্য আছে।

একই বাসার মধ্যে দুটি ঘর; কিন্তু ভিতর-বাড়ীর উঠান একটাই। দুই গৃহস্থের মাঝে পর্দ্দার কোন বালাই নেই।

ষ্টীমার থেকে নেমে সমস্ত ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে ঘর-গুছিয়ে গৃহস্থালীর অবশ্য কর্ত্তব্য কাজ শেষ ক'রতেই সেদিনের মত সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। আমার সমস্ত গুছোনো পূর্ব্বেই হয়েছিল, সুনীতিকে সাহায্য করতে পাঠিয়েছিলাম; সে সাহায্য বিশেষ কিছু করেনি, তবে আলাপ ক'রে এসেছে।

পরদিন স্কুলের ছুটির পর বল্‌লুম, দেবেনবাবু, চলুন বাসায় ফিরি।

যাই, যাই করে অনেকক্ষণ ধ'রে খবরের কাগজের আপাদমস্তক পড়ে উঠে বললেন, চলুন।

বাসায় ফিরে জল খেয়ে এক সঙ্গে চরে বেড়াতে যাব স্থির ক'রে ডাক দিলুম, দেবেনবাবু, চলুন, চরে যাবেন না?

দেবেন বাবু ডাক্‌লেন, আসুন।

ঘরের ভিতর ঢুকে দেখলুম—লুচি তরকারী তৈরী হয়েছে, ষ্টোভে চা'র জল গরম হ'চ্ছে। তিনি বললেন, চা হবে ত?

—না। এক্ষুণি খেয়েছি।

দেবেন বাবু খেয়ে নিলেন। এক সঙ্গেই চরে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম। দেবেনবাবু বললেন, আপনার সঙ্গে টাকা আছে?

—কেন?

—কয়েকটা জিনিষ কিনতে হবে, ওর চিরুণীটার কয়েকটা দাঁত ভেঙে গেছে, দুটো ক্লিপ্‌ একটা তোয়ালে।

দেবেনবাবু উদাসপ্রকৃতির লোক, তবুও তাঁর স্ত্রীর

অসুবিধার প্রতি এই খরদৃষ্টি আমি আশা করি নি। বললুম, —এও লক্ষ্য করেছেন?

—হ্যাঁ, আপনি এ লক্ষ্য করেন না!

—লক্ষ্য করার অবসর হয় না, তার পূর্ব্বেই ফর্দ্দ এসে জোটে।

দেবেনবাবু একটু হেসে বললেন, চাইবার দাবী আছে তাঁর, তাই। এই দাবীই তাঁর ভালবাসার নিদর্শন—কাজেই সে ফর্দ্দ-মাফিক জিনিষ কেনার মধ্যে আনন্দই আছে, না?

ভাবছিলুম, এই দাবী নেই বলেই অথবা তার চাইবার প্রয়োজন হয় না বলেই হয় ত দেবেনবাবুর অন্তরে অতৃপ্তি অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হ'য়ে ওঠে! তাঁর মন বেদনার্ত্ত হ'য়ে নিরন্তর গুম্‌রে মরে।

চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে তিনি বললেন, মানুষ চায় কি জানেন, এই দাম্পত্য জীবনের মাঝে? নারী তার স্নেহ যত্ন প্রেম দিয়ে ঘিরে রাখবে পুরুষের অন্তরটিকে। দিনান্তে শ্রান্ত মন সেই অঞ্চলের আড়ালে নিশ্চিন্ত আবেশে আপনাকে ভুলে যাবে—

—এ জগতে এতখানি কি পাওয়া সম্ভব?

—যারা চায়নি, তারাই খুশী, যারা চেয়েছে তাদের জীবনের একাকীত্ব ঘোচে নি।

পরদিন দেবেনবাবু স্কুল থেকে সরাসরি চরে বেড়াতে গেলেন, জল খেতেও বাসায় ফিরলেন না। আমি কোন দুর্য্যোগ আশঙ্কা ক'রে সুনীতিকে দিয়ে খবর নিলুম, বীণা দেবী লুচি তৈরী ক'রে অপেক্ষা করছেন। দেবেনবাবুর দেখা না পেয়ে গুছিয়ে সেগুলিকে তুলে রাখলেন।

চরে গিয়ে দেবেনবাবুকে বললুম, আপনি গেলেন না, তিনি খাবার তৈরী ক'রে বসে আছেন।

দেবেনবাবু দ্বিরুক্তি না ক'রেই বল্‌লেন—জানি, সে আজ খাবার তৈরী করবে, যেহেতু আমি কাল বলেছিলাম, কিন্তু এ পাওয়ার মধ্যে আমি দুঃখই পাই। চাইলে আমি হয়ত সব কিছুই পাই, আদায় করবার অধিকার আজিও আমার আছে, কিন্তু না চাইতে যে পাওয়া তাই প্রকৃত পাওয়া, সে-ই আনন্দ। কাল যদি সে খাবার তৈরী ক'রে রাখত তা হ'লেই মনটার মধ্যে তৃপ্তি পেতুম।

—আপনি কখন আসবেন, কি খাবেন, তাই তিনি জান্‌তেন না, কাজেই খাবার তৈরী করা তাঁর সম্ভব হয় নি।

—মানুষ বিকেলে খায় এ জানবার বয়স তার না হয়েছে এমন নয়, আর ঘরে যা আছে তাই নিশ্চয়ই খাবো। এর মধ্যে বুদ্ধির কিছু নেই, অভাব আছে অনুভূতির।

—না, এ সম্পূর্ণ ভয়, আজকালকার মত শিক্ষিতা মেয়ে হ'লে হয়ত—

—ভয়েই হোক, লজ্জায়ই হোক, উপেক্ষায়ই আর শিক্ষাভাবের জন্যেই হোক, এ দুঃখটা আমি যে পেয়েছি, এ কথাটা আপনি অস্বীকার করতে পারেন না। কাজেই আমার মন যদি ব্যথিত হয়, নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করি, তবে আমাকে দোষ দেবেন কি! দুঃখটা পাওয়ার উপর নির্ভর করে না, চাওয়ার উপর নির্ভর করে!

দেবেনবাবুর যুক্তি-তর্কের সাম্‌নে সহসা নির্ব্বাক হ'য়ে গেলাম—প্রতিবাদ করবার সাহস হ'ল না।

শ্রাবণের মাঝামাঝি।

সেদিন সন্ধ্যা থেকে অঝোর-ধারায় বৃষ্টি হয়েছে। আকাশের নিবিড় ঘন কালো মেঘের বুক চিরে যেন শত ধারে অশ্রুর বন্যা ঝাঁপিয়ে পড়ে পৃথিবীকে প্লাবিত ক'রে দিয়েছে। সন্ধ্যার পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। গভীর রাত্রে সহসা কেন যেন জেগে গেলাম।

চারিপাশে ঘন অন্ধকার। কদাচিৎ ক্লান্ত ভেকের মৃদু কণ্ঠস্বর ও ঝি ঝি পোকার ডাক, নিঝুম রাত্রির স্তব্ধতা যেন বাড়িয়ে তুলেছে। বর্ষণক্লান্ত আকাশে তখনও মেঘ জমা হ'য়ে আছে, মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ ক'রে দুই-এক ফোঁটা বৃষ্টি হ'চ্ছে—কোন্ ছিদ্রপথে ঘরের মধ্যে যেন এক রেখা আলো প্রবেশ করেছে—

চেয়ে দেখি, দেবেনবাবুর ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। আমার ঘরের একটা জানালার পাশে দাঁড়ালে তার ঘরের প্রায়-সবটাই দেখা যেত। জানালাটা নিঃশব্দে খুলে দাঁড়িয়ে রইলুম।

টেবিলের উপর আলো জ্বলছে, একখানা বই খোলা পড়ে আছে। পাশেই খাটের উপর তাঁর স্ত্রী সম্ভবত ঘুমিয়েই আছেন। দেবেনবাবু অপলক দৃষ্টিতে নিদ্রিত সেই

মুখখানির পানে চেয়ে তন্ময় হ'য়ে বসে আছেন। নিস্পন্দ স্তব্ধ মুখে তার কোনই অভিব্যক্তি নাই।

বীণা দেবী বোধ হয় আলো দেখেই সহসা জেগে উঠে বসলেন।

দেবেনবাবু ধীরে ধীরে বললেন, আচ্ছা বীণা, তুমি ঘুমিয়েছিলে? না?

উত্তরটাও স্পষ্ট শুনলুম। বীণা দেবী বললেন, হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়েছি—

—চারিপাশে এই অঝোর ধারে বৃষ্টি পড়ছে, আজ আমার মনটা উন্মাদের মত কত চিন্তা ক'রে চলেছে। ওই আকাশের মত আমার অন্তর চিরে সমস্ত ভাবধারা তোমার সমস্ত অঙ্গে বর্ষিত হয়েছে। আচ্ছা, তোমার কি ইচ্ছে করে না, এমনি করে একবার সমস্ত অন্তর দিয়ে আমার দুঃখী অন্তরকে ঘিরে ধরতে?

বীণা দেবী বললেন, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি ব'লে রাগ করেছ?

দেবেনবাবু হাসলেন, কিন্তু সে হাসি কান্নারই রূপান্তর মাত্র। তার সমস্ত অন্তর সহসা যেন কঠিন বাস্তবের প্রাচীরে প্রহত হ'য়ে ভেঙ্গে পড়ল। বললেন, না, তুমি ঘুমোও।

—তুমি শোবে না?

—হ্যাঁ, শোব বই কি!

বীণা দেবী স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন দেখলেন। দেবেনবাবু খানিক বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। আমি ধীরে ধীরে শয্যায় ফিরে এলাম। ভাবলুম—এ অতৃপ্তি ত জগতের কাছে তার পাওয়ার নয়, তিনি নিজের ভালবাসার অন্ত পান নি তাই এই অতৃপ্তি, ভালবেসে তিনি তৃপ্তি পান না তাই অতৃপ্তিই কেবল বেড়ে চলে। এত ভালবাসা নিয়ে কি জগতে সুখী হওয়া চলে?

সেদিন সিনেমা দেখে ফিরে এলাম প্রায় রাত্রি দশটায়।

সুনীতি এসে খবর দিল, বীণাদিকে'ত আজ খুবই গম্ভীর দেখলাম, কিছু ঘটেছে বলে মনে হয়।

আমি জানতুম, ঘটবেই এবং এক সঙ্গে ওদের থাকা চলবে না। গগনবিহারী ওই দেবেনবাবুর অন্তরের পিছু পিছু কোন নারীহৃদয়ই ছুটবার সাহস করবে না। ব'ললুম, কিছু শুনলে?

—না, ও তেমন মেয়েই না, বুক ফেটে গেলেও ও কথা বলতে পারবে না।

পরদিন স্কুলে গিয়ে শুনি, দেবেনবাবু ছ দিন ক্যাজুয়াল লিভের দরখাস্ত দিয়েছেন। বিকেলে কারণ জিজ্ঞাসা করলে দেবেনবাবু বললেন, এক সঙ্গে থেকে ব্যবধানের দুঃখকে ভোগ করার চেয়ে দূরে থেকে তাকে ভুলে যাওয়াই লাভের। আমাদের এক সঙ্গে থাকা আর সম্ভব নয়।

—ব্যবধানটা আপনার অনুমান, না—

দেবেনবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, না, অনুমান নয়, অনুভূত সত্য। আপনারা সিনেমায় গেলেন, আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি সিনেমা দেখবে? ও জবাব দিলে—'জানি না।' আমার কাছে দাবী জানাবার শক্তি যার নেই, আমার কাছে চাইবার যার কিছু নেই, তার অন্তরের সঙ্গে আমার অন্তরের ব্যবধান ত অল্প নয়। সে ব্যবধানকে নিরন্তর ভোগ ক'রে দুঃখ আমি কেন পাই!

আজ এই ব্যাখ্যাকে আমিও গ্রহণ করতে পারলুম না, একটু রুষ্ট স্বরেই বললুম, আপনি একে বলেন ব্যবধান, কিন্তু এ ব্যবধান নয়। এই একান্ত আত্মসমর্পণ, এই মৌন মূক আত্মনিবেদন, এই সহনশীলতা—এর কি কোন মূল্য নেই? এই সেবা, এই নিষ্ঠা, এই হাসিমুখে সুখ-দুঃখকে গ্রহণ করা, এর কি কোন মূল্য নেই?

—আছে, সমাজের কাছে এর মূল্য যথেষ্ট, কিন্তু অন্তরের কাছে নয়। এই আত্মসমর্পণকে উপন্যাসের আদর্শ করা চলে, কিন্তু এ মানব জীবনকে সুখী করতে পারে না। আপনি মনে করেন, এই ব্যবধান কেবল আমার আর ওই বীণার মধ্যে—তা নয়—এই ব্যবধানের শাশ্বত চিরন্তন কাহিনী নরনারী হৃদয়কে পৃথক ক'রে মধুরতর ক'রে রেখেছে। বীণাও হয়ত আমারই মত শত দুঃখে বেদনায় ম্রিয়মান হ'য়ে রয়েছে। বলবেন—ও শিক্ষিতা হ'লে হয়ত এমন হ'ত না, তা নয়। শিক্ষিতা হ'লেও এই ব্যবধান অন্য রূপ নিয়ে দেখা দিত। দূরত্বের মধ্যে রয়েছে নৈকট্য, আর নৈকট্যের মধ্যে রয়েছে দূরত্ব।

যাবার দিন স্থির হ'ল।

শহরটার বুকের উপর দিয়ে যে অতি সরু রাস্তাটা ষ্টেশনে গেছে, সেইটা ধরে দেবেনবাবু ও বীণা দেবীর পিছনে পিছনে আমি আর সুনীতি চলেছি। এমনি কত লোককে কতদিন ষ্টেশনে তুলে দিয়েছি, কিন্তু এমন ক'রে বিদায় মুহূর্ত্তটি কোন দিন সমবেদনার ব্যথায় করুণ হ'য়ে ওঠে নি।

ষ্টীমারে বিছানা ক'রে সমস্ত গুছিয়ে একবার চারিপাশে চাইলাম। আজিকার এ বিদায়ের মধ্যে যেন একটা চির-বিদায়ের করুণ সুর ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। দেবেনবাবুকে বল্‌লুম—সত্যি চললেন দেবেনবাবু?

—হ্যাঁ, যাব।

—আপনার এ মন নিয়ে এ জগতে সুখী হওয়া চলবে না।

—জানি, তাই সে ব্যর্থ প্রয়াস আমি করতে চাইনি—আমার মন নিয়ে নয়, মানুষের মন নিয়েই এ জগতে সুখী হওয়া চলে না।

বীণা দেবীর দিকে একবার চেয়ে দেখলাম, নদীর ওপারে দূর দিগন্তরেখার পানে উদাস সজল চোখের দৃষ্টি ন্যস্ত ক'রে স্তূপাকার জড়পদার্থের মত তিনি বসে রয়েছেন, সামনে নদীর স্রোত তর তর ক'রে বয়ে চলেছে—

ষ্টীমার ছেড়ে দিল।

ভারাক্রান্ত মনে শ্লথ মন্থর পদক্ষেপে ফিরে এলাম। চোখের অন্তরালে ধীরে ধীরে ষ্টীমারখানি ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হ'য়ে অদূরে বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।…

তারপর বহুদিন চলে গেছে। দেবেনবাবুও আজ এখানে নেই, বীণা দেবীও আর আসেন নি, তবুও মাঝে মাঝে মনে হয়, অনিন্দ্য সেই চোখ দুটি দিগন্তরেখার পানে আজও যেন সজল উদাসদৃষ্টিতে চেয়ে আছে, আর তারই অতি সন্নিকটে, তারই শয্যায় ব'সে আর একটি অন্তর ক্রমাগত অভিযোগ করছে—মানুষের মন নিয়ে এ জগতে সুখী হওয়া চলে না।

দস্যুর আশীর্ব্বাদ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

(রাণাঘাটের পালচৌধুরীদের পূর্ব্বপুরুষ কৃষ্ণপান্তী মুখে যাহা বলিতেন কাজেও তাহাই করিতেন। সত্যপালন সম্বন্ধে তাঁহার এমন সুখ্যাতি ছিল যে, চোর-ডাকাতও তাঁহাকে বিশ্বাস করিত।)

মানুষ মেরেছি, ডাকাতি করেছি, লুটেছি পরের ধন,
কখনো কোথাও কাতর হয় নি নরম হয় নি মন।
সমাজ মোদেরে শত্রু কয়েছে, শত্রুতা সাধি শুধু,
বিষের বদলে বিষই পেয়েছি; কোথাও পাইনি মধু।
বাঙ্গালার মাঝে এমন একটা মানুষ দেখ্‌ছি আছে,
শুধু মানুষের মর্য্যাদা পায় দস্যুও যার কাছে।
সে যে সব চেয়ে সত্য এবং সততাই বড় মানে
বিশ্বাস সবে করিতে করাতে, রাখিতেও সে-ই জানে।
দস্যুর মাঝে আসল মানুষ কোথায় লুকায়ে থাকে,
সে-ই জানে, আর সেও দেয় সাড়া কেবল তাহারি ডাকে।
আমরা ত নিতি খেলি ছিনিমিনি লইয়া টাকা ও প্রাণ,
জোরে কেড়ে লই, জোরে ত্যাগ করি, নাহিক কোনই টান,
কৃষ্ণপান্তী, আজ দিয়া তুমি তুচ্ছ দু তোড়া টাকা—
দেখালে তোমার কথা, সততার বনিয়াদ কত পাকা।

মানুষকে তুমি শ্রদ্ধাই কর হেয়কে ভাব না হেয়,
জীবনে করেছ আশ্রয় শুধু সত্য এবং শ্রেয়।
তোমার পুণ্য পণ্যের তরী যে ঘাটে দিয়েছে আঁট
রাণাঘাট নয় কালসাগরের এটা জেনো বাঁধাঘাট।
তোমার যশের 'ঢালে' জাগে বীর সততা কৃতজ্ঞতা
বিশ্বজয়ের কথা নাই, আছে দস্যুজয়ের কথা।
চূর্ণী চুর্ণি' সবার গর্ব্ব, বলিছে কলস্বরে—
কৃষ্ণ না হোক কৃষ্ণপান্তী হেতায় বসত করে।
নহে মহারাজা, নহে মহাবীর সে কেবল মহাপ্রাণ
দস্যু এবং তস্করে দেয় মানুষের সম্মান।
ঘৃতে ডুবাইয়া যশের মশাল আমরা যেতেছি গাড়ি'
তোমার যোগ্য বংশধরের উঠিছে বিরাট বাড়ী।
তোমার বংশ লতিকার ফুলে হইবে বঙ্গ আলো
মনে রেখো হীন দস্যুর দল আশীষ করিয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণের পূজাপার্ব্বণের কাল

অধ্যাপক শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ এম্-এ, পি-এচ্-ডি

হিন্দুদিগের পূজাপার্ব্বণের জন্ত পুরাণে বিশেষ বিশেষ কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। কেন এই বিশেষ কাল নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার বিচার করিতে হইলে জ্যোতিঃশাস্ত্রের আলোচনা করিতে হয়। এই প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণের পূজাপার্ব্বণের কাল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। রসের দিক্ হইতে রসিকগণ শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত লীলার কীর্ত্তন করিয়াছেন, তত্ত্বের দিক্ হইতে কত পরমার্থিক ব্যাখ্যা দিয়া পণ্ডিতগণ ইহাদের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন; এই প্রবন্ধে জ্যোতিষিক ঘটনার আলোচনা করিয়া ইহাদের কাল নির্দ্দেশের কারণ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা হইবে।

সূর্য্য এক বৎসরে তাঁহার কল্পিত পথ পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। এই পথকে ক্রান্তিবৃত্ত বলা হইয়া থাকে। এই ক্রান্তিবৃত্তের বিশেষ বিশেষ স্থানে যখন সূর্য্য আসিয়া উপস্থিত হইতেন, সেই সেই কালকে নির্দ্দিষ্ট করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। বরাহপুরাণে বিষ্ণুরূপে ভাস্করের ধ্যান ও পূজার কথা বলা হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের পূজা-পদ্ধতিতে সূর্য্যের প্রাধান্তই লক্ষিত হইয়াছিল। পরে পৌরাণিক যুগে নানা দেবদেবীর আবির্ভাব হইলেও সূর্য্যের বিশেষ বিশেষ অবস্থানের সহিত তাহাদিগের পূজার সম্পর্ক ছিল। এই সমস্ত অনুমানের উপর ভিত্তি করিলে শ্রীকৃষ্ণের পূজাপার্ব্বণের কালের ব্যাখ্যা করা সহজ হইবে।

হিন্দুদিগের জ্যোতিঃশাস্ত্রের অনুসারে বৎসরের আরম্ভ তিনবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কৃত্তিকা হইতে নক্ষত্রগণনার পূর্ব্বে অতি প্রাচীনকালে মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) প্রথম মাস ছিল। সেই সময়ে মার্গশীর্ষে (অগ্রহায়ণে) ও জ্যৈষ্ঠে বিষুব দিন এবং ফাল্গুন ও ভাদ্রে অয়ন নিবৃত্তি হইত। এই পুরাতন কালের বৎসর বিভাগ পরে পরিত্যক্ত হইলেও পুরাতন স্মৃতি লুপ্ত হয় নাই। সেই পুরাতন স্মৃতির নিদর্শন রাখিবার জন্ত কয়েকটি পূজা পার্ব্বণের প্রতিষ্ঠা হইল।

বৎসরের আরম্ভের কাল বিচার করিয়া বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার রচিত 'অরিয়ন' গ্রন্থে বৈদিক কাল নিরূপণ-প্রসঙ্গে অনেক প্রমাণের দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, তখন মৃগশিরা নক্ষত্রে বিষুবন্ (equinox) থাকিত। তিনি মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসের নাম ধরিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মৃগশিরা নক্ষত্রে বসন্ত বিষুবন্ (vernal equinox) থাকিত এবং সেই নক্ষত্রে পূর্ণিমা হইত। এই জন্ত মার্গশীর্ষ মাস অগ্রহায়ণ মাস অর্থাৎ বৎসরের প্রথম মাস (হায়ণ অর্থে বর্ষ, বর্ষের অগ্র বা প্রথম মাস)। সেই সময়ে সম্ভবত বিষুব বৃত্ত হইতে সূর্য্যের উত্তর দিকে গমনের নাম উত্তরায়ণ ছিল এবং তাহা হইতেই নূতন বৎসর গণিত হইত। সুতরাং যে সময়ে অগ্রহায়ণ মাস বৎসরের প্রথম মাস ছিল, সেই সময়ে মার্গশীর্ষ ও জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা বিষুব দিন ছিল এবং ফাল্গুন পূর্ণিমায় দক্ষিণায়ণ শেষ হইত, আর ভাদ্রপূর্ণিমায় উত্তরায়ণ শেষ হইত। বলা বাহুল্য যে, এই সমস্ত কালনির্দ্ধারণে চান্দ্রমাস ব্যবহৃত হইত। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা উভয় তিথি হইতেই চান্দ্রমাসের আরম্ভ গণনা করা যাইতে পারে। অমাবস্যার পর আরম্ভ হইলে অমাবস্যায় শেষ হইবে, এইরূপ মাসকে অমান্ত মাস বলা হয়। পূর্ণিমার পর যে মাসের আরম্ভ ও পূর্ণিমায় শেষ, তাহাকে পূর্ণিমান্ত মাস বলা যায়। অমান্ত মাসের প্রথমে শুক্ল, পরে কৃষ্ণপক্ষ। অমান্ত মাস মুখ্য চান্দ্র এবং পূর্ণিমান্ত মাস গৌণচান্দ্র নামে খ্যাত। বঙ্গদেশে সৌরমাস প্রচলিত, এইজন্ত এখানে অমান্ত বা পূর্ণিমান্ত মাসের বিচার আবশ্যক হয় না। এক্ষণে নর্ম্মদা নদীর উত্তর ভারতখণ্ডে ও ওড়িষ্যায় পূর্ণিমান্ত মাস এবং নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে অমান্ত মাস প্রচলিত। সূর্য্যের এক রাশি ভোগের কাল এক সৌরমাস; সূর্য্য যখন মেষরাশিতে থাকে, তখন বৈশাখ মাস, এইরূপ অন্যান্য মাস। ব্রহ্ম সিদ্ধান্তের ব্যবস্থা অনুসারে মেষ রাশিতে সূর্য্য থাকিতে যে চান্দ্রমাস পূর্ণ হয় তাহা চৈত্র, এইরূপ অন্যমাসের ব্যবস্থা। এক সৌরমাসে দুই চান্দ্রমাস পূর্ণ হইলে তাহার দ্বিতীয়টি অধিমাস বা মলমাস।

এই কয়েকটি জ্যোতিষিক ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া আমরা সূর্য্যের বিশেষ বিশেষ অবস্থানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বিষুববৃত্ত হইতে উত্তর দিকে গমন করিতে করিতে সূর্য্য ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ শেষ করিলেন এবং দক্ষিণদিকে যাইবার উপক্রম করিলেন; এই দিনে মনে হইত যেন সূর্য্য দোদুল্যমান অবস্থায় রহিয়াছেন, অর্থাৎ যেন সূর্য্যদেব দোলায় দোলায়মান রহিয়াছেন। সূর্য্যের এই অবস্থানটি স্মরণ রাখিবার প্রয়োজন হইল।

তৎকালে সম্ভবত বিষুববৃত্তি হইতে উত্তর দিকে গমনের নাম উত্তরায়ণ ছিল। তাহা হইতেই নূতন বর্ষ গণিত হইত। এই নিমিত্ত শতপথ ব্রাহ্মণে, গোপথ ব্রাহ্মণে ও সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে; ফাল্গুনী পূর্ণমাসী সংবৎসরের প্রথমা রাত্রি, ফাল্গুনী পূর্ণমাসী সংবৎসরের মুখ। তৎকালে মাস পূর্ণিমান্ত ছিল। সুতরাং সূর্য্য যখন সংবৎসরের এই মুখে আগমন করিতেন, তখন নব বৎসরের উৎসব হইত, বহ্নি-উৎসবের ব্যবস্থা হইত এবং নববর্ষ সমাগমে মত্ত হইয়া লোকে হোলিক্রীড়া করিত।

এখন দেখা যাউক, এই দোল ও হোলি-উৎসব শ্রীকৃষ্ণের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট হইল কি করিয়া। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ সে যুগের এক পরাক্রমশালী সম্রাট্ ছিলেন, তিনি

ছিলেন বিচক্ষণ পণ্ডিত, সংস্কারক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং সেই সময়ে জ্যোতিষে পারদর্শিতা পাণ্ডিত্যের একটি অঙ্গ বিবেচিত হইত। সুতরাং পূজাপার্ব্বণাদির নির্দ্দেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব যে অসাধারণ ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে সংবৎসরের এই প্রারম্ভ ও সূর্য্যের এই বিশেষ অবস্থিতি স্মরণ রাখার যোগ্য ; কিন্তু সাধারণের পক্ষে স্মরণীয় করিতে হইলে ইহার সহিত কোন পূজাপার্ব্বণের সংযোগ থাকা উচিত। এই জন্যই এই সময়ে একটি উৎসবের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তৎপরে পৌরাণিক যুগে যখন শ্রীকৃষ্ণে অবতারত্ব আরোপিত হইল এবং তিনি পূর্ণব্রহ্মরূপে পূজিত হইতে লাগিলেন, তখন এই পূজাপার্ব্বণ তাঁহার নামের সহিত জড়িত হইয়া গেল এবং এই দিনটি স্মরণ রাখিবার জন্য এই দিনেই শ্রীকৃষ্ণের দোল উৎসবের ব্যবস্থা হইল। সুতরাং ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, সূর্য্যের এই বিশেষ অবস্থিতির স্মৃতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের দোল ও হোলি উৎসবের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

তার পর অমান্ত শ্রাবণ মাসের (অথবা পুর্ণিমান্ত ভাদ্র মাসের) পুর্ণিমায় সূর্য্য উচ্চ হইতে নীচে অবতরণ করিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু এই সময়ে কয়েক দিন তাঁহাকে একেবারে স্থির থাকিতে দেখা যায়, যেন সূর্য্যদেব কি কর্ত্তব্য তাহা নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া স্থির ভাবে অবস্থান করিতেছেন। এই সময়েও সূর্য্যের দোলায়মান অবস্থা। এই প্রাচীন দিনটি স্মরণ রাখিবার জন্য একটি পার্ব্বণ বা উৎসবের ব্যবস্থা হইল। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের আর এক দোলযাত্রা, ইহা ঝুলন বা হিন্দোল নামে বিখ্যাত। এই পুর্ণিমার দিনে রবি মঘায় ও চন্দ্র ধনিষ্ঠা-নক্ষত্রে অবস্থান করেন। এমন শুভযোগে ঝুলন বা হিন্দোল শোভা পায়।

প্রাচীন হিন্দুদিগের তিন প্রকার কাল বিভাগ ছিল—কল্পাদি, মন্বন্তরাদি ও যুগাদি বিভাগ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারি যুগ, দীর্ঘকাল বিভাগ ; তেমনই মন্বন্তর বা মনু অপর কাল বিভাগ, ইহা এক এক মনুর কল্পিত কালের পরিমাপ। ১৪ মনুতে এক যুগ ধরা হয়। ইহাদের উৎপত্তি জ্যোতিষিক কাল বিভাগ হইতে। মনুর কাল জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তে আবশ্যক হয় না, পুরাণেই উহার সম্যক্ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদিগের আধুনিক পূজাপার্ব্বণ অধিকাংশই পৌরাণিক বিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত। সুতরাং উহাতে মন্বাদিকাল বিভাগের প্রভাব লক্ষিত হয়। এইরূপে যখন শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমীতে রবি মঘায় ও চন্দ্র অশ্বিনী নক্ষত্রে, তখন এক মন্বাদিকালের আরম্ভ ; ইহা একটি বিশেষ পর্ব্বদিন বলিয়া গণিত হইল। এই পর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন এবং এই পুণ্যদিনের স্মৃতি রক্ষার জন্য হিন্দুদিগের উৎসব-পার্ব্বণ স্থির হইল।

হিন্দুদিগের দ্বিতীয় বর্ষ বিভাগে কার্ত্তিক প্রথম মাস ছিল। তখন কার্ত্তিক ও বৈশাখ পুর্ণিমায় বিষুব দিন, মাঘ ও শ্রাবণ পুর্ণিমায় অয়ন-নিবৃত্তি ছিল। সুতরাং কার্ত্তিকী পুর্ণিমা বিষুব দিন বলিয়া একটি স্মরণীয় পর্ব্ব ছিল। আবার কার্ত্তিকী পুর্ণিমায় মন্বাদিকালের একটি আরম্ভও বটে ; অতএব ইহার আরও বৈশিষ্ট্য। ঐ দিন সূর্য্য বিশাখা (বা রাধা) নক্ষত্রে বিরাজ করেন। এই বিশেষ কালকে স্মরণ রাখিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের রাধার সহিত রাসলীলা কল্পিত হইয়াছে। এই দিনও হিন্দুদিগের একটি পার্ব্বণ দিন বলিয়া গণ্য হইল।

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মহামানব, তাহার প্রভাব সমসাময়িক পূজাপার্ব্বণ নির্দ্ধারণে অসাধারণ ছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত লীলাই পৌরাণিক যুগে কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার বহু পুর্ব্বে, সম্ভবত বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন জ্যোতিষিক ঘটনা স্মরণ রাখিবার জন্য তিনি যে পার্ব্বণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহা তাঁহারই বিভিন্ন লীলার সহিত জড়িত হইয়া পড়িল এবং পুরাণযুগে হিন্দুরা কল্পনার সাহায্যে এক সুন্দর রসমাধুর্য্যময়ী উপাখ্যান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। অবশেষে জ্যোতিষিক বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হইল এবং শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাই এই সমস্ত পূজাপার্ব্বণের হেতু বলিয়া গণ্য হইল।

এই অল্পপরিসর আলোচনায় ইহাই দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের পূজাপার্ব্বণের কাল সূর্য্যের বিশেষ অবস্থানের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। হিন্দুদিগের জ্যোতিষ, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র পরস্পর এমনই সংশ্লিষ্ট যে, একটির কারণ জানিতে হইলে অপরটি জানিতে হয়। তবে প্রাচীন কালবিভাগের প্রতিই অধিক লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, প্রচলিত বিভাগের প্রতি ততটা নয়। কারণ মানবমনের ধর্ম্মই এই যে, উহা পুরাতন বা প্রাচীন বিধিব্যবস্থায় যত মুগ্ধ হয় এবং তাহাদের স্মরণ করিবার জন্য যত উৎসব অনুষ্ঠান করিতে ব্যগ্র হয়, প্রচলিত বা নূতন বিধিব্যবস্থার প্রতি তত আকৃষ্ট হয় না। এই স্বাভাবিক ধর্ম্মানুসারেই প্রাচীন বর্ষবিভাগ ও যুগবিভাগ স্মরণার্থ যত উৎসব আছে, প্রচলিত বর্ষবিভাগ নির্দ্দেশ করিতে তত উৎসবের ব্যবস্থা নাই। শ্রীকৃষ্ণের পূজার কাল স্থির করিতেও এই নীতিরই অনুসরণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণের পূজাপার্ব্বণে যে রসের ধারা উৎসারিত হয়, ভক্ত হৃদয়ে তাহা এক অপূর্ব্ব ভাবের হিল্লোল বহাইয়া দেয়, ভক্ত ও রসিকগণের সেই কল্পনারাজ্যে বিপ্লব না তুলিয়াও ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না যে, এই পূজাপার্ব্বণের সহিত জ্যোতিষিক ঘটনার সংশ্রব আছে।

চারিশতাধিক বৎসর পূর্বের নাট্যাভিনয়

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু এম-এ

সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে চৈতন্যদেব নবদ্বীপে চন্দ্রশেখরের গৃহে ভক্তগণসহ নৃত্যগীতের অভিনয় করিয়াছিলেন। ইহা প্রায় চারিশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার ঘটনা। চৈতন্য-ভাগবতের মধ্যের অষ্টাদশ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বৃন্দাবনদাস ইহাকে লক্ষ্মীনৃত্য আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। যথা—

মধ্যখণ্ড কথা ভাই, শুন একমনে।
লক্ষ্মী-কাছে প্রভু নৃত্য করিলা যেমনে॥

যদিও এখানে কেবল 'নৃত্য' শব্দটিই ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি পরবর্তী বর্ণনা পাঠে বুঝা যায় যে এই উপলক্ষে প্রকৃতপক্ষে নাটকীয় অভিনয়ই হইয়াছিল। যথা—

একদিন প্রভু বলিলেন সবা-স্থানে।
আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বন্ধনে॥
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু, কাচ সজ্জ কর গিয়া॥
শঙ্খ, কাঁচুলী, পাটসাড়ী, অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সবাকার॥
গদাধর কাচিবেন রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তল বুড়ী সখা সুপ্রভাত॥
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল হরিদাস জাগাইতে ভার॥
শ্রীবাস নারদ কাচ, স্নাতক শ্রীরাম।......

এই বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে মহাপ্রভু বিবিধ অঙ্কে বিভক্ত করিয়া এই নৃত্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে সংস্কৃত নাটকের অভাব নাই। মহাপ্রভু যে ঐ সকল গ্রন্থের সহিত পরিচিত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। অতএব, 'অঙ্কের বন্ধনে' এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, এই নৃত্য সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। একটির পর একটি নৃত্য কি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হইবে তাহা পূর্বেই চৈতন্যদেব স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। পরবর্তী বর্ণনাতেও এই ধারণা সমর্থিত হইবে। শঙ্খ, কাঁচুলী, পাটশাড়ী ও অলঙ্কার প্রভৃতি ব্যবহারে ইহাই বুঝা যায় যে ভূমিকা-অনুযায়ী সাজ-সজ্জা করিবার যথোচিত ব্যবস্থাও হইয়াছিল। এই অভিনয়ে কে কি ভূমিকা গ্রহণ করিবেন তাহাও মহাপ্রভু স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। গদাধর রুক্মিণীর ভূমিকা গ্রহণ করিবেন, ব্রহ্মানন্দ বুড়ীর অভিনয় করিবেন, নিত্যানন্দ হইবেন মহাপ্রভুর বড়াই, আর হরিদাস কোতোয়ালের পাঠ গ্রহণ করিবেন ইত্যাদি। এইরূপে ভূমিকা গ্রহণের পালা শেষ হইলে পর অভিনয়ের উপযুক্ত রঙ্গমঞ্চও নির্মিত হইয়াছিল। যথা—

সেইক্ষণে কথিয়ার চান্দোয়া টানিয়া।
কাচ সজ্জ করিলেন সুছন্দ করিয়া॥

'সর্ব্বথা ভূমিতে অঙ্ক দিলেন আচার্য' পাঠ করিলে বোধ হয় যে অভিনয়ের জন্য উচ্চ মঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল, অথবা উচ্চ ভিত্তিসমন্বিত কোন ঘরে অভিনয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং আচার্য মহাশয় তাহার সম্মুখভাগে বিবিধ অঙ্কের একটা নির্ঘণ্ট লিখিয়া দিয়াছিলেন। অধুনা যেমন অভিনয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণের মুদ্রিত পত্র দর্শকগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য বিতরিত হইয়া থাকে, উক্ত প্রকার ব্যবস্থায় সেই উদ্দেশ্যই সাধিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে। সাজ-সজ্জা করিবার জন্য পৃথক্ গৃহও নির্দিষ্ট হইয়াছিল, যথা—

গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর॥

অতএব নৃত্যাভিনয়ের ব্যবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দরই হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।

দর্শক নির্বাচনে মহাপ্রভু ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন—

"প্রকৃতি স্বরূপা নৃত্য হইবে আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয় তার অধিকার॥
সেই সে যাইব আজি বাড়ির ভিতরে।
যে যে জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে॥

ইহা শুনিয়া আচার্য মহাশয় বলিলেন—তাহা হইলে আমি নৃত্য দেখিতে যাইব না, কারণ আমি অজিতেন্দ্রিয়। শ্রীবাস পণ্ডিতও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন—"মোর ওই কথা।" মহাপ্রভু ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—তোমরা না গেলে নৃত্য কাহারে লইয়া! অতএব ভক্তগণের ভয় দূর করিবার জন্য তিনি—

"পুনঃ আজ্ঞা করিলেন কার চিন্তা নাই॥
মহাযোগেশ্বর আজি তোমরা হইবা।
দেখিয়া আমারে কেহ মোহ না পাইবা॥"

পুরুষ দর্শকগণের জন্য এই ব্যবস্থা হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই অভিনয় দর্শনে রমণীগণও উপস্থিত হইয়াছিলেন। যথা—

আই চলিলেন নিজ বধূর সহিতে।
লক্ষ্মীরূপে নৃত্য বড় অদ্ভুত দেখিতে॥
যত আপ্ত বৈষ্ণবগণের পরিবার।
চলিলা আইর সঙ্গে নৃত্য দেখিবার॥

অভিনয়ের পূর্বে আধুনিক ঐক্যতান বাদ্যের ন্যায় কীর্তন আরম্ভ হইয়াছিল। যথা—

কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ।
রামকৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ॥

তৎপর অভিনয়ের প্রারম্ভে হরিদাস রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি বৈকুণ্ঠের কোটালের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত হইলেন। তাহার বেশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রকার বর্ণনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—

প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু হরিদাস।
মহা দুই গোঁফ করি বদনে বিলাস॥
মহা পাগ শিরে শোভে ধটি পরিধানে।
অঙ্গদ বলয় পরে নূপুর চরণে॥
আরে আরে ভাই সব হও সাবধান।
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ॥

এইরূপ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন যে, তিনি বৈকুণ্ঠের কোটাল। মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ হইতে নবদ্বীপে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এইজন্য তিনিও বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সংস্কৃত নাটকে সর্বাগ্রে সূত্রধার আসিয়া যেমন অভিনেয় বিষয়ের সূচনা করিয়া যায়, এখানেও সেইরূপ হরিদাস অভিনয়ের স্বরূপ, অর্থাৎ—চৈতন্যদেব যে লক্ষ্মীর বেশে নৃত্য করিবেন, ইহা সকলের নিকট প্রচার করিয়া গেলেন। ইহার পরেই শ্রীবাস পণ্ডিত নারদের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বেশ বর্ণনায় বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

ক্ষণেকে নারদ কাচ কাচিয়া শ্রীবাস।
প্রবেশিলা সভা মাঝে করিয়া উল্লাস॥
মহা-দীর্ঘ পাকা দাড়ি, ফোঁটা সর্ব্ব গায়॥
বীণা কান্ধে কুশ হস্তে চারিদিগে চায়॥

তাঁহার পশ্চাতে রামাই পণ্ডিত আসন ও কমণ্ডলু লইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন। যথা—

রামাঞি পণ্ডিত কক্ষে করিয়া আসন।
হাথে কমণ্ডলু পাছে করিলা গমন॥
বসিতে দিলেন রাম পণ্ডিত আসন।
সাক্ষাৎ নারদ যেন দিলা দরশন॥

শ্রীবাসকে এই বেশে সাক্ষাৎ নারদের ন্যায়ই বোধ হইয়াছিল। শচী দেবী তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া মালিনীর নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছিলেন। যথা—

মালিনীরে বলে আই ইনি কি পণ্ডিত।
মালিনী বলয়ে শুনি ঐ সুনিশ্চিত॥

প্রবেশ করিয়া শ্রীবাস বলিলেন যে, তিনি 'কৃষ্ণের গায়ন,' বৈকুণ্ঠে গিয়া দেখিলেন যে সব শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, কারণ কৃষ্ণ নবদ্বীপে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই তিনিও এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন—

প্রভু আজি নাচিবেন ধরি লক্ষ্মী বেশ।
অতএব এ সভায় আমার প্রবেশ॥

এইরূপে অভিনয়ের সূচনা হইলে পর মহাপ্রভু রুক্মিণীর ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যথা—

গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইলা নির্ভর॥

আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী আবেশে।
বিদর্ভের সুতা হেন আপনাকে বাসে॥
নয়নের জলে পত্র লিখেন আপনে।
পৃথিবী হইল পত্র অঙ্গুলি কলমে॥

স্বয়ম্বরে উপস্থিত হইবার জন্য কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া রুক্মিণী দেবী যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা পুরাণে রহিয়াছে। এই অভিনয়ে মহাপ্রভু ভাগবতের সাতটী শ্লোক লিখিয়া পত্র প্রেরণের অভিনয় করিয়াছিলেন। এইভাবে প্রথম প্রহরে এই অভিনয়ের প্রথম অঙ্কের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল। যথা—

প্রথম প্রহরে এই কৌতুক বিশেষ।
দ্বিতীয় প্রহরে গদাধরের পরবেশ॥

এইরূপে প্রথম অঙ্ক অভিনীত হইলে পর দ্বিতীয় প্রহরে বড়াই-বুড়ির সাজে সজ্জিত ব্রহ্মানন্দ ও একজন সখীসহ গদাধর প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহার বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে—

সুপ্রভা তাহার সখী করি নিজ সঙ্গে।
ব্রহ্মানন্দ তাহান বড়াই বুলে রঙ্গে॥
হাতে নড়ি কাঁখে ডালি নেত পরিধান।
ব্রহ্মানন্দ যে হেন বড়াই বিদ্যমান॥
ডাকি বলে হরিদাস কে সব তোমরা।
ব্রহ্মানন্দ বলে যাই মথুরা আমরা॥
শ্রীবাস বলয়ে দুই কাহার বনিতা।
ব্রহ্মানন্দ বলে কেন জিজ্ঞাস বারতা॥

এখানে দেখা যায় যে, অভিনয়ের এই অংশে দানলীলার প্রভাব পড়িয়াছে। ইহার পরে—

হেনই সময়ে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা আদ্যাশক্তি বেশধর॥
আগে নিত্যানন্দ বুড়ী বড়াইর বেশে।
বঙ্ক বঙ্ক করি হাঁটে প্রেমরসে ভাসে॥

ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, বড়াইবুড়ী যেন সর্ব্ব অভিনয়ের অঙ্গস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বেশ দেখিয়া মহাপ্রভুকে প্রথমে কেহই চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু নিত্যানন্দ বড়াই বুড়ী সাজিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পশ্চাতে রমণীবেশে সজ্জিত মহাপ্রভুই যে আসিয়াছেন, ইহা সকলেই অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন। যথা—

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু প্রভুর বড়াই।
তার কাছে প্রভু আর কিছু চিহ্ন নাই।
অতএব সভেই চিনিলেন প্রভু এই।
বেশে কেহ লখিতে না পারে প্রভু সেই॥

এমন কি, শচী দেবীও প্রথমে মহাভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। যথা—

আজন্ম ভরিয়া প্রভু দেখয়ে যাহারা।
তথাপি লখিতে নারে তিলার্দ্ধেক তারা॥
অন্যের কি দায়, আই না পারে চিনিতে।
মূর্ত্তিভেদে লক্ষ্মী কিবা আইলা নাচিতে॥

এই নৃত্যে চৈতন্যদেব নানাপ্রকার ভাবের অভিব্যক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যথা—

হেন দড়াইতে কেহ নারে কোনজন।
কোন প্রকৃতির ভাবে নাচে নারায়ণ॥
কখন বোলয়ে 'বিপ্র! কৃষ্ণ কি আইলা।'
তখন বুঝিয়ে যেন বিদর্ভের বালা॥
* * * *
ক্ষণে বোলে চল বড়াই যাই বৃন্দাবনে।
গোকুল সুন্দরীভাব বুঝিয়ে তখনে॥
—ইত্যাদি।

এইরূপে মহাপ্রভু কখন রুক্মিণীর, কখন শ্রীরাধার, কখন চণ্ডীর, কখন মহা-যোগেশ্বরী ভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ শক্তি আছে।
সকল প্রকাশে প্রভু রুক্মিণীর কাছে॥

চৈতন্যদেবের নৃত্যের সময়ে ভক্তগণ সময়োচিত গীতি গান করিয়াছিলেন এবং নিত্যানন্দও তদনুরূপ বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। যথা—

জগত জননী ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময় উচিত গীত গায় অনুচর॥
* * * *
যখন যেরূপে গৌরচন্দ্র যে বিহরে।
সেই অনুরূপ রূপ নিত্যানন্দ ধরে॥

এইরূপ নৃত্যগীতে নিশি প্রভাত হইলে সকলেই বিষাদিত-চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা—

আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে।
হেনই সময়ে নিশি হইল অবসানে॥
নিশি পোহাইল সবে কাঁদে উভরায়।
কোটি পুত্র শোকেও এতেক দুঃখ নয়॥

এইভাবে রাত্রির প্রথম প্রহর হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত এই অভিনয় চলিয়াছিল। ইহাতে চৈতন্যদেবই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও অভিনয়ের প্রথমভাগে গদাধর রুক্মিণীর সাজে নৃত্য করিয়াছিলেন, তথাপি পুনরায় মহাপ্রভুর রুক্মিণীর আবেশেও অভিনয় করিবার বর্ণনা রহিয়াছে। অদ্বৈতপ্রভুও বাদ যান নাই। তিনিও ইচ্ছানুরূপ কাচ কাচিয়া নৃত্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা নাট্যশালার ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, ইংরেজগণের নাট্যশালার অনুকরণে বাঙ্গালা নাট্যশালা গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা বর্তমান যুগের কথা। এই সময়ে ইহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইহাই মাত্র বলা যাইতে পারে। নূতন আদর্শে নব প্রেরণায় ইহা নবতমরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে মাত্র। এইরূপ পরিবর্তন সকল দেশেই সংঘটিত হইয়াছে। রাণী এলিজাবেথের যুগের অভিনয়-রীতির সহিত বর্তমান ইংলণ্ডীয় নাট্যশালার পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যাত্রাজাতীয় অভিনয়ের ক্রমোন্নতিতেই বর্তমান নাট্যশালা শ্রেষ্ঠ পরিণতি লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশেও অতিপ্রাচীনকাল হইতে রামায়ণ ও মঙ্গলগান প্রভৃতির প্রচলন ছিল। সংস্কৃত নাটকের আদর্শে অভিনয় করিলে তাহা কিরূপ আকার ধারণ করে, তাহারই বর্ণনা চৈতন্যভাগবতে পাওয়া যাইতেছে। বোধহয় ইহাই বাঙ্গালার প্রাচীনতম অভিনয়ের নিদর্শন।

জীবনের পূজা

শ্রীপুষ্প দেবী

শুধায় আমার মন—
অন্তরযামী পৃথক পূজায় কিবা আর প্রয়োজন ?

যখন পিতার চরণে নমেছি ভকতি শ্রদ্ধা দিয়া
পিতার মাঝেতে তুমি পূজা নেছ মহেশের রূপ নিয়া
আপন-ভোলা সে সস্নেহ মুরতি দেবতা ছাড়া কি হয় ?
সার্থক হল পূজাটুকু মোর হৃদয় আমার কয়।

মায়ের চোখেতে দেখেছি যখন ঘনায় মমতা মায়া
তখন তুমিই দেখা দেছ মোরে ধরিয়া দেবীর কায়া
মায়েরে স্মরিয়া পূজেছি যখন মহামায়া দেছে দেখা
মায়ের আননে দেখেছি তোমার অভয় আশীষ রেখা।

প্রিয়তমে যবে পূজিতে গিয়াছি, দেখেছি হরষ ভরে—
তাঁহার মাঝেতে তোমার মুরতি অতুলন রূপ ধরে।
ক্ষমা স্নেহভরা উদার পরাণ কোনখানে ভেদ নাই,
প্রিয়ের সাথেতে নারায়ণ মোর মিশিয়াছে এক ঠাঁই।

সন্তানে যবে বক্ষে ধরিয়া হয়েছে ধন্য দেহ
শিশু নটরাজ রূপেতে সেথায় আলোকিছ মোর গেহ,
ব্যথিতেরে যবে দেছি সান্ত্বনা যতনে বক্ষে ধরে
তখন পেয়েছি হৃদয়ে তোমারে সব কালো আলো করে—

তাইত শুধায় মন
অন্তরযামী পৃথক পূজায় কিবা আর প্রয়োজন ?

বনফুল

২৮

শঙ্কর সকালে উঠিয়াই একখানি পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। উৎপল বিলাতে না কি কোন এক মেম সাহেবের প্রেমে পড়িয়াছে। পত্রখানি লিখিতেছেন উৎপলের একজন আত্মীয়। পত্রখানির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে অবশ্য শঙ্করের দেরি হইল না। কারণ যদিও পত্রখানির ভাষায় আত্মীয়-সুলভ চিন্তা ও ক্ষোভই প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু ভাষার অন্তরালে যে অন্তর্নিহিত খোঁচাটি অপ্রত্যক্ষ রহিয়াও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহা হৃদয়গ্রাহী নহে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ভাবটি এই—ভারি যে উহার শ্বশুর উহাকে বাহাদুরি করিয়া বিলাত পাঠাইয়াছিল, এইবার মজাটা বুঝুক! শঙ্কর ভাবিয়া দেখিল, গিয়া অবধি উৎপলও তাহাকে বিশেষ কোন চিঠিপত্র লেখে নাই। বিলাতে পৌঁছিয়াই সে একখানা দীর্ঘপত্র লিখিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার হৃদয়কাহিনী কিছু ছিল না, ছিল ভ্রমণ-কাহিনী। তাহার পর যে দুই-একখানা পত্র সে লিখিয়াছে তাহা নিতান্তই নিয়ম রক্ষা করিবার জন্ম, দুই-চারি ছত্রের মামুলি চিঠি। শঙ্কর নিজে যদি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিত তাহা হইলে হয় তো উৎপলের ঔদাসীন্যে ব্যথিত হইত; কিন্তু উৎপলের বিলাত যাওয়ার পর হইতে তাহার নিজেরই মানসিক জগতে যে বিপ্লব ঘটিতেছিল তাহাতে বাহিরের কোন কিছুতে বিচলিত হইবার তাহার উপায় ছিল না। মায়ের এতবড় শোচনীয় অসুখও তাহার হৃদয় স্পর্শ করে নাই। সে যাহা করিতেছিল কর্ত্তব্যের অনুরোধেই করিতেছিল, প্রাণের তাগিদে নহে। সহসা সুরমার কথা তাহার মনে পড়িল, সুরমার পূর্ব্বপত্রের উচ্ছ্বসিত প্রলাপের কিছু অর্থও তাহার যেন বোধগম্য হইল। উৎপলের আত্মীয়ের পত্রখানি ডেস্কের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিয়া শঙ্কর কলেজের পড়া করিতে বসিল। অনেক দিন বই ছোঁওয়া হয় নাই। রিণির বই পড়িতেই সে এতদিন ব্যস্ত ছিল, নিজের পড়া কিছুই হয় নাই। ক্লাসে বসিয়াও সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। অধ্যাপকের বক্তৃতা কানে প্রবেশ করে, কিন্তু মনে প্রবেশ করে না। ক্লাসে ভাল করিয়া মন দিয়া শুনিলে বাড়িতে পড়িবার ততটা দরকার হয় না, কিন্তু বিশেষ করিয়া ক্লাসেই সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। ক্লাসের জনতার মধ্যেই সে সেই নির্জ্জনতা পায়—যাহা তাহার পক্ষে এখন একান্তভাবে প্রয়োজন। ক্লাসের বাহিরে ভন্টু আছে, বেলা আছে, শৈল আছে, আরও কত অগণ্য প্রাণী আছে যাহাদের সংস্পর্শে না আসিলে চলে না, যাহাদের সংস্পর্শ অবাঞ্ছনীয়ও নয়, কিন্তু যাহাদের সংস্পর্শে আসিলে ধ্যান ভাঙিয়া যায়, মনের প্রত্যক্ষ লোক হইতে লজ্জিতা রিণি সরিয়া যায়। ক্লাসের এক কোণে বসিয়া মনের মধ্যে সে যে একাকীত্ব অনুভব করে, রিণিকে মনে মনে যেমন একান্তভাবে পায় এমন আর কোথাও সম্ভব হয় না। ক্লাসে তাই তাহার পড়া হয় না। অথচ এই মোটা মোটা বইগুলা পড়িতে হইবে তো!

শঙ্কর বাহিরে গিয়া চাকরকে আর এক পেয়ালা চা আনিতে বলিল এবং ঘটা করিয়া ফিজিক্সের একখানা বহি লইয়া পড়িতে বসিল। নিশ্চিন্ত হইয়া দুই-চারিদিন এইবার পড়িতে হইবে। বাবা একখানা বাড়ি দেখিতে বলিয়াছিলেন তাহা সে দেখিয়াছে, বাবাকে চিঠিও লিখিয়া দিয়াছে। তাঁহারা আসিবার পূর্ব্বে পড়াটাও কিছুদূর আগাইয়া রাখিতে হইবে, কারণ তাঁহারা আসিলে পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা আছে। রিণি তো আছেই। কিন্তু হায় রে, বই খুলিয়া পড়িতে বসিলেই যদি পড়া হইত তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। শঙ্কর খোলা বইটার উপর নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল বটে কিন্তু এক বর্ণও তাহার মাথার ভিতর ঢুকিল না। চাকরে চা দিয়া গেল, চা পান করিয়াও বিশেষ ফলোদয় হইল না। বরং কিছুক্ষণ পরে সে সহসা স্থির করিয়া ফেলিল যে, এমনভাবে বসিয়া শুধু সময় নষ্ট হইতেছে মাত্র, আর কিছুই হইতেছে না। ইহার অপেক্ষা

বরং রিণির কাছে যাওয়াই ভাল। তাহার মনে আর একটা কথা কয়েকদিন হইতে জাগিতেছে, সোনাদিদি মিষ্টি-দিদিকে আসল কথাটা খুলিয়া বলিলে ক্ষতি কি। এই মহিলা দুইজনের সহিত তরল হাস্য পরিহাসের ভিতর দিয়া তাহার এমন একটা অন্তরঙ্গতা হইয়াছে যে, ইঁহাদিগকে যেন মনের গোপন কথাটি বলা যায়। তবু কিন্তু সঙ্কোচ হয়! মনে হয় ভাষায় প্রকাশ করিলেই যেন ইহার পবিত্রতা ইহার মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু আর তো চাপিয়া রাখা যায় না। এমনভাবে লুকাইয়া কত দিন আর থাকা সম্ভব। তাহা ছাড়া মনের ভাব এমন করিয়া গোপন করিয়া ওখানে প্রত্যহ যাতায়াত করা শুধু যে কষ্টকর তাহা নয়, ভণ্ডামিও। তাহার তো কোন অসৎ উদ্দেশ্য নাই, সে রিণিকে বিবাহ করিতে চায়। তাহাকে ভালবাসিয়াছে বলিয়া পত্নীত্বে বরণ করিতে চায়। ইহাতে অগৌরবের বা অসম্মানের কিছুই নাই। প্রফেসার মিত্রকে সে কিন্তু নিজে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিবে না। রিণিকে কিছু বলা আরও অসম্ভব। সোনাদিদি অথবা মিষ্টিদিদিরই শরণাপন্ন হইতে হইবে। তাঁহারা ইহাতে যদি আপত্তিকর কিছু না দেখেন তাহা হইলে তাঁহারাই প্রফেসার মিত্রকে বলিবেন এবং রিণির মনোভাব জানিয়া লইবেন। রিণির মনোভাব শঙ্করের জানাই আছে। মুখে কেহ কাহাকেও কোন দিন কিছু বলে নাই সত্য, কিন্তু তথাপি তাহার মনের নিগূঢ় বার্ত্তাটি নিগূঢ় উপায়েই সে যেন জানিয়াছে। তাহার বিশ্বাস হইয়াছে এ সব বিষয়ে অন্তর্যামী মনের কখনও ভুল হয় না। শঙ্করের বাবা সনাতন-পন্থী লোক, তিনি হয় তো এ বিবাহে আপত্তি করিতে পারেন। শঙ্কর তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবে, তিনি যদি না বোঝেন, তাঁহার অমতেই বিবাহ করিবে সে। আজকাল কুল-গোত্র-গণ-কোষ্ঠি মিলাইয়া বিবাহের দিন চলিয়া গিয়াছে। পাত্রী-হিসাবে রিণি—শঙ্কর আর ভাবিতে চাহিল না। পাত্রী-হিসাবে রিণি অযোগ্য কি সুযোগ্য এ আলোচনা মনে মনে করিতেও শঙ্করের বাধিল। তাহার মনে হইল পাত্রীর বাজারে রিণিকে দাঁড় করাইয়া অন্যান্য পাত্রীর সহিত তুলনামূলক সমালোচনা করিলে রিণিকে অপমান করা হইবে। তাহাকে এমনভাবে মনে মনে খাটো করিবারই বা তাহার কি অধিকার আছে? জামা জুতা পরিয়া শঙ্কর দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল বটে, কিন্তু পথে আসিয়া তাহার গতি-বেগ পুনরায় মন্থর হইয়া আসিল। কেমন যেন সঙ্কোচ হইতে লাগিল। এখনই গিয়া এমনভাবে বলাটা কি ঠিক হইবে? প্রথমে কি বলিয়া কথাটা আরম্ভ করা যাইবে তাহাই তো পরম সমস্যা। এই সব ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইল।

হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল একটা রাস্তার মোড়ে একটা পাগলকে ঘিরিয়া বেশ ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। পাগল আমাদের পূর্ব্বপরিচিত মোস্তাক। শঙ্কর ইহাকে ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই, সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিল। অঙ্গে একটা ছেঁড়া কোট ছাড়া আর কিছু নাই। মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি, চক্ষু দুইটি লাল। নূতনত্বের মধ্যে খবরের কাগজের একটা শিরস্ত্রাণ বানাইয়া মাথায় পরিয়াছে এবং যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছে মিলিটারি কায়দায় সেলাম করিতেছে। একবার দুইবার নয়, 'রাইট য়্যাবাউট টার্ন' করিতে করিতে ক্রমাগত সেলাম করিয়া চলিয়াছে। জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া শঙ্করও কিছুক্ষণ মোস্তাকের পাগলামি উপভোগ করিল। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। এই উন্মাদটার সেলাম-প্রবণতায় তাহার কবিমনে অদ্ভুত একটা রূপকের আভাস জাগিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এই উন্মাদটা যেন সমস্ত বাঙ্গালী জাতির প্রতীক, কারণে অকারণে ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলকে সেলাম করিয়া চলিয়াছে। বেশীক্ষণ ভাল লাগিল না, আবার সে চলিতে সুরু করিল।

ও শঙ্করবাবু!

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল অপূর্ব্ববাবু, আরও কে একজন তাঁহার সহিত রহিয়াছেন—অপর দিকের ফুটপাত হইতে তাহাকে ডাকিতেছেন। শঙ্কর থামিতেই তাঁহারা রাস্তাটা পার হইয়া শঙ্কর যে ফুটপাথে ছিল তাহাতেই আসিয়া হাজির হইলেন।

নমস্কার, শঙ্করবাবু, আপনাকেই খুঁজছি আমরা।

বিনীতকণ্ঠে আনতচক্ষে কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া অপূর্ব্ববাবু শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিলেন। শঙ্কর দেখিল অপূর্ব্ববাবু ঠিক তেমনিই আছেন। সেই

কোঁচানো কাপড়, গিলেকরা পাঞ্জাবি, মুখে স্নো পাউডার। সেই নম্র-নত লীলায়িত হাবভাব। অপর ভদ্রলোকটিকে শঙ্কর আগে দেখে নাই। ভদ্রলোকটির চেহারা কেমন যেন শুষ্ক, রুক্ষ, উদভ্রান্ত। দেখিলে মনে হয় যেন রাত্রে ঘুম হয় নাই।

আমাকে খুঁজছেন? কেন বলুন তো?

মানে, ইনি হচ্ছেন বেলার দাদা, মিছিমিছি একটা রাগারাগি ক'রে সামান্য জিনিষ নিয়ে হঠাৎ এমন একটা, মানে মিটে গেলেই—অনর্থক একটা, বুঝতেই পারছেন—

অপূর্ব্ববাবু কোন কথাই সম্পূর্ণভাবে শেষ করিতে পারেন না। কিছুদূর বলিয়া চুপ করিয়া যান, যেন এত অধিক বাক্যব্যয় করিয়া তিনি অত্যন্ত একটা অন্যায়কার্য্য করিয়া ফেলিতেছেন, অথচ উপায় নাই।

প্রিয়বাবু সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, বেলা কোথায় আছে, জানেন আপনি?

শঙ্কর বলিল, এখন তো ঠিক জানি না। আমাদের কলেজের এক প্রফেসারের মেয়েকে গান শেখাবার ভার নিয়েছেন তিনি। সেই প্রফেসারেরই বন্ধুর একটা খালি বাড়ি আছে—তাতেই উঠে গেছেন পরশুদিন। ঠিকানাটা পরে এনে দিতে পারব আমি, এখন তো জানি না।

প্রিয়বাবু বলিলেন, আপনার প্রফেসারের ঠিকানাটা দিন না—আমরাই খুঁজে নিচ্ছি গিয়ে, আপনি আবার কষ্ট করবেন কেন?

বেশ।

প্রফেসার গুপ্তের ঠিকানাটা শঙ্কর বলিয়া দিল। উভয়েই শঙ্করকে অজস্র ধন্যবাদ দিলেন। অপূর্ব্ববাবুর উচ্ছ্বাসটা কিছু যেন অধিক বলিয়াই বোধ হইল; অসম্পূর্ণ বাক্যাবলী অসংলগ্নভাবে খানিকক্ষণ বলিয়া বিনীত নমস্কারান্তে অপূর্ব্ববাবু বিদায় লইলেন। প্রিয়বাবুও সঙ্গে গেলেন। শঙ্কর পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিল।

খানিকক্ষণ পরে সে যখন অবশেষে প্রফেসার মিত্রের বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল তখন এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। রিণি ও প্রফেসার মিত্র কলেজে চলিয়া গিয়াছেন। বাড়িতে সোনাদিদি ও মিষ্টিদিদি রহিয়াছেন। শঙ্করকে তাঁহারা এ সময়ে প্রত্যাশা করেন নাই, দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সোনাদিদি কোথায় যেন বাহির হইতেছিলেন, শঙ্কর আসাতে যাওয়া স্থগিত করিলেন ও সবিস্ময়ে বলিলেন, এমন সময়ে যে, মানে এমন অসময়ে যে! এ কি অঘটন!

মিষ্টিদিদি বলিলেন, ছুটি আছে বোধ হয়, নয়? বসুন।

শঙ্কর বলিল, না ছুটি নয়, এমনি এলাম!

সোনাদিদি কিছু না বলিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিলেন। শঙ্কর উপবেশন করিয়া বলিল—একটু চা খাওয়াতে পারেন?

নিশ্চয় পারি। কিন্তু এই অসময়ে চা কেন, ব্যাপার কি বলুন তো আজ?

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, ব্যাপার কিছু নয়, এমনি কিছু ভাল লাগছে না বলে এলাম এখানে। শরীরটাও ভাল নেই!

ডক্টর সেন বলছিলেন, কোলকাতাতেও না কি ম্যালেরিয়া হচ্ছে আজকাল, কুইনিন খাবেন? বলিয়া সোনাদিদি পুনরায় হাসিয়া বলিলেন, সত্যি বলছি ডক্টর সেন বলছিলেন সেদিন!

কুইনিন খাবার দরকার নেই, আপনি কথা বলে যান তাহলেই কাজ হবে, কি বলুন মিষ্টিদি?

উভয়েই এই কথায় হাসিয়া উঠিলেন। তাহার পর সোনাদির পানে কোপকটাক্ষে চাহিয়া মিষ্টিদিদি বলিলেন, কেমন জব্দ হয়েচিস তো এবার? থামুন, চায়ের কথাটা বলে দি। এক মিনিটের মধ্যে আসছি।

মিষ্টিদিদি বাহির হইয়া গেলেন। সোনাদিদি হাসিভরা চক্ষু দুইটি শঙ্করের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া পুনরায় বলিলেন, ব্যাপার কি বলুন তো সত্যি করে!

শঙ্কর বলিয়া ফেলিল, থাকতে পারলাম না!

থাকতে পারলেন না? তার মানে!

তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, আপনার না-থাকতে পারার প্রতীকার কি এ বাড়িতে আছে না কি?

তা কি আপনি জানেন না!

শঙ্কর গম্ভীরমুখে বাতায়ন-পথে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

সোনাদিদি বলিলেন, আপনার অজ্ঞাতসারে একটা কাজ ক'রে ফেলেছি কিন্তু। রাগ করবেন না তো?

কাজটা কি?

আপনার সেই কবিতাটা একটা কাগজে দিয়ে দিয়েছি। সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ ছিল, তাঁকে দেখালুম, তিনি এক রকম জোর করেই নিয়ে গেলেন।

কোন্ কাগজে?

তা এখন বলছি না, বেরুলে দেখবেন।

কোন্ কবিতাটা দিয়েছেন? আমি তো অনেকগুলো কবিতা দিয়েছিলাম আপনাকে।

সেই যে—যার গোড়ার লাইনটা হচ্ছে, 'রসনা নীরব মম চিত্ত মম নিত্য মুখরিত'—

ও!

শঙ্কর আবার গম্ভীর হইয়া পড়িল। মিষ্টিদিদি ফিরিয়া আসিলেন। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রসাধনের একটু-আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছেন দেখা গেল।

শঙ্করকে গম্ভীর দেখিয়া মিষ্টিদিদি বলিলেন, সোনা বুঝি আবার ঝগড়া করেছে আপনার সঙ্গে?

না।

শঙ্কর সস্মিত দৃষ্টি মিষ্টিদিদির দিকে ফিরাইল।

চায়ের কতদূর?

বলে দিয়েছি, এখুনি আসচে।

বলিতে বলিতেই চা আসিয়া পড়িল। সোনাদিদি উঠিয়া চা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। অলিখিত আইন অনুসারে সোনাদিদিই এসব কার্য্য সাধারণত করিয়া থাকেন।

সহসা শঙ্কর গাঢ়স্বরে বলিল, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা আজ একটা বলব বলে' এসেছি। আমার একটা শুধু অনুরোধ, হাসি-ঠাট্টা করে জিনিসটাকে হালকা করে ফেলবেন না। সেটা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হবে।

চা ঢালিতে ঢালিতে সোনাদিদি চকিতে একবার শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন এবং একটু ভ্রুকুঞ্চিত করিলেন।

মিষ্টিদিদি বলিলেন—সে কি, আপনার কাছে যেটা এত সিরিয়াস ব্যাপার তা আমরা হাসি-ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেব! ছি, ছি, এতটা খেলো লোক ভাবেন আপনি আমাদের!

শঙ্কর গাঢ়স্বরেই বলিল, খেলো লোক ভাবলে আসতাম না আপনাদের কাছে। আপনারা খেলো লোক নন বলেই অসঙ্কোচে এত বড় একটা কথা বলতে এসেছি।

সোনাদিদি নীরবেই এক কাপ চা শঙ্করের দিকে আগাইয়া দিলেন। মিষ্টিদিদির দিকে চাহিতেই মিষ্টিদিদি বলিলেন—দে, আমিও খাই একটু, আচ্ছা একটু কড়া হোক, পাতলা চা আমি খেতে পারি না বাপু।

সোনাদিদি নিজের জন্য এক কাপ ছাঁকিয়া লইলেন।

শঙ্কর নীরবে ধীরে ধীরে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগিল।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, কথাটা কি শুনিই না?

শঙ্কর আরও খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—রিণিকে আমি ভালবেসেছি, তাকে আমি বিয়ে করতে চাই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

সোনাদিদি সহসা উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। শঙ্কর সেদিকে একবার চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না। তাহার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছিল এবং শরীরের শিরা-উপশিরায় রক্তস্রোত উন্মাদবেগে বহিতেছিল।

মিষ্টিদিদি উঠিয়া নিজের জন্য এক কাপ চা ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, এ তো খুব আনন্দের কথা! আপনাকে আমরা নিজের আত্মীয়রূপে পাব—এর চেয়ে সুখের কথা আর কি হতে পারে! কিন্তু সকলের চেয়ে আগে রিণির মত নেওয়াটা দরকার নয় কি?

রিণির অমত হবে না।

জিগ্যেস করেছিলেন?

না, আমি জানি।

মিষ্টিদিদি শঙ্করের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর বলিলেন, তবু ফর্মালি জিগ্যেস করাটা একবার দরকার!

সে আপনি করবেন। প্রফেসার মিত্রকেও আপনি বলবেন—আমি পারব না, আমার ভারি লজ্জা করবে। আমার বাবা হয় তো আপত্তি করতে পারেন, যদি করেন তাঁর মতের বিরুদ্ধেই আমি বিয়ে করব।

সেটা কি ঠিক হবে?

বাবা হয় তো আপত্তি না-ও করতে পারেন। যাই হোক সে আমি বুঝবো—

শঙ্কর বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সহসা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল—মিষ্টিদিদি একাগ্রদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন।

এবার উঠি আমি, ক্লাস আছে, আসব কাল।

শঙ্কর হঠাৎ উঠিয়া আচমকা বাহির হইয়া পড়িল। বারান্দায় দেখিল অতিশয় গম্ভীর মুখে সোনাদি একপ্রান্তে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সমস্ত মুখ বিবর্ণ। শঙ্করের পদশব্দ শুনিয়া একবার তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন, এক নিমেষের জন্য তাঁহার চক্ষু দুইটি শঙ্করের উপর নিবদ্ধ হইল। তাহার পর ত্বরিতপদে তিনি পাশের ঘরটায় ঢুকিয়া পড়িলেন। শঙ্কর সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

শঙ্কর কলেজে যায় নাই, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতেছিল। ঘণ্টা দুই পরে সে যখন হস্টেলে ফিরিল তখন দেখিল মিষ্টি-দিদির চাকর একটি চিঠি লইয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। চাকরের উপর আদেশ ছিল শঙ্করবাবু ছাড়া অপর কাহাকেও যেন চিঠি দেওয়া না হয়। শঙ্কর তাড়াতাড়ি চিঠি খুলিয়া পড়িল।

শঙ্করবাবু,

আপনি এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন যে, একটা দরকারি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার অবসর পেলাম না। একটা গুজব রটেছে যে, বেলা মল্লিক নাকি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে আপনার আশ্রয়ে কোথায় আছে। বেলার দাদা বেলাকে খুঁজতে এসেছিলেন, অপূর্ব্ববাবু বললেন বেলা আপনার আশ্রয়ে আছে। রিনিও কথাটা শুনেছে। আসল ব্যাপারটা কি পত্রবাহক মারফৎ জানাবেন। কারণ এ বিষয় সবিশেষ না জানলে—বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা! আশা করি এটা সিরিয়াস্ কিছু নয়। সব কথা খুলে লিখবেন। ইতি মিষ্টিদিদি

বেলার সম্বন্ধে যাহা সত্য কথা তাহাই শঙ্কর সংক্ষেপে লিখিয়া জানাইয়া দিল এবং লিখিল যে, তিনি প্রফেসার মিত্র ও রিনিকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফলাফল যেন তাহাকে পত্রযোগেই অনুগ্রহ করিয়া জানান। তৎপূর্ব্বে সে ওখানে যাইবে না, অর্থাৎ যাইতে পারিবে না। মিষ্টিদিদির চাকর চলিয়া যাইবার পর হস্টেলের চাকর আসিয়া বলিল যে, বোস সাহেবের বাড়ি হইতে মাঈজি এই জিনিস ও চিঠি দিয়াছেন। শঙ্কর খুলিয়া দেখিল শৈলর চিঠি।

শঙ্করদা,

তোমার জন্যে চুপি চুপি একটা সোয়েটার বুনেছি। তুমি যেমন বলেছিলে নীল রঙের সঙ্গে সাদা রঙই দিয়েছি। বুনতে বড্ড দেরি হয়ে গেল, শীত তো প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। গায়ে ঠিক হয়েছে কি-না জানিও। তুমি একদিন এসো না সময় ক'রে। একবারও তো এদিকে মাড়াও না। কেমন আছো? ইতি শৈল

শঙ্কর প্যাকেট খুলিয়া সোয়েটারটা বাহির করিল। বেশ বুনিয়াছে তো! গায়ে দিয়া দেখিল, ঠিক ফিট করে নাই। বগলের কাছটা আঁট, গলাটা ঢিলা। তবু কিছুক্ষণ শঙ্কর সেটা পরিয়া রহিল। সহসা তাহার মনে একখানি মুখ ভাসিয়া আসিল—একমাথা কোঁকড়ান চুল, দুষ্টামি-ভরা হাসি-হাসি মুখখানি। সেই কতকাল আগেকার কিশোরী শৈল!

২৯

সমস্ত দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর আপিস হইতে ফিরিয়া ভন্টু যাহা শুনিল তাহাতে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল। অনেক কষ্টে অনেক রকম ফিকির-ধান্দা করিয়া কোনক্রমে সে সংসারটিকে চালাইতেছে তাহার উপর যদি এই সব কাণ্ড ঘটিতে থাকে তাহা হইলে তো সে নাচার। নানারূপ ফন্দী করিয়া সে কিছু টাকা জোগাড় করিয়াছিল এবং সমস্ত মাসের চাল ডাল নুন তৈল মশলা প্রভৃতি কিনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। কিন্তু আজ বাসায় ফিরিয়া সে শুনিয়েছে, শনটু ও ফনতি নাকি ভাঁড়ার ঘরে লুকোচুরি খেলিতে গিয়া সমস্ত তেলের ভাঁড়টি উলটাইয়া ফেলিয়া দিয়াছে। লুকোচুরি খেলিতে গিয়া! ভন্টুর সমস্ত মুখখানা ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল।

বউদিদিকে প্রশ্ন করিল, তুমি ওদের ভাঁড়ার ঘরে যেতে দিয়েছিলে কেন?

বউদিদি তরকারি কুটিতেছিলেন। বঁটি হইতে দৃষ্টি না তুলিয়াই বলিলেন, আমি কি করব? আমার কথা শোনে নাকি ওরা কেউ? তুমি বাড়ি থেকে যেই বেরুবে আর অমনি সমস্ত বাড়ি মাথায় করে দাপাদাপি করবে ওরা। আমি কি করব বল?

ভন্টু কিছু না বলিয়া শনটু ও ফনতিকে একটা ঘরের

মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া ঘরে খিল দিল। তাহার পর আলমারির মাথা হইতে বেতটা পাড়িয়া মার সুরু করিল। চোরের শাস্তি! দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মাদের মতো ভনুটু বেত চালাইতে লাগিল। তাহার যেন খুন চাপিয়া গিয়াছে। শনুটু ও ফনতির আর্ত্ত হাহাকারে সমস্ত বাসাটা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বাকী শিশুগুলি ভয়ে শুষ্ক মুখে নীরবে এককোণে বসিয়া কাঁপিতেছিল, কারণ তাহারাও অপরাধী, তাহারাও লুকোচুরি খেলিয়াছিল। বউদিদি নীরবে নির্ব্বিকারভাবে তরকারি কুটিয়া যাইতে লাগিলেন। বাকু কানে কিছুই শুনিতে পান না সুতরাং তিনিও নির্ব্বিকারভাবে তাম্রকূট-চর্চ্চায় মগ্ন রহিলেন। ভনুটু আজ যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। মারিতে মারিতে বেতটা ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল, তবু তাহার রাগ কমিতেছে না। কতক্ষণ এভাবে চলিত বলা যায় না এমন সময় শঙ্কর আসিয়া প্রবেশ করিল। দরজা খোলাই ছিল। শঙ্কর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মিষ্টিদিদির নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া উদভ্রান্ত চিত্তে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতেছিল। হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল ভনুটুকে লইয়া সেই জ্যোতিষীর বাড়ি গেলে হয়। ধার করিয়া কিছু টাকা জোগাড় করিয়া তাই সে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কুষ্ঠীর ছক তো ভনুটুর কাছেই আছে। কিন্তু বাড়ি ঢুকিয়াই এই নিদারুণ কোলাহল শুনিয়া সে দ্বারের নিকটেই থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এ কি কাণ্ড!

শঙ্করকে দেখিয়া বউদিদি উঠিয়া পড়িলেন—প্রতীকারের যেন একটা উপায় দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি শঙ্করের কাছে গিয়া চাপা-কণ্ঠে বলিলেন, ঠাকুরপো বড্ড রেগে গেছে, তুমি যদি পারো একটু সামলাও ওকে! আমি বললে কিছু হবে না, বরং উল্টো আরও রেগে যাবে। সেইজন্যে আমি কখনো কিছু বলি না।

শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বউদিদি পুনরায় বলিলেন, তুমি একটু ডাক ওকে শঙ্কর ঠাকুরপো, অনেকক্ষণ ধরে বড্ড মারছে, আহা মরে গেল ওরা।

বৌদিদির কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া বন্ধ দরজায় করাঘাত করিতে লাগিল। ভনুটু, এই ভনুটু; কপাট খোল্—করচিস্ কি তুই?

শঙ্করের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভনুটুর যেন চৈতন্য হইল, সে বেতটা ফেলিয়া দিয়া কপাট খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, চল্, বাইরে চল্! থাম্ টিনচার আইওডিনটা লাগিয়ে দিয়ে আসি আগে।

কিসে টিনচার আইওডিন্ লাগাবি?

কেটে গেছে, ওই নিয়ে পরে আবার আমাকেই ভুগতে হবে।

ভনুটু টিনচার আইওডিন লাগাইয়া বাহির হইয়া আসিল।

চল্, বাইরে চল্।

বাহিরে আসিয়া শঙ্কর বলিল, ব্যাপার কি বল্ তো? হঠাৎ ক্ষেপে গেলি কেন?

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভনুটু উত্তর দিল, শরীরে রক্তমাংস আছে বলে!

রক্তমাংস আছে বলে তুই খুন করবি?

ভনুটু উত্তর দিল না। অন্ধকার গলিটা উভয়ে নীরবেই পার হইল। বড় রাস্তায় পড়িয়া শঙ্কর দেখিল ভনুটু দুইহাতে চোখ কচলাইতেছে এবং চোখ দিয়া অবিরল ধারে জল পড়িতেছে।

কি হল?

পোকা না কি একটা পড়েছে মনে হচ্ছে!

রাস্তার একটা কলে তখনও জল ছিল এবং কলের মুখ হইতে জল পড়িতেছিল। ভনুটু সেখানে গিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুখ ধুইয়া ফেলিল। পকেট হইতে মলিন রুমালটি বাহির করিয়া মুখ মুছিয়া সে বলিল, পয়সা আছে সঙ্গে?

আছে কিছু, কেন বল্ দেখি?

সহাস্যে ভনুটু বলিল, ভয়ানক খিদে পেয়েছে। চল্ একটা চায়ের দোকানে ঢোকা যাক।

চল্।

কাছে-পিঠে মনোমত চায়ের দোকান দেখা গেল না। উভয়ে পুনরায় হাঁটিতে লাগিল। হাঁটিতে হাঁটিতে ভনুটু বলিল, উঃ পেটের ভেতর যেন একটা শেয়াল ঢুকেছে, নাড়ি ভুঁড়িগুলো ছিঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে!

শঙ্কর কিছু বলিল না। সে ভাবিতেছিল এ অবস্থায় ভনুটুকে লইয়া জ্যোতিষের বাড়ি যাওয়া ঠিক হইবে কি-না।

রিনির কথাটা এখন ভন্টুকে বলা কি উচিত? তাছাড়া—শঙ্করের চিন্তাস্রোত ব্যাহত হইল। একটা ভাল চায়ের দোকান চোখে পড়িতেই ভন্টু বলিল, চল্, জেক্লিশ্ ম্যাফেয়ারে ঢোকা যাক।

খাইতে খাইতে শঙ্কর প্রশ্ন করিল, তোর কাণা করালির ঠিকানাটা কি রে?

কেন?

যাব সেখানে, একটু প্রাইভেট দরকার আছে।

চল্, আমিও যাচ্ছি।

আমাকে একা যেতে দে আজ—পরে সব বলব তোকে।

মটন চপটা বাগাইতে বাগাইতে ভন্টু সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল।

—পরে সব বলব তোকে—আজ আমাকে একা যেতে দে ভাই।

ভন্টু চপে একটা কামড় বসাইয়াছিল, উত্তর দিল না। মাংসটা গলাধঃকরণ করিয়া বলিল, দেখিস গাড্ডায় পড়িস না যেন, করালি সোজা লোক নয়!

শঙ্কর বলিল, সে আমি ঠিক করে নেব তাকে। আমার ছকটা কোথা?

আমার পকেটেই ডায়েরিতে টোকা আছে। আগে তুই খেয়ে নে না, সব দিচ্ছি আমি।

উভয়ে আহার করিতে লাগিল।

৩০

দ্বারে পদশব্দ শুনিয়া করালিচরণ তাড়াতাড়ি বাক্সটি লুকাইয়া ফেলিলেন ও হাতের আয়নাটি টেবিলের উপর উপুড় করিয়া রাখিয়া বলিলেন, কে?

আমি শঙ্কর, কপাটটা খুলুন একবার।

বাই নারায়ণ!

অস্ফুটস্বরে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া করালিচরণ উঠিয়া কপাট খুলিয়া দিলেন।

কি চান্ আপনি?

ভন্টুর উপদেশ অনুযায়ী শঙ্কর হেঁট হইয়া প্রণাম করিল ও বলিল, কুষ্ঠি গণনা করাতে এসেছি।

এখন হবে না।

ভন্টুর কাছ থেকে আসছি আমি। ভন্টু এই টাকা দশটা আর ছকটা দিতে বললে আপনাকে।

ভন্টুবাবু পাঠিয়েছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অসময়ে যত বখেড়া ভন্টুবাবুর!

সহসা করালিচরণের চক্ষুটি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

আমি কি ভন্টুবাবুর চাকর! টাকা দশটা পাঠিয়ে দিয়ে তিনি কি আমার মাথাটা কিনে ফেলবেন ভেবেছেন না কি?

ভন্টুর নির্দেশ অনুযায়ীই শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল ও সবিস্ময়ে এই একচক্ষু জ্যোতিষীর কাণ্ডকারখানা দেখিতে লাগিল। বোতলের মুখে-গোঁজা মোমবাতি জ্বলিতেছে, কাছে আর একটা মদের বোতল, ফাটা একটা গ্লাস, চতুর্দ্দিকে এলোমেলো স্তূপীকৃত একগাদা বই।

করালিচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ছকটা দেখিতেছিলেন।

কার কুষ্ঠি এটা?

আমার।

বেশ, কাল আসবেন।

শঙ্কর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বড় উদ্বেগের মধ্যে আছি, একটা কথা যদি শুধু বলে দিতেন তা হলে বড় উপকার হ'ত আমার!

ঘোড়াটা কি বাইরে বেঁধে রেখে এসেছেন? বাই-নারায়ণ! এসব কি তাড়াতাড়ির জিনিস? কি জানতে চান আপনি! একসঙ্গে হবে—

আমার বিয়ের ব্যাপারটা জানতে চাই খালি, কবে হবে আর কি রকম স্ত্রী হবে?

বাই নারায়ণ!

করালিচরণের চক্ষুটিতে বিদ্রূপ-করুণা-মিশ্রিত অদ্ভুত একটা চাপা হাসি ফুটিয়া উঠিল। আর একবার ছকটার পানে চাহিয়া বলিলেন, আচ্ছা ঘুরে আসুন তা হলে।

কতক্ষণ পরে আসব?

ঘণ্টা দুই পরে। এখন কটা বেজেছে?

আটটা।

দশটা নাগাদ আসবেন। দশটার বেশী দেরি করবেন না যেন—দশটার পর আমি বেরিয়ে যাব।

আচ্ছা।

নমস্কার করিয়া শঙ্কর বাহির হইয়া গেল।

করালিচরণ খানিকটা মদ্যপান করিয়া মুখবিকৃতি সহকারে স্বগতোক্তি করিলেন, বাই নারায়ণ! এ সব কাণ্ট্রি-ফাণ্ট্রি কি আমার পোষায়! ভন্টুবাবুর ধাপ্পায় পড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি আমার।

মুখটা মুছিয়া খানিকক্ষণ তিনি মোমবাতির শিখাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর সেই লুকানো ছোট বাক্সটি বাহির করিয়া আগ্রহভরে সেটি খুলিয়া চ্যাপ্‌টা সাদা গোছের কি একটা বাহির করিয়া অতিশয় কৌতূহল ভরে সেটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিয়া টেবিলের উপর হইতে উপুড়-করা আয়নাটা তুলিয়া লইয়া সন্তর্পণে সেই চ্যাপ্‌টা বস্তুটি চক্ষুহীন অক্ষিকোটরের ভিতর বসাইয়া দিয়া বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া দর্পণের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পাথরের চোখ! নিতান্ত মন্দ দেখাইতেছে না তো! স্পন্দিতবক্ষে করালিচরণ অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আয়নাটার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পাশের বাড়ির ঘড়িতে টং করিয়া শব্দ হইল—সাড়ে আটটা বাজিল বোধ হয়। করালিচরণ চক্ষুটি খুলিয়া রাখিয়া শঙ্করের ছকে মনোনিবেশ করিলেন।

শঙ্কর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তর যদিও একই চিন্তায় পরিপূর্ণ ছিল, জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে সে যদিও রিনির কথাই ভাবিতেছিল, কিন্তু পরিপূর্ণ নদীস্রোতে ভাসিয়া-আসা একটা ফুল যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে, নদীকে কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া ছোট ফুলটাকেই আমরা যেমন লক্ষ্য করি আজিকার সন্ধ্যায় ভন্টুর বাড়ির ব্যাপারটাও তেমনি শঙ্করের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতেছিল। বউদিদির আর্ত্ত অসহায় মুখচ্ছবিটা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। এখনও যেন তাহার কানে বউদিদির করুণ কথাগুলি বাজিতেছে, আহা মরে গেল ওরা! ভন্টুটা সময়ে সময়ে এমন নিষ্ঠুরও হইতে পারে। অথচ সে বেচারারই বা দোষ কি! এমন অবস্থায় কাহার না রাগ হয়। কতদিক সামলাইবে সে! সমস্ত মাসের খরচ এক ভাঁড় তেল পড়িয়া নষ্ট হইয়া গেলে রাগ হয় বই কি। এই তো সে এখনই আবার হন্তে কুকুরের মত টাকা ধার করিতে ছুটিল—দাদাকে টাকা পাঠাইতে হইবে—বাবাকে বালাপোষ করাইয়া দিতে হইবে। বাকুর জামা আছে, র‍্যাপার আছে, সোয়েটার আছে, কান ঢাকা টুপি আছে, মোজা আছে, তথাপি বালাপোষ দরকার। শীতটা ফুরাইয়া যাইবার পূর্ব্বেই বালাপোষটা করাইয়া দেওয়া চাই, তাহা না হইলে বউদিদিরই মুস্কিল, বাক্যবাণ তাঁহাকেই সহ্য করিতে হইবে! অথচ ভন্টুর কতই বা আয়! ধার করিয়া চলিতেছে। সেই চায়ের দোকানদার ভদ্রলোকের সহিত আলাপ জমাইয়াছে, উদ্দেশ্য যদি কিছু সেখান হইতে হস্তগত করিতে পারে।···সহসা শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল। মনিব্যাগটা খুলিয়া দেখিল গোটা দশেক টাকা এখনও আছে। এক মাসে কত তেল খরচ হয়? কিছুই তো জানে না সে। পৃথিবী হইতে কোন্ নক্ষত্রের দূরত্ব কত 'লাইট ইয়ার' তাহা সে হয় তো নির্ভুল বলিতে পারিবে কিন্তু একটা সাধারণ সংসারে মাসে কত চাল-ডাল-নুন-তেল লাগে এ সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণাই নাই। কিছুদূর হাঁটিয়া সে একটা মুদির দোকান পাইল। সেখানে গিয়া উপবিষ্ট দোকানদারটিকে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা সের পাঁচেক সর্ষের তেলে একটা সংসারের একমাসের চলা উচিত, কি বলেন?

মুদি যুক্তিযুক্ত উত্তরই দিল, সে সংসার বুঝে, রাবণের সংসারে পাঁচ সের তেলে কি হবে!

রাবণের সংসার নয়, ছোটখাটো সাধারণ সংসার, দু-তিন জন বড়-সড় লোক, চার-পাঁচটি ছেলেপিলে। পাঁচ সেরে হবে না?

ভেসে যাবে!

দিন্ তা হলে পাঁচসের তেল আমাকে। আর একটা পাত্রও আপনাকেই দিতে হবে, একটা টিন-ফিন হলেই ভাল হয়।

দিচ্ছি সব ঠিক করে, বসুন আপনি, ওরে মোড়াটা এগিয়ে দে। আর মহেশের দোকান থেকে পাঁচসেরী একটা টিন আন্ গে চট করে—

দোকানের বালক-ভৃত্যটি মোড়া আগাইয়া দিয়া টিন আনিতে চলিয়া গেল এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই টিন আনিয়া হাজির করিল।

মুদি টিনটি ওজন করিয়া তাহার পর তেল মাপিতে বসিল।

ভাল তেল তো ? একটু ভাল দেখে দেবেন দয়া করে।

মুদি ওজন-দাঁড়ির পাল্লার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে রাখিতে সহাস্তে উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল জিনিস দেব বই কি। খাঁটি ঘানির তেল। নসীরামের দোকানে চালাকিটি চলবার জো নেই। খেয়ে অপছন্দ হয় নগদমূল্য ফেরত দিয়ে দেব

ওজন সমাপ্ত করিয়া পাঁচসেরের উপর আরও এক পলা ফাউ দিয়া টিনের মুখটি মুদি বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দিল এবং শঙ্করের প্রদত্ত মূল্য বেশ করিয়া বাজাইয়া নিরীক্ষণ করিয়া কাঠের বাক্সের ছিদ্রমুখে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

শঙ্কর মুদির কার্য্যতৎপরতায় খুশী হইয়াছিল।

জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নামই কি নসীরাম ?

আজ্ঞে না, আমার ঠাকুরের নাম নসীরাম, অধীনের নাম কেবলরাম।

আচ্ছা, চলি তা হলে, নমস্কার।

কেবলরাম সবিনয়ে প্রতি-নমস্কার করিল।

তেলের টিন লইয়া শঙ্কর একটি রিক্‌শ করিল। রাস্তায় একটা ঘড়িতে দেখিল পৌনে ন'টা বাজিয়াছে। রিক্‌শ এবং ট্রামের সহায়তায় সে অনায়াসে ভন্টুদের বাড়িতে তেলটা দিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবে। ভন্টু এখন বাড়িতে নাই সে জানে সুতরাং বেশি দেরি হইবে না।

ভন্টুদের বাড়ির সামনে রিকশা হইতে নামিয়া শঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেমন যেন সঙ্কোচ হইতে লাগিল। কিন্তু এতদূর যখন আসিয়াছে ফেরা যায় না, কড়া নাড়িতে হইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কপাট খুলিয়া গেল।

আচ্ছা ঠাকুরপো, আপিস থেকে এসে না খেয়েই—

বউদিদি শঙ্করকে দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

বন্ধুটি কোথায় ?

সে এক জায়গায় গেছে, এই তেলটা কিনে দিয়ে আমাকে পৌঁছে দিতে বললে। এই নিন।

তেলের টিনটা সে নামাইয়া দিল।

পৌঁছে দিতে বললে ?

হ্যাঁ।

বউদিদির মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। একটু থামিয়া বলিলেন, আপিস থেকে এসে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত মুখে দেয় নি। আমাকে এমন শাস্তি দেওয়া কেন!

শঙ্কর নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন, এস ভেতরে এস।

না, এখন আর বসব না, দরকারি কাজ আছে একটু আমার।

শঙ্কর আর দাঁড়াইল না। বউদিদির মুখের দিকেও আর চাহিতে পারিল না। মুখটা ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি রাস্তায় নামিয়া পড়িল। রাস্তা হইতে সে শুনিতে পাইল বাকু দরাজ গলায় আদেশ করিতেছেন—বৌমা, চায়ের জল চড়াও—

করালিচরণের গলিতে শঙ্কর আসিয়া যখন প্রবেশ করিল তখন পৌনে দশটা। শীতকালের রাত্রি। গলিটা নির্জ্জন হইয়া পড়িয়াছে। গলির মোড়ের পানের দোকানটা এখনও কেবল খোলা আছে। শঙ্কর কপাটে আঘাত করিতেই করালিচরণ বলিলেন, ভেতরে আসুন, কপাট খোলাই আছে।

কপাট ঠেলিয়া শঙ্কর ভিতরে প্রবেশ করিল। এক চক্ষুর দৃষ্টি শঙ্করের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া করালিচরণ বলিলেন, আপনার বিয়ের এখন ঢের দেরি। বছর দেড়েকের আগে তো হতেই পারে না।

শঙ্করের পায়ের তলার মাটি সহসা যেন সরিয়া গেল। তথাপি সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং স্থির কণ্ঠেই পুনরায় প্রশ্ন করিল, আমার স্ত্রী কি রকম হবে একটা আইডিয়া দিতে পারেন ?

নিশ্চয় পারি। শ্যামবর্ণা, নাতি দীর্ঘাঙ্গী—

লেখাপড়া কিছু জানবে কি ?

বাই নারায়ণ, ওটা তো দেখি নি! দেখি দাঁড়ান—বসুন আপনি।

করালি আবার ঝুঁকিয়া পুঁথিপত্র উল্টাইতে লাগিলেন। শঙ্কর চৌকির একপাশে বসিল। কয়েক মিনিট পরে করালিচরণ বলিলেন, লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানবে বলে তো মনে হচ্ছে না। তবে মেয়েটি লক্ষ্মী হবে।

লেখাপড়া কিছু জানবে না ?

কই, সে রকম তো মনে হচ্ছে না কিছু।

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। লোকটার সম্বন্ধে তাহার ধারণাই সহসা বদলাইয়া গেল। মনে মনে 'বোগাস' কথাটা উচ্চারণ করিয়া মুখে সে বলিল, আচ্ছা, উঠি এখন তবে আমি—নমস্কার।

দ্রুতপদে সে বাহির হইয়া গেল।

তাহার প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া করালিচরণ স্বগতোক্তি করিলেন, ছোকরার বউ পছন্দ হল না। বাই নারায়ণ, জোটেও ভন্‌টুবাবুর কাছে সব!

করালিচরণ উঠিতে যাইবেন এমন সময়ে দ্বারপ্রান্তে একটি রমণীমূর্ত্তি আসিয়া দর্শন দিল। কালো কুচকুচে রঙ, বয়স কত তাহা বলা অসম্ভব, গালের হাড় উঁচু হইয়া রহিয়াছে, খোঁপায় ফুল গোঁজা, চোখে কাজল, দাঁতে মিশি। মোড়ের সেই পানওয়ালি!

হাসিয়া বলিল, ও গণকঠাকুর, হারিয়েছে তোমার কিছু?

করালিচরণ রোষদীপ্ত চক্ষে নারীটির পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। ফের্ আসিয়াছে!

ফের্ তুই এসেছিস এখানে? মানা করে দিয়েছি না তোকে?

বাবা রে বাবা! এক চোখেই যেন আগুন ছুটছে। এসেছি কি নিজের গরজে না কি? দশ টাকার নোটটা তখন সিগারেট কিনতে গিয়ে ফেলে এসেছিলে আমার দোকানে, তাই দিতেই এসেছি। ভালর কাল নেই। এই নাও।

করালিচরণের চোখের দৃষ্টি আরও প্রখর হইয়া উঠিল।

দুর হ তুই—চাই না নোট—দুর হ তুই!

পানওয়ালি নোটটা মেজের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। মনে হইল খুব রাগ করিয়াই যাইতেছে, কিন্তু পিছু ফিরিয়া হঠাৎ একটু মুচকি হাসিয়া গেল।

করালিচরণ গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ক্রমশঃ

মৃতবৎসা

শ্রীনীলরতন দাস, বি, এ

একদা কৃষ্ণা গোতমী দীনা হারায়ে পুত্রধনে
চারিদিকে ধায় পাগলিনী প্রায় ঔষধ অন্বেষণে;
পথে দেখে যারে কহে সে তাহারে—'ঔষধ কর দান
শক্তি যাহার বাঁচাবে আমার মৃত পুত্রের প্রাণ।'
অভাগিনী নারী দিশি দিশি ফিরি হতাশ হইল যবে,
বুদ্ধচরণ করিতে শরণ কহিল তাহারে সবে।
শোকাতুরা নারী চলে তাড়াতাড়ি আশায় বাঁধিয়া মন,
শোকের কারণ করিয়া শ্রবণ তথাগত তারে ক'ন,—
'যে গৃহে কখনো মরে নাই কোনো পুরুষ অথবা নারী
সেথা হ'তে এনে সর্ষপ দিলে পুত্রে বাঁচাতে পারি।'

শুনিয়া বচন হরষিত মন ধাইল রমণী গ্রামে,
প্রতি গৃহে যায় সর্ষপ চায় প্রভু বুদ্ধের নামে।
হাহাকার করে দ্বারে দ্বারে ফিরে, মিলে না এমন গেহ—
যেথায় মৃত্যু-পথের যাত্রী হয় নাই কভু কেহ।
কেহ কহে,'আমি হারায়েছি স্বামী অভাগিনীঅতি দীনা
জননীর স্নেহ বঞ্চিত কেহ, কেহ বা পুত্রহীনা।
গৌতমী ভাবে নহে এই ভবে সে-ই শুধু অভাজন,
নিঠুর মরণ করেছে হরণ সবাকার প্রিয়জন।
সম্বরি শোক লভিল আলোক পাগলিনী গৌতমী,—
লইল শরণ দুঃখহরণ বুদ্ধচরণে নমি।

রামায়ণ ও কৃত্তিবাস

সোহ্‌রাব আলী খান্‌ চৌধুরী

রামায়ণ পাঠে উচ্ছ্বসিত হইয়া জনৈক য়ুরোপীয় মনীষী লিখিয়াছেন: "য়ুরোপে যে-কাজ বাইবেল্‌, সংবাদ-পত্র ও সাধারণ পুস্তকাগার—এই তিনের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহা বঙ্গদেশে কেবল রামায়ণ ও মহাভারত দ্বারা সম্পন্ন হয়!"

আমরা জানি, রামায়ণ-উপাখ্যান মহর্ষি বাল্মীকি কর্তৃক পরিকল্পিত এবং বৈদর্ভ রীতিতে, অনুষ্টুভ্‌ ছন্দে, সাত কাণ্ডে এবং প্রায় ২৪,০০০ শ্লোকে তৎকর্তৃক বিরচিত; কিন্তু স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "The Bengali Ramayans" নামক কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত যে-পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাল্মীকির পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে রামায়ণ-উপাখ্যান প্রচলিত ছিল। রামায়ণ-গাথা উত্তর-ভারতে যে-আকারে প্রচলিত ছিল, তাহাতে রাবণের উল্লেখ ছিল না; কিন্তু দাক্ষিণাত্যের বহু গাথায় দ্রাবীড়-রাজ রাবণ নায়করূপে পরিকীর্ত্তিত ছিলেন। বাল্মীকির পূর্ব্বেই সম্ভবত উত্তর-ভারতের রাম-গীতি এবং দক্ষিণ-ভারতের রাবণ-গাথা একত্রিত হয় এবং বাল্মীকির অপূর্ব্ব প্রতিভা ইহার উপর রামায়ণ-রূপ মহাসৌধ রচনা করে।

বাল্মীকি-কৃত রামায়ণের তিন পাঠ বা সংস্করণ (Recension) ভারতবর্ষে প্রচলিত: গৌড়ীয় বা বঙ্গদেশীয়; কাশী বা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয়; সৌরাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্রীয় বা বোম্বাই প্রদেশীয়। বোম্বাই প্রদেশীয় সংস্করণই সর্ব্বপ্রাচীন। প্রায় ৮০০০ শ্লোকে এই তিন সংস্করণে অনৈক্য বিদ্যমান। বহু ভাষাবিদ্‌ গ্রীয়ারসনের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, সম্প্রতি জাভা এবং কাশ্মীরেও রামায়ণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, রামায়ণের দুইখানি সংক্ষিপ্ত সার ক্ষেমেন্দ্র ও ভোজরাজ কর্তৃক ১১শ শতাব্দীতে "রামায়ণ-মঞ্জরী" ও "রামায়ণ-চম্পূ" নামে, কাশী-পাঠ ও বোম্বাই-পাঠ অনুসারে সঙ্কলিত হইয়াছে।

রামায়ণের বহু টীকা বিদ্যমান; তন্মধ্যে রামায়ণ কতকই, রাম বর্ম্মণের তিলক টীকা, গোবিন্দ রাজের শৃঙ্গার তিলক টীকা, মহেশ্বর তীর্থ, বরদরাজ মৈথিল ও নাগেশ ভট্টের রামায়ণের টীকা এবং ত্র্যম্বকযজ্বন্‌-এর ধর্ম্মকূট, রামানন্দ তীর্থের রামায়ণ কূট প্রভৃতি টীকা-গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যে রামায়ণ কতকই নামক টীকাখানি সর্ব্বপ্রাচীন।

বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ যে-প্রাচীন আর্য্য-ভাষায় রচিত হইয়াছে, সে-ভাষার ব্যাকরণ পাণিনি-পূর্ব্ব বহু পণ্ডিত রচনা করিয়া গিয়াছেন, যথা: কশ্যপ, আপিশলি, গার্গ্য, গালব, চাক্রবর্ম্মন্‌, ভারদ্বাজ, শাকটায়ন, শাকল্য, সেনক, স্ফোটায়ন প্রভৃতি; কিন্তু ইঁহাদের প্রণীত ব্যাকরণ একণে লুপ্ত হইয়াছে। পাণিনি "অষ্টাধ্যায়ী সূত্র" নামক ৮ অধ্যায়, প্রতি অধ্যায়ে ৪টি করিয়া পাদ এবং সর্ব্বশুদ্ধ ৩৯৯৬টি সূত্রযুক্ত যে-ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রাচীন ভাষার ব্যাকরণের পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের বহু প্রয়োগ পাণিনি ব্যাকরণ-সিদ্ধ নহে দেখিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে, আর্য্য ঋষিগণ বিশুদ্ধ সংস্কৃত হইতে কথঞ্চিৎ পৃথক একটি কথিত ভাষাও ব্যবহার করিতেন, পরবর্ত্তী যুগে ঐ ভাষা আর্ষ প্রয়োগ নামে অভিহিত হইত। রামায়ণ,মহাভারত ও পুরাণ সম্ভবত এই ভাষায় রচিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে প্রচলিত তিন সংস্করণ বাল্মীকি-রামায়ণের মধ্যেও বহু অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু এ-সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে তাহার আলোচনার স্থান নাই—দুই-একটি উদাহরণ মাত্র উল্লিখিত হইল: শচীগর্ভজাত ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত রামের বনবাসকালে কাকরূপ ধারণ করিয়া সীতার প্রতি উপদ্রব করেন—এই ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া কাশী-সংস্করণ রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডে একটি পৃথক্‌ সর্গ রচিত হইয়াছে, অন্য কোনও সংস্করণে ইহার উল্লেখ নাই। অশোক-বনে বন্দিনী সীতাকে ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র আসিয়া অমৃত খাওয়াইয়া যান—কাশী-সংস্করণে ইহা সম্পর্কেও একটি পৃথক্‌ সর্গ আছে। রাম-লক্ষ্মণ শেলাঘাতে অচৈতন্য হইলে হনুমানের ঔষধি আনয়ন-পথে কালনেমি-সংবাদ, নন্দীগ্রামে ভরতের সহিত সাক্ষাৎ প্রভৃতি যে-সকল ঘটনা গৌড়-সংস্করণে দৃষ্ট হয়, অন্য-কোনও সংস্করণে তাহা দৃষ্ট হয় না। কাশী-সংস্করণে লিখিত হইয়াছে যে, রামকে বন-বাস হইতে ফিরাইয়া আনিতে না পারিয়া ভরত রামের এক জোড়া জরির জুতা সঙ্গে লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন; কিন্তু গৌর-সংস্করণে লিখিত হইয়াছে যে, শরভঙ্গ ঋষি রামের একজোড়া কুশের পাদুকা ভরতকে উপহার দেন।

বোম্বাই ও কাশী-সংস্করণে সুমালীর কন্যা অর্থাৎ রাবণাদির জননীর নাম 'কৈকসী'; কিন্তু গৌড়-সংস্করণে তিনি 'নিকষা' নামে অভিহিতা।

বোম্বাই-সংস্করণে বিভীষণের কন্যার নাম 'কলা'; কিন্তু গৌড়-সংস্করণে তিনি 'নন্দা' নামে পরিচিতা।

বোম্বাই-সংস্করণে সুগ্রীব, বালীর মৃত্যুর পর তারাকে বিবাহ করেন নাই; কিন্তু অন্যান্য সংস্করণে বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীব তারাকে বিবাহ করেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

গন্ধমাদন পর্ব্বতের নাম গৌড়-সংস্করণ ছাড়া অন্য-কোনও সংস্করণে দৃষ্ট হয় না।

বোম্বাই-সংস্করণের মতে, পরশুরাম ২১ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন নাই—"অনেকবার" করিয়াছিলেন।

গৌড়-সংস্করণে কশ্যপ-পত্নী 'মনু' ও 'অনলা'—'বলা' ও 'অতিবলা' নামে অভিহিত হইয়াছেন।

বোম্বাই-সংস্করণের মতে, গৌতম-পত্নী অহল্যা প্রস্তরে পরিণত হন নাই, অন্তকে দেখা না দিয়া কঠোর ব্রহ্মচারিণী-জীবন যাপন করিয়া ছিলেন।

বোম্বাই-সংস্করণের মতে, লঙ্কা-যুদ্ধকালে কুম্ভকর্ণ নয় মাস কাল নিদ্রিত ছিলেন, কিন্তু কাশী ও গৌড়-সংস্করণের মতে, ছয় মাসের মাত্র নয় দিন অতিবাহিত হইতেই তাঁহাকে জাগরিত করা হয়।

বোম্বাই ও কাশী-সংস্করণের মতে, রাবণ ও মেঘনাদ কর্ত্তৃক ভৎর্সিত হইয়া বিভীষণ রামের শিবিরে উপনীত হন; কিন্তু গৌড়-সংস্করণের মতে, রাবণের পদাঘাতে আসনচ্যুত হইয়া মাতার আদেশে বিভীষণ কৈলাসে চলিয়া যান এবং তথা হইতে মহাদেবের অনুমতিক্রমে রামের সহিত যোগদান করেন।

শ্রদ্ধেয় শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, যদি এমন ঘটে যে, বঙ্গদেশ হইতে আর্য্য-ভারতের বেদ-পুরাণ, স্মৃতি-সংহিতা কিম্বা দর্শনাদি এককালে বিদূরিত হইয়া যায়, বাঙ্গালার গৃহস্থের তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না, এই দুইটি পুঁথিই (রামায়ণ ও মহাভারত) বঙ্গদেশে প্রাচীন-সঙ্গত হিন্দু-জীবনের আদর্শ বজায় রাখিতে এবং তাহার 'আর্য্যত্ব' অপ্রতিহত রাখিতে পারিবে।

বস্তুত, বাল্মীকি-কৃত রামায়ণ সমগ্র হিন্দু-ভারতের গৌরবের সামগ্রী হইলেও উহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত; সুতরাং ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে সমগ্র হিন্দু-বঙ্গের পক্ষে উহা পাঠ করিয়া উহার রসোপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না—যিনি বাঙালী-জীবনের মাধুরী মিশাইয়া উহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন এবং রাজ-প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণ কুটীর এবং পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী হইতে নিরক্ষর হিন্দু-মুদীর দোকান পর্য্যন্ত পরিবেশন করিয়াছেন, তিনি কবি কৃত্তিবাস—বঙ্গের বাল্মীকি! হিন্দু-জনসাধারণের মধ্যে কৃত্তিবাসের বাঙলা রামায়ণ যে-ধর্ম্মভাব, উচ্চ নীতি, সুশিক্ষা ও মহান আদর্শ আনয়ন করিয়াছে, কাশীরামের মহাভারত ছাড়া অন্য-কোনো গ্রন্থের পক্ষে তাহা এ-পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই।

বঙ্গদেশে প্রায় ২২ জন কবি রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পঞ্চদশ শতাব্দীর কৃত্তিবাসই সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তৎপরে আসামবাসী অনন্ত কন্দলীর "অনন্ত রামায়ণ," এবং ষোড়শ শতাব্দীর কবিচন্দ্র ও অদ্ভুতাচার্য্য এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফকিররাম ও রঘুনন্দনের রামায়ণের নাম উল্লেখযোগ্য।

স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার মেদিনীপুর অভিভাষণে বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী প্রাচীন পুঁথির স্তূপে যে অর্দ্ধ শত ভিন্ন লেখক-বিরচিত রামায়ণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলিতে বাঙলা দেশের বিভিন্ন যুগের চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে, এমন কি, বাঙলা রামায়ণে বর্ণিত কোন কোনও ঘটনার সহিত প্রাচীন য়ুরোপীয় আখ্যানেরও সাদৃশ্য আছে। বাল্মীকি-পূর্ব্ব কোন কোন ঘটনাও বাঙলা রামায়ণে স্থানলাভ করিয়াছে। চন্দ্রাবতী ১৬শ শতাব্দীর কবি। তিনি কৈকেয়া-কন্যা কুকুয়ার কথা তাঁহার রামায়ণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বহু-ভাষাবিদ্ গ্রীয়ারসন বলেন, কাশ্মীরী রামায়ণে কৈকয়ীর এই কন্যার উল্লেখ আছে। সীতার জন্ম-সম্বন্ধে বাঙলা রামায়ণে বর্ণিত উপাখ্যান যবদ্বীপের কবি-ভাষায় প্রচলিত রামায়ণে প্রচলিত রহিয়াছে। বৌদ্ধ জাতক ও প্রাচীন জৈন-রামায়ণের কোন কোন কাহিনীও বাংলা রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়। ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে য়ুরোপে প্রচলিত গ্যালিক্ দেবতা Balor বাঙলা রামায়ণের ভস্মলোচন এবং King Ludd রাজ্যের নিদ্রাভিভূতকরণ মন্ত্রজ্ঞাতা জনৈক তস্কর বাংলা রামায়ণের মহীরাবণকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

কৃত্তিবাস সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেও কেবলমাত্র মূল বাল্মীকি রামায়ণ অবলম্বন করিয়া বাঙলা রামায়ণ রচনা করেন নাই—অদ্ভুত রামায়ণ, পদ্মপুরাণীয় রামায়ণ, প্রচলিত কাহিনী ও কথকতা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি এক মধুচক্র রচনা করিয়াছেন। মূল রামায়ণে রাম দেবতা নহেন—দেবোপম; কিন্তু কৃত্তিবাস তাঁহাকে ভক্তের আরাধ্য দেবতারূপে চিত্রিত করিয়াছেন। কবিচন্দ্রী রামায়ণে চৈতন্য ও নিত্যানন্দের ছায়া রাম-লক্ষ্মণে এবং রঘুনন্দনের রামরসায়নে রাধা-কৃষ্ণ রাম-সীতায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন।

বাংলা রামায়ণের শকুন্তলা, দুর্ম্মুখ, অঙ্গদ রায়বার, মহী ও অহীরাবণ, রাজা হরিশ্চন্দ্র বা বিভীষণ-পুত্র তরণীসেন—কাহারও নাম বাল্মীকি রামায়ণে দৃষ্ট হয় না। বাল্মীকি রামায়ণের 'পুরী লঙ্কা' বাঙলা রামায়ণে 'দ্বীপ লঙ্কা'য় পরিণত হইয়াছে; এবং জহ্নু মুনির কর্ণ-বিবর হইতে নিঃসরিত গঙ্গা বাঙলা রামায়ণে উরু হইতে নিঃসৃত হইয়াছে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রকৃত পাঠ বা সংস্করণ লইয়া ভাষাবিদ্‌গণের মধ্যে বহু মতভেদ বিদ্যমান। কোন্‌খানি যে আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণ —কৃত্তিবাসের নামাঙ্কিত দেড়শতাধিক পুঁথি আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত তাহার কোনও স্থির মীমাংসা হয় নাই। বটতলা-প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ নাকি জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত। আসল কৃত্তিবাসী নাকি ইহাপেক্ষা বহুগুণে উন্নত। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণ পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে দুই রূপে প্রকাশিত। ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও নোয়াখালী হইতে তিনি যে-সকল কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাইয়াছেন, তাহার মধ্যে বাল্মীকি-রামায়ণ-বহির্ভূত বীরবাহু, তরণীসেন প্রভৃতির যুদ্ধ, রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্রের স্তব এবং রামের চণ্ডীপূজা প্রভৃতি বর্ণিত হয় নাই। তবে কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে পূর্ব্ববঙ্গে পৌঁছিয়াছিল, পূর্ব্ববঙ্গে প্রাপ্ত রামায়ণের ভাব ও ভাষার সহিত বটতলা-প্রকাশিত রামায়ণের ভাব ও ভাষার বহুস্থলের সামঞ্জস্য হইতে তাহা অনুমিত হয়। কেহ কেহ বলেন, কবিচন্দ্র ১৬শ শতাব্দীতে তৎকৃত রামায়ণে তরণীসেন, বীরবাহু ও অতিকায়ের বৈষ্ণবসুলভ ভক্তির কথায় লঙ্কাকাণ্ড প্লাবিত করিয়াছেন, তৎপরবর্ত্তী পুঁথি-লেখকরা, বিশেষ করিয়া, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নাকি উহা কৃত্তিবাসীতে জুড়িয়া দেন। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন যে, কৃত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ড রচনা করেন নাই—কৃত্তিবাসের রচনার সহিত কবিচন্দ্রের রচনা মিশিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, যোগাত্মার বন্দনা, শিব-রামের যুদ্ধ, রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থে আমরা কৃত্তিবাসের ভণিতা দেখিতে পাই; কিন্তু বাংলাভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়া কৃত্তিবাস অমর হইয়াছেন।

কৃত্তিবাসের জন্ম-কাল সম্বন্ধে বহু মতভেদ বিদ্যমান। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পূর্ব্বে যাঁহারা কৃত্তিবাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে, কৃত্তিবাস ১৪৩২ খৃঃ ৩০শে মাঘ, রবিবার শুক্লাপঞ্চমী দিনে জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গীয় হারাদত্ত ভক্তনিধি-সংগৃহীত ১৫০১ খৃঃ লিখিত পুঁথি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-সংগৃহীত পুঁথিতে কৃত্তিবাসের যে বর্ণনা আছে, তাহার জ্যোতিষিক সূক্ষ্ম গণনা করিয়া রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় স্থির করেন যে, কৃত্তিবাসের জন্ম-তারিখ ১৪৩২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মাঘ এবং ১৩৩৫ (১৪৪৩ খৃঃ) শকের ৪ঠা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার চতুষ্পাঠীতে তাঁহার বিদ্যারম্ভকাল। কিন্তু স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তিনি ও এইচ-ষ্ট্যাপলটন্ সাহেব বহু বাদানুবাদের পর (Dacca Review, vol. II. no. 12 p. 448) ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে (১৩৮০ খৃঃ বা তৎসন্নিহিত কোনো কাল) কৃত্তিবাসের জন্ম-কাল নির্দ্ধারণ করেন। পুনরায় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার মেদিনীপুর-অভিভাষণে ঘোষণা করেন যে, ১৩৪০ শক, রবিবার, বাসন্তী-পঞ্চমী তিথিতে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। সম্প্রতি "দৈনিক বসুমতী" পত্রিকায় কৃত্তিবাস-সম্বন্ধে যে-আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কৃত্তিবাসের জন্ম-কাল আনুমানিক ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাস, শ্রীপঞ্চমী তিথি বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

কৃত্তিবাস ভরদ্বাজগোত্রীয় মুখটী ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তখন মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পদবীর সৃষ্টি হয় নাই। কৃত্তিবাস উপাধ্যায় বা ওঝা পদবীতে ভূষিত ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ নৃসিংহ নবাবদত্ত ওঝা উপাধি লাভ করেন, তদবধি বংশ-পরম্পরায় ইঁহাদের ওঝা উপাধি। নৃসিংহ ওঝার পুত্র গর্ভেশ্বর, গর্ভেশ্বরের পুত্র মুরারী, মুরারীর পুত্র বনমালী এবং বনমালীর পুত্র কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাসের মাতার নাম মালিনী দেবী। নৃসিংহ ওঝা রাষ্ট্রবিপ্লবের জন্য স্বীয় আবাসস্থল পূর্ব্ববঙ্গের সুবর্ণগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নদীয়া জেলার রাণাঘাটের এক ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ফুলে বা ফুলিয়া গ্রামে আবাস স্থাপন করেন। ভাগীরথী তখন ফুলিয়া গ্রামের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইত। এই ফুলিয়া গ্রামেই কৃত্তিবাসের জন্ম হয়।

কৃত্তিবাস বাল্যে চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেন, পরে রাজ-পণ্ডিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় গৌড়েশ্বর রাজা কংসনারায়ণের সভায় গমন করেন এবং দ্বারীর মারফৎ পাঁচটি শ্লোক রাজার নিকট প্রেরণ করেন। শ্লোক কয়টি পাঠ করিয়া রাজা তাঁহার কবিত্ব এবং পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে স্বীয় সভা-কবি নিযুক্ত করেন। ইহার কিছুকাল পরে রামায়ণ রচনার ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হয় এবং ১৪৬০ শকে তিনি রামায়ণ রচনা করেন।

স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকরা বলেন যে, কংসনারায়ণ তাহিরপুরের রাজা ছিলেন; সুতরাং কৃত্তিবাস তাহির-পুর-রাজের সভা-কবি ছিলেন। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন যে, কংসনারায়ণের শেষে যে-বংশাবলী পাওয়া গিয়াছে, তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্ত্তীকালের লোক বলিয়া অনুমিত হয়। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন: "১৩৮০ খৃঃ বা তৎসন্নিহিত কোন কাল কৃত্তিবাসের জন্ম-তারিখ ধরিয়া লইলে এই কালের মধ্যে কোন-এক সময় তিনি রাজ-দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক রাজা গণেশ ভিন্ন আর কেহই নহেন।" পুনরায় তিনি মেদিনীপুর-অভিভাষণে বলিয়াছেন: "গৌড়েশ্বর রাজা কংসনারায়ণ তাঁহার (কৃত্তিবাসের) কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে রামায়ণ রচনার ভার দেন।"

কৃত্তিবাসের রামায়ণের একখানি প্রাচীন অরণ্যকাণ্ডের পুঁথির ভণিতায় লিখিত আছে যে, অরণ্যকাণ্ড রচনা-কালে কৃত্তিবাস রোগজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে, কৃত্তিবাস দীর্ঘায়ু ছিলেন না এবং সম্ভবত ১৫শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

ভ্রান্তি

(কবীর)

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার

দুনিয়া এমন হয়েছে পাগল
ভক্তি না বুঝে কেহ
কেহ চায় ছেলে, কহে হে গোঁসাই
পুত্র আমারে দেহ।

দুখ-ভারে কেহ আসে মোর কাছে
বলে কৃপা কর মোরে,
কেহ চায় ধন, কেহ উপহার
দেয় তাই ডালি ভ'রে।

সত্যের কেহ হ'ল না গ্রাহক
মিথ্যারে খোঁজে সবে
হেন অন্ধেরে লয়ে কিবা করি
কে গো মোরে বলে দেবে?

উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব প্রভাব *

রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

রাজসাহীর অধিবাসী আমি না হ'লেও এর সঙ্গে আমার অন্তরের যে নিবিড় যোগ আছে, সেই কথাটি আপনাদের কাছে আগে বলি। আমার এই শেষোন্মুখ কর্মজীবনের সূত্রপাত হয়েছিল রাজসাহীতে। রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক-পদ লাভ করে' প্রথম যখন আসি, তখন প্রমত্তা পদ্মার সেই বর্ষাকালের ঢল ঢল রূপ আমাকে মুগ্ধ মূক করেছিল। আমি সেদিন সারাদিন অভুক্ত ছিলাম, কিন্তু তাতে আমার কোনও কষ্ট বোধ হয়নি। তখন আমি বালক বল্‌লেও অন্যায় হবে না। সেদিন পদ্মা আমাকে যে চঞ্চলতার দীক্ষা দিয়েছিল, জীবনে তা ভুলতে পারিনি। তারপরে এসেছিলাম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে—সেও আজ বহুদিন হ'লো। আপনাদের বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির যখন ভিত্তি স্থাপিত হয়, তখন আমি উপস্থিত ছিলাম সে উৎসবে। লর্ড কারমাইকেল যে সৌধের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, আজ তা সারা বাংলার গৌরবস্থল হয়েছে। সুতরাং আপনাদের আভিজাত্যপূর্ণ ইতিহাসের সঙ্গে কোনও রূপে জড়িত হতে পারা যে-কোনও ব্যক্তির পক্ষে সৌভাগ্যের কথা।

আমার দুঃখ এই যে প্রথম জীবনে যে সকল বন্ধু পেয়েছিলাম, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ নেই। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার, সুকবি রজনীকান্ত, সুলেখক মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ—এঁরা রাজসাহীর লোক, কিন্তু সমগ্র বাংলার দুলাল। এঁদের বন্ধুত্ব লাভ করবার সুযোগ আমার হয়েছিল। তাই স্মরণ ক'রে রাজসাহী জেলার এই উৎসব-বাসরে আমার শ্রদ্ধার স্রক্-চন্দন তাঁদের উদ্দেশে অর্পণ করি। রাজসাহী থেকে একখানি কাগজ বা'র হ'তো—তার নাম উৎসব। ব্রজসুন্দর সান্যাল ছিলেন তার সম্পাদক—আমার প্রবন্ধ সে কাগজে বেরিয়েছে। এখন এ অঞ্চলে কোনও কাগজ আছে কিনা জানিনে। যদি থাকে, তবে আমার সহানুভূতি তার সঙ্গে অবশ্যই থাকবে। যদি কাগজ না থাকে, তা'হলে আপনাদের মারফতে আমি এই আবেদন জানাতে চাই, পাঠাগারের সঙ্গে একখানি সাময়িকপত্র থাকলে সোনায় সোহাগা হয়। তার কারণ যেখানেই জ্ঞান, সেখানেই প্রকাশ। সত্ত্বগুণের ধর্ম্মই এই যে সে প্রকাশশীল। যাঁরা পাঠাগারকে সত্যিকার বস্তু বলে' মনে করেন, যাঁরা তার সমস্ত সার্থকতা দিতে চান, তাঁরা প্রকাশের পথ খুঁজবেনই। কারণ পাঠাগারের সার্থকতা প্রচারে। পাঠাগারের বিস্তৃতিও অনেকটা প্রচারের উপর নির্ভর করছে। তা নইলে ঘরের গৃহিণীরা চাকর পাঠিয়ে মধ্যাহ্ন-বিনোদনের জন্য কতকগুলি পাঠ্য অপাঠ্য নভেল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন। আপনাদের এখানে উপস্থিত পরিস্থিতি ঠিক এই রকম কিনা জানিনে। কিন্তু বহু পাঠাগারের সঙ্গে আমি পরিচিত, যেখানে অবস্থা এর চেয়ে বেশী ভাল নয়। সাধারণ লোককে পাঠকশ্রেণীভুক্ত করা সহজ নয়। আবার পাঠক হলে গ্রন্থ সরবরাহ করা আবশ্যক। অথচ চাহিদা না হলেও জিনিষের সরবরাহ হয় না, গ্রন্থাগারের পুষ্টি হয় না। সুতরাং একদিকে যেমন পাঠাগার গঠন করতে হবে, অন্য দিকে তেমনি পাঠক সৃষ্টি করতে হবে। কাজ খুব সহজ নয়, তা জানি। তবে আজকাল তরুণদের মধ্যে পাঠের স্পৃহা যে পরিমাণে বেড়ে যাচ্চে, তাতে আশারই সঞ্চার হয়। আপনারা যদি দেখেন বছরে বছরে বাংলা বইয়ের সংখ্যা কি পরিমাণে বাড়ছে, তাহলে এ বিষয়ে আপনাদের আর মোটেই সংশয় থাকবে না।

লাইব্রেরীর আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া অনাবশ্যক মনে করি। পৃথিবীতে সমস্ত সভ্য দেশে—এমন কি অর্দ্ধ সভ্য দেশেও গ্রন্থাগারের সংখ্যা বিস্ময়কর ভাবে বেড়ে চলেছে। কারণ একথা আজ সব জায়গায় মেনে নেওয়া হয়েছে যে মানুষের সমস্ত দুঃখকষ্টের মূল তার অজ্ঞানতা। শিক্ষা যে সমাজের প্রথম এবং প্রধানতম প্রয়োজন, সে কথা এখন স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বীকৃত হচ্চে। আমাদের দেশে একজন বিখ্যাত গণনায়ক ২০ বৎসর পূর্ব্বে বলেছিলেন Education can wait but Swaraj cannot. শিক্ষা অপেক্ষা

* নওগাঁ গ্রন্থাগারের বার্ষিক উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

করতে পারে, কিন্তু স্বরাজ একদিনও অপেক্ষা করতে পারে না। ফলে হ'লো এই যে, স্বরাজ ত অপেক্ষা করলোই, শিক্ষাও এগুলো না। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর উদাসীন থাকলে চলে না। পাঠশালা, স্কুল কলেজে পড়ে' যে শিক্ষা হয়, তা হোক্। কিন্তু সেই বাধ্যতামূলক শিক্ষার উপরে থাক আমাদের গ্রন্থাগার—যেখানে সকলেই জ্ঞানের মূল প্রস্রবণ থেকে ইচ্ছামত সহজেই বারি পান করে' পিপাসা দূর করতে পারেন।

লাইব্রেরীগুলি মনে করুন এক একটি ব্যাঙ্ক। জগতের যত জ্ঞান-ধনী ব্যক্তি, তাঁরা এই সকল ব্যাঙ্কে তাঁদের সারা জীবনের সঞ্চয় সযত্নে গচ্ছিত রেখেছেন। এই ব্যাঙ্ক থেকে যিনি যত ইচ্ছা অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন, কোনও সীমা নির্দ্দিষ্ট নেই। এই ব্যাঙ্ককে দেউলিয়া করতে পারায় মানব-জীবনের চরম সার্থকতা। যে সমস্ত লোক জ্ঞান লুটে পুটে নিয়ে লাইব্রেরীকে নিঃশেষ করতে পারে, তার মত ধন্য কে? এ যদি সত্য হয় যে জ্ঞানের আগুনে সমস্ত নীচতা, সমস্ত তুচ্ছতা, সমস্ত বিরোধ কলহ সঙ্কীর্ণতা পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তা হলে আমাদের পক্ষে এর মত বন্ধু আর নেই। আজকাল আমাদের দেশে এত বিরোধ ও দ্বন্দ্বের আ-গাছা গজাচ্ছে, যে আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে' বসে' থাক্‌লে এতদিন ধরে' যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে' উঠেছে আমাদের এই দেশে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আমাদের অতীত ইতিহাস এমন নৈরাশ্যজনক ছিল না। এই বরেন্দ্র ভূমি একদিন যশঃসৌরভে ভারতবর্ষের আকাশ বাতাস মুগ্ধ করে' রেখেছিল। সেদিনকার ইতিহাস যদি আমরা ভুলে যাই, তা হ'লে অকৃতজ্ঞতার চরম হবে। অতীত ইতিহাসের সোপানরাজি কোনও জাতির সভ্যতাকে উন্নত হ'তে উন্নততর রাজ্যে পৌঁছে দেয়, একথা ভুল্‌লে চলবে না। আজ যেখানে আমরা সম্মিলিত হয়ে' এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করে' গৌরব বোধ করছি, একদিন তারই অনতিদূরে নানা বিদেশ হ'তে জ্ঞান-মন্দিরের তীর্থযাত্রীরা সহস্র সহস্র সংখ্যায় সমাগত হয়েছিল। পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার পালরাজাদের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারও পূর্বে হিউয়েনসাং এখানে এসে' এক উন্নতিশালী জনপদের বিবরণ লিখেছিলেন। জৈন ধর্মেরও নিদর্শন এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবও বহুপূর্ব হ'তে বর্তমান ছিল, পণ্ডিতেরা এরূপ অনুমান করেন। শিবশক্তির যে যুগনদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেছে, তার থেকে বৌদ্ধ ও হিন্দুর মধ্যে ঘনিষ্ঠ আদান-প্রদানের পরিচয় পাওয়া যায়। হেবজ্র এবং প্রজ্ঞাপারমিতার যুগল মূর্ত্তি (তিব্বতীয় ভাষার যবযুম্) বোধ হয় পরে শিবশক্তি রূপে হিন্দুদের দেবগোষ্ঠীতে প্রবেশ করেছিল। হিন্দু বৌদ্ধ জৈনের মিলনক্ষেত্র এই সুন্দর দেশে কি ভাবে সভ্যতা, ঐশ্বর্য ও শৌর্যবীর্যের মহান্ আদর্শ গড়ে' উঠেছিল, তা ভাবলে সম্ভ্রমে ও ভক্তিতে আমাদের মস্তক

হরগৌরীর ধাতুনির্মিত মূর্তি: রাজসাহী, পাহাড়পুর

অবনত হয়ে' আসে স্বভাবতঃই। যা আমরা এখন কল্পনাও করতে পারিনে, তাই ঘটেছিল এই উত্তর বঙ্গে। আমরা ভাবি যে সভ্যতা ও জ্ঞানে আমরা অতীত যুগকে বহু পশ্চাতে ফেলেছি। কিন্তু এ যে কত বড় ভুল, তা একটু প্রণিধান করলেই বুঝতে পারা যায়। ইলেক্‌ট্রিক পাখা, টেলিফোন, বেতার, মোটর প্রভৃতি বর্তমান যুগের আবিষ্কার আমাদের নিত্য নূতন চমক লাগিয়ে দিচ্ছে সত্য: কিন্তু সেই অতীত

গৌরবময় যুগের তুলনায়, আমাদের এই ধার-করা উন্নতি যে কতখানি ম্লান তা আমরা ভেবে দেখিনে। সে স্বুবর্ণ যুগের তুলনায় এখনকার যুগকে বড় জোর গিল্‌টি যুগ বলা চলে, তার বেশী নয়।

সেই অতীত যুগের কথা আজ স্মরণ করি। পালরাজগণের সময় উত্তর বঙ্গ যে উন্নতি করেছিল, তা আজ কল্পনার বস্তু। পালরাজগণের গৌরবময় যুগে বঙ্গের এই উত্তর প্রদেশের ইতিহাস ভারতের ইতিহাস বললেও অত্যুক্তি হয় না। সে সময়ে বঙ্গে যে সকল রাজ্য ছিল, তারা কোথায় গেল? সেই দণ্ডভুক্তি, কোটাটবী, বালবলভী, রাজসাহী জেলার কৌশাম্বী প্রভৃতি আজ কোথায়? সেই প্রসিদ্ধ বিহারগুলিই বা কোথায়? ওদন্তপুর, বিক্রমশীল, জগদ্দল প্রভৃতি বিহারগুলি একাধারে ধর্ম ও বিদ্যার প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এই পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহার সেই গৌরবময় যুগের স্মৃতি মৃত্তিকাতলে লুকিয়ে রেখেছে যুগযুগান্ত ধরে'। এই রাজসাহী জেলাতেই দিব্বোকের বিজয়বাহিনী দ্বিতীয় মহীপালের দর্প চূর্ণ করে' যে জয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিল, আজও তা বর্ত্তমান আছে শুনেছি। রাজা রামপাল অতি কষ্টে আবার এই দেশে শান্তি স্থাপন করেছিলেন। শেক শুভোদয়ায় রামপাল সম্বন্ধে যে গল্প আছে, তা রোমের ন্যায়-বিচারের খ্যাতিকেও ম্লান করে। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র যক্ষপালকে অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন এবং সেই শোকে নিজেও নদীগর্ভে আত্মবিসর্জ্জন দিলেন। তারনাথের ইতিহাস থেকেও আমরা পাই যে রামপালের এক পুত্র ছিল তার নাম যক্ষ। এ সব কীর্ত্তি কাহিনী আমরা ভুলে গিয়েছি।

শুধু রাজারাজড়ার কীর্ত্তিগাথা নয়, সংস্কৃতির দিক দিয়েও উত্তরবঙ্গ বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল। স্মরণাতীত কাল হ'তে রাঢ়দেশ অপেক্ষাও উত্তর বঙ্গের গৌরব ছিল বেশী। গুপ্ত সম্রাটদের সময় থেকে আরম্ভ করে' উত্তর বঙ্গের একটি অব্যাহত ইতিহাস দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সেজন্যই এখানে অতীতের এত নিদর্শন পাওয়া যাচ্চে যে বঙ্গের অন্য কোনও স্থানে সেরূপ নয়। বৌদ্ধ ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা কোনও সম্প্রদায় বা শ্রেণী-বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। শ্রমণ বা ভিক্ষুরা আপামর সাধারণের মধ্যে শান্তির বাণী প্রচার করতেন। আমরা এখন শুধু জানি যে বৌদ্ধেরা তাঁদের ধর্ম প্রচার করতে দেশ বিদেশে অভিযান করেছিলেন। কিন্তু দেশের মধ্যেও অহিংসা, সন্তোষ ও শান্তির বাণী তাঁরা যে কি অদম্য উৎসাহে প্রচার করেছিলেন, তা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। অশোকের শিলালিপি, স্তম্ভলিপি—এ সব চিরপরিচিত উপায় ত ছিলই। সারা দেশময় সঙ্ঘারাম, বিহার, মহাবিহার প্রভৃতি স্থাপন করে' তাঁরা লোক-শিক্ষার বিরাট আয়োজন করেছিলেন। লোক শিক্ষার এরূপ বিপুল ব্যবস্থা আর কোনও প্রাচীন জাতির ইতিহাসে দেখা যায় না। হিউয়েনসাঙের বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে তিনি বিংশতিটি বিহার এই উত্তর বঙ্গেই দেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, অন্তঃপুরচারিকাদের নিকট সদ্ধর্মের অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মের মর্ম বুঝাবার জন্য ভিক্ষুণীগণেরও সংখ্যা নগণ্য ছিল না।

বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা সমগ্র জগতের ধর্মেতিহাসে যে এক অতি উন্নততর স্তরের সূচনা করেছিল এ কথা সকলেই জানেন। জীবনযাত্রার যে নীতি তাঁরা শিখিয়েছিলেন তা আজ পুরাণো হয় নি বা অন্য নীতির দ্বারা পরাভূত হয় নি। এই অত্যদ্ভুত উন্নতি কিরূপে সম্ভব হয়েছিল, তার ইতিহাস আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। তবে অনুমান হয় যে পাহাড়পুর, তাম্রলিপ্তি, নালন্দা প্রভৃতি স্থানে যে সকল বিহার ছিল, তাকে কেন্দ্র করে' এক একটি প্রদেশের সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল। প্রত্যেক বিহারে ত্যাগশীল, সুপণ্ডিত, বহুদর্শী প্রবীণ শ্রমণগণ বাস করতেন। তাঁদের কাছে দেশ বিদেশ থেকে ছাত্রেরা সমাগত হতো জ্ঞানলাভ করবার জন্য। এইভাবে বিক্রমশীল, তক্ষশীলা, নালন্দা প্রভৃতির খ্যাতি দেশ বিদেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তেমন আর কখনও হয় নি। পণ্ডিতেরা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন। ছাত্রেরা শিক্ষা করতেন। উভয়ের জন্য পুঁথি লিখিত হতো শত সহস্র সংখ্যায়। পুঁথি না হলে বিশ্ববিদ্যালয় কেন, সাধারণ বিদ্যালয়ও চলে না। নালন্দায় দশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করতো, এই কথা হিউয়েনসাং বলেছেন—তাদের জন্য অন্ততঃ দুই শত কি আড়াই শত অধ্যাপক থাকতেন। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য পুস্তকের প্রয়োজন মিটাতে হলে কত পুঁথি থাকা আবশ্যক, ভেবে দেখুন। নালন্দায় নয়তলা বাড়ীতে গ্রন্থাগার ছিল। অন্যান্য বিহারেও এইরূপ

পুস্তকাগার নিশ্চয়ই ছিল—কারণ পূর্বেই বলেছি বিহারগুলি ছিল প্রধানতঃ শিক্ষার কেন্দ্র। তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, কাজেই পুঁথি নকল করবার জন্য সহস্র সহস্র লোকের পরিশ্রম আবশ্যক হতো। এই সকল লোক ভূমি, গ্রাম এবং বিত্ত পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রাপ্ত হতো। ৮ম শতাব্দী হতে আরম্ভ করে' দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তিব্বতের পণ্ডিতেরা দলে দলে এদেশে আসতেন—ভারতের—বিশেষতঃ উত্তর ভারতের পুঁথি তিব্বতীয় অক্ষরে নকল করতে। এই ভাবেই অতীত কালে আমাদের সংস্কৃতির সৌধ বিরচিত হয়েছিল, যার গঠনে উত্তর বঙ্গ কম সহায়তা করে নি। সে সংস্কৃতি কিরূপ ছিল? আজ আর শত চেষ্টাতেও তার একটি ছবি আমরা চোখের সম্মুখে আনয়ন করতে পারি নে। ভারতবর্ষ থেকে, বাংলা দেশ থেকে বৌদ্ধ ধর্মের নিদর্শন চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়েচে। এর কারণই বা কি?

পাহাড়পুরে সাধারণ দৃশ্য

কেহ কেহ মনে করেন মুসলমানেরা বৌদ্ধ ধর্মের কীর্ত্তি-কলাপ নিশ্চিহ্ন করে' মুছে দিয়েছেন। কিন্তু সেটা সত্য কথা নয়। কারণ মুসলমানদের কাছে বৌদ্ধও যা, হিন্দুও তা-ই। মুসলমান আক্রমণে দেশের সংস্কৃতির স্রোত অনেকটা বাধা পেয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু হিন্দুধর্মের মন্দির, আশ্রম, গুহাগুলি এখনও ত মেখলার মত আমাদের জন্মভূমির অঙ্গ বেষ্টন করে' বিরাজ করছে। এই কারণেই হিমালয় হতে কুমারিকা পর্যন্ত সমগ্রদেশ এখনও হিন্দুদের স্থান বা হিন্দুস্থান বলে' দেশ বিদেশে পরিচিত হবার দাবী রাখে। তা হলে' মুসলমানদের দৌরাত্ম্য বৌদ্ধধর্মের বিলোপের কারণ হ'তে পারে না।

কেহ কেহ বলেন শঙ্করাচার্যের সময় হ'তে হিন্দুধর্মের যে অভ্যুদয় হয়েছিল, তারই ফলে বৌদ্ধধর্মের পতন হয়েছে। কিন্তু তা-ই বা কেমন করে' বিশ্বাস করা যায়? হিন্দুধর্মের যে অবস্থা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, তা বৌদ্ধ ধর্মের অনেকখানি আত্মসাৎ করে' নিয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ—নির্বাণ, হিন্দুদের—মোক্ষ বা মুক্তি। বৌদ্ধদের জন্মান্তর ও কর্মফলবাদের সঙ্গে হিন্দুর অধ্যাত্মবিদ্যার একটুও প্রভেদ নাই। বৌদ্ধদের শূন্য এবং হিন্দুদর্শনের নির্গুণ ব্রহ্মে তফাৎ কি বড় বেশী? এইভাবে হিন্দু এবং বৌদ্ধমতের যে সমন্বয় আমরা দেখ্‌তে পাই, তাতে এক ধর্মের দ্বারা অপর ধর্মের উচ্ছেদ-সাধন সম্ভব কতখানি—তাহাও বিবেচ্য। পালরাজগণ সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁরা হিন্দুমতের প্রতি বিরূপ ছিলেন না। যতদুর জানা যায় তাতে পালরাজারা

ব্রাহ্মণগণকে সমাদর করতেন, ভূমিদান করতেন এবং নিশ্চয়ই তাদের উপাসনাদিতেও বাধা দিতেন না।

আমার বোধ হয় বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুত্থান বৌদ্ধসংস্কৃতির বিশেষ অন্তরায়রূপে দেখা দিয়েছিল। বাংলা দেশে ঐ ধর্মের যে প্রবল বন্যা একদিন বয়েছিল, তার শক্তি সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই হয়ত সুস্পষ্ট ধারণা নেই। আমার বোধ হয় যে বহুদিন এরূপ শক্তিশালী প্রভাব জনসাধারণের মধ্যে অনুভূত হয় নি। তার ফলে হয়েছে এই যে, বঙ্গদেশে বহুলোক এখনও বৈষ্ণব এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতিও নানা ছদ্মবেশে বৈষ্ণবমতের সঙ্গে মিশে আত্মগোপন করে' রয়েচে। হিন্দুর অধ্যাত্মবিদ্যার সঙ্গে বৌদ্ধমতের যতটা মিল আছে, বৈষ্ণবদের সঙ্গে ততটা নয়। কিন্তু একটি বিষয়ে বৌদ্ধদের অনুকরণ করেছিলেন বৈষ্ণবেরা—সেটা হচ্চে বৈষ্ণবদের জাতিভেদের প্রতি অনাস্থা। জাতিভেদ বৈষ্ণব প্রভাবে কতটা খর্ব হয়েছিল, তা এখন বুঝতে পারা কঠিন হবে। কারণ পরে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের যে সমন্বয় ঘটলো, তা'তে জাতিভেদ আবার মাথা তুলতে সমর্থ হয়েছিল। ব্রাহ্মণেরা এই বিষয়ে চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মের উপর গোড়া থেকেই খুব চটা ছিলেন। এখন দাঁড়িয়েছে এই যে, বৈষ্ণবতত্ত্ব কতকটা হিন্দু সমাজে চল্‌লেও জাতিভেদ পুরোমাত্রায় মেনে নেওয়া হচ্চে। সে 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি-পরায়ণঃ' আর নেই। মহাপ্রভু যা শিখিয়ে গিয়েছিলেন—

"যে-ই ভজে সে-ই বড় অভক্তহীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥"

সে শিক্ষা আমরা ক্রমে বিস্মৃত হয়েছি। অবশ্য সেজন্য আমাদের যে দুর্গতি, তার জন্য এখনই আমাদের প্রায়শ্চিত্ত সুরু হয়েচে ভীষণভাবে। বাংলার তথা ভারতবর্ষের প্রধান রাষ্ট্রীয় সমস্যা এখন হিন্দু মুসলমান নিয়ে নয়, এখন সে সমস্যা scheduled caste বা অনুন্নত জাতি নিয়ে। যাদের আমরা আঙ্গিনার বাহির ক'রে দিয়েছি, তারাই অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে হিন্দুদের স্বাধীনতা-লাভের পথে কণ্টক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সব দেখে মনে হয় যে, বৌদ্ধদের শিক্ষা, বৈষ্ণবদের শিক্ষা ত্যাগ করে' আমরা ভাল করি নি। আর কোনও দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে এই জটিলতা নেই। আমাদের নিজ কর্মফল অভিসম্পাতস্বরূপে, আমাদের ভাগ্যকে বিড়ম্বিত করছে।

সে যাই হোক, এই জেলাতেই বৈষ্ণবদের যে অভ্যুদয় হয় যোড়শ শতাব্দীতে, শ্রীচৈতন্যের পরে এত বড় বিপ্লব আর ঘটে নি। খেতুরির রাজপুত্র বুদ্ধেরই মত গৃহত্যাগ করে' যে আদর্শ এই জেলাতেই দেখিয়াছেন, তা গৌতম বুদ্ধের সংসার ত্যাগেরই মত মর্ম্মস্পর্শী ও আধ্যাত্মিক প্রভাবশালী। দিকে দিকে এই বার্ত্তা বাহিত হলো, নরোত্তমদাসের এই ত্যাগের আদর্শে বৈষ্ণব ধর্ম মহীয়ান্ হয়ে উঠলো। দেশব্যাপী যে আন্দোলন হলো, তার কাছে সমস্ত বাধাবিঘ্ন ভেসে গেল। শূন্যবাদের রিক্ত সিংহাসনে বসলেন শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি। শালগ্রাম শিলা নয়, একেবারে রূপেরসে ভরপুর সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ। শালগ্রাম অনেকটা শূন্যের প্রতীক। কিন্তু তার স্থলে আসলেন অখিলরসামৃত মূর্ত্তি, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। বৌদ্ধদের দুরূহ অষ্টমাগিক সাধনের স্থলে এলো আপামর সাধারণের জন্য নাম-সংকীর্ত্তন। শুষ্ক কঠোর বিধি-নিষেধের স্থলে এলো প্রেম, অহিংসার স্থলে করুণা। অহিংসা একটি অভাবাত্মক ধর্ম—হিংসার অভাব এই মাত্র। কিন্তু করুণা হৃদয়ের একটি সহজাত শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। এই ভাবে সারা দেশ বৈষ্ণব ধর্মের আহ্বানে সাড়া দিয়ে উঠেছিল। পূর্বের যে সকল সংস্কৃতির ভগ্নাবশেষ তখনও বর্ত্তমান ছিল, সেগুলি অল্পে অল্পে ধরণীপৃষ্ঠ হতে বিদায় গ্রহণ করতে লাগলো।

বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এইরূপে যখন খর্ব হতে আরম্ভ করেছিল, তখন বৈষ্ণবেরাও ভগবান বুদ্ধের জন্য একটু স্থান করে' তাঁকে দশাবতারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন; তারই পরিচয় আমরা জয়দেবে পাই। জয়দেব বাংলার কবি; তাঁর সময়ে বৌদ্ধ প্রভাব জীবন্ত ভাবে বাংলা দেশে বর্ত্তমান ছিল।

নরোত্তম দাস ঠাকুরের প্রভাব কীর্ত্তনের অনুকূল পবনে দূর দূরান্তরে প্রবাহিত হতে' লাগলো। আমার মনে হয় এই ধর্মের ঢেউ লেগেই কূলপ্লাবিনী পদ্মার প্লাবনের মত পুরাতন ভাবধারার শেষ সৌধগুলি ভেঙে পড়তে লাগলো। নরোত্তম দাস গরাণহাটী কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক, শ্রীনিবাস আচার্য্য মনোহরসাহী কীর্ত্তনের জনক বলে' বিখ্যাত। এঁদের উভয়ের সম্মিলন ঘটেছিল এই জেলাতেই। একজন উত্তর বঙ্গের, আর একজন রাঢ়ের। এই হতে উত্তর বঙ্গ আর রাঢ় এক স্বর্ণ

সূত্রে গ্রথিত হলো। এমনটি পূর্বে কখনও হয়েছিল বলে' জানা যায় না।

শ্রীচৈতন্যের সময়ে এবং তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালে নদীয়া শান্তিপুর দিয়ে রাঢ় অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের ঢেউ বয়েছিল। শ্রীহট্ট অঞ্চলেও এর কতকটা প্রভাব পৌচেছিল। কিন্তু উত্তর বঙ্গে যে বৈষ্ণব ভাব-প্রবাহ এমন প্রবলভাবে ধাক্কা দিতে পারলো, তার কারণ আমার বোধ হয় উত্তরবঙ্গের পুরাতন সংস্কৃতি। উত্তরবঙ্গ পূর্ব থেকেই যেন এর জন্য প্রস্তুত ছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও সোমপুর বিহারকে কেন্দ্র করে' যে সভ্যতা যুগযুগান্ত ধরে' পুরাতন অট্টালিকায় বট গাছের মত অসংখ্য শিকড় বিস্তার করে' সমাজকে আচ্ছন্ন করে ছিল, তারই ফলে একদিন হঠাৎ জাগরণ এসেছিল। সে জাগরণের দিকে সারা বাংলাদেশ নির্ণিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইলো। ঠাকুর নরোত্তম দাস যা' করেছিলেন, তার তাৎপর্য বুঝতে হলে' সমস্ত বৈষ্ণব ধর্ম-মতের ইতিহাস আলোচনা করতে হয়। তিনি একদিকে যেমন কীর্ত্তনের পদ্ধতি বেঁধে দিলেন, তেমনি বৈষ্ণব মতবাদের ভিত্তিও সুদৃঢ় করে' দিলেন। তাঁর 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা', 'হাটপত্তন', 'প্রার্থনা', 'চমৎকারচন্দ্রিকা' প্রভৃতি পুস্তক বৈষ্ণব সমাজের যে কি অসামান্য উপকার করেছে, তা বলে' শেষ করা যায় না। নরোত্তম দাস ঠাকুরের অবদান বরেন্দ্রী-পুণ্ড্রবর্দ্ধনের গরিমময় ইতিহাসের উপযুক্ত বলে' আমরা মনে করতে পারি। তাঁর 'প্রার্থনা' পদগুলি জগতের সাহিত্যে তুলনাবিহীন এবং তাঁর প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিকে বৈষ্ণবেরা বলেন 'লক্ষ গ্রন্থের টীকা'।

দুঃখ দাও ক্ষতি নাই—

শ্রীজিতেন্দ্র বক্সী

দুঃখ দাও ক্ষতি নাই, শক্তি দাও দুঃখ সহিবার ;
সত্যের পতাকা তব, দৃঢ়-চিতে দাও বহিবার
দুর্জ্জয় শকতি প্রভু ; দাও প্রাণে সুদৃঢ়-প্রত্যয়
সর্ব্ব কর্ম্মে ভাবনায়, নিত্য যেন গাহি' তব জয়।

বহু পুণ্যে লভিয়াছি এ জীবন তোমার ভুবনে :
সন্ধ্যায় প্রভাতে, আমি, তৃণে, গুল্মে, বন উপবনে
নীলাভ্র পাহাড়-চূড়ে, রেখায়িত দিকে দিগন্তরে
নানা রূপে রসে হেরি, তব রূপ দুটি আঁখি ভরে'।

এ সংসার ঝরে পড়ে শরতের জ্যোৎস্নাধারা প্রায়
নিত্য মোর হিয়া পরে, লাবণ্যের সহস্র-ধারায়
মুগ্ধ করি রাত্রি দিন। ব্যথা যদি দাও মোরে প্রিয়,
জানি যেন তাহা তব, প্রীতিস্পর্শ দান রমণীয়
অন্তর-দেউল মাঝে ! জীবনের আলোকে তিমিরে
তোমারে নেহারি যেন নিত্য মোর হৃদয়ের-তীরে ॥

অপরাজিতা

শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘটক

ওষ্ঠপুটে জীবনের রেখা কেন বিষাদ মলিন ?
কাজল নয়ন দুটি কেন আজি বরষা চঞ্চল !
ভাঙ্গিয়া গেল কি সখি যৌবনের স্বপন রঙিণ ?
কেন তুমি বল প্রিয়ে আজি হেন বেদনা বিহ্বল !
রূপহীনা বলে কিগো আজি তব প্রেমের প্রেমিক,
ছাড়িয়া গিয়াছে চলি', ফিরাইয়া মুখ অবজ্ঞায় ?
ভ্রমরের ভালবাসা ? নহে প্রেম, মোহ সে ক্ষণিক ;
টুটিলে সে যায় চলি, নাহি কভু আসে পুনরায়।

ভুলে গিয়ে স্মৃতি তার, মুছে ফেল তব আঁখি জল,
তোমারে লইব তুলি' বক্ষে মোর, মোর কবিতায়,
কে বলে কুরূপা তুমি ? মোর চক্ষে সুন্দর উজ্জ্বল !
নীরবে সাজাব তোমা আজি মোর ছন্দে ও ভাষায়।
প্রণয়-লাঞ্ছিতা তুমি, তুমি যে গো চির উপেক্ষিতা ;
ছন্দে তোমা' গাঁথিলাম তাই আমি, হে অপরাজিতা !

কথা ও সুর ঃ—কাজী নজরুল ইস্‌লাম । স্বরলিপি ঃ—শ্রীজগৎ ঘটক

লঙ্ক-দহন্ সারং *—তেতালা

অগ্নি-গিরি ঘুমন্ত উঠিল জাগিয়া ।
বহ্নিরাগে দিগন্ত গেলরে রাঙিয়া ॥
রুদ্র-রোষে কি শঙ্কর উর্দ্ধের পানে
লক্ষ-ফণা-ভুজঙ্গ বিদ্যুত হানে,
দীপ্ততেজে অনন্ত-নাগের ঘুম ভাঙিয়া ॥
লঙ্কা-দাহন হোমাগ্নি সাগ্নিক মন্ত্র,
যজ্ঞ-ধূম বেদ-ওঙ্কার ছাইল অনন্ত ।
খড়্গ-পাণি শ্রীচণ্ডী অরাজক মহীতে
দৈত্য নিশুম্ভ-শুম্ভে এলো বুঝি দহিতে,
বিশ্ব কাঁদে প্রেম-ভিক্ষু আনন্দ মাগিয়া ॥

১ + ৩ ০
II সসা প্‌ন্‌া সরা ৲রা | রা সা সা -া | রা জ্ঞা রা ৲মা | রা -া সা -া I
অগ্‌ নিগি রি৹ ৹ন্থু ম ন্ ত ৹ উ ঠি ল জা গি ৹ য়া ৹

I রমা পণপা মাঃ নঃ | সরা -া সা -া | পা পজ্ঞা জ্ঞা মা | মরা -া সা -া II
ব৹ হ্নি৹রা গে দি গ৹ ন ত ৹ গে ল রে রা ঙি৹ ৹ য়া ৹

১ + ৩ ০
II ননা ননা নপাঃ .পর্সঃ | র্সা -া র্সা র্সা | র্রা -র্সা র্সণা পা | পা -া পা -া I
রু৹ দ্ররো ষে৹ কি শ ঙ্ ক র উ ৹র্ ধে৹ র পা ৹ নে ৹

I পা নর্সা র্রম জ্ঞর্মাঃ মর্রঃ | র্রা -া র্সা -া | ণপা -মরা রা রা | রা -া রা -া I
ল ক্ষফ ণা৹৹৹ ভু জ ঙ্ গ ৹ বি৹ ৹৹ দ্যু ত হা ৹ নে ৹

I ররা র্রর্রা র্সণপাঃ মঃ | মা -পা মজ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা -মা রসা -প্‌ন্‌া | সা সা সা -া II
দীপ ততে জে৹৹ অ ‘ন ন্ ত৹ না গে র্ ঘু৹ ৹ম্ ভা ঙি য়া ৹

II ণণা ণপমা রসা সণ্পা | পন্া -া সা -া | পন্া -া ন্া সা | সা রা রা -া I
লঙ্ কা দা হ ন হো০ ০ মা ০ গ্ নি ০ সা গ্ নি ক ম ন্ ত্র ০

I রা মমা মপা মপা | মজ্ঞা -া জ্ঞমরা সা | সা রা রপা পা | পা -া পা -া I
য জ্ঞ ধূ ০ ম বেদ ও ০ ঙ্ কা ০ র্ ছা ই ল ০ অ ন ন্ ত ০

I মপা পপণা পনা নর্সা | র্সা -া র্সা -া | র্র্রা র্সর্সা ণণা পপা | পা পা পা -া I
খড় গপা ০ ণি ০ শ্রী ০ চ ন্ ডী ০ অ ০ রা ০ জ ০ ক ০ ম হী তে ০

I পা র্র্রা র্র্রা র্মজ্ঞা | জ্ঞর্মা র্রা র্সা -া | র্র্সা ণপা মমা ররা | রা রা রা -া I
দৈ ত্য নি শুম্ ভ ০ শু ০ ম্ ভে ০ এ ০ লো ০ বু ০ ঝি ০ দ হি তে ০

I রমা পণা পপা মপা | মজ্ঞা মা মা -া | মরা সা -প্া ন্সা | পা মা রা -া II II
বি ০ শ্ব কাঁ দে ০ প্রেম ভি ০ ০ ক্ষু ০ আ ০ ন ন্ দ ০ মা গি য়া ০

* 'লঙ্ক-দহন্ সারং'—অপ্রচলিত রাগ। কাফি ঠাট্ ও খাড়ব জাতীয়।
আরোহী—প্া ন্া সা রা, জ্ঞা রা, মা পা না র্সা।
অবরোহী—র্সা ণা পা জ্ঞা, মা রা সা।
আরোহী ও অবরোহীতে 'ধৈবত' বর্জিত। দুই 'নিখাদ'ই ব্যবহৃত হয়।
বাদী = রা। সম্বাদী = পা।

—স্বরলিপিকার।

শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান সম্বন্ধে বক্তব্য

মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

(৭)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, মিথিলা-বিজয়ী বাঙ্গালা নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন না। তাঁহার জন্মভূমি যে শ্রীহট্ট ইহা বিবাদগ্রস্ত। কিন্তু বৈদ্যকুলচূড়ামণি ভক্তপ্রবর মুরারি গুপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও নবদ্বীপে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি যে শ্রীহট্ট এ বিষয়ে বিবাদ নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবন দাস লিখিয়া গিয়াছেন—

"শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য পূজিত॥
ভবরোগবৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার" ॥১।২।

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত মুরারিগুপ্ত সংস্কৃত ভাষায় যে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য রচনা করেন, উহা 'মুরারি গুপ্তের করচা' বা কড়চা নামে প্রসিদ্ধ এবং উহাই শ্রীচৈতন্যচরিতগ্রন্থের মধ্যে আদি গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থ কোন্ সময়ে রচিত বা সমাপ্ত হয়, এ বিষয়ে অনেকে অনেক বিচার করিয়াছেন। কিন্তু বিচার করিলেও ঐরূপ অনেক বিষয়ে বিচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তথাপি বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য। বিমানবাবু বিচার করিয়া লিখিয়াছেন—

"শ্রীবাস ও দামোদর পণ্ডিতের জীবনকালেই মুরারির গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। অনুমান হয় মহাপ্রভুর তিরোধানের দুই বৎসরের মধ্যে গ্রন্থ লেখা শেষ হয়। এরূপ অনুমানের কারণ এই যে মুরারির ন্যায় অন্তরঙ্গ ভক্তের পক্ষে শোক সামলাইতে এক বৎসর ও গ্রন্থ রচনা করিতে এক বৎসর লাগিতে পারে।" ৭৬ পৃঃ

বিমানবাবুর শেষে লিখিত 'অনুমানের কারণ'টি তাঁহার কল্পিত। কিন্তু তিনি মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ-সমাপ্তির কাল-নির্ণয় করিতে যে সমস্ত কথা লিখিয়াছেন, তাহা বিচার্য্য। তাই বিমানবাবুর কথার সমালোচনায় আমিও কিছু বিচার করিব। বিমানবাবুর মতখণ্ডন বা কোন মতস্থাপন আমার উদ্দেশ্য নহে।

বিমানবাবু মুরারি গুপ্তের করচার তৃতীয় সংস্করণের শেষে মুদ্রিত শ্লোকে "চতুর্দ্দশ শতাব্দান্তে পঞ্চত্রিংশতি বৎসরে" এই পাঠই গ্রহণ করিয়া বিচারপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, এই শ্লোকে লিখিত ১৪৩৫ শকাব্দে ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে পারে না। কারণ ১৪৫৫ শকাব্দে মহাপ্রভুর তিরোভাব হয়। কিন্তু মুরারি গুপ্তের ঐ গ্রন্থে মহাপ্রভুর শেষ ১২ বৎসরের 'গম্ভীরা লীলা'র বর্ণনও আছে। পরন্তু মহাপ্রভুর তিরোধানের উল্লেখও আছে। অতএব ঐ গ্রন্থ মহাপ্রভুর তিরোধানের পরেই রচিত হইয়াছে। "অনুমান হয় মহাপ্রভুর তিরোধানের দুই বৎসরের মধ্যে গ্রন্থ লেখা শেষ হয়।"

তাহা হইলে ঐ গ্রন্থের শেষে "চতুর্দ্দশ শতাব্দান্তে পঞ্চত্রিংশতি বৎসরে। আষাঢ়-সিতসপ্তম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ"—এইরূপ শ্লোক দেখা যায় কেন? বিমানবাবু ইহার সমাধান করিতে পরে লিখিয়াছেন—

"মুরারির মুদ্রিত গ্রন্থের শেষকালে বালক শ্লোকটি পরবর্ত্তীকালে কেহ বসাইয়া দিয়াছেন। হয়ত তিনি ভাবিয়াছিলেন ১৪৩৫ শকে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বলিলে উহার প্রামাণ্য বাড়িয়া যাইবে।" (৭৭ পৃঃ)।

"মুরারির মুদ্রিত গ্রন্থের শেষকালে বালক শ্লোকটি"—এই কথার দ্বারা কে কি বুঝিবেন জানি না। মুদ্রিত গ্রন্থের শেষকাল বলিতে যে কালে অমৃতবাজার কার্য্যালয় হইতে ঐ গ্রন্থের মুদ্রণ শেষ হয়, সেই কালই কেহ বুঝিবেন কি? তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারেন যে, সেইকালে কোন বালক ঐ শ্লোকটি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন এবং পরে কেহ তাহা সর্ব্বশেষে বসাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি বুঝিয়াছি, বিমানবাবু এমন কথা বলেন নাই। তবে ঐরূপ ভাবা না লেখাই ভাল।

বিমানবাবু পূর্ব্বোক্ত কথার পরে লিখিয়াছেন—"আমি

এই প্রবন্ধটি শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে পড়িয়া শুনাইলে তিনি বলেন যে হয়ত মুরারি ১৪৩৫ শক পর্য্যন্ত কালের লীলাই লিখিয়াছিলেন। পরে মুরারির পরিবারভুক্ত কোন ব্যক্তি হয়ত অবশিষ্ট অংশও ভূমিকা প্রভৃতি যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। এ অনুমানের গুরুত্ব আমি স্বীকার করি। তবে মুরারির পরবর্ত্তী কোন ব্যক্তি যদি কিছু যোগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে কার্য্য লোচনের চৈতন্যমঙ্গল রচনার পূর্ব্বেই হইয়াছিল বলিতে হয়। কেন না লোচন মুরারির গ্রন্থের বৃন্দাবন ভ্রমণাদির অনুবাদ করিয়াছেন, মুরারির কাল হইতে লোচনের গ্রন্থ রচনার কালের ব্যবধান ৫০।৬০ বৎসরের বেশী হইবে না। অত অল্প সময়ের মধ্যে মুরারির মত সুপ্রসিদ্ধ ভক্তের গ্রন্থে অপর কেহ কিছু সংযোজনা করিবেন, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।" (৭৭ পৃঃ)

কিন্তু "মুরারির মুদ্রিত গ্রন্থের শেষকালে বালক শ্লোকটি পরবর্ত্তীকালে কেহ বসাইয়া দিয়াছেন" ইহা কি বিমানবাবুর ন্যায় সকলেরই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইবে? তাহা না হইলে ঐরূপ কথা নিশ্চয় করিয়া না লেখাই ভাল।

বিমানবাবু জ্ঞান-বয়োবৃদ্ধ দীনেশবাবুর অনুমানের গুরুত্ব স্বীকার করিয়াও তাঁহার অনুমানে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই! কিন্তু দীনেশবাবু কোন অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। তিনি 'হয়ত' বলিয়া তাঁহার তৎকালীন একটা সম্ভাবনারূপ কল্পনাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রকৃত সত্য ধরিতে না পারিলে কল্পনাশীল মানবগণ সে বিষয়ে নানারূপ কল্পনাই করে। মহাকবি ভারবি যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন—"বিচিত্ররূপাঃ খলু চিত্তবৃত্তয়ঃ।" মানবের অসংখ্য বিচিত্র চিত্ত-বৃত্তির মধ্যে সম্ভাবনারূপ কল্পনাও আছে এবং নিশ্চয়রূপ কল্পনাও আছে। সকল কল্পনাই সকলের মনঃপূত হয় না এবং অনেক কল্পনা অনেকের মনঃপূত হয়, ইহাও চিরপ্রসিদ্ধ সত্য।

কিন্তু বিচারকের পক্ষে কল্পনার লাঘব-গৌরব বিচারও কর্ত্তব্য। কল্পনার অতিরিক্তত্ব বা আধিক্যই কল্পনার গৌরব দোষ। সুতরাং দীনেশবাবুর কল্পনা হইতে বিমানবাবুর কল্পনার লাঘব বা গৌরব, ইহা বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। বিমানবাবুর লিখিত দীনেশবাবুর কথানুসারে আমরা বুঝিয়াছি যে, মুরারির গ্রন্থ শেষে মুদ্রিত "চতুর্দ্দশ শতাব্দান্তে" ইত্যাদি শ্লোকটি পরে কেহ 'বসাইয়া দিয়াছেন'—এমন কথা দীনেশবাবু বলিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন যে, ঐ শ্লোকে উল্লিখিত ১৪৩৫ শকাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের ২৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লীলাই মুরারি গুপ্ত লিখিয়া পরে ঐ শ্লোকটি লিখিয়াছিলেন। পরে তাঁহার পরিবারভুক্ত কোন ব্যক্তি হয়ত অন্য অংশ রচনা করিয়া ঐ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু ডাঃ দীনেশবাবুর এই কল্পনাতেও প্রশ্ন হয় যে, পরে কোন ব্যক্তি ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত করিলে তিনিই কি মুরারি গুপ্তের লিখিত "চতুর্দ্দশ শতাব্দান্তে" ইত্যাদি শ্লোকটি গ্রন্থ শেষে লিখিয়া দিয়াছিলেন? তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ১৪৩৫ শকাব্দের পরে ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত হওয়ায় শেষে ঐরূপ শ্লোক লেখা যে সংগত হয় না—ইহা তিনি তখন বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু যিনি পরে সংস্কৃত ভাষায় ঐ গ্রন্থের শেষ অংশ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ঐরূপ প্রমাদের কল্পনা করা যায় না। তবে গ্রন্থ শেষে ঐরূপ শ্লোক দেখা যায় কেন?

আমার মনে হয়, দীনেশবাবুর কল্পনানুসারে বলা যায় যে, মুরারির পরিবারভুক্ত কোন ব্যক্তি ১৪৭৫ শকাব্দে ঐ গ্রন্থের শেষে কিয়দংশ রচনা করিয়া পরে তিনিই শ্লোক লিখিয়াছিলেন—"চতুর্দ্দশ শতাব্দান্তে পঞ্চাদ্রি-শকবৎসরে। আষাঢ়-সিত সপ্তম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥" (পঞ্চ+অদ্রি=পঞ্চাদ্রি। অদ্রি ৭, পঞ্চ ৫) তাহা হইলে উক্ত শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায় যে, ১৪৭৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে আষাঢ় মাসের শুক্ল সপ্তমীতে "গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ" অর্থাৎ ঐ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়। ১৪৬৪ শকাব্দে কবিকর্ণপুর মহাকাব্য রচনাকালে মুরারি গুপ্তের নিজের লিখিত অংশই পাইয়া তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু লোচনদাস "চৈতন্যমঙ্গল" রচনাকালে সম্পূর্ণ গ্রন্থই পাইয়াছিলেন—ইহা ও বিমানবাবুর মতানুসারে বলিবার কোন বাধা হয় না। কারণ বিমানবাবু লোচনদাসের "চৈতন্যমঙ্গল"—রচনার কাল নির্ণয় করিতে বিচার করিয়া বলিয়াছেন—"১৫৬০ হইতে ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে শ্রীচৈতন্য মঙ্গল রচিত হইয়াছিল বলিয়া আমি বিবেচনা করি" (২৫৫ পৃঃ)।

বস্তুতঃ মুরারি গুপ্তের করচার অবিকৃত বিশুদ্ধ পুঁথি

পাওয়া যায় নাই। পূর্ব্বোক্ত "চতুর্দ্দশ শতাব্দান্তে" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে "পঞ্চাদ্রি শক বৎসরে" এই পাঠ কোন অংশে বিকৃত বা অবোধ্য হওয়ায় পরে কোন লেখক ঐস্থলে "পঞ্চত্রিংশতি বৎসরে" এইরূপ লিখিতে পারেন—ইহা অসম্ভব নহে। পূর্ব্বে সংস্কৃত ব্যাকরণে অব্যুৎপন্ন অনেক ব্যক্তিও সংস্কৃত পুথি লিখিয়াছেন, ইহাও সত্য। আর অমৃতবাজার কার্য্যালয় হইতে মুদ্রিত ঐ গ্রন্থে যে বহু অশুদ্ধি আছে, ইহাও সত্য। কিন্তু বিমানবাবু সেবিষয়ে কিছু বেশী কথা লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"গ্রন্থখানির তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হইলেও ইহাতে অজস্র ভুল রহিয়াছে।" "মহাত্মা শিশিরকুমার বা মৃণালবাবু ইচ্ছা করিলেই বইখানি পণ্ডিতের দ্বারা আদ্যোপান্ত সংশোধন করাইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু—এরূপ সংশোধনের উপদ্রবে অনেক সময়েই মূলগ্রন্থের অর্থ বিকৃত হয়। অমৃতবাজারের কর্ত্তৃপক্ষ যে গ্রন্থখানির উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ভুল ছাপা।" (৬৯-৭০)

কিন্তু এই প্রকৃষ্ট প্রমাণের দ্বারা "অমৃতবাজারের কর্ত্তৃপক্ষ যে গ্রন্থখানির উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই" ইহা কখনই প্রতিপন্ন হয় না। আর মহাত্মা শিশিরকুমার বা মৃণালবাবু যে, কোন পণ্ডিতের দ্বারা ঐ গ্রন্থের সংশোধনের ইচ্ছাই করেন নাই, ইহাও কোনরূপে সত্য হইতে পারে না। প্রকাশকের নিবেদনে বিজ্ঞবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ মহোদয় প্রথম পৃষ্ঠাতেই লিখিয়াছেন—"দুর্ভাগ্যক্রমে দুইখানি পুঁথির একখানিও শুদ্ধভাবে লিখিত ছিল না। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুবংশজাত (বর্ত্তমানে নিত্যধামগত) শ্রীল শ্যামলাল গোস্বামিপ্রভুপাদের উপর এই গ্রন্থের সম্পাদনের ভার অর্পিত হয়।"

প্রভুপাদ শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় যে বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুবিখ্যাত প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন, ইহা পণ্ডিত সমাজে সকলেই জানেন। কিন্তু অনেক প্রাচীন পুঁথির বহুস্থলেই যে, এখন প্রকৃত পাঠোদ্ধার অসম্ভব হইয়াছে, ইহাও ত অতি সত্য। কত পণ্ডিত কত পরিশ্রম করিয়াও এপর্য্যন্ত কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণের আদ্যোপান্ত প্রকৃত পাঠোদ্ধার করিতে পারিয়াছেন কি? এইরূপ মুরারি গুপ্তের ঐ গ্রন্থেরও 'পণ্ডিতের দ্বারা আদ্যোপান্ত সংশোধন' কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, ইহা আমরা জানিনা। আর যদি "সংশোধনের উপদ্রবে অনেক সময়েই মূলগ্রন্থের অর্থ বিকৃত হয়"—তাহা হইলে অমৃতবাজারের কর্ত্তৃপক্ষ সেই উপদ্রব না ঘটাইয়া ভালই ত করিয়াছেন।

পরন্তু বিমানবাবু নিজেও ত মুরারির ঐ গ্রন্থের অনেক মুদ্রিত পাঠের সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি ঐ মুদ্রিত পুস্তকে 'অজস্র ভুল' লক্ষ্য করিয়াও শেষে মুদ্রিত শ্লোকে কিছু লক্ষ্য করেন নাই কেন। এখন সেই কথাই বলিব।

প্রথমে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, শেষে মুদ্রিত "চতুর্দ্দশ শতাব্দান্তে" ইত্যাদি শ্লোকে 'শক' শব্দ নাই। "চতুর্দ্দশ শতাব্দ" বলিলেই যে ১৪০০ শকাব্দই বুঝা যায়, ইহা বলা যায় না। পরন্তু "পঞ্চত্রিংশতি বৎসরে" এইরূপ সংস্কৃত কিরূপে শুদ্ধ ও প্রকৃতার্থের বোধক হইতে পারে, ইহাও বুঝা অত্যাবশ্যক। "পঞ্চত্রিংশৎ" শব্দের উত্তর পূরণার্থ 'ড' প্রত্যয়ে "পঞ্চত্রিংশ" শব্দই সিদ্ধ হয়। চতুস্ত্রিংশ বৎসরের পরবর্ত্তী এবং ষট্‌ত্রিংশবৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরকেই পঞ্চত্রিংশ বৎসর বলে, ইহাও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অজ্ঞাত নহে। কিন্তু "পঞ্চত্রিংশতি বৎসরে" লিখিলে পঞ্চত্রিংশ বৎসর বুঝা যায় না। সুতরাং মুরারি গুপ্ত যে ঐরূপ লিখিয়াছেন, ইহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। অতএব ঐরূপ শ্লোককে গ্রহণ করিয়া সমস্যায় পড়িয়া নানারূপ কল্পনা অনাবশ্যক। উক্ত শ্লোকে "পঞ্চত্রিংশতি বৎসরে" এই স্থলে যেরূপ পাঠ সংগত হয়, সেইরূপ পাঠ-কল্পনাই সমুচিত।

কিন্তু বিমানবাবু এত কল্পনা করিয়াও উক্ত শেষ শ্লোকে কোন পাঠ কল্পনা কেন করেন নাই, ইহা চিন্তনীয়। ১৪৫৬ শকাব্দে আষাঢ় শুক্লসপ্তমীতে মুরারি গুপ্তের ঐ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে—ইহা বলিলে যদি তাঁহার মতের কোন বাধা না হয়, তবে তিনি 'হয়ত' বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা না লিখিয়া লিখিতে পারিতেন যে—হয় ত উক্ত শ্লোকে দ্বিতীয় চরণে "ষট্‌পঞ্চ শক বৎসরে" ইহাই প্রকৃত পাঠ ছিল। পরে প্রাচীন পুঁথিতে "ষট্" এই অক্ষরদ্বয় বিলুপ্ত হওয়ায় কোন লেখক "পঞ্চশক" এই স্থলে নিজবুদ্ধি অনুসারে 'পঞ্চবিংশতি' এবং কোন লেখক 'পঞ্চত্রিংশতি' এইরূপ লিখিয়াছিলেন। তাই পরে কোন পুস্তকে উক্তস্থলে 'পঞ্চ-বিংশতি বৎসরে' এবং কোন পুস্তকে 'পঞ্চত্রিংশতি বৎসরে'

এইরূপ পাঠ দেখা গিয়াছে। উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে "ষট পঞ্চশক বৎসরে" এইরূপ পাঠ হইলে উহার দ্বারা ১৪৫৬ শকাব্দে ঐ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। পরন্ত প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইলেও উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় চরণটিকেই প্রক্ষিপ্ত বলিতে হয়। কারণ উহাই নানা কল্পনার মূল। তথাপি বিমানবাবু সম্পূর্ণ শ্লোকটিকেই পরে অন্যের প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন কেন, ইহাও চিন্তনীয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কল্পনা করিতে হইলে বিভিন্ন কল্পনার লাঘব গৌরব-বিচারও বিচারকের কর্ত্তব্য। কিন্তু বিমানবাবুর কল্পনায় গৌরব দোষই আমি বুঝিতেছি। কারণ, তাঁহার কল্পনা রক্ষা করিতে হইলে আরও অনেক কল্পনা করিতে হইবে। তাঁহার মতে যে ব্যক্তি পরে মুরারির গ্রন্থ-শেষে 'বালক শ্লোকটি' 'বসাইয়া দিয়াছেন', তাঁহার সম্বন্ধে কল্পনা করিতে হইবে যে তিনি ব্যাকরণ জানিতেন না। কারণ তিনি লিখিয়াছেন—পঞ্চত্রিংশতি বৎসরে। তিনি উক্ত শ্লোকে অবশ্য কর্ত্তব্য "শক" শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। পরন্ত মুরারি গুপ্তের ঐ গ্রন্থে যে শ্রীচৈতন্যদেবের শেষ লীলারও বর্ণন আছে, ইহাও তিনি জানিতেন না। তিনি ঐ গ্রন্থ পড়েন নাই। পরন্ত ঐ গ্রন্থের প্রামাণ্যবৃদ্ধির আশায় ঐরূপ শ্লোক রচনা করায় তিনি প্রতারক এবং নির্ব্বোধ। কারণ তিনি ঐ গ্রন্থের প্রামাণ্য বৃদ্ধির ইচ্ছা করিয়া উহার প্রামাণ্য নাশেরই কার্য্য করিয়াছেন। ইহাকে "মূলনাশ ন্যায়" বলে।

যেমন কোন ব্যক্তি ধন বৃদ্ধি বা অন্য কোন বৃদ্ধির ইচ্ছায় এমন কোন কার্য্য করিলেন যে, তদ্দ্বারা তাঁহার মূলও নষ্ট হইয়া গেল, তদ্রূপ যে ব্যক্তি মুরারি গুপ্তের ঐ গ্রন্থের প্রামাণ্য বৃদ্ধির আশায় গ্রন্থ শেষে ঐরূপ মিথ্যার্থ শ্লোক বসাইয়া দিয়াছেন, তিনি তখন ইহা বুঝেন নাই যে ঐ গ্রন্থ পাঠের পরে শেষে ঐ শ্লোকটি দেখিয়া অনেকে উহার প্রামাণ্যই স্বীকার করিবেন না। অনেকে অনেক রূপ কল্পনা করিবেন। আর গ্রন্থের প্রামাণ্যের বৃদ্ধি কি এবং তাহার কারণই বা কি, ইহা বুঝাইতেও অনেক কল্পনা করিতে হইবে।

ফল কথা, বিমানবাবুর ঐ কল্পনা রক্ষা করিতে হইলে পূর্ব্বোক্তরূপ অনেক কল্পনা করিতে হইবে। ঐরূপ কল্পনাকে নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন, **কুসৃষ্টি কল্পনা**। কিন্তু যে পক্ষে ঐরূপ কল্পনা-গৌরব দোষ হয় সেই পক্ষ গ্রাহ্য নহে—ইহাই বিচার-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। নৈয়ায়িকের ন্যায় বিচারশাস্ত্রবিৎ মীমাংসকও বলিয়াছেন—

> "কল্পনা-গৌরবং যত্র তং পক্ষং ন সহামহে।
> কল্পনা-লাঘবং যত্র তং পক্ষং রোচয়ামহে॥"

এখন মুরারি গুপ্তের কোন বর্ণনায় বিমানবাবুর নূতন ব্যাখ্যারও কিছু বিচার করিব। বিমানবাবু লিখিয়াছেন—

"মুরারি গুপ্তের কড়চাকে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয় যে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া ঘোষণা করেন। ঘটনাটি এই—একদিন বিশ্বম্ভর স্বগৃহে বসিয়া প্রেমাতিবিহ্বলভাবে আক্ষেপ করিতেছেন—"হরিতে আমার মতি হইবে কিরূপে?" তাহা শুনিয়া দেবী (বিষ্ণুপ্রিয়া) বলিলেন—

> হরেরংশ মবেহি ত্বমাত্মানং পৃথিবীতলে।
> অবতীর্ণোঽসি ভগবন্ লোকানাং প্রেমসিদ্ধয়ে।
> খেদং মা কুরু যজ্ঞোঽয়ং কীর্ত্তনাখ্যঃক্ষিতৌ কলৌ।
> তৎপ্রসাদাৎ সুসম্পন্নো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
> এবং শ্রুত্বা গিরং দেব্যা হর্ষযুক্তোবভূব সঃ॥

শ্লোকে উল্লিখিত দেবী (গিরং দেব্যা) খুব সম্ভব বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। ঐ শব্দে শচীমাতা বুঝাইলে তাঁহার নাম স্পষ্ট বলা হইত। অন্যান্য স্থানে সেইরূপই করা হইয়াছে। (৫৯১-৯২)

এখানে প্রথমে বলা আবশ্যক যে, শ্রীচৈতন্যদেবের পিতৃকৃত নাম বিশ্বম্ভর এবং তাঁহার পত্নীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। একদিন বিশ্বম্ভর নিজগৃহে 'প্রেমাতিবিহ্বল ভাবে আক্ষেপ করিতেছেন—"হরিতে আমার মতি হইবে কিরূপে?" তাহা শুনিয়া তখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বলিলেন যে, 'তুমি পৃথিবীতে নিজেকে হরির অংশ বলিয়া জান। ভগবন্! তুমি জনগণের প্রেমসিদ্ধির নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ। তুমি খেদ করিও না। তোমার অনুগ্রহে কলিযুগে পৃথিবীতে কীর্ত্তন নামক যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইবে, সংশয় নাই। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর এইরূপ বাণী শ্রবণ করিয়া "হর্ষযুক্তো বভূব সঃ" অর্থাৎ তিনি হর্ষযুক্ত হইয়াছিলেন, ইহাই মুরারি গুপ্তের ঐ বর্ণনায় বিমানবাবুর নূতন ব্যাখ্যা। কিন্তু তৎকালে ঐরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়াই বিশ্বম্ভর হর্ষযুক্ত হইয়াছিলেন—ইহাই সরল

প্রাচীন ব্যাখ্যা। তদনুসারেই চৈতন্যমঙ্গলে লোচন দাস লিখিয়া গিয়াছেন—

"হেন কালে দৈববাণী উঠিল সাদরে।
আপনে ঈশ্বর তুমি শুন বিশ্বম্ভরে॥" (মধ্য)

বিমানবাবু লিখিয়াছেন, "দেবী বিশ্বম্ভরকে ভগবান্ বলিলেন ইহা অপেক্ষা বিশ্বম্ভর দৈববাণীতে উহা শুনিলেন বর্ণনা চমকপ্রদ। তাই লোচন ঐভাবে ঘটনাটিকে বর্ণনা করিয়াছেন। লোচনের অনুবাদে এরূপ সংযোজনা অনেক আছে।" (৫৯৩ পৃঃ)

কিন্তু 'দেবী বিশ্বম্ভরকে ভগবান্ বলিলেন' আর 'বিশ্বম্ভর দৈববাণীতে উহা শুনিলেন' এই দুই কথার অর্থ-ভেদের কারণ কি? "দেবী" শব্দের কি কেবল বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীই অর্থ? আর "অনুবাদ" শব্দের অর্থ কি? বিমানবাবুর মতে লোচন দাস যখন উক্ত স্থলে মুরারির বর্ণনা হইতে অন্যরূপ বর্ণনাই করিয়াছেন, তখন লোচনদাস মুরারির কথার ঐরূপে অনুবাদ করিয়াছেন, ইহা তিনি বলিতেই পারেন না। পরন্তু লোচনদাস যে, মুরারির ঐ তাৎপর্য্য বুঝিয়াও কেবল "চমকপ্রদ" বর্ণনার উদ্দেশ্যেই ঐরূপ মিথ্যা দৈববাণীর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, এমন কথা মনে থাকিলেও পুস্তকে না লেখাই ভাল।

বিমানবাবু মুরারির উক্ত শ্লোক পড়িয়া বুঝিয়াছেন যে, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার স্বামী বিশ্বম্ভরকে ভগবান্ বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু মুরারি যে, পূর্ব্বেই প্রথম প্রক্রমের শেষ সর্গে কিরূপ দৈববাণীর বর্ণন করিয়াছেন, ইহাও দেখা আবশ্যক। মুরারি পূর্ব্বেই বর্ণন করিয়াছেন যে, বিশ্বম্ভর পিতৃশ্রাদ্ধের উদ্দেশ্যে ৺গয়াধামে গেলে সেখানে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার নিকটে মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণের পরে কৃষ্ণপ্রেমে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া কোন সময়ে মথুরায় চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক হন। তখন—

প্রাহা শরীরা নবমেঘনিস্বনা
বাণী ত্বমাহ্বয়চল স্বমন্দিরং।
ততঃ পরং কালবশেন দেব!
মথোর্ব্বনঞ্চান্তদপি স্বচেষ্টয়া॥
ভবান্ হি সর্ব্বেশ্বর এব নিশ্চিতঃ ইত্যাদি
১।১৬।৯-১১

অর্থাৎ তখন 'নবমেঘনিস্বনা অশরীরা বাণী' তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলেন যে, তুমি নিজ গৃহে যাও। ততঃপর কালবশে মথুরায় এবং অন্যত্রও যাইবা। তুমি সর্ব্বেশ্বরই নিশ্চিত ইত্যাদি। মুরারির উক্ত বর্ণনানুসারে পরে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয়ও 'চৈতন্যভাগবতে'র আদিখণ্ডের শেষ অধ্যায়ে ঐ ঘটনার বিস্তৃত বর্ণন করিতে লিখিয়াছেন—

"কথো দুর যাইতে শুনেন দিব্যবাণী।
এখনে মথুরা না যাইবা দ্বিজমণি॥
যাইবার কাল আছে যাইবা তখনে।
নবদ্বীপে নিজগৃহে চলহ এখনে॥
তুমি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লোক নিস্তারিতে।
অবতীর্ণ হইয়াছ সভার সহিতে॥"

বলা বাহুল্য মুরারিগুপ্তের পূর্ব্বলিখিত শ্লোকে দৈববাণীর বর্ণনার অপলাপ করিয়া উহার কোন নূতন ব্যাখ্যা করা যায় না। তাহা হইলে—মুরারিগুপ্তের বর্ণনানুসারে বিশ্বম্ভর যে, সর্ব্বপ্রথমে দৈববাণীতেই তিনি সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ ইহা শুনিয়াছিলেন, ইহাই বলিতে হয়। যাহা হউক, এখন দেখিতে হইবে বিমানবাবু মুরারিগুপ্তের করচায় বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন কোথায়। তিনি মুরারিগুপ্তের "এবং শ্রুত্বাগিরং দেব্যা হর্ষযুক্তো বভূব সঃ" এই পর্য্যন্ত আড়াই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ১।২।৭-১০ লিখিয়াছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত শ্লোক করচার দ্বিতীয় প্রক্রমের দ্বিতীয় সর্গে আছে। তন্মধ্যে সপ্তম ও অষ্টম শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

"একদা নিজগেহে স বসন্ প্রেমাতিবিহ্বলঃ।
বসামি কুত্র তিষ্ঠামি কথং মেস্যাম্মতির্হরৌ॥৭॥
ইতি বিহ্বলিতং দেবোনাম্না তং প্রাহ সাদরং।
হরেরংশমবেহি ত্বমাত্মানং পৃথিবীতলে॥৮।

মুরারিগুপ্তের গ্রন্থের সহিত অনেকের সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। কিন্তু দেখা আবশ্যক যে, বিমানবাবু উক্ত স্থলে মুরারিগুপ্তের অষ্টম শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ ত্যাগ করিয়া "হরেরংশ" ইত্যাদি আড়াই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। অষ্টম শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে আছে, "দেবো নাম্না তং প্রাহ।" ঐ কথার দ্বারা দেবী (বিষ্ণুপ্রিয়া) বলিলেন—ইহা কোনরূপেই বুঝা যায় না। বিমানবাবু কিন্তু ঐ কথার ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (৫৯২ পৃঃ)

অবশ্য পরে দশম শ্লোকে "এবং শ্রুত্বা গিরং দেব্যাঃ" এইস্থলে 'দেবী' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু তাহা দেখিয়া বিমানবাবু পূর্ব্বে অষ্টম শ্লোকে "ইতি বিহ্বলিতং দেবী" এইরূপ পাঠ কল্পনা করিলে সে কথা বলেন নাই কেন? অষ্টম শ্লোকের ঐ পূর্ব্বার্দ্ধ উদ্ধৃত না করার হেতু কি? কিন্তু লোচনদাসও লিখিয়াছেন—"এতেক বচন যবে দেবমুখে শুনি। অন্তর হরিষ কিছু না কহিলা বাণী" (মধ্য)।

তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, লোচনদাসও মুরারির উক্ত অষ্টম শ্লোকে "দেব" শব্দ গ্রহণ করিয়াই উক্ত পয়ারে "দেবমুখে" লিখিয়াছেন এবং পরে দশম শ্লোকে তিনি "এবং শ্রুত্বাগিরং দৈবীং" এইরূপ পাঠই দেখিয়াছিলেন। আমাদিগেরও উক্ত স্থলে ঐরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। কারণ পূর্ব্বে অষ্টম শ্লোকে "দেব" শব্দেরই প্রয়োগ দেখা যায়। বস্তুতঃ উক্তস্থলে 'দেবী' পাঠ কল্পনা করিলেও তদ্দ্বারা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীই বুঝা যায় না। পরন্তু উক্ত শ্লোকে "নাম্না" এই পদের অর্থ কি? বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কি তৎকালে 'হে বিশ্বম্ভর' এইরূপে তাঁহার নাম করিয়া ঐ সমস্ত কথা বলিতে পারেন? মনে রাখিতে হইবে, মুরারিগুপ্তের ঐ অষ্টম শ্লোকে প্রথমে আছে,—"ইতি বিহ্বলিতং দেবো নাম্না তং প্রাহ সাদরং।" বিমানবাবু ঐ পূর্ব্বার্দ্ধ উদ্ধৃত করেন নাই। কিন্তু ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"দেবী (বিষ্ণুপ্রিয়া) বলিলেন।"

বিমানবাবু পরে তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করিতে লিখিয়াছেন—

"কড়চায় মুদ্রিত 'এবং শ্রুত্বাগিরং দেব্যা' পাঠটি ঠিক মনে হয়। কেন না উহার মধ্যে অলৌকিক কিছু নাই—স্বামীর প্রেমভাব দেখিয়া স্ত্রী তাঁহাকে ভগবানের অংশ বলিয়া স্থির করিলেন ও তাঁহাকে সেই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহে সান্ত্বনা দিলেন।" ৫৯৩ পৃঃ

বিমানবাবু উক্তস্থলে "এবং শ্রুত্বাগিরং দেব্যা" এইরূপ পাঠ নির্ণয়ের কারণ বলিয়াছেন, "উহার মধ্যে অলৌকিক কিছু নাই" ইত্যাদি। তাহা হইলে বুঝিব কি যে, উহার মধ্যে অলৌকিক কিছু থাকিলে ঐ পাঠ তিনি ঠিক মনে করেন না? মুরারিগুপ্ত যে উহার পূর্ব্বেই অলৌকিক দৈববাণীর বর্ণন করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

পরন্তু পরে উক্তস্থলে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বাণীই তাঁহার বিবক্ষিত হইলে তিনি উক্ত দশম শ্লোকে "এবং প্রিয়াগিরং শ্রুত্বা হর্ষযুক্তো বভূব সঃ" এইরূপ রচনা করেন নাই কেন? কবিগণ উক্তরূপ স্থলে পত্নী বুঝাইতে প্রায়শঃ "প্রিয়া" শব্দেরই প্রয়োগ করেন। যেমন কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে মহাকবি ভারবি লিখিয়াছেন—"বিহিতাং প্রিয়য়া মনঃপ্রিয়া মথ নিশ্চিত্য গিরং গরীয়সীং।" মুরারিগুপ্তের গ্রন্থেও পরে দেখা যায়—"প্রকাশরূপেণ নিজ প্রিয়ায়াঃ" (৪।১৪) "বিষ্ণুপ্রিয়া" এই নামের শেষেও 'প্রিয়া' শব্দ আছে। সুতরাং "এবং প্রিয়া-গিরং শ্রুত্বা হর্ষযুক্তো বভূব সঃ" এইরূপ রচনা করিলে যে-কবিত্বের প্রকাশ হয়, তাহা কি মুরারিরও ছিল না?

পরন্তু বিমানবাবুর উদ্ধৃত শ্লোকের পরেই "কদাচিদ্দৈবযোগেন" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা মুরারিগুপ্ত যে তাঁহার নিজগৃহে দেবালয়ে বিশ্বম্ভরের বরাহ ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যে অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা, ইহা বিমানবাবুরও স্বীকৃত। তিনি সেখানে কোন নূতন ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্তু পূর্ব্বে (১৫ পৃঃ) সেই কথা লিখিতে তিনি শিরোনাম লিখিয়াছেন—

কি প্রকার অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা অবিশ্বাস্য

বিমানবাবুর ঐ কথার সমালোচনায় এখন এইমাত্র বলিতেছি যে, "অবিশ্বাস্য" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় তিনটি পক্ষ হইতে পারে। (১) সর্ব্বলোকের অবিশ্বাস্য (২) অনেক লোকের অবিশ্বাস্য (৩) ব্যক্তিবিশেষের অবিশ্বাস্য। উক্ত স্থলে প্রথম পক্ষ একেবারেই মিথ্যা। কারণ এখনও সহস্র সহস্র লোক ঐরূপ বর্ণনা বিশ্বাস করিতেছেন। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষ বলিলে নূতন কিছু বলা হয় না।

যাহা হউক, এখন প্রকৃত কথা এই যে উক্তরূপ দৈববাণী বিশ্বাস না করিলেও উক্ত স্থলে মুরারিগুপ্ত ও লোচনদাসের ঐরূপ বিশ্বাসকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই। সুতরাং মুরারি যে, উক্ত স্থলে ঐরূপ দৈববাণীরই বর্ণন করিয়াছেন এবং তদনুসারেই লোচনদাসও ঐরূপ বর্ণন করিয়াছেন, ইহা বুঝিবার বাধা কি আছে? লোচনের বর্ণিত দৈববাণী ঠিক মনে না করার কারণ কি? বিমানবাবু পরে লিখিয়াছেন—

"লোচনের বর্ণিত দৈববাণী ঠিক মনে না করার একটি কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতর বিশ্বম্ভর যদি দৈববাণীতে

শুনেন যে তিনিই ভগবান্, তাহা হইলে তাঁহার "অন্তর হরিষ" হইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই—যদি দৈববাণীতে নিজের ভগবত্তার কথা শুনিয়া বিশ্বম্ভর খুসী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু নিজের তরুণী স্ত্রী তাঁহাকে হরির অংশ বলিয়া জানিয়া তাঁহাকে কীর্ত্তনে উৎসাহিত করিতেছেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার যথার্থই আনন্দিত হইবার কথা—কেন না যে বিষ্ণুপ্রিয়াকে অবহেলা করিয়া তিনি কীর্ত্তন করিয়া নিশাযাপন করেন, সেই বিষ্ণুপ্রিয়াই তাঁহাকে কীর্ত্তন প্রচার করিতে বলিতেছেন।" (৫৯১ পৃঃ)

বিমানবাবু লোচনের বর্ণিত দৈববাণী ঠিক মনে না করার একটি কারণ লেখায় বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার মনে আরও কারণ আছে। আমারও তাঁহার ব্যাখ্যা ও যুক্তি ঠিক মনে না করার অনেক কারণ মনে আছে। কিন্তু সেই সমস্ত কারণই আমি লিখিতে চাইনা। বিমানবাবু পূর্ব্বে যে, মুরারির কোন শ্লোক সম্পূর্ণ উদ্ধৃত না করিয়া মুরারির কথার কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এখন সেই ব্যাখ্যার সমর্থনে বিমানবাবুর শেষে লিখিত যুক্তির সমালোচনায় আমি বেশী কথা লিখিতে পারিবনা। কিন্তু বিশ্বম্ভর দৈববাণীতে ঐকথা শুনিলে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি পায়না এবং তজ্জন্য তাঁহার 'অন্তর হরিষ' হইবার কোন সংগত কারণ নাই, কিন্তু তাঁহার তরুণী স্ত্রী তাঁহাকে" ইত্যাদি কথাও নীরবে মানিয়া লইয়া ভক্তপ্রবর লোচনদাসকেও স্বেচ্ছানুসারে ঐরূপ মিথ্যা দৈববাণীর কল্পনাকারী বলিয়া ঘোষণা করিতেও পারিবনা। আর কেবল লোচনদাসই কি দৈববাণী শ্রবণে শ্রীগৌরাঙ্গের 'অন্তর হরিষ' এইকথা লিখিয়াছেন? "চৈতন্যভাগবতে" পূর্ব্বোক্ত দৈববাণীর বর্ণন করিয়া বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ও ত লিখিয়া গিয়াছেন—

"শুনিয়া আকাশবাণী শ্রীগৌরসুন্দর।
নিবর্ত্ত হইলা প্রভু হরিষ অন্তর॥" ১।১২

কি কারণে তখন প্রভুর "অন্তর হরিষ" হইয়াছিল, ইহা আমাদিগের ন্যায় সাধারণ মানবের বুদ্ধির অগোচর। আর সে কারণ সঙ্গত কি অসঙ্গত, ইহা বলিবার অধিকারও আমাদিগের নাই। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, উক্ত স্থলে মুরারি গুপ্ত ঐরূপ দৈববাণীরই বর্ণন করিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীই বিশ্বম্ভরকে তখন ঐ সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, ইহা তিনি লেখেন নাই। মুরারি গুপ্তের কথার ব্যাখ্যা করিতে হইলে তাঁহার বিশ্বাস ও ঐরূপ বর্ণনার উদ্দেশ্য কি, ইহাও চিন্তা করিতে হইবে।

বিমানবাবু মুরারিগুপ্তের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পরে লিখিয়াছেন—"শ্লোকে উল্লিখিত দেবী (গিরং দেব্যা) খুব সম্ভব বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।" (৫৯২ পৃঃ) কিন্তু তিনি পূর্ব্বে নিশ্চয় করিয়া ঐকথা লিখিলেও পরেই আবার কি ভাবিয়া "খুব সম্ভব" লিখিয়াছেন, ইহাও চিন্তার বিষয়। পরন্তু বিমানবাবু শেষে ইহাও লিখিয়াছেন—"যাহা হউক, যদি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বিশ্বম্ভরকে ভগবান্ বলিয়া জানিয়াও থাকেন, তাহা হইলেও তিনি বাহিরে ভক্তদের নিকট ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়না।" (৫৯৩ পৃঃ)

তাহা হইলে বিমানবাবুর পূর্ব্বলিখিত বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর "ঘোষণা" কিরূপ। আর মুরারিগুপ্ত কাহার নিকটে বিশ্বম্ভরের তরুণী স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেই সমস্ত গুপ্ত কথা শুনিয়া পরে নিজগ্রন্থে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন, স্বয়ং বিশ্বম্ভরই কি পরে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তবন্ধু মুরারিকে হরিষ অন্তরে নিজ পত্নীর সেই সমস্ত কথা বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন? এ বিষয়ে আমি আর বেশী লিখিতে পারিতেছিনা। কারণ আমি প্রাচীন। তাই পদে পদে আমার সেই প্রাচীন কথা মনে পড়ে—**শতংবদ মা লিখ**।

ক্রমশঃ

শিল্পী—অধ্যাপক শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ

মন্দির পথে

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

পরিহাস বিজল্পিতম্

একাঙ্ক নাটক

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

পাত্র-পাত্রী

মিনি, মিনির প্রণয়ী, মিনির মা, মেয়র, ক্রিটিক, প্রকাশক, রিপোর্টার, সম্পাদক, ডাক্তার, অধ্যাপক, রাজনীতিক, সাহিত্যিক, সিনেমা ডিরেক্টার, আধুনিক নারী, ভৃত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ধনীর মেয়ে মিনি! আজ তার জন্মতিথি। বয়স তার কত, বাইরের লোকের পক্ষে ঠিক বলা কঠিন; মেয়ে এক রকম বলে; মা এক রকম বলে; তার প্রণয়ীর হিসাব তৃতীয় এক রকমের; বান্ধবদের নানা জনের নানা মত; কাজেই এমন জটিল সমস্যা পূরণের চেষ্টা করিব না!

সারাদিন উৎসব চলিয়াছে! মিনির বাপ নাই; মা-র আদরের মেয়ে; উৎসবের বহর এর চেয়ে কম হইলেও বেশী বলিয়া গণ্য হইত!

উৎসবের শেষ আয়োজনটাই কিছু ফলাও রকমের; সন্ধ্যা-বেলায় একটি নাটকের অভিনয় হইবে! অভিনেতারা আসিয়া পৌঁছায় নাই বটে, কিন্তু অন্য সব ব্যবস্থা প্রস্তুত! মিনিদের বাড়ীর দোতালার বড় হল-ঘরটাতে ষ্টেজ বাঁধা হইয়াছে!

এই উপলক্ষে অনেক গণ্যমান্য অতিথি আসিবেন—এখনও আসিয়া উপস্থিত হন নাই কিন্তু আসিলেন বলিয়া।

নীচের তালার একটি প্রশস্ত হল-ঘর! পিছনের দিকে দোতালায় উঠিবার সিঁড়ি; হল-ঘরের দুই দিকে অর্থাৎ ষ্টেজের দুই উইংসে দুটি করিয়া চারটি দরজা; ঘরটিতে বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছে; অন্য আসবাব-পত্র বেশী নাই—কেবল হাট ও ছড়ি রাখিবার সরঞ্জাম; তার পাশে একখানা দেয়ালে সংলগ্ন আয়না; মাঝখানে খান দুই চেয়ার। অতিথিদের বসিবার ব্যবস্থা এখানে নয়; এখানে প্রবেশ করিলে অভ্যর্থনা করিয়া অন্যত্র লইয়া যাওয়া হইবে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মিনি ও মিনির প্রণয়ী। মিনি কলেজে-পড়া মেয়ে, তাতে ধনী, তাতে আজ আবার তার জন্মদিন—কাজেই সাজ-সজ্জার কিছু আড়ম্বর! কিন্তু অলঙ্কারের অতিশয়োক্তি নাই। বোধ হয় তার বিশ্বাস বিধাতার দেওয়া সহজাত অলঙ্কার তার অঙ্গে আছে। সুন্দর, কুৎসিৎ সব মেয়েরই বিশ্বাস অনুরূপ—মিনি তো সুন্দরী, কাজেই তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

মিনির প্রণয়ীর বয়স নিশ্চয়ই ত্রিশের এদিকে। ছিপছিপে গড়ন; উজ্জ্বল চেহারা, হঠাৎ দেখিলে ফিল্মষ্টার বলিয়া মনে হয়।

মিনি অতিথিদের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে; তার প্রণয়ী একখানা চেয়ারের পিঠের উপরে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া মিনিকে কিছু বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছে:

মিনির প্রণয়ী। মিনি, মিনি, আজ তোমার জন্মদিনে—

মিনি। ওই তো তোমার দোষ! একটুখানি আড়ালে পেয়েছ কি গলার স্বরে কেমন যেন সন্দেহের সুর লাগে!

মিনির প্রণয়ী। শোন মিনি, আজ তোমার জন্মদিনে একটা কথা—

মিনি। তোমার ওই একটা কথাকে আমি সবচেয়ে ভয় করি।

মিনির প্রণয়ী। কেন?

মিনি। কারণ নিশ্চয়ই জানি ওই একটা কথার শেষ নেই!

মিনির প্রণয়ী। বুদ্ধির অসদ্ভাব কোন দিন তোমার হয়নি। ঠিক ধরেছ! যারা অনেক কথার কারবার করে তারা হৃদয়ের খুচরো ব্যবসায়ী; আর আমার একটি কথা হৃদয়ের—

মিনি। পাইকারি ব্যবসা!

মিনির প্রণয়ী। কি আশ্চর্য্য! মনের সব কথা বুঝতে পারো—আর সেই কথাটা বুঝতে পারো না!

মিনি। কারণ, বুঝতে চাইনে।

মিনির প্রণয়ী। নাই-বা চাইলে—একবার শুনতে ক্ষতি কি!

মিনি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

মিনির প্রণয়ী। জিজ্ঞাসা করতে হবে কেন? আমি তো অমনি বলতে চাই!

মিনি। সে কথা নয়! আচ্ছা, লোকের সম্মুখে যখন তুমি কথা বলো—তখন ঠাট্টায়, বিদ্রূপে, হাসি, রসিকতায় তোমার কথাগুলো সকাল বেলার আলো-পড়া নদীর মত ঝলমল করতে থাকে। আর আমার সঙ্গে কথা বলবার সময় তোমার এমন দুর্দ্দশা হয় কেন?

মিনির প্রণয়ী। শীতে!

মিনি। শীতে? সে আবার কী?

মিনির প্রণয়ী। লোকের সম্মুখে যখন কথা বলি তখন আমি ঝলমল-করা নদী; আর তোমার সম্মুখে যখন কথা বলি তখন শীতে বরফ-জমা সেই নদী!

মিনি। সে তো বুঝ্‌লাম। কিন্তু হঠাৎ এমন বরফ জমে কেন?

মিনির প্রণয়ী। সেটা বুঝ্‌তে হলে তার আগে আমার সেই কথাটা বলতে হয়!

মিনি। তা হ'লে আর আমার বুঝে দরকার নেই!

মিনির প্রণয়ী। কিন্তু আমার যে দরকার আছে!

মিনি। আজ থাক্—বরঞ্চ আর একদিন শুনবো!

মিনির প্রণয়ী। আর কবে বা সুযোগ পাবো! এমনি ক'রেই তো কত জন্মতিথি গেল!

মিনি এবারে ভালো করিয়া প্রণয়ীর দিকে তাকাইল; তার অবস্থা দেখিয়া মিনির মন গলিয়া গেল; কিন্তু অত্যন্ত সংযত ভাবে বলিল

মিনি। আচ্ছা বলো, কিন্তু মনে থাকে যেন একটি কথা মাত্র!

মিনির প্রণয়ী। কথা একটি হলেই যে সংক্ষিপ্ত হবে তার কোন মানে নেই।

মিনি। কি রকম?

মিনির প্রণয়ী। যেমন রামায়ণকে বলতে পারো একটি মাত্র কবিতা—মহাভারতকে একটি মাত্র কবিতা—কিন্তু তাই বলে সেগুলো সংক্ষিপ্ত নয়!

মিনি। বলো—বলো—যতটা সংক্ষেপে পারো—

মিনির প্রণয়ী। মিনি! মিনি! সত্যি বলছি! আমি তোমাকে…

তার একটি মাত্র কথা আর শেষ হইতে পারিল না! হলের বাইরে অনেকগুলি পাদুকার শব্দে বোঝা গেল, অনেকগুলি অতিথির সমাগম হইয়াছে

মিনি। (ওষ্ঠাধরে তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া নীচুকণ্ঠে) চুপ! (উচ্চস্বরে) যাও, ওঁদের অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে এস!

মিনির প্রণয়ী। (নিম্নস্বরে ও ইঙ্গিতে) আমার সেই কথাটা!

মিনি। (ইঙ্গিতে) পরে শুনবো! (উচ্চস্বরে) যাও!

মিনির প্রণয়ীর প্রস্থান

পর মুহূর্ত্তেই চারিজন অতিথিকে লইয়া তার প্রবেশ।—(১) মেয়র (২) ক্রিটিক (৩) প্রকাশক (৪) রিপোর্টার! চার জনের বর্ণনা দেওয়া দরকার।

(১) মেয়র নাকি পৌর-পিতা; অজ্ঞাত ও অগণিত সন্তান-বাৎসল্যে তাঁর উদর স্নেহে ও মেদে উচ্ছ্বসিত; চাল-চলন অতিশয় গম্ভীর ও উদ্বেগপূর্ণ; বন্ধুরা বলে, পৌর-চিন্তায় এই দুর্দ্দশা; শত্রুরা বলে, আগামী নির্ব্বাচন আসন্ন; ছবিতে যে জনবুলের চেহারা দেখা যায় মুখখানা সেই রকম; কিন্তু এঁর মস্ত গুণ এই যে যখন যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, লোক দেখিবামাত্র—তা পরিচিত, অপরিচিত যেমনই হোক, একটি হাসি ছাড়িতে পারেন! এই হাসির জোরেই তিনি নাকি এ পর্য্যন্ত নির্ব্বাচন-সাগর পার হইয়া আসিতেছেন। স্বদেশী মেয়র, কাজেই পরণে বিদেশী পোষাক।

(২) ক্রিটিক—ইনি থিয়েটার, সিনেমা প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সমালোচনা করিয়া থাকেন। সেই সব মহলে এঁর বিষম প্রতাপ! শুষ্ক শীর্ণ দীর্ঘাকায়—শীর্ণ বলিয়া যতটা দীর্ঘ তার বেশী মনে হয়! হাড় বাহির-করা মুখখানা চিবুকের দিকে একটি কঠিন কীলকের মত নামিয়া আসিয়াছে; থিয়েটার-সিনেমার ত্রুটি দেখিয়া যখন ইনি মাথা নাড়িতে থাকেন মনে হয়—সেই ত্রুটীর ফাঁকে ওই কীলকটাকে ঢুকাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন।

(৩) প্রকাশকের ওজন পাকি আড়াই মণ; মুখখানা স্ফীত, বেলুনের মত; যেখানেই তিনি যান নিজের ব্যবসার কথা ভোলেন না!

(৪) রিপোর্টার—অল-ইণ্ডিয়া প্রেসের রিপোর্টার! জীর্ণ সাহেবী পোষাক-পরা; পটের শ্রীকৃষ্ণ কাঁচির ভঙ্গীতে দুই পা বিন্যাস করিয়া যেমন দাঁড়ায়, এঁরও দাঁড়াবার ভঙ্গী সেইরূপ; এক হাতে রাইটিং প্যাড, অপর হাতে ফাউণ্টেন পেন; মাথায় রং-জলিয়া যাওয়া একটা পুরাতন ফেল্ট হ্যাট—ভদ্রতার খাতিরেও কখনও সেটা খোলেন না। বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।—কারণ, দুই হাত তো সর্ব্বদা ব্যস্ত; বিশেষ টুপিটার এমন অবস্থা মাথার খুলির আশ্রয় ত্যাগ করিলে চুপসিয়া গিয়া একটা পুঁটুলীর মত হইয়া যায়। মুখে চুরুট, কব্জিতে ঘড়ি।

এবারে পরিচয়ের পালা আরম্ভ হইল। মিনির প্রণয়ী মিনির সঙ্গে সকলের পরিচয় করাইয়া দিল। ইতিমধ্যে মেয়র হ্যাট খুলিতেই ভৃত্য আসিয়া হ্যাট ও ছড়ি লইয়া গিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল।

মিনির প্রণয়ী। ইনি মিস্ মিনতি সোম!

মেয়র। কার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন! আমি ওকে ছোট বেলা থেকে জানি! ওর ফাদার আর আমি চাম্স্ ছিলাম! ব্রাইটনে কি আনন্দেই না কেটেছিল! গুড্ ওল্ড ডেজ! "que de souvenirs que de regrets"

মিনির প্রণয়ী। ইনি ক্রিটিক! বাংলা দেশের থিয়েটার-সিনেমা এঁর প্রতাপে তটস্থ!

ক্রিটিক। (অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে) নমস্কার! বাংলা দেশ! তার আবার থিয়েটার! তার আবার সিনেমা! আজও এদের পারস্-পেকটিভের জ্ঞান হ'ল না!

মিনির প্রণয়ী। ইনি বিখ্যাত গ্রন্থ-প্রকাশক! বাংলা সাহিত্যের বৈতরণীর খেয়া-ঘাটের মাঝি!

প্রকাশক। (কথা বলায় ইঁহার স্বাভাবিক জড়তার মত আছে) নমস্কার! এ পর্য্যন্ত আমি ছাপান্নখানা বই প্রকাশ করেছি। দু'খানা আবার প্রেসে আছে। আমার ক্যাটালগ পাঠিয়ে দেবো, দেখবেন'খন।

মিনির প্রণয়ী। ইনি অল-ইণ্ডিয়া প্রেসের রিপোর্টার। একালের মেঘদুত!

রিপোর্টার। নমস্কার!

হাত ব্যস্ত, কাজেই মাথা নীচু করিয়া নমস্কার করিতেই টুপীটা মাটিতে পড়িয়া তাল পাকাইয়া গেল। কেহ তুলিয়া দিবে না বুঝিতে পারিয়া নিজেই পা-দিয়া উঁচাইয়া দিয়া মাথায় লুফিয়া লইলেন।

মিনি। (মেয়রের প্রতি) আপনাকে কেবল কষ্ট দেবার জন্তই আনা!

মেয়র। (নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন) কষ্ট! এ আর কি কষ্ট মা! আর কষ্ট করতেই তো জন্মেছি! এত বড় একটা শহরের ভার! উঃ (হঠাৎ যেন মাথার উপরে শহরের ভার অনুভব করিলেন) ধৃতরাষ্ট্রের একশ ছেলে ছিল তাতেই তার কি বিপদ গেছে! আর আমার তো চোদ্দ লক্ষ ছেলে!

মিনি। (ক্রিটিকের প্রতি) আপনার মত লোক যে কষ্ট করে এসেছেন তাতে আমি বিশেষ উৎসাহ পেয়েছি।

ক্রিটিক। সে কথা ঠিক! আমার সময়ের বড় টানাটানি! আরও চার জায়গায় এনগেজমেন্ট ছিল! কিন্তু আপনার বাড়ীতে কি একটা নূতন নাটক হবে শুনে ভাবলাম—যাই দেখি—পারস্‌পেকটিভটা ঠিক আছে কি-না দেখে আসি।

মিনি। (প্রকাশকের প্রতি) আপনি যে সময় ক'রে উঠ্‌তে পারবেন ভাবিনি!

প্রকাশক। আজ্ঞে 'খুল্লতাত' উপন্যাসের শেষ ফর্মাটা ছাপতে অর্ডার দিয়ে হাতে একটু সময় ছিল!

মিনি। (রিপোর্টারের প্রতি) আপনার মত ব্যস্ত লোক কি ক'রে সময় করে' উঠলেন! আমার সৌভাগ্য! অনুগ্রহ ক'রে আজকের রিপোর্ট-টা ভাল ক'রে লিখ্‌বেন!

অন্তরা যখন কথাবার্ত্তা বলিতেছিল, রিপোর্টার তখন খস্‌খস্ করিয়া কথাবার্ত্তার বিবরণ, গৃহটির বর্ণনা, গৃহের আসবাব-পত্রের বর্ণনা, মায় সেগুলি কোন্ দেশে তৈয়ারী লিখিয়া লইতেছিল

রিপোর্টার। সে আমাকে বলাই বাহুল্য! অতিথিদের প্রত্যেকের নামধাম, কথাবার্ত্তা, ঘরের আসবাবপত্র, মায় ছাদের কড়ি-বরগার সংখ্যা পর্য্যন্ত টুকে নিয়েছি! কেবল দেয়ালগুলো ক ইটের গাঁথনি বুঝ্‌তে পারছি না!

মিনির প্রণয়ী। ওয়াণ্ডার ফুল!

রিপোর্টার। (খুশী হইয়া একটি সিগার যাচাই করিল) হাভ্ এ সিগার!

মিনির প্রণয়ী। না! ধন্যবাদ।

মেয়র। আজ তোমার এখানে কি নাটক হবে মিনি!

মিনি। জয়দ্রথ বধ!

মেয়র। কমেডি, না ট্রাজেডি?

প্রকাশক। সেটা নির্ভর করবে বইখানা কি রকম বিক্রী হয়, তার উপরে।

ক্রিটিক। সার্টেন্‌লি নট্! নির্ভর করবে, কি রকম অভিনয় হয় তার উপরে।

মিনির প্রণয়ী। আমার তো মনে হয় নির্ভর করচে বেচারা জয়দ্রথের উপরে।

মেয়র। পড়ে মরুকগে! নাটক দেখবার সময় বিবেচনা করলেই হবে। লিখেছে কে?

ক্রিটিক। বোধ হয় গিরিশ ঘোষ—আর কে?

প্রকাশক। ইস! এখনো তা হ'লে বইয়ের কপিরাইট যায় নি!

মেয়র। ভাল কথা মনে হ'ল। ওই যে পার্কে গিরিশ ঘোষের পাথরের মূর্ত্তি-টা আছে না—সেটাকে ভাঙবার জন্ম কে একজন সাহিত্যিক নাকি দু'-দিন থেকে চেষ্টা করছে!

প্রকাশক। কি সর্ব্বনাশ! মহাকবি গিরিশচন্দ্র!

মিনির প্রণয়ী। যেমন মহাজাতি, তেমনি তার মহাকবি!

রিপোর্টার। পুলিশ মোতায়েন করুন না কেন?

মেয়র। করেছিলুম বই কি! কিন্তু হিন্দুস্থানী পুলিশ-গুলো মূর্ত্তিটা দেখে ভয়ে এগুতে চায় না। বলে 'দেও' আছে।

রিপোর্টার। বাঙালী পুলিশ বসান।

মিনির প্রণয়ী। কিন্তু দেখবেন, তারা যেন লেখাপড়া না জানে। তা হ'লে তারাই ভাঙতে সুরু ক'রে দেবে।

ক্রিটিক। লোকটার আর যাই দোষ থাকুক—পারস্-পেক্‌টিভ্ জ্ঞান নিখুঁত ছিল।

মিনি। নাটক আরম্ভ হ'তে একটু বিলম্ব আছে, ততক্ষণ আপনারা একটু চা—

মেয়র। আবার ওসব কেন! আচ্ছা চল।

বিপরীত দিক দিয়ে মিনির সঙ্গে সকলের প্রস্থান,
কেবল তার প্রণয়ী রহিল

হলঘরে পিছনদিকে দোতালার সিঁড়ি দিয়া মিনির মা'কে নামিতে দেখা গেল। মোটা-সোটা বিধবা, বয়স পঞ্চাশের কাছে; মুখে বুদ্ধির ছাপ তেমন নাই; সংসারের ত্রুটির জন্ম সর্ব্বদা অন্যের উপরে দোষ দিবার জন্ম ব্যগ্র; অদৃষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া চাকররা পর্য্যন্ত তাহাকে 'একস্‌-প্লয়েট' করিতেছে—এই রকম তার ভাবটা। মিনির প্রণয়ীকে দেখিয়া প্রায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

মিনির মা। আর তো পারিনে আমি।

মিনির প্রণয়ী। আজ মিনির জন্মদিন! ওরকম করছেন কেন?

মিনির মা। জন্মদিনেই যে বেশী ক'রে মনে প'ড়ে যায়।

মিনির প্রণয়ী। সেই বাতের ব্যথাটা বুঝি!

মিনির মা। মিনির বয়স গো! জন্মদিনে তার বয়স কত হ'ল মনে রাখো!

মিনির প্রণয়ী। ওটা আপনার ভুল মাসিমা! মানুষের বয়স প্রতিদিনই বাড়ে—শুধু জন্মদিনকে দোষ দিলে চলবে কেন?

মিনির মা। তবে? স্বীকার করলে তো! এখন একটা বর খুঁজে দাও! ওর কি বিয়ে দিতে হবে না?

মিনির প্রণয়ী। আমি মিনিকে এতক্ষণ সেই কথাই বোঝাচ্ছিলাম।

মিনির মা। তোমার হাতে বর আছে?

মিনির প্রণয়ী। আপাতত একটি আছে।

মিনির মা। দেখতে শুনতে কি রকম?

মিনির প্রণয়ী। অনেকটা আমার মত।

মা। পড়াশুনা কতদূর করেছে?

প্রণয়ী। আমার সঙ্গে বরাবর প'ড়েছে।

মা। তবে তো ছেলেটি ভাল।

প্রণয়ী। আমারও সেই ধারণা।

মা। মিনি কি বলে?

প্রণয়ী। কিছুই বলে না।

ইহাতে মিনির মা পুনরায় প্রায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন

প্রণয়ী। আবার হ'ল কি আপনার?

মা। আর বাবা, এখন প্রাণটা গেলেই বাঁচি।

প্রণয়ী। সেই ফিকের ব্যথাটা বুঝি! আপনি বসুন, আমি মালিশের ওষুধটা নিয়ে আসি।

তাহার সিঁড়ি দিয়া দ্রুত দোতালায় প্রস্থান

পাশের দরজা দিয়া অত্যন্ত বিব্রত ও বিবর্ণ মিনির প্রবেশ,
সে আসিয়াই একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল

মিনি। মাগো কি হবে?

মা। কি হ'ল?

মিনি। সর্ব্বনাশ হয়েছে!

মা। ওসব কি অলুক্ষণে কথা! কি হ'য়েছে খুলেই বল্ না—

মিনি। অর্জ্জুনের মাথা ফেটেছে।

মা। অর্জ্জুন? কোন্ অর্জ্জুন? অর্জ্জুন চৌধুরী?

মিনি। তা জানিনে।

মা। তা জানিনে? তবে কে? সুব্রতর ভাই?

মিনি। না! যুধিষ্ঠিরের ভাই।

মা। যুধিষ্ঠিরের ভাই? কি যে বলিস্!

মিনি! বলবো আবার কি? যুধিষ্ঠিরের ভাই—পাণ্ডুর ছেলে—দ্রৌপদীর স্বামী! মহাভারত কি ভুলে গেলে নাকি?

মা। তাতে তোর কি হয়েছে?

মিনি। তাদের যে আজ এখানে অভিনয় করবার কথা ছিল!

মা। আমি বুঝতে পারলাম না।

মিনি। তবে এই শোন।

এই বলিয়া সে একখানা টেলিগ্রাম খুলিয়া পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিল

এই মাত্র টেলিগ্রাম পেলাম। অভিনেতার দল বারুইপুর থেকে মোটরবাসে আসছিল—মাঝখানে বিষম য়্যাক্‌সিডেণ্ট হ'য়ে অনেকেই আঘাত পেয়েছে—বিশেষ ক'রে অর্জ্জুনের মাথা ফেটে গিয়েছে, তারা আজ অভিনয় করতে পারবে না।—

এখন আমি কি করি?

মা। আমিই বা কি করবো! তখনি বললাম, ওসব নাটক-ফাটকের মধ্যে গিয়ে কাজ নেই। এখন! এতগুলো ভদ্রলোক ডেকে এনে! এখন তাদের কি বলা যায়!

মিনির প্রণয়ীর প্রবেশ

প্রণয়ী। মাসিমা, আপনার মালিশের ওষুধটা পেলাম না। তার বদলে এই জাম্বাকের কৌটা—

এতক্ষণে সে মাতা ও কন্যার মুখ লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল

কি হ'য়েছে আপনাদের?

মা। হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু!

মিনির হাতে টেলিগ্রামখানা ছিল, সেই টেলিগ্রামখানা পড়িয়া ও মর্ম্ম বুঝিয়া

প্রণয়ী। তাই তো—এ যে বড় মুস্কিল হ'ল! আচ্ছা মিনি, তোমার কি মনে হয়? ওরা কি কেউ আসতে পারবে না?

মিনি। অর্জ্জুনের যে মাথা ফেটেছে।

প্রণয়ী। সেজন্য ভাবি না—আমি অর্জ্জুন সাজতাম। আমি যে লক্ষ্যভেদে আবদ্ধ, অর্জ্জুনের পরীক্ষা তার চেয়ে কঠিন ছিল না!

মা। আমি তখনই নিষেধ করেছিলাম! এখন এতগুলো ভদ্রলোককে ডেকে এনে! আমার মরণ হ'লেই বাঁচি। তোমরা যা হয় করো—আমি চললাম। আমাকে এর মধ্যে জড়াতে পারবে না বলছি।

মিনির মায়ের প্রস্থান

মিনি। এখন কি হবে?

প্রণয়ী। অভিনয় হবে!

মিনি। করবে কে?

প্রণয়ী। আর একদল।

মিনি। কোথায় তারা?

প্রণয়ী। এখনই এল বলে। তুমি চিন্তা ক'রো না, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। অতিথিরা কে কে আসবেন একটা তালিকা করা হয়েছিল না! সেই তালিকা খানা দেখি!

মিনি। এখন যদি ব্যবস্থা ক'রে চালিয়ে দিতে পারো—তবে পরে তোমার সেই কথাটা শুনবো।

প্রণয়ী। কথাটা আগে হয়ে গেলে হ'ত না! তার পরে বেশ ধীরে সুস্থে কাজ করা যেত!

মিনি। না!

প্রণয়ী। আচ্ছা তবে থাক্। ভাল ক'রে একবার তালিকাখানা দেখি।

মিনি। কি করবে তুমি? আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পারছি না!

প্রণয়ী। মনের কথাই যদি বুঝতে পারবে—তা হ'লে কি আমার এই দশা হয়! একটু বসো—আমি ভাবি।

একটু পরে

দেখ, এক কাজ করতে হবে! আমি এই তালিকায় যাদের নামে দাগ দিয়ে দেবো তাদের নিয়ে অভিনয়ের জন্য যে ষ্টেজ বাঁধা হয়েছে, তার উপর বসাতে হবে।

মিনি। কেন?

প্রণয়ী। তারাই অভিনয় করবে।

মিনি। কি যে বল?

প্রণয়ী। ঠিকই বলছি। আর বিশেষ এর উপরে আমার সেই কথাটা যখন নির্ভর করছে, তখন বেশ ভেবে চিন্তেই বলছি।

মিনি। আচ্ছা না হয় বসানো হ'ল। তারা কি করবে?

প্রণয়ী। অভিনয় করবে।

মিনি। তারা কি অভিনেতা?

প্রণয়ী। কবির কথা মনে নেই? সংসারটাই রঙ্গমঞ্চ, আর মানুষ মাত্রেই অভিনেতা?

মিনি। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

প্রণয়ী। তোমার এখন বুঝে দরকার নেই। আমি যখন মেয়র আর অন্য অতিথিদের বুঝিয়ে দেব—তখন শুনো।

মিনি। কিন্তু কাদের নিয়ে ষ্টেজের উপর বসাতে হবে?

প্রণয়ী। হ্যাঁ—সেটা ভাল ক'রে জেনে নাও। বরঞ্চ একটুকরা কাগজে লিখে দাও। সম্পাদককে বসাবে; আর বসাবে অধ্যাপককে—আর এই রাজনীতিককে—এই যে একজন ডাক্তারও আছেন; বেশ হয়েছে, এঁকে; বাঃ বাঃ, তোমার ভাগ্য খুব ভাল—সাহিত্যিক আছেন, সিনেমা-ডিরেক্টার আছেন; এঁদেরও; আর সর্ব্বশেষে এই আধুনিক নারীকে!

মিনি। তার পরে?

প্রণয়ী। তার আগে কি শুনে নাও। ষ্টেজের উপরে তোমার বা আমার যাওয়া চলবে না। তোমার কোন কর্ম্মচারী দিয়ে এই সাতজনকে অভ্যর্থনা করিয়ে ষ্টেজে নিয়ে বসাতে হবে। সে বল্‌বে—অন্য অতিথিরা এখনও এসে পৌছাননি—আপনারা দয়া ক'রে একটু অপেক্ষা করুন। বলে, পান-সিগারেট প্রচুর পরিমাণে রেখে দেবে।

মিনি। বলছো যখন ক'রবো, কিন্তু—

প্রণয়ী। কিন্তু কি, সেই কথাটি শুনবে না? তা যা ইচ্ছে হয় করো। আর শোন—এই যে সাতজনের কথা বললাম, তাদের সঙ্গে যেন অন্য অতিথিদের দেখা না হয়।

মিনি। আচ্ছা!

প্রণয়ী। আচ্ছা নয়! তুমি যাও, সব বলে এস। চট্ ক'রে ফিরবে। আমি মেয়র আর অন্য অতিথিদের নিয়ে আসছি। তুমি এলে দু'জনে মিলে তাঁদের উপরে নিয়ে যাবো। যাও!

মিনি। আচ্ছা!

দুজনে দুদিকের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল; প্রণয়ী অতিথিদের লইয়া না ফেরা পর্য্যন্ত রঙ্গমঞ্চ নির্জ্জন থাকিবে; মিনিট দুই সময়; তারা প্রবেশ করিলে বিপরীত দিকের দ্বার দিয়া সঙ্গে সঙ্গে মিনিও প্রবেশ করিবে; মিনির প্রণয়ীর মেয়র, ক্রিটিক, প্রকাশক ও রিপোর্টারগণের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ

মেয়র। তবে তো আপনাদের বড় মুস্কিল হ'ল।

প্রণয়ী। আমাদের মুস্কিলের জন্য ভাবছি না—আপনাদের ডেকে এনে লজ্জায় পড়েছি।

রিপোর্টার। আচ্ছা—লোকটার মাথাটা কি খুব বেশী জখম হয়েছে?

প্রণয়ী। সংবাদ তো তাই এসেছে।

রিপোর্টার। বড় দুঃখের কথা—

প্রণয়ী। দুঃখের কথা বই কি! তার উপরেই পরিবার প্রতিপালনের ভার ছিল।

রিপোর্টার। আমি সে জন্য ভাবছি না। এমন একটা সুযোগ গেল। একখানা ফটোগ্রাফ নেওয়া হ'ল না। এসব বিষয়ে আমাদের দেশ এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে! আমেরিকা হ'লে দেখতেন!

ক্রিটিক। নাটক নাই হ'ল, সেজন্য দুঃখ করিনে, কিন্তু দেখবার ইচ্ছা ছিল ওদের পারস্‌পেক্‌টিভের জ্ঞান কি রকম!

প্রণয়ী। একেবারে দুঃখিত হবার কারণ নেই। আমরা যা-হো'ক একটা খাড়া ক'রে তুলেছি!

মেয়র। বলেন কি! আপনারা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন দেখছি!

প্রণয়ী। এমন কিছু অসম্ভব নয়। আমাদের পাড়াতেই একটা অভিনয়ের দল আছে। এমার্জেন্সি বলে খবর দিতেই তারা রাজি হয়েছে!

ক্রিটিক। য়্যামেচার?

প্রণয়ী। নেহাৎ য়্যামেচার!

ক্রিটিক। রাইট! আমার অনেক দিন থেকে ধারণা আছে যে, য়্যামেচার আর প্রফেশন্তাল অভিনেতাদের মধ্যে য়্যামেচারদের পারস্‌পেক্‌টিভ জ্ঞান বেশী ডেভেলাপ্‌ড্! আজ পরীক্ষা করতে হবে।

মেয়র। নাটকটার নাম কি?

প্রণয়ী। "মোটেই নাটক নয়!"

মেয়র। তার মানে?

প্রণয়ী। নাটকটার নামই হ'চ্ছে "মোটেই নাটক নয়।"

ক্রিটিক। নামশুনে মনে হ'চ্ছে রিয়ালিষ্টিক নাটক।

মিনি। আপনি ঠিকই ধরেছেন!

ক্রিটিক। আমাদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। আরও বলছি, নিশ্চয় জানবেন নাটকখানা বার্ণাড শ'র ব্যর্থ অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রকাশক। এবিষয় আমি সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। প্রত্যেক বাংলা বইয়ের মূলে একখানা ক'রে ইংরেজী বই! কেবল ধরা পড়ে গিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

মেয়র। সত্যি কথা বলতে কি, সেই জন্যই বাংলা বই পড়া ছেড়ে দিয়েছি।

প্রকাশক। কেন?

মেয়র। বাংলা বই প'ড়লে লেখকের চুরির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। বাংলা লেখকরা ক্রিমিনাল, আর পাঠকরা তার এবেটার।

প্রকাশক। বাংলা বই তো পড়বার জন্যে লিখিত হয় না।

মেয়র। তবে?

প্রকাশক। কিনবার জন্য—

মেয়র। নাট্যকারের নাম কি?

মিনি। সেটা এখন প্রকাশ করা হবে না। নাট্যকারের বিশেষ অনুরোধ!

মেয়র। কেন?

মিনি। তাঁর ইচ্ছা লেখকের নাম দিয়ে নাটক যাচাই যাতে না হ'তে পারে।

ক্রিটিক ও প্রকাশক। ইম্‌পসিব্‌ল্।

মিনি। তাঁর ইচ্ছে, লেখা দিয়ে লেখার গুণ যাচাই হোক্।

ক্রিটিক ও প্রকাশক। য়্যাব্‌সার্ড!

ক্রিটিক। লেখক নিশ্চয়ই বাঙালী নয়।

প্রকাশক। লেখক নিশ্চয়ই সাহিত্যিক নয়।

প্রণয়ী। সেসব বিচার আপনারা করবেন। তবে এবিষয়ে আর একটু বক্তব্য আছে! নাটক দেখবার সময় আপনাদের একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

মেয়র। কি রকম?

প্রণয়ী। এ নাটকে প্রেক্ষাগৃহ বলে কিছু নেই।

মেয়র। তবে দেখব কোথায় ব'সে?

প্রণয়ী। উইংস-এর আড়ালে ব'সে।

মেয়র। সে আবার কি?

প্রণয়ী। আগেই তো বলেছি—এ হ'চ্ছে বিষম রিয়ালিষ্টিক নাটক! অভিনেতারা দর্শক সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠ্‌লে নাটকের রিয়ালিজ্‌ম্ নষ্ট হয়ে যায়। কারণ, জীবনে যে সব ঘটনা ঘটছে তাতে নিষ্ক্রিয় দর্শক ব'লে কেউ থাকে না।

ক্রিটিক। এ বার্ণার্ড শ'র নকল ছাড়া আর কিছু নয়।

মেয়র। আর কোন বিষয়ে সতর্ক হ'তে হবে?

প্রণয়ী। যতদুর সম্ভব নিস্তব্ধ থাকবেন; হাসি বা হাততালি দিয়ে অভিনেতাদের সচেতন ক'রে দেবেন না—তা হ'লেই হবে।

প্রকাশক। সময় কতক্ষণ লাগবে?

প্রণয়ী। এই ধরুন—ঘণ্টাখানেক, কিছু বেশীও লাগতে পারে।

প্রকাশক। তার মানে চার ফর্ম্মার বই; দু'আনা ক'রে ফর্মা ধ'রলেও আট আনার বেশী নয়। নাঃ, দাম উঠবে না।

প্রণয়ী। কাটতি হবে না বলে আশঙ্কা করছেন?

প্রকাশক। আমাদের বাঁধা খদ্দের—কর্পোরেশনের সাহায্যপ্রাপ্ত লাইব্রেরীগুলো!

মেয়র। কর্পোরেশনের টাকায় বাংলা বই কেনা হয়!

বিস্মিত হইয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন

ক্রিটিক। সময় হয়নি কি?

প্রণয়ী। হ'ল ব'লে! আধ ঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক করতে হ'য়েছে, কাজেই বুঝতে পারছেন, প্রোগ্রাম ছাপা হয়নি।

ক্রিটিক। মুখে ব'লে দিন না—

সকলে তার কথা লিখিয়া লইতে লাগিল; মেয়র ও প্রকাশক কিছু লিখিল না

প্রণয়ী। এক অঙ্কের নাটক; দৃশ্যটি সম্পাদকের বৈঠকখানা; পাত্র-পাত্রী এতে সব শুদ্ধ সাতজন।

সম্পাদক, অধ্যাপক, রাজনীতিক, ডাক্তার, সাহিত্যিক, সিনেমা-ডিরেকটার আর আধুনিক নারী; আর নাটকের নাম তো আগেই ব'লেছি—"মোটেই নাটক নয়।"

ক্রিটিক। পাত্রদের কারও নিজের নাম নেই?

প্রণয়ী। হয়তো আছে। কিন্তু নাট্য-ব্যাপারে তারা বিশিষ্ট ব্যক্তি নয়—এক একটি টাইপ মাত্র। নাট্যকার একে টাইপ-ড্রামা বলেছেন।

ক্রিটিক। ইম্‌পসিব্‌ল্!

প্রণয়ী। মিস্ সোম, সব প্রস্তুত হয়েছে কি?

মিনি। সমস্ত তৈরি, এবার গেলেই হয়—

প্রণয়ী। চলুন, যাওয়া যাক্!

ক্রিটিক। চলুন!

মেয়র এতক্ষণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছিলেন—এবারে উঠিলেন।

রিপোর্টার। দেখুন, আমি সব নোট ক'রে নিয়েছি। কেবল দরজা জানলাগুলোর রংটা দেশী কি বিলাতি ধ'রতে পারিনি।

প্রণয়ী। (মেয়রকে) চলুন, উপরে যাওয়া যাক্।

মেয়র। (চলিতে চলিতে) চলুন। (দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে) কর্পোরেশনের টাকায় শেষে বাংলা বই কেনা হ'চ্ছে! ভগবান্!

সকলের দোতালার সিঁড়ি দিয়া উপরে প্রস্থান

—ক্রমশঃ

আমি

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

তোমার তরেই গ'ড়্‌লে আমায়—আমার তরে নয়;
আমায় দিয়ে তোমার প্রচার ক'র্‌ছো ভুবনময়!
বিশ্বে যা' কিছু করিতেছি আমি,
সকলি তোমার—জানি ওহে স্বামি!
আমার প্রতিটি কার্য্যের মূলে তোমারি প্রেরণা রয়;—
তোমার তরেই গ'ড়্‌লে আমায়—আমার তরে নয়!

নয়ন, শ্রবণ, বুদ্ধি ও মন—যা' দিয়াছ তুমি মোরে—
তোমারি কর্ম্ম করিতে সাধন—নহে কিছু মোর তরে।
যদিও গো আমি ক্ষুদ্র ও ছার,
তুমি সুমহান্, বিরাট, অপার!
তবু এ জগতে চলে না তোমার না হ'লে পলক মোরে:
আমার কারণে গড়নি' আমায়, গ'ড়েছ তোমার তরে!

আমার মাঝারে ফুটিবে বলিয়া নিত্য নবীন ভাবে,
তোমার গানের জাগাইতে সুর আমার কণ্ঠ-রবে—
সৃজন-মহিমা গাহিতে তোমার,
তোমার বিশ্বে সৃজন আমার!
লীলাময়, লীলা বুঝিতে তোমার কাহার সাধ্য ভবে?
কাজ-শেষে মোরে ভাঙিয়া আবার তোমাতে মিশায়ে লবে!

চোখের জলে রচিও পারাবার

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি-এ

বিদায়কালে সজল চোখে আকুল হ'য়ে প্রিয়া,
চোখের জলে রচিও পারাবার,
এপারে তার পড়িয়া রবো তোমার স্মৃতি নিয়া,
ওপারে তুমি চলিয়া যাবে তার;
ঝঞ্ঝা-বায়ে বারিধি ফুলে
আছাড়ি গিয়া পড়িবে কূলে,
তাহার মাঝে উঠিবে ফুটি
বেদন হাহাকার—
বিদায়কালে সজল চোখে আকুল হ'য়ে প্রিয়া,
চোখের জলে রচিও পারাবার।

নৌকা নিয়ে বৈঠা বেয়ে চ'ল্‌বে কতো মাঝি,
আপন মনে গাহিয়া যাবে গান—
তাদের সুরে হৃদয়-পুরে উঠ্‌বে ব্যথা বাজি,
উথলি শুধু উঠিবে মন-প্রাণ;
তিতিয়া তব নয়ন-নীরে
নৌকা কেহ ভিড়ালে তীরে,
তাহাতে চাপি এপারে আসি
জানায়ো অভিমান—
তোমার লাগি সকল কাজে আগেই হবো রাজি,
তাতেই হবে বিরহ অবসান।

ঋভু

শ্রীকালীচরণ শাস্ত্রী এম্-এ

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার 'বাল্মীকির জয়' নামক গ্রন্থে ঋভুগণের গানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—মানুষ মরিয়া কি হয়? কে বলিবে? কেহ বলে ভূত হয়; যাহাদের পিতামাতা মরে তাহারা বলে, তাঁহারা স্বর্গে গিয়াছেন। কিন্তু বেদমতে তাহারা স্বর্গে যান না। যে সকল লোক পৃথিবীতে সৎকার্য করিয়া যান, তাহারা ঋভু হন। ইঁহারা কোথায় থাকেন, কি করেন, কে বলিতে পারে? ইঁহারা ছায়াপথেরও ওপারে কোন সুখময় ভবনে বাস করেন। শরৎকালের অমাবস্যা রাত্রে সহসা ছায়াপথ দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া গেল, আর তাহার মধ্য হইতে অগণিতসংখ্যক ঋভুগণ বহির্গত হইলেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের শরীর-প্রভায় আলোকিত হইল। * * * ঋভুগণ মুহূর্তমধ্যে আকাশপথ অতিক্রম করিলেন। পক্ষী ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়, দেখিতে কতই সুন্দর; কিন্তু যখন তীব্র জ্যোতির্ময় ঋভুগণ শরীর-প্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া—আকাশপথ আচ্ছন্ন করিয়া দলে দলে আসিতে লাগিলেন, তখন পৃথিবীস্থ মানববৃন্দ চমৎকৃত হইয়া গেল। কেহ বলিল, ধূমকেতু উঠিয়াছে; কেহ বলিল, নক্ষত্রসমূহ খসিয়া পড়িতেছে। ঋভুগণ আজি জন্মস্থান দর্শন করিতে আসিয়াছেন; তাঁহারা যত নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই; তাঁহারা আসিয়া হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন। তখন টিব্যায় টিব্যায়, চূড়ায় চূড়ায়, শিখরে শিখরে ঋভুগণ দাঁড়াইয়া মহা আনন্দভরে গান ধরিলেন। মানবের সাধ্য কি সে গান বুঝে। কিন্তু সে শ্রুতিমনোহর স্বরে জগৎ মুগ্ধ হইল। জগৎ নিস্তব্ধ, আকাশ নিস্তব্ধ, নক্ষত্র অচল, দ্বিফাল ছায়াপথ নিশ্চল, নিষ্পন্দ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত—স্তিমিত—মহামোহ-নিদ্রায় অভিভূতবৎ হইল। ঋভুগণ একতান স্বরে গান ধরিলেন। গীতধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর পরিপূরিত করিয়া উন্মুক্ত ছায়াপথ-দ্বারপথে অনন্তে বিলীন হইল। * * * আজি ঋভুগণ গায়ক, জন্মভূমি-দর্শনে পুলকে পূর্ণ হইয়া গাইতেছেন, হৃদয় উল্লাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা আবার বহুকাল পরে সেই চতুরুদধি-তরঙ্গ-বাহুক্ষালিত-চরণা চিরনীহার-ধবলোন্নত-শীর্ষা প্রাচীনা সুজলা সুফলা জননী জন্মভূমির দর্শন পাইয়াছেন।

এই জন্মমরণ-শীল শরীরধারী মানুষই কঠোর তপস্যার প্রভাবে, নানাপ্রকার সৎকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা যে দেবত্ব লাভ করিতে পারে, তাহা ঋগ্‌বেদের আর্ভব সূক্তে ঋভুদেবগণের উপাসনায় সুস্পষ্টরূপে বহুবার প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বলিয়াছেন—ঋভুরা মনুষ্য হইয়াও তপস্যার দ্বারা দেবত্ব লাভ করেন।[১]

আঙ্গিরস গোত্রীয় সুধন্বার তিন পুত্র। এই তিনজন ঋগ্বেদে 'ঋভবঃ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এই তিনজনের নাম যথাক্রমে ঋভু, বিভ্‌বা (বিভ্‌বণ্‌) ও বাজ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম বেদে প্রায় সকল স্থলেই ঋভু বলিয়া খ্যাত, কখনও কখনও দুই চারি স্থানে ঋভুক্ষা[২] (ঋভুক্ষণ্‌)—এই নামেও পরিচিত দেখিতে পাওয়া যায়। নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য বলেন[৩] যে, বেদে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঋভু—এই নামের বহুবচন করিলে 'ঋভবঃ' এই পদে তিন ভাইকেই বুঝায়, কিংবা কনিষ্ঠ ভ্রাতার নামের বহুবচনে 'বাজাঃ' বলিলেও তিন ভাইকেই বুঝায়; কিন্তু মধ্যম ভ্রাতার নামের বহুবচনের দ্বারা সেইরূপ বুঝায় না। চতুর্থ মণ্ডলের পঞ্চত্রিংশ সূক্তগত তৃতীয় মন্ত্র[৪] ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বেদে প্রায় বার জায়গায় ঋভুরা তাঁহাদের পৈতৃক নাম 'সৌধন্বন' অর্থাৎ সুধন্বার পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন। দুই-এক স্থানে বা তাঁহারা 'মনোর্ নপাতঃ' অর্থাৎ মনুর পুত্র, অর্থাৎ মানুষ ছিলেন—এরূপ নামকরণও দেখা যায়।

নিরুক্তকার যাস্ক[৫] ঋভু শব্দের তিন প্রকার নির্বচন দিয়াছেন—বহু দীপ্তিমান্‌, যজ্ঞের দ্বারা কিংবা সত্যের দ্বারা দীপ্তিমান্‌, অথবা যিনি যজ্ঞে কিংবা সত্যে থাকেন।

বেদে ইন্দ্রাদি উচ্চস্তরের দেবতা (higher gods) ভিন্ন আরও অনেক দেবতার বিষয় আমরা জানিতে পারি, যাঁহাদের প্রথমে দেবত্ব ছিল না, কিংবা আংশিকভাবে দেবত্ব ছিল। ইঁহাদের মধ্যে ঋভুদের নামই সর্বপ্রধান। এগারটি সম্পূর্ণ সূক্তে কেবল তাঁহাদের দেবতা-হিসাবে যশোগান করা হইয়াছে এবং শতাধিকবার তাঁহাদের নামের উল্লেখ দেখা যায়।

ঋভুদের কার্যকলাপের বিবরণ ছাড়া তাঁহাদের স্বরূপ কিরূপ ছিল—ইহার বিস্তৃত বর্ণনা বেদে অল্পই পাওয়া যায়। তাঁহাদের দেখিতে সূর্যের ন্যায়। তাঁহারা রথে চড়িয়া বেড়ান; সেই রথ ঘোড়ায় টানে। রথটি দেখিতে খুব উজ্জ্বল এবং অশ্বগুলিও বেশ হৃষ্টপুষ্ট। ঋভুরা

১। 'ঋভবো হি মনুষ্যাঃ সন্তস্তপসা দেবত্বং প্রাপ্তাঃ।'
'তে তু সংবৎসরেঽখিলং কৃত্বা মনুষ্যাঃ সন্তো দেবত্বং প্রাপ্তবন্তঃ।'—
—দুর্গাচার্য, নিরুক্ত, আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলি, পৃঃ—৯০১

২। ঋগ্বেদ সংহিতা, ৪।৩৭।৩, ৪।৩৫।৫ ॥ সায়ণ ১।১৬২।১ এবং ২।১৮৬।১০ ঋকে ঋভুক্ষা অর্থে 'ইন্দ্র' করিয়াছেন।

৩। ঋভুণা বাজেন চ বহুবন্নিগমা ভবন্তি, ন মধ্যমেন বিভ্‌বা।
—নিরুক্ত, পৃঃ—৯০১

৪। 'অথ ঐত বাজাঃ অমৃতস্য পন্থাং গণং দেবানাম্ ঋভবঃ সুহস্তাঃ।'

৫। উরু ভান্তীতি ঋতেন ভান্তীতি ঋতেন ভবন্তীতি বা তে ভবতি ॥১৫॥—নিরুক্ত. পৃঃ—৮৯৯

ধাতুনির্মিত শিরস্ত্রাণ এবং সুন্দর কণ্ঠহার পরিধান করেন। তাঁহারা বিশিষ্ট সুহস্তা অর্থাৎ হাতের কাজ খুব চমৎকারভাবে করিতে পারেন, এবং কর্মে অত্যন্ত কুশল। তাঁহারা তাঁহাদের অত্যাশ্চর্য নিপুণ ক্রিয়াসমূহের জন্যই যে দেবত্ব-লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—এ বিষয়ে বেদে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

যে সমস্ত অদ্ভুত কর্মসাধনের ফলে ঋভুরা অমৃতত্ব পাইয়াছিলেন, এখন তাহারই উল্লেখ করা হইতেছে—

(১) ঋভুগণ ইন্দ্রের সন্তোষ-বিধানের নিমিত্ত তাঁহার অশ্ব-যুগলকে রথ বহনোপযোগী এরূপ সুশিক্ষা দিয়াছিলেন যে, তাহারা কোনরূপ তাড়নাদি ব্যতীত সঙ্কল্পমাত্রেই রথে সংযুক্ত হইতে পারে।৬

(২) তাঁহারা সকল প্রকার যজ্ঞের জন্য গ্রহ৭, চমস৮ ইত্যাদি যাগাদির আবশ্যক সামগ্রী নিষ্পাদন করিয়া যজ্ঞে অবস্থান করেন।৯

(৩) তাঁহারা নাসত্যদ্বয়ের (পুরাণের স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়) প্রীতির নিমিত্ত সর্বত্র গমনশীল সুখেউপবেশনযোগ্য একখানি সুন্দর ত্রিচক্র রথ নির্মাণ করিয়াছিলেন।১০

(৪) তাঁহারা বৃহস্পতির জন্য১১ আশ্চর্য কৌশলের সহিত মৃত ধেনুর শরীর হইতে গৃহীত চর্ম দ্বারা একটি সর্বদুঘা ধেনু উৎপন্ন করিয়াছিলেন।১২ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার ঋগ্বেদ-সংহিতার বাঙ্গালা অনুবাদে এই ঋকের পাদটীকায় সায়ণ যে গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ লিখিয়াছেন—পূর্বে কোন ঋষির ধেনু মরিয়াছিল, ঋষি বৎসটিকে দেখিয়া ঋভুর স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋভুগণ তাহার সদৃশ আর একটি ধেনু নির্মাণ করিয়া মৃত ধেনুর চর্ম দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিয়া তাহাই বৎসের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলেন।১৩

(৫) ঋভুদের পিতামাতা বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা মন্ত্র-শক্তির প্রভাবে তাঁহাদিগকে পুনরায় তরুণবয়স্ক করিয়া নব যৌবন প্রদান করেন।১৪ মন্ত্রের প্রভাবে বৃদ্ধকে যৌবন দান করার বিশেষ শক্তি তাঁহাদের ছিল। সায়ণাচার্য বলেন—তাঁহারা পুরশ্চরণাদি কর্মানুষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধমন্ত্র হইয়াছিলেন, তাই যে যে ফলাকাঙ্ক্ষায় মন্ত্র প্রয়োগ করেন তাহা অব্যর্থ হয়, কাজেই সেই সেই ফল সেইরূপই সম্পন্ন হয়। আরও তাঁহারা ছলরহিত, এজন্য তাঁহাদের অনুষ্ঠিত মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে। সকল কার্যেই তাঁহাদের মন্ত্র-শক্তি অপ্রতিহত।১৫ বেদের এই দৃষ্টান্তে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়িগণ প্রাচীন ভারতে শারীরবিজ্ঞানের ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির পরাকাষ্ঠার বিষয় প্রমাণ প্রদর্শন করেন। পুরাণেও দেখা যায় যে, শুক্রাচার্যের শাপে রাজ-শ্রেষ্ঠ যযাতি জরাগ্রস্ত হইলে তাঁহার ইচ্ছানুসারে কনিষ্ঠ নন্দন পুরু তদীয় জরাগ্রহণে সম্মত হইয়া হৃষ্টমনে পিতার সহিত স্বকীয় বয়োঃবস্থার পরিবর্তন করিলেন। রাজা যযাতি পুত্র-প্রদত্ত যৌবন-শ্রীতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। স্বর্গের বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবন মুনি ও কলিকে বৃদ্ধ বয়সে যৌবন দান করিয়াছিলেন। এই যে বয়োবিবর্তের অন্তরালে বার্ধক্যের পুনর্যৌবন, অতি আধুনিক কালেও অসম্ভব নহে। মাত্র কিছু দিন পূর্বের কথা যে, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় কায়কল্প চিকিৎসার প্রভাবে দেহে শক্তি ও যৌবনের স্ফূর্তি পাইয়াছেন—ইহ বোধ হয় সকলেই জানেন।

(৬) তক্ষণ-কর্মে সুনিপুণ দেবতাদিগের অস্ত্রাদি নির্মাতা ত্বষ্টা (ইনি পুরাণের বিশ্বকর্মা, যিনি ইন্দ্রের বজ্র নির্মাণ করেন) দেবতাদিগের সোমপানের জন্য একটি বৃহৎ অতি সুন্দর নূতন কাষ্ঠের চমস প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ত্বষ্টার শিষ্য ঋভুগণ সেই চমসটিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া চারিটি চমস নির্মাণ করিলেন।১৬ বলা বাহুল্য যে, এই সব দেখিয়া অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক মনে করেন—বেদের সময় আর্যগণ সূত্রধারের কাজ ভালরূপেই জানিতেন। এই কার্যের জন্য দেবতাগণের নিকট ঋভুরা বিস্তর সম্মান পাইলেন। এইটিই ঋভুদের সকলের চেয়ে বড় নৈপুণ্যের কর্ম, বেদে ইহার বহুবার উল্লেখ দেখা যায়। তাঁহাদের এরূপ কৃতিত্ব দর্শনে দেবতারাও অত্যন্ত উল্লসিত হইলেন। তখন ঋভুক্ষা (ঋভুক্ষণ্) ইন্দ্রের, বিভ্বা (বিভ্বন্) বরুণের এবং বাজ অন্যান্য দেবতাগণের শিল্পী নিযুক্ত হইলেন।১৭

একখানি চমস হইতে চারিটি চমস প্রস্তুত করার প্রস্তাব দেবতারা তাঁহাদের হব্যবাহন অগ্নি দ্বারা ঋভুদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহারা এই কার্যে সক্ষম হন, তাহা হইলে ঋভুরা দেবত্বের অধিকারী হইবেন।১৮

ত্বষ্টা যখন দেখিলেন যে, তাঁহার সাধের নূতন চমসখানি ঋভুরা চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং তাহা হইতে চারিটি সুন্দর চমস করিয়াছেন, তখন তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং দেবতাগণের পশ্চাতে লুকাইতে প্রয়াস পাইলেন।১৯ পরে নিজের হাতের প্রস্তুত

৬। ঋগ্বেদ ১.২০.২

৭। সোমরসের যে অংশ পাত্রে অথবা স্থালীতে আহুতির জন্য গৃহীত হইয়া আহবনীয় অগ্নিতে দেবোদ্দেশে অর্পিত হয়, তাহার নাম গ্রহ।

—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কৃত অনুবাদ, পৃঃ—৭১৭

৮। আহুতিকালে সোমরস-গ্রহণার্থ কাষ্ঠপাত্র বিশেষ।

—ঐ, পৃঃ—৭১৮

৯। ঋগ্বেদ ১.২০.২

১০। ঋগ্বেদ ১.২০.৩

১১। ঋগ্বেদ ১.১৬১.৬

১২। ঋগ্বেদ ১.২০.৩

১৩। প্রথম খণ্ড, পৃঃ—২৪৪

১৪। ঋগ্বেদ ১.২০.৪

১৫। ১, ২০. ৪র্থ ঋকের সায়ণ-ভাষ্য।

১৬। ১. ২০. ৬ ও ২. ৩. ৪

১৭। ঋগ্বেদ, ৪. ৩৩. ৯

১৮। ঋগ্বেদ, ১. ১৬১. ২

১৯। ঋগ্বেদ, ১. ১৬১. ৪

দ্রব্যের এইরূপ পরিবর্তন দেবতাদের নিকট তাঁহাকে হেয় করিয়াছে—এরূপ ভাবিয়া অপমানবোধে তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ঋভুদের হত্যার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।২০ এই আখ্যান ছাড়া ঋগ্বেদে এখানে আর একটি উপাখ্যানও পাওয়া যায়২১—ত্বষ্টা যখন দেখিলেন তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণ ঋভুরা এমন চমৎকারভাবে একটি চমসকে চারিটি চমসে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাদের এরূপ দক্ষতার জন্য খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কারণ শিষ্য যথার্থ কৃতী হইলে গুরুর আনন্দই হয়।

আমরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের২২ একটি আখ্যায়িকা হইতে জানিতে পারি যে, "ঋভুগণ (প্রজাপতির উদ্দেশে বিহিত) তপস্যা দ্বারা দেবগণ মধ্যে সোমপানে অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন। দেবতারা প্রাতঃসবনে শস্ত্রে ঋভুদের জন্য অংশ কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু অগ্নি বসুদিগের সাহায্যে প্রাতঃসবন হইতে তাঁহাদিগকে নিরাকৃত করিয়াছিলেন। তখন মাধ্যন্দিন সবনে শস্ত্রে তাঁহাদের অংশ কল্পনা হইল। ইন্দ্র রুদ্রগণের সাহায্যে মাধ্যন্দিন সবন হইতে তাঁহাদিগকে নিরাকৃত করিলেন। তখন তৃতীয় সবনে শস্ত্রে তাঁহাদের অংশ কল্পনা হইল। এখানে পান করিতে পাইবে না, এখানেও না—এই বলিয়া বিশ্বদেবগণ তাঁহাদিগকে সেখান হইতেও নিরাকৃত করিলেন। তখন প্রজাপতি সবিতাকে বলিলেন—এই ঋভুগণ তোমার অন্তেবাসী; তুমি ইহাদের সহিত একত্রে সোমপান কর। সেই সবিতা বলিলেন, তাহাই হইবে, তবে তুমিও তাহাদের উভয় দিকে থাকিয়া পান কর। তখন প্রজাপতি তাঁহাদের উভয় দিকে থাকিয়া পান করিলেন। সেই জন্য ১. ৪. ১ এবং ১০. ১২৩, ১—এই দুই ঋঙ্‌মন্ত্র, যাহা কোন বিশেষ দেবতার উদ্দিষ্ট নহে, অতএব যাহার প্রজাপতিই দেবতা;—ধায্যা২৩ স্বরূপে আর্ভব সূক্তের উভয় দিকে পঠিত হয়। এতদ্দ্বারা প্রজাপতি ঋভুগণের উভয় দিকে থাকিয়াই সোমপান করেন। সেই জন্যই দেখা যায়, শ্রেষ্ঠী (বড়লোক) যে ব্যক্তিকে ভালবাসেন, তাহাকে অন্য লোকের নিকটেও আদৃত করান। (প্রজাপতি ঋভুগণকে ভালবাসিতেন, তিনি সবিতার নিকট তাহাদিগকে আদৃত করিয়াছিলেন।)

কিন্তু দেবগণ সেই ঋভুদের হইতে দূরে থাকিয়া মনুষ্য গন্ধের জন্য তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিতেন। সেই জন্য দুইটি ধায্যা২৪ ঋভুগণের ও বিশ্বদেবগণের উদ্দিষ্ট সূক্তের মধ্যস্থলে স্থাপিত হয়।"২৫

২০। ঋগ্বেদ, ১. ১৬১. ৫

২১। ঋগ্বেদ, ৪. ৩৩. ৫-৬

২২। ১৩শ অধ্যায়, ৬ষ্ঠ খণ্ড; আনন্দাশ্রমসংস্কৃতগ্রন্থাবলি, পৃঃ ৩৬৬-৩৬৮.

২৩। সংখ্যাপূরণের জন্য যে অতিরিক্ত মন্ত্র প্রয়োগ করা হয়।—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী: ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, বঙ্গানুবাদ, পৃঃ—৭২২

২৪। ঋগ্বেদ, ১০. ৬৩, ৬ এবং ৪. ৫০. ৬

২৫। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী: ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, বঙ্গানুবাদ পৃঃ—২৮১-২৮২

এই ব্যবধান কিন্তু খুব বেশী দিন টিকিল না। কারণ ঋভুরা অনেক যজ্ঞে সোমপানার্থ দেবতা হিসাবেই আহূত হইয়াছেন—এরূপ বহু দৃষ্টান্ত ঋগ্বেদের গোড়ার মণ্ডলেই পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের বড় বড় দেবতা যথা—ইন্দ্র, মরুৎ, অগ্নি, আদিত্য, সবিতা ইত্যাদির সহিত ঋভুরা একত্রেই যজ্ঞে আহূত হইয়াছেন। সায়ণাচার্য প্রথম মণ্ডল বিংশ সূক্তের পঞ্চম ঋঙ্‌মন্ত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, ইন্দ্র ও আদিত্য প্রভৃতি দেবগণের সহিত ঋভুদের একত্র সোমপান তৃতীয় সবনে বিহিত হইয়াছে: এবং এই বিষয়ে তিনি মহর্ষি আশ্বলায়নের আবাহন-মন্ত্রও উদ্ধৃত করিয়াছেন। আরও ইন্দ্রের সহিত ঋভুদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। ঋভুদের ইন্দ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে—ঋভুরা যেন নূতন ইন্দ্র। ইন্দ্রের সহিত তাঁহারা মানবদিগকে জয়ী হইতে সাহায্য করেন এবং শত্রু সমূলে নাশ করিতে আহূত হন। কেবল তাঁহাদের সুদক্ষ কর্ম-প্রভাবেই ইন্দ্র তাঁহাদের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ও বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন।

সোমপানাদি ব্যতীত যজ্ঞের হবির্‌ অংশ না পাইলে পূর্ণ দেবত্ব হয় না; কাজেই ইহা পুরণের জন্য ঋভুরা দাবী করিলে তাহাও মনোনীত হইল।২৬

ম্যাক্স-মুলর (তাঁহার Chips from a German Workshop, Vol. II, p. 128) বলেন—বৃবু নামক এক সূত্রধার বংশ কার্য বা ধর্ম গুণে ঋত্বিক সম্প্রদায়ে প্রবেশ পাইয়া ঋত্বিক হইয়াছিল। তাহারা ভারদ্বাজ ঋষির অনেক সহায়তাও করিয়াছিল। তাহাদের বিশেষ কোন উপাস্য দেব ছিল না, অতএব তাহারা ঋভুগণের উপাসনা-পরায়ণ হইল এবং কালক্রমে সেই বৃবু বংশীয়দিগের পাত্রাদি নির্মাণে নৈপুণ্য হইতে সেই কুলের দেব ঋভুগণ সেইরূপ নৈপুণ্যের খ্যাতিলাভ করিলেন।২৭

ঋভুদেবতারা অন্যান্য দেবগণের সহিতও নানা যজ্ঞে হবির্ভাগ পাইতে লাগিলেন২৮ এবং তখন হইতে তাঁহাদের পূর্ণ দেবত্ব সকলকেই স্বীকার করিতে হইল। আমরা ঋগ্বেদের বহু সূক্তে দেখিতে পাই যে, উচ্চস্তরের দেবতার ন্যায় তাঁহাদিগকে পুরোহিত ও যজমান যজ্ঞে যথারীতি আহ্বান করিতেছেন ও সর্বপ্রকার ধন-সম্পৎ, ধেনু, অশ্ব, বীর পুত্র ইত্যাদি তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ঋভুরা যাহাদের সহায়তা করেন, তাহারা যুদ্ধে অজেয় হয়—এবং এ বিষয়ে ঋভু ও বাজ—এই দুই দেবতারই বিশেষভাবে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।

ঋগ্বেদে ঋভুদের সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায়, মোটামুটিভাবে তাহার যথাযথ বর্ণনা করিলাম। ঋগ্বেদের অনেক স্থলের অস্পষ্ট বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া বহু রূপকের উৎপত্তি হইয়াছে—এখন তাহারও কিঞ্চিৎ বর্ণনা দিতেছি।

বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার 'ওরায়ণ' পুস্তকে বলেন যে, ঋভুরা সূর্য-রশ্মির প্রতীক২৯ এবং সংবৎসরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ।

২৬। ঋগ্বেদ ১. ১৬১. ৬

২৭। রমেশচন্দ্র দত্ত: ঋগ্বেদ সংহিতা, অনুবাদ, পৃঃ—৩০ (পাদটীকা)

২৮। ঋগ্বেদ, ১. ২০. ৮

২৯। আদিত্যরশ্ময়োঽপি ঋভব উচ্যন্তে।—সায়ণ

তাঁহারা সমস্ত বৎসর কাজ করেন, কেবল বৎসরে দ্বাদশ দিন মাত্র অগোহ্যের (সূর্য) ভবনে বিশ্রাম লন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে৩০ ঋভুরা সূর্যের অন্তেবাসী বলিয়া বর্ণনা আছে। এই দ্বাদশ দিন বৎসরের মলদিন হিসাবে ধরা হয় এবং এই দ্বাদশ দিন উষা তাঁহাদের কার্য সম্পাদন করেন।৩১

আর একটি উপাখ্যান বেদে দেখা যায়। বৎসরের মধ্যে তিনটি ঋতু দেবতাদিগের মধ্যে প্রচলিত—বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা। তিনটি ঋতুর প্রতীক-স্বরূপ অথবা অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে তিন ঋভু সারা বছর ধরিয়া দেবতাদিগের জন্য আশ্চর্যজনক সকল কর্মে নিযুক্ত থাকেন ও তাঁহাদের গতির শেষে অগোহ্যের গৃহে অতিথিরূপে অভ্যর্থনা পাইয়া থাকেন। এখানে তাঁহারা উৎসবে দ্বাদশ দিন অতিবাহিত করেন। তারপরে তাঁহাদের গতি পুনরায় নূতনভাবে আরম্ভ হয় এবং পৃথিবী নব আকারে ফল প্রসব করে, নদী প্রবলবেগে বহিয়া যায় ইত্যাদি প্রকৃতিরাণীর সমস্ত কাজ অভিনব উদ্যমে সুশৃঙ্খলে চলিতে থাকে।

গ্রীক্‌দিগের মধ্যে গল্প আছে যে, 'অর্ফিয়স্' নামক এক গায়কের স্ত্রীর কাল হইলে তিনি তাঁহার গীত দ্বারা মৃত্যুরাজকে তুষ্ট করিয়া স্ত্রীকে ফিরিয়া পাইলেন, কিন্তু পথে তিনি ঔৎসুক্যের সহিত স্ত্রীর দিকে চাওয়ায় তাঁহার স্ত্রী পুনরায় অদৃশ্য হইলেন। মোক্ষমূলর বলেন, 'অর্ফিয়স্' 'ঋভু বা অর্ভুর' রূপান্তর মাত্র, এবং গল্পের মূল অর্থ এই যে, সূর্য উষার দিকে চাহিলেই অর্থাৎ উদয় হইলেই উষা অদৃশ্য হইয়া যান। তিনি আরও বলেন, উর্বশী ও পুরূরবার যে গল্প বেদে ও হিন্দুসাহিত্যে পাওয়া যায়, তাহারও এই মূল অর্থ ; উর্বশীর আদি অর্থ উষা।৩২

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঋভুগণের গানের কথা বলিয়াছেন ; যতদূর দেখা যায়, বেদে তাহার কোন উল্লেখ নাই। জানি না, তিনি ম্যাক্স-মূলরের 'অর্ফিয়স্' ঋভুর রূপান্তর মাত্র—এই বিষয় ভাবিয়া এরূপ কল্পনা করিয়াছেন কি-না ?

ভিণ্টারনিজ বলেন যে, বেদের ঋভুর সহিত German 'elbe'-এর সামঞ্জস্য দেখা যায়, বোধ হয় নামান্তর মাত্র। জার্মান 'elbe' ইংরেজীতে 'elf' (i. e. supernatural being) বলিয়া পরিচিত—ইহার অর্থ বামনাকার দেববিশেষ।

ম্যাক্‌ডোনেল তাঁহার 'Vedic Mytholgy' নামক গ্রন্থে এক জায়গায় বলিয়াছেন—ফরাসী পণ্ডিত বার্গেঁ (Bergaigne) তাঁহার 'La Religion Vedique' (2.412) পুস্তকে এই মত পোষণ করেন যে, ঋভুরা তিনজন প্রথমে প্রাচীন সুদক্ষ যজমান ছিলেন এবং পরে তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন ; এবং যজ্ঞে যে তিনটি অগ্নি (গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি) থাকে, তাহার সহিত ইঁহাদের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু কোন মূল স্থান হইতে যে তিনি এই মত পাইয়াছেন, দুঃখের বিষয়, তিনি তাহার কোন নির্দেশ দেন নাই।

পুরাণমতে ঋভু ব্রহ্মার পুত্র, ইনি তপোবলে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুলস্ত্যপুত্র নিদাঘ ইঁহার শিষ্য। পৌরাণিক মতে ইনি চারিজন কুমারের মধ্যে একজন।

আজ ব'লে নয়, কাল ব'লে নয়, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান—অনন্ত কাল ধরিয়া যে সকল মনুষ্য আপনার কর্ম-প্রভাবে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন—ঋভুদেবগণের স্তবার্চনা তাঁহাদিগের উদ্দেশেই বিনিযুক্ত হইয়াছে। এই মানুষই যখন কর্মবলে দেবত্ব লাভ করিয়া পূজার আস্পদ হইতে পারে, তুমিই বা না হইবে কেন? কর্মী হও, ভক্ত হও, জ্ঞান লাভ কর। তুমিও সে আসন লাভ করিতে পারিবে।

জন্ম-জন্মান্তরের অভ্যুদয় প্রভাবে নরদেহ লাভ হয়। নরজন্মই এ সংসারের শ্রেষ্ঠ জন্ম। সেই শ্রেষ্ঠ জন্ম যখন পাইয়াছ, কলুষ কল্পনায়, নীচ কর্মে নিমগ্ন না হইয়া উর্ধে আরোহণের চেষ্টা কর—ঋভু দেবতাগণের আসন লাভ করিবে। অন্তরে সৎ হও, কর্মে সৎ হও, অনুধ্যানে সৎ হও, তোমার আচার-ব্যবহার সৎ হউক, তুমিও ঋভুগণের ন্যায় পূজার্হ হইতে পারিবে।

আমরা মানুষ, আমরা যেন তাঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারি, আমরা যেন তাঁহাদের ন্যায় সৎকর্মশীল হইয়া পরাগতি লাভ করি।৩৩

৩০। ১৩শ অধ্যায়, ৬ষ্ঠ খণ্ড

৩১। ঋগ্বেদ, ৪.৫১.৬

৩২। রমেশচন্দ্র দত্ত : ঋগ্বেদ-সংহিতা, অনুবাদ, পৃঃ—৩৯, পাদটীকা

৩৩। দুর্গাদাস লাহিড়ী : ঋগ্বেদ-সংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ—৯৬৭-৯৬৮

ভারতের জাতীয় উন্নতি

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ সম্পদশালিনী, কিন্তু অধিবাসীরা দরিদ্র। নদীবহুল দেশের ভূমির উর্ব্বরতা প্রচুর এবং সমগ্র দেশের বিভিন্ন স্থানে খনিজ পদার্থের সমাবেশ অন্য অনেক দেশের তুলনায় অপ্রতুল নহে। রৌদ্র ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণও স্বচ্ছল। কিন্তু এই প্রাকৃতিক বৈভবের সদ্ব্যবহার আজিও অজ্ঞাত। গত তিনশত বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞানের আলোচনার ফলে ও বৈজ্ঞানিকের পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্যের 'অসভ্য' দেশ ও প্রাচ্যের ক্ষুদ্র দ্বীপরাজ্য জাপান এখন সভ্যতার শীর্ষে উঠিয়াছে। আর আমরা এখনও প্রাচীন সভ্যতার মোহেই ডুবিয়া আছি। আমরা ধর্ম্ম ও দর্শনের বুলি আওড়াইয়া বাস্তব জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করিয়া পরজন্মের কাল্পনিক সুখময় জীবনের জন্য সদা প্রস্তুত হইতেছি।. আমরা যে আজ তপস্যার যুগ ছাড়াইয়া গোষ্ঠিজীবন অতিক্রম করিয়া এক বৃহৎ সমাজের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি তাহা বোধ হয় স্বীকারই করিতে চাহি না।

সভ্যতার প্রধান নিদর্শন মানবের ও তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তির ও গুণের প্রকাশ ও বিস্তার। খুব স্থূলভাবে দেখিতে গেলে সভ্যতার পরিমাপ আমাদের অভাবের সংখ্যা ও মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া তাহার প্রতিকার সাধনের কৃতকার্য্যতায়। আদিম মানুষ নিজের উদরপূর্ত্তির জন্য ব্যস্ত থাকিত। ক্রমে গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইল, সমাজের ভিত্তি হইল, তাহার পর রাষ্ট্রের ব্যবস্থার প্রয়োজন হইল। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এইভাবে একত্রিত হইয়া কৃষি শিল্প গড়িয়া উঠিল। জলাভাবের জন্য সেচব্যবস্থা হইল। আচ্ছাদনের জন্য পশুচর্ম্ম ছাড়িয়া তাঁতের পত্তন হইল। যানবাহনের সুলভ উপায় অবলম্বন করিয়া দেশের সীমা বাড়িতে লাগিল। ক্রমে বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে বিভিন্ন লোকসমাজের মধ্যে পরিচয় ঘটিল। ভাবের এবং দ্রব্যের আদানপ্রদান স্থায়ী ভাব ধারণ করিল।

চার-পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বেও ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দ্রব্যসম্ভারের জন্য বিখ্যাত ছিল। তখন শিল্প ছিল মানুষের হাতের কৌশলায়ত্ত এবং পিতৃ-পুরুষপরম্পরা পেশাই ছিল কোন বিশেষ সামগ্রী তৈয়ারী করা। পিতৃপিতামহ পুরুষানুক্রমে সেই জিনিষেরই সাধনা করিতেন এবং তাহার বিনিময়ে ক্ষুদ্র সংসারের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। রাজার রাজ্য বিস্তারের ফলে এবং নূতন নূতন দেশ আবিষ্কৃত হওয়ায় বহু লোকের একত্রে ও এক অবস্থায় বাস করিতে হইল। তাহারই ফলে সেই সব জিনিসের চাহিদা বাড়িয়া গেল এবং প্রচুর পরিমাণে তাহা তৈয়ারী করিবার জন্য যন্ত্রের আবিষ্কার হইল। মানুষের সময় সংক্ষেপ হইল এবং সমাজের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সুখ ও সোয়াস্তির জন্য নানাবিধ কাজ করিবার জন্য বহুসংখ্যক লোক মুক্ত হইল।

প্রত্যেক মানুষই তাহার নিজের জীবনধারণের জন্য এক ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে কাজ করিয়া জীবন শেষ করিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যখন নানা কর্ম্মে লিপ্ত বহুবিধ মানব একত্রে বসবাস করে তখন কার্য্যের সীমা ও আয়তন এত বাড়িয়া যায় যে, বিভিন্ন দলে সমস্ত সমাজকে ভাগ করিয়া সমস্ত কাজ করিয়া উঠিতে হয়। মানুষ একত্রে থাকিলে সময়ের যে প্রাচুর্য্য হয় তাহাতে চিন্তাশক্তি ও আনুষঙ্গিক কর্ম্মশক্তি স্ফুরণের অবকাশ পায়। তাই ক্রীতদাসের সেবা তুচ্ছ করিয়া মানুষ প্রকৃতির ক্রোড় হইতে বিপুল শক্তি অর্জ্জন করিয়া লোভ' বাড়াইয়া চলিয়াছে। কিছুকাল আগে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে—প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংখ্যা গত একশত বৎসরের মধ্যে ৫২ হইতে ৫৮৪-তে উঠিয়াছে। এই ৫২-টি দ্রব্যের মধ্যে অতি-প্রয়োজনীয় ছিল ১৬-টি, কিন্তু এখন সেই অতি-প্রয়োজনীয়ের সংখ্যা হইয়াছে ৯৪-টি।

আমরা এক বৃহৎ বিশ্বসমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যান্য দেশের ঘাত-প্রতিঘাত আমাদিগকেও সহ্য করিতে হইতেছে। কূপমণ্ডুক হওয়া সম্ভব হইত যদি কূপের ন্যায় আমাদের দেশের চারিদিকে বিরাট প্রাচীর তুলিয়া

রাখিতে পারিতাম। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার দান কেন আসে নাই তাহা এই আলোচনার বহির্ভূত। *কিন্তু মূলকথা বর্ত্তমান বিশ্বের পরিস্থিতিতে আমরা ৪০ কোটি নরনারী দীনহীন হইয়া আছি। নিজেদের চেষ্টার* অনেক ত্রুটি আছে। মুষ্টিমেয় 'মহাপুরুষ' বাদে দৈনন্দিন জীবনের অভাবের তাড়নাই আমাদের জীবনের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যের সুখপ্রকরণ দেখিয়া জীবনে ধিক্কার আসে। কিন্তু ইহার প্রতিকারের কোন সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার চেষ্টা হয় নাই। এই মাটি, এই জল, এই আকাশ সুখ-সম্ভারে প্রস্তুত হইয়া আমাদের চেষ্টার ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছে। উন্নতির মূলে মানুষের চেষ্টা এবং উন্নতি-জাত সুখও মানুষেরই ভোগের জন্য। যদি প্রকৃতি হইতে শক্তি অর্জ্জন করিয়া মানুষের কাঁধ হইতে তাহার ভারের বোঝা নামাইতে পারি তবে বিরাট কারখানার অন্তরালে কোন ক্ষোভ বা দুঃখের কারণ লুক্কায়িত থাকিলে তাহার দুরীকরণ মুস্কিল হইবে না। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা এই বিষয়ে সাহায্য করিবে। যদি যান্ত্রিক সভ্যতার ফলে বিষ উঠিয়া থাকে তবে সেই গরলকে অমৃতে পরিণত করা কি একেবারেই অসম্ভব হইবে? রুশিয়ায় ত আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যাপক শ্রমিক অসন্তোষের কথা জানা যায় নাই; সুইডেন (সাম্যবাদী দেশ নহে, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত) অত ক্ষুদ্র দেশ হইয়াও গত যুদ্ধের ফলে কত শিল্পের সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু কোন অশান্তির সংবাদ ত আসে নাই। তাহার ত তৈয়ারী পণ্য বিক্রয় করিবার জন্য কাহারও সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইতেছে না।

কিন্তু আমাদের দেশের দিকে চাহিলে কি ভীষণ অবস্থা দেখি। কোটি কোটি লোক বুভুক্ষু অবস্থায় দিন কাটাইতেছে। যদিও শতকরা প্রায় ৭০ জন লোক চাষ আবাদ করে এবং শতকরা ২০ জন এই চাষের উপর নির্ভর করে (যেমন জমিদার, মহাজন, দালাল) তবুও ভারতের চাষীর দুইবেলা পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি চাষ করিয়া যে ফসল ওঠে তাহাতে সকলের কুলায় না। আর একদিকে পরণে কাপড় নাই, থাকিবার ঘর নাই, রোগের প্রতিকার নাই। তবে আমরা যদি পল্লীবাটে শ্যামল ছায়ে স্বগৃহের অদূরবর্ত্তী জমিতে চাষ করিয়া ও শান্ত শীতল গৃহপ্রাঙ্গণে সুতা বুনিয়া পরলোকের জন্য দিন গুণিয়া যাই তাহা হইলে নিজের উদরপূর্ত্তি ও আচ্ছাদনের ব্যবস্থা বাদে আর কোন কিছু ভাবিবার বা করিবার সময়ের দরকার বোধ করিব না। *কিন্তু আমরা এখনও অতি অল্পতেই সুখী। আমাদের প্রয়োজনের তালিকা অতি ছোট। কৃষিই আমাদের সকলেরই জীবনের* প্রধান অবলম্বন। কিন্তু এক ক্ষুদ্র জমিখণ্ডের উপর ৫।৭ জন নির্ভর না করিয়া বাড়তি লোককে অন্য কাজ দেওয়া দরকার। আমরা অনেক রকমের জিনিষ ব্যবহার করি, যাহার তৈয়ারীর সুবিধা থাকিতেও আমরা আজ পর্য্যন্ত পরের দেশ হইতে কিনিয়া আনি। আমাদের কাজের লোক আছে এবং তৈয়ারী করিবার সরঞ্জামও আছে। দরকার কেবল কাজে লোক লাগান এবং যাহাতে এই কর্ম্মপ্রসার যথেচ্ছভাবে চলিয়া সমাজের এবং দেশের ক্ষতি করিতে না পারে সেই জন্য সর্ব্বদিক বিবেচনা করিয়া জাতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা আজ ভারতে অনেক দেরীতে আসিয়াছে মনে হইতেছে; আমরা এতদিনে আমাদের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছি। বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান ইউরোপের এই যুদ্ধের ফলে জিনিষপত্রের দাম চড়িয়া যাওয়ায় আমরা যে কত দরিদ্র ও পরনির্ভরশীল তাহা বুঝিতেছি। আমাদের মাথাপিছু আয় এত কম যে মূল্যবৃদ্ধি হেতু আমাদের অনেককে অনেক জিনিষের ব্যবহার ছাড়িতে হইয়াছে এবং অনেক মালের ও যন্ত্রপাতি এবং ঔষধপত্রের ক্রয়-বিক্রয়ে যে আয় ও লাভের সম্ভাবনা ছিল তাহা দূর হইয়াছে। গতযুদ্ধে বস্ত্র ভীষণ দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল কিন্তু যুদ্ধের পরে কাপড়ের কলের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় এবার অবস্থা বিশেষ খারাপ নহে। কিন্তু এখনও আমরা বিদেশ হইতে নানা প্রকার বস্ত্র আমদানী করি এবং তৎসত্ত্বেও মাথাপিছু এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আবশ্যকীয় ৩০ গজ কাপড়ের স্থলে মাত্র ১৫ গজ কাপড় ব্যবহৃত হইতেছে। গরীব চাষীরা মলিন ও অধৌত এবং অতি ক্ষুদ্র বস্ত্র ব্যবহার করে এবং গাত্রাচ্ছাদন নাই বলিলেই চলে।

কোন কোন শিল্প আমাদের দেশে গড়িয়া উঠিতেছে কিন্তু কোন সুচিন্তিত পন্থানুসারে নয়। চাহিদা আছে, অতএব ধনীর উদ্বৃত্ত ধন দিয়া অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তাহা মিটাইবার জন্য কল-কারখানা বাড়াইয়া চলিলে যে কি রকম বিষময় ফল হয় তাহা চিনির কলের অবস্থাতেই প্রমাণ। যে দেশে চিনি বাহির হইতে আনিয়া খাইতে হইত, তাহা ন্যূনাধিক পাঁচ বৎসরের মধ্যে দেশে প্রস্তুত হইয়া বাহিরে রপ্তানি

হইতেছিল। কিন্তু কোন শৃঙ্খলা না থাকায় ও অসাবধানে কারখানা স্থাপিত ও পরিচালিত হওয়ায় রক্ষণ শুল্ক কমাইয়া দেওয়ায় অনেক কল উঠিয়া গিয়াছে। এইজন্য চাই প্রথমে তথ্য সংগ্রহ করা, চাহিদার পরিমাণ ঠিক করা, সেই চাহিদা মিটাইবার জন্য রসদের জোগাড় ও কলকারখানা স্থাপনের বা অন্য উপায় অবলম্বনের নির্দ্দেশ এবং সেই নির্দ্দেশ পালনের ব্যবস্থা। এই সব বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এক উদ্দেশ্যে সম্মিলিত চেষ্টার প্রসার ও কার্য্যের শৃঙ্খলা নির্দ্ধারণ করা বিশেষ আবশ্যক।

গত যুদ্ধের পরই বিশেষ করিয়া জাতি গঠনের অর্থাৎ জাতীয় জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত ও আনুষঙ্গিক জীবনযাত্রার উন্নতি বিধানের প্রয়োজনীয়তার সর্ব্বদেশেই অল্পবিস্তর উপলব্ধি হয়। দেশের ভিতরে কি কি মালমসলা রহিয়াছে এবং আরও কি কি পাওয়া যাইতে পারে, কি করিয়া দেশের ধন বৃদ্ধি করা যায়, অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া কতদূর নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থা হইতে পারে এই সব প্রশ্নসমাধানের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ বড় দেশের মধ্যে রুশিয়া এবং ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে সুইডেনের কথা বলা যাইতে পারে। রুশিয়া আমাদের দেশের মতই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়াও সম্পদের অব্যবহারে এক দীন দেশ ছিল। এমন কি অনেক ঐশ্বর্য্যের কোন খোঁজই ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বজাতি ভূতত্ত্ব সম্মেলনে আহূত বৈজ্ঞানিকগণ রুশিয়ায় অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রভূত খনি ও খনিজ পদার্থের আবিষ্কার ও ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু জ্ঞানী ও গুণী লোক ইহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সেই দেশে এখনও পাঁচ বৎসর অন্তর দেশময় কাজ ও কার্য্যলব্ধ ফলের হিসাবের উপর নূতন ও পরিবর্দ্ধিত উপায়ে দেশের লোকের যাবতীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত হইতেছে। সেই দেশে এখনও ত কোন বিরাট অসন্তোষ বা অবনতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। দেশান্তরে বিশৃঙ্খল উপায়ে গঠিত ও অনেক সময় অস্বাভাবিকভাবে পুষ্ট শিল্পরাজ্যে যে নানাবিধ দুর্য্যোগ ঘটিয়াছে রুশিয়ায় সেইরূপ গোলোযোগ হয় নাই এবং রাষ্ট্রিক বিধানের দরকার হয় নাই। সুইডেন সাম্যবাদী নহে। সেখানে সমাজে উচ্চনীচ ভেদ থাকা সত্ত্বেও নিজের দেশের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত বেশ সুচারু রূপেই ত হইতেছে। কৃষি ও শিল্প গড়িয়া তুলিবার সময় মানুষের প্রয়োজন যেমন দেখিতে হইয়াছে, সেইরূপ যন্ত্রকে প্রাধান্য দেওয়ার সময় মানুষের সত্তাকেও উপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে। যন্ত্রযুগের সূচনায় যে সামাজিক বিপ্লব (Industrial Revolution) আসিয়াছিল এবং বর্ত্তমানের যন্ত্র ও মানুষের ধীর ও সুস্থির সামঞ্জস্যে (National Planning) যে দেশে দেশে উন্নতি হইতেছে এই দুই যুগের আন্দোলনের বিশিষ্ট তফাৎ হইতেছে এই যে, প্রথমোক্ত উপায়ে প্রচুর উৎপাদনী শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া মানুষ দিশাহারা হইয়া গিয়াছিল এবং সেইজন্য উত্তরকালে ফল স্থানে স্থানে অমঙ্গলের সূচনা করিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় উপায়ে এই উৎপাদনী শক্তিকে মানুষের দাস করিয়া মানুষ এখন নিজের হিতসাধনে প্রবৃত্ত। এইজন্য ইংলণ্ডেও অনেক শিল্প, যথা—বৈদ্যুতিকশক্তি উৎপাদন, রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজনীয় শিল্প পরিচালনার ভার সরকার লইয়াছেন এবং বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ও শিল্পকুশলীদের গঠিত এক সমিতির অধীন করিয়া রাখিয়াছেন। ইহারা উৎপাদনের কেন্দ্র ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় চিন্তা করিয়া কার্য্য পরিচালনা করেন। এই ব্যবস্থার ফলে কোনপ্রকার বিশৃঙ্খলা বা বিঘ্নকারী প্রতিযোগিতা এখন আর হইতেছে না।

সারা জগতময় এইভাবে মানুষের সৃজনী শক্তি নিয়োজিত হইতেছে, কিন্তু আমরা ভারতের লোক কৃষির উপরই নির্ভর করিয়া বসিয়া আছি। ধরিত্রীমাতারও সহ্যসীমা আছে এবং সেইজন্য হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শতকরা ৫০ জনের অধিক লোক কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকিলে দেশের লোকের আয় বাড়িতে পারে না। চাষীর যদি তাহার পরিবারের সকলকে চাষের ফসল বিক্রয় করিয়া খাওয়াইতে পরাইতে হয় তাহা হইলে তাহার অন্য দ্রব্য ক্রয় করার আর সামর্থ্য থাকে না। ব্যবহার্য্য দ্রব্য কিনিবার অর্থসামর্থ্য না বাড়াইতে পারিলে, জীবনযাপনের ধরণ উন্নত না করিলে দেশের মঙ্গলসাধন সম্ভব নয়। বাঁশে ঘুণ ধরিয়াছে। ঘুণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে দেশের কাঠামোতে ঘুণে ধরা বাঁশের জায়গায় প্রলেপ দেয়া বাঁশ বসাইতে হইবে। দেশের দারিদ্র্যের অধোগতিকে বন্ধ করা আশু প্রয়োজন। বিশিষ্ট শিল্পবিদ্ ও মহীশূর রাজ্যের শিল্পোন্নতির প্রধান অধিনায়ক

স্যর এম্, বিশ্বেশ্বরীয়া দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার উন্নতির প্রসার নিম্নোদ্ধৃত তালিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তালিকাটি কয়েক বৎসর আগে রচিত হইয়াছিল। কোন কোন বিষয়ের পরিমাণ ইতিমধ্যে বোধ হয় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু সকল তথ্য একত্রে সমাবেশিত হওয়ার ফলে তালিকাটি বিশেষ উপযোগী ও পথনির্দ্দেশী, সেইজন্য এখানে উদ্ধৃত হইল।

উন্নতিবিধায়ক কার্য্যসূচীর প্রথম দশ বৎসরের জন্য উন্নতিকরণের বিষয় ও তাহার পরিমাণ

বিষয়	মান	বর্ত্তমান অবস্থা	উন্নতির সী
জাতির মোট বার্ষিক আয়	কোটি টাকা	২,৫০০	৫,০০০
শিল্পলব্ধ অর্থের আনুমানিক বার্ষিক মোট	„	৪০০	২,০০০
কৃষিশিল্পের দাদন টাকা	„	৩০০	১,০০০
লৌহ ও ইস্পাত	টন (২৭ মন)	২,০০০,০০০	৩০০,০০০
কয়লা	„	২৪,০০০,০০০	৪০,০০০,০০০
বস্ত্রশিল্পের মোট টাকু	সংখ্যা	১০,০০০,০০০	১৫,০০০,০০০
„ তাঁত	„	২০০,০০০	৩,৮০০,০০০
মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ (ইহার সঙ্গে নানা ইঞ্জিনিয়ারীং শিল্প গড়িয়া উঠিবে)	„	———	২০,০০০
কৃষিকর্ম্মলব্ধ বার্ষিক আয়	কোটি টাকা	২,০০০	২,৫০০
ব্রিটিশশাসিত ভারতে চাষের জমি			
নিঃসেচ ক্ষেত্র	১০ লক্ষ একর ব ৩০ লক্ষ বিঘা	২১২	২৫০
সেচনীয় ক্ষেত্র	„	৫০	৬০
যাতায়াতের পথঘাট	মাইল	২৫°,১২৫	৫০০,০০০
রেলওয়ে লাইন	„	৪২,৭৫০	৫৫,০০০
বৈদ্যুতিক শক্তিকেন্দ্রের কার্য্যক্ষমতা	কিলোয়াট (একঘণ্টা এই শক্তিতে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালনে এক ইউনিট খরচ হয়)	১,০০০,০০০	২,২০০,০০০
বৈদ্যুতিক শক্তি	উল্লিখিত মানের ১০ লক্ষ ইউনিট	১,৮০০	৪,০০০
বাণিজ্য ও লোকচলাচলের জাহাজের বহন করিবার ক্ষমতা	টন	২৭১,৮২০	১,০০০,০০০
কৃষিনির্ভর লোকসংখ্যা	লক্ষ	২৫০	২০০
বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত লোক	সংখ্যা	১,৫০০,০০০	১০,০০০,০০০
নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প	„	১৫,৩৬১,০০০	৫০,০০০,০০০
তাহার উপর উপর নির্ভর লোক	„	৩৫,৩০০,০০০	৮৫,০০০,০০০
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র	„	১০০,০০০	২০০,০০০
লোকশিক্ষা	মোট লোকসংখ্যার শতকরা অনুপাত	৮	৫০
শিক্ষাব্রতী লোকসংখ্যা	„	৫	১৫

এই পরিবর্ত্তনের কাজে হাত দিতে গেলে প্রথমেই আমাদের একদিকে যেমন দেশের সম্পদ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে সেইরূপ আর একদিক হইতে দেশবাসীর সহযোগিতা ও মিলিত চেষ্টার প্রয়োজন হইবে। শিল্পী,

বৈজ্ঞানিক, ধনী, শ্রমিক, মহাজন ইত্যাদি সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের একত্রীকরণ ও পরস্পরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিলিব্যবস্থার আবশ্যক। এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করিয়া একটা লোহার কারখানা, একটা চিনির কারখানা, একটা বৈদ্যুতিক শক্তির কেন্দ্র প্রভৃতি শ্রমশিল্প হ য ব র ল-ভাবে গড়িয়া তুলিলে হইবে না। সেইজন্যই ১১-টি প্রদেশের ৮-টি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী কার্য্যভার গ্রহণের পর গত ১৯৩৮ সনে অক্টোবর মাসে শিল্পবিভাগের মন্ত্রিগণ অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার আগ্রহে তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর আমন্ত্রণে দিল্লীতে মিলিত হন এবং স্থির করেন যে একটি জাতীয় উন্নতিবিধান-নির্দ্দেশী সমিতি (National Planning Committee) সর্ব্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়া এক বিবরণী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিকট পেশ করিবেন এবং ওয়ার্কিং কমিটির বিধান অনুযায়ী যতদিন না কেন্দ্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইতেছে ততদিন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অবস্থানুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইবে। এই কার্য্য যাহাতে ব্যাপকভাবে সর্ব্বদেশময় হইতে পারে সেইজন্য অকংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীকে ও প্রধান করদরাজ্যসমূহে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ পাঠান হইয়াছিল। ফলে সমস্ত প্রদেশগুলির এবং বরোদা, মহীশূর, হায়দ্রাবাদের প্রতিনিধি লইয়া ও ইহাদের অর্থানুকূল্যে পণ্ডিত জহরলালের নেতৃত্বে National Planning Committee বা জাতীয় উন্নতিবিধানী নির্দ্দেশ-সমিতি (ভুলবশত ইহাকে জাতীয় শিল্পোন্নতি সমিতি বলা হইতেছে) প্রায় এক বৎসর হইল কার্য্য করিতেছে। বোম্বাইতে ইহার কেন্দ্রীয় আফিস এবং বিখ্যাত ধননীতিবিদ কে-টি-সাহা ইহার সম্পাদক এবং ইহাকে সহায়তা করিবার জন্য বোম্বাইবাসী জি-পি-হাতীসিং ও ভূতপূর্ব্ব সিংহল গভর্ণমেণ্টের শিল্পবিষয়ক উপদেষ্টা বাঙ্গালী শ্রীকরুণাদাস গুহ নিযুক্ত হইয়াছেন। গত এপ্রিল মাসে এই কমিটির প্রথম সভায় স্থিরীকৃত হয় যে কার্য্যের গুরুত্বহেতু ও শৃঙ্খলার জন্য উপসমিতি স্থাপন প্রয়োজন এবং ২৯-টি উপসমিতি বর্ত্তমানে তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। যদি কেবল যন্ত্রশিল্পের উন্নতির বিষয়ে এই কমিটিকে নির্দ্দেশ দিতে বলা হইত তাহা হইলে কাজ অনেক সহজ হইত। কিন্তু জাতির উন্নতির জন্য কেবল কল-কারখানাই যথেষ্ট নহে। আমাদের বহু পুরাতন কৃষি ব্যবস্থা, ধনসমস্যা, শিক্ষার একদেশদর্শিতা, সমাজে নারীর স্থান ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে দেশের মধ্যে বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যেও আলোড়ন উঠিবে। সেই হেতু জাতির জীবনের প্রত্যেক স্তর ও বিভাগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করা দরকার। প্রথমত দেশের সমস্যাকে আটভাগে ভাগ করা হইয়াছে। (১) কৃষি (২) শিল্প (৩) লোকসম্বন্ধ (Demographic relations) (৪) বাণিজ্য ও ধনসম্পদ (৫) যানবাহন ও সংবাদ সরবরাহের ব্যবস্থা (৬) লোকোন্নতি (Public welfare) (৭) শিক্ষা এবং (৮) নারীর কর্ম্মক্ষেত্র। কৃষি ও তৎসংলগ্ন তথ্য সংগ্রহ করিবার ও এই বিষয়ে উন্নতির নির্দ্দেশ দিবার জন্য আটটি উপসমিতি গঠিত হইয়াছে। তাহাদের সন্ধানের বিষয় যথাক্রমে গ্রামের কেনাবেচার কি ব্যবস্থা ও এই ব্যাপারে অর্থের সংস্থান, দ্বিতীয়ত—সেচ ও জমির পার্শ্ববর্ত্তী নদীর অবস্থা, তৃতীয়ত—প্রধানত বৃষ্টির জলে ও অন্য কারণে জমির ক্ষয় ও তাহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা, চতুর্থত—জমিদারী ও চাষীর অবস্থা এবং প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের প্রতিকার, পঞ্চমত—গবাদি পশু ও তাহাদের পালন, ষষ্ঠত—ফসলের হিসাব ও ফলন এবং লাভবান ফসলের প্রচলন, সপ্তমত—ফুল ও ভেষজ গাছপালার চাষ, অষ্টমত—সামুদ্রিক ও নদীপুষ্করিণীর মৎস্যের ব্যবসার অবস্থা ও ব্যবস্থা।

শিল্পবিভাগের অধীনে সাতটি উপসমিতি আছে। প্রথমেই অধুনা প্রচলিত ও প্রবর্ত্তনযোগ্য গ্রামের লোকের অবসরসময়োপযোগী শিল্প ও বিশেষ ক্ষেত্রে কুটীরে সম্ভব সৌখীন কারুশিল্পের বা কোন বৃহৎ শিল্পের জোগানদার হিসাবে কুটীরজাত শিল্পের অবস্থা, তাহাদের অর্থানুকূল্য ও বিক্রয়ের ব্যবস্থার বিষয় আলোচিত হইতেছে। কিন্তু বর্দ্ধিত সমাজের নানাকার্য্যে ব্রতী লোকের সৌহার্দ্য কুটীরে তৈয়ারী করিয়া (বিশেষ শ্রেণীবদ্ধ লোক দ্বারা নিজের ও অন্যের প্রয়োজনার্থে) মিটান অসম্ভব। সেইজন্য বৃহৎ শিল্পস্থাপন ও তাহার উন্নতির জন্য ব্যবস্থা প্রয়োজন। এইজন্য চাই সুলভ ও অশ্রান্ত শক্তি ও তাপের ব্যবস্থা। বর্ত্তমানে একজন লোক যদি দুই বলীবর্দ্দসহ কোন কাজ করে তবে সে মোট ৭৫ইউনিট শক্তির ব্যবস্থা করিতে সক্ষম এবং হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, ভারতের লোক মাথাপিছু মাত্র ৯০ ইউনিট শক্তি ব্যবহার করে। সভ্যতার প্রধান অঙ্গ যে মানুষের অবসর সৃষ্টি করা এবং সেই

অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করা এই ভাব এখনও আমাদের দেশে বিস্তার লাভ করে নাই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কোন রকমে এই পৃথিবীর জীবন কাটাইয়া স্বর্গে বাস করিবার জন্য আমরা লালায়িত। মানুষের সুবিধার জন্য প্রথমে ক্রীতদাসের ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু এখন প্রাকৃতিক সম্ভারের সুযোগ লইয়া পাশ্চাত্য দেশবাসী বিপুল দাস-দাসীর অধিকারী হইয়াছে। সেইজন্যই যেখানে আগে দশজন লোক কাজ করিত সেখানে এখন একজন লোক কাজ করে এবং বাকী নয়জন লোক অন্য কাজে হাত দিতে পারিয়াছে এবং এই বিভিন্ন কাজের ফলেই আমাদের অভাব অসুবিধা সব দূর করা সম্ভব হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশে মাথাপিছু প্রায় ১৮০০ ইউনিট শক্তি ব্যয়িত হয়। আমাদের দেশে যতদূর অনুসন্ধান লওয়া হইয়াছে তাহাতে প্রাকৃতিক সঞ্চিত শক্তির অভাব নাই এবং এখনও অনেক খোঁজ হয় নাই। শক্তি উৎপাদন করিবার প্রধান উপায় উচ্চ স্তর হইতে জলস্রোত, কয়লা পোড়াইয়া গ্যাস ও বাষ্প এবং খনিজ তেল। খনিজ তেল আমাদের দেশের প্রয়োজন অনুপাতে খুব অল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু জলস্রোত বা জলপ্রপাত ও কয়লা যাহা আছে তাহাতে আমাদের পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় মাথাপিছু ২০টি ক্রীতদাস (১৮০০ ইউনিট) তৈয়ারী করা সহজ। স্যর এম-বিশ্বেশ্বরীয়া কিছুকাল আগে হিসাব করিয়াছিলেন যে, জলস্রোত হইতে তাড়িত শক্তি (hydro-electricity) উৎপাদন করিবার যে সুযোগ আছে তাহার শতকরা ৩ ভাগের বেশী বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত আমরা সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই। মহীশূর—মান্দ্রাজ (পাইকারা) অঞ্চলে কিছু কাজ এইদিকে অগ্রসর হইয়াছে। বোম্বাই অঞ্চলে বৃষ্টির জল আটকাইয়া জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়া টাটা কোম্পানী বহু শিল্পের প্রসারের সুবিধা করিয়াছেন। পাঞ্জাবের মণ্ডি স্কীম ও যুক্তপ্রদেশের Upper Ganges Grid System সেচ প্রণালীর ব্যবহারের জন্য যে শক্তির ব্যবস্থা করিয়াছে, দুর্ভাগ্যবশত তাহার খরচ অসাধারণ হইয়াছে। শক্তি উৎপাদনের যে বিশেষ বাধা নাই তাহা উল্লিখিত শক্তি-কেন্দ্র স্থাপনেই প্রমাণিত; তবে এই দুই স্থলে অদূরদর্শিতা ও অপর্য্যাপ্ত তথ্যে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া কাজ করা হইয়াছিল।

কতকগুলি শিল্প না থাকিলে দেশের ব্যাপক ভাবে শিল্পোন্নতি অসম্ভব। বিশেষ করিয়া যখন কোন যুদ্ধ বাধিয়া ওঠে এবং ব্যবসাবাণিজ্যের গতিরুদ্ধ হয় তখন দেশের অবস্থা বিচার করা খুব সহজ হইয়া ওঠে। গত যুদ্ধের পর বস্ত্রশিল্পের কিছু প্রসার হইয়াছে। এবারের যুদ্ধে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও ঔষধপত্রাদির আমদানির এত অসুবিধা হইয়াছে যে, দেশের রাসায়নিক শিল্পের ভিত্তি যে খুব কাঁচা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। অন্যান্য শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা প্রস্তুতের ব্যবস্থা দেশে খুব মন্থরগতিতে চলিতেছে এবং দেশজাত যন্ত্রাদির অভাবে বিদেশ হইতে প্রচুর অর্থ দিয়া যন্ত্রাদি আনাইয়া শিল্পস্থাপনে বিঘ্ন হইতেছে।

সস্তায় যন্ত্রচালনা করিবার শক্তি সরবরাহ করা হইলেও মালমসলার জন্য আমাদের এখনও অনেক স্থলে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। জমির জন্য কৃত্রিম সার, কাপড়ের কলে সুতার মাড় ও রং, কাগজের কলের মণ্ড ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের স্বচ্ছল সরবরাহ চাই। কষ্টিক সোডা, সালফিউরিক য়্যাসিড ইত্যাদি মূল রাসায়নিক দ্রব্যের অভাব দেশে সুস্পষ্ট। সুখের বিষয়, টাটা কোম্পানী বরোদার নিকট কষ্টিক সোডা ও সোডা গ্যাস তৈয়ারীর কারখানা খুলিতেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত লবণ ও চুনের খনির ইজারা আংশিক আমাদের উদ্যম ও দূরদর্শিতার অভাব হেতু সরকার বাহাদুর বিলাতী কোম্পানী ইম্পিরিয়েল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজকে দিয়াছেন এবং তাহারা কলিকাতার সন্নিকটে রিষড়ায় এবং খনির মুখে কার-খানা খুলিতেছেন। তবে ইহার আয়তন অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। মান্দ্রাজের মেটুরে অনুরূপ কারখানার যন্ত্রপাতি বসান সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত কাজ আরম্ভ হয় নাই। বিদেশী মাল আমদানির লাভই বোধ হয় পরিচালকদের নিকট বেশী অর্থপ্রদ হইয়াছে। খনির কয়লা কোক্ কয়লায় পরিণত করি-বার সময় যে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস বাহির হয় তাহা আমরা আকাশেই উড়াইয়া দিই। এই গ্যাস হইতে আলকাতরা, ন্যাপথালিন, রংয়ের মূল মসলা এবং নানাবিধ ঔষধ তৈয়ারী ও অন্যান্য শিল্পে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। যুদ্ধের চাপে বারুদ গোলা তৈয়ারীর জন্য সরকার বাহাদুর জামসেদ-পুরের নিকট কারখানার বন্দোবস্ত করিতেছেন। আশা করা যায়, সরকারী উদ্যোগে আমাদের অর্থবান দেশবাসীর চোখ খুলিবে। স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ নিবারণের জন্য বিশেষ করিয়া রসায়ন শিল্প আরও সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

এই রসায়ন শিল্পের মালমশলা আবার অনেক খনিজ দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। তাহা ছাড়া, লোহা, তামা, য়্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর প্রচুর উৎপাদন প্রয়োজনীয়। লোহা আমরা তৈয়ারী করিতেছি, কিন্তু সামান্য স্ক্রু, কব্জা, পেরেক এখনও বহুল পরিমাণে আমাদিগকে আমদানি করিতে হয়। নূতন হাওড়াপুলের জন্য অনেক লৌহজাত দ্রব্য বিদেশ হইতে আনিতে হইতেছে। য়্যালুমিনিয়াম এখনও এদেশে খনিজ যৌগিক পদার্থ হইতে নিষ্কাষিত হইতেছে না—যদিও বিহার ও মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলে খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ বৈদ্যুতিক শক্তির দুষ্প্রাপ্যতা। আমাদের এই বিরাট দেশের ভিতরে ব্যবসা ও লোকচলাচলের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা আছে কিন্তু রেলগাড়ীর ইঞ্জিন বিলাত হইতে আনাইতে হয় এবং জাহাজ ষ্টীমারও বিদেশে তৈয়ারী হয়। এখানে মেরামতের কাজ কিছু হয় এবং কিছুদিন আগে সরকার বাহাদুর বিলাতী ইঞ্জিনীয়ারের পরামর্শে সায় দিয়াছেন যে ঈষ্টর্ন বেঙ্গল রেলওয়ের কাঁচড়াপাড়ার কারখানায় সস্তায় বড় ইঞ্জিন প্রস্তুত হইতে পারে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, দেশের কারিগর ও মালমসলার অভাবের কথা ভিত্তিহীন। ইহা ছাড়া, কারখানায় প্রয়োজনীয় কল, মোটর, ডায়নামো ইত্যাদির নির্ম্মাণ হওয়া আবশ্যক। লোক-শিক্ষার জন্য মুদ্রণযন্ত্র, সিনেমার সরঞ্জাম, জনস্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে জলসরবরাহ, দূষিত জল নিষ্কাশন প্রভৃতির ব্যবস্থার জন্য যন্ত্রাদি, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণার জন্য নানাবিধ আবশ্যকীয় সরঞ্জাম তৈয়ারীর ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই বলিলেই চলে। এই সব শিল্পের শ্রেণী ভাগ করিয়া সাতটি উপসমিতির নিকট বিবরণী চাহিয়া পাঠান হইয়াছে। উপসমিতিতে বিষয়গুলি ভাগ করিয়া দেওয়ায় বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা তাঁহাদের সুচিন্তিত মতামত সুদৃঢ়ভাবে তাঁহাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য তাহা ব্যক্ত করিতে পারিবেন। উপসমিতিগুলি ভিন্ন ভিন্ন শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা, তাহার প্রসারের ব্যবস্থা, স্থাপনের উপযুক্ত স্থান ও মালমসলার সুবিধা, তাহাদের পরিচালনা, অর্থের ব্যবস্থা, প্রস্তুত দ্রব্যের সুনিয়ন্ত্রিত বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন কারখানা একত্রীকরণ কিংবা প্রয়োজনবোধে আইনের প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিবেন।

একদিকে যেমন দানবশক্তির আবাহন করিতে হইবে, অন্যদিকে সেই শক্তির নিষ্পেষণ যাহাতে আমাদের উপর আসিয়া না পড়ে এবং শিল্পের শ্রমিকেরা যাহাতে মনুষ্যত্ব না হারাইয়া হাসিমুখে কাজ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা বিভিন্ন শিল্প স্থাপন এবং সমাজ পরিবর্ত্তনের আনুষঙ্গিক হওয়া দরকার। সেইজন্য আজ যে কারখানায় দশজন লোক আছে সেখানে যন্ত্রদানবের আবির্ভাব হইলে যে আটজনকে অন্য পথ দেখিতে হইবে সেই পথের নির্দ্দেশ চাই। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের শ্রমিকদের স্বল্প কৌশলকে বাড়ান বা বিভিন্ন কার্য্যের জন্য বিভিন্ন প্রদেশবাসীর (যেমন জামসেদপুরে কৌশলানুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশবাসী কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বিভাগে নিযুক্ত আছে) শ্রেণীভাগ উচিত কি-না তাহা স্থির করা দরকার। শ্রমিকদের স্বচ্ছল জীবনযাপন করিবার জন্য অতি আবশ্যকীয় ব্যবস্থার তালিকা ও সমাজে তাহাদের স্থানের নির্দ্দেশ—এই সব বিষয়েও সমিতি চিন্তা করিতেছেন। ভারতের বর্দ্ধিষ্ণু লোকসংখ্যাকে কি ভাবে বিভিন্ন কর্ম্মশ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে এবং জন্মমৃত্যুর কোন্ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের কি প্রতিষেধক হইতে পারে এই বিষয়টিও একটি উপসমিতির বিবেচনাধীন।

এইভাবে সমস্যাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া জটিল করিয়া তোলা হইয়াছে এবং বিশদ আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্যই ২৯-টি উপসমিতিতে প্রায় ৩০০ বিশিষ্ট ভারতবাসী সহায়তা করিতেছেন। বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য, শ্রমশিল্পের অর্থ-সংস্থান, শাসন-ব্যবস্থার জন্য সরকারী আয়ের রীতি ও নীতি, ব্যাঙ্ক ও মুদ্রা বিনিময়ের হার ও শৃঙ্খলা, নানাবিধ দুর্য্যোগ ও বিপদের প্রতিকার (insurance) ইত্যাদি বিষয় মূলসমিতির বাণিজ্য ও ধনসম্পদ নিয়ামক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। প্রতি লোকের বসবাসের জন্য ১০০ বর্গ ফিট স্থান দরকার ও প্রতি ১০০০ লোকের জন্য একজন চিকিৎসক দরকার। এই প্রয়োজন সর্ব্বনিম্ন। কিন্তু আমাদের দেশে এই সামান্য অভাব এখনও দূর হয় নাই এবং বর্ত্তমানের রীতিতে এখনও প্রায় ছয় শত বৎসর বাকী। গত ১০০ বৎসরে ৩৫,০০০ (এলোপ্যাথি) ডাক্তার বাহির হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ১৫,০০০ জন গ্রামে চিকিৎসা করিতেছেন, কিন্তু ভারতে গ্রামের সংখ্যা ৭,০০,০০০। লোকের বাসের গৃহ নির্ম্মাণ ও রক্ষণ-পদ্ধতি এবং রোগের

হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় নির্দ্ধারণ করা আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতির এক প্রধান অঙ্গ। গৃহহীন অবস্থায় রোগে ও দুঃখে আমাদের দেশের বহু লোক প্রতি বৎসর মারা যাইতেছে। সেইজন্য কেবলমাত্র দেশময় শিল্প সৃষ্টি করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধি করিলেই উন্নতির পথে আমরা অগ্রসর হইতে পারিব না। দেশের উন্নতির পথে শিল্পের চালনার জন্য শ্রমিকদের সহাস্য মুখে সুস্থ দেহে কাজে ব্রতী রাখিতে হইবে এবং এই সম্বন্ধে সমিতি সচেষ্ট আছেন। সমস্যার এই বহুমুখী আলোচনার ফলে বহু-লোকপ্রচারিত যন্ত্রদানবের অহেতুক বিভীষিকাকে যে দূর করিতে পারা যাইবে তাহা অনুমান করা অহেতুক নহে। পাশ্চাত্য দেশে যে বিভীষিকার ইতিহাস আমরা পাই তাহা একমাত্র অদূরদর্শিতার ফল। যেমন লোকদেহে হস্তপদের অঙ্গাঙ্গীভাব, সেইরূপ লোকসমাজে এক কাজের সঙ্গে আর আর এক কাজের যোগসূত্র রাখিতে হইবে।

আজ যে আমরা 'শিক্ষিত বেকার' নামক এক শ্রেণীর লোকের আবিষ্কার করিয়াছি তাহার মূলে অনুসন্ধান করিলে দেখিব যে, আমরা সকলেই এযাবৎ শিক্ষাক্ষেত্রে কাব্য ইতি-হাসকেই প্রাধান্য দিয়াছি, কোন রকমে ডিগ্রী লইয়া আফিসে আয়াসী কাজ পাই কি-না সেই হিড়িকে। যেমন পুরাকালে শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য 'অধিকার-ভেদ' সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমাদের দেশেও ছাত্রের গুণের উপর তাহার উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। শিক্ষা বিস্তার অর্থাৎ কি-না জগতের 'কারবারে'র সহিত পরিচয় রাখিতে পারে, নিজের গ্রামের খবর আর একজনকে দিতে পারে, প্রত্যেক দেশবাসীর জন্য এইরূপ প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। কিন্তু তাহার পরই যে প্রত্যেককে অর্থসংগ্রহ করিতে পারিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লইতে হইবে তাহা হেতুহীন এবং ইহা মঙ্গলপ্রসূ বিধান নহে। চৌদ্দ-পনর বৎসরের অনূর্দ্ধে প্রত্যেক ছেলের জীবনের ধারা নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। তাহার বাড়ীর শিক্ষা ও দীক্ষা, তাহার নিজের ইচ্ছা, তাহার ক্ষমতা ইত্যাদি বিচার করিতে হইবে। বর্ত্তমানের বেকার-সমস্যা যে আংশিক ভাবে আমাদের দেশের কৃষিলব্ধ সম্পদ ও শিল্পলব্ধ সম্পদের মধ্যে বিশাল বৈষম্যহেতু, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্যাকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে অপরিণামদর্শী পিতামাতা ও তাহাদের পুত্রদের অর্থসুলভ পুঁথির বিদ্যা অর্জ্জন করিবার হুজুগ। শ্রমের যথোপযুক্ত সম্মানকে অস্বীকার করিয়া মস্তিষ্কের 'অপব্যবহার'কেই সমাজ বরণীয় করিয়া লইয়াছে। শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহু শিল্পজ্ঞানী ছাত্রের দরকার হইবে, তাহাদের জন্য অনেক শিল্পশিক্ষার স্কুল ও কলেজ স্থাপিত করিতে হইবে। অল্পশিক্ষিত শ্রমিকগণ যাহাতে অবসর সময়ে পুঁথির বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া বহুল পরিমাণে কুশলী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা দরকার হইবে। যেমন কলা-কাব্য ইতিহাস দর্শনের চর্চ্চার প্রয়োজন আছে এবং থাকিবে, সেইরূপ শিল্পের বর্দ্ধিষ্ণু ধারাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবার জন্য কৃষি, শিল্প ও অন্যবিধ জাতির উন্নতির উপায়ের জন্য—প্রচুর অর্থ সাহায্যে গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে। এই ভাবে কার্য্যের প্রকারভেদে বহুবিধ লোকের কাজ করিবার সুযোগ জুটিবে।

গত তিনশত বৎসরের জরাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তাবিত প্রায়-আমূল সংস্কারের কার্য্যে সিদ্ধি শীঘ্রই হইবে না। পাঁচ-দশ বৎসরে বড় বড় শিল্পের প্রসার করা সম্ভব, কিন্তু যে মানসিক বৃত্তি ও শক্তি এই সব পরিবর্ত্তনের মূলে রাখিতে হইবে তাহার জন্য ভবিষ্যৎ দেশপ্রেমিক সুস্থমনা ভারতবাসী গড়িয়া তুলিতে হইবে। বর্ত্তমানের শিশুদের তাহাদের মাতা-ভগিনীর কাছ হইতে ভারতবর্ষকে ভালবাসিতে শিখিতে হইবে। এই রুক্ষ রুষ্ট জগতে সেই জন্যই বোধ হয় ভগবান পুষ্টদেহ বিক্রমশালী পুরুষের সহিত সুচারু সুকোমল নারী মূর্ত্তিকে প্রেরণ করিয়াছেন। নারীর কাজ পুরুষের সঙ্গে সমান ক্ষেত্রে নহে। পুরুষের কার্য্যের আড়ষ্টতা ও কদর্য্যতাকে সুষ্ঠু করিয়া তোলাই নারীর দান। এই নারীর দান ও জাতির কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার নিজস্ব স্থানের বিষয়েও সমস্ত দিক ভাবিয়া দেখিবার জন্য এক উপসমিতি কাজ করিতেছেন।

আশা করা যায় এই সব উপসমিতি এপ্রিল মাসের মধ্যে তাঁহাদের মতামত মূল সমিতির নিকট পেশ করিবেন। কাজ কিছু মন্থরগতিতে হইতেছে তাহার কারণ দেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্রিক অবস্থা। যাঁহাদের উপরে দেশ শাসনের ভার তাঁহারা যদি এই কাজে হাত দিতেন তাহা হইলে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য এক প্রবল প্রেরণা জাগিত ও লোকের সাহায্য সুলভ হইত। অনেকেই এই সমিতির কার্য্যের উপযোগিতা বিষয়ে এখনও সন্দিহান। তাঁহারা বোধ হয় ভুল করিতেছেন যে, এই সমিতির বিবরণীর উপরেই কার্য্যপ্রণালী উপস্থাপিত করা হইবে। এই মূল

সমিতি মাত্র উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করিতেছে। সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ হইলে পর একটি স্থায়ী বেতনভোগী বা অবৈতনিক সভা গঠিত করিয়া বিভিন্ন দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। ৫।১০ বৎসরের কোন কর্ম্মতালিকা স্থির করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে পর উন্নতির পরিমাণ ও বিঘ্নকারী কারণ নির্ণয় করিতে হইবে এবং আবার সেই সকলের প্রতিকার করিয়া কাজে নামিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব আমাদের হাতে না আসা পর্য্যন্ত ব্যাপক ভাবে কার্য্য পরিচালনা সম্ভব হইবে না। কিন্তু সেই হেতু ইহার কার্য্যকলাপ যে বৃথা তাহা মনে করা ভুল। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সমিতির উদ্যোক্তারা যেন ধরিয়া লইতেছেন যে বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থা কায়েমী হইবে এবং সেই অনুসারে যাহা কিছু নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে তাহা হইতে ধনিক সম্প্রদায়ের নিজেদের বা তাহাদের প্ররোচনায় সরকারী তহবিলের অর্থ লইয়া কেন্দ্রগত ধনলাভের আশায় একটি একটি শিল্প ব্যবসায় গড়িয়া উঠিবে। এই মতবাদের মূলে এই ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে যে, আমাদের মূল সমিতি কেবলমাত্র শিল্প স্থাপনের অবস্থা ও ব্যবস্থা আলোচনা করিবে। কিন্তু মূল সমিতি উল্লিখিত ২৯-টি সমিতিতে বিভক্ত হইয়া যে জটিল সমস্যাকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং আনুষঙ্গিক অবস্থা বিপর্য্যয়ও যে উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। • ইহা ছাড়া এই সমিতির কার্য্যের ফলে যে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ হইবে তাহার উপযোগিতা বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার ঘোরতর অদলবদলে হীন হইবে না। ভবিষ্যতে যে কোন রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যবস্থা হউক না কেন, তাহারা মূল সমিতির নিকট এই বিষয়ে ঋণী হইয়া থাকিবে। মূল সমিতির কাজে যদি দেশবাসী সজাগ হন ও স্বীয় সাধ্যানুসারে জাতির উন্নতি বিধানে মন দেন তবে কেবলমাত্র জাতির চেতনা আনিয়া দিবার জন্যও সমিতি সার্থকতা অর্জ্জন করিবে। জাতি গঠনের এই ক্ষীণ জলস্রোতই একদিন বিশাল নদীরূপে শুষ্ক মরু প্লাবিত করিয়া ভবিষ্যৎ ভারতকে সুশ্রী ও সুফলা করিবে।

পথের কাব্য

শ্রীরামেন্দু দত্ত

কন্‌কনে শীত, ব্যারোমিটারের কাঁটায় 'ছেচল্লিস্'—
ষোলো বছরের মধ্যে এমন হয়নি আর!
চেষ্টার-ফিল্ড্ পুল্-ওভারের সঙ্গে খায় না মিশ্
তবুও গলাতে হয়েছে জড়াতে কম্ফার্টার!
এরোড্রোম্ হ'তে আমদানী-করা পোষাকে ঢাকিয়া তনু
তথাপি বজায় হতেছে প্রভাতী টহল্ মোর
পথে ও বিপথে জল দিয়ে গেছে আক্কেল-হীন হনু
উত্তুরে হাওয়া, গ্যাস জ্বলিতেছে, হয়নি ভোর!

* * *

চায়ের দোকানে পাঁয়জীর ভীড়, বাঙ্গালীরা বিছানায়—
খোট্টা-খবর-কাগজ-ওয়ালারা মারিছে পাড়ি—
উড়িয়ারা শিরে মূলা-বার্ত্তাকু ঝাঁকা ঝাঁকা লয়ে যায়—
অফিসে ছুটিবে মন্ত্র-'সাহেব' কামায় দাড়ি
আছোলা-আঁচাছা শ্লথ কোঁচা-কাছা হাফ্‌শার্ট পরিধানে
'বাবু'রা কুড়াবে মাসিক বেতন তিরিশ টাকা—
চালেতে কিন্তু পাঁয়জী খোট্টা উড়ে মেড়া হার মানে,
কুঁড়ের বাদ্‌শা, মেজাজে বাদ্‌শা, ট্যাঁকটি ফাঁকা!

* * *

যাক্ গে সে কথা, দিন-কাল গুণে ওঠে আক্কেল-দাঁত!
অতীত ভাঙ্গায়ে আর চলিবে না মালুম হয়
সেই 'বাবু'দেরই একটি চাকর, একটু চলে তফাৎ—
অজ্ঞাতসারে এই 'বাবু'টির সঙ্গ লয়!
গায়ে তার ছেঁড়া ময়লা 'র‍্যাপার' ছিন্ন জামাটা ঢাকে,
হালুয়া-কচুরি হয়ত কিনিবে প্রভুর তরে
শেষ-হওয়া বিঁড়ি চলেছে আঁকড়ি' আধোয়া দাঁতের ফাঁকে—
'দস্তুরি'টুকু চলিতে চলিতে হিসাব করে!

* * *

সহসা তাহাকে থমকি দাঁড়াতে দেখিনু পথের পাশে,
আমিও থামিনু, একটা গাছের আড়ালে গিয়া—
ও কি ও! ও ব্যাটা র‍্যাপার খুলিছে পউষ মাসে!
আবার চলিল, সেখানে সেটিকে রাখিয়া দিয়া!
মনে ভাবি, হ'লে চোরাই র‍্যাপার, এমনি ব্যাপার হয়—
ভোগে লাগাইলে দুর্ভোগ ঘটে, সেটা ও জানে,
আগাইয়া দেখি, ইহার উপরও রহিয়াছে বিস্ময়!
হাড়-বের-করা হাত সে র‍্যাপার টানে!

* * *

প'ড়ে আছে পথে বুড়া ভিক্ষুক, হাড় ও চামড়া সার
জলের উপরে পৌষের হাওয়া,—হয়েছে কাবু!
দাঁতে দাঁত লাগে, বুঝি প্রাণটাকে রাখিতে পারে না আর,
মোরে দেখে ভয়ে কোনোমতে কহে "নিস্‌নে বাবু!"
আমি আগাইয়া ঢাকা দিতে যাবো, সংবরি' আঁখি লোর,
হঠাৎ হইল কথা-কওয়া শেষ, অবশ দেহ;
হাতের র‍্যাপার ভীত-কম্পিত হাতেই রহিল মোর,
পরোপকারীর উপকার আর নিল না কেহ!

* * *

পথের উপরে বিয়োগান্ত যে কাব্য রচিত হ'ল
যে উপনায়ক যথা-সম্বল করিল দান
কত শত হেন রয়েছে অভাগা, একটি যাহার ম'ল—
দিনেকের তরে কি হ'বে কাঁদিলে একটি প্রাণ?

তীর ও তরঙ্গ

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

এক

পদ্মাপাড়ের একখানি গ্রাম।

এককালে বড়ই ছিল। আজ ছোট। অর্দ্ধেকই গিলিয়া লইয়াছে রাক্ষসী নদী। বাকি অংশ এবার যদিও রক্ষা পায়, আর বেশি দিন নয়। হয় তো সামনের বছরেই!

রাতদিন পদ্মা করে ফোঁস ফোঁস। আজ বছর দুই কি ভাঙাই না ভাঙিতেছে! গ্রামের মধ্যে কিন্তু ভাঙন লাগিয়াছে অনেককাল আগেই।

গাঁয়ের জমিদার চৌধুরী গোষ্ঠী যেদিন কলিকাতার অস্থায়ী বসবাস অবশেষে চিরস্থায়ী করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে সাত পুরুষের বাৎসরিক পূজার পাট হইল খতম, সেই দিন থেকেই নাকি গ্রামের বুকেও ঘুণ ধরিল। আজ সর্ব্বনাশা নদী শুধু ঐ ঝাঁজরা দেহটার শেষকৃত্য করিতে চায়।…

চৌধুরীরা গেলেন। দু'বছর পরেই সেনের বাড়ী। দেখাদেখি গুপ্ত পরিবারও। মুখুজ্যে বাড়ীর তিন হিস্যাই আজ দুই যুগ হইতে চলিল যে-যাহার কর্ম্মস্থলে—কেউ দিল্লী, কেউ মীরাট, এক শরিক তো সেই সুদূর ব্রহ্মদেশে। এতদিন যারা অন্তত পূজার ছুটিতে দিন কয়েকের জন্য আধ-মরা এই বকুলতলা গ্রামটাকে একটু চাড়া দিয়া চলিয়া যাইতেন, একে একে তাঁদেরও অনেকে আজ সে-দায়টুকুও এড়াইয়াছেন। মায়ার তেল ফুরাইয়া গেলে দয়ার সলিতা আর কতকাল জ্বলিবে!

বাসিন্দাদের অনেকেরই মনের দৃষ্টি আজ গ্রামের মধ্যে নাই। কারু ছেলে স্কুলে পড়ে, কারু ভাই কলেজে, কারু নাতির চাকুরিটা পাকা হওয়াই কেবল বাকি। তারপর হয় তো একদিন পাড়াপড়শীদিগকে মাঝে মাঝে দর্শন দিবার আশ্বাস দিয়া সারা অস্থাবর সংসার লইয়া সটান তারপাশা জাহাজঘাটে। সে-সুযোগেরও বুঝি প্রয়োজন হইবে না। তার আগেই পদ্মা গ্রাম ছাড়িবার অপবাদ হইতে রেহাই দিবে অনেককেই। নদীর যে-রোখ এবার! সামনের বর্ষা পার হইলে হয়!

দিনরাত পদ্মা করে ফোঁস ফোঁস। সমগ্র পৃথিবী গ্রাস করিলেও বুঝি ও-ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই। অবিশ্রান্ত ঘোলাটে আক্রোশ আছাড় খাইয়া ভাঙিয়া পড়ে নিরুপায় কূলে কূলে। গ্রামের উত্তর প্রান্তে দিনের বেলাই কান খাড়া করিলে—শাঁই শাঁই; পূব-দক্ষিণে কালীবাড়ীর বটতলায় আনমনা দাঁড়াইলেও—ঝুপঝাপ্; গ্রামের শেষ সীমানায় কাঁসারী পাড়ায় মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙিলে বালিসের মধ্যে বাজিতে থাকে সমুদ্র শঙ্খ—শোঁ শোঁ! কি ভীষণ জেদ! কি অসহ্য তোড়! যেন লক্ষ কোটি কেউটের সরোষ শোভাযাত্রা ফেনিল ফণায় ফণায়!

তবু ঘরে-বাহিরে ভাঙন-ধরা বকুলতলার মাথার উপর আজ আশ্বিনের এই প্রভাতখানি চমৎকার! দুদিনের দেখা-পাওয়া সেই চিরদিনের শরৎকাল। অজস্র কাঁচা রোদ ঢেউ-এর কোলে নাচে, দোলে, চিকমিক করিয়া ভাঙিয়া হয় চুরমার। গাছে গাছে শিস্ তোলে দোয়েল-শ্যামা। খঞ্জন নাচে ডালে ডালে। ঝোপে-ঝাড়ে ডাহুক হাঁকে। কাক ওড়ে বাড়ী বাড়ী। নিকারীপাড়ায় মোরগ ডাকে। পুকুর পাড়ে লাউ-ঝাকায় মাছরাঙা। উঠানের কোণে শসার মাচায় কুটুমাই। টিনের চালার টুয়ার উপর কবুতর।…মাঠের বুকে, খালের ধারে, দীঘির জলে, পুকুর ঘাটে শাপলা ফুটিয়াছে অগুন্তি। সেফালী করবী, জবা ঝুম্‌কা, অতসী অপরাজিতা—কাড়াকাড়ি করিয়া সাজি ভরে পুঁটি খেঁদী আন্না টুনীরা।…

ওপারে ফরিদপুর। এপারে বিক্রমপুর। মাঝখানে চিরবিদ্রোহী পদ্মা। যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল তোড় আর তোলপাড়। নিকটে-দূরে ছোট-বড় ডিঙির নৃত্য। জোড়া ধরিয়া গাঙ-চিলের নির্ভীক আনাগোনা। সার বাঁধিয়া বেলে-হাঁস দেয় এপার-ওপার পাড়ি।…ঊর্দ্ধে নীল আকাশে 'ছিটকানো পেঁজা তুলার মত সাদা মেঘের নিঃশব্দ সঞ্চরণ।…মালবোঝাই বড় বড় নৌকার ফাঁপানো বাদামে নানান রঙের জোড়াতালি। কেউ লম্বা, কেউ মোটা

—কেউ চলে উত্তরে, কেউ বা দক্ষিণে; কেউ হাল ধরিয়া পাড়ি ধরিয়াছে। দু'-একখানি আবার এ দুর্দিনেও তীর ধরিয়া গুণ টানিয়া চলিয়াছে। তেমাল্লা, চারমাল্লা, দশমাল্লা, বিশমাল্লা—মহাজনী নৌকাগুলি খড়, ধান, চাল, হাঁড়ি, কলসী, টালি, বালি, ইট, গুড়, নারিকেল লইয়া পদ্মার বুকে নাচিয়া কাঁপিয়া চলিয়াছে দূরদূরান্তরে। কেহ কেহ এপারের ভরা ঘাটেও ভিড়ে—বাকি সব আপন আপন গন্তব্যস্থলের অভিমুখে চলিয়াছে বোঝাই মাল খালাস করিতে।... দক্ষিণে ধূ ধূ করে জল আর জল—চাহিয়া চাহিয় চোখের আন্দাজও ফুরাইয়া যায়। বহুদূরে নদীর বুকে মেঘায়িত ধোঁয়ার কুণ্ডলী একখানি ষ্টীমার আসিতেছে তার-ই পূর্ব্বাভাষ।...

বকুলতলা আজ সরগরম। পূজার মাত্র দু'দিন বাকি। প্রবাসী ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরিতেছে। অনেকে কাল আসিয়াছে, কতক আসিবে আজ, বাকি সবাই পরশুর মধ্যেই। কাল বোধন। পরদিন সপ্তমী—প্রথম পূর্জা!

ব্রজনাথ রায় আজ সংক্ষেপে আহ্নিক সারিয়া লইয়াছেন। চাকর রাজু এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া গিয়াছে বাড়ী। অতএব নিজেই আজ বাজার করিবেন। সেখান থেকে জাহাজঘাটে। পিতৃহীন নাতি সুনীল পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিতেছে এক বছর পরে।

দেখিতে দেখিতে বেলা বাজিল সাড়ে নয়টা। ঢাকা মেল তারপাশা পৌছায় বেলা দশটায়। আর মাত্র আধ ঘণ্টা বাকি। ঠাকুরদাদা ষ্টেসনে। মা রান্নাঘরে। ছোট ভাইবোন—বাবলু আর নীলু—বড় ঘরের দাওয়ায় বসিয়া মহা দুর্ভাবনায় পড়িয়াছে। চাহিয়া আছে আকাশের দিকে।...আজ এমন সুন্দর সকালবেলা; কোথাও কিছু নাই; হঠাৎ এক রাশ কালো মেঘ আসিয়া সারা আকাশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বৃষ্টিও যে সুরু হইয়াছে। ভাইবোন বারবার আকাশের দিকে চায়।...দাদা আসিতেছেন। আর খানিক বাদেই তাদের বাড়ীর একটু দূর দিয়াই না ঢাকা মেল বাঁশি ফুঁকিয়া চলিয়া যাইবে। প্রতি বারের মত এবারও তারা মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল—যথাসময় সদলবলে নদীর পাড়ে গিয়া দাঁড়াইবে। আনি পদ্মী খেন্তিও সঙ্গে যাইবে বলিয়া রাখিয়াছে। ও-বাড়ীর অহুদিও অনুরোধ জানাইয়াছেন, তাকেও যেন ডাকিয়া লওয়া হয় যথাসময়। এক মাস ধরিয়া দাদা আসিবার এই দিনটি লইয়া কত গবেষণা দাদা। রুমাল দেখাইয়া আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিবেন চলন্ত ষ্টীমার হইতে, অমনি নীলু ও বাবলু উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী ছুটিবে—কে আগে মাকে এই শুভ সংবাদ পৌছাইয়া দিবে!

এত জল্পনাকল্পনা সবই আজ মাঠে মারা গেল। সূয্যিমামা শেষকালে কিনা বাদ সাধিলেন দাদা আসিবার সময়টাতেই!

ছোট ভাই বাবলু সুর করিয়া আবৃত্তি করে:

"মেঘরাণীর ভাঙা ঘর
বৃষ্টি পড়ে ঝর ঝর।"

"দূর বোকা ছেলে। ও ছড়া বলতে আছে বুঝি? তাতে যে আরো বৃষ্টি হয়!"

দিদির কথায় বাধা পাইয়া ছয় বছরের ছোট ভাই অপরাধীর মত চুপ করিল। ছড়া বলিতে হয়, ছড়া বলিয়াছে। অতশত সে কি বোঝে!

"তবে কী বলব দিদি?"

"বলবি—

"নেবুপাতা করমচা
ওরে বৃষ্টি দূর যা।"

গড়্ গড়্ করিয়া মেঘ ডাকে। বৃষ্টি পড়ে ঝুপ্ ঝুপ্। তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়া এবার দুটি ভাইবোন গাহিয়া চলিয়াছে:

"নেবুপাতা করমচা
ওরে বৃষ্টি দূর যা।"

তবু বৃষ্টি থামে না। জলের শব্দে পদ্মার আক্রোশও চাপা পড়িয়া গেছে।

দূরে শোনা গেল—ফু-উ-উ...

এ-যে চলিয়া যাইবার 'সিটি'। নীলু সোৎসাহে রান্নাঘরে মাকে ডাকিয়া কহিল, "মা, জাহাজ অনেকক্ষণ এসে গেছে। শুনলে না ঐ ছেড়ে দেবার বাঁশি বাজল।"

রান্নাঘর থেকে মা শুধু জানান—হুঁ।

ঢাকা মেল কখন যে তারপাশা গেল আজ কেহ তাহা টের পায় নাই। ঐ আবার বাজে—ফুঁউ। কি আওয়াজে ছাড়ে, কোন্ আওয়াজে ভিড়ে, ঢাকা মেলেরই গলার স্বর মোটা, না চিটাগাং মেলের, মাদারীপুর লাইনের সব কয়টি ষ্টিমারেই মিহি স্বর কি-না—নীলু ও বাবলুর সে-সব কথা একেবারে ঠোঁটস্থ।...হিসাব অনুসারে দাদারা এতক্ষণে

জাহাজ-ঘাটে নৌকায় উঠিয়াছে নিশ্চয়ই। কিন্তু বৃষ্টির যে এদিকে থামিবার কোন লক্ষণই নাই!

"দাদারা ভিজছে দিদি?"

"না রে। তাঁরা এখন নৌকায় উঠেছে।—দুই-এর মধ্যে বৃষ্টি যাবে কেমন ক'রে?"

"চক্কোত্তি বাড়ীর ঘাট থেকে যখন আমাদের বাড়ীতে আসবে, তখন?"

"ঠাকুরদা ছাতা নিয়ে গেছে দেখিস্ নি?"

"যা—কখন নিলে? আমি বুঝি তা হ'লে দেখতাম না?"

"তুই তো তখন ইষ্টিসানে যাবার জন্তে কাঁদতে লেগেছিস।"

দিদির কথায় বিশ্বাস না হওয়ায় বাবলু ডাকিল, "মা! ও মা!"

"কী?"—বৃষ্টির শব্দে রান্নাঘর হইতে মায়ের ঝাপসা কণ্ঠস্বর শোনা যায় না ভাল।

বাবলুকে বলিবার অবসর না দিয়া নীলু চীৎকার করিয়া কহিল, "হ্যাঁ মা, ঠাকুরদা ছাতা নিয়ে যায় নি?"

"হ্যাঁ।"

"ঐ শোন্, মাও বলছে," নীলু ভাইকে নিশ্চিন্ত করিতে চাহিল। এবার বাবলু সুধায়, "আচ্ছা দিদি, বল্ তো এবার দাদা আমার জন্তে কী আনবে?"

"সে কথা পরে হবে'খন।—ঐ ছাখ্ আবার জোরে বৃষ্টি আসে।"

আবার দু ভাইবোন ছড়া কাটে:

"নেবুপাতা করমচা
ওরে বৃষ্টি দূর যা।"

মিনিট পনের গর্জ্জিয়া বর্ষিয়া এখন থামি-থামি ভাব। নেবুপাতা ও করমচার জয় জয়কার। নীলু হাঁকিল, "মা, চেয়ে ছাখো—বৃষ্টি ধরে গেছে।"

মা মন্দাকিনী দুয়ারের বাহিরে একবার মুখ বাড়াইয়া হাসিয়া কহিলেন, "এখনো ভালো করে থামে নি রে—তোরাও থামিস নি যেন।"

বাবলু থামে নাই। দিদিকে বাদ দিয়া সে একাই ছড়া কাটিয়া চলিয়াছে। দিদি আবার যোগ দিল ভাইয়ের সঙ্গে।

ঝিরঝির ইলশেগুঁড়ি। এক ঝলক রোদও উঁ উঠানের জল আঁকুবাঁকু হইয়া পুকুরে নামিতেছে।

এবার থামিয়াছে। গাছের পাতারা জল ঝাড়িয়া ফেলিল। নারিকেলের আগ-ডালে রোদ করে চিকচিক। খেয়ালী প্রকৃতি আবার হাসে। হাসে ভাই, হাসে বোন। রান্নাঘরে মায়ের মুখেও খুশীর হাসি।

দাদা আসিতেছেন; ছেলে আসিতেছে; আসিবে আজ নাতি। ব্রজনাথ রায়ের গোটা সংসার আজ উচাটন।

বারান্দায় বসিয়া আছে মা, মেয়ে আর ছোট ছেলে। হেঁসেলের আর সব কাজ সারিয়া মন্দাকিনী ভাতের হাঁড়িতে গলা অবধি জল দিয়া আসিয়াছেন। তিন জনের মিলিত দৃষ্টি দত্তদের আম বাগানের কোণে—অন্তরালের পথটা যেখানে মোড় ঘুরিতেই তাহাদের বাড়ী থেকে সটান চোখে পড়ে।

নীলু বলে, "এখনো যে আস্ছে না মা।—জাহাজ ছেড়ে গেছে, এক ঘণ্টা হয় নি?"

"কী জানি, এত সময় নেবার তো কথা নয়।—বৃষ্টির জন্তে বোধ হয় নৌকায় উঠতে দেরি করেছে।"

"দাদার এবার বিয়ে হবে, না মা?" বাবলু সুধাইল।

আনমনা মাতার এ-কথায় কান নাই। ভাবিতেছেন আর এক ছেলেরই কথা।

"বলো না, মা!"

"হ্যাঁ রে হ্যাঁ," মন্দাকিনী শুধু চাহিয়া আছে কখন হঠাৎ ঐ পথের বাঁকে মুটের মাথায় সেই আটাশ ইঞ্চির সুটকেসটা দেখা দিবে—আর পিছনেই সুনীল।

বসিয়া আছে মা ও মেয়ে। বাবলু উঠিয়া চৌকির তলা থেকে বিড়ালের বাচ্চাটাকে লইয়া আসিল। এই অভ্যর্থনায় সে-ও একজন সভ্য আজ। রোজ রোজ একটা বড় টিকটিকি ঢেউখেলানো টিনের পাটাতনে ঘুরিয়া বেড়ায়, সে-ও আজ কি জানি কেন ঠিক এই সময়টাতেই চৌকাঠের উপরে আসিয়া থামিয়া আছে। বাকি ছিল শুধু বাবা। সে প্রাত্যহিক প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল; বাদাড়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া, এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় ডজন খানিক স্বজাতির সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিয়া, ঘরে ফিরিবার পথে এতক্ষণ শুধু বৃষ্টির জন্তই ধোপাবাড়ীর ঢেঁকিঘরে আটকাইয়া ছিল। সে-ও এখন দাওয়ার কোল ঘেঁষিয়া উঠানের কোণে শুইয়া পড়িয়া

ঘন ঘন লেজ নাড়িতেছে। সংবর্দ্ধনার কোন ত্রুটি নাই। ব্যাপার তো আর সহজ নয়। পূজার ছুটিতে আজ বাড়ী আসিতেছে রায় পরিবারের মধ্যমণি।

"মা, ঐ ছাখো একটা কুটুমাই পাখী।" কাপড় শুকাইবার বাঁশের খুঁটিতে একটা পাখী উড়িয়া আসিয়া ডাকিতেছে—কুট্ কুটুম। কুটুমাই ডাকিলে সেদিন বাড়ীতে নাকি কুটুম আসে।

"দাদা বুঝি কুটুম, বোকারাম আমার।"

"হ্যাঁ, কুটুম। তুই জানিস্ না," দিদির কথায় ছোট ভাই প্রতিবাদ জানায়।

নীলু মাকে সাক্ষী মানিবে এমন সময় অণিমা আসিয়া হাজির। অণিমাদের বাড়ী পুকুরের ওপারের বাঁশঝাড় পার হইলেই।—গ্রাম-সম্পর্কে আত্মীয় ওরা। উঠানে পা দিয়াই অণিমা কহিল, "এখনো আসে নি, বড়মা?"

"না।—আয় মা। বোস্ এখানে।"

অণিমা নীলুকে অনুযোগ করে, "আমায় তো খুব ডেকেছিলি?"

"বা রে! নদীর পাড়ে আমরাই বুঝি গেছি! বিষ্টি ধরবার আগেই না জাহাজ চলে গেল অনুদি!"

বেলা বেশ চড়িয়াছে। তবু শ্বশুর আসেন না। মন্দাকিনী অনুমান করিলেন, ছেলে নিশ্চয় আসে নাই, তাই বৃদ্ধ শ্বশুর পয়সা বাঁচাইবার জন্য অনেক ঘুরিয়া পায়ে হাঁটিয়া আসিতেছেন। এবার বর্ষা আসিয়াছে শেষের দিকে। মাঠেঘাটে এখনো জল। জেলাবোর্ডের বাঁধানো সড়ক হইয়া আসিলেও তো এত দেরি হইবার কথা নয়! ··

ছেলে আসে নাই। এমন কি দুর্ভাবনা? আজ সন্ধ্যায় চিটাগাঙ্ মেলেও তো আসিতে পারে। না হয়, কাল। নতুবা পরশু নিশ্চয়ই। তবু আজ তো আর কাল-পরশু নয়। তাই উৎকণ্ঠিতা মাতা ছোট ছেলেকে সহসা প্রশ্ন করিলেন, "খোকন, ঠিক ক'রে বলো তো, দাদা তোমার আজ আসবে, না কাল আসবে?"

ছেলেপিলেদের মুখ হইতে হঠাৎ প্রশ্নের চটপট জবাবে নাকি খাঁটি খবর পাওয়া যায়, এমন একটা সংস্কার আছে। বাবলু একটু ইতস্তত করিয়া উত্তর দেয়, "আজ আসবে।"

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যেও একটা টিকটিকি ডাকিল—টিক্-টিক-টিক্।

"সত্য সত্য সত্য—তিন সত্য"—মন্দাকিনী ও অণিমা প্রায় একসঙ্গেই তুড়ি দিয়া এই অভাবিত সংঘটনে সায় দিল। মন্দাকিনী আবার কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময় নীলু চীৎকার করিয়া উঠিল, "ঠাকুরদা আসছে মা।"

ব্রজনাথ রায় বাড়ীর সীমানায় আসিয়া পড়িয়াছেন। একা। মন্থর গতি। বগলে ছাতা। ডান হাতে একটা বড় ইলিশ। বাজার সারিয়াই ষ্টেসনে গিয়াছিলেন। কিন্তু নাতি আসে নাই।

বাবলু দৌড়িয়া গেল ঠাকুরদার কাছে।

"দাদাকে নিয়ে এলে না কেন?"

"আসে নি আজ।"

"হ্যাঁ এসেছে, তুমি ছাখো নি।"

ছাতা আর মাছটা বারান্দায় রাখিয়া ব্রজনাথ ছোট নাতিকে এক হাতে কোলে তুলিয়া লইলেন, "দাদা তোমার কালই আসবে।—বৌমা, আমার ডান হাতে একটু জল দাও।"

শ্বশুরের আঁশ হাতে জল দিয়া মন্দাকিনী প্রশ্ন করেন, "আজ এল না কেন বাবা?"

জবাব দিল অণিমা, "অত ভাবছো কেন বড়মা? কোনো কারণে হয় তো কাল রাতে রওয়ানা হতে পারে নি।"

অণিমার আশ্বাসে মাতা যে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই তাহা বেশ বোঝা যায়। ব্রজনাথ এবার পুত্রবধূকে প্রশ্ন করিলেন, "তোমার চিঠিতে শুক্রবার রওয়ানা হবে বলেই তো লিখেছিল?"

"তাই তো লিখেছে।"

"অনুর কথাই ঠিক। কাল রওয়ানা হ'তে পারে নি।—ওদের ভুপেন এসেছে, তারিণী দাশের পরিবারও আজ সব এল।"

মন্দাকিনী ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "খোকার সঙ্গে ওদের দেখা হয় নি?"

"ভুপেন বললে, দিন দশেক আগে নাকি একদিন রাস্তায় দেখা হয়েছিল।"

শ্বশুর ও পুত্রবধূর বাক্যালাপের মাঝখানে ভাই-বোন চুপ করিয়া চাহিয়া আছে নিরাশায়। ঠাকুরদাদা যে একটা বড় ইলিশ আনিয়াছেন সেদিকে আজ কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই।

অন্য দিন হইলে এতক্ষণে বিতর্ক সুরু হইত, মাছটার ডিম হইয়াছে কি-না—হইলে, কত বড়, আজ কে ল্যাজা খাইবে, কে খাইবে কণ্ঠা। মাছটার দিকে আজ শুধু বিড়ালের বাচ্চাটাই তাকাইয়া আছে।

কুমড়া-ঝাকায় আবার একটা কুটুমাই আসিয়া ডাকিল—ইষ্টু কুটুম। অণিমা পুকুর পাড়ে কুল বাগানের দিকে একবার তাকায়। এ-বাড়ীতে আসিবার পথে খানিক আগেই না দেখিয়াছিল, কামারদের গরুটা বৃষ্টির জলে ভিজিয়া তখনো একটা খুঁটিতে বাঁধা—আর বাছুরটা মাতৃস্তন্য পান করিতেছে। অণিমার আসিবার সময় গো-প্রভৃতি ছিল ডানদিকে—নিঃসন্দেহে শুভ লক্ষণ। বাদলদা অর্থাৎ সুনীল যে আজ নিশ্চয় আসিবে সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না তার। বাদলদাকে অণিমা কতকাল দেখে নাই! —দীর্ঘ দশ বৎসর।...

উৎকণ্ঠিত মন্দাকিনী শ্বশুরকে কহিলেন, "কোনো অসুখ-বিসুখ হয় নি তো বাবা? আমার মনে যে—"

অণিমা বাধা দিয়া কহিল, "তোমার যত অলক্ষুণে কথা, বড়মা। কালই বাদলদা আসবেন, দেখে নিয়ো।"

"মা দুগ্গা ভালোয় ভালোয় খোকাকে আমার বাড়ী এনে দিন। মহাষ্টমীর দিন আমি পাঁচ সিকের চিনির ভোগ দেব।" বলিয়া মাতা হাতজোড় করিয়া দেবতার উদ্দেশে সন্তানের কুশল কামনা করিলেন।...

পুত্র সুনীল তখন কলিকাতায়।—আরপুলী লেনের মেসে। কলতলায় ঘটা করিয়া স্নান সারিয়া লইতেছে। আজ দুপুরে কুমারী নমিতা সেনের পরিবারকে, আসলে নমিতাকেই শিলং মেলে সী-অফ্ করিতে যাইবে।

দুই

পরদিন ঢাকা মেলে সুনীল বাড়ী আসিয়াছে।

ঠাকুরদাদাও পূর্ব্বদিনের মত যথাসময় ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। একদিনেই এত কাণ্ড! পিতামহের দুর্ভাবনা দূর হইল। মা-ও সুস্থির হইয়াছেন। ছোট ভাইবোনের ব্যাকুল প্রতীক্ষা মিটিয়াছে। প্রবাসী ঘরের ছেলে ঘরে আসিয়াছে।

এখন আর 'এশিয়া কেমিক্যালে'র ষাট টাকা মাহিনার কেরাণী নয়। বকুলতলার ব্রজনাথ রায়ের পরলোকগত পুত্র সুধীর রায়ের পুত্র সুনীল রায়। সে তো আর যে-সে ছেলে নয়। এম-এ পাশ। রাজধানীতে থাকে। তায় চাকুরি করে।

পূজার ভিড়ে সুনীল কাল সারারাত গাড়িতে একটি বারও চোখ বুজিতে পারে নাই। দুপুরে ঘুমাইবে বলিয়া বিছানায় শুইয়াছে। মা তাঁর ছেলের মাথায় খানিকক্ষণ হাত বুলাইয়া গৃহকাজে বাহিরে চলিয়া গেলেন। সুনীল শুইয়া আছে একা। একাই ভাল লাগে। বহুক্ষণ এক কাত হইয়া পড়িয়া আছে নিঃশব্দে। চোখে কিন্তু ঘুম নাই। মনের চোখে বার বার জাগে শিয়ালদহ মেন্ ষ্টেসন—৫নং প্লাটফর্ম।—বিদায়ক্ষণে নমিতা সেনের সেই দুষ্টু চোখের মিষ্টি হাসি!...

কুমারী নমিতা সেন! বালীগঞ্জে নীড়। বুলি শিখে বেথুনে। রেডিওতে গান গায়। মাসিকে সাপ্তাহিকে কবিতা লেখে। খবরের কাগজের সম্পাদকীয় প্রবন্ধও পড়ে। পড়িয়া মন্তব্যস্ত করে সব জান্তার মত। এক কথায় সে এই বিংশ শতাব্দীরই এক সুচতুরা সাধারণ বাঙ্গালী তরুণী।

বাহিরে ব্রজনাথ রায় ডাকিলেন, "বাদল! বৌমা, বাদল কোথায়?"

"এখন ওকে ডেকো না বাবা—কাল সারা রাত ঘুমুতে পারে নি।"

"মধুবাবু দেখা করতে এসেছেন। এই কাঁচা ঘুমে ডাকবো? থাক্, বিকেলে বাদলই না হয় ওদের পাড়ায় যাবে।" ব্রজনাথ বাহিরের ঘরে ফিরিয়া যান।

সুনীল শুনিল সবই। উঠিবার ইচ্ছা নাই।...মিষ্টি করিয়া ভাবিতেছে, ধুপছায়া রঙের শাড়ির উপর নমিতার গোথ্রো বেণীর লাল টক্‌টকে রেশমী ফিতা।...তার ডান কপালে ভ্রূর ঠিক উপরেই ছোটবেলাকার সামান্য একটু কাটার দাগ। বড় সুন্দর সেই খুঁৎটুকুও।...গাড়ি প্লাটফর্ম ছাড়িল এই মাত্র। জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া আছে নমিতা, —অবশ্য তার দাদা আর বৌদিও।...

ঢেঁকি-ঘরের ওদিকে মা কার সঙ্গে কথা বলিতেছেন। কুকুরটাকে কে যেন 'আতু-তু' করিয়া ডাকিতেছে। 'চৈ-চৈ'

বলিয়া পুকুরের হাঁসগুলিকে পাড়ের কাছে ডাকে বুঝি ও-বাড়ীর ময়না, না তার ছোটটা? কাঁসারী-পাড়ার ধাতব আর্ত্তনাদ কানে আসিয়া লাগে। এই সব ছাড়া-ছাড়া শব্দসমষ্টির সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সারাক্ষণ অদূরেই পদ্মার একঘেয়ে আস্ফালন।···সুনীল শুনিতেছে সকল কিছুই। ভাবিতেছে আর। কাল সারাদিন সারারাত, আজ এখনও—বেলা বাজে তিনটা, তবু নমিতা সেনের বিদায় বেলার ছোট্ট নমস্কারটি কিছুতেই যেন শেষ হইতে চায় না। বলে নাই তো কিছুই। সুনীলকে তার বলিবার মত কি-ই বা আছে। সুনীল তার গৃহ-শিক্ষক। সপ্তাহে চারদিন সন্ধ্যার পর ইংরেজী ও ইকনমিক্স পড়াইয়া আসে। দুই মাসের পরিচয়ে পড়াশুনার মাঝে মাঝে স্বল্প অবসরের সুযোগে সুবিধায় এমন ঘটনা ঘটে নাই যাহাতে পঁচিশ বছরের বুদ্ধিমান ছেলে সুনীলের পক্ষে এতটা বোকা হওয়াও উচিত। তবু এই দু'মাসেই, অন্তত সুনীল তা-ই মনে করে, এই কয় মাসেই দু'জনের মধ্যে এমন-কিছু-তেমন-নয় ধরণেরই দু'চারিটি তুচ্ছ ব্যাপার হইয়া গেছে যাহাতে নমিতার মনে যাহাই থাকুক, সুনীল তাকে ভালো না বাসিলেও সে যে খুব ভালো লাগে তার—এ-অনুমানে এই তরফে এতটুকু সন্দেহ নাই। হয় তো নমিতার সবখানিই সুনীলের আপনার রচনা। তাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে, যদি বা উৎসাহের অভাব নাই এক তিল। তার এত সব সম্ভব-অসম্ভবের ভুল যদি একদিন ভাঙ্গেই, ভাঙ্গুক না! সে-জন্য সুনীল অ-প্রস্তুত নয়। সে বেশ জানে, এ তার আসল বসন্ত নয়—জল বসন্ত; রোগ সারিয়া গেলে দাগও মিলাইয়া যাইবে। তবু—

ভাবিতে সে ছাড়িবে না। অথচ সে স্পষ্টই জানে—নমিতা যদি একটু-আধটু ঝুঁকিয়াও থাকে, তবু সুনীল তার প্রথমতম নয়। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবশ্য সে পায় নাই; কিন্তু অনেক কথার ফাঁকে ফাঁকে অনুমানেই টের পাইয়াছে বেশ কিছু। বাসায় ওদের অনেকেই আসে—সম্পর্কিত আর পাতান দুই রকমেরই। সকলেই 'দাদা'। 'তুমি'-ও সবা-ই। কিন্তু এদের মধ্যে কে যে সেই আসল 'তুমি' এতদিনেও সুনীল তাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই। আর বিশেষ করিয়া, নমিতা সেন সে-ঘরের-ই মেয়ে যার পক্ষে ত্রিশ টাকা বেতনের গৃহ-শিক্ষকের কাছে প্রেমের প্রথম পাঠ গ্রহণ করা সম্ভব হইলেও প্রেমে পড়া অসম্ভবই। এ সব-ই সুনীল বোঝে। তবু ঐ কালো মেয়েটিকে তার এত ভালোও লাগে! নমিতা সেন কালো। বেশ একটু কালো। তবু কুশ্রী কালো নয়। মোলায়েম ময়লা—কেমন যেন নিরীহ গোছের রঙ্। তার সান্নিধ্যে আসিলে টের পাওয়া যায় কালো পাথরের মতই এক স্পর্শ-নিরপেক্ষ সুসহ শীতলতা। এক কথায়, নমিতা সেন অ-রূপসী যদিও বা, কুরূপা সে নিঃসন্দেহে নয়। কি উল্লাস তার চলায়, কি উচ্ছ্বাস তার বলায়, কি মাধুর্য্য তার লম্বা ছিপছিপে দেহের প্রতি রেখায়!

সুনীল উঠিয়া বসে। খালি খালি আর কতক্ষণ শুইয়া থাকা যায়। বাহিরে আসিতেই মন্দাকিনী সুধাইলেন, "খোকা, উঠেছিস?"

পঁচিশ বছরের ছেলে আজও মায়ের কাছে সেই 'খোকা'-ই আছে।

"অনু এসেছিল রে—তোর সঙ্গে দেখা করতে।"

"কখন? আমি তো টের পাই নি।"

"তুই ঘুমুচ্ছিলি ব'লে ডাকি নি—কালও তুই আসবি বলে তোর তিন-আনীর ন'কাকীমা আর অনু এসে দু'বার করে ফিরে গ্যাছে। তোকে তারা কতকাল দ্যাখে নি ·"

"চিঠিতে একবার লিখলে, অনুরা সব দেশে এসেছে—ওর বাবার চাকুরি নেই। ব্যস্! তারপর আর কোন খবর দিলে না। ওদের আজকাল চলে কেমন করে?"

"অনুর বাবা পলাশপুরের কুণ্ডুদের বাড়ী থেকে ছেলে পড়িয়ে সাত টাকা পায়। আর সুলতা ওদের দক্ষিণের ভিটের ঘরে এক ইস্কুল খুলেছে—আমাদের পাড়ার মেয়েরা পড়ে। মাসে দু' সের করে চাল দেয় সবাই—ওতেই কোন রকমে চলে যায়।"

"ন'কাকা এদ্দিন চাকুরি ক'রে কি কিছুই জমাতে পারেন নি?"

"পারলে আর এ দুর্দ্দশা হ'বে কেন—শুনবি সব পরে। মেয়েটাকে দেখলে বড় দুখ্খু হয়।—তুই একবার ওদের বাড়ী যা। আমি অনুকে বলে দিয়েছি, ঘুম থেকে উঠে খোকাই দেখা করতে যাবে 'খন।"

"না মা, আজ আর কোথাও বেরুচ্ছি নে—কাল যাব।" সুনীল বাইরের ঘরে চলিয়া যাইতেছিল, মন্দাকিনী কহিলেন, "তোর ন'কাকীমা কী মনে করবে—আজ এক

মাস ধরে তুই আসবি-আসবি করছে ওরা। আজ-ই একবার যাস্ লক্ষ্মীটি।"

"আচ্ছা, সন্ধ্যেবেলা ঘুরে আসব—এখন নয়।"

"বাড়ী এসেই বরাবর তুই তক্ষুণি সারা গ্রাম ঘুরে সবার সঙ্গে দেখা করে আসিস।—এবার না গেলে সবাই মনে করবে কী বল্ তো?"

"যাব তো বললাম—কাল সকালে গেলেই তো হবে। সারারাত জেগেছি।" বলিয়া সুনীল এক পা দু পা করিয়া বাইরের ঘরে চলিয়া যায়।

পশ্চিমের ভিটার দো-চালা ঘরখানিই বৈঠকখানা। ছোট্ট বারান্দায় বেতের চেয়ারটা টানিয়া আনিয়া পদ্মার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া পড়িল সুনীল। তাদের বাড়ী থেকে নদী এখন খুব-ই কাছে। সবটা স্পষ্ট দেখা যায়। দুর্ব্বার দুর্দ্ধর্ষ পদ্মা! সামনের ঐ ছোট মাঠটুকুর পরেই ছিল যদু কামারের বাড়ী। গেল বারও সুনীল তাদের চার ভিটায় চারখানি করোগেট-টিনের চৌ-চালা ঘর দেখিয়া গিয়াছে। এবার তার কোন চিহ্ন নাই। রাক্ষসী!…

শঙ্কিত দৃষ্টি দিয়া পদ্মার অশ্রান্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখিতে দেখিতে আর শুনিতে শুনিতে মনে আসিয়া দাঁড়ায় আবার কুমারী নমিতা সেন। সেই প্রথম পরিচয়ের দিনটা। শহর ছাড়িয়া গ্রামের বুকে সে-কথা আজ একটু বিশেষ করিয়াই ভালো লাগে। মনে পড়ে, যেন সুনীল যেদিন নমিতাকে পড়াইতে গেল সেই প্রথম দিনটি। বড়লোকের বাড়ী। যথাসময়ের অনেক আগেই বাহির হইয়া পড়িল। রাস্তায় নামিবার মুখে রুম-মেট্ ভবানী হাত নাড়িয়া গাহিয়া দিল—"জয় যাত্রায় যাও গো…"

বাহিরে আষাঢ়ের টিপ টিপ বৃষ্টি। কলেজ ষ্ট্রীট থেকে বালীগঞ্জ অবধি সুনীল লংক্লথের ইস্তির ভাঁজ অতি-যত্নে বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। চশমার কাচ মুছিয়া লইয়াছে বার পাঁচেক। মনে মনে কত শঙ্কা, কত আশা। শেষকালে—…হা হতোঽস্মি! এ-ই তার ছাত্রী! কালো-ও তো দেখিতে ভালো না হয় এমন নয়। এ যে একেবারে খড়কেকাঠিনী! তায়, বেয়াড়া রকমের লম্বা। ভাঙ্গিয়া পড়িবার ভয়েই যেন চেয়ারটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

পরিচয় হইয়াছিল ওদের বাহিরের ঘরে। আসন্ন সন্ধ্যা। ঘরের মধ্যে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালানো। ওর দাদা সৌমেনের কাছ থেকে ছাত্রী আর মাষ্টার চলিল উপরে পড়ার ঘরে। সিঁড়ির আলোটা জ্বালানোই ছিল। উপরে উঠিতেছে নমিতা। পিছনে নূতন মাষ্টার। তিন ধাপ নীচু থেকে অবাধ আলোর সুযোগে সুনীল এবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইল ছাত্রীর পশ্চাতের আপাদ-শির।…না, আর যা-ই হউক্ বা না হউক্, বিধাতা চুলের দিকে কোন কার্পণ্য রাখেন নি। ডান হাতে সরু ক'গাছি চুড়ি। কানের দুলজোড়া প্রতি পাদক্ষেপে কথা কয় যেন। চমৎকার! তবু—কি বিশ্রী রোগা! অবশ্য খাশা ঐ সিঁড়ির পথে উপরে ওঠার ভঙ্গিটি। আর নিখুঁৎ ঐ আলতা-না-পরা পা দুখানির সশব্দ ছন্দটুকু। সুনীলের প্রথম পরিচয়ের হতাশ মেঘভার কতকটা হালকা হইয়া আসিয়াছে যা হোক্।…

রাত নটায় সুনীল ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিল—অবশেষে, আর কিছু না-ই বা থাকুক, চোখদুটি তার মন্দ নয়। মন্দ নয় কি! চোখ দুটি তার ভালোই বলিতে হইবে। ঐ ভাসাভাসা ডাগর দুটি চোখ। বাঙ্গালী মেয়ের সকল রূপ যে ঐখানেই।…

মেসে ঢুকিয়াই মহাবিপদ। বন্ধুর দল ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সমস্বরে একই দাবী—প্রথম দিনের ইতিহাস।

"আঃ ছাড় না। অসভ্য!—বলছি সব। আমার ঘরে চল।"

সুনীলের পিছনে চলিল লোভাতুর বন্ধুবাহিনীটি।

"বলো, কী জানতে চাও?"—সুনীল মুচকি হাসিল।

পাঁচু বলিল, "আগে কথা দাও, কোন কথা লুকোবে না—হলফ পড়ো, I shall speak the truth, only the truth and nothing but the truth."

"জানবে কেমন করে?"

জবাব দিল মন্মথ, "If looks speak mind's laws, you shall be hanged."

সুনীল হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে, "তোরা যে কী ভাবিস্! আমি কি সেখানে প্রেম করতে গেছি!—প্রাইভেট টিউটর বুঝি নভেলের নায়ক? এক ভদ্রঘরের বাঙালী মেয়ে প্রথম দিনের পরিচয়ে—"

সবাই প্রায় একসঙ্গেই চীৎকার করিয়া উঠিল, "সে-টি হচ্ছে না—ও কথায় ভুলব না।"

এবার সুনীল স্থির হইয়া বসিয়া লয়, "বেশ! তোমাদের

খুশি রাখতে করতে পারি সব কিছুই, মানে বানিয়ে বাড়িয়েও বলতে পারি অনেক কিছুই। কী জানতে চাও? প্রশ্ন করো, এক এক ক'রে।"

"অল রাইট।—আগে বলো, ছাত্রীর বয়স কতো?"

"কুড়ির ওপারে, বুড়ি হতে চ'লছে।"

"তা—যাক্, দেখতে কেমন?"

"দেখতে?" সুনীল একটু কাশিয়া লইল, "দেখতে horribly কালো, আর lamentably রোগা—প্রেমে পড়তেও করুণা জাগে।"

"ঘাবড়াও মাৎ। Beauty is lover's gift. তারপর?"

"এর পরেও আর কী থাকতে পারে?"

"তবু, আরো কিছু।"

"তবে শোন।—চোখ দুটি অবশ্য ভালো ই।"

সকলে সমস্বরে—"এরে-রে!—তারপর?"

"মুগ্ধ তাহার তরুণ তনুর সঙ্গীতে।"

"বহুৎ আচ্ছা।"

"দেখেছি তাহারে সিঁড়িতে ওঠার ভঙ্গিতে।"

"Then?"

"নাকে-মুখে-চোখে সুর-শৃঙ্গার ঝংকৃত।"

"তারপর?"

"তারপর, তোম্‌রা এক একটা ইডিয়ট্।—ভুলে যাচ্ছ, বাঙ্গলা দেশটা মার্কিন মুলুক নয়"—সুনীলের স্মৃতির সূত্র ছিঁড়িয়া দিয়া মা মন্দাকিনী ডাকিলেন, "খোকা, কিছু খাবি এখন? দুধ গরম ক'রে দিই?"

"না মা, খিদে পায় নি।"

"একটুখানি খা। ক'লকাতায় তো আর দুধের মুখ দেখতে পাস্ না," বলিতে বলিতে মা আসিয়া ছেলের কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়ান।

"চুপ ক'রে বসে ভাবছিস কী?"

"এমনি।"

"তোর শরীর ভালো লাগ্‌ছে না?"

"না-গো, এমনি বসে বসে নদীর দিকে চেয়ে আছি।—তুমি দুধ নিয়ে এসো—খুব অল্প।"

মন্দাকিনী রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। সুনীল আবার তাকায় উত্তাল পদ্মার দিকে। ভাঙন লাগিয়াছে! এপারে, কূলে কূলে ফেনিল আর্ত্তনাদ। ধূ ধূ করে ওপার। মাঝখানে রাতদিন শুধু শোঁ-ও-ও শোঁ-ও-ও···

সুনীলের কাছে কতদিন নমিতা পদ্মাপাড়ের কত কথাই শুনিয়াছে। তার বড় ইচ্ছা, একবার পূর্ব্ববঙ্গ ঘুরিয়া যাইবে। মাষ্টার মশাইর মুখে ঐ সর্ব্বনাশা নদীর কূলে কূলে অবারিত অব্যাহত শ্যামলশ্রীর কাব্যিক বিবরণ শুনিয়া শুনিয়া বাঙ্গাল দেশটাকে সে নাকি বড় ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে।···

"দুধ অল্প করেই এনেছি—"

সুনীল চমক ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া চায়। মা'র হাতে দুধের বাটি।

"খোকা, তোর কি কোন অসুখ্ করেছে?"

সুনীল হঠাৎ একটু রাগতভাবেই যেন বলিয়া ওঠে, "না গো না।—আচ্ছা বিপদ! তোমাদের জন্যে একটু চুপ ক'রে বসে ভাবাও চলবে না!" কথাটা বলিয়াই সুনীল পরক্ষণে নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হয়। বৎসরান্তে বাড়ী আসিয়া প্রথম দিনই মায়ের সঙ্গে বাক্যালাপের এই বুঝি ধরণ! চাহিয়া দেখে, মায়ের মুখের উপর দিয়া একখানি অভিমানের চকিত ছায়া মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল।

মন্দাকিনী উঠিয়া গেলেন নিঃশব্দে। দুধের বাটি হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। সুনীল চুপ করিয়া চাহিয়া আছে। মার আঘাতটা সে ভাল করিয়াই বুঝিতে পারে। সে যে মায়ের কতখানি এ-কথা সে বেশ জানে। কিন্তু···মা কেন ছাই বোঝে না—আর তো একচেটে দাবী নাই। শিশু যে আজ বড় হইয়াছে!···

অদূরে ঐ পদ্মার তীরে তীরে ভাঙ্গন লাগিয়াছে! তবু ঐ সংহার মূর্ত্তির উপর অপরাহ্নের পড়ন্ত ছায়াখানি মাতৃস্নেহের মত ছড়াইয়া পড়িতেছে অবলীলায়।

খানিক বাদে সুনীল মা'র খোঁজে উঠিয়া পড়ে। বড় ঘরে আসিয়া দেখে, মা বিছানার উপর বসিয়া বালিশে অড় পরাইতেছেন। সামনে বসিয়া ছেলে ডাকিল, "মা!"

"বল্!"

"তুমি রাগ করেছ?" সুনীল শিশুর মত মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

—"তুই যেন আজকাল কেমন হয়ে গেছিস্ খোকা,

এসে অবধি তোর মুখ ভার। তোর কী হয়েছে সে কি আমি জিগ্‌গেস করতেও পারি নে?"

"খুব পারো মা," বলিয়া সুনীল মাকে দু'হাতে জড়াইয়া ধরিল। মন্দাকিনীও ছেলের মাথাটা বুকের কাছে লইয়া আধ-শোওয়া অবস্থায় হাসিতে থাকেন মনে মনে—গর্ব্বের হাসি, তৃপ্তির হাসি। মেজাজটা ঠিক বাপেরই মত—হঠাৎ কেমন রুখিয়া ওঠে, আবার পরক্ষণেই নরম হয় চতুর্গুণ। বাপেরই তো ছেলে! চাহিয়া আছেন মন্দাকিনী নিষ্পলক চোখে। ঘাড়টা আর একটু খাটো হইলেই অবিকল তাঁরই মত। মুখের আদল তো তাঁরই পাইয়াছে, সবাই বলে।

"মা!"

"কী?"

"কথা কও।"

এই সুযোগে মা তার বড় সাধের কথাটি পাড়িলেন, "খোকা, এবার কিন্তু আমি কোন আপত্তি শুনব না।"

সুনীল একটু হাসে। কথাটা যে কি তা সে জানে।

"হাসি নয়। আমি কথা দিয়েছি।—বড় ভাল মেয়ে, তোর ন'কাকীমার চেয়েও দেখতে ফর্শা। পুজোর পরেই তুই একবার দেখে আসবি।"

অসহায় কচি শিশুর মত সুনীল মায়ের বুকে চুপ করিয়া আছে।

মন্দাকিনী হাসিয়া কহিলেন, "চুপ ক'রে থাকলে চলবে না। জবাব দিতে হবে।"

"ফর্শা মেয়ে আমি বিয়ে করব না মা। বিয়ে করি তো তোমারই মত এক কালো মেয়ে।"

"তা বই কি! তোমায় আমি কালো মেয়ে বিয়ে করাব কি-না?"

"ফর্শা হ'লেই বুঝি দেখতে ভাল?"

—"না রে, মেয়েটি দেখতে ভা-রী সুন্দর।—বয়েসও কম নয়, সতের—তোদের আজকালকার পছন্দসই।"

সুনীল মৃদু হাসিয়া রহস্য করে, "হুঁ।"

"হুঁ কি! কালো বৌ ঘরে আনছি যেন! আমি কালো ব'লে তোর ঠাকুরমা'র মনে খুঁৎখুঁৎ ছিল। ভাগ্যিস তোরা কেউ আমার রঙ পাস্‌নি। তোদের ঘরে কেউ কালো নয়। তোর ঠাকুরদা ফর্শা, তোর বাবা ছিলেন ফর্শা; তোর পিশিমাকে মনে পড়ে? দুধে-আলতা রঙ ছিল তার ..."

মা অনর্গল কথা বলিয়া চলিয়াছেন। পুত্রও কতক শুনিয়া কতক না-শুনিয়া চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া আছে।...একদিন ছিল, আজও কিছু কিছু মনে পড়ে, যেদিন মাকে ছাড়িয়া সুনীল একরাত্রি কাটাইতে পারিত না অন্যকোথাও। তারও আগেকার ইতিহাস—একেবারে শিশু-অবস্থার কথা—সে কি আর কাহারও মনে পড়ে! সেদিনের বুক-জোড়া শিশু ক্রমে ক্রমে হাঁটিতে শিখিল, কথা বলিতে শিখিল, শিখিল আপনি নাহিতে-খাইতে কাপড় পরিতে—তারপর; একা একাই খেলার মাঠ, তাসের আড্ডা, যাত্রার আসর; অবশেষে স্কুল, স্কুল হইতে কলেজ; কলেজ ছাড়িয়া চাকুরি। আজ কত কথা, কত চিন্তা; নানা মত, নানা পথ; দেশ-বিদেশের অতীত ও বর্ত্তমান; জীবনের বড় বড় সমস্যা। চঞ্চল শিশু একদিন যে গতি-প্রাচুর্য্যে অশ্রান্ত হাত-পা নাড়িয়াছে মায়ের কোলে, সেই শক্তি এখন সুসংবদ্ধ ও সুস্থির, অথচ কত জটিল, কত না গভীর—স্পষ্ট ও অস্পষ্ট অর্থ ও অনর্থের কি বিপুল বেদনা তার মনে—কি সুন্দর সংঘাত। মা-ছেলের একটানা অধিকারের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সারা দুনিয়া। এই না নিয়ম! এই তো রীতি।...ঝুপ করিয়া খানিক পাড় বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়িল।—নদীর দিক হইতে স্থিতি ও গতির চির-বিরোধের শব্দ ভাসিয়া আসে।...

"কথার জবাব দিচ্ছিস্ না যে?"

"হাঁ।"

"ওঃ! তা হ'লে আমার কথায় এতক্ষণ তোর কান ছিল না?"

সুনীল হাসিয়া উঠিল, "বিয়ে আমি করব না মা।"

"কেন?"

"শুনতে পাচ্ছ না ঐ শোঁ শোঁ শব্দ?—পদ্মা ভাঙছে।"

মন্দাকিনী হাসিয়া উঠিলেন, ছেলের কথা শোন! "পদ্মা ভাঙছে তো বিয়ের কি?"

"তুমি কি ক্ষেপেছ মা?—গেল বার কামারবাড়ীর চার ভিটেয় চারখানা ঘর দেখে গেছি; এবার তার কোন চিহ্ন নেই। তোমাদের নিয়ে যাব কোথায়? কলকাতা ছাড়া তো আর কোথাও ঠাঁই নেই। আমার এ সামান্য আয়ে আমরাই আগে খেয়ে থাকি, তারপর বিয়ের—"

"রাখ্। অত-শত ভাবলে দুনিয়ায় কেউ কোন দিন বিয়ে করত না। এ তোর একটা ছুঁতো।"

পাশাপাশি শুইয়া আছে মা আর ছেলে। মন্দাকিনী পুত্রকে এত কাছে বহুকাল পায় নাই—এমন করিয়া কোলের কাছে। খানিক আগের অপরিচিত পুত্র তার শৈশবের আত্মভোলা আবেগ লইয়া এমন করিয়া ধরা দিয়াছে! আজ তার কত কথাই না এক নিমেষে এক সঙ্গে মনে পড়িতে চায়! সুনীল তার প্রথম সন্তান।—তার বড় আদরের 'খোকা'।

মন্দাকিনী থাকিয়া থাকিয়া ছেলের গায় মাথায় হাত বুলান।

"মা, আমায় তুমি সত্যি বিয়ে দিতে চাও?"

"হুঁ"

"কেন?"

"ছেলের কথা শোন!"

"আমি মা হ'লে কিন্তু ছেলেকে আমার বিয়ে দিতুম না।"

"কেন?"

"বিয়ের পর, লোকে বলে, ছেলে নাকি পর হয়ে যায়।—পর না হোক্, অনেকখানি দূরে সরে যে যায় এ-কথা কি মিথ্যে মা?"

মন্দাকিনী উত্তর দিতে গিয়া দুয়ারের দিকে চোখ পড়িতেই থামিয়া গিয়া ডাকিলেন, "অনু এসেছিস্? আয় মা, আয়। লজ্জা পাচ্ছিস কাকে দেখে?—এক মাস ধরে যে 'বাদলদা কবে আসবে, কবে আসবে'—করে অস্থির হয়ে উঠেছিলি রে! আয় না ইদিকে।"

সুনীল উঠিয়া বসে। অনিমা কাছে আসিয়া তার পায়ের ধূলা লয়। লজ্জাটা কেবল অনিমারই নয়, হঠাৎ তাকে সম্বোধন করিতে বেশ একটু সঙ্কোচ বোধ হয় সুনীলেরও। অনিমাকে সে ছোট বেলায় দেখিয়াছে। সেই—সেবার যখন রাজাবাড়ীর মঠ কীর্ত্তিনাশার জলে ডুবিয়া গেল, সেই বৎসর অনুর বাবা সপরিবারে কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন। তারপর দশ-এগার বৎসর পরে দেখা। সেদিনের ছোট্ট অনু যে আজ দস্তরমত কুমারী অনিমা দেবী! কথা বলিতে রীতিমতই ভয় লাগে।

সুনীল মৃদু হাসিয়া কহিল, "অনু, তুই এত বড় হয়ে গেছিস?"

লজ্জাভারে অনিমার চোখের পাতা নামিয়া পড়ে। কথা বলিলেন মন্দাকিনী, "দাঁড়িয়ে আছিস কেন মা?—বোস্ না এখানে।"

সুনীল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, "ও আমায় দেখে লজ্জা পাচ্ছে মা।—আরে, সেদিনও তো তোকে ফ্রক্ পরে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি।"

অনিমা চৌকির উপর মন্দাকিনীর পাশে গিয়া বসিল এবার অনায়াসে। সুনীল জিজ্ঞাসা করিল, "ন'কাকা আর কাকীমা ভাল আছেন তো?"

অনিমা মাথা তুলিয়াই ঘাড় নাড়িল—"হুঁ"।

লজ্জা পাইবারই কথা। সুনীলকে সেই কবে দেখিয়াছে! মনে আছে, সেবার আষাঢ়ের মাঝামাঝিই অকাল বর্ষা। চারিদিকে জল করে থৈ থৈ। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে—ভাল পাশ করিয়াছেন সুনীলদা। সেই ছিপছিপে সুনীলদা আজ লম্বা-চওড়া এক বলিষ্ঠ পুরুষ। ভরাট গলায় সংহত আওয়াজ!

অনিমার মুখের দিকে ভাল করিয়া তাকাইল সুনীল। সেদিনের অনিমার কতটুকু আছে বা কতটুকু নাই একবার তাহা মিলাইয়া বুঝিতে চায়। বাহিরে গোধূলির ছায়া পড়িয়াছে। আবছা আলোয় তার সলজ্জ মুখের ভাষাভাষা মাধুর্য্যটুকু ছাড়া বিশেষ কিছুই বোঝা গেল না। একটা কথাই স্পষ্ট হয় শুধু।—অনিমার ফুটিবার পালা সাঙ্গ হইয়াছে। কানায় কানায় ভরা আজ।

"অনু, আমি খানিক বাদেই তোদের ওখানে যেতাম। ন'কাকীমাকে কতদিন দেখি নি।"

অনুযোগের সুযোগ পাইয়া অনিমার লজ্জা অনেকটা কাটিবার পথ পাইল এবার। কহিল, "হ্যাঁ। সকাল থেকে সন্ধ্যের মধ্যে আপনার সময় হ'য়ে ওঠে নি।—আমাদের বাড়িটা পাঁচ শ' মাইল দূরে কি-না!"

"খুব যে কথা শিখে গেছিস্!"

মন্দাকিনী হাসিয়া কহিলেন, "শিখবে না? ওকি আর ছোটটি রয়েছে।" তারপর অনিমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "তুই তো আমার মলিনারও ছ'মাসের বড় লো।"

বয়সের উল্লেখ উঠিতেই অনিমা আবার চোখ নামায়। কিন্তু এবার আর মুখে কথা বন্ধ হয় না। সুনীলকে লক্ষ্য করিয়া মন্দাকিনীকে কহিল, "মা-ছেলেতে আলাপ চলছিল

তো বেশ!—বড়মা, বাদলদাকে তুমি এখনো সেই খোকাই ক'রে রেখেছ।"

মন্দাকিনী হাসিয়া উঠিলেন, "ও কী বলছিল শুন্‌বি অনু? ছেলের বিয়ে দিলে নাকি সে পর হয়ে যায়। ও তাই বিয়ে করবে না।"

সুনীল বাধা দিল, "ও সব কথা রাখো এখন।—অনু, ন'কাকা বাড়ী আছেন?"

মন্দাকিনী তেমনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আবার বলে—কালো মেয়ে বিয়ে করব। আমার মা কালো, ফর্সা মেয়ে ঘরে আনব না।"

"সত্যি বাদলদা, এবার কিন্তু আপনাকে বিয়ে করতেই হবে।" অণিমার কণ্ঠস্বর এতক্ষণে অনেকখানি পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। সুনীল রসিকতা করিয়া জবাব দেয় "মেয়ে কোথায়?"

"তা বটে! দুনিয়ায় বাদ বাকি আর সবাই পুরুষ।"

"সেই ছিঁচ-কাঁদুনে অনুও দেখছি কথা বলতে শিখেছে!"

"আমি ছিঁচ-কাঁদুনে, আর আপনি ভারী ই—য়ে ছিলেন, না?—কাউকে না ব'লে উমেদপুর হাটে যাত্রা শুনতে গিয়েছিলেন, মনে আছে? পরদিন সকালে জ্যাঠা-মশাইএর মারের ভয়ে আমাদের বড়ঘরের চৌকির তলায় সারা দুপুর লুকিয়ে ছিলেন—এদিকে বাড়িতে হৈ-চৈ কান্নাকাটি। মা বাসন আনতে গিয়ে ছাখে—আমাদের বড় ঘরের চৌকির নীচে আপনি—বড় একবাটি নতুন গুড়ের পায়েস ছিল ঢাকা। আপনি চেঁচে মুছে সব—" অণিমা হাসির আবেগে কথাটা আর শেষ করিতে পারিল না।

"ছাখ অনু, মিছামিছি বানিয়ে বলিস্‌ নি।"

"আমি তো মিথ্যে কথাই বলছি—আচ্ছা, বড়মাই সাক্ষী।—হ্যাঁ বড়মা, তারপর ও-বাড়ীর ঠান্‌পিশিমা জ্যাঠা-মশাইকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাদলদাকে চুপি চুপি রান্নাঘরে তোমার কাছে রেখে যায় নি? ঠিক বলো।"

মন্দাকিনী হাসি চাপিয়া কহিলেন, "কী জানি রে। অত শত মনে থাকে না।"

"বা-রে! এই না তুমি পরশু বিকেলেই আমার কাছে গল্প করছিলে?"

তিনজনে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল একসঙ্গে। হাসি থামিলে অণিমা অভিমানের ভান করিয়া কহিল, "বড়মা, তুমি ছেলের কোল টেনে কথা কইছ!"

মন্দাকিনীর কথা ডুবাইয়া দিয়া তাদের বাড়ী-বরাবর চিটাগং মেল 'সিটি' দিল এবার। কি গম্ভীর আওয়াজ। বর্ষাকালে ষ্টীমার এখন পাড় ঘেঁষিয়াই যায়। দুপ্‌দাপ্‌ শব্দ করিয়া কলের দৈত্যটা চলিয়া গেল পাড়া মাতাইয়া। পাড়ের উপর ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের ঝাপটা এ-ঘর থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। সুনীল শঙ্কিত হইয়া ওঠে। নদী তবে এত কাছে!

মন্দাকিনী কহিলেন, "সন্ধ্যে হয়ে এল রে! খোকা, তুই এবার ন'কাকীমাদের সঙ্গে আর তোর চক্কোত্তি বাড়ীর পিশেমশাইর সঙ্গে দেখা সেরে আয় গে—বেশি রাত করিস্‌ নি যেন।"

সুনীল বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। মাতৃ আজ্ঞায় এবার সারা গ্রাম ঘুরিয়া আসতেও রাজী আছে—অবশ্য সর্ব্ব-প্রথমে ন'কাকাদের বাড়ীটা।

জামা পরিতে পরিতে অণিমাকে কহিল, "চল্‌ অনু, আগে তোদের বাড়িই যাব।"

এই অভাবিত প্রস্তাবে অণিমা পড়িল বিপদে। এই ভর সন্ধ্যাবেলায় বাদলদার সঙ্গে এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী যাওয়াটা যে আজ একেবারেই অসম্ভব এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নাই অত বড় ছেলের!

সুনীলের ব্যগ্র আহ্বানে অপ্রতিভ অণিমা মুখ ফিরাইল মন্দাকিনীর দিকে সলজ্জ ভরসায়। দু'জনের চোখে চোখে কি কথার যেন অর্থ বিনিময় হইল মুহূর্ত্ত মধ্যে। মন্দাকিনী মনে মনে হাসিলেন, তার পঁচিশ বছরের ছেলে যেন আজও সেই পাঁচ বছরেরই অবুঝ খোকা! বিব্রত অণিমার লজ্জা বাঁচাইয়া দিয়া মুচকি হাসিয়া পুত্রকে কহিলেন, "তুই যা না। অনু একটু বাদেই যাবে। ওকে দিয়ে আমার একটা কাজ আছে এখন।"

বাহিরে আসিয়া মনে মনে হাসিল সুনীল।...সত্যই তো! অণিমা কি আর সে-অনু আছে! এখন সে নিয়ম মাফিক শ্রীমতী অণিমা সরকার। সারা অঙ্গে তার প্রগাঢ় যৌবন। মুখে চোখে আজ অগাধ অর্থ!

ক্রমশঃ

নহ নারী, তুমি বহ্নিশিখা

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

নহ নারী,
তুমি বহ্নিশিখা !
দেহের দেউলে জ্বালা ঘৃতদীপ সন্ধ্যা আরতির,
নয়ন গবাক্ষ-পথে বিচ্ছুরিয়া আলোর ইসারা
পৃথিবীর অন্ধকার বুকে—
লক্ষ্যভ্রষ্ট পঙ্গপাল পঙ্গু পতঙ্গেরে
রাত্রিদিন দেহ আমন্ত্রণ ।
তোমার মসৃণ চুলে—
ক্ষণে ক্ষণে রচি স্বপ্নজাল
উর্ণনাভ উর্ণরাশি সম,
দিগন্তের পথবাহী মানুষেরে সীমাহীন কাল
কর শৃঙ্খলিত ।
পুরুষের রক্তে নাচে
তোমারই অধরপ্রান্ত হ'তে ঝ'রে-পড়া সিধু-উন্মাদনা ;
জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্নায়ুগ্রন্থি ব্যাপি
জ্বলে যেন লক্ষশত ফণা
অনির্ব্বাণ সে আগুন,
হৃৎপিণ্ডে তার
বহে উষ্ণ রক্তস্রোত ফেনিল উচ্ছ্বাসে ;
তোমারি লাগিয়া
সৃজনের বেদনায় কাঁদে অহরহ
সৃজন-প্রয়াসী মহাকাল
মৃত্যুঞ্জয় । বিজয়ী রাধেয়
তোমারই ভুলের বোঝা ব'য়ে
কেঁদে মরে ব্যর্থ হাহাকারে ;
শৈল কারাগেহে
কাঁদে বক্ষ বিরহ বিধুর,
শান্তনু বাড়ায় হাত নিষ্ফল আগ্রহে
মহাশূন্য পানে ।
রক্ষপুর স্বর্ণচূড়া হ'তে—
লেলিহান শিখা-সর্ব্বভুক্
ছড়ায় আকাশে,
তোমারই পিঙ্গল জটাজাল
সর্পিল জিহ্বায়
করে গ্রাস রত্নপুরী ট্রয় ।
মহাতপা কৌশিক কঠোর
তোমারই ইঙ্গিতে—
ডালি দেয় পদপ্রান্তে সর্ব্বজয়ী জয়ন্ত পুরুষে,
শ্রোণীভ্রষ্ট বসনের অসহ আহ্বান তব
জ্বালে তার মর্ম্মে মর্ম্মে মরণের দীপ,
যার দীপ্তি মরণেরে সম্মুখ সংগ্রামে
অনিবার করিয়াছে পাণ্ডুর নিষ্প্রভ ।
ধ্যান ভাঙি চাহে লামা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে
তোমার চঞ্চল আঁখিপানে ;
হিমাদ্রির গিরিগুহা
ঝঙ্কারিত তব স্তবগানে, পুলস্ত্য আশ্রমে ।
তব ক্রুর কটাক্ষের অগ্নিজ্বালা—
রুদ্রজয়ী ফাল্গুনীরে করে ক্লীব নির্জীব নিষ্প্রাণ,
শতক্রতু বজ্রধর
গৌরবের রত্নাসিংহাসনে বহে ক্লিন্ন সহস্র আঘাত
অঙ্গে অঙ্গে তার ।
সৌবলের বিশীর্ণ পঞ্জরে
জ্বলে শিখা যুগ যুগ ধরি,
বক্ষতলে কাঁদে অস্থি ।
জন্মান্তের প্রায়শ্চিত্ত হোমে—
মৃত্যুহীন দেবব্রত মৃত্যুজর্জ্জরিত ।
মিশরের মরুপথে নৈশ অন্ধকারে
কেঁদে মরে তাপস তরুণ,
সে করুণ অশ্রুপাতে ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া ওঠে পীরামিড্ ।
ইস্পাহান, নিস্তব্ধ দুপুরে—
ইরাণের বনপথে ফেলে দীর্ঘশ্বাস ।
তবুও সুন্দরী তুমি মানুষের জীবন-পাথেয়,
মরুছায়া ; বিলোলিত কায়ার অঞ্জলি
ঢেলে দাও মানুষের পদপ্রান্তে,
জানাও প্রণাম তারে ।
নহ নারী, তুমি বহ্নিশিখা !
তবু সে রুদ্রের মাঝে আর-এক রূপ
দেখেছি তোমার,
যবে ওই স্ফীত পয়োধর
বিগলিত স্নেহধারা উৎসারিয়া মানুষের মুখে
দাও তারে অমৃতের মৃত্যুহীন বর ।
নহ বহ্নিশিখা,
সেথা তুমি প্রাণনির্ঝরিণী ;
সেই রূপে শুধু তোমা জানাই প্রণতি ।

রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা

(আলোচনা)

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডক্টর মজুমদার মহাশয়ের গবেষণার গোচরীভূত হইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ প্রবর্ত্তিত করিয়া তিনি প্রত্যেক বাঙ্গালীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধপঞ্চকে যে সকল বিচারবিতর্কের অবতারণা হইয়াছে তাহাদের সম্যক্ আলোচনা মাসিকের ক্ষুদ্রপ্রবন্ধে অসাধ্য। এ যাবত যাহারা কুলশাস্ত্রের গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধানতঃ দুইজন মাত্র মূলগ্রন্থ সংগ্রহ ও আলোচনার পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। স্বর্গত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় নিজ অধ্যাপনাকার্য্যের অবসরকাল এ বিষয়ে ক্ষেপণ করিয়া প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ধন্য হইয়াছেন—তিনি "ভট্টাচার্য্য" বংশীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, ঘটকতা তাঁহার ব্যবসায় ছিল না। পরন্তু তাঁহার সময়ে বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ নিতান্তই বিরল ছিল। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের দোষগুণ বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে অবিদিত নাই; আদিশূর-জয়ন্তের অভেদকল্পনা দ্বারা তিনি যথেষ্ট লাঞ্ছিত হইয়াছেন—বর্ত্তমানে উহার পুনঃ পুনঃ খণ্ডন করিয়া তাঁহার প্রেতাত্মাকে জর্জ্জরিত করা অশোভন। আমরা প্রথমতঃ রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্রকার ধ্রুবানন্দ মিশ্র, এড়ুমিশ্র ও তথাকথিত সর্ব্বানন্দ মিশ্রের গ্রন্থের আলোচনা করিয়া দেখাইতেছি, মূল কুলগ্রন্থের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কিরূপ বিড়ম্বনামাত্র।

ধ্রুবানন্দ মিশ্র

বিগত ১০০ বৎসর মধ্যে যে সকল কুলগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে তন্মধ্যে একটি মাত্র মূলগ্রন্থ কতকটা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে একাধিক আদর্শ পুঁথির সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে—নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত ধ্রুবানন্দের "মহাবংশ" (১৩২৩)। ধ্রুবানন্দের বিবরণে (ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক ১৩৪৬ পৃঃ ৬৬৬) ডাঃ মজুমদার মহাশয় এই সংস্করণের যথোচিত মূল্য দিতে বিমুখতা অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞানবিরোধী বিদ্বেষভাব সূচিত করিয়াছেন বলিয়া আমাদের ধারণা। নব্যন্যায়ের 'অবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকের' নিবিড় অরণ্যে প্রবেশের পথ বাঙ্গালী যেমন আজ হারাইয়াছে, সেইরূপ মহাবংশের "আর্ত্তিক্ষেম্যলভ্যের" দুর্ভেদ্য জঙ্গল ভেদ করার শক্তিও শিক্ষিত সমাজে বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা স্পর্দ্ধা সহকারেই বলিতে পারি, এই গ্রন্থখানি আমূল বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে আলোচনা করিয়াছেন এরূপ ধৈর্য্যসম্পন্ন পুরুষ বর্ত্তমানে বাঙ্গালাদেশে নাই এবং থাকিতে পারে না। অথচ এইগ্রন্থ ঘটকদের নিকট বেদস্বরূপ ছিল। বসু মহাশয় লিখিয়াছেন "অদ্যাপি রাঢ়ীয় শ্রেষ্ঠকুলাচার্য্য মাত্রেই মহাবংশ-রূপ কুলশাস্ত্রের পূজা করিয়া থাকেন।" মুলো পঞ্চানন লিখিয়াছেন :—

> "সে ধ্রুবানন্দ, পিতৃপিতামহাদি ক্রমে।
> লেখে কুলের কথা, অনৃত নহে ভ্রমে॥" (সম্বন্ধনির্ণয়, ৩ পৃঃ, ৭২৭)

এই অভ্রান্ত গ্রন্থের প্রামাণ্য আলোচনায় উৎসুক হইয়াও ডঃ মজুমদার মহাশয় সম্ভবতঃ মূলগ্রন্থের একটি অক্ষরও না পড়িয়া মুখবন্ধে গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র একনজর দেখিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন এবং অত্যন্ত যুক্তিহীন বংশপর্য্যায়ের একটা গড়পড়তা ধরিয়া এক কথায় সমগ্র গ্রন্থের প্রামাণ্য উড়াইয়া দিয়া তাঁহার প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে ধ্রুবানন্দের নিজ বংশাবলীই অবিশ্বাস্য! (পৃঃ ৬৬৬, ৮৪২-৪৪, ১৮০ এবং ৩৭২)। গড়পড়তা ধরিয়া সময় হিসাব করার যে বস্তুতঃ কোনই মূল্য নাই তাহার শত শত উদাহরণ বিদ্যমান। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের পূর্ব্বপুরুষ নরসিংহ বাচস্পতি অনুমান ১৬১০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন—তাঁহার স্বহস্তলিখিত গ্রন্থের তারিখ ১৬২৭ ও ১৬৪৬ খৃঃ এবং তাঁহার এক পুত্রের জন্ম তারিখ ১৬৫৪ খৃঃ। ১৯৪০ সনে তাঁহার জন্মের ৩৩০ বৎসর পরে তাঁহার অধস্তন ৭ম পুরুষ একজন, বহু ৮ম ও ৯ম পুরুষ এবং কতিপয় ১০ম পুরুষ জীবিত। মহেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মণসেনের ২য় সমীকরণে উল্লিখিত হইয়াছেন (মহাবংশ, পৃ ২)। তাঁহার জন্মতারিখ অনুমান ১১৫০ খৃঃ ধরিলে তাঁহার ৮ম পুরুষ অধস্তন (মজুমদার মহাশয় ভ্রমবশতঃ ৭ম পুরুষ লিখিয়াছেন, পৃ ৬৬৬) ধ্রুবানন্দের ১৪৮০ খৃঃ কিম্বা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে জীবিত থাকা ঘুণাক্ষরেও বিজ্ঞানবিরোধী নহে। নবদ্বীপ-গৌরব গদাধর ভট্টাচার্য্যের জন্মতারিখ তাঁহার জনৈক বংশধরের নির্দ্দেশানুসারে ঠিক ১০০৬ সন অর্থাৎ ১৫৯৯ খৃঃ—ইহা প্রমাণ সিদ্ধ না হইলেও গদাধরের জন্মতারিখ বেশী পরে হইবে না; কারণ ১৬৫০ হইতে তাঁহার পূর্ণ অভ্যুদয় যুগ। নবদ্বীপাধিপতি রাজা রাঘব ১০৬৮ সনে (১৬৬১ খৃঃ) তাঁহাকে ভূমি দান করিয়াছিলেন (নবদ্বীপ মহিমা, ২য় সং, পৃ ১৭৮)। বর্ত্তমান সনে তাঁহার অধস্তন ৭ম, ৮ম ও ৯ম পুরুষ জীবিত। নবদ্বীপের অপর একজন অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দ ন্যায়বাগীশও ১০৬৭ সনে রাজা রাঘবের নিকট ভূমিদান পাইয়াছিলেন (ঐ, পৃ ১৭৯)—তাঁহারও অধস্তন একাধিক ৭ম পুরুষ এখন জীবিত আছেন। এরূপ শত শত উদাহরণ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিদ্যমান। বস্তুতঃ গ্রন্থখানা একবার আলোচনা করিয়া লিখিলে ডঃ মজুমদার মহাশয় এইরূপ প্রমাদোক্তি করিতেন না। ধ্রুবানন্দের কুলকার্য্যাদি প্রসঙ্গক্রমে ৭০ সমীকরণে লিখিত হইয়াছে (পৃঃ ৮৮); ৮৪ সমীকরণে (১১০ পৃঃ)

ধ্রুবানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র গঙ্গাধর এবং ১০৭ সমীকরণে (১৩৩ পৃঃ) গঙ্গাধর-পুত্র ভগীরথ উল্লিখিত হইয়াছেন এবং ভগীরথের কারিকায় তাহার বহু পুত্রের নামও প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং ধ্রুবানন্দের পৌত্র ও প্রপৌত্র পর্য্যায়ের অর্থাৎ মহেশ্বর হইতে ১০।১১ পুরুষের নাম পর্য্যন্ত এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য হওয়ারও কোন কারণ নাই। ধ্রুবানন্দের পিতা বিষ্ণুমিশ্রের ৮ পুত্র ছিল, ধ্রুবানন্দ সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন এবং শিষ্টোচিত বিনয় সহকারেই তিনি নিজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন :—

"সর্ব্বেষাঙ্ক কৃপাস্থলং তদনুজো মিশ্রধ্রুবানন্দকঃ।" (পৃ. ৬২)

এই বিনয়োক্তি গ্রন্থের প্রামাণ্য পরিপোষক সন্দেহ নাই।* ডঃ মজুমদার মহাশয়ের লেখার একটা স্বতঃসিদ্ধ প্রামাণিকতা আছে, তাঁহার প্রমাদোক্তির ফলে কৃত্রিম-অকৃত্রিমনির্ব্বিশেষে সমস্ত কুলশাস্ত্রের উপর শিক্ষিত সমাজের অশ্রদ্ধা হওয়া সম্ভব ; সুতরাং ইহার প্রতিবাদকল্পে আমরা কথঞ্চিৎ তীব্রতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম। ইহাতে শ্রদ্ধাস্পদ মজুমদার মহাশয়ের ভারতব্যাপী প্রতিষ্ঠার কোন হানি হইবে না।

আমরা এ যাবৎ যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি তদ্দ্বারা অবধারিত হয় যে ধ্রুবানন্দ প্রথমতঃ বিভিন্ন বংশ ধরিয়া গ্রন্থরচনা করেন এবং সেই গ্রন্থের শ্লোকদ্বারাই তাঁহার দ্বিতীয় সমীকরণ গ্রন্থ রচিত হয়। শেষোক্ত গ্রন্থ বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচারলাভ করিয়াছিল এবং আমরা যদৃচ্ছাক্রমে নানাস্থানে ইহার হস্তলিখিত বহু প্রতিলিপি দেখিয়াছি। লণ্ডনে ইহার এক প্রতিলিপি আছে (I. O. p., 1510) ; রাজেন্দ্রলাল মিত্র ২টী পুঁথির বিবরণ দিয়াছেন (L. 400-402)। কাশীর সরস্বতীভবন পুঁথিশালায় গ্রন্থের ৪খানা প্রতিলিপি রক্ষিত আছে—দুইখানি সম্পূর্ণ, তন্মধ্যে একখানির লিপিকাল "শাকে রামযুগাব্ধিচন্দ্রগণিতে" অর্থাৎ ১৭৪৩ শক (তত্রত্য তালিকায় ভ্রমক্রমে ১৪৪৩ শক লিখিত হইয়াছে)। রাজসাহী বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে ৩খানি পুঁথি আছে, ২খানি সম্পূর্ণ এবং ১টী খণ্ডিত—১৭১০ শকের প্রতিলিপি তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগারেও ২টী খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে। এই ৯ খানার প্রত্যেকটী বিভিন্ন আদর্শ হইতে অনুলিখিত এবং তত্ত্বাংশে মোটামুটি মুদ্রিত সংস্করণ হইতে পার্থক্যবর্জ্জিত। ধ্রুবানন্দ 'মিশ্র' উপাধিধারী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার শ্লোকাবলীতে ছন্দঃপতন কিম্বা ব্যাকরণদোষ একেবারেই ছিল না। কিন্তু উক্ত প্রতিলিপিগুলিতে এবং মুদ্রিত সংস্করণে অর্দ্ধশিক্ষিত ঘটকের হস্তে শ্লোকগুলি বিপর্য্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। পুঁথি মিলাইয়া বিশুদ্ধপাঠ উদ্ধার করা অসাধ্য নহে। এই গ্রন্থ যে প্রণালীতে লিখিত তাহাতে বংশপর্য্যায়ের ভ্রমপ্রমাদের অবকাশ নাই বলিলেই চলে। প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয়ে পৃথক্ শ্লোক, শ্লোকমধ্যে নানাবিধ কুলক্রিয়ার বিবৃতি সহিত পুত্রসংখ্যা ও পুত্রের নাম এবং শ্লোকের শিরোদেশে কুলের ও পিতার নামোল্লেখসহ তত্তৎব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইয়াছে। শিরোভাগ সম্পাদকের যোজনা নহে, গ্রন্থেরই অন্তর্ভূত।

কোন কোন সুপঠিত পুঁথিতে পার্শ্বটীকায় বহু ব্যক্তির পরিচয় ও কুল-বিশ্লেষণ যোজিত দেখা যায়। এই গ্রন্থের রচনাকাল ৮বসুধৃত বচনানুসারে ১৪০৭ শক অর্থাৎ ১৪৮৫ খৃঃ। আমাদের অনুমান, ইহা কিছুকাল পরে-অনুমান ১৫০০ খৃঃ—রচিত হইয়াছিল। ৬১ সমীকরণে পূতি শোভাকর বিরাজমান ছিলেন এবং তাহার ব্যক্তিগত কারিকায় তাহার মৃত্যুকাল নির্দ্দিষ্ট আছে (১৩) ৭৭ শক ("সপ্তসপ্তগতে শাকে", সপ্তসপ্ততিকে, সপ্তসপ্ততিগতে, সপ্তসপ্ততীতে প্রভৃতি পাঠ আছে এবং শ্লোকটী সমস্ত পুঁথিতেই পাওয়া যায়)। তাহার পুত্র পরমেশ্বর ৭৮ সমীকরণে গৃহীত অর্থাৎ এক পুরুষকাল মধ্যে (২৫ বৎসরে) ১৬ সমীকরণ হইয়াছিল। মাঝামাঝি ৬৯ সমীকরণ কালে ১৪৫৫ খৃঃ শোভাকরের মৃত্যু ধরা যায়। পরবর্ত্তী সমীকরণগুলি প্রতি বৎসর হইয়াছিল ধরিলে শেষ ১১৮ সমীকরণের কাল হয় ১৫০০ খৃঃ। দ্বিতীয়তঃ চৈতন্যসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ লোকনাথ গোস্বামী কুলীন ছিলেন—তাঁহার পিতা পরমানন্দ ১১৪ সমীকরণে স্থান লাভ করেন (১৩৯ পৃঃ)। ধ্রুবানন্দের কারিকায় পরমানন্দের তিন পুত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে—

"লোকনাথো রঘুশ্চৈব ভবনাথোঽপি তৎসুতঃ।"

লোকনাথের জন্মতারিখ অনুমান ১৪৮৩ খৃঃ (সপ্ত গোস্বামী, পৃ ১৭) সম্ভবতঃ ধ্রুবানন্দের গ্রন্থরচনাকালে ৪র্থ পুত্র প্রগল্‌ভের জন্ম হয় নাই কিম্বা নিতান্ত শিশু ছিলেন। এতৎপ্রমাণে ও পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে গ্রন্থ রচনাকাল নির্দ্দিষ্ট হয়। এইরূপ বিশ্লেষণ দ্বারা প্রত্যেক সমীকরণের কালনির্ণয় সাধন করা যায়—১০।১২ বৎসরের বেশী ভুল হইবে না—এবং এই দিক্ দিয়া গ্রন্থখানি একটী অপূর্ব্ব কালনির্ণায়ক প্রমাণগ্রন্থরূপে বহু বিতর্কের মীমাংসা সূচিত করিতে পারে। আমরা একটী সর্ব্বজনবিদিত উদাহরণ দিতেছি। কবি কৃত্তিবাসের পিতা বনমালী ৫৩ সমীকরণে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন (পৃ ৬৫)—এই সমীকরণের কাল পূর্ব্বোল্লিখিত গণনানুসারে অনুমান ১৪৩০ খৃঃ। ধ্রুবানন্দের কারিকানুসারে কৃত্তিবাস জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন—কারিকাংশ বিশুদ্ধভাবে পাঠ মিলাইয়া উদ্ধৃত হইল :

তৎসুতা জজ্ঞিরে শুভাঃ।
কৃত্তিবাসঃ কবির্ধীমান্ শান্তঃ শান্তির্জনপ্রিয়ঃ।
মাধবঃ সাধুরেবাসীৎ মৃত্যুঞ্জয়ো জয়াশয়ঃ।
বলো শ্রীকণ্ঠকঃ শ্রীমান্ চতুর্ভুজ ইমে সুতাঃ॥

সমীকরণকালে জ্যেষ্ঠপুত্র কৃত্তিবাসের বয়স ৩০।৪০ হইবে ; সুতরাং তাঁহার পৃষ্ঠপোষক গৌড়াধিপতি তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ হইতে পারে না। কংসনারায়ণের পক্ষপাতিগণ অতঃপর ধ্রুবানন্দের প্রামাণ্য-ধ্বংসে বদ্ধপরিকর হইবেন, বলা বাহুল্য। ধ্রুবানন্দের পিতা বিষ্ণুমিশ্র অল্প পূর্ব্বে অনুমান ১৪২৫ খৃঃ ৫০ সমীকরণে উল্লিখিত হইয়াছেন (পৃ ৬১-৬২) ; সুতরাং সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ধ্রুবানন্দের জন্মতারিখ অনুমান ১৪২৫ খৃঃ ধরিলে গ্রন্থ রচনাকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৭৫ হয় এবং তৎকর্ত্তৃক ভ্রাতৃপ্রপৌত্রের নামোল্লেখও সম্ভবপর হয়। এইরূপ অভ্রান্ত

ভাবে ১১৭৫—১৫০০ খৃঃ মধ্যবর্ত্তী ৩২৫ বৎসরের বাঙ্গালার ইতিহাসের অন্ধকার যুগের প্রধান প্রধান কুলীন বংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া ধ্রুবানন্দ প্রকৃষ্ট আলোকপাত করিয়া গিয়াছেন।

আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, ধ্রুবানন্দ প্রথমতঃ বিভিন্ন বংশধারা ক্রমেই "মহাবংশাবলী" প্রণয়ন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় গ্রন্থ পৃথক্ এবং রাজসাহীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুঁথিখানিতে তাহার নাম পাওয়া যায় "ইতি সমীকরণসারঃ সমাপ্ত"। ধ্রুবানন্দের প্রথম মৌলিক গ্রন্থখানি অধুনা দুষ্প্রাপ্য। আমরা তাহার কতিপয় বিক্ষিপ্ত এবং অতি জীর্ণ পত্র নবদ্বীপ পাব্লিক লাইব্রেরীর পুঁথিমধ্যে আবিষ্কার করিয়াছি। সৌভাগ্যবশতঃ ধ্রুবানন্দের নিজ বংশাবলীর প্রকরণটী তাহাতে পাওয়া গিয়াছে: তাহাতে ধারাবাহিক তাঁহার ভ্রাতুষ্পৌত্র ভগীরথ পর্য্যন্ত শ্লোকগুলি রহিয়াছে, সামান্য পাঠভেদ ভিন্ন মুদ্রিত 'সমীকরণ' গ্রন্থের সহিত তাহাদের পার্থক্য নাই। কেবল ভগীরথের ভ্রাতা রত্নগর্ভের নামীয় কারিকা অতিরিক্ত পাওয়া যাইতেছে—ইহা মুদ্রিত সংস্করণে নাই বটে কিন্তু রাজসাহীর একখানা পুঁথিতে সমীকরণকারিকায় রত্নগর্ভের নাম যোজিত পাওয়া যায় (পৃ ১৩৩, "পঙ্‌ক্তৌ সমতাং যযুঃ" স্থলে "রত্নগর্ভ ইমে সমাঃ" পাঠ আছে) এবং রত্নগর্ভ সংক্রান্ত শ্লোকও পাওয়া যায়। রত্নগর্ভের শ্লোকটীর পর ধ্রুবানন্দের মৌলিক গ্রন্থে প্রকরণ সমাপ্তিসূচক নির্দ্দেশ আছে—"ইতি গঙ্গাধরপ্রকরণং"। লক্ষ্য করিবার বিষয়, ধ্রুবানন্দের উভয় গ্রন্থই অন্যান্য কুলশাস্ত্রসুলভ পরবর্ত্তি-যোজনা কিম্বা প্রক্ষিপ্তাংশ হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত। ইহার প্রধান কারণ, কুলীন ও ঘটকসম্প্রদায়ের এই গ্রন্থকারের প্রতি অনন্যসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি—যাহা ডঃ মজুমদার মহাশয় এক কথায় উড়াইয়া দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

ধ্রুবানন্দের প্রথম গ্রন্থে কুলীনদের বংশাবলী আদিশূরের সময় হইতে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ ছিল। নবদ্বীপের বিক্ষিপ্ত পত্রমধ্যে আমরা মুখটি, চট্ট এবং পূতিবংশের নামমালা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি। নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল :

"ওঁ নমঃ কুলদেবতায়ৈ ॥"
দিণ্ডেঃ শ্রীহর্ষকো জাতঃ শ্রীগর্ভশ্চাস্তবস্ততঃ।
শ্রীনিবাসস্ততো জাত আসীন্মেধাতিথিস্ততঃ ॥
আবরঃ পাবরশ্চৈব সবরস্তৎসুতা ইমে ॥
আবরস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ শতোলথোত্রিবিক্রমাঃ।
কাকঃ কুলপতিশ্চৈব তৃতীয়শ্রীলকৌতুকঃ।
ত্রিবিক্রমসুতা এতে স্বীয়বংশাব্জভাস্করাঃ।
কাকস্য তনয়া জাতা ধাধুকশ্চ বরাহকঃ।
শ্রীমৎসুরেশ্বরো ধীরশ্চ এতে ক্রমোদিতাঃ।
ধাধুনামা মুখে খ্যাতো রাজগ্রামী বরাহকঃ।
সতোপি দিণ্ডিবংশে চ সাহড্যালঃ সুরেশ্বরঃ।
ধাধুকস্য সুতো জাতো জলাশয় ইতি শ্রুতঃ।
বাণেশ্বরস্ততো জাতঃ প্রাণেশ্বরস্ততো মতঃ।

তস্যৈতৌ তনয়ৌ জাতৌ শ্রীজিয়াশুক্রিকাবুভৌ।
আচার্য্যমাধবো জ্যেষ্ঠো নহুড়ো(যাপ)তী তথা।
বরাহাখ্যঃ কীর্ত্তিবাসো শুক্রিকস্য সুতা ইমে।
আচার্য্যমাধবাৎ পঞ্চ জাতাঃ পুত্রা মহৌজসঃ।
কোলাহলশ্চ সন্ন্যাসী গরুড়োৎসাহকৌ ততঃ।
দাক্ষিশ্চৈব বিঠোনামা সর্ব্ব এতে ক্রমোদিতাঃ।
উৎসাহস্য সমঃ পূতি রুৎসাহো ভুবি বিশ্রুতঃ।
ষোড়শৈব সুতাস্তস্য আয়িতোপি গদাধরঃ।
মহাদেবো জয়শ্চৈব (কাম)দেবো বামদেবকঃ।
গোবর্দ্ধনশ্চক্রপাণি র্ভবদেবশ্চ বামনঃ।
লক্ষ্মীধরশ্চ গোবিন্দো হরিশ্চ পদ্মনাভকঃ।
গঙ্গাধরস্ততো জাতো রত্নাকরস্ততো মতঃ।
উৎসাহস্য সুতা এতে বিখ্যাতাঃ কুলপণ্ডিতৈঃ।
আয়িতোকস্য পরীবর্ত্ত আর্ত্ত্যা দেবলকে পুরা।
ইত্যাদি (মহাবংশ, পৃ ১)

মুখবংশের প্রারম্ভ হইতে প্রথম ৩ পত্র এবং শেষ দুই পত্র পাওয়া গিয়াছে। ৩য় পত্রে কবি কৃত্তিবাসভ্রাতা মৃত্যুঞ্জয়ের শ্লোকের পর (মহাবংশ, পৃ ৯১) "ইতি নৃসিংহপ্রকরণং" লিখিত আছে। আর একটি পত্রে "ইতি লৌলিকপ্রকরণং" এবং শেষ পত্রে "ইতি মহাদেবপ্রকরণং। ইতি মুখয়টীকুলং ॥ অথ পূতিকুলং লিখ্যতে।" এক সঙ্গে লিখিত। মুখবংশের শ্লোকগুলি সমস্তই মুদ্রিত গ্রন্থে পাওয়া যায়, যদিও পাঠভেদের অভাব নাই।

অথ চট্টকুলং লিখ্যতে ॥

আসীৎ শ্রীবীতরাগঃ সুরপতিনগরীনাগরীগীতকীর্ত্তি।
জাতঃ শ্রীকাশ্যপোসৌ নিজকুলতিলকো ধর্ম্মকর্ম্মপ্রতীকঃ।
তস্মাদ্রত্নাকরাখ্যো যত ইহ ভুবনে জাতবান্ শুদ্ধবুদ্ধিঃ
তস্যৈতৌ হামকামৌ নয়বিনয়যুতৌ দক্ষসংজ্ঞঃ কণাদঃ ॥
দক্ষঃ সুপক্ষপ্রতিপালনে চ
বিপক্ষপক্ষক্ষয়ণে রণে চ।
দীক্ষাক্ষমাদানদয়াতিদক্ষো
দক্ষাখ্যয়া (খ্যাতি) মতো গতোহয়ম্ ॥
দক্ষস্য বহবঃ পুত্রাঃ মহাবল পরাক্রমাঃ।
ধীরো নীরঃ শুভঃ শাণ্ডুঃ কৌতুকশ্চ সুলোচনঃ।
কাকঃ কাহু স্তথা ভানুরোঙ্কারো রাম এব চ।
সৌরিধর্ম্মস্ততঃ কর্ম্ম শিবো বিষ্ণুশ্চ ষোড়শ ॥
ধীরশ্চ শুড়বিখ্যাতো নীরোপ্যঙ্গুলিরেবচ।
ভূরীগ্রামী শুভোনামা শাণ্ডুকস্তৈলবাটিকঃ।
কৌতুকঃ পীতমণ্ডী চ চট্টখ্যাতঃ সুলোচনঃ।
খ্যাতঃ কাকো হড়গ্রামী কাল্লারির্দ্দিন্ধবাটিকঃ।
পলশা ক্রিরস্তুৎ ভানু ওঙ্কারঃ শিম্বলায়িকঃ।

রামঃ পালধীবিখ্যাতঃ শৌরিঃ পৌবলিয়েব চ।
* লবাটী চ ধর্ম্মশ্চ কর্ম্মঃ পাকড়িবালকঃ।
শিবনামা কোঁয়াড়ী চ বিষ্ণুঃ ভট্ট উদারধীঃ।
শাসনেন নিডেনাপি (?) রামো রাজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতঃ।

চট্টস্য বীজী শুলোচনঃ তৎসুতঃ বাসুদেবস্তৎসুতাঃ নাইদেবরূপদেব-মহাদেবকাঃ। নাইসুতা হারোহধনালোবরাহকাঃ। বরাহসুতাঃ—

সুধায়িশ্চ পিতায়িশ্চ মহাবুদ্ধির্বিনায়কঃ।
শ্রীধরঃ শ্রীকরশ্চৈব নন্দুড়শ্চ মহাযশাঃ।
বহুরূপঃ পশোনামা সোমো শ্রীকরসুনবঃ।
বহুরূপোচিতা এতে চাষ্টৌ বিখ্যাত পৌরুষাঃ।

ইত্যাদি (মহাবংশ, পৃ ১)

চট্টবংশের ১০ পত্রে যথাক্রমে কৃষ্ণপ্রকরণ, পাটুলিয়াকুলং, খনিয়াকুলং, নান্দোকুলং কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪।৫ শ্লোক ব্যতীত সমস্তই মুদ্রিত সমীকরণ গ্রন্থে অন্তর্নিহিত আছে। ধ্রুবানন্দের উভয় গ্রন্থই আদ্যন্ত শ্লোকরচিত, কোথাও গদ্যরচনা নাই। সুতরাং অনুমান হয়, সুলোচন হইতে বরাহ পর্য্যন্ত শ্লোকগুলি বিলুপ্ত হওয়ায় লিপিকার আধুনিক গ্রন্থ হইতে গদ্যাংশ যোজনা করিয়া দিয়াছেন।

অথ পুতিকুলং লিখ্যতে।

প্রজাপতেরভূৎ বৎসো * * * মহৌজসা।
বাৎসে সুধানিধির্জাতশ্ছান্দড়স্তৎসুতোঽভবৎ।
রবিঃ কবিশ্চ সুরভির্ধীরো নীরো মহাজসাঃ।
বিশ্বম্বরঃ শ্রীধরশ্চ শ্রীকরঃ শ্রীনিবাসকঃ।
ছান্দড়স্য সুতাঃ জাতাঃ মহাকুলসমুদ্ভবাঃ॥
রবির্ম্মহিন্ত্যা কবিরে(ব) শিম্বলাল্,
শ্রীঘোষবংশে সুরভিঃ প্রতিষ্ঠঃ।
ধীরোঽভবৎ সম্প্রতি পুতিতুণ্ডো
নীরস্তথাভূদথ পিপ্পলীয়ঃ॥
মহাযসা বাপুলি বংশবীজং
সশ্রীধরোঽভূদথ কাঞ্জিবিল্বী।
(বিশ্বম্ভরঃ স্বীয়কুলেন্দুরাসীৎ
যৎপূর্ব্বগ্রামীতি জনৈরিহোক্তঃ॥)
ততো বিশ্বম্ভরঃ পূর্ব্বশ্চতুর্থশ্রীকরোপি চ।
কগ্গাড়ী শ্রীনিবাসশ্চ বাৎস্যে চ দশধাকুলং॥
ততঃ পুতিকুলাম্ভোজভানুরেষ মহামতিঃ।
ধীরো ধীরতরো ধীমানতীব জনবল্লভঃ॥
জৈমিনিস্তৎসুতোজাতস্তৎসুতো (ভু) স্তমোপহঃ।
তস্মাল্লক্ষ্মীধরো জজ্ঞে বনমালী চ তৎসুতঃ॥
বনমালিসুতঃ খ্যাতঃ মৎসলো বৎসলঃ কুলে।
যস্তেযং প্রতি গাথাস্তি।

"কাশিকাসরসীহংসং কারিকাদারিকাপতিং।
নাটকাস্তটবীসিংহং মাস্তং জানামি মৎসলং॥"
তস্য পুত্রাবিমৌ জাতৌ পুণ্ডোকসুভকাবুভৌ।
পুণ্ডোকস্য সুতাঃ সর্ব্বে শ্রোত্রিয়ত্বং প্রপেদিরে।
বল্লভস্য (?) সুতা এতে মহাত্মানো মহৌজসঃ।
অশোক-হিঙ্গুলশ্চাপি মহাতীর্থ ইতি স্মৃতঃ।
উৎসাহো মেদনীভানুঃ শোভনাস্তাস্তথাপরে।
উৎসাহস্তোচিতো মুখ উৎসাহ ইতি বিশ্রুতঃ।
পুত্রো গোবর্দ্ধনাচার্য্যস্তস্য জাতঃ কুলোত্তমঃ।
গোবর্দ্ধনস্যাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বভৃঙ্গকরে চ বন্দ্যতে।

ইত্যাদি (মহাবংশ, পৃ ১)

এই অংশে উদ্ধৃত প্রাচীন গাথাটী অতি মূল্যবান্ একটী ঐতিহাসিক তথ্য।

মুদ্রিত সমীকরণ গ্রন্থে এবং তাহার সমস্ত হস্তলিখিত প্রতিলিপিতে (মায় লণ্ডনের পুঁথিতেও) ২য় সমীকরণের পূর্ব্বে এই পঙ্‌ক্তি পাওয়া যায়:—

"ইদানীং লক্ষ্মণসেনস্য সভাশ্রিতা কুলীনা নিগদ্যন্তে।"

সুতরাং অনুমান হয়, ১ম সমীকরণ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের পূর্ব্বে খৃঃ ১২শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে সম্পাদিত হইয়াছিল। ১ম সমীকরণের অন্তর্ভুক্ত আয়িত, বহুরূপ ও গোবর্দ্ধন যথাক্রমে আদিশূরানীত মেধাতিথি, বীতরাগ ও সুধানিধি হইতে অধস্তন ১২শ, ৯ম ও ১১শ পুরুষ প্রতিপন্ন হইতেছে। ১১।১২ পুরুষে ৩০০।৪০০ বৎসরের কম কিছুতেই হইবে না। সুতরাং কোন মূলগ্রন্থের পুঁথি না দেখিয়া তথাকথিত কুলশাস্ত্রের দোহাই দিয়া আদিশূরকে খৃঃ ১১শ শতাব্দীতে স্থাপনপূর্ব্বক ডঃ মজুমদার মহাশয় যে সকল একপক্ষপাতী যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা সর্ব্বৈব প্রমাদগ্রস্ত (ফাল্গুন, পৃ ৬৬৭—৮)। আমরা কিছুতেই বুঝিতেছি না, কোন্ বিজ্ঞানবলে তিনি ১২৫—১৫০ বৎসর মধ্যে অন্ততঃ ৯ পুরুষের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ধ্রুবানন্দের উদ্ধৃত শ্লোকানুসারে আদিশূরানীত ব্যক্তিগণের ৫ম, ৪র্থ ও ৩য় পুরুষে "গাঞি-সৃষ্টি" হইয়াছিল।

সর্ব্বানন্দের কুলতত্ত্বার্ণব

প্রামাণিক কুলশাস্ত্র দ্বারাই তথাকথিত কুলশাস্ত্রের কৃত্রিমতা নির্ণয় করা যায়। কুলতত্ত্বার্ণব গ্রন্থখানি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই গ্রন্থ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কতিপয় প্রতারক দ্বারা রচিত হইয়া এক কৃত্রিম "সর্ব্বানন্দ মিশ্র" নামে প্রচারিত হইয়াছে—বাহ্য এবং অন্তর্লীন উভয়বিধ প্রমাণ দ্বারাই এইরূপ নির্ণয় হয়। অথচ "রাঢ়ীয়কুলতত্ত্ব" প্রভৃতি গ্রন্থে এবং ডঃ মজুমদার মহাশয়ের সংশয় সত্ত্বেও তাঁহার প্রবন্ধে এই জাল গ্রন্থের বহুতর বচন ও মতবাদ উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়া প্রতারকের উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ চরিতার্থ হইয়াছে। আমরা কথঞ্চিৎ বিবৃতভাবে ইহার কৃত্রিমতা নির্ণয় করিতেছি:—(১) এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে

রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্রকার সর্ব্বানন্দ মিশ্রের নাম ঘুণাক্ষরেও কেহ অবগত ছিল না। (২) ৭০ সমীকরণে (পৃঃ ৮৮) ধ্রুবানন্দ মিশ্রের কুলক্রিয়া বিবৃত হইয়াছে। মুদ্রিত গ্রন্থে, আমাদের আলোচিত সমস্ত পুঁথিতে এবং ধ্রুবানন্দের প্রামাণিক গ্রন্থের বিক্ষিপ্ত পত্রে ধ্রুবানন্দ-সম্পর্কিত শ্লোকে তাঁহার কোন পুত্রের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন এবং মহেশের কুলপঞ্জী প্রভৃতিতে তাঁহার কোন বংশধরের উল্লেখ নাই। যদি কেহ কোন প্রামাণিক পুঁথিতে ধ্রুবানন্দের কোন পুত্রের নাম আবিষ্কার করিতে পারেন তাহা হইলে আমরা আমাদের মতবাদ পরিত্যাগ করিব। (৩) গ্রন্থখানির প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় অপরিপক্ক রচনা এবং আধুনিক ভাব ও ভাষা বিরাজমান। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি :—

পৃ ১, "মিশ্রবংশসমুদ্ভূঃ" ও "ইতিহাসক্রমেণৈব"। ধ্রুবানন্দের গ্রন্থে "মিশ্র" উপাধিধারী বহুতর ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়, একটিও 'মিশ্রবংশে'র উল্লেখ নাই। 'মিশ্র' পাণ্ডিত্যের উপাধি এবং তদ্দ্বারা কুলগ্রন্থে কুলপরিচয় সূচনা করিতে পারে না। "ইতিহাস" শব্দটি আধুনিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

পৃঃ ১, ৫ম শ্লোকটী অবিকল ৺বসুধৃত বাচস্পতি মিশ্র হইতে গৃহীত (বসু, ১, পৃঃ ৮৬) এবং ষষ্ঠ শ্লোকও তাহাই ; কেবল একটি ছন্দঃপতন সংশোধিত হইয়াছে এবং শেষপাদ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

পৃ ২, ৪, ৬, ৭ ইত্যাদি বহুস্থলে "বঙ্গদেশ" শব্দটী গৌড়দেশের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই একটী শব্দ দ্বারাই গ্রন্থের কৃত্রিমতা প্রমাণিত হয় ; আদিশূরকে "বঙ্গেশ" বলিয়া প্রতারকপ্রবর রাঢ়বরেন্দ্রকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন ভাবিয়া দেখেন নাই। প্রাচীন সমস্ত কুলগ্রন্থে এ সকল স্থলে গৌড় শব্দেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয় এবং পরে দেখিব তথাকথিত এডু মিশ্রের কারিকায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, তুরুষ্কভয়ে কেশবসেন 'গৌড়' দেশ পরিত্যাগ করিয়া 'বঙ্গে' দনুজমাধবের সভায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। ৬৯ পৃঃ প্রতারকপ্রবর বসুধৃত (বসু, ১, পৃঃ ১২৪) এড়ুমিশ্রের সার্দ্ধ শ্লোকদ্বয় সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ৬৮ পৃঃ বসুধৃত (ঐ, পৃ ১৫৩) হরিমিশ্রের কয়েকটি কারিকাও বাদ পড়ে নাই। উপন্যাসপ্রিয় বাঙ্গালী জাতির পাতে এই ভাবে এক অপূর্ব্ব খিচুড়ী পরিবেষিত হইয়াছে এবং তাহারই আস্বাদে বাঙ্গালী মুগ্ধ! (৪) এই কৃত্রিম গ্রন্থের তথ্যভাগে বিশেষতঃ সমীকরণাংশে যে সকল ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হয় তাহাদের বিস্তৃত উল্লেখ করিয়া আমরা পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না। গ্রন্থরচনাকালে ধ্রুবানন্দের মহাবংশ মুদ্রিত না হওয়ায় প্রতারকপ্রবর অম্লানবদনে বহু অলীক বস্তু চালাইয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থ "মধ্যশ্রেণীয়" ব্রাহ্মণদের গৌরব বৃদ্ধির জন্য রচিত, নিতান্ত স্থূল দৃষ্টিতেও ইহা ধরা পড়ে (পৃঃ ৯৩—৯৯)। এই গ্রন্থানুসারে অমাত্য দত্তখাসের সভায় (তখনও বসু মহাশয় 'গণেশ দত্তখাসে'র আবিষ্কার করেন নাই) ৮জন বিজয়ী কুলীনের সমীকরণ হয় (পৃঃ ৯৫—৬)—তন্মধ্যে ২ জন আদিত্য ও দিগম্বর দত্তখাসের বহুপূর্ব্বে ৩৭ সমীকরণে উল্লিখিত (মহাবংশ, পৃঃ ৪২—৪৩), ১ জন বলভদ্র মোটেই "অবসথী" বংশীয় নহেন এবং ২৪ সমীকরণের লোক (ঐ, পৃ ২৫) অপর বশিষ্ঠ ও দত্তখাসের পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৯ সমীকরণের অন্তর্ভূত (ঐ, পৃ ৪৮) এবং ইহাদের তথাকথিত অনুজ ভ্রাতাদের নাম একটাও মহাবংশে পাওয়া যায় না—ইত্যাদি ইত্যাদি! হায়! বসু মহাশয় কেন "মহাবংশ" এত পরে মুদ্রিত করিলেন? এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, "শ্রীদত্তখাস" নামক ব্যক্তির সভা ধ্রুবানন্দ গ্রন্থের একটীমাত্র স্থলে ৫৭ সমীকরণে (ঐ, পৃ ৭০) একটী কুলক্রিয়ার প্রসঙ্গে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—অধিকাংশ পুঁথিতে 'দত্তখান', একটী পুঁথিতে 'দণ্ডখান' এবং মুদ্রিত গ্রন্থে 'দত্তখাস' পাঠ আছে। "খান" উপাধিবিশিষ্ট বহু ব্যক্তির নাম—দুর্ব্বার খান (পৃ ৭৪) দেবেন্দ্র খান (পৃ ৫৫) প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। বসু মহাশয় তাঁহার স্বভাবসুলভ কল্পনাশ্রয়ে এই ক্ষীণ সূত্র ধরিয়া "রাজা গণেশ দত্তখান"-রূপ বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা রাজা গণেশের এক পুরুষ পরবর্ত্তী কালের ঘটনা বটে। কুলতত্ত্বার্ণব গ্রন্থের সৃষ্টিকর্ত্তা আদিশূরের অভিনব তারিখ, বল্লালসেন-কৃত কুলগ্রন্থের রচনাকাল, দনুজমাধবের মৃত্যুশক এবং পুতি শোভাকরের ও ধ্রুবানন্দের কুলাচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠার শকাঙ্ক প্রভৃতি মনোহর আকাশ-কুসুম রচনা করিয়া বাঙ্গলার পাঠকমণ্ডলীকে এক পাদশতাব্দীকাল বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাদের একটীও প্রমাণসিদ্ধ নহে। এইরূপ একখানি বীভৎস গ্রন্থ যে আলোচনায় সন্দিগ্ধচিত্তে হইলেও পুনঃ পুনঃ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার বিচারপ্রণালী কিরূপ বিজ্ঞানসম্মত হইয়াছে সহজেই অনুমান করা চলে।

এড়ুমিশ্র

ডঃ মজুমদার মহাশয় এড়ুমিশ্রের কুলগ্রন্থের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন। নবদ্বীপ পাব্লিক লাইব্রেরীতে এই দুর্লভ পুস্তকের ২ পত্র মাত্র আমরা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি—তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল। এই গ্রন্থ স্বয়ং এড়ুমিশ্রের রচনা কি-না বলা যায় না। বসু মহাশয় যে সকল শ্লোক এড়ুমিশ্রের নামে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার অনেকগুলি এখানে পাওয়া যাইতেছে এবং তিনি যে এই গ্রন্থেরই খণ্ডিত প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ করার কারণ নাই। বসু মহাশয়ের অপকার্য্য পরিবর্জ্জনীয়, কিন্তু তিনি কুলতত্ত্বার্ণবের মত আকাশকুসুম রচনা করেন নাই—বহু প্রামাণিক গ্রন্থরাজি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল।

এড়ুমিশ্রের কারিকা

(২ ক)

দিব্যাবিষয়ং পঞ্চদ্বিজেন্দ্রানিমান্
আনিন্যুঃ শতমন্যুপণ্ডিতসমাঃ (স্) তত্র ক্ষিতীশাস্বরঃ।
শ্রীমেধাতিথি বীতিরাগসহিতো গৌড়াবনীং প্রস্থিতো
দ্বাবক্তৌ চ সুধানিধিস্তদপরঃ শ্রীসৌভরিশ্চাগতৌ॥
কর্ণাত্তাগতকুণ্ডকুণ্ডিতমুখাম্মুক্তীষবুধোদিতান্
উক্তত্ব্রতুরঙ্গভঙ্গবলিতান সন্নাহভারোদ্ধরান।

তানুত্থানকমান (?) বাণবিলসত্তূণান্ নিশম্যাগতান্
আজানূদ্গতপাদুকান্নরপতিঃ সোঽন্তঃপুরেঽচিন্তয়ৎ ॥
এতে ক্ষত্রকুলোদ্ভবাঃ কিমথবা পাশ্চাত্যজাত্যন্তরা
নৈষাং বিপ্রগণানুরূপচরিতং কিঞ্চিন্ময়াকর্ণিতম্ ।
তদ্বিদ্রাবকমুদ্রয়াতিচতুরা নৈতে দ্বিজাঃ শোভনাঃ
তেপ্যাসন্ মনুজাঃ প্রতারিতধিয়ো ধূর্তা দ্বিজাহ্বায়কাঃ ॥
ইত্যালোচ্য মহীপতির্দ্বিজগণানিত্যাহ সম্মন্ত্রিণো
"গচ্ছধ্বং বদতাগতানিদমিতো বাসং কুরুধ্বং দ্বিজাঃ ।
সম্প্রত্যেষ নিতম্বিনীগণমনস্তোষায় কৌতূহলাদ্
অক্ষৈরক্ষতবিক্রমো নরপতিঃ সোঽন্তঃপুরে দীব্যতি ॥"
তে তত্রৈব ততস্তদৈব বিনয়াত্তানূচিরে মন্ত্রিণ-
স্তেপ্যাসন্নৃপতেরনাদরগতানালক্ষ্য তে দুঃখিতাঃ ।
ক্রোধাদূচুরিদঞ্চ বো নরপতি র্নাত্যাদৃতোঽস্মদ্বিধে
তদ্দাতুং ফলমস্য শায়কশতৈঃ শাপৈশ্চ শক্তা বয়ম্ ॥
কিন্তু ক্ষন্তুমতো যুনক্তি চ যতো বিপ্রাঃ ক্ষমাশালিনঃ
তৎপশ্যধ্বমিহাস্তু নঃ সমুদয়ে বেদধ্বনেঃ পৌরুষং ।
ইত্যাভাষ্য বিশিষ্য বেদবিহিতাশীর্ব্বাদমত্যাদরাদ্
অগ্রাবস্থিতমল্লকাষ্ঠশিরসি প্রত্যর্প্য তে প্রস্থিতাঃ ॥
তে নির্গত্য পুরাদথো পরিচলদ্বীচিপ্রচারোদ্ভটং
নক্রাক্রীড়বিসঙ্কটং সুনিকটং তে প্রাপ্য গঙ্গাতটং ।
বাসং চক্রুরুপাত্তরক্তবসনাবাসাঃ পরীবারিণঃ
পশ্চাদ্বেদবিধানতো বিদধিরে মাধ্যাহ্নিকীং প্রক্রিয়াং ॥
তে তদ্বীক্ষ্য চ মল্লকাষ্ঠমধিকং প্রত্যুল্লসৎপল্লবং
তস্মৈ (২থ) ভূপতয়ে ভয়াতিবিনয়াঃ সর্ব্বার্থমাবেদয়ন্ ।
তত্তদ্ভূমিপতির্নিশম্য চ ভয়াশ্চর্য্যাকুলঃ সত্বর-
স্তানানেতুমথ স্বসৈনিকগণৈঃ সার্দ্ধং প্রতস্থে ততঃ ॥
তে চালোক্য পদাতিকং নরপতিং প্রত্যাগতং চানতং
প্রত্যুত্থাপ্য শুভাশিষং দদুরথো বাসং ক্ষিতীশস্ততঃ ।
কিঞ্চিন্নম্রশিরোধরঃ ক্ষি (তি) পতিঃ প্রোবাচ বদ্ধাঞ্জলিঃ
তেজঃপুঞ্জমনোরমান্ দ্বিজবরাংস্তান্ ভক্তিসন্তোষিতান্ ॥
অস্মদ্ভাগ্যবিশেষতঃ সমভবদ্ যুষ্মাদৃশামাগমো
দেশশ্চাপি ভবদ্বিধৈর্নিজপদাধানৈঃ পবিত্রীকৃতঃ ।
কিঞ্চাস্মদ্ভবনং পবিত্রয়তি চেৎ যুষ্মৎপদাব্জাত্রজঃ
সম্প্রত্যেব ভবেম বংশবিভবৈঃ সর্ব্বৈরশোচ্যা বয়ং ॥
ইত্যাকর্ণ্য বিনীতভূপতিবচস্তে ভূমিদেবাঃ ক্ষমা-
বন্তঃ প্রোচুরিদং প্রসন্নহৃদয়া যাতাশ্চ তে সেবয়া ।
তত্ত্বং ব্রূহি বয়ন্তু কিন্তু নিপুণাঃ শাস্ত্রেষু শস্ত্রেষু চ
ত্বৎপ্রীতিং বিরচয্য কেন গমনং কুর্ম্মো বয়ং তে গৃহে ॥
তৎশ্রুত্বা স জগাদ ভার্গবসমখ্যাতাশ্চ নানাগুণৈঃ
খ্যাতা যূয়মসাধ্যমত্রভবতাং কিম্বা ত্রিলোকীতলে ।
কিঞ্চিন্নাস্তি তথাপি শস্ত্রবিহিতং যুষ্মাদৃশাং পৌরুষং
বিজ্ঞাতস্তু পুরৈব শাস্ত্রবিহিতং যত্তৎ সমাচর্য্যতাং ॥
ইত্যাকর্ণ্য বচো নৃপস্য সশরং সন্ধায় চাপং দ্বিজাঃ
তস্মৈস্তৈরভিমন্ত্র্য তান্ বিদধিরে শব্দাদিভেদান্ শতুন্ ।
তদ্দৃষ্ট্বৈব সুবিস্মিতো নরপতিঃ সন্তোষ্য সেবাদিভিঃ
তানাত্মালয়মানিনায় মহতীং পূজাঞ্চ চক্রে পুনঃ ॥
বিপ্রান্ ভূপতিরাহ সাহসযুতঃ পাদানতঃ প্রাঞ্জলি-
র্যুষ্মাকং ময়ি চেদনুগ্রহবরঃ তদ্বাসযোগ্যাশ্রমং ।
যুষ্মভ্যং বিতরামি, তৎ দ্বিজগণাঃ শ্রুত্বা বচঃ ক্ষ্মাপতেঃ
প্রোচুর্দেহি বিশিষ্টপঞ্চনগরং দানং নিবাসায় নঃ ॥
তৎশ্রুত্বা নৃপতিঃ প্রহৃষ্টহৃদয়স্তেভ্যো দদৌ কামটীং
দিব্যাং ব্রহ্মপুরীং তথৈব চ হরিং কোটীং পুরীমাদরাৎ ।
কঙ্কগ্রামমথ প্রসিদ্ধমদদান্নাম্না বটগ্রামকং
গ্রামেষ্বেষু চ পঞ্চসু ক্ষিতিসুরা-
শ্চক্রুঃ স্ববাসাদিকং ॥

(৩ ক)

তেষাং তেষু বভূবুরদ্ভুতগুণাঃ সৎপুত্রপৌত্রাদয়ঃ
তে যাগাধ্যয়নাদিভিঃ বহুতরং কালং বিনিন্যুঃ ক্ষিতৌ ।
তেষাং তত্র নিরাকুলং বহুতিথৌ কালে গতে ভূপতি-
বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলৈকতিলকো বল্লালসেনোঽভবৎ ॥
যো দানেষু হৃণীকৃতামরপুরক্ষৌণীরুহশ্রীভরঃ
শাস্ত্রাভ্যাসরসী বিশেষকুতুকী বিদ্বজ্জনানন্দনঃ ।
যো বিপ্রানকরোৎ কুলাকুলপরীক্ষাণং দ্বিজানাং চ যঃ
চক্রে শক্রসমঃ স ভূপতিরভূৎ বল্লালসেনশ্চিরং ॥
তৎপুত্রো রঘুবীরলক্ষ্মণসমঃ খ্যাতোঽভবৎ লক্ষ্মণঃ
তস্যাভূৎ বিধিবৈশসেন সুচিরং দুর্লক্ষণং কিঞ্চন ।
তস্যাভূত্তনয়ঃ প্রচণ্ডবিনয়ঃ শ্রীকেশবাখ্যঃ স্বয়ং
দেশঞ্চাপি বিহায় বঙ্গমগমৎ ভীতস্তুরুষ্কাত্তঃ ॥
তত্রাসীদ্দনুজাদি-মাধবনৃপস্তং (১) কেশবো ভূপতিঃ
সৈন্যৈঃ বিপ্রগণৈঃ পিতামহকৃতৈরন্যৈশ্চ যুক্তো গতঃ ।
তাঞ্চক্রে নৃপতির্মহাদরতয়া সম্মানয়ন্ জীবিকাং
তদ্বর্গস্য চ তস্য চ প্রথমতশ্চক্রে প্রতিষ্ঠান্বিতঃ ॥
ভূপালঃ স চ কেশবং নরপতিং কিঞ্চিৎপ্রসঙ্গান্তরে
বাক্যং প্রাহ ভবৎপিতামহকৃতী বল্লালসেনো নৃপঃ ।
কীদৃগ্বিপ্রকুলাকুলাদিনিয়মং কস্মাৎ কথং বা কুতঃ
কেনোদ্যোগভরেণ বিপ্রনিকরং চক্রে তদাখ্যাসি মে ॥
তৎশ্রুত্বা কুলপণ্ডিতং কথয়িতুং তত্তজ্জগাদাদরাৎ
এডুংমিশ্রমশেষশাস্ত্রকুশলং বিপ্রস্তথা পারগং ।
যো মিশ্রঃ কবি * * রেষ জগতীবিখ্যাতকীর্ত্তির্দ্বিজ-
শ্রেণিপ্রস্তুতসৎকুলাকুলবিধে বিদ্যাবতামগ্রণীঃ ॥

(১) পুঁথিতে "তত্রাসীন্নদনুজাদিমাধবনৃপঃ" পাঠ আছে।

পুত্রো যস্য কুশধ্বজঃ সমভবৎ পত্নী চ রত্নাবতী
যদ্ভৃত্যো বকরায়িকঃ স তু কুলব্যাখ্যাং বিতেনে তদা।
ভো রাজন্নবধেহি সম্প্রতি কুলব্যাখ্যানমাকর্ণ্যতাম্
আস্তে পশ্চিমদিগ্বিশে—(৩৭) য বিষয়ে শ্রীকান্যকুব্জাহ্বয়ঃ ॥
তন্মধ্যেঽস্তি বিশিষ্টবিপ্রনিলয়ঃ কোলাঞ্চদেশঃ শুভ-
স্তস্মাদানয়দাদিশূরনৃপতিঃ পূর্ব্বস্ত পঞ্চদ্বিজান্।
তানানীয় বিশিষ্টপঞ্চনগরং তেভ্যো দদৌ গৌড়ত-
স্তেষাং বিস্তরপুত্রপৌত্রবিভবৈর্ব্যাপ্তঞ্চ গৌড়স্থলং ॥
কালে ভূরিতিথৌ গতেঽথ সমভূৎ বল্লালসেনঃ সুধীঃ
সপ্রত্যর্পণদিৎসয়া দ্বিজগণাংস্তানানিনায়াস্তিকে।
দানাদানপরাঙ্মুখাঃ ক্ষিতিপতিং প্রোচুর্ব্বয়ং যাজ্ঞিকাঃ
তদ্বিজ্ঞায় চুকোপ ভূপতিরসৌ বল্লালসেনো মহান্ ॥
চণ্ডীমেব সমারয়াধ সুচিরং ভূরিপ্রয়োগাদিভিঃ
প্রত্যক্ষাজনি সা নিশার্দ্ধসময়ে দুর্গাপবর্গপ্রদা।
রাজানং তমুবাচ বাঞ্ছিতবরং যাচস্ব দাস্যাম্যহং
রাজাসোঽথ বৰার তং দ্বিজগণং নিম্নাতুমিচ্ছাম্যহম্ ॥
তুষ্টা সা জগদীশ্বরী নৃপমুবাচামুং বরোঽয়ং মহান্
কিন্তু ত্বংপ্রহরস্বয়ং কুরু নবং বিপ্রং যমাকো * যঃ (?)।
দত্ত্বেমন্তু বরং নৃপায় সহসৈবান্তর্হিতা পার্ব্বতী
রাজা সপ্তশতদ্বিজানথ তথৈবাজ্ঞয়া নির্ম্মমে ॥
তান্নির্ম্মায় নৃপঃ সুবিস্তরমহাদানানি তেভ্যো দদৌ
জাতা হৃষ্টতরস্বকীর্ত্তিকমলঃ সৌরপ্রতাপোজ্জ্বলঃ।
তৎশ্রুত্বা নৃপতিং সমেত্য চুকুপুঃ পূর্ব্বদ্বিজা যাজ্ঞিকাঃ
বংশধ্বংসকৃতে নৃপস্য সহসা শপ্তুং সমারেভিরে ॥
ভীতোঽভূন্নৃপতিস্ততো দ্বিজগণান্ সন্তোষ্য সেবাদিভিঃ
তানাহোত্তম-মধ্যমাধমতয়া ভূয়ঃ করিষ্যে দ্বিজান্।
তৎশ্রুত্বাথ কথঞ্চিদেব নৃপতিং শপ্তুং নিবৃত্তাঃ দ্বিজাঃ
রাজা চাপি তথাকরোৎ কুলবিধিগ্রন্থং দ্বিজানাং ততঃ ॥
বংশাংশাদিকুলাকুলাদিরচনগ্রন্থস্য বিস্তারকৃৎ
জাতোঽহং নৃপতৌ গতে সুরপুরং বল্লালসেনে ততঃ।
অন্তর্দুঃখতয়া তয়া দ্বিজগণাগ্র্যাণাং নরেন্দ্রাত্মজাঃ
সর্ব্বে নাশমুপাগ ...

উল্লিখিত 'শার্দ্দূলবিক্রীড়িত' ছন্দের ২৯ শোক মধ্যে সার্দ্ধসপ্ত শ্লোক মাত্র বসু মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ ৮৫, ১৩৪, ১৫৫)। একটী শ্লোকে আদিশূরের নাম পাওয়া যাইতেছে এবং অপর এক শ্লোকে এড়ুমিশ্র নিজপুত্র, পত্নী এবং ভৃত্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—ইহা নূতন তথ্য বটে। কুলশাস্ত্রের নূতন কিছু প্রকাশ করা বর্ত্তমানযুগে অত্যন্ত বিপজ্জনক; আমরা সাদরে আহ্বান করিতেছি, অনুসন্ধিৎসু পাঠক পুঁথি সম্বন্ধীয় কোন প্রকার সন্দেহ অবিলম্বে ভঞ্জন করিয়া লইবেন। এই গ্রন্থে ৫ জন রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৪ জনের অস্তিত্ব ও পারম্পর্য্য পাথুরে প্রমাণ দ্বারাও অব্যাহত থাকে। লক্ষ্মণসেন অন্ততঃ ২৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (ভাওয়াল তাম্রশাসন) এবং খুব সম্ভবতঃ তিনি ১৩শ শতাব্দীর প্রথম দশকে জীবিত ছিলেন। সুতরাং কেশবসেন ১৩শ শতাব্দীর ২য় ও ৩য় পাদে দনুজমাধবের অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়া থাকিবেন ইহা অসম্ভব নহে। এই বিবরণের 'অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য' অংশ মল্লকাষ্ঠে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বল্লালসেন কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ-সৃষ্টি। বিংশশতাব্দীর জ্ঞানবিশ্বাসের মাপকাঠিতে গ্রন্থের প্রামাণ্যবিচার অন্যায় হইবে। ১৩শ শতাব্দীতে পুরাণের আদর্শেই এতাদৃশ গ্রন্থ রচনা হইত—গ্রন্থের তথ্যাংশ পৌরাণিক আবেষ্টনী হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া বিচার করাই বিজ্ঞানসম্মত।

প্রতিবাদের উত্তর

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি-এচ-ডি

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার প্রবন্ধগুলির যে প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহার ভাব, ভঙ্গি ও ভাষা কতদূর বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুমোদিত অথবা শিষ্টাচারসম্মত হইয়াছে তাহার বিচার পাঠকেরাই করিবেন। মূল আলোচ্য বিষয়ের প্রতিবাদে তিনি যেটুকু বলিয়াছেন আমি তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিবেদন করিতেছি। উদ্ধৃত বাক্যগুলির অধোরেখা আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যোগ করিয়াছি।

১। ধ্রুবানন্দমিশ্রকৃত মহাবংশ

দীনেশবাবুর মন্তব্য: (ক) "ডঃ মজুমদার মহাশয় এই সংস্করণের যথোচিত মূল্য দিতে বিমুখতা অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞানবিরোধী বিদ্বেষভাব সূচিত করিয়াছেন।

(খ) "এই অভ্রান্ত গ্রন্থের প্রামাণ্য আলোচনায় উৎসুক হইয়াও ডঃ মজুমদার মহাশয় সম্ভবতঃ মূলগ্রন্থের একটি অক্ষরও না পড়িয়া মুখবন্ধে গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র এক নজীর দেখিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন এবং অত্যন্ত যুক্তিহীন বংশপর্য্যায়ের একটা গড়পড়তা ধরিয়া এক কথায় সমগ্র গ্রন্থের প্রামাণ্য উড়াইয়া দিয়া........"

(গ) গড়পড়তা ধরিয়া সময় হিসাব করার যে বস্তুতঃ কোনই মূল্য নাই তাহার শত শত উদাহরণ বিদ্যমান।

(ঘ) লক্ষ্য করিবার বিষয় ধ্রুবানন্দের উভয় গ্রন্থই অন্যান্য কুলশাস্ত্রসুলভ পরিবর্ত্তী যোজনা কিম্বা প্রক্ষিপ্তাংশ হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত। ইহার প্রধান কারণ কুলীন ও ঘটক সম্প্রদায়ের এই গ্রন্থকারের প্রতি অনন্যসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি—যাহা ডঃ মজুমদার মহাশয় এক কথায় উড়াইয়া দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই; (ক, খ, ঘ) ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশ আলোচনা-প্রসঙ্গে ধ্রুবানন্দের নিজের বংশাবলী বিশ্বাস করা

কেন কঠিন তাহার উল্লেখ করিয়া আমি লিখিয়াছি যে, "এই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই দেখা যাইবে যে প্রামাণিক গ্রন্থোক্ত প্রাচীন বংশাবলীও সর্ব্বত্র সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নহে।" (৬৬৭ পৃঃ)

আমার বিশ্বাস, পাঠকমাত্রেই ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, আমি ধ্রুবানন্দ-কৃত মহাবংশ প্রামাণিক বলিয়াই মনে করি, যদিও দীনেশবাবুর ন্যায় ইহার প্রত্যেক উক্তিকে 'অভ্রান্ত' বলিয়া মনে করি না। আমি "এক কথায় সমগ্র গ্রন্থের প্রামাণ্য উড়াইয়া" দেই নাই অথবা এই গ্রন্থের "যথোচিত মূল্য দিতে বিমুখতা অবলম্বন" করি নাই। কুলীন বা ঘটক সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ভক্তি উড়াইয়া দিতেও প্রয়াসী হই নাই। (খ, গ) ধ্রুবানন্দের নিজের বংশাবলী সম্বন্ধে আমি লিখিয়াছি: "ধ্রুবানন্দ মিশ্র বল্লালের মৃত্যুর তিন শত বৎসর পরে বিদ্যমান ছিলেন। সাত পুরুষে তিন শত বৎসরের ব্যবধান স্বীকার করা কঠিন এবং যদি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে বংশপর্য্যায়ের গড়পড়তা ধরিয়া সময় হিসাব করার কোন মূল্য থাকে না"। (১৮৪২ পৃঃ) দীনেশবাবু তাঁহার জনৈক পূর্ব্বপুরুষের ও গদাধর ভট্টাচার্য্যের উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "গড়পড়তা ধরিয়া সময় হিসাব করার কোনই মূল্য নাই।" কিন্তু ঐতিহাসিকগণ মাত্রেই অন্য বিশ্বস্ত প্রমাণ না থাকিলে এই উপায়েই কালনির্ণয় করিতে বাধ্য হন। সংবাদ-পত্রে মাঝে মাঝে শতাধিক বৎসরের বৃদ্ধের কাহিনী পড়া যায়; কিন্তু যাহা সচরাচর ঘটে তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই অনুমান করিতে হয় এবং দীনেশবাবুর আপত্তি সত্ত্বেও ঐতিহাসিকগণ করিতেছেন ও করিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দীনেশবাবু নিজেও ঐতিহাসিক-জনোচিত এই কুসংস্কার হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রবন্ধে তিনি ৬১—৭৮ সমীকরণ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "তাঁহার পুত্র পরমেশ্বর ৭৮ সমীকরণে গৃহীত অর্থাৎ এক পুরুষ কাল মধ্যে (২৫ বৎসরে) ১৬ সমীকরণ হইয়াছিল।" আমিও ২৫ বৎসরে এক পুরুষ গণনা করিয়াই সাত পুরুষে তিন শত বৎসরের ব্যবধান বিশ্বাস করা কঠিন বলিয়াছি। এক পুরুষে পিতাপুত্রের ব্যবধান ৫০।৬০ বৎসর বা তদধিকও হইতে পারে এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে—বরং সাত পুরুষের ব্যবধানে এই প্রকার গড়পড়তার হিসাব অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। দীনেশবাবু নিজে এক পুরুষে ২৫ বৎসর ব্যবধান কল্পনা করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রবন্ধের অন্যত্র লিখিয়াছেন "১১।১২ পুরুষে ৩০০।৪০০ বৎসরের কম কিছুতেই হইবে না।" অথচ অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করায় আমার লেখায় "কথঞ্চিৎ তীব্রতা" সহকারে প্রতিবাদ করিতে "বাধ্য" হইলেন কেন —তাহার বিচারভার পাঠকদের উপরই দিলাম। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আদিশূরের তারিখ সম্বন্ধে আমার যুক্তি যে "ভ্রমপ্রমাদগ্রস্ত" ও "এক-পক্ষপাতী" তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি বংশপর্য্যায়ের গড়পড়তা হিসাবের উপরই নির্ভর করিয়াছেন!

(খ) ধ্রুবানন্দ মিশ্রের "মূল গ্রন্থের এক অক্ষরও যে আমি পড়িয়াছি" কোন ব্যক্তিবিশেষের সাক্ষ্য দিয়া তাহা প্রমাণিত করিতে আমি অসমর্থ, কারণ গ্রন্থ পড়িবার সময় কোন লোককে ডাকিয়া সম্মুখে রাখার অভ্যাস আমার নাই। তবে এ সম্বন্ধে আমি আমার প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি: "৺বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, "মহাবংশের একষষ্টিতম সমীকরণ-কারিকায় ধ্রুবানন্দ লিখিয়াছেন যে, ১৩৭৭ শকে অর্থাৎ ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে পৃথিশোভাকরের মৃত্যু হয়।" ইহা ঠিক নহে। কারণ ৺বসু মহাশয় কর্ত্তৃক মুদ্রিত গ্রন্থের ৭৭ পৃষ্ঠায় "সপ্তসপ্ততীতে শাকে পৃথিশোভাকরে মৃতে" মাত্র এই শ্লোকটি আছে। ইহাতে অনুল্লিখিত শতাব্দীর সাতাত্তর বর্ষের উল্লেখ আছে, ১৩৭৭-এর উল্লেখ নাই।" (৬৬৬ পৃঃ) দীনেশবাবু শতাধিক মাইল দূরে থাকিয়াও কে কোন্ গ্রন্থ পড়িল বা পড়িল না তাহা জানিতে পারেন। আমার যে সেরূপ দিব্যদৃষ্টি নাই, সুতরাং গ্রন্থের ৭৭ পৃষ্ঠায় (এই পত্রাঙ্ক মুখবন্ধে বা ভূমিকাতে দেওয়া নাই) কি আছে তাহা না পড়িয়া আমার জানিবার সম্ভাবনা নাই—ইহা পাঠকবর্গের নিকট স্বীকার করিতে আমি কোন প্রকার কুণ্ঠা বোধ করিতেছি না। দীনেশবাবুর উক্তি সত্য হইলে অর্থাৎ কোন গ্রন্থের 'মুখবন্ধ এক নজর দেখিয়াই' তাহার অভ্যন্তরস্থ কোন শ্লোকের বিষয় জানিতে পারিলে আমার বিশেষ উপকার হইত। দীনেশবাবু আমার এই অতীন্দ্রিয় শক্তি সম্বন্ধে যে অযাচিত প্রশংসাপত্র দিয়াছেন আমি তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

(ঘ) দীনেশবাবুর 'ঘ' শীর্ষক উক্তির প্রথম বাক্যের সহিত তাঁহার প্রবন্ধোক্ত নিম্নলিখিত বাক্যটি তুলনীয়: "ধ্রুবানন্দের উভয় গ্রন্থই আদ্যন্ত শ্লোকরচিত, কোথাও গদ্যরচনা নাই। সুতরাং অনুমান হয়, সুলোচন হইতে বরাহ পর্য্যন্ত শ্লোকগুলি বিলুপ্ত হওয়ায় লিপিকার আধুনিক গ্রন্থ হইতে গদ্যাংশ যোজনা করিয়া দিয়াছেন।" কোন মূলগ্রন্থের পরবর্ত্তী লিপিকার আধুনিক অন্য গ্রন্থ হইতে কোন অংশ যোজনা করিলে আমরা তাহাকেই 'প্রক্ষিপ্ত' বা 'পরবর্ত্তীযোজনা' বলিয়া থাকি। দীনেশ বাবুর মতে ঐ দুই শব্দের অর্থ কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সাধারণ অর্থ ধরিলে ধ্রুবানন্দের উভয় গ্রন্থই "পরিবর্ত্তীযোজনা কিংবা প্রক্ষিপ্তাংশ হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত" ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায় তাহা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগোচর।

২। সর্ব্বানন্দের কুলতত্ত্বার্ণব

দীনেশবাবু বহু যুক্তিপ্রমাণসাহায্যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থখানি "কতিপয় প্রতারক দ্বারা রচিত" এবং উপসংহারে মন্তব্য করিয়াছেন যে, "এইরূপ একখানি বীভৎস গ্রন্থ যে আলোচনায় সন্দিগ্ধচিত্তে হইলেও পুনঃ পুনঃ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার বিচার প্রণালী কিরূপ বিজ্ঞান সম্মত হইয়াছে সহজেই অনুমান করা চলে।"

কুলতত্ত্বার্ণব সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধে ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়-প্রসঙ্গে আমি লিখিয়াছি, "এই গ্রন্থের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। অন্যত্র তাহা আলোচিত হইবে।" (১৮৬৬ পৃঃ), পরে লিখিয়াছি, "এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে যে কয়টি

বিষয় লইয়া বাদানুবাদ হয় তাহার মধ্যে অনেকগুলি সমস্যার সমাধানই এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয় এবং তাহা ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর মতের অনুকূল। বিশেষত এই কুলগ্রন্থে বহু ঘটনারই সঠিক তারিখ দেওয়া আছে। সাধারণত কুলগ্রন্থে এইরূপ ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসৃত হয় না। এই সমুদয় কারণে যদি কেহ এই গ্রন্থের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন তবে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। এই গ্রন্থখানির মূল পুঁথির বিচার আবশ্যক" (পৌষ, ১২৭ পৃঃ)।

তথাপি যে আমি এই গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার কারণ দুইটি :

(১) হয়ত অনেকে এই গ্রন্থের কৃত্রিমতা সম্বন্ধে আমার মত গ্রহণ করিতে না পারেন।

(২) অকৃত্রিম অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে ধ্রুবানন্দ-পুত্র সর্ব্বানন্দ-রচিত গ্রন্থ না হইলেও সম্ভবতঃ ইহা পরবর্ত্তী কালের কোন কোন কুল-গ্রন্থের বিবরণ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং অসম্ভব নহে যে, খুব প্রাচীন না হইলেও দুই-এক শতাব্দীর পূর্ব্বের প্রচলিত কোন কোন জনশ্রুতি বা মতবাদ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। সুতরাং কোন কোন প্রসঙ্গে অন্যান্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক কুলগ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থেরও আমি উল্লেখ করিয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি যে, ৮৪০ পৃষ্ঠায় আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের কালজ্ঞাপক কুলতত্ত্বার্ণব ও অন্যান্য গ্রন্থোক্ত ১২টি শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়া আমি মন্তব্য করিয়াছি : "উদ্ধৃত শ্লোকগুলির মধ্যে কোনটিই কোন প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থে আছে এরূপ প্রমাণ নাই।"

দীনেশবাবুর মত "প্রতারক" "বীভৎস" প্রভৃতি শব্দ এই গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রয়োগ করি নাই এবং এই গ্রন্থকে 'অপাংক্তেয়' করিয়া "চণ্ডালের হাত দিয়া" পোড়াইবার ব্যবস্থা করি নাই ইহাই দীনেশবাবুর রাগের কারণ। দীনেশবাবুর কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে যেরূপ সহজ দৃঢ়তা আছে আমার তাহা নাই। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'মহাবংশ' একেবারে "অভ্রান্ত", তাহার কোন উক্তিতে সন্দেহ করা মহাপাপ এবং কুলতত্ত্বার্ণব "বীভৎস" গ্রন্থ, অপ্রামাণিক ঘোষণা করিয়াও তাহার কোন শ্লোক উল্লেখমাত্র করিলেও তাহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ—উপযুক্ত প্রমাণ না থাকিলেও এইরূপ এককথায় ডিক্রী বা ডিসমিস করিয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে আমার ঐতিহাসিক-সংস্কার ও সত্যনিষ্ঠায় বাধে, ইহা স্বীকার করিতে আমি লজ্জাবোধ করি না।

৩। এডুমিশ্রের কারিকা

দীনেশবাবুর মন্তব্য : "ডঃ মজুমদার মহাশয় এডুমিশ্রের কুলগ্রন্থের অস্তিত্ববিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন।"

৬৬৩-৪ পৃষ্ঠায় এডুমিশ্রের কারিকা সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি নিরপেক্ষ পাঠক তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে, দীনেশবাবুর এই উক্তি সত্য নহে। ৺নগেন্দ্র বসু সংগৃহীত এডুমিশ্রের কারিকার সম্বন্ধে আমি লিখিয়াছি : প্রায় সমসাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে যদি কাহারও উক্তি অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য হয় তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, হয় গ্রন্থখানি কৃত্রিম, নয়ত গ্রন্থকার বিচারশক্তিহীন।"

তৎপর আমি লিখিয়াছি : "এডুমিশ্রের কারিকার কোন পুঁথি সন্ধান করিয়া পাই নাই।"

দীনেশবাবু নবদ্বীপ পাব্লিক লাইব্রেরীতে এই দুর্লভ পুস্তকের ২ পত্র আবিষ্কার করিয়াছেন—এবং তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন "এই গ্রন্থ স্বয়ং এডুমিশ্রের রচনা কি-না বলা যায় না।" 'কুলতত্ত্বার্ণব' কৃত্রিম গ্রন্থ এই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াও আমি তাহা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করায় দীনেশবাবু আমার সমগ্র আলোচনাই অবৈজ্ঞানিক—এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু দীনেশবাবু উক্ত পুথি এডুমিশ্রের রচনা কি-না তাহা বলিতে না পারিলেও তাহা সমগ্র উদ্ধৃত করিয়া "এডুমিশ্র নিজ পুত্র পত্নী এবং ভৃত্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—ইহা নূতন তথ্য বটে"—এইরূপ বহু মন্তব্য করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। দীনেশবাবুর যুক্তি অনুসারে এই একটি মাত্র কারণেই তাহার প্রবন্ধ অবৈজ্ঞানিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু আমার মতে অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও এই গ্রন্থাংশ লোকলোচনের গোচরীভূত করিয়া দীনেশবাবু কুলশাস্ত্র আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন যে, আমার "প্রমাদোক্তির ফলে কৃত্রিম-অকৃত্রিমনির্ব্বিশেষে সমস্ত কুলশাস্ত্রের উপর শিক্ষিত সমাজের অশ্রদ্ধা হওয়া সম্ভব"—এই কারণেই তিনি ইহার 'প্রতিবাদকল্পে কথঞ্চিৎ তীব্রতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু তিনি কুলতত্ত্বার্ণব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন এবং "অন্যান্য কুলশাস্ত্রসুলভ পরবর্ত্তীযোজনা কিম্বা প্রক্ষিপ্তাংশ" প্রভৃতি যে সমুদয় পদ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রবন্ধের সাহায্যে কুলশাস্ত্রের উপর শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা কতটুকু বাড়িবে তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করার বিষয়। কারণ, কুলতত্ত্বার্ণবই যে প্রথম ও শেষ কৃত্রিম কুলগ্রন্থ এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। দীনেশবাবু কুলতত্ত্বার্ণব সম্বন্ধে যে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন তাহা যে অন্যান্য অনেক কুলগ্রন্থ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, স্বয়ং নগেন্দ্রনাথ বসুকেও তাহা স্বীকার করিতে হইয়াছে।

প্রতিবাদের উত্তর সুদীর্ঘ হইয়া পড়িল, সুতরাং দীনেশবাবুর নিজের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিব না। ভারতবর্ষে আমার প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইবার পর আমি প্রতিবাদ-সূচক বহু চিঠিপত্র পাইয়াছি, প্রতিবাদের কোন উত্তর দিই নাই। কারণ অধিকাংশ প্রতিবাদকারীই ভাষার অসংযম ও প্রাচীন বদ্ধমূল সংস্কারের পরিচয় মাত্র দিয়াছেন। যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঐতিহাসিক তথ্য আলোচিত হয় তাহার মূল সূত্রগুলি সম্বন্ধে যদি উভয় পক্ষের ধারণা একরূপ না হয় তবে বাদ-প্রতিবাদে কোন উপকার হয় না। আপ্তবাক্যে বিশ্বাসের ন্যায় যাঁহারা কোন কুলগ্রন্থকে অভ্রান্ত ধরিয়া লইয়াই তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হন তাঁহাদের সহিত আলোচনায় বিশেষ সুফলের সম্ভাবনা নাই। ঠিক এই কারণেই শ্রীযুক্ত দীনেশবাবুর প্রবন্ধেরও কোন প্রতিবাদ করিতে আমার অনিচ্ছা

ছিল। কিন্তু 'ভারতবর্ষ'-এর সম্পাদক মহাশয় আমার নিকট এই প্রবন্ধ পাঠাইবার পর আমি ইহার কোন উত্তর না দিলে অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনে করিতে পারেন যে আমি তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছি এবং সাধারণ পাঠকবর্গ মনে করিতে পারেন যে, আমি যখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উক্তির কোন জবাব দিই নাই তখন তাঁহার কথাই সত্য। অতএব উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, আমার অবসর খুব প্রচুর নহে—সুতরাং প্রতিবাদকারী পত্রলেখকগণকে যদি উত্তর না দিয়া থাকি এবং ভবিষ্যতে এইরূপ নিষ্ফল বাদ-প্রতিবাদে যদি যোগদান না করি তাহা হইলে কেহ যেন না মনে করেন যে, আমার প্রতিবাদে বলিবার কিছুই নাই এবং প্রতিবাদকও যেন মনে না করেন যে, আমি তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছি।

মাথুর বেদনা

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর

অক্রূরের রথে চড়ি লীলারঙ্গ পরিহরি
কবে শ্যাম হায়
কাঁদাইয়া গোপীগণ কাঁদাইয়া বৃন্দাবন
গেল মথুরায়।
গন্ধে মিলাইল ধূপ অরূপ হইল রূপ
অনির্বচনীয়;
ইন্দ্রিয়ের রসায়ন ভাবে হয়ে নিমগন
হলো অতীন্দ্রিয়।
উঠিল শ্রীরাধিকার বুকফাটা হাহাকার
বিদারি গগন,
"কোথা গেলে রসরাজ দশমী দশায় আজ
দাও দরশন।"
কাঁদে তায় প্রতি শাখী গোকুলের মৃগপাখী
রাধিকার শোকে,
কাঁদে গোপগোপী যত, অশ্রু ঝরে অবিরত
জটিলারও চোখে।
অরূপ ফিরেনি রূপে, গন্ধ ফিরেনিক ধূপে,
শ্যাম বৃন্দাবনে।
তাই আজো রাধিকার আর্ত্তনাদ হাহাকার
বাজিছে ভুবনে।
গুমরে গিরির বুকে, ধ্বনিছে নির্ঝ'র মুখে,
নদী কলকলে,
মর্ম্মরিছে বনে বনে মন্দ্রিতেছে খনে খনে
বারিদমণ্ডলে।
জীবনে জীবনে ব্যথা জাগাতেছে ব্যাকুলতা
অজানার টানে,
মুখে অন্ন নাহি রুচে চোখে ঘুমঘোর ঘুচে
চাহি কার পানে?

সে বিরহ আজো বাজে মন নাহি লাগে কাজে,
কারে যেন চায়,
কারে নাহি পেয়ে বুকে সংসারের কোন সুখে
প্রাণ না জুড়ায়।
মান যশ ধন জন তৃপ্ত করে না ক' মন,
মিটে না ক' সাধ,
একজনে না পাওয়ায় সবি ব্যর্থ হ'য়ে যায়,
সকলি নিঃস্বাদ।
কাহার বরণ স্মরি মেঘ হেরি শির'পরি
পরাণ উদাস!
প্রেয়সী রহিতে কোলে উন্মনা তাহারে তোলে,
শ্লথ বাহু-পাশ!
ব্রজের সজল আঁখি যত মৃগ যত পাখী
নব জন্ম লভি'
হইল কি দেশে দেশে যুগে যুগে ফিরে এসে
শত শত কবি?
রাধার বিরহ রাগে তাদের কল্পনা জাগে
হইয়া অরুণ,
তাদের সকল গীতি ছন্দিত সকল স্মৃতি
করেছে করুণ।
জাগায় সে গূঢ় ব্যথা কোন্ সুদূরের কথা,
পূর্ণের পিয়াসা!
তাহাদের গানে গানে ছুটিছে অনন্ত পানে
অমৃত তিয়াষা।
নিখিল ভুবন ভ্রমি বিশ্বসীমা অতিক্রমি
লক্ষ্য নাহি জানি;
কাহার সন্ধানে ঘুরে দেশকালাতীত সুরে
তাহাদের বাণী?

অমর চৌধুরী

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

অমরবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল নিতান্ত আকস্মিক-ভাবে। আমি তখন কলকাতার কোন বিখ্যাত দৈনিক কাগজের অফিসে কাজ করি। রাত্রির গভীর প্রসুপ্তির মধ্যে শহরের অধিকাংশ লোক যখন দিন-যাপনের প্রাত্যহিক গ্লানিকে কিছুক্ষণের মত ভুলে থাকতে চায়, আমরা ক'জনা তখন শেড্-বিচ্ছুরিত হালকা আলোয় দেশী-বিদেশী খবরের তর্জ্জমা করি; আর্জ্জেণ্টাইন থেকে নভোগ্রাদ, কাশ্মীর থেকে কলম্বো—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সব কিছু এসে ধরা দেয় আমাদের নখ-দর্পণে। সামান্য কলমের আঁচড়ে আমরা প্রাতঃকালীন চায়ের আসরের জন্য গভীর উত্তেজনা সৃষ্টি করি; দেশের কোন্ নেতার কোন্ বক্তৃতাকে কতটুকু প্রাধান্য দিতে হবে, কাকে বাঁচাবার জন্য কাকে মারতে হবে—এসব তখন আমাদের রীতিমত জানা হয়ে গেছে।

এমনি ধারা একটি রাত। বাইরে ঝুপ ঝুপ ক'রে বৃষ্টি পড়চে। পিছনের খোলা জানালা দিয়ে জলের ছাট আসছে মাঝে মাঝে; কিন্তু উঠে সেটা ভেজিয়ে দেবার মত উৎসাহ নেই। হাতে কাজকর্ম্ম বিশেষ ছিল না; সামনের টেবলটার উপর পা দুটো তুলে দিয়ে অলসভাবে কি যেন ভাববার চেষ্টা করছিলাম। ঠিক কি ভাবছিলাম তা এতকাল পরে মনে থাকবার কথা নয়। হয়ত ভাবছিলাম কৈশোরে যে রাত্রির কল্পনায় বিশ্রামের মুহূর্ত্তগুলি রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, প্রয়োজনের খাতিরে আমরা তাকে কতখানি নিরর্থক ক'রে তুলেছি, রূপকথার পল্লীকে টেনে নিয়ে এসেছি একেবারে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মাঝখানে,…কিম্বা এমনি একটা কিছু!

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখের পাতায় বুঝি ক্লান্তি নেমে এসেছিল, হঠাৎ যেন টেবলের খুব কাছাকাছি ভারি বুটের পদশব্দ শুনতে পেলাম। তখনও চোখের পাতা খুলিনি; মনে হ'ল তন্দ্রার রথে চেপে বোধ হয় আবিসিনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পৌছেচি। কিন্তু একটু পরেই আমার ভুল বুঝতে পারলাম। সামনে দাঁড়িয়ে কে যেন আমায় ডাকলে: শুনচেন?

চোখ চেয়ে সামনে যাঁকে দেখলাম পরে জানা গেল—তিনিই অমর চৌধুরী। নাম শুনে আপনাদের মনে হতে পারে, তিনি হয় ত বীরভূমের কি ফরিদপুরের প্রতিপত্তি-শালী কোন ভূস্বামী, প্রজাদের সঙ্গে খাজনার ব্যাপারে হয়ত একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধে গেছে, প্রকাণ্ড মোটরখানা নিয়ে নিজেই খবর দেবার জন্য ছুটে এসেচেন; নিতান্ত পক্ষে বড়দরের একজন সাহিত্যিক বা অভিনেতা। কিন্তু অমরবাবুর আকৃতিগত বর্ণনা শুনলে আপনারা সহজেই আপনাদের ভুল বুঝতে পারবেন।

পরণে একটা খাকী পায়জামা, এককালে সেটাকে ফুল্‌প্যাণ্ট বলা চলত নিশ্চয়ই, কিন্তু এখন সেটার চার-ভাগের তিনভাগ মাত্র অবশিষ্ট। কারণ, পায়ের দিকের খানিকটা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন, বটের ঝুরির মত সুতো ঝুলচে দু-চার গাছি এবং কাদায় ও ময়লার প্রায় অন্ধকার হয়ে উঠেচে। পায়ে জুতো একজোড়া ছিল বই-কি, এককালে রীতিমত বুটজুতোই বলা চলত, কিন্তু তালি-মাহাত্ম্যে এখন আর সেটির স্বরূপ নির্ণয় করবার উপায় নেই। গায়ে একটা গরম কোট, সেটাতেও জায়গায় জায়গায় ছাতার কালো কাপড়ের তালি মারা। বগলে খবরের কাগজে বাঁধা একরাশ কাগজপত্র, মুখে একটা নিভন্ত বর্ম্মাচুরুট এবং হাতে একটা রং-চটা টিনের কৌটা। মুখে খোঁচা খোঁচা একগাল কাঁচা-পাকা দাড়ি, মাথার চুলের সামনের দিকটা খুব পাতলা হয়ে এসেচে—টাকও বলা যেতে পারে।

এ হেন একটি লোক হঠাৎ আমাকে সচকিত ক'রে জিজ্ঞাসা করলে: শুনচেন?

কান দিয়ে তাঁর মুখের কথা হয়ত ভাল ক'রে শোনা হয়নি, কিন্তু চোখ দিয়ে তাঁকে এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই উপলব্ধি

করলাম। গাম্ভীর্য্য যথাসাধ্য বজায় রেখে জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাই আপনার?

লোকটিকে বসবার জন্য চেয়ার দেখিয়ে দেওয়া দরকার মনে করিনি, কারণ সেই বৃষ্টির রাত্রিতে আমি বোধ হয় মনে মনে অবাস্তব একটা স্বপ্ন রচনা করছিলাম এই লোকটি মূর্ত্তিমান বিঘ্নের মত এসে সেটাকে ভেঙে চুরমার ক'রে দেওয়ায় আমি তার প্রতি প্রসন্ন হতে পারিনি। কিন্তু আমাকে খুশী করবার জন্য তিনি বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন না। এক মিনিট অপেক্ষা করে, আমার সামনের চেয়ারটা নিয়ে বসে পড়লেন এবং বললেন, দেশলাইটা দিন ত, চুরুটটা বুঝি নিভেই গেল।

লোকটির কথা বলার মধ্যে কেমন একটা সহজ দাবীর সুর ছিল। পকেট থেকে দেশলাইটা বা'র করে দিলাম।

বিলিতি খবর নিয়ে সবুজরঙের খাম এসে পড়ল। হয়ত ফোর্ট বেলভেডিয়ারে কোন ভোজের বিবরণ, কিম্বা হিটলার কি মুসোলিনির গালভরা বক্তৃতা। কাজ সুরু করতে হবে এবার। একটু ব্যস্ততা প্রকাশ ক'রে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কি চান বলুন।

হরিকিশোরের ঠিকানা।

হরিকিশোর গুপ্ত আমাদের বার্ত্তা-সম্পাদক। প্রায় দুশো টাকা মাইনে পান। মেসে থেকে খরচ বাঁচিয়ে দেশে ছোটখাট একটা জমিদারী ক'রে ফেলেচেন। এ হেন একটা লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় থাকতে পারে, এ কথা সহজে বিশ্বাস করতে পারি নি। বললাম, তিনি ত অফিসে নেই।

আমি তাঁর বাড়ীর ঠিকানা চাই।

মুস্কিলে পড়া গেল। তাঁর ঠিকানা আমার কেন, আমাদের ঘরের কারও জানা ছিল না। সে কথা তাঁকে জানিয়ে বললাম, কিন্তু হরিকিশোরবাবু ত বাড়ীতে থাকেন না, ওটা মেস।

—তাই নাকি? তা হ'লে ত আমার পক্ষে ভালই হয়। আচ্ছা, সকালে কোন্ সময়টায় এলে ওঁকে ধরা যায় বলুন ত? ভয় পাবেন না, এমন কিছু মারাত্মক দোষ করেনি আমার কাছে, এমনি একটু দেখা-সাক্ষাৎ করতে চাই।

হরিকিশোরবাবু সাধারণত বেলা তিনটে থেকে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত অফিসে থাকেন। সে কথা তাঁকে জানিয়ে দিলাম। অপরিচিত ভদ্রলোকটি হঠাৎ হো হো ক'রে হেসে উঠে বললেন, এখন তা হ'লে ক্লান্ত হয়ে একেবারে গাধার মতন ঘুমুচ্চে! কি বলুন?

এ সম্বন্ধে সঠিক কোন কথা আমার জানা ছিল না, কাজেই কিছু বলতে পারলাম না। কিন্তু মনে মনে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠলাম। রয়টারের খাম এসে পড়ে রয়েচে। রাত প্রায় দেড়টা হবে।

আমার বিরক্তির ভাবটা তিনি বোধ হয় বুঝতে পারলেন। যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বললেন—আচ্ছা, চললাম ত হ'লে। হরিকিশোরের সঙ্গে যদি দেখা হয়, বলবেন আমি এসেছিলাম। আমার নাম অমর চৌধুরী।

এমন স্মরণীয় নাম নয় যে তা মনে ক'রে রাখতে হবে। কাজেই সেদিন তাঁর চলে যাবার পর নামটা হয়ত ভুলেই গিয়েছিলাম। কেবল বিলিতি খবরের তর্জ্জমার ফাঁকে ফাঁকে হয়ত তাঁর সেই অদ্ভুত চেহারাটা মাঝে মাঝে মনে পড়ে থাকবে। খবরের কাগজের নৈশ-সম্পাদকের সঙ্গে বিশেষ এক শ্রেণীর নারী-জীবনের তুলনা করা চলে। এক-ঘণ্টা আগের কথা একঘণ্টা পরে স্মরণ রাখবার কোন দস্তর নেই। এখুনি হয়ত মস্কোর একটা উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা, তার পরমুহূর্ত্তে হয়ত কইঘাটুরের কাছে নৌকা-ডুবির একটা খবর, আর কিছুক্ষণ পরে বুঝি বা নারীহরণের রোমাঞ্চকর একটা বিবরণ। এদের সকলের প্রতি যথাযোগ্য বিবেচনা এবং খাতির করা চাই। পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দেবার উপায় নেই, যদি বা দিতে হয় তার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য থাকা চাই। রাত্রি বারটা থেকে তিনটে তিরিশ মিনিটের মধ্যে সারা পৃথিবীর স্পন্দন আমাদের অনুভব করতে হয়, আশে পাশে চারিদিকে কেবল রুদ্ধশ্বাস, উর্দ্ধগতি। এর মধ্যে অমর চৌধুরীর দাঁড়াবার জায়গা কোথায়?

অমরবাবুর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। কে জানত যে যথার্থ পটভূমিকায় তিনিও সামান্য থেকে হঠাৎ অসামান্য হয়ে উঠতে পারেন, সুযোগ পেলে তিনি বুঝি প্রতিদিন দেশের ইতিহাসের নব নব অধ্যায়ের উপাদান রচনা করতে পারতেন!

ভুলে যাওয়ার মত অনায়াসসাধ্য কাজ মানুষের জীবনে

খুব অল্পই আছে। অমরবাবুকেও আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আর একদিন তিনি তাঁর অস্তিত্বের পরিচয় দেবার জন্য হঠাৎ অফিসে এসে হাজির হলেন।

হরিকিশোরবাবুও তখন অফিসে ছিলেন। হেলান একটি চেয়ারের উপর মাথাটি ক্লান্ত ভাবে স্থাপন করে তিনি মধ্যাহ্নের মাধুর্য্য যথাসাধ্য উপভোগের চেষ্টা করছিলেন। কি একটা কাজে আমিও সেদিন অসময়ে অফিসে গিয়ে পৌছেছিলাম। হয়ত বিশেষ কোন পলিটিকাল পার্টি সম্বন্ধে আমাদের কি রকম ভাবগতি অবলম্বন করতে হবে বা বিশেষ কোন ব্যক্তিসংক্রান্ত সংবাদের শিরোনামাকে কতটুকু প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন সে সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শ দেবার ছিল। তাঁদের আহ্বানের প্রত্যাশায় যখন নিউজ ডিপার্টমেণ্টে এসে অপেক্ষা করছিলাম, সেই সময় দুঃস্বপ্নের মত অমর চৌধুরীর প্রবেশ।

কোন রকম ভূমিকা নয়, সঙ্কোচ নয়, সোজা এগিয়ে গিয়ে হরিকিশোরবাবুর কাঁধের উপর হাত রেখে অমরবাবু বললেন, কি খবর নম্বর টু, অফিসে এসেও তোমার ঘুম ছাড়ে না দেখচি!

হরিকিশোরবাবু চমকে উঠে বসলেন। মনে হ'ল হঠাৎ যেন তিনি ভূত দেখেচেন। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হয়ে উঠল।

এখানে কি মনে ক'রে?

অমরবাবু তারস্বরে হেসে উঠে বললেন: আদব-কায়দা সব এরি মধ্যে শিখে ফেলেচ দেখচি। আমাকেও এখানে কিছু মনে ক'রে আসতে হবে নাকি?

হরিকিশোরবাবু যেন একটু বিব্রত হয়ে বললেন, তা নয়, তা নয়; কিন্তু হঠাৎ কি জন্যে···

অমরবাবু প্রায় ধমক দিয়ে বলে উঠলেন: আবার সেই এক কথা; আমি যে নিতান্ত অকারণে তোমার কাছে আসতে পারি সে কথা কি আজ একেবারেই মনে করতে পার না?

মনে হ'ল হরিকিশোরবাবু ইতিমধ্যে সামলে নিয়েচেন। মুখখানা যথাসাধ্য প্রফুল্ল করবার চেষ্টা ক'রে তিনি বললেন, খুব পারি। তারপর কি করা হচ্চে এখন?

এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়, যা তুমি তোমার কাগজে ছাপতে পার।

তবু?

আপাতত আলুর চাষ করব বলে খানিকটা জমি নিয়েচি দমদমের কাছাকাছি। ওই সঙ্গে একটা কামারশালা খোলবার সঙ্কল্প রয়েচে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই হবে না, দেখে নিও।

কেন হবে না?

যে কারণে এ পর্য্যন্ত সব কাজ পণ্ড হয়েচে, অর্থাৎ টাকার অভাবে। সেদিন প্রফেসার তরফদারের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তরফদার এখন মেম বিয়ে ক'রে সায়েব বনে গেছে। বাড়ীতে পুরোদস্তর সাহেবী কায়দা। দারওয়ান কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। টাকাকড়ির ব্যাপারে তরফদারের মাথা খুব পরিষ্কার, এ ত তোমরাও জান। এই জন্যেই সেদিন বালীগঞ্জ পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছিলাম। অতি কষ্টে দেখা করবার অনুমতি পাওয়া গেল। চোখ-কান বুঁজে কিছু সাহায্য চেয়ে বসলাম। আদব-কায়দা-দুরস্ত মিঃ তরফদার হাতজোড় ক'রে মাফ চাইলেন। নিজের লেখা কতকগুলো অপাঠ্য বাংলা অর্থনীতি শাস্ত্রের কেতাব হাতে দিয়ে বললেন—'এগুলো পড়ে দেখো ভাল ক'রে। তা হ'লেই পয়সা রোজগারের পথ খুঁজে পাবে।' সেই থেকে পথ খুঁজে বেড়াচ্চি, কিন্তু আজও মিলল না হে!

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অমরবাবুর হো হো ক'রে সেই বিকট হাসি! যেন মস্ত বড় একটা তামাসার ব্যাপার!

ঠিক সেই সময় কর্ত্তাদের ঘর থেকে ডাক পড়ল। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম সেইদিকে।

নৈশ-সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয় ক'রে যখন ফিরে এলাম, তখন অমরবাবু চলে গেছেন। হরিকিশোরবাবু ঠিক সেই ভাবে আরাম-কেদারায় চোখ বুঁজে পড়ে আছেন। মুখের দিকে চাইলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি অনেক কথা ভাবচেন। হয়ত ছেলেবয়সের কথা—যে বয়সে অমর চৌধুরী ছিল তাঁদের দলের হিরো, যে বয়সে জমার খাতায় চুল-চেরা হিসেব রাখবার কোন দরকার ছিল না।

ঘরে ঢুকে তাঁর সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। তিনি চোখ মেলে চাইলেন আমার দিকে। কর্ত্তাদের সদ্যঃপ্রচারিত হুকুমগুলো তাঁকে জানালাম।

তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, অমরবাবু সেদিন রাত্রে আপনাকে খুঁজতে এসেছিলেন। কিন্তু কথাটা একেবারেই মনে ছিল না, তাই আপনাকে খবর দিতে পারিনি।

হরিকিশোরবাবু শুধু বললেন: ভালোই করেছ, ওকে দেখলে আমার ভয় লেগে যায়।

কেন বলুন ত ?

জীবনে কখনও compromise করতে শিখল না। ভারি একরোখা।

কৌতূহলী হয়ে হরিকিশোরের মুখের দিকে তাকালাম। তিনি বলতে লাগলেন: অমরের নিজস্ব একটি দল ছিল এবং এখনও আছে। দলটির উপর পুলিসের সুনজর নেই, তার সম্বন্ধে ত নয়ই। একসময় বাংলাদেশের বিপ্লবী ছেলেমেয়েরা এক ডাকে অমর চৌধুরীকে চিনত। অনেক দিনের কথা সে সব। খাঁটি বোমাওয়ালা বলে তখন তার নামডাক। অমরের কথা শুনেই হয়ত বুঝতে পেরেচ যে, এক সময়ে তোমাদের এই নিরীহ বার্ত্তা-সম্পাদকটিও…'

বললাম, আপনি বোধ হয় 'নম্বর টু' নামে পরিচিত ছিলেন ?

হরিকিশোরবাবু হাসবার চেষ্টা করলেন। বললে হয়ত বিশ্বাস করবেন না, তাঁর চোখ দুটোও একবার অস্বাভাবিক দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। একটু থেমে তিনি বলতে লাগলেন: বিজ্ঞানচর্চ্চা সম্বন্ধে অমরের ছেলেবেলা থেকে অসম্ভব আসক্তি ছিল। পুলিস জানত তার বিজ্ঞানচর্চ্চার গভীরতর উদ্দেশ্য আছে। অমর একটা টুরিং বায়স্কোপ খুলেছিল, তখনও 'সিনেমা' কথাটার প্রচলন হয়নি। পথের ধারে তাঁবু খাটিয়ে ছবি দেখান হ'ত—তাতেই পয়সা পাওয়া যেত রাশি রাশি। সেই পয়সা সঞ্চয় ক'রে অমর আর তার বন্ধু যতীন একদিন পাড়ি দিলে আমেরিকায়। যতীন এখনও আমেরিকাতেই আছে, চিঠিপত্র লেখে মধ্যে মধ্যে। ও দেশেরই একটি মেয়েকে অর্দ্ধেক রাজত্ব সমেত বিয়ে করে দিব্যি ঘরসংসার করচে। কিন্তু অমরটা বরাবরই পাগল। দিনকতক পরেই ও দেশে ফিরে এল। নানারকম বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্ট, দেশকে স্বাধীন করবার জন্য নানা আয়োজন, পুলিস একদিন ওকে গ্রেপ্তার করলে। তারপর আন্দামানে। আজ ওর দলের অনেকে খবরের কাগজ এবং কর্পোরেশনের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে দু-তিনখানা করে বাড়ী হাঁকিয়েচে, কেউ-বা সরকারী দপ্তরখানায় যাতায়াত করে বিপ্লবপন্থীদের কুৎসা প্রচার ক'রে জীবিকা অর্জ্জনের ব্যবস্থা করে নিয়েচে। এমন কি, আমিও খবরের কাগজে উত্তেজনাপূর্ণ হেড্ লাইন সাজিয়েই দেশের সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য প্রায় নিঃশেষ ক'রে ফেলেছি। কিন্তু অমরটা ঠিক সেই রকম রয়ে গেল। স্বপ্নের ভূত আজও ওর মাথা থেকে নামল না।

কুণ্ঠিতভাবে বললাম, আদর্শের প্রতি এই যে গভীর নিষ্ঠা, এটাকে কি আপনি প্রশংসার যোগ্য মনে করেন না ?

হরিকিশোরবাবু বললেন, কিন্তু জীবনের প্র্যাক্‌টিকাল সাইডটা ? দেশকে ভাল আমরাও বেসেছিলাম, হয়ত আজও বাসি। কিন্তু তাই বলে, একেবারে উন্মাদ হয়ে যাওয়াটাই হয়ত চরম আদর্শ নয়।

ভয়ে ভয়ে বললাম, তা হয় ত নয়। কিন্তু দেশে প্র্যাকটিকাল লোকের সংখ্যা কি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে আপনার মনে হয় না ? থাকলই বা দু-একজন বে-হিসেবী, বাউণ্ডুলে…

—এটা নিছক সেন্টিমেন্টের কথা। ওর জীবনের আর একটা দিক যে একেবারে ফুরিয়ে শূন্য হয়ে গেল, সেকথা কি কেউ ভাববে না ?

'হয় ত তার দায়িত্ব একা অমরবাবুর নয়।' ব'লে ওঠবার চেষ্টা করেছিলাম। হরিবাবু সংক্ষেপে বললেন, ব'স।

আবার চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসতে হ'ল। হরিকিশোরবাবু চোখ বুঁজে কি ভাবতে সুরু ক'রে দিয়েচেন। কয়েক মিনিট চুপচাপ তাঁর সামনে বসে থাকতে হ'ল। তারপর তিনি ঠিক তেমনি ভাবেই বসে থাকতে থাকতে বললেন, আচ্ছা এস, তোমারও ত আবার ডিউটির সময় হয়ে আসচে।

বুঝতে পারলাম, অনেক কথা তাঁর বলবার ছিল, কিন্তু তিনি বলতে পারবেন না। উঠে পড়লাম।

তখনও ঘর ছেড়ে যাইনি। পিছন থেকে হরিকিশোরবাবু বললেন—যেন অনেক দূর থেকে তাঁর কণ্ঠ শোনা গেল, অমরকে আমি শ্রদ্ধা করি সুপ্রকাশ। কিন্তু ওকে দেখলে আমার ভয় হয়। মনে হয়, আবার বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

কোন কথা বলবার প্রয়োজন মনে করিনি। নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম।

আবার অনেক দিন কেটে গেল। অমরবাবুর কথা কয়েক দিন মনে মনে ভেবেছিলাম, তারপর ধীরে ধীরে আবার তাঁর স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে এসেছিল। জীবনে বিস্মৃতি এত অনায়াসলভ্য বলেই না মানুষ প্রতিদিনের ব্যর্থতা, নৈরাশ্য এবং ক্ষতি সত্বেও সহজভাবে বেঁচে থাকতে পারে!

এরপর আর একদিন অমর চৌধুরীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তখন সবেমাত্র ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করেচে। অফিসে কাজের ভিড়। হাতে-হাতিয়ারে লড়াই বাংলা দেশের ক'জন আর দেখেচে, কিন্তু বাংলা দেশের খবরের কাগজের শিরোনামায় হাবসীদের সঙ্গে ইটালীয়ানদের লড়াইয়ের বিবরণ যেরকম চমকপ্রদ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছিল, তাতে একথা বিশ্বাস না ক'রে উপায় ছিল না যে পৃথিবীর সংবাদপত্রগুলির মধ্যে একমাত্র আমরাই এ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সংবাদ রাখি। হাবসীদের বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যকে প্রাধান্য দিয়ে কাগজে কলমে আমরা ইটালীকে প্রায়-বিপর্য্যস্ত করে ফেলেছিলাম।

এমন সময় একদিন অমরবাবুর আবির্ভাব।

রাত গভীর হয়নি। অমরবাবুকে বসতে বললাম।

কেমন আছেন, কি দরকার বলুন ত?

অমরবাবু খানিক অন্যমনস্কের মত বসে রইলেন। তারপর বললেন, আজ আমার মেয়ের বিয়ে। মেয়ের বিবাহের সঙ্গে এমন অসময়ে তাঁর অফিসে আসবার কি কারণ থাকতে পারে তা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু আপনি—?

অমরবাবু বললেন, হ্যাঁ, একটু আশ্চর্য্য হবার কথা বই কি। মেয়ের বিয়ে হচ্চে দেশে, অথচ আমি বসে রইচি খাস কলকাতায়।

আপনি যান নি তা হ'লে?

একজন লোক একই সময়ে দু জায়গায় থাকতে পারে না, এত ন্যায়শাস্ত্রের গোড়ার কথা। কাজেই আমি যাব কি ক'রে?

অমরবাবু হাসবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে হাসি আমার ভাল লাগল না। বললাম, এখন কি চান তাই বলুন।

অমরবাবু বললেন, একটু অনুগ্রহ করতে হবে আপনাকে।

তিনি যে এত রাত্রিতে আমার কাছে অর্থ সাহায্যের প্রত্যাশা ক'রে এসেচেন এমন কথা মনে করবার কোন কারণ ছিল না। কাজেই বলতে পারলাম, বেশ ত, বলুন।

অমরবাবু বললেন, মেয়েটার বিয়ের খবর আপনার কাগজে ছেপে দিতে হবে। বলেই পকেট থেকে তিনি ভাঁজ করা একটুকরো কাগজ বার করলেন। চিঠি একখানা। তাতে পাত্রের নাম, ধাম, পরিচয় সবই ছিল। মেয়ের নামটা তিনি মুখে জানিয়ে দিয়ে বললেন, এইবার গুছিয়ে খবরটা লিখে ফেলুন দেখি।

কিন্তু খবরটা গুছিয়ে লিখে ফেলবার মত মনের অবস্থা তখন আমার নয়। এক দৃষ্টিতে আমি কতক্ষণ অমরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। ব্যস্ত হয়ে তিনি তখন রং-চটা কৌটো থেকে বিড়ি বার করবার চেষ্টায় ছিলেন।

বললাম, বাড়ী গেলেন না কেন আপনি?

অমরবাবু পরম প্রশান্তির সঙ্গে বিড়িটিতে অগ্নি-সংযোগ ক'রে বললেন: অভ্যাস নেই বলে।

কথাটা ঠিক বুঝতে পারলুম না অমরবাবু।

সহজে বোঝবার মত নয়ও। দেশে থাকতেই ওরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল; তারপর আর যাবার সময় ক'রে উঠতে পারলাম কই।

গভীর বিস্ময়ে কথা বলা দুষ্কর হয়ে উঠল। এই ক'দিনে মনের মধ্যে তাঁর জন্য কোথায় যেন শ্রদ্ধার আসন পাতা হয়েছিল, মনে হ'ল নিতান্তই ভুল করেছি। বললাম, কর্ত্তব্যবোধ ব'লে কোন জিনিষই কি আপনার নেই?

অমরবাবু তেমনই ক'রে সশব্দে হেসে উঠলেন। বললেন, কর্ত্তব্যের চেহারা সব সময় হয়ত এক নয় ভায়া। আন্দামান থেকে ফিরে এসে আমি শহরের রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করেছি; খবরের কাগজে প্রবন্ধ পাঠিয়েছি, অধিকাংশই ফিরে এসেচে, যারা ছেপেছে তারাও দুটোর বেশী টাকা দেওয়া দরকার মনে করেনি। আঠারো বছরের চেষ্টার পর এতখানি আর্থিক সম্বল নিয়ে দেশে ফিরে যাবার মত কর্ত্তব্যবোধ আমার সত্যিই ছিল না। কারণ,

ছেলেমেয়েগুলো চোখের সামনে না খেয়ে বা আধপেটা খেয়ে মরবে, এ দৃশ্য দেখবার মত মনের জোর আমার কোন দিনই নেই। আন্দামান থেকে হঠাৎ ছাড়া পেয়েও আমি তাই বাড়ীতে কোন খবর দেওয়া দরকার মনে করিনি। এতদিন পরে কোথা থেকে, কি ক'রে যে তারা আমার ঠিকানা জোগাড় করলে সেইটেই এখনও বুঝতে পারলাম না।

অমরবাবুর দিকে মুখ তুলে চাইতে পারছিলাম না। তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামগুলো বাছবার ভাণ করতে করতে বললাম, তবু যাওয়া আপনার উচিত ছিল।

অমরবাবু হেসে উঠে বললেন, হ্যাঁ, নেমন্তন্ন খেতে! কি বলেন?

ঠিক তা নয়···

ঠিক তাই। উপরি লাভের মধ্যে বিয়েটা ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনাও থাকত। কিন্তু ও তর্ক থাক ভাই। তুমি খবরটা ছেপে দেবে কি-না বলো!

নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু এতে লাভ কি?

কিছুই না। যারা পড়বে তারা ভাববে, সমারোহের সঙ্গে তোমাদের দেশের একজন রাজনীতিক কর্ম্মীর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। তা ছাড়া··ছেলেপুলেগুলোর চোখে পড়লে তারাও হয় ত একটু খুশী হবে, ভাববে যে অমর চৌধুরীর পাগল হয়ে যাওয়ার খবরটা বুঝি খাঁটি সত্যি নয়।

অমরবাবু আর অপেক্ষা করলেন না। তাঁর সেই বিরাট কাগজের তাড়া, ছেঁড়া ছাতা, রংচটা সিগারেটের টিন্··· কোনমতে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সেদিন রাত্রিতে খবর পাওয়া গেল—হাবসীদের রাজা নেগাস হঠাৎ আবিসিনিয়া ছেড়ে পালিয়েছেন। কাগজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জায়গায় সাত কলমব্যাপী শিরোনামা দিয়ে সে খবর আমাদের ছাপতে হয়েছিল। সেই কাগজেরই একপ্রান্তে শুভবিবাহের শিরোনামা দিয়ে অমরবাবুর মেয়ের বিয়ের খবর আমি ছেপে দিয়েছিলাম। পরের দিন কলকাতা শহরের নামকরা খবরের কাগজগুলির সম্পাদকরা নেগাসের সেই আকস্মিক পলায়নের কথা উল্লেখ ক'রে বিস্তর খেদ প্রকাশ করেছিলেন এবং হাবসীদের অদ্ভুত বীরত্ব ও সাহসের কথাও প্রসঙ্গক্রমে আর একবার উল্লেখ করতে ভোলেন নি। অমরবাবুর মেয়ের খবরটা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, করবার কথাও নয়। আমি শুধু মনে মনে ভাববার চেষ্টা করেছিলাম, নেগাসের পলায়ন আর মেয়ের বিবাহ-বাসরে অমর চৌধুরীর অনুপস্থিতির মধ্যে কোন্‌টা বেশী শোচনীয়?

সাধারণ মানুষকে এ ধরণের প্রশ্ন করলে তাদের বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক। আপনি কি বলেন?

সেই ছোট গ্রামখানি

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্‌-এ

সেই ছোট গ্রামখানি—
কি যে মায়া দিয়া বেঁধেছে এ হিয়া
আমি তাহা নাহি জানি!
হেথা প্রবাসের কর্ম্ম-পাথার
যেন একটানা—নাহি শেষ তার—
তবু তার পারে দাঁড়াইয়া সে যে
দেয় মোরে হাতছানি।

সেথা এক গৃহমাঝে
আজি সন্ধ্যার সান্দ্রতিমিরে
মঙ্গলশাঁখ বাজে।
সেই ধ্বনি যেন আজি বার বার
বাজিছে আমার মর্ম্ম-মাঝার;—
স্মৃতির সুরভি আজিকে আমায়
উন্মনা করে কাজে।

আজিকে শিশির-শেষে
সে গাঁয়ে এসেছে নব বসন্ত
নব নাগরের বেশে।
নিলীনভৃঙ্গপলাশে তাহার
উত্তরী ওঠে ঝলি বার বার,
ধরণী তাহারে আদর করিয়া
বরণ করিছে হেসে।

আহা এই পরবাসে—
আজি সে গাঁয়ের কুসুম-গন্ধ
যেন হেথা ভেসে আসে!
একটি চাহনি ঘোম্‌টার তলে
সেথা গৃহে মোর দিবারাতি জ্বলে,
সেই চাওয়া—সেই মধুর চাহনি
আজি চারিধারে ভাসে!

মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের অষ্টমবার্ষিক প্রদর্শনী

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন যুগে গুহার ভিতর ছবি আঁকিয়া যাঁহারা জীবন সার্থক করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী ও সাধনার প্রেরণার সহিত আধুনিক শিল্পীর বিশেষ মিল নাই। এ যুগের শিল্পীরা অধিকাংশ স্থলেই পেশাদার অর্থাৎ ছবি বিক্রী না হইলে আহারের সংস্থান হয় না।

ফিরি করিয়া ছবি বিক্রী করিতে হইলে জুতার তলা এমন মজবুৎ হওয়া দরকার যাহা নিশ্চিন্তভাবে বৎসর খানেক

অভিজ্ঞ শিল্পীরা বলেন—ছবি বিক্রীর প্রস্তাব করিলেই নিষ্ঠাবান্ মিতব্যয়ীরা এমন অস্বাভাবিক ভাবে দরদী হইয়া ওঠেন যে তখনকার মত পেট অপেক্ষা পিঠ বাঁচানোর দরকার হয় বেশী করিয়া। উক্ত অবস্থায় খড়ম পরিয়া দ্রুত সরিয়া পড়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

ছবি আঁকার সহিত তিরস্কার ও লগুড়ের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ

কুঁড়েঘর — শিল্পী—শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

ব্যবহার করা চলে। অথচ এই জাতীয় পাদুকার মূল্য সকল শিল্পীর পক্ষে সংগ্রহ করা সহজ নয়। সস্তায় বেহারী নাগ্‌রা পাওয়া যায়, যাহার আয়ু স্বত্বাধিকারীর বয়স ছাপাইয়া উঠিতে পারে; কিন্তু তাহা পরিবে কে? যথেষ্ট তৈল মর্দ্দন করিয়া জুতাকে বাগ মানাইতে যে সময় ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন হয়, তাহা শিল্পীদের নাই। শেষ অবলম্বন খড়ম। কিন্তু খড়ম পরিয়া চোঁচা দৌড়-মারিবার উপায় নাই।

থাকিলেও অনেকেই শেষোক্ত দুইটির ব্যবহার পছন্দ করেন না। অগত্যা বাধ্য হইয়া কোনও প্রদর্শনীর আশ্রয় লইতে হয়। ইহাতে চালাক শিল্পীর মাথা ও পিঠ উভয়ই বাঁচে এবং মার্জ্জারের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িলে পেটেরও যৎসামান্য ব্যবস্থা হয়।

প্রদর্শনীর একটি উদ্দেশ্য ছবির স্রষ্টা ও ক্রেতার মিলন। অপর উদ্দেশ্য সুন্দরের পূজা এবং তাহার প্রচার। সুন্দরকে

হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া দর্শকের দল ছবি দেখিতে আসিলে শিল্পী বেচারা নিজেকে অন্তত মানুষ ভাবিবার অবকাশ পাইত, কিন্তু সত্যকে স্বীকার করিতে হইলে বলিব, এই জাতীয় অনুষ্ঠানে অনেকের রসবোধ অপেক্ষা রূপার ঔদ্ধত্য সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে।

প্রদর্শনীর পৃষ্ঠপোষকেরা সাধারণত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ভিতর হইতে নির্ব্বাচিত হন। পরস্পর পরস্পরকে প্রশংসা করিবার পক্ষে ইহা একটি সঙ্গম স্থল। তাস, দাবা ইত্যাদির মত ছবির প্রদর্শনীও একটি amusing diversion. ছবি যখন শিল্পীর কাল্পনিক রূপের অর্ঘ্য লইয়া অপেক্ষা করিতেছে—নির্ব্বাক ভাষার দ্বারা সুখ দুঃখের কাহিনী বলিতেছে তখন দর্শকের দল How do you do হইতে আরম্ভ করিয়া চেরাপুঞ্জীর বৃষ্টি পতনের রেকর্ড স্মৃতি হইতে উদ্গীরণ করিতে ব্যস্ত।

লগুড়ের সম্বন্ধ যেমন শিল্পীর সহিত অবিচ্ছেদ্য, তেমনি ওয়েদার রিপোর্ট আবৃত্তি, বিশেষ করিয়া মার্জ্জিত সমাজে মেলা-মেশার পক্ষে অবর্জ্জনীয়। কথোপকথনের গোড়ায় কিংবা শেষের দিকে মেঘলা আকাশ অথবা দারুণ গ্রীষ্মের

ধ্বংসের দেবতা ভাস্কর—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধরী
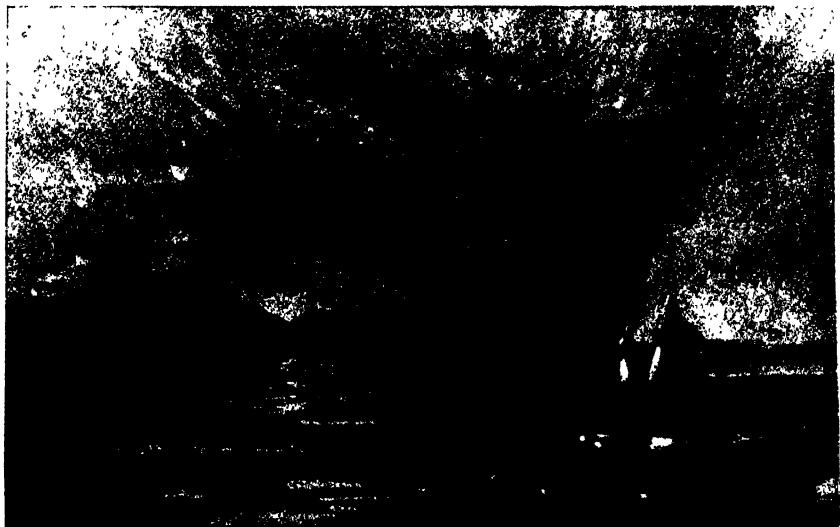
আকাশ ও মৃত্তিকা শিল্পী—শ্রীকে-সি-এস্ পানিকর

উল্লেখ না করিলে শিক্ষা ও রুচি সন্দেহজনক হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় জাতিচ্যুতি হইতে বাঁচিতে হইলে কাল্‌চারের ফ্যাশান না মানিয়া উপায় নাই। ভুল সংশোধনের দণ্ড-স্বরূপ যাহা কিছু একটা কিনিয়া ফেলিতে হয়। ফলে ক্রেতার নাম অপর দ্রব্যের সহিত অবশ্য দ্রষ্টব্য বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। স্বল্পায়াসে স্বনামধন্য হইবার পক্ষে ইহা অপূর্ব্ব সুযোগ।

তাহা হইলে কৃপান্বিত হওয়া অপেক্ষা কৃতজ্ঞ হইবার চেষ্টা আগে আসিত।

…প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়া এই সব কথাই মনে আসিতেছিল। আরও ভাবিতেছিলাম, যতদিন পর্য্যন্ত দেশ তাহার শিল্পীদের একান্ত আপনার করিয়া না লইতেছে, উপযুক্ত শিল্পীর কাজকে দেশের সম্পদ না ভাবিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত এই সব প্রদর্শনী কেবল হুজুগের ফ্যাশান্ হইয়া থাকিবে, যাহা প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য নহে।

ষ্টাডি শিল্পী—মিস কমলা পুদ্রভেল

ধ্বংসের দেবতা ভাস্কর—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

উক্ত আচার হইতে প্রমাণ হইবে, আমাদের দেশে শিল্পী এখনও সাধারণের নিকট হইতে কতদূরে সরিয়া আছে। সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রতি আন্তরিক টান থাকিলে কবি এবং শিল্পীকে অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। সাধারণ আসলে মূক। তাঁহাদের উচ্ছ্বাস থাকিলেও প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। সাধারণ যদি জানিত,'জাতির অন্তরের বাণী শুনিতে হইলে কবি এবং শিল্পীর উপর নির্ভর করিতে হয়,

মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে প্রতিবৎসরের মত এবারও শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাজ লইয়া প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণ অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবী-প্রসাদ রায়চৌধুরী (এম্. বি. ই) মহাশয়ের মিহি এবং তেজিয়ান কাজ। এ বৎসর তিনি দুইটি মূর্ত্তি এবং বারোটি ছবি দিয়াছেন। ছবি ও মূর্ত্তির সংখ্যা ও বিরাটাকার দেখিয়া বুঝা যায় তাঁহার কর্ম্মশক্তি অদম্যনীয়।

অশোকের সভা শিল্পী—শ্রীধনপাল

শিল্পীকে কাজের নেশা যখন ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে তখন তাঁহার ক্লান্ত হইবার অবকাশ থাকে না। দেবীপ্রসাদ মার্জ্জিত পাগলদের মধ্যে এক জন। এই ধরণের আরও দু-একটি পাগল দেশে থাকিলে দেশের উপকার হইত। দেবীপ্রসাদ স্বনামধন্য শিল্পী। তাঁহার কাজ সাধারণের নিকট নূতন করিয়া পরিচিত করাইবার প্রয়োজন বোধ করি না।

তাঁহার দেয়াল অতিক্রম করিলে, পরিতোষ সেন এবং সৈয়দ্ আহ্মেদের রসানুরাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাকৃতিক দৃশ্যে পরিতোষ সেনের জাপানী প্রথার আভাষ থাকিলেও

বকধার্ম্মিক শিল্পী—শ্রীপরিতোষ সেন

প্রকাশ-কৌশল নিজস্ব বলা যায়। সামান্য একটি বক ভুট্টাগাছের তলায় দাঁড়াইয়া জলের দিকে তাকাইয়া আছে, যদি কোনও ছোট মাছ খেই মারে। বকধার্ম্মিক বস্তুটি কি এই ছবিটি দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। যেখানে যতটুকু toning দরকার, মাত্র ততটুকু দিয়াই শিল্পী তুলি থামাইয়াছেন। ইহা সংযমের পরিচয় দেয়। শিল্পীর ভবিষ্যৎ উন্নতি কামনা করি। সৈয়দ্ আহ্মেদের "বীণা বাদিনী" ছবিতে অজন্তাকে বেপরোয়াভাবে আধুনিক নারীর গঠনে অপূর্ব্ব কমনীয়তা ছবির রাজ্যে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। রেখা ও হাল্কা আলো-ছায়ার ব্যবহার শিল্পীকে ওস্তাদ্ কারিগর প্রমাণ করে। ডি. ভেঙ্কট নারায়ণ রাও দুইটি ছবি দিয়াছেন। একটি "বাসন্তিকা", অপরটি "সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবার।" "বাসন্তিকা" ছবিটিতে অধ্যক্ষের রংএর সামঞ্জস্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। ইহা স্বাভাবিক। তথাপি আশা করি, ভবিষ্যতে নিজের বৈশিষ্ট্য ছবিতে আরও বেশী করিয়া ফুটাইবার চেষ্টা

প্রতিবেশিনী শিল্পী—শ্রীসৈয়দ আহ্মেদ

বাসন্তিকা শিল্পী—শ্রীভেঙ্কট নারায়ণ রাও

করিবার ক্ষমতা সুস্পষ্ট। ছবির পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী গোলমেলে আবর্জ্জনার দ্বারা পূরণ হয় নাই। শিল্পী জানিতেন, তাঁহার বক্তব্য কি এবং তাহা তিনি নিঃসংকোচে প্রকাশও করিয়াছেন। ইঁহার অপর আর একটি ছবি, "প্রতিবেশিনী।" —শিল্পীকে ভাগ্যবান্ বলিতে হইবে, কারণ তিনি পাশের বাড়ীর ভাড়াটে। বিষয়বস্তু, একটি পূর্ণ যুবতী। হয়তো তাহার প্রেমিকের আশায় দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে।

করিবেন। বাসন্তিকার compositlon-এ rythm-ই শিল্পীকে বেশী করিয়া অভিভূত করিয়াছে। ছবির সর্ব্বত্র রোমান্স ঘিরিয়া আছে। রং আরও তাজা হইলে ভাল হইত। ঘষা-মাজায় কিঞ্চিৎ মেটে ভাব ধারণ করিয়াছে।

দেশী প্রথায় অঙ্কিত ছোট ছবির মধ্যে সুশীলকুমার মুখার্জ্জি, রাজম্, পানিকর, শ্রীমতী আইরিশ্ খাঁ, শ্রীমতী কমলা ও শর্ম্মার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুশীল মুখার্জ্জির

"কবি" ছবিটির বর্ণসমাবেশ স্নিগ্ধ ও নয়নানন্দকর। ছবিটি শিল্পীর ভাবুক মনের পরিচয় দেয়। পরিকল্পনায় নতুনত্ব আছে।

পাশ্চাত্য চিত্রকলা বিভাগে কে, সি, এস, পাণিকর, পল্‌রাজ এবং জ্ঞানায়ুথম্‌ ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাজ করিয়াছেন। পাণিকর এবং পল্‌রাজের কাজে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য আছে। পাণিকরের "আকাশ ও মৃত্তিকা" ছবির পরিকল্পনা ও প্রকাশ অপূর্ব্ব। রং এবং রচনার সুষমামণ্ডিত হইয়া ছবিটি সজীব হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা, কে-শ্রীনিবাসম্‌, ধনপাল, মানি, শচীন মুখার্জ্জি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

...সর্ব্বশেষে অধ্যক্ষ মহাশয়ের "ধ্বংসের দেবতা" মূর্ত্তিটির সম্বন্ধে কিছু না বলিলে আমার প্রদর্শনী সম্বন্ধে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রদশনী-গৃহে প্রবেশ করিলে সর্ব্বপ্রথম এই মূর্ত্তিটিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মূর্ত্তির পরিকল্পনা অভিনব—অভূতপূর্ব্ব!... যেন এক বিরাট পাহাড় অনাদি অতীত হইতে কালের প্রচণ্ড ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রুদ্র দেবতা অর্দ্ধ নিমিলিত চক্ষে তাকাইয়া আছেন। ধ্বংসের প্রতীক,—যোগী মহেশ্বর। তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে বক্র অবজ্ঞার হাসি।... ক্ষণজীবী মনুষ্যের বাঁচিবার ব্যর্থ চেষ্টা দেখিয়া রুদ্র দেবতা হাসিতেছেন। উন্নত ললাটের মধ্যস্থলে জ্ঞানচক্ষু। যেন ভূমিকম্পের প্রচণ্ড আলোড়নে মেদিনী ফাটিয়া অতল ফাটলের সৃষ্টি হইয়াছে। দুই অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষের গভীরতার কাছে মহাসাগরের গভীরতাও তুচ্ছ। চক্ষুতে কি অদ্ভুত সম্মোহনী শক্তি। বেশীক্ষণ তাকাইয়া থাকা যায় না। আপনা হইতেই চক্ষু নত হইয়া আসে। চক্ষুর দৃষ্টি সুদূর অনন্তের দিকে। বিরাট এক অজগর "নীলকণ্ঠের"র কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আছে। যে অজগরের দেহের চাপে বিরাট হস্তীর অস্থি পর্য্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়, শক্তির প্রতীক্‌ "ধ্বংসের দেবতা" তাহাকে অবহেলায় কণ্ঠে স্থান দিয়াছেন।

...আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্য্যে এই মূর্ত্তিটি দেবীপ্রসাদের এক বিরাট দান। ইহা ভারতের জাতীয় শিল্পভাণ্ডারে একটি অমূল্য সম্পদ হইয়া থাকিবে। এই মূর্ত্তির টেক্‌নিক্‌ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি; কেন না, ইহার টেক্‌নিক্‌ এত উচ্চাঙ্গের যে ভারতীয় অন্য কোনও ভাস্করের পক্ষে তাহা কল্পনারও অতীত।

সকলের শেষে বলি, "ধ্বংসের দেবতা" স্রষ্টা ভাস্কর দেবীপ্রসাদকে নমস্কার।

জয়দেব

শ্রীভোলানাথ সেনগুপ্ত

গোপবালকসহ নৃত্যতি কৌতুকে নন্দহৃদয়পুরানন্দ,
সনূপুরশিঞ্জন চরণকমল চল বন্দী করিল তব ছন্দ;
সখিজনখেলন-উৎসবনিমগন ত্রস্তচকিতবনচারী
ত্বরিত কৃতাঞ্জলি যাচে পদমোচন ভবভয়বন্ধনহারী!
একে করবন্ধন না সহে অলজ্জন ব্রজগৃহনবনীত চোর—
মিনতিকাতরদরবিগলিতলোচন হেরি তব হৃদয় বিভোর।

*　*　*　*

রাসসুরতশতবহুদিনবঞ্চিতবিচলিতচিতবনমালী
রভসা সমাগত ধীরসমীর যথা পরশে যামুনতটবালি;
কলকলকল্লোল না চলে যমুনাজল না গাহে বিহগ তথা কুঞ্জে,
কেলিকদম্বতল নিপতিত পুষ্পে না বসে ভ্রমর গাহি পুঞ্জে,
বিষাদিত-অন্তর গমননিরন্তর উপজি অজয় নদতীরে;
লবঙ্গলতাকৃত তব পরিকল্পিত প্রবেশিলা কুঞ্জকুটীরে।

*　*　*　*

কুঞ্জভবনতলগমনবিলম্বনে পরমকুপিতা গোপনারী—
মদনগরলভরবিষমবিড়ম্বিত গোপীজনজীবনবিহারী;
করি বহুবেদনবচনবিমোচন চরণকমলকৃতদাস
ধরি পদপল্লব মানবিভঞ্জনে জনমিল চিতে অভিলাষ;
লোককলুষভয় বিমলিন মানস জনমতবাদবিশঙ্কী,
স্বকরকমলে তব কলম কলঙ্কিয় ভকতেরে করিলা কলঙ্কী।

*　*　*　*

দশরূপে বন্দিয়া জগজনবন্দনে ভবভীতি করিলে বিনাশ,
নিন্দিয়া নবরূপে নীলমোহনরূপ কবিজন-হৃদয়বিলাস;
কভু ঘননর্ত্তনগমনপরায়ণ গোপবালকবৃন্দে ভাসে,
পুন শতচুম্বনদৃঢ়পরিরম্ভনে নিষ্কামকাম পরকাশে;
এক ভকতি করে বন্ধন মাধবে ভক্তহৃদয়কারাগেহে,
কত রূপে মাধব বন্দী হইল তব প্রেমভকতিকামস্নেহে?

অনুকর্ষ

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

১৩

পশ্চিমের একটি সহরে প্রায় গরম আসিয়া গেলেও বসন্তের শেষরেশ তখনো প্রভাত ও সন্ধ্যাকালে আপনার অস্তিত্ব সময়ে সময়ে সহরবাসীকে জানাইয়া দিতেছিল। চারিদিকে পুষ্পোদ্যানবেষ্টিত একটি সুসজ্জিত অট্টালিকার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আধুনিক বেশে সজ্জিতা সুন্দরী দুইটী নারী। একটি তরুণী, আর একটিকে প্রৌঢ় যৌবনা বলিলেও চলে, কেননা মধ্যবয়সের তখনো তাঁহার অনেক দেরী আছে; কিন্তু তথাপি তিনি যেরূপ গম্ভীর মুখে স্নেহের সহিত তরুণীটির মুখে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন তাহাতে তাঁহাকে নিজের বয়সের অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্না এবং তরুণীটির মাতৃপদবাচ্যা বা অভিভাবিকার মতই দেখাইতেছিল। তিনি তরুণীটির অসংযত বন্ধনভ্রষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশগুলি (এখানে বলা উচিত তখনো 'বব্' করা চুলের চলন এদেশে আসে নাই) ললাটের উপর হইতে সরাইয়া দিতে দিতে বলিতেছিলেন "একজামিন শেষ হয়ে গেছে, ভাল লিখেছ জান্‌তে পেরেছ, বাড়ী এসেছ, তবু মুখ ভার? হ'ল কি—হ্যাঁ রে লতু?"

ললিতা অথবা লতিকাই বোধহয় তরুণীর নাম—সে প্রশ্নকর্ত্রীর হস্তের স্পর্শ হইতে মুখখানা অন্যদিকে সরাইয়া 'কিছু না' বলার সঙ্গে সঙ্গে এমনি জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিল যে বয়োধিকা নারী দ্বিগুণ আগ্রহে তাহার নিকটস্থ হইয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। "হ্যাঁ রে, বি-এ একজামিন হ'য়ে গেলে বাঁচি—এই ক'টা দিন পরে তোমার কোলে সোয়াস্তি হ'য়ে ঘুমুব—এসব কথা দুদিনেই শেষ হয়ে গেল? মিলা, লীলা, শীলা—কি যে সব বন্ধুদের নাম তোর্—তাদের জন্য বুঝি এরি মধ্যেই মন কেমন কর্‌ছে?"

"কি বক' কাকিমা কতকগুলো—ভাল লাগে না বাপু।"

"আচ্ছা এইবার ঠিক্ বল্‌ছি—বেড়াতে বেরুবার জন্যে—না?"

"কোথায় বেড়াতে বেরুব? এই সব পার্কে—না শুখনো হাড় বের্ করা নদীর ধারে, খোলা খাপ্‌রার টিপির মধ্যে?"

"আহা তাই কি বল্‌ছি! যে দেশে বড় বড় নদী ঝর্‌ণা, ভাল ভাল বাগান, মস্ত মস্ত পাহাড় আছে—সেই সব দেশে?"

তরুণী ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া এবার ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাসকে একেবারে যেন অন্তরের ভিতর হইতে বাহিরে আনিয়া মৃদুস্বরে বলিল "বেড়াবার নামেই প্রাণ কেমন করে ওঠে কাকিমা। 'দাদু' গিয়ে বেড়াবার মধ্যে যে একটা সুখ তা চলে গিয়েছে। তুমি বেড়াতে ভালবাস, তোমাদের সঙ্গে যাই বটে কিন্তু ঠিক্ ভাল লাগে না কিছুই! সব সময়তেই মনের মধ্যে কি যেন বিশ্রী—"

কাকিমা তাহার এই বিষাদময় ভাবকে সরাইয়া দিবার জন্য মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন "ওরে আমার পাকা বুড়ি! আমি বেড়াতে ভালবাসি তাই আমাদের সঙ্গে অগত্যা উনি যান্! "কাকা, নেপাল চল"—ব'লে ধুম তুলেছিল সেবার কে? দক্ষিণে আরবার পূজোর বন্ধে কে হায়রাণ ক'রে মেরেছিল আমাকে? বাপ্‌রে বাপ্, যতগুলো ষ্টেশন সবগুলোতেই—ও কাকিমা, ও কাকা, এটায় খুব ভাল ভাল মন্দির আর দেখ্‌বার জিনিষ আছে—কত যে গোপুরম্ দেখ্‌বে"—এই ক'রে ক'রে নেমে নেমে মেরে ফেলা হয়েছে আমাদের, আবার এখন বলা হ'চ্চে তোমাদের জন্যই যাই?"

কাকিমার এই দোষারোপেও তরণীর ভাবান্তর হইল না; একই ভাবে সে উত্তর করিল "হ্যাঁ, আনন্দ পাব বলে যাই—কিন্তু গিয়ে দেখি তেমন হয় না, যেমন সেই দাদুর সঙ্গে ছোটবেলায় বেড়িয়ে সুখ পেতাম! সেই লোভে যাই কিন্তু ফল উল্টো হয়"—কাকিমা তখনো হাল্ ছাড়িলেন না। "হ্যাঁ সে তো বড্ড ছোটবেলায়! সেইত ম্যাট্রিক্ দেবার পর তাঁর সঙ্গে রাজপুতানার ওদিক্ গিয়েছিলি! ছোটবেলায় তোমাকে তোমার কাকা কবে পাহাড় পর্ব্বতে বনে জঙ্গলে

বেড়াতে দিয়েছেন? অসুখ করবে বলে তিনি ভয়েই অস্থির হতেন"।

"সেই ম্যাট্রিক দেওয়ার আগে পাঠাওনি একবার দাদুর কাছে? সেইবারের কথা বল্‌ছি। আর তার পরের বার গিয়েই যা অনেকদিন তাঁর কাছে থাক্‌তে পাই; রাজপুতানা বেড়িয়ে আসারও আগে তাঁর সঙ্গে ডুলী ক'রে যা বন বেড়িয়েছিলাম বৃন্দাবনে প্রায় একমাস ধরে, সেতো তোমাদের তখন বলিইনি!"

"না বল্লেও তোমার পড়া কামাইয়ে তোমার কাকা যা-রেগেছিলেন! 'বললেন' এই যে উচ্ছৃঙ্খলতা আর 'যাযাবর' স্বভাব মেয়েটার ক'রে দিচ্ছেন স্নেহান্ধ বৃদ্ধ, এতে লতিকার শেষে স্বভাবই বিগ্‌ড়ে যাবে হয়ত।"

"কাকা সে যাই বলুন, তোমরা যা-ই ঐ কয়মাস আমাকে দাদুর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলে তাই দাদু আমার একটু সুখী হ'য়ে গেছেন। নৈলে বড্ডই দুঃখ থেকে যেত কাকিমা আমার।"

কাকিমা বুঝিলেন লতিকার মন এখন একেবারেই অতীত স্নেহ-স্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে, এখন সেখান হইতে তাহাকে টানিয়া তোলা দুষ্কর। নহিলে ঐ সব দোষারোপের আভাষ মাত্রে সে লাফাইয়া উঠিয়া বকিয়া রাগিয়া অনর্থ বাধাইয়া দিত, কিন্তু এখন একটু ভাবান্তরও তাহার হইল না। তিনি তখন পরম স্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"কি করবি বল লতু! মানুষ তো চিরজীবী নয়।"

"কাকিমা, আমাকে লতিকা আর বলো না—ললিতা ব'লেই ডেক।"

কাকিমা সনিশ্বাসে বলিলেন—"তাই বলব! তুইই তো বল্‌তিস্ লতু যে কি বুড়োটে নাম রেখেছেন দাদু—ললিতার চেয়ে লতিকা বরং ভাল। তাইত আমরা লতিকা বল্‌তে ধরি।"

ললিতা বলিল "জানি তা! কি জানি, এখন ললিতাই ভাল লাগ্‌ছে।"

কাকিমা নীরবে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন আর তাঁহার বুকের উপর দুই চারি ফোঁটা জল যে ঝরিয়া পড়িতেছে তাহা অনুভব করিয়া কি কথায় তাঁহার স্নেহাস্পদকে একটু অন্যমনা করিবেন মনে মনে তাহাই খুঁজিতে লাগিলেন। নিঃসন্তানা এই নারীর সমস্ত স্নেহই যে এই তরুণীটির উপর ন্যস্ত ছিল!

তিনি জানিতেন 'বিষস্য বিষমৌষধং'। বুঝিলেন সেই অতীত কাহিনীর সুখস্মৃতির মধ্যেই ললিতার এখনকার এই বিষাদগ্রস্ত মনের আনন্দ—ওষধি নিহিত আছে। সেই কথারই আলোচনা এখন এক্ষেত্রে বিহিত। তিনি সহসা উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন "সে বনযাত্রার গল্প কিন্তু একদিনও করনি বাপু তুমি! এমন লুকিয়ে রেখেছিলে—"

"সাধে কি লুকিয়েছিলাম? কাকা পাছে দাদুর ওপর রাগ করেন, আর আমাকে যেতে না দেন তাঁর কাছে! দাদুও তাঁর ভয়ে আর না বেরোন্ আমাকে নিয়ে—এই ভয়! সে ভারি মজার কাণ্ড কাকিমা। ভারি ত রাস্তা, ৮৪ ক্রোশ কিনা একশো আটষট্টি মাইল—একখানা মোটরে ক দিনের রাস্তা বল ত? পাহাড় পর্ব্বত নদী টপ্‌কানোও নয়, এক মথুরা জেলার মধ্যেই ঘুরে ঘুরে বেড়ান, তবে ভরতপুরের এলাকার ভেতর দু চার বার পড়্‌তে হয় বটে, আর আলিগড়ের দিক্ ঘেঁসেও খানিকটা যেতে হয়, এই! বনের নামও নেই কোথাও, কেবল জায়গায় জায়গায় অদৃশ্য কাঁটার বন যদি বল তো বল্‌তে পার, খালি পায়ে একটু হাঁটতে গেলেই সর্ব্বনাশ আর কি! আর সেই মাঠ ময়দান ভেঙে দলে দলে লোকের সেকি উৎসাহে ছোটা—যদি দেখ্‌তে। তাই কি দুচার দিন? দিনের পর দিন—কম্‌সে কম তিন সপ্তাহ। 'যানে'র মধ্যে এক ডুলী আর কিছু না, বয়েল্ গাড়ীতে গেলে সব বন 'পরিকম্মা'ও হবে না, পুণ্যিরও কমতি থেকে যাবে, কাজেই দাদুর সঙ্গে আমাকেও ডুলীতেই বস্‌তে হ'ল! দেখেছ কখনো সে ডুলীর চেহারা। হুঁ—ঘাড় নাড়্‌লেই হল? কক্‌খোনো দেখনি!"

"কি জালা, কাশীতে ডুলী ক'রে বুড়িরা দর্শনে যায় দেখিস্‌নি! ভুলে গেছিস্ বুঝি? আর নেপালের পথেও তো খাটুলি চলে, তবে ডাণ্ডি কাণ্ডিই বেশী সে পথে বটে। আর কম্বলের ঝোলা? নেপালের পথের ঐ এক বিভীষিকা! চন্দ্রাগড়ি আর শিশাগড়ি পাহাড়ের সেই অসূর্য্যম্পশ্য পথে ছ্যাদ্‌লা ধরা বিরাট বনের মধ্যের ঝরণার জলে কাদায় পিছল উৎরাই রাস্তায় ঘোড়ার কদম্ কদম্ শব্দের মত তালে নেপালি ডাণ্ডিওলাগুলো যখন ডাণ্ডি ঘাড়ে ছুটে ছুটে নাম্‌তো, মনে হ'ত তখন যদি এদের কারু

পা পিছ্‌লায়, যদি আমারি ডাণ্ডিওলার সেই ভাগ্যি ঘটে, যে খড়ের মধ্যেই প'ড়ে ছাতু হই না কেন—তবু কম্বলে মুখ চাপা হয়ে মরব না ; দুচোখে আলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাছে গাছে ডিগ্‌বাজী খেতে খেতে পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেতে খেতেই অক্কা পাব। তোমার মার কম্বল ঝোলার দিকে তাকিয়ে বাপু আমার কি যে ভয় হ'ত! যেন আমাকেই কে কম্বল চাপা দিয়েছে। কি যে বিদ্‌ঘুটে সখ্‌ হ'ল তাঁর শুয়ে শুয়ে যাবেন ঘুমুতে ঘুমুতে।"

তরুণীর অপরিমিত হাসিতে কাকিমা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। কথাটা আরও কিছুক্ষণ চালাইয়া ললিতার মনের কালিমার শেষটুকুও মুছিয়া ফেলিবার জন্য তিনি গল্পের জের্ টানিয়া চলিলেন—"ভুলে যাচ্চিস্ বাপু সে সময়ে সে দলে আর ডাণ্ডি ছিল না, একটা কম্বলওয়ালাই ছিল মাত্র। সবাই ভাড়া পেলে—সে কাঁদ কাঁদ মুখে দাঁড়িয়ে থাকলো, মার তা সইলো না, আর আমাদেরও একটা যানের অভাব হচ্চিল তো?"

"মনে আছে গো সব মনে আছে, তবু তোমার মার বাহাদুরীটা কিছুতেই এখনো ভুলতে পারি না! কেউ যাতে রাজী হ'ল না তিনি অমন পাহাড়ে পথেও কম্বল চাপা হ'য়ে চল্‌লেন! বাবারে—"

"নে তোর বনযাত্রার গল্প বল্‌বি কিনা?"

"সত্যি কথা বলতে গেলে এই বনযাত্রায় আমাদের পক্ষে দেখ্‌বার কিছু না থাকলেও পথের যাত্রাটা দেখায় বেশ আনন্দ ছিল। পাহাড়ে পথে রাত্রে চলা চলে না, এদের ঐ বনযাত্রায় রাত্রি তিনটে বাজ্‌তেই সব তাঁবু তুল্‌তে আরম্ভ হ'ত। যাত্রীদের বিছানা বাক্স ব্যাগ খাবার-দাবারের লট্‌বহর, বাসন-কোশন ভরা বস্তা টব্ তাঁবু কানাত্ চ্যাটাই ইত্যাদি বোঝাই বা 'লাদাই' করা বিরাট বিরাট বয়েল-গাড়ী যা হাতির মত তিনটে করে বলদে কি ষাঁড়ে টান্‌ছে, তারই একটা প্রসেশন্ চল্‌তো আলো জ্বালিয়ে দুল্‌তে দুল্‌তে ডাক হাঁক করতে করতে! এদের দল চলতো একটা মেঠো চওড়া রাস্তায়, তা কোথাও ধুলোর সমুদ্র—কোথাও বর্ষার জলে কাদার দহ। আর পায়ে হাঁটা যাত্রী মায় ডুলি চল্‌তো অন্য সরু পথে পায়ে চলার রাস্তায়। মাঠের মধ্যে অল্প অন্ধকারে যখন দল পড়তো তখন কি যে মজা দেখাতো, যেন আলোর মালা দুল্‌ছে মাঠের এধার থেকে দৃষ্টির শেষ সীমা পর্য্যন্ত। আর কি গম্ গম্ শব্দ, যেন নদীর স্রোত গজ্‌রাচ্ছে। আবার যখন বেলা দশটা এগারোটায় সেই যাত্রা পথের যত সব তীর্থ—অর্থাৎ ছোট খাটো বন আর তার ঠাকুর দেখে, কুণ্ডের জলস্পর্শ বা স্নান করে যে 'বনে' সেদিনের আড্ডা পড়্‌বে সেইখানে পৌঁছুতো—সে এক মহামারী ব্যাপার। ব্রজবাসী পাণ্ডাদের নিজেদের ছড়িদার আগে আগে ছুট্‌তো আপন আপন যাত্রীদলের জন্য কুণ্ডের ধারে গাছের ছায়ায় স্থান নির্ব্বাচন করে গণ্ডি কেটে জায়গা আগ্‌লাতে। বয়েল গাড়ী পৌঁছুলে তখন তাঁবু গাড়ার কি ধুম, কোদাল কাটারী হাতে জায়গা সাফ্ করছে গাছের ডাল কাট্‌ছে। গাঁয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ইতিমধ্যে শুখ্‌নো বন ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট আঁটি করে কাঠ বেচে বেড়াচ্চে যাত্রীদের কাছে—গাঁয়ে যদি কারও তরি-তরকারী হয়ে থাকে এই সুযোগে সে বেশ লাভ কর্‌ছে। তখন রান্না-বান্নারও কি ধুমধাম—একটা একটা তাঁবুতে তিন চারটা উনুন জ্বলেছে। বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখ্‌তে ভারি মজা! আর কি কুণ্ড সব ঐ বনে, দেখে আশ্চর্য্য লাগে! কোথায় কোন্ গ্রাম, লোক বসতি কিচ্ছু নেই কোথাও, অথচ হ্রদের মত একটা একটা বিরাট কুণ্ড, তার চারিদিকে সিঁড়ি আর প্রাচীরের মত ভাবে সেই জলরাশিকে ঘিরে চলেছে তার বাঁধাই! কি যত্ন আর কি পয়সা খরচ করেই তখনকার রাজারা আর বড় বড় ধনীরা ঐ সব তীর্থকে অমর ক'রে রেখে গেছেন।

"তুই আগেই দেখা সেরে রাখ্‌লি বাপু, আমার কপালে আর আশা নেই, শুনে এমন ইচ্ছে হচ্চে—যেতে পাব কি কখনো?"

"কেন, একবার দেখ্‌লে কি আর দেখ্‌তে নেই? আমাকে তুমি পাণ্ডা করে নিয়ে যাবে—আমি তোমাকে সব দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাব, কোন ব্রজবাসী তোমায় ঠকাতে পারবে না যেমন দাদুকে ঠকাতো। তারপরে বুঝেছ কাকিমা, রাত্রেরও তেমনি সুন্দর দৃশ্য। এই যাত্রার আগে থেকেই ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে পাশ হয়ে সব বন্দোবস্ত হয় কিনা, কোথায় কোন দিন্ যাত্রার দলের আড্ডা পড়্‌বে, কোন্ কুণ্ড কি কোন্ 'নহরের' ধারে, সেই সেই জলের সংস্কার—সেখানে সেখানে পুলিশের চৌকী আর ছোটখাটো হস্‌পিটালের তাঁবুতো পড়্‌তোই, তাছাড়া আলোর

বন্দোবস্ত ! বড় বড় খুঁটি পুঁতে যাত্রীদলের এক দিনের আর রাত্রির সহরকে মাঝখানে রেখে চারিদিকে বড় বড় 'ডে-লাইট্' জেলে 'যাত্রা'কে চৌকী দেওয়া ! সারা রাত্রিই চৌকীদার হাঁক্‌ছে "জয় রাধেশ্যাম রাধেশ্যাম"। তারি মধ্যেই চোরেরা সুযোগ বুঝে 'রাধেশ্যাম'কে কদলী প্রদর্শন করে নিজের কাজও গুছুচ্ছে। ওঃ তখন কি হৈ হৈ শব্দ, "ঐ চোর, ঐ যায়, ধর ধর পাকড়ো" শব্দ ! সমস্ত যাত্রাটা সমস্ত রাত কি ঘুমোতো ? জায়গায় জায়গায় 'লীলা গান' হচ্চে, 'রাস' হচ্চে—অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ আর সখীসখা সাজিয়ে নাচ গান। আর হাটে বাজারে চারদিকে গম্ গম্। আমার এই সব দেখে দেখে বেড়াতে ভাল লাগ্‌তো—আর দাদু কোথায় কোন্ বনে কোন মহাত্মা তপস্যা করছেন্—কোন্ মন্দিরে কোন্ সাধু লুকিয়ে আছেন এই সন্ধানে ফিরতেন ! আমাদের আর ভাল ক'রে তীর্থের স্নান দর্শন ঘটে উঠ্‌তো না, তার জন্য ব্রজবাসী ঠাকুরদের কি গোঁসা। দাদুর ভয়ে আর তাঁর অঢেল্ দেওয়ায় কিছু বল্‌তে পারতো না—নৈলে আমাকে তাদের 'খিরিস্তান্' বল্‌বার জন্য যে মুখ চুলকাতো সে বেশ বুঝ্‌তাম—আর মনে মনে খুব হাসতাম। আমি সত্যই ঐ সব ধূম্ দেখ্‌তে আর বেড়াতে গিয়েছিলাম, কিন্তু দাদু গিয়েছিলেন অন্য উদ্দেশ্যে ! তিনি—"

বলিতে বলিতে ললিতা বিমনা ভাবে সহসা নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। যেন স্বচ্ছন্দচারিণী কলধ্বনিময়ী নির্ঝরিণীর গতি কোন এক প্রস্তর খণ্ডে ব্যাহত হইল। কাকিমার উৎসাহ তখন মাত্রা ছাড়িয়া উঠিয়াছে, ব্যগ্রস্বরে বলিলেন "তিনি আবার কি উদ্দেশ্য নিয়ে যাবেন ? তীর্থ করতে আর সাধু সন্ন্যাসী খুঁজ্‌তে বল্‌লি যে এখনি ?—তা তিনি বুঝি তাঁর মনের মত সাধু খুঁজে পেলেন না ?"

"না, যেখানে যেদিন আড্ডা পড়্‌বে তার চতুর্দ্দিকে কোন' গাঁয়ে কি কোন' বনে কোন' মহাত্মা আছেন কিনা আমাদের সঙ্গী বৃন্দাবনের খোদ ব্রজবাসী যিনি, তাঁকেই আগে হ'তে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে রাখ্‌তেন। তিনি সহর বৃন্দাবনে থাকেন—গাঁয়ের অত খোঁজ রাখেন না, তিনি দাদুর দায়ে বিপদে প'ড়ে তাঁর সঙ্গী যাত্রা'র যত পাণ্ডা ব্রজবাসী—তার পর ঐ সব জায়গার স্থানীয় পাণ্ডা সকলের কাছে খোঁজ নিতে নিতে হয়রাণ হতেন। দাদুকে যেটুকু সন্ধান দিতেন, দাদু সেদিনের আড্ডায় পৌঁছিয়েই না স্নান না খাওয়া—ডুলীর বেহারা বেচারাদের বখ্‌শিষে খুসি করে সেই দিকে ছুট্‌তেন। কিন্তু ফিরে আস্‌তেন এমন বিষণ্ণ মুখে—"

"তাঁর চেনা কোন' সাধুকে বুঝি খুঁজতেন তিনি ?"

"চেনা ? না—কেবল একবার দেখামাত্র, আর দেখা মিল্‌লো না"।

"কোথায় তাঁকে' দেখেছিলেন ? বৃন্দাবনেই ? তুইও দেখেছিলি ? কি রকম সাধু তিনি ? খুব মহাত্মা বুঝি ? খুব বুড়ো ?"

"হ্যাঁ—না—কাকিমা—উঃ বড্ড মাথা ধরে উঠ্‌লো—"

"ধর্‌বে না ?—যে ব'কে চলেছিস্ একদমে ? চল, মাথায় একটু কিছু দিয়ে ফ্যানের তলায় শুবি। তার আগে ডাবের জল খা দেখি একটু, এনেছিস্ গুচ্ছার কেবল, খেলিনে একটাও, খাবারও তো খাস্‌নি এখনো।"

বলিতে বলিতে কাকিমা বারান্দা হইতে ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন, আর ললিতা বামহস্তে নিজের কপাল টিপিয়া ধরিয়া রেলিংয়ের উপর মুখ রাখিল।

একটু পরেই গ্লাশ্ হস্তে কাকিমা নিকটে আসিতেই ললিতা একটু অতিরিক্ত আগ্রহে তাঁহার হস্ত হইতে পানপাত্র গ্রহণ করিয়া জলটা পান করিয়া ফেলিল এবং দ্বিগুণ আগ্রহে বলিল "তার পরে শোন' কাকিমা, বনযাত্রার কথা"

"না বাপু আর বক্‌তে হবে না—মাথা ধরিয়ে ফেল্‌লি—"

"ও কিছু না—হঠাৎ একটা শির টন্ টন্ ক'রে উঠেছিল, ডাবের জল খাবার আগেই সেরে গেছে—".

"খাবার খাবি তবে চল্"

"না আগে শোন ! ভরতপুরের রাজা এই যাত্রীদলের খুব তদারক করেন জান কাকিমা, তাঁর অধীন 'ডিগ্' বলে যে সহর আছে তার মধ্যে বনযাত্রার পথ নয়—তবু তিনি যাত্রীদের সেবা করবেন বলে সেই পথে 'যাত্রা' চালিয়ে একদিন ঐ ডিগ্ সহরে তাদের আড্ডা বসান্। ডিগের কাছে বুঝি একটা বন আছে তার নাম 'লাঠা বন।' সেদিন ডিগে একটা উৎসব ব'সে যায়। রাজার একটা বাগান আছে তার নাম 'ফুয়ারা বাগ্'। ফোয়ারার বাগানই বটে, সেদিন বৈকাল থেকে যাত্রীদের আনন্দ দেবার জন্য সমস্ত ফোয়ারা খুলে দেওয়া হয়, আর সব যাত্রী গিয়ে তাই

ত্থাখে। কত রকম আকারের—আর কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফোয়ারাই তৈরী করা আছে বাগানটায়। কোন' থামের মাথায় প্রকাণ্ড পদ্মের মত চেহারা, আর তারই প্রতি দল দিয়ে জলের ঝরণা, কোনটা লম্বায় চওড়ায় যেন সত্যিকারেরই প্রস্রবণ! হাতির উঁচু শুঁড় দিয়ে কোথাও জল ঝরছে। ফোয়ারাগুলো যেন ফুলগাছ, সেই গাছেরই বাগান সাজান! এক একটা মস্ত মস্ত দালানের মত, কোনটা হ্রদের মত, অজস্র ঝরণার নানা খেলায় সেগুলো ভর্ত্তি, আবার এমন বৈজ্ঞানিক ভাবে এক জায়গায় শত'খানেকই বোধ হয় ঝরণার ডাণ্ডা সাজানো যে তাদের মুখ দিয়ে জল জোরে ওপরে উঠ্‌ছে—আর তাদের জলের কণায় পশ্চিমে হেলা সূর্য্যের আলো লেগে শূন্যে গোটা কয় রামধনুর সৃষ্টি হয়েছে, এই দৃশ্যটা দেখ্‌তে এত সুন্দর কাকিমা যে কি বল্‌ব!"

"বাঃ—শুনেই যে লোভ লাগ্‌ছে। চা খাবিনে? চল্ এইবার।"

"যাচ্চি, বেচারা যাত্রীরা সেই ভাদ্রমাসের দারুণ রোদে পুড়ে সেই মাঠে মাঠে নির্জ্জলার দেশে ঘুরে ঘুরে সেদিনের জলের কণাভরা বাতাসে শরীরটাকে জুড়িয়ে নেয় যেন। আর তাদের কষ্ট কমায় গাঁয়ের লোকেরা। বনযাত্রী দেখ্‌তে আশে পাশের গাঁ থেকে ছেলে বুড়ো বৌ ঝি সব পথে এসে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ বা দুধ নিয়ে কেউ বা ঘোলের হাঁড়া নিয়ে আসে যাত্রীদের 'সেবা' করবার জন্য —অর্থাৎ বিনামূল্যে তাদের খেতে দেয়। জায়গায় জায়গায় শেঠেরা মহান্তরাও যাত্রীদের ভাণ্ডারা দেয়, কিনা পুরী মিঠাইয়ের ভোজ খাওয়ায়; কাঙাল যাত্রীরা ভিন্ন সকলে সে সব 'দান গ্রহণ' করে না—কিন্তু কাঙ্গাল যাত্রীই তো বেশী! ওঃ, সে যে এক কাণ্ড ৺বদরীনারায়ণের পথে! যেমন রোদ—তেমনি এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো পাথরের পথ, খানিক খানিক বেশ ছোটখাটো পাথর ভাঙা রাস্তার মধ্যে প'ড়ে সব তেষ্টায়—কষ্টে যাত্রীরা—"

বাধা দিয়া কাকীমা বলিলেন, "ওর মধ্যে আবার বদরীনারায়ণ কিরে? থালির মধ্যে হাতি?"

"তা বুঝি জাননা? সব তীর্থই যে ব্রজধামে আছে। কেন কাশীতেও দেখনি, ভারতবর্ষের সব তীর্থের পকেট এডিসন। কিন্তু বৃন্দাবনের ঐ সব এডিসন্‌গুলো কাশীর চেয়ে অপেক্ষাকৃত সত্যি ঘেঁষা!—ভরতপুর রাজার "কামবন" বা 'কামা' সেই মহাভারতের কাম্যবন তা জান কাকিমা? এই কথাটা মনে করে কেবলি আমার মন কি রকম ক'রে উঠ্‌ত—কিন্তু যুধিষ্ঠিরের বৈঠক বলে যা দেখায় তাতে আমার মন লাগে নি। কৃষ্ণঠাকুরের কথাগুলো বরং খাপ খায়।"

কাকিমা সহসা বলিয়া উঠিলেন "ওরে শুনেছিস্, তোর কাকাবাবুর বন্ধু রাজেনবাবু ডাক্তার এবার সপরিবারে বদরী কেদার যাচ্চেন, গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী এসবও নাকি তাঁরা ঘুরবেন, হয়ত কৈলাসও যেতে পারেন সুবিধা বুঝ্‌লে?"

ললিতা চমকিতভাবে বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া বলিল 'সত্যি?'

"তোর কাকাকে জিজ্ঞাসা ক'রে ত্থাখ্ সত্যি কি মিথ্যে!" তিনি তাঁহার কন্যাস্থানীয়াটির স্বভাব ভালরূপেই জানিতেন এবং নিজেরও সে বিষয়ে যে সহানুভূতি এবং ঝোঁক ছিল তাহাও সত্য। এ বিষয়ে ললিতাও তাহার কাকিমা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল তাহা মিথ্যা নয়। একটা সম্মুখে আগত ভ্রমণের সম্ভাবনায় অতীতের স্মৃতিমন্থন উভয়ের মন হইতেই সরিয়া গেল।

ললিতা একটু বেগের সহিত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"বেল পাক্‌লে কাকের কি! কাকা কি বেরুবেন, না আমাদের যেতে দেবেন? একে তো ঘর থেকেই তিনি বেরুতে ভালবাসেন না, কত কষ্টে কত কাণ্ড ক'রে এক একবার বার করা হয়, তাতে পাহাড়ে মুলুককে তাঁর ভয় বেশী, দার্জ্জিলিং আর নেপালটা আমরা কত কষ্টেই তাঁকে রাজী করিয়ে নিয়ে যাই মনে আছে তো? ট্রেণটা যাই সমতলে নামলো বল্লেন বাব্বা বাঁচ্‌লাম! পাহাড় ছাড়া প্লেন মাটি যে পৃথিবীতে আছে তা ভুলিয়েই দিয়েছিল! কি যে কাকার কাণ্ড"—আবার ললিতার মুখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটিতে লাগিল "এ পর্য্যন্ত মুসৌরী কি নৈনিতাল যেতে রাজী করতে পেরেছ? পাহাড় থেকে ট্রেণটাই গড়িয়ে প'ড়ে যাবে কি নিজেরাই কখন্ গড়িয়ে পড়্‌ব—কিম্বা পাহাড়টাই কখন্ ধ্'সে যাবে, এই রকম ভয় বোধহয় তাঁর মনে আছে—স্বীকার করতে চান্ না লজ্জায়—না কাকিমা?"

কাকিমাও হাসিতে যোগ দিয়া বলিলেন "খুব সম্ভব, ওরে এই যাত্রায় ডেরাডুন মুসুরী নৈনিতাল আলমোড়া সবই

দেখা হ'তে পারে। রাণী-ক্ষেতের পাশ দিয়েই তো চলে আসার সময় পথ শুনেছি বদরীনারায়ণ থেকে।"

ললিতা হাসিতে হাসিতে বলিল "কোথা থেকে এত খবর জোগাড় কর কাকিমা, আমার চেয়েও তোমার ফুর্ত্তি বেশী কিনা বোঝ', কিন্তু বল্লে স্বীকার করবে না তুমিও। অত যে নাম ক'রে গেলে, কাকা একেবারে সুপুত্তুরের মত সবগুলি আমাদের দেখাতে দেখাতে চলবেন আর কি! অত আশা কর না, যাহক্ একটা স্থির ক'রে তাঁকে বল্‌তে হবে।"

"তুই আগে তাঁকে বার্ কর তো ঘর থেকে, পরে দেখা যাবে।"

"তুমিও আমার সঙ্গে জোর রেখ' কিন্তু! কাকাকে খুসি করতে তাঁর সুমুখে যে বল্‌বে 'তাইত রে লতু—এবারটা না হয় থাক্।' তা হবে না। ছাখ' এই যে ডাক্তারবাবু যাবেন বল্‌ছ—এইটি একটা পরম সুযোগ। সঙ্গে ওঁর মত একটা ডাক্তার থাকলে আর তাঁর ছেলে কি ভাগ্‌নের মত কাজের ছেলে কেউ থাক্‌লে, কাকা ভরসা পাবেন। কাকিমা শুধুই বেড়ানোর কথা বলো না বাপু। তুমি তোমার ধর্ম্মের দিক্ দিয়েও বুঝিও কাকাবাবুকে। বল কি শ্রীবদরীনারায়ণ শ্রীকেদারনাথ দর্শন—বুঝছ তো? পুনর্জ্জন্ম হবে না আর।" উভয়েই তখন মন খুলিয়া হাসিয়া স্থানটির হাওয়া বদলাইয়া দিল। একটু পরেই কাকিমা বলিয়া উঠিলেন—"কিন্তু লতু আমার মাকে সঙ্গে নিতে হবে রে! নৈলে তাঁর আর হবে না—দুঃখ পাবেন তিনি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ সে আর বল্‌তে, সে বুড়ি ঝোলায় শুয়ে শুয়ে যখন নেপাল গিয়েছিলো তখন বদরীও যাবে বৈকি। এখনো সেকথা মনে পড়লে আমার এত হাসি পায়, আবার দুঃখও ধরে! আহা বেচারা! কম্বলওলারা ফিরে যাবে বলে নিজে অমন পথের কিছু না দেখে মড়ার মত কম্বলের ঝোলায় শুয়ে শুয়ে চল্‌লেন। বলেন "পথের আবার কি দেখ্‌ব—পশুপতিনাথ দেখতে পেলেই হ'ল! মাগো—" বলিতে বলিতে ললিতা অপরিমিত হাসিতে যেন লুটাইয়া পড়িল। কাকিমা এখন একটু কম হাসিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন "তিনি যে চোখ বুজে কেবল জপ করতে করতেই তীর্থের পথে চলেন—দেখার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কি!"

"ভারী ভাল লোক তোমার মা-টি বাপু! কাকিমা, শীগ্‌গির তাঁকে আন্‌তে উপীন্‌কে পাঠিয়ে দাও। খুব বুদ্ধি মাথায় এসেছে! তিনি এলে আমাদের বেজায় পৃষ্ঠবল হবে। তিনি যখন কাকাকে বল্‌বেন 'বাবা তুমি না হলে আমাকে এ বয়সে এ সঙ্কটের তীর্থ কে করাবে,' তখন কাকা বাছাধন আর পথ পাবেন না। শীগ্‌গির কাকিমা শীগ্‌গির—"

"বাবারে থাম্ থাম্—এখনি উনি হয়ত শুন্‌তে পেয়ে সব ভেস্তে দেবেন।"

"ভেস্তে দেবেন! আমি এখনি কাকাকে বল্‌ছি—দিদ্‌মা আস্‌তে চাচ্চেন—উপীনকে আজই পাঠাবেন, কিন্তু—যাঃ—কি হবে কাকিমা—"

"কি হলো রে আবার? লাফাতে লাফাতে মাথায় হাত দিয়ে বস্‌লি যে?"

"শীলা যে আস্‌বে বলেছে এবারে বেড়াতে, কালই তার চিঠি পেয়েছি—হপ্তাখানেকের মধ্যেই সে এসে পড়বে যে।"

"তাইত, তবে কি হবে?"

"কুছ্ পরোয়া নেহি, তাকেও ফুস্‌লিয়ে সহযাত্রী করব। তুমি ব্যাগ্ ট্যাগ—অলষ্টর্ লং-কোট্ তারপর আর যা যা ঠিক্ করাতে হবে এখনি থেকে জোগাড় করতে ধর কাকিমা, আমি কাকার ফটোর ক্যামেরাটা সারাতে দিই। উপীন্‌কে সঙ্গে নিতে হবে, না কাকিমা? কি কাকে নেবে? তেওয়ারী, শুকুল, ওদের না নিয়ে তো কাকা এক পাও বেরুবেন না। চুপ করে রয়েছ যে! আমি চল্লাম শীলাকে এলারম্ দিতে—আর দিদ্‌মাকে এনে ফেলার জোগাড় দেখতে। তুমি ডাক্তারবাবুর বাড়ী গিয়ে তাঁদের গোছগাছ দেখে আমাদেরও তেমনি সরঞ্জাম ঠিক্ কর। ও তুমি ভেবো না, দিদ্‌মা এলেই যাওয়া ঠিক্, বুঝ্‌লে?"

"যা হোক্ মেয়ে তুমি বাছা!"

ক্রমশঃ

চণ্ডীদাস ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

রজনীর অন্ধকারে ধ্যানমৌন বনস্পতিশিরে
স্তিমিত তারকালোকে কুহেলিকা নামিতেছে ধীরে।
সহসা না জানি কোন্ বিধাতার খেয়ালের ভুলে
বাশুলী-মন্দিরদ্বার সঙ্গীতের মন্ত্রে গেল খুলে!
সহসা কঙ্করবক্ষে উচ্ছ্বসিল মন্দাকিনীধারা
দুর্বার তরঙ্গভঙ্গে স্রোতস্বিনী হ'য়ে আত্মহারা—
চূর্ণ করে দুকূলের কারা।
তরুণ তাপস কবি চণ্ডীদাস পরি গলে কলঙ্কের হার—
রাধিকার সমবেদনার—
তুচ্ছ করি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষেধের তীক্ষ্ণ অত্যাচার,
দেবতার প্রেম দিয়ে মানুষে করিল আবিষ্কার।
গাহিল উদাত্ত কণ্ঠে উৎপীড়িত মানুষের জয়
শুনাল আশার বাণী ধ্বংসহীন অক্ষয় নির্ভয়—
শুনহে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

তারপর নামিল আঁধার! সপ্তডিঙা মধুকর
ডুবিল রে কালিন্দীর জলে। কাঁপে মাটী থরথর
অগণিত বাহিনীর পদভরে। আগুনের স্রোতে
বন্যার বিপুল গ্রাসে ভূলুণ্ঠিত রাজপুরী হতে
দরিদ্রের জীর্ণ পর্ণকুটীরেরো নাহিক নিস্তার
ধ্বংসের রাক্ষসী এল লোলজিহ্বা করিয়া বিস্তার।
থেমে গেল যত গান, ঝটিকায় নিভিল দীপালী
রুদ্ধশ্বাসে অন্ধকারে লক্ষ্যহারা মরিল বাঙালী।

মরিল বাঙালী?
কে বলে সে মরিয়াছে? মৃত্যু তার পায়ের নফর
শতঝঞ্ঝা শিরে বহি আজিও সে রয়েছে অমর।
কণ্ঠে তার গান আছে, চক্ষে স্বপ্ন, বক্ষে ভালবাসা
রক্তে তার মত্ততার নৃত্য করে ছন্দ সর্বনাশা!
তার কবি বিশ্বে আজি মানুষের একমাত্র কবি,
সহস্র খদ্যোৎ মাঝে জ্যোতির্ময় একমাত্র রবি।

কত দীর্ঘ তপস্যার কত যুগ যুগান্তের কাঙ্খিত রতন
কত মৌন সাধনার ধন
উৎপীড়িত মানবের পুণ্যের সঞ্চয়
অন্ধকারা-বন্ধনের দ্বার ভাঙি তব অভ্যুদয়—
ওগো জ্যোতির্ময়!

সবার উপরে মানুষেরে ঠাঁই দিয়েছিল যেই কবি
আজিকে আমার নয়নসমুখে দেখিতেছি তার ছবি
হেরিতেছি আজি বহুদিন শেষে বহু প্রতীক্ষাপরে
এই আঙিনায় দুই মহাকবি দুজনে জড়ায়ে ধরে!
দুই কাব্যের গঙ্গাযমুনা—ভানু ও চণ্ডী নাম,
মিলিয়া হেথায় রচনা করিল বাণীর প্রয়াগধাম।
হেরি বিস্ময়ে—বেণুতে বাণীতে হইল আলিঙ্গন
শাওন দেয়ায় বিজুরীলিখন—অরূপ আলিম্পন!
ধন্য আমরা ভক্তিপ্রণতশিরে
স্নান ক'রে যাই এই তীর্থের নীরে।

শুন ওই—আর্তনাদস্তনিত বাতাস
হত্যার যান্ত্রিক তন্ত্রে মুহুর্মুহু বিদরে আকাশ
শুধু এক কবিকণ্ঠ রহি রহি করে আবেদন
হে মানব! ঘরে ঘরে সৃষ্টি কর শান্তিনিকেতন!
ডুবে যায় সেই স্বর উন্মাদের রণকোলাহলে
আত্মঘাতী জিঘাংসার বজ্রনাদে ক্রূরহাস্যতলে।
—কিন্তু সে নিষ্ফল নয়! তার বাণী হবে বহ্নিময়ী
ন্যায়ের দুর্বার তেজে সেই বাণী হবে বিশ্বজয়ী!
দগ্ধ করি অন্যায়ের প্রমত্ত সঞ্চয়
গগনের দিকে দিকে আঁকি দিবে দীপ্তপরিচয়।
অনাগত যে-দেউলে তব বাণী পাতি সিংহাসন
উৎসারিত উৎসস্রোতে অমৃতের করিবে সিঞ্চন
সে দেউলে ওগো পুণ্যনাম,
মহাকবি, রেখে গেনু আমার প্রণাম।

পৃথিবীর প্রায় দু'শো কোটি লোকের ভিতর দেড়শো কোটি লোক আজ মহাযুদ্ধে লিপ্ত। মানুষের শক্তি যখনই এসে সভ্যতার আবরণে এ-ও মানুষের পশু-শক্তির একটা বৈপ্লবিক তাণ্ডব। যাঁর যতটুকু আছে, সেইটুকু নিয়ে তার

ম্যাগিনট লাইনের ব্রিটিশ রক্ষিত অংশে ব্রিটিশ সৈনিকেরা বন্দুক ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে।

পৌঁছয় প্রাচুর্য্যে, মানুষ অমনি ক'রেই মারামারি কাটাকাটিতে করে আত্মক্ষয় আর পৃথিবীর শান্তিক্ষয়। হয় না পরিপূর্ণ তৃপ্তি, তাই সে হাত বাড়ায় অন্যের ভাগে; আবার মানুষের বরাদ্দ পাওনার সবটুকু আঁকড়ে ধ'রে

নাৎসী বিমান "ফ্লাইং পেন্‌সিল" ফরাসী সীমানায় প্রবেশ করতে গিয়ে বিধ্বস্ত হ'য়েছে। বিমানের ধ্বংসাবশেষে আগুন জ্বলছে।

অন্তকে বঞ্চিত ক'রে যে করে ষোল আনা ভোগদখল, সে-ও পারে না নিজের উপ্‌চে-পড়া অংশটুকু বিলিয়ে দিতে; তাই যুগে যুগে পৃথিবীর বুকে হয় সংগ্রাম। অশান্তির আগুনে মানুষের শান্তিকুঞ্জ বারবার পুড়ে ছাই হয়। আবার

সুইডেনের ম্যাগিনট লাইন। শত্রুপক্ষের গতিরোধ করবার জন্তে সুইডেনের চারিদিকে এই দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী রচিত।

নিরপেক্ষ থাক্‌লেও নরওয়ের ট্যাঙ্কবাহী গাড়ী ও কামান প্রস্তুত।
[নরওয়ের জনসংখ্যা ৩০,০০,০০০ এবং রাজ্যসীমা ১,২৪,৫৫৬ বর্গ মাইল।]
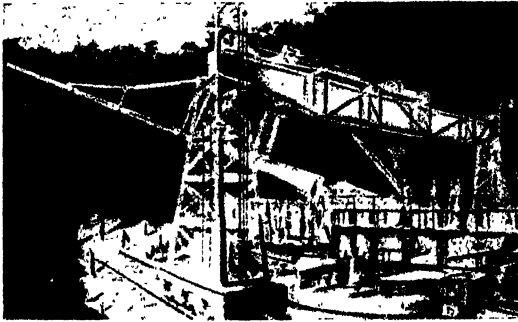
গত মহাযুদ্ধে এই কামানের সাহায্যে জার্মানী প্যারি শহরে গোলা নিক্ষেপ করেছিল। কামানটির পাল্লা ছিল ৭৫ মাইল।

জার্মানীর 'ইউ' বোট। সাত জন নাবিক উপরে দাঁড়িয়ে আছে।

ব্রিটিশের পর্য্যবেক্ষণকারী বিমানপোত। এই পোতে চারিটি হাজার অশ্বশক্তির এঞ্জিন আছে এবং ঘণ্টায় ২১০ মাইল অতিক্রম করে।

হয়ত যুগের পর যুগ ধ'রে গড়ে ওঠে সেই বিধ্বস্ত শান্তির ভিত। যাক, বর্ত্তমানে য়ুরোপের বুকে যে ধ্বংসের আগুন জ্বলে উঠেছে, তার কথাই আলোচনা করা যাক।

সুইডিশ সৈনিকেরা বিমানধ্বংসী কামান সংযোজনায় রত।

সুইডেনের ম্যাগিনট লাইনে শক্তিশালী কামানের গোলা সংরক্ষিত হচ্ছে।

একদিকে প্রবল ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বলতে পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ স্থলভাগ বোঝায়,
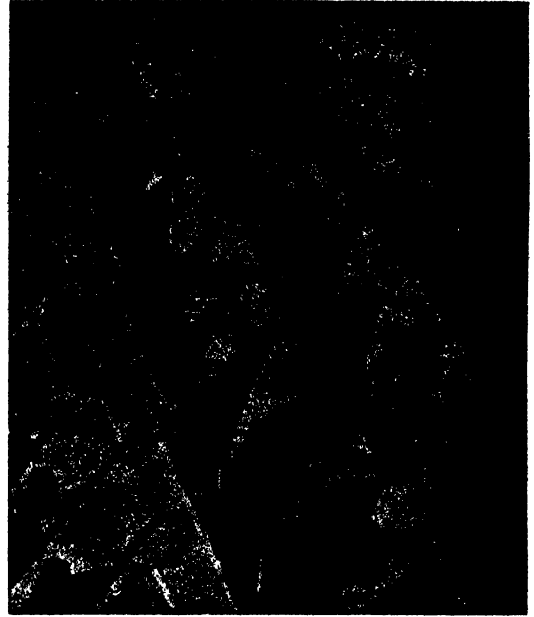
সিগ্‌ফ্রিড লাইনের সীমায় যাতে শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক না প্রবেশ করতে পারে, তার জন্যে জার্মানরা "ড্র্যাগন্‌স্ টিথ" বসিয়েছে।

একটি জার্মান বালিকা শাসের কাজ শিক্ষা করছে।

যার পরিমাপ প্রায় ১৪০ লক্ষ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা পঞ্চাশ কোটির অধিক। আর ফরাসী সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা

তুষারাচ্ছন্ন ফরাসী সীমান্তে বিমান পর্য্যবেক্ষণে রত তিন জন সৈনিক 'মেসিন গান' সংস্থাপিত করছে।

জার্মান প্রহরী সিগফ্রিড লাইনের অন্তরালে দাঁড়িয়ে শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

প্রায় ১ কোটি ৭ লক্ষ এবং ব্যাপ্তি ৪৩,৩৬,০০০ বর্গ মাইল। অপর দিকে জার্মানী। বর্ত্তমানে পশ্চিম পোলাণ্ড, স্লোভাকিয়া, চেক ও অষ্ট্রিয়া ধ'রে জার্মানীর সাম্রাজ্য-সীমা প্রায় ৩,২১,৫৭৫ বর্গমাইল। তবে পোলাণ্ড ও চেকবাসীরা এখনও হিট্লার-বিরোধী এবং স্লোভাকদের ওপর নাৎসীরা আজও বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে নি। এ ছাড়া আছে রুশিয়া। ওই মহাযুদ্ধের সঙ্গেই জ্বলে উঠেছে রুশিয়া ও ফিন্ল্যাণ্ডের যুদ্ধ-বিগ্রহের আগুন। রুশিয়ার জনসংখ্যা প্রায় ১৮ কোটি আর ফিন্ল্যাণ্ডের জনসংখ্যা ৩৮,০০,০০০। এত বড় বিপ্লবের মধ্যে তবু একটু শান্তি দেখা
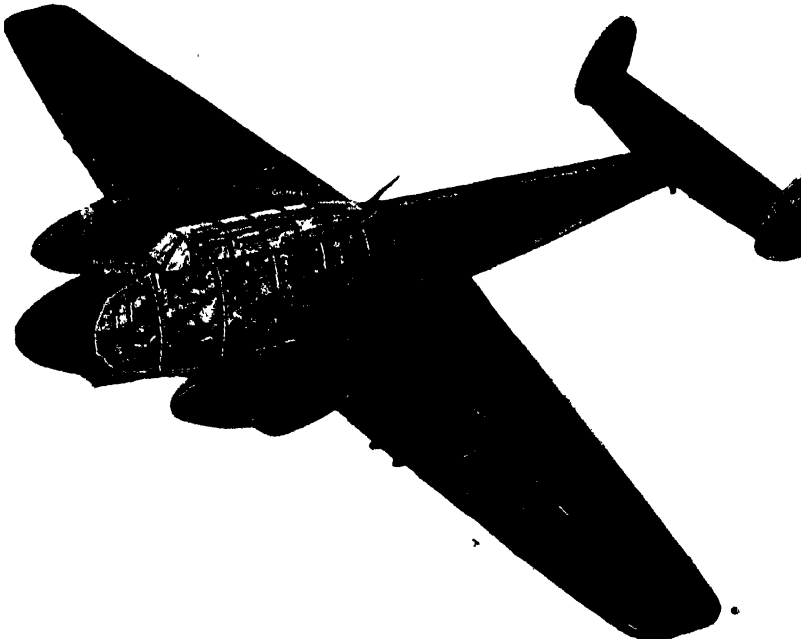
যুগ্ম এঞ্জিনযুক্ত জার্মানীর নূতন "ডেস্‌ট্রয়ার প্লেন," ইহার গতি—ঘণ্টায় ৩৭০ মাইল। ইহাতে ২টি কামান ও ৪টি মেসিন গান আছে।

দিয়েছে,রাশিয়া আর ফিন্‌ল্যাণ্ডের সন্ধিতে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কার অবস্থা কি দাঁড়ায়, সেটা এখনও সঠিক অনুমান করা যায় না।

রণদেবতা শুধু য়ুরোপের ওপর দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রেই যে ক্ষান্ত আছেন, তা নয়। এদিকে জাপানের অশ্বমেধ এখনও শেষ হয় নি। চীন-জাপানের যুদ্ধ হয় ত শেষ পর্য্যন্ত কৌলিকপ্রথায় দাঁড়াবে। কাজেই সে কথা আলোচনা ক'রে আর এখন বিশেষ লাভ নেই।

ফরাসী সীমান্তে রচিত দুর্ভেদ্য ব্যূহ ম্যাগিনট লাইনে ফরাসী ও ব্রিটিশ সৈন্যেরা জার্মানীর গতিরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। অপর দিকে নরওয়ে এবং সুইডেন আপন আপন সীমান্ত রক্ষায় তৎপর। জার্মানীর ভিতরে ও বাইরে চলেছে সমান কর্ম্মতৎপরতা। সমগ্র য়ুরোপের বাতাসে যেন উঠেছে ঝড়।

জার্মান রমণীরা যুদ্ধের জন্যে নানা উপকরণ তৈরিতে আত্মনিয়োগ করেছে।

প্রতিবৎসর ৩০,০০০ হাজারের অধিক সুইডিশ সৈন্যকে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়। একজন সুইডিশ সৈনিক শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ ক'রছে।

নরওয়ে ও ফিনিশ সীমান্তে নরওয়েজিয়ান সেনানিবাস ও দুর্গ। আক্রমণের আশঙ্কায় নরওয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে।

রুশিয়ার সঙ্গে ফিন্‌ল্যাণ্ডের সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী আসন্ন বিপ্লবের মাঝখানে শান্তির প্রস্তাবে কতকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায় তাতে সন্দেহ
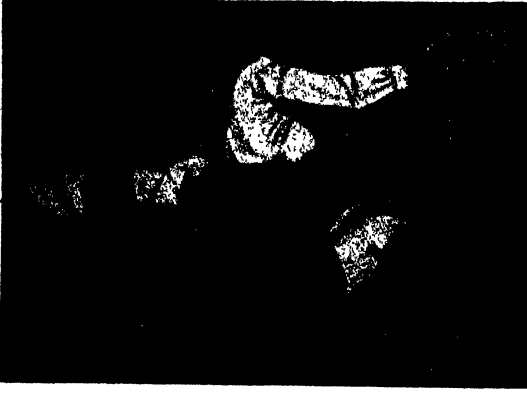
জার্মান মেয়েরা লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করছে, যাতে দরকার হ'লে তারাও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে পারে।
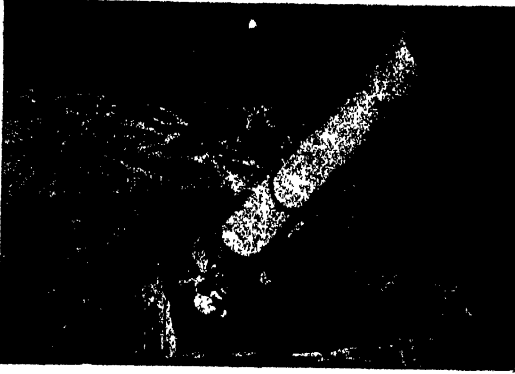
ব্রিটিশ গোলন্দাজেরা সীমান্তের প্রচ্ছন্ন স্থানে গ্যাস-মুখোস পরিহিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে কামান চার্জ ক'রে প্রস্তুত হ'য়ে আছে।

নেই। য়ুরোপের বুকে গত মহাযুদ্ধে যে গভীর ক্ষত হয়েছিল, তার দাগ আজও মিলিয়ে যায় নি। কাজেই যুদ্ধ এখন কা'রো অভিপ্রেত নয়; অথচ জার্মাণী তথা হিট্‌লার যে বিষদৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে সমগ্র য়ুরোপের পানে, তাতে যুদ্ধ ছাড়াও গত্যন্তর নেই। মানুষের সমৃদ্ধির জন্মে বিজ্ঞান পৃথিবীকে যে অসামান্ত দান ক'রেছে, তার তুলনা
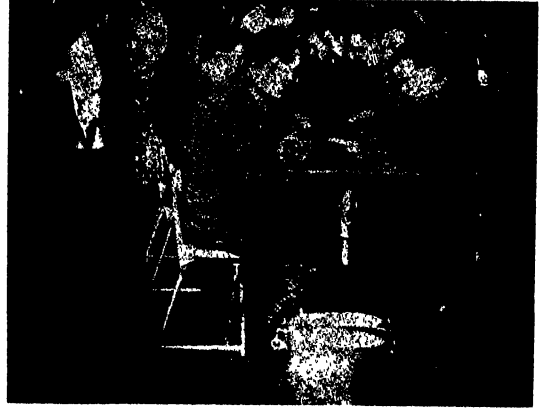
'ইউ' বোটের অভ্যন্তরের দৃশ্য। জার্মান নাবিকেরা একত্র ভোজনে বসেছে।

নেই সত্যি; কিন্তু সেই সমৃদ্ধির অনুপাতে ধ্বংসের উপকরণ আজ অধিকতর হ'য়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে মারণাস্ত্রের আধিক্য পৃথিবীকে অধিক শঙ্কিত ক'রে তুলেছে।

সর্ব্ববিদ্যাবিশারদের বৌ

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবাহের রাত্রেই নিবারণ ডানদিকের স্ত্রীকে বাঁদিকে চালান করিয়া দিয়াছিল। 'তুমি এপাশে এসে শোও, কেমন?'

এই তার প্রথম প্রেমালাপ। সুকুমারী একটু ভীরু আর ভাবপ্রবণ মেয়ে, তার আশঙ্কা আর আশা দুই-ই ছিল অন্ত রকমের। ব্যাপারটা সে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, কিন্তু কারণ জানিবার চেষ্টাও করে নাই। কে জানে, ডানদিকের কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয় তো ব্যথাট্যাথা হইয়াছে মানুষটার, ডানদিকে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বৌ-এর সঙ্গে আলাপ করিতে কষ্ট হইবে। এই রকম একটা অনুমান করিয়া সে নীরবে স্বামীর সঙ্গে শয্যায় স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছিল।

সুকুমারী কোন প্রশ্ন করিল না দেখিয়া নিবারণ নিজেই কারণটা ব্যাখ্যা করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল : 'স্ত্রীকে বাঁ দিকে শুতে হয়—তাই নিয়ম। পরে এ নিয়ম মেনে চলো বা না চলো তাতে অবশ্য কিছু এসে যায় না, কিন্তু বিয়ের রাতে—'

রাত্রি তখন প্রায় তিনটা বাজে। এতরাত্রে এরকম একটা তামাসার মধ্যে কি কেউ বৌ-এর সঙ্গে প্রথম আলাপ আরম্ভ করে? যারা আড়ি পাতিয়াছে তারা শুনিলে কি ভাবিবে! সুকুমারী ভীরু বটে, কিন্তু ভাবপ্রবণতার জোরে ভীরুতাকে জয় করিয়া একটু রাগিয়াই গিয়াছিল। আর কিছু মাথায় না আসুক, সোজাসুজি নাম জিজ্ঞাসা করিয়া কথা আরম্ভ করিলেই হইত!

নিবারণের বোধ হয় ধারণা হইয়াছিল, কথা আরম্ভ করা মাত্র বৌ-এর সঙ্গে ভাব জমিয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড একটা হাই তুলিয়া অন্তরঙ্গ স্বামীর মত সে বলিয়াছিল, 'কত যে ভুল হয়েছে বিয়েতে বলবার নয়। মন্ত্রতন্ত্র থেকে আরম্ভ করে স্ত্রী-আচার পর্য্যন্ত। নতুন জামাই বলে চুপ করে ছিলাম, কিন্তু এমন অস্বস্তি লাগছিল মাঝে মাঝে—'

শুনিতে শুনিতে সুকুমারীর সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিয়াছিল। কি সর্ব্বনাশ, শেষপর্য্যন্ত তবে কি একটা পাগলের সঙ্গে তার বিবাহ হইয়াছে? একটু পরেই অবশ্য জানা গিয়াছিল—নিবারণ ঠিক পাগল নয়, সম্ভবতঃ তামাসাই করিতেছিল।

'তুমি যে কথা বলছ না? ও, সাধাসাধি করি নি বলে?' বলিয়া এতক্ষণ পরে নিবারণ আবার গোড়া হইতে বৌ-এর সঙ্গে ভাব করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিল, সুকুমারীর বন্ধুদের কাছে শোনা বিবরণের সঙ্গে যার অনেক মিল। বেশ মিষ্টি লাগিয়াছিল নিবারণকে সুকুমারীর তখন, ভোর পর্য্যন্ত সামান্য সময়টুকুর মধ্যেই অনেকবার রোমাঞ্চ হইয়া সর্ব্বাঙ্গ তার অবশ হইয়া আসিয়াছিল—প্রথমবারের চেয়ে ভিন্ন কারণে।

কয়েকটা দিন কাটিতে না কাটিতে সুকুমারী বুঝিতে পারিল, বিবাহের রাত্রে বাঁ দিকে তাকে শোয়াইয়া আর মন্ত্রতন্ত্র এবং স্ত্রী আচারের ভুল দেখাইয়া দিয়া নিবারণ তার সঙ্গে তামাসা করে নাই। তামাসা যে নিবারণ করে না তা নয়, রসকস মানুষটার মধ্যে যথেষ্টই আছে, কিন্তু নিয়ম পালনের সময়—আর ভুল ত্রুটি দেখাইয়া দেওয়ার সময় তামাসা করার পাত্র সে নয়।

বিবাহ হইয়াছে শীতকালে, মুখে তাই সুকুমারী একটু ক্রীম মাখে। নয়তো, এমন টুকটুকে রঙ তার, সে ক্রীম পাউডার মাখিবার তার দরকার? ক্রীমের কৌটাটি দেখিয়া নিবারণ একদিন বলে কি, 'এই ক্রীম মাখো তুমি? ছি! আর মেখো না।'

সুকুমারী অবাক।—'কেন?'

'এ ক্রীমটা ভাল নয়, চামড়া উঠে যায়। তোমায় অন্য ক্রীম এনে দেব।'

সুকুমারীর দুই বৌদিদি এই ক্রীম মাখিয়া মাখিয়া চামড়া ফাটা ঠেকাইয়া রাখে—দুজনের চামড়াই বড় ফাটল-প্রবণ। সুকুমারী নিজেও আজ কত বছর এই ক্রীম মাখিতেছে ঠিক নাই। সে একটু হাসিয়া বলে, 'তুমি কি করে জানলে চামড়া ফাটে?'

নিবারণ রীতিমত বিরক্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া সুকুমারীর হাসি পরক্ষণেই মিলাইয়া যায়। নিবারণ গম্ভীর মুখে বলে, 'আমি জানি। আর মেখো না।'

এরকম হুকুম কোন নতুন বৌ মানিতে পারে? অন্য একটা ক্রীম আনিয়া দিলেও বরং কথা ছিল। বিকালবেলা সুকুমারী মুখে একটু ক্রীম মাখিয়াছে, তারপর কতবার যে আঁচল দিয়া মুখ মুছিয়াছে হিসাব হয় না, রাত্রি আটটার সময় বাড়ী ফিরিয়া নিবারণ যে কি করিয়া টের পাইয়া গেল!

'ক্রীম মেখেছ যে?'

নিবারণের মুখ দেখিয়া সুকুমারীর মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে।

ঢোঁক গিলিয়া সে বলে, 'এমন চড়্ চড়্ করছিল—'

'চড়্ চড়্ করবে বলেই তো মাখতে বারণ করেছি। এবার থেকে এই ক্রীম মেখো।'

পকেট হইতে নিবারণ নতুন ক্রীমটি বাহির করিয়া দেয়। হাতে নিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া সুকুমারী হাসিবে না কাঁদিবে ভাবিয়া পায় না।

'এই ক্রীম মাখবো? একি মেয়েরা মাখে? এতো ব্যাটাছেলের দাড়ি কামিয়ে মাখবার ক্রীম।"

নিবারণ জাঁকিয়া বসিয়া বলে, 'তাই তো এটা আনলাম। দাড়ি কামিয়ে লোকে ক্রীম মাখে কেন, চামড়া চড় চড় করবে না বলে তো? কামানোর পর যে ক্রীমে চড়্ চড়্ করে না, এমনি লাগালে তো তোমার আরও বেশী কম চড় চড় করবে।'

সেদিন হইতে সুকুমারীর ক্রীম মাখা বন্ধ হইয়াছে।

কেবল মেয়েদের প্রসাধনের একটি বিষয় নয়, নিবারণ জানে না এমন বিষয় নাই। বিবাহের রাত্রে চারিদিকে সমস্ত ব্যাপারে ভুল ত্রুটি আবিষ্কার করিয়া নিবারণের অস্বস্তি বোধ করিবার অর্থটা ধীরে ধীরে সুকুমারী বুঝিতে পারে। চোখের সামনে মানুষকে ভুল করিতে দেখিয়াও চুপ করিয়া থাকাটা নিবারণের পক্ষে অস্বস্তির ব্যাপারই বটে। এখনও মাঝে মাঝে ওরকম অস্বস্তি তাকে বোধ করিতে হয়। সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের কথা, নিজের বাড়ীতে চুপ করিয়া থাকিবার প্রয়োজন বেশী হয় না বলিয়া অস্বস্তিটাও তাকে বেশী ভোগ করিতে হয় না। বাড়ীর বাহিরে পথে ঘাটে আত্মীয়বন্ধুর বাড়ীতে আর আপিসে সে কি করে সুকুমারী জানে না।

সমস্ত বিষয়েই নিবারণ ব্যবস্থা দেয়, সমস্ত ব্যবস্থার সমালোচনা করে। ব্যাখ্যা তার মুখে লাগিয়াই আছে, পিঁপড়ার লাইন বাঁধিয়া চলার কারণ হইতে সেজো পিসীর ছেলেটা অপদার্থ কেন পর্য্যন্ত। তার অনেকগুলি নিয়ম এখন এ বাড়ীতে চালু হইয়াছে, তার প্রায় সবগুলি নিষেধই বাড়ীর মানুষেরা তার সামনে মানিয়া চলে। আগে যে তার মতামতের এতটা মর্য্যাদা ছিল না, বাড়ীর কর্ত্তা হওয়ার পর হইয়াছে, এটুকু সুকুমারী সহজেই অনুমান করিতে পারে। তবে কর্ত্তা হইয়া নিবারণ যে নিয়মকানুনের বহর আর অবিচার অনাচারে বাড়ীটাকে গারদখানা বানাইয়া তুলিয়াছে তা নয়। মত মানানোর জন্য তার কোনরকম জোর জবরদস্তি নাই, তার মতের বিরুদ্ধে গেলেও সে রাগ করে না বা তার মতটা মানিয়া চলিলে বিশেষ খুসীও হয় না। মত প্রকাশ করিতে পাইলেই তার হইল। কঠোর সে শুধু তার অমতের বেলা। তার নিষেধ কেউ না মানিলে সে রাগিয়া আগুন হইয়া ওঠে—তা সে যত তুচ্ছ বিষয়েই নিষেধ হোক। কাঁচা টম্যাটো খাওয়া যে কত উপকারী আর কেন উপকারী সেকথা সে প্রায়ই বলে কিন্তু সে ছাড়া বাড়ীর কেউ কাঁচা টম্যাটো খায় না। খায় কি না খায় এটা সে খেয়াল করিয়াও ছাখে না। কিন্তু একবার যদি তার নজরে পড়ে যে কেউ একতলায় খালিপায়ে হাঁটিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যায়। চটি বা স্যাণ্ডেল পায়ে সকলের হাঁটার ব্যবস্থা সে দেয় নাই, দিলে হয়তো সকলে মিলিয়া একসঙ্গে সেঁতসেঁতে উঠানে খালিপায়ে সারাদিন হাঁটিলেও সে চাহিয়া দেখিত না। কিন্তু খালিপায়ে একতলায় হাঁটা সে নিষেধ করিয়া দিয়াছে কিনা, তাই বিধবা পিসীকে পর্য্যন্ত খালি পায়ে হাঁটিতে দেখিলে সে গজ গজ করে—আর কাঠের সোল দেওয়া নানা প্যাটার্ণের কাপড়ের জুতা কিনিয়া আনিয়া জুতা পরানোর জন্য দু'বেলা পিসীর সঙ্গে ঝগড়া করে।

পিসী বলে, 'নে থাম। জুতো পরিয়ে আমায় চিতায় তুলিস্।'

নিবারণ বলে, 'ছেলে কি তোমার সাধে বিগড়েছে পিসীমা? তোমার এই স্বভাবের জন্ম।'

পিসী তখন কাঁদিতে আরম্ভ করে। দুটি অন্ন দেয় বলিয়া এমনভাবে লাঞ্ছনা গঞ্জনা অপমান করা কি নিবারণের উচিত, যতই হোক সে তো তার বাপের বোন? বলিতে বলিতে ভাই-এর জন্ম পিসীর শোক উথলাইয়া ওঠে, নিবারণ কিছু বলিলেই পিসীর এরকম হয়। বাড়ীতে একমাত্র পিসীর সঙ্গেই নিবারণ আঁটিয়া উঠিতে পারে না।

পিসীর ছেলের নাম নিখিল। যেমন রোগা তেমনি লম্বা চেহারা। ছেলেটা সত্যই এক নম্বরের সয়তান। এদিকে মা হয় তো তার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেছে, আর যুদ্ধে হার মানিয়া নিবারণ গজর গজর করিতেছে; ভালমানুষের মত মুখ করিয়া চোখ মিট্ মিট্ করিতে করিতে নিখিল প্রশ্ন করে, 'কাঁদলে মানুষের চোখ দিয়ে জল পড়ে কেন দাদা?'

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার উপক্রম করিতে করিতে সুকুমারী মুখ লাল করিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়। ভাবে, উদ্ধত গোঁয়ার ছেলেটার এমন একটা খোঁচা দেওয়া ফাজলামিতে কি রাগটাই না জানি নিবারণ করিবে! হয় তো দূর করিয়া তাড়াইয়াই দিবে বাড়ী হইতে। কিন্তু পরক্ষণে নিবারণের ব্যাখ্যা তার কাণে আসে—বাপের বাড়ীর জন্ম মন কেমন করিয়া কাঁদায় একদিন তাকে সে ব্যাখ্যা শুনিতে হইয়াছিল। চাহিয়া দেখিতে পায় দু'হাত পিছনে দিয়া একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়া নিবারণ পায়চারি আরম্ভ করিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে উপরে গিয়া নিবারণ নিজেই বলে, 'বড় বজ্জাত হয়েছে নিখিলটা। কি রকম অপমান করলে আমায় দেখলে?'

'অপমান জ্ঞান আছে তোমার!'—সুকুমারীর বড় রাগ হইয়াছিল।

'কি বললে?' বলিয়া রাগ করিয়া কাছে আসিয়া নিবারণ অন্যমনা হইয়া যায়। এতক্ষণ সুকুমারী মাথা নীচু করিয়াছিল, মুখ তুলিয়া চাহিবামাত্র নিবারণ ব্যস্ত হইয়া বলে, 'তোমার জ্বর হয়েছে!'

'না, জ্বর হতে যাবে কেন?'

'উঁহু, তোমার নিশ্চয় জ্বর হয়েছে। এবেলা ভাত খেয়ো না।'

স্নেহ করিয়াই নিবারণ তাকে ভাত খাইতে বারণ করে, চিন্তিতমুখে সহানুভূতিভরা কোমল গলায়। অন্য সময় হয় তো সুকুমারী গলিয়া যাইত, এখন ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'কি করে জানলে আমার জ্বর হয়েছে? মুখ দেখে?'

নিবারণ গম্ভীর হইয়া যায়।—'আমি জানি।'

'ছাই জানো তুমি। রঙ ফর্সা, রাগটাগ হলে আমার মুখ এরকম লাল দেখায়—সবারি দেখায়। থার্মোমিটার দিয়ে ত্যাখো, এক ফোঁটা জ্বর যদি ওঠে—'

'সব জ্বর থার্মোমিটারে ওঠে না। যাই হোক, এবেলা ভাত খেয়ো না।'

ছুটির দিন সকাল বেলার ঘটনা, সবে চাটা খাওয়া হইয়াছে, ভাত খাইতে তখনও অনেক দেরী। তবু সুকুমারীর মনে হয়, সে যেন কতকাল খায় নাই, তখন খুব ঝাল কোন একটা তরকারী দিয়া দুটি ভাত খাইতে পাইলে বড় ভাল হইত। এখনো দেহে মনে স্বামীর গত রাত্রের আদরের স্বাদ লাগিয়া আছে, এর মধ্যে স্বামীর নিষেধ ভাঙ্গার স্বাদ পাওয়ার জন্ম এরকম ছটফটানি জাগার মত রাগ হওয়া কি তার উচিত? ঠিক রাগ কিনা সুকুমারী বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কেমন একটা ঝাঁঝাঁলো বিষাদ। দিন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে অন্যদিনও তো এটা সে অনুভব করিয়াছে, আজ তো নয় কেবল?

এবেলা তাকে ভাত খাইতে বারণ করিয়া নিবারণ বাজারে গিয়াছে, সমস্ত বাজারটাই কিনিয়া আনিবে। কিন্তু একটি বেহিসাবী জিনিষ কি থাকিবে তাতে? যা খাইলে মানুষের ভিটামিন বাড়ে না, রক্ত মাংস হাড়ের পুষ্টি হয় না, তাপের উৎপাদন হয় না? খাওয়ার কথা ভাবিলে নিছক জিভে জল আসে মাত্র এমন কোন বাজে জিনিষ?

সকালবেলা এখন সংসারের কত কাজ, ঘরে বসিয়া থাকা তার উচিত নয় জানে, তবু ভাত খাইতে বারণ করার রাগে ঘরেই সুকুমারী বসিয়া থাকে। বাজার আসার পাঁচ মিনিট পরে আসে ছোট ননদ পলটু। বিবাহের এক বছরের মধ্যে পলটুর সন্তানসম্ভাবনা ঘটিয়াছে। পলটুর

ধারণা, এ জগতে এমন কেলেঙ্কারি আর কোন মেয়ের অদৃষ্টে জোটে নাই।

'দাদা যেন কি, ছি!' বলিয়া লজ্জায় প্রায় মূর্চ্ছা গিয়া সে বৌদিদির গায়ের উপর ঢলিয়া পড়ার উপক্রম করে, 'একগাদা কত কি সব কিনে এনে বলছে আমার জন্য এনেছে, আমার খেতে ভাল লাগবে। এ অবস্থায় আমাদের নাকি অরুচি হয়!'

চোখ বুজিয়া থাকিয়াই পলটু একবার শিহরিয়া ওঠে!

সুকুমারী ভাবে, তবু তো আনিয়াছে? তাই বা কম কি! কাজের ছলে বাজার দেখিতে নীচে গিয়া বাহিরের ঘর হইতে নিবারণের গলা তার কাণে ভাসিয়া আসে। খবরের কাগজকে কেন্দ্র করিয়া পাড়ার কয়েকজন ভদ্র-লোকের কাছে রাজনীতির বক্তৃতা হইতেছে। কথা শুনিলে মনে হয়, সব যেন তার কাছে অপোগণ্ড শিশু। ভিতরের দিকের জানালার পর্দ্দা একটু ফাঁক করিয়া সুকুমারী একবার উঁকি মারে, মুচকি হাসি খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সকলের মুখের দিকে তাকায়। সকলেই চা পানে ব্যস্ত। নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনাও তাদের নির্ব্বিবাদে চলিতেছে। এক বছরের মধ্যে ইউরোপের অবস্থা কি দাঁড়াইবে ব্যাখ্যা করিতে করিতে নিবারণ যেন কেমন করিয়া ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে চলিয়া গিয়াছিল, কার একটা কথা কাণে যাওয়ায় মুখের কথাটা শেষ না করিয়াই বলে, 'আপনি ভুল করেছেন সতীশবাবু, ও শেয়ার কি কিনতে আছে! এক মাসের মধ্যে অর্দ্ধেকে নেমে যাবে। তার চেয়ে যদি—'

এখন নয়, এসব বিষয়ে নিবারণের সঙ্গে কেউ বিশেষ তর্ক করে না, ঝগড়া বাধিবে খেলার সময়। আজ ছুটির দিন, তাস আর দাবার আড্ডা বসিবেই; নিবারণ হয়তো তাস হাতে করিয়া দাবার চাল বলিয়া দিতে থাকিবে। ঝগড়া শুনিয়া মাঝে মাঝে ভয় হইবে এই বুঝি মারামারি বাধিয়া গেল। কেন যে ওরা এখানে খেলিতে আসে!

'কি ঠাকুর?'

'এবার মাংস চড়াব।'

বাহিরের ঘরের ভেজানো দরজার কাছে ঠাকুর ইতস্ততঃ করে।

'নাই বা ডাকলে? নিজেই চড়িয়ে দাও আজকে- চলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

সে সাহস ঠাকুরের নাই, মাংস চড়ানোর সময় নিবারণ তাকে ডাকিবার হুকুম দিয়া রাখিয়াছে, না ডাকিলে কি রক্ষা রাখিবে!

শুনিয়া সুকুমারীর মনে হয়, তবে তো বারণ না মানিয়া এবেলা মাংস দিয়া সে দুটি ভাত খাইলেও নিবারণ রক্ষা রাখিবে না! এতক্ষণ পরে গভীর অভিমানে সুকুমারীর চোখে হঠাৎ জল আসিয়া পড়ে।

নতুন কিছুই আজ বাড়ীতে ঘটে নাই, তবু যেন সব সুকুমারীর কেমন খাপছাড়া অর্থহীন মনে হয়, বাড়ীর সকলের কাজকর্ম্ম চলাফেরা গল্পগুজব। নিবারণের ভাগ্নী অর্গান বাজাইয়া গান ধরিয়াছে, নিবারণ নিজেই তাকে গান শেখায়। সুকুমারী নিজেও ভাল গান জানে, ভাগ্নীর ভুল সুর শুনিতে শুনিতে তার হতাশা মেশানো এমন একটা উৎকট কষ্ট হয়! রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিবারণের মা একটি নাতিকে দুধ খাওয়াইতেছিল, ভাঁড়ার ঘরের পাশের ছোট ঘরটিতে বাড়ীর অন্য মেয়েরা চানাচুর খাইতে খাইতে গল্প করিতেছে, ছেলেমেয়েরা হৈ চৈ করিয়া খেলা করিতেছে সারা বাড়ীতে। এর মধ্যে কি খাপছাড়া, কি অর্থহীন? এত বড় একটা সংসারের দায়িত্ব যার ঘাড়ে সেই লোকটা একটু খাপছাড়া বলিয়া কি তার এরকম মনে হয়? সঙ্গ ভাল না লাগায়, করার মত একটা বাজে কাজও হাতের কাছে না থাকায় সুকুমারী ঘরে গিয়া ব্লাউজ সেলাই করিতে বসে। ব্লাউজ দুটি নিবারণ ছাঁটিয়া দিয়াছে। গলার ছাঁট দেখিতে দেখিতে সুকুমারী ভাবে, এ ব্লাউজ পরিলে লোকে হাসিবে না তো?

বেলা প্রায় তিনটার সময় সুকুমারীর দাদা পরমেশ আসিল। এই দাদাটির জন্য সুকুমারীর মনে কত যে গর্ব্ব আছে বলিবার নয়। পরমেশ খ্যাতনামা অধ্যাপক, এই বয়সেই কলেজের ছেলেদের জন্য দু'খানা বই পর্য্যন্ত লিখিয়া ফেলিয়াছে। তার ডিগ্রীগুলি উচ্চারণ করিবার সময় আহ্লাদে সুকুমারীর জিভ জড়াইয়া আসে।

খানিকটা দুধ বার্লি গিলিয়া সুকুমারী বিছানায় পড়িয়াছিল। এতক্ষণে তার নিজের মনেই সন্দেহ জন্মিয়া

গিয়াছে, থার্ম্মোমিটারে ধরা পড়ে না এমন জ্বর হয় তো সত্য সত্যই তার হইয়াছে।

ঘরের পাশে একতলার মস্ত খোলা ছাদ, তারই এক প্রান্তে এদিকের ঘরগুলির সঙ্গে কোণাকুণিভাবে আরেকটি ঘর তোলা হইতেছে। নিবারণ গিয়া মিস্ত্রীদের কাজ দেখাইয়া দিতেছিল আর শুইয়া শুইয়া জানালা দিয়া সুকুমারী তাই দেখিতেছিল। পরমেশ সাড়া দিয়া ঘরে ঢুকিতে সে খুসী হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'এসো দাদা।'

'তোর নাকি জ্বর হয়েচে?'

'হুঁ।'

পরমেশ বসিয়া বলিল, 'নিবারণ কই?'

সুকুমারী আঙ্গুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল। একজন মিস্ত্রী তখন কাজ বন্ধ করিয়া নিবারণের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছে, বোধ হয় সর্দ্দার মিস্ত্রী। ঘরের মধ্যে ভাই-বোনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, আর এদিকে সর্দ্দার মিস্ত্রী বলে, 'আপনি যদি সব জানেন বাবু, তবে আর আমাদের কাজ করতে ডেকেছেন কেন?'

সুকুমারী চাপা গলায় বলে, 'শীগগির ডাকো দাদা—এখুনি হয় তো মেরে বসবে।'

নিবারণ কি করিত বলা যায় না, পরমেশের ডাক শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল। তারপর মিস্ত্রীকে বলিল, 'তোমাদের আর কাজ করতে হবে না। নীচে যাও, তোমাদের পাওনা দিয়ে দিচ্ছি।' বলিয়া গটগট করিয়া ঘরে চলিয়া আসিল।

তারপর সাধারণ কুশল প্রশ্নের অবসরও তাদের হয় না, শালা ভগ্নীপতিতে তর্ক সুরু হইয়া যায়। পরমেশ বলে, 'ওরা সব ছোটলোক, ওদের সঙ্গে কি ঝগড়া মারামারি করতে আছে হে!'

নিবারণ আশ্চর্য্য হইয়া বলে, 'ছোটলোক? ছোটলোক হবে কেন ওরা? ওই তো দোষ আপনাদের, যারা খেটে খায় তাদেরি ছোটলোক ধরে নেন।'

অকারণে খোঁচা খাইয়া পরমেশ একটু চটিয়া বলে, 'ও, তোমার বুঝি ওসব মতবাদ আছে? কিন্তু তুমিও তো বাবু সামান্য একটা কথা সইতে না পেরে বেচারাদের তাড়িয়ে দিলে?'

নিবারণ একটু অবহেলার হাসি হাসিয়া বলে, 'তাড়িয়ে দিলাম কি ওরা ছোটলোক বলে? ওইখানে তো মুস্কিল আপনাদের নিয়ে, বই পড়ে পড়ে সহজ বিচারবুদ্ধিও আপনাদের লোপ পেয়ে গেছে। ঘর তুলব আমি, আমি যেরকম বলব, সেরকম ভাবে ওরা যদি কাজ না করে তা হলে চলবে কেন? তাই ওদের বিদেয় করে দিলাম—ওরা ছোটলোক বলে নয়।'

আজ প্রথম নয়, আগেও কয়েকবার দুজনে তুমুল তর্ক হইয়া গিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত যা গড়াইয়াছে প্রায় রাগারাগিতে। তর্কটা অবশ্য আরম্ভ করে নিবারণ, বিজ্ঞানের কোন একটা বিষয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা অভিমত—প্রশ্ন বা সন্দেহের মধ্যে ব্যক্ত করিয়া পরমেশের মুখ খুলিয়া দেয়। প্রথমে পরমেশ পরম ধৈর্য্যের সঙ্গে তাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে, তারপর ধৈর্য্যহারা হইয়া চেষ্টা করে আত্মপক্ষ সমর্থনের, তারও পরে চটিয়া গিয়া আরম্ভ করে আক্রমণ। আজ নিবারণের খোঁচায় প্রথমেই তাকে চটিয়া উঠিতে দেখিয়া সুকুমারী চট্ করিয়া ঘরের বাহিরে গিয়া ডাকে, 'দাদা, একবার শোনো। শীগ্গির শুনে যাও আগে।'

পরমেশ কাছে গেলে ফিস ফিস করিয়া বলে, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, ওর সঙ্গে তর্ক কর কেন? যাই বলুক হেসে উড়িয়ে দিতে পার না?'

শুনিয়া আজ পরমেশের হঠাৎ প্রথম খেয়াল হয় যে, তাই তো বটে, নিবারণের সঙ্গে সে তর্ক করে কেন? নিবারণ ছেলেমানুষী করে বলিয়া সেও ছেলেমানুষ হইতে যায় কেন? তারপর দুজনে ঘরে ফিরিয়া যায়, একথায় সেকথায় কিছুক্ষণ কাটিয়া যায়, কোথা হইতে একটুকুরা মেঘ আসিয়া বাহিরের রোদটুকু মুছিয়া নিয়া যায়। ভাসা আলগা মেঘ, একটু পরেই সরিয়া যাইবে।

তখন নিবারণ বলে, 'আচ্ছা আপনারা যে বলেন লাইটের চেয়ে বেশী স্পাড্ আর কোন কিছুর হতে পারে না, তার কি প্রমাণ আছে?'

পরমেশ তাকায় সুকুমারীর মুখের দিকে, ঠোঁটের কোণে মৃদু একটু হাসি দেখা দেয়। উদাস ভাবে বলে, 'কে জানে।'

জবাব শুনিয়া একটু থতমত খাইয়া নিবারণ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকে। তারপর বলে, 'আমি বলছিলাম, মানুষের চিন্তার স্পীড তো আরও বেশী হতে পারে। যাকগে ওকথা। আচ্ছা, গ্রহণের সময় দেখা গেছে তারার

আলো সূর্য্যের পাশ দিয়ে আসবার সময় সূর্য্যের আকর্ষণে বেঁকে যায়।—'

'তাও আমি জানি না।'

'ও!' বলিয়া নিবারণ এবার গম্ভীর হইয়া যায়। গাম্ভীর্য্য তার বজায় থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণে সুকুমারীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে এবং পরমেশ দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতে আরম্ভ করিয়া ভাবিতেছে, তার রাগটা কমানোর জন্য কি বলা যায়। কিন্তু গাম্ভীর্য্য নিবারণের আপনা হইতেই উবিয়া যায়। সহজভাবেই আবার সে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে। আলগা মেঘটা উড়িয়া গিয়া আবার চারিদিক রোদে ভরিয়া যায়, সুকুমারীর মুখের বিষাদের ছায়াটা কিন্তু সরিয়া যায় না। গম্ভীর হইয়া থাকাটা বেশী অপমানকর জানিয়াই কি নিবারণ গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিল? আর সমস্ত বিষয়ে যেমন, রাগ দুঃখ মান অভিমানের বেলাতেও কি তেমনি জানাটা নিবারণের কাছে বড়? এত যে ভালবাসে তাকে নিবারণ, তার মধ্যেও জানাজানির প্রাধান্য কতখানি কে জানে!

সন্ধ্যার সময় পরমেশের সঙ্গে নিবারণও বাহির হইয়া যায়। পরমেশ যায় বাড়ী ফিরিয়া, নিবারণ যায় বেড়াইতে। বেড়াইতে গেলে নিবারণ ফিরিয়া আসে এক ঘণ্টার মধ্যে, আজ ন'টার সময়ও তাকে ফিরিতে না দেখিয়া মনের ক্ষোভে সুকুমারীর মুখে জ্বালাভরা হাসি দেখা দেয়। ক্ষুধায় পেটটা বড় বেশী জ্বলিতেছিল বলিয়াই বোধ হয় ক্ষোভটাও তার বেশী হয়। বাড়ীর সকলে অনেকবার খবর নিয়া গিয়াছে, দুধ আনিয়া খাইতে সাধিয়াছে, সুকুমারী খায় নাই। পলটু বসিয়া বসিয়া গল্প করিয়া গিয়াছে ন'টা পর্য্যন্ত। একা হওয়ামাত্র ক্ষোভটা যেন একলাফে মাথায় চড়িয়া গিয়াছে।

আর কি সুকুমারীর জানিতে বাকী আছে, এতকাল তাকে ভালবাসার মধ্যে এত বৈচিত্র্য নিবারণ কি করিয়া আনিয়াছে? আর সব সে যেমন জানে বলিয়া করে, ভালবাসিবার নিয়মকানুনও জানে বলিয়া মানিয়া চলে। পলটুর মত অবস্থায় মেয়েদের অরুচি হয় জানে বলিয়া সে যেমন বিশেষ বিশেষ খাবার জিনিষ আনিয়া দিয়াছে, ওর মধ্যে দয়া মায়া স্নেহমমতার প্রশ্ন কিছু নাই; স্ত্রীর সঙ্গে কি করিয়া ভাব করিতে হয়, স্ত্রীকে কি করিয়া আদর যত্ন করিতে হয় তাও তেমনি জানে বলিয়াই তার সঙ্গে এমনভাবে ভাব করিয়াছে, তাকে এত আদর যত্ন করিয়াছে। নয় তো নিবারণের মত মানুষের কাছে ওরকম রোমাঞ্চকর মধুর কথা ও ব্যবহার কে কল্পনা করিতে পারে, প্রতিদিন রাত্রে ঘরে আসিবার পর এতকাল তার যা জুটিয়াছে?

নিজের মনের জানাজানি প্রক্রিয়াকে সেও যে নিবারণের চেয়ে অনেক বেশী খাপছাড়া ভাবে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিতেছে এটা অবশ্য তার খেয়াল হয় না, বেশ জোরের সঙ্গেই অনেক কিছু জানিয়া চলিতে থাকে। একেবারে নিঃসন্দেহ হইয়া জানে, রাত্রে নিবারণকে একেবারে নতুন মানুষ মনে হইত কেন, তার কারণটা। বাপের বাড়ীতে যে রাত্রিগুলি নিঃসঙ্গ কাটিয়াছে সেগুলি ছাড়া প্রত্যেকটি রাত্রি আজ দুপুরেও তার কাছে রোমাঞ্চ ও শিহরণে ভরা ছিল, এখন সব ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। সব ফাঁকি নিবারণের, শুধু নিয়ম পালন।

আজ একটু রাগ হইয়াছে তাই নিয়ম মাফিক স্ত্রীকে স্নেহ করিবার ইচ্ছাটাও উবিয়া গিয়াছে। পরমেশের উপর রাগটা চলিয়া গেল দু'চার মিনিটের মধ্যেই, কিন্তু অসুস্থা উপবাসী বৌকে আর ক্ষমা করিতে পারিল না। কি করিয়া করিবে? যেখানে দরদ আন্তরিক নয়, সেখানে সুবিচারের প্রেরণা আসিবে কোথা হইতে?

বিবাহের আগে এরকম বিশ্লেষণের ক্ষমতা সুকুমারীর ছিল না, কোন মানুষের মাথার মধ্যে যে নিজের পছন্দ মত সিদ্ধান্ত দাঁড় করানোর জন্য দৈনন্দিন জীবনের রাশি রাশি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আবর্জ্জনা হইতে যুক্তিরূপী প্রয়োজনীয় টুকরাগুলিকে শুধু বাছিয়া নেওয়ার এমন একটা প্রক্রিয়া চলিতে পারে—একথা কল্পনা করার ক্ষমতাও ছিল না। এখন সে যেন খানিক খানিক বুঝিতে পারে, এ ধরণের চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া তার পক্ষে ঠিক উচিত হইতেছে না, এসব ছেলেমানুষী কল্পনামাত্র, এরকম জ্বালাভরা দুঃখ ভোগ করার কোন কারণ ঘটে নাই। তবু অন্ধকার ঘরে ছটফট করিতে করিতে না ভাবিয়া সে পারে না যে, হায়, যে স্বামী উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে বলে এই করা উচিত আর ওই করা উচিত নয়, যে ক্রীম মাখিতে দেয় না, অকারণে উপবাস করাইয়া রাখে—আর একরকম বিনা দোষে রাগ করিয়া বাড়ী ফিরিতে দেরী করে, তার সঙ্গে জীবন কাটাইবে কি করিয়া?

দশটার পরে অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া নিবারণ আলো জ্বালে। সুকুমারী চোখ বুজিয়া ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকে আর চোখের পাতা একটু ফাঁক করিয়া চুপি চুপি নিবারণ কি করে দেখিবার চেষ্টা করিয়া রামধনুর রঙ দেখিয়া বসে। চোখে একটু জল জমিয়াছে। চোখ মেলিয়া হয়তো সব স্পষ্ট দেখা যাইবে, চোখের পাতা একটুখানি ফাঁক করিয়া কিছু দেখা সম্ভব নয়—অন্ততঃ চোখ না মুছিয়া।

জামা কাপড় ছাড়িয়া নিবারণ মুখ হাত ধুইতে বাহির হইয়া যায়। সুকুমারী তাড়াতাড়ি চোখ দুটি মুছিয়া ফেলে বটে, কিন্তু এবার আরও বেশী জল আসিয়া পড়ে। জানে, নিবারণের মত সব না জানুক, এটুকু সে জানে যে নিবারণ আর কোনদিন তার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলিবে না।

নিবারণ ঘরে ফিরিয়া আসে। খানিকক্ষণ তার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায়। তারপর প্রায় কানের কাছে অতি মৃদুস্বরে তার প্রশ্ন শুনিতে পায়, 'কাঁদছো কেন?'

সুকুমারীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে, একমুহূর্ত্তে তার এতক্ষণের সমস্ত জানা যেন বাতিল হইয়া যায়। চোখে একটু জল দেখিবামাত্র রাগ কমিয়া গিয়াছে! দাদাকে পরামর্শ দিয়া অপমান করানোর মত অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য যে রাগ হইয়াছিল! এমন গভীর মায়া তার জন্য স্বামীর—আর সে এতক্ষণ সন্দেহ করিয়া মরিতেছিল কিছুই তার আন্তরিক নয়!

চোখের পলকে উঠিয়া সুকুমারী নিবারণের পা চাপিয়া ধরে।—'আমায় মাপ কর, আমি বড্ড অন্যায় করেছি।'

নিবারণ অবশ্য তখন তাকে বুকে তুলিয়া নেয়।—'তোমার জ্বর তো বেড়েছে দেখছি।'

'জ্বর বেড়েছে? গা গরম হয়েছে আমার?'

'বেশ গরম হয়েছে। দাঁড়াও, একবার থার্মোমিটার দিয়ে দেখি।'

থার্মোমিটারে দেখা যায়, সত্যই সুকুমারীর জ্বর হইয়াছে, প্রায় একশ'র কাছাকাছি। থার্মোমিটারটি রাখিয়া আসিয়া সুকুমারীর গায়ে নিবারণ আদর করিয়া হাত বুলাইয়া দেয়। সুকুমারী আরামে চোখ বোজে।

নিবারণ বলে, 'আমার সত্যি রাগ হয়েছিল। রাগ করে থাকতে পারলাম না কেন জান?'

সুকুমারী নীরবে মাথাটা একটু কাত করে। মনে মনে বলে, জানি, আমায় ভালবাস বলে।

আবার প্রায় কানের সঙ্গে মুখ লাগাইয়া অতি মৃদুস্বরে নিবারণ বলে, 'আজ জানতে পারলাম কি না তোমার খোকা হবে। জানামাত্র সব রাগ যেন জল হয়ে গেল।'

ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া সুকুমারী বিস্ফারিত চোখে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। জানামাত্র সব রাগ জল হইয়া গেল! এই তবে নিবারণের ক্ষমা করার কারণ! যে খোকার মা হইবে তার গুরুতর অপরাধও ক্ষমা করিতে হয়! গায়ের চামড়া বড় চড়্ চড়্ করিতে থাকে সুকুমারীর, যেখানে নিবারণের হাত বুলানোয় এতক্ষণ আরামের সীমা ছিল না। পেটটা জ্বালা করিতে থাকে। মুখটা তিতো লাগে। মাথাটা ঘুরিতে থাকে।

হঠাৎ সে করে কি, নিবারণকে দু'হাতে ঠেলিয়া দিয়া ছুটিয়া খোলা ছাতে চলিয়া যায়। ক্ষীণ চাঁদের আলোয় মিস্ত্রীরা ঘরের যে গাঁথনি আরম্ভ করিয়াছিল অস্পষ্ট হইলেও দেখা যাইতেছিল। তবু সেই ছাতখানেক উঁচু গাঁথনিতে হোঁচট খাইয়া সুকুমারী দড়াম্ করিয়া পড়িয়া যায়।

বৈদেশিকী

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র রায় এম-এ

ফরাসী মন্ত্রিসভার পতন

মন্ত্রিসভার দ্রুত পরিবর্ত্তন ফ্রান্সে খুব বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। ফরাসী-জাতি চিরকালই ভাবপ্রবণ; নিছক যুক্তিদ্বারা কোন বস্তু গ্রহণ বা বর্জ্জন তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে, জাতি যেখানে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত, আত্মকলহ তথায় আত্মহত্যারই নামান্তর। দলীয় এবং উপদলীয় রাজনীতি দ্বারা জাতির সংহতি বহু দিন হইতেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তদুপরি ক্রমাগত ফ্রাঙ্কের মূল্য হ্রাস আর্থিক স্বচ্ছলতারও সূচক নহে। প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ার বিচক্ষণ ও কূটরাজনীতিক সন্দেহ নাই, কিন্তু অতীতে তিনি যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন তাহা জাতীয় সংহতির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কম্যুনিষ্টদিগকে দমন এবং সম্ভব হইলে সমূলে ধ্বংস

ফিনল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি হাসপাতালে আহত সৈন্যের খবর লইতেছেন

করিতে তিনি চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। সেই অপচেষ্টার ফলে বহিশত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে যে ঐক্য দরকার তাহা ফরাসীজাতির মধ্যে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। কাজেই মঁসিয়ে দালাদিয়ারের পতন খুব অভিনব ব্যাপার নহে।

কিন্তু মঁসিয়ে রেনো-গঠিত নব মন্ত্রিসভার ভিত্তিও যে সুদৃঢ় হইবে তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। আইন সভার গোপন বৈঠকে তাহাদের অবশ্য সংখ্যাধিক্য হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার বিশেষ কোন মূল্য নাই। কারণ ১১০ জন সমাজতন্ত্রবাদী সভ্য ঐ বৈঠকে যোগদান করেন নাই। যদি তাঁহারা সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিতেন তাহা হইলে মঁসিয়ে রেনোর দলের সংখ্যা বিপক্ষদল হইতে মাত্র দুইটি বেশী হইত। কিন্তু ঐ প্রকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা কোন গভর্ণমেণ্ট চলিতে পারে না।

আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া মঁসিয়ে রেনো বলেন, এই যুদ্ধের উপর জাতির ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। যদি আমরা জয় লাভ করিতে পারি তাহা হইলে সকল দিক রক্ষা হইবে; পরাজয়ের ফল সর্ব্বনাশ। আপনারা আমার উপর যে বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়াছেন তাহার শক্তিতে আমি জাতিকে জয়যাত্রার পথে লইয়া যাইতে সমর্থ হইব।"

কিন্তু পরিতাপের বিষয় প্রধানমন্ত্রী রেনো ফরাসী জাতির সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হইতে সমর্থ হন নাই। দক্ষিণপন্থী কিংবা বামপন্থী কাহারও নব-গঠিত মন্ত্রিসভার উপর আস্থা নাই। এমন কি, রক্ষণশীল দলও গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। একথা অবশ্য সত্য, র‍্যাডিকেলগণ সরকারপক্ষে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয়, গভর্ণমেণ্টের পক্ষ অপেক্ষা প্রতিপক্ষের সংখ্যাই অধিক।

মন্ত্রিসভার অবস্থা বাস্তবিকই আশঙ্কাজনক। মঁসিয়ে রেনো অতীব দুরূহ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। অচিরে না হউক, অদূর ভবিষ্যতে নবগঠিত মন্ত্রিসভার পতনও বিচিত্র নহে।

একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, ফিনল্যাণ্ডে সোভিয়েটের সাফল্য মিত্রশক্তির কর্ণধারগণের সুনামের পক্ষে অতিশয় ক্ষতিকর হইয়াছে। যদি বৃটেন এবং ফ্রান্স জার্মানীকে সাংঘাতিকভাবে পরাজয় করিতে কিংবা কোনও প্রকার কূট রাজনীতির চালে মাৎ করিতে পারে, একমাত্র তাহা হইলেই তাঁহাদিগের হৃত গৌরবের পুনরুদ্ধার হইতে পারে।

মিত্রশক্তির পক্ষে আজ এমন নেতার প্রয়োজন যাহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সাহস এবং নূতন দৃষ্টিভঙ্গী জাতির বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে। অতি-সাবধানী, বিশেষত্ববর্জ্জিত নেতৃত্ব আজ জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না। তাই আজ পার্লামেণ্টে বৃটিশ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। ফরাসীজাতি ক্লেমেশোঁর নাম স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে। ফরাসী মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

ফিনল্যাণ্ড

রুশ ফিন যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। সন্ধির ফলে ভাইপুরী সহ সমগ্র ক্যারেলীয় যোজক বিজয়ী সোভিয়েটের হস্তগত হইয়াছে এবং হাঙ্গো উপদ্বীপে তাহার একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হইয়াছে।

রুশ-পররাষ্ট্রসচিব মলোটভের হিসাব অনুসারে এই যুদ্ধে সোভিয়েটের

৪৮,৭৪৫ জন সৈন্য হত ও ১,৫৮,৮৮৩ জন আহত হইয়াছে। ফিনল্যাণ্ডের ন্যূনপক্ষে ৬০,০০০ নিহত ও ২,৫০,০০০ সৈন্য আহত হইয়াছে। উভয় পক্ষের এই বিরাট হতাহতের সংখ্যা ব্যতীত ফিন-নরনারীর যে চরমদুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা অবর্ণনীয়।

সোভিয়েট যাহা চাহিয়াছিল তাহা সে পাইয়াছে। লেনিনগ্রাড শত্রু আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ হইল। ম্যানারহাইম লাইন আইনত রুশ অধিকারভুক্ত না হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহার করায়ত্ত হইল। ফিনল্যাণ্ডে সোভিয়েট-বিরোধী কোন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না। রুশ-যদি ইচ্ছা করিত তাহা হইলে সমগ্র দেশটি অধিকার করিতে পারিত। বৃটেন এবং ফ্রান্স ইচ্ছাসত্বেও ফিনল্যাণ্ডকে যথাযোগ্যভাবে সাহায্য করিতে পারিত না। কারণ, নিরপেক্ষ সুইডেন তাহার ভিতর দিয়া বৈদেশিক বাহিনী লইয়া যাইতে আপত্তি করে এবং উহা ব্যতীত ফিনল্যাণ্ডকে সাহায্যপ্রদানের অন্য পথও ছিল না। দ্বিতীয়ত, পেটসামোর দক্ষিণে প্রায় একশত মাইল ব্যাপী ভূভাগ সোভিয়েটের হস্তগত হইয়াছিল। এই অবস্থায় মুখ্যভাবে ফিনল্যাণ্ডকে সাহায্যপ্রদান মিত্রশক্তির পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, জার্মানীর ভয়প্রদর্শনেই সুইডেন এবং নরওয়ে তাহাদের ভিতর দিয়া মিত্র শক্তির বাহিনী যাইতে দিতে সম্মত হয় নাই। আন্তর্জ্জাতিক নীতি এবং মানবতার দিক দিয়া বিচার করিলে নিরপেক্ষ শক্তিদ্বয়কে অবশ্য সমর্থন করা যায় না। কিন্তু নীতি দিয়া রাজনীতি চলে না। সুইডেন এবং নরওয়ে তাহাদের ক্ষুদ্রস্বার্থ অর্থাৎ আত্মরক্ষার নিকট বৃহত্তর স্বার্থ অর্থাৎ ইউরোপের নিরাপত্তাকে বলি দিয়াছেন। কিন্তু মাত্র এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র দুইটিই এই দোষে দোষী নয়। এতাবৎকাল বৃহত্তর রাষ্ট্রসমূহও "চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা"নীতিরই অনুসরণ করিয়া মুখে বড় বড় বুলি আওড়াইতেছিলেন। কাজেই বৃটেন এবং ফ্রান্সের নরওয়ে এবং সুইডেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার বিশেষ কোন যুক্তি অথবা অধিকার নাই।

নিতান্ত দুঃখের বিষয়, বিপন্ন ফিনল্যাণ্ডের আহ্বানে প্রথম হইতে কেহই উপযুক্ত সাড়া দেয় নাই। দিনের পর দিন মিত্রশক্তির কর্ণধারগণ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের যে বিশেষ কোন নীতি কিংবা কর্ম্মপদ্ধতি ছিল তাহাও প্রতীয়মান হয় না। শেষ পর্য্যন্ত যখন তাঁহারা প্রস্তুত হইলেন তখন নিরপেক্ষ শক্তিদ্বয় সমস্ত ব্যবস্থা পণ্ড করিয়া দিল।

পোলাণ্ডের ভয়াবহ দৃষ্টান্ত ফিনল্যাণ্ডের মনে জাগরূক ছিল। তাই শেষ পর্য্যন্ত যখন চেম্বারলেনের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আসিল—তখন রণক্লান্ত, অবসন্ন ফিনদের তাহার দিকে আর কোন আগ্রহ রহিল না।

যদি আজ ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর আসনে কোন যোগ্যতর ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকিতেন তাহা হইলে হয়ত বৃটেনের পক্ষে এই সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট হইত না। লণ্ডনস্থিত সোভিয়েট রাজদূত প্রথম যে সন্ধিসর্ত্ত প্রদান করিয়াছিলেন যদি ইংলণ্ড তাহা ফিনল্যাণ্ডকে গ্রহণ করিতে সম্মত করাইত তাহা হইলে সোভিয়েট ও বৃটেনের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় হইত। হিটলার এবং ষ্টালিনের মধ্যে এখনও পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস সুপ্ত হয় নাই। সন্ধির সর্ত্ত গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ড রুশের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিত এবং সঙ্গে সঙ্গে জার্মানী ও সোভিয়েটের মৈত্রী ক্ষুণ্ণ হইত। কিন্তু মিঃ চেম্বারলেন ভুল বুঝিলেন। তিনি ফিনদিগকে বাধাপ্রদানে উৎসাহিত করিলেন এবং এজন্য সোভিয়েটের সহিত যুদ্ধে তাঁহার আপত্তি ছিল না। অথচ শেষ পর্য্যন্ত সন্ধির সর্ত্ত, যাহা লণ্ডনস্থিত রুশ রাজদূত প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাই গৃহীত হইল।

যে ধনিকসম্প্রদায় দ্বারা ইংলণ্ড শাসিত তাহারা যে কম্যুনিষ্ট রুশিয়ার সহিত সহযোগিতা করিবে তাহা বিশ্বাস করা ভুল। একমাত্র এই কারণেই যে জার্মানী এবং রুশিয়ার মধ্যে অহি-নকুল সম্বন্ধ ছিল তাহারা আজ পরস্পর সখ্যে আবদ্ধ।

তারপর প্রতিবেশী নরওয়ে ও সুইডেন। প্রথম দিকে খানিকটা সাহায্য তাহারা ফিনল্যাণ্ডকে দিয়াছিল। তার পরেই তাহা বন্ধ হইয়া গেল। অবশেষে মিত্রশক্তির বাহিনীকে তাহাদের ভিতর দিয়া ফিনল্যাণ্ডে প্রবেশ করিতে দিতে প্রবল আপত্তি উত্থাপিত হইল। তাহাতে
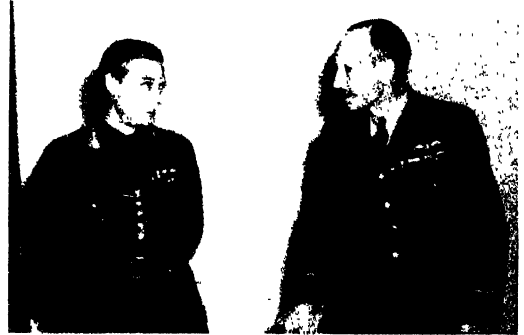
ডিউক অফ্ উইণ্ডসর ফ্রান্সে বিমান বিভাগের কর্ত্তার সহিত বিমানবাহিনী দেখিতেছেন

অবশ্য মিত্রশক্তির কতকটা সুবিধা হইয়াছে। এই ব্যাপারের দায়িত্ব নরওয়ে এবং সুইডেনের ঘাড়ে চাপাইবার সুযোগ ঘটিল।

যুক্তরাষ্ট্র আরও এক কাঠি উপরে। তাঁহারা যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় কিছু কিছু রসদ জোগাইয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমে তাহা থামিয়া গেল। তারপর টাকা ধার দিতে আরম্ভ করিলেন; তাহাও আবার অল্প সময়ের মধ্যে বন্ধ হইল। তারপর আসিল বিবৃতির পালা। তাহাও কালক্রমে থামিয়া গেল। তারপর সব চুপ।

আর এদিকে, মহাকালের তাণ্ডব চলিতে লাগিল। তুষারের উপর রক্তলেখার বিরাম হইল না। অবসন্ন ফিনের আর্ত্তকণ্ঠ জগতের নিকট করুণা ভিক্ষা করিয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া রুদ্ধ হইয়া গেল।

আবার গণতন্ত্রের মহিমা প্রচারিত হইবে। বিশ্বশান্তির নামে বড় বড় বাণী উচ্চারিত হইবে। কেবলমাত্র ইতিহাসের পাতায় বিংশ

শতাব্দীর চতুর্থ দশকের এই হীন, নীচ এবং নির্লজ্জ অভিনয় মূক সাক্ষী হইয়া রহিল।

ফিনল্যাণ্ডের ব্যাপারে চেম্বারলেনের পররাষ্ট্রনীতির মোটামুটি ফল দাঁড়াইল এইরূপ: উভয়পক্ষে ন্যূনকল্পে একলক্ষ দশ হাজারের উপর সৈন্য নিহত এবং চার লক্ষের উপর আহত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ নরনারী আশ্রয়হীন হইয়াছে। একটি সমগ্র রাষ্ট্র সোভিয়েটের করতলগত হইয়াছে। ভবিষ্যতে ফিনল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রনীতি বলিতে কিছু থাকিবে না। হাঙ্গোর সামরিক ঘাঁটি মিত্রশক্তির পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারে।

ততঃ কিম্

রুশ-ফিন সন্ধির প্রতিক্রিয়া ইউরোপে এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভূভাগে কি ভাবে দেখা দিবে তাহা আলোচনা করিবার সময় হয়ত এখনও

সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ জঙ্গীলাট সার চার্লস ফোর্ডেসের সহিত স্কটল্যাণ্ডে নৌবাহিনী দেখিতেছেন

আসে নাই। কিন্তু এইটুকু বলা যায় যে, ফিনল্যাণ্ডের ঘটনাবলীর উপর যবনিকাপাত হইলেও এই মহানাটকের অভিনয় অন্য পটভূমিতে আরম্ভ হইবে। ঘটনাস্রোত কোন্ মুখে ধাবিত হইবে তাহা বর্ত্তমানে কেহই নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন না।

নরওয়ে, সুইডেন এবং ফিনল্যাণ্ড এই ত্রিশক্তির মধ্যে আত্মরক্ষাত্মক একটি সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই প্রস্তাব কার্য্যকরী হওয়ার সম্বন্ধে রাজনীতিকমহল গভীর সন্দেহ পোষণ করেন। ফিনল্যাণ্ড যখন আক্রান্ত হইয়া সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন করে তখন কেহ অগ্রসর হয় নাই। আর এখন বিজয়ী সোভিয়েটের বিরুদ্ধে তাহারা দলবদ্ধ হইতে সাহসী হইবে একথা বিশ্বাস করা দুরূহ। হিটলার কর্ত্তৃক মিউনিক অধিকারের পর চেকোশ্লোভাকিয়ার যে অবস্থা হইয়াছিল তাহার সহিত ক্যারেলীয়-যোজকবিহীন ফিনল্যাণ্ডের তুলনা চলে। তখন যদি ফরাসী ও বৃটেনের মত প্রবল শক্তি জার্মানীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস না করে, তবে এক্ষেত্রে নরওয়ে ও সুইডেনকে তাহাদের সাহসের অভাবের জন্য বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি? যদি একথা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, জার্মানীর ভয়ে তাহারা মিত্রশক্তিবাহিনীর গমনাগমনের অনুমতি প্রদান করে নাই—তাহা হইলে সেই ভয় যে এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিরোহিত হইবে তাহার আশা অল্প। সুইডেনের পররাষ্ট্র সচিব গান্থার সেদিন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, নিরপেক্ষতা ত্যাগ করিলে সুইডেনকে অবশ্যই মহাসমরে লিপ্ত হইতে হইত এবং যুধ্যমান প্রবল শক্তিসমূহ তাহাকে স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির ক্রীড়নক রূপে ব্যবহার করিত।

মলোটভ সেদিন তাহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন,"রুশ-ফিন সন্ধির বিরুদ্ধে যে-কোন প্রচেষ্টা রোধ করিতে আমরা দৃঢ়সংকল্প। আত্মরক্ষাত্মক মৈত্রীর প্রস্তাবের অন্তরালে নরওয়ে, সুইডেন এবং ফিনল্যাণ্ড সেই চেষ্টা করিতেছে। একথা বোঝা খুব কঠিন নহে যে, এই মৈত্রীর অর্থ রুশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ। যদি নরওয়ে এবং সুইডেন এরূপ কোন সখ্যতাবন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহা হইলে আমরা মনে করিব যে তাহারা নিরপেক্ষ নীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

মলোটভের এই উক্তির পরেও নাকি সুইডেন সন্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বিরত হন নাই, কিন্তু এই সংবাদের উপর আস্থা স্থাপন করা কঠিন। অবশ্য এই সঙ্গে একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, একমাত্র স্কাণ্ডিনেভিয়ার ভিতর দিয়াই রুশ ও জার্মানী আটলাণ্টিক মহাসাগরে সোজাসুজি প্রবেশ লাভ করিতে পারে। কিন্তু উহা যে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে হিটলার এবং ষ্টালিনের লক্ষ্যস্থল তাহা মনে হয় না।

হাওয়া কোন্ দিকে?

কিন্তু যুধ্যমান শক্তিসমূহ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে না। মহাসমর যে শীঘ্রই বিস্তৃতি লাভ করিবে সে কথা সেদিন উইনষ্টন চার্চ্চিল বলিয়াছেন। কিন্তু হিটলার যদি উন্মাদ না হয়, তাহা হইলে ম্যাজিনো লাইনের উপর প্রবল আক্রমণ করিয়া আপনার শক্তি ক্ষয় করিবে না। চার্চ্চিল বলেন, দশ লক্ষের উপর জর্মান সৈন্য লাক্সেমবুর্গ, বেলজিয়ম এবং হলাণ্ডের সীমান্তে সমবেত হইয়াছে। এই বিরাট বাহিনী মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রত্রয়ের উপর আপতিত হইতে পারে। ইহাই হইল ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থা।

মহাসমরের অন্য দিক

কিন্তু চার্চ্চিল আর একটা দিকের কথা উল্লেখ করেন নাই; হয়ত অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপ, বিশেষত রুমানিয়া, বল্টিক

কেন্দ্রে পরিণত হইতে পারে। তবে শোনা যাইতেছে, সোভিয়েটের সঙ্গে রুমানিয়ার একটা চুক্তি হইয়া গিয়াছে। জর্মানী নাকি রুমানিয়া হইতে নিয়মিত তৈল সরবরাহের প্রতিশ্রুতির পরিবর্ত্তে এই চুক্তি সঙ্ঘটন করাইয়াছে। অবশ্য মলোটভ তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, যদি এরূপ কোন সন্ধি হইত তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে বেসারবিয়া সংক্রান্ত সমস্যারও সমাধান হইয়া যাইত। চুক্তি হউক আর না হউক, ষ্টালিন যে বেসারবিয়ার উপর তাহার সমুদয় দাবী প্রত্যাহার করিবেন তাহা মনে হয় না। সোভিয়েট রক্তের আস্বাদ পাইয়াছে। শিকার হাতে পাইলে কে ছাড়িয়া দেয়?

কিন্তু যদি বাস্তবিকই রুশ তাহার দাবী ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে জর্মানীর পক্ষে উহা পরম লাভের কারণ হইবে। বল্কানে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে না; ইটালীর সঙ্গে রুশিয়ার বল্কানের উপর কর্ত্তৃক লইয়া বিরোধ ঘটিবে না এবং জার্মানীর তৈল সরবরাহের পথ নিরঙ্কুশ হইবে। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে ঝটিকাকেন্দ্র রুমানিয়া হইতে মধ্যএসিয়ায় স্থানান্তরিত হইবে। ককেসাসের অন্তঃপাতি খনিসমূহ অফুরন্ত তৈলের আকর। সোভিয়েট ও মিত্রশক্তি উভয়েরই উহা লক্ষ্যস্থল। কিন্তু ভারতের পক্ষে তাহা মোটেই শুভ নহে; যুদ্ধ তখন আমাদের দরজার গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইবে। তবে ভরসার কথা এই, ককেসাস ও ভারতের মধ্যবর্ত্তী অনেকগুলি দেশ রহিয়াছে। সেগুলি অতিক্রম করিয়া যুদ্ধ আমাদের দেশে পৌঁছিতে দীর্ঘ সময় কাটিয়া যাইবে।

রুশিয়ার তোড়জোড়

মধ্য এসিয়ায় যুদ্ধ আসন্নই হউক অথবা দূরবর্ত্তী হউক, রুশিয়ার কিন্তু চেষ্টার অন্ত নাই। রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, আফগানিস্থানের উত্তরে অবস্থিত সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র তাজিকিস্থানে বহু সামরিক রাস্তা নির্ম্মিত হইতেছে। সমস্তগুলি রাস্তাই রাজধানী ষ্টালিনাবাদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অন্য সংবাদে প্রকাশ, দুইটি জর্মানবাহিনী ককেসাস এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অঞ্চল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে শোনা গিয়াছিল, জর্মানীর সহায়তায় সোভিয়েট তুরস্ক এবং ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের কল্পনা করিতেছে। তুরস্ক এবং ইরানের সীমান্তে অবস্থিত সোভিয়েট অধিকৃত অঞ্চলসমূহে অতি দ্রুতবেগে দুর্গ নির্ম্মাণকার্য্য হইতেছে। ঐ সকলের পরিকল্পনা করিয়াছেন ডঃ টড—সিগফ্রিড লাইনের শিল্পী। বিলাতের সুবিখ্যাত পত্রিকা "নিউজ ক্রনিক্‌ল্‌স" আমষ্টার্ডামস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, মিত্রশক্তি এবং রুশ উভয়-পক্ষের ইঞ্জিনিয়ারগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, কে প্রথমে বসন্ত আগমনের পূর্ব্বে নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা করিতে সমর্থ হইবেন।

কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই সোভিয়েট পত্রিকাসমূহে তুরস্ক এবং ইরানের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিষোদ্গার চলিতেছে। সচরাচর দেখা যায়, সামরিক আক্রমণ সুরু হইবার পূর্ব্বে সংবাদপত্রের ভিতর দিয়া প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ চলিতে থাকে। হয়ত এই কারণেই সেদিন তুরস্ক গভর্ণমেণ্ট দেশরক্ষা আইন প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী তাঁহার গত বিবৃতিতে বলিয়াছেন তুরস্ক সর্ব্বপ্রকার বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত।

মিত্রশক্তিও আয়োজনের ত্রুটি করিতেছেন না। জেনারেল ওয়েগাঁও মিশরের সেনানায়কগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সুয়েজ রক্ষার জন্য অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড হইতে তথায় সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। সিরিয়াতে ফরাসীগণ এক বিরাট বাহিনী সংস্থাপিত করিয়াছেন তাহার সংখ্যা প্রায় চার লক্ষ। পূর্ব্ব-আনাতোলিয়ায় তুরস্কসৈন্যও প্রায় চার লক্ষ হইবে। তদ্ব্যতীত তথায় বহু পরিমাণে ভারতীয় ও মিশরী সেনা সংস্থাপিত করা হইয়াছে। সুয়েজ খাল এবং ইরাকের তৈলের খনি এই দুইটিই বৃটিশের পক্ষে সমান প্রয়োজনীয়; তাই এই বিপুল উদ্যোগ।

ওয়াকিবহাল মহলে প্রকাশ তুরস্ক, ইরান এবং ইরাক এই তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছে। মিশরও নাকি তাহাতে যোগদান করিতে পারে। এ সংবাদ কতটুকু সত্য, তাহা জানা যায় নাই। যদি সত্য হয় তাহা হইলে মধ্য-এশিয়ায় মিত্রশক্তির প্রভাব সুদৃঢ় হইবে। প্রকৃতপক্ষে বল্কানের চাবি তুরস্কের হাতে এবং মধ্য-এসিয়ায় ইরানের ভৌগলিক অবস্থান সামরিক নীতির দিক দিয়া অত্যন্ত সুবিধাজনক। বর্ত্তমান অবস্থায় নীতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন কিংবা কোন শক্তির পক্ষাবলম্বন ইরানের অভিপ্রেত নহে। তবে সোভিয়েট আক্রমণের ইঙ্গিত পাইলে ইরানের পক্ষে তাহার প্রতিবেশী তুরস্ক ও ইরাকের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বিচিত্র নহে।

বল্কানে বা মধ্য-এসিয়ায় ঘটনাস্রোত কোন্ দিকে ধাবিত হইতেছে তাহা সঠিক নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এ কথায় কোন সন্দেহ নাই যে আগামী ছয় মাসের মধ্যে মহাসমরের গতি অন্য দিকে ফিরিবে। যদি পশ্চিম রণাঙ্গন নিস্তব্ধ থাকে তাহা হইলে ইউরোপের পূর্ব্বভাগে সমরানল প্রধূমিত হইয়া উঠিবে। যদি মধ্য-এসিয়া পাশ্চাত্য জাতিসমূহের রণস্থলে পরিণত হয় তবে ভারতের পক্ষে তাহার পরিণাম কি হইবে?

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-সপ্তাহ

শ্রীমণিকা ঘোষ

গত ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় বালীগঞ্জ গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-সপ্তাহ ও প্রদর্শনী সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানের নান্দী পাঠ করেন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ জে, এম বটম্লী এবং উদ্বোধন করেন বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ, কে ফজলুল হক। প্রধান মন্ত্রী প্রদর্শনীরও দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সহস্রাধিক শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী, গণ্যমান্য, ভদ্রমহোদয়গণ এবং বিশিষ্ট ভদ্রমহিলাগণ উপস্থিত হইয়া এই অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। এই অনুষ্ঠান কেবল সাংসিকের-

মিঃ বটমলী—শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর — মিঃ এস্-কে-ঘোষএম-এ (ক্যাণ্টাব)

অধ্যবসায় নয়, উদ্দেশ্যহীন রূপাড়ম্বরের নিছক-ভনিতা নয়, ইহার বিকাশের ইতিহাস আছে। একটি মনের আকাঙ্খা, একটি প্রাণের অনুপ্রেরণা অদৃশ্যপথে চলিতে চলিতে কেমন করিয়া সহসা একদিন আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে—"পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-সপ্তাহ ও প্রদর্শনী"—তাহারই একটা প্রতিধ্বনি। ১৯৩৬ সালের কথা। শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হকের অভিনব প্রেরণায় জ্ঞানও মৈত্রীমূলক "নিখিলবঙ্গ-শিক্ষা-সপ্তাহ" পূর্ণাঙ্গরূপে দেখা দিয়াছিল। সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রীর মনের যে সৃষ্টিরহস্য নবীন আষাঢ়ে নূতন বীজ বপন করিয়াছিল, আজ চারি-বৎসরের দীর্ঘপথ চলিয়া আসিয়া সে তাহার প্রথম ফলকে হাতে পাইয়াছে। সেদিন বাঙ্গালাদেশের নগরও পল্লী হইতে বহু শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী সম্মেলনের প্রতিনিধি হইয়া একত্র সমবেত হইয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মিঃ হক্ তাঁহার সাবলীল বক্তৃতার মধ্যে শিক্ষা-সপ্তাহের প্রগতিকে অভিনন্দিত করিয়া "নিখিল-বঙ্গ শিক্ষা-সপ্তাহ" না করিবার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। তিনি বলেন—বাঙ্গালাদেশ একটি বিরাট দেশ; ইহার সকলস্থান হইতে সকল শিক্ষাব্রতীকে একত্র সমবেত করা সম্ভবপর নয় বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ নামক দুইটি পৃথক শিক্ষা-সপ্তাহের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। নারী-শিক্ষা প্রসঙ্গে হক্সাহেব বলেন—নারী ও পুরুষের জন্য শিক্ষার পথ বিভিন্ন হওয়া' উচিত। নারীর বিশ্ব-বিদ্যালয় হইবে স্বতন্ত্র, তাহাদের শিক্ষা-পদ্ধতিও হইবে স্বতন্ত্র। বৃত্তিনিচয়ের পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে লক্ষ্য করিলে ইহার সারবত্তা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আশা করা যায়, হক্সাহেব তাঁহার এই সদিচ্ছাটি কার্য্যে পরিণত করিয়া বাঙ্গালাদেশের মহিলাবৃন্দের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ণধার মিঃ আজিজুল হক্ দরিদ্র শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক সমবেদনা জানাইয়াছেন। তিনি শিক্ষকমণ্ডলীর দুর্দ্দশার জন্য ব্যথিত। তাঁহার মতে তাঁহারা সমাজ হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন। নাগরিকের যোগ্য মান তাঁহারা পাইতেছেন না। তাহার কারণ, দেশের বর্ত্তমান দুর্গতি। দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণ, জাতীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার যোগ্য ভার যাহাদের হাতে, তাঁহারা শিক্ষক, তাঁহারা শিক্ষাব্রতী। ছাত্রছাত্রীগণ যাহাতে ভবিষ্যতে মানুষ হইয়া তাহাদের জীবন-যাত্রার পথ চিনিয়া লইতে পারে, যাহাতে তাহারা প্রকৃত নাগরিক হইতে পারে, প্রকৃত সৈনিক হইতে পারে—একথা ভাবিবার সময় বাঙ্গালার

শিক্ষকমণ্ডলীর আজ আসিয়াছে। তাঁহাদের শিক্ষা প্রভাবের মধ্য দিয়া যেন ছাত্রছাত্রীগণের সুকুমার চিত্তে দেশাত্মবোধ, সামাজিক কল্যাণ জাগরূক হইয়া থাকে।

৫ই ফেব্রুয়ারী মহিলা-দিবস অনুষ্ঠিত হয়। মহারাণী সুচারু দেবী সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি মহিলাগণের শিক্ষার উন্নতি-বিষয়ে উৎসাহ দান করিয়া একটি সুন্দর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সেদিন প্রায় সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ মহিলা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীগণ বহু ছাত্রী লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রায় দুই সহস্র মহিলার সমাগম হইয়াছিল। সেদিন অপরাহ্নে মিসেস্ বি-এল্-চৌধুরী পরিচালিত সঙ্গীত-সম্মিলনীর ছাত্রীগণ নৃত্যগীত বাদিত্রের দ্বারা উপস্থিত সকলের চিত্তবিনোদন করিয়াছিল। ছায়াচিত্রযোগে খ্যাতনামা ডাঃ ডি-এন্-মৈত্র স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

শিক্ষা-সপ্তাহের সমগ্র অনুষ্ঠানটির মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল প্রদর্শনী। ইহাই হইল শিক্ষা-সপ্তাহের এক আত্মিক বিকাশ। ইহাতে ছিল, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণের হস্তশিল্পের ভূরি ভূরি নিদর্শন। কয়েকটি শিশুপাঠ্য পুস্তকের দোকানও আসিয়াছিল; বীডন্ ষ্ট্রীটস্থ ভারতী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণের সুনিপুণ কারুকার্য্য, চর্ম্মশিল্প, বেতের সাজ বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেক্‌নিক ইন্‌ষ্টিটিউশনের শিল্পকুশলতা, কলিকাতা, খুলনা, খড়্গপুর-বি-এন-রেলওয়ে, আরও অপরাপর কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের চিত্রাঙ্কনগুলির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এতদ্ভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়গুলির শিল্পসাধনা তাহাদের অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছে। আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটি চিত্র সত্যই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। বাঙ্গালার সরকারী শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ জে-এম-বটম্‌লীর প্রেরণায় সকল কার্য্য সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

এই অনুষ্ঠানের সকল কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন সভাপতিরূপে খাঁন বাহাদুর এম-এ-জাফর এবং সম্পাদকরূপে মিঃ এস-কে-ঘোষ মহোদয়। যাহা হউক, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক-সমাজের আন্তরিক সহানুভূতিতে ও শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের অতন্দ্রিত চেষ্টাতেই যে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, ইহা বলিয়া দিতে হইবে না। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষক-জগতে যে নববাণী প্রচারিত হইয়াছে, জয়যাত্রায় যে নব পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে, যে নবীন

খান বাহাদুর এম-এ-জাফর

আলোকের সন্ধান মিলিয়াছে, তাহার ফল কখনই ব্যর্থ হইবে না। নূতন শক্তি, নবীন পরিকল্পনা, নবীন ভাবধারা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক-সমাজকে যে প্রগতির পথে ঠেলিয়া দিবে, ইহা দুরাশা নহে। আমরা সেই দিনের জন্য অপেক্ষায় থাকিলাম—যেদিন শিক্ষকের স্থান হইবে সর্ব্বাগ্রে এবং শিক্ষকের নিষ্ঠা, শিক্ষকের জ্ঞান, শিক্ষকের বাণী ও সাধনা দেশের ভবিষ্যৎ কৃষ্টির সহিত সুর মিলাইয়া জাগরণের গান গাহিয়া যাইবে।

বিশ্বভারতী—

কবিগুরু প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বাঙ্গালার গৌরবের বস্তু। এই প্রতিষ্ঠানটি বাহিরের সাহায্য হইতেই পরিচালিত হয়; কিন্তু অর্থাভাবে ইহার কাজ তেমন সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইতেছে না, কোন কোন বিভাগে ব্যয় সঙ্কোচের ফলে অনেক অসুবিধাও দেখা গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সারা-জীবনের সাধনায় গড়া বিশ্বভারতী সম্বন্ধে বাঙ্গালার ধনী এবং বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিরা হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিবেন ইহা ভাবিতেও কষ্ট বোধ হয়। অবিলম্বে তাঁহাদিগকে নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিতে দেখিলে আমরা আনন্দিত হইব।

কংগ্রেস বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে রাষ্ট্রপতি আবুল কালাম আজাদ বক্তৃতা করিতেছেন

কংগ্রেস নগরে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রভৃতি ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় যাইতেছেন

পরলোকে মৌঃ ইয়াকুব হাসান—

মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসী মন্ত্রী মৌলানা ইয়াকুব হাসান রামগড় কংগ্রেস হইতে ফিরিবার পর হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, কিন্তু মত বিরোধের ফলে পরে তিনি মুসলিম লীগের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসে

যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে মাদ্রাজের কংগ্রেস দল একজন বিশিষ্ট মুসলিম সহকর্ম্মী হারাইল।

বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে রাষ্ট্রপতি আজাদ, সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল ও মহাত্মা গান্ধী

ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের সম্মান—

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, বিলাতের রয়াল সোসাইটি শ্রীযুক্ত কে-এস-কৃষ্ণনকে এফ্-আর-এস উপাধি দান করিবেন স্থির করিয়াছেন। ভারতীয়দের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে স্বর্গীয় ডক্টর রামানুজম্, স্বর্গীয় স্যর জগদীশচন্দ্র বসু, অধ্যাপক ডক্টর মেঘনাদ সাহা, সার সি-ভি-রমন এবং ডক্টর বীরবল সাহানী এই উচ্চসম্মান লাভ করেন।

রামগড়ে বৃষ্টির পর কংগ্রেসে প্রতিনিধিবর্গের অবস্থা

বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-মন্দির—

গত ১৭ই মার্চ রবিবার মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার অধীন বীরসিংহ গ্রামে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের পৈত্রিক ভিটায় বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-মন্দিরের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পৌরোহিত্য করেন। সভায় প্রায় পাঁচ হাজার নরনারী সমবেত হইয়াছিল। যাঁহারা এই মন্দির নির্ম্মাণ

রামগড় কংগ্রেসে ব্রহ্মদেশীয় প্রতিনিধিগণ

কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যান্যের সহিত বিশেষ করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেনের নাম কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হয়। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় গ্রন্থাবলীর তৃতীয় বা শেষ খণ্ড সভায় উপস্থাপিত করেন। সভাপতি মহাশয় অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন ও মন্দির উদ্বোধন করেন। এক বছরে মেদিনীপুর শহর ও বীরসিংহ গ্রামে যে সকল মহোদয়ের চেষ্টায় স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ সম্ভব হইয়াছে, আমরা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগের প্রতি সকৃতজ্ঞ সাধুবাদ অর্পণ করিতেছি।

কংগ্রেসে বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির প্রবেশ পথের জনতা

প্রাদেশিকতার ধুঁয়া—

বাঙ্গালার দরজা ভারতের সকল প্রদেশের জন্য খোলা, কিন্তু বাঙ্গালীর দরজা ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই বন্ধ হইতে চলিয়াছে। এ বিষয়ে বিহার সকলের অগ্রণী। সম্প্রতি আসামও তাহার অনুসরণ করিতে উদ্যত। আসাম সরকার আইন পাশ করিয়া পক্ষপাতিত্ব করিয়া আসামের বাঙ্গালা-ভাষীদের প্রতি অসঙ্গত বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছেন। আসামপ্রবাসী বাঙ্গালীদের এক সম্মিলনীতে সভাপতি ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এই সমস্যার নানা দিক দিয়া আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান তখনই সম্ভব, যখন দেশের মধ্যে অখণ্ড জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তোলা সম্ভব হইবে। প্রাদেশিকতা ভারতীয় জাতীয়তার বিশেষ পরিপন্থী—একথা যে অন্য প্রদেশবাসীরা বোঝেন না বা জানেন না, তাহাদের সম্বন্ধে এতবড় হীনধারণা আমরা পোষণ করি না। কিন্তু কার্য্যত তুচ্ছ স্বার্থবোধ তাঁহাদিগকে এমন সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। যতক্ষণ না তাঁহারা এই ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া ভারতের বৃহত্তর স্বার্থে উদ্বোধিত হইবেন ততক্ষণ এই ভেদবুদ্ধির অবসান হইবে না।

ভারতরক্ষা আইনের প্রকোপ—

গত ২৭ মার্চ বাঙ্গালার ব্যবস্থা পরিষদে রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর প্রশ্নের জবাবে বাঙ্গালার অন্যতম মন্ত্রী খাজা স্যর নাজিমউদ্দীন বলেন যে, ভারত রক্ষা আইনের বলে

রামগড়ে রাষ্ট্রপতি আজাদ গাড়ী হইতে নামিতেছেন

বাঙ্গালাদেশে এ পর্য্যন্ত ৫৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং ৫৯ জনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে। ঐ দিনই পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদেও সর্দ্দার মোহন সিং যশের প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে কবুল করা হইয়াছে যে, এ পর্য্যন্ত পাঞ্জাবে ২০৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই দুই প্রদেশের মধ্যে বাঙ্গালা সরকারই যে কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় বেশী দিতে পারিয়াছেন ইহাতে আমাদের গৌরব করা উচিত, না লজ্জায় অধোবদন হওয়া উচিত—তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।

তি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

মাকিন শান্তিদূত মিঃ সামনার ওয়েলস ও ফরাসী রাষ্ট্রপতি লেবরা
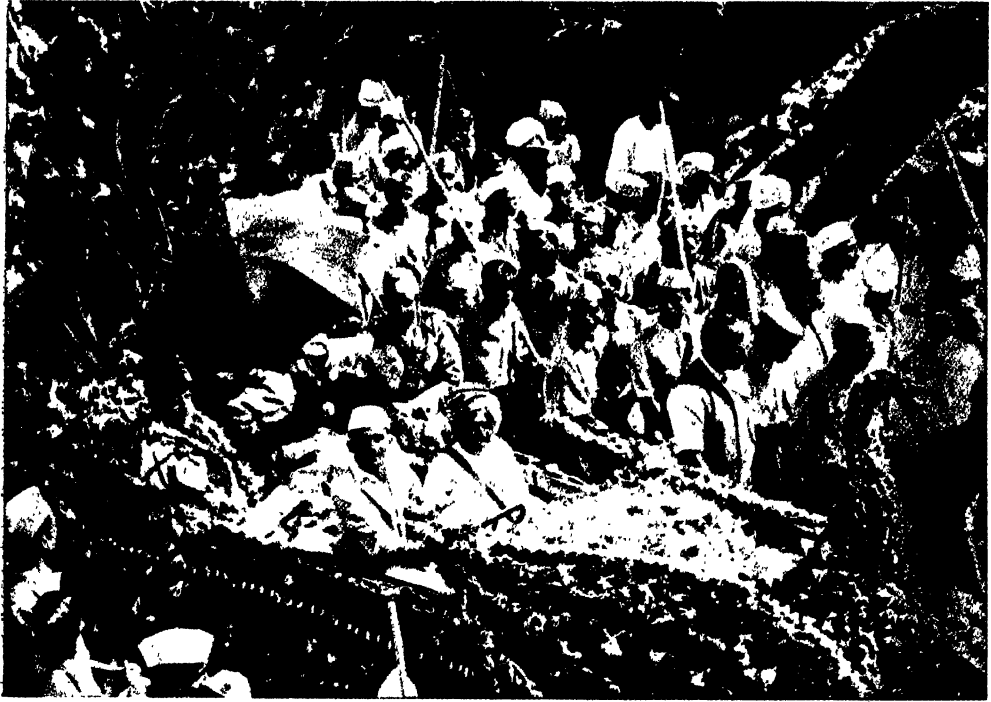
রাষ্ট্রপতি সম্বর্দ্ধনার মিছিল, রামগড়।   ময়ূরের আকারে সজ্জিত মোটরে মৌলানা আজাদ

অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল—

প্রসিদ্ধ অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। বর্দ্ধমানবিভাগ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চতর পরিষদ) সভ্যপদের জন্ত উপনির্ব্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইয়াছিলেন এবং নির্ব্বাচনকালে স্বয়ং উপস্থিত থাকিবার জন্ত তিনি মোটরে আসানসোল হইতে বর্দ্ধমানে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে মোটরখানি উল্টাইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যায়। তিনি ছিলেন একজন প্রথমশ্রেণীর পণ্ডিত এবং প্রসিদ্ধ অধ্যাপক। কিন্তু পরাধীন দেশের ডাককেও তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তাই কংগ্রেসের নিষ্ঠাবান সেবক হিসাবেও তিনি প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং হাসিমুখে কারাবরণও করিয়াছিলেন। বিগত শাসনতন্ত্রে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ অর্জ্জন করিয়া নির্ভীকতা ও বাগ্মিতার প্রমাণ বহুবার দিয়াছিলেন। নানাভাবে তিনি দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে সমাসীন ছিলেন। ছাত্রেরা তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত, দেশবাসী তাঁহাকে ভালবাসিত, সুতরাং তাঁহার অকালবিয়োগে সকলেই ব্যথিত হইবেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা মাতা ও পুত্রের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি ও ভগবানের নিকট তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তিলাভ কামনা করিতেছি।

হাজারীবাগে বিহার বাঙ্গালী-সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সমবেত বাঙ্গালীবৃন্দ

ভোটদাতাদের তালিকা—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভোটদাতাদের নূতন তালিকার খসড়া ১লা এপ্রিল প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ববারে

পানিহাটী গোবিন্দকুমার হোমের পুরস্কার বিতরণী সভায় গভর্ণর-পত্নী লেডী মেরী হার্বার্ট

যে সকল ভোটদাতার নাম তালিকায় স্থান পায় নাই, তাঁহাদের নাম যাহাতে এবারে বাদ না পড়ে তৎপ্রতি আমরা কংগ্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এদেশের অধিকাংশ লোক এখনও ভোটাধিকারের সত্য মূল্য কি তাহা জানে না এবং ভোটদানের যোগ্যতা কিসে হয় তাহাও অনেকেরই অজানা। সুতরাং সময় থাকিতে সুপরামর্শ পাইলে অশিক্ষিত ও অজ্ঞ ব্যক্তিরাও সম্যক সচেতন হইতে পারে। তাই আমরা কংগ্রেসকে এই কার্য্যে উদ্যোগী হইয়া ভোটার-তালিকা সংশোধনে জনগণকে সাহায্য করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেসনে উপাধিপ্রাপ্ত মহিলাবৃন্দ

যুদ্ধ ও বাঙ্গালার শ্রমশিল্প—

ইউরোপে যুদ্ধ ঘোষণার পর হইতে এদেশে ঔষধপত্র ও নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। অথচ এদেশে এই সব অত্যাবশ্যক দ্রব্য এখন যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয় না, যাহাতে দেশের সকল চাহিদা নির্ব্বাহিত হইতে পারে। আর সেই কারণে ইতিমধ্যেই চিকিৎসা ও ব্যবসায়ের বাজারে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই সব কিছুর অভাব দেখা দিবে। মূল্যের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। সম্প্রতি ভারত সরকার যে শিল্পবিস্তার বোর্ড গঠনের পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদিগকে পরামর্শের জন্য আহ্বান করা হইবে এবং তাঁহাদের সম্মিলিত অনুমোদনক্রমে বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা করা হইবে জানা গিয়াছে। কিন্তু এদেশের কল্যাণজনক কার্য্যে যেরূপ মন্থরতার প্রাদুর্ভাব হয় তাহাতে কবে যে কার্য্য সুরু হইবে—তাহা কে বলিবে?

জনস্বাস্থ্য বিভাগের বরাদ্দ—

বাঙ্গালা সরকারের চিকিৎসা বিভাগের ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ গিয়াসউদ্দীন আহ্‌ম্মদ পল্লীর অস্বাস্থ্য ও তৎপ্রতি সরকারের নির্বিকার ঔদাসীন্যের দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন। অন্য নানা রোগের কথা ছাড়িয়া দিলেও শুধু ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরে বাঙ্গালার পল্লীতে বছরে যে কত অসহায় নরনারীর জীবন নষ্ট হয় তাহা যে সরকার অবগত নহেন, একথা বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠা জাগে। কিন্তু এই সমস্যার সমাধানের জন্য যে ব্যবস্থার প্রয়োজন.বাঙ্গালার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের মতে সরকারের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় সেরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। বাঙ্গালা দেশে পুলিশ বিভাগের টাকা কম হইলে চলে না, অথচ দেশে যে হাজার হাজার নরনারী রোগে ভুগিয়া বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, তাহাদের রক্ষা করার দায়িত্ব সরকার অর্থাভাবের অজুহাতে স্বীকার করিতে চাহেন না। অথচ ইহাদেরই প্রতিনিধি হইয়া মন্ত্রী মহাশয়েরা বাঙ্গালা দেশ শাসন করিতেছেন!

বেতার ও তাহার উপযোগিতা—

মাত্র কয়বৎসর পূর্ব্বে ভারতে প্রথম সরকারী তত্ত্বাবধানে বেতার বিভাগ খোলা হয় এবং বোম্বাই ও কলিকাতায়

প্রতিষ্ঠিত দুইটি কেন্দ্র হইতে সমগ্র ভারতে মাত্র এগার হাজার লাইসেন্স বিলি করা হয়। গত পাঁচ বৎসরে কেন্দ্রের সংখ্যা সাতটিতে দাঁড়াইয়াছে এবং বেতার লাইসেন্সের সংখ্যাও প্রায় লক্ষাধিক হইয়াছে। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যাইবে, বেতার কিরূপ জনপ্রিয় হইতে চলিয়াছে। পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্য দেশেই বেতারকে জনশিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা একাধারে শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদ ও সংবাদ প্রচারের কাজে নিয়োজিত।• ভারতে ইহার ব্যাপক প্রসার সত্ত্বেও ইহা এখনও ঠিক এই স্তরে আসিয়া পৌছায় নাই। কবে যে লক্ষে আসিয়া পৌঁছিবে তাহা বলা কঠিন। কেন না, ইহার পরিচালনায় যে নীতি প্রকট হইয়া পড়িতেছে তাহাতে দেশের কল্যাণকামী আরও সব প্রতিষ্ঠানের মতই ইহাও তথাকথিত হইয়া রহিবে কি-না বলা যায় না।

ভারতের স্বাধীনতার অন্তরায়—

হিন্দু-মুসলমান সমস্যাই নাকি ভারতের স্বাধীনতার পথের অন্যতম অন্তরায় এবং যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতার বিরোধী তাঁহারাই এই কথাটা যেখানে সেখানে প্রচার করিয়া বেড়ান। কিন্তু আসলে এই সমস্যা খুব বেশী দিনের ব্যাপার নহে। দেড়শত বৎসরের বিদেশী শাসনের ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর ভেদনীতিই এই সমস্যার মূল। সুতরাং যাহাতে বিদেশী সরকারের কৌটিল্য অতঃপর আর এদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে প্রভাবান্বিত করিতে না পারে তাহার প্রতি জাতীয়তাবাদী নরনারীর একাগ্র নিষ্ঠা সক্রিয় হইতে দেখিলে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

রাজন্যবর্গের সিদ্ধান্ত—

সম্প্রতি দিল্লীতে ভারতীয় নরেন্দ্রমণ্ডলের এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা যে শুধু বৃটিশ-সরকারের প্রতি তাঁহাদের ঐকান্তিক আনুগত্যই প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নহে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনায় তাঁহাদেরও যে দাবী আছে এবং সে দাবীও যে উপেক্ষা করা চলিবে না—তাহাই বৃটেনকে সসম্মানে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। কংগ্রেস তাঁহার পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানাইয়াছেন, মুস্লিম লীগ তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যের কথা নিবেদন করিয়াছে—সুতরাং নরেন্দ্রমণ্ডলই বা তাঁহাদের আবেদন-নিবেদনের সুযোগ ছাড়িবেন কেন? বর্ত্তমান যুদ্ধে তাঁহারা অকাতরে বৃটিশকে সাহায্য করিতেছেন, অতএব তাঁহাদের দাবীগুলি যাহাতে উপেক্ষিত না হয় তৎপ্রতি তাঁহারাও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসনে উপাধিপ্রাপ্ত চিকিৎসকবৃন্দ

করিয়াছেন। তাঁহারা যদি এখনও এ সত্য না বুঝিয়া থাকেন—ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র দেশের অগণিত লাঞ্ছিত বুভুক্ষিতের প্রতিনিধিদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবে, এতকাল যাহাদের দ্বারা হইয়া আসিয়াছে তাহাদের দ্বারা নহে—তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে আপশোষ করিতে হইবে।

বাঙ্গালায় মৎস্যপালন—

বাঙ্গালার নদী খালে বিলে প্রচুর মৎস্য জন্মে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্যপালন ব্যবসায় আরম্ভ করিলে এ দিক দিয়া যেমন প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে, অপর পক্ষে তেমনই বহু বেকারেরও কাজের সুরাহা হয়। অনেক দিন আগে সিভিলিয়ান স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় এ প্রদেশে মৎস্যপালন শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া যে সকল সরকারী সাহায্য ও ব্যবস্থার সুপারিশ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা সরকার কার্য্যত তাহার কিছুই করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। অথচ উক্ত সুপারিশ কার্য্যকরী না করিয়াই বাঙ্গালা সরকার পুনরায় তদন্তের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তাহাতে সরকারী অর্থই শুধু নষ্ট হয়। সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে শিল্প বিভাগীয় ব্যয় বরাদ্দ আলোচনার সময় কৃষক-প্রজা দলের জনৈক সদস্য বাঙ্গালার এই শিল্পটির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমরা মন্ত্রিমণ্ডলকে এ বিষয়ে সহৃদয় দৃষ্টি দিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙ্গালায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা—

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে মিঃ ইদ্রিস আহমেদ মিয়ার এক প্রশ্নের উত্তরে বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী তথা শিক্ষা-মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক বাঙ্গালায় শিক্ষিত লোকের হার সম্বলিত এক বিবৃতি পেশ করেন। এই বিবৃতিতে বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় শিক্ষিত লোকের শতকরা হার এইরূপ দেখান হইয়াছে—ময়মনসিংহ ৭·৭, ঢাকা ১০·৯, ফরিদপুর ৯·১, বাখরগঞ্জ ১৪·৫, ত্রিপুরা ৯·৩, নোয়াখালী ১৩·২, চট্টগ্রাম ১৪·৪, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ৫·০, বর্দ্ধমান ১২·৩, বীরভূম ৮·১, বাঁকুড়া ৯·৯, মেদিনীপুর ১৭·৫, হুগলী ১৬·০, হাওড়া ২০·৭, চব্বিশ পরগণা ১২·৭, কলিকাতা ৪৩·২, নদীয়া ৬·৯, মুর্শিদাবাদ ৬·৩, যশোহর ৭·৬, খুলনা ১০·৯, রাজসাহী ৭·৭, দিনাজপুর ৭·৪, জলপাইগুড়ি ৫·৬, দার্জ্জিলিং ১২·৬, রংপুর ৬·৯, বগুড়া ১১·৩, পাবনা ৭·০, মালদহ ৩৮।

কনভোকেসনে উপাধিপ্রাপ্ত স্কটীশ চর্চ্চ কলেজের ছাত্রীবৃন্দ

হরিতকীর রপ্তানি—

গত জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে মোট ৫,৫৮,৮৮০ টাকা মূল্যের হরিতকী রপ্তানি হইয়াছে। পূর্ব্ব

স্বেচ্ছাসেবক নেতা শ্যামাপ্রসাদ সিংহ ও সেবিকানেত্রী
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী
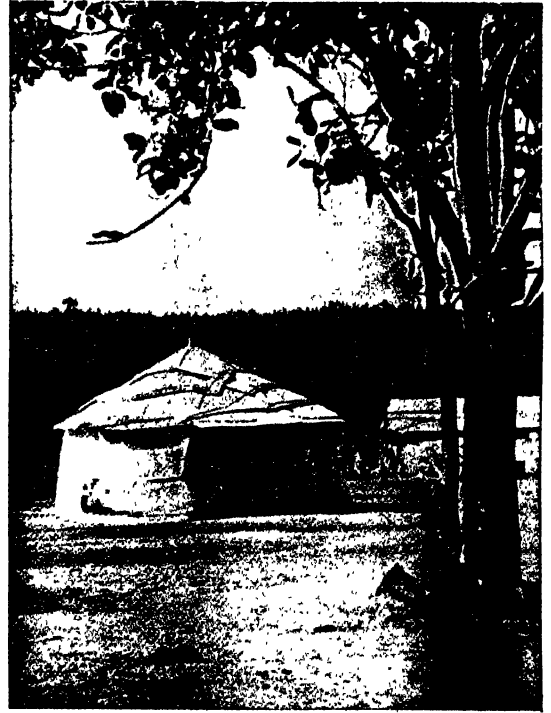
রামগড় মজহরপুরীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং
কমিটির অধিবেশন গৃহ

মজহরপুরীতে মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে বক্তৃতা করিতেছেন

রামগড়ে কংগ্রেসের ৫৩তম অধিবেশনের বক্তৃতা মঞ্চ

বৎসর জানুয়ারী মাসে মোট ৩,২৩,৭৭৬ টাকার হরিতকী রপ্তানি হইয়াছিল। প্রদেশ হিসাবে গত জানুয়ারী মাসে বাঙ্গালা হইতে ১,৪৮,৩৫৮ টাকার, বোম্বাই হইতে ৪,০৯,৭৫১ টাকার, সিন্ধু হইতে ৫ টাকার ও মাদ্রাজ হইতে ৭৬৬ টাকার হরিতকী রপ্তানি হইয়াছে।

এই হরিতকীই আবার বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের হাতে রূপান্তরিত হইয়া আমাদের বাজার ছাইয়া ফেলিবে এবং বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা শুষিয়া লইবে। কবে আমাদের জ্ঞানোদয় হইবে?

স্কটীশ চর্চ্চ কলেজের সম্মুখে ছাত্রধর্ম্মঘট

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—

হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করেন। এবার তাঁহার জন্মতিথি উৎসব হুগলী-জেলাবাসীগণের উদ্যোগে কামারপুকুরে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া আমরা খুশী হইলাম। কামারপুকুর ও তাহার চারি পাশের বহু গ্রামের হাজার হাজার নরনারী এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিল। সেখানে কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে জেলার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের আন্তরিক আগ্রহকে কার্য্যে পরিণত করিতে অর্থের অভাব পরিলক্ষিত হইবে না।

নূতন পথে ট্রাম—

কলিকাতা সহরে অধিবাসীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য ট্রাম কোম্পানী আপার সার্কুলার রোডে ট্রাম চালাইবার জন্য লাইন পাতিতেছেন এবং পার্ক সার্কাস হইতে বালীগঞ্জ ষ্টেশনে ট্রাম লইবার জন্য গড়িয়াহাটা রোডও বিস্তৃততর করা হইতেছে। সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশন ট্রাম কোম্পানীকে দুইটি নূতন রাস্তায় লাইন পাতিবার অনুমতি দিয়াছেন—(১) বেলিয়াঘাটা মেন রোড ও (২) পার্কসার্কাস হইতে সুরাবর্দ্দী এভেনিউ, দুর্গা রোড ও নূতন রাস্তা হইয়া ধর্ম্মতলা

স্কটীশ চর্চ্চ কলেজ ধর্ম্মঘটে অনশনব্রতী ছাত্র—হরিপদ ভট্টাচার্য্য ও অংশুমালী মজুমদার। —ফটো—সি ব্রাদার্স

ও লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড় পর্য্যন্ত। এ সকল শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ট্রাম কর্তৃপক্ষকে একটি বিষয়ে বাধ্য করা প্রয়োজন। ভারতের অন্যান্য সহরের তুলনায় কলিকাতায় ট্রামের ভাড়া অত্যন্ত বেশী এবং সম্প্রতি তাহাও আবার বাড়ান হইয়াছে। কর্পোরেশন যদি এই সঙ্গে ভাড়া হ্রাসেরও ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে সহরবাসীরা সত্যই উপকৃত হইবে। ট্রাম কোম্পানী বিদেশী মূলধনে গঠিত ও প্রতি বৎসর যে প্রচুর পরিমাণ

লাভ করেন, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী—

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গতঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ১৮৪০ সালের ১৩ই মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯২৫ সালে ৮৫ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। গত ১৩ই মার্চ্চ বোলপুর শান্তি নিকেতনে তাঁহার জন্মের শতবার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্যের কথা বাঙ্গালী কখন বিস্মৃত হইবে না। তিনি ভারতী মাসিক পত্রিকার প্রথম সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম যুগের সভাপতিদিগের অন্যতম ও হিন্দু
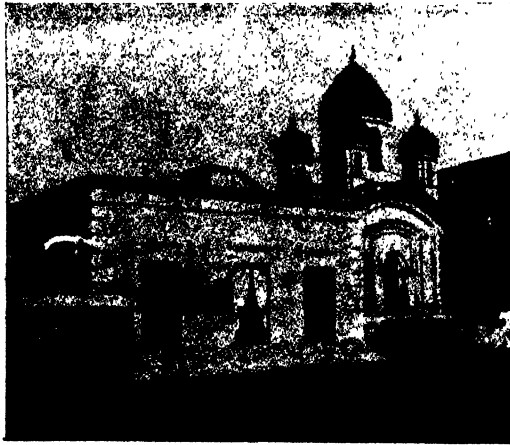
কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম ভবন (সংস্কারের পর)

—ফটো—সি ব্রাদার্স

মেলার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁহার রচিত জাতীয় সঙ্গীতও এক সময়ে বিশেষ আদৃত ছিল। সর্ব্বোপরি তিনি কবি ও দার্শনিক ছিলেন। কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের সম্মান তিনি বিশেষভাবে বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন। এই উপলক্ষে দেশের সর্ব্বত্র তাঁহার রচনাবলী পঠিত ও আলোচিত হইলে দেশ তদ্বারা উপকৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

আর-সি-বোনার্জ্জী—

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি স্বর্গত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার মিঃ আর-সি-বোনার্জ্জী গত ৫ই মার্চ্চ মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। তাঁহার নাম ছিল রত্নকৃষ্ণ কুরণ বোনার্জ্জী—তিনি বিলাতের রাগবী ও অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করিয়া ১৯০৭ সালে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়াছিলেন ও প্রথম জীবনেই আলিপুর বোমার মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। আইন ব্যবসায়ে দক্ষতার জন্য তাঁহার সুনাম ছিল এবং প্রচুর অর্থও তিনি উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি সকলের নিকট সম্মানিত হইতেন এবং সময়ে সময়ে তিনি সাংবাদিকের কার্য্যও করিতেন। মৃত্যুর দিনও তিনি আদালতে গিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া শয়ন করিলে রাত্রি সাড়ে দশটায় সহসা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম ভবন—

গত ১০ই মার্চ্চ নৈহাটীর নিকট কাঁঠালপাড়া গ্রামে মনীষী শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভায় বঙ্কিম ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব হইয়া গিয়াছে। ঐ স্থানে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৈতৃক বাটী। বঙ্কিমচন্দ্র যে বৈঠকখানায় বসিয়া তাঁহার অধিকাংশ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, সেই ঘরখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া উহা সাধারণের সম্পত্তিরূপে রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়াছেন। সম্প্রতি সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঐ গৃহের সংস্কার করা হইয়াছে। গৃহটির চিত্র আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম। উৎসব উপলক্ষে কাঁঠালপাড়ায় কলিকাতা হইতেই প্রায় ৪ শত সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি গমন করিয়াছিলেন। যাঁহাদের যত্ন ও চেষ্টায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই গৃহ গৃহীত ও সংস্কৃত হইয়াছে, তাঁহারা দেশবাসী সকলের ধন্যবাদভাজন সন্দেহ নাই। প্রসিদ্ধ আইনব্যবসায়ী ও দেশকর্ম্মী শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় সর্ব্বপ্রথম এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ও অর্থদান করিয়া বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার করিলেন, তাহার জন্য তাঁহাকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

রামগড় কংগ্রেস—

গত মার্চ্চ মাসের ১৯শে ও ২০শে তারিখে বিহার প্রদেশে হাজারীবাগের সন্নিহিত রামগড় নামক স্থানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৫৩তম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস অধিবেশনের কয়দিন পূর্ব্বেই রামগড়ে যাইয়া তথায় একটি খাদি ও কুটীর শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম দিনের অধিবেশনের পূর্ব্বেই তথায় ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় অতি অল্প সময়ের জন্য কংগ্রেসের অধিবেশন চলিয়াছিল এবং আলোচ্য বিষয় ও অধিক না থাকায় অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় নাই। পাটনায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশনে (কংগ্রেসের এক মাস পূর্ব্বে) দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তাহাই প্রকাশ্য কংগ্রেসের অধিবেশনে সমর্থিত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী পুনরায় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সংগ্রাম পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন! এবার কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে রামগড়েই শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বামপন্থী নেতাদিগের উদ্যোগে একটি আপোষ-বিরোধী সম্মিলনও হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেসের বর্ত্তমান পরিচালকগণ বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের সহিত আপোষের জন্য সর্ব্বদা উদগ্রীব বলিয়া সুভাষবাবু প্রমুখ অধিকাংশ কংগ্রেস কর্ম্মী তাহার বিরুদ্ধে মনোভাব জ্ঞাপনের জন্য এই স্বতন্ত্র সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সমগ্র দেশের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া এবার সুভাষবাবু যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। সুভাষবাবুর সমর্থকের দলের সংখ্যা যে কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দের সমর্থকগণের অপেক্ষা অনেক অধিক, তাহাও রামগড়ে দেখা গিয়াছিল। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন অপেক্ষা আপোষ বিরোধী সম্মিলনে অধিক লোকসমাগম হইয়াছিল এবং রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সম্বর্দ্ধনার মিছিল অপেক্ষা শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর অভ্যর্থনার মিছিলে অধিক লোক যোগদান করিয়াছিল। আপোষ বিরোধী সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এবং প্রসিদ্ধ বামপন্থী নেতা স্বামী সহজানন্দ উক্ত সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। দলে দলে বিহার ও বাঙ্গালার কৃষক ও মজুরগণ রামগড় যাইয়া উক্ত আপোষ বিরোধী সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনের পর রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ নিম্নলিখিত নেতৃবৃন্দকে লইয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করিয়াছেন—সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আচার্য্য কৃপালানী, সরোজিনী নাইডু, শেঠ যমুনালাল বাজাজ, সি-রাজগোপালচারী, ভুলাভাই দেশাই, খান আবদুল গফুর খান, শঙ্কররাও দেও, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, আসফ আলি, সৈয়দ মামুদ। পঞ্চদশ সদস্যের

বেহালায় কৃষিশিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন —ফটো, এন-ব্যানার্জ্জী

বেহালা শিশু প্রদর্শনীতে পুরস্কার প্রাপ্ত তিনটি শিশু —ফটো, এন-ব্যানার্জ্জী

নাম এখনও ঘোষিত হয় নাই। মৌলানা আজাদ কমিটীর সভাপতি এবং পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও আচার্য্য কৃপালানী যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হইয়াছেন।

এসিয়াটিক সোসাইটির ক্ষতি—

সম্প্রতি কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির সংগৃহীত বহুমূল্যবান হাজার হাজার পুঁথি কীটদষ্ট হইয়া ও অবহেলায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সব পুঁথির মধ্যে এমন অনেক পুঁথি ছিল যাহা রাজ্যের বিনিময়েও সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না। গত দেড়শত বৎসর ধরিয়া এইগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল। যে সব অযোগ্য অপদার্থ লোকের উপর এগুলি রক্ষার ভার ছিল অবিলম্বে তাহাদের তাড়াইয়া দেওয়া উচিত। এইসব মূল্যবান দ্রব্যের মূল্য যাহারা আদৌ জানে না তাহাদিগের উপর এত বড় একটা দায়িত্বভার ন্যস্ত

বালীগঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সংঘে হিন্দু সম্মিলন

করা আদৌ সঙ্গত হয় নাই। অবিলম্বে ক্ষতির পরিমাণ ও কেমন করিয়া ক্ষতির কারণ ঘটিল তাহার বিশদ তদন্ত হওয়া আবশ্যক। আশা করি এসিয়াটিক সোসাইটির বর্ত্তমান পরিচালক সংঘ অবিলম্বে তাঁহাদের তদন্তের ফল দেশবাসীকে জানাইবেন।

স্বাধীনতা ও আত্মরক্ষা—

সম্প্রতি গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আনে কয়েকটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতের প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। কেন না, এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে আত্মরক্ষার ক্ষমতা না থাকায় আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারিতেছি না। যতদিন না ভারত আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবে ততদিন স্বাধীনতা তাহার স্বপ্নমাত্রেই পর্য্যবশিত হইবে। বর্ত্তমান জগতে যে রাজনৈতিক খেলা চলিতেছে তাহাতে দুর্ব্বল জাতি স্বাধীনতা পাইলেও তাহা রক্ষা করিতে পারিবে না। প্রত্যেক দেশের যুবসম্প্রদায়েরই দেশরক্ষার স্বাভাবিক অধিকার আছে। ভারতের যুবকদেরও সেই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে। নবযুগের শিক্ষার ইহাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমরা শ্রীযুক্ত আনে মহাশয়ের প্রস্তাব অন্তরের সহিত সমর্থন করি।

গণপরিষদ চাই—

গণপরিষদের সাহায্যে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা করিবার জন্য কংগ্রেস যে দাবী উত্থাপন করিয়াছেন, আহমদাবাদের মুসলিম নবজীবন দল তাহা সমর্থন করিয়া এবং জিন্নাসাহেবের পরিকল্পিত ভারত বিভাগের দাবীর বিরোধিতা করিয়া নিজেদের দলের কার্য্যকরী পরিষদে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। আহমদাবাদের অহ্‌রর দল ও ঘোষণা করিয়াছেন যে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিবার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত। প্রগতিশীল মুসলমানগণ সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া আসিতেছেন ইহা সমগ্র দেশের পক্ষে কল্যাণজনক। জনকয়েক খেতাবী রাজা-উজীর-জমিদার-ব্যারিষ্টারের রাজনীতিক প্রভুত্ব স্থায়ী করিবার জন্য ৯ কোটি মুসলমানকে চিরদিন যে মোহগ্রস্ত রাখা সম্ভব নয়, ইহা তাহার সূচনা।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন—

গত ২৮শে মার্চ কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। এবার নূতন আইন অনুসারে কর্পোরেশনের সদস্য সংখ্যা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নূতন কর্পোরেশনে সদস্য সংখ্যা হইবে ৯৮ জন। তন্মধ্যে ৫ জন অলডারম্যান বাকী ৯৩ জন কাউন্সিলার কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন—৯৩ জনের মধ্যে ৮ জন গভর্ণমেণ্ট মনোনীত, বিশেষ নির্ব্বাচন কেন্দ্রের ১২ জন, শ্রমিক কেন্দ্রের ২ জন ও এংলোইণ্ডিয়ান কেন্দ্রের ২ জন—এই ২৪ জনকে বাদ দিয়া ৬৯ জনের মধ্যে ২২ জন মুসলমান ও ৪৭ জন

অমুসলমান হইয়াছেন। ৪৭ জন অমুসলমানের মধ্যে ২ জন মিঃ কোহেন ছাড়া ৪৫ জন হিন্দু—তাঁহারা নিম্নলিখিতরূপ দলভুক্ত—হিন্দু সভা—১৫, কংগ্রেস দলভুক্ত—২৪ জন ও স্বতন্ত্র—৬ জন। এখন এই ৪৫ জন হিন্দু একত্র মিলিত হইলেও কর্পোরেশনে সংখ্যাধিক দল হইতে পারিবেন না। কয়েকজন জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে দলে লইয়া তবেই সংখ্যাধিক দল হইতে পারিবে। বাঙ্গালায় কংগ্রেসে দলাদলির জন্য একদল কংগ্রেসকর্ম্মী ঘোষণা করিয়াছিলেন যে কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে কংগ্রেস হইতে কোন প্রার্থী স্থির করা হইবে না। কিন্তু শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ একদল কংগ্রেস সেবক কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রার্থী স্থির করিয়াছিলেন এবং দল হিসাবে তাঁহাদের পক্ষেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক প্রার্থী নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিয়াছিলেন। মুসলমান কেন্দ্রেও লীগের পক্ষ হইতে প্রার্থী স্থির করা হইয়াছিল এবং অধিকাংশ স্থলে তাঁহারাই জয়ী হইয়াছেন। এখন হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস উভয় দলের প্রার্থীরা সমবেতভাবে কার্য্য না করিলে কলিকাতাবাসী হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষার গত্যন্তর নাই। আমাদের বিশ্বাস, নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে উভয় দলে যতই বিবাদ থাক না কেন, এখন বৃহত্তর স্বার্থের জন্য উভয় দল একযোগে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও হিন্দুনেতা শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নির্ব্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন। ১নং ওয়ার্ডে ও ৯নং ওয়ার্ডে ১জন করিয়া কংগ্রেস পক্ষের প্রার্থী ও ১জন করিয়া হিন্দু প্রার্থী জিতিয়াছেন। ফলে ১নং ওয়ার্ডের পুরাতন কাউন্সিলার শ্রীযুত রাজেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (হিন্দু) ও ৯নং ওয়ার্ডের পুরাতন কাউন্সিলার শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস (কংগ্রেস) পরাজিত হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও হিন্দুনেতা শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মুসলমান কেন্দ্রে অতি অল্প সংখ্যক বাঙ্গালী মুসলমানই নির্ব্বাচনে জয়ী হইয়াছেন।

কুমারী পারুল দে —ফটো, পান্না সেন

নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত-সম্মিলনে গান গাহিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীঅরুণকুমার বসু

পাটনা মেডিকেল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সাইকোলজিকাল মেডিসিনে স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন।

কুড়মিঠায় সাহিত্য সম্মিলন—

গত ৫ই ফাল্গুন রবিবার শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের জন্মভূমি বীরভূম জেলায় কুড়মিঠা গ্রামে বীরভূম সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীহর মিত্র, সজনীকান্ত দাস, মৌলবী রেজাউল করিম, নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি পাল, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ঐ উপলক্ষে তথায় গমন করিয়া সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। হরেকৃষ্ণবাবু নিজে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সাদর অভ্যর্থনাদি করিয়া পরিতৃপ্ত করেন। পল্লীগ্রামে দরিদ্র সাহিত্যসেবীর গৃহে এইরূপ সম্মিলন প্রকৃতই সাহিত্যিকদিগের পক্ষে আনন্দের বিষয়। কলিকাতা হইতে সজনীবাবু গিয়া সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং সাতকড়িবাবু, তারাশঙ্করবাবু ও গৌরীহরবাবু বিভিন্ন শাখার সভাপতিত্ব করেন। সম্মিলনে

ভারতবর্ষ

সূচীপত্র

সপ্তবিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ-১৩৪৬—জ্যৈষ্ঠ-১৩৪৭

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচী—মাসানুক্রমিক

পৌষ—১৩৪৬

বহুবর্ণ চিত্র

দ্বিবর্ণ চিত্র

মাঘ—১৩৪৬

বহুবর্ণ চিত্র

দ্বিবর্ণ চিত্র

ফাল্গুন—১৩৪৬

বহুবর্ণ চিত্র

বিশেষ চিত্র

চৈত্র—১৩৪৬

বহুবর্ণ চিত্র

বৈশাখ—১৩৪৭

বহুবর্ণ চিত্র

বিশেষ চিত্র

জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৭

বিশেষ চিত্র

বহুবর্ণ চিত্র